রূপ - মঞ্চ

(বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ) ১৩৫৫

অষ্টম - বর্ষ প্রথম - সংখ্যা

কুমারী গীতশ্রী

[illegible] 'চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'মাটি ও মানুষ' চিত্রে একটি বিশেষ চরিত্রে দেখা যাবে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন 'প্রবীণ বন্ধু'

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও-এ ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রের স্যুটিংএর ফাঁকে গল্পগুজবরত কর্মী, শিল্পী ও বন্ধুবর্গ : ডান দিক হতে বামে (বসিয়া)। ১। নায়িকা শ্রীমতী দীপ্তি রায়। ২। বৃদ্ধের রূপসজ্জায় পাহাড়ী সান্যাল। ৩। সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায়। ৪। অসিতবরণ রোজই আসেন এঁদের সংগে গল্প করতে। ৫। জনপ্রিয় জহর গাঙ্গুলী। ৬। সহকারী পরিচালক নীতীশ রায়কে আড়াল করে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পাহাড়ীর কাছ হতে 'সিগারেট নিচ্ছেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী তাঁর বাম দিকে দাঁড়িয়ে। ১। প্রচার শিল্পী ফণীন্দ্র পাল। ২। কাহিনীকার কথাশিল্পী পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। পিছনের লাইনে দাঁড়িয়ে (বাম দিক হইতে . শ্যাম লাহা (হুয়া)। ২। দলের বিশেষ বন্ধু শিল্পী রবীন মজুমদার । ৩। প্রতাপ মুখোপাধ্যায় (মণ্ট বাবু)। ৪। 'ঘরোয়া'-চিত্র পরিচালক মণি ঘোষ।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ
১৩৫৫

রূপ-মঞ্চ

অষ্টম-বর্ষ
প্রথম-সংখ্যা

আমাদের আজকের কথা

আপনাদের আশীর্বাদ সিঞ্চনে আমাদের চলার পথ সহজ হ'য়ে উঠুক

রূপ-মঞ্চ অষ্টম-বর্ষে পদার্পণ করলো—অর্থাৎ চিত্র ও নাট্য সাংবাদিক জগতে আর এক বছরের অভিজ্ঞতা সে লাভ করলো। বর্ষারম্ভে বর্ষ-শেষের ফিরিস্তি দেবার রীতি আছে—আমরাও প্রতি বছর আমাদের পৃষ্ঠপোষক অর্থাৎ পাঠকসমাজের কাছে রূপ-মঞ্চের হিসাব নিকাশ পেশ করে থাকি। কি করতে পেরেছি—কি করতে পারিনি—এই পারা না-পারার হিসাব দাখিল করে যা পারিনি তা নতুন বছরে পারবো বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়ে, নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু আজ বর্ষারম্ভে বিগত বছরের হিসাব-নিকাশ-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে যে সম্পূর্ণ হতাশ হ'য়ে পড়েছি। সবই যে খরচার খাতায়- জমার ঘর যে শূন্য। কি জবাবদিহি দেবো আমাদের উপরওয়ালা অর্থাৎ পাঠকসমাজের কাছে! কিছুই যে দেবার নেই- একমাত্র আমাদের অযোগ্যতার কথা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করা ছাড়া। বিগত বছরেও কাগজ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়নি—আশানুরূপ তার অংগ-সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে পারিনি। গত বছর এমনি দিনে যে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তুলতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম—পূর্ণাংগত দূরের কথা, আংশিকভাবেও সে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে পারিনি। আমাদের অযোগ্য হাতে রূপ-মঞ্চের রূপ-পরিকল্পনা বারবার আঘাত খেয়ে বিকাশের পথ খুঁজে পাচ্ছে না—তাই সে অযোগ্যতার কথা ছাড়া কিই-বা বলবার আছে? কিছু যে নেই তা নয়—যা আছে, সে-কথা পরে বলছি। এই অযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে জনৈক পাঠক ব্যক্তিগত-ভাবে সম্প্রতি আমায় যে পত্রাঘাত করেছেন, প্রথমে সে সম্পর্কেই দু'একটা কথা বলে নিতে চাই। তিনি যা লিখেছেন, তার ভাবার্থ হচ্ছে: যদি রূপ-মঞ্চকে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে না পারেন, তবে অন্য কোন যোগ্য সম্পাদকের হাতে তার দায়িত্ব ছেড়ে দিন না! রূপ-মঞ্চকে আমরা অন্তরের সংগে ভালবাসি—তাই তাকে সমস্ত কলুষমুক্ত দেখতে চাই—আমরা চাই, কোন দুর্বলতাই যাতে তাকে স্পর্শ না করে।' রূপ-মঞ্চের প্রতি পত্র-প্রেরকের আন্তরিকতাকে প্রথমেই শ্রদ্ধা জানিয়ে নিচ্ছি। অবশ্য একমাত্র অনিয়মানুবর্তিতা ছাড়া রূপ-মঞ্চের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ তিনি আনেননি। তবু তাঁকে উত্তর দিতে যেয়ে একথা স্পষ্ট করেই বলতে চাই—যদি কোন যোগ্যতর ব্যক্তি রূপ-মঞ্চ সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন—এই মুহূর্তে রূপ মঞ্চ সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে দিতে আমি প্রস্তুত আছি। আমার অযোগ্য সম্পাদনায় রূপ-মঞ্চের অগ্রগতির পথকে কোন মতেই রুদ্ধ করে দাঁড়াতে চাই না। সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশের মাঝেই যে স্রষ্টার আনন্দ, একথা কোন মুহূর্তেই আমি ভুলতে পারি না। স্রষ্টার পদাধিকারের স্পর্ধা আমার নেই—কিন্তু তবু কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে রূপ-মঞ্চ যদি সুষ্ঠু রূপ নিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারে—রূপ-মঞ্চের একজন প্রাক্তন কর্মী হিসাবেও আমি যে আনন্দ লাভ করবো—শ্রদ্ধেয় পত্রপ্রেরক আমার

অন্তরের এই সত্যটুকুকেও কি বিশ্বাস করতে স্বীকৃত হবেন না? কিন্তু কথা হচ্ছে, সেই যোগ্য ব্যক্তির সন্ধান কি তিনি দিতে পারবেন? পারবেন না যে, একথা হলফ করে আমরা বলতে পারি। শুধু আমি বা আমরাই নই—যে পরিবেশের মাঝে চিত্র ও নাট্য মঞ্চ সম্বলিত পত্র-পত্রিকা-গুলিকে আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যেতে হয়, সে সংগ্রামের চাপে রূপ-মঞ্চের চেয়ে সুষ্ঠু রূপ নিয়ে কোন পত্রিকাই আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরম নিষ্ঠার সংগে যে সাতটি বছর আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি—এই সাতটি বছরের অভিজ্ঞতা থেকেই একথা নিশ্চিত করে বলতে পাচ্ছি। রূপ-মঞ্চকে কোনদিন ব্যক্তিগত মুনাফার লোলুপ দৃষ্টি দিয়ে আমরা বিচার ক'রে দেখিনি। তাকে শোষণ করে নিজেদের পরিপুষ্ট ক'রে তুলতে চাইনি—আমাদের বিলাস-বাসনের উপকরণ যোগাবার মাধ্যম বলেও তাকে গ্রহণ করিনি—তার অংগ-সজ্জার সংস্থান রেখে আমাদের অন্নসমস্যার দায়িত্বটুকুই শুধু তার ওপর চাপিয়েছি। এজন্য যেটুকু স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন, শুধু আমি কেন—রূপ-মঞ্চের কোন কর্মীর মাঝেই তার বিন্দুমাত্রও ফাঁক খুঁজে পাবেন না। যোগ্য ব্যক্তি হয়ত থাকতে পারেন—কিন্তু আমাদের প্রতিজন কর্মীর সহনশীলতা ও সংগ্রামশীলতার সামনে বুক ফুলিয়ে এসে দাঁড়াতে পারেন—এমন শক্তিমানের সাক্ষাৎ—এই সাত বছরের ভিতর ত পাইনি! যদি পাই, অবনত মস্তকে সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে নতি স্বীকার করবো। দম্ভোক্তি বলে আমাদের এই আত্মবিশ্বাসকে যারা তাচ্ছিল্যের হাসিতে উড়িয়ে দিতে চাইবেন—তাঁদের আমরা যে-কোন মুহূর্তে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান জানাতে প্রস্তুত আছি। নাট্য ও চিত্র সাংবাদিক জগতে এই সাত বছর রূপ-মঞ্চের কোন উল্লেখ-যোগ্য দান আছে কিনা, সে বিচারের ভার বাংলার চিত্র ও নাট্যামোদীদের হাতে। তবে আমাদের সহযোগী আরো যাঁরা রয়েছেন—তাঁদের পার্শ্বে রূপ-মঞ্চকে দাঁড় করালে তার শির যে লজ্জায় নত হ'য়ে আসবে না—এটুকু বলবার অধিকার হয়ত আমরা অর্জন করেছি। দোষ অন্যান্য পত্র-পত্রিকারও নয়—রূপ-মঞ্চেরও নয়, দোষ যে পরিবেশের মাঝে এই শ্রেণীর পত্র পত্রিকাগুলিকে পথ চেয়ে চলতে হয়, সেই পরিবেশের। স্বীকার করে নিলাম, রূপ-মঞ্চ একটি নিকৃষ্ট ধরণের পত্রিকা—তার কোন দানই নেই চিত্র ও নাট্য-জগতে—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তাদের—যাঁরা অজস্র নিন্দাবাদ বর্ষণে আমাদের চলার পথকে বারবার রুদ্ধ করে দাঁড়াতে চান—আর জিজ্ঞাসা করি আমাদের সেই সব সহযোগীদের—যাঁরা চিত্র ও নাট্য-সাংবাদিক জগতে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করবার দম্ভ নিয়ে ঢক্কা-নিনাদের সংগে আত্মপ্রকাশ করে রূপ-মঞ্চের চেয়ে যোগ্যতর বলে নিজেদের জাহির করছেন—তাঁরা কে কতটুকু যোগ্যতার পরিচয় দিতে সক্ষম হ'য়েছেন? নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর সামনে তাদের এই ঢক্কা-নিনাদ যদি শূন্য কুম্ভের দম্ভ ব'লে বিবেচিত হয়, কোথায় তাঁরা মুখ লুকোবেন! রূপ-মঞ্চের ব্যর্থ অনুকরণ যদি তাঁদের পাতায় পাতায় ফুটে ওঠে—কি তাঁরা জবাব দেবেন! তাই, সেই সব বন্ধুদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রূপ মঞ্চ কতটুকু কি করতে পেরেছে না পেরেছে, তা নিয়ে নিজেরা বিচার করতে না বসে—এ বিচারের ভার জনসাধারণের উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেদের যোগ্য করে তুলবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করুন—তাঁদের যোগ্যতা যেদিন প্রমাণিত হবে—রূপ-মঞ্চ সকলের আগে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে পিছনে হটে আসবে।

রূপ-মঞ্চের বর্তমান সম্পাদক ও তাঁর সহকর্মীদের ওপর যেসব পাঠকপাঠিকাদের আস্থা রয়েছে—যাঁরা আমাদেরই মত রূপ-মঞ্চের ভবিষ্যৎকে কেবলমাত্র পরিকল্পনার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান না—বাস্তবে সে রূপের বিকাশ দেখতে চান—আমার প্রথম দিককার কথায় যদি তাঁদের মনে কোন নৈরাশ্যের সঞ্চার হ'য়ে থাকে—সে নৈরাশ্য তাঁদের মন থেকে মুছে ফেলতেই অনুরোধ জানাচ্ছি। আর নতুন বছরে দাঁড়িয়ে নতুন করে আবার আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি—রূপ-মঞ্চকে আরো সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে তুলবার জন্য। পাঠক সাধারণের আন্তরিকতা এবং আমাদের নিষ্ঠা কোনমতেই ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে না। ক্ষণিকের দৌর্বল্য যা আমাদের চলার পথকে মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে চায়—অধিকতর উদ্দীপনা ও কর্মপ্রচেষ্টায়
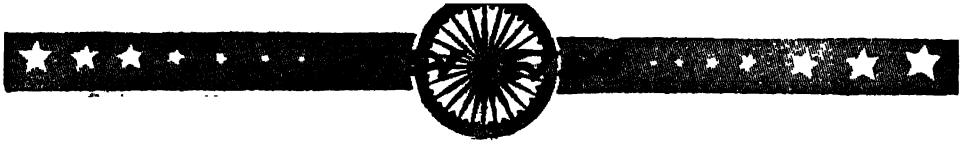
তাকে আমরা কাটিয়ে উঠবোই। আশা করি, রূপ-মঞ্চের পাঠক সাধারণের কাছ থেকে এ বিষয়ে সহযোগিতার বিন্দুমাত্রও ত্রুটি হবে না। আজ আমরা নিজেদের অন্ন-সমস্যার যেটুকু ভার রূপ-মঞ্চের উপর ন্যস্ত করতে বাধ্য হচ্ছি—ভবিষ্যতে সে দায়িত্ব থেকে তাকে মুক্তি দিতেই সচেষ্ট থাকবো। অর্থাৎ একখানি কাগজের বিনিময়ে পাঠকসাধারণ যে মূল্য দিয়ে থাকেন, তার ষোল আনাই ব্যয়িত হবে রূপ-মঞ্চের অংগ-সজ্জার চাহিদা মেটাতে। কাগজ প্রকাশে কাগজ সংগ্রহে যে অসুবিধা আছে, ভুক্তভোগী মাত্রই তা জানেন—রূপ মঞ্চের পাঠকসাধারণেরও তা' অজানা নয়। তাই সেই পুরোন সমস্যার কথা নতুন ক'রে উল্লেখ করতে চাই না। শুধু রূপ মঞ্চ নয়—নতুন করে প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকা আজ যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তা' হচ্ছে চিত্র জগতে কতকগুলি শঠ ও প্রবঞ্চকের আধিক্য! পাঁচ টাকা দিয়েও এদের কাউকে বিশ্বাস করবার উপায় নেই। এই শঠ ও প্রবঞ্চকের দল যেন আজ চিত্রজগতে কিলবিল কচ্ছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত চিত্র জগতে এদের আধিক্য এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, প্রকৃত সাধু ব্যক্তিদেরও আমরা সন্দেহের চোখে দেখে অনেক সময় তাঁদের ওপরও হয়ত অবিচার কচ্ছি। কারণ, শঠ ও প্রবঞ্চকদের এতই দৌরাত্ম্য সুরু হ'য়েছে যে, তাদের মাঝ থেকে প্রকৃত সাধুকে চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর। বৈদেশিক পত্র-পত্রিকার নজির দেখিয়ে লাভ নেই—আনুসংগিক ব্যয়ভার বহন করে বিজ্ঞাপন ব্যতীত কেবল মাত্র মুদ্রণ-সংখ্যার ওপর নির্ভর করে কোন দেশীয় পত্রিকা নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পেরেছে, এমন নজির মনে হয় কেউ দেখাতে পারবেন না। একদিকে যেমনি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যও পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, অন্যদিকে পণ্যের প্রচারকার্য দ্বারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থও এর সংগে কম জড়িত নেই। তবে কোন পত্র-পত্রিকাই নিজেদের মর্যাদাকে এই বিজ্ঞাপনের জন্য বিকিয়ে দিতে পারেন না। তাতে কাগজের ধর্মও যেমনি নষ্ট হয়—পাঠক সাধারণের বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত হ'য়ে কাগজের প্রচার সংখ্যাও ধীরে ধীরে কমে আসে। তাই কাগজের ধর্মরক্ষার জন্য কাগজের নিজস্ব দায়িত্বত আছেই—বিজ্ঞাপনদাতাদের দায়িত্বও কম নয়। কারণ, যে কাগজের প্রচার-সংখ্যা যত বেশী, সে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বিজ্ঞাপনদাতারা তত বেশী লাভবান হবেন। দুঃখের বিষয়, এই লাভের কথা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপন-দাতারা মনে না রেখে কাগজগুলির ধর্ম নষ্ট করতে উদ্যত হ'য়ে থাকেন। এটাকেও আমরা খুব বড় সমস্যা বলে মনে করি না। এই সমস্যার সম্মুখীন হবার ক্ষমতা আমাদের আছে। যারা আমাদের ধর্ম নষ্ট করতে উদ্যত হন, তাদের চৌকাঠও আমরা মাড়াই না। কিন্তু যারা আমাদের ধর্মের ওপর হাত না তুলে স্বাভাবিক ভাবেই বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন অথচ বিজ্ঞাপনের মূল্য চাইতে গেলে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন অথবা এড়িয়ে যাবার যোগাড়ে থাকেন—তারাই যে আজ আমাদের সামনে বড় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছেন। অনেকে বলতে পারেন, নগদ মূল্য না দিলে বিজ্ঞাপন গ্রহণ করবেন না। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব নয়। পরস্পরের সততার ওপরই পরস্পরের ব্যবসায়ী-স্বার্থ সুদৃঢ় হ'য়ে ওঠে এবং বিস্তার লাভ করে। ব্যবসায় যদি বিশ্বাস না থাকে, কোন দিনই তা প্রসারলাভ করতে পারে না। ব্যবসায়ের এই মূল কথাটিকে আজ কতগুলি শঠ ও প্রবঞ্চকদের জন্য আমরা অস্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি। তাই বলছিলাম, প্রকৃত সৎ ব্যক্তিদেরও এই প্রবঞ্চনার মাঝে চিহ্নিত করতে না পেরে, আমরা হয়ত তাঁদের উপর অবিচার কচ্ছি। অথচ অন্য পন্থাই বা কোথায়! অন্য পন্থা আবিষ্কার করতেই হবে। তাই আমরা আবেদন জানাচ্ছি চিত্র ও নাট্য জগতের সংগে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে, যিনি বা যাঁরা যখন এরূপ কোন প্রবঞ্চকদের সংস্পর্শে আসবেন, অন্যান্যদের কাছেও যেন তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দিয়ে সকলকে সতর্ক করিয়ে দেন। পরস্পরের স্বার্থের জন্যই আজ এই পন্থা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। নইলে প্রতি মুহূর্তে এদের প্রবঞ্চনার ফাঁদে আমাদের আটকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবার পুরোন কথায় ফিরে আসা যাক। বিগত বছরে আমরা সত্যি কোন যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছি কি

না—সে কথা পাঠক সাধারণের কাছেই জিজ্ঞাসা কচ্ছি। দশখানি সংখ্যা দিয়ে আমাদের সপ্তম বর্ষ শেষ করা হ'য়েছে। গত বছরে চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত আরো যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হ'য়েছে—তাদের পার্শ্বে রূপ-মঞ্চের এই দশটি সংখ্যাকে রেখে পাঠক সাধারণকে তুলনা করতে বলি—তাঁদের নিরপেক্ষ অভিমতের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে· তাঁরা যে রায়ই দিন না কেন আমাদের প্রতিকূলে হ'লেও, তাকে মাথা পেতে নেবো।

যোগ্যতা-অযোগ্যতা—পারা ও না-পারার কচকচানি দিয়ে পাঠক সাধারণকে আর ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে চাই না। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় রূপ-মঞ্চ অতীতের সাতটি বছর ডিঙ্গিয়ে এসেছে—সমালোচকের দৃষ্টিতে যত দুর্বলতাই ফুটে উঠুক না কেন—সে দুর্বলতাকে দম্ভোক্তি দিয়ে আমরা উড়িয়ে দিতে চাই না—সেগুলি সামনে রেখেই আমরা নতুন বছরে শুধরে নেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পা বাড়ালাম। শিশির-স্নাত ধরণীর মত পাঠক-সাধারণের আশীর্বাদ সিঞ্চনে আমাদের চলার পথ সহজ ও স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠুক। জয় হিন্দ্। —শ্রীকাঃ

ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রেক্ষাগৃহগুলি চিত্রাভাবে বন্ধ—

সংবাদপত্রে প্রকাশ, গত ২১শে মে থেকে ঢাকার ১৩টি ও চট্টগ্রামের ৫টি প্রেক্ষাগৃহ চিত্রের অভাবে চিত্র-প্রদর্শন বন্ধ রাখা স্থির করেছেন। কারণ, ভারতীয়, বৃটিশ ও মার্কিণ চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব সমিতিতে প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা পাকিস্থানে সর্বশ্রেণীর চিত্র সরবরাহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত করেছেন। সম্প্রতি পাকিস্থান সরকার অত্যধিক হারে যে আমদানী শুল্ক ধার্য করেছেন, তারই প্রতিবাদে উক্ত পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা মনে করেন, এই অত্যধিক হারে আমদানী শুল্ক দিয়ে চিত্র ব্যবসায় মোটেই চলতে পারে না। পূর্ব পাকিস্থানে এখন পর্যন্তও চিত্র প্রস্তুত হচ্ছে না। পূর্ববঙ্গে প্রায় ১১৭টি প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে—চিত্রের অভাবে সবগুলি প্রেক্ষাগৃহই বন্ধ করে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এর ফলে প্রায় ৫ হাজার হিন্দু ও মুসলমান পরিবারের সামনে যে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেবে, তাকে পাকিস্থান সরকার কোনমতেই অবহেলা করতে পারেন না। তাছাড়া আমোদ-কর বাবদ পূর্ববঙ্গ সরকারের ৫০ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। এই আয়কেই বা পাকিস্থান সরকার উড়িয়ে দেবেন কী করে? গত ২০শে মে, ঢাকা জেলা সিনেমা প্রদর্শক সমিতির এক বৈঠকে বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনার পর সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বসু ও চট্টগ্রামের জনাব সিদ্দিকীকে পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রীর নিকট বিষয়টি পেশ করার জন্য করাচীতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আমরা ফলাফলের জন্য উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় আছি।

শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসুর ক্ষমা প্রার্থনা

'চন্দ্রশেখর' চিত্রনাট্যে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উপন্যাসের বিকৃত রূপ দেবার জন্য খ্যাতনামা চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসু গত ১২ই মে সংবাদপত্র মারফৎ নিম্নোক্ত বিবৃতিটি দিয়েছেন: "ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নাট্য রচনায় আমার যে সব ত্রুটির জন্য আমি দেশের জনসাধারণ ও বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধুদের মনে কষ্ট দিয়েছি তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি সকলের কাছেই ক্ষমা চাইছি।"—দেবকীকুমার বসু।

পাঠকসাধারণের স্মরণ থাকতে পারে, 'চন্দ্রশেখর' চিত্র মুক্তিলাভ করবার পর তার বিকৃত রূপ দর্শনে বাংলার সুধীসমাজ ও পত্র-পত্রিকাগুলি একসংগে প্রতিবাদ জানান। গত কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা রূপ-মঞ্চে চন্দ্রশেখরের সমালোচনা প্রসংগে এই ত্রুটির জন্য আমরা সংবাদপত্র মারফত দেবকী বাবুকে বাঙ্গালী জনসাধারণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে অনুরোধ করি, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এরূপ অন্যায়ের মাঝে লিপ্ত হ'য়ে না পড়েন। দেবকী বাবু বা 'চন্দ্রশেখর' চিত্রের প্রযোজক পাইওনিয়ার পিকচার্স লিঃ-এর দিক থেকে এ বিষয়ে আমরা কোন সাড়া পাই না। আমাদের সমালোচনাকে অভিনন্দন জানিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত শতগ্রীব চট্টোপাধ্যায় স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনিও আমাদের অভিমতকে সমর্থন
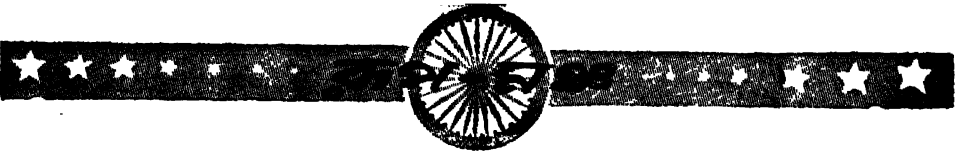
করে দেবকী বাবুকে ত্রুটি স্বীকারের জন্য আবেদন জানান, নইলে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয়দের দিক থেকে মানহানির মকদ্দমা রুজু করা হবে একথাও ব্যক্ত করেন। রূপ-মঞ্চের সপ্তম-বর্ষের একাদশ দ্বাদশ সংখ্যায় শতঞ্জীব বাবুর পত্রখানি 'সম্পাদকের দপ্তর'-এ প্রকাশ করা হয়। গত ৫ই মে উক্ত সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করে। ১২ই মে দেবকী বাবু সংবাদপত্র মারফৎ ত্রুটি স্বীকার করে উক্ত বিবৃতিটি প্রচার করেন। ভুল মানুষ মাত্রেই করে থাকে। কিন্তু সে ভুলকে স্বীকার করে নেবার ভিতর কিছুটা সাহসের পরিচয় রয়েছে বৈকী! তাই, এই ত্রুটি স্বীকারের জন্য দেবকী বাবুকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে তিনি যদি পত্র-পত্রিকাগুলির প্রতিবাদ প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই এই ত্রুটি স্বীকার করতেন, আরো সাহসের পরিচয় দিতেন। এই প্রসংগে শ্রীযুক্ত বসুকে আমরা বলতে চাই, তিনি যেন আমাদের ভুল না বোঝেন। তাঁর ওপর আমাদের ব্যক্তিগত কোন ক্ষোভ নেই! বর্তমানেও বঙ্কিমচন্দ্র ও অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যিকদের রচনা নিয়ে কয়েকখানি চিত্র নির্মিত হ'চ্ছে, দেবকীবাবুর এই ত্রুটি-স্বীকার তাঁদেরও কিছুটা সজাগ করে তুলবে বলে আমরা মনে করি। সর্বশেষে জনমত আজ জয়ী হ'য়েছে বলে চিত্রামোদী জনসাধারণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এমনি ভাবে সংঘবদ্ধভাবে যদি চিত্রজগতের প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জানান—চিত্রজগতের সমস্ত কলুষ ধীরে ধীরে অপসারিত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সেন্সার বোর্ডের নীতিজ্ঞান!

সম্প্রতি সেন্সার বোর্ডের নীতিজ্ঞানের যা পরিচয় পাচ্ছি, তাতে আমরা বেশ চিন্তিত হ'য়ে উঠেছি। এই সব নীতিবিদের দল কান ধরে যেভাবে আমাদের নীতিজ্ঞান শিক্ষা দিতে কোমর বেঁধে লেগেছেন, তাতে রাতারাতি সমস্ত দেশটাই নীতিজ্ঞ হ'য়ে না পড়ে। কোন চিত্রে মদ এবং মেয়ে মানুষ নিয়ে কোন দৃশ্য দেখলে আর রক্ষা নেই, এদের নীতিজ্ঞানের নাড়ীটা অমনি টনটনিয়ে ওঠে। বম্বে প্রভৃতি দেশে মাদকদ্রব্য-বর্জন-আন্দোলন সুরু হ'য়েছে, সেখানকার প্রাদেশিক সেন্সার কর্তারা মদ এবং মেয়েমানুষ সংক্রান্ত কোন দৃশ্য দেখলেই কাঁচি নিয়ে তেড়ে আসছেন। আমাদের এখানকার কর্তারাও যে তাঁদেরই পদাংকানুসরণ করে চলেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, এইভাবে কয়েক ফিট ফিল্ম কাঁচি দিয়ে কাটিয়েই কী তাঁরা সমাজটাকে রাতারাতি নীতিজ্ঞ করে তুলতে পারবেন? তা যে পারবেন না, তা আমরা জানি। জানি বলেই, তাদের বলতে চাই, সমাজের অভ্যন্তরে যে গলদ রয়েছে আগে সেদিকে দৃষ্টিপাত করুন। সমাজের দুষ্ট ক্ষত যেদিন তাঁরা মুছে ফেলতে পারবেন—পর্দার বুক থেকে সেদিন আপনা থেকেই এসব দুর্নীতি দূর হ'য়ে যাবে। সমাজকে বাদ দিয়ে চলচ্চিত্র হয় না—সমাজের প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হ'য়ে থাকে রূপালী পর্দায়। তবে তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে, এই সব দৃশ্যাবলী সত্যই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে না তার শোচনীয় পরিণামের কথা প্রকাশ কচ্ছে। সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের সাম্প্রদায়িক উগ্রতা সম্পর্কে আর একটি অভিযোগ আমাদের কানে এসেছে। সম্প্রতি কোন ছবির প্রাক-প্রদর্শনীর সময় জনৈক মুসলিম সভ্য একটি দৃশ্য সম্পর্কে আপত্তি তোলেন—ঐ দৃশ্যে নাকি কোন একটি লোক লুঙ্গি পরে একটি মেয়েকে অপহরণ করে--অমনি তার স্বধর্ম প্রীতির উচ্ছ্বাস দেখা যায়। তিনি ঐ দৃশ্যটিকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না বলে বেঁকে বসলেন। সংগে সংগে হিন্দু সভ্যরাও নাকি হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন। ঐ একই চিত্রে দেবমন্দিরে একটি মেয়েকে লুকিয়ে রাখবার দৃশ্য আছে। হিন্দু সভ্যরাই বা ছাড়বেন কেন? দেবমন্দিরে এই অনাচার তাঁদের ধর্ম-প্রীতিতে আঘাত করলো। তাঁরাও বেঁকে বসলেন, কাটো কাটো -ও দৃশ্যটি কেটে বাদ দাও। ফলে হ'লো এই, চিত্রটি মুক্তি-দিবসের ঘোষণা করেও মুক্তি পেল না। অসৎলোকদেরও যে ধর্ম আছে, এ আমাদের জানা ছিল না। কোন বিশেষ ধর্মের অসৎ হ'লেই যে সে-ধর্মের সকলকেই অসৎ বলে প্রতিপন্ন করা হ'বে, তাও নতুন করে শিখলাম সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের কাছে। আর অনাচার যে করে অপরাধ তার নয়—অনাচারের কথা যে প্রকাশ করে, সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের কাছে তাকেই করা হ'লো
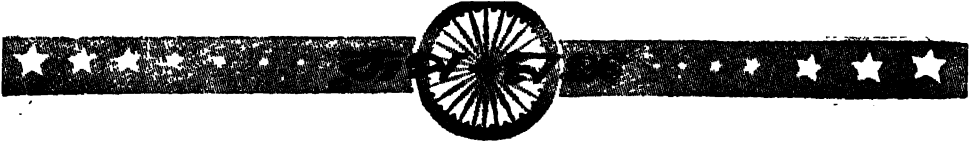
অপরাধী। এদের স্বধর্ম-প্রীতির নমুনা দেখে তাজ্জব বনে যাই।

হবেই বা না কেন! বৃটিশ আমলেও সেন্সার বোর্ডের যে কাঠামো ছিল—আজ স্বাধীনতা লাভ করবার পরও সে কাঠামো তেমনি রয়েছে। একমাত্র ডাঃ প্রতুল গুপ্ত ছাড়া এঁর ভিতর এমন কোন সভ্য নেই, চিত্র ও নাট্য সম্পর্কে যাঁদের বিচার শক্তিকে আমরা স্বীকার করে নিতে পারি! সেন্সার বোর্ড আজও জনসাধারণের সত্যিকারের প্রতিনিধি স্থানীয় হ'য়ে উঠলো না। এ বিষয়ে আমরা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি।

সর্দার প্যাটেলকে ধন্যবাদ!

১৯১৮ সালের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন করা হবে বলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল কিছুদিন পূর্বে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে এক ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা করতে যেয়ে তিনি বলেছেন যে, বয়স্কদের জন্য নির্মিত ছবিগুলি দেখে শ্রেণীবিভাগ করে দেওয়া হবে! এবং যে সব চিত্র অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে ক্ষতিকর, সেগুলিকে চিহ্নিত করে তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে সর্দার প্যাটেলের এই ঘোষণাকে আমরা অভিনন্দিত কচ্ছি এবং সংগে সংগে অনুরোধ কচ্ছি, যাতে অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য চিত্র নির্মাণে চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর আইনের বিধি-ব্যবস্থা আরোপ করেন। অথবা কেবল মাত্র ছোটদের উপযোগী চিত্র নির্মাণে যাতে তাঁরা আকৃষ্ট হন,সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি তাঁরা পেতে পারেন।

দিনের আলোতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে দিনের আলোতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে বলে মস্কোর একটি সংবাদে প্রকাশ। শিক্ষামূলক এবং শিল্পগত চলচ্চিত্রগুলিকে জনপ্রিয় করে তুলতেই সোভিয়েট সরকার এই প্রচেষ্টাকে কার্যকরী করে তুলছেন যাতে, দিনের বেলায় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের এই চিত্রগুলি দেখানো যেতে পারে। সোভিয়েট সরকারের এই প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত কচ্ছি।

কল্পনার বাস্তব রূপ

যে পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে ভারতের প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকর তাঁর 'কল্পনা' চিত্র নির্মাণ করেছেন—তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য ইতিমধ্যেই নাকি তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য কামনা করে আবেদন করেছেন। সাত শত জন শিল্পী উদয়শংকরের এই পরিকল্পিত শিল্পকেন্দ্রে শিক্ষার সুযোগ পাবেন বলে প্রকাশ। উদয়শংকরের এই প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হউক, তাই আমরা কামনা করি।

চিত্রমুক্তি দিবসে শিল্পী লাঞ্ছিত

কলকাতার একটা প্রেক্ষাগৃহে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত একখানা বাংলা চিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে যেয়ে বিক্ষুব্ধ দর্শক সমাজ উক্ত চিত্রের জনৈক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নাকি কোন এক প্রদর্শনী শেষে অপমানিত করেন। প্রকাশ, উক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী উক্ত চিত্রের প্রদর্শনী দেখতে এসেছিলেন। সংবাদটি প্রচারিত হ'য়ে পড়ে এবং দর্শক-বৃন্দ প্রদর্শনী শেষে তাঁদের ঘিরে দাঁড়িয়ে এরূপ নিন্দনীয় অভিনয়ের জন্য নিন্দাবাদ বর্ষণ করতে থাকেন। দর্শক-সাধারণের এরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণে আমরা খুবই মর্মাহত হয়েছি। তাঁরা এরূপভাবে প্রতিবাদ জানাতে না যেয়ে যেন সংঘবদ্ধভাবে পত্র-পত্রিকা মারফৎ নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন। দর্শক সাধারণের তরফ থেকে উক্ত শিল্পীদের কাছে আমরা এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সংগে সংগে শিল্পী ও কর্তৃপক্ষদের দর্শক সাধারণের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের দিকে দৃষ্টি রেখে চিত্র-নির্মাণে অনুরোধ কচ্ছি। —শ্রীকাঃ

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নাট্য-মঞ্চ

(দুই)

শ্রীযামিনী কান্ত সেন

যবদ্বীপের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাট্যকলাই হল পুত্তলিকার সাহায্যে সৃষ্টি। একে বলা হয় Wayang Golek বস্তুতঃ এই শ্রেণীর নাট্যকলা Sten Konow সাহেবের মতে বৈদেশিক যুগে প্রচলিত ছিল। ক্রমশঃ তা সারা প্রাচ্যভূখণ্ডে ছড়ায ডাক্তার মাকগাওনের মতে, চৈনিক নাট্যের আদিম সৃষ্টি হচ্ছে পুত্তলিকাভিনয়। [W. Ridgeway D D D N R P 266] কাজেই পুত্তলিকা নাট্য একটা উঁচুদরের নিমল অভিনয়-প্রসংগ ছাড়া আর কিছুই নয়। যবদ্বীপে এ শ্রেণীর নাট্যকলার আদিম শ্রী এখনও অপতিহত অবস্থায় আছে। এমন কি যেখানে জীবন্ত পুরুষ অভিনয় করে সেখানেও তারা নির্বাক আর একজন আবৃত্তিকারক তাদের বক্তব্য উচ্চারণ করে যায়।

এ শ্রেণীর নাট্যকলার প্রখর যাদু এদেশের পুতুলনাচেও দেখা যায়। কৃষ্ণনগরের পুতুলনাচ এ বিষয়ে খ্যাতি লাভ করেছে। পুত্তলিকা হলেও অংগভংগী এবং প্রচলিত ইংগিতও রূপকের সাহায্যে কথা বলার কোন কাজ বাকি থাকে না। এসব ইংগিত, মুদ্রা বা রূপক যারা বোঝেনা তাঁদের পক্ষে প্রাচ্য নাট্যকলা উপলব্ধি করা কঠিন। এজন্য চৈনিক থিয়েটার সম্বন্ধে একজন ইউরোপীয় রসিক যা বলেছেন তা যবদ্বীপের নাট্যকলা সম্বন্ধেও প্রযুক্ত করা চলে। তিনি বলেন: The Chinese Theatre is almost meaningless for any but Eastern appreciation. Although the high standard of the theatrical art is objectively cordent its intricate symbolism is lost to the uninitiated. এ লেখক যবদ্বীপের নাট্যকলাকে "extraordinary phenomena বলেছেন। যবদ্বীপের আর একশ্রেণীর নাট্যকলাকে বলা হয় 'Wayang Kulit (Shadow theatre) বা ছায়া-নাট্য। এ ব্যাপারটি আরও রহস্যজনক ও অদ্ভুত এবং এসব নাটকে মূর্তিগুলির সমন্বয় ও ছন্দ এক অপরিসীম সৌন্দর্য রচনা করে। চামড়া কেটে চ্যাপটা মূর্তি কাগজে আঁকা ছবির মত তৈরী করা হয়। এগুলির বাহুকে করা হয় চলন্ত। দেহের সংগে জুড়ে দেওয়া হয় যেন নড়চড় সম্ভব হয় মূর্তিগুলি রঙিন ও গিলটি করা হয়। এ রকমের ছায়ানাট্যের যাদু অনেকসময় রীতিমত নাটককে হতশ্রী করে। যা জীবন্ত অভিনেতা দ্বারা সম্ভব হয় না এবং যা পুত্তলিকার অভিনয়ের সীমা অতিক্রম করে Wayang kulit সেই জগতে এক অভিনব উন্মাদনা সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ যবদ্বীপে অভিনয় কলার যত বিচিত্র ও বহুমুখী রূপ এখনও জীবন্তভাবে প্রচলিত, জগতের আর কোথাও সেরূপ দেখা যায় না।

এসব ছাড়া আর একটি প্রথা আছে তাকে বলা হয় Wayang Beter বা চিত্রাভিনয়। এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সংগে সংগে চিত্র ও লিপিকে ক্রমশঃ খোলা হয়। এরকম ব্যাপারও কতকটা নাট্যশ্রীতে মণ্ডিত হয়ে থাকে। Wayang Golek পশ্চিম মধ্যম যবদ্বীপে প্রচলিত আছে। অন্যান্যগুলি সুরকর্ত ও যকযকও নগরে প্রচলিত আছে। এসব অঞ্চল প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার কেন্দ্র বরবুদর ও প্রম্বনম হ'তে বেশী দূরে নয়। এখানকার পুত্তলিকা অভিনয়ে পুতুলগুলিকে উঁচু হ'তে সুতো বা তার দিয়ে পরিচালনার রীতি নেই।

নাট্য নৃত্য—এসব নাট্যাভিনয়ে প্রচুরভাবে প্রচলিত। এগুলির বৈচিত্র্য যবদ্বীপের কলালীলাকে প্রচুর মর্যাদা দিয়েছে। ঝটিকার ন্যায় দ্রুতগামী নৃত্যে অভ্যস্ত ইউরোপীয় দর্শক এসব নৃত্যের ধৈর্য, অবকাশ

এবং শান্ত অথচ গভীর গতিভংগী দেখে বিস্মিত হয়। এর ভিতর সেরিম্পি নৃত্যাভিনয় নটীর দেহকে ধনুকের মত বংকিম করে তোলে এবং দু'টি হাতের অঙ্গুলিকে নানামুদ্রায় সজ্জিত করে সকলকে পুলকিত করে। এসব মুদ্রা জটিল বা জ্যামিতিক আকারকে অনুসরণ মোটেই করে না। মুখ চোখের, কণ্ঠের, শিরের, বক্ষের, কটির ও পদদ্বয়ের বিন্যাস এক্ষেত্রে যেন এক রূপের ধাঁধাঁ তৈরী করে—অথচ তাতে মৌলিক ভংগীটি অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত হয়ে সমগ্র প্রচেষ্টাকে আহত করে না। সেরিম্পি নৃত্যে সকল রকম গতিভংগীর রূপরচনা দেখা যায়। কখনও বা নটী প্রণত হয় অতি নিপুণ সরলতার ছন্দের ভিতর—কখনও প্রণামের শেষে উঠে পড়ে এক চমৎকার ভংগী করে। এঁদের দেহান্দোলন কোন ব্যক্তিগত কুৎসিত অংগভংগী বা ইসারা সৃষ্টি করে না। সব যেন তালে তালে চলে, যেমন ফুল মুকুল হ'তে ক্রমশঃ স্বভাবের প্রেরণায় বিকশিত হয়। সব চেয়ে এক্ষেত্রে এঁদের ভিতর লক্ষ্যের বিষয় হচ্ছে, এঁদের পরিচ্ছদ-কলার অনণুকরণীয় অফুরন্ত শ্রী।

সেরিম্পি-নর্তকী দেবীমূর্তির ন্যায় মুকুট পরে—সমগ্র ললাট জুড়ে এ মুকুট এক চমৎকার আবহাওয়া সঞ্চার করে। মাথার উপর কাল চুল এই উজ্জ্বল অলংকারের সৌন্দর্য আরও ঘনীভূত করে। তা' ছাড়া ব্রততীর মত সুদীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠের উপর ভুজঙ্গের মত একটা রেখার সূচনা করে। কানের দীর্ঘ কুণ্ডল এর সহিত সমতাল রক্ষা করে। কণ্ঠ ও বক্ষের ঊর্ধ্ব অংশ অনাবৃত থাকে, তা'তে কণ্ঠের সুরুচিপূর্ণ হারখানির সৌন্দর্য খোলে ভাল। একটা রক্তিম জ্যাকেট পরা হয় যা কটিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে। হাতের কেয়ূর মাথার কীরিটের সহিত এক ছন্দ বহন করে। কোমরে একটি নক্সা করা কাপড়ের বেল্ট, সমগ্র শরীরকে করে অপেক্ষাকৃত শীর্ণ—তা'তে নটীর সৌন্দর্য বাড়ে। পরিধানে থাকে শাড়ী, তা শুধু নিম্নভাগেই নক্সাকরা লুঙ্গীর মত থাকে—যদি তার পরিধি অতি বিস্তৃত কখনও বা সূক্ষ্ম ওড়নার মত ব্যাপার কোমর হ'তে ঝুলে থাকে—তাকে এক হাতে নিয়ে ছন্দের আয়তনকে দীর্ঘ ও লোভজনক করা হয়। পরিচ্ছদকলার এরূপ অসাধারণ অধিকার যবদ্বীপের নটনটীর একটা প্রশংসার বিষয়। এদেশে এবিষয়ে শান্তিনিকেতনের অভিনয়ই বিশেষ মনোযোগ দেয়। নৃত্যাভিনয়ে একাধিক নর্তকীও অনেক সময় যোগদান করে। এর ভিতর ছুরিকানৃত্যে দক্ষিণ হস্তে আলংকারিক ভাবে ছুরিকা গ্রহণ করে নর্তকী অভিনয়ে অগ্রসর হয়। এমন চমৎকার ওর ধরবার কায়দা যে, ছুরিকা-খানির বংকিম চেহারাকে নর্তকীর একখানা হাতের গয়না বলে ভ্রম হয়। পাঁচটি আঙ্গুলকে পাঁচরকম ভংগীতে ছুরিকার উপর নিহিত করা হয়। সমগ্র অংগের ভূষণের বৈচিত্র্যকে আরও যেন এ উপায়ে জোরালো করা হয়। হাতের বালার সংগে অস্ত্রের সংগতি হয় ধরবার কায়দায়—তা' যেন হয়ে পড়ে একটা ফ্রেমের মত। নারীর কমনীয়তাকে কোন রূপে আঘাত না করে এই ছুরিকানৃত্য সৌন্দর্যের এক মরীচিকা সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ যবদ্বীপের নৃত্যাভিনয় শালীনতায় ও সৃষ্টির পুলকে অপরাজেয়।

এসব অভিনয়ের সংগে সংগে গেমেলান (gamelan) বা অর্কেষ্ট্রা বাজতে থাকে অফুরন্ত ভাবে—তার সংগে আবৃত্তি ও গীত হয়।

যবদ্বীপের নাট্যাভিনয় রাজপরিবার ও উচ্চবংশের

পরিপোষকের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। শুধু বাদ্যকার, পরিচালক ও নৃত্যবিদদের সাহায্য করে এঁরা কর্তব্য-শেষ করে না। রাজবংশের মহিলারা কোন কঠিন নৃত্যে শিক্ষিতা হ'য়ে ঐ WayWang অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে—অনেক সময় রাজপুত্রেরাও পার্ট গ্রহণ করে সকলকে উৎসাহিত করে। রাজপুরী এতে নিজেকে অবনত বা অপমানিত মনে করে না। এসব রাজপরিবারের লোকেরা সম্প্রতি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমানই হয়েছে। বিস্ময়ের বিষয়, তা'তে এসব ক্ষেত্রে যোগদান করার কোন বাধা সৃষ্টি হয়নি। পুরাতন প্রথা অক্ষতভাবেই চলছে। পৃথিবীর অন্যত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কোন রাজসম্প্রদায় রামায়ণ-মহাভারত অভিনয়ে অগ্রসর হবে—একথা স্বপ্নেরও অতীত।

পুরুষানুক্রমে নিম্নজাতীয় লোকেরাই অভিনয় ব্যাপারে দীক্ষিত হয়। এসব থিয়েটার সামাজিক ও ধর্মগত অনুষ্ঠানরূপে পরিণত হয়েছে এবং শুধু টাকার জন্য এক্ষেত্রে অভিনয়ের জন্য কেউ অগ্রসর হয় না—ভালবাসার খাতিরই সব চেয়ে বড় খাতির।

WayWang Kulit বা ছায়ানাট্যের দু'টি রূপ আছে। একটি হল WayWang Purva—এতে মহাভারত ও রামায়ণের উপাখ্যানই অভিনীত হয়। রাম-রাবণের যুদ্ধ বা কুরুপাণ্ডবের সংঘর্ষ প্রভৃতি এক্ষেত্রে হয়ে পড়ে প্রধান বিষয়। অন্যটি হ'লো Panji Cycle অভিনয়ের ক্ষেত্র। এরকমের নাট্যে রাজবংশের পূর্বপুরুষ পূজারই একটা পথ খোলা হয় মাত্র এবং তাতে পূর্বপুরুষদের ভৌতিক শরীর উপস্থিত করা হয়। চামড়া ছুড়ি দিয়ে কেটে এসব মূর্তি করা হয় এবং কাঠের বা শৃঙ্গের handle রচনা করে এসব চালনা করা হয়। এসব রচনা করাও একটা উৎকৃষ্ট শিল্প। এঁদের ভিতর মাঝখানটা যে দ্রব্য রাখা হয় তাকে "গুণম" বলে। এইটির সাহায্যে পর্বত বা অট্টালিকাকে সূচনা করা হয়। তা ছাড়া এক্ষেত্রে একটা পর্দা ব্যবহৃত হয় যার নাম হচ্ছে Kelir। এর মাপ হচ্ছে ৬× ১৫ ফুট। এটা তৈরী হয় সুতোর কাপড়ে এবং একটা ফ্রেমে রাখা হয়। একটি ল্যাম্প প্রধান পরিচালকের মাথার উপর ঝুলিয়ে রাখা হয় এবং এটিই WayWang মূর্তিগুলির ছায়া নিক্ষেপ করে পর্দার ওপর। ছায়ানাট্যে Dalang হচ্ছে প্রধান অধিকারী। পুত্তলিকাগুলি চালিত হওয়ার সময় এই লোকটি সংগে সংগে চলতে থাকে এবং গদ্যে ও পদ্যে আবৃত্তি করতে থাকে। পদ্য অংশ গীত হয়। এ ছাড়া অর্কেষ্ট্রাও চলতেই থাকে ক্রমান্বয়ে কোথাও না থেমে। অর্কেষ্ট্রার আওয়াজের উচ্চনীচতা নির্ভর করে নানা ঘটনার দ্যোতিত ভাবের গভীরতা ও উৎকটতা বা সামান্যতার সহিত সংগতি রক্ষা করে। যখন কোন উচ্ছ্বাসকে প্রবলভাবে উপস্থিত করতে হয় তখন বাদ্যযন্ত্রে উচ্চস্বরে মূর্ছনা ফলিত করা হয়—তা না হয় যখন যেরূপ দরকার সেরূপ ভাবে উচ্চনীচের তরঙ্গায়িত লীলায় ধ্বনিসুষমাকে বিকশিত করা হয়। রাত্রি নয়টা হতে ভোর ছয়টা পর্যন্ত যবদ্বীপের ছায়ানাট্য প্রদর্শিত হয়। ছায়ানাট্য সুরু হওয়ার সময় পর্দার মাঝখানটাতে পশ্চাতের সূচনা করবার জিনিষটি রাখা হয়। ক্রমে ক্রমে নানা মূর্তিগুলিকে উপস্থিত করা হয়। এর কায়দা সম্বন্ধে কোন লেখক ও দর্শক বলেন: The audience is seated behind the screen on the opposite side that is to the performers." অনেক সময় কতকগুলি মূর্তিকে বহুকাল মঞ্চে রাখা হয়—"A group of figures are left on the stage without movement for several minutes—the points of
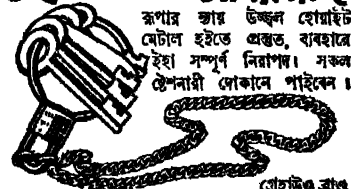
horn or wooden handles being struck in soft plantain stems while the recitation proceeds."

এসব মূর্তির বাহুগুলি সব কনুইতে ও কাঁধে কব্‌জা দিয়ে জুড়ে দেওয়া। যতরকমের ভদ্র, শান্ত, ভীষণ মূর্তি হ'তে পারে এগুলির অংগপ্রত্যংগের ভংগী দ্বারা সব রকম অবস্থা দেখান যায়। Dalang যত অধিক বিচক্ষণ হয় ততটা দৃশ্যও পরিপাটি হয়। কতকগুলি মূর্তি বাক্সেও ভর্তি থাকে—প্রয়োজন হলে ওখান থেকে বাইর করে কাজে লাগান হয়। এ বাক্সের সংগে একটা ঘণ্টা (gong) থাকে। যখন কোন নূতন দৃশ্য দেখান হয় তখন Dalang ঘণ্টা বাজিয়ে তা' সূচনা করে। পর্দার মধ্যভাগটিতে ল্যাম্পের আলো দিয়ে উজ্জল করা হয়—তার দু'ধারে ক্রমশঃ গভীর ছায়ায় ঢাকা থাকে। WayWang এর মূর্তিগুলি দু'দিকের এই ছায়ার ভিতর দিয়ে পর্দার উপর থাকে এবং অদৃশ্য হয়। এর ভিতর যুদ্ধের দৃশ্যগুলি, অশ্বারোহী দ্রুত ধাবমান জন্তু। অকালে উড়ন্ত রাক্ষসের চেহারাগুলি অতি চমৎকার হয়। সন্ধ্যার সূর্যালোকে মেঘমালার মত এগুলি তীক্ষ্ণভাবে চোখে পড়ে। অর্জুন বিবাহ নামক একাদশ শতাব্দীর একটি যবদ্বীপের আখ্যানের ছায়াভিনয়ের সময় অনেক লোক অশ্রুবর্ষণ করে—যদিও তারা জানে এসব মূর্তি বাস্তব নয়, চামড়ার তৈরী জিনিষ।

বলা হয়েছে WayWangWong হচ্ছে সত্যিকারের নাটক যেখানে মানুষই অভিনয় করে থাকে। রাজার দরবারে এরকমের অভিনয় হয়। সাধারণ লোকের ভিতর যে অভিনয় হয়—তা'ও অতি চমৎকার। stage বলতে এসব ক্ষেত্রে মঞ্চ বা উচ্চ কোন ভূখণ্ড বোঝায় না। প্রধান দর্শকদের সামনের জায়গাকেই মঞ্চ বলা হয়। সাধারণতঃ রাজবাড়ী "পণ্ড পোতে" বা মণ্ডপে এরকম অভিনয় হয়। সর্বসাধারণ বিনা ব্যয়ে এসব নাট্যাভিনয় দেখতে আসে। অভিনেতারা একটা ছোট সাজঘর (green-room) হ'তে বেরিয়ে আসে। সাজঘরটি অর্কেষ্ট্রার পাশেই থাকে। তাতে একটি দরজা থাকে এবং তার উপর একখানি পর্দা থাকে।

যবদ্বীপের পরিচ্ছদকলার সুখ্যাতি প্রচুর। এরূপ চমৎকার ভাবে বেশভূষা পরান আর কোথাও দেখা যায় না। পোষাকগুলি খুব জমকালই হয়ে থাকে। বিশেষতঃ রাজকীয় ইতিবৃত্ত অভিনয়ের সময় পোষাকের ঘটা দেখে তাক্‌ লেগে যায়। স্ত্রী চরিত্রগুলি স্ত্রীলোকের দ্বারাই অভিনীত হয়। ভাঁড়ের পার্ট খুবই প্রিয় সকলেরই। এরা প্রধান নটদের নানা ভাবে ব্যঙ্গ করে' সকলের কৌতুক সৃষ্টি করে।

অভিনয়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কঠিন রূপক ও বিধিতে ভরপুর। সবকিছু বুঝতে হলে প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রয়োজন। প্রাচীন প্রচলিত সৌন্দর্যের আচার ও রূপকাদির সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকলে ভিতরকার সৌন্দর্যের রসবোধ হওয়া কঠিন। উপরকার চাকচিক্যে মুগ্ধ হওয়া এক্ষেত্রে প্রধান বা শেষ কাজ নয়। সৌন্দর্যের ফোয়ারা বুঝতে হলে যেমন তার কুন্তলায়িত গতির সমগ্র হিল্লোলের মর্ম বুঝতে হয় এক্ষেত্রেও তেমনি ব্যাপার। এজন্য পাশ্চত্য রসিকগণ এসব রস হ'তে বহুপরিমাণে বঞ্চিত হয়। যবদ্বীপের অভিনয় ও নৃত্যের মাঝখানটা কোন গণ্ডী নেই। অভিনেতার চালচলন চমৎকার ছন্দে নিয়ন্ত্রিত হয়—এলোমেলো ভাবে কেউ ঘোরাফেরা করে না। চলবার তালে বাজনাও ঝঙ্কৃত হয়।

যবদ্বীপের মুখোস নাটক বা Wayang Toping এর উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। এটা খুবই জনপ্রিয়। যবদ্বীপের মুখোসগুলির—বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য অতুলনীয়। মুখোসের ভিতর ভাবপ্রকাশের একটা অসীম সম্ভাবনা থাকে। মানুষের স্বাভাবিক মুখের কুঞ্চন বিকৃতি বা সুকৃতি সীমাবদ্ধ—কিন্তু মুখোসের সাহায্যে অতি ভয়াবহ দানব লোক এবং অতি আনন্দজনক দেব-লোককে সামনে উপস্থিত করা যায়। তিব্বতেও মুখোস নাট্য প্রচলিত আছে। তার ভিতর Black hat dance একটা বিখ্যাত সৃষ্টি। অভিনেতারা সকলেই মুখোস পরে' রঙ্গস্থলে উপস্থিত হয়—তা'তে এক আশ্চর্য উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষেও মুখোসনৃত্য ও অভিনয়

প্রচলিত আছে। ইদানীং ইউরোপেও Mask Dance চলতি হয়েছে—মধ্যযুগেও ছিল। তবে প্রাচ্য রচনা ও অভিনয়ের ঐশ্বর্য কোনকালেই ইউরোপ অতিক্রম করতে পারেনি। এদেশে কলিকাতায় জেলেপাড়ার সংঙে মুখোস পরে শোভাযাত্রার ব্যবস্থা আছে। অথচ ভারতের আধুনিক রঙ্গ-মঞ্চ এসব বিষয়ে একান্ত পশ্চাৎপদ।

বস্তুতঃ যবদ্বীপের কলালীলাতে একদিকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কার কাজ করেছে—অন্যদিকে চৈনিক শীলতার (Culture) সমৃদ্ধ উপঢৌকন অজস্র সম্পদ দান করেছে। এ অঞ্চলের দ্বৈপায়ন অনুভূতি এর ভিতর একটা সামঞ্জস্য সংস্থাপন করেছে। রীতি, আচার ও সংস্কার যে সব বিধিকে বহু শতাব্দী ধরে প্রামাণ্য করে তুলেছে, যে সব সম্পুর্ণভাবে অটুট আছে। যারা এ সব বোঝেনা বা জানে না তাদের কাছেও যবদ্বীপের রূপরচনা অনবদ্য ও চমৎকার। বহিবঙ্গ ঐশ্বর্যের সংগে প্রাচ্য-রচনায় অন্তরংগ গভীরতা,ঐশ্বর্য ও অনুভব প্রয়োজন। যাদের নিকট দ্বিতীয়টি অপরিচিত তারা এসব নাট্যকলার ভিতর হেঁয়ালি দেখবে প্রচুর। সোণার হরিণের-এর মত ভিতরকার সৌন্দর্য বার বার অদৃশ্য হয়ে পুলককে করবে ঘনীভূত এবং মাদকতাকে করবে অসীম। এটাই হল উচ্চতর কলার লক্ষণ। ফরাসী কবি ম্যালারমে (Male arme) বলেছে, পাতা ঢাকা ফুলে বা ঘোমটা ঢাকা মুখে যতটা সৌন্দর্য খোলামেলা—চেহারায় তা থাকে না। রহস্য ভিতরে না থাক্‌লে সৌন্দর্যের আকর্ষণ সহজেই শুকিয়ে যায়। এজন্য সব কিছু স্পষ্ট বলতে বা করতে নেই। তাঁর উক্তি 'To name is to destroy, to suggest is to create চিরস্মরণীয় হয়েছে। যবদ্বীপের রচনার সৌন্দর্য অনেকটা যে চৈনিক নাট্যকলার মত দুর্বোধ্য একথা স্বীকৃত হয়েছে। এই দুর্বোধ্যতা দূর হ'তে পারে যদি কেউ সাধনার দ্বারা এর অন্তঃপুরে ঢুকতে পারে। বাইরের দ্বারে আঘাত করে ভিতরের প্রাণবস্তুকে পাওয়া যায় না। একথা বিশ্বাস করতে হবে এসব নাট্য সৃষ্টি শুধু জ্ঞানের (intelectual) কারসাজি নয়। এর ভিতর জীবনের সম্পর্ক এবং রক্তের আস্বাদ আছে। এসব নৃত্য, গীত ও অভিনয় অখণ্ড সামাজিক জীবনের অংগীভূত। যবদ্বীপের প্রাণ শতদল বিকশিত হচ্ছে অজস্র ধারায় এসব ঘটনা ও আনন্দের ভিতর। এসব না থাকলে প্রমাণিত হ'ত এ অঞ্চলের সৌন্দর্য ধ্যান একেবারে ভ্রষ্ট হয়েছে, জয়যাত্রার পথে। ইউরোপ এসব ক্ষেত্রে যা' দান করতে পারে তা' এত অকিঞ্চিৎকর যে তা বলবার নয়।

এশিয়ার সুদীর্ঘ নিশা অবসান কখনও হবে কিনা কে জানে। ইউরোপের যান্ত্রিক জীবনের চাপে পড়ে এশিয়ার হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে যাওয়ার গতিক হয়েছে। এজন্য এই সৌন্দর্য জগতের সহিত সকলের ভালরকমে বোঝাপড়া হওয়া প্রয়োজন। [সমাপ্ত]

বর্তমান বাংলা-চলচ্চিত্র শিল্প

পঙ্কজ দত্ত

●

কলকাতা যে ভারতের মধ্যে ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র হিসাবে সবচেয়ে বিরাট, এবিষয়ে এখন আর সন্দেহ করা যায়না। এখানে প্রতি বছর বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী মিলিয়ে যতগুলি ছবি মুক্তিলাভ করে, ভারতের আর কোন সহর তা দাবী করতে পারে না। তা সত্বেও কিন্তু বাংলাদেশের চিত্রশিল্প তার পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তারিত ক'রে তুলতে পারছে না কিছুতেই। কারণটা খুঁজে বের করা শক্ত নয়।

কলকাতায় এখন যে মোট আটান্নটি চিত্রগৃহ চলছে, তার মধ্যে তিরিশটি হ'চ্ছে অবাঙ্গালীদের সম্পত্তি অথবা তাঁদের পরিচালনাধীন। অর্থাৎ এই তিরিশটি চিত্রগৃহে যা আয় হয়, এখানকার খরচ চালিয়ে দেবার মত সামান্য অংশ ছাড়া টাকার সবটাই চলে যায় বাংলার বাইরে। তাছাড়া বছরে কয়েকশত যে ভিন্ন-ভাষার ছবি মুক্তিলাভ করে, তার দরুণ কলকাতা ছাড়া বাংলার পল্লীঅঞ্চল থেকেও বছরে প্রচুর টাকা বাইরে চালান হ'য়ে যায়। একখানি ছবির কথা জানি যে, ছবিখানি এক কলকাতাতেই একটি মাত্র চিত্রগৃহে প্রায় তিন বছর একাদিক্রমে প্রদর্শিত হয়ে তের লক্ষ-টাকারও বেশী উপার্জন করে; উক্ত চিত্রগৃহের দরুণ এবং অন্যান্য আনুসংগিক ব্যাপারে ঐ তিন বছরে খুব বেশী করে ধ'রলেও তিনলক্ষ টাকার বেশী কলকাতায় খরচ হয়নি। সুতরাং ঐ একখানি ছবিই শুধু কলকাতা থেকেই একচোটে দশলক্ষ টাকা বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া মফঃস্বল থেকেও বড় কম তোলেনি। ঐ তিন বছরে অ-বাংলা ছবি সমগ্রভাবে বাংলার চিত্রামোদীদের দেওয়া খুব কমপক্ষে আড়াই কোটি টাকা তুলে নিয়ে গিয়েছে। আর তার তুলনায় বাংলাদেশের ছবি বাংলার বাইরেকার প্রদেশগুলি থেকে ঐ সময়ের মধ্যে মোট আড়াই লক্ষ টাকাও ফিরিয়ে আনতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বাংলার চিত্রামোদীদের দেওয়া টাকার বেশীর ভাগটাই যদি বাংলার বাইরে চলে যেতে থাকে—তা'হলে শুধু চিত্রশিল্প কেন, বাংলার সাধারণ আর্থিক অবস্থাটাই বিপর্যস্ত হ'তে বাধ্য।

এই বিপদ থেকে বাঁচবার উপায় দুটি। একটি হচ্ছে, 'কোটা' প্রবর্তনের দ্বারা বাংলার প্রত্যেক চিত্রগৃহে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাংলা ছবি দেখাতে বাধ্য করে বাংলা ছবির সংখ্যা ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং অপরটি হ'চ্ছে বাংলার বাইরেকার যে-যে প্রদেশের ছবি বাংলাদেশে দেখানো হবে, প্রধানতঃ সেই সেই প্রদেশে বাংলা দেশে বাংলার মূলধনে তোলা একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ছবি প্রদর্শন করবার জন্য বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দ্বারা বাংলা থেকে অপহৃত টাকার অন্ততঃ কিছুটা আদায় ক'রে নিয়ে আসা। বলা বাহুল্য সরকারি উদ্যোগ ছাড়া ওরকম কোন ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়।

এবিষয়ে বাংলার চিত্রামোদীদেরও এগিয়ে আসা দরকার। শুধু বেশী ক'রে বাংলা ছবি দেখলেই সমস্যার কোন সমাধান হবে না। অন্যান্য ভাষার ছবিও তাঁরা দেখুন কিন্তু সেই সংগে যেন এটাও লক্ষ্য রাখেন যে, তাঁদের দেওয়া পয়সার বেশী অংশটাই বাংলার চিত্রশিল্পের উন্নতি ও প্রসারের কাজেতেই খাটতে পারছে, বাংলার বাইরের অন্য কোথাও নয়। চিত্রামোদীরা সংঘবদ্ধ ভাবে চাপ দিলে তবেই বাংলার আইন পরিষদও সমস্যাটাকে আমলের মধ্যে আনার যোগ্য ব'লে বিবেচনা করবে; নচেৎ খুব সম্ভবতঃ প্রস্তাব দু'টো সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ব'লে পরিত্যক্ত হবে।

মাদ্রাজী ছবি মাদ্রাজ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থান এবং ভারতের বাইরেও মাদ্রাজী অধ্যুষিত বহু স্থানে প্রদর্শিত হয়ে মাদ্রাজ থেকে অপহৃত টাকার ফাঁক পুরণ করায়

যোগ পায়, মাদ্রাজের চিত্রশিল্প তাই ক্রমশঃ প্রসারের দিকেই এগোতে পারছে। পাঞ্জাবের ছোট শিল্পটিও ওখানে তোলা, বছরে আট দশখানা ছবি ভারতের সর্বত্র দেখিয়ে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বেশ কিছু টাকা তুলে ওখানকার শিল্পের আর্থিক ক্ষমতা বজায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে। শুধু বাংলা দেশ থেকে টাকা বাইরেই যাচ্ছে, বাইরে থেকে কিছু তুলে এনে সমতা রক্ষার কোন ব্যবস্থাই নেই; প্রদেশের সমগ্র আর্থিক সংগতিই দুর্বল হয়ে পড়ার এটা একটা প্রধান কারণ। এর প্রতিকার করতে যাওয়ার মধ্যে প্রাদেশিকতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, বরং প্রদেশের আর্থিক সংগতি সমতা হারানোর ফলে দুরবস্থাপ্রসূত যে প্রচণ্ড অশান্তি সমগ্র অধিবাসীকেই বিপর্যস্ত করে তোলে, তা গোড়ার আগে বাংলা চিত্রশিল্প যে উদ্যম দেখিয়েছিলো এবং বাংলা ছবি-তৎকালে যে বিস্ময়কর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলো, তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্র কেন্দ্র কলকাতারই হবার কথা। কিন্তু তা হ'তে পারেনি এবং না পাবার প্রধানতম কারণই হচ্ছে, আয়ের অংশ বাংলার বাইরে চলে গিয়ে এখানকার শিল্পে নিয়োজিত মূলধন নিঃশেষ ক'রে দেওয়া। তাই বাস্তবের সামনে আজ মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াতে হবে প্রত্যেককেই; এ ব্যাপারে প্রাদেশিকতার দোষারোপে কুণ্ঠিত হ'তে গেলে আস্তে আস্তে বাংলা দেশকে বাইরের লোকের মর্জির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হবে সম্পূর্ণরূপে। স্বাধীন দেশেও অবাধ ব্যবসার মানে এক প্রদেশ দ্বারা আর এক প্রদেশকে শোষণ যদি হয়ে দাঁড়ায় তো সে-নীতির মধ্যে কিছু রদবদল নিশ্চয়ই দরকার। বাংলা দেশের চলচ্চিত্রশিল্প ছোট নয়, প্রসারের তার আশু সম্ভাবনাও বিরাট; টাকা খাটাবার লোকের অভাব নেই পৃথিবীর যে কোন দেশের সংগে উৎকর্ষে পাল্লা দিয়ে এবং তার যোগ্য ছবি তোলার মত গুণী কলাকুশলী ও শিল্পীও যথেষ্টই রয়েছে—তা সত্ত্বেও বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে পঙ্গু হ'য়ে থাকতে হচ্ছে। প্রমোদকরের টাকা, আমদানী কাঁচা মালের ওপর ধার্য শুল্কের টাকা কেন্দ্রীয় তহবিলে যাচ্ছে, আর ছবি দেখিয়ে জনসাধারণের থেকে পাওয়া টাকা যাচ্ছে অন্যত্র চালান হয়ে; এ অবস্থায় বাংলা দেশে চলচ্চিত্রশিল্প থাকার কি সার্থকতা

সর্বজনপ্রিয়
অভিনেতা
পাহাড়ী সান্যাল
তাঁর অভিনীত কয়েকটী
'চিত্রের রূপ-সজ্জায়'
রূপ-মঞ্চ : অষ্টম-বর্ষ :
প্রথম সংখ্যা '৫৫

একটু মিঠেল হাসির ঝলকানি

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন এমন ঝকমারিতে আর কোনদিন পড়িনি। প্রথম দিন রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের বাড়ীতে তাঁকে পাকড়াও করলাম। রাত আটটা থেকে একটা অবধি পিছু পিছু রইলাম। তাঁকে দেখলাম পরিচালক নীরেন লাহিড়ী—সাহিত্যিক পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়—অভিনেতা শ্যাম লাহা—প্রচারবিদ ফনীন্দ্র পাল, আরো অনেকের সংগে তাসের মজলিসে—ভোজনের আসরে। দেখলাম, গল্প-কৌতুকে হাসির ফোয়ারায় সম্পাদকের আস্তানাটি মাতিয়ে তুলতে। কিন্তু আমি একটুকুও ফাঁক পেলাম না আমার কাজ হাসিল করে নিতে। সম্পাদকের পিছু পিছু আর একদিন ছুটলাম ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। 'সাধারণ মেয়ে'র দৃশ্যপটে যেয়ে হাজির হলাম। মিঠেল হাসির ঝলকানিতে স্বাগত অভিনন্দন জানালো। বেলা ১টা থেকে রাত ৯ টা অবধি কাটিয়ে দিলাম ওর আশে-পাশে-কাছে-কাছে। বিশ্রামের ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরও পেলাম। কিন্তু আমারই যখন মন ভরলো না তাতে—তখন সেটুকু দিয়ে আপনাদের মন ভরানোর দুরাশা বাধ্য হ'য়েই পরিত্যাগ করতে হ'লো। আর অত ভিড়ের মাঝে কোন কথা কী বলা যায়—না শোনা যায়? অন্য কোন দৃশ্যপট হ'লে নয় দেখা যেত। কিন্তু বেনুবাবুর দৃশ্যপটের কথাই আলাদা! লোকটা যেন বেনু বাজিয়েই যাচ্ছে সব সময়, আর তার মিঠেল স্বর স্টুডিওর যত কর্মী ও শিল্পীকে একজায়গায় টেনে এনে জড়ো করছে। কে জানে ও লোকটা কোনদিন বৃন্দাবনে বেনু বাজিয়েই বেড়াতো কি না! দেখলাম চাঁদাচপল চির নবীন অসিতবরণকে—পরিচালক চারু সেন—ধীরেশ ঘোষ—মণি ঘোষ—আরো যেন কাকে কাকে। শব্দযন্ত্রী ইরাণী—গৌর দাস—চিত্রশিল্পী সুরেশ দাস—অভিনেতা নীতীশ মুখোপাধ্যায়—রবীন মজুমদার—ইন্দু মুখুজ্জে—অভিনেত্রী দীপ্তি রায়—পাঁচু বাবু—ফণী পাল—নিরঞ্জন ঘোষ নীতীশ রায়—সুরশিল্পী রবীন চাটুজ্জে—চিত্রজগতের বুলবুল সুপ্রভা সরকারকেও দেখলাম। দেখলাম আরো অনেককেই। কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো কর্মাধ্যক্ষের টেবিলে ভারিক্কী চালে যে লোকটিকে কাজ করে যেতে দেখলাম। তাঁর অভিনয় দেখেও এতটা হাসি পায় না—যতটা পেল অভিনয়ের বাইরে তাঁর গাম্ভীর্য দেখে। ভাবলাম এও ওর অভিনয় কিনা কে জানে! কিন্তু না। অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্য করে দেখলাম—কোন ভাবান্তর নেই। কাজের বেলায় সত্যি ওর নিষ্ঠার অন্ত নেই। কাজে ব্যস্ত ভারিক্কী চালের এই লোকটী আর কেউ নয়, আপনাদের চিরপরিচিত তুলসী। এই পরিবেশের মাঝে খুব বেশী প্রয়োজনীয় কথা যেমনি কাউকে বলা চলে না—কারোর কাছ থেকে তেমনি আদায় করাও যে দুরূহ—আশা করি তা আপনারা বুঝবেন। আসবার সময়ও ও মিঠেল হাসি দিয়েই বিদায় দিল। আর একটা তারিখ দিল রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে আসবে বলে। বেশ কয়েক ঘণ্টা এসে কাটিয়ে দেবে আমাদের কর্মীদের মাঝে। এত মিঠেল যাঁর হাসি, তাঁকে অবিশ্বাস করি কী করে বলুনত? খবরটা এসে দিলাম সম্পাদককে।

শুধু তিনিই নন—রূপ-মঞ্চের প্রত্যেক কর্মীরাই খুশী হ'লেন এ সংবাদে। নির্দিষ্ট তারিখে ওর আসা-পথ চেয়ে আমরা উন্মুখ হ'য়ে রইলাম। কেউ ওকে উপহার দিতে নিয়ে এলো রজনী গন্ধার স্তবক। কেউ সুদৃশ্যভাবে বাঁধাই করে আনলো পর পর রূপ-মঞ্চের কয়েকটী সংখ্যা। ওর আসবার সময় নির্ধারিত ছিল বেলা ৯টায়। ৯টা—১০টা—১১টা—১২টা বেজে গেল। ওর আশা আমরা ছেড়ে

দিলাম। বারোটার পর একটা লোক এসে একটা চিরকুট হাজির করলো। ওরই লেখা। লিখেছে: আমার অভিনীত কোন চিত্রের প্রাক-প্রদর্শনীর জন্য আগামী তারিখে যেতে পারবো না—ক্ষমা করবেন। পরে একটা তারিখ আপনাদের সুবিধা মত ঠিক করে জানাবেন।" আমরা ত' অবাক। চিরকুটের তারিখ দেখলাম দু'দিন পূর্বেকার। ব্যাপারটা একটু ঘোলাটে মনে হলো। খোঁজ নিয়ে জানলাম, দোষ ওর নয়—খবরটা যাতে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে পৌঁছোয় একন্য চিরকুটটি পৌঁছে দেবার ভার দিয়েছিল ও আমাদেরই এক বন্ধুর ওপর। তিনিই দয়া করে সে দায়িত্ব আর পালন করেননি সময় মত। যাক—আর একটা তারিখ ঠিক করে সম্পাদক ওকে জানিয়ে দিলেন। সে তারিখের আর একটুকুও নড়চড় হ'লো না। সময়েরও না। কাটায় কাটায় ও এসে হাজির হ'লো। গাড়ী থেকে নামতে নামতে বল্ল: মাপ করবেন—ওদিন আপনাদের কষ্ট দিয়েছি বলে। আমি কোনদিন কথার খেলাপ করিনা। এমনিইত আমাদের দুর্নামের অন্ত নেই—তার ওপর ইচ্ছা করে আর বোঝা চাপাতে চাই না।" ওর কথার সংগে মিষ্টি হাসিতে মনের ক্ষোভ কোথায় যে ধুয়ে মুছে গেল! কোন অভিযোগই আনতে পারলুম না। বরং সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ওই অভিযোগ আনলো: "আপনাদের আর কী ক্ষতি হ'য়েছে! ক্ষতি হ'য়েছে আমার। শুনলাম, চর্ব্য-চস্য-লেহ্য-পেয়'র আয়োজন করেছিলেন—ফাঁকে পড়ে গেলাম!" গাড়ী থেকে নামা আর সিঁড়ি বেয়ে উপরে আসা—এ আর কতটুকু সময়ের ব্যবধান! কিন্তু এরই মাঝে ও যে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা কী আর মনে করেছিলুম! অন্য সময় হ'লে নয় কথা ছিল না। কিন্তু তখন বেলা দশটা! কোন রকমে মুখে গ্রাস পুরে যার যার অফিসের দিকে ছুটেছেন—ওকে দেখে তাঁরাও যে ট্রাম ধরবার কথা ভুলে যাবেন তা আর ভাবতে পারিনি! ওকে নিয়ে আমরা ভিতরে এসে বসেছি। দোতলার ঝুল বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। সকলের দৃষ্টি দেখে এবং তাঁদের ফিসফিসানী শুনে আমিত চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। আজকের দিনটাও যদি এমনিভাবে গুণগ্রাহীদের খুশী করবার জন্য ওকে ছেড়েদি', তাহ'লে আরো অনেককেই খুশী করবার পরিকল্পনা থেকে আমায় বিরত থাকতে হবে। আমি সবিনয়ে তাঁদের বল্লাম: "রূপ-মঞ্চের" পাতায় আপনাদের সকল কৌতূহল মেটাতে চেষ্টা করবো—আজকের দিনে আপনারা মাপ করুন। ওকে ছেড়ে দিন আমার আওতায়।" সম্পাদককে বল্লাম: দোতলার ঘরটিতে আজ ওকে নিয়ে আমায় থাকতে দিন।" আর অনুরোধ করলাম দু'জন সহকর্মীকে: ভাই তোমরা দু'জনে দুই দরজা পাহারা দাও—কেউ যেন আজ আর এঘরে না আসতে পারেন!" কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমি তৈরী হ'য়ে নিলাম। ও আর আমি বসলাম সামনা-সামনি—অর্থাৎ দু'জনে মুখোমুখী। টেবিলের ওপর সিগারেট ও বড় এক প্লেটে প্লেট ভরতি পান রাখা হ'লো। আপনাদের নিশ্চয়ই ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে—আর চটছেন মনে মনে আমার প্রতি। ভণিতা রেখে নামটা বলে ফেলোনা বাপু! কিন্তু নামটা আপনারাও কী অনুমান করে নিতে পারেননি? ভারতীয় চিত্রজগতে এঁকে বাদ দিয়ে এমন আর কোন অভিনেতার নাম করতে পারবেন কী—যাঁর হাসি দেখে আপনারা মজেছেন? নিশ্চয়ই পারবেন না। এই উল্লেখযোগ্য হাসির ঝিলিক রূপালী পর্দায় একমাত্র পাহাড়ী সান্যালের ওষ্ঠাধারেই খেলে যেতে দেখেননি কী? নামটা কিন্তু আসলে ওর পাহাড়ী নয়। পাহাড় দেশে জন্মেছিল বলেই সকলের কাছে ও পাহাড়ী নামে পরিচিত হ'য়ে উঠলো। আর ওর সত্যিকারের নগেন্দ্র নাথ সান্যাল নামটা অপরিচয়ের গণ্ডির মাঝে যেয়ে পড়লো। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে দার্জিলিং-এর শৈল-শিখরে পাহাড়ীর জন্ম হয়। এঁদের পরিবারটি তিনপুরুষ ধরে লক্ষ্ণৌতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছে। পাহাড়ীর পিতামহই বাংলা থেকে প্রথম যেয়ে সেখানে ঘর বাঁধেন। শুধু প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভিতরই নয়—লক্ষ্ণৌর স্থায়ী বাসিন্দাদের ভিতরও এই সান্যাল পরিবারটি যথেষ্ট খ্যাতি ও সুনাম অর্জন করেছে। মাত্র দেড় বৎসর বয়সের সময় পাহাড়ীর মাতৃবিয়োগ ঘটে। মায়ের অভাব কোনদিন

পাহাড়ীর পিতা পাহাড়ীকে অনুভব করতে দেননি। তিনি একাধারে পিতৃ ও মাতৃ-স্নেহে পাহাড়াকে বড় করে তোলেন। পাহাড়ীর পিতা সৈন্য বিভাগের হিসাব-পরীক্ষক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় গুন গুন করে ভজন গান করতেন। মাতৃহীন পুত্রকে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে রাখতেন--গাইতে গাইতে তিনি নিজে কত সময় তন্ময় হয়ে যেতেন। সে তন্ময়তা শিশু পাহাড়ীকেও স্পর্শ করতো। সংগীতের অন্তর্নিহিত মাধুর্য তার শিশুমনকে অপূর্ব উন্মাদনায় অনুপ্রেরিত করতো। ধীরে ধীরে সেও গাইতে থাকে—নিজে নিজে একলা একলা মনে মনে সুর ভেজে চলে। বড় হবার সংগে সংগে শ্রোতার দলে তার বাবাকে পায়। বাবা একাধারে শ্রোতা ও উৎসাহদাতা। কিন্তু এই শ্রোতা ও উৎসাহদাতাকে সে বেশীদিন ধরে রাখতে পারলো না। মাত্র দশবৎসর বয়সের সময় পাহাড়ী তার বাবাকেও হারালো। তার জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত বেদনার ভার বুক পেতে গ্রহণ করলেন। আর সংগীত শিক্ষার উৎসাহদাতার স্থান দখল করলো তার মেজকাকার ছেলে স্বনামধন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল—পাহাড়ীর দ্বিজু দা। তিনি কোত্থেকে একটা ভাঙা হারমোনিয়াম সংগ্রহ করেছিলেন--ওকেই কেন্দ্র করে চলতে লাগলো পাহাড়ীর সাধনার কসরৎ। পরিবারটি ছিল খুব গোঁড়া। গৃহে বাদ্যযন্ত্রাদির সাহায্যে কেউ সংগীত চর্চা করে—এ ব্যাপার কেউই বরদাস্ত করতে রাজী নন। তাই এদের সাধনা চলতে লাগলো অন্য বাড়ীতে আর গোপনে।

পাহাড়ীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা আরম্ভ হয় লক্ষ্ণৌতে। শৈশবের পাঠ্যাবস্থাকালীন একটী ঘটনা আজও পাহাড়ীর মনে দাগ কেটে রয়েছে। ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে পাহাড়ী কারো সংগে কোন বাকবিতণ্ডায় নিজেকে জড়িয়ে নিতে চায় না। যে সত্যকে নিজের জীবনে একাধিকবার অনুভব করেছে, যুক্তি তর্কের দ্বারা কেউ তাকে অস্বীকার করতে চাইলেও পাহাড়ী অন্ততঃ সে দলে থাকতে চাইবে না। কেষ্ট ঠাকুর বা শিব ঠাকুর কোন ঠাকুরের বেশে সে অদৃশ্যশক্তি ধরা দেন, পাহাড়ী হয়ত সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলতে পারবে না—তবে এক অদৃশ্যশক্তি অন্তরাল থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধ-সংগ্রামে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করছেন—এসত্য বহুবার নিজের জীবনে পাহাড়ী অনুভব করেছে। সামান্য একটী ঘটনা বলে অনেকের কাছে মনে হ'তে পারে, কিন্তু পাহাড়ীর জীবনে এই একটী ঘটনা বিরাট সত্যের রূপ নিয়ে আজও ভাস্বর হ'য়ে আছে। তখন তার বয়স হবে এগারো কী বারো। দাদা আদরও যেমন দেন, শাসনেও শৈথিল্য প্রকাশ করেন না। প্রতি পরীক্ষাতেই তিনি লক্ষ্য করে আসছেন, পাহাড়ী অঙ্কে আশাজনক নম্বর পায় না। শিক্ষকদের কাছে থেকে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন—অঙ্কশাস্ত্রে পাহাড়া বরাবরই একটু দুর্বল। কয়েক জনের সাথে এনিয়ে পরামর্শ করলেন—অনেকেই পাহাড়ীর জন্য একজন অঙ্কের শিক্ষক নিযুক্ত করতে পাহাড়ীর দাদাকে পরামর্শ দেন। পাহাড়ীকে একদিন তার দাদা ডেকে বল্লেন: একজন অঙ্কের মাষ্টার দেখে নাও—তোমার যাকে পছন্দ হয়।"

পাহাড়ীদের স্কুলে একজন ইংরেজ-শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকতায় তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় শুধু পাহাড়ীই নয়—বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রেরাই পেয়েছে। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব ভাল ছিল না। শিক্ষকের এই আর্থিক অভাব-অনাটন বহুদিন ছাত্রকে পীড়া দিয়েছে—কিন্তু প্রতিকারের কোন পথ খুঁজে পায়নি। সুযোগ এলো। পাহাড়ী মনে করলো, ঐ শিক্ষককে নিয়োগ করলে যেমনি তার নিজের পক্ষে ভাল হবে, তেমনি পরোক্ষভাবে তাঁকে সাহায্য করাও হবে। সে এক ছুটে চলে গেল তার ঐ বিদেশী শিক্ষকের কাছে। যেয়ে বলল: আমাকে পড়াতে হবে আপনার।" শিক্ষক উত্তর দিলেন: বেশত, ভাল কথা। তোমাকে পড়াতে পারলে আমি খুশীই হবো।"

পাহাড়ী খুশী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে: টাকা পয়সা কী দিতে হবে—দাদাকে যেয়ে কী বলবো?" তিনি হেসে উত্তর দেন: সেজন্য ভাবতে হবে না। যা দেবে তাই নেবো। দাদাকে যেয়ে বলো, তিনি যা দিতে পারবেন, আমি তাতেই খুশী হবো।" পাহাড়ী খুশী মনে ফিরে আসে। দাদাকে এসে সব বলে। দাদা অমত করেন না। অমত জানায়—

আত্মীয়-স্বজন,পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল। তাদের তথাকথিত স্বদেশপ্রীতি যেন হঠাৎ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। তারা প্রতিবাদ জানিয়ে পাহাড়ীর দাদাকে বলে: শেষে একটা বিধর্মী ইংরেজকে রাখবে? না—না,অমন কাজ কখনও করো না।" দশচক্রে ভগবান ভূত। তাদের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া দাদার উপায়ন্তর থাকে না। দাদা পাহাড়ীকে ডেকে আমতা আমতা করে বলেন, না পাহাড়ী, তোমার এ মাষ্টারকে রাখা চলবে না—সকলেই নিষেধ করছেন।" পাহাড়ী কান্নায় ফেটে পড়ে। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে দাদার কাছ থেকে ছুট দেয়। রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে না। ঘুমের ভান করে থাকে। কিন্তু সারারাতে ঘুম একবারও ওর চোখে বসতে পারে না। রাতটাকে ও কাটিয়ে দেয় কান্নায় আর অনিদ্রায়। বারবার ও যেন কার উদ্দেশ্যে মিনতি জানিয়ে বলে: ভগবান তুমি যদি থাকো, এর বিহিত করো। মাষ্টার মশায় বিদেশীয় বলে কোন অন্যায় ত করেন নি, আর আমি তাঁকে বলে এসেছি—আমি তাঁকে মুখ দেখাবো কেমন করে!" ফরসা হ'য়ে যেতে পাহাড়ী বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ওর পূর্বেই ওর দাদা ঘুম থেকে উঠে উঠোনে পায়চারী কচ্ছিলেন। তাঁরও সারারাত অনিদ্রায় কেটেছে কিনা কে জানে! ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্বে তাঁর মনও হয়ত আলোড়িত হ'য়ে উঠেছিল। নইলে পাহাড়ীকে দেখতে পেয়েই বলবেন কেন: পাহাড়ী, শোন।" পাহাড়ী মুখ নীচু করে দাদার সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি বলেন: দুঃখ করো না। তোমার এই মাষ্টারমশায়কেই নিয়োগ করা হবে আর আসছে কাল থেকেই।"

সপ্ত রঙের জাল বুনতে বুনতে সূর্য তখন পূর্ব দিকে দেখা দিয়েছেন। পাহাড়ীর মনের সমস্ত অন্ধকার যেন নিমেষে তার জ্যোতিতে দূরীভূত হ'য়ে যায়।

লক্ষ্ণৌর শিক্ষা সমাপ্ত করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাহাড়ী কাশীতে যায়। সেখানে বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করে। সেখান থেকে ফিরে আসে লক্ষ্ণৌতে। লক্ষ্ণৌতে এসে সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করে। ওস্তাদ মহম্মদ হোসেন, ছোটে মোন্না খাঁ, হায়দরাবাদের নাসির খাঁ ও আহম্মদ খাঁর নিকট সংগীত এবং স্বর্গতঃ রাসবিহারী শীল ও খলিফ আবিদ খাঁ হোসেনের কাছে তবলা-বাদ্য শিক্ষা করে। সংগীতে ওর জ্ঞান-পিপাসা তবু দিন দিন বেড়েই চলে। ও লক্ষ্ণৌর ম্যারিস মিউজিক কলেজে সংগীত শিক্ষার জন্য ভরতি হয়। নাসির খাঁর নিকট যখন পাহাড়ী সংগীত শিক্ষা করে, ওর গুরুভগ্নী লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত বাইজী বেনাজীর-এর আত্মমর্যাদার একদিন যে পরিচয় পায়, ওকে তা খুবই মুগ্ধ করে। নাসির খাঁর নিকট থেকে পাঠ নেবার জন্য একদিন ও বসে আছে ওর ঐ গুরু-ভগ্নীর বাড়ীতে। বাইজীর বাড়ীতে নানান লোকজনই আসে। সেদিনও এলো একজন। বেশ কাপ্তান গোছের লোকটি। পাহাড়ীকে দেখে তার মনে অন্য কোন সন্দেহ জেগেছিল কিনা তা ও বলতে পারে না—হয়তো লোকটি স্বভাবশতঃই একটা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে বসে। বেনাজীর তা শুনতে পায়। গুরুভাইয়ের সামনে লোকটির এই অশ্লীল কথা বাইজীর আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। সে ছুটে এসে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায়। শুধু প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত হয় না—লোকটাকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী থেকে বের করে দেয়।

বাঙ্গালী হ'য়েও বাংলার বাইরেই পাহাড়ীর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে। এবং হিন্দি ও উর্দুতে যখন কথা বলে,ওকে বাঙ্গালী বলে কেউ সন্দেহও করতে পারবেন না। অথচ বাংলা সাহিত্যে যেমনি পাহাড়ীর রয়েছে গভীর জ্ঞান, তেমনি পাহাড়ীর বাংলা উচ্চারণও অতি প্রাঞ্জল। তাঁর বাংলা উচ্চারণ কোনদিনই হিন্দি ও উর্দুর চাপে বিকৃত হ'য়ে যায়নি। এজন্য পাহাড়ী গভীর কৃতজ্ঞতা জানায় স্বর্গতঃ অতুল প্রসাদ সেনকে। অল্প বয়সেই তাঁর সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য পাহাড়ীর হ'য়েছিল। তিনি এ বিষয়ে পাহাড়ীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন যাতে বিকৃত উচ্চারণে তাঁর কণ্ঠে বাংলা ভাষার মাধুর্যহানি না হয়। শুধু তাই নয়, পাহাড়ীর সংগীত জীবনেও তাঁর দান অনেকখানি। আজও পাহাড়ী মুক্ত কণ্ঠে তা স্বীকার করে।

পাহাড়ীর জীবনে বিরাট সংঘাত আসে তাঁর একুশ বৎসর বয়সের সময়। এ বয়সটারই বোধ হয় দোষ আছে। এ

এ বয়সে কোন বাধা-বিপত্তিই মন মানতে চায় না। উদ্দাম উচ্ছল-ছল-ছল তটিনীর মতই সমস্ত বাধা-বিপত্তি ভাসিয়ে নিয়ে ছুটে চলে—কে তার পথ রোধ করে দাঁড়াবে! যৌবনের উন্মাদনা তার শিরায় শিরায়—প্রণয়ের গুঞ্জন ধ্বনি অবিরত অবিশ্রান্ত ভাবে সুরে ভেজে চলেছে এই সুরে সুর মিলিয়ে সাড়া দিল ভিন্ন শ্রেণীর একটী মেয়ে—জাতিতে বৈদ্য। বয়সে পাহাড়ীর চেয়ে তিন চার বছরের বড়ই হবে। হউক না! ক্ষতিই বা কী তাতে! কী ভাবেই না সে সুর মিলিয়েছে পাহাড়ীর সংগে। সত্যই যেন মধুক্ষরা! সুরে সুরে সুর ভেজে ওরা শাশ্বত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ওদের এই চাঞ্চল্য কী আন্তরিকতার রূপ নিয়ে দেখা দেবে না! মিলনের সার্থকতায়—ওরা কী পারবেনা ওদের অন্তরের সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে? সামাজিক অনুশাসনের চোখে ওদের এই আন্তরিকতা কী অলীক হ'য়েই দেখা দেবে? হৃদয়ের কী কোন মূল্য নেই? বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে উত্তর আসে: না নেই। সমাজ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বড়ো। তোমরা সমাজের বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করতে চলেছো--তোমাদের এই গর্হিত কাজ সমাজ স্বীকার করে নেবে না কোন মতেই।"

পাহাড়ী উত্তর দেয়: ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ। ব্যক্তিই যদি না থাকে সমাজ চলবে কাকে নিয়ে? আর আমরাত কোন অন্যায় করতে যাচ্ছি না। ভুয়ো বিধিনিষেধ আরোপ করে স্বার্থান্বেষীরা সমাজে যে বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে, আমরা সেই তথাকথিত নীতির মূলে আঘাত হেনে সমাজের মঙ্গল করতেই চাইছি।" সমাজ কোন সদুত্তর দিতে পারে না। বিধি নিষেধের দোহাই দিয়ে কেবল চোখ রাংগায় আর জিজ্ঞাসা করে: তোমার আত্মীয়স্বজন!" পাহাড়ী বলে: আত্মীয়স্বজন কেন বাধা দিতে আসবেন? আমরাত কোন অন্যায় কিছু করতে যাচ্ছি না!"

আত্মীয়স্বজন হুঙ্কার দিয়ে ওঠে: নিশ্চয়ই বাধা দেবো। আমরা সমাজের বাইরে নই।" পাহাড়ী চুপ করে থাকে। তাহ'লে শেষ পর্যন্ত এই অভিশাপই কী তাঁর মাথা পেতে নিতে হবে? দয়িতার কাছে নিজেকে প্রতারক ব্যতীত আর কিছুই কী তাঁর প্রতিপন্ন করবার নেই। না—কিছুতেই সে হার মানবে না -মানবে না হার এই অন্যায় জবরদস্তির কাছে। তাঁদের আন্তরিকতা এমনিভাবে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেবেনা—দিতে পারে না।

আত্মীয়স্বজন গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করে: কী—কী বল্লে?"

পাহাড়ী উত্তর দেয়: আমি ওকে বিয়ে করবো।"

আত্মীয়স্বজন আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করে: বলতে পারলে এ কথা? মুখে আটকালো না?" পাহাড়ী তেমনিভাবে উত্তর দেয়: না—সত্যকে মেনে নিতে দ্বিধা করবো কেন?"

আত্মীয়স্বজন অস্ত্র নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়: ভেবে দেখো ঠাণ্ডা মাথায়। নইলে—"

পাহাড়ী বলে: নইলে কী?"

আত্মীয়স্বজন উত্তর দেয়: নইলে এ দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হবে তোমার কাছে।" পাহাড়ী হাসতে হাসতে বলে: এইত! বেশ!" আত্মীয়স্বজন বলে: এইত নয়। কোন আর্থিক দাবীও তোমার স্বীকার করা হবেনা।" পাহাড়ী বলে: রইল তোমাদের সব। আমি চলে যাচ্ছি।" পাহাড়ী বেরিয়ে পড়লো। নিশ্চিত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দের মোহ কাটিয়ে নির্মম অনিশ্চয়তার মাঝে পা বাড়ালো। কিন্তু তবু তাঁর মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই—হতাশা নেই। সে তাঁর প্রণয়কে অবমাননা করেনি—তাঁর প্রণয় প্রবঞ্চনার রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। স্রোতস্বনীর স্বচ্ছ ধারার মত সে প্রণয়ের পবিত্রতাকে অস্বীকার করবে কে? ওদের বিয়ে হ'য়ে গেল।

পাহাড়ীর স্ত্রী মোরাদাবাদ হাই স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল। মাসিক আয় ২৫০৲ থেকে ৩০০৲ টাকা। আর পাহাড়ী বেকার। বাড়ী ছেড়ে এসে উঠেছে মিউজিক কলেজের ছাত্রাবাসে। সেখানে একখানা ঘর পেল বিনে ভাড়ায় থাকবার জন্য। কলেজ কর্তৃপক্ষ ওর আর্থিক অবস্থার কথা জানতে পেয়ে কলেজের মাইনেটাও রেহাই করে দিলেন। পাহাড়ীর মত ছেলের যদি শেষ পর্যন্ত পড়াটা না হয়, তাঁদেরও কম দুঃখের কথা নয়। কিন্তু এ সব ছাড়াও ত আরো খরচা আছে। সেগুলি পাহাড়ী চালিয়ে উঠবে

কোথেকে! স্ত্রী অবশ্য তাঁর মাইনের সব টাকাই পাহাড়ীর কাছে তুলে ধরলেন। কিন্তু স্বামী হ'য়ে স্ত্রীর টাকা পাহাড়ী নিতে যাবে কেন? তাছাড়া তাঁর শ্বশুরদের পারিবারিক ব্যয় পূর্বে থেকেই নির্ভর করতো স্ত্রীর উপার্জনের ওপর। পাহাড়ী তাঁকে বাধা দিয়ে বলে: আমি চালিয়ে নেবো যে প্রকারেই হউক। খরচা করে যদি কিছু বাঁচাতে পারো—তোমারই কাছে জমিয়ে রেখো। প্রয়োজন হলে নেবো।" আর নিজে চেষ্টায় রইল অর্থোপার্জনের। দু'টো গানের টিউসনী পেল। দু'টো মিলিয়ে যথাক্রমে আয় হ'তে লাগলো মাসে পাঁচ ও সাত করে মোট বারো টাকা। এরই পর নির্ভর করে সে চলতে লাগলো। কোন সময়ে নিজে রান্না করে খায়। আবার যখন হোটেলে যায়—দু' আনার পুরি ও প্যারার মধ্যেই তাঁর বাজেট নিবদ্ধ রাখে। কিন্তু এইভাবে কৃচ্ছসাধনায়ই বা ক'দিন চলতে পারে? তারপর ওদিকে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। স্বামী হ'যে বিয়ের পর তাঁকে কোন আর্থিক সাহায্যই করতে পারেনি। এমনকী কোন উপহারও দেয় নি। এই বেদনা অক্ষম স্বামীকে ব্যথাতুর করে তুললো। ১৯৩০খৃঃ। নভেম্বর মাস। স্ত্রীর আটমাসের গর্ভাবস্থা। তখনও তিনি কাজ করছেন। এ অবস্থায় তাঁকে আর কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু নিরুপায় পাহাড়ী। অন্তর্দ্বন্দ্বে হাহুতাশ করা ছাড়া কোন পথই খুঁজে পায় না। তাছাড়া নিজেও একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। পথ যেন নিজে এসে ধরা দিল। সন্ধ্যাবেলা—ছয়টা কি আটটা হবে। ছাত্রাবাসে বসে ভূপালের 'সারে-গা-মা' সাধছে। দু'জন সাক্ষাৎপ্রার্থী এলো ওর কাছে। সংগীত সাধনায় বাধা পড়লো। পাহাড়ী তাঁদের সংগে উর্দুতে কথাবার্তা বলতে লাগলো। পাহাড়ীর উর্দু উচ্চারণ শুনে তাঁরাত অবাক! পরের দিন দেখা করবে বলে তাঁরা ওদিন বিদায় নেয়। তাঁরা চলে গেলে পাহাড়ী কার কাছ থেকে যেন জানতে পারে,ওদের ভিতর একজন দেওয়ার রাজ্যের কুমার সাহেব। কুমার সাহেব তাঁর একজন পদস্থ কর্মচারীকে নিয়েই পাহাড়ীর সংগে দেখা করতে এসেছিলেন। অবশ্য এ সংবাদে পাহাড়ীর মনে কোনই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। পরের দিন সকালে আবার তাঁরা এসে হাজির হলেন। কুমার সাহেব পাহাড়ীকে বল্লেন:—দেখুন, আমি আটটি সন্তানের পিতা। কিন্তু আমার ছেলেকে কিছুতেই বাগে আনতে পাচ্ছি না। ভয়ানক দুষ্টু। তার ওপর পড়াশুনায় মন নেই। বছর আট এর বয়স হবে। আমার এই ছেলেটির দায়িত্ব আপনাকে নিতে হবে।"

পাহাড়ী বিস্মিত হ'য়ে উত্তর দেয়: দায়িত্ব নেবো আমি! বলেন কী? আমার নিজের দায়িত্বই যে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যেতাম। না, আমার দায়িত্ব নেবার মত কোন শক্তি নেই।"

কুমার সাহেব বাধা দিয়ে বলেন: আছে কী না আছে তা বুঝবো আমি। আর বুঝেছি বলেইত আপনার কাছে এসেছি। ওর দায়িত্ব আপনাকে নিতেই হবে। আর আপনার দায়িত্বের কথা বলছেন—তা নয় চাপিয়ে দিন আমার ঘাড়ে।" পাহাড়ী নিরুপায় হ'য়ে উত্তর দেয়: বেশ। কিন্তু ছেলেটিকে আমি যে একবার দেখতে চাই।" কুমার সাহেব হাসতে হাসতে বলেন: নিশ্চয়ই। চলুন আমাদের সাথে কষ্ট করে।" লক্ষ্ণৌ থেকে এই দেওয়ার রাজ্যটি ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। পাহাড়ীকে সংগে নিয়ে কুমার সাহেব তাঁর রাজ্যে ফিরে এলেন। পাহাড়ী ছেলেটির সংগে আলাপ করলো। নাম তার ছোটে। দেখতে ভারী সুন্দর। পাহাড়ী রাজী হ'লো। কুমার সাহেব হাঁফছেড়ে বাঁচলেন। পাহাড়ীকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনাকে কত দিলে চলতে পারে?" পাহাড়ী তার সমস্ত বিষয় কুমার সাহেবকে খুলে বলে। কুমার সাহেব সব শুনে একটু চিন্তা করে বলেন: আমি আপনাকে মাসে নগদ পঞ্চাশ টাকা করে দেবো। আমার লক্ষ্ণৌর বাড়ীতে থাকবেন। চার পাঁচটা চাকর থাকবে আপনার হেপাজাতে আর থাকবে আমার ছেলে। আপনার অন্য কোন খরচ লাগবে না। কাপড়-চোপড়ও না।" পাহাড়ীর অমত করবার কোন কারণ থাকে না। সে ছোটের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এতটা কষ্ট স্বীকার করে আসবার দরুণ কুমার সাহেব পাহাড়ীকে দু'শ টাকা দিলেন। আর বল্লেন: আপনিত মোরাদাবাদ হ'য়ে লক্ষ্ণৌ যাবেন। বাড়ী

মেরামতের জন্য আর দু'শ টাকা এরই মাঝে লক্ষ্ণৌতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর ছোটেকেও পৌঁছে দেবো ডিসেম্বরের ভিতরই।" পাহাড়ী ওখান থেকে মোরাদাবাদে স্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করতে যায়। এবং ঐ দু'শ টাকাই স্ত্রীর হাতে তুলে দিয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হয় আর তাঁকে কাজ করতেও নিষেধ করে আসে। এর পূর্বেও লক্ষ্ণৌ থেকে সময়মত পাহাড়ী স্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করতে মোরাদাবাদে যেত। মোরাদাবাদে কয়েকদিন থেকেই পাহাড়ী লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসে এবং দু' এক দিনের ভিতরই বাড়ী মেরামতের জন্য কুমার সাহেবের কাছ থেকে টাকা পেয়ে যায়। টাকা পেয়েই পাহাড়ী বাড়ীর প্রয়োজনীয় সংস্কারকার্য সমাধান করে রাখে। কিন্তু ২০শে ডিসেম্বর অবধিও কুমার সাহেবের কাছ থেকে কোন সংবাদাদি না পেয়ে একটু চিন্তিত হ'য়েই পড়ে। ৩০ তারিখও পেরিয়ে গেল। ৩১ তারিখে কুমার সাহেবের কাছ থেকে এক টেলিগ্রাম এলো, ছোটে আসছে বলে। ছোটে এসে হাজির হ'লো। জানুয়ারী গেল। ফেব্রুয়ারীও যাই যাই করছে। ২৮শে অথবা ২৭শে হবে। দোলযাত্রার দিন। মোরাদাবাদ থেকে টেলিগ্রাম এলো, পাহাড়ীর স্ত্রীর অবস্থা সংকটাপন্ন। ছোটের ব্যবস্থা করে দিয়ে পাহাড়ী টেলিগ্রাম পেয়েই মোরাদাবাদ অভিমুখে রওনা দিল। মন তাঁর অস্বাভাবিক উদ্বিগ্নে ভরপুর। ষ্টেশনে নেমেই এক পরিচিত টাঙ্গাবাহকের সংগে দেখা হ'লো। তাকে নিয়েই পাহাড়ী বাসার দিকে ছুটলো—পথে যেতে যেতে তার কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নেয়। সকলেই প্রসূতিকে নিয়ে ব্যস্ত। পাহাড়ীদের পারিবারিক চিকিৎসক ব্যতীত একজন মহিলা ডাক্তারও নিয়োগ করা হ'য়েছে। একটী পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলো। প্রসবের সময় অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হ'য়েছিল—প্রসূতিকে নিয়ে তাই ডাক্তাররা একটু আশংকিত ছিলেন। শিশুর জন্ম-সংবাদ পাহাড়ীর মনে আদৌ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি, তাঁর মনও শিশুর মায়ের চিন্তায়ই ছিল ভরপুর। প্রসূতি এবং শিশু দু'য়ের জন্যই সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হ'লো কিন্তু চতুর্থ দিনে শিশুটীর জীবন-দীপ নিভে গেল—যা কেউই আশংকা করেনি। ওদিন রাত্রের দিক থেকে প্রসূতির অবস্থাও ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যেতে থাকে। প্রসূতির জীবনীশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চিকিৎসকেরা যেন প্রতিমুহূর্তের সংগে লড়াই করছেন। পঞ্চমদিনে পাহাড়ী সমস্ত কথা জানিয়ে কুমার সাহেবের কাছে ডাক্তারবাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে দিতে বলে। তাঁর নিজের যেন কিছু করবার শক্তি নেই! টেলিগ্রাম পেয়ে কুমার সাহেব নিজেও খুব চিন্তিত হ'য়ে ওঠেন। কুমারসাহেবের ভাই কার্যোপলক্ষে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন, তাঁকে নির্দেশ দিলেন মোরাদাবাদ ষ্টেশন হ'য়ে যেতে। আর পাহাড়ীকে টেলিগ্রাম করে দিলেন—ষ্টেশনে তাঁর সংগে দেখা করতে। পরের দিন ষ্টেশনে পাহাড়ীর সংগে কুমার সাহেবের ভাইর সাক্ষাৎ হ'লো। তিনি পাহাড়ীর হাতে তিনশত টাকা দিয়ে বল্লেন: দাদা এই টাকা দিয়েছেন আপনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসার যেন কোনরকম গাফিলতি না হয়। বড় ডাক্তার আনতে বলেছেন। টাকার যখন যা দরকার হয় তাঁকে লিখবেন, তিনি পাঠিয়ে দেবেন।" পাহাড়ী কৃতজ্ঞতা জানাবার কোন ভাষা খুঁজে পেল না। তাঁর চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

১০ই মার্চ চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'তে চললো। পাহাড়ী প্রসূতির শিয়রে বসে। প্রসূতির রোগপাণ্ডুর চোখ দু'টী পাহাড়ীর দিকে নিবদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিতে চায়: অনেক দুঃখ—অনেক আঘাত দিয়েছি তোমায়—আমার জন্য অনেক কিছুই সহ্য করতে হ'য়েছে—নীলকণ্ঠের মত সমস্ত বিষনির্যাস হাসি মুখে তুমি পান করেছো—বিদায়—আজ যাবার বেলায় হাসিমুখে বিদায় দাও—আমার সমস্ত অপরাধ একটুখানি হাসির ঝিলিকে ক্ষমা হ'য়ে ফুটে উঠুক তোমার চোখে—যাবার বেলায় নিশ্চিন্ত আরামে আমি বিদায় নিয়ে যেতে চাই।" পাহাড়ী নির্বাক। নিশ্চল। মুহূর্তে যেন পাষাণের মানুষে রূপান্তরিত হ'লো সে। সৎকারাদি হ'য়ে গেল। মুখাগ্নি দিতে হ'লো তাঁকেই। না—আর সে পারবে না এই পরিবেশের মাঝে মুহূর্তকালও কাটিয়ে দিতে। তাঁর

শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। জিনিষপত্র যেখানে যা যেমনিভাবে সাজানো ছিল—তেমনিভাবে রেখে পাহাড়ী পালিয়ে এলো লক্ষ্ণৌতে। তবু খানিকটা হাফ ছেড়ে বেঁচেছে।

১৯৩১ খৃ-এর এপ্রিল। গরমের ছুটিতে পাহাড়ী ষ্টেটে গেল। সেখানে যেয়ে দেখতে পেল রাজবাড়ীটা একটা হাসপাতাল হ'য়ে উঠেছে। কুমারসাহেবের ছেলেরা সবাই হাম জ্বরে আক্রান্ত। রাজবাড়ীর সকলেই এত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন যে, শুশ্রূষা করতেও ওদের কাছে কেউ যেতে চায় না। পাহাড়ী প্রাণ ঢেলে দিল ওদের শুশ্রূষায়। ওরা এক এক করে সকলেই ভাল হ'য়ে উঠলো। কুমার সাহেব অবাক। কী মহৎ প্রাণ ওর! শুধু তিনিই নন—রাজপরিবারের সকলের সংগেই পাহাড়ীর সম্পর্ক নিবিড়তর হ'য়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর ছাত্র সংখ্যা এক থেকে ছয়'তে বৃদ্ধি পেল। রাজপরিবারের ওপর তাঁর ক্রমোবর্ধমান প্রভাব অন্যান্য রাজকর্মচারীদের ঈর্ষার ইন্ধন যোগাতে লাগলো। পাহাড়ীর বুঝতে বেগ পেতে হয় না। সে কুমার সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিদায়ের আবেদন পেশ করে। কুমার সাহেবের বাধা সত্ত্বেও ৩১শে ডিসেম্বর ষ্টেটের কাজে ইস্তাফা দিয়ে আবার সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে সে পাঁচ শত টাকা জমিয়ে ফেলেছিল। এবং সংগীত কলেজের উপাধি পরীক্ষা কৃতিত্বের সংগে উত্তীর্ণ হ'য়ে কলেজের ফেলোসিপের বৃত্তি উপভোগ কচ্ছিল। ফিরে এসে সে কলেজে সংগীত শিক্ষা দিতে লাগলো। লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসার পর বিনয় চক্রবর্তী নামে পাহাড়ীর এক বন্ধু পাহাড়ীকে চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করে তোলেন। বিনয়বাবু হিন্দুস্থান ইন-সিওরেন্স কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি। তিনি পাহাড়ীকে কলকাতায় যেতে বলেন। চলচ্চিত্র তার রূপের ভাণ্ডার পাহাড়ীর সামনে তুলে ধরে। চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য পাহাড়ীর অন্তরের ব্যাকুলতা দিন দিনই যেন বৃদ্ধি পায়।

১৯৩২ খৃঃ। মার্চ মাস। তখনও পাহাড়ী কলেজের ফেলোসিপের বৃত্তি উপভোগ করছে। চিত্রজগতের খ্যাতনামা যন্ত্রবিদ কৃষ্ণগোপালের সংগে পাহাড়ীর হৃদ্যতা ছিল। তিনিও এবার পাহাড়ীকে চলচ্চিত্রের দিকে টানতে চাইলেন, পাহাড়ীকে কলকাতায় আসতে পরামর্শ দেন। এই বছরের মার্চ কী এপ্রিল মাসে পাহাড়ী কলকাতায় কৃষ্ণগোপালের কাছ থেকে চিঠি পায়। তাতে তিনি লেখেন: যত শীঘ্র সম্ভব চলে এসো, বড়ুয়া ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী কুমার প্রমথেশ বড়ুয়াকে তোমার কথা বলে রেখেছি—হয়ত সুযোগ পেয়ে যেতে পারো। পাহাড়ী কালবিলম্ব না করে কলকাতায় চলে আসে। তদানীন্তন গ্রেট ইণ্ডিয়ান হোটেল—বর্তমানে যা হোটেল সেসিল নামে পরিচিত—পাহাড়ী এই হোটেলে এসে উঠলো। কলকাতায় বলতে গেলে এই সে প্রথম এলো—সবই অপরিচিত। রাস্তাঘাটও ভাল করে চেনে না। লোকজনের কাছ থেকে খোঁজ খবর নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে বড়ুয়া ষ্টুডিওতে যেয়ে হাজির হ'লো। কে, জি'র (কৃষ্ণ গোপাল) সংগে সাক্ষাৎ হ'লো। কে, জি, তাঁকে নিয়ে যেয়ে প্রমথেশ বড়ুয়ার সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাহাড়ীকে অফিস-কক্ষে বসিয়ে রেখে বড়ুয়া সাহেব একটু বাইরে যান। ইত্যবসরে স্বনামধন্য অভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তী সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি পাহাড়ীর উদ্দেশ্য জানতে পেরেছিলেন হয়ত! পাহাড়ীকে আড়চোখে তিনি অনেকক্ষণ দেখে নিচ্ছিলেন। তিনি তখন একখানি চিত্রের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বড়ুয়া সাহেব এসে হাজির হ'তেই তিনকড়ি বাবু তাঁর উক্ত ছবির জন্য পাহাড়ীকে চাইলেন। বড়ুয়া সাহেব সেকথা যেন শুনেও শুনতে পাননি—অথবা ও প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জন্য অন্য কথার অবতারণা করেন। ওদিন চিত্র-পরিচালক সুশীল মজুমদারের সংগেও ওখানে পাহাড়ীর সাক্ষাৎ হয়। বড়ুয়া আনুসংগিক কথাবার্তা শেষ করে পরের দিন পাহাড়ীকে আসতে বলেন। পাহাড়ী পরের দিনও নির্দিষ্ট সময়ে যেয়ে হাজির হ'লো। বড়ুয়া তাঁর সংগে অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন এবং পরে বললেন: গানত জানেন! একটু গাইয়ে শোনান না।"

পাহাড়ী মুচকী হেসে বলে: বেশত, কিন্তু তবলা বাজাবে কে?

বড়ুয়া উত্তর দেন: কে আর বাজাবে! আমিই কোন রকমে ঠেকা দিয়ে চালিয়ে নেবো।"

পাহাড়ী রাগিনী ধরলো। বড়ুয়া সাহেবের চালিয়ে নেওয়া একটু বে-চালেই চললো। গান থামলে এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন: বা! গানটাত বেশ গান।" পাহাড়ী নমস্কার করে ভদ্রলোকটিকে কৃতজ্ঞতা জানায়। লোকটির বেশভূষা দেখে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলেই পাহাড়ীর মনে হ'লো। কিন্তু এই ভুল ভাঙলো তখন, যখন বড়ুয়া সাহেব পাহাড়ীর সংগে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিতে যেয়ে বল্লেন: ও হো-আপনার সংগে পরিচয় করিয়ে দি - ইনি শ্রীনীরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী ওরফে বেণুবাবু—বাংলার প্রাচীন রাজপরিবার নাটোরের দৌহিত্র।" পাহাড়ীত অবাক। সেখানে সুশীল মজুমদারও উপস্থিত ছিলেন। বড়ুয়া পাহাড়ীকে বসিয়ে রেখে এঁদের নিয়ে একটু বাইরে গেলেন - সম্ভবতঃ পরামর্শের জন্য। এবং পরের দিন আবার পাহাড়ীকে দেখা করতে বল্লেন। তাঁরা পাহাড়ীকে যে নির্বাচন করেছেন একথাও জানিয়ে দিলেন এবং ওদিন আইনগত কাজগুলি শেষ করবেন বলে বল্লেন। পাহাড়ী খুশী মনেই হোটেলে ফিরে এলো। পরের দিন আবার রওনা দিল বড়ুয়া ষ্টুডিওর উদ্দেশ্যে। এদিন ট্যাক্সী করেই গেল। ট্যাক্সী থেকে নামতেই কে, জি-র সংগে দেখা। কে, জি, তাঁকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি চুক্তিপত্র সম্পর্কে হুসিয়ার করে দিয়ে বল্লেন: খবরদার পাহাড়ী! চুক্তিপত্রটা ভালভাবে পড়ে না নিয়ে উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে সই করে ফেল না! তাতে কিন্তু তোমার ভবিষ্যতই নষ্ট হবে। এমন কড়াকড়িভাবে সর্ত আরোপ করেছে—যার দ্বারা ওরা তোমাকে হাতের মুঠোর ভিতর রাখতে চায়।" কে, জি তাঁর কাজে চলে যান। পাহাড়ী একটু দমে পড়ে যাই হউক, সে বড়ুয়ার কক্ষে যেয়ে হাজির হ'লো। কিছুক্ষণের ভিতরই বড়ুয়া সাহেব চুক্তিপত্রটা এনে পাহাড়ীর সামনে তুলে ধরলেন। মাসিক ১২৫৲ টাকা হারে বর্তমানে পাহাড়ীর মাইনে নির্ধারণ করা হ'য়েছে এবং বাৎসরিক পঁচিশ টাকা হারে বৃদ্ধি পাবে। মাইনের জন্য পাহাড়ীর আপত্তি ছিলনা কিন্তু এমন কতগুলি নিয়ম বেঁধে দেওয়া হ'য়েছে, যাতে কয়েক বছরের ভিতর বড়ুয়া ষ্টুডিওর বাইরে পাহাড়ীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। বাইরে যদি পাহাড়ীর কোন ডাক আসে তাও স্থির করবেন বড়ুয়া ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষ এবং পারিশ্রমিকের হারও তাঁরাই নির্ধারণ করবেন—পাহাড়ী সেজন্য অতিরিক্ত কিছু দাবীও করতে পারবে না। চুক্তিপত্রটা পড়তে পড়তে কে, জি-র কথাগুলি পাহাড়ীর মনে হ'তে লাগলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বড়ুয়াকে বল্ল: আমি একটু ভেবে দেখি! বিকেলে টেলিফোন করে নয় আপনাকে জানিয়ে দেবো। পাহাড়ী হোটেলে ফিরে এসে তাঁর জিনিষ পত্র গোছ-গাছ করতে থাকে। অযথা আর এখানে থেকে অর্থ ধ্বংস করে লাভ কী? বিকেলে বড়ুয়া ষ্টুডিওতে টেলিফোন করলো। বড়ুয়াকে পেল না। কে যেন একজন টেলিফোন ধরলেন। পাহাড়ী তাঁকে বলে দিল: বড়ুয়া সাহেব এলে বলবেন, আমি আজই লক্ষ্ণৌ চলে যাচ্ছি—ও-চুক্তি পত্রে সই করতে আমি পারবো না।" টেলিফোন শেষ করার সংগে সংগেই কে, জি, পাহাড়ীর হোটেলে এসে হাজির হ'লেন। দু'জনের অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হ'লো। চলচ্চিত্রের আশা পরিত্যাগ করে ভগ্ন মন নিয়ে পাহাড়ী আবার লক্ষ্ণৌতে ফিরে এলো। বড়ুয়া সাহেব তাঁর 'অনাথ' ছবির জন্য পাহাড়ীকে গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন। এই 'অনাথ'ই পরে 'রূপ-লেখা' নাম নিয়ে নিউথিয়েটার্সে'র প্রযোজনায় আত্মপ্রকাশ করে। কলকাতায় যাবার পূর্বে পাহাড়ীর কাছে শ'তিনেক টাকা ছিল। এবং কলেজের ফেলোসিপের পরমায়ুটাও তখন অবধি ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু ফিরে এসে পাহাড়ী আবার আর্থিক অনটনের ভিতর হাবুডুবু খেতে লাগলো। বন্ধু বিনয়ের কাছে সব খুলে বল্ল। তিনি আশ্বাস দিয়ে বল্লেন: ঘাবড়াবার কি আছে? আমার আয় দিয়ে চালিয়ে নেবো।" এপ্রিল চলে গেল। পাহাড়ীর সম্বল পঞ্চাশ টাকা। লক্ষ্ণৌতে জি,সি, দাস নামে পাহাড়ীর পরিচিত এক ডাক্তার ছিলেন। তাঁদের পরিবারের প্রত্যেকের সংগেই পাহাড়ীর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। তাঁর স্ত্রীকে পাহাড়ী দিদি বলে ডাকতো। ডাক্তার দাসকে রুগী দেখতে সেবার লক্ষ্ণৌর বাইরে যেতে হয়, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত তাঁর বাড়ীতে পাহাড়ীকে পাহারায় রেখে যান। ডাক্তার দাসের বাড়ীর প্রাংগনে খাটিয়া পেতে পাহাড়ী

শুয়ে আছে। রাতের বেলা। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশে পাহাড়ী শুয়ে শুয়ে ভাবছে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের কথা। কোন আশা নেই, ভরসা নেই। নির্মম অনিশ্চয়তা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনকে ঘিরে রেখেছে। শত চেষ্টা করেও পাহাড়ী এর হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। পাহাড়ীর ঘুম আসছে না—চিন্তার চিন্তায় রাত বেড়েই চলেছে। দেড়টা তখন হবে। বাড়ীর বাইরে কে যেন ডাঃ দাসকে হাক দিলেন। পাহাড়ী উঠে যেয়ে বল্ল: ডাঃ দাসত বাইরে গেছেন।" লোকটি জিজ্ঞাসা করে: এখানে সানিয়াল বাবু আছেন? যিনি খুব ভাল গান করেন?" পাহাড়ী আশ্চর্য হ'য়ে উত্তর দেয়: কেন? আমিইত সানিয়াল বাবু! কী দরকার আপনার? আর এখানেই বা কী করে এলেন?" লোকটী বলে: যাক, বাঁচা গেল! আপনার বোর্ডিং-এ গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানকার খোঁজ পেলাম। আপনাকে আমার সংগে যেতে হবে। আমি মরওয়ানা ষ্টেট থেকে আসছি।" পাহাড়ীর কৌতূহল বেড়ে যায়। জিজ্ঞাসা করে: কেন? কী দরকার? আমি সেখানে যাবো কেন?" লোকটি বলে: কুমার সাহেবের ছেলের অন্নপ্রাশন—আপনাকে সেখানে গান গাইতে যেতে হবে। আপনি আর অমত করবেন না। আমরা নিয়ে যাবো—পৌছেও দেব সময় মত! তা'ছাড়া আপনাকে কত দিতে হবে বলুন!" পাহাড়ী চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানায়। কিন্তু কতই বা চাইবে। এ বিষয়ে তাঁর যে কোন অভিজ্ঞতা নেই। এর পূর্বে এরূপ কোন সুযোগও তাঁর আসেনি, এলেও টাকা নিয়ে গান করাটা তাঁর মর্যাদায় বাধছে। কিন্তু এখন তাঁর টাকার প্রয়োজন। সে বল্ল: আমাকে দেড়শ' দিতে হবে। একজন তবলচী নেবো তাঁকে দিতে হবে পঞ্চাশ।" লোকটী সানন্দে রাজী হ'লো। তবলচী হিসাবে যে ছেলেটির কথা পাহাড়ী বল্ল, তাঁর আর্থিক অবস্থাও খুব খারাপ ছিল। সেও ঐ সংগীত বিদ্যালয়েরই ছাত্র। ডাক্তার গিন্নীকে সব বিস্তারিত বলে ছাত্রাবাস থেকে ঐ ছেলেটিকে তুলে নিয়ে পাহাড়ী ওদের সংগে মরওয়ানা রাজ্যাভিমুখে রওনা হ'লো। রাজা সাহেব সাদরে ওদের গ্রহণ করলেন। বয়সে তিনি খুবই নবীন। খাওয়া-দাওয়ার পর গান হ'লো। গান শুনে সকলেই খুব মুগ্ধ হ'লেন। পাহাড়ী তাঁর সংগীকে নিয়ে ফিরে আসবার জন্য তৈরী হচ্ছে—এমনি সময় কুমার সাহেব এসে বল্লেন: আপনাদের আজকের দিনটা থেকে যেতে হবে। আমার বৃদ্ধা মায়ের অনুরোধ। তিনি কাল সকালে আপনাদের গান শুনতে চান।" পাহাড়ী একটু ভেবে চিন্তে বল্ল: বেশ, আপনার মাকে প্রণাম জানিয়ে বলবেন, কাল তাঁকে গান শুনিয়েই আমরা যাবো। কিন্তু এজন্য অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে না আপনাকে।" পরের দিন সংগীত আসরে ডাক পড়লো পাহাড়ীর। সংগীত আসরত নয়—যেন সেখানে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা হবে এমনি আয়োজন করা হয়েছে। একটী বেদী নির্মিত হ'য়েছে পাহাড়ীর বসবার জন্য। চারিদিক ধূপ দীপের গন্ধ অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। রাজপরিবারের অন্যান্য মেয়েরা চিকের আড়ালে বসেছেন। রাজমাতা বসেছেন পাহাড়ীদের সামনাসামনি। পাহাড়ী রাজমাতাকে নমস্কার জানিয়ে বেদীর ওপর যেয়ে বসলো। পরপর কয়েকঘণ্টা পাহাড়ী দেহাতি ও ভজন গান করলো। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। বারোটায় যখন আসর ভাঙলো—তাঁদের যেন হদিস ফিরে এলো। রাজমাতা নিজে হাতে পাহাড়ী ও তাঁর সংগীকে খাওয়ালেন। এবং ভোজনের পর একখানি রূপোর থালার পর তিনখানি মোহর রেখে পাহাড়ীর সামনে তুলে ধরে বল্লেন: বেটা, তোর গানে খুব খুশী হ'য়েছি। এটা তোর মায়ের আশীর্বাদ।" পাহাড়ী মাথা পেতে গ্রহণ করে। কুমার সাহেবও নাছোড়বান্দা। তিনি পাহাড়ীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ও তাঁর সংগীকে যথাক্রমে ২৫০৲ ও ৭৫৲ টাকা দিলেন। ওরা ছাত্রাবাসে ফিরে এলো। পাহাড়ী এসেই ডাক্তারের বাড়ী দেখা করতে যায় এবং যেয়ে শুনলো, তাঁরা মুসৌরীতে হাওয়া খেতে গেছেন। পাহাড়ীর হাতেও কিছু টাকা জমেছে। সেও ভাবল—ঘুরেই আসবে মুসৌরী থেকে। সে মুসৌরী রওনা হ'য়ে গেল। এবং মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে গেল, সেখানে যেয়ে আর রাগরাগিনীর চর্চা করবে না। নিশ্চিত

আরামে কাটিয়ে দেবে কিছুদিন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয়ে দাঁড়ায় অন্যরকম। ওখানে কী করে রটে গেল - পাহাড়ী সংগীত শাস্ত্রে একজন ওস্তাদ। ওখানকার এক হোটেলের মালিক মিসেস ষ্টেপলী নামে এক ইংরেজ মহিলা পাহাড়ীর সংগে দেখা করে বল্লেন: "আমি একটা সাহায্য দিবসের আয়োজন করছি—আপনাকে এই অনুষ্ঠানে গান গাইতে হ'বে।" পাহাড়ী আর অমত করতে পারলো না। অনুষ্ঠানলিপি রচিত হ'লো। সকলের শেষের দশ মিনিট পাহাড়ীর জন্য নির্ধারিত রইল। অনুষ্ঠানের দিন পাহাড়ী যেয়ে শ্রোতাদের দলেই বসেছে। মিসেস ষ্টেপলী এসে বলে গেলেন: "আপনার কোন অসুবিধা হবে না। নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরই আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো।" অনুষ্ঠান আরম্ভ হ'লো। শ্রোতার দল দেখে পাহাড়ীতঅবাক। চারিদিকের ঝলমল পরিবেশ কীভাবেইনা ঝলমলিয়ে উঠেছে। যত রাজরাজার দল এসে জড়ো হ'য়েছে। পাহাড়ীর অবস্থা ক্রমে ক্রমেই কাহিল হ'য়ে উঠছে। তারপর ওর পাশে কয়েকজন পার্শী ভদ্রলোক বসেছিলেন—পাহাড়ীর গায়ের সিল্কের জামা দেখে তাঁরা নিজেদের মধ্যে পাহাড়ীকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ করে উঠলেন: "লোকটা নিশ্চয়ই সিল্ক-ব্যবসায়ী"। ওদের এই সব মন্তব্যে পাহাড়ী যেন আরো বিচলিত হ'য়ে পড়লো। আটটা বাজতে দশ মিনিট বাকী—পাহাড়ীর ডাক পড়লো। পাহাড়ী যেয়ে তাঁর আসন গ্রহণ করলো। কিন্তু সে এত ঘাবড়ে গেছে যে, ভিতরের জামাকাপড় ভিজে ঘাম চুইয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে যেন, গলা দিয়ে স্বরও বেরোচ্ছে না। ভগবানের নাম নিয়ে ও রাগিনী ধরলো। সংগে সংগে বাইরে মুশলধারে বৃষ্টি নেমে পড়লো। ভিতরের পরিবেশ এক অভূতপূর্ব গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণতা লাভ করলো। পাহাড়ী গান গেয়ে চলেছে। দশমিনিট কেটে গেল। শ্রোতাদের মাঝখান থেকে—'আর একটা—আর একটা' বলে বারবার গাইবার জন্য অনুরোধ আসতে লাগলো। পাহাড়ীরও খেয়াল নেই। তাঁর শ্রোতারাও সংগীতের মূর্চ্ছনার ভিতর নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন। প্রায় ৯টায় পাহাড়ী তাঁর গান বন্ধ করে। ওদিনকার অনুষ্ঠানের সবটুকু প্রশংসার ভাগ যেন দস্যুর মত সে একাই কেড়ে নিল। গান শেষ হবার পর অনেকেই এসে পাহাড়ীর সংগে সাক্ষাৎ করতে লাগলো। কেউ ঠিকানা নিয়ে গেল—কেউ পাকাপাকিভাবে তারিখ ঠিক করে গেল। রাজা পিপলা ও আলসা রাজ্যের সেক্রেটারীরাও ঠিকানা নিল। ঠিকানা নিল সেই পার্শী ভদ্রলোকেরাও। রাজপিপলা এবং আলসার মহারাণীর অনুরোধে পাহাড়ী যথাক্রমে একশ এবং দুশ টাকা নিয়ে গান করে। পার্শী-ভদ্রলোকেরা দুশো টাকা ছাড়াও পাহাড়ী সিল্ক ব্যবহার করে বলে তিন বেল সিল্কের সিট খুশী হ'য়ে পাহাড়ীকে উপহার দেন। তাঁদের সংগে আলাপ করে পাহাড়ী জানতে পারে, মূলতঃ তাঁরাই সিল্ক ব্যবসায়ী এবং এ নিয়ে বেশ কৌতুক উপভোগ করে। রাজপিপলার মহারাণীর অনুরোধে যখন পাহাড়ী গান করে, তখন সেখানে কপূরতলা রাজ্যের এক ভাগনী না কে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও তাদের বাড়ীতে গান গাইবার জন্য পাহাড়ীকে অনুরোধ করেন। পাহাড়ী এবার ৫০০৲ টাকা দাবী করে এবং তাঁর ঐ হার বলে রাজপিপলার মহারাণী সায় দেন। পাহাড়ী ঐ টাকা নিয়েই ওখানে গান করে। এমনিভাবে মুসৌরীতে কয়েকদিনের ভিতর পাহাড়ী হাজার টাকার মত উপার্জন করে। কিন্তু যখন লক্ষ্ণৌতে ফিরে আসে তাঁর পকেট গড়ের মাঠ। তিরিশটাকার বেশী সেখানে কিছুই হাতে ঠেকে না। কারণ, রাজরাজাদের বাড়ীতে গান গেয়ে যেমন উপার্জন করেছিল—তেমনি তাঁদের সাংগ-পাংগদের ভোজনে আপ্যায়িত করতে যেয়ে সব ফাঁক হ'য়ে গেল। আবার পুনর্মূষিক অবস্থা। ঠিক এমন সময় দেওয়ারের কুমার সাহেব পাহাড়ীর সন্ধানে লক্ষ্ণৌতে এসে হাজির হ'লেন এবং পাহাড়ীর সংগে সাক্ষাৎ করে তাঁর পার্সোনেল সেক্রেটারীর পদে বহাল করতে চাইলেন। পাহাড়ী সোজাভাবে উত্তর দিল: "না-না, সে হ'তে পারে না। আমার কী যোগ্যতা আছে! আপনি অন্য লোক দেখুন। এতবড় দায়িত্ব আমি নিতে পারবো না।" কুমার সাহেব নাছোড়বান্দা। আগেকার মতই তিনি বলেন: "সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না। তোমাকে কোন কাজই করতে হবে না। কাজ করবার জন্য অন্যলোক
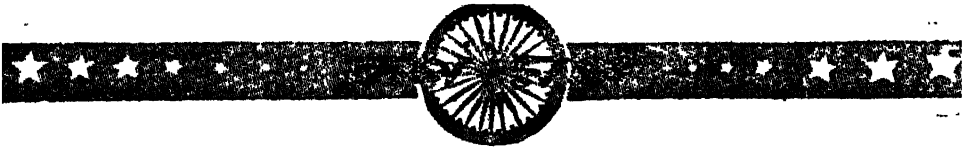
আছে। ইংরেজীটা তো তোমার ভাল জানা আছে—ওতেই চলবে। তুমি আমার সংগে সংগে থাকবে। ব্যস।” পাহাড়ী দ্বিমত করতে পারে না। সমস্ত খরচাপত্র বাদে পাহাড়ীর মাইনে কুমার সাহেব দু'শ টাকা নির্ধারণ করে দিলেন। সেদিনই পাহাড়ীকে কুমার সাহেবের সংগে নৈনিতাল যেতে হয়। ইতিমধ্যে খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক দেবকী বসু কার্যোপলক্ষে লক্ষ্নৌ এসেছিলেন। কে, জির সংগেই তাঁর প্রয়োজন ছিল। শ্রীযুক্ত বসু সন্ত নামে পাহাড়ীর এক বন্ধুদের বাড়ী উঠেছিলেন। এঁদের সংগে দেবকীবাবুর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। সন্তই দেবকীবাবুকে পাহাড়ীর জন্য অনুরোধ করে এবং পাহাড়ীকে সুযোগ দেবেন বলে তাঁর কাছে দেবকীবাবু প্রতিশ্রুতি দেন। জানুয়ারী—ফেব্রুয়ারী—মার্চ এই তিনমাস পাহাড়ী কুমার সাহেবের কাজ করলো। এই সময় পাহাড়ী সন্তর কাছ থেকে এক চিঠি পায়, দেবকীবাবু কলকাতায় পাহাড়ীকে যতশীঘ্র সম্ভব দেখা করতে লিখেছেন এবং পাহাড়ী যেন চিঠি পেয়েই কলকাতা রওনা হয়। পাহাড়ীর মন আবার চলচ্চিত্রের জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সে তাঁর কোন এক বন্ধুকে দিয়ে নিজের কাছে এক মিথ্যা টেলিগ্রাম করালো—টেলিগ্রামখানা কুমার সাহেবকে দেখিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতায় রওনা হ'য়ে চলে আসে। এবার কলকাতা তাঁর খানিকটা পরিচিত। ১৯৩৩খৃঃ—১১ই এপ্রিল। হোটেলের মালিক অমিয় গোস্বামী (বর্তমানে মারা গেছেন) অনেকদিন বাদে পাহাড়ীকে পেয়ে খুব খুশী হ'লেন। দেবকীবাবু তখন নেবু-তলার কাছাকাছি কোথায় থাকতেন। 'চণ্ডীদাস ও পুরাণ ভকত' সবে মাত্র তিনি শেষ করেছেন। সন্তর নির্দেশ মত পাহাড়ী দেবকীবাবুর বাড়ী যেয়ে হাজির হয়। কিন্তু যেয়ে শোনে: দেবকীবাবু কলকাতায় নেই—মিহিজাম চলে গেছেন। পাহাড়ী তখন রাইবাবুর বাড়ীতে গেল। সেখানে হরিশ নামে ওর পরিচিত এক ভদ্রলোক থাকতেন। তাঁর দেখা না পেলেও সেখানে গোকুল বাবুর সংগে পাহাড়ীর সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর কাছ থেকে জানতে পারে, দেবকী বাবু মিহিজাম থেকে ফিরেছেন এবং পাহাড়ীর খোঁজ করেছেন। পাহাড়ী দেবকীবাবুর বাড়ীতে যেয়ে হাজির হয়। দেবকীবাবু বাড়ীতেই ছিলেন। একটা টেবিলের সামনে তিনি এবং আরো কয়েকজন ঝুকে পড়ে কী যেন দেখছিলেন। দেবকী বাবু পাহাড়ীর পরিচয় ও প্রয়োজন জানতে চাইলেন। পাহাড়ী তাঁকে সব খুলে বল্ল। কিন্তু দেবকীবাবু এমন ভাব দেখালেন যেন,তিনি পাহাড়ীর নামও শোনেননি কোনদিন। দেবকীবাবুর এই ব্যবহারে পাহাড়ী খুবই মর্মাহত হ'লো। তারপর নিজেকে সংযত করে সন্ত—গোকুল, কে, জি, আনুসংগিক সকলের কথা যখন বলতে লাগলো—দেবকী বাবু কিছুটা অনুমান করে নিতে পারলেন বলে মনে হলো এবং এরপর আস্তে আস্তে পাহাড়ীকে বল্লেন: আমি—আমি আপনার জন্য কিছু করতে পারবো বলে মনে হয় না—আর এ বিষয়ে কিছু কাউকে বলতেও পারবো না—শুধু মিঃ সরকারের সংগে আপনার পরিচয় করিয়ে দেবো।” পাহাড়ী কিছুটা আশ্বস্ত হ'লো এবং এর পর দেবকীবাবু যে ব্যবহার করলেন—তাতে খুশীই হ'লো। পরের দিন ষ্টুডিওতে দেখা করবার নির্দেশ দিয়ে দেবকীবাবু পাহাড়ীকে বিদায় দিলেন। পাহাড়ী পরের দিন ষ্টুডিওতে গেল। সেখানে মিঃ সরকার, ছোটাই বাবু, অমর মল্লিক প্রভৃতির সংগে পাহাড়ীর সাক্ষাৎ হ'লো। দেবকী বাবুও এসে পড়লেন এবং মিঃ সরকারের সংগে পাহাড়ীর পরিচয় করিয়ে দিতে যেয়ে বল্লেন: **"Mr. B. N. Sorkar, Managing Director, New Theatres Ltd, and Mr. Pahari Sanyal, who wants to join in the film."** মিঃ সরকার ব্যতীত কেউই ততটা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না পাহাড়ীর প্রতি। রাই বাবুকে ডাকা হ'লো এবং পাহাড়ীকে গান গাইতে বলা হ'লো। রাইবাবু পাহাড়ীর সংগে আলাপ করে তাঁকে চিনতে পারলেন—পাহাড়ীও একজন চেনা লোক পেয়ে একটু আশ্বস্ত হ'লো। কেরামতুল্লা সংগত করলো। পাহাড়ী গান গাইল। পাহাড়ীর গানে সকলেই খুশী হ'লেন। মিঃ সরকার বাচ্চু বলে একটী বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন—তার হাতে একখানি স্লিপ দিতে আর এক ভদ্রলোক এসে হাজির হ'লেন। পাহাড়ীকে পরীক্ষা করে মিঃ সরকারকে তিনি

বল্লেন : "He has got photogenic feature." ভদ্রলোক যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। এই ভদ্রলোকটিকে পাহাড়ী তখন চিনতে না পারলেও পরে বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে, ইনিই স্বনামধন্য চিত্রশিল্পী ও পরিচালক নীতীন বসু! সাউণ্ড-ট্রাক বাইরে থাকার দরুণ কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করতে বিলম্ব হ'লো। বেলা চারটে অবধি পাহাড়ীকে অপেক্ষা করতে হয়। চারটের সময় সাউণ্ড-ট্রাক এলে তাঁকে মাইকের সামনে খালি গলায় গাইতে বলা হয়। পরীক্ষা শেষ হ'লে দেবকীবাবু পাহাড়ীকে বলেন: আপনি আসতে পারেন সময়মত আপনাকে খবর দেওয়া হবে।" পাহাড়ী চলে আসে। পাহাড়ীর সংবাদ পেয়ে ইতিমধ্যে একদিন পরিচালক প্রফুল্ল রায় বাবুলাল চোখানী ও পণ্ডিত সুদর্শনকে নিয়ে দেখা করতে এলেন—তাঁদের কোন একখানি ছবিতে চুক্তি করতে। এবং মাসিক পাঁচশত টাকা মাইনে দিতে চাইলেন। কিন্তু নিউ থিয়েটার্সের বাইরে পাহাড়ী অভিনয় করবে না বলে স্থির করায়,তাঁদের সংগে কোন চুক্তি করে না। পরের দিন পাহাড়ী আবার দেবকীবাবুর সংগে দেখা করে—আর একবার তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়। ওদিন ৪টা থেকে ৭-৩০ অবধি অপেক্ষা করবার পর দেবকীবাবু পাহাড়ীর কাছে এসে বল্লেন : "Give your right hand. Mr. Sorkar has selected you". মাইনের হার নির্ধারণের সময় পাহাড়ী দু'শ টাকা দাবী করে। দেবকীবাবু ১৫০৲ টাকায় রাজী হ'তে পাহাড়ীকে অনুরোধ করেন—পাহাড়ী অমত করে না। দেড়শ টাকা মাইনেতে পাহাড়ী এক বৎসরের জন্য নিউ থিয়েটার্সের সংগে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লো। পাহাড়ী সমস্ত সত্য ঘটনার কথা উল্লেখ করে কুমার সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লেখে। কুমার সাহেব তাঁর ভবিষ্যৎজীবনের উন্নতি কামনা করে চিঠির উত্তর দেন।

কিন্তু বহুদিন পাহাড়ীকে কোন ছবিতে নামানো হয় না। তাঁকে প্রথমে নিউথিয়েটার্সের পাঞ্জাব-কার্যালয়ে পাঠানো হয়। এবং পরে শ্রীযুক্ত সরকারই আগ্রহ করে তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনেন এবং 'মীরাবাঈ'তে অভিনয়ের সুযোগ দেন। নিউথিয়েটার্সের 'মীরাবাঈ' পাহাড়ী সান্যালের সর্বপ্রথম চিত্র। নিউথিয়েটার্সে পাহাড়ীর মাইনে দেড়শত টাকা থেকে একহাজারে উঠেছিল। মাঝখানে নিউথিয়েটার্সের আর্থিক সংকটের সময় পাহাড়ী উপযাচক হ'য়ে কম মাইনে গ্রহণ করতে থাকে। প্রথম প্রকাশের সংগে সংগেই পাহাড়ী দর্শক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নিউথিয়েটার্সের পর পর কয়েক খানি চিত্রে অভিনয় করেই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার সম্মানে ভূষিত হয়। নিউথিয়েটার্সের অভিনয় কালে পাহাড়ীর জনপ্রিয়তা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দু'একজন ছাড়া আর কেউই দাঁড়াতে সাহস করেননি। নিউথিয়েটার্সে পাহাড়ীর অভিনীত চিত্রগুলির ভিতর নাম করা যেতে পারে—১। মীরাবাঈ। ২। রাজরাণী (হিন্দি)। ৩। ইহুদি-কা-লেড়কী (হিন্দি) ৪। চণ্ডীদাস (হিন্দি)। ৫। রূপলেখা (হিন্দি)। ৬। ডাকুমনসুর (হিন্দি)। ৭। কারওয়ানী হাওয়া (হিন্দি)। ৮। ভাগ্যচক্র। ৯। ধূপছাঁও (হিন্দি)। ১০। মিলিওনিয়ার (হিন্দি)। ১১-১২। মায়া (হিন্দি ও বাংলা)। ১৩। দেবদাস (হিন্দি)। ১৪। দেনা পাওনা। ১৫। পূজারীণ (হিন্দি)। ১৬। বিজয়া। ১৭-১৮। অধিকার (হিন্দি ও বাংলা)। ১৯-২০। বড়দিদি (হিন্দি ও বাংলা)। ২১-২২। বিদ্যাপতি (হিন্দি ও বাংলা)। ২৩। জিন্দগী (হিন্দি)। ২৪-২৫। অভিনেত্রী (হিন্দি ও বাংলা)। ২৬। বকুল কুমারী। ২৭-২৮। সাপুড়ে (হিন্দি ও বাংলা) ২৯। প্রতিশ্রুতি। ৩০। সৌগন্ধ (হিন্দি) প্রভৃতি চিত্রগুলির।

১৯৪২ খৃঃ। ২৫শে মার্চ। পাহাড়ী বম্বে রওনা হ'য়ে যায়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ গোপালই তাকে বম্বে নিয়ে যান। বম্বেতে—১। কিছিছে না-কহনা। ২। মৌজ (Mauz)। ৩। সহেলী। ৪। মজাক। ৫। ইনকার। ৬। মহব্বৎ। ৭। কাদম্বরী। ৮। ইনসান। ৯। কালিদাস। ১০। আনবান (গয়ামিলের হিন্দি)। ১১। ম্যায় কেয়া করু। ১২। গীত। ১৩। শকুন্তলা। ১৪। নৌকাডুবি (বাংলা) ১৫। মিলন। ১৬। বড়ে নবাব সাহেব। ১৭। পরিস্থান
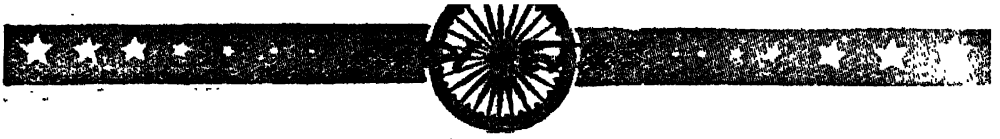
প্রভৃতি চিত্রগুলিতে পাহাড়ী অভিনয় করে। লক্ষ্ণৌতে অভিনেতা ও প্রযোজক 'কুমার'-এর সংগে একসময় পাহাড়ীর হৃদ্যতা জন্মে ওঠে। কথা প্রসংগে একদিন পাহাড়ী তাঁকে বলেছিল "তুমি যদি কোনদিন প্রযোজক হও তোমার চিত্রে বিনে পয়সায় আমি অভিনয় করবো।" 'বড়ে নবাব সাহেব' চিত্রে পাহাড়ী তার সেই প্রতিশ্রুতি পালন করে। এই চিত্রের অভিনয়ের জন্য কুমারের কাছ থেকে পাহাড়ী এক কপর্দকও গ্রহণ করে না। এবং কোনদিন এজন্য তাঁর কাছে শৈথিল্যের পরিচয়ও দেয়নি। এই চিত্রে পাহাড়ী সম্পূর্ণ নতুন একটা খল চরিত্রে অভিনয় করে। এবং তাঁর বম্বের অভিনয়ের ভিতর 'বড়ে নবাব সাহেব' ও 'প্রেম কুমার'ই পাহাড়ীর মতে শ্রেষ্টত্বের দাবী করতে পারে। নিউথিয়েটার্সের অভিনীত চিত্রগুলির ভিতর যদিও তাঁর বিদ্যাপতির অভিনয় তাঁকে অনেকখানি জনপ্রিয়তা এনে দেয়, তবু বিদ্যাপতির ভূমিকাভিনয়ে তাঁকে ততখানি ক্লেশ স্বীকার করতে হয়নি—যতখানি হ'য়েছে বড়দিদি চরিত্রের সুরেন্দ্রনাথকে রূপায়িত করে তুলতে। নিউথিয়েটার্সের হিন্দি ও বাংলা চিত্রগুলির ভিতর যথাক্রমে বড়দিদি, মায়া, সৌগন্ধ এবং বড়দিদি ও প্রতিশ্রুতির অভিনয় পাহাড়ীর কাছে ভাল লেগেছিল। বম্বে থাকতে থাকতেই পাহাড়ী বোসার্ট প্রডাকসনের 'প্রিয়তমা' চিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। চিত্রখানি ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছে। প্রিয়তমা পরিচালনা করেছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। স্থায়ীভাবে কলকাতায় ফিরে এলে পাহাড়ী ভ্যানগার্ড প্রডাকসনের সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়। বর্তমানে নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় ভ্যানগার্ডের নির্মীয়মান চিত্র 'সাধারণ মেয়ে'তে সম্পূর্ণ নূতন একটী চরিত্রে অভিনব রূপসজ্জা নিয়ে পাহাড়ী অভিনয় করছে। নিউথিয়েটার্সের বাইরে বর্তমানে অভিনয় করলেও পাহাড়ী মূলতঃ নিজেকে নিউ থিয়েটার্সের শিল্পী বলেই মনে করে। এবং নিউ-থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের ওপর রয়েছে পাহাড়ীর অসীম শ্রদ্ধা। পাহাড়ীর অভিনেতা জীবনের সাফল্যের মূলে শ্রীযুক্ত সরকারের আগ্রহ ও উৎসাহ কোনদিন পাহাড়ী ভুলবে না। এবং পর পর যে সুযোগ তিনি দিয়েছেন, সে কৃতজ্ঞতা কেই বা পাহাড়ী মন থেকে মুছে ফেলবে কেমন করে! ব্যক্তিগতভাবে শ্রীযুক্ত সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যেয়ে পাহাড়ী বলে, "এরূপ একজন ভদ্রলোক জীবনে আমি দেখিনি।" শ্রীযুক্ত সরকার যদি পাহাড়ীকে বিনা পারিশ্রমিকেও তাঁর কোন ছবিতে অভিনয় করতে বলেন—পাহাড়ী পরম আনন্দের সংগে তাতে স্বীকৃত হবে। ভারতীয় চিত্রজগতে প্রয়োগশিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়ার মত প্রতিভাসম্পন্ন পরিচালক আর দ্বিতীয়টি নেই বলে পাহাড়ী মনে করে। শ্রীহেমচন্দ্র ও নীতীন বসুর দক্ষতাকেও পাহাড়ী শ্রদ্ধা জানায়—আর তারিফ করে বর্তমান পরিচালক গোষ্ঠীর ভিতর পরিচালক নীরেন লাহিড়ীকে।

বম্বে ও বাংলার অভিনয়ের তুলনামূলক মানবিচারে বাংলাকেই পাহাড়ী আগে স্থান দেয়। বিশেষ করে বাংলার অভিনেতারা বম্বের অভিনেতাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। আবার সেই তুলনায় বম্বের অভিনেত্রীদের শক্তিমত্তাকে পাহাড়ী অস্বীকার করে না। বর্তমান বাঙ্গালী অভিনেত্রীদের ভিতর পাহাড়ী মলিনার ভূয়সী প্রশংসা করে – অভিনেতাদের ভিতর ছবি বিশ্বাসের সংগে সে আর কারোর তুলনা করতে রাজী নয়। অবশ্য জহর গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব ভংগীমায় পাহাড়ীকে মুগ্ধ করেন। পুরোনদলের ভিতর উমাশশী, স্বর্গতঃ যোগেশ চোধুরী, ৺শৈলেন চৌধুরী এবং অহীন্দ্র চৌধুরীর বৈশিষ্ট্যকে পাহাড়ী শ্রদ্ধা জানায়। স্বর্গতঃ দুর্গাদাসের ভাগ্যচক্রের অভিনয় পাহাড়ীর খুবই ভাল লেগেছিল এবং প্রিয়দর্শন নট হিসাবে তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করলেও দুর্গাদাসকে খুব শক্তিমান অভিনেতা বলে পাহাড়ী মেনে নিতে রাজী নয়। শ্রীনরেশ মিত্রের অভিনয়-শিক্ষা-পদ্ধতিকে পাহাড়ী ভূয়সী প্রশংসা করে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কথা বলতে যেয়ে পাহাড়ী বলে: "He is the only actor, the world has ever produced." সংগীত পরিচালকদের ভিতর রাইচাঁদ বড়ালের শক্তিমত্তাকে পাহাড়ী সর্বাগ্রে উল্লেখ করে। তবে চিত্রজগতের বর্তমানকালীন সংগীত-পরিচালনা পদ্ধতি পাহাড়ীর মোটেই ভাল লাগে না। আধুনিক

...িকাদের ভিতর যথাক্রমে শচীন দেববর্মন, ধনঞ্জয়, ভট্টাচার্য, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সুপ্রভা সরকার ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—পাহাড়ীর মন কেড়ে নেয়। এঁদের ভিতর ধনঞ্জয় ও সুপ্রভার কথাই সে বেশী জোড় দিয়ে বলে।

বিলিয়ার্ড ও নিজের ছোট্ট সাত বছরের মেয়ে 'লুকু'কে নিয়ে পাহাড়ী সারাক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারে। আরও ভাল লাগে তাঁর বই নিয়ে মসগুল হ'য়ে থাকতে। পাহাড়ীর বই কেনা ও পড়া দেখে তাঁকে বইয়ের পোকা বলা যেতে পারে। খেলাধুলার ভিতর বিলিয়ার্ড ছাড়া ক্রিকেট—টেনিস ও হকি পাহাড়ী যেমনি খেলতে পারে, তেমনি খেলা দেখতেও ভালবাসে। ফুটবল না খেললেও খেলা দেখতে পাহাড়ী ...পায়। 'পনটুন' নামে আর একটী খেলা পাহাড়ীর খুবই প্রিয়। রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করলে পাহাড়ী বলে: ওটা থাক। রাজনীতির কচকচানী আর ভাল লাগে না।" পাহাড়ীর মতে ভারতে রাজনীতি ব্যর্থ হ'য়েছে। কোন খাবারটা পাহাড়ীর বেশী প্রিয়, তা সে নিজেও বলতে পারে না। যখন যেটা সামনে এসে হাজির হয়, সেটাকেই পরম পরিতৃপ্তির সংগে গ্রহণ করে। এবং খাবার বিষয়ে তাঁকে একজন পাল্লাদারী ওস্তাদের পর্যায়ে অনায়াসেই টানা যেতে পারে। 'পান'টা যদিও পাহাড়ী খুবই অতিরিক্ত ..., যখনই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হ'বে—দেখতে পাবেন ... করে পান চিবোচ্ছে—আর ঠোট দু'টি লাল ...—কিন্তু পান-দোষ পাহাড়ীর কোনদিন ...নেই। পাহাড়ী দ্বিতীয়বার বিয়ে করে ...মীরা দেবীকে। 'অধিকার' চিত্রে মীরাদেবীর সংগে ...নেকেরই সাক্ষাৎ হ'য়েছে। পাহাড়ীর এইবারের বিয়েও ...স্বাভাবিক পথ বেয়ে হয়নি। দ্বিতীয়বারেও সে মনের ...উদারতা ও বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছে, তা খুব কমই ...খতে পাওয়া যায়। পাহাড়ীর পারিবারিক জীবন খুবই মধুর। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে তাঁরা এত ভালভাবে জানে ও ...চনে যে, সেখানে কোনদিন কোন ভুল এসে মাথা চাড়া দিতে পারেনি—যে-ভুল বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্বামীস্ত্রীর সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়। অবসর সময়ে স্বামী-স্ত্রীর কাটে তাঁদের একমাত্র সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে। দেখতেও যেমনি ফুটফুটে—কথাবার্তায়ও তেমনি চটপটে। পাহাড়ীর মেয়েটি শুধু তার মা বাপেরই নয়—যে সব অতিথি বন্ধুবান্ধবরা বাড়ীতে আসেন, কিছুক্ষণের ভিতরই লুকু তাঁদের অন্তরও জয় করে নেয়।

ব্যক্তিগতভাবে পাহাড়ী খুব অমায়িক ও সদালাপী। তাঁর মিষ্টি হাসির মতই ব্যক্তিগত ব্যবহারটুকুও অপূর্ব মিষ্টি। পাহাড়ী কাউকেই শত্রু বলে মনে করে না। কারোর বিরুদ্ধে কোন কুটিল মনোভাব কোনদিন সে পোষণ করে না—চিত্রজগতে তাই পাহাড়ীর মত জনপ্রিয় শিল্পী খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। বেলা দশটা থেকে বেলা পাঁচটা অবধি পাহাড়ী রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে ছিল—এই সময়টা রূপ মঞ্চ কর্মীদের সংগে হাসি তামাসায় এতই মধুর করে তুলেছিল যে, আমরা কোনদিন তাঁর কথা ভুলবো না। রূপ-মঞ্চের কথা জিজ্ঞাসা করাতে পাহাড়ী বলে: রূপ-মঞ্চের সংগে আমার পরিচয় বম্বেতে। বাংলার বাইরে একখানি বাংলা কাগজ ষ্টুডিওর ভিতর সকলের হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে খুবই আনন্দ পাই। এবং ধীরে ধীরে রূপ মঞ্চ আমারও হাতে আসতে থাকে—আমার মনের উপরও তার প্রভাব বিস্তার করে। কলকাতায় এসে এ দৃশ্যটা আরো বেশী চোখে পড়ে। রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলতে চাই না।" এদিনও আমরা সামান্য জলযোগের আয়োজন করেছিলাম—আমাদের এই দীন আয়োজন কতটা আন্তরিকতার সংগেই না পাহাড়ী গ্রহণ করলো! শিল্পী হিসাবে পাহাড়ীর স্থান দর্শকসমাজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে আছে—কিন্তু মানুষ হিসাবে পাহাড়ী যে কত বড়—তা বলতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা এক দিনও তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছেন। তাই, শিল্পী পাহাড়ী ও মানুষ পাহাড়ী কাউকেই কোনদিন আমরা ভুলতে পারবো না। বিদায় নেবার সময় তেমনি মিষ্টি হাসি পাহাড়ীর ঠোঁটের কোনে ফুটে ওঠে—আমরা ওকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি। ওর গাড়ী আমাদের পেছনে রেখে রাস্তা বেয়ে ছুটে চলে—ওর হাসির ঝিলিকটুকু আমাদের সারাদিনের ক্লান্তিকে যেন দূর করে দেয়। আমরা উপরে চলে আসি। —শ্রীপার্থিব।

উপন্যাস

কালীশ মুখোপাধ্যায়

রূপ-মঞ্চের যেসব পাঠক পাঠিকা এতদিন ধৈর্যধবে আগ্রহের সংগে 'রাই'র জন্ম অপেক্ষা করে আসছিলেন—প্রথমে তাঁদের জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। রূপ-মঞ্চ-র সম্পাদনার ফাঁকে শুধু তাঁদের উৎসাহ এবং প্রেরণাতেই 'রাই'কে সমাপ্ত করতে পেরেছি। তাই, তাঁদের কাছে নিছক মামুলী ধরনের কৃতজ্ঞতা জানাবোনা—তাঁদের জন্য রইল আমার অন্তরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা। কতগুলি বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'রাই' রচিত হলেও ব্যক্তিগত ভাবে কাউকে আঘাত দিতে চাইনি—যে অন্যায় আমাদের 'ব্যক্তি'কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে—তারই বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছি। এই অন্যায়ের পাকে 'রাই'র মত বহু জীবনকে ব্যর্থ হয়ে যেতে দেখেছি। এজন্য আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা কম দায়ী নয়। আমি শুধু তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই চাইনি—চেয়েছি এই অন্যায়ের মুখোস খুলে দিয়ে—নির্যাতিতা 'রাই'দের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন করে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। কতটা সফল হয়েছি—তা বলতে পারবেন—আমার পাঠক সমাজ। এই প্রসংগে তাঁদের নামোল্লেখ করতে চাই—যাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ আমার মনে প্রথম আগুন জ্বালায়—যাঁরা এই উপন্যাসে প্রচ্ছন্ন ভাবে থেকে তাঁদের আদর্শের দ্যুতিতে আমার 'রাই'র চলার পথকে করেছেন উদ্ভাসিত। এঁরা হচ্ছেন—ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণদাস ও যতীন ভট্টাচার্য আর এঁদের একান্ত অনুগত সৈনিক আমার অগ্রজ অমূল্য মুখোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'য়ে এলো। মিত্রশক্তির সহযোগিতায় বৃটিশ রাজশক্তির মর্যাদা এবারের মতও বজায় রয়ে গেল। কিন্তু সমস্ত বিশ্বই আজ যেন নতুন রূপ ধারণ করেছে। দিকে দিকে—দেশে দেশে মানুষের স্বাধীন-সত্তা কোন যাদুমন্ত্রে যেন আজ জেগে উঠেছে। বিশ্বের নিপীড়িত মানবাত্মা আজ এক সংগে মুক্তির জোয়ারে নেচে উঠেছে। এই জাগ্রত শক্তির অগ্রগতির পথ কে রুদ্ধ করে দাঁড়াবে? বিশ্বের এই নব জাগরণের সুর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে বিচলিত করে তুললো। বৃটিশ রাজশক্তির শিকড়ও আজ নড়ে উঠেছে। বৃটিশ জনসাধারণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলো—এ-জয় তো সত্যিকারের জয় নয়। এ-জয় প্রীতি ও শুভেচ্ছার বিনিময়ে তারা লাভ করেনি—এ-জয় তারা অর্জন করেছে ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে। এই ঘৃণা ও বিদ্বেষের বহ্নিতে তারাও যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে! দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে হ'লে নতুন পথ চাই! পার্লামেণ্টের নির্বাচনে এর নিদর্শন পাওয়া গেল। চার্চিলের স্থলাভিষিক্ত হ'লেন এ্যাটলী। তিনিও তাঁর পূর্বানুবর্তীদের পদাংকানুসরণ করে চলতে চাইলেন। কিন্তু ঐ চাতুর্যের মায়াজাল বিস্তার করে আর কি তারা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে সমর্থ হবেন? দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ছোট ছোট দেশগুলিও আজ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে জেগে উঠেছে। এশিয়া ভূ-খণ্ডে কারো প্রতিপত্তি তাঁরা বরদাস্ত করবে না। জেগেছে মালয়—ব্রহ্মদেশ—ইন্দো-চীন—ভিয়েটনাম-সিংহল। জেগেছে ভারত। প্রথম যুদ্ধে বৃটিশ রাজশক্তিকে বিশ্বাস করে যে ভুল সে করেছিল—সে ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হতে দেবে না। দেয়ওনি। যুদ্ধে জয়ী হ'লেও বৃটিশরাজশক্তি আজ সর্বস্বান্ত। বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশগুলির সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে কোন সম্পদ নিয়ে ব্রিটেন রুখে দাঁড়াবে? হার তাদের আজ মানতেই হবে। নৈতিক শক্তির কাছে নতিস্বীকার করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় নেই। নেতাদের মিতালী কামনায় তারা আগ্রহ প্রকাশ করে। ভারতের সংগে আপোষ রফায় তাদের
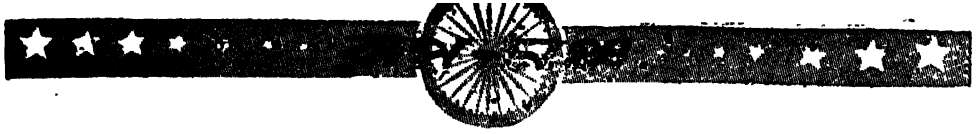
কতইনা তৎপরতা! নেতাদের পথ করে দিয়ে কারার কপাটগুলি এক এক করে উন্মুক্ত হ'তে থাকে। দেশের মুক্ত প্রাংগনে এসে নেতারা দাঁড়ালেন। দীর্ঘদিন জনসাধারণের মাঝখান থেকে তাঁদের সড়িয়ে রাখা হয়েছিল—দেশের কোন খবরাখবরই তাঁদের কানে পৌঁছোতে দেওয়া হয়নি। এরই সুযোগ নিয়ে আমলাতান্ত্রিক সরকার আপোষ রফার কাজটা তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে চায়। নেতারা বলেন: সবুর, অতটা আগ্রহ ভাল নয়। অনেকদিন আটকে রেখেছিলে, একবার বিরহের জ্বালাটা কাটিয়ে নিতে দাও। আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে খবরাখবরটা নিয়ে নি। এই খবরাখবর নিতে যেয়ে তাঁদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। দেশের একী রূপ আজ! কে এই মহাশ্মশান রচনা করলো? আর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠবার সুযোগই বা কে দিল? বাইরের আলোয় নেতাদের বুঝতে বেগ পেতে হয় না—কারা এই শোচনীয়তার জন্য দায়ী! তাই আপোষ রফার কথায় তাঁদের মন ভুলতে চায় না। তাঁরা স্পষ্টভাবে বলে: থামো। আগে ঘর সামলাতে দাও।

সাম্রাজ্যবাদী অন্তরাল থেকে ক্রূর হাসি হাসে: মনে মনে বলে: পারবে কী আর ঘর সামলাতে। নেতারা দমে যাবার পাত্র নন। দেশ ও জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে না পারলে এতদিনের সংগ্রামই যে যাবে ব্যর্থ হ'য়ে। তাঁরা জনসাধারণের নাড়ী টিপে দেখতে চান—সমস্ত স্পন্দনই কী থেমে গেছে! আর কী সেখানে ঝড় উঠবে না? কে বলে! ওসবই ওদের ছল-চাতুরী। বহুদিন বাদে নেতাদের ফিরে পেয়ে বিমূঢ় জনসাধারণ যেন আবার তাঁদের জীবনীশক্তি ফিরে পায়। নেতারা আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর আজাদী সৈনিকদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে ইংরেজ সরকার মনে করেছিল, জনমতকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করতে তারা কৃতকার্য হয়েছে। নেতাদের সামনেই সেই মিথ্যা প্রচারের মায়াজাল বিস্তার করলো। কিন্তু বৃটিশ সরকার হিসাবে ভুল করলো—বুঝতে পারলোনা যে, সুভাষ এঁদের কত চেনা! তাঁর সংগে এঁদের অন্তরের যোগই বা কতখানি! সুভাষ যদি ভুল করে থাকে, দেশের জন্যই করেছে—জনসাধারণ এবং নেতাদের এই বিশ্বাসের মূলে সরকারের আঘাত ব্যর্থ হ'য়েই ফিরে এলো। তারা সুভাষের আজাদী সৈনিকদের বন্দী করে শত্রুর সংগে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপবাদে শাস্তি দিতে উদ্যত হ'লো। যে লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের স্বপ্নে ছিল তাঁরা বিভোর—সেখানে অবরুদ্ধ করে রাখা হ'লো তাঁদের। কিন্তু আজ একী গুঞ্জন ভারতের আকাশে বাতাসে! একী বজ্রদীপ্ত প্রতিবাদের ধ্বনি! সকলের মুখে এক কথা: ছেড়ে দাও—দাও ছেড়ে ওদের। ওদের কেশাগ্রও তোমাদের কলংকিত হস্তে কলুষিত হ'তে দেবোনা। হিন্দু মুসলমান সবাই রুখে দাঁড়ায় এক সংগে। রাজপথ শহিদের রক্তে রঞ্জিত হ'য়ে ওঠে। নেতারাত এই চেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন, জাতির প্রাণশক্তিকে যাচাই করে নিতে—তাঁদের আবার ঝড়ের নাচনে নাচিয়ে নিতে। তাঁদের ডাকে সবাই সাড়া দেয়। কংগ্রেস বুক পেতে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর সৈনিকদের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু একী—একী নতুন কাহিনী! ভুলত ওরা করেনি। যাঁদের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল—তাঁরাও বলে, তাইত, বলি ভুল কী ওরা করতে পারে! না-না ভুল ওরা করতে পারে না। বৃটিশের যুদ্ধকালীন ধাপ্পাবাজীর নতুন আর এক রূপ ধরা পড়ে। আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত ভুল ফুল হ'য়ে জাতিকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। সমস্ত দেশ আজ বীর সেনানীদের বন্দনায় মেতে উঠেছে। আজাদ হিন্দ ফৌজকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস নতুন শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ওঠে। বৃটিশ রাজশক্তি স্তম্ভিত: না—এদেশ তাদের ছাড়তেই হলো। 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে?' তারা পরিষ্কার ভাষাতেই বলতে লাগলো: এই রইল তোমাদের দেশ। বুঝে নাও আমাদের কাছ থেকে সকল দায়িত্ব।

আমরা সত্যিই চলে যাচ্ছি। যাবার সময় শুধু একটা অনুরোধ জানিয়ে যাবো—এতদিন একসংগে ঘর করলাম, আমাদের অতীতের সকল অপরাধ ভুলে যেও তোমরা। যাবার বেলায় তোমাদের বন্ধুত্ব নিয়েই যেতে চাই। দেশের কণ্ঠ থেকে উত্তর আসে: তোমরা আঘাত দিয়েছো বলে আমরা আঘাত হানতে যাবো কেন? নিশ্চয়ই তোমরা আমাদের বন্ধুত্ব পাবে। হ্যাঁ, পাবে বৈ কী! আঘাতের পরিবর্তে আমরা প্রেম বিলাই--এইত এ-দেশের মর্মকথা। ভারতের অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর এই শাশ্বত ধারা সভ্যতার আদিম যুগ থেকে সমান খাতে বয়ে আসছে। বুদ্ধ—চৈতন্য এঁরাও ত এই বাণীই প্রচার করে গেলেন। আজও দেখো—এ যুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধীর কণ্ঠেও ঐ অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর বাণী। এঁরাইত ভারতের নৈতিক আত্মার প্রতিমূর্তি।
মহাত্মা গান্ধী সমস্ত দেশের পক্ষ থেকে অভয় দিয়ে বলেন: মেরেছো-মেরেছো কলসীর কাঁধা—তাই বলে কী প্রেম দেবো না? এসো, সমস্ত ছলনা পরিত্যাগ করে সরল মন নিয়ে আলোচনা চালাও। জিন্নাসাহেব রয়েছেন—রয়েছেন মৌলানাসাহেব—জওহরলাল—আরো অন্যান্য নেতারা রয়েছেন। এঁরাই জনসাধারণের প্রতিনিধি। আমি কোন দলের নই। আমি সকলের। তোমরা যেখানে আটকে পড়বে—আমায় তলপ করো—পারিতো সাহায্য করবো। কিন্তু আগে ওদের ছেড়ে দাও—ঐযে যাঁদের আটকে রেখেছো তোমাদের গারদখানায়। দেশকে ভালবেসে তোমাদের কত নির্যাতনই না ওরা সয়েছে! ওদের না ছাড়লেত চলবে না।
—ওদের ছাড়তেই হয়। জেলের কপাট এক এক করে উন্মুক্ত হতে থাকে। আবার চরকার গুন গুনানিতে সারা দেশ ভরে ওঠে। বল্লভপুর গ্রামও এই গুনগুনানি থেকে বাদ যায় না। ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার সংগে সংগেই শিবশঙ্কর সুধীর মিস্ত্রীকে কতকগুলি চরকা তৈরী করে দিতে বলেছিলেন। সুধীর মিস্ত্রী সেগুলি দিয়ে গেছে দু'একদিন হলো। আজ সূত্রযজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। গ্রামের সকলকেই ডাকা হয়েছে সূত্রযজ্ঞে যোগদান করতে—। কেউ এসেছে। কেউ আসেননি। পাঁচকড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাংগনে সতরঞ্চি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুরুষেরা আসর করেছে শিবশংকরকে ঘিরে—আর মেয়েরা ঘিরে বসেছে সুনন্দাকে। বিদ্যালয়ের মেয়েরাই শুধু নয়—গায়ের এবাড়ী ও-বাড়ীর বহু হিন্দু-মুসলমান মেয়েরাও এসে যোগ দিয়েছে। জেলে বৌ এসেছে। পুরুষদের ভিতর হলধরও স্থান করে নিয়েছে। বেলা দু'টা থেকে সূত্রযজ্ঞ আরম্ভ হবে। তখনও যারা এসে পৌছোয়নি, তাদের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে—সকলের সামনেই সুতোর পাঁজ আর চরকা। মাঝখানে একটা হারমোনিয়াম রয়েছে। লেখা ও তার সমবয়সী আরো কয়েকটি ছেলে মেয়ে হারমোনিয়ামটার চারিদিক ঘিরে বসেছে। সময় হয়ে এসেছে। আনুষ্ঠানিক কার্যের জন্য সকলে প্রস্তুত হয়ে আছে। সমস্ত পরিবেশটি এক নিস্তব্ধ পবিত্রতায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

"বাবু এ্যাট্টু এধারে আইসবেন" গাঁয়ের পিওন পদ্মলোচনের ডাকে শিবশংকর সচকিত হয়ে ওঠেন।

"কে পদ্মলোচন—চিঠি-ঠিটি আছে নাকি?"

পদ্মলোচন তার সুতোয় বাধা ভাঙ্গা চশমাটা চোখে চড়িয়ে নিতে নিতে বলে: "আইজ্ঞে হ্যা—টেলুগাম আছি।" শিবশংকর ত্রস্ত হয়ে বাইরে আসেন। সকলের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি তাঁকে অনুসরণ করে চলে। শিবশংকর সই করে পদ্মলোচনের হাত থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে খুলতে থাকেন। পদ্মলোচন বলে, "ভাঙ্গার থ্যা ডাকে আইছে, সেইর লাইগ্যা এ্যাকদিন দেইর হইয়া গ্যাছে। তয় ভাল খপর তো?"

টেলিগ্রামটি পড়তে পড়তে শিবশংকরের মুখে খুশীর ভাব ফুটে ওঠে—। পদ্মলোচনকে উদ্দেশ্য করে বলেন: "হ্যা ভাল খবর। ছোটবাবু শীঘ্রই ছাড়া পাবে—তুমি পরে এসো।" পদ্মলোচন চলে যায়। শিবশংকর টেলিগ্রামটা হাতে নিয়ে এসে ভিতরে ঢোকেন। সকলেই তাঁর মুখ থেকে সংবাদ শুনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে—। শিবশংকর দাঁড়িয়ে বলেন, "আজ এই শুভদিনে
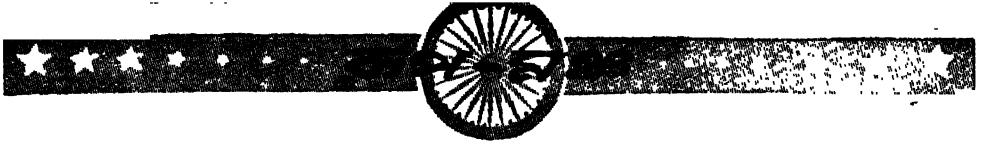
—আর একটি শুভ সংবাদ আপনাদের দিচ্ছি। আপনাদের দেবুর মুক্তির হুকুম হয়েছে।" শিবশংকর থেমে পড়েন। সকলের মনটাই আজ খুশীর সংবাদে ভরে উঠেছে। কিন্তু একখানি মুখ তখনও শিবশংকরের দিকে চেয়ে আছে—সে মুখ আর কারোর নয়—সুনন্দার। টেলিগ্রামটা নিজে না দেখে যেন তাঁর তৃপ্তি হচ্ছে না। শিবশংকর টেলিগ্রামখানা লেখার হাতে দিয়ে বলেন, "তোমার মাকে দিয়ে এসো !" লেখা টেলিগ্রামখানা মার হাতে পৌঁছে দিয়ে আসে। ছেলেদের ভিতর কে যেন ধ্বনি দিয়ে ওঠে, "জয় দেবশংকরের জয়"—সংগে সংগে প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে, "জয় দেবশংকরের জয়।" শিবশংকর বলেন: "যিনি আমাদের রাষ্ট্রপিতা, যাঁর নির্দেশে এতদিনের সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে চলেছে—আগে ঐ মহামানবের জয়ধ্বনি দাও"—সভায় মহাত্মাজীর একখানা প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল, তার দিকে চেয়ে সকলে ধ্বনি দিয়ে ওঠে—"জয় মহাত্মাজীর জয়।" পরে আর একজন দাঁড়িয়ে বলে, "জয় সুভাষচন্দ্রের জয়—জয় পূর্ণ দাসের জয়, জয় যতীন ভট্টাচার্যের জয়", সকলে পর পর প্রতিধ্বনি করে ওঠে।

জয়ধ্বনির পর শিবশংকর দাঁড়িয়ে বলেন: "সূত্রযজ্ঞের পূর্বে আপনাদের আমি অনুরোধ করবো—যে সব শহীদের আত্মত্যাগে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম আজ জয়যুক্ত হতে চলেছে, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হ'য়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে। ফাঁসির মঞ্চে, কারা প্রাচীরে, বৈদেশিক সরকারের নির্যাতনে যাঁদের জীবন দীপ নির্বাপিত হয়েছে—সেই শহীদদের স্মরণার্থে আসুন, আমরা দু'মিনিট মৌন থেকে তাঁদের আত্মার মঙ্গল কামনা করে—আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।" শিবশংকরের কথা শেষ হতে হতেই সকলে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট মৌনতা অবলম্বন করেন। মৌনতা ভংগ করে শিবশংকর বলেন, "এবার অপনারা সবাই বসে পড়ুন। "সকলে বসে পড়লেন। শিবশংকর বসে বলতে লাগলেন: "সূত্রযজ্ঞ আরম্ভ হবার পূর্বে দীন গ্রামবাসীকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আদর্শে যিনি উদ্বুদ্ধ করেছেন—আমাদের লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত করেছেন—ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনে যাঁর শ্রেষ্ঠ দান এই চরকা—সেই মহামানব মহাত্মা গান্ধীর প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিচ্ছি। বলুন সকলে—জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়—" সকলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে, "জয় মহাত্মা গান্ধীর জয়।"

শিবশংকরের সংগে সংগে সকলের হাতের চরকা গুন্-গুন্ ঘর-ঘর করে ওঠে—লেখাদের কণ্ঠে গীত হতে থাকে—"জয় জয় জয় চরকার জয়—" লেখাদের রাগিনী আস্তে আস্তে থেমে আসে। কারোর মুখেই কোন কথা নেই—শুধু চরকার ঘর ঘর শব্দ চারিদিক মাতিয়ে তুলেছে। পাশের স্তূপীকৃত পাঁজগুলি ধীরে ধীরে কমে আসছে। কারোর কোনদিকে দৃষ্টি নেই। সকলেই যেন আজ সকলের সংগে পাল্লা দিয়ে চলেছে।

* * * *

প্রেসিডেন্সী জেলে সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তির হুকুম এসেছে। রাজবন্দী ও বন্দিনীরা সবাই নানান জল্পনা কল্পনায় মত্ত। কয়েকদিনের ভিতরই যেন জেলের আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে পালটে গেছে। জেল কর্তৃপক্ষ যেঁচে যেঁচে এসে আলাপ করে যাচ্ছে সকলের সংগে। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে তাদের অপরাধের জন্য। এমন যে মেট্রোন, তিনিও দু'ঘণ্টা বসে রাজবন্দিনাদের সংগে কথাবার্তা বলছেন। তার আলাপ আলোচনায় তোষামোদের সুরও ফুটে উঠেছে! মেট্রোন চলে গেলে মিস লাইট কমলাদিকে বলেন, "কমলা দি—কী খাতিরটাই না করে গেলো—এখন থেকেই ভয়ে ধরেছে। কী জানি, তুমি হয়ত লীলাদিই যদি কারা-মন্ত্রী হয়ে আসবে এই জেল পরিদর্শন করতে!"

লীলাদি কৌতুক করে বলেন: "আচ্ছা—আমি কী কমলা মন্ত্রী হলে তোকে সেক্রেটারীর পদে বহাল করা যাবে।" সকলে একসংগে হেসে ওঠে।

কয়েদীদের মাঝেও একই জল্পনা কল্পনা ক'দিন ধরে। ওরাও যেন বুঝে নিয়েছে—এঁদের এই শেষ যাত্রা—জেলের দরজা আর এঁদের মারাতে হবে না। লখিয়া, -বিন্দা আরো অনেকে ছল ছল চোখে এসে দাঁড়ায়।
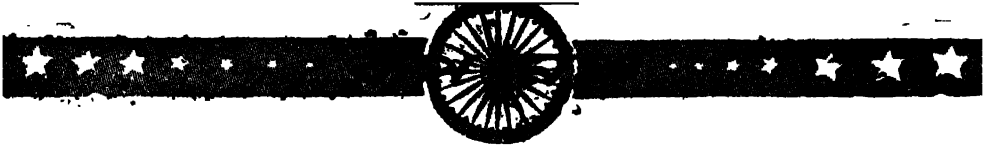
মিস লাইট জিজ্ঞাসা করেন, "কিরে, কিছু বলবি নাকি?" লখিয়া বলে: "আমাদের কথা ভুলবেক না দিদিমণি!" মিস লাইট সান্ত্বনা দিয়ে বলেন: "নারে না! এ-সুখত আমাদের একার জন্য নয়। তোদের—আমাদের সকলেরই সব দুঃখ এবার ঘুচে যাবে।"

লখিয়া-বিন্দা—এঁদের অবিশ্বাস করতে পারে না। ভবিষ্যতের কোন আশায় ওরাও আশান্বিত হয়ে ওঠে। রাজবন্দী ওয়ার্ডেও ঐ একই অবস্থা। স্বয়ং জেইলার এসে আড্ডা জমিয়েছেন। তার ভারিক্কীয়ানা চাল আর নেই। তিনিও বলছেন, "কর্তব্যের খাতিরে কত অন্যায়ই না করেছি আপনাদের ওপর। ওগুলি আর মনে রাখবেন না।" দেবু ওবা হাসতে হাসতে বলে, "না-না-কী যে বলেন!" জেইলর উঠে যাবার সংগে সংগে রমেশ দত্ত বলে ওঠে: "বেটা দাঁড়াও, সুযোগ পেলে তোমার চাকরী আগে খাবো।" দেবু হাসতে হাসতে ধমকে ওঠে; "আঃ থাম না রমেশ—শুনে ফেলবে।" রমেশ সংগে সংগে বলে ওঠে, "শুনে ফেললে বয়েই গেল—ব্যাটা কী জ্বালাতনই না করেছে! ওকে আমি দেখে নেবোই।" "বেশ দেখে নিস" বলে দেবু রমেশকে থামায়। তারপর মেয়েদের ওয়ার্ডের দিকে পা বাড়ায়। মিস লাইটকে আগেই খবর দিয়েছিল। দেবু অফিসে যেয়ে একটু অপেক্ষা করতেই মিস লাইট এসে হাজির হলেন। দেবু পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করে তাঁর হাতে দিল। মিস লাইট টেলিগ্রামটা খুলতে খুলতে জিজ্ঞাসা করেন: "কে—শিবদা দিয়েছে বুঝি!"

দেবু উত্তর দেয়, "পড়েই ছাখ না?"

টেলিগ্রামটা পড়তে পড়তে মিস লাইট উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠেন, "আরে, সু-বৌদি-দাদা লেখাও আসছে যে —ইস লেখা কত বড়ই না হয়েছে! চিনতেই পারবেনা হয়ত।" টেলিগ্রামটা খামে পুরে দেবুর হাতে দিয়ে হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে যান। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, "না, দেবুদা, ভেবে দেখলাম—" মিস লাইট থেমে পড়েন। দেবু জিজ্ঞাসা করে, "কী ভেবে দেখলাম!" মিস লাইট মুখ নিচু করে উত্তর দেন, "আমার যাওয়া হবে না।"

দেবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, "তার মানে?" মিস লাইট বলেন, "আমি কমলা দি'র সংগে যাবো— তুমি বৌদিকে সব খুলে বলো।" দেবু অভিভাবকত্বের সুরে বলে, "ওসব পাগলামি রাখ—বৌদিরা আসছেন, দেখিস কী ভাবে ওদের অবাক করে দি।"

মিস লাইট কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাঁর অন্তরের ভাষা দেবুর কাছে আর গোপন রয়না। সান্ত্বনার সুরে দেবু বলে, "অভিমান করবি কার ওপর, বল! তোকে কেউ পথ খুঁজে দিতে পারেনি সত্য—কিন্তু তোর নির্যাতনের নজির রেখেই না আজ বৌদিরা বিরাট এক পরিকল্পনাকে মূর্ত্ত করে তুলেছেন—আজ কত অসহায় মেয়েদের একটা হিল্লে করে দিয়েছেন। তুই যাবি সেখানে মাথা উঁচু করে—বুক ফুলিয়ে—তোর আদর্শ তাদের কত প্রেরণা দেবে!" দেবু চুপ করে। আবার বলে, "তুই ভেবে দেখ তোর প্রথমদিনের অসহায়তার কথা—তুই তোর এই প্রতিষ্ঠা নিয়ে যখন হাজির হবি—কত বল পাবে তারা। জানি, আজ সহরেও কাজের অন্ত নেই। কিন্তু গাঁয়েও ত আমাদের কম প্রয়োজন নয়। আজ অসহায় গ্রামই যে হবে আমাদের গঠনমূলক কর্ম-প্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল। নতুন করে—নতুন ছাঁচে তাকে ঢেলে গড়তে হবে। তুই ভেবে দেখ রাই, তোর মত কর্মীরই আজ বল্লভপুরের বেশী প্রয়োজন। অন্ন নেই—শিক্ষা নেই—স্বাস্থ্য নেই—অর্থ নেই বাংলার এই অসহায় গ্রামই যে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তোর আর কোথাও যাওয়া চলতে পারে না!" মিস লাইটের চোখ দিয়ে টস টস করে জল গড়িয়ে পড়ে। দেবু জিজ্ঞাসা করে, "কী, তাহ'লেত আর পাগলামী করবি না!" মিস লাইট নিজেকে সংযত করে ভাঙ্গা গলায় উত্তর দেন, "না—আর পাগলামি করবো না। তোমার নির্দেশ মাথা পেতে নিলাম।"

"বাঁচালি আমাকে।" দেবুর বুক থেকে যেন মস্ত বড় একটা বোঝা কমে যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। মিস লাইট গড় হ'য়ে প্রণাম করে নেয়।—দেবু তাঁদের ওয়ার্ডের দিকে চলে আসে।

জেলে প্রতিটি কাজেই নিয়ম বাঁধা আছে। কিন্তু আজ ক'দিন ধরেই তার ব্যতিক্রম চলছে। মাত্র আর একটা রাতের ব্যবধান। তারপর এই মুক্তি-সেনার দল দেশের মুক্ত প্রাংগনে যেয়ে মুক্তির গানে আবার মেতে উঠবে। অনেকরাত অবধি গল্পগুজব চলেছে—যে যার তৈজসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত রয়েছে—তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। মিস লাইটও এসে বিছানা নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর চোখে আজ আর ঘুম নেই। একটা রাতইত—না হয় জেগেই কাটিয়ে দেবে। কত কথাই না আজ মিস লাইটের মনে পড়ছে! মনে পড়ছে বহুদিন আগেকার আর একটা বিনিদ্র রজনীর কথা। বাদল ও তার বৌ'র ষড়যন্ত্রের কথা! সেদিন তাদের ওপর রাগ হলেও আজ তাদের বিরুদ্ধেও মিস লাইটের কোন নালিশ নেই। আজ সমস্ত বিপদ কাটিয়ে উঠেছে—আজ আর ভয় কী! ক্ষোভই বা কী! কোন ক্ষোভ নেই! ক্ষোভ শুধু মেহের-নাসির-মিঃ লং—এদের সংগে আর দেখা হবে কিনা এই কথা ভেবে—তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পাবে কিনা—তারই অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে মিস লাইটের মনটা টনটনিয়ে ওঠে। জীবনে কোনদিন সে এদের কথা ভুলতে পারবে না। ভুলতে পারবে না জীবনের আরো অনেক কথাই। কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাঁর মনের মাঝে তোলপাড় করে—তাকে যে ভুলতেই হবে। কিন্তু নিজের সংগে অহরহ সংগ্রাম করেও সেকথা ভুলতে পারে কৈ মিস লাইট! ভুলতেও পারে না—প্রকাশ করতেও পারে না। তাই অব্যক্ত বেদনায় শুধু সেকথাকে রাঙিয়ে নেবে মিস লাইট।

জেলের ঘন্টিতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল এরই মধ্যে। কোনদিক দিয়ে রাতটা যে কেটে গেল মিস লাইটের! কিন্তু একটুকুও তবু ক্লান্তি হয়নি—অবসাদ আসেনি। নানা কথার মাঝে বার বার তাঁর ঐ একই কথা মনে বেশী করে উঁকি মেরেছে—অন্তরের দেবতার কাছে বার বার ঐ একই মিনতি জানিয়েছে—"ভগবান আমায় শক্তি দাও—সাহস দাও প্রভু—আমি যেন দেবুদার এতটুকু অসম্মান না করি। তাঁর কর্মের মাঝেই যেন নিজেকে সপে দিতে পারি—দেশের সেবার ভিতরই যেন তাঁকে দেখতে পাই।"

চারিদিক ফরসা হ'য়ে উঠেছে। জেলের বদ্ধ প্রাচীর ভেদ করেও যেন আজ তার স্পর্শ এসে লেগেছে। রাজবন্দিনীরা এক এক করে উঠে পড়েছেন। রাত্রের আবিলতা ভোরের স্নিগ্ধ স্পর্শে দূর হ'য়ে যায়। মিস লাইট বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েন। তাঁর মনে আর বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা নেই। মনের অপরিমিত শক্তি যেন তাঁর সর্বাংগ উপছে পড়ছে।

শীতের কুয়াসার মাঝেই দু'একজন করে জেলগেটের বাইরে অপেক্ষা করছে। প্রেসিডেন্সী জেলের বিরাট অশথ গাছটার পাতাগুলি শীতের ঝির ঝিরে হাওয়ায় গায়ে গায়ে লেগে কানাকানি সুরু করেছে। রাজবন্দী ও বন্দিনীরা বাইরে আসবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। কয়েদীরা সার বরাদ্দে ওদের সাথে সাথে চলেছে। ওদের মনের অব্যক্ত বেদনা রাজবন্দী ও বন্দিনীদের কাছে ভাষামুখর হ'য়ে ওঠে—শুধু ওদেরই নয়—সমস্ত প্রেসিডেন্সী জেলটাই যেন আছাড় খেয়ে ওদের কাছে আবেদন জানাচ্ছে—তোমরা যাও বিজয়ী বীরের দল—দেশের বুকের সমস্ত জঞ্জাল দূর করো যেয়ে—দূর করো যেয়ে তার বুকের স্তূপীকৃত অন্ধকার। তোমরা পারবে নিশ্চয়ই পারবে। তোমরা আলোকের দূত। তোমাদের মঙ্গল হস্তের স্পর্শে আমার বুকের অন্ধকারও দূরীভূত হবে—এই কারার রুদ্ধ কক্ষও একদিন আলোর খেলায় ঝলমলিয়ে উঠবে—আমি সেই আশায় বুক বেঁধে রইলাম—। ওরা নির্বাক মুহূর্তের ভিতর দিয়ে তার উত্তর দেয়। বাইরে থেকে 'বন্দেমাতরম্ ও জয়হিন্দ ধ্বনি' ভেসে আসছে—ওরা যেন তখনও কোন সাড়া দিতে পাচ্ছে না। এতদিন কাটিয়ে গেল এই কারাগারে—তার সংগে খানিকটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল বৈকী! তাইত বিদায় বেলা ওদের মনটাও একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে।

রাজবন্দীরা ততক্ষণ জেল প্রাংগন পেরিয়ে জেল গেটে এসে পৌঁছেছে। অগণিত জনতার জয়ধ্বনিতে চারিদিক কেঁপে উঠেছে। বটগাছটার পাতায় পাতায় মুক্তির শিহরণ—বিজয়ী বীরদের বিদায় বন্দনায় ওর শাখায় শাখায় মুক্তির নাচন।
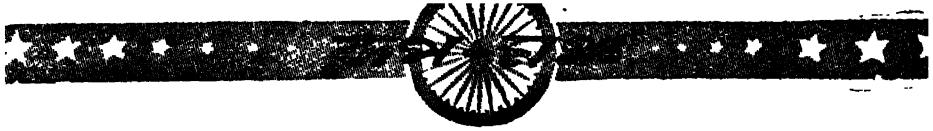
জেল গেটের বাইরে এসেই দেবু প্রতীক্ষমাণ দাদা, বৌদি ও লেখাকে দেখতে পায়। বৌদিকে প্রণাম করে দাদার কাছে এগোতেই শিবশংকর দু'হাত দিয়ে তাকে কোলে আবড়িয়ে নেন। আবেগের আতিশয্যে আজ আর তিনি নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। দেবুকে বুকের মাঝে জড়িয়ে শিশুর মত কাঁদতে থাকেন। এ কান্নাত নিছক চোখের জল নয়—এ কান্নাত শুধু শিবশংকরকে বেয়েই উপছে পড়ছে না—আজ দেশের কত দাদা—কত মা-ভগ্নী ও জায়া এমনি আনন্দাশ্রু দিয়ে এঁদের অভিষিক্ত করে নিচ্ছেন। কত অনাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করে আজ ঘরে ঘরে বিজয়ী বীরেরা ফিরে যাচ্ছে—এই চোখের জল ছাড়া নিঃস্ব ভারতবাসী কী দিয়েই বা তাঁদের বরণ করে নেবে! ঐ চোখের জলই যে আজ প্রত্যেকটি মুক্তিকামী ভারতবাসীর আশীর্বাদরূপে ঝরে পড়ছে! দেবুও নিজেকে সামলাতে পারে না। অতটুকু মেয়ে লেখা সেও অভিভূত হয়ে পড়েছে। কাকাকে প্রণাম করতেও তার মনে ছিল না। তাড়াতাড়ি যেয়ে প্রণাম করে। দেবু তাকে কোলে তুলে নেয়। ততক্ষণ দু'ভাইই প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছে। রাজবন্দিনীরা ইতিমধ্যেই এক এক করে বেরিয়ে পড়েছেন। মিস লাইট দূর থেকেই এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে আছেন। সুনন্দা দেবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "কৈ, তোমার মিস লাইট আসবেন না?" দেবু উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, ওরা বোধ হয় পেছনে আসছেন।" তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে মিস লাইটকে দেখতে পেয়ে পূর্ব নির্দেশ মত ইশারা করে—মিস লাইট পেছন থেকে এসে সুনন্দাকে প্রণাম করতেই দেবু বলে, "বৌদি এইযে তোমার লাইট।" সুনন্দা মিস লাইটের হাতের স্পর্শে, "ছিছি—ওকি করছেন।" বলে দূরে সরে দাঁড়ান। কিন্তু মিস লাইট উঠে দাঁড়াতেই সুনন্দার আশ্চর্যের অবধি থাকে না। তিনি বলে ওঠেন, "এ কী, রাই!" মিস লাইট সুনন্দার গলা জড়িয়ে ধরে বলেন, "হ্যাঁ, বৌদি হ্যাঁ—মিস লাইটই তোমার রাই।" সুনন্দা তার মাথায় হাত বোলান—এই স্নেহের পরশ রাই'র মন থেকে সমস্ত অভিমান দূর করে দেয়।

কুয়াশার মায়াজাল কাটিয়ে শীতের সূর্য তার পূর্ণ দীপ্তি নিয়ে দেখা দেয়—ওরা অপেক্ষামাণ গাড়ীতে যেয়ে ওঠে। মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম ও জয় হিন্দ' ধ্বনি তখনও শোনা যাচ্ছে—। প্রেসিডেন্সী জেলের বৃদ্ধ ত্রিকালজ্ঞ বটগাছটা ভূষণ্ডি কাকের মত ওখানে বহুদিন থেকেই দাঁড়িয়ে আছে—বৃটিশ রাজশক্তি দীর্ঘদিন ধরে দেশের মুক্তি-কামী সৈনিকদের এই ফাটকে আটকে রেখে যে নির্যাতন করেছে—তার প্রতিটি কাহিনীই ওর কাছে শুনতে পাওয়া যাবে। সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে আজ মুক্তি-কামী বীরেরা দেশের মুক্ত প্রাংগনে ছুটে চলেছে! ওর চেয়ে খুশী আজ কে! ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মত ও দাঁড়িয়ে আছে—ওদের গৌরবদীপ্ত ভবিষ্যৎও ওর অজানা নয়—তাই নিজের সমস্ত শাখাপ্রশাখা দিয়ে ওদের বিদায় অভিনন্দন জানায়—।

এক এক করে অপেক্ষামাণ গাড়ীগুলি জয়ধ্বনির মধ্য দিয়ে মুক্তি-সেনাদের নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। বটগাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলোক সম্পাতে ওদের যাত্রাপথ ঝলমলিয়ে ওঠে—। গাছের শাখা-প্রশাখাগুলি অস্বাভাবিক ভাবে আন্দোলিত হ'তে থাকে, এই আন্দোলনের ভিতর দিয়ে বুড়ো বট ওর নিজের ভাষায় বলতে চায়, "ভেঙ্গেছে দুয়ার এসেছে জ্যোতির্ময়।"

—সমাপ্ত।

বাংলার বধূ

(গল্প)

শ্রীসনৎ কুমার মৌলিক

দুপুরে ঘুমুচ্ছিলাম।

কার ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে দেখি বৌদি—আমাদের পাড়ার নীলা বৌদি।

--আরে বৌদি তুমি! বোস না এই টুলটায়!

বৌদি বসলেন।

—তারপর কি মনে করে?

—বাসায় আমার তিষ্ঠানো দায় হয়ে উঠেছে।

—কেন, কেউ কিছু বলেছে নাকি?

—তুমি তো জানো উনি বছর খানেক হোল সার্কাসের দলের সংগে বেরিয়ে গেছেন। আমাকে কোন চিঠি-পত্র দেন না। সেই সার্কাসের দল নাকি কুকুমপুরে এসেছে। বটঠাকুর সেখান থেকে যা শুনে এসেছেন তা তোমায় শোনাতে যেয়ে আমার জিভ আটকে আসছে।

বৌদি চুপ করলেন।

—হুঁ। বুঝলুম। তা আমায় কি করতে বলো?

—কথাটা সত্যি কিনা একবার খোঁজ নিয়ে এসো, আমি যে তোমার মুখ্য সুখ্য বৌদি।

—আচ্ছা আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। আমি নিজে যেয়ে সব খবর তোমায় এনে দেব। তুমি কিছু ভেব না।

বৌদি বিদায় নিলেন।

ঘুম আর হলোনা। সতীনাথদা'র কথা মাথায় ঘুরতে থাকে। সেই সতীনাথদা—এ পাড়ার লক্ষ্মীছাড়া সতীনাথদা। তাঁকেই সৎপথে আনার জন্য বৌদিকে আনা হোয়েছিল। গ্রামে এসেছিল এক সার্কাস পার্টি। খুব খেলা চলেছিল মাসখানেক ধরে। সতীনাথদার খুব যাতায়াত ছিল ওই দলে। একদিন সতীনাথদা তার দাদাকে বল্লেন—কদ্দিন আর তোমাদের ভাত ধ্বংস করবো—সার্কাসে আমি রীং-এর খেলা দেখাবো। দাদা বল্লেন:—ভাত ধ্বংস করবে—করো, তবু সার্কাসের দলে চাকরী নিতে পারবে না। সতীনাথদা নীলা বৌদিকে বোঝালেন—দাদা চান না যে আমার ভাল হয়, বুঝলে না।

বৌদিও তাই বুঝলেন। তারপর একদিন সত্যই সতীনাথদা সার্কাসের দলের সংগে চলে গেলেন।

কুকুমপুরে এসে পৌঁছেছি। একখানা টিকিট কিনে সার্কাস দেখতে গেলাম। খেলা দেখছি অনেক রকম —বাঘ, ভালুক, সিংহ, হাতী কিছুই বাদ যায় নি। মাঝে মাঝে বাধ্য হোয়ে সহ্য করতে হচ্ছে জোকারের কাতু কুতু দিয়ে হাসাবার প্রাণপণ চেষ্টা। কিন্তু কই সতীনাথদাকে তো দেখছি না। তবে কি তিনি দল ছেড়ে দিলেন?

খেলা শেষ হোয়ে গেল। আমিও বেরিয়ে এলাম। টিকিট ঘরে গিয়ে বল্লাম। —আচ্ছা সতীনাথ বাবু এখানে চাকরী করেন না?

—হুঁ। কেন বলুন তো?

—আমাদের দেশের লোক। তাই দেখা করতে চাই।

—আচ্ছা আসুন আমার সংগে।

টিকিট মাষ্টার আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে দিলেন। ঘরটি ঠিক সার্কাসের তাঁবুর পাশেই। ঘরে ঢুকলাম। সতীনাথদা বসে আছেন। গ্লাসে গ্লাসে মদ খাচ্ছেন। আর তারই কোলের কাছে বসে রয়েছে চোখে সুর্মা দেওয়া পায়জামা পরা একটি মেয়ে। মেয়েটির মুখে সিগ্রেট। আমায় দেখে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

—আরে তুই এখানে! সতীনাথদা আমায় বল্লেন।

—এই সার্কাস দেখতে এসেছিলাম, ভাবলাম আপনাকে একবার দেখে যাই। তা কেমন আছেন?

সতীনাথদা হাসলেন। উপরের পাটির সোনা দিয়ে বাঁধানো দুটো দাঁত দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

—খাসা আছি।

মুখ থেকে ধক্ করে মদের গন্ধ বেরিয়ে এল। চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে বসলাম। —আচ্ছা ও মেয়েটি কে—মানে একটু আগে যাকে দেখলাম?

—ও মেরা আঙুর—মেরা বাগিচা—মেরা বুলবুল—মেরা কলীজা। বুঝতে আর বাকি থাকলো না কার প্রভাবে সতীনাথদার মুখ থেকে এসব শব্দ বেরুচ্ছে। —বাড়ীর খবর কিছু রাখেন টাখেন?

—না-না...না। কেন রাখব? এমন ভাবে চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন যেন, আমায় মারতে আসছেন।

—তা হ'লে বৌদিকে আমি কি বলব?

—আরে উ কৌন হ্যায়?

—আমাদের নীলা বৌদি—আপনার বিবাহিতা স্ত্রী।

—নীল-টিল নেহি মাংতা। হামকো আঙ্গুর হ্যায়—উভি পাসা—খাবসুরত।

মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করলেন।

—আপনার পার্সী-হিন্দি ভাষা রাখুন। শুনুন, আপনি যে মেয়েকে ভালোবেসেছেন—ওরা কোনদিন কাউকে ভালোবাসতে পারে না।

—তুমিও বাপু বাংলায় শুনে রাখো। আমার আঙ্গুরের একটি আঙ্গুর হবে। সেইজন্যে আমরা ছুটি নিয়েছি। কাল চলে যাব। তুমি বল্লে যে ও মেয়েটি ভালোবাসতে পারে না, না ভালোবাসলে কি আর—একটা অশ্লীল মন্তব্য করলেন।

—নীলা বৌদিকে আমি কি বলব, বলে দিন?

—বলো যে, আমি খুব সুখে আছি। তা'হলেই ফুরিয়ে গেল। ব্যাস্।

এক গ্লাস মদ খেলেন।

বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। সেইদিনই কুকুমপুর ত্যাগ করে আমাদের গাঁয়ে ফিরে এলাম।

বৌদির বাড়ীতে গেলাম। বৌদি পুজোর ঘর থেকে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলেন।

ঠাকুর পো, উনি কেমন আছেন?

—হ্যাঁ ভালই আছেন!

কেন জানি না হেসে ফেল্লাম!

—তুমি যেয়োনা ঠাকুর পো! আমি এই পুজো সেরেই আসছি। বেশী দেরী হবে না। ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনেছেন। বৌদি ছুটে গেলেন পুজোর ঘরে আনন্দের বেগে তিনি যেন ভাসতে ভাসতে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম,—এবার যখন বৌদি পুজোর ঘর থেকে ফিরে আসবেন, তখন তাঁর কথার কি উত্তর দেব।

স্বাধীন ভারতের নব নাট্যলোক

ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশ এক নতুন যুগে পদার্পণ করিয়াছে। বৃটিশ ঘোষণা অনুযায়ী গত ১৫ই আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষ স্বাধিকার লাভ করিয়া স্বাধীনতার প্রথম সোপানে পা দিয়াছে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সে অধিকার আমাদের সমগ্র বিদেশী শক্তি কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। এক কথায় আমরা আজ স্বাধীন হইয়াছি। এই স্বাধীন ভারতে আজ সকল রকম গঠন মূলক কার্যের মধ্য দিয়া দেশ ও জাতিকে পুনর্গঠিত করিয়া উন্নতির দিকে আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন আজ আমাদের বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে জনগণের সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মুক্তির পথ। দেশবাসীকে আজ সকল দিক দিয়া শিক্ষিত, সভ্য এবং উন্নত করিয়া জাতির মুখ বিশ্ব সমক্ষে উজ্জল করার মধ্যেই রহিয়াছে আমাদের এই নবলব্ধ স্বাধীনতার সর্ব মহৎ কর্তব্য।

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি বিধায়ক কার্যাবলীর জন্য দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দ নানাদিক দিয়া চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু সংস্কৃতি, কলা (Art) এবং শিল্পের মধ্য দিয়া দেশকে উন্নত করার প্রচেষ্টা দেশের সাহিত্যিক এবং শিল্পী ও আর্টের উপাসকদের দ্বারাই করিতে হইবে। ভারতের তথা বাংলা দেশের ঐতিহ্য বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নাট্যালোকের ভিতর দিয়া এ দেশের সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছে এবং দেশের ও জাতির নৈতিক, সামাজিক এবং নানাবিধ কল্যাণের পথ
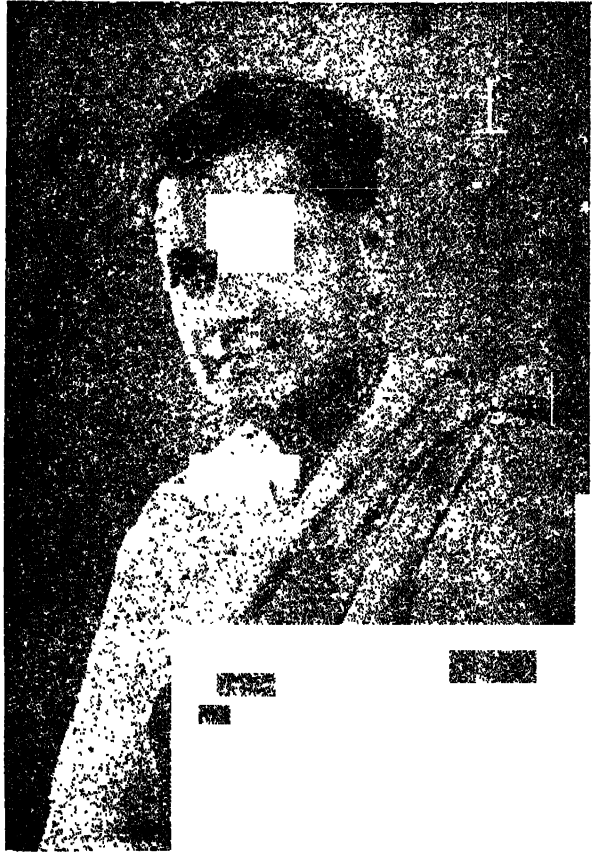
খ্যাতনামা চরিত্রাভিনেতা ও লেখক ডাঃ হরেন

উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। আমাদের দেশে এক সময়ে টপ্পা ও যাত্রাগান, কথকতা, কবিগান ও রামায়ণ গীত এবং

ভাগবৎ পাঠের মধ্য দিয়া নানা দিকে শিক্ষা বিস্তার ও জাতিগঠনের প্রচেষ্টা হইয়া আসিয়াছিল। বিলিতি আমলে বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়াই আমাদের বর্তমান নাট্যরস ও নাট্যমঞ্চের সৃষ্টি হয়। নানা আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়া এই নাট্যলোক বিংশ শতাব্দীর মধ্য যুগে এমন এক পর্যায়ে অবনতি লাভ করে যে,বিজ্ঞানের নব-আবিষ্কৃত ছায়ালোকের প্রভাব ও প্রসার হেতু আজ নাট্যমঞ্চ ও নাট্যলোক তাহার নিজ অস্তিত্বই প্রায় হারাইতে বসিয়াছে। সারা ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে বিশেষতঃ কলিকাতায়ই এই নাট্যলোক একদা প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এমন কি এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানেই নাট্যলোকের উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করে নাই। কেবলমাত্র বাংলাদেশ ও কলিকাতাই এই বিষয়ে অগ্রণী এবং প্রসিদ্ধ। কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে, বিদেশী সভ্যতার মোহে এই বাংলাদেশও এই শিল্পকলাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিতেছে না। এই ব্যর্থতার দোষ বা গুণের বিচার করিতে আজ বসিব না। আজ আমি শুধু বাঙালী সাহিত্যিক নাট্যকার ও সুধীসমাজকে বাংলার এই সংস্কৃতিমূলক শিল্পকলাটীকে নব চেতনায় নবীন স্বাধীন ভারতবর্ষের শিক্ষা বিস্তার ও জাতি গঠনের আলোকবর্তিকারূপে জ্বালাইয়া রাখিতে অনুরোধ করিব। স্বাধীন ভারতের নব নাট্যলোক ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষার বাণী নিয়া জগৎ সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য পুনরায় বিস্তার করুক। দেশ-বিদেশে ভারতবর্ষকে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে এই নাট্যলোক যেন প্রধান সহায়ক হইয়া উঠে। দেশের জাতীয় গভর্ণমেন্টেরও এদিকে সমান দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন হইবে। এই শিল্পকে নবরূপে জন্মদান করিতে হইলে যেমন প্রয়োজন হইবে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি, তেমনি বেশী করিয়া প্রয়োজন হইবে দেশের গভর্ণমেন্টের সর্বাংগীন আর্থিক সাহায্য। আমি আশা করি, শিক্ষিত ও নাট্যামোদী সুধীসমাজ নতুনভাবে আন্দোলন করিয়া দেশের সকলের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইবেন এবং এই শিল্পটীকে আশু মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া নবচেতনা, নতুন জীবন দান করিয়া যাহাতে জাতীয় কল্যাণে সর্বতোভাবে নিয়োজিত করিতে পারা যায় সেই বিষয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে সমর্থ হইবেন। নাট্যমঞ্চ ও নাট্যালোকের পুনর্গঠন ও উন্নতি সাধন করার নানাবিধ কার্যাবলীও এখন হইতে তাহাদের বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইলে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হইবে দেশের শিল্প-সাহিত্য কলা ও নাট্যকে বাঁচাইয়া রাখা এবং গঠনমূলক কার্যাবলীর মধ্য দিয়া ইহার উন্নতি বিধান করা।

সমগ্রজগতের প্রগতির ইতিহাস, উত্থান পতনের কাহিনী, সব কিছুর সংগেই জড়াইয়া রহিয়াছে প্রত্যেক জাতির কলা ও কৃষ্টির অমর অবদান। যে জাতির যত বেশী অবসর আছে, সেই জাতির তত ঐতিহ্যও রহিয়াছে। কিন্তু, আমাদের মত এই আত্মবিস্মৃত জাতির কাছে অবসর আজ অভিশাপের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। আমাদের অবসর আছে, প্রেরণা নাই। উৎসাহ আছে, উদ্যম নাই। বৃত্তি আছে, বুদ্ধি নাই। তাই আজ এতবড় সুযোগের মধ্যেও আমাদের চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই। ইহার উত্তরে জরাজীর্ণ তথাকথিত প্রগতিপন্থীরা উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন, তোমরা অর্বাচীন। এতকাল প্রগতির সাধনা করিয়া আমরা আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছি অতএব আমাদের সাতখুন মাপ। তাছাড়া তোমরা কি দেখ নাই যে, বিশ্বের উপর দিয়া কতবড় অঘটন ঘটিয়া গেল। এই বিশ্ববিপর্যয়ের মধ্যে আমরা যে আমাদের ঘর সামলাইয়া রাখিয়াছি ইহাই যথেষ্ট।

এর প্রতি জবাবে আমরা অনভিজ্ঞেরা বলিব—বিশ্বের এই ভাঙ্গাগড়ার ধূম্রজালের অন্তরালে বসিয়া ফরাসী ও রাশিয়ার কবি ও লেখকরা গৃহহীন, অন্নহীন অবস্থায় গাছতলায় বসিয়া ভগ্নস্তূপের আড়ালে বসিয়া দেশের রক্তকে তাজা রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ সাধনার তুলনা নাই। তাই না জাতি আজ এত বড়।

কিন্তু আমরা এখানে কি দেখিয়াছি। অনর্থক একটা কল্পিত হীনমন্যতার মিথ্যা আতংকে অস্থির হইয়া, এই সব

প্রগতিপন্থীরা সমগ্র জাতটার অতীত ঐতিহ্যের মূলে পর্যন্ত কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

নবজাগরণের আবাহনী রচনা করিয়া, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, কবি রঙ্গলাল, কবি নবীন সেন, কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের মত মনীষীরা অমর হইয়া রহিয়াছেন। আর নবজাগরণের সন্ত অরুণালোকের মধ্যে দাঁড়াইয়াও এঁরা খেই হারাইয়া ফেলিতেছেন। এই দুঃখ।

এই নবলব্ধ চেতনার মধ্যে আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে অরূপ রতন। কয়লার খনি খুঁড়িয়া আর কয়লার প্রয়োজন নাই। চাই মণি, মুক্তা, জহরৎ। যার ঝলমলে চাকচিক্যের মধ্যে বহির্জগতের চক্ষু যেন ঝলসাইয়া যায়। এই উদ্যম সার্থক করিতে পারিলে হয়ত আমাদের জাতি আজ বোধন দুয়ারে দাঁড়াইয়া যে অকল্পিত আঘাত পাইয়াছে তাহার ব্যথাও ভুলিতে পারিবে।

আজিকের দিনের নাট্যলোক হবে একটা গর্বিত জাগরণশীল জাতির দুর্দম কাহিনীর অভিব্যক্তির পীটভূমি। জাতীয় জীবনের দর্পণ এই নটলোকে জাতির স্বরূপ প্রকটিত না করিয়া, বিকৃত করিয়া তুলিলে কাহারও পক্ষেই সুখকর হয় না।

অথচ আজকালকার নটলোক নব নব সৃষ্টির বন্যায় ডুবিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু বলিতে দুঃখ হয়, সেই সৃষ্টি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যহীন আগাছার মত আবর্জনার স্তুপের অংগ ভারী করিয়া তুলিতেছে। যে সব অর্থবান ব্যক্তি এইটীকে ব্যবসার বাহন হিসাবে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা নাটকের গুণাগুন অর্থাগমের তৌলদণ্ডে বিচার করিতে গিয়া জাতির সেবা না করিয়া বরং নিজেদের সুবিধাই করিয়া লইতেছেন। ইহাতে সহজ সুন্দর সৃষ্টি পথে বাধার সৃষ্টি হয়—নীতি হয় ব্যাহত। যত খুসী অর্থ তাহারা তুলুন কিন্তু সেই সংগে এই রঙ্গালয়ের চির সজীবতা যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার ব্যবস্থাও তাহাদের করা উচিত। কিন্তু, এই উচিতের সার্থকতা এতদিনেও কিন্তু উপলব্ধি করিলেন না। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ৺অমৃতলাল বসু, ৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ ৺ডি, এল, রায়ের পর দু'একখানা নাটক ছাড়া, ঠিক নাটক পদবী লাভ করিবার মত একখানিও উপযুক্ত নাটকও রচিত হয় নাই। কেন? এই কেনর জবাবই আমাদের আজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, এই সব ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা লাভের প্রাচুর্যে অতি সত্বর সমগ্র শিল্পব্যবসায়ে একটা অমঙ্গল ডাকিয়া আনে। সমগ্র জাতির সত্যমিথ্যা, উত্থান, পতন যাহার উপর অনেকটা নির্ভর করে, কোন স্বাধীন জাতই, সেই শিল্পটিকে কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার না। জাতির ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করিতে হইলে আর কাল বিলম্ব না করিয়া ভারত সরকার এই বিষয়ে একটি সুগঠিত পরিকল্পনানুযায়ী সমগ্র ভারতের কৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি নির্ধারণ করিয়া একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করুন এই আমাদের অনুরোধ।

আগামী সংখ্যা রূপ-মঞ্চে ১৩৫৩ সালের বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শকসমিতির ফলাফল প্রকাশিত হবে।

সম্পাদকের দপ্তর
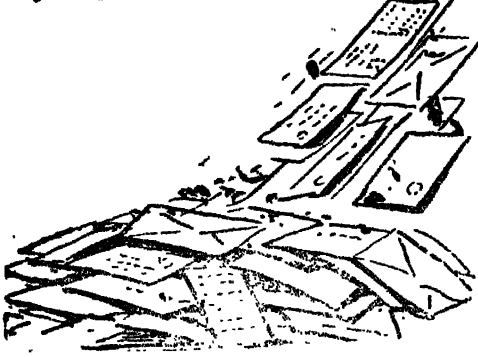
তরুণকান্তি ঘোষ (মির্জাবাজার, মেদিনীপুর) কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সংগ্রাম, স্বপ্ন ও সাধনা ও পূরবী ছাড়া আর কোনও কাহিনী কী পর্দায় রূপায়িত হচ্ছে? (২) হিন্দি 'পথের দাবী'তে সব্যসাচীর ভূমিকায় কে অভিনয় করেছেন?

●● (১) আবর্ত, ওরে যাত্রী, সম্পাদিকা, তাছাড়া আরো বহু চিত্রই নিতাই ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠছে। (২) কমল মিত্র।

সমরালো (রেলওয়ে ষ্টেশন, রাঁচী)

●● উদয়শংকর বাঙ্গালী। আশা করি আপনাদের বিরোধ মিটিয়ে নিতে পারবেন।

নিমাই রায় (গরিফা বাগ হাউস, ২৪ পরগণা)

●● ফটোর জন্য আরো কিছুদিন বাদে ব্যক্তিগতভাবে আমায় চিঠি লিখবেন।

রবীন চৌধুরী (গৌহাটি, আসাম)—শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া কি চিত্রজগৎ হ'তে বিদায় নিয়েছেন?

●● না। তিনি অনেকদিন যাবৎই অসুস্থ আছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

কুমার ননী ভট্টাচার্য (ডিব্রুগড়, আসাম)

রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত যে কোন রচনা ও সমালোচনা নিয়ে সমালোচনা করবার অধিকার রূপ-মঞ্চ পাঠকগোষ্ঠীর আছে। রেণুকা রায়ের ঠিকানা প্রকাশ করতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

কল্পনা রায় (লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজ, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণী)—শ্রীমতী বনানী চৌধুরী সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছি যে,তিনি নাকি বাঙ্গলা চিত্রক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কৃষ্টি সম্পন্না মহিলা। আরো শুনেছি, তিনি নাকি বাংলা সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এ সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কী? বনানী চৌধুরীর বাসার ঠিকানা জানাইতে পারেন কিনা—এ কলেজের অনেক মেয়ে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করিতে এবং ছায়াচিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক।

●● শ্রীমতী বনানী চৌধুরীকে চিত্রজগতের সর্বাপেক্ষা কৃষ্টিসম্পন্না শিল্পী বলে স্বীকার করে নিয়ে আরো অনেকের ওপর অবিচার করতে চাই না। আর তা' বলবই বা কী করে? তাঁর সংস্পর্শে আসবার আমার সুযোগও হয়নি। তবে এইটুকু বলতে পারি, তিনি শিক্ষিতা এবং তাঁর রচনা থেকে বুঝতে পারি যে, শিল্প সম্পর্কে অন্ততঃ কিছুটা তিনি চিন্তা করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন একথা সত্য। তাঁর ঠিকানা দিলাম—আপনারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সংগে আলাপ করতে পারেন। বনানী চৌধুরী, স্যুট নং ৩১, উপরের তালা, পার্ক প্লেস, ১, সারওরার্দী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা।

কুমারী অলকা দাস (নওগা, আসাম)

●● রাইর জন্য যে অভিনন্দন জানিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ। বর্তমান সংখ্যায় 'রাই' শেষ করা হ'লো। 'রাই'র পরিণতি আপনাদের খুশী করলো কি না জানাবেন।

এম, এল, রায় (শ্রীমঙ্গল, শ্রীহট্ট)

●● এ বিষয়ে আমরা নিরুপায়। আপনি নিজেই উক্ত কাগজের কার্যালয়ে এ বিষয়ে পত্র লিখুন।

চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, সুরগীতি ভট্টাচার্য (সবজীবাগান লেন, চেতলা)—গান্ধীজির জীবনকাহিনী অবলম্বনে কোন সবাক ছায়াচিত্র তোলা হইবে কী?

●● বাংলায় কোন প্রযোজকের এরূপ কোন উৎসাহের পরিচয় পাইনি। বম্বেতে একাধিক চিত্র প্রতিষ্ঠান না'কি ইতিমধ্যেই মহাত্মাগান্ধীর জীবনী অবলম্বনে চিত্র প্রস্তুতের তোড়জোড় করছেন। এর মধ্যে রঞ্জিৎ মুভিটোনের নামও শুনছি। বম্বের কাগজগুলো ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরাও তাঁদের সংগে সুর মিলিয়ে বলছি—মহাত্মা'দের আর হত্যা করে কোন লাভ নেই। আপনারাও ধৈর্য ধরে থাকুন। চিত্র শিল্পটিকে আরো সুষ্ঠু রূপ নিতে দিন—তারপর দেশের মহাপুরুষদের জীবনী অবলম্বনে চিত্র নির্মাণের আবেদন জানাবেন।

এস, এন, সালভী (টকাটোরা প্যালেস, নিউদিল্লী)
আমি একজন সিন্ধু দেশের লোক। আমি ভাল বাংলা জানি ও আমার বন্ধু যাঁরা আছেন, তাঁরা বলেন যে, এত স্পষ্ট বাংলা তাঁরাও বলতে পারেন না। আমি জানতে চাই যে, আমি কী কোন বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে পারি ?

●● আপনি সিন্ধু দেশের লোক হ'য়েও বাংলা শিখেছেন, এজন্য বাঙ্গালী হ'য়ে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার বাঙ্গালী বন্ধুরা যাঁরা বলেন, তাঁদের চেয়েও আপনি ভাল বাংলা বলতে পারেন—এ বলায় তাঁদের কোন গৌরব নেই। লজ্জারই কথা। বাংলা জানলেও ভাল উচ্চারণ করতে পারলে বাংলা ছবিতে হয়ত অভিনয় করতে আপনার আটকাবে না। কিন্তু সে সুযোগটা আপনাকে কে দেবে? রূপ-মঞ্চে যে সব প্রতিষ্ঠান নবাগতদের সুযোগ দেবেন বলে বিজ্ঞপ্তি দেন, আপনি তাঁদের কাছে আবেদন জানাতে পারেন।

শিহরণ সেন (কলিকাতা)
●● ঠিকানা দেওয়া না থাকলে কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হয় না।

এ, গমেছ (তালতলা, কলিকাতা)
●● অভিনেতা রবীন মজুমদার চিত্রজগত থেকে বিদায় নেন নি। সম্প্রতি 'সর্বহারা' চিত্রের অভিনয় তিনি শেষ করেছেন।

'বিশবছর আগে' চিত্রে অনুভা গুপ্তা

বিমলকুমার শীল (নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা)
●● আপনার অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। আপনার বন্ধুকে যে কোনদিন ১০টা থেকে ১১টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে বলবেন।

মীনাক্ষী বিশ্বাস (আসানসোল)
●● কমলমিত্রকে 'সব্যসাচী' চিত্রে (পথের দাবীর হিন্দি সংস্করণে) নাম ভূমিকায় দেখতে পাবেন। তাঁর সংগে কোন পত্রালাপ করতে চাইলে আমাদের ঠিকানাতে লিখতে পারেন।

নির্মলকান্তি সেন (আশুতোষ কলেজ : প্রথম বর্ষ : কলাবিভাগ)
●● যে কোনদিন ১০টা থেকে ১১টার ভিতর দেখা করতে পারেন। অন্য সময়ে এলে পূর্বে থেকে জানিয়ে আসবেন।

অমলকুমার গুপ্ত, বি, বি, দত্ত ও সুশীল কুমার দাস (গৌহাটি আসাম)-গত পৌষালী সংখ্যায়

আপনি একজন পাঠকের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, অশোককুমার অভিনয়ে ছবি বিশ্বাসের কাছে ছেলেমানুষ। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন যে, অশোককুমার এই প্রথম বাংলা চিত্রে অভিনয় করলেন। ইতিপূর্বে তিনি উক্ত বাংলা চিত্র ছাড়া সমস্ত অভিনয়ই হিন্দিতে করতেন এবং হিন্দি চিত্রেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। অনবরত হিন্দি অভিনয় করার পর তাঁর এই প্রথম বাংলায় অভিনয় করা। নিশ্চয় একটু খারাপ হবে। কিন্তু তার জন্য দায়ী তিনি নন—দায়ী পরিচালক স্বয়ং নন কী? হিন্দি অভিনয়েও কী অশোককুমার ছবিবাবুর কাছে ছেলেমানুষ?

●● ভাষাগত পার্থক্যের জন্য কোন অভিনেতা বা বা অভিনেত্রীর অভিনয়ের প্রতিভা বিচার করতে অসুবিধা হয় না। ছবি বিশ্বাসের কাছে অশোককুমার অভিনয়-প্রতিভায় যে অনেক ছোট, তা' ঐ ভাষাগত অসুবিধার কথা চিন্তা করেই বলেছি। তাই বলে অশোককুমারের প্রতিভাকে যেমনি পূর্বেও অস্বীকার করি নি—বর্তমানেও করবো না। তবে তুলনা করতে যেয়ে ছবি বিশ্বাসের পাশে তাঁর দীনতা সকলেরই চোখে ধরা পড়বে।

হীরেন্দ্র দত্তরায় (বৌবাজার, কলিকাতা)

●● শিল্পীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বয়সটাকে একটু কমিয়েই প্রচার করেন—বিশেষ করে অভিনেত্রীরা। তাই তাঁদের নিজেদের কাছ থেকেও যদি তাঁদের বয়সের কথা শোনেন—সেটাকে সত্য বলে মেনে নেবেন না। অযথা এই মিথ্যা দিয়ে কৌতূহলকে প্রশমিত করতে যাবেন কেন? ওর চেয়ে নিজের সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নেওয়াই উচিত নয় কী?

সুচিত্রা ঘোষ (শ্যামবাজার)

(১) আপনাদের মণিদীপা মাঝে মাঝে ডুব মারেন কেন? (২) দেবব্রত বিশ্বাস এবং কণক বিশ্বাস এঁরা কী স্বামী-স্ত্রী! সত্য চৌধুরী ও বীণা চৌধুরীর ভিতর কোন সম্পর্ক আছে কী? (৩) সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় বর্তমানে মিত্র হ'য়েছেন, এই মিত্র মহাশয়টি কে? সুচিত্রা দেবী কী সাহিত্যিক সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে?

●● (১) সাংসারিক কাজের ফাঁকে যতটুকু সময় পান মণিদীপা কোন পারিশ্রমিক না নিয়ে সেটুকু রূপ-মঞ্চের জন্য ব্যয় করেন। তাই সব সময় তাঁকে আমরা পেতে পারি না। তাছাড়া রূপ-মঞ্চের কাজে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে তিনি নূতন করে ছাত্রীজীবন সুরু করেছেন। বর্তমানে তিনি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। বাংলা ও অর্থনীতি নিয়ে বি. এ. পড়ছেন। সাংসারিক কাজ এবং পড়াশুনার ফাঁকে মধ্যবিত্ত ঘরের একটী মেয়ে কতটকু সময় আর শিল্প-সাধনার জন্য ব্যয় করতে পারেন? তিনি বেতার শিল্পী নন। তবে সুগায়িকা। আধুনিক গান ছাড়া শ্রীযুক্ত শান্তি দেব ঘোষের কাছে রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষা করেছেন। বেতার শিল্পী হবার ইচ্ছা তাঁর নেই—পড়াশুনা শেষ হ'লে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সংগীত আন্দোলনে যোগদান করবার পরিকল্পনা আছে। (২) না। শ্রীযুক্তা বিশ্বাস দেবব্রত বিশ্বাসের ভ্রাতৃবধূ। (৩) শ্রীযুক্ত ও শ্রীযুক্তা চৌধুরীর ভিতর কোন পারিবারিক সম্পর্ক নেই। (৩) সুচিত্রা দেবীর সম্প্রতি বিয়ে হ'য়েছে—বিয়ের আসরে উপস্থিত থাকলে বলতে পারতাম মিত্র মহাশয়টি কে? বর্তমানে তিনি তাঁর স্বামী ছাড়া আর কোন পরিচয় দিতে পারলুম না। সুচিত্রা দেবী প্রবীণ সাহিত্যিক সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে এবং চিত্র পরিচালক সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়ের ভগ্নী। এর আর এক ভগ্নী হচ্ছেন সুজাতা ডেভিস—ইনিও বেতার-শিল্পী ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় এক আইরিস ভদ্রলোকের সংগে এঁর বিয়ে হয়।

বিভা ঘোষ (উইং ফিল্ড পার্ক, লক্ষ্ণৌ) (১) ছবি বাবুকে আমরা আর কি কি ছবিতে দেখতে পাবো?
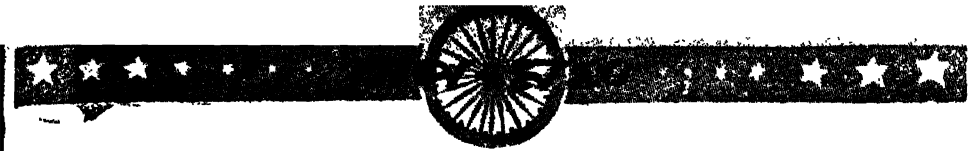
(২) পর্দায় সন্ধ্যারাণী, মলিনা দেবী এঁরা কী নিজস্ব কণ্ঠে গেয়ে থাকেন?

●● (১) ছবি বাবুকে সাধারণ মেয়ে, উমার প্রেম অনির্বাণ আগামী আরো অনেক চিত্রেই দেখতে পাবেন বলে মনে হয়। (২) না।

প্রভাত কুমার সেনগুপ্ত (গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা) সুমিত্রা দেবীর পরবর্তী ছবি কী

●● দেবী চৌধুরাণী।

অনুভা রায় (টেম্পল চেম্বাস)—জনরব বাংলা চিত্র-জগতের একজন সুবিখ্যাতা বাঙ্গালী অভিনেত্রী বিশ্বদ্যািলয়ের এম, এ পরীক্ষা দিতেছেন—নামটা জানাবেন কী?

●● বনানী চৌধুরী।

হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায় (বন্দী রোড, জামসেদপুর) প্রায়ই দেখি, ছবি দেখতে দেখতে ভাল লাগলে প্রেক্ষাগৃহের মাঝেই দর্শকেরা হাত তালি দিয়ে থাকেন, আবার খারাপ লাগলে অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করে প্রতিবাদ জানিয়ে থাকেন—এই উচ্ছ্বাস ও প্রতিবাদের স্থায়ীত্ব অনেক সময় এতই হয় যে, অনেকক্ষণ ধরে ছবির কথাবার্তাও শোনা যায় না। —এঁটা কী আপনি সমর্থন করবেন? নাট্য-মঞ্চ হলে নয় সরাসরি প্রশংসা বা নিন্দার একটি প্রয়োজন আছে, কিন্তু ছবির বেলায় কি এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে?

●● আপনার মত আমিও দর্শক সাধারণের উচ্ছ্বাস ও প্রতিবাদ জানাবার এই পন্থাকে মোটেই স্বীকার করি না। শুধু আমরাই নই, প্রত্যেক সুরুচীসম্পন্ন দর্শকই এই তথা-কথিত দর্শকদের কার্যকলাপকে নিন্দা করবেন। কতক-গুলি বিষয়ে আমরা বরাবরই অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আসছি অথচ নিজেদের ত্রুটিগুলির প্রতি মোটেই দৃষ্টিপাত করি না। যেমন মনে করুন: ভাল ছবি হয়না বলে আমাদের অভিযোগ রয়েছে—অথচ একখানি নিম্নশ্রেণীর ছবি দেখতেও আমরা কম ভিড় করি না। প্রেক্ষাগৃহে ফেরীওয়ালাদের চিৎকারে কান ঝালাপালা হ'য়ে ওঠে—তারপর সংকীর্ণ স্থানের ভিতর দিয়ে তাদের যাতায়াত অনেক সময়ই বিরক্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে—আমরা যদি ওদের কাছ থেকে কোন কিছু না ক্রয় করি তবে কি ওদের যাতায়াত বন্ধ হয় না? দু'তিন ঘণ্টার মধ্যে কিছু না খেলে রামায়ণ-মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। তারপর ধরুন, বেশী মূল্য দিয়ে প্রবেশ পত্র সংগ্রহ। নিজেরা যদি একটু সংযমী হই, অনায়াসেই এগুলিকে আমরাই বন্ধ করতে পারি। এবং ছবি দেখতে দেখতে যদি কেউ এরূপ বিকৃত উচ্ছ্বাসের পরিচয় দেন, তখন পাশে যিনি বসে থাকেন তিনি যদি বাঁধা দেন, তবে এই উচ্ছ্বাস অতি সহজেই বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে। আমার মনে হয়, এগুলি সম্পর্কে প্রত্যেক দর্শকেরই সচেতন হওয়া উচিত।

অজিতকুমার মিত্র (বাজে শিবপুর রোড, হাওড়া) (১) মমতাজ শান্তি কি পর্দায় নিজ কণ্ঠে গেয়ে থাকেন? (২) উমাশশী, শ্রীলেখা, পান্না এঁরা কী চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন?

●● (১) না। (২) প্রথমোক্ত দু'জন পারিবারিক জীবন যাপন করছেন। শেষোক্ত জন বিদায় নেননি। 'যুগের দাবী' চিত্রে পান্নাদেবী একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন—কর্তৃপক্ষের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার জন্যই সম্ভবতঃ 'যুগের দাবী' আজও মুক্তি লাভ করতে পারলো না।

পবিত্রকুমার দাশগুপ্ত (পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেস, মুরলীধর সেন লেন) আজ কাল প্রায়ই দেখা যায়, যত বাজে বই আত্মপ্রকাশ কচ্ছে বড় বড় নাম করা লোকের প্রশংসা-

'দেবদূত চিত্রে' অভি ভট্টাচার্য

পত্র নিয়ে। এভাবে দর্শকদের ধাপ্পা দেবার সার্থকতা কী? যাঁরা প্রশংসাপত্র দেন, তাঁরা কেউ বা নাম করা কাগজের সম্পাদক—কেউ বা দেশনেতা। তাঁরা নেতা হিসাবে বা সম্পাদক হিসাবে দর্শকদের কাছে বড় হ'তে পারেন, কিন্তু সমালোচক হিসাবে তাঁদের বড় বলে মনে করি না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক কোন ব্লেডের প্রশংসা যেমন হাস্যকর, পূর্বোল্লিখিত নেতাদের চিত্র সমালোচনাও তেমনি হাস্যকর এবং ধাপ্পা বলেই আমার ধারণা—আপনার মত জানালে বাধিত হ'বো।

●● দর্শক হিসাবে প্রত্যেকেরই কোন কিছু সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে। দর্শক বলতে আমরা তাঁদেরই মনে করবো, যাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই ছবি দেখে থাকেন। অর্থাৎ ৯ মাসে ৬ মাসে একখানা নয়। এদিক দিয়ে যাঁরা সাধারণতঃ ছবির আনুকূল্যে বিবৃতি দিয়ে থাকেন, তাঁরা দর্শকদের শ্রেণীর ভিতর পড়েন না। তাই, কোন ছবি সম্পর্কে দর্শক হিসাবে কোন কিছু বলবার অধিকার তাঁদের নেই। তারপর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এসব অভিমত দিতে হয় অনুরুদ্ধ হ'য়ে—সত্যিকার অভিমত কোনমতেই তাঁরা ব্যক্ত করতে পারেন না। অথচ যেহেতু জনসাধারণের ওপর তাঁদের প্রভাব রয়েছে যথেষ্ট—তাঁদের অভিমতও কম প্রভাব বিস্তার করে না এবং তাঁরই সুযোগ নিতে দেখি আমাদের চিত্র প্রযোজকদের। কিন্তু একাধিকবার এই ভূয়ো প্রশংসাবাদের সংগে দর্শকেরা পরিচিত হ'য়েছেন বলে, আজ আর এগুলি ততটা কার্যকরী হ'য়ে দেখা দেয় না। আপনারা যখন এই ধাপ্পার স্বরূপ উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়েছেন, তখন আর ভয় কী! তবে অনুরোধ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে, তাঁরা যেন অবিবেচকের মত নিজেদের এমনি খেলো না করেন!

গৌড়েন্দু রায় (আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য) ১৬ মিলিমিটারের কোন ছবি বাংলাতে আছে কিনা? এ সম্পর্কে একটু ধারণা পেতে চাই।

●● কোন পেশাদারী ছবি অবশ্য গৃহীত হয়নি। তবে রামা-সেল প্রচার-কার্যের জন্য ১৬ মিলিমিটারের ছবি তুলেছিলেন ব'লে শুনেছিলাম। তাছাড়া কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ একক প্রচেষ্টায় কয়েকটি ১৬ মিলিমিটারের ছবি তুলেছিলেন। এঁদের ভিতর ডাঃ ডি, এন্, মৈত্রের নাম করা যেতে পারে। তাছাড়া কোডাক কোম্পানীর ফিল্ম লাইব্রেরীতেও ১৬ মিলিমিটারের ছবি আছে। সাধারণতঃ পেশাদারী ছবিগুলি ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মে গৃহীত। ১৬ মিলিমিটার যখন আবিষ্কৃত হয় তখন ৩৫ মিলিমিটারের কাছে তাকে খেলনা বলেই উড়িয়ে দেওয়া হ'তো। তাই ১৬ মিলিমিটার সৌখীন প্রযোজকদের কাছেই আস্তানা গেড়েছিল। বর্তমানে ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম-এর প্রচলন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি পেশাদারী কার্যেও তার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হ'চ্ছে এবং তাঁরা বিদেশীয় বাজারে ১৬ মিলিমিটার ফিল্ম্ রপ্তানী করতে নাকি সুরু করে দিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষাগত বিষয়ে ১৬ মিলিমিটার আজ তাই বলতে গেলে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ব্যক্তিগত ঘরোয়া-ব্যাপারে স্থান দখল করে নিচ্ছে ৮ মিলিমিটারের ফিল্ম্। এই তিন শ্রেণীর ফিল্মের কার্যিক পার্থক্য থেকেই কোনকাজে কোনটা সুবিধাজনক তা অতি সহজেই বুঝতে পারবেন। ৩৫ মিলিমিটারের এক ফিট ফিল্ম্ এ ১৬ খানা ছবি গ্রহণ করা যায়—১৬ মিলিমিটারের ৪০ এবং ৮ মিলিমিটারের ৮০। অর্থাৎ মনে করুন ৮ মিলিমিটারের একখানি ছবি তুলতে যদি আপনার লাগে ২০০ ফিট ফিল্ম্—১৬ মিলিমিটারে লাগবে ৪০০ ফিট এবং ৩৫ মিলিমিটারে লাগবে ১০০০ ফিট।

ভক্তিরাণী ভট্টাচার্য (লোকপুর, বাঁকুড়া) নৌকাডুবি চিত্রে কার অভিনয় আপনার ভাল লেগেছে? এঁদের মধ্যে কাকে কাকে শ্রেষ্ঠ বলবেন? অভি ভট্টাচার্য ও বিমান বাড়ুজ্যে, মীরা সরকার ও মীরা মিশ্র।

●● নৌকাডুবি চিত্রে পাহাড়ী সান্যালের অভিনয়ের সংগে আর কাউকেই তুলনা করা চলে না। অভি ও বিমান এবং মীরা সরকার ও মিশ্রের ভিতর অভি ও মীরা সরকারকেই আমার ভাল লেগেছে। অবশ্য বিমানের কতটুকু অংশই বা অভিনয় করবার ছিল!
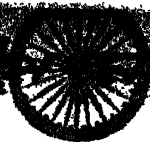
শেফালিকা মল্লিক (বাগেরহাট, খুলনা)

●● যে শিল্পীর ঠিকানা চেয়েছেন—দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

প্রতিমা মুখোপাধ্যায় (মহানির্বাণ রোড, কলিকাতা)

●● যাঁদের ঠিকানা চেয়েছেন প্রকাশ করতে পারলুম না। ভারতী নিজে গান না। নিউ থিয়েটার্সের চিত্রে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইলা ঘোষ গেয়ে থাকেন।

রথীন বন্দ্যোপাধ্যায় (সরকার বাই লেন, কলিঃ)

শুনেছিলাম কানন দেবী একটি স্টুডিও করছেন—একথা কি সত্যি ?

●● হ্যাঁ, সত্য। শুধু স্টুডিও নয়—কানন দেবী প্রযোজনা ক্ষেত্রেও অগ্রসর হ'য়েছেন। কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রথম চিত্র গড়ে উঠবে এবং চিত্রখানি পরিচালনা করবেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী অজয় কর।

অলোক চাঁদ মিত্র (বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা)

আমি আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। গত ১২ই মে সংবাদপত্রে দেখিলাম, শ্রীযুক্ত দেবকী কুমার বসু বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস চন্দ্রশেখরের চিত্র-নাট্য দিতে গিয়া তাঁর যে ত্রুটি হইয়াছে, তার জন্য দেশবাসীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবেন শ্রীপার্থিবকে। তাঁর কঠোর সমালোচনার জন্যই এই অন্যায়ের প্রতিবিধান সম্ভবপর হইয়াছে। অবশ্য শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের পত্র যে এ-কার্যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে, তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। যাহা হউক,এই অন্যায়ের প্রতিবিধান হওয়াতে আমি এবং আমার আত্মীয়স্বজন অত্যন্ত খুসী হইয়াছি। (২) চন্দ্রশেখর ছায়াচিত্রে ছবি বিশ্বাসের অভিনয়ের পরই নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় স্থান পায় বলে আমার মনে হয়। নবাবের ভূমিকায় তিনি ভালই করিয়াছেন। অশোককুমারের চেয়েও তাঁর অভিনয় ভাল হইয়াছে। আপনার মত কী ?

●● (১) রূপ-মঞ্চের এই সাফল্যের মূলে আপনারাই রয়েছেন। আপনাদের সকলের শক্তিতেই রূপ-মঞ্চ শক্তিশালী। শ্রীপার্থিবকে আপনার ধন্যবাদ জানিয়েছি—তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন এবং অনুরোধ করেছেন, যেন আপনাদের সতর্ক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে, রূপ-মঞ্চ শুধু অপরের অন্যায়ের মূলে আঘাত হেনেই ক্ষান্ত না থাকে—কোনদিন কোন অন্যায় যেন তাকেও স্পর্শ করতে না পারে। ভুল মানুষ মাত্রেই করে থাকে। ভুল বা অন্যায় করে কেউ যদি স্বীকার করে অনুতপ্ত হন—তাঁদের বিরুদ্ধে কোনদিনই আমাদের কিছু বলবার থাকবে না। বরং অন্যায়কে স্বীকার করে নেবার ভিতর যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দেবকী বাবুকে জনসাধারণের কাছে অনুতপ্ত বলে ক্ষমা চাইবার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে তিনি যদি এই স্বীকারোক্তিটুকু পত্র পত্রিকাগুলির সমালোচনা প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই প্রচার করতেন, তাঁর আন্তরিকতায় বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতাম না। কিন্তু বর্তমানের স্বীকারোক্তির জন্য যদি বলি, ঋষি বঙ্কিমের আত্মীয়ের যে পত্র রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হ'য়েছে, তার ভিতর যে ভীতির আভাষ রয়েছে, তারই বশবর্তী হ'য়ে তিনি এই বিবৃতি দিয়েছেন—তা কী অন্যায় হবে ? (২) নীতীশ মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর চিত্রে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে অশোককুমারের অভিনয়কেও কোনমতেই ছাপিয়ে যেতে পারে নি।

লীলাময়ী পিকচার্সের 'দেবদূত' চিত্রে অজন্তারাণী
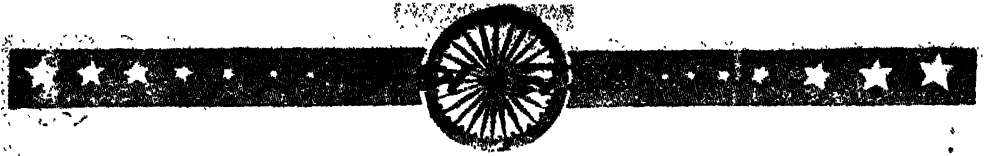
বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতাপ ফুটে না উঠলেও, দেবকী বাবুর প্রতাপ অশোককুমারের অভিনয়ে স্বচ্ছ হ'য়েই ফুটে উঠেছে।

শচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কেষ্ট চক্রবর্ত্তী ও সতীশ ভুইঞা (আসাম বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ, কলিকাতা) একই দৃশ্যে একই ব্যক্তি সামনা সামনি টেবিলে বসে তাস খেলছে অথবা টেবিলের সামনে মুখোমুখী বসে আছে—এ দৃশ্য কী করে গ্রহণ করা সম্ভব?

●● এই ধরণের চিত্র গ্রহণ করতে হয় duplicator Device-এর সাহায্যে। এই Duplicator Device টি একটি ঢাকনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ঢাকনীটি দ্বারা প্রথমে ক্যামেরার লেন্সের অর্দ্ধেক ঢেকে রাখা হয়। তারপর চিত্রগ্রহণ করার সময় প্রথমে সম্পূর্ণ দৃশ্যের অর্দ্ধেক গ্রহণ করা হয় এবং বিষয় বস্তুটি বিপরীত দিকে রেখে বাকী অর্দ্ধেকটুকু গ্রহণ করা হয়। এমনি ভাবে চিত্র নিলে দেখা যাবে একটি লোক সামনা সামনি বসে আছে।

চণ্ডীপদ চট্টোপাধ্যায় (মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট) মহাশয় গত ২৯ শে বৈশাখ ১৩৫৫ ১২ই মে ১৯৪৮ তারিখের আনন্দ বাজার পত্রিকায় দেখিলাম চন্দ্রশেখর চিত্রনাট্য রচয়িতা পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবকী কুমার বসু মহাশয় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্র শেখর' উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র রচনায় সমস্ত ত্রুটির জন্য দেশের জনসাধারণ ও বংকিমচন্দ্রের আত্মীয় বন্ধুগণের মনে যে কষ্ট দিয়াছেন, তার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। সংবাদটা দেখিয়া সত্যই দেবকী বাবুর মনোবলের প্রশংসা ও ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। তবে এ সম্পর্কে অন্যান্য প্রযোজকদের কাছে আবেদন জানাতে চাই, তাঁরা যেন আর এরূপ কাউকে হত্যা করিতে উদ্যত না হন।

●● আপনার মত আমিও দেবকীবাবুকে তাঁর সৎসাহসের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অন্যান্য প্রযোজক ও চিত্রপরিচালকদের এ বিষয়ে সতর্ক হ'তে অনুরোধ কচ্ছি।

দীপালী দাশগুপ্তা (রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ে অসাবধানতা বশতঃ একটু ভুল করে ফেলেছি। 'যা হয় না'র দীপ্তি রায় পুরুষ। বহুদিন পূর্বে রূপ-মঞ্চে তার ছবিও প্রকাশিত হ'য়েছিল।

গিরিশ-স্মৃতি

কলকাতায় এবার খুব সমারোহের সংগে সমাপিত হলো গিরিশ স্মৃতি-তর্পণ। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করলেন পশ্চিম বাঙলার মাননীয় লাটসাহেব বাহাদুর। সভামঞ্চ উজ্জ্বল করে আসীন হ'লেন তদীয় সাংগপাংগ এবং প্রসাদপ্রার্থী বহু খ্যাতিমান এবং ভাগ্যবান। সভাগৃহ লোকারণ্য—এমন কি রুদ্ধগৃহের বাহিরেও প্রতীক্ষমাণ বিরাট জনতা। সভাপতির পদতলে সগৌরবে রক্ষিত গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্র। দুইটী সুদৃশ্য পুষ্পাধারে মনোহর পুষ্পসজ্জা সভাপতির টেবিলের শোভাবর্ধন কার্যে নিয়োজিত ছিল। তাদের বিপুল কলেবর সভাপতির মুখমণ্ডল আবৃত করে ফেলায় সভাপতি মহাশয় তাদের মঞ্চোপরি নামিয়ে রাখবার নির্দেশ দিলেন। সে নির্দেশ পালিত হ'লে দেখা গেল ঘটনাচক্রে তাদের গিরিশের তৈলচিত্রের উভয় পার্শ্বে স্থান নিতে হ'য়েছে। তারাও ম্রিয়মাণ হ'লো কিনা জানা যায়নি। তবে সভাপতির সিংহাসন আরও এক ফুট উঁচু দেখে না আনবার জন্য অনেকেই ক্ষুব্ধ হ'য়ে পড়লেন এবং এ সব কাজের ভার যার-তার হাতে দিলে এমনি বিড়ম্বনাই হয় এবম্প্রকার অভিমতও জ্ঞাপন করলেন। আসন ত্যাগ ক'রে সভাপতি মহোদয় একবার এসে গিরিশের চিত্রখানির একপার্শ্বে একগাছি মালা জড়িয়ে দিলেন। ক্ষণপূর্বে তাঁকে বন্দনা করে যে মালাখানি তাঁর গলায় নিবেদন করা হ'য়েছিল এবং যা তৎক্ষণাৎ খুলে তিনি টেবিলে রেখে দিয়েছিলেন সেইখানিই কি না অতটা খেয়াল নেই।

ধন্য গিরিশ—ধন্য তোমার ভাগ্য—ধন্য তোমার আজীবন সাধনা! বাঙলা দেশের জীবিত কি মৃত কোন নটের ভাগ্যে স্বয়ং লাটসাহেব কর্তৃক বর্ধিত-শোভা এহেন সম্বর্ধনার সুযোগ তো ঘটেইনি—কোন মহাকবির ভাগ্যেও ঘটেছে বলে দেখা যায়নি।

অথচ এমনিই বোধ হয় বিরাট একটা আত্মবিস্মৃত জাতি এমনি করেই বোধহয় তার পূজার অর্ঘ্যও নিবেদন করে। মঞ্চোপরি আসন গ্রহণে অনুরুদ্ধ হ'য়ে গিরিশভক্ত কোন পরম পণ্ডিত ব্যক্তি সেদিন সখেদে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এসেছিলেন গিরিশ স্মৃতি-পূজায় যোগদান করতে। এসে দেখেন, সেখানে প্রদেশপালের পূজারই সমারোহ। সে মঞ্চে তাঁর আসন গ্রহণের কোন সার্থকতা নেই।

এর মধ্যেই বাঙালী তার একাধারে পরম সাধক মহাকবি নটশ্রেষ্ঠকে ভুলে গেছে মনে করতে প্রাণে আঘাত লাগে। স্মৃতি-সভার আহ্বান করে তাতে যে পূজার চাইতে অবহেলাই প্রকাশ করে বেশী, এ দৃশ্য মর্মান্তিক তবু এই সত্য। আজকালকার শিক্ষাভিমানী বাঙা[illegible] কতজন [illegible] চন্দ্রের রচনাবলীর সংগে পরি[illegible] গিরিশ স্মৃতিসভায় লোকাভাব বিশেষ [illegible] এবারেও বিশেষ করে নটগোষ্ঠীর মধ্যে [illegible] শিশিরকুমার, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুক্ত রাঞ্জিৎ রায় ব্যতীত আর কেউ দৃষ্টিগোচর হননি। শ্রীরঙ্গম মঞ্চে সেদিন এই স্মৃতি-পূজার আয়োজন হ'য়েছিল। অপরাপর রঙ্গালয়ে যেখানে নিয়মিত অভিনয় চলছিল, তাঁরাও কেউ এই পুণ্য দিনে গিরিশচন্দ্রের রচনা থেকে একটী দৃশ্যাভিনয় করেও স্বর্গত মহাকবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননি বা গিরিশ-স্মৃতির অপর কোনরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেননি।

বাঙলার রঙ্গালয়ে আজ গিরিশচন্দ্রের নাটকের অভিনয় হয় না বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাজরোষে যখন গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী প্রভৃতি নাটকের প্রকাশ এবং অভিনয় নিষিদ্ধ হ'য়েছিল, তখন বাঙ্গালীর আকুল ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। আজ প্রায় আট মাসের অধিক হ'লো এই নাটকগুলি রাজরোষ মুক্ত হ'য়ে পুনরায় অভিনয়যোগ্য হ'য়েছে কিন্তু একমাত্র নটনাথ শিশিরকুমারের অসার্থক প্রচেষ্টা সিরাজদ্দৌলার অভিনয় ব্যতীত অপর কোনও নাটক কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত

হয়নি। দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপ' যাঁরা নতুন করে খুললেন তাঁরাও 'মীরকাশিম' অভিনয় করবার দায়িত্ব বা প্রয়োজন বোধ করেননি—শচীন্দ্রনাথের 'গৈরিক পতাকা' নিয়ে যাঁরা আজও ঢক্কা নিনাদরত—গিরিশচন্দ্রের 'ছত্রপতি' আজও তাঁদের দরবারে অপাংক্তেয়। বাঙালী দর্শক সমাজ বলে কোন বস্তু কদাপি পরিলক্ষিত হয়েছে বলে অনুভূত হয়নি। বিভিন্ন কারণে যে জনসমষ্টি পয়সা খরচ করে অথবা অনেকেই না ক'রে রঙ্গালয়ে ভীড় জমান, তাঁদের কোনদিনই মনে হয়নি এই সব নাটকের অভিনয় করবার জন্য সমবেত দাবী জ্ঞাপন করা—যে দাবীর কাছে যুদ্ধ বাজার স্ফীত মঞ্চ মালিকদের মস্তক অবলীলাক্রমে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য হ'তো। অথচ আশ্চর্য এই, প্রত্যেক রঙ্গালয়েই গিরিশচন্দ্রের একখানি করে প্রতিকৃতি তাদের গণেশ ঠাকুরটির মতই সাড়ম্বরে রক্ষিত হ'য়ে আসছে।

সেক্সপীয়রের জন্মভূমি স্ট্রাটফোর্ড অন আভন আজ ইংলণ্ডের মহাতীর্থে পরিণত। ইংলণ্ডের প্রতিটি নরনারী আজ এই মহাকবির সহিত পরিচিত। কিন্তু দুর্ভাগা বাঙালাদেশে গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী আজ অপ্রকাশিত—তাঁর বাস্তুভিটাটুকু পর্যন্ত শোনা যায় ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কবলিত প্রায়। হায় বাঙালী—এই কি তুমি! সেদিন স্মৃতি-সভায় নটনাথ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বাঙালী সমাজের কাছে আবেদন এবং বিশেষ করে His Excellency the President-এর কাছে ভিক্ষা জানিয়েছিলেন, একটি National Stage গঠন ক'রে গিরিশচন্দ্রের স্থায়ী স্মৃতি-রক্ষার ব্যবস্থা করতে। His Excellency অবশ্য তাঁর সুমধুর অভিভাষণে বৈদান্তিক ব্যাখ্যায় অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন যে, ইঁট, কাঠ, সিমেণ্ট দিয়ে কোন মনীষীর স্মৃতিরক্ষা হয় না। স্মৃতিরক্ষা করতে হ'লে প্রয়োজন তাঁর আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি (গান্ধীজী সম্ভবতঃ Noble Exception) বাকী এখন কৃপাযোগ্য বাঙালী সমাজ। তাঁরা কিভাবে সাড়া দেবেন জানি না। কিন্তু তৎপূর্বে একটা সাধারণ কথা জানতে অভিলাষ হয়। National Stageকে বাঁচিয়ে রাখবেন কারা। নাট্যকার, শিল্পী ও দর্শক এই ত্রিসংগমে নাটকের সম্পূর্ণ রসসৃষ্টি এবং উপলব্ধি। নাট্যকার সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সামান্য আলেখ্য ইতিপূর্বেই নিবেদন করা হ'য়েছে। দর্শক সম্বন্ধেও অধিক উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাকী শিল্পীগোষ্ঠী, বিশেষ করে নটকুল এবং সর্বজ্ঞাতা পরিচালকমণ্ডলী। এঁদের সর্বকুশলী হস্তের যাদুস্পর্শে বাল্মীকির মানস সৃষ্টি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠা মহামহিমময়ী নারী সীতা আজ তাম্রকূটসহযুক্ত তাম্বুলচর্বণনিরতা এবং চটুল চাহনি শোভিতা হালফ্যাশানী বস্ত্রবিমণ্ডিতা নব্যা তরুণীতে পর্যবসিতা; অপূর্ব শৌর্যবীর্যদৃপ্ত সংযত-দৃঢ় চরিত্র ত্যাগী প্রতাপ আজ মিহিসুরে মেয়েলী ঢঙে প্রেম জরজর প্রণয় নিবেদনরত গোপাল যাত্রে রূপান্তরিত। প্রশ্ন করলে অবগত হবেন—মশাই একেই বলে 'human touch'। সীতা চিরকালই কিছু গম্ভীর ভাবযুক্ত ছিলেন না। প্রতাপকেই বা এমন কাঠখোট্টা ঠাওরাবার কি অধিকার আপনার? মনে পড়ে শিশিরকুমারের রামের ভূমিকাভিনয়ে দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপী বিরহের পরে লবের সহিত মিলনদৃশ্যের উচ্ছসিত প্রশংসামুখর এক বিশিষ্ট দর্শকের সেই অভিমত—oh, he has played better than Rama himself। শিশিরোত্তর যুগের শিল্পীরা কালের বিবর্তনে নিশ্চয়ই আরও অগ্রবর্তী হবার অধিকারী। তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ বাঙলার রঙ্গালয় আজ যে ভৌতিক তাণ্ডবে লীলায়িত, এই প্রচণ্ড লীলা নিকেতনে গিরিশচন্দ্র আজ কি মূর্তিতে উপস্থাপিত হবেন তার সম্যক ধারণা করা দুঃসাধ্য। অসামান্য প্রতিভাধর শ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পী নটনাথ শিশিরকুমার 'National Stage' পরিচালনার সুবিপুল দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন কি না বা করতে চাইলেও সর্বপ্রকার দলাদলি অধ্যুষিত এই দুর্ভাগা বাঙলা দেশে শেষ পর্যন্ত তাঁর কিম্বা অনুরূপ কোন সুযোগ্য হস্তে সে ভার অর্পিত হবে কি না জানি না। তাই বলতে ইচ্ছে করে, হে বর্তমান বাঙলার তথাকথিত শিক্ষাভিমানী মহান ব্যক্তিবৃন্দ, তোমাদের কৃপাদৃষ্টি থেকে গিরিশচন্দ্রকে মুক্তি দাও। অবসান হোক এই স্মৃতি পূজারহস্যের—এই বাৎসরিক এক শ্রান্ত সন্ধ্যার বাগ্‌বিভূতির। চির-শান্তিতে শয়ান সেই মহাপুরুষের সুনিবিড় শান্তির ব্যাঘাত ঘটায়োনা। জড়চেতন বাঙালী যদি কোনদিন এই বিরাট পুরুষের কাছে সত্যিকারের ঋণ স্বীকার করে, সেইঋণ পরিশোধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হয় তবেই যেন সে আসে এগিয়ে, নইলে অন্তঃসার বিহীন আত্মঘাতী এই বৃহৎ পরিহাস বর্জন করলেই তবু তার আত্মমর্যাদা বোধের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রকাশ পাবে।

—শ্রীকুমার

দৃষ্টিদান

প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত এস, বি প্রোডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন 'দৃষ্টিদান' একযোগে চিত্রা, ছায়া ও পূর্ণতে প্রদর্শিত হচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন নীতিন বসু। চিত্রনাট্য রচনা ও সুর সংযোজনা করেছেন যথাক্রমে সজনী দাস ও তিমির-বরণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'দৃষ্টিদান' গল্পটিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য চিত্রটি গড়ে উঠেছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সুনন্দা দেবী, অসিতবরণ, ছবি বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বিমান, অমিতা, কেতকী প্রভৃতি আরো অনেকে।

প্রথমেই বাংলার একজন প্রখ্যাতা অভিনেত্রীকে প্রযোজক রূপে দেখতে পেয়ে আমরা তাঁকে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'দৃষ্টিদান' বাঙ্গালী দর্শক সাধারণের অনেকেরই পরিচিত। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত কবিগুরুর গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্ভবতঃ ষোড়শ খণ্ডে গল্পটি স্থানলাভ করেছে। 'দৃষ্টিদান' যাঁরা পড়বার সুযোগ পাননি 'দৃষ্টিদান' চিত্রখানি দেখবার পূর্বে অথবা পরে গল্পটিকে পড়ে নেবার জন্য তাঁদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি। গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় খণ্ডে ২৭৫ পৃষ্ঠা থেকে ২৯৯ পৃষ্ঠার অর্ধাংশ মোট ২৪½ পৃষ্ঠায় গল্পটি স্থানলাভ করেছে। গল্পটি পড়লেই দর্শক সাধারণ বুঝতে পারবেন যে, এই ছোট্ট কাহিনীটিকে চিত্রে পূর্ণাংগ রূপ দিতে হ'লে কবিগুরু আভাষে যে চিত্র এঁকে গেছেন—তার উপর কিছুটা রং ফলান ছাড়া উপায় নেই। তাই চিত্রনাট্যকারকে সে স্বাধীনতা দিতে আমরা অস্বীকার করবো না। এখন কথা হচ্ছে, এই রং ফলাতে যেয়ে কবিগুরুর মূল কাহিনীর কতখানি মর্যাদাহানি হ'য়েছে অথবা আদৌ হয়নি তা বিচার করে দেখতে হবে। সম্প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে যেয়ে চিত্রপরিচালক দেবকী বসু মহাশয় যে অন্যায় করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে সমাজের প্রত্যেক স্তর থেকেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়ে উঠেছিল এবং বর্তমান চিত্রের চিত্রনাট্যকারও সে প্রতিবাদের সংগে সুর মেলাতে দ্বিধাবোধ করেননি। অবশ্য দেবকী বাবু জনসাধারণের কাছে শেষ পর্যন্ত ক্ষমা চেয়ে সে অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 'দৃষ্টিদান' সম্পর্কেও নানান মহল থেকে নানান প্রতিবাদ উঠেছে। বর্তমান চিত্রনাট্যকার একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সম্পাদক। তিনিও দেবকী বাবুর মত ঐ একই অন্যায়ের মাঝে সত্যই নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন কি না, বহু দর্শক ইতিমধ্যেই কৌতূহলী হ'য়ে প্রশ্নবাণে আমাদের জর্জরিত করে তুলছেন এবং যদি ঐ একই অন্যায় তাকেও স্পর্শ করে থাকে তবে তাঁকেও আমরা অভিযুক্ত করে এই অন্যায়ের জন্য জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চাইতে বলবো কি না, সে কথাও জানতে চাইছেন। পাঠক সাধারণের প্রশ্নগুলি আলোচ্য চিত্রের সমালোচনার সংগে জড়িত, তাই এবিষয়ে যাঁরা সম্পাদককে চিঠি লিখেছিলেন, তার উত্তর সমালোচনা প্রসংগে আমিই দিতে চেষ্টা করবো। আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে যদি কারো কিছু বলবার থাকে, আশা করি যথা সময়ে সম্পাদকের কাছে তাঁরা তা পেশ করবেন। কবিগুরুর ইতিপূর্বেকার আর একটি কাহিনীর চিত্রনাট্য রচনায় শ্রীযুক্ত দাসকে যে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম, বর্তমান চিত্রে তা জানাতে পারবো না বলে যদি কেউ শ্রীযুক্ত বসুর সমগোষ্ঠী অপরাধী বলে তাঁকে মনে করেন—তবে তাঁর ওপর অবিচার করা হবে।

দৃষ্টিদান চিত্রে তিনি যে অন্যায় করেছেন, তা তাঁর ইচ্ছাকৃত নয় এবং সবটা দোষ তাঁর নিজেরও নয়। কিছুটা পরিচালক ও কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপাতে চাই। তিনি যে-দোষে দোষী, সে কথারও উল্লেখ কচ্ছি। প্রথমতঃ তিনি যে জমিদারের চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাতে চাই। কবিগুরুর কাহিনীতে এই চরিত্রটির কোথাও বিন্দুমাত্র আভাষ নেই। কাহিনীকে প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি এই চরিত্রটির সৃষ্টি করেছেন—অথচ কাহিনীর অন্যত্র যে আভাষ রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করেও তিনি এ কাজ সাধন করতে পারতেন। এই জমিদার চরিত্রটি সৃষ্টি করে যেমনি তিনি কবিগুরুর ওপর কর্তৃত্ব করতে গেছেন-তেমনি মূল কাহিনীর অপর আর একটি চরিত্রের

ওপর খুবই অবিচার করেছেন। এই চরিত্রটি হচ্ছে নায়িকা কুমুর দাদা। কুমুর দাদার চরিত্রটি যে খুবই উঁচু ধরণের ছিল, একথা স্পষ্টই বোঝা যায় এবং ভগ্নীর প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহের আভাষ একাধিক স্থানে কবিগুরুর কাহিনীতে পাওয়া যায়। হেমাঙ্গিনীর প্রতি যখন কুমুদের বাড়ীতে—কুমুর দাদা একবার বেড়াতে আসেন এবং হেমাঙ্গিনীর প্রতি কুমুর স্বামীর ব্যবহার যে তাঁর দাদার চোখ এড়িয়ে যাবেনা, দাদার তীক্ষ্ণদৃষ্টি-শক্তি ও বিচার ক্ষমতার অনুকূলে তাই কুমুকে বলতে শুনি, "আমার দাদা বড় কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করতে জানেন না।" হেমাঙ্গিনীর প্রতি অবিনাশের ব্যবহার যে কুমুর দাদার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়না, তারও যেমন প্রমাণ পাই, তেমনি কুমুর দাদার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাই তাঁর বিদায় বেলার দৃশ্য থেকে যা কবিগুরু তাঁর কুমুর মুখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। "দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন; মনে মনে একাগ্রচিত্তে কী আশীর্বাদ করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল।"

কুমুর প্রতি তাঁর দাদার স্নেহের আরো গভীরতার পরিচয় পাই যখন কুমুর স্বার্থের জন্য তিনি হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করলেন। এখানেও কুমুর মুখ দিয়েই কবিগুরু এই পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন: "আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না; মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমি তাঁহা[কে] বিবাহ দিলাম: দুই চক্ষু বাহিয়া হু হু করিয়া জ[ল] ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, কিছুতেই থামাইতে পারি না[।] দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাই[য়া] দিতে লাগিলেন; হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরি[য়া] কেবল হাসিতে লাগিল।" এখন কথা হচ্ছে চিত্রনাট্[য]কারের সৃষ্ট জমিদার চরিত্রটি কুমুর দাদার চরিত্রটি মর্যাদাহানি করলো কী করে? চিত্রটি যাঁরা দেখেছে[ন] —কুমুর দাদার উপরোক্ত চরিত্র বিশ্লেষণ থেকেই তাঁ[রা] তা বুঝতে পারবেন। যাঁরা দেখেন নি, সম্পূর্ণ নতু[ন] সৃষ্ট জমিদারের চরিত্রটি নিয়ে একটু আলোচনা করলে তাঁদের সামনেও এই অবিচার সহজেই ধরা পড়বে[।] আলোচ্যচিত্রে কুমুর দাদাকে জমিদারের ওপর সম্প[ূর্ণ] নির্ভরশীল একটি চরিত্ররূপে আঁকা হয়েছে। জমিদার[ই] তাঁকে বার বার অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন কুমুর কাছে[।] মনে হয়েছে, জমিদারের হাতে এই চরিত্রটি একটা পুতু[ল] মাত্র। ভগ্নীর প্রতি তাঁর অন্তরের স্নেহ নিজস্ব শক্তি[র] উপর কোথাও বিকশিত হয়ে ওঠেনি। এমন ক[ি] হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করে কুমুর দাদা কবিগুরুর মূল কাহিনীতে শুধু কুমুর কাছেই নয়—পাঠক সাধারণের কাছেও আত্ম-ত্যাগের জন্য যতখানি মহিমময় বলে দেখা দেন—আলোচ্য চিত্রে তাঁর সে আত্মত্যাগকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ক[রা] হ'য়েছে। চিত্র জগতের সস্তা "suspense"-কে ফুটি[য়ে] তুলতে যেয়ে সজনীবাবুর মত সাহিত্যিকও যে কুমু[র] দাদার চরিত্রটিকে উপেক্ষা করবেন, এ আমাদের ধারণা[র] অতীত ছিল। কুমুর দাদা আলোচ্য চিত্রে হেমাঙ্গিনীকে বিয়ে করলো কুমুর কথা চিন্তা করে নিজস্ব প্রেরণা[র] কর্ত্তব্য থেকে নয়। সে বিয়ে করলো, জমিদারের অনুরোধে[।] তারপর শেষ দৃশ্যের পরিণতি মূল কাহিনীতে যেরূপ আ[ছে] সজনী বাবু তার ওপর কিছুটা মাতব্বরী করেছেন ব[লে] খুবই ব্যথিত হ'য়েছি। পরিণতিতে আছে, জল ঝড়ের [মধ্যে] হেমাঙ্গিনীদের বাড়ীতে যেতে অবিনাশের দু' তিন দি[ন] দেরী হ'লেও, সে হেমাঙ্গিনীদের বাড়ীতে যেয়ে হাজি[র] হ'য়েছিল এবং যেয়ে শুনতে পায়, কুমুর দাদার সংগে দু'[টি]
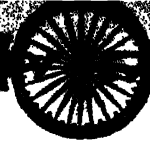
দিন পূর্বেই হেমাঙ্গিনীর বিয়ে হ'য়ে গেছে। তখন অনুতপ্ত মনে ফিরে আসে। বিয়ে করতে আসার সময়ই তার অন্তর্দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় এবং যখন হেমাঙ্গিনীর বিয়ের সংবাদ পেল, তখন এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পায়। চিত্র নাট্যকার তাঁর পরিণতির স্বপক্ষে অবিনাশের চরিত্রটির নজির দেখিয়ে বলতে পারেন, অবিনাশকে জমিদারের বাড়ীতে নিয়ে হাজির করা হ'য়েছে পূর্ব থেকেই তার অনুশোচনার কথা ফুটিয়ে তুলবার জন্য। স্বীকার করি। কিন্তু অবিনাশ যে ধরণের চরিত্র, তাতে পূর্বে থেকে তার অনুশোচনা ফুটিয়ে না তুললেও কোন কিছু আসতো যেতোনা। কবিগুরু যে পরিণতির নির্দেশ দিয়ে গেছেন, সে পরিণতি চলচ্চিত্রেরও অনুপযোগী হ'ত না। বরং সকলের মিলনের মধ্য দিয়ে চিত্রনাট্যকার চিত্রজগতের চিরপ্রচলিত যে পরিণতি ফুটিয়ে তুলেছেন—তাতে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীরও মূলে যেমনি আঘাত করা হ'য়েছে তেমনি তা সাধারণ দর্শকদের খুশী করবার দাবী নিয়ে কর্তৃপক্ষের নিম্নগামী চিন্তাধারার পরিচয়ই দিয়েছে। অন্যান্য চরিত্রের ওপর অবশ্য সজনী বাবু কোন অবিচার করেন নি। ভজন দাসের চরিত্রটির আভাষ আছে এবং কাহিনীর প্রসার উদ্দেশ্যে যতটুকু তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন—সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবার নেই। সজনী বাবুর সৃষ্টি জমিদার চরিত্রটির বিরুদ্ধেও আমাদের বলবার আছে। কুমুর যখন বিয়ে হয়, তখন তার বয়স আট বছর। অবশ্য বালিকা কুমু রূপে কেতকীকে আট বছর বলে কর্তৃপক্ষ চালিয়ে দিতে পারেন না—এজন্য দায় কর্তৃপক্ষের, সজনী বাবুর নয় এবং কেতকীর মত মেয়েকে দেখেও ছবি বিশ্বাসের বয়সী জমিদারের প্রেম জমতে পারে না। এজন্য জমিদারের চরিত্রে ছবি বিশ্বাসের নির্বাচনকেও আমরা সমর্থন করতে পারবো না। অথচ এই জমিদার চরিত্রটি যে ছবি বিশ্বাসের কথা চিন্তা করেই সৃষ্টি করা হ'য়েছে, তার পরিচয় পাই ছবি-বিশ্বাসী সংলাপের ভিতর দিয়ে। যার সংগে চিত্রের অন্যান্য চরিত্রের মোটেই কোন সংগতি নেই। জমিদার চরিত্রটির সংগে চিত্রে যখন আমরা পরিচিত হই, তখন তাকে উচ্ছৃংখল বলেই মনে হ'তে থাকে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সেই ধারণাকে আরো বদ্ধমূল করে তোলে। অথচ তার পরিণতি সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। দর্শকমনে বিস্ময় উৎপাদনের জন্য চিত্রে কী এই চরিত্রটির পরিণতি চিত্র নাট্যকার এমনি বৈপরীত্যের ওপর সৃষ্টি করেছেন?

"দৃষ্টিদান" কাহিনীটির রচনাকাল ১৩০৫, পৌষ, অর্থাৎ এখন থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে। কিন্তু এই পরিবেশ পরিচালক মোটেই ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। শুধু প্রধান চরিত্রের গায়ে দু'চারটা প্রাচীন ধরণের কোট বা জামা চড়ালেই হয় না। প্রত্যেকটি চরিত্রের এবং পরিবেশের সমতা রক্ষা করেছেন কোথায়? 'নৌকাডুবি' চিত্রে পরিচালক নীতিন বসু এ বিষয়ে যে অনুশীলন-ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন—আলোচ্য চিত্রে তা দিতে মোটেই সক্ষম হননি। এমন কী, শিল্পী নির্বাচনের দূরদৃষ্টির জন্য সমস্ত চিত্রে যে শালীনতা স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠেছিল, আলোচ্য চিত্রে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হ'য়েছে। যতক্ষণ চিত্রকাহিনী সুনন্দা, অসিতবরণ ও বিমানকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়েছে, ততক্ষণ এই শালীনতা রক্ষিত হ'য়েছে। অবশ্য ছবি বিশ্বাস যে দৃশ্যে রয়েছেন, সে দৃশ্যেও এই শালীনতাও বজায় রয়েছে। তবে তাঁর মুখের সংলাপ রবীন্দ্র-সংলাপের অনুগামী নয় বলে সমস্ত চিত্রখানির ভিতর ছবি বিশ্বাস অভিনীত দৃশ্যগুলি যেন পৃথক এক ছাপ নিয়ে ফুটে উঠেছে।

"দৃষ্টিদানে"র মর্মকথা একটি দৃষ্টিহীন নারীর দৃষ্টিহীনতার কথাই নয়—একটি দৃষ্টিহীন নারী তাঁর বাহ্যিক দৃষ্টি হারিয়েও অন্তরের দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিতা হয়নি অথচ তার স্বামী বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন হ'য়েও অন্তর্দৃষ্টিহীন হ'য়ে ওঠার জন্য স্ত্রীর অন্তরের বেদনার কথা এবং শেষ পর্যন্ত তার ঐকান্তিক কামনায় ও ধৈর্যে স্বামীর অন্তর্দৃষ্টি দানে সক্ষম হ'য়েছিল তারই মহিমময় কাহিনী। আলোচ্য চিত্রে এই মর্মকথাও স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে ওঠেনি। অভিনয়ে ছবি বিশ্বাস জমিদারের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিনয়ে সমগ্র চিত্রটিতে এই চরিত্রটি পৃথক এক রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। তাতে যেমনি তাঁর নিজস্ব অভিনয়-দক্ষতা নূতন করে দর্শকদের কাছে প্রমাণিত হ'য়েছে তেমনি

মুল কাহিনীকেও ব্যাহত করেছে। অবশ্য শেষোক্ত দোষে তিনি নিশ্চয়ই দোষী নন। কুমুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সুনন্দা দেবী—কুমুর মর্যাদা পূর্ণভাবে তাঁর অভিনয়ে অক্ষুণ্ণ রয়েছে। শুধু সংলাপকে অবলম্বন করেই যে অভিনয়-দক্ষতা বিকাশ পাবে, তা নয়—নির্বাক মুহূর্তে ভাব ও ব্যঞ্জনার দ্বারাও তাকে ফুটিয়ে তোলাও শক্তিমত্তার পরিচায়ক। শ্রীমতী সুনন্দা সেদিকে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হ'য়েছেন। কুমুর স্বামী অবিনাশের ভূমিকায় চপল-পরায়ণ অসিতবরণও যে এই ধর্মকে রক্ষা করতে পারবেন, তা আমাদের ধারণা ছিলনা. কিন্তু আলোচ্য চিত্রে তিনি সে কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন বলে তাঁকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই দু'টি চরিত্র নিয়ন্ত্রণে চিত্র-নাট্যকারও যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন. সেজন্য তিনিও ধন্যবাদের যোগ্য। কুমুর দাদার ভূমিকায় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কেও প্রশংসা করবো। ছোট কুমুর ভূমিকায় কেতকী খুবই খুশী করেছে। হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অমিতা দেবী চলনসই। ভজনদাসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। মূলতঃ সংগীতের জন্যই তাঁকে হয়ত নির্বাচন করা হ'য়েছিল কিন্তু তাঁর কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীতের চংয়ে একটুকুও রক্ষিত হয়নি, একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। অন্যান্য পার্শ্ব চরিত্রগুলি অনুল্লেখযোগ্য। বরং তাঁরা কাহিনীর রাবীন্দ্রিক-পরিবেশকে ব্যাহতই করেছেন। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ খুবই ভাল। এদিক দিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। তবে সম্পাদনায় একটা দৃশ্যে যেন একটু ত্রুটি চোখে পড়ে গেল। পরিচালনায় নীতিন বাবু যদি কাশীনাথের পরামর্শ সংগীর সাহায্য নিতেন, তবে চিত্রটি আরো হৃদয়গ্রাহী হ'তো বলেই আমরা মনে করি। বর্তমানে যতগুলি চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে, দৃষ্টিদানে এসব দোষত্রুটি থাকা সত্বেও দর্শকদের যে অধিক আনন্দ দেবে একথা নিশ্চিত করে আমরা বলতে পারি।

আমাদের অবতারনায় পাঠক সাধারণের যে প্রশ্নের উল্লেখ করেছি, সে প্রশ্নের জবাব এখনও দেওয়া হয়নি। সজনীবাবু রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর যে মর্যাদাহানি করেছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে দেবকী বাবু যতখানি অপরাধ করেছিলেন 'চন্দ্রশেখর' চিত্রের বেলায়, আলোচ্য-চিত্রে সজনী বাবুকে ততখানি অপরাধী বলে আমরা মনে করিনা। তবু এই ত্রুটির জন্য তাঁর কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমরা মনে করি এবং এবিষয়ে তাঁর বক্তব্যের জন্য আমরা অপেক্ষায় রইলাম।

—মণিদীপা

স্যার শঙ্করনাথ—

দেবকী বাবুর "সোনার সংসার" চিত্রের স্যার শঙ্করনাথের চরিত্রটি নিয়ে এই গল্পাংশটি রচিত হয়েছে। স্যার শঙ্করনাথ নার্ভাস রোগী। কলিকাতার বড় বড় ডাক্তাররা বৃটিশ ফারমাকোপিয়ার যাবতীয় ঔষধ প্রয়োগ করেন কিন্তু রোগ সারে না। চিকিৎসার ভার পড়ল বর্মা ফেরৎ ডাক্তার দম্পতী মিষ্টার ও মিসেস রায়ের উপর। ডাক্তার পরিবারের সংগে তপতী নামে একটি পিতৃ-মাতৃহীন মেয়ে এলো। বর্মা থেকে তপতীর ব্যর্থ প্রণয়ী ধনী ব্যবসায়ী অজিত রায়ও তপতীর জন্য কলিকাতায় এলো তার তপতীকে চাই যেমন করেই হোক। রবীন শঙ্কর-নাথের বাড়ীতে পিয়ানো সারাতে এসে তপতীর প্রেমে পড়ে। অজিতের হাত থেকে তপতীকে বাঁচাতে স্যার শঙ্করনাথ রবীনের সংগে তপতীর বিবাহ দেন।

"স্যার শঙ্করনাথ" চিত্রের আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়, সব জিনিষেরই একটা মাপকাঠি থাকা দরকার. পূর্ণ দৈর্ঘ্য হাসির ছবি, অতএব প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সর্বক্ষেত্রে ভাড়ামির চূড়ান্ত ও অবাস্তব পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেই বাহবা বা হাততালি পাওয়া যায় না। এক পয়সার সাড়ে বত্রিশ ভাজার মত সস্তার প্যাঁচ যতগুলি আছে, প্রায় সবগুলিকে এর মধ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে।
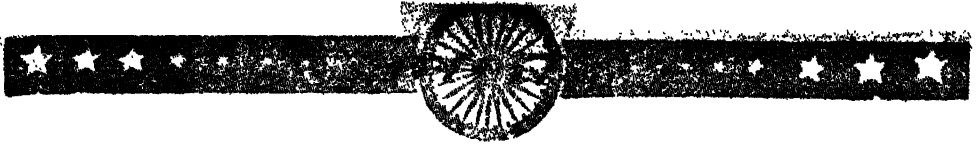
যথা—জয়হিন্দ, দিল্লী চল, সাইরেন, বোমা, যুদ্ধ, এ, আর, পি, বন্দুক, গুলি, প্রজা আন্দোলন, চুরি, খুন, কিডন্যাপ, মহাত্মার ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি।

কয়েক জায়গায় আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। সেইজন্য দেবকীবাবুকে প্রশ্ন করছি। তিনি যদি আমাদের বুঝিয়ে দেন তবে বাধিত হব। (১) বর্মা থেকে সদ্য আগত ডাক্তার দম্পতী মিষ্টার ও মিসেস রায় স্যার শঙ্করনাথের সহিত পরিচয়ের সময় মিসেস রায় তাঁর মাতৃভাষা ভুলে বর্মা মুলুকের ভাষায় স্যারকে প্রণাম বা নমস্কার জানালেন এবং পরমুহূর্ত থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত পরিষ্কার বাংলা ভাষায় কথা বলে গেলেন। প্রথমে দুইটি বিদেশী ভাষার কথা বলা হ'ল, তার কারণ কি বর্মা ফেরৎ বোঝানোর জন্য? (২) তপতীর হাতে বরণডালা দিয়ে পূজার ব্যবস্থা করা হয় এবং সংগে সংগে সারা আকাশ বরণডালায় ছেয়ে গেল এবং সেগুলি যাদুকরের যাদুকাঠির স্পর্শে মহাত্মার ছবির কাছে চলে গেল, এর অর্থ কি? (৩) তপতী পথ হারিয়ে স্যার শঙ্করনাথের বাড়ী বা ঠিকানা কি করে জানল? তপতীকে শঙ্করনাথের বাড়ীতে না আনলে হয় না, সেই জন্যই কি?

অভিনয়ে ফণী রায়, নবদ্বীপ হালদার ও হরিধন মুখোপাধ্যায়ের ভাড়ামি আর সহ্য করা যায় না। অহীন্দ্র, সিপ্রা, ও অপর্ণার অভিনয় ভাল। জীবেনের অভিনয়ের মধ্যে সংগ্রামের ছাপ আছে। অন্যান্য সকলে এক রকম। আলোক-শিল্প ও শব্দানুলেখন ভাল। সুর চলনসই।

—মহেন্দ্র গুপ্ত

মনে ছিল আশা

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য — বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। কাহিনী—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। সুরশিল্পী—রবি রায়। শব্দযন্ত্রী—পরিতোষ বোস। চিত্রশিল্পী—দিব্যেন্দু ঘোষ।

"মনে ছিল আশা" বইখানি একযোগে চলিতেছে, মিনার ছবিঘর ও বিজলীতে। চিত্রটী দেখবার আগে মনে আশা রেখেই গিয়েছিলুম কিন্তু "মনে ছিল আশা" দেখবার পর মনে যত আশা ছিল, সবই হতাশায় পর্যবশিত হল। ছবি আরম্ভ হ'বার সংগে সংগেই দর্শকদের মৃদু গুঞ্জন সকলকে জানিয়ে দেবে যে, বইটী দর্শক মনের খোরাক মোটেই যোগাতে পারেনি। কাহিনীকারের ঘটনাগুলি জোড়বার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সত্যই আশ্চর্যান্বিত হলুম। তাই দৃশ্য পরিবর্তনের সময় মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল যে, ছবি দেখতে আসিনি বোধ হয় "বুড়ো শিবঠাকুর তলায়" এসে হাজির হয়েছি। পরিচালককে আর কি বলব—মনে হল তিনি "বুড়ো শিবঠাকুর তলা"য় যারা আসর জাঁকিয়ে বসে থাকে, তাদেরই একজন চেলা। তা না হলে এমন অপূর্ব সমাবেশ করবেন কি করে! যেমন কাহিনী, তেমনই পরিচালনা। দুই সমান। এ বলে আমায় দেখ্ ও বলে আমায় দেখ্। যাক্ চেলা গুরুতে মিলে আচ্ছাই খেল দেখিয়েছেন যাহোক। ছেলে ও মেয়ের মন ভাল করবার জন্য চণ্ডীতলার মেলাতে যাওয়া থেকে আরম্ভ করে মায়া ও বনমালীর মিলন পর্যন্ত সবই বায়ুর ঊর্ধ্ব চাপের মত এলো মেলো।

প্রতাপ ও লতির দুষ্টামি স্বভাব ভাল করবার জন্য তাদের মা ও বাবা প্রভৃতিদের চণ্ডীতলার মেলাতে বিগ্রহের নিকট মানত করবার জন্য যেতে হ'ল। অবশ্য কাহিনীকারের ইচ্ছানুযায়ী মিলন করতে যেয়ে অমন ঝড় আর ছাপটা মারা আর প্রতাপকে অপর আত্মীয় স্বজনের মাঝ থেকে উড়িয়ে নিয়ে রায়বাহাদুরের বাড়ীতে না ফেললে চলবে কেন?

সুদীর্ঘ ১৫ বৎসর পার হয়েছে। প্রতাপ এম, এ, সি পাশ করেছে। "ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে" ইত্যাদি মধুর বুলিও তার মুখে শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করবার ১৫ বৎসর আগে মেলাতলায় নেতাজীর সামরিক পোষাক পরিহিত ছবি (আজাদ হিন্দ ফৌজ হইবার পর যে ছবিগুলি রাস্তায় বিক্রি করা হয়) পরিচালক কোথা হ'তে আবিস্কার করলেন? বড় তামাকের টানটা বোধ হয় একটু জোর হয়েছিল, তাই নেশায় মসগুল হ'য়ে নেতাজীর ছবিকে একটু টানাটানি করেছেন মাত্র। ঝড়ের সময় একটী ছেলে পালাতে গিয়ে কয়েকটী গাছের পাতা ও সরু চারা গাছ চাপা পড়ে মারা গেল। এই কৃত্রিম গাছের ডাল দেখিয়ে পরিচালক দর্শক মনকে

মোটেই ফাঁকি দিতে পারেননি। আশ্রমবাসী লতি (কণা) পুকুর থেকে জল নিয়ে গ্রাম্য পথ দিয়ে আসছে, তার সংগে সাক্ষাৎ ও প্রণয় হওয়ার জন্যই প্রতাপকে যেতে হ'ল বনে পাখী স্বীকার করতে। সাক্ষাৎ হওয়ার কালে যে কথাবার্তা বলান হয়েছে, তা আশ্রমবাসী একটী মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। একটা অপরিচিত পুরুষের কাছে বসে নানা ভাবে কথা বলায় প্রত্যেক মেয়েরই আড়ষ্ট ভাব থাকে। সর্বশেষে কাহিনীটিকে মেলাবার জন্য অদ্ভুত কারসাজির সাহায্য নেওয়া হ'য়েছে। এইরূপ বহু হঠাৎ ঘটিত ব্যাপার ও ছেলেমানুষী দেখিয়ে কর্তৃপক্ষ দর্শক সাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। তাই তাঁদের কাছে অনুরোধ যে, তাঁরা ভবিষ্যতে এই রকম বই তোলা থেকে নিবৃত্ত থাকুন। আর আমাদের সবচেয়ে বেশী অভিযোগ প্রথম দৃশ্যটীর উপর। একটী বালক ও বালিকার ভালবাসার দৃশ্য দেখান হয়েছে। বালক বালিকাদের ভালবাসা হওয়া উচিৎ নিষ্পাপ ও নিষ্কাম; কিন্তু এই দৃশ্যটীতে যথেষ্ট নিকৃষ্ট ধরণের প্রেমের উস্কানি আছে। শিশু মনের উপর এর প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। এর জন্য কর্তৃপক্ষকে আমরা সাবধান করে দিতে চাই।

চিত্রে দাদুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিপিন গুপ্ত। তাঁর অভিনয়কে প্রশংসা করবো। বনমালীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন গোকুল মুখার্জি। তিনি ভালই অভিনয় করেছেন। প্রতাপের ভূমিকায় পরেশ ব্যানার্জি ও ম্যানেজারের ভূমিকায় কিশোর মিত্র অশানুরূপ অভিনয় করতে পারেননি। মায়ার ভূমিকায় ছায়া দেবীর কোন আন্তরিকতার পরিচয় পাইনি। বড় লতির ভূমিকায় ছন্দা দেবীর অভিনয় মোটামুটি একরূপ।

সংগীত পরিচালনায় বিশেষ কৃতিত্ব নেই। সংগীতগুলি অধিকাংশই কীর্তন। সুরসংযোজনাকে তবু প্রশংসা করবো। তবে সঙ্গীতগুলি স্থানোপযোগী হয়নি বলেই বোধ হয় দর্শক মন জয় করতে সক্ষম হয়না। 'মনে ছিল আশা' বর্তমানকালীন নিকৃষ্ট ধরণের ছবিগুলিরই সংখ্যা বৃদ্ধি করলো। —মদন চক্রবর্তী

খুচরো খবর—

লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ

'দেবদূত'—সমস্ত সহরকে চঞ্চল করে তুলেছে—চার অক্ষরের একটি মাত্র নাম। কে সে—তা কেউ জানে না, কেউ তাকে চোখেও দেখেনি। অথচ তার প্রতিটি কার্যকলাপের সংগে সবাই অতি পরিচিত। কে কার ওপর অত্যাচার করলো, কে কাকে ঠকিয়ে বড়লোক হ'য়ে গেল, আর কে কাকে খুন করে নিশ্চিন্তে সমাজের মাথা সেজে বসে থাকলো—তাতে আজকের পৃথিবীতে কার কি আসে যায়? কিন্তু তবু আজ এই বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এত বড় সহরটার বুকে এমন একজন লোকের আবির্ভাব হ'য়েছে, যে এসব নিয়ে মাথা ঘামায় এবং মাথা ঘামানোটা অন্যায় না হ'লেও আইনতঃ অপরাধ বলে নিজেকে আত্মগোপন করে আমাদেরই মাঝে চলাফেরা করে—সে দেবদূত। বহু প্রতীক্ষার পর এই দেবদূত ১১ই জুন উত্তরা প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায় দর্শকসাধারণের সামনে ধরা দেবে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাল পাঞ্জার কাহিনীকে কেন্দ্র করে দেবদূত গড়ে উঠেছে। দেবদূতের সংলাপ, চিত্রনাট্য ও গীত রচনাও তিনিই করেছেন। আর চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিনয় গোস্বামী। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অমিতা বসু, নৌকাডুবি-খ্যাত অভি ভট্টাচার্য, ভাস্কর দেব (এঃ), তুলসী চক্রবর্তী, অজন্তা কর, প্রণব বাগচী, হারাধন, শঙ্কর, রমাপ্রসাদ, সন্তোষ, নীরোদ, বিমল, অচিন্ত্য, সুমিত্রা, রেণুকা, চৈতন্য প্রভৃতি। চিত্রখানি অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

নিউ থিয়েটার্সের "প্রতিবাদ" বাংলা চিত্রখানির মুক্তির

দিন ঘনিয়ে এসেছে বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন। শ্রীযুক্ত বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে 'প্রতিবাদ' গড়ে উঠেছে। 'প্রতিবাদ' পরিচালনা করেছেন জনপ্রিয় পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্র। যার "প্রতিশ্রুতি" আজও দর্শক সাধারণ ভুলে যেতে পারেন নি। প্রতিবাদের সুর সংযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত পঙ্কজ কুমার মল্লিক আর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন স্বর্গত দেবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা দেবী, ভারতী, চন্দ্রাবতী, পূর্ণেন্দু, কালী সরকার, প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানি অরোরা ফিল্ম কর-পোরেশনের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

ওরিয়েন্ট পিকচার্স

ওরিয়েন্ট পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন "বিচারক" শীঘ্রই তার ন্যায় নিষ্ঠা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। বিচারক রচনা ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। আমাদের সাংবাদিক বন্ধু অনিল গুপ্তের ওপর বিচারকের চিত্র গ্রহণের ভার ছিল। শব্দ গ্রহণ ও সম্পাদনার ভার ছিল যথাক্রমে সত্যেন ঘোষ ও রাজেন চৌধুরীর ওপর। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অলকা দেবী, ঝরণা দেবী, রাজলক্ষ্মী, কণক ঘোষ, অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, সন্তোষ দাস, দেবীপ্রসাদ, মণি মজুমদার (এঃ), কালীচক্র, বাণীবাবু প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন পূর্ণ মুখোপাধ্যায়। কোয়ালিটি ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে।

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী" রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে চিত্র-রূপায়িত হ'য়ে উঠছে। "দেবী চৌধুরাণী"র নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন জন-প্রিয়া অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী। দেবী চৌধুরাণীর মর্যাদা যাতে কোনমতে অভিনয়ের জন্য ক্ষুণ্ণ না হয়, সেজন্য সর্বদা সতর্ক আছেন বলে শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী আমাদের প্রতিনিধির কাছে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছেন উৎপল সেন, লীলাবতী, সুদীপ্তা নীতীশ, উপেন ও আরো অনেকে। দেবী চৌধুরাণীর আলোক চিত্রগ্রহণ ও সুর সংযোজনা করছেন যথাক্রমে শৈলেন বসু ও কালীপদ সেন। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন সতীশ দাশগুপ্ত। আর সর্ববিষয়ে তদারক কচ্ছেন সর্বজনপ্রিয় মাষ্টার মশায়—রতন বসু মল্লিক মহাশয়।

লক্ষ্মী প্রোডাকসন্স

এঁদের প্রথম বাংলা ছবি 'এ যুগের মেয়ে'র শুভ মহরৎ গত ১০ই মে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন কমল চট্টোপাধ্যায় ও তুষার মিত্র। এঁরা দু'জনেই চিত্র পরিচালক শৈলজানন্দের সহকারীরূপে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। সুর সংযোজনা করবেন গিরীন চক্রবর্তী এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন বিমান, ইন্দু, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভা মুখার্জি, অপর্ণা প্রভৃতি।

কল্প চিত্রমন্দির

এঁদের প্রথম চিত্র "ওরে যাত্রী'র চিত্র গ্রহণের কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন কৃতি চিত্র-সম্পাদক রাজেন চৌধুরী। বর্তমানে তিনি "ওরে যাত্রী'র সম্পাদনা-কার্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন। "ওরে যাত্রী"র কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য। কাহিনীকারকে এই চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। চিত্রখানির সংগীত পরিচালনা করেছেন কালীপদ সেন। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন প্রভা, রেণুকা, নমিতা, অনুভা, প্রীতিধারা, দীপক, উত্তম, জ্যোতি, ডি, জি, নবদ্বীপ, মাষ্টার সত্য, হরিদাস, মাষ্টার লক্ষ্মী, অমল প্রভৃতি আরো অনেকে।

এন, পি, প্রোডাকসন

শ্রীযুক্ত নগেন দাস ও কুন্তুর প্রযোজনায় এঁদের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "অনাগত"র প্রাথমিক কাজ দ্রুত প্রস্তুতির পথে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীবিশু সরকার। সংগীত ও ও ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে মণি দাশগুপ্ত ও কেশব সেন।

কৃষ্ণ প্রডিউসার্স লিঃ

গত ১৯শে মে শ্রীবিজয়সিংহ নাহার সভাপতিত্বে এঁদের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র "বিস্মৃতি"র শুভ মহরৎ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীঅতুল দাশগুপ্ত। কাহিনীটি তাঁরই রচনা।

দেবকুমার কলামন্দির

শ্রীকুমার প্রযোজিত দেবকুমার কলামন্দির-এর প্রথম চিত্র "উদয়াচল" শ্রীকুমার ও অপূর্ব মিত্রের যুগ্ম-পরিচালনায় গৃহীত হবে। গতসংখ্যা রূপ-মঞ্চে এ সম্পর্কে একটু ভুল সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে। বর্তমানে পরিচালকদ্বয় "উদয়াচল"-এর প্রাথমিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। উদয়াচল-এ কয়েকজন নতুনকে গ্রহণ করা হবে—এসম্পর্কে গত সংখ্যা রূপ-মঞ্চে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হ'য়েছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দিয়ে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই যথাসময় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংবাদ পাবেন। সম্প্রতি শ্রীকুমার এবিষয়ে আমাদের অনুরোধ করে চিঠি লিখেছেন, যাতে আবেদনকারীরা উতলা না হন। নবাগতদের ভিতর থেকে ইতিমধ্যেই নন্দিতা দেবী ও প্রতিভা বিশ্বাসকে নির্বাচন করা হ'য়েছে। অন্যান্যদের সম্পর্কে পত্রমারফত যথাসময়ে মতামত জানিয়ে দেওয়া হবে।

গোল্ডেন ফিল্ম ডিসট্রিবিউটস

এঁদের পরিবেশনায় গত ২১শে মে বোসার্ট প্রডাকসনের প্রথম চিত্র 'প্রিয়তমা' একযোগে কলকাতায় বসুশ্রী ও বীণা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, আরতি মজুমদার, অহীন্দ্র চৌধুরী, কানু বন্দোপাধ্যায়, অজিত, ইন্দিরা রায়, তুলসী প্রভৃতি। 'প্রিয়তমা'র সুর সংযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আগামী সংখ্যায় 'প্রিয়তমা'র সমালোচনা প্রকাশ করা হবে।

শুভ-পরিণয়

গত ২শে বৈশাখ নাট্যকার মন্মথ রায়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী জয়ন্তীর শুভ-বিবাহ শ্রীমান সচ্চিদানন্দের সহিত শ্রীযুক্ত রায়ের বিবেকানন্দ রোডস্থিত বাসা বাড়ীতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। এতদুপলক্ষে চিত্র ও নাট্য-জগতের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থেকে নবদম্পতীকে আশীর্বাদ করেন। আমরা এঁদের নব জীবনের শুভ কামনা করি।

রূপ-মঞ্চের লেখক গোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য শ্রী নির্মল চন্দ্র দত্তের শুভ পরিণয় সম্প্রতি টাকী নিবাসী শ্রীযুক্ত অমল কৃষ্ণবসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যা ইলারাণীর সংগে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। আমরা নির্মল বাবুর নবজীবনের শুভ কামনা করি।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বগতঃ অনাদিনাথ বসু মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ অমল কুমার বসু সম্প্রতি গৌরীরাণী দেবীর সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। এতদুপলক্ষে স্বর্গতঃ বসুর কাশীমিত্র-ঘাট ষ্ট্রীটস্থিত নিজস্ব বাড়ীতে এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। চিত্র ও নাট্য-জগতের বহু শিল্পী, সাংবাদিক, প্রযোজক ও কর্মীদের সমাবেশ হয়েছিল। অনাদি বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত বাবু ও কনিষ্ঠ-পুত্র আমাদের সর্বজনপ্রিয় ছোট বাবু অতিথিদের আপ্যায়নে সবসময় সতর্ক ছিলেন। আমরা নবদম্পতীর মধু-জীবনের শুভ কামনা করি।

সাধারণ মেয়ের দৃশ্যপটে

থিয়েটার দেখতে গিয়েছেন—ড্রপ তুলতে দেরী হচ্ছে। যত দেরী হচ্ছে ততই আপনার ধৈর্য থাকছে না।

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী (হাত-কাটা-গেঞ্জী গায়ে) 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রের একটি দৃশ্য সম্বন্ধে ঐ দৃশ্যের শিল্পী পাহাড়ী সান্যাল, শ্রীমতী দীপ্তি রায় ও প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের সংগে আলোচনা করছেন।

★

কি ভাবে দাঁড়ালে ও চলাফেরা করলে কি রকম কম্পোজিসন হয় তা যেন প্রত্যেক ষ্টুডিও দর্শনেচ্ছু মানুষ ফটোগ্রাফারের চোখ নিয়ে দেখতে পেয়েছেন ভেবে আত্মপ্রসাদ বোধ করেন।

রঙ্গালয়ের গ্রীণরুমে শিল্পীদের যেমন আসল থেকে নকলে রূপান্তর গ্রহণের কৌশল দেখে কৌতুক বোধ হয়, তেমনি আবার তাঁদের নিতান্ত ঘরোয়া কথাবার্তায় কিছু অসাধারণত্ব নজরে পড়বেই বলে ধরে নেওয়া হয়। সিনেমা ছবির শিল্পী, পরিচালক ও যন্ত্রীদের নিতান্ত ঘরোয়া পরিচয় পাওয়ার জন্যে সাধারণ মনে ঠিক একই

ছবি দেখতে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হওয়ার পর মেসিন বিকল বা অন্য কোন অবস্থার ফলে ছবি সুরু হতে বিলম্ব ঘটলে যেমন বিরক্ত বোধ হয়, তার চেয়েও বিরক্তিকর হ'ল ছবির স্যুটিং দেখা। থিয়েটারের ড্রপ উঠতে দেরী হ'লে যাঁরা হৈ হৈ করে ওঠেন, সিনেমার ছবি পর্দায় প্রতিফলিত হ'তে বিলম্ব ঘটলে যাঁরা নিজেদের বসবার আসনটি ভেঙ্গেচুরে অধৈর্যের প্রচুর পরিচয় দেন—তাঁরা এই গ্রীষ্মে ষ্টুডিও-সেটের অভ্যন্তরে ছবি তোলা দেখতে গেলে কি যে করবেন জানি না! অথচ মজার ব্যাপার এই যে, সাধারণ মানুষের মনে ষ্টুডিও-এ স্যুটিং দেখতে যাওয়ার একটা অদম্য কৌতূহল ও আগ্রহ থাকে। বিশিষ্ট অভিনেতা, অভিনেত্রীরা ক্যামেরার সামনে

নীরেন লাহিড়ীর তিনজন যোগ্য সহকারী (ডানদিক থেকে) মানু সেন, কচিবাবু ও নারায়ণবাবু চিত্রনাট্য ও continuity sheet মিলিয়ে নিচ্ছেন। এঁদের ভিতর 'এই তো জীবন' এবং 'রাত্রি' ছবির পরিচালকরূপে মানু সেনের সংগে আমাদের পরিচয় ঘটেছে।

রকম একটি কৌতূহল বাসা বাঁধে। ছবি তোলার ব্যাপারটা নিতান্তই টেকনিক্যাল—তার ভেতর যেটুকু আর্ট বা আর্টিষ্টিক তা এমনই বিচ্ছিন্ন ও অস্পষ্ট যে, সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না। গায়ক না হ'লে নানা রাগ রাগিণীর সুরের হেরফের করার কৃতিত্ব ও কারুকার্য বোধগম্য হয় না, শুধু আওয়াজ আর Rythym এর আকর্ষণই শ্রোতাকে ধরে রাখে। তেমনি ষ্টুডিও-এ ছবি তোলার আসল ঘটনার চেয়ে ছবি যাঁরা তোলেন তাঁদের mood টাই উপভোগ্য। যে সেটে সেই mood সৃষ্টি হয় না, সেই সেটে সাধারণ দর্শকের পক্ষে ধৈর্য ধরে বসে থাকা অত্যন্ত কঠিন।

ধরুন কোন সেটে গিয়ে দেখলেন, কতকগুলি Flat দেওয়ালের মত দাঁড় করানো রয়েছে—ক্যামেরাম্যান এবং তাঁর সহকর্মীরা অত্যুগ্র আলোগুলি নিয়ে ব্যতিব্যস্ততার ভাব দেখাচ্ছেন—কখন কখন শোনা যাচ্ছে 'আর একটু আপ' 'পাঁচ নম্বরটা আর একটু ডাউন' 'আর একটু বড় কর' 'হ্যাঁ এইবার টাইট করে দাও' 'মাইক, সরাতে হবে, Shadow পড়ছে', এইভাবে পঁয়তাল্লিশ মিনিট টানাহ্যাঁচড়া করবার পর শিল্পী এসে স্যুটিং-zone-এ গিয়ে দাঁড়ালেন। পরিচালক হাঁকলেন, 'মনিটর, silence'। পরিচালক গিয়ে শিল্পীদের বুঝিয়ে দিলেন শেষ অবধি শিল্পীরা কে কি অবস্থায় থাকবে, কারণ পরের শটের position তিনি এখন থেকে মনে মনে কম্পোজ করে নেবেন। আপনারা এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায় আছেন, ঘর্মাক্ত অবস্থায় বসে বসে ভেবেছেন, এত আয়োজন, এত বিলম্ব, এত হৈ চৈ হাঁকডাক না জানি কতখানি দেখতে পাবেন। নায়িকা হয়তো বললে, বাবা যদি না রাজী হয়, তা'হলে কি হবে? নায়ক কোন কথা বললে না। চিন্তিত ও ব্যথাতুর দৃষ্টিতে নায়িকার দিকে চেয়ে নকল ঘরের নকল জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরিচালক হাঁকলেন, That's all. আপনি হয়তো ভাবলেন,* তোলা হয়ে গেল। কিন্তু না আরও বার

'সাধারণ মেয়ে'র আলোকচিত্রশিল্পী সুহৃদ ঘোষ ওরফে মন্টুবাবু দুপাশে দু'জন সহকারী নিয়ে ক্যামেরা পরিচালনা করছেন।

দুই রিহার্স্যাল দেওয়ার পর ছবি তোলা হ'ল। আবার সেই ক্যামেরাম্যানের পরের শটের তোড়জোড়—যার মানে খুব কম করে হলেও পঁচিশ মিনিট পূর্ব পঁয়তাল্লিশ মিনিটের ধারা অনুযায়ী কিছু সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তি।

ছবি তোলার মাঝে মাঝে এত দীর্ঘ ফাঁকগুলি মনোরম হয়ে উঠতে পারে যদি শিল্পী, কর্মী ও যন্ত্রীরা ভাল mood-এ থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই জিনিষটির অভাব থাকার দরুণ আমরা বাইরে থেকে গিয়ে স্যুটিং দেখার মধ্যে বিশেষ কোন আকর্ষণ খুঁজে পাইনা। বহুদিন থেকে শুনে আসছিলাম পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর সেট সর্বদা এমন জমজমাট হয়ে থাকে যে, স্যুটিং দেখার ক্লান্তি নিকটে ঘেঁষতে পায় না।

শোনা কথা পরখ করবার জন্যে ষ্টুডিও অভিমুখে পাড়ি দিলাম: বেলা আড়াইটা। আমার সংগ নিলেন প্রাইমা ফিল্মসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী মনোরঞ্জন ঘোষের একমাত্র পুত্র শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ এবং প্রচারশিল্পী

শ্রী ফণীন্দ্র পাল। সিনেমা ব্যবসায়ের বর্তমান নানা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করার মাঝখানে হাতীবাগান থেকে টালীগঞ্জের পথের দূরত্ব হ্রাস পেতে লাগল। নিরঞ্জন বাবু অতি অল্পদিন মাত্র প্রাইমা ফিল্মসের অফিসের সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি চিত্র ব্যবসায়ের নানা তথ্য সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। তার ওপর শিক্ষা ও তারুণ্যের জন্যে তাঁর দৃষ্টিভংগী আধুনিক, মন উন্নত ও উদার, চিন্তাশক্তি বলিষ্ঠ। ষ্টুডিও-এ আমার কদাচিৎ যাওয়া ঘটে। সিনেমা ও সিনেমার সম্পর্কিত প্রত্যেকটি লোককেই নিজের আত্মীয় বলে মনে হয়। তাঁরা ষ্টুডিও এর মধ্যে থেকে যে রূপসৃষ্টি করেন, আমরা ছাপাখানার ঘরে বসে সেই সৃষ্টি ও স্রষ্টাদের সম্বন্ধে আপনাদের সব খবর দিই। তাঁরা আমাদের স্বল্প পরিচিত হ'লেও অল্পকালের মধ্যে তাঁদের সংগে আমাদের হৃদ্যতা জমে উঠতে বাধে না।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর শব্দযন্ত্রী জে, ডি, ইরাণী তাঁর সহকারীকে নিয়ে 'সাধারণ মেয়ে'র সেটে মাইক্ স্থাপন করছেন।

ষ্টুডিওর গেটের ভিতর প্রবেশ করার সংগে সংগে নানা জনের সাদর আপ্যায়নে ও আহ্বানে অভ্যর্থিত হলাম। সহাস্যমুখে সকলকে নমস্কার জানাতে জানাতে পৌঁছলাম ভ্যানগার্ড প্রোডাকশনের ঘরে।

দ্বিপ্রাহরিক আহারাদির ব্যাপারে তখন এক ঘণ্টা স্যুটিং বিরতি ছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই প্রায় সমস্বরে সকলে 'আসুন', 'আসুন দাদা', 'আসুন স্যার' বলে আহ্বান করলেন। ঘর একেবারে গুলজার! ঘরে দু'টি টেবিল। একটি টেবিল দখল করে কড়া ইস্ত্রীর পাতলা পাঞ্জাবী পরে বসেছেন শ্যামবাবু অর্থাৎ শ্যাম লাহা ওরফে হুয়া। টেবিলের এক পাশে ছোট একটি স্যুটকেশ, ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাউচার, রসিদ, চেক বই, লেটারহেড, খাম, কল-কার্ড, একটা টাইপ মেসিন। হুয়াবাবু হিসেব লিখছেন এবং মাঝে মাঝে মুখ তুলে হুকুম চালাচ্ছেন: নিমাই, দেখতো সেটে সব জিনিষ ঠিক সাজানো হ'য়েছে কিনা,—এই বিশ্বনাথ, তুই যা দেখে আয় পাহাড়ীবাবুর মেক-আপ শেষ হ'য়েছে কিনা।

আর একটি টেবিলের মধ্যমণি হয়ে বসেছেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, তাঁর একপাশে 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী দীপ্তি রায়। অন্য পাশে অসিতবরণ একটি হিন্দী গান গাইছেন, তবলা হিসাবে টেবিল ঠেকা দিচ্ছেন সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর পাশে বসে গায়ক ও বাদককে তারিফ করছেন রবীন মজুমদার। সামনে দু' সারি সোফায় বসেছিলেন কাহিনী রচয়িতা পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, "ঘরোয়া" চিত্র-পরিচালক মণি ঘোষ, সহকারী পরিচালক নীতীশ রায়, 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রের নায়ক নীতীশ মুখুজ্যে।

প্রচারশিল্পী ফণীন্দ্র পাল দীপ্তি রায়ের সংগে আলাপ করিয়ে দিলেন। শ্রীমতী দীপ্তি 'রূপ-মঞ্চ' পত্রিকার বিশেষ অনুরাগিণী। শ্রীমতী দীপ্তি মাত্র 'স্বয়ং সিদ্ধা' চিত্রে যে সুনাম অর্জন করেছেন, তা অনেক নাম-করা শিল্পীর ঈর্ষার বিষয়। কিন্তু দেখলাম অনেক নাম-করা অভিনেত্রীর মত তিনি এখনও খ্যাতির মোহে প্রভাবান্বিত হ'ন নি। অহংকারীর একটি বিচ্ছিন্ন ভাব দেখাতে এখনও পটু হ'য়ে ওঠেন নি

তাঁর সারল্য ও ছেলেমানুষী চাঞ্চল্য বেশ লাগল—তা যেমন সহজ, তেমনি অকপট।

ভ্যানগার্ডের ঘরে একটু বসলেই অনায়াসে বোঝা যায়, এঁদের ইউনিটের পরস্পরের মধ্যে যেমন একটা গভীর প্রীতি আছে, তেমনি ষ্টুডিওর যে কোন কর্মী, শিল্পী বা অন্য প্রযোজক, পরিচালক, প্রডিউসার্সের সংগে এঁরা সদ্ব্যবহারের হৃদ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ। অন্য ফ্লোরে যে সব ছবির কাজ হচ্ছে তার শিল্পী ও টেক্‌নিসিয়ানরা একটু অবসর পেলেই ভ্যানগার্ডের ঘরে এসে আসরে যোগদান করেন। কোন টেক্‌নিসিয়ান বা শিল্পী কোন সমস্যায় পড়লে নীরেন লাহিড়ীর পরামর্শ নিয়ে যান।

ব'সে আছি এমন সময় পাশে একটি বৃদ্ধের গলা শোনা গেল, কি ভায়া কখন এলে ?

মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলাম—মাথার সব চুল সাদা হয়ে গেছে, গোঁফটিও সাদা, সামনের দাঁতগুলির মাঝখানে কয়েকটি নেই। চোখে সুতোয় বাঁধা ভাঙা চশমাটি বারবার নাকের নীচের দিকে নেমে আসছে। পরণের কালিঝুলি মাখা ছেঁড়া পেন্ট্‌লুনটিকে মাঝে মাঝে টেনে তুলে কোমরে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস করছে। গায়ের জামা ও ওভারকোটটি ছিন্ন ও মলিন।

মুখটি নিতান্ত পরিচিত কিন্তু তবু যেন তাঁর নাম ধরে ডাকতে একটু সংকোচ হচ্ছে। বেণুবাবু অর্থাৎ নীরেন লাহিড়ী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ে বললেন, পাহাড়ী চল, চল আর এখানে নয়, সেটে যাই। তিনি আমাদের সেটে যাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। তা'হলে ভুল করিনি, বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হচ্ছেন রূপসজ্জায় পাহাড়ী সান্যাল। এমন আত্মভোলা মিষ্টি হাসি আর কার আছে!

সেটে প্রবেশ করে দেখা গেল সব ঠিক ঠাক আছে। ক্যামেরাম্যান সুহৃদ ঘোষ (মন্টুবাবু) ক্যামেরা ট্রাকের ওপর বসে হাকলেন, লাইটস। হাজার হাজার বৈদ্যুতিক আলোর তীব্রতা সেটটিকে ছেয়ে ফেল্‌ল। শব্দযন্ত্রী জে. ডি. ইরাণী এসে মাইক ঠিক আছে কিনা দেখে গেল। পরিচালক নির্দেশ দিলেন, সেটের সব পাখা বন্ধ করে দিতে।

হাজারো বাতির ঔজ্জ্বল্য ও তীব্রতায় চারিদিক বন্ধ ফ্লোরের পাখাহীন আবহাওয়া প্রায় অসহ্য হয়ে উঠল। মনে করেছিলাম, এক ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে পড়ি; দরকার নেই স্যুটিং দেখে—পুরো ছবিটাই কোন প্রেক্ষাগৃহের পাখার তলায় বসে দেখা যাবে। এমন সময় বেণু বাবু বললেন, মণিটর। পাহাড়ী সান্যাল ও শ্রীমতী দীপ্তি সংগে সংগে কথা বলতে সুরু করলেন। অপূর্ব অদ্ভুত অভিনয়, তাঁদের সেই অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে দেখলাম। দীর্ঘ শট্। সেটের কোন লোকের যেন নিঃশ্বাস পড়ছেনা। মনে রইলনা গরমের কথা, ভুলে গেলাম পাশে কে কে দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল না ছবির স্যুটিং দেখছি। দুজনেই এত সহজ ও স্বাভাবিক অথচ তাঁদের অভিনীত চরিত্র বৈশিষ্ট্য মুখে চোখে কথায়ও হাবভাবে সুপরিস্ফুট।

(আগামীবারে সমাপ্য)

ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ

সামান্য একজন অবিবেচক পরিদর্শকের অবিবেচনা-প্রসূত রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাঁদের সিডিউল্ড তালিকা থেকে ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ এর নাম কেটে দেয়, তারই সুযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্বার্থান্বেষীরা শুধু ব্যাঙ্ক অফ্-কমার্সের উপরই নয়, সমস্ত বাঙালী ব্যাঙ্ক গুলির বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে সুরু করে এবং কতকাংশে সাফল্যলাভও করে। এই প্রচার কার্যের বিরুদ্ধে আমরা সমস্ত বাঙালী জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। তাঁরা যদি স্বার্থান্বেষীদের হাতের ক্রীড়নক হ'য়ে ওঠেন, তবে ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর কোন অস্তিত্বই থাকবে না। সিডিউলড্ ব্যাঙ্ক গুলিকে সংকটের সময় সাহায্য করবার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোন মতেই অস্বীকার করতে পারে না—অথচ ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্স লিঃ-এর ক্ষেত্রে তাঁর সে দায়িত্ব পালনের কোন প্রমাণই পাওয়া যায়নি। তাই তাঁর এই কাজের আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ব্যাঙ্ক অফ্ কমার্সের ওপরে আমাদের আনুগত্য স্বীকার করে সমস্ত বাঙালী ব্যাঙ্ক গুলির প্রতিই বাঙালী জনসাধারণকে আস্থাভাজন হতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক : "রূপ-মঞ্চ"

শ্রীমতী কাননদেবী——

এম, পি, প্রভাকসনের মুক্তি-প্রতীক্ষিত

• হেমচন্দ্র পরিচালিত নিউথিয়েটার্স লিমিটেডের প্রতিবাদ চিত্রে **পূর্ণেন্দু ও সুমিত্রা দেবী**

জ্যৈষ্ঠ
১৩৫৫
★

রূপ-মঞ্চ

অষ্টম-বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
★

সেন্সার বোর্ড

ভারতের রাষ্ট্রনায়ক বাংলার গৌরব—নির্যাতিতের পরম বন্ধু স্বর্গত দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস একদিন পরম বেদনার সংগেই বলেছিলেন, "ঘরের ইন্দুরে বাঁধ কাটলে—ঘর সামলানো দায়—পরাধীন জাতির সব চেয়ে বড় অভিশাপ, নিজের দেশের এই ইন্দুরের দল।" দেশবন্ধুর উক্তিকে হুবহু উদ্ধৃত না করতে পারলেও, তার ভাবার্থ এই ছিল। বৈদেশিক সরকারের আওতায় যারা কতকটা সোনা মেলা বাঁধ দিয়ে চলাফেরা করতো—তাই তাদের চিনতে পারতাম এবং তাদের জব্দ করেই আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করবার পর আমরা বুঝতে পাচ্ছি, ইন্দুরের দলকেত আমরা ধ্বংস করতে পারিনি। সাময়িক ভাবে হয়ত তাদের নিস্তেজ করতে পেরেছিলাম—তাদের বংশ নাশ করতে পারিনি। নইলে কিছুদিন পূর্বেও প্লেগের ভিড়িতে আমাদের নাগরিক জীবন অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল কেন? রাস্তা ঘাটে—নর্দমায়—বাড়ীতে—আবর্জনার স্তূপে ডি, ডি, টি ও অন্যান্য বীজনাশক দ্রব্যাদি ছড়িয়ে জাত-ইন্দুর গুলিকে ধ্বংস করতে কতকটা আমরা সফলকাম হ'য়েছি ইন্দুর বংশ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না হ'লেও কতকাংশে যে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হ'য়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিছুদিন পূর্বেকার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির পাতা উলটে গেলেই ইন্দুরদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তির কথা বড় বড় হরফে আমাদের চোখে পড়বে। তা ছাড়া প্লেগের ভিড়িকও বন্ধ হ'য়ে গেছে। তাই সম্পূর্ণ না হ'লেও সাময়িক কৃতকার্যতা আমরা যে অর্জন করেছি—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং ডি, ডি, টি ও অন্যান্য সংক্রামক নাশক দ্রব্যাদি যে এ বিষয়ে কার্যকরী হ'য়েছে তাও অস্বীকার করতে পারবো না। এত গেল জাত ইন্দুরদের কথা। আবার তারা উপদ্রব সুরু করলে আমরা নয় আবার ঐ ইন্দুর নাশক দ্রব্যাদি প্রয়োগ করবো কিন্তু বে-জাত ইন্দুরদের জন্য আমাদের জীবন যে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—সে অসহ্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা যদি গবেষণালব্ধ প্রতিষেধক কিছু জাতিকে উপহার না দেন, তবে জাতটা যে যেতে বসেছে—এই যাওয়া থেকে তাকে কে রক্ষা করবে? পরাধীনতার সময়ও এই বে-জাত ইন্দুরের দল আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে বারবার রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগে যাঁরা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরাই তার সাক্ষ্য দেবেন—তাছাড়া দেশবন্ধুর সখেদ উক্তিই এর সপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনের পরও এই বে-জাত ইন্দুরের দল যেভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, তাতে দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, তাকে বজায় রাখাই যে আর এক সমস্যা হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এরা আমাদের জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতির পথকে এমনিভাবে রুদ্ধ করে দাঁড়াচ্ছে যে, যে পরিকল্পনা নিয়ে স্বাধীনতার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি—সে পরিকল্পনা কোনমতেই সুষ্ঠু রূপ নিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পাচ্ছে না। আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধুত সাদা-চামড়ার অপসারণের দাবীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না—

আমাদের সংগ্রাম বৈদেশিক শক্তির হাত থেকে দেশকে মুক্ত করে—সর্বপ্রকার কায়েমী স্বার্থের মূলে আঘাতহানার আদর্শ নিয়েই যে গড়ে উঠেছিল! বৈদেশিক শাসক ও শোষণের হাত থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে দেশীয় শোষকের কবলে দেশ ও দেশবাসীকে তুলে দিতে আমরা চাইনি। আমরা চেয়েছিলাম, সর্বপ্রকার শোষণের কবল থেকে দেশ ও দেশবাসীকে মুক্তি দিতে। চেয়েছিলাম, দেশের বুক থেকে সর্বপ্রকার দুর্নীতি দূর করে দেশ ও জাতিকে নতুন ছাঁচে ভারতের কৃষ্টি-সভ্যতা ও ঐতিহ্যের আদর্শে রূপান্তরিত করতে। যেখানে থাকবেনা কোন হানাহানি—ব্যক্তিগত স্বার্থ যেখানে মাথা উচিয়ে উঠতে পারবে না—এক সুস্থ ও সবল জাতি গড়ে উঠে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য দেশের বিস্ময় জাগাবে। 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' দেশের কবির এই শাশ্বত বাণীকেই যে আমরা রূপ দিতে চেয়েছিলাম জাতির ভিতর দিয়ে! কিন্তু স্বাধীনতা অর্জন করবার পর আমাদের সে আদর্শ যে আজ ধূলায় লুটিয়ে যেতে বসেছে। দেশবন্ধু আজ অমৃতলোকে বিরাজ করছেন—তাঁর নাগাল পাওয়া দায়—পেলে বলতাম—তোমার উক্তিকে একটু সংশোধন করে নিতে হবে। শুধু পরাধীন জাতির পক্ষেই বে-জাত ইন্দুরের দল অভিশাপ নয়—স্বাধীন জাতির পক্ষেও তারাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগ থেকে যে সব পথদ্রষ্টাদের আমরা আমাদের সংগ্রামের পুরোভাগে পেয়েছিলাম—তাঁদের যাঁরা আজ অমৃতলোকে অবস্থান করছেন—সেখানে যেয়ে তাঁরা হয়ত একই স্থানে আস্তানা পেতেছেন (কারণ এ-লোকে তাঁরা একই পথের পথিক ছিলেন—তাই অমৃতলোকে যেয়েও এক সংগে বিরাজ করছেন এ ধারণা আমরা করতে পারি)। তাঁদের সকলের কাছেই আমাদের অনুরোধ, তাঁরা যেন ইন্দুরের রক্ষক সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের কাছে আবেদন জানান যাতে, তাঁর জাত ইন্দুরগুলোকে আমদের এই মর্তলোকে পাঠিয়ে দেন বে-জাত ইন্দুর গুলিকে চিনিয়ে দেবার জন্য। তাদের আগমনের সংগে সংগে আবার যদি প্লেগের হিড়িক হয়—তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কারণ ডি, ডি, টি ছিটিয়ে প্লেগকে আমরা উপশম করতে পারবো। আর নেহাৎই যদি দু'পাঁচ শত লোক প্লেগে মরে যায়, ত যাক—সে ক্ষতি আমাদের সইবে। অন্ততঃ সমস্ত জাতটাত অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে! জাত-ইন্দুরগুলোর জন্য বে-জাত গুলোকে আমরা পৃথক করে চিনে নিতে পারবো—তাতে আমাদের চলাও সহজ হ'য়ে উঠবে।

নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকার আজ এই বে-জাত ইন্দুরদের জন্যই কোন পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করে তুলতে পাচ্ছেনা—এরা আত্মগোপন করে মিশে আছে সরকারী দপ্তরখানায়—আমাদের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনে। তাই যখনই মহত্তর কোন কিছু আমরা গড়ে তুলতে অগ্রসর হই—আমাদের সমস্ত চিন্তা ধারা ও কর্ম-পরিকল্পনাকে এরা পেছন থেকে কুটুর কুটুর করে কেটে টুকরো টুকরো করে দেয়। নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অতীতের স্বার্থপরতার কাঠামোটী যাতে বজায় থাকে, এরা সেদিকেই যত্নবান—জাতীয় সরকারের প্রতি আনুগত্যের মুখোস পরে এরা এমনি ভাবে সমস্ত পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিচ্ছে। বিদেশী আমলাতান্ত্রিক সরকারের আমলে শাসন ব্যবস্থার যে কাঠামো ছিল, আজও তার কোন পরিবর্তন হ'লো না। তাই বলছিলাম, এই বে-জাত ইন্দুরগুলোকে তাড়াতে হবে।

দেশের পুনর্গঠনে জাতীয় সরকারকে ঠিক পথে পরিচালনা করবার দায়িত্ব দেশবাসী অস্বীকার করতে পারেন না। যে সরকার তাঁদেরই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার জোরে দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন—তাঁদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবার দায়িত্বও যেমনি দেশবাসীর রয়েছে—তেমনি জনমতকে অস্বীকার করে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় সরকার কোন মতেই চলতে পারেন না। কিন্তু আজ জনমতকে নানা ক্ষেত্রে উপেক্ষা করা হচ্ছে বলেই আমাদের পরম বেদনার সংগে কতগুলি রূঢ় সত্য কথা বলতে হচ্ছে এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি এদিকে আমরা আকর্ষণ করতে চাইছি।

আমাদের বর্তমানের অভিযোগ বাংলার বর্তমান সেন্সার

বোর্ডের বিরুদ্ধে। গত সংখ্যার রূপ-মঞ্চেও এ বিষয়ে একটু আভাষ দিয়েছি। কিন্তু সেন্সার বোর্ডের বিরুদ্ধে দিন দিন যেভাবে অভিযোগ এসে আমাদের দপ্তরে স্তূপীকৃত হচ্ছে—তাতে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার যদি সচেতন না হয়ে ওঠেন, তাহলে এদের স্বেচ্ছাচারিতা চিত্রজগতকে যে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সেকথা চিন্তা করে আমরা শিউরে উঠছি। জাতীয় সরকার যদি এই স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবার জন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন—বর্তমান সেন্সার বোর্ডের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিক্ষুব্ধ জনমত যখন সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে দাঁড়াবে, তখন তার কাছে নতি স্বীকার করতে সরকার বাধ্য হবেন। কিন্তু এই সময়ের ব্যবধানে বাংলার চিত্র ও নাট্যজগতে স্বেচ্ছাচারিতার যে তাণ্ডব নর্তন চলবে, তাতে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্র অনেকখানি পেছিয়ে পড়বে। তাই পূর্বে থেকেই সরকারকে অবহিত হ'য়ে উঠতে হবে।

বৃটিশ আমলে এই সেন্সার বোর্ড নানাভাবে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। সেন্সারবোর্ডের তখনও যে কাঠামো ছিল—আজও তা বিদ্যমান। তখনও যেসব অক্ষমদের দৌরাত্ম্য আমাদের সহ্য করতে হ'য়েছে—আজও তা থেকে রেহাই পেলাম না। বর্তমান সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের নাম ইতিপূর্বেকার রূপ-মঞ্চের এক সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছিল। পাঠকসাধারণের সুবিধার্থে এখানে আবার নামগুলি আমরা প্রকাশ কচ্ছি। (১) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার, সভাপতি (পদাধিকার বলে)। ২। পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম এলাকার হেড কোয়ার্টার্স কর্তৃক মনোনীত এক ব্যক্তি। ৩। পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে)। ৪। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে)। ৫। জনাব মোহাম্মদ রফিক। ৬। ডক্টর প্রতুল গুপ্ত। ৭। মিঃ জে, সি, গুপ্ত। ৮। জনাব ই, এস, এম, আয়ুব। ৯। শ্রীযুক্তা নীতা চৌধুরী। সভ্যদের কারো পেছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী দেওয়া হয়েছে, কারো পেছনে দেওয়া হ'য়েছে আইন পরিষদের ছাপ। কোন একখানি চিত্রকে বিচার করে ছাড়পত্র দেবার এই কী এঁদের যোগ্যতা! পূর্বেকার অর্থাৎ বৃটিশ আমলের সেন্সার বোর্ডের সভ্যদের তালিকা দেখলে অতি সহজেই চোখে পড়বে যে, কাঠামোর একটুকুও পরিবর্তন হয়নি। রামের স্থানে যদুকে নেওয়া হ'য়েছে মাত্র। রামেরও যেমনি চিত্রজগত সম্পর্কে কোন কিছু বলবার অধিকার ছিলনা—যদুরও তেমনি নেই! তাই কাঠামোটি ঠিকই আছে ছাড়া আর কী বলবো! আবার সম্প্রতি সংবাদ পেলাম, আর্যস্থান ইনস্যুরেন্স কম্পানীর শ্রীযুক্ত এস, সি, রায়কেও নাকি গ্রহণ করা হ'য়েছে এবং তিনি নাকি সেন্সারবোর্ডের নীতি সম্পর্কিত একটী পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেছেন! সংবাদটি যদি সত্য হয়, তাহলেত সোনায় সোহাগা! আসছে কাল যদি শুনতে পাই, কলুর এক বলদকেও সেন্সারবোর্ডে গ্রহণ করা হ'য়েছে, তাতেও আশ্চর্য হবোনা! কারণ, সেওত কোন বিশেষ কার্যে নিজ অধ্যাবসায়ের দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে! সেন্সারবোর্ডের বর্তমানকালীন সভ্যদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কোন আক্রোশ নেই বা যে সব বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে তাঁরা জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন—তাতে বিন্দুমাত্রও আমাদের সন্দেহ নেই। আমরাও তাঁদের সে নিষ্ঠাকে পরম শ্রদ্ধার সংগেই স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু তাই বলে চিত্রজগত সম্পর্কে তাঁদের কোন কিছু বলবার অধিকারকে মেনে নেবো কেন? বৈদেশিক সরকারের আমলে এমনি অযোগ্যদের বোঝা বইতে বইতে কাঁধে যে ব্যথা হ'য়েছিল, আজও তা সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। দেশীয় সরকারের আমলে আর ঘানি বইবো কেন? সেন্সার বোর্ডের কর্তারা বলতে পারেন, আমাদের যোগ্যতা রয়েছে বৈকী? তার উত্তরে তাহলে পরম বিনয়ের সংগেই বলবো, সে যোগ্যতাকে আমরা একটু পরিমাপ করে দেখতে চাই। তাঁরা যদি প্রস্তুত থাকেন, আমাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বানে সাড়া দিন—নইলে আত্মসম্মান নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়ুন। সরকারী প্রতিনিধিরা ছাড়া সেন্সারবোর্ডের সভ্যরূপে আমরা তাঁদেরই দেখতে চাই—দেশের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যাঁদের গবেষণা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পেয়েছি—চিত্রজগত সম্পর্কে যাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আমাদের শ্রদ্ধার্জন

করেছে—নাট্য-কলা ও অভিনয়ের সেবায় দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা আত্মনিয়োগ করে আসছেন --চিত্র ও নাট্যকলার সুষ্ঠু রূপদানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের যাঁরা সুচিন্তিত নির্দেশ দিতে পারবেন। যান্ত্রিক কলা-কুশলতার কথাও যাঁদের অজানা নয়। তাঁদেরই আমরা দেখতে চাই সেন্সারবোর্ডের সভ্য-রূপে। বর্তমানের ব্যক্তিগত খুশী অখুশীর উপর চিত্র শিল্পের ভাগ্যকে আমরা ছেড়ে দিতে রাজী নই। কোন একটী চিত্রের কোন একটি দৃশ্য কোন একজন সভ্যকে খুশী করলো কী না করলো—এই খুশী ও অখুশীর ওপরই চিত্রখানির ছাড়পত্র প্রাপ্তি বর্তমানে নির্ভর কচ্ছে। খুশী না করলে অমনি সেই দৃশ্যটীকে কেটে বাদ দেবার হুকুম জারি হ'লো—অথচ সভ্যরা এটুকু তলিয়ে দেখলেন না যে, ঐ একটি দৃশ্যের সংগে সমগ্র চিত্রখানির সম্পর্ক কতটুকু আছে না আছে। এ বিচার শক্তি যদি তাঁদের থাকতো, তা'হলে অর্বাচীনের মত এরূপ হুকুম জারি থেকে তাঁরা নিবৃত্ত থাকতেন। সেন্সারবোর্ডের এই স্বেচ্ছাচারিতার প্রমাণ তাঁদের ছাড়পত্র নিয়ে মুক্তি প্রাপ্ত ছবিগুলির ভিতরই রয়েছে। এমন দৃশ্য--এমন চরিত্র—এমন সংলাপ তাঁরা অনুমোদন করে থাকেন যা সমাজসচেতনশীল একজন সাধারণ দর্শককেও পীড়া দেয় আর সেন্সারবোর্ডের সভ্যদের পুরু চোখের পরদায় ধরা পড়ে না। অথচ তাঁদের হুকুম জারি হ'লো এমন দৃশ্যের ওপর, যে দৃশ্য চিত্রখানির মর্যাদাও যেমনি বৃদ্ধি করতো—উপপাদ্য বিষয়কে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করতেও সাহায্য করতো! তাই তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণের সপক্ষে তাঁরা কী নিদর্শন দেখাবেন? কিছুই দেখাতে পারবেন না। আজ সেন্সারবোর্ডকে নিছক ছাড়পত্র-প্রদানকারী রূপে থাকলেই চলবে না। চিত্রজগতের উন্নতিতে তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে—কী দেওয়া চলবে না—এই টুকুই বলে তাঁদের দায়িত্ব শেষ হবে না। কী দিলে ভাল হ'তে পারে, সেটুকু বলে তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে। যেটুকু দিলে ভাল হ'তে পারে, সেটুকু দিতে যেয়ে কর্তৃপক্ষ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবেন—সে সমস্যা সমাধানেও তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে হবে। এই সাহায্য তাঁরাই করতে পারবেন, দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা চিত্রশিল্পের সংগে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন বা এর উন্নতির জন্য চিন্তা করে আসছেন। চিত্র ও নাট্যজগতের সেই সব দরদী বন্ধুদের নিয়েই আজ সেন্সারবোর্ডটি তৈরী করে নিতে হবে। তাই বলছিলাম, বর্তমানের কাঠামোর পরিবর্তনই আবশ্যক, ব্যক্তিবিশেষের রদবদল দ্বারা কোন সুরাহা হবে না। প্রশ্ন উঠতে পারে, সে সব যোগ্য ব্যক্তি কোথায়? যোগ্য ব্যক্তিদের অভাব নেই ব'লেই তো অযোগ্যদের অপসারণের দাবী জানাচ্ছি। তাঁদের নামোল্লেখ করবার পূর্বে কাঠামোটিকে কী ভাবে গড়ে তুলতে হবে সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিচ্ছি। পদাধিকার বলে যে সব সরকারী প্রতিনিধি আছেন তাঁরা থাকুন, (যদিও আজ তাঁদের থাকবার কোন প্রয়োজন নেই) তাছাড়া যাঁদের রাখতে হবে, তাঁদের কথা বলছি। (১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন দায়িত্বশীল প্রতিনিধি—যিনি কংগ্রেসের আদর্শ যাতে কোন চিত্রে বা নাট্যে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। (২) শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত একজন বে-সরকারী শিক্ষাবিদ্। কোন চিত্র অপ্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী কিনা সে বিষয়ে বিচার করবার ভার থাকবে এঁর ওপর। ছাড়পত্র দেবার সময়—অপ্রাপ্তবয়স্কদের পক্ষে চিত্রখানি ক্ষতিকর হ'লে, ছাড়পত্রে সে বিষয়ে উল্লেখ করে দেওয়া হবে এবং সংবাদপত্র মারফৎ প্রচার করা হবে যে, কেবল মাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যই চিত্রখানি প্রদর্শিত হ'তে পারে। তা'ছাড়া কোন চিত্রের শিক্ষনীয় বিষয়টিতে কোন গলদ থাকলে, তিনি সে বিষয়ে অন্যান্য সভ্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং কর্তৃপক্ষকে তা শুধরে নিতে সাহায্য করবেন। (৩) বঙ্গীয় প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একজন সভ্য—যিনি প্রযোজকদের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করে তুলবেন। সভ্যেরা হয়ত কোন চিত্রের এমন দৃশ্য সম্পর্কে আপত্তি তুললেন—কার্যক্ষেত্রে যা বাতিল করতে গেলে নানান অসুবিধার সৃষ্টি হবে এবং ঐ দৃশ্য পুনরায় গ্রহণ করতে হ'লে কী ভাবে নেওয়া যাবে, সে সম্পর্কে বোর্ডকে পরামর্শ দেবেন (৪) বঙ্গীয় চলচ্চিত্র
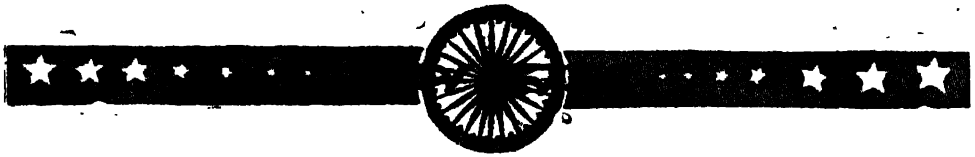
সাংবাদিক সংঘের একজন প্রতিনিধি—সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে যিনি ছবিকে বিচার করবেন। (৫) বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির একজন প্রতিনিধি—দর্শক সাধারণের স্বার্থকে যিনি তুলে ধরবেন বোর্ডের কাছে। (৬) একজন যন্ত্রবিদ্। (৭) একজন চিত্রশিল্পী। (৮) একজন ঐতিহাসিক—ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিও যেমনি দৃষ্টি রাখবেন, তেমনি সময়ের ভিত্তিতে দৃশ্যসজ্জা ও সাজসজ্জার দিকেও তাঁর লক্ষ্য রাখতে হবে। (৯) একজন সংগীত বিশারদ্—কোন সুরের বিকৃতি ঘটলে তিনি সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। (১০) একজন সাহিত্যিক বা নাট্যকার। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যিকদের কোন রচনার যাতে বিকৃতি না ঘটে, সাহিত্য অথবা সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কোন ভুল তথ্য যাতে না থাকে এবং কোন সাহিত্যিকের রচনার চৌর্যবৃত্তি না ঘটে, মূলতঃ তিনি সেদিকেই লক্ষ্য রাখবেন। (১১) অভিনয়ের দিক বিচার করবার জন্য থাকবেন একজন অভিনয়বোদ্ধা। এরই ওপর ভিত্তি করে সেন্সার বোর্ডটিকে গড়ে তুলতে হবে। যাঁরা শুধু ছাড়পত্র দিয়েই খালাস হবেন না, মূলতঃ চিত্র ও নাট্যের মান বৃদ্ধির জন্যও যাঁদের প্রত্যক্ষ ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এই দায়িত্ব সমাধান করতে হলে সভ্যদের প্রচুর সময় এজন্য ব্যয় করতে হবে। তাই, যাঁদের প্রচুর অবসর আছে অথবা যাঁরা শিল্পজগতের সংগেই জড়িত আছেন—তাঁরাই এই কর্তব্য সম্পাদনে সক্ষম হবেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার জন্য এতটা ঝকমারী কেন তাঁরা গ্রহণ করবেন? এইজন্যই বলেছি, কেবল মাত্র শিল্প জগতের পরম দরদশীলদের কাছ থেকেই এতটা ঝুকি গ্রহণের আশা করা যেতে পারে এবং তাঁরা এ-বিষয়ে আন্তরিকতার পরিচয় দিতে বিন্দুমাত্রও কার্পণ্য করবেন না। কারণ, তাঁদের আমরা জানি এবং চিনি। বহুদিন থেকে তাঁদের দেখে আসছি। সরকার যদি আমাদের এই আশ্বাসে আস্থা স্থাপন করতে না পারেন, তাহ'লে বলবো, বেশ, সরকারী প্রতিনিধি ছাড়া যাঁরা থাকবেন—তাঁদের জন্য নয় মাসে একটা ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়া হউক। বে-সরকারী সভ্যদের জন্য জন প্রতি যদি একশত টাকা করেও নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাতে মাসে দেড় হাজার টাকার বেশী ব্যয়িত হবে না। একটা শিল্পের উন্নতিতে এই সামান্য অর্থও কী সরকার ব্যয় করতে কুণ্ঠিত? যদি সরকারী তহবিল থেকে এই অর্থ ব্যয় করতে সরকার কুণ্ঠিতই হন, তবে চিত্র শিল্পের ওপরই এই ব্যয়ভার তাঁরা চাপিয়ে দিন—তাও আমরা বহন করতে রাজী আছি। প্রতি ছবি পিছু একটা হার নির্ধারণ করে দেওয়া হউক এবং প্রতি ছবি থেকে প্রাপ্ত অর্থ নিয়ে পৃথক একটি তহবিল এজন্য গড়ে তোলা হউক।

বর্তমানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সেন্সার বোর্ড ছবি দেখে থাকেন, সে পদ্ধতিরও পরিবর্তন আবশ্যক। চিত্রগ্রহণ ও আনুসংগিক কার্য সম্পাদিত হবার পর মুক্তির জন্য প্রস্তুত হ'য়েই কোন চিত্র সেন্সারবোর্ডকে দেখানো হ'য়ে থাকে। তাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের অসুবিধা থেকে যায়। তাই, চিত্রমুক্তির অন্ততঃ একমাস পূর্বে চিত্রখানি সেন্সার বোর্ডের দেখা উচিত এবং চিত্রগ্রহণের কার্য শেষ হলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য ছবিখানি যেমন দেখে থাকেন, তেমনি ভাবেই সেন্সার বোর্ডকে দেখাতে হবে। এই অবস্থায় সেন্সার বোর্ড ছবিখানি দেখে যদি কোন পরিবর্তন অথবা পরিবর্ধনের নির্দেশ দেন—সেগুলি পালন করে চিত্রখানিকে মুক্তির উপযোগী করে নিয়ে মুক্তির অব্যবহিত পূর্বে আবার বোর্ডকে ছবিখানি দেখিয়ে ছাড়পত্র নিতে হবে। তা ছাড়া কোন প্রযোজক যখনই কোন একখানি চিত্র নির্মাণের জন্য অগ্রসর হবেন, সেন্সার-বোর্ডের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ সভ্যদের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ নিতে থাকবেন। বর্তমানে চিত্রনাট্য পূর্বে থেকে অনুমোদন করে নেবার যে আইন জারি করা হয়েছে—আমরা তারও বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এই ভাবে অনুমোদন করার কোন অর্থই হয়না। এতে বরং দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারীকে কিছু রজত মুদ্রার দ্বারা খুশী করলেই প্রযোজকেরা কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন। আর চিত্রনাট্যটি এমনই জটিল বিষয় যে, সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী তা নিয়ে মাথা

মৃণ্ময়ী পিকচাসের 'স্বর্ণসীতা' চিত্রে

গীতশ্রী ও রাধামোহন ———

— উপরে —

কল্প চিত্র মন্দির-এর 'ওরে যাত্রী'র একটী দৃশ্যে দীপক ও অনুভা যথাক্রমে শেখর ও শতদলের ভূমিকায়।

— নীচে —

কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য ও জ্যোতি মজুমদারকে দেখা যাচ্ছে রাজকুমার ও চন্দ্রনাথের ভূমিকায়। 'ওরে যাত্রী' পরিচালনা করেছেন কৃতি চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরী——

ঘামাতে বেশ ঘেমে উঠবেন, তা ছাড়া এতই পরিশ্রম সাপেক্ষ যে, তিনি শেষে দু'একবার চিত্রনাট্যের খাতাটার দু'একটা পাতা উলটেই অনুমোদন করতে বাধ্য হবেন।

এবার আমরা এমন কয়েকজন সুধীব্যক্তির নাম কচ্ছি, যাঁদের নিয়ে অথবা যাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে সেন্সার বোর্ড গড়ে তুললে সত্যিকারের কাজ হবে। এঁদের ভিতর নাম করা যেতে পারে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, যামিনীকান্ত সেন, হেমেন্দ্রকুমার রায়, অধ্যাপক মাখনলাল চৌধুরী শাস্ত্রী, জনাব রেজায়ুল করিম, অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ বসু, নিরুপমা-দেবী, অতুল চট্টোপাধ্যায় (নিউথিয়েটার্সের শব্দযন্ত্রী) নিরঞ্জন পাল (যাঁকে চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরূপেও বাংলা সরকার স্থায়ী ভাবে গ্রহণ করতে পারেন), প্রমথেশ-বড়ুয়া, বীরেন্দ্রনাথ সরকার, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রতুল গুপ্ত অথবা অতুল গুপ্ত, ডাঃ কালিদাস নাগ ডাঃ ডি, এন, মৈত্র, বনফুল, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, অজিত সেন (চিত্রশিল্পী), অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র-কিশোর আচার্যচৌধুরী, শান্তিদেব ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, সরযূ দেবী, নরেশ মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (যাঁকে বাংলা সরকার বম্বে থেকে স্থায়ী ভাবে বাংলায় আনিয়ে নিতে পারেন) শিশির মল্লিক. ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়—প্রভৃতি আরো কতজনেরই ত নাম করা যেতে পারে।

আশাকরি প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে উদ্যোগী হয়ে উঠবেন।

পাকিস্থানে ফিল্মের উপর আমদানী-শুল্ক হ্রাস

করাচী ২৮শে মে, ইউনাইটেড প্রেসের একটী সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি পাকিস্থান সরকার চলচ্চিত্রের ওপর ফিট প্রতি দু'আনা হারে যে আমদানী শুল্ক ধার্য করে দিয়েছিলেন—তা হ্রাস করে নিয়েছেন। চলচ্চিত্রের ওপর অত্যধিক হারে শুল্ক ধার্যের জন্ম পাকিস্থানের চলচ্চিত্র ব্যবসায় বিরাট এক সংকটের সম্মুখীন হয়। পূর্ববঙ্গের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের এক প্রতিনিধি দল পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারকে সমস্যাটির গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করে এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান। পাকিস্থান সরকার বিষয়টিকে সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করে ফিট প্রতি দু'আনা হারে নির্ধারিত শুল্ক হ্রাস করে বর্তমানে দু'পয়সায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পাকিস্থান সরকারের এই সময়োপযোগী বিবেচনার জন্ম আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু এই হার হ্রাসেও সমস্যাটির সমাধান হবে কিনা সে বিষয়ে আমরা চিন্তিত আছি। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে যা সংবাদ পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, এই আমদানী শুল্ক সম্পূর্ণরূপে রহিত না করে দিলে সমস্যার সমাধান হতে পারেনা। এবিষয়ে সংশ্লিষ্টদের অভিমত নিয়ে প্রথমে আলোচনা কচ্ছি। তাঁরা বলেন, এগারো হাজার ফিটের একখানি ছবি পাকিস্থানে প্রদর্শনের জন্ম পাঠাতে গেলে এই দু'পয়সা হারে শুল্ক দিলেও প্রথম দফায় লাগবে ৩১৮৸০ আনা। অনেক সময় বিভিন্ন স্থানের প্রেক্ষাগৃহে একযোগে ছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সে ক্ষেত্রে যতগুলি প্রেক্ষাগৃহে ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে ততখানি 'প্রিন্ট' পাঠাতে হবে এবং প্রতি 'প্রিন্ট'-এর দরুন যদি ঐ ৩১৮৸০ আনা করে রপ্তানী শুল্ক দিতে হয়, তাহ'লে লাভের অংক আর চোখে পড়বে না। তা ছাড়া প্রিন্টগুলি আর অক্ষয় নয়—প্রদর্শিত হতে হ'তে অকেজো হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। তখন আবার নতুন 'প্রিন্ট' পাঠাতে গেলে নতুন সেলামী দিতে হবে। তাই সমস্যাটার সমাধান বর্তমান শুল্ক হ্রাসেও যে হয়নি, এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এ গেল এক তরফা সমস্যার কথা। পাকিস্থান সরকারের দিক থেকেও কিছু বলবার আছে বৈ কী? ভারত বিভক্ত হওয়ার পর ভারত ও পাকিস্থান দু'টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। উভয় রাষ্ট্রকেই সত্যিকারের শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে উভয় রাষ্ট্রের সরকারেরই কঠিন দায়িত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে আর্থিক বুনিয়াদকে
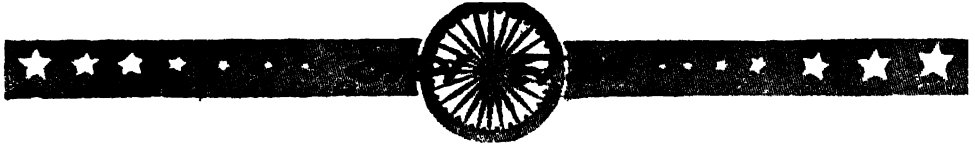
শক্ত করে গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তাই সর্বাগ্রে অনুভূত হচ্ছে। দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনায় এবং দেশের পুনর্গঠনে দেশীয় সরকারকে যে গুরু ব্যয়ভার বহন করতে হয়—সে কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? সরকারের নিজস্ব কর্তৃত্বে যে সব আয়ের পন্থা রয়েছে বা দেশের সম্পদ থেকে দেশশাসন ও পুনর্গঠনের জন্য যে যে অংশ তারা গ্রহণ করে থাকেন—তাতে ঘাটতি দেখা দিলে জনসাধারণকে শোষণ না করে নতুন করে সুচিন্তিত পন্থায় জনসাধারণের উপর কর ধার্য করবার রীতিকে কেউ অন্যায় বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না। এই কর ধার্যের দ্বারা ব্যক্তিগত সঞ্চিত বা উদ্‌বৃত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের তহবিলে যেয়ে দেশের সমগ্র জনসাধারণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কার্যেই ব্যয়িত হ'য়ে থাকে। ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হলেও, পরস্পরের ব্যবসায়গত ও অন্যান্য স্বার্থ বিদেশীয় রাষ্ট্রের মতই পরস্পরের কাছে বিবেচিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে ভারতের চিত্র ব্যবসায়ীরা যদি পাকিস্তানে তাঁদের ব্যবসায়কে চালু রাখতে চান, তবে লভ্যাংশের কিছুটা সেলামী শুল্কবাবদ পাকিস্তান সরকারকে দিতে হবে বৈ কী? আভ্যন্তরীন আমোদকর যা পাকিস্তান সরকারের তহবিলে যাচ্ছে, তাত দিচ্ছেন পুরোপুরী পাকিস্তানেরই জনসাধারণ। তাই আমোদকর বাবদ প্রাপ্য অর্থের নজির দেখিয়ে নির্ধারিত আমদানী শুল্ককে সরকারের খামখেয়ালী মনোভাব বলে মোটেই উড়িয়ে দিতে পারেন না।

পাকিস্তানের চিত্রশিল্প যদি ভারতের উপর নির্ভরশীল না থাকতো—অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রেক্ষাগৃহগুলির চাহিদা মেটাতে পাকিস্তানেই যদি চিত্র নির্মিত হ'তো—তখন ভারতের চিত্র ব্যবসায়ীরা কী করতেন? বৈদেশিক চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি (বৈদেশিক বলতে পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ইং-মার্কিণ ও এই ধরণের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কথা বলছি) ভারত সরকারের আমদানী শুল্ক দিয়েও ভারতের চিত্রজগতে কী ভাবে জেঁকে বসে আছেন—আর সেই অনুপাতে অনেক কম শুল্ক দিয়েও ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ীরা কী পাকিস্তানের বাজারে নিজেদের স্বার্থ কায়েমী রাখতে পারবেন না? পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে কিছু বলছি না বা ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ীদের স্বার্থহানি করবার জন্যও কোমর বেঁধে কিছু বলছিনা—আমরা যা বলছি, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবেই বলছি। পাকিস্তান সরকার বর্তমানে চলচ্চিত্রের প্রতি ফিট পিছু যে দু'পয়সা করে আমদানী শুল্ক ধার্য করেছেন, তা স্বীকার করে নেবার মত উদারতা আশা করি ভারতীয় চিত্রব্যবসায়ীরা দেখাতে পিছু হটবেন না। তবে অধিক 'প্রিণ্ট' ও একই ছবির নতুন 'প্রিণ্ট' পাঠাবার সময় যেসব অসুবিধার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেগুলি হৃদ্যতা পূর্ণভাবে পরস্পরের সংগে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলাই সমীচীন বলে মনে করি। এ ব্যাপারে আমরা যে সব পন্থা নিয়ে ভেবে দেখেছি, সেগুলি উভয় পক্ষের কাছে উপস্থিত করতে চাই। তাঁরা এ নিয়ে পরামর্শ করে পরস্পরের স্বার্থ বজায়

রাখতে, যে পন্থাকে উপযুক্ত বলে মনে করবেন—সেটাকেই গ্রহণ করতে পারেন। প্রথমতঃ ভারতের প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগতভাবে পাকিস্থানের জন্য স্বতন্ত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান খোলা। পাকিস্থানের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই প্রতিষ্ঠান মারফৎ চিত্র পরিবেশিত হবে। তাহলে একাধিকবার আমদানী শুল্কের হাত থেকে তাঁরা অতি সহজেই রেহাই পেয়ে যাবেন। তবে এতেও একাধিক প্রিন্ট-এর সমস্যার কথা থেকে যায়। সে ক্ষেত্রে পাকিস্থান সরকার প্রতি ছবির প্রিন্ট বেঁধে দিতে পারেন। যেমন মনে করুন, এগার হাজার ফিটের একখানা ছবি পাঠাতে গেলে বর্তমান হার অনুযায়ী শুল্ক দিতে হবে ৩১৮৸০ আনা। এই ৩১৮৸০ আনা দিয়ে একখানা ছবি পাঠাবার সময় যদি আরো চারখানা 'প্রিন্ট' বিনা শুল্কে রপ্তানী করবার অনুমতি দেওয়া হয়, তবে ভুকলই বজায় থাকতে পারে। অর্থাৎ একখানা ছবির জন্য ৩১৮৸০ আনা দিয়ে ব্যবসায়ীরা পাকিস্থানে একসংগে পাঁচখানা 'প্রিন্ট' পাঠাতে পারবেন এবং পাঁচখানা 'প্রিন্ট' যখন শেষ হ'য়ে যাবে তখন প্রয়োজনবোধে আবার ৩১৮৸০ আনা দিয়ে ঐ একই ছবির পাঁচখানা 'প্রিন্ট' পাঠাতে পারবেন। একখানা ছবির পাঁচখানা 'প্রিন্ট' পাকিস্থানে খাটিয়ে কর্তৃপক্ষ যে অর্থ উপার্জন করবেন, তাতে পাকিস্থানস্থিত তাঁদের পরিবেশন শাখার খরচা চালিয়ে ৩১৮৸০ আনা পাকিস্থান সরকারকে দিতে খুব অসুবিধা হবে না বলেই আমরা মনে করি। পাকিস্থানে পরিবেশন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ঝুঁকিকে যদি ভারতের চিত্র ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করতে না চান—তখন দ্বিতীয় পন্থাটি গ্রহণ করতে পারেন। এই পন্থাটি হ'লো: পাকিস্থানের স্থায়ী ব্যবসায়ী ও আস্থাবান বাসিন্দারা যদি নিজেরাই পাকিস্থানে পরিবেশন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁরা পাকিস্থানে প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্য দিয়ে পাকিস্থানের জন্য ছবির স্বত্ব ক্রয় করে নিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ীরা ভারতের ভিতর ছবি প্রদর্শনের জন্য যে ব্যবস্থাকে অনুসরণ করে চলেন, আমরা এখানে সেই পন্থাটির কথাই বলছি—যদি পাকিস্থানের কোন ব্যবসায়ী আপাততঃ এদিকে আকৃষ্ট হ'তে না চান, তখন পাকিস্থানস্থিত প্রদর্শকেরাই এবিষয়ে অগ্রণী হতে পারেন। উভয়ের স্বার্থের কথা চিন্তা করে বর্তমানে এর চেয়ে সুচিন্তিত গ্রহণযোগ্য পন্থা আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি। যদি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অন্য কোন পন্থা আবিষ্কার করে থাকেন ত ভাল কথা, নইলে এ নিয়ে তাঁদের ভেবে দেখতে বলি। সর্বশেষে নিজের স্বার্থের জন্য পাকিস্থানের নিজস্ব চিত্রশিল্প যাতে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে উঠতে পারে, সেজন্য পাকিস্থান সরকারকে অবহিত হ'তে আমরা অনুরোধ জানাবো। পাকিস্থানের প্রয়োগশালায় নিজস্ব চিত্র নির্মিত হলে, ভারতেও তা প্রদর্শিত হতে পারবে এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার গোড়া থেকেই যত্নবান হওয়া উচিত বলেই আমরা মনে করি।

পরলোকে চিত্র সাংবাদিক চিত্তরঞ্জন ঘোষ

গত ২৮ শে মে শুক্রবার প্রবীণ চিত্র সাংবাদিক শ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ মহাশয় ৩১, সুরবারবান স্কুল রোড-স্থিত তাঁর কলিকাতাস্থ বসত বাড়ীতে মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স পঞ্চাশ বৎসর হয়েছিল। স্বর্গত ঘোষ বরিশালের গাভাগ্রামের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। প্রথম জীবনে স্বর্গত ঘোষ বাংলার চিত্রসাংবাদিক জগতে একজন নিপুণ সাংবাদিক বলে পরিচিত ছিলেন। বাংলার সর্বপ্রথম ইংরেজী সিনেমা পত্রিকা ফিল্মল্যাণ্ডের তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্পাদক ছিলেন। বাংলা চিত্রসাংবাদিক জগতে Film land তখন যথেষ্ট সাড়া এনেছিল এবং বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। পরে তিনি চিত্রশিল্পের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং অরোরাফিল্ম করপোরেশন-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ অনাদি বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠানে তাঁর জীবিতকালেই যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি অরোরা ফিল্ম করপোরেশনর সংগেই জড়িত ছিলেন। অনাদি বাবুর পুত্রেরা অভিভাবকের মতই ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর পরামর্শ মেনে চলতেন। অরোরার তিনি

কেবলমাত্র একজন বেতনভুক কর্মী ছিলেন না, অরোরার সংগে তাঁর হৃদয়ের যোগ গড়ে উঠেছিল। স্বর্গতঃ ঘোষ বঙ্গীয় চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠানেরও (Bengal Motion Pictures Producers Association.) উৎসাহী কর্মী ছিলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক হিসাবে তিনি যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তা বাংলার প্রযোজকেরা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের সংগে জড়িত থাকলেও তিনি সমগ্র চিত্রশিল্পেরই একজন দরদী বন্ধু ছিলেন। বাংলা চিত্রজগতের সামনে যখন যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তিনি পরম আন্তরিকতার সংগেই তা সমাধানের জন্য অগ্রসর হয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবেও কোন প্রযোজক কোন সমস্যায় পড়লে—স্বর্গতঃ ঘোষের কাছে উপস্থিত হ'লে তিনি সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়ে তাঁদের সাহায্য করেছেন। চিত্রব্যবসায়ের সংগে জড়িত হয়ে পড়লেও চিত্রসাংবাদিকতা ক্ষেত্র থেকে তিনি সম্পূর্ণ অবসর কোনদিনই নেন নি। কর্মব্যস্ততার মাঝেও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। চিত্রজগত সম্পর্কিত কোন নতুন পত্রিকা তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হ'লে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। এই প্রসংগে রূপ-মঞ্চ তাঁর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। রূপ-মঞ্চের প্রতি শুধু রচনা দিয়েই তিনি তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি—কী করলে রূপ মঞ্চকে সুন্দর করে তোলা যায় সে সম্পর্কে একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকী চিত্রজগত সম্পর্কিত তাঁর অমূল্য পুস্তক-সংগ্রহ থেকে বহু সুযোগ রূপ-মঞ্চকে দান করেছেন। রূপ-মঞ্চে বাংলার নির্বাক ও সবাকচিত্রের যে তালিকা প্রকাশিত হয়, তাতেও তাঁর সহযোগিতার কথা স্বীকার না করে আমরা পারবো না। তাই, স্বর্গতঃ ঘোষের মৃত্যুতে রূপ-মঞ্চ তার একজন পরম বন্ধু ও উপদেষ্টাকেই হারালো। ভগবান মৃতের আত্মার মঙ্গল করুন। —কালীশ মুখোপাধ্যায়

শুভ উদ্বোধন
শনিবার ১৯শে জুন
নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন
প্রতিবাদ
পরিচালনাঃ হেমচন্দ্র চন্দ্র
সঙ্গীতঃ পঙ্কজ মল্লিক
যুগ যুগ বাঁচিয়া যাহারা
নিপীড়িত, অপমানিত, লাঞ্ছিত
তাহাদেরই মর্ম্ম কথা—
চরিত্রে :
চন্দ্রাবতী : ভারতী : সুমিত্রা দেবী
পূর্ণেন্দু : মোহন : কালী সরকার
প্রভৃতি।
প্রতিবাদ
পরিচালক : হেমচন্দ্র চন্দ্র
কাহিনী : বিনয় চট্টোপাধ্যায়
সঙ্গীত : পঙ্কজ মল্লিক
চিত্রা * রূপালী
নিউ থিয়েটার্সের বাংলা ছবির
একমাত্র পরিবেশক :
অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির পরিচালিত ১৩৫৩ সালের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিযোগিতার ফল।

শ্রেষ্ঠ চিত্র

(১)	**সংগ্রাম**—	২১,১০১
(২)	**বিরাজ বৌ**—	১৮,১২৭
(৩)	**পথের দাবী** -	১৭,১০৪
(৪)	সাতনম্বর বাড়ী—	৫,০১১
(৫)	পরভৃতিকা—	২০০৭
(৬)	বন্দেমাতরম—	১০০৬
(৭)	মাতৃহারা—	২১২
(৮)	দুঃখে যাদের জীবন গড়া—	৬০
(৯)	অভিযাত্রী—	৩৮
(১০)	এই তো জীবন—	১৭
(১১)	তুমি আর আমি—	১৫
(১২)	মন্দির—	১০
(১৩)	প্রতিমা—	৬
(১৪)	নতুন বৌ—	৪

সংগ্রাম, বিরাজ বৌ, পথের দাবী এই চিত্র তিনখানি শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করলো।

মৌলিক কাহিনী

(১)	**সংগ্রাম**—	২৩,৫০৬
(২)	সাতনম্বর বাড়ী—	৮০৯
(৩)	অভিযাত্রী—	৫৩৭
(৪)	মাতৃহারা—	৩৩৭
(৫)	মন্দির—	২০৩
(৬)	বন্দেমাতরম—	১৩

সংগ্রাম শ্রেষ্ঠ মৌলিক কাহিনীর মর্যাদা লাভ করলো।

চিত্ররূপ (চিত্রনাট্য)

(১)	**বিরাজ বৌ**—	১৭,১০৮
(২)	সংগ্রাম—	১২,১০৪
(৩)	পথের দাবী -	২,৬৫২
(৪)	অভিযাত্রী—	৩৭৪
(৫)	তুমি আর আমি—	১৮
(৬)	মন্দির—	১৫
(৭)	মাতৃহারা—	৪
(৮)	নতুন বৌ -	২

'বিরাজ বৌ' শ্রেষ্ঠ চিত্র-নাট্যের মর্যাদা পেল।

পরিচালনা

(১)	**সংগ্রাম** -	১৬,০৫২
(২)	বিরাজ বৌ—	৫,১২৬
(৩)	পথের দাবী -	৩,০৩২
(৪)	মন্দির—	৩৪
(৫)	বন্দেমাতরম—	৩২

সংগ্রাম চিত্রের পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে নির্বাচিত হ'লেন।

অভিনেতা

(১)	**ছবি বিশ্বাস**-- (বিরাজ বৌ)	২১,৩৯৮
(২)	**কমল মিত্র**— (মাতৃহারা, পথের দাবী)	১৬,০৯৩
(৩)	**নির্মলেন্দু লাহিড়ী** -- (অভিযাত্রী)	১৪,১৭৮
(৪)	জহর গঙ্গোপাধ্যায়—	৫,০৩১
(৫)	অহীন্দ্র চৌধুরী—	৪,৮৫৬
(৬)	বিপিন মুখোপাধ্যায়—	২,১২৩
(৭)	স্বগত দেবী মুখোপাধ্যায়—	১৩২৬
(৮)	রাধামোহন ভট্টাচার্য—	১১১৯
(৯)	জীবেন বসু—	১০০৩
(১০)	রবি রায়—	৬২৩
(১১)	সিধু গাঙ্গুলী—	৫১৯
(১২)	বিকাশ রায়—	২০১

শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র ও নির্মলেন্দু লাহিড়ী শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদা লাভ করলেন।

অভিনেত্রী

( )	**মলিনা**— (সাতনম্বর বাড়ী)	১৭,০৯৩
(২)	**চন্দ্রাবতী** (পথের দাবী)	১৫,১৮২
(৩)	**সুনন্দা**— (বিরাজ বৌ)	১৩০৭৬
	সুমিত্রা— (পথের দাবী)	১৩০৭৬
(৪)	**সন্ধ্যারাণী**—	৪,০০৮

(৫) কানন্ দেবী— ৩,০৩১

(৬) শ্রীমতী প্রভা— ৩,০১৫

(৭) শ্রীমতী সরযূবালা— ১০৫১

(৮) বিনতা দেবী— ৬৯০

(৯) সিপ্রা দেবী— ৫১৯

(১০) নীলিমা দাস— ৬৩

(১১) প্রমীলা ত্রিবেদী— ১৭

শ্রীমতী মলিনা, চন্দ্রাবতী, সুনন্দা ও সুমিত্রা শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর মর্যাদা লাভ করলেন।

চিত্রগ্রহণ

(১) **বিরাজ বৌ**— ১২,২১৩

(২) পথের দাবী— ১১,৮১২

(৩) সাতনম্বর বাড়ী— ৩,২৫৬

(৪) তপোভঙ্গ— ৩২০২

(৫) সংগ্রাম— ১০১৩

(৬) বন্দেমাতরম— ৫০৩

(৭) মন্দির— ৪৪২

(৮) অভিযাত্রী— ২০১

বিরাজ বৌ চিত্রের চিত্রশিল্পী শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীর সম্মান লাভ করলেন।

শব্দ গ্রহণ

(১) **বিরাজ বৌ**— ১০,৮০৫

(২) সাতনম্বর বাড়ী— ১০,২১৩

(৩) পথের দাবী— ২,০০১

(৪) সংগ্রাম— ৬০৪

(৫) এই তো জীবন— ১২

(৬) অভিযাত্রী— ৭

বিরাজ বৌ চিত্রের শব্দযন্ত্রী শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করলেন।

দৃশ্য রচনা

(১) **সংগ্রাম**— ১৪,৫০৩

(২) বিরাজ বৌ— ৬,৫০৩

(৩) পথের দাবী— ৫,১৯৯

(৪) অভিযাত্রী— ২,১১১

(৫) মন্দির— ৮০৬

(৬) বন্দেমাতরম— ৭,১৬

(৭) নতুন বৌ— ৪১২

(৮) তুমি আর আমি— ২১৩

সংগ্রাম চিত্রের শিল্প নির্দেশক শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করিলেন।

গান (কথা)

(১) **সাত নম্বর বাড়ী**— ১২,০০২

(২) পথের দাবী— ৪,৫০৩

(৩) তুমি আর আমি— ৩,২১৪

(৪) সংগ্রাম— ৩০২৫

(৫) মন্দির— ৮৫৬

(৬) তুমি আর আমি ৫৩২

(৭) বন্দেমাতরম— ৪১৪

(৮) নতুন বৌ— ১২৩

'সাত নম্বর বাড়ী' চিত্রের গীতিকার শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করলেন।

সুর-সংযোজনা

(১) **সাতনম্বর বাড়ী**— ২৩,০৮৭

(২) পথের দাবী— ৮০৫

(৩) বন্দেমাতরম— ৭০৮

(৪) সংগ্রাম— ২০৩

(৫) মন্দির ও অভিযাত্রী— ৪

(৬) নতুন বৌ— ১

সাত নম্বর বাড়ী চিত্রের সুর-শিল্পী শ্রীযুক্ত রবীন চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ সুরকারের সম্মানে ভূষিত হলেন। প্রায় তিরিশ হাজারের অধিক দর্শক এবার এই প্রতিযোগিতায় ভোটদান করেন। গত বছরে ভোট দাতাদের সংখ্যা ছিল আঠারো হাজারের অধিক। ভোট গণনায় অত্যধিক সময় লাগাতেই ফলাফল ঘোষণা করতে এত বিলম্ব হ'য়ে গেল। আশা করি দর্শকসাধারণ এজন্য ক্ষমা করবেন। ষষ্ঠ-বর্ষ অর্থাৎ ১৩৫৪ সালের প্রতিযোগিতা-পত্র আগামী সংখ্যা থেকে প্রচার করা হবে।

সম্পাদক: **বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি**

বাংলা-ছবির বাজার

পরিচালক সুধীবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন এক পরিবেশকের দপ্তরখানায় বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা ঘরোয়া সভা বসেছিল। সেই সভায় আমি কিছু বলেছিলাম। আমি বড় বক্তা নই বড় লেখকও নই, সুতরাং বলাটাও সেদিন হয়ত বড় ক'রে বলতে পারিনি—তবু লেখাটা হয়ত ছোটো করে লিখতে পারবো ভরসায় আরম্ভ করেছিলাম, কিন্তু লেখক ছোট হ'লেও বিষয়টা বড়—তাই বিনয় ছেড়ে বিষয়টা বড় করেই বলি।

বাংলা ছবির বাজারের যাঁরা মাতব্বর তাঁদের দৃষ্টিতে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ তাঁরা কি দেখছেন—তাঁরাই বলতে পারেন। তাঁদের বৈষয়িক দৃষ্টির প্রসারতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে নিজের বুদ্ধির অহংকার করার সাহস আমার নেই, কিন্তু তবু যেন মনে হয় চোখে তাঁদের দূরবীন টেনে নেওয়ার সময় এগিয়ে এসেছে ছবির বাজারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা চলেছে, একে বন্ধ করবার অধিকার তাঁদেরই আছে—যাঁরা শুধু অর্থ অর্জনের জন্য আসেননি—এসেছেন এই শিল্পটিকে ভালবেসে। কিন্তু তাঁরা কারা এবং তাঁদের সংখ্যাই বা কত? —হয়ত সংখ্যার হিসেব করতে গেলে ঠক বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে—যথার্থ দরদীর সন্ধান একটিও মিলবে না। কিন্তু উপার্জনটাই যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের একটা সত্য কথা আজ উপলব্ধি করতে হবে যে, এই শিল্পটিও দরদের সংগে গ্রহণ না করলে এই বাণিজ্যটিও একদিন অচল হয়ে যাবে এবং বাণিজ্যটি অচল হলেই উপার্জনের ঘরেও অবশেষে শূন্য নিয়ে কাড়াকাড়িই সার হবে। সুতরাং ভাববার দিন এসেছে এবং একে বাঁচাতে হ'লে সর্বপ্রথম নৈতিক দায়িত্ব হলো সিনেমা সংক্রান্ত কাগজগুলোর। সংস্কারের প্রথম সিঁড়িতেই তাঁদের পদক্ষেপ হবে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। ছবির বাজারে মাতব্বরদের যে বৈঠকটি (B M P. A.) আছে তাঁদের সংগে হাত মিলিয়ে কিম্বা প্রয়োজন হ'লে হাত ছিনিয়ে নিয়ে তাঁদেরই করতে হবে পৌরোহিত্য। দু'টি বছর ধ'রে অবিরাম যে পড়িউসার বধ যজ্ঞ চলেছে, এর শেষ কোথায়? পড়িউসর বাঁচলে ত' ডিষ্ট্রিবিউটর, ডিষ্ট্রিবিউটর বাঁচলে এগজিবিউটর এবং এঁরা বাঁচলে বাঁচবে ডিরেক্টর, বাঁচবে নট নটী বাঁচবে আরও অনেকে, যারা জড়িয়ে আছে এর সংগে। কিন্তু মূলধারটিকে ধরে যে ভাবে দোহনের পালা চলেছে, তাতে নির্মূল হতে হবে অনেকেরই এবং এই অনাচারের প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে প্রায় প্রথম দু'চারদিন বিবেকের পীড়ন আর চোখের কিঞ্চিৎ জ্বালাও অনুভব করেছিলাম পরে বুঝলাম অনাচারটাই এঁদের আচার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যা কিছু ঘটে, তা প্রকাশ্যেই ঘটে। ভয়, লজ্জা, পাপ, অন্যায়—নীতিবাক্যগুলো আর রুদ্ধকক্ষে সীমাবদ্ধ নেই—বে আব্রু করে তাকে উন্মুক্ত রাজপথে টেনে আনা হয়েছে। প্রকাশ্যে অনাচার করার সংকোচের বালাইটুকু যা ছিল—তা ধুয়ে মুছে আজ নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে। যুদ্ধশেষে স্বাধীন হয়ে আমরা কতদূর এগিয়েছি—সে বিচারের সময় অবশ্য এখনও আসেনি, কিন্তু বুক ঠুকে যে অন্যায় করতে শিখেছি—তারও কি বিচারের সময় আসেনি। এই ব্যাভিচার সর্বত্র যেমন চলেছে—আমাদের জগতেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গা-সওয়া এই ঘটনাগুলো কে না জানে?

প্রথম এলেন ধনী তার মূলধন নিয়ে। ডিরেক্টরের হাতে সপে দিলেন বিরাট অংকের একটি ব্ল্যাংক-চেক্। ব্ল্যাংক চেকই বলবো—সইসাবুদের কাজটি শেষ ক'রে কিছুটা ছবি এগিয়ে গেলেই আর আমাকে পায় কে? পাঁচটি আঙ্গুলের ফাঁক দিয়েও বেচারীর নিঃশ্বাস ফেলবার উপায় নেই। ধনী মহাজনটি যে বোবা নন—কথা বলতেও জানেন—প্রমাণ হয় তখন, যখন ছবিটি তৈরী শেষ হয়ে তাঁর হাতে এসে পৌঁছোয়। এই হলো প্রথম পরিচয়।

দ্বিতীয় পরিচয় শুরু হলো ষ্টুডিও নিয়ে। একদিন

সেখানে ঢুকতে হতো যে মূল্য দিয়ে, এই দুর্মূল্যের বাজারে অবশ্য সেই সুলভ ভাড়া আশা করা সম্ভব নয়। তাই ভাড়া বাড়লো এবং থামলো না—বাড়তেই চললো! তা বাড়ুক; কিন্তু চতুর্গুণ বেড়েও জুলুমের মাত্রা কমলো না। দু'টি একটি বাদ দিলে প্রায় প্রত্যেক ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষই মরিয়া হয়ে দোহন করতে সুরু ক'রে দিলেন। মেক্-আপের জন্য দিতে হবে পৃথক দক্ষিণা, সেট তৈরীর জন্য দিতে হবে আলাদা মজুরী, আর্টডাইরেক্টর, ষ্টীল ক্যামেরা-ম্যান নিয়ে আসতে হবে বাইরে থেকে—এমনি আরও কত কী......! পূর্বে ষ্টুডিও ভাড়ার মধ্যে এই সবই পাওয়া যেত; কিন্তু এখন বর্ধিত ভাড়ার উপরও এই সব ট্যাক্স দেবার নিয়ম চালু হয়েছে। তারপর পর্দার অন্তরালে ঘাটে ঘাটে বাম হস্তটি পাতাই রয়েছে! এত বড় পীড়াদায়ক অনাচার কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতসারে ঘটে না—এ কথা পাঁচ বছরের শিশুও বিশ্বাস করতে পারে—আমরা কি পারি? সুখের বিষয় শহরের উত্তর প্রান্তে যে সব নূতন ষ্টুডিও হয়েছে—তাঁরা এই অনাচার ঢুকতে দেন নি। এ পাপের প্রশ্রয় যে তাঁরা দেন নি, এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ! আসল কথা হয়েছে, উদার মন নিয়ে শিল্পটিকে ভালবেসে এর বিধিমত সংস্কার যাঁরা করবেন—তাঁরাই বাঁচবেন—নইলে অদূর ভবিষ্যতেই অনেক ষ্টুডিওর দরজা বন্ধ করা ছাড়া উপায় থাকবে বলে মনে হয় না।

তারপর আসে তাঁদেরই কথা—যাঁরা ছবিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। বড় বড় প্রখ্যাত বিখ্যাত নট ও নটী থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ সুপার আর্টিষ্টকে পর্যন্ত ভয় ক'রে চলতে হয়। কিন্তু সাধারণ সুপার আর্টিষ্টটিও যখন 555 সিগারেট টিনটি হাতে ক'রে ফ্লোরে ঢোকেন—তখন একথা ভাবেন না—ওটিনের মূল্যটি আসে কোত্থেকে? বড় বড় প্রখ্যাত বিখ্যাতদের তো কথাই নেই। পান থেকে চূণ খসলেই তাঁদের আর্টিষ্টিক্ মেজাজ সুরু হয়!

ফেরাজিন-কারপোব খানা না হ'লে লাঞ্চটা তাঁদের ভালো জমে না, গাড়ীটা দিতে পাঁচমিনিট দেরী হলে রীতিবিরুদ্ধ কথাও তাঁরা বলতে জানেন—তাঁরা সময়ে আসতে জানেন না—অসময়ে যেতে জানেন! তা হোক, তবু তাঁরা আমাদের মাথার মণি—টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে প্রডিউসর বেচারীকে চোর হয়ে বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে হবে যে তাঁদেরই পানে! এঁদের মধ্যেও যে ব্যতিক্রম নেই—একথা বলবো না। শত্রুও যাঁদের প্রশংসা করে, এমন দরদী শিল্পীও আছে। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম অন্ততঃ করতে পারি—তিনি হচ্ছেন মলিনা দেবী।

এমনি সব বাধা বিপত্তি ডিংগিয়ে ছবিটি এলো যাঁদের ঘরে, তাঁদের নাম ডিষ্ট্রিবিউটর। মন্দের ভালো এই বিভাগটিকে নিষ্কলুষ বলতে না পারলেও, সহ্য করা চলে।

কিন্তু তারপর পর্দায় প্রকাশের পালা। ধরনা দিতে হয় তাঁদের দরজায় যাঁরা বড় বড় ইমারৎ গড়ে বসে আছেন স্বয়ম্ভূ হয়ে। অচলায়তনের সেই কক্ষ থেকে আজকাল তাঁরা আইন করেছেন যে, ছবি দেখে ছবির বিচার ক'রে তাঁরা প্রদর্শনীর ছাড়পত্র দেবেন। আইনটি খুব ভাল, যথার্থই ভাল! কিন্তু বিচারের শক্তি তাঁদের কতটুকু আছে—এইটেই আমার প্রশ্ন। বিধাতা তাঁদের বুদ্ধির ঘটে বিচারের শক্তি কতটুকু দিয়েছেন, সে বিচার করবার শক্তি আমার না থাকতে পারে কিন্তু অর্থ অর্জনের শক্তি যে তাঁদের দিয়েছেন একথা লক্ষবার স্বীকার করবো। তবে কি অর্থ অর্জনের শক্তির বলেই বলীয়ান্ হ'য়ে তাঁরা বিচার সুরু ক'রে দিয়েছেন?—সব চেয়ে পরিতাপের বিষয় এই যে, ছবির বিচার তাঁরা করছেন না—করছেন বিচারের ভান! ছবি দেখছেন, পছন্দ করছেন: কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রদর্শনীর ছাড়পত্র পেলো এমন একটি চিত্র—যে চিত্রটি তাঁরা একেবারে দেখলেনই না! এর পশ্চাতে কি আছে কে জানে! প্রদর্শনীর ন্যায্য মূল্য তো আছেই—আরও কিঞ্চিৎ হয়ত ধরে দিতে হবে কৃষ্ণমূল্য! বলির এই শেষ দক্ষিণাটি দিয়ে হয়ত মন্দির প্রবেশের অনুমতি পত্র মিলবে—নইলে হরিজনের আসুরে তার অপাংক্তেয় হয়ে থাকতে হবে কত-কাল কে জানে? এগ্জিবিটরদের ঘরে 'Hold over' ব'লে আর একটা কথা আছে। কথাটি এঁরা আজকাল

প্রায় মুখেই দিয়ে থাকেন। তার কারণ, কথাটি হয়ত খেলাপ করতে হ'তে পারে জেনেই কাগজে কলমে এঁরা ধরা দিতে চান না এবং যথাসময়ে খেলাপও তাঁরা ক'রে থাকেন। জনসাধারণ যে ছবি বরণ ক'রে নিয়েছেন—সে ছবি এতদিন House full দিয়ে এসেছে, যে ছবি তার নিজের জোরে আরও চলতে চায়—তাকে তার মেয়াদের পূর্বেই অন্যায়ভাবে তুলে দিতেও এঁদের সংকোচে বাধে না, বিবেকেও সাড়া দেয় না! যে গরু এতদিন দুধ দিয়ে এলো, তার সামান্য দু'টো একটা লাথি খেতেও এঁরা প্রস্তুত নন! অথচ ছবির বাজারে এঁদের উপার্জনের তুলনা হয় না! চিন্তা, উদ্বেগ, লোকসানের ভয় প্রোডাকসনের তুলনায় এঁদের নেই বললেই চলে। সততার সংগে স্বাভাবিক ভাবেই এঁরা প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন; তবু অস্বাভাবিক উপায়ে সমগোত্র ব্যবসায়ীর ওপর এবং মর্মান্তিক অন্যায় করতে এঁদের এতটুকু বাধে না! লোভে এঁরা এতই আত্মহারা হ'য়ে পড়েছেন যে, যাঁদের নিয়ে ঘর করতে হচ্ছে, কিম্বা হবে, তাদেরও ঘর ছাড়া করতে মনের পর্দায় তো বাধেই না—চোখের পর্দাও হারিয়ে ফেলেছেন। বুক ঠুকে নির্ভীকভাবে এই যে এঁরা জুলুমবাজি ক'রে চলেছেন—এই চলা আর কতদিন? বাজারের ছবি তো ফুরিয়ে এলো। প্রডিউসরদের দরজায় গিয়ে মাথা তাঁদের ঠুকতেই হবে! এদিন তাঁদের থাকবে না—থাকতে পারে না। বর্তমান ষ্টুডিওয়ালাদের মত দুর্দিন তাঁদের জন্যও তৈরী হ'য়ে আছে—অত্যন্ত বিনয়ের সংগে একথা আজ তাঁদের স্মরণ করা উচিৎ। ব্যতিক্রম এঁদের মধ্যেও আছে এবং এই কলুষিত আবহাওয়ার মধ্যে যখন আজ পর্যন্তও তাঁরা বানচাল হয়নি—আর হবেও না। এই দরদী প্রতিষ্ঠানদের একজনের নাম অন্ততঃ করতে পারি—তিনি হ'লেন নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার। যতদূর জানি, এঁর পরিচালনায় ষ্টুডিও কিম্বা প্রেক্ষাগৃহের আভিজাত্যের গায়ে এই নোংরা আবহাওয়া স্পর্শ করেনি এবং এই দলে আরও যাঁরা আছেন—তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এই-বার বলবো তাঁদের কথা—যাঁদের হ'য়ে এত বললাম এবং যাঁদের হ'য়ে এত বললাম—তাঁদের না-হয়ে কিছু বলি। অর্থাৎ প্রডিউসরদের! আমি নিজেকেও বাদ দিইনি; সুতরাং তাঁদের কথাই বা বলবো না কেন?

আমাদের দেশে যাঁরা টাকা দেন—তাঁরাই হলেন প্রডিউসর। সুতরাং টাকা যখন আমার, তখন শুধু প্রডিউসর হ'য়েই বা থাকবো কেন, ডিরেক্টরও আমায় হ'তে হবে। 'আমি প্রডিউসর'—এই আত্মাভিমান তিনি ভুলতে পারলেন না। শুরু হ'ল ডিরেকসন! কিন্তু এতই যদি বিদ্যা বুদ্ধি এবং টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে তাঁর দম্ভ. তিনি নিজেই কেন ডিরেকসন দেন না? অত টাকা দিয়ে ডিরেক্টর নিয়োগ করবার কি প্রয়োজন? যুদ্ধের বাজারে অনেক টাকা নিয়ে যাঁরা এই বাণিজ্যে পা দিয়ে শুধু পদস্খলনের পদচিহ্নই রেখে গেছেন—তাঁরা এইটুকুই প্রমাণ করে গেছেন যে, অনেক টাকা নিয়ে এলেও অনেক বুদ্ধি তাঁরা সংগে ক'রে নিয়ে আসতে পারেন নি! গল্প তাঁরা বোঝেন না, অথচ গল্প নির্বাচন হ'য়ে গেল! ডিরেকশন দেওয়া দূরের কথা, সহকারী হিসাবেও কোনদিন যাঁর নাম ওঠেনি—তাঁরই হাতে তুলে দিলেন পরিচালনার এত বড় দায়িত্ব! গল্প লেখা এত সহজ, পরিচালনা করা এত সহজ! এতই যদি সহজ—শৈলজানন্দের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক নীতিন বোসের মত বিখ্যাত পরিচালকের কাছে পাঁচ বছর সাকরেদি ক'রে পরিচালনার আসরে কেন নেমেছিলেন? আমরা যাঁরা এমনি তিন চার-পাঁচ বৎসর সহকারীর ঘানিতে ঘুরে মরেছি—কেন মরেছি ভেবে পাইনে! বিদ্যাটি এতই সহজ যে, এর কোন training এর প্রয়োজন হয় না—এই ধারণাটি যে কি ক'রে এদের মাথায় এসেছিল, ভেবে অবাক হ'তে হয়! আজ যা-কিছু অনর্থ ঘটেছে এঁদেরই জন্যে! ধারাবাহিক ভাবে এঁদের বিচার করলে মনে হয়, এরা ঠিক ব্যবসা করতে আসেন নি—এসেছিলেন টাকা নিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে! খেলা তাঁদের শেষ হ'য়ে গেছে—সরে পড়েছেন। মাঝখানটাতে ছবির বিচারের মান এমন জায়গায় টেনে এনেছেন যে, দর্শকের মন ফেরাতে কতদিন যাবে কে জানে? ব্যবসায় নামতে হ'লে হিসেব ব'লে যে সব চেয়ে একটা বড় কথা আছে—তা বড় ক'রে তো তাঁরা কোন দিনই দেখেন নি— ছোট ক'রে দেখলেও আজ এ
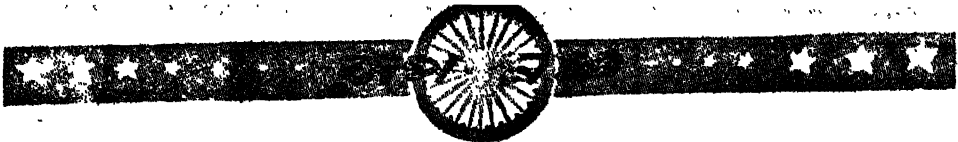
দুর্দশা হ'তো না। চোখ বুজে এঁরা ছবি করতে এসেছিলেন—চোখ একেবারে বুজিয়ে নিয়ে চলে গেছেন!

মুদ্রাস্ফীতির বাজারে যখন স্ফীতির জোয়ারটা এসে পৌঁছয়নি—তখন "শহর থেকে দূরে"র মত ছবিতে হয়ত খরচ হয়েছিল এক লাখের কিছু বেশী; কিন্তু সে ছবি মুদ্রাস্ফীতির পূর্ণ জোয়ারে ফিরিয়ে দিয়েছে পাঁচ ছয় লক্ষেরও উপর! মুদ্রার স্ফীতি যখন সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো, তখন কে কত খরচ ক'রে ছবি তুলতে পারে, লেগে গেল তার বিরাট প্রতিযোগিতা। দু'তিন লাখ টাকার বোঝা বেঁধে মুক্তির আসরে যখন তারা নেমে এলো—তখন মুদ্রার স্ফীতি উবে গেল—মনুষ্যের স্ফীতিতে শহর গেল ছেয়ে! কিন্তু মুদ্রাহীন মনুষ্য যে আমাদের কারবারে অচল, তা গেলাম ভুলে—ফিরে পেলাম তিন লাখ টাকা খরচ ক'রে এক লাখ দেড় লাখ। হিসাবের ভুলে যাঁরা চলে গেছেন, তাঁদের এখন ভুলতে পারি; কিন্তু যাঁরা রইলেন তাদের তো ভোলা যায় না। নতুন ক'রে তাদের হিসাব করতে হবে—নতুন ক'রে তাদের ঢেলে সেজে চলতে হবে। এবারও যদি ভুল ক'রে বলি যে, গোটা বাঙলাটাই ঢেলে সাজা হয়নি, পাকিস্থান ব'লে একটা নূতন স্থান হয়নি এবং বাঙলা ছবির বাজারের একটা বড় কেন্দ্র ছোট হ'য়ে যায়নি—তা হ'লে হিসেবের ভুলে আর বাণিজ্যটিকে বাঁচানোই দায় হ'য়ে উঠবে! একথা কোন প্রডিউসর কিম্বা কোন ডিরেক্টর দিতে পারেন না যে, বড় বড় আর্টিষ্ট নিয়ে দু'লক্ষ টাকা খরচ ক'রে ছবি করলে আমার ছবি হিট্ করবে। একথা বলতে তাঁরাই পারেন যাঁদের ভিতরে বিদ্যার চেয়ে বিদ্যার অহংকারটাই বেশী। All star নিয়ে প্রভূত অর্থব্যয়ে ছবি তৈরী ক'রেও All star tragedy হ'য়েছে, এর প্রমাণ খুঁজতে "তুমি আর আমি"র মত অনেক চিত্রই মিলবে। আবার অপেক্ষাকৃত অর্থব্যয়ে নতুন শিল্পী নিয়ে হিট্ ছবি হ'য়েছে তার সাক্ষ্যও মেলে "উদয়ের পথে", "স্বয়ং সিদ্ধা"য়! আসল কথা, কাহিনী হয়েছে ছবির প্রাণ। ছবির তিন ভাগ টেনে নিয়ে যায় শুধু গল্পের জোরে। অন্ততঃ 'স্বয়ং সিদ্ধা' সেই প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। 'উদয়ের পথে' চিত্রে শুধু কাহিনীর মৌলিকত্ব ছিল না—ছিল সম্ভবতঃ technical perfection। 'স্বয়ং সিদ্ধা' সেদিক দিয়ে যথেষ্ট দুর্বল হ'য়েও সিদ্ধিলাভ করলো শুধু গল্পের মৌলিকত্বে। সুতরাং চিত্র নির্মাণের পূর্বে সর্বপ্রথম কাহিনী নির্বাচনে হতে হবে যথেষ্ট সচেতন। তারপর কাহিনীটি তুলে দিতে হবে তাঁদেরই হাতে, যাদের যথার্থই টেক্‌নিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। ভালো কাহিনীটি অনভিজ্ঞের হাতে তুলে দিয়ে তাকে হত্যা করলে আত্মহত্যারই সামিল হবে। তাই ব'লে কি নূতনের স্থান হবে না? নিশ্চয়ই হবে। নতুন কাহিনী, নতুন শিল্পী, নতুন পরিচালকের প্রয়োজনীয়তা কে না স্বীকার করে? পুরাতন মুছে যায়, নতুন আসে—এই তো নিয়ম।

আমিও তো নূতন—দু'টো ছবি ক'রেই পুরাতনের খাতায় আমার নাম লেখা হয়ে গেছে—একথা বলবার মতো আমি এমন কিছু আজও পাইনি। কিন্তু চিত্র রাজ্যের চীনা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে কেমন ক'রে পরিচালকের সনদটুকু পেয়েছিলাম সেই কষ্টের ইতিহাস কিঞ্চিৎ নিশ্চয়ই

আছে বৈকি? সব চেয়ে বড় দায়িত্ব পরিচালকের। বড় শক্ত কাজ। মেধা চাই, চাই কলাসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট জ্ঞান, চাই সাহিত্যের রসবোধ, চাই বহুবিভাগের সম্মিলিত অভিজ্ঞতা—তবে তো সে পরিচালক! পূর্বে যাঁরা আমাদের আগে এসে পুরাতন হ'য়ে আজও পুরোভাগে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—দেবকী বোস, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীতিন বোস, শৈলজানন্দ এবং আরও অনেকে—এঁরা সবাই একদিন নতুন থাকলেও স্বকীয় শক্তির সংগে অনেক কিছু নিয়েও এসেছিলেন। তবু তো আজও জোর ক'রে তাঁরা বলতে পারেন না যে, তাঁদের সব ছবিই রসোত্তীর্ণ হ'য়ে জনসমাজে আদৃত হবে। দেবকী বোস 'কৃষ্ণলীলা' করেছেন, প্রমথেশ 'চাঁদের কলঙ্ক' করেছেন, নীতিন বসু 'বিচার' করেছেন—সর্বোপরি পাঁচ পাঁচটি ছবি পর পর হিট্ করে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন শৈলজানন্দ—তিনিও তো 'ঘুমিয়ে আছে গ্রামে' ফিরে গেছেন। ফিরে গেলেও কাল তাঁরা জেগেও উঠতে পারেন! তাঁরা শক্তিমান। মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে দরদের সংগে ছবি করলে আজও তাঁরা চমক লাগাতে পারেন—এ বিশ্বাস করাটা বোধহয় অন্যায় হবে না।

তাই বলছিলাম—বড় শক্ত কাজ! এহেন দায়িত্বপূর্ণ কাজে রাম আসছে, শ্যাম আসছে, যদুর পিছনে মধুও আসছে! এই উচ্ছৃঙ্খল পদক্ষেপ অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। সিনেমা সংক্রান্ত পত্রিকার দায়িত্বই এতে সব চেয়ে বেশী! শুধু ছবিটি ভালো কিম্বা মন্দ—এইটুকু লিখেই তাঁরা দায়িত্ব এড়াতে পারেন না! তাঁদের দায়িত্ব আরও বেশী। তাঁদের করতে হবে আন্দোলন, সংঘবদ্ধ হ'য়ে জানাতে হবে ছবিরবাজারের মাতব্বরদের বৈঠকটিকে। তা হলেই যথার্থ শক্তিহীনের আস্ফালন যাবে থেমে। আমার টাকা আছে বলেই যা-ইচ্ছা তাই করবার অধিকারী যে আমি নই—এই কথাটা আজ আমাদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে। তাই বলছিলাম, এমনি একটি সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ কাহিনী অবলম্বনে নিপুণতার সংগে নির্বাচিত যতদূর সম্ভব শিল্পী নিয়ে দক্ষ পরিচালক কিম্বা পরিচালনার অভিজ্ঞতায় পারদর্শী সহকারীর পরিচালনায় এবং সংযত প্রয়োজনায় ষাট হাজার থেকে একলক্ষ টাকার মধ্যে যদি একটি বাংলা ছবি তৈরী সম্ভব হয়—তা হলেই অন্ততঃ বাংলা ছবির স্বাস্থ্য ও পরমায়ু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। প্রিন্ট এবং পাবলিসিটি সমেত লক্ষটাকার মধ্যে যদি ছবি শেষ না হয়—তা হ'লে সংকুচিত বাংলার ছোট্ট পরিধিতে বাংলা ছবির প্রদর্শনী বন্ধ হ'য়ে যদি একদিন দেখতে পাই, হিন্দি ছবিতে ভরে গেছে আশ্চর্য হবো না।

পরিশেষে আমার নিবেদন—যা কিছু লিখলাম সাধারণ ভাবেই লিখেছি। কোন ব্যক্তিবিশেষকে অজ্ঞাতেও আক্রমণের ভাব নিয়ে আমার লেখনী কলুষিত হয়েছে ব'লে আমি ধারণা করতে পারছিনে! যা আমি বুঝেছি—তাই আমি লিখেছি এবং আমার বোঝার মধ্যে যদি ভুল থেকে থাকে কিম্বা অজ্ঞাতসারে আমার লেখনী মাত্রা লঙ্ঘন ক'রে থাকে এবং সে জন্য যদি কেউ ভুল বুঝে থাকেন—আমি তাঁর কাছে অগ্রিম ক্ষমা চেয়ে নিয়ে লেখনীর পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিলাম।

ডাঃ সুকুমার বসু। এই নবাগত প্রিয়দর্শন তরুণকে আপনারা দেখতে পেয়েছেন, 'মনে ছিল আশা' চিত্রে। আরো বহু চিত্রেই এঁকে আপনারা দেখতে পাবেন।

আছি কোথায়?

শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী এম, এ

"দিনেদিন যা নমুনা দিচ্ছিস তোরা,—বাংলা ছবি দেখার মানে সময় আর পয়সা নষ্ট"—বাংলা ছায়াছবির কথা উঠলেই বন্ধুদের কাছ থেকে ঐ মন্তব্যটুকু শুনতে হয়। উত্তরে বলতে হয় অনেক কথা যা শুনলে বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনারা নিরাশ হ'য়ে পড়বেন।

ছাত্র জীবনে যখন বাংলা ছবি দেখতাম, তখন আমার মনে কেবলই একটী প্রশ্নের উদয় হত—'ছবির জগতে আমরা আছি কোথায়?' তুলনা করতাম বাংলা ছবিকে হলিউডের ছবির সংগে,—মন খারাপ হ'ত আর প্রতিজ্ঞা করতাম, টালিগঞ্জের ছবিতোলা আটচালা থেকেই হলিউডিয়া ছবি করে পরিচালক আর দর্শক মশাইদের তাক লাগিয়ে দেব। প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারিনি—ভবিষ্যতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। এ সন্দেহ যে কেন—তার বিচারের ভার আপনাদের ওপর দেওয়া গেল।

একটা প্রমাণ (Full length) বাংলা ছবি তুলতে এখন খুব টেনেটুনে খরচা করলে প্রায় এক লাখ টাকা লাগে। এই লাখো টাকায় যে ধরণের ছবি তোলা হ'তে পারে, তার গল্পের পটভূমি হতে হবে খুব সংকীর্ণ। অর্থাৎ পাহাড়ী দেশ সমুদ্র তীর, বড় বাগান, বড় বাড়ী বা ঐ রকম দেখতে ভাল লাগে এমন কিছু দৃশ্যপট থাকবে না। কারণ, ঐ সব পটভূমিতে ছবি তুলতে গেলে খরচার অঙ্ক লাখ টাকা থেকে লাফিয়ে দেড় লাখ ছাপিয়ে দু'লাখ অবধি উঠে যাবে। কাজেই ঐ লাখোটাকার ছবির দৃশ্যপটের মধ্যে থাকবে—খান চারেক ঘর, বড় জোর একটা মাঝারি হল, এক ফালি রাস্তা সমেত বাগান, একটা থিয়েটার ষ্টেজ, একটু মোটর দৌড়, বড় জোর রেলের কামরায় নায়ক নায়িকার প্রথম পরিচয়- কিম্বা একটা সস্তা মোটর দুর্ঘটনা।

এই লাখো টাকার ছবির অভিনেতারা হবেন বেশীর ভাগই অল্প মাইনের নবাগত। শুধু দু' একটা টাইপ চরিত্রে অভিনয় করবেন নাম করা দু'একজন অভিনেতা, যাঁরা মোটা টাকার দৈনিক হারে কাজ করবেন এবং দুচার দিনের স্যুটিংয়েই যাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। এঁদের নিয়োজিত করার কারণ হচ্ছে. পাবলিসিটি এবং ডিষ্ট্রিবিউটর আকর্ষণ। এর পর দেখতে হবে কত কম দিন স্যুটিং করে ছবিটাকে শেষ করতে পারা যায়। এই প্রসংগে একটা কথা বলে রাখতে হচ্ছে যে, —যে সমস্ত কোম্পানীর ছবি আপনারা দেখেন, তাদের ভেতর তিন চারটী ছাড়া কোন কোম্পানীরই নিজস্ব ষ্টুডিও নেই। এঁরা ষ্টুডিও ভাড়া করে ছবি তোলেন, কাজেই তাঁরা ভাড়ার অঙ্কটা কমাতে চান কম দিন স্যুটিং করে। দু'দিনের কাজ একদিনে করে নিলে কাজের কোয়ালিটি কি রকম হয়. তা আপনারা ছবি দেখতে গেলেই বুঝতে পারেন

নতুন আর্টিষ্টদের কথা বলি এবার। তাদের কাজ সচরাচর ভাল হয়না। তার কারণ হচ্ছে ছায়াছবিতে অভিনয় করতে গেলে, কথা বলা, হাত-পা-মুখ নেড়ে গোস্ত-পশ্চার দেখানো,—সব কিছুর জন্যেই বেশ একটু তালিম পাওয়ার প্রয়োজন। একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝাই,—ধরুন রাগ, আনন্দ, দুঃখ, এই রকম কিছু একটা ভাবের অভিব্যক্তি আপনি পর্দায় দেখাতে চান; থিয়েটারের মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যদি ঐ টুকু দেখাতেন, তবে আপনাকে বেশ একটু স্থূল ভাবে অভিনয় করতে হত। কারণ, শেষের রো তে বসে থাকা দর্শককেও আপনার রসের পরিবেশন করতে হবে—যিনি মঞ্চ থেকে অনেক দূরে বসে, কিন্তু পর্দার অভিনয়ের বেলায় আপনাকে ক্যামেরা তাঁদের সামনে অনেক বড় করে দেখাল আপনার প্রকাণ্ড ক্লোজ আপ দিয়ে,—আপনার সাধারণ মুখায়তন অনেকগুণ বড় হয়ে পর্দায় ফুটে উঠল। সুতরাং সেখানে আপনাকে অভিনয় করতে হবে সূক্ষ্ম ভাবে, একটু চোখের ইংগিতে কি গ্রীবার আন্দোলনে মনের ভাবটুকুকে দর্শকদের কাছে করতে হবে পরিবেশন। নতুন আর্টিষ্টরা ঐ খানেই পড়েন পেছিয়ে। ক্যামেরা আর আলোর সংগে বন্ধুত্ব না থাকায় তাঁরা নিজেদের ভাল ভাবে প্রকাশ করতে পারেন না,
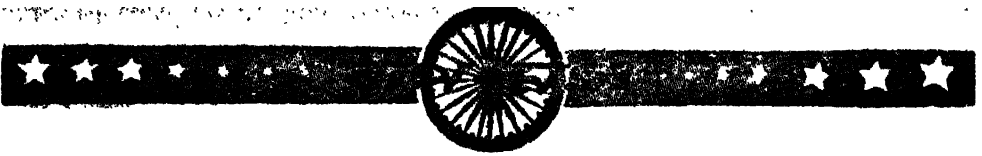
চরিত্র ভালভাবে হৃদয়ংগম করলেও। এবার আসে ফটোগ্রাফীর কথা। ফটোগ্রাফী ভাল হয় সুচারু আলোক সম্পাতে, ক্যামেরাম্যানের প্রচুর ফুরসৎ আর ল্যাবোরেটরীর কাজ ভাল হলে। ভাড়াটে ষ্টুডিওতে তিনটের কোনটাই আপনি পেতে পারেন না। ষ্টুডিওর মালিকরা ব্যবসাদার। তাঁরা কোন রকমে তিনটে কি চারটে ক্যামেরা, খান দুই রেকর্ডিং মেশিন আর গোটা কতক আলো নিয়ে, চারটে ফ্লোর (ছবিতোলা আটচালা) বানিয়ে হয়ত সাতটা কোম্পানীকে এক সংগে ভাড়া দিলেন। কারুর ভাগ্যে কোন দিন পড়ল নড়বড়ে ক্যামেরা (ফিল্ম চলতে চলতে যার অটোমেটিক সুইচ পড়ে যেতে লাগল দু'দশবার), আর গোটা কতক আলো,—যা দিয়ে এক সংগে গোটা দৃশ্যপটের অর্ধেকও এক সংগে আলোকিত করা যায় না। তাই ক্যামেরাম্যানকে শট্ নিতে হ'ল দৃশ্যপটের খণ্ড খণ্ড অংশকে আলোকিত করে। ফলে পর্দার ওপর দর্শক মশাইরা একটাও দূর থেকে নেওয়া লং শট দেখতে পেলেন না, যা দেখলে তাঁরা তৃপ্ত হতেন, ছবির গল্প বলাও উঠত জমে।

ক্যামেরাম্যানের ফুরসৎ আর মুডের কথা এবার বলি। ছায়াছবি মুখ্যত হল দেখার জিনিষ। দেখানোর মারপ্যাচের ওপরই ছবির গল্প বলা, গল্প জমে ওঠা, দর্শককে কাঁদানো, হাসানো, রাগানো—এই সব নির্ভর করে। আসলে রূপ-সৃষ্টির কাজটা হল ক্যামেরাম্যানের। সৃষ্টির ব্যাপারটা সব শিল্পেই প্রধানতঃ মনজ। কল্পনায় কোন রূপকে আগে দেখতে হবে, তবেই তো তাকে বাস্তবে বাধতে পারা যাবে। কিন্তু আমাদের ক্যামেরা-ম্যানদের কল্পনায় ধ্যানস্থ হবার সময় কই? ক্যামেরাম্যান—যিনি করবেন ছবির রূপসৃষ্টি লেখকের গল্পকে তাঁর কল্পনা-তুলি বুলিয়ে, তিনি জানতেই পারলেন না সাপ, ব্যাং কি গড়তে যাচ্ছেন। হয়ত সোমবার রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে অবধি কাজ করলেন কোন এক কোম্পানীর ট্রাজিক ছবির মৃত্যু দৃশ্যের; প্যাক আপ (স্যুটিং শেষ) হবার ছ' ঘন্টা পরে, মঙ্গলবার দশটার সময় তিনি আবার ছবি তুলতে গেলেন অন্য একটা ছবির হাসির দৃশ্যের, গল্পের মাথামুণ্ড কিছুই জানেন না তিনি; কোম্পানীর ভাড়া করা কেষ্ট—বাঁশী যখন মিলছে তখন বাঁশী বাজাচ্ছেন, আবার বাঁশীর বদলে পাঞ্চীর বাট ধরিয়ে দিলে তাতেও ফুঁ দিতে হচ্ছে, বাজুক আর না বাজুক।

এবার আসুন ল্যাবোরেটরীতে। ষ্টুডিও মহলে ঠাট্টা করে ল্যাবোরেটরীকে বলা হয় ধোবী খানা। রাজ্যের নেগেটিভ, পজেটিভ একাকার হয়ে আছে এখানে। যে ভদ্রসন্তানেরা সেখানে দিবারাত্র কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করে কাজ চালান, তাঁদের পারিশ্রমিক তো পরিশ্রম অনুযায়ী পানই না, পরন্তু তাঁদের ওপর, ক্যামেরাম্যান, রেকর্ডিষ্ট, প্রডিউসার, ডিরেক্টার নিজেদের ভুল ত্রুটির সংশোধন দাবী করেন। এঁদেরও কোয়ালিটির দিকে তাকিয়ে থাকলে চলে না। কত হাজার ফিট ছবি দিনে ডেভেলপড্ বা প্রিণ্টেড্ হ'য়ে বেরুতে পারবে, সেই দিকেই এঁদের নজর রাখতে হয় বেশী। কারণ দশটা কোম্পানীর কাজ করতে হয় এক সংগে। তবেই বুঝুন, ফোটগ্রাফী ভাল হয় না কেন সচরাচর।

সাউণ্ড রেকর্ডিংয়ের বেলাও ঠিক তাই। এই ভাড়াটে স্টুডিওতে তোলা ছবিতে রেকর্ডিংয়ের ষ্টাণ্ডার্ড বলে কোন জিনিষ আপনারা পেতে পারেন না। একটা ছবির গোড়া থেকে শেষ অবধি অন্ততঃ তিন রকম সাউণ্ড সিষ্টেমে কাজ হ'য়ে থাকে। ছবির গোড়ার দিকে হয়ত তোড়জোড় করে আর, সি, এ, সাউণ্ড ক্যামেরায় কাজ করা হ'ল, তারপর স্যুটিং কিছুটা যখন এগুলো, তখন ছবি তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্যে প্রডিউসার ঘন ঘন স্যুটিং ডেট্ নিতে লাগলেন ষ্টুডিও মালিকের কাছ থেকে। স্যুটিং ডেট্ হয়ত মিললো, কিন্তু মিললো না ঐ আর, সি, এ, সাউণ্ড ক্যামেরা; —কাজ কোন দিন হ'ল ব্রিটিশ এ্যাকষ্টিকুসে, —কোন দিন ফিড্লিটোনে, —কোন দিন বা ভিসাটোনে। রেকর্ডিং করলেন তিন জন ভিন্ন অডিওগ্রাফার। ফলে ছবি দেখতে গিয়ে শুনলেন কমল মিত্তিরের গলায় গিটকিরীর খোঁচ, সরযূ দেবীর গলায় সর্দির পোঁচ; —ছবি বিশ্বাস হাঁড়ীর ভেতর থেকে কথা বলছেন কিম্বা পরেশ বাঁড়ুয্যে কোন দুঃখে সাবালক হয়ে গেলেন তাঁর কণ্ঠস্বরে।

এবার বলি ছবি সম্পাদনার কথা। ছায়াছবির সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এই সম্পাদনার কাজ। ছায়াছবির সবচেয়ে কঠিন কাজ হচ্ছে এ সম্পাদনা—এডিটিং। সম্পাদকরা ইচ্ছে করলে ধোপার গাধাকে রেসের ঘোড়া বানাতে পারেন,—অবশ্য গাধাটা যদি সত্যি সত্যিই চারপেয়ে ল্যাজওয়ালা—মানে কিছুটা ঘোড়ার মতন দেখতে হয়। যুদ্ধের সময় থেকে আজ অবধি বহু ভুঁইফোড় পরিচালক লেড়িকুত্তাকে ঘোড়া বানাতে এনেছিলেন এঁদের কাছে। কিন্তু সে সব শ্বাপদ গাধাকে ঘোড়া বানান ত' দূরের কথা গাধার কাছ দিয়ে নিয়ে যাওয়া নাম করা সম্পাদকের পক্ষেও সম্ভবপর হয়নি। চিত্র পরিচালক হ'তে গেলে এই এডিটিং সম্বন্ধে বেশ পরিষ্কার জ্ঞান থাকা দরকার এবং এডিটিং-টুকু মাথায় না নিয়ে কোন দৃশ্য স্যাট্ করলে পরের দৃশ্যের সংগে সে দৃশ্যটুকু মেলানো যায় না। একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে বোঝাই; ধরুন ছবিতে দেখাতে হবে আর্টিষ্ট বারেন্দা দিয়ে হেঁটে এসে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে একজনের সংগে কথা কইবে। এইটুকু পর্দায় দেখাতে গেলে ছবি নিতে হবে, ক্যামেরা দু' জায়গায় বসিয়ে,—একবার আর্টিষ্টের বারেন্দা দিয়ে হেঁটে এসে ঘরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকা (তখন ক্যামেরা থাকবে বারান্দায়), আর একবার আর্টিষ্টের বাইরে থেকে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে কথা বলতে আরম্ভ করা (তখন ক্যামেরা থাকবে ঐ ঘরের মধ্যে)। এডিটরের কাজ হবে ঐ দুটো শটের মধ্যে এমন একটা সাধারণ ফ্রেম বেছে নেওয়া, যেটা দুটো শটের মধ্যেই আছে,—যেমন ধরুন প্রথম শটে আর্টিষ্ট দরজার অর্দ্ধেকটা ঢুকেছে যে ফ্রেমে—সেই ফ্রেমটা, আর দ্বিতীয় শটে আর্টিষ্ট বাকী অর্দ্ধেকটা ঢুকতে আরম্ভ করেছে যে ফ্রেমে, সেই ফ্রেমটা।

এই কমন অর্থাৎ সাধারণ ফ্রেমটা মাঝে রেখে দুটো শট জুড়ে দিলেই মনে হবে একটা সাবলীল গতি রয়েছে ছবিটার। কিন্তু শট নেবার সময় পরিচালক মশাই যদি দু' জায়গায় ক্যামেরা রেখে আর্টিষ্টকে দুবার হাঁটিয়ে কিউ অর্থাৎ সূত্র দিয়ে শট না নেন, তবে কোন এডিটরের ওস্তাদজীও ছবির সাবলীল গতি রাখতে পারবেন না। পুডহফ কিম্বা সম্পাদক রবিন দাসকেও কচাকচ কাঁচি চালাতে হবে, জাক অর্থাৎ চিড়িক বাঁচাবার জন্যে; ফলে হবে হাতীর শুঁড় ছেঁটে শুওর আর শুওরের শুঁড় ছেঁটে ছুঁচো। গল্প লেখকের বিরাট ঐরাবত পর্দার ওপর ছুঁচো হয়ে চিঁচিঁ করে বেড়াবে।

আবার ভাল ডাইরেক্টরদের কথাও বলি। তাঁরা বেশীর ভাগ সময় তাঁদের মনোমত দৃশ্যগুলো বাদ দিতে দেন না। হয়ত' আলাদা করে ধরলে তাঁদের একটা বা কতকগুলো শট বেশ সুন্দর হয়েছে, কিন্তু সমস্ত ছবিটার ভেতর যে শটগুলো রাখতে গেলে ছবির গতি হয়ত ঝুলে যাবে। এডিটর চাইছেন সে শটগুলো বাদ দিতে, কিন্তু ডাইরেক্টর মশাই শটগুলোর লোভ সামলাতে পারলেন না। ফলে হল ছবির টেম্পো বা গতির হ্রাস। সেই জন্য হলিউডের নিয়ম হচ্ছে,—ছবি তোলার পর ডাইরেক্টর এডিটিংয়ের মধ্যে কিছুই করতে পারবেন না। এডিটর শুধু প্রোডিউসরের সংগে আলোচনা করবেন কাঁচি চালানো বা জোড়াতালি দেওয়ার ব্যাপারে। তবে ওদেশের প্রোডিউসাররা হচ্ছেন ছায়াছবির পাকৃকা সমঝদার - স্যাম গোল্ডউইন, আর্নেষ্ট লুবিশ, লরেন্স অলিভার বা কিং ভিডর; আর আমাদের দেশের প্রডিউসররা হচ্ছেন,—মিলিটারী কনট্রাক্টর, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার,—মানে যাদের কাছে প্রিন্টিং মেশিন আর সিঙ্গার সিউইং মেশিন একই জিনিষ।

কাজেই দেখুন, সস্তায় ছবি তুলতে গেলে ঐ দুর্ভোগ হবেই। আর পূর্ব বাংলায় পাকিস্থান কায়েম হয়ে বাংলা ছবির বাজার অত্যন্ত সংকীর্ণ হ'য়ে গেছে। এক লাখ টাকার বেশী খরচ করলেই ছবির বেদম মার খাবার সম্ভাবনা রয়েছে বক্স অফিসের দিক থেকে। আপনারাই বলুন, আমরা আছি কোথায়, আমাদের ছায়াছবির ভবিষ্যৎ কী?

রঙ্গমঞ্চ ও সমাজ

অজিত কুমার বিশ্বাস

কাব্যের ভিতর যেমন কবি ও গ্রন্থের ভিতর যেমন আমরা গ্রন্থকারকে খুঁজিয়া পাই, ঠিক তেমনই পাই আমরা এই রঙ্গমঞ্চের রঙ্গীন পর্দার অন্তরালে সমাজের একটা প্রত্যক্ষ ছবি। মানুষ ধর্মের অনুশাসনে ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানুকুল্যেই গড়ে তোলে তার সমাজ। সমাজ সভ্যতারই নামান্তর। ইহাদের একটীকে বাদ দিলে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না। সামাজিক জীবনের উৎকর্ষই সভ্যতা। তাই সভ্য জগতে সভ্য সমাজে রঙ্গমঞ্চের স্থান সর্বোচ্চে হওয়াই উচিত। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের ভিতর দিয়া তদানীন্তন সমাজের একটী প্রত্যক্ষ ছবি রাখিয়া যান, আর রঙ্গমঞ্চ দেয় তাহারই একটা সহজ, সুন্দর, জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। সেই জন্য নাটক যথাযথরূপে অভিনীত হইলে, লিখিত নাটক অপেক্ষা অভিনীত নাটক আরও হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য হয়। যদি কোনও নাট্যের বা গ্রন্থের আলেক্ষ্য তার পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে, তাহা হইলেই নাট্যকারের নাট্য ও গ্রন্থকারের গ্রন্থ সার্থক হইয়া উঠে। তখন সেই নাট্যের মূলতত্ত্ব ও শিক্ষনীয় বিষয় পাঠকচিত্তে রেখাপাত করে। যে সমাজ অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বা সামান্য কয়েকজন শিক্ষিত লইয়া গঠিত, রঙ্গ-মঞ্চ সেই সমাজের কর্ণধার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চিত্তাবসাদে ভারাক্রান্ত মানুষ যখন চিত্তবিনোদনের জন্য রঙ্গালয়ে প্রবেশ করে, অশিক্ষিত দর্শকবৃন্দ নির্বিচারে সেই নাট্যের একটা সুস্পষ্ট অনুভূতি লইয়া ফেরে ও অনুকরণাবিষ্ট হয়। অজ্ঞতাবশতঃ অক্ষম হৃদয় অধিকাংশ সময়ে আলোচ্য বিষয়ের নীতিগত উপদেশ গ্রহণ না করিয়া, রহস্যজালাবৃত রঙ্গীন নেশার ব্যূহভেদ করিয়াই প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে যে সমাজের অধিকাংশই অশিক্ষিত, সে সমাজ রঙ্গের নেশায় রঙ্গীন হইয়া উঠে। সেই জন্যই আমরা বিপণিতে দেখিতে পাই—শাঁপমুক্তি ব্লাউজ, সিনেমাটিপ, মানেনা-মানা শাড়ী ইত্যাদির এত আধিক্য। নবযৌবনের প্রাণবন্ত উচ্ছল সলিলে সদ্যস্নাত যুবক যুবতীর বাক্যবিন্যাসে পাই—অভিনেতা-অভিনেত্রীর বাকচাতুর্য, চালচলনে পাই—অংগভংগীমা ও নয়ন কোনের নিত্য মাধুরীমা। এমন কি দাম্পত্য জীবনে মধুর ও স্বর্গীয় পবিত্র প্রেমকেও নাট্যচাতুর্য স্পর্শ করিয়াছে। ছবি ও ধীরাজ যেমন ডগলাস্ গোঁফ, হ্যাটকোট ও নেকটাই মারফৎ কানন ও সন্ধ্যাকে বিস্মৃত করিয়াছে; কানন সন্ধ্যাও তাঁদের আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগলে সুচারুরূপে সুরমা টানিয়া, অধঃবিন্যস্ত দোদুল্যমান কেশভার গ্রীবাদেশে এলাইয়া দিয়া, বুজ-কুমকুমে অংগবিশেষ আরক্ত করিয়া, ভ্যানিটি ব্যাগে ভ্যানিটি ভরিয়া একেবারে ঠিক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুস্থতা না থাকিলেও চটুলতা চাতুর্যে কিন্তি মাত। সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য তাঁহাদের অনেকেরই বিলাসব্যসনে ও আত্মম্ভরিতায় আত্মবিলোপ করিয়াছে। অর্ধশিক্ষিতেরা রঙ্গীন চশমা ধারণ করিলেও ক্ষণেকের বিস্মৃতি কাটাইয়া উঠিতে পারেন। সেই জন্য সংস্কারকে মুছিয়া ফেলিতে না পারিলেও সংস্কৃতিগত উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত হবেন। আর শিক্ষিতেরা বাহুল্য ও রং তামাসা বর্জন করিয়া প্রকৃত শিক্ষনীয় বিষয়ই গ্রহণ করেন। এইখানে হয় অতীত ও বর্তমানের সমন্বয়। অতীতের সভ্যতা, কৃষ্টি বা যা-কিছু গ্রাহ্য, বর্তমান সমাজ-জীবনে অপরিহার্য ও সহায়ক, তাহা গ্রহণ করেন এবং নানা পন্থায় নব্যসমাজের গতিবেগকে ফিরাইয়া দিয়া আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। তাহা হইলেই দেখা যায়, রঙ্গালয় রং তামাসার লীলা-নিকেতন হইলেও বস্তুতঃ সমাজ-জীবনে ইহার স্থান অনেক উচ্চে। অবশ্য কিছুটাত রঙ্গ ও অংগভংগীমা পরিত্যাগ পূর্বক সামাজিক সর্বাংগীন উন্নতির একমাত্র সহায়ক হওয়া চাই।

রঙ্গালয় হইবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমন্বয়-ক্ষেত্র। অতীতের সংস্কৃতি, সভ্যতা ও স্বর্ণময় ইতিহাসকে স্মরণ করাইয়া বর্তমানকে প্রণোদিত ও প্রাণবন্ত করিয়া ভবিষ্যতের উচ্চাদর্শকে অনুসরণ করাইবে।
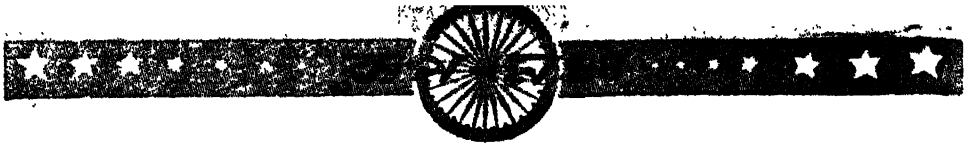
দুর্নীতিকে পরিহার করাইয়া বর্তমান সমাজের তির্যক দৃষ্টিভংগীকে ফিরাইবে। ইংরাজ আমলে সুচতুর বিদেশীরা সমাজ ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করিবার নিমিত্ত, এই রঙ্গালয়গুলির উপর নিষেধ আজ্ঞা জারী করিয়াছিল। তখন রঙ্গালয়কে রঙ্গালয় করিয়াই রাখা হইয়াছিল। সমাজের একটি মাত্র দিকই ছবির পর্দায় দেখান হইত। ফলে বৈধ ও অবৈধ প্রেমের বন্যা বহিয়া গেল। নীতি ও আদর্শের অভাবে দর্শকবৃন্দের হৃদয় জয় করা কষ্টসাধ্য ছিল। সুতরাং সাজপোষাকের পরিপাট্যে ও অংগভংগীমার অভিব্যক্তিতেই তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে হইত। ফলে সমাজ জীবনে তাহারই একটা প্রত্যক্ষ ছাপ পড়িয়াছিল। পৌরাণিক নাট্যাভিনয় যে হইত না, তাহা নহে। তবে পাপপংকিল বিলাসভোগী ব্যাধিগ্রস্ত মানব হৃদয় পৌরাণিক যুগের সেই কঠোর শ্রমলব্ধ নীতিজ্ঞান ও আদর্শকে গ্রহণ করিতে পারিল না। ইহার পর উৎপীড়িত ভারতবাসী যখন মালিক ও বৈদেশিক শাসনে তিক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, তখন সর্বপ্রকার আইন বাঁচাইয়া "উদয়ের পথে" এক নূতন অধ্যায়ে দেখা দিল। সবাই যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। ক্রমে ক্রমে গণতন্ত্রবাদে নাট্য, নাট্য-মন্দির ছাইয়া গেল। অমনি সমাজের বুকে তাহারই একটা ছাপ পড়িল। ধর্মঘট আর ধর্মঘট। এমন কি স্বামী-স্ত্রীতে পর্যন্ত ধর্মঘট আরম্ভ হইল। দুঃস্থ ও উৎপীড়িতের নিকট গণতন্ত্রবাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিষ আর কি থাকিতে পারে? তবুও দেখিতেছি ইহার উপরেও দর্শকবৃন্দের অবজ্ঞা আসিয়াছে। ইহার কারণ কি?—সমাজ আজিও তেমন গ্রহণযোগ্য হইয়া উঠে নাই। আমরা মায়াকান্না কাঁদিতে পারি ও ক্রূর হাসি হাসিতে পারি, কিন্তু প্রাণ খুলিয়া হাসিতে বা কাঁদিতে পারি না। তাই হৃদয়হীন বাক্যাড়ম্বরে কতকগুলো লোক জড়ো করা যায়। সমুদ্র বক্ষে ব্যাত্যার আক্রমণে তরী রক্ষা হয় না। কর্মী হওয়া ও কর্মী তৈরী করা এক কথা নয়। বাগ্মীতা আদর্শকে ছাপাইয়া উপছাইয়া পড়ে আর কর্ম আদর্শকে পুরাপুরি রূপ দিয়া তবে ক্ষান্ত হয়। ভারতের বাগ্মী গণতন্ত্রবাদী নেতাদের অন্তঃসার শূন্য বক্তৃতায় মানুষ প্রলুব্ধ হয় বটে কিন্তু অনুপ্রাণিত হয় না। আবেগ আসে কিন্তু আত্মস্থ হয় না। তাই উহাতে ভাঁটা পড়িয়াছে। আর ভাল লাগে না। বরং "রামের সুমতি" ও "স্বয়ং সিদ্ধায়" নৈতিক আদর্শ আধুনিক ধারায় প্রতিফলিত হওয়ায় আবার একটা নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে। ইহার কোন দলবিশেষ বা ব্যক্তি বিশেষকে লইয়া অংকিত হয় নাই। তাই ইহারা সর্বকালের ও সব দেশের, ইহারা চির নতুন। তাহা হইলে নাট্যাভিনয় আদর্শবাদী ও আধুনিক রুচিসম্মত হওয়া চাই। পূর্বেই বলিয়াছি সামাজিক উৎকর্ষই সভ্যতা। রঙ্গালয়গুলি একটু চেষ্টাশীল হইলেই সমাজ সংস্কার অনেক সহজ সাধ্য হইবে। সমাজের অন্তর্গলদ সম্বলিত ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নাট্যাদি অভিনীত হইলেই মানব চরিত্র সংগঠিত হইবে ও ব্যাধিগ্রস্ত সমাজ স্তরে স্তরে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে। ক্রমে সুসংযত মানবকে তথা সমাজকে ত্যাগ ও অহিংসার পথে চালিত করিতে হইবে। এ ছাড়া অভিনয়যোগ্য নাটকগুলির ভিতর শ্রেণী বিভাগ করিতে হইবে। যে সকল নাটক হাস্য কৌতুক, চরিত্র সংগঠন, বীরত্বব্যাঞ্জক ঐতিহাসিক তত্ত্বে পরিপুষ্ট, অপরিণত বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রী ও বালক-বালিকাদের কেবল তাহাতেই প্রবেশ অধিকার থাকিবে মাত্র। অদ্যকার শিশু-ছাত্রই আগামী দিনের সমাজ নেতা, দেশনেতা, ও জাতি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং যাহাতে কোনক্রমেই তাহাদের চরিত্র কলংকিত না হইতে পারে ও কু-আদর্শে অনুপ্রাণিত না হয়, সে জন্য পিতা মাতার লক্ষ্য রাখা যেমন কর্তব্য, সমাজ সংস্কারক হিসাবে রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে অনুরূপ দৃষ্টি রাখা উচিত। অন্যথা সমাজ জীবনের অধঃগতির জন্য তাঁহারা যত বেশী দায়ী হইবেন এত বেশী আর কোন পক্ষই আর হইবে না। হয় আর্থিক উন্নতির দিকে একটু লোভ সম্বরণ করিয়া অথবা শিশু-ছাত্রদের উপযোগী বিভিন্ন নাট্যের অভিনয় দ্বারা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য রঙ্গালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

পরিবর্তন

[গল্প]

কুমারী মীণা মুখোপাধ্যায়

[বর্তমান গল্পের লেখিকা একজন কিশোরী বালিকা। তার কচিহাতের কাঁচা লেখা আশাকরি রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকারা সহানুভূতির দৃষ্টি দিয়েই বিচার করবেন। কুমারী মীণা চরিত্রাভিনেতা ডাঃ হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা এবং জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাগিনী। —সম্পাদক]

সারাদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর সন্ধ্যার দিকে আকাশটা একটু স্বাভাবিক হ'য়ে এসেছে, রাস্তায় আবার লোকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। জানলাটা এতক্ষণ বন্ধই ছিল। সুমিত্রা কি মনে করে জানলাটা হঠাৎ খুলে ফেল্লে। সংগে সংগে ভিজে হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। সুমিত্রার এলোমেলো চুলের মধ্যে দিয়ে হাওয়াটা চলে গেল —আরও এলোমেলো করে দিয়ে গেল তার কৃষ্ণকালো চুলের গোছাগুলিকে। চুলগুলো সামলাতে সামলাতে বাইরের দিকে চাইল। চাউনির মধ্যে কোন উদ্দেশ্যই ছিল না—এমনি, অর্থহীন।

রাস্তার ওপারের ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে ছোট একটি মেয়ে ভিজে চুপচুপে শতছিন্ন একটি জামা গায়ে। ভিখেরীর মত কেউ নেই! কে একজন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে দেখে মেয়েটী কাতর কণ্ঠে বল্লে, "সারাদিন কিছু খাইনি বাবু, একটি পয়সা"—কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই তাকে এক ধমক দিয়ে ভদ্রলোকটি সামনের একটি রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলো।

শহরের পথে ঘাটে এ দৃশ্য নতুন নয়। স্থানে অস্থানে বহ্মানের অহেতুকী ক্রোধের এ অভিব্যক্তি সুমিত্রা বহুবার লক্ষ্য করেছে। কিন্তু আজকের এই ছোট ঘটনাটি হলো তার মানসলোকে এক অভূতপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করলো। কি অদ্ভুত মানুষের প্রবৃত্তি। মেয়েটীকে একটা ধমক দিয়ে সে নিজে বন্ধুবান্ধব নিয়ে খেতে ঢুকলো। এতগুলো ছেলের মধ্যে একজনেও কি একটা ফুটো পয়সা দিয়ে মেয়েটীকে সাহায্য করতে পারলো না? মানুষ হ'য়ে জন্ম গ্রহণ করে মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপনের সংগতি তার নেই। তাই বলে কি তার বাঁচবার অধিকারও নেই? সারাদিন বড়লোকদের ধমক খাবে, আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, ওদের কি এই জীবন! এমনি ভাবেই বড় হবে—এমনি ভাবেই খেতে না পেয়ে পেয়ে জীবনের শেষ হ'য়ে আসবে! ওদের কি এই সমাজের মধ্যে একটুও স্থান নেই—একটুও মেশবার অধিকার নেই! হয়তো নেই। ওরা যে নিঃস্ব।

* * *

সামাজিক ব্যবস্থার এই অসংগতি নিয়েই অনিলদার সংগে আজ বিকালে সুমিত্রার ঝগড়া হ'য়ে গেছে। তাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল এক উৎসবে। কিন্তু সে উত্তর দিয়েছিল: "যে টাকা খরচ করে তোমরা এই উৎসব করছো, সেই টাকাটা "অনাথ আশ্রমে" পাঠিয়ে দিও। যে দেশের লোকেরা দিনের পর দিন না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছে, 'সেই দেশেই' এক শ্রেণীর লোক অজস্র টাকা খরচ করে স্ফূর্তি করছে। তোমার লজ্জা করছে না? আমি তোমাদের ও উৎসবে যোগ দিতে পারবো না! কিছুতেই পারব না!"

অনিল দা জবাবে বলেছিল, "সুমি, এটা তোমার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি", সুমিত্রা উত্তরে বলেছিল—"হ'তে পারে! কিন্তু জেনে রেখ, তোমাদের ও সমাজের সংগে আমি নিজেকে একটুকুও খাপ খাওয়াতে পারবো না। পারবোনা ওদের ভুলে থাকতে,—যারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—চোখের জল যাদের শুকোয় না—"

সুমিত্রার বড় ইচ্ছে হল অনিলদা'কে ডেকে এনে একবার দেখায়! কিন্তু বৃথা! ওরাতো সব সময়ই এ সব দেখ্‌ছে। তবু ওদের চৈতন্যোদয় হচ্ছে কোথায়!

সুমিত্রার মন নানান কথায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে।

হঠাৎ চমক ভাঙলো। আরে! মেয়েটীকেতো আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেল? একটু এদিক

ওদিক তাকিয়ে দেখতে গেল, পাশের ঐ গাছটার তলায় বসে মেয়েটী এক দৃষ্টিতে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে।

সুমিত্রার কতগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। তার মধুর স্বভাবের জন্য সকলেই তাকে ভালবাসে। যেখানেই যাক না কেন, কেউ ওকে "বা! বেশ, সুন্দর মেয়েটাতো," না বলে থাকতে পারতো না। দেখতে যে ও খুব সুন্দর ছিল তা নয়, কিন্তু অপরূপ লাবণ্য, আর অপূর্ব উজ্জল দু'টি চোখ নিয়েই লোক সমাজে ছিল তার জয় যাত্রা। ওর শান্তময়ী লক্ষ্মীমূর্তি দেখে কত গিন্নিই না ওকে তাঁদের ঘরের বধু করে নিতে চেয়েছেন!

সুমিত্রার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। স্কুলে ওকে ছাড়া সহপাঠিনীদের একমিনিটও চলতো না। ওর মত না নিয়ে কেউ কোন কাজ করতো না। নাচ, গান, থিয়েটার সবেতেই ওর ডাক পড়তো সবাগ্রে। স্কুলের প্রতিটি শিক্ষয়িত্রী ওকে খুব ভালবাসতেন। ওর স্বভাবে সকলেই মুগ্ধ। কিন্তু, সুমিত্রা বেশী কথা বলতো না। সব সময় একটা যেন কি ও ভাবতো। স্কুলে থাকতে যদিও বা দু-একটা কথা বলে, বাড়ীতে ঢুকলেই ওর মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়। বাড়ীর আবহাওয়ার সংগে ও যেন সমান তালে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না। ওর মনের ভাবটা কারোর কাছে প্রকাশ করতেও পারে না। ও বাইরে পেত খ্যাতি, নিজের বাড়ীতে পেত তাচ্ছিল্য।

সুমিত্রা ঐ সামান্য স্কুলের লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু শেখবার মত সুবিধা বা সুযোগ পায়নি। কিন্তু নাচে, গানে, আলাপে, আলোচনায়—যে খ্যাতি অর্জন করেছে তা নিজের চেষ্টায়। তাকে বয়স অনুযায়ী একটু ছোট দেখাতো বলে সকলেই তাকে বড় ছেলেমানুষ বলে মনে করতো। যদি কোন সামাজিক আলোচনায় যোগদান করতে যেত, তাহলে ওর কথা বাড়ীতে বিশেষ কেউ কানে নেওয়া প্রয়োজন মনে করতো না। অনেক উচ্চ আকাঙ্খা ওর এমনি ভাবে অবহেলিত হ'ত। মাঝে মাঝে ওর মনে হ'ত কোথাও পালিয়ে যায়। অনাথাদের সেবা করবে—দরিদ্রের দুঃখ মেটাবে—গ্রামে গ্রামে ঘুরবে—দুস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সংঘবদ্ধ করবে—তাদের শিক্ষা দেবে। মনে তাদের নতুন আশার সঞ্চার করাবে। নতুন করে গড়ে তুলবে তাদের। নানারকম শিক্ষায়তন খুলবে তাদের জন্য। কিন্তু সব কল্পনাই বৃথা হয়ে যায়। কে তাকে এত টাকা দিয়ে সাহায্য করবে? এই অসম্ভব কাজে কে হবে তার সহায়? সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শূন্য আকাশের দিকে। কে ওকে আশারবাণী শোনাবে! ওর আশা কি মিটবে না?

সুমিত্রা চমকে ওঠে। তার মনের মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। যদি সত্যি সত্যি সে তাদের একটু খানিও দুঃখ মেটাতে পারে—যদি সে এই পথে বেরিয়ে পড়তে পারে, তাহলে অনিলদাদের হাত হ'তে ও রক্ষা পায়। তখন এমনি ভাবে জ্বালাতন করতে সাহস পাবে না। এই কথা ভেবে সে তার আলনা হ'তে একটা কাপড় ও ব্যাগ থেকে দু টাকার নোট একটা নিয়ে সিঁড়ি থেকে নীচে নামতে লাগল।

* * *

সুমিত্রাদের বাড়ীটা খুব বড় না হলেও একেবারে ছোট ছিল না। নীচের ঘরগুলোকে একেবারে খালি না ফেলে রেখে সুমিত্রার বাবা ওরই মধ্যে ভাড়াটে বসিয়েছিলেন। ভাড়াটেরা তিনটী প্রাণী—অজিত, অণিমা ও তাদের মা।

অজিত এম-এ ক্লাসের ছাত্র, কিন্তু অবসর সময়ের পেশা ছিল তার ছবি আঁকা। আরও হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু সে যে কি করতো তা কেউ জানতো না। শোনা যায় ইতিপূর্বে দু-একবার পুলিশের নেক নজরে পড়ে জেল খেটেও এসেছে।

উপরের লোককে নীচে নামতে হলে অজিতদের এই বারান্দা পার হ'য়ে যেতে হয়। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে অজিত দেখলো বাড়ীতে কেউ নেই। ঠাণ্ডার দিনে ভেবেছিল বাড়ী থেকে এক কাপ চা খেয়েই ক্লাবের দিকে বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু তা আর হবার নয়। তবু যে এক কাপ চা না হ'লে তার চলছিল না! কি একটু ভেবে সে সুমিত্রাদের উপরের দিকে যাবার

জন্য সিঁড়িতে পা দিতেই সুমিত্রার সংগেই দেখা হ'য়ে গেল।

অজিত আশ্চর্য হ'য়ে বলে উঠলো, "সুমি এত রাত্রে একলা কোথায় বেরুচ্ছো?" সুমিত্রা একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো। জবাবে আমতা আমতা করে বল্লে, "কোথাও না। আপনাদের এখানেই আসছিলাম! অণিমা কোথায়?"

"জানিনা তো, ওরা সবাই কোথায় বেরিয়েছে। ভিজে ভিজে কলেজ থেকে এসে এক কাপ চা পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম, তোমাদের ওখানে গেলে হয়তো এক কাপ জুটতেও পারে। দেবে এক কাপ? আমাদের উনুনে আগুন নেই। থাকলে হয়তো তোমাকে বোলতাম না।"

সুমিত্রা কৃত্রিম অভিমানের সুরে জবাব দিল, "বললেই হয় এক কাপ চা দাও! এত বিনয় কেন? কোনও দিন কী আপনাকে চা দিইনি?"

"আহা, রাগ করছো কেন? আমি কি বলছি তুমি দাও নি? কথা রেখে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসোতো লক্ষ্মীটি।"

সুমিত্রা কি উদ্দেশ্যে নীচে নেমেছিল তা অজিতকে বলতে সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু ভয়ই বা কেন? অজিতদাইতো এদেরই জন্য কতবার জেল খেটেছেন—এদের সুখ-সুবিধার জন্য কতবার কত আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশের কাছ থেকে লাঠি খেয়েছেন, সেদিন তো অজিত দা-ই বলছিলেন, "ওরা যতদিন না সুখী হবে ততদিন আমাদের কাজের বিরাম নেই। ওদের জন্য সংগ্রাম আমাদের ততদিন করতে হবে, যতদিন না ওরা দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে।"

এতক্ষণ এক দৃষ্টিতে ও অজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অজিতও একটু অন্যমনস্ক ছিল। নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিত্রাকে এখনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অজিত বল্লে, "কি সুমি! তুমি এখনোও গেলে না?" সুমিত্রা চোখটা নিচু করে জবাব দিলে, "আমি যে একটু বাইরে যাবো। বাইরে ঐ গাছতলায় একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কাপড় নেই। যেটুকুও আছে তাও শতছিন্ন—আর তাও আবার গেছে বৃষ্টিতে ভিজে। তাকে এটা দিয়ে এসে চা করে দিচ্ছি। এক্ষুনি আসবো।"

সুমিত্রার কথা শুনে অজিত বিস্মিত হল না। জবাবে গম্ভীর ভাবে বললে, "আচ্ছা সুমি, এরকম অনেক আছে। তুমি কতজনের দুঃখ মেটাতে পারবে? ওর সাময়িক কষ্ট হয়তো মিটবে। কিন্তু তারপর! ওদের দুঃখতো এমনি করে মেটানো যায় না, সুমি।"

"জানি, অজিতদা কিন্তু, চোখের সামনে ওর কষ্ট যে দেখতে পাচ্ছি না।"

"তোমাকে আমি দিতে নিষেধওত করছি না সুমি! আমি বলছিলাম, দানে কখনোও দুঃখ মেটানো যায় না।" তারপর কি একটু ভেবে অজিত পুনরায় বল্লে—"কৈ দাওতো আমায় ওটা, দিয়ে আসছি। রাত্রে আর একা বাইরে যেও না।"

"আচ্ছা অজিত দা, আপনি যে বলেছেন, সাহস না থাকলে কোন কাজ করা যায় না। আবার আপনিই একা আমায় বাইরে যেতে দিচ্ছেন না! এমনি করেই তো আপনারা আমাদের পেছনে টেনে রাখছেন।"

অজিত একটু হেসে জবাব দিলে, "একা বাইরে গিয়ে, ভিক্ষে দিয়ে কি এমন সাহসের পরিচয় দেবে? এক্ষুণি তোমার বাবা কি মা দেখলে একটা ধমক দেবেন, অমনি ভালমানুষের মত সুর সুর করে পড়ার ঘরে ঢুকবে। এই টুকুতো তোমার দৌড়! সাহসের পরিচয় এমনি ভাবে দেওয়া যায় না, আর এটাতো সাহসের পরিচয় নয় সুমি, এটা দাতার অভিমান।"

"তা হোক, আমি আপনার সংগে যাবো।"

"বেশ চলো।" বলে ওরা দু'জনেই বেরিয়ে পড়লো।

গলি দিয়ে খানিকটা পর রাস্তা, অজিত জিজ্ঞাসা করলো, "কৈ সুমি মেয়েটা এখানে নেই তো।"

সুমিত্রা একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে বল্লে, "ঐ যে, ঐ ফুটপাথে, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না, ডেকে আনুন না ওকে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।"

অজিত একটু এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ডাকলো। মেয়েটি ছুটতে ছুটতে এসে অজিতের সামনে দাঁড়ালো। অজিত ওকে সুমিত্রার কাছে নিয়ে এল।

সুমিত্রা ওর ছোট হাত দুখানির মধ্যে কাপড়খানা ও নোটটা গুঁজে দিয়ে বল্লে, "ভিজে কাপড়টা খুলে ফেল। আর
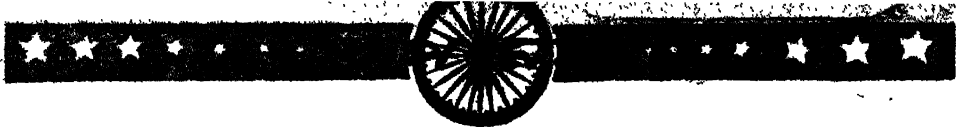
এটা দিয়ে কিছু কিনে খেও, কেমন?" আরও অনেক কিছু বলবার ইচ্ছে হচ্ছিল তার, কিন্তু অজিতের সামনে লজ্জায় তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

মেয়েটির মনে হ'লো সে যেন স্বপ্ন দেখছে। কিছুক্ষণ অর্থহীন অবাক দৃষ্টিতে সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা হেঁট হ'য়ে সুমিত্রাকে প্রণাম করতে গেল। সুমিত্রা এক পা পিছিয়ে এসে বল্লে, "ছিঃ প্রণাম করছ কেন! ছুটে চলে যাও। বৃষ্টিতে আর ভিজো না।" মেয়েটি আরও খানিকক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে চলে গেল।

মেয়েটি দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। অজিত ও সুমিত্রা অন্ধকারের মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মেয়েটির চলে যাওয়ার দিকে চেয়েছিল কিছুক্ষণ। হঠাৎ সুমিত্রার খেয়াল হতেই বাড়ীর দিকে ফিরে গেল। অজিত সেই অন্ধকারের মধ্যে ঠিক তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। তার ভাবপ্রবণ মনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীগুলির ওপর দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেন কিসের একটা আলোড়ন বয়ে গেল—সমস্ত তন্ত্রীগুলো একসংগে শব্দমুখর হ'য়ে উঠলো।

অজিতের সহসা আজ মনে হ'ল সুমিত্রা অতি সুন্দর। দেহে, মনে, কর্মে, করুণায় অপরূপ! তুলনা নাই। সর্বহারার দুঃখে বিগলিত চিত্ত—তাদের ব্যর্থ জীবনের সমস্ত গ্লানি মুছে দেবার ছবি যেন সে সুমিত্রার করুণ দুটি চোখের মধ্যে দেখতে পেল।

মাঝে মাঝে অজিতের ইচ্ছে হয়, ওকে পাশে টেনে নিয়ে একসংগে দাঁড়িয়ে সামনের দুরন্ত ঝড়ের সংগে লড়াই করে! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই ঝড়ের উদ্দাম গতিমুখে ভেসে গেছে কত সাধক—ভয় কি? যদি তাই হয়! হাজারে হাজারে আসবে অজিত ও সুমিত্রার দল। তাদের শক্তি রুদ্ধ করে দেবে ঝড়ের গতিকে।

হঠাৎ তার চমক ভেংগে গেল। দেখলে সুমিত্রা তার পাশে নাই। ছুটে বাড়ীতে ঢুকে দেখতে পেল, সুমিত্রা ওপর থেকে চা নিয়ে নামছে।

অজিত হেসে বল্লে—"আমায় একলা ফেলে তুমি যে বড় পালিয়ে এলে?"

"আমারতো আর আপনার মত ভাববার ফুরসৎ নাই—চা করতে ছুটে এলাম। এই নিন—ধরুন। খেয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করুন। আমি চললুম—কাল আবার স্কুলে যেতে হবে।" ব'লে সামনের টি-পয়ের ওপর চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে ওপরে উঠতে গেল।

অজিত বাধা দিয়ে বল্লে—"শোন। যেওনা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব।"

সুমিত্রা ফিরে দাঁড়াল—"বলুন।"

অজিত আবিষ্টের মত তাকে প্রশ্ন করলে, "আচ্ছা, সুমি, তুমি তোমার দেশকে ভালবাসো?"

সুমিত্রা হেসে ফেল্লে, জবাবে বল্লে—"ওমা! এ আবার কি কথা। নিজের দেশকে কে আবার ভালবাসে না।"

"না সুমি, সে রকম ভালবাসা নয়। এই দেশের যত কল্যাণ-অকল্যাণ, যত কিছু সঞ্চিত অভিশাপ, সব কিছুকে সমান ভাবে তুমি ভালবাসতে পারবে?"

আবহাওয়াটা হালকা করবার অছিলায় সুমিত্রা বল্লে, "আপনার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল।"

অজিতের কানে ও কথা ঢুকলো না—পুনরায় প্রশ্ন করলে—"কই বল্লে না?"

সুমিত্রা সিঁড়ি থেকে নীচে নেমে এল—স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ অজিতের মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, "অজিতদা, আমি বিচার করে কখনোও কাউকে ভালবাসিনি। যেদিন থেকে দেশকে ভালবাসতে শিখেছি, সেদিন থেকে এই হতভাগ্য দেশটার পাপ, পুণ্য, ছোট, বড় সব কিছুই ভালবেসেছি। ভালবেসেছি এই দেশের মাটিকে, ভালবেসেছি এই দেশের সোনাকে।" বলতে বলতে সুমিত্রার চোখ দুটো জলে ভরে এলো। আর কিছু সে বলতে পারলো না—মুহূর্তের মধ্যে ছুটে ওপরে চলে গেল। অজিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। (আগামীবারে সমাপ্য।)

সম্পাদকের দপ্তর
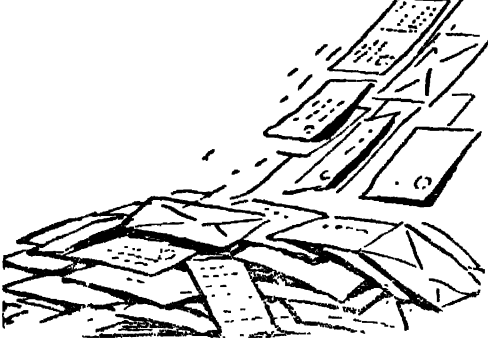
রীতা রায় (লোকপুর, বাঁকুড়া)—শুনলাম সব্যসাচী চিত্রখানি শেষ করে 'অগ্রদূত' এসোসিয়েটেড ডিষ্টিবিউটর্সে'র হ'য়ে নিতাই ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে 'সমাপিকা' নামে একখানি চিত্র তুলছেন। এর নায়ক-নায়িকার নাম জানাবেন কি ?

●● 'অগ্রদূত' সব্যসাচীর কাজ শেষ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের হ'য়ে নিতাই ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে 'সমাপিকা' নামে আর একখানি চিত্র-নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছেন, একথা সত্য। সমাপিকার নায়ক-নায়িকা রূপে দেখতে পাবেন—দীপ্তিরায়ও সম্ভবতঃ কমল অথবা জহরকে

রমা বসু (কাঁথি, মেদিনীপুর)

●● রবীন্দ্র জন্মতিথি উদযাপনে আপনারা কলেজের মেয়েরা মিলে 'গৃহ-প্রবেশ' নাটকাভিনয় করেছেন জেনে খুবই খুশী হলাম। আপনার অখিলেশের জন্ম ধন্যবাদ। আশা করি পড়াশুনার ফাঁকে এমনি কৃষ্টিমূলক আন্দোলনে যোগ দিতে ভবিষ্যতেও দ্বিধা বোধ করবেন না।

বাসন্তী ও কৃষ্ণা গোস্বামী (শ্রীরামপুর, হুগলী) আমরা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা জানতে চাই—আশা করি জানাবেন।

●● হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ৩বি, ইন্দ্র রায় রোড, কলিকাতা।

নির্মল শীল (শীল গলি, চুঁচুড়া)

'রূপ-মঞ্চে' পাঠকদের জন্য কোন বিশেষ একটী বিভাগ খুলবার পরিকল্পনা আছে কী ? আমার মনে হয় এমন একটী দপ্তর খোলা উচিত, যাতে চিত্রশিল্পের উন্নতি সম্বন্ধে পাঠকদের মতামত স্থান লাভ করতে পারে ?

●● নতুন করে এরূপ আর একটী বিভাগ খুলবার প্রয়োজনীয়তা কী আছে ! এজন্য সম্পাদকের দপ্তরই কী যথেষ্ট নয় ? এ বিভাগেত শুধু প্রশ্নের উত্তরই দেওয়া হয় না—চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কে পাঠকসাধারণের অভিমতকেও ত স্থান করে দেওয়া হয়। নামে এটা সম্পাদকের দপ্তর হ'লেও, মূলতঃ এটী পাঠক সাধারণেরই দপ্তর নয় কী ? চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কে আপনাদের যে কোন অভিমত এই বিভাগ মারফৎ ব্যাক্ত করতে পারেন।

জিতেন মুখোপাধ্যায় (কলোনেল গোলা, মেদিনীপুর) যদি কোন নতুন লেখক তাঁর রচনা পর্দায় রূপায়িত করিতে চান, তবে কি করিলে বা কাহার নিকট আবেদন করিলে সুফল পাওয়া যাইবে। এ সম্পর্কে আপনার নিকট হইতে কোন সুফল পাওয়া যাইবে কি না।

●● নতুন লেখকদের পর্দার লোভটা পরিত্যাগ করতে প্রথমেই অনুরোধ জানাবো। সাহিত্য সৃষ্টিতে শুধু জন্মগত প্রতিভা থাকলেই চলে না—অভিজ্ঞতা ও প্রচুর অধীত জ্ঞানের প্রয়োজন, যা নতুন লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না। এখানে 'নতুন' বলতে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে 'নতুন ও পুরাতনের' শ্রেণী বিভাগ রয়েছে—সেই নতুনের কথা আমি বলছি না। এখানে নতুন বলতে, যাঁদের রচনার সংগে জনসাধারণ মোটেই পরিচিত নন। যাঁদের প্রতিভাকে যাঁচাই করে নেবার কোন সুযোগই তাঁরা পাননি। অধীত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে যেসব প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা সাহিত্য জগতে পা বাড়িয়ে পত্র-পত্রিকা অথবা প্রকাশিত পুস্তকাদির দ্বারা জনসাধারণের আস্থা অর্জন করতে পারবেন—তাঁরা যদি নিজেদের কোন রচনাকে চিত্র-রূপায়িত করে তুলতে চান, তখন আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে একথাও ঠিক, এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত নেই।

উমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (সাঁনবান্ধা, বাঁকুড়া) কমল মিত্রকে আর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে দেখতে পাওয়া যায় না কেন ? (২) মানানুসারে এঁদের পর পর সাজিয়ে দিন : মিহির ভট্টাচার্য ; শরৎ চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কেষ্টধন, কমল মিত্র, ভূমেন রায়, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী।

●● (১) মিনার্ভা নাট্য-মঞ্চের সংগে কমল মিত্রের সম্পর্ক-চ্ছেদ হ'য়েছে। (২) এভাবে পরপর সাজিয়ে দিয়ে শিল্পীদের সত্যিকারের মান বিচার করা যায় না। একথা একাধিকবার এই বিভাগে আমি বলেছি। কারণ, এক একজন শিল্পী নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের গুণে আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। যে সব শিল্পীদের মাঝে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমশ্রেণীর বলে মনে হয়, কেবলমাত্র তাঁদেরই মানানুসারে সাজানো চলে। তবে অনেকসময় এঁদের প্রতিভার মানানুসারে নয়, জনপ্রিয়তার মানানুসারে সাজিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবু এর ভিতর কিছুটা গোঁজামিল থেকে যায় বৈকী ? যাক। আপনার বর্তমান শিল্পীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করে নিচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর ভিতর ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র ও জহর গাঙ্গুলীকে ফেলতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভূমেন রায়, বিপিন গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, কেষ্টধন মুখোপাধ্যায় ও শরৎ চট্টোপাধ্যায়কে ফেলতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীদের ভিতর ভূমেন রায়ের বিগত-প্রতিভার কথা একটু বিশেষভাবেই উল্লেখ করতে চাই। সংযম ও নিষ্ঠার সংগে চললে ভূমেন বাবু তাঁর বৈশিষ্ট্যের গুণে এঁদের যে কোন শিল্পীকে টেক্কা দিতে পারতেন।

বিমল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সুখচর, ২৪ পরগণা) ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের পরবর্তী চিত্রের নাম কী ?

●● এঁদের 'গাঁয়ের মেয়ে' বহুদিন পূর্বে সমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে।

পরিমল ভট্টাচার্য (আগড়তলা, ত্রিপুরারাজ্য)

●● মণিদীপাকে এক রূপ-মঞ্চের পাতায় ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখতে পাবেন না। শিল্পী হিসাবেত নয়ই। হয়ত এই নামটা কারো ভাল লেগেছে, তিনি অমনি এটাকে গ্রহণ করে বসেছেন—যা মোটেই উচিত নয়। কমল মিত্রকে কানন দেবী প্রযোজিত অনন্যা চিত্রে দেখতে পাবেন—এসোসিয়েটেড পিকচার্সের সব্যসাচী ও সম্রাপিকাতেও দেখতে পাবেন—তাছাড়া আরো যেসব চিত্রে অভিনয় করছেন, ষ্টুডিও সংবাদের ভিতর থেকে জানতে পারবেন।

ফণি গুপ্ত, রুবী গুপ্ত, জয়দেব চট্টোপাধ্যায় (লক্ষ্মণ দাস লেন, হাওড়া)

আমাদের বাংলাদেশে একটি এমন প্রতিষ্ঠান নাই যেখানে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে যথা : পরিচালনা, শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু এইরূপ একটী প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশে খুবই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে। বাংলা দেশে প্রতিভাবান পরিচালক ও শিল্পীর অভাব নেই অর্থাৎ বাংলা দেশে অভিনয় এবং পরিচালনা শিক্ষা দেবার লোক যথেষ্ট আছেন, কিন্তু তাঁরা বোধ হয় এই বিষয়ে সচেষ্ট নন বা দায়িত্ব নিতে চান না।

●● এরূপ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা চিত্র শিল্পের শুভানুধ্যায়ী কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। যাঁরা ষ্টুডিও মালিক, তাঁরা অতি সহজেই এরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠছেন কোথায় ? শিক্ষা দেবার লোকেরও যে অভাব নেই, একথাও সত্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংক্রান্ত নতুন নতুন বিভাগ খুলছেন, তাঁদেরও পরিকল্পনার মাঝে যে একে কেন গ্রহণ করছেন না তার জবাব তাঁরাই দিতে পারেন।

সমীর কান্ত লাহিড়ী (মিত্র লেন, বড়বাজার)

●● রবিবার বাদে যে কোনদিন ৩০, গ্রে ষ্ট্রীটে বেলা ১০-১১টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে পারেন।

সুধীন চন্দ্র মিত্র (অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা) গত চৈত্র বৈশাখ মাসের রূপ-মঞ্চে ডাঃ কোটনিশ কী অমর কাহিনীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি ভুল সংশোধন করিয়া জানাইতে বাধ্য হইলাম। প্রথম কথা ডাঃ কোটনিসের পিতার ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন খ্যাতনামা পরিচালক কেশব রাও ভেট আর জেনারেল ফেঙে-এর ভূমিকায় যিনি অভিনয় করিয়াছেন তাঁর নাম বাবুরাও পেন্ধরকর, বিনায়ক পেন্ধরকর নয়। আর বুন্দুর ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন বিখ্যাত পরিচালক বিনায়ক।

●● ভুলগুলি আমাদের সমালোচনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্যেরও নজরে পড়েছে—তবু আপনি যে ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন—এজন্য ধন্যবাদ! আমাদের সমালোচনা বিভাগে রূপ-মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদেরও যেমনি সুযোগ দেওয়া হয়—তেমনি পাঠক সাধারণের ভিতর থেকে যাঁরা সাংবাদিকতা সম্পর্কে কিছুটা হাত পাকাতে চান, তাঁদেরও আমরা সুযোগ দিয়ে থাকি। এঁরা অনেকেই মনে করেন—সমালোচনা করা কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ নয়—দু'একখানা ছবি দেখেই দু'একবার কালির আঁচড় টানলেই এ কাজের উপযোগী হ'য়ে ওঠা যায়। তাঁদের এই ধারণা যে কত ভ্রান্ত, তা তাঁদের দু'একবার সুযোগ দিয়েই আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি। তাঁদের অসতর্কতার ঝুক্কিও সম্পাদক হিসাবে আমাকে কম সইতে হয় না—এ তারই একটি নিদর্শন। অবশ্য এজন্য সম্পাদক হিসাবে আমি আমার নিজের ত্রুটি স্বীকার করে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি এবং ভবিষ্যতে এরূপ কাউকে যে সমালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে না, সে প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি। তবে উপযুক্তদের জন্য রূপ-মঞ্চের দ্বার সব সময়ই খোলা থাকবে।

অধীর কুমার দে (বেহালা) (১) পরলোকগত জ্যোতি প্রকাশের অভিনয়ের শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ চিত্রে ফুটে উঠেছে? (২) শিশিরকুমার ভাদুড়ী চিত্রে অভিনয় করেন না কেন? তিনি কি মঞ্চ-প্রেমিক! (৩) কলকাতায় অনেক চিত্র-গৃহ হ'য়েছে এবং হচ্ছে। তার মধ্যে দু'টো চিত্রগৃহ কি এমন হ'তে পারে না—যেখানে শুধু কিশোরদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করতে পারে এমন চিত্র প্রদর্শিত হ'তে পারে?

●● (১) ডাক্তার। (২) তিনি মঞ্চ-প্রেমিক তো বটেই—তাঁর সমস্ত জীবনটাই একটা মঞ্চের অভিব্যক্তি। চলচ্চিত্রে যে বিশেষ বাধানিয়ম মেনে চলতে হয়, নাট্যাচার্য তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে রাজী নন। (৩) একটা চলতি কথা আছে, "মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা।" আপনাদের প্রস্তাবটা ঠিক সেই জাতীয়। বছরে একখানা করে শিশু-চিত্র যাঁরা নির্মাণ করতে পারেন না—তাঁরা সারা বছর দু'টো প্রেক্ষাগৃহ ছেড়ে দেবেন কেবল মাত্র শিশু-চিত্র প্রদর্শনের জন্য! তবু এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় আমরা অপেক্ষা করব বৈকী?

অনন্তকুমার দাশগুপ্ত (রামধন মিত্র লেন, কলিঃ)

●● হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ঠিকানা এই বিভাগের অন্যত্র প্রকাশিত হ'লো। অনুভা গুপ্তার প্রকৃত নাম মৃদুলা গুপ্তা। ইনি কবি আভা গুপ্তার মেয়ে।

বাণী সান্যাল (লোকপুর, বাকুড়া) সুনন্দা দেবীর সহিত পত্রালাপ করিতে ইচ্ছুক। কোন্ ঠিকানায় তাঁকে পত্র দিলে তিনি পাবেন?

●● সুনন্দা দেবী, ৯৮-এ, একডালিয়া রোড, বালিগঞ্জ।

সরোজ ভৌমিক (শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা) মন্দির, সাত নম্বর বাড়ী প্রভৃতি বই-এর কাহিনীকার ও খ্যাতনামা গীতিকার প্রণব রায় ও কালিকা রংগমঞ্চে যিনি অভিনয় করেন, সেই প্রণব রায় কী একই ব্যক্তি?

●● না।

শ্রীঅনামিকা দেবী (বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ) গত পূজা সংখ্যায় রূপ-মঞ্চে শ্রীকুমার নামে যে শিল্পীর অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালকরূপে শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবার কথা ছিল—তাঁর এই তিন প্রকার রূপের কবে বিকাশ দেখতে পাবো?

●● গত সংখ্যার রূপ মঞ্চেই শ্রীকুমারের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে। বর্তমান সংখ্যায়ও হ'লো। শ্রীকুমার বর্তমানে তাঁর চিত্রের প্রাথমিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। চিত্র গ্রহণের কাজ আরম্ভ হ'লেই আপনারা সংবাদ পাবেন।

বিশ্বনাথ দত্ত (কুষ্টিয়া, থানাপাড়া)।

●● পড়াশুনা শেষ না করে এ বিষয়ে কোন চিন্তা করা উচিত বলে আমি মনে করি না। তাই নিজের আকাঙ্ক্ষাকে আপাততঃ দমিয়ে রাখবেন।

গৌরী হালদার (বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা) সুমিত্রা, সুনন্দা, সন্ধ্যা, রেণুকা ও দীপ্তি রায়—এঁদের মধ্যে কে কে গান জানেন?

●● সন্ধ্যা, রেণুকা ও দীপ্তি—এঁরা গান জানেন বলে শুনেছি—তবে এঁদের কেউ চিত্রে গেয়ে থাকেন না।

এম, এ, সালেক (এগরা, মেদিনীপুর) স্যুটিং কি দিবারাত্র হ'য়ে থাকে ? না শুধু দিনের আলোয় হয় ? স্যুটিং গ্রহণের প্রশস্ত সময় কখন ?

●● স্যুটিং দিবারাত্রই হ'য়ে থাকে। দিনের বেলা হ'লেও দিনের আলোয় চিত্রগ্রহণ করা হয় না। প্রথম যুগে স্বাভাবিক সূর্যকিরণের উপর নির্ভর করে অবশ্য চিত্রগ্রহণ করা হ'তো—কিন্তু তাতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হ'তো। সূর্য'ত আর মানুষের প্রয়োজন মত তাঁর আলোর দ্যুতিকে কমিয়ে-বাড়িয়ে নেবেন না—তিনি চলেন তাঁর মেজাজ মাফিক। তাই কৃত্রিম আলোতেই অর্থাৎ দিনের বেলাতেও বৈদ্যুতিক আলোতেই চিত্র গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। অবশ্য বহির্দৃশ্যের জন্য স্বাভাবিক আলোর সাহায্যেই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। তাই রাত্রি আর দিন দুইই চিত্রগ্রহণের পক্ষে প্রশস্ত। তবে স্থানীয় ষ্টুডিও গুলিতে দিনের বেলায় চিত্রগ্রহণ প্রচলিত থাকলেও বেশী কাজের চাপ থাকলে রাত্রেও অনেকে চিত্র গ্রহণ করেন।

রতনচন্দ্র শেঠ (অম্বিকা কুণ্ডু লেন, হাওড়া) সুনন্দা ব্যানার্জির মাসিক আয় কত ? হঠাৎ 'দৃষ্টিদান' বাজারে বের করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। তিনি কালো বাজারের সংগে জড়িত নন তো ?

●● সুনন্দা দেবী বাংলা চিত্র জগতের একজন প্রখ্যাতা শিল্পী। তাঁর মাসিক উপার্জনের পরিমাণ যাই থাকুক না কেন—নেহাৎ কম নয়। তাঁর স্বামী একজন ব্যবসায়ী। তাছাড়া বনিয়াদী ঘরের ছেলে। নিজের সংস্থান এবং ধনী অংশীদারের নিয়েই তিনি 'দৃষ্টিদান'এর প্রযোজনা করেছেন। কালো বাজারের সংগে জড়িত হ'তে যাবেন কেন! আর প্রযোজনা ক্ষেত্রে তাঁর আগমনও হঠাৎ নয়।

কানাই লাল কর্মকার (মিতালী সংঘ, রিসড়া) (১) প্রমথেশ বড়ুয়ার "মায়াকাননের" সংবাদ কি ? (২) রবীন মজুমদার, জগন্ময় মিত্র ও ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভিতর কে ভাল গেয়ে থাকেন ?

●● (১) প্রমথেশ বড়ুয়া যে কয়খানি চিত্র পরিচালনা করছিলেন—তাঁর অসুস্থতার জন্য সব কয়খানির কাজই বন্ধ আছে। তবে "মায়াকানন" নাকি তিনি প্রায় শেষ করে এনেছিলেন। (২) গায়কদের মান সব সময় ঠিক থাকেনা। কোন সময় একজন খুবই ভাল গাইতে থাকেন—আবার কিছুদিন বাদে আর একজন তাঁকে ছাপিয়ে ওঠেন। তবে বর্তমানে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এঁদের দু'জনের চেয়েই ভাল গাইছেন। জগন্ময় মিত্র বর্তমানে যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। রবীন মজুমদারের গান অনেকদিন শুনিনি। তাই তাঁর সম্পর্কে বর্তমানে কিছু বলতে পারবো না।

অজিতকুমার বসু (রায়বাহাদুর রোড, বেহালা) ধীরাজ ভট্টাচার্য ও নরেশ মিত্রের জীবনী কবে প্রকাশিত হবে ?

●● ধীরাজ ভট্টাচার্যের জীবনী বহু পূর্বেই প্রকাশিত হ'য়েছে। নরেশ মিত্রকে ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন।

প্রবোধ বাগচী, শান্তি ঘটক, দীলিপ সান্যাল, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামল গাঙ্গুলি (পাঠক সংসদ, জামসেদপুর) "রামের সুমতি"র পরে কি বাংলায় কোন কিশোর চিত্র গৃহীত হচ্ছে ?

●● দু'একটি নতুন প্রতিষ্ঠান বহুদিন থেকেই ত' আস্ফালন করে আসছেন শিশু চিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্র তুলে আমাদের তাক লাগিয়ে দেবেন বলে—আজ অবধিও তাঁদের সে আস্ফালনের কার্যকরী রূপ দেখতে পেলাম না। তাই তাঁদের কথা না উল্লেখ করাই ভাল। পুরোনদের কাছ থেকেও আপাততঃ কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না।

সন্দীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (বিহাবাড়ী, ডিব্রুগড়, আসাম) অভিনয়ের দিক দিয়ে শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস ও নরেশ মিত্রের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ?

●● এঁরা দু'জনেই শক্তিমান শিল্পী। তাই পরস্পরের সংগে তুলনা করে এঁদের কাউকে ছোট করতে চাইনা।

নীলরতন চক্রবর্তী (ভদ্রেশ্বর, হুগলী)

●● যৌথ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করে জনসাধারণের অর্থের ওপর নির্ভর করে যারা চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানের সত্তার কোন পরিচয় পাইনি—অন্ততঃ যাঁদের নিমিত্ত একখানা

ছবি বাজারে মুক্তিলাভ করেছে সেই সব প্রতিষ্ঠানের শেয়ারই কিনতে পারেন। যে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনেছেন—তাঁদেরও কার্যকলাপের কোন সংবাদ পাইনি, তাই নিজেকে প্রবঞ্চিত বলেই মনে করবেন।

সনৎ কুমার (পুরুলিয়া, মানভূম)

●● গ্রাহক-গ্রাহিকাদের তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাঁর কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই।

সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায় (মোগালী রোড, জামসেদপুর) ইউরেকা পিকচার্স কি দোটানায় পড়েছেন।

●● দোটানায় পড়ে—চিত্রজগৎ থেকে তাঁরা আমাদের মত আরো অনেককে কলা দেখিয়ে ডুব মেরেছেন।

আনোয়ার হোসেন (লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট, পশ্চিম পাকিস্থান)

(১) চিত্রজগতের দ্বার কতকাল আর অন্ধ সাম্প্রদায়িকতার তালা দিয়ে বন্ধ থাকবে? সাম্প্রদায়িক হিংসা ও বিদ্বেষের উর্দ্ধে মিলিত দুই বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাংলার চিত্রজগতের অনগ্রসর মুসলিম উৎসাহীদের জন্য সুযোগ দেওয়া উচিত নয় কি? (২) বনানী চৌধুরী নাকি মুসলমান, কিন্তু তাঁর পরিচয়ত রূপ মঞ্চে এখনও পাইনি?

●● (১) বাংলা চিত্রজগতে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়েছে বলে আমি মনে করিনা। বাংলা চিত্রজগত সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সামনে তার দরজা রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে বলে যাঁরা অভিযোগ করবেন, তাঁদের সে অভিযোগের মূলে আদৌ কোন সত্য নেই। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় কোন বিশেষ শিল্পী বা কর্মীর মাঝে এই দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইলেও, আমাদের সাবধান-বাণীতে তাঁরা সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিলেন বলেই আমি মনে করি। শিল্পী-কর্মী-বা ব্যবসায়ীরূপে চিত্রজগতে প্রবেশ করতে না পেরে যদি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক চিত্রজগত থেকে ফিরে যেয়ে থাকেন—তবে তা সাম্প্রদায়িকতার জন্য নয়—তাঁদের অনুপযুক্ততার জন্যই। বাংলা চিত্রজগত যে অনগ্রসর মুসলমান উৎসাহীদের সুযোগ দিতে মোটেই দ্বিধা করবে না—এ প্রতিশ্রুতি শুধু আপনাকেই নয়, সমস্ত মুসলিম ভাইদেরই আমি দিতে পারি এবং এবিষয়ে ইতিপূর্বে মুসলিম ভাইদের ভিতর থেকে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা আমাদের কাছ থেকে কিরূপ সহযোগিতা পেয়েছেন একথা উল্লেখ করলে আমাদের আন্তরিকতায় আপনি নিঃসন্দেহ হয়ে উঠতে পারবেন। প্রথম প্রযোজকদের কথা বলি। এপর্যন্ত মুসলমানদের ভিতর থেকে যে কয়জন প্রযোজক বাংলা চিত্রজগতে প্রবেশ করেছেন, তাঁর ভিতর সবাগে বলতে হয় 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রের প্রযোজক ডায়ানটপিকচার্স লিঃ এর কর্তৃপক্ষদের কথা: এঁদের মত ভদ্রলোক খুব কমই দেখেছি—ঠিক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় চিত্রজগতে তাঁদের আমরা দেখতে পাই এবং যখনই সাম্প্রাদায়িকতার সমস্যা এসে তাঁদের সামনে দেখা দেয় রূপ-মঞ্চ তার সর্বশক্তি নিয়ে তাঁদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়। শুধু রূপ-মঞ্চই নয়—উক্ত চিত্রপ্রযোজনার সংগে জড়িত কয়েকজন বিশেষজ্ঞ, শিল্পী ও কর্মী তখন যে উদারতার পরিচয় দেন, সেজন্য তাঁদের আমরা তারিফ করি। ডায়ানটপিকচার্স লিঃ-এর কর্তৃপক্ষের উপযুক্ততাও আমরা অস্বীকার করবোনা। অথচ তাঁরা কেন যে চিত্র প্রযোজনায় আর অগ্রসর হলেন না, বলতে পারিনা।

সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়ায়নি, এ কথা নিশ্চিত করে বলতে পারি। তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টার দিকে আজও আমরা চেয়ে আছি। প্রযোজনা ক্ষেত্রে আর একজন মুসলমান বন্ধুর সংগে আমাদের পরিচয় হয়—তিনি হচ্ছেন 'মানুষের ভগবান চিত্রের' প্রযোজক ও পরিচালক জনাব উদয়ন: পূর্বোক্ত প্রযোজকদের চেয়ে তাঁর উপযুক্ততা ও সম্ভাবনা অনেক কম থাকা সত্ত্বেও তাঁকেও সর্বপ্রকার সাহায্য আমরা করেছি—শুধু আমরাই নই—যাঁদের সংস্পর্শেই জনাব উদয়ন এসেছেন, তাঁদের কাছ থেকেই এই সহানুভূতি লাভ করেছেন। কিন্তু তিনি যে মর্যাদা রাখতে পারলেন কোথায়—আজ যদি তিনি ফিরে যেয়ে বাংলা চিত্রজগতের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য

চালান যে, মুসলমান বলেই তিনি অকৃতকার্যতার ব্যর্থতায় ফিরে গেলেন—তা'হলে তাঁকেই বিশ্বাস করবেন না আমাদের বিশ্বাস করবেন? এমন কী জনাব উদয়নের জন্য আমরা যে আর্থিক ঝুঁকিও বহন করেছি - তারও মর্যাদা তিনি রাখতে পারেননি। তাঁকে সমর্থন করতে যেয়ে অন্যান্য মুসলিম ভাইদের কাছ থেকেও আমাদের কম সমালোচনা সহ্য করতে হয়নি। অথচ মুসলমান বলেই তিনি আমাদের কাছ থেকে আশাতীত সহযোগিতা পেয়েছিলেন। অভিনয়ের জন্য আমার কাছে যেসব মুসলমান ছেলে ও মেয়ে আবেদন করে থাকেন – তাঁদের মাঝে হুগলী অথবা মেদিনীপুরের একটি ছেলের ভিতর উপযুক্ততার পরিচয় পেয়েছিলাম এবং আমি যেসব স্থানে তাঁকে পাঠিয়েছিলাম, তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য তাঁরা আশ্বাসও দিয়েছিলেন। পরে সেই ভদ্রলোকটি আর আসেন নি—সম্ভবতঃ তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে পরিত্যাগ করেছেন। মেয়েদের ভিতর একজন মাত্র মুসলিম মহিলা এসেছিলেন—যাঁর তাঁর কোন প্রকার যোগ্যতা আছে কিনা—সে কথা শুধু আমি কেন, যে কোন একজন সাধারণ দর্শকও বিচার করতে পারবেন। আমার কয়েকজন মুসলিম বন্ধুও সেই মহিলার ছবি দেখেছেন এবং আমারই মতে তাঁরা মত দিয়েছেন। মুসলমান ছেলে বা মেয়ে যাঁরা অভিনয় করতে চান, বিন্দুমাত্রও যদি তাঁদের মাঝে সম্ভাবনা থাকে, বাংলা চিত্রজগত তাঁদের সহানুভূতির সংগেই গ্রহণ করবে।

(২) শ্রীমতী বনানী চৌধুরী মুসলমান, "রূপ-মঞ্চে" যথাসময়ে তাঁর জীবনী দেখতে পাবেন।

প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবীর বিদেশ-ভ্রমণ

বাংলা চিত্রজগতে—শুধু বাংলা ভারতীয় চিত্র-জগতে যে কয়জন মুষ্টিমেয় শিল্পী তাঁদের আজন্ম সাধনা ও নিষ্ঠায় খ্যাতিলাভ করেছেন—তাঁদের ভিতর শ্রীমতী কাননের নাম যে দর্শক সাধারণের মনে সর্বাগ্রে উঁকি মারবে, আশা করি তা অনেকেই অস্বীকার করতে পারবেন না। সমাজের অবিচার ও অন্যায়ের জঞ্জাল মাথায় করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের মহিলা-শিল্পীদের শিল্প-জগতে পা বাড়াতে হয়—কাননের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম দেখতে পাইনি। শিল্পজগতের প্রবেশ পথে যে বাধাবিপত্তি রয়েছে—যে অশিক্ষা শিল্পীদের বিকাশের পথকে বারবার রুদ্ধ করে দাঁড়ায়—এ সবকিছুর মুখোমুখী হ'য়েই শ্রীমতী কাননকে দাঁড়াতে হ'য়েছিল—কিন্তু নিজের অধ্যবসায় ও জন্মগত প্রতিভার বলে সমস্ত বাধাবিপত্তি ডিঙ্গিয়ে শিল্প জগতে কানন নিজের যে আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে—তাকে অস্বীকার করবে কে? তাঁর এই প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য শিল্পীরা ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠতে পারেন—সে ঈর্ষা যদি তাঁদেরও শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রেরণা যোগায়, তবেই তাকে আমরা অভিনন্দন জানাবো—নইলে সে ঈর্ষা তাঁদের মনের নীচতার কথাই কী আমাদের কাছে প্রকাশ করবে না? তাই কাননের খ্যাতিকে ঈর্ষার চোখে না দেখে, যে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে চিত্রজগতের প্রতিটি বাধাকে ডিঙ্গিয়ে কানন আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে—সেই প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যই অন্যান্য শিল্পীদের উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠতে অনুরোধ জানাবো। জন্মগত প্রতিভা কাননের আছে—অভিনেত্রীর উপযোগী সৌন্দর্য থেকেও কানন বঞ্চিতা নয়—কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠার মূলে এই প্রতিভা ও সৌন্দর্যই ত সব কিছু নয়—তাঁর সাধনাই যে আজ আমাদের সামনে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। কাননের চেয়ে প্রচুর রূপ নিয়েও ত অনেকে চিত্রজগতে পা বাড়িয়েছিলেন—প্রতিভাও যে তাঁদের না ছিল তাও নয়, কিন্তু কৈ, তাঁরাত এমনিভাবে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেননি! বড় হবার সংগে সংগে কানন বুঝতে পারে, তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ছে—দর্শক সাধারণের আশীর্বাদ তাঁর ওপর বর্ষিত হচ্ছে—অভিনেত্রী হিসাবে তার খ্যাতি ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হচ্ছে। খ্যাতির এই ব্যাপ্তি অহংকারের রূপ নিয়ে কাননের ভবিষ্যৎ শিল্পজীবনের পথকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারলো না। নিজের দুর্বলতাগুলিকে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কানন বিচার করতে বসলো এই দুর্বলতা যদি সে সময়মত শুধরে না নিতে পারে—তাঁর এই যশ ত কোনদিন স্থায়ী হ'য়ে থাকবে না—এ যশ যে জলের বুদ্বুদের মত ক্ষণিকের জন্য ভেসে বেড়াবে। তাই, প্রথমেই সে নিজের অন্তর থেকে অশিক্ষার জমাট অন্ধকার অপসারণে আত্মনিয়োগ করলো: শিল্পীরূপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হ'লে তাঁকে উপযুক্ত-ভাবে শিক্ষিতা হ'য়ে উঠতে হবে। যে-শিল্প শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম বলে আজ সর্ববাদীসম্মত, তার একজন নগণ্যা সাধিকা হ'লেও, শিক্ষাই যে তাঁর সর্বপ্রথমে প্রয়োজন, একথা সে কোনমতেই অস্বীকার করতে পারলো না। সংগীত ও অভিনয় চর্চাও যেমনি কানন আপ্রাণ দিয়ে করতে থাকে—তেমনি ছোট্ট মেয়েটির মত—অভিনয়ের ফাঁকে যে সময় পায়, তার বেশীর ভাগ টুকুই পাঠাভ্যাসে কাটিয়ে দেয়। বাংলা-ইংরেজী দুইই সে শিখতে থাকে। এই দু'টো ভাষা একটু আয়ত্তে এলে হিন্দির কথা মনে হয়—তাকেও ত বাদ দেওয়া চলে না! হিন্দি ভাষাতেও যে তাঁর অভিনয় করতে হয়। কোন ভাষাতেই হয়ত কানন সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারেনি—সে দম্ভও তাঁর নেই—আর কেউই তা স্পর্ধা করে বলতে পারেন না। এমন যে নিউটন তিনিও বলেছিলেন—কতটুকু বা শিখেছি—জ্ঞান সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি মাত্র! আর কানন সে স্পর্ধা করবেই বা কেন? তবু শিল্পজগতে চলতে হ'লে যতটুকু শিক্ষা তাঁর প্রয়োজন, তা সে অর্জন করেছে

বৈকী? সে কথা সে নিজে স্বীকার না করলেও, আমরা যাঁরা জানি—তাঁরা অস্বীকার করবো কেন? কিন্তু তবু কাননের জ্ঞানস্পৃহায় কোন ছেদ পড়েনি—দিন দিন তা বেড়েই চলেছে। বাংলা সাহিত্যের সে একজন নিয়মিত পাঠিকা। ইংরেজী যাতে নিজে বলতে ও বুঝতে পারে এবং ইংরেজী ভাষাভাষী লোকেদের সংগে কথা বলতে পারে, সেজন্য দীর্ঘদিন ধরে মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে ইংরেজী শিক্ষা করেছে। আজ হয়ত তাঁর কোন শিক্ষকের প্রয়োজন নেই কিন্তু আরো শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলেই সে মনে করে এবং শিক্ষার যে শেষ নেই, একথা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই—তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটে পড়াশুনার ভিতর দিয়ে।

অভিনেত্রী জীবনে খ্যাতির শেষ প্রান্তে যেয়েও কানন খুশী হ'তে পারলো না। বাইরের সংস্পর্শে নিজের ক্ষমতাকে যাচাই করে নেবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ও একবার বাইরের সংগে নিজের অভিনয়-ক্ষমতাকে তুলনা করে দেখতে চায়। যে হলিউড তার চমকে সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে - হলিউডের একজন অভিনেত্রী কী সেখানকার উর্বশীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তার যোগ্যতাকেও পরিমাপ করতে পারবেনা! চিত্রজগতের সেই বিস্ময়ের মাঝে উপস্থিত হ'য়ে সেও কী পারবেনা তাঁদের গুপ্ত রহস্যের ইন্দ্রজাল ভেদ করতে? কবে আসবে এই সুযোগ! সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকে কানন। নিশ্চয়ই সে সাগর পারে পাড়ি দেবে--কোন মাদুমন্ত্রে ওরা পর্দার ওপর এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে ওদের এই শক্তিমত্তাকে একটু জেনে আসতেই হবে। তাই সুযোগের অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষায় থাকে কানন: সুযোগ আসে।

১৯৪৭ খৃঃ। ৬ই আগষ্ট: সাগরপারের উদ্দেশ্যে কানন যাত্রা করলো। সে লণ্ডন গেল—প্যারিসে গেল—সেখান থেকে আবার লণ্ডনে ফিরে এলো। লণ্ডন থেকে যাত্রা করলো নিউইয়র্ক অভিমুখে—সেখান থেকে ওয়াসিংটন যায় আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসে। তারপর ক্যানাডা—ওটোয়া, টোরেনটো পরিভ্রমণ করে নায়াগ্রা জলপ্রপাত পরিদর্শন করে। চিকাগো সহরটা না দেখলেই বা চলবে কেন? চিকাগো সহরের সংগে একজন ভারতীয় মহাপুরুষের যে বিজয়-গৌরবের কথা জড়িয়ে রয়েছে! চিকাগো থেকে কানন স্যানফ্রানসিসকো, গ্রান-ক্যানিং, লস এ্যাঞ্জেল ও ম্যাক্সিকো পরিদর্শন করে আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। নিউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে আসেন, সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ড পরিদর্শন করে কায়রো হ'য়ে ভারতের দিকে রওনা হন। দীর্ঘ পাঁচ মাস বিদেশ ভ্রমণ করে ১৯৪৭ খৃ-এর ২৫শে ডিসেম্বর কানন ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর এই পরিভ্রমণে সর্বত্রই এ্যারোপ্লেনে যাতায়াত করতে হয়েছে। কেবলমাত্র একবার নিউ ইয়র্ক থেকে কুইন মেরী জাহাজে চড়ে লণ্ডন গিয়েছিলেন। এর পূর্বে প্লেনে যাতায়াত না করলেও—সুদীর্ঘ পথ প্লেনে যাতায়াত করলেও সেজন্য বিন্দুমাত্রও কাননের কোন অসুবিধা হয়নি।

লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় হাই কমিশনার ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন ও অন্যান্য ভারতীয়দের আমন্ত্রণে ও অনুরোধে কাননদেবী কয়েকটি গান করেন। এর সব ক'খানিই রবীন্দ্র সংগীত। প্রথম গানখানি কবিগুরুর জনপ্রিয় সমবেত সংগীত 'জনগন মন অধিনায়ক হে' যা আমাদের জাতীয় আন্দোলনে বহুদিন থেকে প্রেরণা দিয়ে এসে আজ জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে। এই গানখানি শেষ হ'লে কবিগুরুর—'একটুকু ছোঁয়া লাগে' ও 'আমি তোমায় যত' গান দু'খানি গাইবার জন্য সকলে কাননকে অনুরোধ করেন। কাননদেবী তাঁদের সে অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন না।

ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রয়োগশালা পরিদর্শন করে কানন দেবী চিত্রশিল্প সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জেনে নিয়ে তাঁর কৌতূহল দমাতে মোটেই শৈথিল্যের পরিচয় দেন নি। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ দেখে ওখানকার কর্তৃপক্ষরাও অবাক হ'য়ে গেছেন। তাঁরা আরো যত্ন নিয়ে কানন দেবীকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন। আলেকজাণ্ডার কোর্ডার ষ্টুডিওটিও পরিদর্শন করবার সৌভাগ্য কানন দেবীর হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যেদিন কোর্ডার ষ্টুডিও পরিদর্শনে যান, সেদিন প্রযোজক কোর্ডা ষ্টুডিওতে ছিলেন না। কোর্ডার সংগে সাক্ষাৎ না হওয়াতে কাননের মনে অনেকটা ক্ষোভ
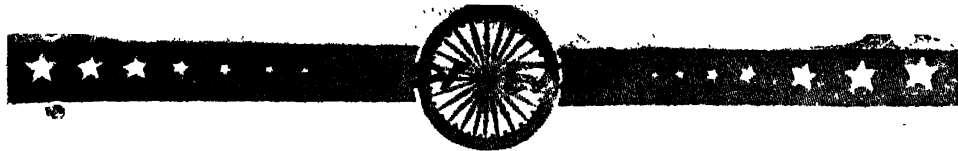
থেকে গেছে। অন্যান্য যে সব ষ্টুডিও কাননদেবী পরিদর্শন করেছেন—তার ভিতর এম, জি, এম ষ্টুডিওর কথাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু এম, জি, এম-এর ষ্টুডিওই নয়—ওদের দেশের যে কোন ষ্টুডিওর সংগেই আমাদের এখানকার ষ্টুডিওগুলির কোনমতেই তুলনা করা চলে না। এম, জি, এম ষ্টুডিওটির একটু আভাষ দিলেই ওদেশের ষ্টুডিওগুলি সম্পর্কে দর্শকসাধারণের কিছুটা ধারণা জন্মে উঠবে। ছয়শত বিঘারও বেশী জায়গা নিয়ে এম, জি, এম, ষ্টুডিওটি নির্মিত হ'য়েছে। তাই ষ্টুডিওটির পরিধি নিয়েই পৃথক একটি সহর গড়ে উঠেছে বলা চলে। ষ্টুডিও সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও বিষয়গুলি ছাড়া—একটা আধুনিক সহরের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিই এখানে রয়েছে। ষ্টুডিওর নিজস্ব টেলিগ্রাম অফিস—ডাকঘর—পুলিশ ষ্টেশন হাসপাতাল—পাঠাগার—জীবন-বীমা প্রতিষ্ঠান—আরো যে কী নেই বলা কঠিন। ষ্টুডিওর কর্মীদের অবসর গ্রহণান্তে ভাতার ব্যবস্থা আছে ও অন্যান্য সর্বপ্রকার সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত কর্তৃপক্ষ করে দিয়েছেন। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি জিনিষই ষ্টুডিওর ভিতর পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যে সব ষ্টুডিও কাননদেবী পরিদর্শন করেন—পরিদর্শন কালে যে সব শিল্পী ও কর্মীদের সংগে তাঁর আলাপ হয়—তাঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় চিত্র জগত সম্পর্কে খুব আগ্রহ প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'লেও একজন ভারতীয় শিল্পীকে নিজেদেরই সমগোষ্ঠী বলে—আলাপ-আলোচনায় তাঁরা কাননকে যতখানি কাছে টেনে নিয়েছিল—তাঁদের সেই আন্তরিকতার কথা কোনদিন কানন ভুলবে না। ওখানে যেসব অভিনেতা অভিনেত্রীর সংগে কাননদেবীর আলাপ হয়, তাঁদের ভিতর ভিভিয়ান লী, ক্লার্ক গ্যাবেল, স্পেনসার ট্রেসী, ক্যাথারিন হেপবার্ণ, মার্ণা লয়, রবার্ট টেইলর, রবার্ট ডোনাট প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তাছাড়া বহু শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের সংগেও কাননের আলাপ পরিচয় জমে ওঠে। এই আলাপ পরিচয়ে কোন সময়ই কাননের তাঁদের অপরিচিত বলে মনে হয়নি। কেবল-শিল্পী হিসাবে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যই কানন বিদেশে গিয়েছিলেন না—চিত্রশিল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি, যান্ত্রিক কলা-কুশলতা জানবার অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। বহুদিন থেকেই নিজস্ব ষ্টুডিও নির্মাণের পরিকল্পনা কাননের ছিল এবং প্রযোজনাক্ষেত্রে পা বাড়াবার অভিপ্রায়ও মাঝে মাঝে তাঁর মনে উঁকি মারতো। বিদেশ ঘুরে এসে কানন দেবী তাঁর এতদিনের সেই পরিকল্পনাকে মূর্ত করে তুলতেই আত্ম-নিয়োগ করেছেন। তাঁর নিজস্ব জমির ওপর একটি নতুন ষ্টুডিও গড়ে উঠছে। জমিটি তাঁর নিজস্ব হ'লেও ষ্টুডিওটির মালিক তিনি একা নন; আরও অংশীদার রয়েছেন। আমাদের প্রতিনিধির কাছে দুঃখ প্রকাশ করে কানন দেবী বলেন—"যে পরিকল্পনানুযায়ী স্টুডিও নির্মাণের ইচ্ছা আমার ছিল—কার্যতঃ তা আর হ'য়ে উঠলো না।" কারণ, অন্যান্য অংশীদারদের সংগে তাঁর পরিকল্পনার আদৌ মিল খাচ্ছে না। তাই, তিনি তাঁদের উপরে সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে কেবল অংশীদাররূপেই আছেন। কানন দেবী এ সম্পর্কে তাঁর নিজের ভাষাতেই বলেন, "আমি আছি শুধু নাম কো আস্তে।" এই বলার ভিতর তাঁর অন্তরের গভীর বেদনার কথা ফুটে ওঠে। তাই ষ্টুডিও নির্মাণ-পরিকল্পনা থেকে প্রত্যক্ষভাবে সরে দাঁড়িয়ে কানন দেবী তাঁর নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান শ্রীমতী পিকচার্স নিয়েই মেতে পড়েছেন। কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে তাঁর প্রথম চিত্রের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই সুরু হয়ে গেছে! শ্রীমতী পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র "বিপর্যয়" শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন 'সব্যসাচী'। প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অজয় করের ওপর 'বিপর্যয়ে'র চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হ'য়েছে। সংগীত পরিচালনা করবেন শ্রীউমাপতি শীল—তবে "বিপর্যয়ে"র প্রত্যেকখানি গানই রবীন্দ্র সংগীত। ২০শে জুন থেকে কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে "বিপর্যয়ে"র কাজ আরম্ভ হবে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন কানন দেবী, রেবা দেবী, বিজলী দেবী, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

গত আঠারই জুন, কানন দেবীর বিদেশ ভ্রমণ ও তাঁর বর্তমান কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকসাধারণের অনু-রোধে সম্পাদকের নির্দেশে আমাদের একজন প্রতিনিধিকে
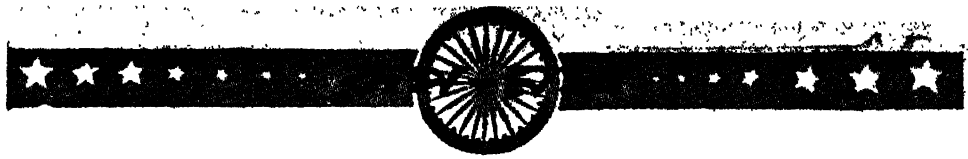
কানন দেবীর কাছে পাঠানো হয়। আমাদের প্রতিনিধি কানন দেবীর সংগে সাক্ষাৎ করে যে সব তথ্য জেনে এসেছেন, তারই উপর নির্ভর করে বর্তমান প্রবন্ধের সংবাদগুলি সরবরাহ করা গেল। কানন দেবী অন্যান্য বারের মত এবারও তাঁর স্বাভাবিক সহজ ও অনাড়ম্বর আপ্যায়নে রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধিকে আপ্যায়িত করেন। এই সাক্ষাৎকার প্রসংগে চিত্র জগতের সর্বজনপ্রিয় ও পরিচিত বিমল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য : তিনি এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। নিজস্ব চিত্রের প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধিকে কানন দেবী যে সময় দেন, এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শ্রীমান স্নেহেন্দ্র গুপ্তকে এবার প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠানো হ'য়েছিল। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় কয়েকটি কলেজ থেকে কয়েকজন ছাত্রী কানন দেবীর সংগে চিত্র-শিল্প নিয়ে আলোচনা করতে চেয়ে সম্পাদককে অনুরোধ করে কিছুদিন পূর্বে পত্র লিখেছিলেন, সম্পাদক তাঁদের সেই অনুরোধগুলি অনুমোদন করে কানন দেবীকে এক পত্র দিয়েছিলেন—কানন দেবী সম্মতি জানিয়ে উত্তর দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে যাঁরা আগ্রহশীল, তাঁরা রূপ-মঞ্চ কার্যালয় থেকে অনুমোদন পত্র নিয়ে কানন দেবীর সংগে সাক্ষাৎ করতে পারবেন। যাঁরা কানন দেবীর সংগে পত্রালাপ করতে চান—রূপ-মঞ্চ মারফৎ তাঁদের সংগে পত্রালাপ করতেও কানন দেবী স্বীকৃতা হ'য়েছেন।

—শ্রীপার্থিব।

ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ এর "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" চিত্রের মহরৎ উৎসব উপলক্ষে বাংলার বহু বিপ্লবী কর্মীদের দেখা যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পবিদ শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের সহিত শ্রীপার্থিবের সাক্ষাৎকার!

★

ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর দান পরম বাঙ্গালী বিদ্বেষীও কোন মতে অস্বীকার করতে পারবে না। সবক্ষেত্রে সর্বসময়ে বাঙ্গালী যেয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের পুরোভাগে। শুধু দেশের প্রাত্যহিক সব বিষয়েই নয়—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সর্ববিষয়ে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠত্ব বার বার প্রমাণিত হয়েছে। বাঙ্গালীর শৌর্য-বীর্য বিদেশীয়দের বিস্মিত করেছে—বাঙ্গালীর কণ্ঠ-নিঃসৃত ভারতের মর্মবাণী মুগ্ধ করেছে তাঁদের—বাংলার কুটিরশিল্পের কাছে সসম্ভ্রমে তাদের মাথা নুইয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ছেলেমেয়েরাই সকলের আগে বুক পেতে দিয়েছে বৃটিশ ব্যায়নেটের সামনে। বাঙ্গালীর দেশপ্রেম শুধু সমগ্র ভারতবাসীকেই নয়-প্রতীচ্যেরও বিস্ময় উৎপাদন করেছে—ভারতের পূর্বসীমান্তের পরাধীনতায় জর্জরিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের জনসাধারণের মনে স্বাধীনতার আগুন জ্বালিয়েছে বাঙ্গালী—উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে তাঁদের সুপ্ত স্বাধীন সত্তাকে। যে কঠিন লৌহ-শৃঙ্খলে বৃটিশ বেণিয়াবণিক দীর্ঘদিন ধরে ভারতের আত্মাকে বন্ধন করে রেখেছিল, তার মূলে বাঙ্গালীর সবল আঘাতকে অস্বীকার করবে কে? বাঙ্গালী কবির কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে—"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে—কে বাঁচিতে চায়"—সে ধ্বনি সমস্ত ভারতের সুপ্ত আত্মাকে নিমেষে জাগ্রত করে তোলে। বাঙ্গালীর সাহিত্য সমুদ্রের অতল-স্পর্শী মণিমুক্তার রূপ নিয়ে বিদেশীর চোখ ঝলসে দিয়েছে। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্যে প্রতীচ্যের দম্ভকে বাঙ্গালীই চূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলার এই গৌরবের ইতিহাস—কোন বাঙ্গালীরই অজানা নেই। সমগ্র ভারতে বাংলাই পাদপ্রদীপের আলোক মালায় সমগ্র ভারতের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে প্রোজ্জ্বল রেখেছে। আজ সে আলোক মালার প্রভাও স্তিমিত হয়ে এসেছে—সর্ববিষয়েই আজ যেন নৈরাশ্যের হাহাকারে বাঙ্গালী হাবুডুবু খাচ্ছে। আজ বাঙ্গালী নিস্তেজ ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে—বাংলার এই দুর্দিনে বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনসমাজ যদি সচেতন হয়ে না ওঠেন—সমস্ত বাঙ্গালীকে অপমৃত্যুর হাত থেকে কে বাঁচাতে আসবে! কেউ না। বাংলার চিত্রজগতও আজ এমনি ঘনায়মান অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বাংলার চিত্রজগত আজ বাঙ্গালীকেও খুশী করতে পাচ্ছে না—বাঙ্গালী দর্শক সমাজও আজ বাংলা চিত্রজগতের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁরা চেয়ে আছেন ভারতের হলিউড বম্বের চিত্রজগতের প্রতি। বাঙ্গালীর অর্থে ও শ্রমে ভিন্ন প্রদেশের চিত্র-শিল্প ফেঁপে উঠছে অথচ বাংলা চিত্রজগতের কণ্ঠ শুষ্ক ও আর্ত হয়ে উঠেছে। শুধু ভারতের ভিন্ন প্রদেশগুলিই নয়—সাগরপারের বেণিয়ারা জাহাজ বোঝাই করে আমাদের সম্পদ লুটে নিয়ে যাচ্ছে, আর বাংলার তহবিল চিচিং ফাঁক। অথচ চিত্রশিল্পের প্রথম যুগে বাংলার ত এই অবস্থা ছিল না। সম্পূর্ণ বৈদেশিক এই শিল্পটিকে জাতীয় শিল্পে রূপান্তরীত করতে বাঙ্গালীই অগ্রসর হয়েছিল সকলের পূর্বে। দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রথম যুগের ইতিহাস বাঙ্গালীর দানেই ত গৌরবান্বিত হয়ে আছে। আজ পর্যন্তও দেশীয় চলচ্চিত্র জগত যতটুকু নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছে, সে-নৈপুণ্যের বেশীর ভাগটাই যে বাঙ্গালীর প্রাপ্য। বোম্বাই—যে সহরটি ভারতীয় চিত্রজগতের আজ প্রাণকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হচ্ছে—তার প্রথমদিককার ইতিহাস ঘাটলে যে বাঙ্গালী শিল্পী, কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের অবদানই বড় হয়ে দেখা দেবে।
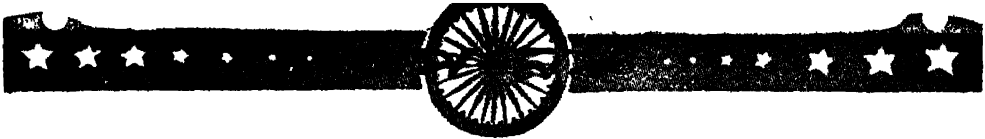
শুধু বোম্বাইই বা কেন, আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে ভারতীয়দের যতটুকু স্থান নজরে পড়ে—সে গৌরব বাঙ্গালীদের প্রচেষ্টায়ই যে অর্জিত হয়েছে—তার নিদর্শনকেওত অস্বীকার করা যেতে পারে না। পারেনা যে, তার প্রমাণ দিতেই আজ এমন একজনের কথা আপনাদের কাছে বলতে চাই—যাঁর সংগ্রাম-মুখর দিনগুলির ভিতর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অবদানের কথা আজও চির উজ্জল হয়ে আছে। এ লোকটির নাম হয়ত আপনারা অনেকে শুনেছেন—অনেকে শোনেন নি—শুনলেও তাঁর সম্পর্কে দর্শক সমাজ খুব বেশী কিছুই জানেন না। কারণ, তিনি সব সময়ই অন্তরালে থেকে কাজ করে গেছেন—প্রচারের ঢক্কা-নিনাদে কোনদিন নিজেকে জাহির করতে চান নি। আজও সে প্রচারের মোহ বিন্দুমাত্রও তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেনি। ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্র একদিন লাল-বাল-পাল-এর জ্বালাময়ী কর্মতৎপরতায় যে রূপ নিয়েছিল, সে-রূপ সুদূর ব্রিটেনের রাজশক্তির মনেও বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। এই লাল-বাল-পাল-এর শেষোক্ত পাল বাংলারই একজন দেশ প্রেমিক কর্মবীর—আমাদের সর্বজন পরিচিত স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে যে কয়জন শিল্পী তাঁদের শিল্প-প্রতিভায় গৌরবের আসনে বসিয়েছেন, তাঁদের ভিতর যাঁর নাম সর্বাগ্রে করা যেতে পারে—তিনি স্বর্গতঃ দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র স্বনামধন্য চিত্রশিল্পবিদ শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল।

বহুদিন থেকেই শ্রীযুক্ত পালের সংগে সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এ পর্যন্ত সে সুযোগ কোন দিন পাইনি। তিনি বর্তমানে বেশীর ভাগ সময় বম্বে থাকেন—মাঝে মাঝে কার্যোপলক্ষে কলকাতায় এলেও কোন মতেই তাঁর সংগে সাক্ষাৎ ক'রে উঠতে পারিনি। সুযোগ এলো। নব পরিচিত বন্ধু লক্ষ্ণৌর খ্যাতনামা যন্ত্রবিদ্ শ্রীযুক্ত শ্যামাপদবসু ও তাঁর সহকর্মী সুযোগ্য চিত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন গুহ মহাশয় একদিন কথায় কথায় বল্লেন, 'শ্রীযুক্ত পাল সম্প্রতি কলকাতায় এসেছেন এবং কিছুদিন থাকবেনও।' সুযোগটিকে কিছুতেই অবহেলা করতে পারলুম না। বীরেন বাবু বহুদিন থেকে শ্রীযুক্ত পালের সংগে জড়িত রয়েছেন তাঁর মারফৎ শ্রীযুক্ত পালকে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করে পাঠালুম। তিনি সে অনুরোধ উপেক্ষা করলেন না। গত ১৯শে মার্চ, ১৯৪৮, সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের সাক্ষাতের তারিখ নির্দিষ্ট হ'য়ে গেল। শ্রীযুক্ত পাল কিছুদিন পূর্বে বম্বে থেকে কলকাতায় এসেছিলেন ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট একস্‌প্যানসন্ বোর্ডের হ'য়ে কয়েকখানি প্রচারমূলক খণ্ডচিত্র তুলতে এবং ৫, ডোভার লেনে তাঁর আত্মীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দত্তের বাড়ীতে অবস্থান কচ্ছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই আমি সেখানে যেয়ে হাজির হলাম। আমার সংগে নিলাম বন্ধুবর বীরেন গুহ ও শ্যামাপদ বসুকে। আমরাত প্রথমটায় সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়লাম, যখন যেয়ে শুনলাম, শ্রীযুক্ত পাল বাড়ীতে নেই। কিছুক্ষণ বাদে তাঁর ছেলে 'কলিন' নেমে এলেন—তিনিও চিত্র জগতের পরিচালনা ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন। এই একটি মাত্র ছেলে শ্রীযুক্ত পালের। বছর ২৫।২৬ বয়স হবে। তিনি সাদর আপ্যায়ন জানিয়ে আমাদের সংগে গল্প জুড়ে দিলেন এবং বল্লেন, "আপনারা অপেক্ষা করুন, বাবা শীঘ্রই এসে যাবেন। তিনি হঠাৎ টেলিফোন পেয়ে হাসপাতালে আমার এক পিসীমাকে দেখতে গেছেন। আপনাদের অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।" পরিষ্কার বাংলা বলে যেতে লাগলেন। মা হচ্ছেন ইংরেজ মহিলা—জন্মও বিলেতে আর জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে বাংলার বাইরে বাইরে—তাই তাঁর পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ কিছুটা আমাদের বিস্মিত করলো বৈকী? কিছুক্ষণের ভিতরই শ্রীযুক্ত পাল এসে পড়লেন। আমরা নীচের ঘরে অপেক্ষা কচ্ছিলাম—তিনি সরাসরি আমাদের ঘরে এসেই উপস্থিত হলেন—তাঁর বিলম্বের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে কতক্ষণ আমরা এসেছি সমস্ত সংবাদ জেনে নিয়ে আমাদেরই পাশে আসন গ্রহণ করলেন। চুলগুলি পেকে উঠেছে—দাঁতগুলি সব পড়ে গেছে—বার্ধক্যের ছাপ তাঁর সর্বাংগে। কিন্তু কী বলিষ্ঠ দেহ—বার্ধক্য সেখানে মোটেই হাত দিতে পারেনি। মনের সজীবতা যেন প্রতি মুহূর্তে
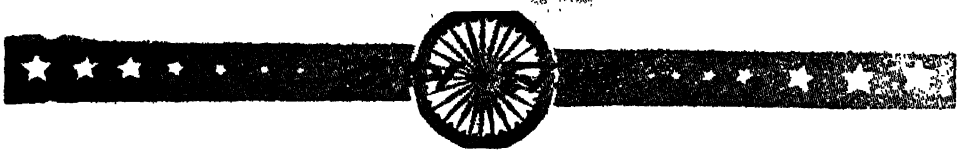
দেহের ওপর খেলে বেড়াচ্ছে। শ্রীযুক্ত পালের পৈতৃক বাসস্থান শ্রীহট্টে হ'লেও তাঁর জন্মস্থান কলকাতায়। ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দ হবে—১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নিরঞ্জন পালের জন্ম হয়। বর্তমানে তাঁর বয়স প্রায় ৫৭ কী ৫৮। বেনেটোলাস্থিত মিত্র ইন্‌স্টিটিউশনে তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছাত্র থাকলেও, ছোট বেলার দিনগুলি কেটেছে অসম্ভব দৌরাত্মপনার ভিতর দিয়ে। বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ই সহপাঠী ও সমবয়সীদের নিয়ে একটা দল গড়ে তুলেছিলেন। তাই প্রায়ই স্কুলে থাকতেন অনুপস্থিত আর এই দল নিয়ে টহল দিয়ে বেড়াতেন সহরের নানা জায়গায়। শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় অত্যাচারের ফলে তখন থেকেই ইংরেজ-বিদ্বেষী মনোভাব ধীরে ধীরে এদেশের লোকের মনে ছড়িয়ে পড়ে—শ্রীযুক্ত পালের মনেও তার প্রভাব কম বিস্তার করেনা। ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে ইংরেজদের প্রতি এক বিতৃষ্ণার ভাব পরিলক্ষিত হয়। দেশের বুকে ঐ লালমুখোগুলোকে বুক ফুলিয়ে চলতে দেখে তাঁর বুক ফেটে যেত, ওদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না তিনি। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ধার দিয়ে যখনই যেতেন, কোন লালমুখ যদি সামনে এসে পড়তো, কী পাশ কাটিয়ে যেত—ইচ্ছা করেই একটা ধাক্কা মেরে যেতেন। শ্রীযুক্ত পালের এই ইংরেজ-বিদ্বেষী মনোভাব ধীরে ধীরে এমনই ব্যাপক রূপ নিতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত তাঁকে এদেশ ছেড়ে ঐ লালমুখোদের দেশেই পাড়ি দিতে হয়। তখন হয়ত তাঁর বছর ১২।১৪ বয়স হবে। শ্রীযুক্ত পাল একদিন তাঁর ভগিনীপতি স্বর্গতঃ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে হাজরা পার্ক দিয়ে আলিপুর ট্রামে চড়ে এসপ্ল্যানেড-এ আসছিলেন। ট্রামটি গড়ের মাঠের মাঝামাঝি আসতে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ট্রামে উঠলেন এবং শ্রীযুক্ত পাল ও তাঁর ভগ্নীপতি যে আসনে বসেছিলেন—তারই পিছনে আসন দখল করে বসলেন। ট্রামটি চলতে আরম্ভ করলো—গড়ের মাঠের ঝিরঝিরে নির্মল হাওয়া ইংরেজ ভদ্রলোকটির মনে যেন বেশ একটা আমেজের ভাব সৃষ্টি করলো। তিনি মনের আমেজে শিষ দিতে দিতে তার একখানি পা তুলে দিলেন শ্রীযুক্ত পালের আসনে। শ্রীযুক্ত পাল তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে পা টা সরিয়ে নিতে বলেন। ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর সে-বলায় মোটেই কর্ণপাত করলেন না। বরং পা'টাকে আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে বেশ আমেজ করে বসলেন। শ্রীযুক্ত পালও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি এবার তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। দেশীয় কালা আদমীর একটা বালকের এই প্রতিবাদ ইংরেজ ভদ্রলোক প্রথমে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু বালক তাতেই দমে যাবার পাত্র নয়—সে ঐ চোখরাঙ্গানীর সমুচিত উত্তর দিতে রুখে দাঁড়ায়। ইংরেজ ভদ্রলোকও কী দমে যাবেন—তিনিও কম বীর নন—তাছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে তার সংগে—যা দিয়ে এই বিরাট দেশটাকে শাসন করছে তার স্বজাতিরা—আর একটা বালককে থামাতে পারবেন না! তিনি তার পকেট থেকে রিভলবার বের করে বালককে তাক করে বাগিয়ে ধরলেন। বালকও ভয় পাবার ছেলে নয়। মুহূর্তে অতবড় জোয়ান লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল রিভলবারটি—ট্রামের অনেক যাত্রীই যোগ দিল তার সংগে। অনেকদিন ভয় ক'রে চলেছে তারা ঐ লালমুখগুলোকে—অনেক অত্যাচার সহ্য ক'রেছে—আর না। বেশ উত্তম মধ্যম কিছু বসিয়ে দিল। এই গণ্ডগোলের ফাঁকে বালকটি যে কোথায় উধাও হ'য়ে গেল, তা আর কেউ বুঝতে পারলো না। মুরারীপুকুরের নাম আজ আর কোন বাঙালীর অবিদিত নেই—বালক নিরঞ্জন পালের সেখানে বেশ যাতায়াত ছিল। সোজা ছুটে এসে রিভলভারটি দিয়ে দিল বিপ্লবী উল্লাস করকে। কিন্তু ব্যাপারটার এখানেই শেষ হয়না, অনেকদূর গড়িয়ে পড়ে। শ্রীযুক্ত পাল তখন তাঁর বাবার সংগে থাকতেন হাজরা পার্কেরই কাছাকাছি একটা ভাড়া বাড়ীতে। ব্যাপারটা পুলিশের গোচরীভূত হয়। স্বর্গত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তা জানতে পেরে পুত্রকে নিয়ে সাগরপারে পাড়ি জমান। ছেলে তো নয়, যেন কেউটে সাপ। তিন বছর তিনিও পুত্রের সংগে রয়ে গেলেন বিলেতে। জহুরীই জহুরের সন্ধান রাখে। সাগরপারে থেকে যেসব বিপ্লবী দল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন—নিরঞ্জন পাল তাঁদের সন্ধান লাভ

করলেন। শুধু সন্ধান নয়, সাভারকর, রাণা, ম্যাডাম কমা প্রভৃতির সংস্পর্শে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িয়ে পড়লেন এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ম্যাট্রিকটা পাশ করে কিংস্ কলেজ হাসপাতালে মেডিসিন বিদ্যা অধ্যয়নে লিপ্ত হ'লেন। বিলেতে তাঁর সমস্ত খরচ বহন করতেন স্বর্গতঃ দেশনেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। তিনি তখন ওখানে। বিলেতে স্বর্গতঃ বিমলকুমার গাঙ্গুলী নামে এক ভদ্রলোকের সংগে শ্রীযুক্ত পালের খুব হৃদ্যতা জমে ওঠে। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল। দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত পালকে যে অর্থ সাহায্য করতেন—তাই দিয়ে শ্রীযুক্ত পাল কোনরকমে দু'জনের খরচ চালিয়ে নিতেন। তাতেও কুলিয়ে ওঠা যেতনা। তখন নিজেরা রান্না ক'রে খেতেন। তাঁরা থাকতেনও একটা বিশ্রী জায়গায়। বিমল বাবু সম্পর্কে দেশবন্ধুর কাছে কয়েকটি বিরুদ্ধ অভিযোগ যায়—দেশবন্ধু শ্রীযুক্ত পালকে ডেকে তাঁর সংগে মিশতে বারণ ক'রে দিলেন প্রথমে। শ্রীযুক্ত পাল তাঁর সে বারণ শুনলেন না। তখন দেশবন্ধু আর একদিন পালকে ডেকে বল্লেন, "তুমি যদি ওর সংগে মেশ, আমি তোমার খরচা বন্ধ করে দেবো।" তখন মেডিসিন বিদ্যা অধ্যয়নে দু'বছর কাটিয়ে উঠলেও সম্পূর্ণ শিক্ষা শ্রীযুক্ত পালের সমাপ্ত হয়নি। তিনি দেশবন্ধুর মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিলেন, "আমি ওর সংগে না মিশে পারবো না।" আরো বল্লেন, "God gives us our relations, but thank God, we can choose our friends." দেশবন্ধু কোন উত্তর দিলেন না। শ্রীযুক্ত পাল চলে এলেন। মনে মনে স্থির করলেন আর কোন সাহায্য গ্রহণ করবেন না দেশবন্ধুর কাছ থেকে। অবশ্য তখন তিনি দেশবন্ধু হননি। কিন্তু তাঁর চলবে কী করে—উঠে পড়ে লেগে গেলেন নিজের ভাগ্যান্বেষণে। বিদেশে সম্পূর্ণ সহায় সম্বলহীন, চট করে কিছু সংগ্রহ করাও তো সম্ভব নয়। পকেটও কপর্দকশূন্য। এই সময় একাদিক্রমে ৩৬ ঘণ্টা কেটে যায় শ্রীযুক্ত পালের সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থায়। ক্ষুধার যে কি তীব্র জ্বালা, তা তিনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে এই সময় মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। এই ৩৬ ঘণ্টার ভিতর একমাত্র জল ছাড়া আর কিছুই তাঁর জোটে না। এই ঘটনা ঘটে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। দেশবন্ধু যে কত বড় প্রাণবান ছিলেন, তার পরিচয় শ্রীযুক্ত পাল পান ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। দেশবন্ধু কোন হোটেলে শ্রীযুক্ত পালের নামে একটি হিসাব খুলে দিয়েছিলেন। এই হিসাবে প্রতি মাসে ৫ পাউণ্ড করে জমা দিয়ে যেতেন এবং শ্রীযুক্ত পাল তার বিনিময়ে তাঁর প্রয়োজনীয় আহার্য প্রভৃতি সংগ্রহ করতে পারতেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত হোটেলে তিনি নিজের উপার্জিত অর্থে যখন নতুন একটি হিসাব খুলতে গেলেন, তখন হোটেলের ভারপ্রাপ্ত পরিচিত একজন কর্মচারী তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার খবর কি পাল—এতদিন তুমি কোথায় ছিলে! তোমার নামে যে অনেক অর্থ জমা হ'য়ে আছে।" শ্রীযুক্ত পালের তো আশ্চর্যের অবধি থাকে না। তিনি অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকেন কর্মচারিটির পানে। তখন তিনি হিসাবের খাতা খুলে দেখালেন যে, মিঃ সি, আর, দাশ এই পাঁচ বছরে প্রতি মাসে পাঁচ পাউণ্ড করে তাঁর নামে জমা দিয়ে গেছেন—তার মোট অংক বর্তমানে যেয়ে দাঁড়িয়েছে তিন শত পাউণ্ডে।

শ্রীযুক্ত পালের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। তার চোখ বেয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার জল গড়িয়ে আসে। সত্য, কী মহৎ প্রাণ! আর এঁরই উপর তিনি ভুল ধারণা পোষণ করে আছেন। নিজের মনে নিজেকেই ধিক্কার দিয়ে আত্মগ্লানিতে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেন। শ্রীযুক্ত পালের সেই বন্ধুটি পরে প্যারিংটন রেলওয়ে ষ্টেশনের স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট হ'য়েছিলেন এবং বিলেতেই তিনি মারা যান। কোনদিনই তাঁদের বন্ধুত্বে কোন চেদ পড়েনি।

বিলেতের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে শ্রীযুক্ত পাল মাঝে মাঝে প্রায়ই ছবি দেখতে যেতেন। এই সব ছবি দেখতে দেখতেবেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর মন বিষিয়ে উঠতো। প্রায় প্রত্যেক বিদেশীয় ছবিতেই ভারতীয়দের এবং রেড ইণ্ডিয়ানদের চরিত্র বিকৃত ক'রে আঁকা হ'তো। দস্যু, খল বা নারী অপহরণকারী 'ভিলেইন' ছাড়া ভারতীয় কোন চরিত্র এই সব চিত্রে স্থান পেত না। শ্রীযুক্ত পাল মনে মনে এতে খুবই ব্যথা পেতেন। তিনি ভারতীয় চরিত্রের ওপর এই অনাচার বন্ধ করবার জন্য ছবি দেখে এসে সুষ্ঠু ভারতীয় চরিত্র চিত্রণ করে গল্প
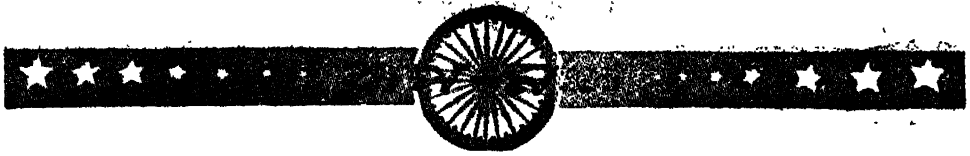
লিখতে সুরু করে দিলেন। এক একটি গল্প শেষ হয় আর বিভিন্ন চিত্র প্রতিষ্ঠানের-নির্বাচন বিভাগে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু সব জায়গা থেকেই তার গল্পগুলি অনির্বাচিত হ'য়ে ফেরৎ আসতো। অনেকেই লিখে জানাতো: বর্তমানে তোমার এ গল্প নির্বাচন করতে পারলুম না বলে দুঃখিত। কিন্তু তাতেও শ্রীযুক্ত পাল নিরুৎসাহিত হতেন না। চিত্র জগতের প্রতি তার ঝোঁক যেন দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে লাগলো। 'কিনেমা-কলার' নামে তখন ওখানে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। দিল্লীর দরবারকে তাঁরাই রংগিন চিত্রে রূপান্তরিত করেছিলেন। তা'ছাড়া প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীরও তারা অনেকগুলি ধারাবাহিক চিত্র তুলেছিলেন—এইগুলি সাধারণতঃ 'আরবান নেচার সিরিজ' নামে খ্যাতিলাভ করেছিল। চার্লস্ আরবান ছিলেন উক্ত কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা। দিল্লীর দরবারের চিত্রটি প্রায় দেড় বৎসর ধ'রে লণ্ডনে প্রদর্শিত হ'য়ে বিপুল সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। শ্রীযুক্ত পাল ভগবান বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বনে একটি কাহিনী রচনা ক'রে এই 'কিনেমা-কলার' প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। চার্লস্ আরবান নিজেই গল্পটি ফেরৎ পাঠিয়ে শ্রীযুক্ত পালকে এক চিঠি লিখলেন, "You have got no practical knowledge." শ্রীযুক্ত পাল এই মন্তব্যটির ভিতর যেন কোন আশার আলোক দেখতে পেলেন। শ্রীযুক্ত পাল উক্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সংগে দেখা করে তাঁদের ষ্টুডিওর প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করেন এবং ষ্টুডিওতে যাতে অন্ততঃ কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন, সে সুযোগ দানের জন্য অনুরোধ করলেন। কর্তৃপক্ষ এটুকু সুযোগ শ্রীযুক্ত পালকে দিতে চাইলেন। লণ্ডন থেকে আঠারো মাইল দূরে 'সারবিটনে' (Surbiton)-এ এদের ষ্টুডিওটি অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত পাল সেখানে যেয়ে হাজির হলেন। পরিচালক মার্টিন থর্নটনের সংগে ধীরে পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। প্রথমে অবশ্য থর্নটনের সংগে তাঁর মোটেই আলাপ ছিল না। চিত্র শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য উক্ত ষ্টুডিওতে উপস্থিত থাকতে শ্রীযুক্ত পাল কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়েছিলেন একথা পূর্বেই বলেছি। প্রত্যহ এই আঠার মাইল ডিংগিয়ে শ্রীযুক্ত পাল ষ্টুডিওতে যাতায়াত করতেন। সারাদিন ষ্টুডিওতে নির্বাক দর্শকের ভূমিকাভিনয় তিনি করতেন না। প্রয়োজন মত তিনি পরিচালককে নানান ভাবে সাহায্য করতেন। এমন কী সেটের কুলিদের সংগে কাজে লেগে যেতেও তিনি দ্বিধা করতেন না বা তাঁর আত্ম-সম্মানে বাধতো না। শ্রীযুক্ত পালের এই কর্মতৎপরতাই পরিচালক মার্টিন থর্নটনকে (Martin Thornton) বেশী করে আকৃষ্ট করে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন শ্রীযুক্ত পালের সংগে। তাঁর নিখুঁত সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে নেন—তাঁর উদ্দেশ্য জানতে পেরে খুশী হন এবং নিজেই আগ্রহ ক'রে চিত্র শিল্প সম্পর্কিত জটিল তথ্যগুলি বুঝিয়ে দিতে থাকেন এসেও পালকে।

কিন্তু শ্রীযুক্ত পালের আর্থিক অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হ'তে শোচনীয়তর হ'য়ে উঠতে লাগল। যে বাড়ীতে তিনি থাকেন, বহুদিন সেখানে ভাড়া বাকী পড়েছে। গৃহকর্ত্রী (Land lady) সত্যি খুব ভদ্র মহিলা—নইলে কবে তাঁকে তাড়িয়ে দিতেন। এদিকে পোষাক পরিচ্ছদ, জুতো ইত্যাদি যা-কিছু ছিল, সবই শ্রীযুক্ত পাল বন্ধক দিয়ে বসে আছেন। রোজ আঠারো মাইল ডিংগিয়ে ষ্টুডিওতে যান—তারও তো কিছু খরচা আছে! তারপর নিজের অন্যান্য খরচ তো রয়েছেই। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ। বড়দিনের আগমনী ঘোষিত হ'য়েছে। গৃহকর্ত্রী একদিন শ্রীযুক্ত পালকে ডেকে বল্লেন, "ছাখো, আমাদের পর্ব এসে গেছে—এখন যদি তুমি কিছু না দাও—।" খুব ভদ্রভাবেই তিনি বল্লেন। শ্রীযুক্ত পাল তাঁর এই ভদ্রতার অবমাননা করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উত্তর দিলেন, "তোমার ভদ্রতার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো বড়দিনের পূর্বেই তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিতে।" গৃহ-কর্ত্রীকে কথা অবশ্য দিয়ে ফেলেন কিন্তু তা রক্ষা করবেন কী করে—সেই চিন্তাই শ্রীযুক্ত পালকে পেয়ে বসলো। শ্রীযুক্ত পালের নিজের ওপর খুবই বিশ্বাস ছিল—তাই মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হ'য়ে নিলেন, প্রতিশ্রুতি যখন দিয়েছি, যে কোন প্রকারেই হউক তা' রক্ষা করতেই হবে। প্রতিশ্রুতি পালনের উপায় শেষ পর্যন্ত এক অভাবিতভাবে এসে হাজির হ'লো। বড়দিনের কয়েকদিন পূর্বে মিঃ আরবান একদিন
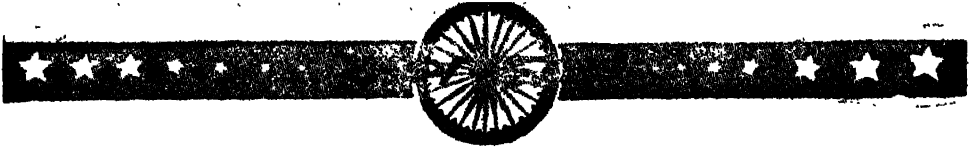
শ্রীযুক্ত পালকে ডাকালেন। তিনি একা বসেছিলেন তাঁর কক্ষে। পাল নমস্কার জানিয়ে ভিতরে ঢুকতেই মিঃ আরবান তাঁকে বসতে বললেন এবং একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমায় কিছু ভাতা ঠিক করে দেবো আমি ভেবেছি—কিন্তু তুমি কত চাও?" শ্রীযুক্ত পাল বিস্ময়ের সংগে উত্তর দিলেন, "অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু আমি কত চাইব—আমি যাতে বাঁচতে পারি এমন কিছু হ'লেই খুশী হবো।" মিঃ আরবান হেসে উত্তর দিলেন, "আমিত সপ্তাহে চারশত পাউণ্ড পাই তবুও নিজেকে চালিয়ে নিতে পারি না। যাই হোক, সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড ক'রে আমি তোমার ভাতা ঠিক করে দেবো—কেমন, আপাততঃ এ দিয়ে চালিয়ে নিতে পারবে না?" শ্রীযুক্ত পাল কৃতজ্ঞচিত্তে উত্তর দেন, "তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার ভাষা আমার নেই।" মিঃ আরবান আরো বল্লেন, "তুমি তো গল্প লিখতে পারো—যদি তোমার কোন গল্প নির্বাচিত হয়, সেজন্য অতিরিক্ত মূল্য যাতে পাও, তারও ব্যবস্থা আমি করে দেবো।" শ্রীযুক্ত পাল মিঃ আরবানকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন। একটা সুরাহা অবশ্য হ'লো। কিন্তু গৃহ-কর্ত্রীর কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা রক্ষা করবার কোন উপায়ই যে আবিষ্কার ক'রতে পাচ্ছেন না। আর সত্যি, এই উৎসবের সময় গৃহ-কর্ত্রীর অর্থেরও যে প্রয়োজন। ১৯১৩, ডিসেম্বর। ক্রিষ্টমাস উ'ভ এলো। শ্রীযুক্ত পাল একদম ভেংগে পড়েছেন। বড়দিনের পূর্বে একদিন দেখতে পেলেন—আরবানের অফিসের লোকজনের মাইনে হচ্ছে। সকলেই মাইনে নিয়ে তাঁর সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে শ্রীযুক্ত পাল যেন আরো মুষড়ে পড়লেন। আরবান যদি তাঁকে এই ভাতাটি পূর্বে থেকে নির্ধারণ ক'রে দিতেন, অন্ততঃ গৃহ-কর্ত্রীর কাছে নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগ থেকে রেহাই পেয়ে যেতেন। এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন। হঠাৎ তাঁরও ডাক পড়লো। ক্যাশিয়ারের কাছ থেকে লোক ডেকে গেল। তাঁকে কেন ক্যাশিয়ার ডাকবে—নিশ্চয়ই ভুল করেছে। শ্রীযুক্ত পাল কোন সাড়া না দিয়ে তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। আবার লোক এলো। অগত্যা ক্যাশিয়ারের কাছে যেয়ে হাজির হ'লেন। ক্যাশিয়ার খাতায় সই নিয়ে একটা খাম পালের হাতে দিলেন! ভুল করে দেয়নি তো! না, খামের ওপর যে শ্রীযুক্ত পালেরই নাম লেখা র'য়েছে। শ্রীযুক্ত পালের বিস্ময়ের অবধি রইল না। মাইনে দেবার সময় এমনি ভাবে খামে করে দেবার প্রথা এখানে প্রচলিত—যাতে পরস্পরের মাইনের পরিমাণ কেউ জানতে না পারে। আর এতে ঝামেলাও কমে যায় অনেকটা। তাই এই মাইনের খাম হাতে পেয়ে শ্রীযুক্ত পাল আনন্দ ও বিস্ময় দুইয়েই অভিভূত হয়ে পড়লেন। কারোর সামনে খামটা খুলতেও তাঁর লজ্জা কচ্ছিল। তিনি খামটাকে পকেটে পুরে বাথরুমের দিকে ছুটে গেলেন। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খামটা খুলতে লাগলেন—তাঁর হাত কাঁপছে—জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে—ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে ভগবান! —আর ধন্যবাদ তোমাকে মিঃ আরবান! শ্রীযুক্ত পালের আনন্দের অবধি থাকে না। তিনি হিসাবটার সংগে অর্থের পরিমাণটা তাড়াতাড়ি মিলিয়ে নেন। ছয় মাস ধ'রে তিনি ষ্টুডিওতে যাতায়াত কচ্ছেন। এই ছ'মাসে প্রতি সপ্তাহে পাঁচ পাউণ্ড হারে মোট ১২০ পাউণ্ড তাঁকে দেওয়া হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত পাল খুশী মনে বেরিয়ে আসেন। লালমুখোগুলো সম্পর্কে যে ভুল ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হ'য়ে ছিল, এবার তাতে ভাঙন ধরলো। ভাবতে আসে ওরা শোষণ ও উৎপীড়ন করতে কিন্তু ওদের নিজেদের দেশেই ওদের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ভারতের লালমুখ আর বিলেতের লালমুখে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সম্পূর্ণ বিপরীত ধাতে এরা তৈরী। এই আরবান ষ্টুডিওতেই চিত্রশিল্প সম্পর্কে সর্বপ্রথমে হ'লো শ্রীযুক্ত পালের হাতেখড়ি। নিজের প্রতিশ্রুতি ভংগের আশংকা থেকে শ্রীযুক্ত পাল রেহাই পেয়ে গেলেন। শ্রীযুক্ত পাল ইতিপূর্বে ভগবান বুদ্ধের জীবনী রচনা করেছিলেন—বর্তমানে সে রচনাটিকে চিত্রোপযোগী করে ঝালাই করে নিলেন। 'কিনেমা-কলার' চিত্র প্রতিষ্ঠানই বুদ্ধদেবের জীবনীকে পর্দায় রূপায়িত করে তুলতে স্বীকৃত হলো এবং ঠিক হ'লো শ্রীযুক্ত পাল অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ১৯১৪ খৃঃ-এ ভারতে আসবেন চিত্রগ্রহণের জন্য। কিন্তু এই পরিকল্পনা আর বাস্তবে রূপলাভ করতে পারলো না। ১৯১৪
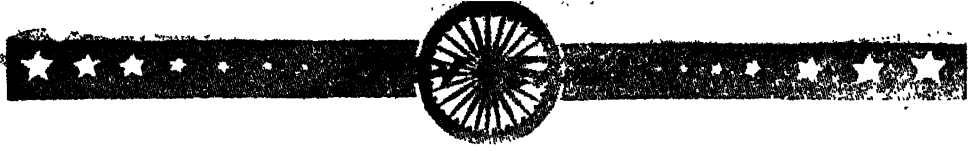
খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে যুদ্ধ বাধলো। গান্ধীজি তখন বিলেতে। তিনি সেখানকার ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে একটি 'এ্যাম্বুলেন্স কোর' তৈরী করলেন। দলের সংখ্যা ছিল ৪৮৩ জন। শ্রীযুক্ত পালও এই দলে যোগদান করেছিলেন। সকলকেই অফিসার র‍্যাঙ্কে গ্রহণ করা হয় প্রথমে। কিন্তু কার্তিকব বলে এক মারাঠী যুবক একদিন মত্ত অবস্থায় গর্হিত কাজ করে বসাতে কোরের কাছ থেকে অফিসারদের পোষাক-পরিচ্ছদ কেড়ে নেওয়া হয় এবং পরিবর্তে তাঁদের সাধারণ টমির পোষাক দেওয়া হয়। এতে দলের ভিতর বেশ অসন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা দলত্যাগেরও হুমকী দেখান। তখন গান্ধীজি সকলকে ডেকে বোঝালেন যে, তাঁরা সেবার আদর্শে স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে যোগদান করেছেন—এ অবস্থায় তাঁদের কোনপ্রকার অসন্তোষের ভাব পোষণ করা উচিত নয়। সামান্য পোষাক নিয়ে এই ঝগড়া খুবই গর্হিত। কিন্তু গান্ধীজির এই উপদেশ বড় বেশী কার্যকরী হ'লো না। মাত্র ৩৫ জন বাদে সকলেই পদত্যাগ করলেন। এই ৩৫ জনের বেশীর ভাগই বাঙ্গালী ছিলেন। এঁরা প্রয়োজনবোধে কোন কাজ করতেই দ্বিধা করেননি—এমন কী পায়খানাও পরিষ্কার করেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অফিসারদের পোষাকই এঁদের দেওয়া হ'লো এবং সবাই ফিরে এলেন। সকলকেই অফিসার র‍্যাঙ্কে উন্নীত করা হ'লো। এ্যাম্বুলেন্স কোরের কাজ থেকে ছুটি পাবার পর আরো বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থেকে শ্রীযুক্ত পাল নিজের জীবিকার্জন করেছেন। কিন্তু মূলতঃ তাঁর মন পড়েছিল চিত্র জগতের প্রতি। বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকা সময়েও তিনি চিত্রশিল্পের কথা ভুলে যাননি। ১৯১৬ খৃঃ-এ কেন ফিল্ম্ কোম্পানীর তরফ থেকে "Faith of a Child" নামক ছয় রিলের ছবিখানি করেন। "Faith of a Child" ইংল্যাণ্ডে গৃহীত সর্বপ্রথম ছয় রীলের ছবি এবং 'কিউ গ্যালারী' সিনেমাতে দু'সপ্তাহ চিত্রখানি প্রদর্শিত হয়। ইংলণ্ডে গৃহীত প্রথম সবাক ছবির কাহিনীটিও শ্রীযুক্ত পালই রচনা করেন। এই চিত্রখানির প্রথমে নাম ছিল "A gentle man of Paris" পরে এই নামটি বদল করে রাখা হয় "He honoured the Judge."—এই সবাক চিত্রখানি অবশ্য গৃহীত হয় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে। "Faith of a child" চিত্রখানির পরিচালনা করেছিলেন মিঃ থর্ণটন এবং তাঁরই প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত পাল প্রতি সপ্তাহে দশ পাউণ্ড পারিশ্রমিকে উক্ত চিত্র প্রতিষ্ঠানে কাজ পেয়ে যান। এই কেনফিল্ম কোম্পানীতে কাজ করার সময় শ্রীযুক্ত পাল রেক্স উইলসন নামে এখানকার আর একজন চিত্র পরিচালকের সংগে পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। রেক্স উইলসনের ধারণা ছিল, দুই শ্রেণীর ভারতীয় আছে। এক শ্রেণীর হচ্ছে রাজরাজার দল—আর এক শ্রেণীর হচ্ছে জাহাজের লস্কর। শ্রীযুক্ত পালকে রেক্স উইলসন (Rex Wilson) প্রথমোক্ত দলের ব'লেই গ্রহণ করে। উইলসন লোকটি বড় সুবিধার ছিল না। দেখতেও যেমনি গোঁয়ার গোবিন্দ—শিক্ষাও তেমনি তার কিছু ছিল না। তা'ছাড়া বেশ একটু ঠকবাজ ছিল। মিঃ থর্ণটন যিনি শ্রীযুক্ত পালের একজন পরম উপকারী বন্ধু, তিনি উইলসন সম্পর্কে পালকে পূর্বে থেকেই হুঁসিয়ার করে দিয়েছিলেন। তাঁর সে হুঁসিয়ার বাণী পালের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারলো না—বরং পাল তাঁকে এড়িয়েই চলতে লাগলেন। আর তাঁর মাখামাখি বেড়ে চললো উইলসনের সংগে—বিষ্ণুশর্মার কাক, হরিণ আর শৃগালের কাহিনীর মত এই তিন জন বন্ধুর কাহিনীও পরিণতির দিকে এগোতে লাগল। উইলসন নানাভাবে শ্রীযুক্ত পালকে প্ররোচিত করতে থাকে। তাঁর কানে অনবরত চাটুবাক্য বর্ষণ করতে লাগলো: এসো পাল, তুমি নিজেই চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে নেমে এসো—তোমার এত সংগতি রয়েছে—তাছাড়া রাজপুত্রের উপযোগী চেহারাই বটে তোমার! এসো, তুমিই নামবে নায়কের ভূমিকায়—গল্প লিখতে সুরু করে দাও। একাধারে তুমি হবে প্রযোজক, কাহিনীকার ও অভিনেতা! তোমাকে আর পায় কে? চারিদিকে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়বে—পকেটও দেখতে দেখতে উঠবে ফেঁপে। আমি আর কী করবো, তুমি বন্ধুলোক—হাত খরচা যাই হউক কিছু দিও—খুব অল্প খরচার ভিতরই ছবিখানি পরিচালনা করে শেষ করে দেবো।" পাল উইলসনের প্রভাব থেকে কোনমতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। চিত্রপ্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করলেন।
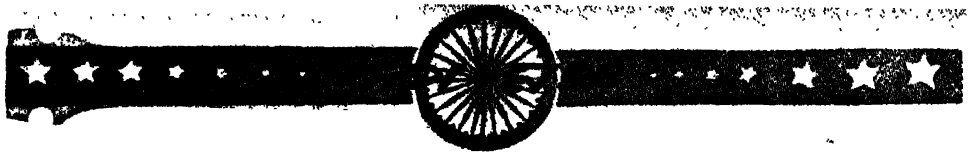
তিনিই কাহিনী রচনা করলেন কাহিনীর নায়ক একজন শিকারী। ঠিক হ'লো নায়কের ভূমিকাভিনয়ও তিনিই করবেন আর চিত্রখানি পরিচালনা করবেন মিঃ রেক্স উইলসন। ছবিখানির নাম করা হ'লো Tricks of fate—একটী বাগান বাড়ী ভাড়া নিয়ে চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু হলো। সূর্যের আলোতেই চিত্রগ্রহণ করা হবে বলে তাঁরা স্থির করলেন। রেক্স প্রথমে ১২৫০ পাউণ্ডের ভিতর ছবিখানি শেষ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই সম্পূর্ণ অর্থই শ্রীযুক্ত পাল তাঁর সঞ্চিত অর্থ থেকে ব্যয় করলেন। ১২৫০ পাউণ্ড শেষ হ'লে গেল কিন্তু চিত্রখানি শেষ হ'তে যে তখনও অনেকখানি বাকী! অথচ পকেট শূন্য। ছবিখানাকে শেষ করতে উইলসনের আগ্রহ না থাকলেও পাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'য়ে উঠলেন—যাই হউক না কেন, ছবিখানি শেষ করতেই হবে। তখন পালের গৃহ-কর্ত্রী ছবিখানি শেষ করতে আরো যে অর্থের প্রয়োজন, তা যোগাতে রাজী হ'লেন। তার কাছ থেকে আরো ১০০০ হাজার পাউণ্ড ধার নিয়ে ছবিখানা কোনরকমে শেষ করা হ'লো। ছবিখানা সমাপ্ত হ'লে পাল'ত অবাক! উইলসন এ কী করেছে! এ যে সাপ ব্যাঙ কিছুই হয়নি! না, এ ছবিকে কিছুতেই পাল মুক্তির অনুমতি দিতে পারেন না। বন্ধুর কথা তিনি অবহেলা করেছেন - তার জন্য শাস্তি তাঁকে পেতে হবে বৈ কী? 'Tricks of Fate করতে যেয়ে নিজের ভাগ্যই একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। নিজের অর্থের কথা শ্রীযুক্ত পালকে ততটা ভাবিয়ে তুললো না, যতটা ভাবিয়ে তুললো গৃহকর্ত্রীর হাজার পাউণ্ডের কথা। সে মহিলা শুধু তাঁর ওপর বিশ্বাস করেই এই অর্থ সাহায্য করেছেন—তাঁর বিশ্বাসের অমর্যাদা কখনও তিনি করতে পারেন না। যেমন করে হউক, গৃহ-কর্ত্রীর দেনা তাকে পরিশোধ করতেই হবে। কারণ, বিদেশে তিনি শুধু নিরঞ্জন পাল নন—তিনি একজন ভারতবাসী। তাঁর ব্যবহারের ওপর ভারতের সুনাম জড়িয়ে আছে বৈকী! তাই নিজের ব্যক্তিগত কারণে সে সুনামকে কোন মতেই তিনি ক্ষুন্ন হ'তে দিতে পারেন না। ধীরে ধীরে তিনি গৃহকর্ত্রীর সম্পূর্ণ দেনা কিছুদিন পরে পরিশোধ করে দেন।

Tricks of fate করতে যেয়ে শ্রীযুক্ত পাল সর্বস্বান্ত হ'য়ে পড়লেন। আবার তাঁকে ভাগ্যান্বেষণের জন্য ছুটোছুটি করতে হ'লো। অবশেষে এক ইটালীয়ান হোটেলে রান্না করবার জন্য পদপ্রার্থী হ'য়ে কর্মাধ্যক্ষের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। কর্মাধ্যক্ষ পালের চেহারা ও কথাবার্তায় মুগ্ধ হ'লেন—তিনি বুঝলেন, নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়েই এই অনভিজ্ঞ যুবক এই কাজের জন্য তাঁর কাছে পদপ্রার্থী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু নিজের এই মনোভাব শ্রীযুক্ত পালকে জানতে না দিয়ে 'হেড কুকে'র সংগে আলাপ করিয়ে দিয়ে পালকে তার বিভাগে গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। এই হোটেলটির নাম গ্যাটিস রেসটুর্যান্ট (Gattis Restaurant)। হেডকুক তার বিভাগে পালকে বহাল করে নিলেন। পালের অনভিজ্ঞতা পদে পদে প্রকাশ হ'য়ে পড়তে লাগলো। একদিন কচি মুরগীর পালক ছাড়াতে যেয়ে এমনই কাণ্ড করে বসলেন যে, মুরগীর হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছু রইল না। হেড-কুকের কাছে সংবাদ যেতে সে এসে খুব বকাবকি সুরু করে দেয়—পালের মেজাজ গরম হ'য়ে ওঠে—হাতের কাছ থেকে একটা সসপ্যান তুলে নিয়ে তাকে আঘাত করে বসেন। কিন্তু অমন পালোয়ান আর রাগী হেড-কুক কোন উত্তর না করে শুধু বলে—মাই বয়, পোষাক গুলো রেখে চলে যাও—মেজাজটাকে দমিয়ে রেখো, নইলে জীবনে অনেক দুঃখ পাবে। আমি তোমার ভবিষ্যতের উন্নতি কামনা করি।" পাল'ত অবাক! তিনি কোন কথা না বলে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু অশিক্ষিত হেডকুকের কাছ থেকে যে শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন, জীবনে কোনদিন তা ভুলতে পারেন নি।

অনেকদিন কেটে গেছে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পালের 'Goddes' নাটকটি লণ্ডনের একটি বিখ্যাত নাট্য-মঞ্চে অভিনীত হ'লো। নাটকটি অদ্ভুত সাড়া এনে দেয়। এই উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত পালকে অভিনন্দন জানাবার জন্য গ্যাটিস রেসটুর্যান্টে কর্তৃপক্ষ এক প্রীতিভোজের আয়োজন করেন। শ্রীযুক্ত পালকে দেখে হেডকুক তখন চিনতে পারে না। পাল নিজে গিয়ে তার সংগে আলাপ করেন এবং পূর্বের কাহিনী বর্ণনা করতে হেড কুক আনন্দে পালকে জড়িয়ে ধরে অভিনন্দন জানায়। এই গ্যাটিস হোটেলের চাকরী
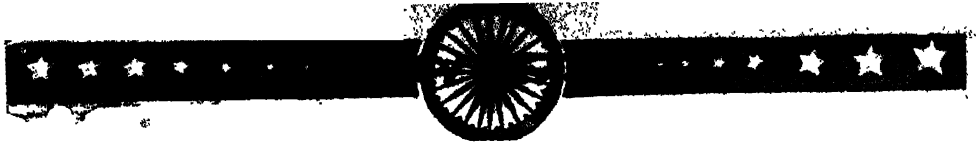
ছাড়বার পর পাল খামের ওপর ঠিকানা লিখবার একটি কাজ যোগাড় করেন। তারপর লিপটনের মদ ও স্পিরিট বিভাগে একটী স্থায়ী কাজ পেয়ে যান এবং এখানে তিনি সহকারী কার্যাধ্যক্ষের পদে উন্নীত হ'য়েছিলেন। তখন তাঁর উপার্জন ছিল সপ্তাহে আট পাউণ্ড করে। প্রথম যখন এখানে যোগদান করেন, তখন তাঁর মাইনে ছিল সপ্তাহে দু' পাউণ্ড। এই সময় তিনি খ্যাতনামা মঞ্চ-প্রযোজক ও অভিনেতা অসকার আসকের (Oscar Asche) সংস্পর্শে আসেন। অসকার তার পূর্বে 'চুচিং চাং' নাটকটি প্রযোজনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। অসকারই পালকে লিপটনের কাজটি যোগাড় করে দেন। আলিবাবার কাহিনীকে কেন্দ্র করেও পাল তাঁকে একটী নাটক রচনা করে দেন—এটিও বহুদিন ধরে অভিনীত হয়। তারপর শ্রীযুক্ত পাল ষ্টল পিকচার্স প্রডাকসনের সংস্পর্শে আসেন এবং এখানে এসে দেখতে পান তাঁর পুরোন বন্ধু থর্ণটনকে—তিনি এখানে অন্যতম একজন পরিচালকরূপে কাজ কচ্ছেন। থর্ণটনের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের গল্প বিভাগে গল্প তদারক করবার জন্য শ্রীযুক্ত পাল কাজ পেয়ে যান। সিনক্লেয়ার (Sinclair) নামে এই প্রতিষ্ঠানের আর একজন পরিচালক ছিলেন। তিনি তখন 'Her place of honour' চিত্রখানি পরিচালনা কচ্ছিলেন। ভারতের পটভূমিকাতেই এই চিত্র কাহিনীটি গড়ে উঠেছিল। সিনক্লেয়ারের ধারণা ছিল, ভারতীয় সংক্রান্ত যাই কিছু হউক না কেন—কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখাতে হ'লে পামটি অর্থাৎ তালগাছ জাতীয় বৃক্ষ তাতে রাখতেই হবে। সিনক্লেয়ারের মতে এই পামটি ভারতীয় পটভূমিকার অপরিহার্য অংগ। তিনি একটি পাহাড়ের চূড়ো পামটি বসিয়ে দিলেন। শ্রীযুক্ত পাল-এর প্রতিবাদ করলেন কিন্তু সিনক্লেয়ার তাঁর সে প্রতিবাদ শুনতে রাজী নয়। এই নিয়ে দু'জনের ভিতর বেশ মতদ্বৈধ দেখা দিল। সিনক্লেয়ারের ভারত সম্পর্কে আরো অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা ছিল—যেমন যে ধরণের ছবিই হউক না কেন, ভারতের গন্ধ থাকলে পামটির মত সাপ আর সন্ন্যাসী তার ভিতর তিনি রাখবেনই। পাল তখন থর্ণটনের সংগে কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রতিষ্ঠান 'Needles eye' নামে পালের আর একটি কাহিনী চিত্র রূপায়িত হয়।

১৯১৯ খৃঃ-এ শ্রীযুক্ত পাল তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে নিয়ে British & Oriental Company নামে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। লর্ড মেস্টন এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদান করলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য রইলো, বিটেনের যা ভাল তা চিত্র মারফৎ ভারতে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে আবার ভারতের যা প্রশংসনীয়, চিত্র মারফৎ ব্রিটেনের জনসাধারণের সামনে সেগুলি তুলে ধরা হবে। টাটা কম্পানীর লণ্ডনস্থ কার্যালয়ের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে. কে, মেঠাও এই চিত্র প্রতিষ্ঠানে অন্যতম পরিচালক ও কর্মকর্তারূপে যোগদান করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপগ্রহণ করতে পারে না—তখন উদ্যোক্তারা সকলে পরামর্শ করে কম্পানীটি ইচ্ছাকৃতভাবে লিকুইডেশনে দিয়ে দেন। শ্রীযুক্ত পাল তখন মঞ্চের দিকে ঝুকে পড়েন এবং মঞ্চের উপযোগী কয়েকখানা নাটক লিখতে সুরু করেন। এই এই সময়ই তাঁর গডেজ (Goddess) মঞ্চস্থ হয়। The Magic Crystal, What a change, House opposite প্রভৃতি লণ্ডনের নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়। 'দি ম্যাজিক ক্রাইসট্যাল' যখন মঞ্চস্থ হয়, তখন কর্তৃপক্ষ অদ্ভুত প্রচার কার্য করেছিলেন। গডেজ প্রযোজনার সময়ও অবশ্য প্রচার কার্য কম করা হ'য়েছিল না। এমন কী সপ্তাহে হাজার পাউণ্ড মাইনে দিয়ে গডেজ প্রযোজনার জন্য আমেরিকা থেকে গে ব্রাগডন (Gay Bragdon) নামে একজন বিশেষজ্ঞকে আনা হ'য়েছিল। তিনিই গডেজ প্রযোজনা করেন। যাই হউক, ম্যাজিক ক্রিসট্যালের প্রচার কার্য স্বর্গত হিমাংশু রায়কে আকৃষ্ট করে। লাহোরের গ্রেট ইষ্টার্ণ করপোরেশন কম্পানীর চেয়ারম্যান মতিসাগর নামে এক ভদ্রলোকের সংগে হিমাংশু রায়ের পরিচয় ছিল। লণ্ডনের খ্যাতনামা নাট্যপ্রযোজক স্যার আলফ্রেড যিনি এই ম্যাজিক ক্রিসট্যাল প্রযোজনা করেন, তাঁর সংগেও মতিসাগরের পরিচয় ছিল। এঁদের মধ্যস্থতায় হিমাংশু রায় শ্রীযুক্ত পালের সংগে পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। এই ঘণ্টায়

ভিতর স্যার আলফ্রেডের সংগে ব্রাগডনের এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়। মিসেস আরাকান, হিমাংশু রায় এবং মিসেস লোকেন পালিত শ্রীযুক্ত পালের নাটকে অভিনয়ের জন্য চুক্তি বদ্ধ হন। এদের ভিতর সতু ঘোষ, মটি ঘোষ প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য। হিমাংশু রায়কে সংগে নিয়ে এই সময় শ্রীযুক্ত পাল একবার কার্নোপলক্ষে মিউনিকও গিয়েছিলেন। এই সময়ই 'লাইট অফ এশিয়া'র চিত্ররূপের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং শ্রীযুক্ত পাল ১৯২৪ অথবা ২৫ খৃষ্টাব্দে দলবল নিয়ে ভারতে আসেন লাইট অফ এশিয়ার চিত্রগ্রহণ করতে। 'লাইট অফ এশিয়া' শ্রীযুক্ত পাল ও ফ্রান্স অসটিন (Franz Ostin) এর যুগ্ম পরিচালনায় গৃহীত হয়। চিত্রগ্রহণ সমাপ্ত হলে তাঁরা আবার ফিরে যান বিলেতে। 'লাইট অফ এশিয়া'তে স্বর্গত হিমাংশু রায় বুদ্ধদেবের চরিত্রকে রূপায়িত করে তোলেন। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্তা মায়া রায়, শ্রীযুক্ত চারু রায় ও প্রফুল্ল রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনস্থ প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা প্রথম এই ভারতীয় চিত্রখানির মুক্তি দিতে স্বীকৃত হন না। তখন মফঃস্বলে ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে 'লাইট অফ এশিয়া' মুক্তিলাভ করে। সুইজারল্যাণ্ডেও ছবিখানি অসম্ভব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রীযুক্ত পালের কাছে অভিনন্দন পত্র আসতে থাকে। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে চার্লি চ্যাপলিনের গোল্ডরাসের পাশাপাশি প্রদর্শিত হ'য়ে 'লাইট অফ এশিয়া' জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মিঃ হ্যামিলটন পরে যিনি রিচার্ড টেম্পল হ'ন, তিনিও চিত্রখানি দেখে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লণ্ডনে চিত্রখানি যাতে মুক্তি লাভ করতে পারে, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবেও যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তাঁরই উদ্যোগে লণ্ডনের ফিল হারমোনিক হ'লে 'লাইট অফ এশিয়া' মুক্তি লাভ করে। শ্রীযুক্ত পালের ইচ্ছা হ'লো সম্রাটকে ছবিখানি দেখাবেন। কিন্তু ইচ্ছা হলেই আর উপায় হয় না। উপায় আবিষ্কারে তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন। তখন লণ্ডনস্থ ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন স্যার অতুল চট্টোপাধ্যায়। পাল তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করলেন। তিনিও কোন কথা দিতে পারলেন না। কারণ, এর পূর্বে ইংল্যাণ্ডের রাজা ইংলণ্ডে নির্মিত কোন ছবিও দেখেননি—তাঁর প্রথম ছবি দর্শনের গৌরব একখানি ভারতীয় ছবি লাভ করবে—এতো একটা অসম্ভব ব্যাপার। ইংলণ্ডের লোকই বা তা সহ্য করবে কী করে! শ্রীযুক্ত পাল ফিরে এসে স্যার অতুলের পরামর্শে নিজেই রাজার কাছে এক আবেদন করলেন। কোন উত্তর পেলেন না। আট দশ দিন কেটে গেল। হাইকমিশনের হাউস থেকে শ্রীযুক্ত পাল একদিন এক টেলিফোন পেলেন। 'লাইট অফ এশিয়া' ছবিখানি দেখবেন বলে রাজা সেখানে সংবাদ পাঠিয়েছেন এবং হাই কমিশনারের অফিসে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্টদের অবহিত হতে বলা হ'য়েছে। বলা বাহুল্য যে, শ্রীযুক্ত পাল স্যার অতুলের

পরামর্শেই তাঁর অফিস মারফৎ রাজার নিকট আবেদন করেছিলেন। উওসর ক্যাসেলে সম্রাটকে 'লাইট অফ এশিয়া' চিত্রখানি দেখাবার ব্যবস্থা করা হ'লো। একখানি ভারতীয় ছবিই সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেশ্বরকে দর্শকরূপে পাবার গৌরব লাভ করলো। বেনহুরের মত চিত্র সেখানে লণ্ডনে সাড়ে নয় মাস ধরে প্রদর্শিত হ'লো, তারই পাশাপাশি 'লাইট অফ এশিয়া' চললো পুরো দশ মাস। তারপর খ্যাতনামা 'উফা' প্রতিষ্ঠানটি তার 'সিরাজ' কাহিনীকে রূপায়িত করে তোলে। এবং 'থ্রো অফ ডাইস' ও পর্দায় রূপলাভ করে এদেরই প্রযোজনায়। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পাল বোম্বাইতে ফিরে আসেন। স্বর্গতঃ হিমাংশু রায়ের প্রযোজনায় তাঁর কর্ম রূপলাভ করে। এই সময় স্বর্গতঃ রায়ের সংগে তাঁর কিছুটা ছাড়াছাড়ি হয়—কারণ তিনি 'উফা'র ভারতীয় শাখার সংগে জড়িত হ'য়ে পড়েন। পরে শ্রীযুক্ত পাল কলকাতায় আসেন এবং অরোরা ফিল্ম ও ইণ্ডিয়া কিনেমা আর্টের পক্ষ থেকে যথাক্রমে 'পূজারীণ'ও 'পরদেশীয়া' চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পাল স্বর্গতঃ হিমাংশু রায়ের আমন্ত্রণে বোম্বাইতে যান—স্বর্গত রায় তখন বম্বে টকীজের পরিকল্পনায় মত্ত - শ্রীযুক্ত পাল বম্বে টকীজের গোড়াপত্তনেই সেখানে যোগদান করলেন এবং দু'বৎসর কাজ করবার পর ১৯৩৭ খৃঃ এ তাঁর কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে অরোরা ফিল্ম করপোরেশনে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত পালের বম্বের উল্লেখযোগ্য চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্যের ভিতর নাম করা যেতে পারে—১। জোয়ানী কী হাওয়া। ২। মমতা। ৩। মিয়া বিবি। ৪। জীবন নইয়া। ৫। প্রেম কাহিনী। ৬। অচ্ছুতকন্যা। ৭। ইজ্জত ৮। জীবন প্রভাত। ৯। জন্মভূমি। ১০। সাবিত্রী। এই চিত্রগুলির ভিতর একমাত্র ইজ্জত ছাড়া আর সব কয়টিরই কাহিনী রচনা করেন শ্রীযুক্ত পাল।

কলকাতায় এসে ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানসান বোর্ডের হ'য়েও তিনি কতগুলি খণ্ড চিত্র তৈরী করেন। তাছাড়া অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের হ'য়ে তিনি বাংলার শিশু-চিত্রামোদীদের জন্ত তিনখানি চিত্র নির্মাণ করেন। হাতে খড়ি, দ্বিতীয় পাঠ - অন্ধনাচার এই তিনখানি শিশু চিত্রই শুধু বাংলার নয় ভারতের সর্বপ্রথম শিশু চিত্রের গৌরবে আজও স্মরণীয় হ'য়ে আছে, বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্তও ভারতীয় চিত্রজগত কেবল মাত্র শিশু দর্শকদের কথা চিন্তা করেই এই সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবার মত কোন শিশু চিত্র গড়ে তুলতে পারলেন না। নিউ থিয়েটার্স লিঃ অবশ্য রামের সুমতি সম্প্রতি উপহার দিয়েছেন—রামের সুমতি শিশুদের উপযোগী পূর্ণাংগ চিত্র হ'লেও কেবলমাত্র শিশুদের কথা চিন্তা করেই যে চিত্রখানি গ্রহণ করা হ'য়েছে একথা যদি অস্বীকার করি তার বিরুদ্ধে কেউ কোন প্রতিবাদ তুলতে পারবেন বলে মনে হয় না। কলকাতায় শ্রীযুক্ত পাল কয়েকখানি পূর্ণাংগ চিত্র গ্রহণ করেন এর ভিতর শুকতারা, রাসপূর্ণিমা, ব্রাহ্মণকন্যা (বাংলা) ও আম্মার (তেলেগু) নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিমধ্যেই ৩২ খানারও উপরে শ্রীযুক্ত পাল খণ্ড চিত্র নির্মাণ করেন। অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গতঃ অনাদি বসু মহাশয়কে শ্রীযুক্ত পাল খণ্ড-সংবাদ চিত্র নির্মাণের এক পরিকল্পনা দিয়েছিলেন। স্বর্গতঃ বসুর এই পরি-কল্পনাকে কার্যকরী করে তুলবার ইচ্ছা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠেনি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার ব্যাপকতা নিয়ে দেখা দিয়েছে—সরকারের আমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত পাল লাহোরে আসেন এ, আর, পির প্রচার কার্যের জন্য কয়েক খানা খণ্ড চিত্র তুলতে। লাহোরে মিঃ থাপ্পারের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি সরকারের জন্য আরো কতগুলি খণ্ড চিত্র নির্মাণে অনুরোধ করেন। শ্রীযুক্ত পাল সম্মত হ'য়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কতগুলি খণ্ডচিত্র নির্মাণ করেন। এগুলির ভিতর ইণ্ডিয়ান মেন অফ লেটার্স, ইণ্ডিয়ান মেন অফ ইনডাসট্রিস, ইণ্ডিয়ান মেন অফ সায়েন্স উল্লেখ-যোগ্য। আমলাতান্ত্রিক সরকার এই চিত্রগুলি দেখে তার প্রদর্শন নিষিদ্ধ করে দেন। এরই প্রতিবাদে তিনি ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়া থেকে অবসর গ্রহণ করে বম্বে ফিরে আসেন। বম্বে প্রত্যাবর্তন করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে চুক্তি অনুযায়ী খণ্ড চিত্র নির্মাণ করতে থাকেন—কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করবার দায়িত্ব ও গ্রহণ করে থাকেন।
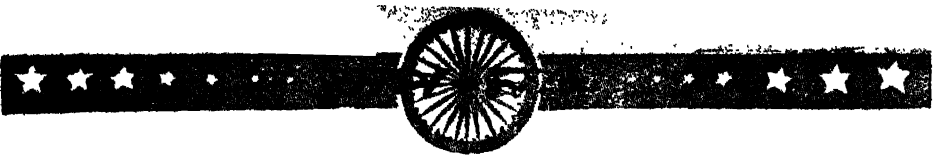
বর্তমানে এরই ওপর শ্রীযুক্ত পালের জীবিকা নির্ভর কচ্ছে।

চিত্র শিল্প সম্পর্কে ভারত সরকারের নবতম পরিকল্পনার প্রতি শ্রীযুক্ত পালের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি জিজ্ঞাসা করি: শিক্ষামূলক ও সংবাদধর্মী খণ্ড চিত্র নির্মাণে ভারত সরকার বর্তমানে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, সে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তুলবার জন্ম আপনার কাছে কোন আমন্ত্রণ এসেছে কিনা এবং এসে থাকলে আপনি তা গ্রহণ করবেন কিনা—" এর উত্তরে শ্রীযুক্ত পাল বলেন, "আমার কাছে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন আমন্ত্রণ আসেনি—ভবিষ্যতে যদি আসে তখন ভেবে দেখা যাবে। তবে একথা ঠিক, উপযাচক হ'য়ে আমি কোন দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহও যেমনি দেখাবো না—অগ্রসরও তেমনি হবো না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নৈরাশ্যের সংগে শ্রীযুক্ত পাল বলেন, "এ বিষয়ে যারা উমেদারী করতে পারবে তাদেরই ডাক আসবে। এই বুড়ো বয়সে আর অতটা ধরপাকড়ের ইচ্ছে নেই।"

আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি একজন অভিজ্ঞ ও ও প্রবীণ চিত্রশিল্পবিদ্। জাতীয় সরকারের এই পরিকল্পনায় আপনার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যথেষ্ট সাহায্য করবে বলেই আমরা মনে করি—নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের সাহা য্যার্থে অগ্রসর হওয়ায় আপনার নিজেরও যে কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে তা কী আপনি অস্বীকার করেন? আপনার সহ-যোগিতায় এই পরিকল্পনা হয়ত সুষ্ঠুরূপ লাভ করতে পারবে।" শ্রীযুক্ত পাল আমার কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, "আমি কতদূর কী করতে পারবো বলা কঠিন—তবে এ বিষয়ে বহুদিন থেকেই ঘাটাঘাটি কচ্ছি হয়ত কিছুটা ধারণা লাভ করেছি এবং চলচ্চিত্রের শিক্ষার দিকটা বিকাশের আদর্শকেই বড় করে দেখেছিলাম—তাই জাতীয় সরকারের সাহায্য পেলে হয়ত তাকে রূপায়িত করে তুলতে একবার সুযোগ পেতাম। কিন্তু ব্যাপারটার সংগে যদি কেউ ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা টেনে আনেন, এই আশংকাতেই আমি উপযাচক হ'য়ে কিছু বলবো না।" আমি এই প্রসংগ ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভারতীয় চিত্র-জগতে আপনি এমন কোন প্রযোজকের সংস্পর্শে এসেছেন কিনা—যিনি বা যাঁরা নিছক ব্যবসায়টাকেই বড় করে দেখেন নি—চলচ্চিত্রের অন্যান্য দিকটা নিয়েও যাঁরা চিন্তা করেন।" আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শ্রীযুক্ত পাল বলেন, "এ প্রসংগে সর্বাগ্রে স্বর্গতঃ অনাদি বসুর কথাই আমি বলবো। ভারতীয় চিত্রজগতে অনাদিবাবুর মত হৃদয়বান লোক আমি আর দ্বিতীয়টি দেখিনি বল্লেই চলে। চিত্রজগতের তিনি একজন নিছক ব্যবসায়ী ছিলেন বল্লে তাঁর সম্পর্কে ভুল বলা হবে। তিনি ছিলেন চিত্রজগতের একজন দরদী বন্ধু। যে কোন পরিকল্পনার ভেতর যদি কোন নতুনত্ব থাকতো অথবা সে পরিকল্পনা আদর্শমূলক হ'তো তা তাঁকে অতি সহজেই আকৃষ্ট করতো। তিনি সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকলে তাঁকে দিয়ে আরো অনেক কিছুই করানো যেতো।"

"একখানি চিত্রের সাফল্যের মূলে কোন বিষয়টিকে আপনি সবচেয়ে আগে স্থান দেবেন—?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রীযুক্ত পাল উত্তর দিলেন, "একখানি চিত্রের সাফল্যের মূলে পারস্পরিক সৃহৃতা ইংরেজীতে যাকে আমরা বলি, 'team-work' তাকেই আমি সর্বাগ্রে স্থান দেবো। যদি কোন চিত্র পরিচালক বা প্রযোজক তাঁর কর্মী, বিশেষজ্ঞ ও শিল্পীদের ভিতর এই পারস্পরিক সৌহার্দ গ'ড়ে তুলতে পারেন, তবে তাঁর প্রযোজনার সাফল্য সম্বন্ধে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন। আজ এইটের অভাব ব'লেই চিত্রশিল্পের এত দুর্গতি। তারপর আসে কাহিনী এবং কুশলী যন্ত্র-শিল্পীদের কথা।" "বম্বে এবং বাংলার চিত্র জগতের তুলনা-মূলক বিচারে কাকে আপনি শ্রেষ্ঠ আসন দেবেন"—একথা জিজ্ঞাসা করলে শ্রীযুক্ত পাল উত্তর দেন, "কাহিনী এবং অভিনয়ের দিক থেকে বাংলার সংগে তুলনায় বম্বের আসন অনেক নীচে বলেই আমি মনে করি। তবে যান্ত্রিক কলা-কুশলতার দিক থেকে বম্বে বাংলাকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক-

খানি একথাও না বলে পারবো না।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীযুক্ত পাল বলেন, "আবার একথাও ঠিক, বাংলার যন্ত্রশিল্পীরা সুযোগ পেলে যে বম্বের যন্ত্রবিদদের ছাড়িয়ে যাবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যে পরিবেশ ও মালমসলা নিয়ে তাঁদের কাজ করতে হয়—তাতে তাঁরা যা' করেন সেটুকু প্রশংসার বৈকী? শুধু যন্ত্র-শিল্পীরাই নন—শুধু চিত্রজগত সম্পর্কেই নয়—সমগ্রভাবেই বাঙ্গালীরা বেশী মেধাবান। সুযোগ পেলে তাঁরা যে কোন ভারতীয়দের সংগে যে কোন বিষয়ে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন।"

বাংলার বর্তমান চিত্রজগতের অবনতির জন্য শ্রীযুক্ত পাল খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "দলাদলির জন্যই বাঙালী নষ্ট হ'য়ে গেল। এই দলাদলিই বাংলা চিত্র শিল্পের অবনতির অন্যতম কারণ। আপনারা সাংবাদিক—আপনারা এই দলাদলি রেষারেষি দূর করবার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করুন।" বাংলা চিত্র জগতের আরো বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শ্রীযুক্ত পালের সংগে আলোচনা হয়—বাংলা চিত্র জগতের প্রতি তাঁর যে দরদী মনের পরিচয় পাই, তা বর্তমানকালীন বাংলা প্রযোজকদের অনেক চাঁই-চামুণ্ডাদের ভিতরও দেখতে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত পাল ব্যক্তিগত-সঞ্চয়ের বিরোধী। তিনি নিজেকে একজন পুরোদস্তুর বহিমিয়ান বলে মনে করেন। এই বৃদ্ধ বয়সেও ভবিষ্যতের কথা তিনি চিন্তা করেন না। তিনি পরিবারবর্গের জন্য কোন সংস্থানও রাখেন নি—এমন কী জীবন-বীমাও তিনি করেননি। তিনি এক সংগে ভাগ্য এবং কর্ম দু'য়েই বিশ্বাসী। এ বিষয়ে তিনি বলেন, "যতক্ষণ দেহে শক্তি ও মনে বল আছে কাজ করে যাচ্ছি—যা হবার তা হবেই। রোজগার রইল—খেলাম। রোজগার রইল না—খেলাম না। না খেয়ে যদি থাকতে না পারি, উপায় তখন একরকম ভাবে এসে দেখা দেবেই।"

শ্রীযুক্ত পালের সংগে দু'দিন আমি সাক্ষাৎ করি। এই দু'দিনে তাঁর কাছ থেকে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, তা আমার সাংবাদিক জীবনে পরম পাওয়া বলেই উজ্জল হ'য়ে থাকবে।

শ্রীযুক্ত পাল ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বিলেতে এক ইংরেজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। নাম তাঁর লিলি। এই দু'দিনেই খুব কাছ থেকে শ্রীযুক্তা পালকেও লক্ষ্য করবার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। আমাদের বাংগালী ঘরের খাঁটি মহিলাদের সংগে তাঁর কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনি। আলোচনার সময় তিনি একবার বিশেষ প্রয়োজনে তাঁর স্বামীকে ডাকতে এসেছিলেন—আমি তাঁকে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াই। তিনি হাসিমুখে প্রতি নমস্কার জানিয়ে বলেন, "ওঁকে একটু বিশেষ দরকারে দু'মিনিটের জন্য ডাকতে হ'লো—অসুবিধার জন্য ক্ষমা করবেন।" তাঁর এই সৌজন্য প্রকাশের ভিতর নিছক মামুলী প্রথারই পরিচয় পেলাম না - তাঁর আন্তরিকতা ও চারিত্রিক মাধুর্যে আমার অন্তর শ্রদ্ধায় নুইয়ে পড়লো। স্বামীর প্রতিটি কাজ বাংগালী ঘরের বধূর মতই তিনি নিজে হাতে করে থাকেন—বিদেশীয় হ'য়েও বাংলার আচার-ব্যবহার তিনি মজ্জাগত করে নিয়েছেন। তাই, শ্রীযুক্ত পালের আত্মীয়-স্বজনের মাঝে তাঁকে কেউ বিদেশীয় বলে মনে করেন না। এঁদের একমাত্র ছেলে কলিন পালও পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রথম দিন অর্থাৎ ১৯শে মার্চের সাক্ষাৎকারের দিন রূপ-মঞ্চের কয়েকটি খণ্ড শ্রীযুক্ত পালকে উপহার দেবার জন্য আমি সংগে নিয়ে গিয়েছিলাম। ওগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আসবার সময় বলে আসি, "২১শে মার্চ যখন আসছি, আমাদের পত্রিকা সম্পর্কে আপনার মতামত চাই।" ২১শে মার্চ আলোচনা শেষে শ্রীযুক্ত পাল কোন একটি বিশেষ চিত্রের সমালোচনার কথা উল্লেখ করে বলেন, "আপনাদের এই সমালোচনা দেখি এক সাড়া এনে দিয়েছে। আমার আত্মীয়-স্বজনদের যাঁদের বাড়ীই যাচ্ছি, তাঁরা এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন, 'দেখেছেন, কী রকম লিখেছে! আর এর এক বিন্দুও মিথ্যে নয়।' নির্মম হ'লেও সত্যভাষণ হচ্ছে পত্রিকার প্রধান ধর্ম—আপনারা সে ধর্ম মেনে চলছেন, তার প্রমাণ আপনাদের গুণগ্রাহীদের কাছ থেকেও যেমনি পেলাম—তেমনি যে কয়খানা কাগজ দিয়ে গেছেন, তা' থেকেও একটু ধারণা করে নিতে পেরেছি বৈকী?" নমস্কারের সংগে গভীর কৃতজ্ঞতা ও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রীযুক্ত পালের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে আসি। —শ্রীপার্থিব।

রাজ জ্যোতিষী

পূরবী—

নব গঠিত কে, সি, দে প্রডাকসনের ছবি—অভিনয়াংশে আছেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্ধ্যারাণী, পরেশ ব্যানার্জি, তুলসী চক্রবর্তী, সুহাসিনী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন—চিত্ত বসু। সুর-সৃষ্টি করেছেন—কৃষ্ণচন্দ্র দে ও প্রণব দে। কাহিনী—নিতাই ভট্টাচার্য।

নিতাই ভট্টাচার্য রচিত কাহিনীকে অবলম্বন করে পুরবী গঠিত হয়েছে। পুরবীর আখ্যানভাগের মূল কথা হ'চ্ছে, উচ্চাংগ সংগীত ও আধুনিক সংগীতের পার্থক্য ও আদর্শের সংঘাত। ভারতের দর্শন শাস্ত্রের মতই এই উচ্চাংগ সংগীত ভারতের কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের বাণী বহন করে এনেছে। এর গভীরতা, এর ভাবরাজ্যের সন্ধান পেতে হলে চাই গভীর সাধনা— অর্থের বিনিময়ে এর মর্যাদা হয় ক্ষুন্ন—কিন্তু বর্তমানে হালকা আধুনিক সংগীতের মোহে এই সাধনা কারোর মাঝে বড় দেখা যায় না। কাহিনীকার এই কথাটিই আমাদের বলতে চেয়েছেন—পরস্পর আদর্শ বিরোধী দু'টি চরিত্রের ভিতর দিয়ে। কাহিনীর যে সম্ভাবনা ছিল, তাতে পুরবী একটি সুন্দর চিত্র রূপে দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারতো কিন্তু একাধারে চিত্রনাট্যকার ও পরিচালকের হাতে পড়ে এই সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চিত্রের প্রথম দিকে দেখা দিলেও, দ্বিতীয়ার্ধে তা সেই চিরাচরিত 'সিনেমাটিক' আবহাওয়ায় এসে তাল গোল পাকিয়ে গেছে। সমস্ত ছবিটি অসংখ্য ত্রুটি ও অসংগতিপূর্ণ। কাহিনী কোথাও দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। প্রথমদিকে কাহিনী ভালভাবে এগিয়ে চললেও শেষের দিকে যেন জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে শেষ করা হয়েছে। চরিত্রগুলিও তাই যেন অসম্পূর্ণ, কোথায় যেন কোন মিল নেই, এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার। উচ্চাংগ সংগীতের আদর্শে অনুপ্রাণিত চন্দ্রনাথ সংগীতের সাধনায় দারিদ্রকে বরণ করে —ছোট ভাই উমানাথ তাঁর শিষ্য হয়েও সংগীতকে অর্থকরী করে তুললো আধুনিক রূপ দিয়ে, এই নিয়ে লাগলো সংঘাত—কিন্তু তার কি পরিণতি তা পরিষ্কার করে ফুটে ওঠে নি। উচ্চাংগ সংগীতের প্রাধান্যের কাছে আধুনিক গানের মান যে নিম্ন তা জোর গলায় স্বীকার করা হয়নি, মূল সুরকে বজায় রেখে উচ্চাংগ সংগীত যে আধুনিক গানে প্রেরণা যোগাতে পারে, তা পরিষ্কার ভাবে দেখানো উচিত ছিল। কাহিনীর সম্ভাবনা অস্বীকার করব না, কিন্তু তার অসাফল্যের গ্লানিমা বহন করতে হবে পরিচালক ও কর্তৃপক্ষের। চরিত্রগুলিতে অসংগতি থাকার দরুন তার দৃঢ়তা নেই—তার ফলে চরিত্রাভিনয়েও প্রাণ সঞ্চার হয়নি। তবু এর মাঝে সংগীতাচার্য অন্ধ চন্দ্রনাথের ভূমিকায় অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সত্যিকারের শিল্পী হতে হলে যে সাধনার প্রয়োজন, তার জন্য কৃচ্ছতা অবলম্বন করলেও পণ্যের দরে সুরলক্ষ্মীকে বিকিয়ে দেওয়া চলেনা—চন্দ্রনাথের এই আদর্শকে তিনি সাধ্যমত ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। আমাদের মনে হয়, তাঁর চন্দ্রনাথ তাঁর অভিনেতাজীবনের সার্থকতম অভিনয়। যতটুকু ত্রুটি হয়েছে, তা হয়েছে চরিত্রের দুর্বলতার জন্য। এই প্রধান চরিত্রটীকে আরো দৃঢ়ভাবে গড়ে তুললে এর সার্থকতা ফুটে উঠতো। ভিন্ন মতাবলম্বী ছোট ভাই উমানাথের চরিত্রে পরেশ ব্যানার্জি যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন, তার অসদ্ব্যবহার করেন নি বলা চলে। নাটকের অন্যতম প্রধানা চরিত্র "পুরবী"। এই
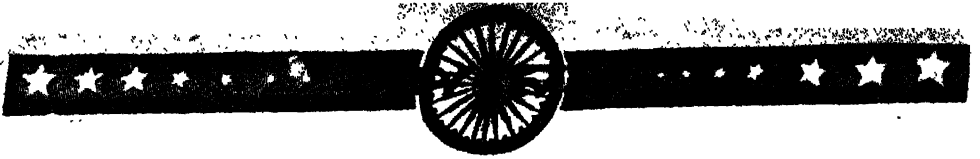
চরিত্রটীও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পূরবী দরিদ্র ট্রাম কোম্পানীর মিস্ত্রীর মেয়ে, বস্তীতে থাকে। নাট্যকার এই বস্তী বলতে বিশেষ পল্লী ধরে নিয়েছেন। তাই বার বার বলেছেন, পাঁকের ভিতর পূরবীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু বস্তী যে বিশেষ পট্টি নয়, এটুকু মনে রাখা উচিত ছিল। যে সময়ের পটভূমিকায় চিত্রটি রচিত, সে সময় থেকেও ১৯৪৭ সাল বা আজও অনেক ভদ্রপরিবার বস্তীতে বাস করে আসছেন। তাছাড়া পূরবীর বাবা ভদ্র কিন্তু দরিদ্র, তাই বলে পূরবীর জন্ম পাঁকে, তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পংকিল—এসবের কোন প্রামাণিক সত্য নেই। আবহাওয়া দারিদ্র্যপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু তা পংকিল নয়। তারপর সব সময়েই দেখা গেছে পূরবী তার দারিদ্র ও নোংরা পরিবেশের জন্য যেন সংকুচিত—দারিদ্রকে স্বীকার করে তাকে আরো সবল হয়ে উঠতে হবে—এই দৃঢ়তাটুকু পূরবীর চরিত্রের কোথাও নেই। চন্দ্রনাথের শিক্ষায় পূরবী যখন শিক্ষিতা এবং সুযোগ্যা হয়ে উঠলো, উমানাথের সংস্পর্শ তখন তাকে অর্থ, খ্যাতি নাম ও যশের মোহ আকর্ষণ করতে লাগলো, তারপর একদিন যক্ষারোগগ্রস্থ দরিদ্র পিতার তিরস্কারে সে অর্থের প্রয়োজন বুঝতে পারলো। একদিকে গুরুজীর আদর্শ অন্যদিকে এই সমস্যা তাকে উদ্বেল করে তুললো। দ্বন্দ্ব এলো তার মনে, অবশেষে অর্থ ও মোহ হল জয়ী। পূরবী ধরা দিল আধুনিকতার স্পর্শে—অর্থ এলো—গানকে অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করতে লাগলো। নিজের দারিদ্র দূর করলো বটে, কিন্তু তার পিতা ও ভাইবোনদের দারিদ্র মোচন তার দ্বারা হ'লো কিনা চিত্রখানির শেষ পর্যন্তও আমরা তার কোন নিদর্শন পেলাম না। সব কিছুই যেন মাঝপথে শেষ। তারপর ভদ্রঘরের এত বড় মেয়ে রাস্তার কলে জল আনতে গিয়ে ওভাবে চপওয়ালীদের মত গান করে বলে আমাদের জানা নেই, বস্তীর চিত্র দেখাতে গেলেই কি এসব পরিবেশ দেখাতে হয়? এ ছাড়া বস্তী জীবনের আর কোন দিক কি দেখাবার নেই? পূরবীর সাজ-পোষাকও তার চরিত্রের বিপরীত। বস্তীতে যে ধরণের দরিদ্র বাস করে, তাদের মেয়েদের শাড়ী ব্লাউজের ঝকমকানি থাকে না। সাজসজ্জার এই ত্রুটি বহু চিত্রের সমালোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি কিন্তু পরিচালক কিংবা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে এখনও পড়েনি। তাদের লক্ষ্য এদিকে পড়বে কবে? এধরণের ত্রুটী ও অসংগতিতে চিত্রখানি পূর্ণ। পূরবীর ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন সন্ধ্যারাণী, অভিনয়ে কোন নূতনত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই, যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন ততটুকু মন্দ হয়নি তবে ছোট্ট খুকুটীর মত আধো আধো কথার ন্যাকামীপনা তিনি ছাড়তে পারেন নি। এই ধরণের ন্যাকামী আর সহ্য হয়না। পূরবী যখন ভারতের বিভিন্ন সহরে গান গেয়ে বেড়াচ্ছে, তার সংগীত আসরগুলি যে ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তার ভিতর কোন বাস্তব দৃষ্টিভংগীর পরিচয় পাইনা। এযেন সেই মফঃস্বলের চপওয়ালীদের আসর। কানু বন্দোপাধ্যায়ের পিয়ারীর চরিত্র অনাবশ্যক সৃষ্টি। অভিনয়ে অবশ্য তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুহাসিনীর ঝি এবং তুলসী চক্রবর্তীর খুড়ো চরিত্রানুযায়ী অভিনীত হয়েছে।

দৃশ্য রচনা অত্যন্ত ত্রুটী পূর্ণ, বস্তীর ঘরে বসে পূরবী ও চন্দ্রনাথ গান গাইছে—জানালা দিয়ে দেখা যায় ধানের ক্ষেত, কাশের বন, কুয়াশায় ঢাকা বনভূমি, বস্তীর বিশেষতঃ কলিকাতার বস্তীতে এসব থাকার কি কোন সম্ভাবনা আছে? পরিচালকের সজাগ দৃষ্টি কোন দিকে পড়েনি বলেই মনে হয়েছে, পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তার ছিনিমিনি খেলাই হয়েছে, পরিচালনার কাঁচা হাতের ছাপ সর্বত্র সুপরিস্ফুট। বিভিন্ন ঋতুর অনুগামী বিভিন্ন রাগরাগিণীর সংগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর জন্য তাঁর কল্পনা-শক্তির প্রশংসাই করতাম, যদি তিনি ঐসব দৃশ্যাবলীর ভিতর চরিত্রগুলোকে টেনে নিয়ে হাজির না করতেন। সংগীত পরিচালনা খুসী করেছে আমাদের। সংগীতমূলক হলেও এতে গান খুব বেশী নেই—তবে গান দর্শকদের আনন্দ দেবে। তবে একটা কথা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য, চন্দ্রনাথের পূরবীকে সংগীত শিক্ষা দানের দৃশ্যগুলি এভাবে দেখানো উচিত ছিল, যাতে দর্শকগণও তার থেকে উচ্চাংগ সংগীতের আস্বাদ পেতে পারতেন। শিক্ষাদান পদ্ধতি আরো বিস্তারীত ভাবে দেখানো উচিত ছিল। প্রথমে সারে গা মা, তার পরেই দেখানো হলো পূরবী পূর্ণাংগ গান গাইছে।
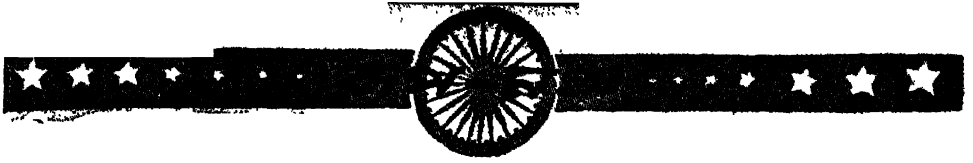
মাঝের দৃশ্যগুলিতে পূরবীকে নির্বাক না রেখে কি করে সে শিক্ষা লাভ করলো, তা দেখালে চিত্রখানির মর্যাদাও বাড়তো, দর্শকরা ও উচ্চাংগ সংগীতের রস গ্রহণের সুযোগ পেত এবং যে সমস্যা নিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে, এই ভাবে দেখালে কাহিনীর কিছুটা মর্যাদা থাকতো, চিত্রেরখানিকটা সার্থকতা আমরা স্বীকার করে নিতে পারতাম।

শব্দগ্রহণ ও চলচ্চিত্র গ্রহণ প্রশংসনীয়। —মণিদীপা।

প্রিয়তমা—

প্রযোজনা: সুখেন্দু বসু, পরিচালনা, কাহিনী ও চিত্রনাট্য: পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সংলাপ: বিপ্রদাস ঠাকুর। সংগীত পরিচালনা: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। রূপায়ণে: পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা, অহীন্দ্র, ইন্দু, অজিত, ইন্দিরা, তুলসী, কানু, রেবা প্রভৃতি। গত ২১শে মে, শুক্রবার, গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় বসুশ্রী ও বীণা চিত্রগৃহে একযোগে মুক্তি লাভ করেছে। বোসার্ট প্রোডাকসনের প্রথম চিত্র নিবেদন প্রিয়তমা। 'প্রিয়তমা'র সমালোচনা লিখতে বসে প্রিয়তমার সমালোচনা করে রূপমঞ্চের একজন পাঠক যে পত্র লিখেছেন, প্রথমেই সে পত্রখানি এখানে প্রকাশ করা হচ্ছে। পত্রখানি লিখেছেন, শ্রীবাসুদেব পাল, ভদ্রকালী সখের বাজার, পোঃ কোতরং হুগলী থেকে। তিনি লিখেছেন: যুদ্ধের পর কলিকাতায় বহু নূতন সিনেমা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং বাংলা ছবির উৎকর্ষ সাধনের জন্য এই সকল প্রযোজকের সংকল্পের কথা নানাভাবে প্রচার করা হয়েছে। 'প্রিয়তমা' এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র। ছবিখানি লোকদেখানো দেশসেবার বাহাদুরীবর্জিত একখানি নির্মল ও সুন্দর হৃদয়বৃত্তিমূলক চিত্র হবে এই আশা করেছিলাম। কিন্তু ছবিখানি গতানুগতিক বাংলা ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে মাত্র।

কাহিনীটি পরিচালক স্বরচিত বলে দাবী করেছেন। কিন্তু আসলে ইহা শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' ও 'নববিধান' এই দুইটি গল্প এবং ইঙ্গ-বঙ্গ-সমাজের কিঞ্চিৎ ইংরাজী বুলির সংমিশ্রণে গঠিত। চিত্রনাট্যকার বহুস্থানে শরৎচন্দ্রের সংলাপ গ্রহণ করেছেন। তালপুকুরের জমিদার চরিত্রটির উপর শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথের' 'কৈলাশখুড়োর' প্রভাব এসে পড়েছে এবং কাহিনীর অন্যতম নায়িকা রেবার দিদির চরিত্রের সহিত নববিধানের 'বিভা' চরিত্রের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে: কিন্তু চিত্রনাট্য রচনার পটুত্বের অভাবে তাহা বিরক্তিকর হয়ে উঠেছে। প্রোফেসরের স্ত্রীর স্মৃতিসভার দৃশ্যটি অবাস্তব বলেই মনে হয়। প্রথমতঃ স্বর্গতা মহিলা একজন প্রোফেসরের স্ত্রী ছিলেন, কেবলমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে প্রকাশ্য স্মৃতি সভার অনুষ্ঠান কল্পনাতীত; দ্বিতীয়তঃ নিজের স্ত্রীর শোক কেহ সভা ডেকে প্রকাশ করেনা; বিশেষতঃ প্রোফেসরের মত আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অনুষ্ঠানের আহ্বান সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ মাথাখারাপ না হলে প্রকাশ্য সভায় কেহ দেবু রায়ের মত আচরণ করতে পারেনা এবং ঐরূপ নির্লজ্জতার প্রতি স্মৃতি সভায় সমাগত শ্রোতাবর্গের উৎসাহিত বোধকরা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। কলকাতার 'সোসাইটির' প্রতি বিরক্তি বোধ করে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মত চাকরবাকরকে লুকিয়ে প্রোফেসরের গৃহত্যাগের কোন সংগতিমূলক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তালপুকুরে অবস্থানকালের অংশটি পরিচালককৃত সামান্য পরিবর্তনের সহিত শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধা' গল্পের পুনরাবৃত্তি; সেই গাছে চড়ে মুড়ি ও নাড়ু খাওয়া; মাসীমা পেয়ে কলকাতায় ফিরতে অসম্মতি এবং কলকাতায় মাসীমা না থাকার জন্য অনুশোচনা।

প্রোফেসারের কলকাতা প্রত্যাবর্তনের সংগে সংগে আরম্ভ হয় নববিধানের আংশিক চিত্ররূপ। শেষদিকে অবশ্য পরিচালক কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করেছেন। প্রোফেসারের পরিত্যক্তা প্রথমাস্ত্রীকে লাভ করবার সংগেই ছবির পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ছবিখানির পরিচালনায় পরিচালক কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি।.....

অভিনয়াংশে প্রথমেই পাহাড়ী সান্যালের নাম করতে হয়। বিদ্বান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, পল্লীপ্রেমানুরাগী, ভাবুক ও উদাসীন প্রোফেসারের ভূমিকায় তিনি অত্যন্ত সংযত ও সুন্দর অভিনয় করেছেন। মৃন্ময়ীর

ভূমিকায় মলিনা দেবীর অভিনয় চলনসই। রেবার ভূমিকায় আরতি মজুমদার মন্দ অভিনয় করেন নি; কিন্তু তাঁর বাচন ভংগী যেন কেমন আড়ষ্ট ধরণের। দেবু রায় বেশী অজিত চাটুজ্যের ভাঁড়ামি আধিক্য দোষে দুষ্ট। জমিদার অতীন্দ্র চৌধুরী তাঁর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবার সুযোগ পান নি। তথাপি তিনি সু-অভিনয় করেছেন। কানু বন্দ্যোর 'রজনীমিস্ত্রি' উপভোগ্য। ছবিখানির চিত্র গ্রহণ ও শব্দানুলেখন অতি সাধারণ স্তরের। সংগীত পরিচালনায় নিম্নসীত সংগীতটি ব্যতীত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর কোথাও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি।"

পত্রপ্রেরকের সমালোচনার সংগে, সবক্ষেত্রে যে আমরা একমত নই, তা আমাদের সমালোচনা থেকেই পাঠক সাধারণ ধরতে পারবেন। তবে মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের বেশী অমিল হবে না। আর 'প্রিয়তমা' একটু

বিশদভাবে সমালোচনা করবার প্রয়োজন আছে। চিত্রখানি কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই জনপ্রিয়তা-অর্জনকারী চিত্রগুলি সম্পর্কেও দর্শক সাধারণের অবহিত হওয়া দরকার। কারণ, দর্শক সাধারণকে আকর্ষণের জন্য কর্তৃপক্ষ যে সব তুণ ছেড়ে থাকেন, তার ফলকে যে সত্যিকারের কোন ধার নেই—যাত্রাদলের সৈনিকদের শোভাবর্ধনকারী নকল তুণের সমপর্যায়-ভুক্ত একথা আজ দর্শক সাধারণের বুঝবার সময় এসেছে। ভেজাল আর নকলের মাঝে আমরাও আমাদের সত্যিকারের 'আমি'কে হারিয়ে ফেলছি। তাই, এখন থেকেই এই নকল আর ভেজাল থেকে নিজেদের যদি দূরে সরিয়ে না রাখি, তা হ'লে এখনও যে 'আমিত্ব' টুকুর অস্তিত্ব মাঝে মাঝে উপলব্ধি করতে পারি, কিছুদিন বাদে তাকেও আর হাতড়িয়ে পাওয়া যাবে না। কাহিনী সম্পর্কে পত্রপ্রেরক যে অভিযোগ উপস্থিত করেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রিয়তমার পরিচালক বা কাহিনীকারও হয়ত কিছু বলতে পারবেন না—আমাদের অভিমত যে পত্রপ্রেরকের অনুকূলে, সেকথা বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না—এ বিষয়ে যদি কোন বিতর্ক ওঠে—ভবিষ্যতের জন্য বিশদভাবে বলাটুকু রেখে দিলাম।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য কচ্ছি এবং আজকাল এটা যেন একটা সংক্রামক ব্যাধির মত আমাদের পরিচালকদের পেয়ে বসেছে যে, তাঁরা শুধু পরিচালনা করেই খুশী নন—কাহিনী রচনা করতে না পারলে তাদের অতৃপ্তআত্মা আর কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না! 'টাইটেল'-এর মাঝে কে কত তাঁর নামের পিছনে লেজুড় বসাতে পারবেন, সেদিকে যেন উঠে পড়ে লেগে গেছেন। তাই তাঁদের নামের পিছনে আজকাল শুধু পরিচালনাই নয়—কাহিনী রচনা—চিত্রনাট্য রচনা—সংলাপ রচনা প্রভৃতি স্থান পাচ্ছে। সম্প্রতি কোন একটি বিজ্ঞপ্তিতে দেখলাম, একজন নবাগত পরিচালক সংগীত পরিচালনার লেজুড়ও যোগ করে দিয়েছেন। কোনদিন দেখবো 'টাইটেল'-এর মাঝে আর কোন বিশেষজ্ঞদের নাম থাকবে না, কেবলমাত্র পরিচালকের নাম ছাড়া।
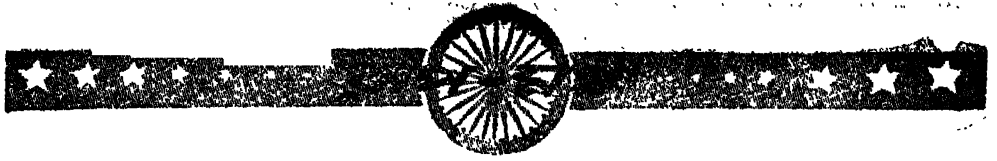
সেদিন শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ, ব্যবস্থাপনা, প্রধান চরিত্র রূপায়ণ, দৃশ্যরচনা, প্রযোজনা, পরিবেশনা, প্রদর্শনা, নৃত্য পরিকল্পনা সবক'টা লেজুর জুড়ে দিয়ে কোন এক প্রতিভা-ধর আবির্ভূত হবেন। সেই সুদিনে (?) বাংলা চিত্র জগতের অস্তিত্ব যদি একদম বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, তাতেও আশ্চর্য হবো না। তাই, এই সব প্রতিভাধরদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, তোমাদের এই ক্রমবর্দ্ধমান লেজুড়-স্পৃহাকে সংহত করো—তোমাদের অতৃপ্ত আত্মা নিজেদের মাঝেই নয় গুমরে গুমরে বেড়াক—নইলে তার বহিঃপ্রকাশ যে, চিত্র জগতকে ধ্বংসের মাঝে টেনে নিয়ে যাবে। তোমরা যদি এই আত্মসংযমটুকুর পরিচয় দিতে না পারো, তাহ'লে বাধ্য হয়ে 'মূর্খস্য লাঠৌষধি' আমাদের প্রয়োগ করতে হবে। কারণ ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে সমষ্টির স্বার্থকে আমরা কোনমতেই অবহেলা করতে পারি না।

আলোচ্য চিত্রের পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'পরিণীতা' ও 'শেষরক্ষা' চিত্রোপহার দিয়ে দর্শক সমাজের কিছুটা শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর পরিচালকগোষ্ঠির ভিতর তাঁর নাম তালিকা-ভুক্ত করতে না পারলেও— তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা খুবই আশাবাদী ছিলাম। চিত্রজগতের তথাকথিত সাধারণ শ্রেণীর পরিচালকদের শ্রেণীতে বসিয়ে কোন দিন তাঁকে আমরা বিচার করিনি। কারণ, তিনি শিক্ষিত, দীর্ঘদিন চিত্রশিল্পের সংগে জড়িত থেকে অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছেন—আর অভিজ্ঞতার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন, শেষরক্ষা ও পরিণীতা চিত্রে। কাহিনীকার হবার দুর্বুদ্ধি যে কেন তাঁকে পেয়ে বসেছিল, বুঝতে পারলুম না। যেটুকু শ্রদ্ধা তাঁর জন্য সঞ্চিত করে রেখেছিলাম, তাঁর এই দুর্বুদ্ধির দোষেই তিনি যে আজ তা হারাতে বসেছেন! এই হারানোর ক্ষতি তাঁর ভবিষ্যৎ চিত্রজীবনকেও যদি আচ্ছন্ন করে ফেলে—তা থেকে মুক্তি পাবার মত শক্তি কী তাঁর ভিতর আছে?

নববিধান বা অন্যান্য কাহিনীর ছাপ আছে বলে দর্শক সাধারণ কাহিনীকার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে

ভ্যানগার্ডের 'সাধারণ মেয়ে'র অসাধারণ চরিত্রে দীপ্তিরায় চিত্রখানি ১লা জুলাই মুক্তিলাভ করবে।

চৌর্যবৃত্তির যে অভিযোগ এনেছেন এবং আমরাও যার সংগে সুর না মিলিয়ে পারবো না—এ অভিযোগ যদি আমরা ভুলেও নি—'প্রিয়তমা'র কাহিনীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ রয়েছে, তাকে পশুপতি বাবু অস্বীকার করবেন কী করে? কাহিনী সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান থাকতে পারে—সাহিত্য নিয়ে ঘাটাঘাটিও তিনি করেন। তাই, তাঁকে সাহিত্য-বোদ্ধা বলতেও দ্বিধা করবো না। কিন্তু এই সাহিত্য-বোধ আর সাহিত্য-সৃষ্টি এক কথা নয়। পরিচালক হ'তে হ'লে সাহিত্য বোধ শক্তি সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পশুপতি বাবুর তা ছিল (এখনও আছে) বলেই তিনি ইতিপূর্বেকার ছবিতে আমাদের খুশী করেছেন। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা যে তাঁর নেই, তার প্রমাণ দেবে তাঁর চৌদ্দহাজার

ফিটের 'প্রিয়তমা'। কোন জিনিষকে কী ভাবে গুছিয়ে বলতে হবে এবং কতটুকু বলতে হবে—সাহিত্য স্রষ্টার অন্যতম প্রধান গুণ পশুপতি বাবুর এগুণ থাকলে এগারো হাজার ফিটেই তাঁর কর্তব্য শেষ করতে পারতেন। এগারো হাজারের স্থানে চৌদ্দহাজার নিয়েও তাঁর বলার শেষ হলো না। বাংলা ছবির যত দুর্নামই থাকুক না কেন—কাহিনীর উৎকর্ষে বম্বে বা ভারতের যে-কোন ছবিকে টেক্কা দিয়ে এসেছে এবং দিচ্ছে। অবশ্য এই কাহিনী যখনই দেখেছি কোন সাহিত্যিকের হাত থেকে বেরিয়েছে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে ব্যর্থ হ'য়েও অনেক চিত্র আজও চিত্রজগতে স্মরণীয় হয়ে আছে তাঁর কাহিনীর শ্রেষ্টত্বের জন্য। কিন্তু বর্তমান চিত্রে বাংলা ছবির এই বৈশিষ্ট্য মোটেই চোখে পড়বে না। বম্বের সাড়ে বত্রিশ ভাজার গন্ধেই চিত্রখানি ভরপুর। যদি বাংলা সংলাপের পরিবর্তে হিন্দি সংলাপ বসিয়ে দেওয়া হতো, তবে বোম্বাই-মার্কা-ছবি বলে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যেত।

আলোচ্য চিত্রের নায়ক একজন মৃতদার প্রৌঢ় অধ্যাপক। আত্মভোলা, সাহিত্য-গত প্রাণ। প্রথমবার বিয়ে হয় বাল্যবয়সে। বাপের নির্দেশে বিয়ের আসর থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে উঠে আসতে হয়, কারণ, কন্যাপক্ষ বরপক্ষের সম্পূর্ণ দাবী মিটিয়ে উঠতে পারে না। বালিকা বধুর সংগে মুহূর্তের জন্য দেখা হলেও—তার কথা বড় হয়েও ভুলতে পারেন না। নিজের পিতার

নির্দেশ তখন প্রতিপালন করলেও, পরে সে নির্দেশ অবিচারের রূপ নিয়েই তাঁর মন অধিকার করে থাকে। আবার দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। স্ত্রী একটী পুত্রসন্তান রেখে মারা যান। তাঁর স্মৃতি অধ্যাপকের সমস্ত মনটাকে জুড়ে বসে থাকে। চিত্রে এই অধ্যাপক নায়কের সংগে যখন আমাদের পরিচয় তখন তাঁর ছেলেটির বয়স আট নয় বছরের। প্রাসাদোপম গৃহ। আর চিত্রজগতের তথাকথিত ইঙ্গ-বঙ্গীয় আসবাব পত্রে বাড়ীটি সজ্জিত; যদিও এই ইঙ্গ বঙ্গীয় সমাজের সংগে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নেই। সে কথা অবশ্য পরে বলছি। অধ্যাপক চলেন তথাকথিত ইঙ্গ-বঙ্গীয় চালে। বাড়ীর চাকর-বাকরদেরও তাঁর সংগে তাল রেখে চলতে হয়। ছেলেটিও মানুষ করা হচ্ছে এই ঢংএ। মেট্রোন রেখে দেওয়া হয়েছে; বার ও সময়ের তালিকানুযায়ী তাকে খেলানো হয় শোয়ানো হয়। অধ্যাপকের কাছে পড়তে আসে তাঁর এক ছাত্রী, সম্পর্কে শ্যালীকা। তার দিদিও এক অধ্যাপক গিন্নি। শ্যালীকা ছাত্রীটি (যদিও প্রায় মেয়ের বয়সী) প্রৌঢ় অধ্যাপকের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। তার দিদিও পেছন থেকে ওস্কানো দেন। একটী বিশেষ সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে এদের দেখানো হয়েছে। অধ্যাপকের স্ত্রীর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সমাজের অনেকেই তাতে যোগদান করেন। অধ্যাপকের ছাত্রী রেবার প্রেমমুগ্ধ এক যুবক (যাকে ভাঁড় ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না) অধ্যাপকের প্রতি রেবার আকর্ষণ দেখে বরাবরই ঈর্বান্বিত ছিল। ওদিন রেবা এক গান গাওয়াতে তার এই ঈর্ষা যেন ফেটে পড়ে এবং সে যে কাণ্ড করে বসে, তাতে তাকে বিকৃত মস্তিষ্ক ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। সংগে সংগে কাহিনী রচয়িতা সম্পর্কেও মনে সন্দেহ জেগে ওঠে। অধ্যাপক ক্ষুন্ন হয়ে সভা পরিত্যাগ করেন এবং ওদিন রাত্রে নিজের বাড়ী থেকে পালিয়ে অজানা পথের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। রাস্তায় এক মত্ত বৃদ্ধলোককে

মটর দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাতে মটর বিগড়ে যায়। ভদ্রলোক তালপুকুরের জমিদার বলে খ্যাত। ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করে অধ্যাপক ও তার ছেলেটিকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে অধ্যাপকের ছেলে জমিদারের এক ভাগনীর অনুরোক্ত হয়ে ওঠে। ছেলেটির কাছ-থেকে জমিদার ভাগিনী জানতে পারে, এরই সংগে তার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সেসম্পর্কে কিছু প্রকাশ করে না। অধ্যাপকের ছাত্রী অধ্যাপকের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেক অনুসন্ধানের পর সে তার দিদি, জামাই বাবু প্রভৃতিদের নিয়ে অধ্যাপককে নিতে আসে। ছেলেটি তার মাসীমা বা ভাল মাকে ছেড়ে যেতে চায়না কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে হয়। ফিরে এসে তার ভয়ানক জ্বর হয়। বিকারের মধ্যে ভাল মার কথা বলে। ডাক্তারের পরামর্শে অধ্যাপক ভাল মা অর্থাৎ মৃন্ময়ী দেবীকে আনতে ছোটে এবং নিয়ে আসে। ছেলেটি নিরাময় হয়ে ওঠে। ভাল মাকে আর দেশে যেতে দেয় না। ধীরে ধীরে ভাল-মা অধ্যাপকের সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠেন। রেবা ও তার দিদিরা অধ্যাপক ও মৃন্ময়ী দেবীকে কেন্দ্র করে নানান কুৎসা রটনা করেই ক্ষান্ত হয় না—ব্যক্তিগত ভাবে অধ্যাপককে এ নিয়ে নানান কথা শোনায়। মৃন্ময়ী দেবীর কানে আসে—তিনি অধ্যাপকের বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার অভিমত ব্যাক্ত করেন। অধ্যাপক তাঁকে অনেক বুঝিয়ে শুঝিয়ে এই কুৎসা বন্ধ করবেন বলে কথা দিলেন। অধ্যাপক রেবাকে বিয়ে করতে সম্মত হলেন। অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে একদিন রেবা মৃন্ময়ী দেবীকে বাড়ী থেকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিল—কারণ এ বাড়ীর সেই যে হবে একদিন সর্বময়ী কর্ত্রী। মৃন্ময়ী দেবী তখুনি বেরিয়ে পড়েন। অধ্যাপকের ছেলেও স্কুলে গিয়েছিল—সে ফিরে এসে ভাল-মাকে না দেখতে পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। সকলকে জিজ্ঞাসা করে—কেউ কোন উত্তর দেয় না। রেবা দেবীকেও জিজ্ঞাসা করে। সেও উত্তর দেয় না। ছেলেটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে —রেবা দেবীও অতটুকু ছেলের উত্তেজনা সহ্য করতে

রাজেন চৌধুরী পরিচালিত কল্পতরু মন্দিরের 'ওরে যাত্রী' চিত্রে অনুভা গুপ্তা।

রাজী নয়—মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না তার ধাক্কা লেগে গৌতম সিড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়। ইত্যবসরে অধ্যাপক এসে হাজির হন। ডাক্তার আসে। অধ্যাপকের কাছে সমস্ত বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে—। গৌতম সুস্থ হয়ে ওঠে—। মৃন্ময়ী দেবীর ক্যাশবাক্সটা গৌতম লুকিয়ে রেখেছিল, সেটা তার বাবাকে দেখাতে যেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ে যায়—তার ভিতরের কতগুলি নিদর্শন থেকে অধ্যাপক বুঝতে পারেন, মৃন্ময়ী দেবী তাঁরই প্রথমা স্ত্রী সুপ্রভা। তখনই গৌতমকে নিয়ে রাজাবাহাদুরের বাড়ীতে ছোটেন এবং তাঁকে সমস্ত তথ্য বলে মৃন্ময়ীকে নিয়ে আসেন। মোটা-মুটী এই গেল কাহিনী। এটুকু বলতে যেযে কাহিনীকার-পরিচালককে যে কত কষ্ট করতে হয়েছে, চিত্রখানি যাঁরাই দেখেছেন, তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। প্রতিটি চরিত্রে—প্রতিটি ঘটনায় অসংগতি আর বৈপরীত্যের দৌরাত্ম্য যে কোন দর্শকের নজরে পড়বে। অপ্রাসংগিক ঘটনা, চরিত্র ও দৃশ্যসজ্জায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে চিত্রখানি দর্শকদের বাস্তব দৃষ্টিকে পীড়া দেবে। প্রথমতঃ যে ইঙ্গ-বঙ্গীয় সমাজের সভ্যরূপে যাদের আঁকা হ'য়েছে অর্থাৎ রেবা—রেবার প্রণয়-প্রার্থী, রেবার দিদি এবং প্রথম দিকে অধ্যাপককে—সে সমাজের কোন অস্তিত্ব ছিল কিনা বা আছে কিনা—তা

বিশ্বাস করতে আমরা রাজী নই। এগুলি অতিরঞ্জিত দোষে দুষ্ট। তারপর এই অতিরঞ্জিত চরিত্রগুলি বা সমাজের সংগে অধ্যাপককে ত কোনমতেই টেনে আনা যায় না। যে অধ্যাপক অত বড় পণ্ডিত—শুধু বিদেশীয় কায়াই নন—প্রাচীন ঐতিহ্যের মাঝেও ডুবে থাকেন, তিনি এই সব ভাঁড়-গুলিকে কী করে সহ্য করতে পারেন এবং এই পরিবেশের সংগে খাপ খেয়ে চলতে পারেন, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই। পশুপতিবাবুকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপগুলো ডিঙ্গিয়ে এসেছেন—তাঁকেই জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি তার সৃষ্ট অধ্যাপকের মত একজন অধ্যাপকেরও সন্ধান দিতে পারবেন? জীবনের বেশীর ভাগ সময় যে সব অধ্যাপকের কেটেছে বিদেশে জ্ঞানার্জনের জন্য—তাদেরও কোনদিন এরূপ পরিবেশের মাঝে আমরা দেখতে পাই নি। প্রযোজকদের ঘাড় ভাঙতে ভাঙতে পরিচালকেরা নিজেদের আয়টাকে এতই ফাঁপিয়ে তোলেন যে, অন্যের আয়কেও তাঁরা সেই অনুপাতেই পরিমাপ করতে থাকেন। নইলে একজন অধ্যাপক কত আয় করতে পারেন যে, ওরূপ প্রাসাদোপম বাড়ী ও সেই অনুপাতে আসবাব পত্রের সংস্থান করতে পারবেন? যে চালে 'প্রিয়তমায়' অধ্যাপককে চালানো হ'য়েছে, তা কালোবাজারের কালোহাতীদের পক্ষেই সম্ভবপর, একজন অধ্যাপকের পক্ষে নয়। স্ত্রীর জন্য এরূপ প্রকাশ্য স্মৃতিসভার আয়োজন কোন অধ্যাপক কেন, কেউ করেছেন বলে শুনিনি। প্রিয়তমার অধ্যাপকের পক্ষেত মোটেই সম্ভব নয়! তারপর যিনি এ পর্যন্ত অনেক ভাঁড়ামিই সহ্য করে আসতে পারেন, স্মৃতিসভার আধিক্যটুকু তাঁর পক্ষে মোটেই অসহ্য নয়। এদেরই হাত থেকে রেহাই পেতে কিনা নিজের বাড়ী ছেড়ে চোরের মত রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যেতে হ'লো! ঠিক যেন 'চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া।' তাঁর গন্তব্যই বা ছিল কোথায়? রাচী, না অন্যত্র? ঐ গাড়ী নিয়ে ওভাবে পালানো—রাচী ছাড়া আর কোথায় হবে! তারপর কিনা জেলাপুকুরেই ব্যাট হ'য়ে বসে গেল। রেবারা যেয়ে যখন হাজির হ'লো—আবার তাদের সংগে চলে আসতে বাধলো না, বা রেবার ভাঁড় বেশী প্রণয়ীর সংগে করমর্দন করতেও আটকালো না। এমনি অসংগতিতে চিত্রটি পরিপূর্ণ। পরিচালক পশুপতিবাবু যেন কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি, যেজন্য তাঁকে প্রশংসা করবো। অভিনয়ে অধ্যাপকের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। পারিপার্শ্বিক কথা ভুলে যেয়ে যদি শুধু অভিনয়টুকুর ভিতরই মসগুল হওয়া যায়, তাহলে রসগ্রহণে দর্শকদের কোন বাধা সৃষ্টি করে না। কিন্তু যে মুহূর্তে চিত্রের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার ভিতর অধ্যাপককে ঘুরতে দেখি—সেই মুহূর্তে মনে হয় যেন, সবই একটা পরিহাসের নামান্তর মাত্র। অধ্যাপকের অমন গাম্ভীর্যের কথা আর মনে থাকে না। মৃন্ময়ীদেবীর ভূমিকায় মলিনা দেবীর প্রশংসা করবো। মৃন্ময়ীর চরিত্রেও অসংগতির পরিচয় পাই। প্রথম কথা পিতৃপ্রতিজ্ঞার প্রতি যদি তাঁকে শ্রদ্ধাশীলাই থাকতে হতো—তাহ'লে সে কিছুতেই অধ্যাপকের বাড়ীতে আসতে পারে না। তারপর নিজের স্বামী জেনেও মৃন্ময়ীর মত মেয়ে ও ভাবে প্রচ্ছন্নভাবে থাকতে পারেনা বা রেবা ও তার দিদিদের অপমান সহ্য করতে পারে না। তার তখনই নিজের সত্যকার পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করা উচিৎ ছিল। অধ্যাপকের বাড়ী থেকে রেবা যখন তাকে তাড়িয়ে দিল—তাও হাস্যাস্পদ বলেই মনে হ'য়েছে। পিতৃপ্রতিজ্ঞার প্রতি যদি সে অমন অটলই থাকবে, তাহ'লে অধ্যাপককে মোটেই স্বামী বলে স্বীকার করতো না। দু'টো বিপরীত আদর্শকে একসংগে জোড়াতালি দেওয়া হ'য়েছে মৃন্ময়ী চরিত্রে। আর মৃন্ময়ীর মত মেয়ের স্বামীর জীবিতাবস্থায় তার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য দিতেও পারেনা। সংস্কারে বাধে।
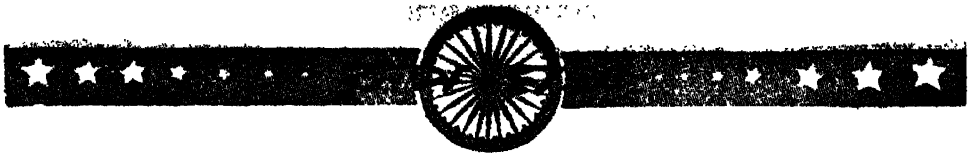
জমিদার মৃন্ময়ীর কতখানি নিকট আত্মীয় তা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। অধ্যাপকের জন্য যেমন রেবা ও তার দিদিদের আনা হ'য়েছিল—তেমনি মৃন্ময়ীর জন্য আনা হয়েছে জমিদারকে। জমিদারের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী সম্পূর্ণ নূতন ধরণের অভিনয় করেছেন। সমগ্র চিত্রের ভিতর তবু এই তাল-পুকুরের পরিবেশকে কিছুটা প্রশংসা করবো। তার কানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত মিস্ত্রী চরিত্র এনে এই পরিবেশের কিছুটা মর্যাদা হানি করা হ'য়েছে। রেবার ভূমিকায় আরতি মজুমদারের আড়ষ্টভাব পীড়া দেয়। তাঁর কণ্ঠস্বর কর্ণ বিদারক। শ্রীমতী মজুমদার পরিচালক সুশীল মজুমদারের স্ত্রী। শিক্ষিতা এবং সদ্‌বংশজা। অভিনয় ক্ষমতা না থাকতে পারে কিন্তু তাঁর ভিতর শালীনতার অভাব হবে কেন? কোন একটি দৃশ্যে তাঁকে এমনভাবে দেখানো হ'য়েছে যা, যে কোন রুচিবান দর্শকের রুচিতে আঘাত করবে। তিনিও প্রাক-প্রদর্শনীতে চিত্রখানি দেখেছিলেন, অথচ নিজে ঐ দৃশ্যটি অনুমোদন করলেন কী করে তাই ভাবছি! এই দৃশ্যে তাঁকে এমন একটি ক্ষুদ্র আয়তনের ব্লাউজ পরাণ হ'য়েছে, যাতে তাঁর কটিদেশের উপরাংশের কিছুটা অনাবৃত অবস্থায় ক্যামেরা আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে! সেন্সারবোর্ডের নীতিবিদ সভ্যদের চোখেও কী এই অশ্লীলটুকু চোখে পড়লো না! অজিত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত রেবার প্রণয়ীর চরিত্রটিও রুচিবিগর্হিত। এই চরিত্রটিকে প্রদর্শিত হ'তে অনুমতি দিয়ে সেন্সারবোর্ডের কর্তারা তাঁদের নীতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। হায়রে নীতিবিদের দল! তোমাদের এই অনুমোদন তোমাদের স্বরূপকেই দর্শকসমাজের সামনে তুলে ধরছে! গৌতমের ভূমিকায় যে বালকটি অভিনয় করেছে, তাকে খুবই প্রশংসা করবো। আমরা তার ভবিষ্যৎ অভিনেতা-জীবনের উন্নতি কামনা করি। অন্যান্য ভূমিকায় তুলসী চক্রবর্তী, রেবা, ইন্দু, কানু প্রভৃতি চিত্রোপযোগী চলন সই।

চিত্র গ্রহণে মাঝে মাঝে চিত্রশিল্পীর নৈপুণ্যের পরিচয় পেয়েছি। বিশেষ করে রাত্রের দৃশ্যগুলি রাত্রির পরিবেশ নিয়েই ফুটে উঠেছে। মটরের দৃশ্যগুলিকেও প্রশংসা করবো। শব্দগ্রহণ প্রথম দিকে খুবই নিন্দনীয়। এমন কী সংলাপও বোঝা দায়। শেষের দিকে চলনসই। দৃশ্য-সজ্জার প্রশংসা করবো না। বলবো, প্রযোজকের অর্থ ধ্বংসে দৃশ্যকার ও পরিচালক সাফল্য লাভ করেছেন। দাঁড় কাককে ময়ূর পুচ্ছ দিয়ে সাজালে যেমন সে ময়ূর হয়না বরং সে সজ্জা কাকের বৈশিষ্ট্যকেই নষ্ট করে, প্রিয়তমার দৃশ্য সজ্জা সম্পর্কে এই কথাই বলা চলে। একজন অধ্যাপকের গৃহ এতখানি জাঁকজমকময় হ'তে পারে, তা আমাদের কল্পনাতীত। সুচিত্রার পরিবেশটার তবু প্রশংসা করবো।

সংগীত পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের দুর্ভাগ্য বলতে হবে। সুরগুলি যে খারাপ হ'য়েছে তা নয়, কিন্তু সেগুলির ভিতর এমন কোন উগ্রতার সন্ধান পাইনি যা, মনটাকে জোর করে টেনে নেয়। তবু ইতিপূর্বেকার চিত্রগুলি থেকে 'প্রিয়তমা'য় হেমন্ত বাবু সংগীত পরিচালনায় কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছেন। সংলাপে বিপ্রদাস ঠাকুর নিজের সুনাম বজায় রেখেছেন।

—শীলভদ্র

খুচরো খবর—

শ্রীমতী পিকচার্স

বাংলা চিত্রজগতের প্রখ্যাতা চিত্রশিল্পী কানন দেবীর প্রযোজনায় শ্রীমতী পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন 'বিপর্যয়' গড়ে উঠবে শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে। ইতিপূর্বে উক্ত চিত্রের বৈজয়ন্তী বা অনন্যা বলে যে নামকরণ করা হয়েছিল, তা বাতিল করে দিয়ে 'বিপর্যয়' রাখা হয়েছে। রূপ-মঞ্চের বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র 'অনন্যা' বলে প্রচার করা হয়েছে। আশাকরি পাঠকসাধারণ তা সংশোধন করে নেবেন। বিপর্যয় পরিচালনা করবেন 'সব্যসাচী' আর আলোক চিত্রশিল্পী রূপে কাজ করবেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী অজয় কর। সংগীত পরিচালনা করবেন উমাপতি শীল। তবে বিপর্যের প্রত্যেকখানি সংগীত রবীন্দ্র সংগীত হবে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। বিপর্যয়ের বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন কানন দেবী,
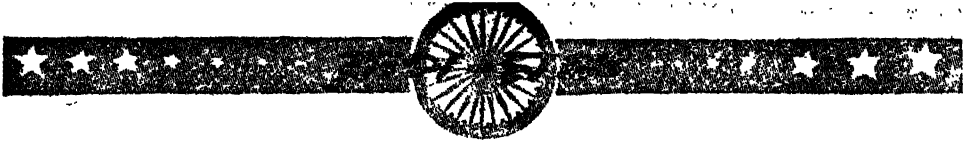
রেবা দেবী, বিজলী (কাশীনাথ চিত্রখ্যাত), কমল মিত্র বিপিন গুপ্ত, প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানি কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে গৃহীত হবে। আমরা শ্রীমতী কাননকে তাঁর প্রযোজক জীবনের যাত্রাপথে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। শ্রীমতী পিকচার্সের পরবর্তী আকর্ষণ চন্দ্রনাথ ও বিপ্রদাস বলে সংবাদ পেয়েছি।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স লিঃ

এদের 'সব্যসাচী' (পথের দাবীর হিন্দিচিত্ররূপ) সমাপ্ত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে এবং দ্বিতীয় বাংলা চিত্রনিবেদন 'সমাপিকা'র প্রাথমিক কাজ শেষ হয়ে গত ১১ই জুন থেকে আনুষ্ঠানিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবার পর কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে চিত্রগ্রহণের কাজ সুরু হয়েছে। সমাপিকার কাহিনী রচনা করছেন শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য আর চিত্রখানির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন অগ্রদূত। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন সুনন্দা দেবী, রেণুকা রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি আরো অনেকে।

চলন্তিকা চিত্র প্রতিষ্ঠান

চলন্তিকা চিত্রপ্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় বাংলা চিত্র নিবেদন 'মাটি ও মানুষ' সম্ভবতঃ বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হবার সংগে সংগে কয়েকটি বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন সুধীর বন্ধু, বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন নরেশ মিত্র, বিমান, সুধীর কুমার, অমর চৌধুরী, হরিধন, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ, গীতশ্রী, মণিকা ঘোষ, শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়, রেবা বসু, প্রভৃতি আরো অনেকে।

ভ্যারাইটি ফিল্মস

ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের অমর উপন্যাস রবীন মাষ্টার-এর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত রবীন মাষ্টার চিত্রখানি বহুদিন থেকেই মুক্তির দিন গুনছে। সম্ভবতঃ শীঘ্রই 'রবীনমাষ্টার' তাঁর আদর্শ নিয়ে দর্শকসাধারণের সামনে ধরা দেবেন। রবীনমাষ্টারের সুকঠিন চরিত্রটি রূপায়িত করে তুলেছেন উদীয়মান অভিনেতা বিপিন মুখোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে রাজলক্ষ্মী (ছোট), অজন্তা কর প্রভৃতি আরো অনেককে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন প্রবীণ পরিচালক জ্যোতীষ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান

"এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমাকে দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, আমি নতুন নহি, আমি পুরাতন।...... কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম।" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনীর যাদুস্পর্শে এই শাশ্বত নারী তাঁর বিভিন্ন মহিমময়ী রূপে ধরা দিয়েছিলেন—। নারী চরিত্রের এরূপ বিভিন্ন বিকাশ সত্যদ্রষ্টা ঋষির কল্পনায় যতখানি স্বচ্ছ হয়ে দেখা দিয়েছে—সে স্বচ্ছতা বাস্তবের রূপ নিয়েই পাঠকের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সত্যিকারের স্রষ্টার এখানেইত স্বার্থকতা। কিন্তু তবু এই প্রফুল্ল উপন্যাসের পাতায়ই নিবদ্ধ আছে—এই শাশ্বত প্রফুল্ল তাঁদের কাছে এখনও অপরিচিতা—নিরক্ষরতার জন্য যাঁরা উপন্যাসের মর্মোদ্ধারে অক্ষম। উপন্যাসের প্রফুল্ল যাঁদের কাছে অপরিচিতা নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের মানস প্রতিমা কায়া নিয়ে তাঁদের সামনেও ধরা দিলে, তাঁরাও কম খুশী হবেন বলে মনে হয় না।

জনসাধারণের এই খুশী ও আগ্রহের কথা চিন্তা করেই রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মানস প্রতিমাকে ছায়ার কায়ায় রূপায়িত করে তুলবার সাধনায় নিমগ্ন আছেন। সৌন্দর্য ও অভিনয় প্রতিভায়—শিক্ষা ও আভিজাত্য গরিমায় বাংলা ছায়া জগতে যে অভিনেত্রীটি একাধিকবার বাঙ্গালী দর্শক-

সাধারণের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে নিয়েছেন, শ্রীমতী সুমিত্রাকেই দেওয়া হয়েছে দেবী চৌধুরাণীর এই সুকঠিন চরিত্রটী রূপায়িত করে তুলবার দায়িত্ব। বাংলা ছায়াজগতের একজন নবাগত তরুণ ঠিক অনুরূপ প্রতিভার উজ্জ্বল্যে ইতিপূর্বে দু'একবার ঝিলিক দিয়ে দর্শকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই প্রদীপ বটব্যালকেও দেখতে পাওয়া যাবে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়। তাছাড়া থাকবেন উৎপল সেন, নীতীশ, তুলসী চক্রবর্তী, উপেন, সুদীপ্তা, লীলাবতী (করালী) ও আরো অনেকে। এই মহাসাধনায় পরিচালকের কঠিন দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্তের উপর। ইতিপূর্বে কর্ণার্জুন, পোষ্যপুত্র, পথের দাবী প্রভৃতি চিত্রে তিনি যে আন্তরিকতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে মনে হয়, তাঁর পরিচালন-নৈপুণ্যে দেবী চৌধুরাণী পূর্ণ মর্যাদা নিয়েই রূপালী পর্দায় ধরা দেবে।

লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ

বহু প্রতীক্ষার পর লীলাময়ী পিকচার্স লিঃ প্রযোজিত প্রথম বাংলা বাণীচিত্র 'দেবদূত' গত ১১ই জুন, উত্তরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটী রহস্যমূলক কাহিনীকে কেন্দ্র করেই এই রহস্যমূলক চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। 'দেবদূত' পরিচালনা করেছেন শরদিন্দু বাবুর সুযোগ্য পুত্র নবীন চিত্র পরিচালক অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অমিতা বসু, অভি ভট্টাচার্য, ভাস্কর দেব (এঃ), তুলসী চক্রবর্তী, অজন্তা কর, প্রণব বাগচী, হারাধন, শঙ্কর, রমাপ্রসাদ, সন্তোষ, নীরোদ, বিমল, অচিন্ত্য, সুমিত্রা, রেণুকা, চৈতন্য, প্রভৃতি। চিত্রখানি অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরিচালনায় মুক্তিলাভ করেছে।

অরোরা ফিলম্ করপোরেশন লিঃ

নিউথিয়েটার্সের 'প্রতিবাদ' ১৯শে জুন থেকে একযোগে

পি, আর প্রডাকসনের অরক্ষণীয়া চিত্রে নিলীমা দাস, রবীন মজুমদার ও আরো অনেককে দেখা যাচ্ছে।

চিত্রা ও রূপালী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হবে বলে প্রকাশ। 'প্রতিবাদে'র কাহিনী রচনা, পরিচালনা ও সুর সংযোজনা করেছেন যথাক্রমে বিনয় চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র ও পঙ্কজ মল্লিক, বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন স্বর্গতঃ দেবী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা দেবী, ভারতী, চন্দ্রাবতী, পূর্ণেন্দু, কালী সরকার, প্রভৃতি আরো অনেকে।

ওরিয়েণ্ট পিকচার্স

আগামী ১৫ই আগষ্ট, ওরিয়েণ্ট পিকচার্সের প্রথম বাংলা বাণীচিত্র একযোগে সহরের কয়েকটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। বিচারক-এর কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন—অলকা দেবী, ঝরণা দেবী, রাজলক্ষ্মী, (বড়) কণক ঘোষ, অহীন্দ্র, মনোরঞ্জন, সন্তোষ দাস, দেবীপ্রসাদ, মণি মজুমদার (এঃ), কালী চক্র, বাণীবাবু, তারু প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন পূর্ণ মুখোপাধ্যায়। চিত্রখানি কোয়ালিটি ফিল্মস্-এর পরিবেশনায় মুক্তি লাভ করবে।

শ্রীপঞ্চদীপা লিঃ

গত চারমাস শৈলজানন্দ তাঁর যে নতুন ছবির চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তার চিত্র গ্রহণের কাজ শীঘ্রই ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুরু হবে। এই চিত্রখানির নামকরণ হ'য়েছে 'রং বেরং'। ঘটনা বৈচিত্র্যে ও রং বেরংয়ের চরিত্র সমাবেশে চিত্র কাহিনীটি অনন্যসাধারণ হবে বলে পরিচালকের একান্ত বিশ্বাস। ছবিখানি প্রযোজনা কচ্ছেন শ্রীপঞ্চদীপা লিঃ। প্রকাশ, সাহিত্য ও সিনেমা জগতে সুপরিচিত কয়েকজন লোকের উদ্যোগে এই নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হ'য়েছে।

এস, দাস, প্রডাকসন

দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক বলে জহর গাঙ্গুলীর কিন্তু মাছের চাষে পণ্ডিত হবার কথা নয়। গত সোমবার ২৮শে মে, রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে জহরবাবু একথায় তীব্র প্রতিবাদ করতেই শ্রীমতী কানন ক্লাপষ্টিকের সাহায্যে তাঁকে নিরস্ত করে দেন। শোনা গেল, এ বিতর্ক শ্রীসুধীর দাসের নতুন ছবি 'বাঁকা-লেখার' মহরৎ উপলক্ষে গৃহীত সংলাপাংশ মাত্র। অভ্যাগত সমাগম শেষে কর্মাধ্যক্ষ শ্রীবিমল ঘোষ কর্তৃক সেদিন মিষ্টান্ন বিতরণ দেখে তাই মনে হ'লো বটে। শ্রীমণি বর্মার একটী কাহিনীকে অবলম্বন করে চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রী চিত্ত বসু। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন কানন দেবী, জহর, বিপিন গুপ্ত, কমল মিত্র, সুপ্রভা, সুহাসিনী, তুলসী, অজিত ও কিশোর অনুপ কুমার, সুর সংযোজনা ও গীত রচনা করবেন যথাক্রমে রবীন চট্টোপাধ্যায় ও কবি শৈলেন রায়।

দি নারাঙ প্রডাকসন্স

গত ২৩শে মে, নারাঙ প্রডাকসনের 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' চিত্রের মহরৎ উৎসব মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কিরণ শঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার এই উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত লাবণ্যপ্রভা দত্ত।

অন্যান্য উপস্থিত অতিথিদের ভিতর ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী কালীপদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি আরো অনেকে। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এস, ডি, নারাঙ ও উৎপল সেন অতিথিদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। চিত্রখানির নামকরণ হ'য়েছে 'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' (India's Battles for Freedom)

ইন্দিরা

দক্ষিণ কলিকাতায় নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহ ইন্দিরাকে আমরা স্বাগতঃ অভিনন্দন জানাচ্ছি। আধুনিক প্রেক্ষাগৃহের সর্বরকম সুখ-সুবিধা নিয়ে ইন্দিরা দর্শক সাধারণকে সাদর আহ্বান জানিয়েছে। দর্শকসাধারণের আরামের জন্য গ্রীষ্মতাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কুশন সম্বলিত কেদারা প্রভৃতি:

আধুনিক প্রেক্ষাগৃহের সর্বপ্রকার সুখ সুবিধা নিয়েই ইন্দ্রিরা আত্মপ্রকাশ করবে।

মৃন্ময়ী পিকচার্স

মৃন্ময়ী পিকচার্সের "স্বর্ণসীতা" গত ১১ই জুন অজন্তা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় রূপবাণী, ছায়া, কালিকা, আলেয়া ও অজন্তা প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাস "স্বর্ণসীতা"কে কেন্দ্র করেই আলোচ্য চিত্রখানি গড়ে উঠেছে। "স্বর্ণসীতা"র সংলাপ নারায়ণ বাবুই রচনা করেছেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন সাহিত্যিক তাদের অপূর্ব রচনাশৈলী, বাস্তব দৃষ্টিভংগী ও দরদী মন নিয়ে আমাদের সামনে দেখা দিয়েছেন—শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর বর্তমান কাহিনীটিও তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই কাহিনীটিই চিত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে হলিউড প্রত্যাগত চিত্রশিল্পবিদ্ অসিতকুমার ঘোষের পরিচালনায়। "স্বর্ণসীতা"র সুর সংযোজনা করেছেন সুরশিল্পী সুবল দাশগুপ্ত। আর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন রাধামোহন, প্রমোদ, গায়ত্রী, অবনী মজুমদার, ইন্দু মুখুজ্যে, জহরেন বসু, রাজলক্ষ্মী (বড়), জহর রায়, নৃপতি, খগেন, যোকেন, তুলসী চক্রবর্তী, কেষ্ট দাস, চিত্রা দেবী, অলকা মিত্র, উমা গোয়েঙ্কা, বাসন্তী ও আরও অনেকে। আগামী সংখ্যায় "স্বর্ণসীতা"র সমালোচনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

কল্প চিত্র মন্দির

কৃতি চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরী তাঁর পরিচালক জীবনের প্রথম চিত্র 'ওরে যাত্রী'র চিত্রগ্রহণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন। একক দায়িত্বে 'ওরে যাত্রী' রাজেন বাবুর প্রথম চিত্র হ'লেও, ইতিপূর্বে একাধিক চিত্রে তাঁর পরিচালন-নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা পেয়েছি। 'বন্দিতা' ও 'দুঃখে যাদের জীবন গড়া' চিত্রের পরিচালনায় রাজেন বাবুকে যে অংশ গ্রহণ করতে হ'য়েছিল, তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। তাছাড়া বহু চিত্রের সম্পাদনা কার্যে রাজেন বাবু যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাও কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। 'ওরে যাত্রী' শুধু চিত্র সম্পাদক হিসাবেই যে তাঁর সেই নৈপুণ্যকে অক্ষুন্ন রাখবে

তা নয়, চিত্র পরিচালকরূপেও রাজেন বাবুকে প্রতিষ্ঠিত করবার দাবী নিয়েই আত্মপ্রকাশ করবে বলে প্রকাশ। কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সংগে এই চিত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দর্শক সাধারণের পরিচয় হবে। তাছাড়া বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন—শ্রীমতী প্রভা, রেণুকা, নমিতা, অনুভা, প্রীতিধারা, কল্যাণী, দীপক, উত্তম, জ্যোতি, ডি, জি, নবদ্বীপ, হরিদাস, অমল, সুশান্ত, রঞ্জিত, মাষ্টার সত্য, মাষ্টার লক্ষ্মী প্রভৃতি। 'ওরে যাত্রী'র সুর সংযোজনা করেছেন সুরকার কালীপদ সেন। সুরকার কালীপদ সেন তাঁর সুরের মায়াজালে দর্শকদের অভিভূত করবেন বলে বিশ্বাস। শ্রীযুক্ত চৌধুরী বর্তমানে 'ওরে যাত্রী'র যাত্রা পথের শেষ কাজটুকু নিয়ে ব্যস্ত আছেন আর প্রযোজক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বিশ্বাস কবে থেকে তার যাত্রা সুরু হবে সেই দিনটি নির্ধারণে উঠে পড়ে লেগে গেছেন।

এস, বি, প্রডাকসন

প্রকাশ, শ্রীমতী সুনন্দা দেবী প্রযোজিত এস, বি প্রডাক্-সনের দ্বিতীয় বাংলা চিত্র নিবেদন গড়ে উঠবে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্র-খানির নামকরণ করা হ'য়েছে 'সিংহদ্বার'। 'সিংহদ্বার' পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী এবং ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে চিত্রখানি গৃহীত হবে। আগামী সংখ্যায় 'সিংহ-দ্বার' সম্পর্কে বিস্তারীত সংবাদ দিতে পারবো বলে আশা কচ্ছি। তবে ওয়াকীফহাল মহল থেকে যতটা জানতে পেরেছি, তাতে প্রকাশ, 'সিংহদ্বারে'র বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করবেন সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার প্রভৃতি এবং সুর সংযোজনা করবেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণা প্রডিউসার্স লিমিটেড

এদের প্রথম চিত্র 'বিস্মৃতি'র কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুরু হ'য়েছে। 'বিস্মৃতি'র কাহিনী রচনা করেছেন অতুল দাশ-গুপ্ত। চিত্রখানি তাঁর পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। সুর সংযোজনা করছেন বিনয়ভূষণ গুপ্ত। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন রেণুকা, অপর্ণা, বলাই মুখুজ্জে, সন্তোষ সিংহ, উৎপল সেন প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত অজয় সেনগুপ্ত চিত্রখানিকে দর্শক মনোরঞ্জনের উপযোগী করে তুলতে সর্বপ্রকার চেষ্টা করছেন।

দেবকী বসুর পরিচালনায় 'কবি'

একদিন বাংলার পল্লীসমাজ মুখরিত ছিল 'কবির লড়াই' 'তরজা'র গান প্রভৃতি স্বতঃস্ফূর্ত কাব্য প্রতিভায়। কিন্তু আজ বাঙ্গালীর নিজস্ব কৃষ্টির অন্তর্গত এই অপূর্ব প্রতিযোগিতাগুলির সংগে গ্রাম্য কবিকুলও অনাদৃত ও লুপ্তপ্রায়। শ্রী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' এরূপ এক গ্রাম্য চাঁড়াল কবির কাহিনী নিয়ে রচিত। এই চিত্ররূপে শ্রীযুক্ত দেবকী বসু আমাদের একটা বিস্মৃত রসের পুনরাস্বাদ দানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। চিত্রামোদিগণ এ সংবাদে খুবই খুশী হবেন সন্দেহ নেই। 'কবি'র বিভিন্নাংশে দেখা যাবে নীলিমা দাস, অনুভা গুপ্তা, রবীন মজুমদার, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেককে। শ্রীযুক্ত অনিল বাগচী চিত্রখানির সুর সংযোজনার ভার নিয়েছেন। চিত্রখানি ডি, লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

সাধারণ মেয়ের দৃশ্যপটে

[গত সংখ্যার শেষাংশ]

পাহাড়ী সান্যাল ও শ্রীমতী দীপ্তি রায় অভিনীত সেই দৃশ্যের সংলাপগুলি এখানে উদ্ধৃত করে আপনাদের ঠিক বোঝাতে পারব না কতখানি উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল তাঁদের তখনকার রিহার্স্যাল। কিন্তু সেদিন 'সাধারণ মেয়ে' ছবির সেই দৃশ্যের কয়েকটি শট্ দেখে একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, প্রতিশ্রুতি-র পাহাড়ী-সান্যাল এক নূতন রূপসৃষ্টির পরিচয় দেবেন 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রের এই চরিত্র-চিত্রণে। 'স্বয়ংসিদ্ধা'র চণ্ডী 'সাধারণ মেয়ে'র উমা রূপে আর একবার সকলকে বিস্ময়ান্বিত করবেন। ভাল চরিত্রে এবং উঁচুদরের পরিচালকের পরিচালনায় শ্রীমতী দীপ্তিরায় যে কি অসাধারণ কুশলতার স্তরে উঠতে পারেন, তা 'সাধারণ মেয়ে' ছবিখানি দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

কাহিনী রচয়িতা শ্রী পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে 'সাধারণ মেয়ে'র বিশিষ্ট চরিত্রগুলির সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে বললাম। তিনি শটের ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটি চরিত্রের মূল কাঠামোটুকু আমাদের জানিয়ে দিলেন।

অজিত (নীতিশ মুখোপাধ্যায়)—রসায়নশাস্ত্রে এম, এ। স্বপ্নবিলাসী মানুষ। তার জীবনের স্বপ্ন—আধুনিক ল্যাবরেটরী ও প্রাচীন হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের সমন্বয়ে সে এমন একটি ঔষধ আবিষ্কার করবে, যা সহজে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছবে—যাতে উপকার হবে ধনী, দরিদ্র সকলের। উমার পিতা শাস্ত্রীমশাই (তারাকুমার-ভাদুড়ী, শিশিরকুমারের অনুজ) তাকে সাহায্য করেছিলেন। উমা ছিল তার স্বপ্নের প্রেরণা। মানুষের জীবন-স্বপ্ন সহজে সত্য হয় না এবং সেইখান থেকেই জীবন-নাট্যের উদ্ভব হয়। উমা (শ্রীমতী দীপ্তি রায়) সংস্কৃতকাব্যানুরাগিণী মেয়ে। শাস্ত্রীমশাই তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়ে সে গ্রাম ছেড়ে এসেছিল কলকাতায় অজিতের সন্ধানে। অজিতের সন্ধান সে পায়নি। কিন্তু নানা পুরুষের কাছ থেকে পেয়েছিল অবিচার। সেই অবিচারের বিরুদ্ধে সে দাঁড়াল, ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সব করল আয়ত্ত, কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার চরমে উঠে সে করল ভুল আর অবিচার। মিঃ গাঙ্গুলী (ছবি বিশ্বাস) জীবনে চেয়েছিলেন অনেক, পেয়েছিলেন অনেক, কিন্তু মন ভরেনি। অজিতকে পেয়ে মনে করেছিলেন, তিনি
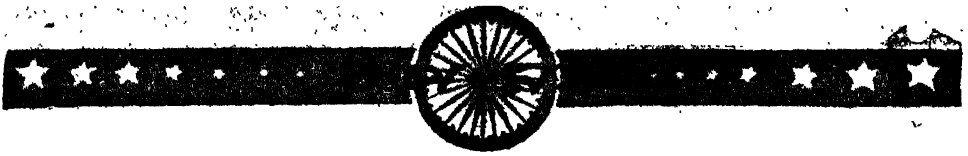
নিজের অচরিতার্থ স্বপ্ন তার ভিতর দিয়ে সফল করে তুলবেন। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের পিছুটান মানুষের মহত্তর সাধনাকে ব্যর্থ করে দেয়, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর তিনি নিষ্ঠুর হয়তো বা হৃদয়হীনও। তবু তিনি হৃদয়হীন ন'ন। নিজের অগোচরেই তিনি কখন এই নাটকে villian-এর স্থান গ্রহণ করে ফেলেছিলেন; কিন্তু সত্যকারের villian তিনি ন'ন। হয়তো শুধু একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা।

মিঃ মজুমদার (পাহাড়ী সান্যাল) বিলিতি ডিগ্রিধারী এঞ্জিনিয়ার। তিরিশ বছর ধরে ব'সে ব'সে স্বপ্ন দেখছেন কত কি করবার, করতে পারেন নি কিছুই। লোকে বলতো পাগল, কেউ কেউ দয়াও করতো। কিন্তু তিনি সত্যিকারের মানুষ, দরদী আত্মভোলা। উমাকে হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে তিনিই সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

নরেন (জহর গাঙ্গুলী) বোহেমিয়ান টাইপ শিক্ষিত ছেলে। লোকের মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে বাধতো না—এমন কি স্বপ্নাবিলাসের জন্যে অভিভাবককেও সে শক্ত কথা বলতে ছাড়েনি। কিন্তু বাইরের এই অপ্রিয়ভাষণের আড়ালে সত্যকার একটা দিলখোলা লোক ছিল লুকানো।

ইতিমধ্যে নীরেন বাবু কয়েকটি শট নিয়ে নিয়েছেন। একটা আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য করলাম, শটের ফাঁকে ফাঁকে এঁদের দলবল একজায়গায় জমায়েৎ lirt and humour-এর চুটকি গল্প, গানের সুর, ফুটবলের আলোচনা, বিলিয়ার্ডসের কথা, দেশ-বিদেশের সাহিত্য এবং পৃথিবীর অন্য নানা বিষয় ও বস্তু নিয়ে মেতে উঠলেও কাজের সময় মুহূর্তের মধ্যে এঁদের অদ্ভুত রূপান্তর ঘটে। পাহাড়ী সান্যালকে তো দেখলাম শটের বাইরেও তিনি সব সময়েই বৃদ্ধের ভংগী বজায় রেখে চলছেন। চোখে মিঃ মজুমদারের স্বপ্ন, এদিকে কথা বলছেন বিলিয়ার্ডস খেলা নিয়ে। মুখে সর্বদা আত্মভোলা হাসি আর একটু ভাল সুর কিম্বা কথা, রসিকতা অথবা দুই একটা সুখাদ্যের নাম শুনলে ত উচ্ছ্বাসের অন্ত

পরিচালক : নীরেন লাহিড়ী। চিত্রগ্রহণ : পান্না সেন

নেই। অন্যদিকে শ্রীমতী দীপ্তিকে দেখে মনে হ'ল, তাঁর অন্তরস্থিত শিল্পী এই শিল্পপ্রাণ দলটীর সংস্পর্শে এসে যেন বিকশিত হয়ে ওঠবার পথ খুঁজে পেয়েছে।

যিনি 'গরমিল' ও 'ভাবীকাল' চিত্রপরিচালনার জন্য বাঙলার সিনেমা সাংবাদিকদের নিকট অভিনন্দন-পত্র লাভ করেছেন, যিনি 'দম্পতী' 'সহধর্মিনী' 'জয়যাত্রার' পরিচালক, তাঁর সম্বন্ধে কিছু না বলে আমার এই 'সাধারণ মেয়ে'-র স্যুটিং পরিদর্শন-বৃত্তান্ত শেষ করা যায় না। পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর ব্যক্তিত্ব অসাধারণ, যে ব্যক্তিত্ব দূর থেকে শ্রদ্ধা দাবী করে, যে ব্যক্তিত্ব শুধু বলতে চায়, আমি স্বতন্ত্র, আমি থাকি সাধারণ স্তরের অনেক উঁচুতে—তিনি সেই ব্যক্তিত্বের অভিলাষী ন'ন। সেটের কুলি থেকে শিল্পী আর টেক্‌নিসিয়ান, সমালোচক আর সুধীসমাজ তাঁর সংস্পর্শে এলে খুশী হয়, প্রত্যেকের কাছেই তিনি অত্যন্ত নিকটের লোক—সর্বজনপ্রিয়তার মধ্যেই সত্যকারে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। প্রত্যেকের যোগ্যতার উপর তাঁর বিশ্বাস, প্রত্যেকের নিষ্ঠার ওপর তাঁর শ্রদ্ধা, প্রত্যেকের কুশলতার ওপর তাঁর নির্ভরতা তাঁকে এতখানি জনপ্রিয় করে তুলেছে।

কল্পনাপ্রবণ মন তাঁর সর্বদাই আগামীকালের জীবনের আদর্শকে আবিষ্কার করবার জন্যে সামনে ছুটে চলে। বুদ্ধিদীপ্ত মনের আয়নায় জীবনের প্রত্যেকটি বৈচিত্র্য, মানুষের নব নব রূপ যে ছায়া, যে রহস্য সৃষ্টি করে, সেইখানেই তাঁর অনুসন্ধানের গভীরতর আগ্রহ দেখেছি।

তাঁর পরিচালিত চিত্রকাহিনী গতানুগতিক জীবনের কাহিনী হয়ে ওঠে না। শুধু তিনি সাধারণ মানুষের কাহিনীই বলে চলেছেন অসাধারণ একটি দৃষ্টিভংগীর বিশ্লেষণধারায়। হৃদয়, শক্তি, বুদ্ধি আর সাহস নিয়ে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ ঘূর্ণিপাকে ভেসে কোথায় চলেছে, আজও হয়তো কেউ জানেনা। যার হৃদয় আছে, শক্তির অভাবে সেই স্রোতে হয়তো কোথায় হারিয়ে যায়, যার শক্তি আছে, হৃদয়ের অভাবে তাকে চরম মুহূর্তে ডুবে যেতে দেখি। যার বুদ্ধি আছে, শক্তির অভাবে সে কোন তীরেই আজও পৌঁছল না, যার সাহস আছে, বুদ্ধির অভাবে সে অকারণ দুঃসাহসিকতা দেখাতে গিয়ে জীবনের দুর্নিবার স্রোতের কবলে পড়ে পঙ্গু হ'য়ে গেছে। প্রতি মানুষের জীবনে প্রতি মুহূর্তের এই যে বেদনা ও বিক্ষোভ, স্বপ্ন ও ব্যর্থতা, ভয় ও দুর্বলতা, আশা আর আনন্দ, ক্ষমতা এবং অক্ষমতার দম্ভ ও লজ্জা তা' সাধারণ মানুষেরই কাহিনী। কিন্তু পরিচালক নীরেন লাহিড়ীর ছবিতে সেই সাধারণ কাহিনীর একটি নূতন দার্শনিক রূপ দেখতে পাই। দেখতে পাই, মনের ওপর নূতন আলো-ছায়ার খেলা। তাঁর আঘাতের পর উদার আশ্বাস দিতে তিনি এগিয়ে এসেছেন। তিনি এই কথা অত্যন্ত বিশ্বাসের সংগে প্রচার ও প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, মানুষ তাদের এই জীবন পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়ে একদিন সেইখানে নিশ্চয় পৌঁছবে, যেখানে দেখতে পাওয়া যাবে, সত্য যা কিছু তা হারিয়ে যায় নি, বৃথা হয়নি। যে অশ্রু সত্য, যে আশা সত্য, যে ত্যাগ সত্য তা অস্বীকৃত হয়নি। মানুষের সামান্য যোগ্যতা, ক্ষুদ্র শক্তি, তুচ্ছ আয়োজন, ছোট প্রচেষ্টা, বিফল স্বপ্ন কল্যাণের রূপকে আহ্বান করে এনেছে।

নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রটিও নিতান্ত সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ জীবনের তীরে অভিযানের কাহিনী। নীরেন লাহিড়ী বললেন, ব্যবসায়ের দিক থেকে আমার ছবির সাফল্য সম্বন্ধে আমি কোনদিন আগে থেকে চিন্তা করিনা, কারণ আমি জানি, যদি আমার বক্তব্য জীবনের নাটকীয়তার পরিবেশে ঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারি, তাহলে দর্শকসাধারণ কখনও আমার ছবিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না। তাঁদের আশীর্বাদই আমার পরিচালক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম, বাইরে এসে সম্পাদনা ঘরের ধারে ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখুজ্জে, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার প্রভৃতিকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেদিকে অগ্রসর হ'লাম। 'মুভিওলা'-য় একটি গান চলছে। পাশে সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে আছেন। 'মুভিওলা'-র গানটি শেষ হ'তেই তিনি এগিয়ে এসে বললেন, গানের সুরের টানে যখন এদিকে এসেই পড়েছেন, তখন 'সাধারণ মেয়ে'-র কয়েকখানা গান শুনে যেতে হবে।

'মুভিওলা'-য় পর পর পাঁচখানি গান শুনলাম। প্রত্যেকটি গান শ্রুতিমধুর। রচনা ও সুরবৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

বাংলা চলচ্চিত্রের সুরশিল্পীদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। যার মধ্যে কণ্ঠ সংগীতে সুরযোজনার কৃতিত্ব দেখেছি, তাঁর মধ্যে ব্যাক্ গ্রাউণ্ড সুর-রচনার শক্তির অভাব প্রায়ই দেখা গেছে। আবার ব্যাক্ গ্রাউণ্ড-সুর-যোজনার কৃতিত্ব অনেকের মধ্যে কণ্ঠ সংগীতের সুর-সৃষ্টিকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

কিন্তু সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় দুই দিকেই সমান বিদগ্ধতার পরিচয় দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। শুধু সুরশিল্পীর ওপরে তাঁর আর একটি যোগ্যতার পরিচয় হ'ল, ছবির গতি সম্বন্ধে তিনি লক্ষ্য রাখেন। কাহিনীর ধারা না জেনে তিনি সুর-রচনার কাজে মন দিতে রাজী ন'ন।

সুতরাং তাঁর গানের অভিব্যক্তিতেও ঠিক সেই রূপটির অপরূপ মিল দেখতে পাওয়া যায়।

[আগামী ১লা জুলাই থেকে সাধারণ মেয়ে রূপবাণী ও ইন্দিরায় প্রদর্শিত হবে]

শ্রীমতী মধুছন্দা রায় : রূপ-মঞ্চ পত্রিকার নতুন আবিষ্কার। বাংলার চিত্রামোদীদের সব প্রথম অভিবাদন জানাবেন 'রাই' চিত্রের একটী বিশিষ্ট চরিত্রে।

আষাঢ়
১৩৫৫

রূপ-মঞ্চ

অষ্টম-বর্ষ
তৃতীয়-সংখ্যা

বেতাল-জগত—(১)

জগতটা যে বে-তালে চলছে একথা আর অস্বীকার করি কী করে বলুন ত? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, অতি সহজেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। রুশজুজুর ভয়ে ইঙ্গ-মার্কিনী দলের সংগে সংগে তাদের ফেউগুলি তারস্বরে এক নাগারে 'গেলাম গেলাম' রব তুলেছে। তাছাড়া প্যালেষ্টাইনে হামড়া-হামড়ি, চীনে ধস্তাধস্তি, জার্মানীতে ঠেলাঠেলি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় পালটা-পালটি—গ্রীস ইটালী-ফিনল্যাণ্ড কেইবা তালমত চলছে বলুনত? ভিয়েটনাম, ইন্দোনেশিয়া—বার্মা এবং ভারত ও পাকিস্থানেও তার ঢেউ এসে যে তাল-বেতালের নতুন কাহিনী রচনার যোগাড় করে তুলেছে—একথা আর অস্বীকার করতে পারি কী করে! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এত বটা করে দল পাকিয়ে বড় বড় বাঘ-ভল্লুকরা মিলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে মিলনখানার সৃষ্টি করলেন—সেখানেও যে বে-তাল সুর এরই মাঝে তাল গোল পাকিয়ে ফেলবার উপক্রম করেছে! ভারতের অভ্যন্তরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন; সর্বত্র বে-তাল সুর. কাশ্মীরে হানাদারদের বে-তালে তাল ঠোকা বন্ধ হচ্ছেনা। হায়দ্রাবাদে রাজাকরদের দৌরাত্ম্য তালমতই বে-তালে চলছে। বৃহত্তর ভারতের খণ্ডিত অংশদ্বয়ও যে ঠিক তালমত চলতে পাচ্ছে, তাই বা কী করে বলতে পারি? পঞ্চমে কেউ রাগিনী ধরলেনত আর একজন তাকে ছাড়িয়ে অষ্টমে হাক দিলেন। এই হাকা-হাকি আর হুমকা-হুমকীর মাঝে জগতটা আর কী করে তালমত চলতে পারে? আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন বিরাট পরিধির কথা ছেড়েই দিলাম—যে ছোট সীমাবদ্ধ গণ্ডির মাঝে নিজেকে চলাফেরা করতে হয়-সেখানেও যে সব তালগোল পাকিয়ে আছে। প্রতি মুহূর্তে—প্রতিপদক্ষেপে আদর্শের সংঘাত অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দাঁড়াচ্ছে। যা বলতে চাই—যা করতে চাই—তা' আর বলাও হয় না—করেও উঠতে পারি না। পরাধীনতার জগদ্দল পাষাণ যখন বুকে চেপেছিল, তখনও যেসব সমস্যার ভারে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠবার উপক্রম হয়েছিল—আজও তা থেকে মুক্তি পাচ্ছি কোথায়? সামাজিক জীবনে পরস্পরের সংগে সুর মিলিয়ে চলতে পাচ্ছি না—রাজনৈতিক জীবনে কিংকর্তব্য বিমূঢ়তায় সত্যকার পথ খুঁজে পাচ্ছিনা—অর্থনৈতিক জীবনে বিপর্যয়ের বোঝায় পঙ্গু হয়ে পড়ছি দিন দিন। মুক্তি কোথায়? সত্যকার মুক্তিত আজও পেলাম না। পারিবারিক জীবনও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। যে সুখ-নীড়ের স্বপ্নে ছিলাম বিভোর—আজ নির্মম বাস্তবের সংঘাতে সে স্বপ্ন যে ভেংগে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। স্বামী স্ত্রীর মিলন-সৌধে অবিশ্বাসের কালো ছায়া গভীরতর হয়ে উঠছে—হৃদয়ের বন্ধন আজ আর অচ্ছেদ্য বলে মনে করতে পাচ্ছি না—আইনের বন্ধনকেই বড় বলে মনে কচ্ছি। পিতা, পুত্র, ভ্রাতা-ভগ্নী—

সকলের মাঝেই বিরোধ—ভাইয়ে ভাইয়ে স্বার্থের হানাহানিও নতুন নয়। র‍্যাশনে পেট ভরছে না—ন্যায্যমূল্যে নিত্য ব্যবহার্য কোন কিছুই সংগ্রহ করা যাচ্ছে না—উপার্জনের সংগে তাল রেখে ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা মোটেই সম্ভব হয়ে উঠছে না। তাই সমস্ত জগতটাই যে বেতালে চলছে, এ ছাড়া আর কী বলবো! আমার বর্তমানের আলোচনা এসব তাল-বেতালের কথা নিয়ে নয়, রাজনীতির কচ্‌কচানী -জপ-জপানীর কথাত দৈনিক সংবাদপত্রগুলিই আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়। অর্থনৈতিক টানাটানিত নিজেদের পকেট টানাটানিতেই বুঝতে পারবেন। আর পারিবারিক খচ্‌খচানীর কথা বলছেন—ওটার বিচার-বিন্যাসের ভার আপনাদের উপরই থাকনা কেন! অনধিকার হস্তক্ষেপ নাই বা করলাম। আমার বর্তমান আলোচনার গণ্ডির মাঝে যে বেতাল জগতকে টেনে এনে একটু ঠোকাঠুকী করতে চাই, তার বে-তাল সম্পর্কে ঠোকাঠুকীটা একটু কম হয় বলেই 'বেতাল' চলাটাই তার আজকাল চাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার আলোচনা বে-তাল জগতকে নিয়ে নয়—'বেতাল জগত'কে কেন্দ্র করে। আমার আলোচনার বিষয় এবারও হয়ত আপনারা ঠিক ধরতে পাচ্ছেন না অথবা যদি একটু বিশ্লেষণ করে না বলি, দোষটা হয়ত চাপিয়ে দেবেন ভুল-সংশোধকের (proof-reader) ঘাড়ে। নিশ্চয়ই 'বেতার জগৎ' এর 'র' স্থানে ভুল করে 'ল' বসিয়েছেন। আলোচনাটা অবশ্য গার্স্টিন প্লেসের কর্তাদের জগত নিয়েই, তবে তাদের বেতার জগতকে ভুল করে বেতাল করা হয়নি—ইচ্ছা করেই বেতাল এই নতুন নাম দিয়ে ভূষিত করা হ'য়েছে। 'বেতার জগত' স্থলে যদি 'বেতাল জগত' নাম রাখা হয়—আপনাদের তরফ থেকে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে বলে মনে করিনা। তবু গণতন্ত্রের যুগে গণভোট গ্রহণের বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না। তাই আপত্তি থাকলে বলবেন।

বৃটিশের আমলে এই বেতার জগত জাতীয় স্বার্থকে বে-তালেই চালিয়ে নিয়ে এসেছে। তাই নেতাজী সুভাষচন্দ্র এদের সাহেবী নামকে অর্থাৎ A I R (All India Radio)-র সাহেবী ব্যাখ্যা করেছিলেন: Anti Indian Radio। সম্প্রতি বাংলা সরকারের নির্দেশে ভাষাচার্যেরা যে পরিভাষা তৈরী করেছেন, তার তালিকার ভিতর অবশ্য Anti Indian Radio-র পরিভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না—তবে যে বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করে তাঁরা পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন—আমরাও সে বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসরণ করেই নেতাজী প্রদত্ত Anti Indian Radio-র পরিভাষা রাখলাম 'বেতাল-জগত'—যাকে গার্স্টিন প্লেসের কর্তারা বলে থাকেন—বেতার। বৈদেশিক সরকারের আমলে এই বেতার-কেন্দ্র জাতির স্বার্থ বিরোধী কাজ করে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। বৈদেশিক সরকারের বিলোপ সাধনের পরও বেতারকেন্দ্রের জাতির স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হ'লো না। পরিবর্তন যেটুকু চোখে পড়ে, তা অপরিবর্তিত কাঠামোর গায়ে শুধু দু' একটু রং-এর প্রলেপ মাত্র। পূর্বে ভুল ক্রমে যদি দু' একবার বন্দেমাতরম বা অনুরূপ কোন জাতীয় গন্ধযুক্ত সংগীতের রেকর্ড চড়ানো হ'তো—অমনি হুকুম আসতো, ভাঙো—জলদি ভাঙো'—সেখানে ইচ্ছা করেই আজকাল জাতীয় সংগীত বাজানো হয়—জনসাধারণের কানে ধাঁধাঁ সৃষ্টির জন্য—তাঁদের কানে এই কথাটাই কসরৎ করে প্রবেশ করানোর জন্য যে, আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। নইলে কী আর এসব সংগীত প্রচার করা যেত! প্রথম প্রথম শ্রোতাদের কানে তক্ক লাগলেও, এই বুলির ধাপ্পাবাজী ধরে ফেলতে আর বেশী বেগ পেতে হয়নি। তাই তাদের রং পালটানোর সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থতার রূপ নিয়েই দেখা দিয়েছে। 'ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নাচ' বলে একটী প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে। এই বেতাল-জগত কতগুলি গালভরা দেশাত্মবোধক শব্দের আবরণে জাতীয় স্বার্থবিরোধী যে নাচন সুরু করেছে—তাকে অবিলম্বে বন্ধ করাতে হবে। 'ঘোমটা' কথাটি বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের এক গৌরব মাখানো প্রতীক। ঘোমটার আবরণ উন্মোচনের সংগে সংগে বাঙ্গালীর মনে স্বতঃই জেগে ওঠে, পল্লীবধুর স্নিগ্ধ সলজ্জ পবিত্র মুখাবয়বের কথা। বাঙ্গালীর

শাশ্বত জায়া ও জননীর ঐ মুখদৃশ্যের কথা মনে হতেই মাথা সম্ভ্রমে নুইয়ে পড়ে। ঘোমটা কথাটি এমনি একটা সম্ভ্রমের প্রতীকরূপে বাঙ্গালীর হৃদয় জুড়ে আছে। যারা এই সম্ভ্রমের সুযোগ গ্রহণ করে জাতির সামনে ঘোমটা টেনে অনাচার চালায়—তাদের যোগ্য শাস্তি বৃটিশ আমলের নির্মমতার মাঝেও খুঁজে পাই না। দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের জন্য মহাভারতের পাতায় দুঃশাসন সকলের চোখে ঘৃণা হয়ে আছে। কিন্তু আজ কলিযুগের এই বিংশ শতাব্দীতে দ্বাপরযুগীয় মহাভারতের সেই দুঃশাসন যদি জন্ম গ্রহণ করতো—তাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে, এই নাচিয়ে দলের শাস্তি বিধানের দায়িত্ব বিনা দ্বিধায় তার হাতে তুলে দিতাম। এদের শাস্তিবিধানের জন্য দুঃশাসনকেই আজ প্রয়োজন · শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ! কিন্তু দুঃশাসনকে আর পাচ্ছি কোথায়! না পাই ক্ষতি নেই—নররূপী নারায়ণই দমন করেছিলেন দুঃশাসনকে। যদি সেই সর্বশক্তিসম্পন্ন নররূপী নারায়ণের ধ্যান ভংগ করতে পারি, তবে আর আমাদের ভাবনা কিসের? তাই আজ সমস্ত অন্যায় ও অনাচারের বিরুদ্ধে সাবধ্য করতে নররূপী নারায়ণের কাছেই আবেদন জানাচ্ছি—'ওঠো—জাগো। মোহগ্রস্ত মনের জড়তা কাটিয়ে তোমার স্বমূর্তি নিয়ে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠো!'

পনেরোই আগষ্টের পর আমরা শুনেছিলাম—বেতার জগতের সমস্ত কাঠামোটাই পাল্টে যাচ্ছে—জাতির স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ হ'য়ে যাবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল স্বয়ং এ বিভাগটির ভার গ্রহণ করেছেন—তাঁর মত লোহার মানুষ কোন অনাচারকেই প্রশ্রয় দিতে পারেন না—কঠোর হস্তে সব দমন করবেন। সেখান থেকে নির্দেশ আসবে জাতির স্বার্থের অনুকূলে—সেই নির্দেশকে অবনত মস্তকে মেনে নিতে হবে কলকাতা কেন্দ্রকে। আশান্বিত হ'য়ে উঠেছিলাম—সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে এই আশাকে ফলবতীরূপে দেখবার জন্য উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছিলাম—পুরো একটা বছর কেটে গেল এই উৎফুল্লের ভিতর দিয়ে। আবার ১৫ই আগষ্ট ফিরে আসছে। কিন্তু কৈ, কোন পরিবর্তনইত চোখে পড়লো না! সমস্ত আশাই যে আজ নিরাশায় পর্যবসিত হ'তে চলেছে!

প্রথম প্রথম জাতীয় সংগীতগুলির প্রতি বেতারকেন্দ্রের খুব উৎসাহ দেখা গিয়েছিল—ধীরে ধীরে সে উৎসাহেও ভাটা পড়ে যায়—সে উৎসাহ বর্তমানে প্রথম অধিবেশনের এবং অনুষ্ঠান শেষের কয়েক মিনিটের মাঝেই নিবদ্ধ আছে। আর দু'চারটে জাতীয় সংগীতকে স্থান করে দিলেই যদি জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হ'তো, তাহলেত কথাই ছিল না—তাই নররূপী নারায়ণদের কাছে আবেদন, আর ঐ অলীক উৎফুল্লের মাঝে ডুবে থাকলে চলবে না। তাঁদের অবহিত হ'য়ে উঠতে হবে এ বিষয়ে। গত পনেরোই আগষ্টের পর থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা নিয়মমত, নির্দিষ্ট সময়ে বেতার-যন্ত্রটির কাছে কান খাড়া করে রয়েছেন, তাঁদের কথা ছেড়েই দিলাম, যে কোন শ্রোতা যদি এক সপ্তাহ বা একপক্ষ ধরে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলি শ্রবণ করেন—তাঁদের কানেও এই অনুষ্ঠান লিপির অসারত্ব ধরা পড়বে অতি সহজেই। বৈদেশিক সরকারের আমলে যদি কারো তদানীন্তন কোন অনুষ্ঠানলিপির অভিজ্ঞতা থাকে—তাহলে দুইকে তুলনা করে দুইয়ের মাঝে কোন ব্যবধানই আবিষ্কার করতে পারবেন না। বেতার কর্তারা নিজেদের সপক্ষে বলবার জন্য বলতে পারেন—আমরা এই করেছি, তা করেছি, কিন্তু কার্যকরী ক্ষেত্রে তারা যে কিছুই করতে পারেন নি—একথা প্রমাণ করতে আমাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। বড় জোর তাঁরা হয়ত চেষ্টা করে থাকতে পারেন—কিন্তু সে চেষ্টাই যে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। এ দোষ তাঁদের নয়—তাঁদের মজ্জার। বৈদেশিক সরকারের আওতায় যে কর্মপদ্ধতি—যে আদর্শ—যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে তাঁরা চলতেন—তা তাঁদের মজ্জার সংগেই মিশে গেছে। তাই চেষ্টা করেও সে প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্তি পাচ্ছেন না। তাঁদের এই অক্ষমতার জন্য দুঃখ হয়—সমবেদনা জাগে। তাঁদের অবস্থার কথা মনে হ'তে চার্লি চ্যাপলিনের 'মডার্ণ টাইমসের' কথা মনে পড়ে। দাসত্বের বোঝা বইতে বইতে—উপরের হুকুম তামিল করতে করতে এঁদের ঘাড়েই শুধু দাগ পড়েনি, মনেও গভীর রেখা পড়েছে—সে রেখা যতদিন না মুছে ফেলতে পারবেন—ততদিন জাতির কোন্ স্বার্থই তাঁদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হবে না। তাই, হয়
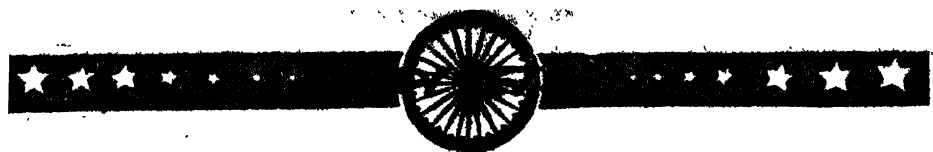
তাঁদের সম্পূর্ণ রূপে সরে দাঁড়াতে হবে—আর না হয় ঐ দাগ মুছে ফেলতে অস্ত্রোপচার করতে হবে।

কিছুদিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বড়কর্তাদের সংস্পর্শে এসে জানতে পেরেছিলাম—বেতারকে জনপ্রিয় করে তুলতে এবং জাতির মহত্তর কাজে লাগানোর জন্য বিরাট পরিকল্পনা চলছে। বেতারকে নিয়ে যাওয়া হবে চাষীর খামারে—কলকারখানার মাঝে—কিষাণ ও মজুরদের জীবনের নিরানন্দ মুহূর্তগুলিকে আনন্দে মুখরিত করে তোলা হবে—তাঁদের অশিক্ষার জমাট অন্ধকার দূর করা হবে বেতারের সাহায্যে—দেশ-বিদেশ সম্পর্কে তাঁদের ওয়াকীফহাল করে তোলা হবে—দেশের পুনর্গঠনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য তাঁদের সত্যকার অংশীদার রূপে গড়ে তোলা হবে—বেতারকে নিয়ে যাওয়া হবে শিক্ষা-প্রাংগনে—দেশের ভাবী উত্তরাধিকারদের গড়ে তুলবার শুভকার্যে বেতারকে লাগানো হবে পূর্ণ ভাবে—পাড়ায় পাড়ায়—পার্কে পার্কে—সরকার থেকে বেতার যন্ত্র শোনাবার স্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে। যাঁদের বেতার-যন্ত্র ক্রয় করবার সামর্থ নেই, যাঁরা বেতার যন্ত্র শোনার সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত—তাঁরা এই বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবেন। কিন্তু হায়,—'সকলি গরল ভেল'—। সমস্ত আস্ফালনই কী শূন্যে ভেসে গেল! সরকারী শ্রমিক-কেন্দ্রে দু'একটী বেতার যন্ত্র বিলি করা হয়েছে বলে শুনেছি। এই লোক দেখানো বিলিব্যবস্থার নমুনাত বৈদেশিক সরকারের আমলেও ছিল। আমাদের দেশীয় কর্তারা তাহলে আর কী করলেন? কিছু করেছেন কিনা আমাদের জানা নেই—যদি করে থাকেন, জানালে বাধিত হবো। এত গেল বিরাট কিছু করার কথা। এই বিরাটত্বের কথা আপাততঃ চাপা দিয়ে রাখতেও আমরা রাজী আছি। কারণ, এ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তুলতে হ'লে প্রচুর অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। শাসনভার গ্রহণ করেই নানান সমস্যা নিয়ে জাতীয় সরকারকে জড়িয়ে পড়তে হ'য়েছে। সে সমস্যাগুলির কথা আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। কিন্তু যা রয়েছে, অর্থাৎ যার জন্য নতুন করে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন নেই—বরং যে অর্থব্যয়িত হ'চ্ছে, তা' জাতির স্বার্থে ব্যয়িত হচ্ছে কিনা—জাতীয় সরকার যদি সেদিকেও দৃষ্টিপাত না করেন, তাহলে তাঁদের আন্তরিকতায় আমাদের সন্দেহ জাগতে পারে বৈ কী? তবু তাঁরা যদি বিভিন্ন সমস্যার নজির দেখিয়ে নিজেদের কর্তব্যচ্যুতিকে এড়িয়ে যেতে চান এই বলে যে, এতদিকে দৃষ্টি দিতে হচ্ছে যে, এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় পাইনি—সেই জন্যই এতদিন অপেক্ষা করবার পর নতুন করে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে ঘোমটার ভিতর যে খেমটা নাচ চলছে, তার প্রতি তাঁরা দৃষ্টিপাত করুন। অকর্মণ্য ও অযোগ্যদের দৌরাত্ম্যে বাঙ্গালী শ্রোতার দল যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন! শুধু শ্রোতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থজড়িত থাকলে নয় কিছু বলতাম না—এদের দৌরাত্ম্যের জন্য জাতির মহত্তর স্বার্থগুলিও অবহেলিত হচ্ছে। জাতির স্বার্থবিরোধী যে কার্য কলাপ চলছে—তার আশু প্রতিকার না করলে—যে মহাক্ষতির বোঝা জাতির ঘাড়ে চেপে বসবে—তাকে মাথায় করে অগ্রগতির পথে অগ্রসর হওয়ায় শুধু কষ্ট স্বীকারই করতে হবে না—তার চলার পথকে রুদ্ধ করেও দাঁড়াতে পারে। সেদিন হয়ত অনুশোচনারও সুযোগ থাকবে না।

কিছুদিন পূর্বে কলকাতা কেন্দ্রের কোন দায়িত্বশীল কর্মকর্তার সংগে আলাপ আলোচনা প্রসংগে শুনেছিলাম, কলকাতা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানলিপির একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হচ্ছে। এই পরিবর্তনে সংগীত ও অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষামূলক ও বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনাকেই বেশী স্থান দেওয়া হবে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে নির্দেশও নাকি তাঁরা পেয়েছিলেন। উক্ত দায়িত্বশীল সদস্যের এই উক্তিতে মনে একদিকে যেমনি আশার সঞ্চার হয়েছিল—অন্যদিকে তেমনি শংকার ভাবও যে উঁকি না মেরেছিল তা নয়। আশার ভাব মনে জেগেছিল এই জন্য যে, বেতারের সত্যকার রূপ এবার হয়ত দেখতে পাবো—বেতার-কেন্দ্র যে শুধু আনন্দ বিতরণের মাধ্যমই নয়—অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মনে শিক্ষার আলোক বিকিরণে—দেশের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে শুধু দেশবাসীর কাছেই নয়,
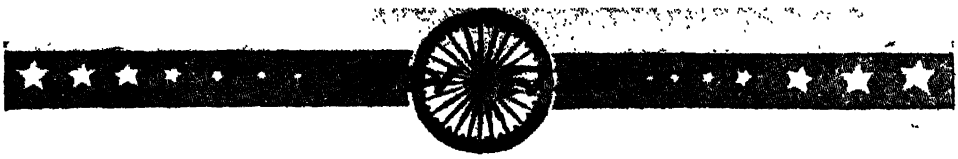
বৈদেশিকদের কাছেও তুলে ধরবার দায়িত্ব যদি সে গ্রহণ করে—তার চেয়ে আর সুখের বিষয় কী হতে পারে? আর শংকিত হয়ে উঠছিলাম এই জন্য যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছা হয়ত আছে কিন্তু তা অযোগ্যদের হাতে পড়ে আর রূপ-পরিগ্রহণ করতে পারবে না। প্রয়োজনের নাম নিয়ে এমন অপ্রয়োজনীয় বলা সুরু হবে—যার দৌরাত্ম্যে শ্রোতাদের কানের পরদা ফেটে গেলেও বিস্মিত হবো না। আজ সেই শংকাই মনে গেড়ে বসেছে। তাই আমাদের বর্তমানের এই আলোচনা।

বেতার কেন্দ্রের বর্তমান অনুষ্ঠানলিপির যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সে পরিবর্তন অনুষ্ঠানের বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে নয় –পরিবর্তন হয়েছে সময়ের। অর্থাৎ যেমন অনুরোধের আসর পূর্বে যে সময়ে নির্ধারিত ছিল, আজকাল তার পরিবর্তন করা হয়েছে--স্থানীয় সংবাদ এবং এরূপ আরো অনুষ্ঠানগুলিকে কেবল ৮টা থেকে ৯টা ৯টা থেকে ছ'টায় পরিবর্তিত করা হয়েছে! আর কোন পরিবর্তন হয়েছে বলেত আমাদের কানে বাজেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, কোন শ্রোতাই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না। বরং কতগুলি অনুষ্ঠান যা শ্রোতাদের হৃদয়গ্রাহী হতো, আজ কাল সেগুলি অশ্রাব্যরূপে বেজে ওঠে। বিশদভাবে সবগুলি নিয়ে এক সংখ্যায় আলোচনা করা হয়ত সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। তাই যতটা হয় উল্লেখ করে বাকীগুলি রেখে দেবো ভবিষ্যতের জন্য।

(১) অভিনয়ের আসর

বর্তমান রচনাটি লিখতে বসে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি—(গত বুধবার, ১৬ই জুন) অভিনয় আসরের সময় হয়ে এলো। শরৎচন্দ্রের অমর আলেখ্য 'বড়দিদি' অভিনীত হবে। তাই লেখা বন্ধ রেখে—অভিনয় শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলাম। বেতারজগতের (অনুষ্ঠান-লিপি) পাতার উপর চোখ বুলিয়ে গেলাম। দেখলাম: বড়দিদির বেতার নাট্য-রূপ দিয়েছেন নীলিমা দেবী, প্রযোজনা করবেন অতুল মুখোপাধ্যায় (সম্ভবতঃ প্রাক্তন-মেয়র দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র), রূপদান করবেন নীলিমা সান্যাল, বিকাশ রায়, মৃত্যুঞ্জয় বন্দোপাধ্যায়, লিলি ঘোষ, ছায়া মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর ভট্টাচার্য, মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়, জয়ন্ত চৌধুরী (সম্ভবতঃ অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর পুত্র এবং এর অন্য এক ভ্রাতা কোন একটি বিখ্যাত মাসিকের বেতার-সমালোচনার সংগে জড়িত)। নাট্যরূপদাত্রী এবং অভিনেতৃ সমাবেশের নমুনা দেখে মনটা আমার মত বহু শ্রোতাদেরই যে খিচড়ে গিয়েছিল—সেকথা উল্লেখ করবার কোন প্রয়োজন নেই। তবু, 'শোনাই যাকনা' এই মনোভাব নিয়ে নাট্যাভিনয়টি শুনতে বসলাম। নীলিমা সান্যালের পরিবর্তে শ্রীমতী মলিনার কণ্ঠ ভেসে এলো—একটু আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আশ্বস্ত ভাবটুকু আর জিইয়ে রাখা গেলনা। মলিনার অভিনয় নৈপুণ্যের জন্যও নয়। শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদির' অভিনয়ের অছিলায় বেতারের স্বয়ম্ভু অভিনেতৃবর্গ ও নাট্যরূপদাত্রী যে মহাসমারোহে বড়দিদির শ্রাদ্ধকার্য সমাপন করেছেন, ওদিন 'বড়দিদি'র অভিনয় যাঁরা শুনেছিলেন—সেই শ্রোতৃদলের প্রত্যেক জনই যে একথা স্বীকার করবেন--দৃঢ়তার সংগেই আমরা বলতে পারি। শরৎচন্দ্রের বহু চরিত্রকে মঞ্চে ও পর্দায় রূপায়িত করে যে অভিনেত্রী বাঙ্গালা চিত্র ও নাট্যামোদীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন, সেই শ্রীমতী মলিনার অবস্থা বোধহয় শ্রোতাদের চেয়েও শোচনীয়তর হয়ে উঠেছিল ওদিনকার পরিবেশের মাঝে। তাঁর মনেও ওদিন এই ভাবই জেগে উঠেছিল—'এত অভিনয় নয়—সবই যেন প্রহসনের নামান্তর মাত্র' এবং এই প্রহসনের কথা চিন্তা করেই হাসি ও বেদনায় তিনি যে ফেটে পড়ছিলেন—তাঁর মত সংযতশীলা অভিনেত্রীও এই মনোভাবকে অভিনয়ের ভিতর দিয়ে ফুটে উঠতে বাধা দিতে পারেন নি। প্রথম কথা, নাট্যরূপদাত্রী শ্রীমতী নীলিমা দেবীকে নিয়ে। তিনি নাট্যজগতে এমন কী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন যে, শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র নাট্যরূপ দিতে সাহসী হ'লেন? তিনি কী মনে করেন, বাংলার শ্রোতৃদল তাঁর চেয়ে কম নাট্য-রসিক?

সারা জীবন যাঁদের দেশলাম জাতীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও নাট্য-সাধনায় কাটিয়ে দিতে, তাঁরাও অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাহিনীগুলির নাট্যরূপ দিতে যেয়ে ভুল করে বসেন—আর শ্রীমতী নীলিমা দেবী বিনা সাধনায় সাহসী হ'য়ে উঠলেন শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি'র মত কাহিনীকে নাট্যরূপ দিতে। একে সাহস বলবো না—বলবো দুঃসাহস। জানিনা বেতারের নাট্য-বিভাগটীর দায়িত্ব কার হাতে আর তিনি কত বড় বোদ্ধা! এই বোদ্ধা ব্যক্তিটি কী নাট্যরূপটি অনুমোদন করবার সময় তার গুণাগুণ বিচার করে দেখেছিলেন? বেতারের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাইত দেখা উচিত। যদি দেখে থাকেন, তাহলে সেই বোদ্ধা ব্যক্তিটি নাট্য সম্পর্কে যে একটী মস্ত 'বুদ্ধু' সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেতারের অভিনয় আসরের এই বোদ্ধা বা 'বুদ্ধু' ব্যক্তিটিকে অপসারণ করে একজন সত্যিকারের নাট্যকার বা নাট্য-রসিককে তার স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। শুধু বড়দিদির নাট্যরূপেই এই 'বুদ্ধু' ব্যক্তিটির বুদ্ধির পরিচয় আমরা পাইনা—বেতারের বর্তমানে অভিনীত যে কোন নাটক-নাটিকা বা অনুরূপ কিছুতেই তার এই দুর্বুদ্ধির পরিচয় আমরা পাই। নাটক বা নাটিকা রচয়িতাদের ভিতর অবশ্য নতুন অনেক নাম পাওয়া যায়—কিন্তু ঐ নতুন নাম দেখেইত আর শ্রোতারা খুশী হ'তে পারেন না! নতুনদের সুযোগ দিতে হবে বলে রামা-শ্যামাকে ধরে আনলে চলবে না। যে নতুনদের ভিতর নাটক রচনার প্রতিভা রয়েছে, তাঁদেরই সুযোগ দিতে হবে, তাঁদেরই আবিষ্কার করতে হবে। এই আবিষ্কার তাঁর বা তাঁদের দ্বারাই সম্ভব, যিনি বা যাঁরা দীর্ঘদিন নাট্য-সাধনায় কাটিয়েছেন—গভীর গবেষণা করেছেন নাট্য-শিল্প নিয়ে। এমন কোন যোগ্য ব্যক্তিকেই বহাল করতে হবে বেতারের নাট্যবিভাগের জন্য। বেতার কেন্দ্রের নিজস্ব কোন প্রতিনিধি শুধু থাকবেন, তাঁকে সাহায্য করতে এবং তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে। এই প্রসংগে বেতার কর্তৃপক্ষ যাঁদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন, তাঁদের কয়েকজনের নামোল্লেখ কচ্ছি: নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, দেবনারায়ণ গুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, প্রমথ নাথ বিশী, মনোজ বসু, নরেশ মিত্র, নিতাই ভট্টাচার্য, বনফুল, তুলসী লাহিড়ী প্রভৃতি। আর অভিনয়াংশের জন্য শিল্পী নির্বাচনের ভারও এঁদের বা এঁদের সমপর্যায়ভুক্ত কারোর ওপর ছেড়ে দিতে হবে। চিত্রে বা মঞ্চে যাঁরা চিত্র এবং নাট্যামোদীদের শ্রদ্ধার্জন করেছেন। প্রধান প্রধান ভূমিকাগুলির জন্য তাঁদেরই গ্রহণ করতে হবে: যদি বেতার কর্তৃপক্ষ মনে করেন, তাঁদের নিজস্ব কর্তৃত্বাধীনে একটী অভিনেতৃগোষ্ঠী গড়ে তোলবার প্রয়োজন রয়েছে, সে ক্ষেত্রে প্রথমে একজন অতিরিক্ত নাট্যশিক্ষক বহাল করতে হবে। নাট্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য যখন কোন নাটক নির্বাচন করবেন—এই নাট্যশিক্ষক নাটকটি পড়ে নিয়ে চরিত্রোপযোগী ভূমিকালিপি তৈরী করে ফেলবেন প্রথমে—বেতার জগৎ মারফৎ বেতারের নিজস্ব অভিনয়গোষ্ঠী গড়ে তুলবার জন্য অভিনয়েচ্ছুক জনসাধারণকে আহ্বান জানানো হবে এবং তাঁদের থেকে যাঁদের গ্রহণ করা হবে—নাটকের ভূমিকালিপি বেতারের এই নিজস্ব অভিনেতৃগোষ্ঠী এবং চিত্র ও নাট্যজগতের অভিনেতৃগোষ্ঠীর মাঝে উপযুক্ততা বিবেচনা করে বণ্টন করে দিতে হবে। চরিত্রগুলি বণ্টিত হ'লে অভিনয় শিক্ষক তাঁদের নিয়ে রিহার্সেল দিতে বসবেন এবং নির্দিষ্ট অভিনয় সময়ের পূর্বে সমস্ত গোষ্ঠীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে তৈরী করে নেবেন। বেতারের এই অভিনয়-শিক্ষকের পদে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চেয়ে আর উপযুক্ত লোক কে আছেন!

'বড়দিদি'র অভিনয়ে একমাত্র ছোট বোনের ভূমিকাটি ছাড়া আর কোন চরিত্র সুঅভিনীত হয়নি। মলিনার কথা অবশ্য বাদ দিয়েই বলছি। কারণ, অভিনয়াংশের অন্যান্য নটরাজ ও নটপটিয়সীদের সংগে তাঁর নাম টেনে তাঁর প্রতিভার মর্যাদা হানি করতে চাইনা! এই যে অন্যান্য নটরাজ ও নটীপটিয়সীর দল, এদের দৌরাত্ম্য বেতারের বিভিন্ন বিভাগে শ্রোতাদের বাধ্য হ'য়ে সহ্য করতে হয়। এর ভিতর বিশেষ করে (১) মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (২) মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়

(৩) জয়ন্ত চৌধুরী এই নটরাজদের কথা বলতে চাই। বিকাশ রায় এবং লিলি ঘোষের নাম বাদ দিলাম বলে তাঁরা যে অভিযোগমুক্ত বা অভিনয়পটু বা পটিয়সী একথা যেন মনে না করেন, বিকাশ রায়ের অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় কিছুটা পেয়েছি, লিলি ঘোষও নিতান্ত অসহ্য নন। তবে কথা হচ্ছে, একাধারে ঘোষণা করা, গান গাওয়া এবং অভিনয় করা থেকে নিরস্ত থাকলেই শ্রীমতী ঘোষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবেন—নইলে দু'দিন বাদে যদি তিনি নীলিমা সান্যালের মত অসহ্য হ'য়ে ওঠেন—তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না—বর্তমানে শ্রীমতী সান্যালের উপদ্রব কিছুটা কমলেও, রবীন্দ্র সংগীতের শ্রাদ্ধকার্য থেকে আজও বিরত হ'তে পারেননি। যাক। এবার তিনজন নটরাজ সম্পর্কে কিছু বলি : (১) মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনয় এবং সংগীত আসরে এই প্রভুটির প্রভুত্ব—শুধু নিন্দনীয়ই নয়—অমার্জনীয়। ভজন গানের আসরে তাঁর ভক্ত-ভজানী পীড়া দেয়নি, এমন শ্রোতা বিরল। শুনতে পাই, বেতারে সংগীত অথবা অভিনয় আসরে যখন কাউকে গ্রহণ করা হয়—কণ্ঠস্বর পরীক্ষা করে নেবার নাকি একটা বিধি আছে। এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হ'য়ে ফিরে আসেন এমন বহুজনকে পাওয়া যাবে। এই ভদ্রলোকটীর কণ্ঠস্বর কোন শব্দধর পরীক্ষা করেছিলেন, বলতে পারিনা। তবে শিষ্যের প্রতি যে তাঁর অসীম করুণা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। (২) দু'ঃখের বলতে হয় মহীতোষ চট্টোপাধ্যায়ের কথা। বিরাট মহীকে সন্তুষ্ট করে যিনি পিতামাতার ঘর আলোকোজ্জ্বল করে আবির্ভূত হ'লেন—দীর্ঘদিন বেতার-কেন্দ্রে দৌরাত্ম্য করে তিনি একজন শ্রোতাকেও তোষণ করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। এর দৌরাত্ম্যপনা শুধু অভিনয় আসরেই সীমাবদ্ধ নয়—গল্পদাদুর আসরে কালোদা'র মুখোস পরে এর কালো কপটি ছোটদের সাদা মনগুলিকে যে কলংকিত করে তুলছে, বেতার কর্তৃপক্ষ তার প্রশ্রয় যে কী করে দেন, তা ভেবে অবাক হয়ে যাই! শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ই কী এই আসরটি পরিচালনা করবার পক্ষে যথেষ্ট নন! যদি তাঁর পক্ষে সমস্ত দিক দেখা সম্ভবপর না হয়ে ওঠে—তবে অন্য কোন খ্যাতিমান শিশু সাহিত্যিককে এ আসরে কেন বহাল করা হয় না? আমাদের অভিভাবকদের কথাও বলি—কার ছেলে বা মেয়ে বেতার মারফৎ একটু কথা বলবার সুযোগ পেল—বেতার জগতে তাঁদের শ্রীমান শ্রীমতীদের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হ'য়ে গেল—অমনি তাঁরা কৃতার্থ বনে গেলেন! দলে দলে তাদের ঠেলে পাঠাতে লাগলেন কালোদা-ভুলোদাদের যথেচ্ছাচারের মাঝে। প্রত্যেকটি পত্র-পত্রিকা এই কালোদাকে নিয়ে সমালোচনা করেছেন—জানিনা তিনি বিষল্যকরণীর মত কোন মহৌষধি প্রয়োগ করেছেন, যে জন্য বেতার কেন্দ্রের কাছে তাঁর বিরুদ্ধের সমস্ত অভিযোগ অমৃত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এই ভদ্রলোকটি আবার চিত্র জগতের দিকেও ধাওয়া করছেন। বেতার কর্তৃপক্ষের বধির কর্ণে পৌঁছেছে কিনা বলতে পারিনা—তবে আমাদের কানে ইতিমধ্যে যে অভিযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে, তাতে লক্ষণ খুব ভাল বলে মনে হচ্ছে না। প্রযোজক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে এর যাতায়াত নাকি দিনদিন বেড়েই চলেছে চলচ্চিত্রে সুযোগ পাবার উমেদারী নিয়ে এবং বেতারে তাঁর প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে—তাই তাকে সুযোগ দিলে সমালোচনাটা একটু নরম সুরে করে দেবার ব্যবস্থা করা যাবে, এরূপ প্রলোভনও নাকি দেখানো হচ্ছে! কথাটা যদি সত্য হয়—তাহ'লে তার গুরুত্ব যে কতখানি, আশা করি সে বিষয়ে বেতার কেন্দ্রের গুরু পদে আসীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি একটু চিন্তা করে দেখবেন। তবে ব্যাপারটা যে একেবারে অলীক নয়, তা মনে হলো সম্প্রতি বোসার্ট প্রডাকসনের 'প্রিয়তমা' চিত্রখানির সমালোচনা শুনে। বেতারের সমালোচনা যাঁরা শুনেছেন, রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত সমালোচনার সংগে মিলিয়ে নিয়ে তাঁরা এ বিষয়ে কিছুটা আঁচ করে নিতে পারবেন। বেতার কেন্দ্রের সমালোচনার সংগে আমাদের সমালোচনাকে তুলনা করে নিরপেক্ষ রায়ের ভার যে কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর হাতে আমরা তুলে দিতে পারি এবং এই রায় দানে বেতার কেন্দ্রের সমালোচনা যে প্রভাব মুক্ত নয়, তাও প্রমাণ করতে আমাদের বেগ পেতে

হবে না। অবশ্য একথাও বলবো, বেতারকেন্দ্র থেকে এই ধরণের প্রলোভন দেখিয়ে চিত্র জগতে যাঁরা আনাগোনা কচ্ছেন, তাঁদের মাঝে ইনিই অদ্বিতীয় নন—দল আরো ভারী। এই প্রসংগে প্রিয়তমার সমালোচক যে মস্তবড় একটা ভুল বলে এড়িয়ে গেলেন, তাও যে কর্তৃপক্ষের কানে বাধলো না সে কথাও উল্লেখ করতে চাই। সমালোচক পরিচালকের কথা বলতে যেয়ে মন্তব্য করেন যে, প্রিয়তমার পরিচালক নিউথিয়েটার্সের 'পরিণীতা' চিত্রখানি পরিচালনা করেন ইতিপূর্বে। যা সম্পূর্ণ ভুল। 'পরিণীতা' তিনি পরিচালনা করেছিলেন সত্য, তবে তা নিউথিয়েটার্সের নয়, পি, আর, প্রডাকসনের ছবি এবং তার স্বত্ব কোম্পানিটি ফিল্মস পরে ক্রয় করে নেন। এই চিত্রসমালোচনা প্রসংগেও যা আমাদের বলবার আছে, ভবিষ্যতের জন্য সেকথা রেখে দিলাম। কারণ, বর্তমান প্রসংগে তা অবান্তর—এবং আলোচনা প্রসংগে যেটুকু অবান্তর বলে ফেলেছি, সেজন্য আশা করি পাঠকসাধারণ ক্ষমা করবেন। (৩) তিন নম্বরের নটরাজ সম্পর্কে অভিযোগ অবশ্য পূর্বোক্ত দু'জনের মত মারাত্মক নয়—তবে তাঁর অন্তরের অভিনয়-স্পৃহাকে সংহত করলেই খুশী হবো। আর যে বিষয়ে তাঁকে সতর্ক করিয়ে দিতে চাই, তা হচ্ছে, স্বর্গত ইন্দু সাহার প্রেতাত্মা মাঝে মাঝে তাঁর ওপর ভর করা সুরু করেছে—অনুরোধের আসর বা এই ধরণের অন্যান্য আসরে রেকর্ড বাজাবার সময় বা কোন কথিকার সময় তাঁর মনের অব্যক্ত হাহুতাশ যেভাবে বেতার মারফৎ আমাদের কানে ভেসে আসে—এই ভেসে আসাটা তার বন্ধ করতে হবে। বর্তমান আলোচনায় অনেকখানি স্থান নিয়ে ফেললাম। তাই বর্তমান সংখ্যায় শুধু অভিনয় আসর এবং সেই প্রসংগে যেটুকু এলো, তাই বললাম—বেতারের অন্যান্য বে-তাল বলা নিয়ে যেটুকু বাকী রইল, তা আগামী বারের জন্য রেখে দিলাম।

—কালীশ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমতী পরাগ সরকার

অভিজাত বংশীয়া এই উচ্চ শিক্ষিতা প্রিয়দর্শনা তরুণীকে নরেশ মিত্র পরিচালিত এম, পি, প্রডাকসনের আগামী চিত্র 'বিদুষী ভার্যা'তে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে।

প্রাচীন-সংগীত

শ্রী যোগেশ চন্দ্র দাস

[রূপলাল হাউস, ঢাকা]

১। ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য

কোনও জাতির কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সেই জাতির শিল্প ধারার গতিবিধি, উৎপত্তি ও বিকাশ ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। কারণ, সুকুমার শিল্পের মধ্য দিয়াই এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়াই জাতির ভাবধারা প্রকাশ পায়। শিল্প বা আর্টের প্রধান কাজ ভাবের অভিব্যক্তি দান করা। এই মনোভাব প্রকাশের তারতম্যের উপরই শিল্পের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ভর করে এবং যে অনুপাতে কোনও শিল্প সূক্ষ্ম ভাব প্রকাশে সমর্থ হয়, সেই অনুপাতে সেই শিল্প উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সভ্য মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শিল্প বা আর্টের নানাপ্রকার শ্রেণী বিভাগ সম্ভবপর হইলেও শিল্পকে প্রধানতঃ আমরা দুই ভাগে ভাগ করিতে পারি। এক কারুশিল্প ও অপর চারুশিল্প। তক্ষণ-শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি কারুশিল্পের অন্তর্গত। এই শিল্পের অনুশীলনে শিল্পী সাধারণতঃ ভাব প্রকাশের দিকে ততটা লক্ষ্য না রাখিয়া বস্তুকে যথাসম্ভব সৌন্দর্য দান করিয়া মানুষের আবশ্যক প্রয়োজন পূর্ণ করিবার উপরই অধিকতর ঝোঁক দিয়া থাকেন।

আর চারুশিল্প বা ললিতকলা তাহার নাম—যাহা শব্দ, অংগ-ভংগী, রেখা ও বর্ণাদির দ্বারা একের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনোভাব অপরের নিকট প্রকাশ করে। এক এক জাতি এক এক প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক বেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া এক এক প্রকার মনের আলোকে জগতকে দেখিতে অভ্যস্ত। ইহার ফলে যে বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়, তাহাকে অবলম্বন করিয়া এক এক জাতি এক এক ভাবে গড়িয়া ওঠে এবং শিল্প ও সাহিত্যের ভিতর দিয়াও সেই ভাবকে প্রকটিত করিতে চেষ্টা করে। এক শ্রেণীর মানব এই পরিদৃশ্যমান নামরূপের জড়জগতকেই সর্বস্ব মনে করিয়া শিল্পের মধ্য দিয়াও সেই ভাবেরই অভিব্যক্তি দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রতীচ্যের শিল্প ধারার বিকাশে আমরা এই ভাবই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করি। আর অপর এক শ্রেণীর মানব এই দৃশ্যমান নামরূপের জগতের অন্তরালে লুক্কায়িত এক পরম রহস্যময় অতীন্দ্রিয় সত্তাকে জানাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা মনে করিয়া সেই ভাবকে শিল্পের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় সুকুমার শিল্পের ইতিহাসের ধারায় আমরা এই বিশেষত্বই বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতও তাহার সংগীত-সাধনার ভিতর দিয়া এই রহস্যময় অতীন্দ্রিয় ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইয়াছে। ইহার নিদর্শন পাই, ভারতের পুরাণ-সাহিত্যে। ইহার স্পষ্ট নিদর্শন পাই ভারতীয় দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনার মধ্যে। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবাদিদেব মহাদেবের সংগীত প্রভাবেই নারায়ণ বিগলিত দেহ হইয়া মর্ত্যধামে ত্রিলোক পাবনী গঙ্গারূপে প্রবাহিতা। আবার যখন লক্ষ্য করি, ভারতীয় কলালক্ষ্মী সরস্বতীর এক হস্তে বীণা ও অপর হস্তে পুস্তক—তখন আমাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, ভারতীয় ভাবধারা সংগীত ও সাহিত্য সাধনার ভিতর দিয়াই তাহার চরম শ্রেয় এবং প্রেয়কে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই, সংগীত সাধনা ভারতবাসীর পক্ষে শুধু অবসর বিনোদন নহে, সংগীত সাধনা ভারতবাসীর চরম শ্রেয়ের প্রাপক।

২। Classical Music সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, সংগীত সাধনা এক সময়ে ভারতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেও জাতির অবনতির সংগে সংগে ইহার সমস্ত গৌরব লুপ্ত হইয়া অধুনা ইহা অত্যন্ত হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অনেক শিক্ষিত লোকেরাও ইহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন।

(ক) Classical Music এর নাম শুনিলেই অনেকের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে মস্ত পাগড়ি, বড় বড় মোছ, ও অস্পষ্ট হিন্দি ভাষায় গোঙানি বা কান্নার আওয়াজ আর তবলার চটাপট শব্দ। যাহার সহিত বর্তমান যুগের মার্জিত রুচির যেন খাপ খাইতে চায় না! কিন্তু আমি সবিনয়ে

জিজ্ঞাসা করি, উচ্চ সংগীতের ইহাই কি প্রকৃত চিত্র? প্রথম কথা—ভাষার সহিত Classical Music-এর কোনও রক্তের সম্বন্ধ নাই। হিন্দিতে যেমন Classical Music হয়, বাঙলা, উড়িয়া, মারহাট্টি, মাদ্রাজী সব ভাষাতেই Classical Music-এর ঢং-এ গান গাওয়া যাইতে পারে। হিন্দি ভাষার প্রতি Classical Music-এর পক্ষপাতিত্ব শুধু এইজন্য যে, অন্যান্য ভাষায় তেমন উচ্চাংগের খেয়াল ও ধ্রুপদ এখনও তেমন রচিত হয় নাই। বাংলায় কিন্তু সেই অপবাদও দেওয়া চলে না। বাংলায় নিধু বাবুর টপ্পা আছে, উচ্চ তালমানসংযুক্ত ব্রহ্ম-সংগীত আছে, অতুলপ্রসাদের ঠুংরী আছে। আমরা যে গানের আসরে হিন্দি ছাড়া গাই না, ইহা শিল্পীর দোষ, Classical Music-এর দোষ নয়।

তারপর বেশভূষার কথা সম্পূর্ণ অবান্তর। এখন যখন শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন বাঙালীচিত্ত উচ্চ সংগীতের দিকে উন্মুখ হইয়াছে, তখন বেশভূষাও যে ক্রমশঃ সুরুচিসম্পন্ন হইবে ইহাতে আর কথা কি? আসল কথা বেশভূষা বা বাইরের আবেষ্টনীর অন্তরায় বড় অন্তরায় নয়। আসল অন্তরায় ভিতরের। বিবেকানন্দ একটা বড় সত্য প্রচার করিয়াছিলেন—যখন তিনি বলিয়াছিলেন, চালাকীর দ্বারা কোন মহৎ কার্য সাধিত হয় না। আমরা এখন সর্বদাই short-cut খুঁজি। উচ্চ-সংগীত সাধনা ফাঁকি দিয়া চলে না, ইহা অতি সত্য কথা। কারণ, শুধু সংগীতই নয়, কোনও উচ্চাংগের শিল্পই নিরলস সাধনা ব্যতীত হইতে পারে না।

(খ) আরও একটি গুরুতর বিষয়ে Classical Music সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকের মনে এখনও একটি ভ্রান্তি ধারণা আছে। তাহারা মনে করেন, Classical Music সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো এক অচল, অনড় জিনিষ। বর্তমান যুগে যাহার সার্থকতা মোটেই নাই। ইহার সাধনা শুধু যে পণ্ডশ্রম তাহাই নয়, এ শুধু পুরাতনের পুনরাবৃত্তি। কারণ, Classical আমাদের কাছে দাবী করে নিখুঁত পুনরাবৃত্তি।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, Classical Masic কি শুধু পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি? শুধুই কি তানসেনের গানের উপর আমরা দাগা বুলাতেছি। রাগ-রাগিনীর বিস্তার বিষয়ে নূতন রাগ, নূতন ছন্দ, নূতন ঢং সৃষ্টি করিবার পথে স্বাধীনতা কি আমাদের কিছুই নাই? পাঠান সম্রাট মহম্মদ শাহ রংগীলার দরবারে সদারঙ্গ "চামেলি ফুল চম্পা" গাহিয়া যে রূপ ও ভাবের অভিব্যক্তি দান করিতেন, আমরা যখন সেই গান করি, তখনও কি 'হুবহু' সেই ভাবই ফুটিয়া উঠে, না আমি নিজের কল্পলোক সৃষ্টি করি? স্বীকার করি, গানের সুর ও কথা সেই সদারঙ্গের সময়েরই আছে, কিন্তু সুরের কল্পলোক সৃষ্টিতো নিজস্ব। সুরের বিস্তারের বেলায় আমি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি স্বীকার করিব কেন? তারপর বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরের সময় পর্যন্ত Classical Music-এর রূপ কি সমানই আছে? কখনই নয়। সংগীত ও সাহিত্য জাতির জীবনের ধারা ও রুচি অনুসারে গড়িয়া উঠে। সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিষ। প্রাণ যেমন চঞ্চল, সংগীতের ধারাও তেমনি পরিবর্তনশীল। বৈদিক সামগানের কথা তুলিবো না, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ভরতমুনির নাট্য শাস্ত্রের কথাও তুলিবো না। কারণ, সেই সময়ের সংগীতের পরিচয় আমাদের বাস্তবিকই বড় ক্ষীণ। এমন কি সংগীত রত্নাকরের গ্রন্থকার ত্রয়োদশ শতাব্দীর শার্ঙ্গদেব যদি গোয়ালিয়রে বসে লঘু খাঁ, হচ্চু খাঁ, হস্সু খাঁর বিলম্বিত খেয়ালের চাল শুনিতেন, তিনি কখনই তাহাকে Classical Music বলে মানিয়া লইতে পারিতেন না।

ষোড়শ শতাব্দীর মিঞা তানসেন যদি আজ আমাদের স্বর্গতঃ গিরিজা বাবুর গলায় ঠুংরী গান শুনিতেন,তাহা হইলে তিনিও ঠুংরীকে classical গান বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেন না। দৃষ্টান্তের পরিধি আর বাড়াইবো না। আমার বলার কথা এই যে, যাকে আমরা এখন Classical Music বলি, তা অচল অনড় অচলায়তন নয়, ইহা যেহেতু প্রাণবন্ত জিনিস, সেই হেতুই ইহা সদা পরিবর্তনশীল। কিন্তু সদা পরিবর্তনশীল হইলেও ইহার ঔপপত্তিক অর্থাৎ Theory অংশ কিন্তু একই ঐতিহ্যকে মানিয়া চলিয়া আসিতেছে। সংগীতের পরিভাষার নায়কি ঢং স্থির থাকিলেও গায়কি ঢংএ যুগে যুগে পরিবর্তন চলিয়া আসিতেছে। এই কথাটা আরও পরিষ্কার ভাবে আমরা বুঝিতে পারিব যদি আমরা ভারতীয় সংগীতে বিবর্তধারার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করি।

ভারতীয় সংগীতের আরম্ভ কবে, এ জিজ্ঞাসা উঠিলেই আমরা বলিয়া ফেলি, সামবেদ হইতে। আমি বলি, সামবেদই বা কেন আদি হইবে, সামবেদের পূর্বে কি ভারতীয় সভ্যতা বলিতে কিছু একটা ছিল না? আমি বলিতে চাই, সভ্যতা যতদিনের, সংগীতও ততদিনের! সংগীত ছাড়িয়া সভ্যতার কোনও অর্থ নাই। অবশ্য সামবেদের সময় ভারতীয় সংগীত বোধ হয় একটা সুপ্রণালীবদ্ধ সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং গন্ধর্ব বেদে বোধ হয় তাহার ঔপপত্তিক অংশও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সামগানে ব্যাবহৃত স্বরের শ্রুতি পরিমাণ লৌকিক সংগীতের মতই ছিল কি না, একথা আমরা বলিতে পারি না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের নজির তুলিব না। কারণ, সে বই আমি এখনও চোখেই দেখি নাই, কোনও উধৃতাংশও আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তবে এ কথা বলা চলে, মুসলমান সভ্যতা ভারতে আমদানী হইবার পূর্বেই হিন্দুদের সংগাত কি ঔপপত্তির দিক দিয়া, কি প্রকাশের দিক্ দিয়া এক সুপ্রণালী-বদ্ধ সংগীত বিজ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল এবং সেই সংগীতকে তাঁহারা দুই ভাগে ভাগ করিয়াছিলেন। এক প্রকার চাল বা ঢংকে তাঁহারা তখন গন্ধর্ব বলিতেন আর এক প্রকার চালকে তাঁহারা গান বলিতেন। যে সংগীত ধারা অনাদি অর্থাৎ বেদের মত অপৌরুষেয়, গন্ধর্বগণ যাহা গান করিতেন এবং যে সংগীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষ, সেই গীতকে তাহারা গন্ধর্ব বলিতেন। আর যে গীত সংগীত পটু বিদ্বানেরা নিজেদের বুদ্ধি সামর্থ দ্বারা রচনা করিয়া দেশী রাগাদিতে লোক রঞ্জনের জন্য গান করিতেন, তাহাকে তাঁহারা "গান" বলিতেন। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি, ভারতে একটা সংগীত ধারা বৈদিক সময় হইতেই প্রণালী-বদ্ধ হইয়া চলিয়া আসিতেছিল তাহাকে অতি প্রাচীন কালে গান্ধর্ব বিদ্যা বলা হইত, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর লাভ, শুধু ক্ষণিকের চিত্ত বিনোদন নয়। আর ঠিক তার পাশাপাশি আর এক প্রকার গান ছিল, নানা-প্রকার দেশী রাগে রচিত, যাহার উদ্দেশ্য ছিল লোকরঞ্জন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রধান সংগীত নায়ক শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত রত্নাকর' নামে একখানা খুব প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। মুসলমান সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগার পূর্বে ভারতীয় হিন্দু সংগীত কি রকম ছিল তার একটা আভাস আমরা এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। রত্নাকর গ্রন্থের টীকাকার কল্লিনাথ বলেন, পূর্বোক্ত গান্ধর্ব ও গানকেই পরবর্তীকালে যথাক্রমে মার্গ ও দেশী সংগীত বলা হইত। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও মার্গ সংগীতের অধিক প্রচলন ছিল; শার্ঙ্গদেবের সময়ও তখনকার প্রচলিত ঢং-এ দেশী সংগীতই গাওয়া হইত। সেই দেশী সংগীতের সংগে কিন্তু আধুনিক প্রচলিত হিন্দুস্থানী পদ্ধতির সংগে কোনও সাদৃশ্য নাই। যাঁহারা মার্গ সংগীতকেই Classical Music বলিতে চান, তাঁহারা একটা মস্ত ভুল করেন এই যে, মার্গ সংগীত যে কি জিনিস তাহা আমরা কিছুই জানিনা, এক নাম জানা ব্যতীত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের সময়ও দেশী সংগীতকেই Classical Music বলা হইত। এই সংগীতের রূপ ছিল দুই রকম। এক নিবদ্ধ রূপ, যাহাকে শার্ঙ্গদেবের সময় বলা হইতো "প্রবন্ধ" ইহাতে এখনকার দিনের ধ্রুপদের মত ভাগ বা অবয়ব থাকিত, তখনকার দিনে এই অবয়বগুলির নাম ছিল উদ্‌গ্রাহ, মেলাপক, ধ্রুব ও অন্তরা। এখন যেমন আমাদের ধ্রুপদে থাকে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ। আর এক প্রকার গান ছিল, 'অনিবদ্ধ' যাহাকে বলা হইত আলপ্তি। ইহাই ছিল খুব সম্ভব আমাদের বর্তমানকালে প্রচলিত আলাপের পূর্ব রূপ। এতগুলি কথা বলিবার প্রয়োজন হইল এই যে, Classical সংগীত মান্ধাতার কালের অচলায়তন নয়, তাহা যে যুগে যুগে লোকের রুচি অনুযায়ী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া আসিতেছে, ভারতীয় সংগীত ধারার ক্রম পরিবর্তনশীল ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ করা। এককথায় মুসলমানগণের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের রূপ ছিল আলপ্তি এবং প্রবন্ধ গীত। মার্গ সংগীত বা strictly classical বলিতে যাহা বুঝাইত, তাহা বহুদিন হইতেই ভারতে লোপ পাইয়াছিল। এখন যাহাকে আমরা হিন্দুস্থানী গায়ন-পদ্ধতি বা classical music বলি, তাহা হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সভ্যতার মিলিত অবদানের এক মধুর ফল। এক classical
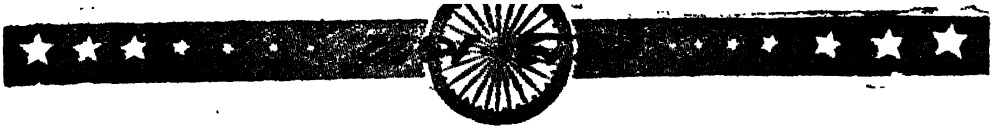
music-এর বেলাতেই দেখিতে পাই যেখানে কোনও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নাই। মুসলমান ও হিন্দুগুণী উভয়ে মিলিয়া এই সংগীত ধারাকে বিচিত্র রসে ও রূপে রূপায়িত করিয়াছে। মুসলমানগণ বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ভারত যেমন হিন্দুর মাতভূমি, মুসলমানগণেরও এখন সেই রূপই মাতৃভূমি। ভারতীয় সভ্যতা মুসলমানগণেরও সভ্যতা। ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই ভারতীয় সংগীত কলার ইতিহাসে।

খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাঠানরাজ সুলতান আলাউদ্দীন তোগলকের সময়ে বিখ্যাত সংগীত শিল্পী ও পারস্য কবি আমির খসরু ভারতে আগমন করেন। তিনি ভারতীয় সংগীত শ্রবণ করিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তিনি শ্রদ্ধার সহিত ভারতীয় সংগীত শিক্ষা করিয়া ভারতীয় সংগীতকে এক নব রূপে ও ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন।

তিনিই ভারতীয় সংগীতে প্রথম পারস্য ঢং ও সুরের প্রবতন করেন। এই জন্য ভারতীয় সংগীতকলার ইতিহাসে আমির খসরুর নাম চির স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি পারস্য দেশের কতকগুলি গাইবার ঢং যেমন তেড়ানা, কাওয়াল, গুল্‌নকৃস, কল্‌বানা প্রভৃতি প্রবর্তিত করিয়া হিন্দু সংগীত ধারাকে অপূর্ব বৈচিত্র্যে, হৃদয়গ্রাহী রসে ও রূপে সঞ্জীবিত করিয়া তোলেন। তিনি কতগুলি নূতন রাগেরও সৃষ্টি করেন। যথা ইমন, গাঢ়া, সরপরদা, জিলা প্রভৃতি। তারপর খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে আসিলেন সম্রাট আকবর। তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী সম্রাট ছিলেন। সংগীতে তাঁহার অনুরাগও ছিল অপরিসীম। তাঁহার সময়েই সংগীত নায়ক তানসেন সংগীতের ধ্রুপদ পদ্ধতিকে এক অপূর্ব সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। তখন পর্যন্ত আলাপ এবং ধ্রুপদ সংগীতই Classical বলিয়া গৃহীত হইত। "খেয়াল" তখনও সংগীতের আসরে অবতীর্ণ হয় নাই। খেয়াল আসিল মুসলমান নরপতি মহম্মদ শাহ রঙ্গীলার সময়। সদারঙ্গ, অদারঙ্গ, সুলতান হুসেন, শর্কি প্রভৃতি গুণিগণ খেয়াল গানকে লোকপ্রিয় করিয়া তোলেন। মহম্মদ শাহ শুধু সংগীত রসিক ছিলেন না, তিনি নিজেই ছিলেন একজন সংগীতকার। "রঙ্গীলা" নামেই তাঁহার পরিচয়। তাঁহার নিজের রচিত অনেক খেয়াল এখনও Classical-music-এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন। খেয়ালের পর আসিল টপ্পা। ইহাও মুসলমানের দান। বিখ্যাত সংগীতকার গোলাম নবি ওরফে শোরী মিঞা এই অপূর্ব চালের প্রবর্তক।

টপ্পার পর ঠুংরী চালের সৃষ্টি। লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত নবাব ওয়াজাদ্ আলী সাহ ঠুংরী ঢং-এর প্রবর্তক। আজকাল Classical-music বলিতে আমরা সাধারণতঃ আলাপ, ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, তেড়ানা, চতুরঙ্গ ও সারেগমকেই বুঝিয়া থাকি। ইহার সহিত প্রাচীন পদ্ধতি প্রবন্ধ-সংগীতের কোনও আদর্শই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। Classical music যে অচলায়তন নহে, ইহা যে যুগে যুগে লোক-রুচির ও জীবন যাত্রার গতিকে অবলম্বন করিয়া পরবর্তিত হইয়া আসিতেছে, সংগীতের ইতিহাস কি এই সত্যকেই পরিস্ফুট করিয়া তোলে না? এই জন্যই—আমি পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম, Classical music সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজেও এখনও অনেক ভ্রান্তি আছে।

আমার বক্তব্য আর বাড়াইব না। সংগীত শুনিতে যতই হৃদ্য হউক, সংগীতের প্রবন্ধ যে অত্যন্ত নিরস তাহা আমি জানি। আপনাদের ধৈর্যকে যে এতক্ষণ অযথা পীড়ন করিয়াছি, এজন্য ক্ষমা চাই। ইহাতে আপনাদের চিত্ত উচ্চ-সংগীতের দিকে যদি একটুখানি উন্মুখও হয়, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সার্থক মনে করিব।

বেতারের গানের কথা

জয়শ্রী বসু

গান গাওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই যে, সে গান কেউ শুনবে ; অর্থাৎ গান শোনাবার জন্যেই গান গাওয়া। পাখীরা যে গান গায়, তা তারা নিজের আনন্দেই গায়, না আমাদের শোনাবার জন্য, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, কেন না পক্ষী-তত্ত্ব যদি বা বুঝতে পারি, পক্ষীদের মনস্তত্ত্ব মাথায় ঢুকবে না। আমি বলছি মানুষের গানের কথা।

আমি গান গাইতে জানিনা, শুনতে ভালবাসি। তাই রোজই বেতারের গান শুনি, আনন্দ পেতে চেষ্টা করি, কিন্তু আনন্দ কদাচিৎ পাই। সেই দুঃখেই এ প্রবন্ধ লিখতে বসেছি।

রবীন্দ্র-সংগীত রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকেই চলতি। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর এর অত্যন্ত বেশী রকম বাড়াবাড়ি সুরু হয়েছে বলে মনে হয়। এই অতি ভক্তি বা অতি উৎসাহের ফলে তাঁর গানগুলো তো গাওয়া হচ্ছেই, কবিতাগুলোকেও গান বানানো হচ্ছে। "কৃষ্ণকলি" গান হয়ে গেছে ; "ভ্রষ্টলগ্ন" হয় তো শীগগীরই হবে, যদি ইতি-মধ্যে আমার অজানিতে হয়ে না থাকে, হয়তো কোনোদিন বেতারে এও শুনতে পাবো "অল্ ইণ্ডিয়া রেডিও।...... এবারে অমুক চন্দ্র অমুক রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে শোনাচ্ছেন। ইনি প্রথমে গাইছেন হিং টিং ছট্। গানখানার প্রথম কয়েকটি হচ্ছে......"

এমন কি আমার ভয় হয়, এভাবে কবিগুরুর কবিতাগুলো শেষ হয়ে গেলে পর সেই দূর ভবিষ্যতে যদি রবীন্দ্রনাথের ধোপার হিসেবের খাতা আবিষ্কৃত হয়, তাহলে সেই খাতা থেকে এক এক দিনের কাপড়, জামা, চাদর, তোয়ালে, রুমাল প্রভৃতির ফর্দও রাবীন্দ্রিক সুর দিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত বলে গাওয়া হবে।

আরেকটী কথা এই যে, উপযুক্ত কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীতের যেমন তুলনা নেই, অনুপযুক্ত কণ্ঠে গাওয়া রবীন্দ্র-সংগীত তেমনি অসহ্য—অন্ততঃ অসহ্যবোধ হওয়া উচিত ; আমার তো হয়। রবীন্দ্র-সংগীত যেন গানের জগতে পতিতপাবন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার গলায় সুর নেই, মাথায় তাল ঢোকে না, অথচ গাইয়ে হবার সখ প্রাণে আছে প্রচুর, তিনিই ধরেন রবীন্দ্র-সংগীত। তাই এত অশ্রাব্য রবীন্দ্র-সংগীতের ছড়াছড়ি। এই অবাঞ্ছনীয় ছড়াছড়ি বন্ধ করবার জন্য এতই কড়াকড়ি থাকা দরকার যে, যার খুশী সেই ইচ্ছামত বেতারে বা অন্যত্র রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে পারবে না। আগে পরীক্ষা দিতে হবে গান গেয়ে, গাওয়া ঠিক হলে পাবে লাইসেন্স বা অনুমতি-পত্র। সেই অনুমতি-পত্র যার না থাকবে, সে রবীন্দ্র-সংগীত গাইতে পারবে না।

অনেকে বলেন, রবি ঠাকুরের গান গাওয়া সহজ। আমি বলি, অত সহজ বলেই তো অত কঠিন। এ গানে উচ্চাঙ্গ মার্গ সংগীতের কঠিন কালোয়াতি নেই, আছে স্নিগ্ধ সরল মাধুর্য। কিন্তু ঐ জিনিষটী সার্থকরূপে ফুটিয়ে তুলতে হলে কণ্ঠে থাকা চাই সুর এবং দরদ, মনে থাকা চাই কাব্যবোধ।

এক একবার আমার মনে হয়েছে, হিন্দুস্থানী কালোয়াতীতে সাধা গলা যাদের, তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীত ভালো গাইতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের পক্ষে বিপদ এই যে, প্রতি পদে তাঁদের ইচ্ছে হবে, এইখানটাতে একটু ওস্তাদি মোচড় দিই, এইখানটায় একটা তান ছাড়ি, এখানে একটা তেহাই দিয়ে এসে পড়ি শমে, যেমন হয়ে থাকে হিন্দি খেয়াল বা ঠুংরীতে। ফলে গানের ভাব-মাধুর্য—রবীন্দ্র-সংগীতের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ—যাবে নষ্ট হয়ে। কিন্তু এ সব প্রলোভন একবার কাটিয়ে উঠতে পারলেই আমার মনে হয়, এঁরা রবীন্দ্র সংগীতের ভাল শিল্পী হতে পারেন। কেননা, স্বর-সাধনার ভিৎ এঁদের পাকা হয়ে আছে। এম-বি পাশ করে যাঁরা অ্যালোপ্যাথির মিক্‌চার আর ইনজেক্‌শনের মোহ কাটিয়ে উঠে হোমিও-প্যাথির সাধনা করেন, তাঁরা যেমন সাধারণতঃ ঢের বেশী ভাল হোমিওপ্যাথ হ'তে পারেন হাতুড়ে হোমিওপ্যাথের চাইতে।

আমার মতে রবীন্দ্র সংগীতের যে আবেদন, সেটা বিশুদ্ধ সংগীতের আবেদন নয়, সে আবেদন হচ্ছে কাব্য-রসের আর সুরের আবেদনের রাসায়নিক মিশ্রণ। ঠিক কতটুকু

ভালো লাগ্‌লো সুরের জন্য, আর কতটুকু ভালো লাগ্‌লো কথার জন্য, তা নির্ণয় করা কঠিন--হয়তো বা অসম্ভব।

তারপর আধুনিক গান। আধুনিক গানের কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ দিয়েছেন কিনা জানি না। তবে আধুনিক গান বলে যে সব গান আজকাল গাওয়া হয়ে থাকে, তার অধিকাংশের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর্‌লে এই মনে হয় যে, বাংলা গানের জগতে 'আধুনিক' কথাটার মানে হচ্ছে 'অশ্রাব্য' বা 'বিরক্তিকর'। আধুনিক গান গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গান গাওয়ার চাইতে অনেক বেশী সহজ, কেন না তাতে স্বাধীনতা অনেক বেশী। এ গান গাওয়া হ'য়ে থাকে প্রায় ষোল আনা ক্ষেত্রেই দাদরা বা কাহার্‌বা তালের ছন্দে, এই তাল দুটীই তাল-সমাজে সব চেয়ে সোজা বলে। তবু এ তালে গাইতে গিয়েও বেতাল হয়ে পড়েন, এমন গাইয়েরও অভাব দেখিনা আজকাল। এরা গান না শিখেই গান শোনা-বার জন্যে ব্যস্ত। এদের হয়তো ধারণা, এরা ভাল গান করেন অথবা হয়ত মনে করেন, গান শুনিয়ে নাম হলেই হলো--সেটা সুনাম বা বদ্‌নাম, যা-ই হোক্‌ না কেন। বাংলার যে সব পুরুষ শিল্পী আধুনিক বাংলা গান গেয়ে শোনান, তাদের অনেকের গান শুনে মনে হয়, বাংলার ছেলেরা খেয়ালী হয়ে গেছে এবং তারই ছাপ পড়েছে আধুনিক বাংলা গানে। সুরে গাইবার ভংগীতে এবং কণ্ঠস্বরে নেই সজীব বলিষ্ঠতা। এ ক্ষেত্রেও মনে হয় বড় কারণই হচ্ছে, উপযুক্ত কণ্ঠ চর্চার অভাব, সাধনার অভাব, অল্প শিখেই আসর মাৎ করবার ঝোঁক। আমরা নাকি অত্যন্ত চালাক জাত, তাই নিষ্ঠা এবং সাধনার প্রয়োজন বোধ করি না, মনে রাখি না, স্বামী বিবেকানন্দের মহৎ বাণী, "ফাঁকি দিয়া কোনো মহৎ কাজ সিদ্ধ হয় না।'

বেতারে আধুনিক গান শুন্‌তে শুন্‌তে এত বিরক্তি এসে গেছে যে, এইবারে আধুনিক গান সুরু হবে শুনলেই ইচ্ছা হয়, রেডিও সেট্‌টী বন্ধ করে রাখতে। গান গাইবার ছলে অপটু কণ্ঠে বাংলা কবিতার সুরেলা (অথবা বে-সুরেলা) আবৃত্তি আর সহ্য হয় না। বেতারে আধুনিক গান শোনাবার ছাড়পত্র অত্যন্ত সুলভ হয়েছে দেখ্‌তে পাচ্ছি, এসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ একটু কঠোর হলে সেটা প্রথমে অনেক সংগীত যশোপ্রার্থীর মনোকষ্টের কারণ হবে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাতে ফল ভালো হবে। কেন না গানের মান (standard) বাধ্য হয়েই অর্থাৎ নিজের গরজেই উন্নত হবে, শ্রোতারাও অনেকখানি যন্ত্রনা থেকে রেহাই পাবেন।

আধুনিক গানের চাইতে আভিজাত্যে একটু উঁচু হচ্ছে রাগপ্রধান গান, অর্থাৎ সংগীত-শাস্ত্রে প্রচলিত রাগের ওপর ভিত্তি করে যে গানে সুর দেওয়া হয়েছে।

এ জাতীয় গান গাওয়ার সুবিধা আছে। গায়ক (অথবা গায়িকা) আত্মপ্রসাদ বোধ কর্‌তে পারেন এই ভেবে যে, আধুনিক গানের চাইতে উচ্চতর স্তরের সংগীত তিনি গাইছেন, কিন্তু বিশুদ্ধ রাগ-সংগীত গাইতে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন, তা এতে নেই।

এরও ওপরে ধরা যাক বাংলা খেয়াল ও বাংলা ঠুংরীর কথা। আমি যতদূর জানি, এ জিনিষ স্বর্গীয় সংগীতাচার্য জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীই সত্যিকারের জনপ্রিয় করে তোলেন তাঁর অপূর্ব মাদকতাময় কণ্ঠমাধুর্যে এবং চমৎকার গাইবার ভংগীতে, যার ফলে গ্রামোফোন রেকর্ড জগতেও তাঁর 'একি তন্দ্রা বিজড়িত আঁখিপাত' (মালকোষ), 'আমায় বোলো না ভুলিতে বোলো না' (বেহাগ), 'দামিনী দমকে' (জয়জয়ন্তী), 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়' (দরবারী কানাড়া) প্রভৃতি গানগুলির প্রচুর চাহিদা হয়েছিল। গোঁসাইজীর পরে বাংলা রাগ-সংগীতে শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু এঁদের পরে আর কেউ বাংলা রাগ-সংগীত সত্যিকারের শুনবার মত ক'রে গাইতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না।

একথা কোনো সংগীত রসিক অস্বীকার করবেন না আশা করি যে, খেয়াল বা ঠুংরী গানের পক্ষে হিন্দি ভাষা যত উপযুক্ত, বাংলা ভাষায় তত নয়—এর কারণ হচ্ছে, দুটী ভাষার উচ্চারণ পদ্ধতির বিভিন্নতায়। সুতরাং বাংলা গানকে খেয়ালের (বা ঠুংরীর) ছকে ফেলে গাওয়া একটু শক্ত। হিন্দি রাগ-সংগীতে কথাকে কোনো আমলই দেওয়া হয় না, কথা শুধু সুরের বাহন মাত্র। কিন্তু বাংলা গান আপনি যখনি ধরলেন—হোক্ না সে রাগ-সংগীত—তখনি বাঙালী শ্রোতামাত্রেই ঐ গানের কথাকে খানিকটা আমল দেবেই; না দিয়ে পারবে না, কেন না বাঙালী জাতটাই কাব্য-প্রবণ। সুতরাং হুবহু হিন্দি খেয়ালের অনুকরণে যদি আপনি বাংলা খেয়াল গেয়ে শোনান, তাহ'লে তা বিসদৃশ শোনাতে বাধ্য। একটা নমুনা দিচ্ছি। ধরুন বাহার রাগের একটি হিন্দি খেয়াল আপনি গাইছেন 'অব মোরি লাগত'। নানারকম তান প্রভৃতি করে আপনি তেহাই দিলেন 'অব মোরি লা, অব মোরি লা, অব মোরি লাগত……'। সেটা তত খারাপ লাগবে না। কিন্তু ঐ ছকের বাংলা গান যদি হয় 'মম কুঞ্জ বনে কে গো আসিলে' এবং আপনি যদি এভাবে তেহাই দেন 'মম কু—, মম কু—, মম কুঞ্জ বনে……' তাহলে সেটা হাসির উদ্রেক করবে—অন্তত করা উচিত। অন্তত আমি তো আপনার তেহাই পর্যন্তও অপেক্ষা করবো না। দোহাই পর্যন্ত (অর্থাৎ মম কু মম কু পর্যন্ত) শুনেই হেসে ফেলবো। কিন্তু ভারী দুঃখের বিষয়, বাংলা খেয়াল যাঁরা গান, তাঁরা এই অতি সহজ কথাটা বোঝেন না বা মনে রাখেন না। হিন্দি খেয়ালের মাছিমারা নকল করে তাঁরা বাংলা খেয়ালের বাংলাত্ব আর খেয়ালত্ব দু'য়েরি গঙ্গাযাত্রা করান। তাঁরা ভুলে যান যে, বাংলা খেয়াল হওয়া উচিত হিন্দি খেয়ালের হুবহু তর্জমা নয়, ভাবানুবাদ।

সর্বশেষে আমাদের বাঙালী গাইয়েদের গাওয়া হিন্দি খেয়াল ও ঠুংরী গানের প্রসংগে আসা যাক। হিন্দি খেয়াল ঠুংরী সত্যি ভালো গাইতে পারেন এহেন শিল্পী আমাদের ভেতর যাঁরা আছেন, তাঁদের গোনা যায় এক হাতের আঙুলের ডগায়—তাও সবগুলো আঙুলের দরকার হয় না। উচ্চাঙ্গ সংগীতের উচ্চাঙ্গ সমাজদার আমি নই সত্য, কিন্তু সত্যিকারের ভালো শিল্পীর গান শুন্‌তে ভালো লাগে। তাই বাঙ্গালী খেয়াল আর ঠুংরী গাইয়েদের গানে যে সব ত্রুটি আমাকে দুঃখ দিয়েছে, তাঁদের কথা বল্‌বার অধিকার আমার আছে বলে মনে করি। একনম্বর, উচ্চারণ বিকৃতি। একই গান শুনেছি পশ্চিম ভারতীয় এবং বাঙ্গালী গায়কের মুখে। কণ্ঠে দক্ষতা সমান থাকা সত্ত্বেও, শেষোক্ত গায়কের গান খারাপ লেগেছে হিন্দি-বাণীর অ-হিন্দি উচ্চারণের জন্য। দু'নম্বর ইচ্ছাকৃত অনুচ্চারণ। হয় তো গানের সুরটুকু শুধু মক্‌সো করে তুলেছেন, কিন্তু কথাগুলো ঠিক তুলতে পারেন নি। পাছে উচ্চারণ করলে ভুল ধরা পড়ে যায়, সেজন্য মনে হয় ওপরে নীচে দু'পাটি দাঁতের এক পাটিও নেই। আছে শুধু মাড়ি। এভাবে ফাঁকি বাজি করে বোকা শ্রোতাকে ঠকাবার চেষ্টা না করে গানের কথাগুলো এবং তাদের শুদ্ধ উচ্চারণ জেনে নিলেই তো হয়! অথবা যে গানের বাণী জানা নেই ঠিকমত, সে গান না গাইলে হয়। তিন নম্বর, একবার গান ধর্‌লে আর থামবার নামটি নেই। এদিকে শ্রোতার হয়তো কান ঝালাপালা এবং প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে। যাক্, অনেক অপ্রিয় সত্য বলা গেল—অপ্রিয় বলে নয়, সত্য বলে। এর ফলে গাইয়েদের মনে একটু যদি দোলা লাগে, তাহলে আমার এই প্রবন্ধ লেখা সার্থক মনে করব।

জোসেফ আর্থার র‍্যাঙ্ক

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিলাতী চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমান কর্ণধার হলেন ৬৯ বৎসর বয়স্ক জোসেফ আর্থার র‍্যাঙ্ক। তাঁহার পিতা ছিলেন ইয়র্কসায়ার নিবাসী লক্ষপতি ব্যবসায়ী। কেম্ব্রিজের Leys school-এ বাল্যকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আর্থার র‍্যাঙ্ক পিতার ব্যবসায়ে যোগ দেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তিনি লড়ায়ে যোগ দেন এবং মেজরের পদে উন্নীত হন। র‍্যাঙ্ক বাল্যকাল হইতেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং এখনও নিয়মিত গীর্জায় গমন করেন।

লর্ড মার্শালের কন্যা লরা-এলেনকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহিত জীবনে তাঁহারা উভয়েই মহাসুখী।

১৯৩৩ সালে আর্থার র‍্যাঙ্ক প্রথম চলচ্চিত্রশিল্পে যোগ দেন। চলচ্চিত্র শিল্পের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহার সহযোগিতায় ১৯৩৫সালে Turn of Tide নামক চিত্র নির্মিত হয়। এই চিত্রখানি ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে ৩য় স্থান অধিকার করে। তৎকালীন চিত্র প্রদর্শকেরা এসম্বন্ধে কোন উৎসাহই প্রকাশ করেন না, অতএব চিত্র প্রদর্শনের নিমিত্ত র‍্যাঙ্ককে "লিষ্টার স্কোয়ার থিয়েটার" ক্রয় করিতে হয়। এই সময়ে তিনি 'জর্জ ফ্রেড্রিক-হেণ্ডেল'-এর জীবনী লইয়া একখানি চিত্র নির্মাণ করেন। ধীরে ধীরে এই ধর্মপরায়ণ ব্যবসায়ী চলচ্চিত্র শিল্পের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়েন।

এদেশী চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা তখন মোটেই আশাপ্রদ ছিল না। চিত্রনির্মাণ কার্য বেশীরভাগই আমেরিকার অর্থে ও কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত। বিলাতী চিত্রকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিবার আদর্শ লইয়া আর্থার র‍্যাঙ্ক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

চিত্রনির্মাণের জন্য ষ্টুডিও ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন, পরিবেশক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলেন এবং প্রদর্শনের নিমিত্ত 'ওডিয়ন' ও গমণ্ট ব্রিটিশের অধীনে যতগুলি চিত্রগৃহ ছিল সব ক্রয় করিলেন। সরঞ্জামের অভাবে যাহাতে চিত্রনির্মাণের কার্য ব্যাহত না হয়, তন্নিমিত্ত ঐ সকল সরঞ্জাম নির্মাণকারী কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও ক্রয় করিলেন—তন্মধ্যে G. B. Kalee Ltd, Taylor Hobson, Cinema Television Ltd. British Acowstic films Ltd. প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এইভাবে র‍্যাঙ্ক তাঁহার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি কোম্পানীর পরিচালক ও ২৩টি কোম্পানীর সভাপতি। এদেশের শতকরা ৬৬টি ষ্টুডিওর মালিক আর্থার র‍্যাঙ্ক। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশের শতকরা ৫০টি চিত্র নির্মাণ কার্যের ও শতকরা ৬০টি চিত্রগৃহের সহিত আর্থার র‍্যাঙ্ক জড়িত।

ম্যানরফিল্ড ট্রাষ্ট, জে আর্থার র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন, ওডিয়ন (ওদেঅঁ), গমণ্ট ব্রিটিশ, জেনারেল সিনেমা ফিনান্স, মেট্রোপলিস ও ব্রাডফোর্ড ট্রাষ্ট, জেনারেল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থার র‍্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া আমেরিকার ঈগল লায়ন, ইউনিভার্সেল, ইণ্টারন্যাশনাল এবং কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও সাউথ আফ্রিকার কয়েকটি পরিবেশক ও প্রদর্শক প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ব্যবসায়ীক সম্বন্ধ বর্তমান।

আর্থার র‍্যাঙ্কের কর্তৃত্বাধীনে উপরোক্ত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ওডিয়ন (ওদেঅঁ) শেয়ার হোল্ডার ১৯৪১-৪২ সালে শতকরা ১০টাকা, ১৯৪৩-৪৪ সালে শতকরা ২০টাকা, ১৯৪৪-৫ সালে শতকরা ২৫টাকা, ১৯৪৫-৬ সালে শতকরা ১৭৷৷০টাকা ডিভিডেণ্ট পাইয়াছেন।

জোসেফ আর্থার র‍্যাঙ্কের প্রচেষ্টা ছাড়া যে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রশিল্প বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হইত একথা নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ।

[শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লণ্ডনস্থ "রূপ-মঞ্চে"র অন্যতম পাঠক। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে বহু তথ্য তিনি সরবরাহ করেন।]

পরিবর্তন

[গল্প]

(২)

কুমারী মীণা মুখোপাধ্যায়

সহসা একি হলো! সুমিত্রার ঐ সজল দুটি চোখের মধ্যে অজিত আজ যেন কি দেখতে পেল। কুয়াসার অন্তরালে অরুণালোকের মত উজ্জ্বল তেজোদীপ্ত একটা জ্বলন্ত বিশ্বাসের অপূর্ব মূর্তি। অবাক হয়ে গেল সে। ভাবলে, সুমিত্রার এই মহিয়সী রূপ, এতো এর পূর্বে আর কখনও সে দেখেনি। সে সুমিত্রাকে দেখেছে অনিলের পাশে। ধনগর্বিত, পাশ্চাত্য শিক্ষার মিথ্যা অনুকরণ মুগ্ধ অনিলের ভাবী স্ত্রীর কল্পনাময়ী রূপে।

চিন্তিত মনে পেছন ফিরতেই দেখতে পেল টিপয়ের ওপর চা ও খাবার ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে আছে। ভাবতে ভাবতে এসে পাশের চেয়ারটার ওপর বসে পড়লো। চায়ের বাটিটা তুলে চুমুক দিতে যাবে, এমন সময় সুমিত্রা আর এক কাপ চা হাতে করে পুনরায় এসে বল্লে, "ওটা আর খাবেন না, ওতো জল হ'য়ে গেছে। এই নিন্।" বলে সে হাতের কাপটা এগিয়ে দিলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত অজিত সুমিত্রার আদেশ পালন কল্লে। কারোর মুখে কোন কথা নেই। অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সুমিত্রাই প্রথম কথা আরম্ভ করলে। জিজ্ঞেস করল, "কি ভাবছেন?"—

অজিত ধীরে ধীরে জবাব দিলে, "ভাবব আবার কী? ভাল করে কোনদিন ভাবতেই শিখিনি। যখনই কিছু ভাবতে যাই, একটা না একটা ভুল করে বসি। এই দেখনা, একটু আগে কি ভুলই না করে ফেললুম।"

বিস্মিত কণ্ঠে সুমিত্রা প্রশ্ন করলে, "কখন আবার কি ভুল করলেন?"

"এই যে একটু আগে, বোকার মত কি জিজ্ঞেস করতে তোমায় কি জিজ্ঞেস ক'রে ফেল্লুম। কি দরকার ছিল আমার বলতো? আমিতো জানি, দেশকে ভাল করে ভালবাসতে ঠিক না পাল্লেও, তার জন্য অনেক নির্যাতন আমি ভোগ করেছি, আরও অনেকে করেছে। আর এই নির্যাতন ভোগ করবার জন্য তোমাকে আহ্বান করবার কি অধিকার আমার ছিল বলতো?—"

সুমিত্রা আস্তে আস্তে জবাব দিলে, "সামাজিক অধিকার হয়ত কিছুই ছিল না, কিন্তু নৈতিক অধিকারতো ছিল। তাছাড়া আপনি ডাকলেই যে আমি আসব, এ ধারণা আপনি কোথা থেকে পেলেন?"

অজিতের সমস্ত স্বপ্ন মুহূর্তের মধ্যে ভেংগে চুরমার হয়ে গেল। অতি সত্য কথা। অনধিকার চর্চা। সুমিত্রা কেন আসবে—ঐশ্বর্যের মমতা দু'হাতে সরিয়ে দিয়ে ভিক্ষার ব্রত কে কবে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে!

সুমিত্রার প্রশ্নের কোন জবাব সহসা অজিতের মনে জোগাল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, "আমিত গোড়ায় বলেছি, আমি ভুল করেছি, আমায় মাপ কর।" বলে অজিত গভীর বেদনার আবেগ লুকোতে গিয়ে হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সুমুখের টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়লো।

সুমিত্রার ওষ্ঠাধারে বিজয়নীর মৃদু হাস্য রেখা। আস্তে আস্তে অজিতের মুখখানা তুলে ধরে বল্লে, "কোথায় যে যাবার কথা ছিল বল্লেন? নিন উঠুন। বেরিয়ে পড়ুন। ফিরতে দেরী করবেন না, আমি চল্লুম!" বলে চায়ের বাটি হাতে করে সুমিত্রা ওপরে উঠে গেল।

অজিতের মনে এ কিসের আলোড়ন সুরু হ'ল!

সুমিত্রার পিতা খাটি সাহেবিয়ানায় ভরপুর, সাহেবি খানা, সাহেবি পোষাক, নানা রকম দেশী, বিদেশী মেম, সাহেবের আনাগোনা—এই ছিল তাদের বাড়ীর বিশেষত্ব। সুমিত্রার পিতা চাইতেন, যাতে তার ছেলে-মেয়েরা সব সময় বেশ ফিটফাট ভাবে সেজেগুজে থাকে।

কতদিন তিনি বলেছেন, "সুমিত্রা তুমি, এমনি অগোছালো ভাবে থাকো কেন? লোকে দেখে তোমাকে কি বলবে? তোমার দিদি, মা এঁরাত সব সময় ফিটফাট থাকেন। তোমার কিসের অভাব?"

সুমিত্রা কিছুই বলে না। নীরবে থাকে। তার দিদি সুচিত্রার

বিয়ে হয়েছে একটি তরুণ ব্যারিষ্টারের সংগে, দিদি এই সমাজটাকেই বেশী পছন্দ করেন। সুমিত্রার সংগে সুচিত্রার কোনও খানে একটুও মিল নেই।

তার পিতার খুব ইচ্ছা যাতে, অনিলের সংগে তার মেয়ে সুমিত্রার বিয়ে হয়। কিন্তু সুমিত্রার এরূপ ব্যবহারে তিনি খুবই চিন্তিত ও অসন্তুষ্ট। বাড়ীতে তথাকথিত নানা রকম উত্তম শ্রেণীর লোক আসেন। তার মা, দিদি, অনিল ও তার বন্ধুবান্ধবীরা নানারকম হাসি ঠাট্টায় বসবার ঘর-খানিকে মুখরিত করে তুলেছে।

সুমিত্রাকে তার পিতা ডেকে বলেন, "একলাটি ভুতের মতন বসে না থেকে, যাওনা একবার ওঘরে, পাঁচজনের সংগে না মিশে কুনো হয়ে থাকবার কোন অর্থ হয়? শেষ পর্যন্ত একেবারেই কারুর সংগে মিশতে পারবে না। কুনো হ'য়ে যাবে—হ্যাঁ আরেকটা কথা শোন, ওরকম সাধারণ কাপড় পরে ওখানে যেও না, যাবার আগে কাপড়টা বদলে যেও।"

সুমিত্রা সেখানে গেল পিতার আদেশ অনুযায়ী, কিন্তু তার সেই চিরাচরিত সাধাসিধে পোষাকেই।

অনিলের বন্ধুরা তার ভাবী স্ত্রীকে "Good evening" বলে অভিবাদন জানায়। সুমিত্রা প্রতি নমস্কার করে।

অতো রংবেরংএর সাজ পোষাকের মধ্যে সুমিত্রার সাধারণ লালপাড় শাড়ী—সামান্য একটু এলোমেলো ভাবে বাঁধা একটি বিনুনি ঝুলছে পিঠের ওপরে, খালি পা, হাতে একগাছি করে চুড়ী। এই সাধারণ সজ্জায়ও সুমিত্রার সর্বজয়ী রূপ অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে ঝলমল করত। তাদের সমাজের নানারকম কথা আরম্ভ হলে সুমিত্রা সেখান হ'তে যে কোন অছিলায় বিদায় নিত। এমনি ভাবে তাদের দিন কাটে।

*　　*　　*

এদিকে অনিলের সংগে সুমিত্রার বিয়ের ব্যবস্থা যতই পাকা-পাকি হ'য়ে আসতে লাগল, সুমিত্রার আনাগোনা নীচে সেই পরিমাণে বেড়ে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে সে অজিতদের ক্লাবে আনাগোনাও করে। অজিতের সংগে সুমিত্রার দাদা অমিতের খুব আলাপ ছিল। আর সে অজিতের বিশেষ বন্ধু ও তাদের দলের একজন পাণ্ডাও ছিল। অমিতের কাজে অজিত খুব খুশী ছিল।

অমিত যখন জানতে পারল, সুমিত্রা তাদের দলে যোগ দিয়েছে এবং তার আনাগোনা ক্রমশই বাড়ছে, তখন একদিন তাকে জানালো, "সুমি, তুই কি ঠিক করলি এ পথে এসে? এ পথ যে বড় কঠিন। আমি তোকে এর থেকে আর কি বেশী বলবো। অজিততো সবই তোকে বলেছে—তোকে বোঝাতেও চেষ্টা করেছে শুনলাম।"

সুমিত্রা জবাবে জানায় যে, সে কিছু ভুল করেনি।

অমিতেরও খুব ইচ্ছা নয় যে অনিলের সংগে সুমিত্রার বিয়ে হয়। কিন্তু উপায় কি! আর তারতো এতে কোন হাত নেই। তাছাড়া সুমিত্রার উপযুক্ত স্বামী কেইবা আছে! অজিত? কিন্তু সেতো বিয়ে করবে না। তাছাড়া

পিতা অমরেশবাবুর কাছে সুমিত্রার সংগে তার বিবাহের কথা উত্থাপন করে কোন সদুত্তরতো পায়নি, উল্টে তিনি অমিতকেই অজিতের সংগে মিশতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

ক্রমে যখন তিনি জানতে পারলেন, অমিত এবং কন্যা সুমিত্রাও ঐ পথে পা বাড়িয়েছে, তখন তিনি অজিতদের নিচের তলা থেকে উঠিয়ে দেবার নোটিশ দেন।

অজিতকে ডেকে তিনি একদিন বল্লেন, "আমার বাড়ীতে থেকে আমার ছেলেমেয়েকে নষ্ট করবার তোমার কি অধিকার আছে, এরজন্য তুমিই একমাত্র দায়ী।"

কিন্তু এই কথাতে অমিত তার পিতাকে জানাতে বাধ্য হয়, এজন্য অজিত মোটেই দায়ী নয়। "আমি এই পথটিকেই ভাল বুঝেছি, তোমাদের ঐ সমাজে নিজেকে মিল খাওয়াতে না পারার জন্য দুঃখীত নই বরং আরও খুশী। কারণ, এ সমাজে শুধু কয়েক শ্রেণীর লোক নিজেদের ভোগবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে অন্যের অভাব সৃষ্টি করছে।

দরিদ্রের মুখের অন্ন গ্রাস করে বিলাস ব্যসনের মাঝে কালযাপন কচ্ছেন। এদেশে যাদের জন্ম, সকলেই আমাদের ভাই, বোন। ধনী, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচী, মেথর, চণ্ডালকে ভাই বলে আলিঙ্গন দিতে হবে—ভেদাভেদ জ্ঞান ভুলতে হবে—উচ্চশ্রেণী নিম্নশ্রেণী বলে কিছু থাকবে না, তবেই আমাদের পতনন্মুখ সমাজকে বাঁচান যাবে।"

অজিত ও সুমিত্রা চুপ করে অমিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অমরেশবাবু এতক্ষণ পুত্রের কথা শুনে একটু বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তারপর আবার অমিত বলে, "এখনোও কি অজিতকে আমাদের এ পথে টানার জন্য দায়ী কচ্ছেন? আপনি আমার গুরুজন, এসব বলা আপনাকে আমার কোন দরকার ছিল না বা উচিত নয়, কিন্তু একজনকে অপরাধী বলে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য বলতে বাধ্য হলাম।"

অমরেশবাবু রাগে টেবিলের ওপর একটা মুষ্ট্যাঘাত করে বলেন—"তোমাদের এই লোফার বৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে আমি কিছুতেই পারবনা।"

অমিত ও সুমিত্রার দিকে দৃষ্টি রেখে বলেন—"তোমাদের এ পথ ছেড়ে দিতে হবে, আমি চাই না যে, তোমরা তোমাদের ভবিষ্যৎ এমনি করে নষ্ট কর। আমার যা করণীয় আমি তা ঠিক করে ফেলেছি—শুধু তোমাদের সাবধান করে দিলাম।" বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

কয়েক মিনিট বাদে ফোন বেজে উঠলো, অমিত রিসিভার তুলে সব শুনে নিল এবং অজিতকে বললো, "পুলিস আমাদের ক্লাব সার্চ করতে এসেছে, উপস্থিত সবাইকে গ্রেপ্তার করেছে!"

সুমিত্রা ও অজিত দুজনেই মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পড়লো। অমিতও তাড়াতাড়ি করে বেরুতে যাবে পথে অমরেশবাবু তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কোথায় যাচ্ছো এত ব্যস্ত হয়ে?"

অমিত বল্লো—"একটু বিশেষ কাজে।"

"কোথায় যাচ্ছো আমি জানি আর কিসের জন্য তাও জানি।" ততক্ষণে অমিত রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

অমরেশবাবু একটু মুচকি হেসে বল্লেন—"তোমাদের বড় বড় লেকচার দেওয়া এবারে বেরিয়ে যাবে।"

কয়েকবার সুমিত্রাকে ডাকলেন কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর পেলেন না! নিচে লোক পাঠালেন সুমিত্রা সেখানে আছে কিনা জানবার জন্য, কিন্তু সেখানেও সুমিত্রা নেই শুনে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

এদিকে অমিত ওখানে পৌছে দেখে সব খাতা, বই, কাগজ পত্র মাটীতে এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে। মনে হলো পুলিস নানা ভাবে সন্ধান করেছে জিনিষ পত্রের। একটি লোকও নাই ক্লাবে। অজিত সুমিত্রা দুজনেই গ্রেপ্তার হয়েছে তাহলে।

ভাবতে ভাবতে অমিত নিচে নামছে এমন সময় দলের অন্যতম সভ্য নরেন ব্যস্ত হ'য়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সামনেই অমিতকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে—

"কিরে তুই এখানে? আমাদের এখানে সার্চ করতে এসেছিল শুনলাম? আরও শুনলাম, অমরেশ ব্যানার্জী বলে কে একজন ব্যারিষ্টার আমাদের ঐখানে কাল

এসে শাসিয়ে গেছেন সবাইকে। সকলের ধারণা তিনিই নাকি ফোন করে আজকে সকালে পুলিস পাঠিয়েছেন।"

অমিত চিৎকার করে উঠলো—"কি নাম ?"

"অমরেশ ব্যানার্জ্জী!" অমিতের সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। রাগে ও অভিমানে নিঃশব্দে সে সুমুখের চেয়ারটার ওপর বসে পড়লো। নরেন তার এই ভাবান্তরে অবাক হয়ে গেল। ক্লাবের কেউ জানতো না যে, অমিত একজন ব্যারিষ্টারের ছেলে। সকলেই জানত, একজন সামান্য গৃহস্থের ছেলে। কারণ বেশীর ভাগ সময় অমিত অজিতদের বাড়ীতেই থাকতো, বন্ধু বান্ধব এলে ওখানেই আলাপ, আলোচনা হ'ত।

অমিত কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। মনস্থির করতে পারলো না। নরেনও একটা চেয়ার টেনে চুপ করে বসে পড়লো। নরেন ভাবলো, বন্ধু অজিতের জন্য হয়ত অমিতের মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কিছুক্ষণ পর অমিত নরেনকে একটা কাগজ কলম আনতে বলে পিতার কাছে চিঠি লিখতে বসলো। তার হাত কাঁপছে। পিতার অন্ধক্রোধের জলন্ত অগ্নিশিখায় আজ যতগুলো তরুণ-তরুণী নিজেদের জীবন আহুতি দিল, তার বাস্তব ছবিটা ওর চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগলো। অমিত লিখলো,—

শ্রীচরণেষু— কলিকাতা,

বাবা,

আজ আপনি অজিতের সর্বনাশ করতে গিয়ে নিজের মেয়ের সর্বনাশ ডেকে আনলেন। আপনি এখানকার সন্ধান দিয়েছেন পুলিশকে, তা আমিও জানলাম, সবাইও জেনেছে। হয়তো আপনি আপনার পুত্রের প্রতি কর্তব্য করেছেন, ভেবেছিলেন এরপরে আপনার ছেলেমেয়েকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। এ পথ আজ থেকে আরও নতুন করে সুমিত্রার কাছে দেখা দিল। এ সর্বনাশ না করলে হয়তো ফেরানো সম্ভব ছিল ওকে। কিন্তু এখন আর পারবেন না। ওর বদলে আমাকে যদি ধরে নিয়ে যেত!

অজিত ও আমাদের ক্লাবের সর্বনাশ আপনি কিছুতেই করতে পারবেন না, আর আমাদের সর্বনাশ আপনি কিছুই করেননি, করেছেন আপনার মেয়ের। আজ থেকে আমি ও সুমিত্রা আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।—অমিত। লেখা শেষ হ'লে অমিত নরেনকে ডেকে বল্লো—"এই চিঠিটা এই ঠিকানাতে দিয়ে আসতে পারবি ভাই, দিয়েই চলে আসবি। দেরী করবি না।"

নরেন চলে গেল। গিয়ে দেখে সেই অমরেশ ব্যানার্জির বাড়ী। বাইরে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলো, বাবু বাড়ীতে আছেন কিনা। আছেন জেনে, নরেন অমরেশ বাবুর সংগে দেখা করে চিঠি দিয়ে চলে আসবে এমন সময় অমরেশ বাবু তাকে দাঁড়াতে বল্লেন।

সে একটুও দাঁড়াতে চাইল না। তার অনেক কাজ আছে বলে চলে গেল সেখান থেকে। কারণ সে জানতে পেরেছিল যে, এই ভদ্রলোকই তাদের সর্বনাশ করেছেন।

সে চলে যাওয়ার সময় দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল, অমিত এই বাড়ীর ছেলে, সুমিত্রা অমিতের বোন, আর অজিত এই বাড়ীর ভাড়াটে।

নরেন সোজা দেখা করতে গেল অমিতের সংগে ক্লাবে, কিন্তু তাকে সেখানে পেল না।

এদিকে অমরেশ বাবু অমিতের চিঠিখানা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তিনি যা করে ফেলেছেন, তার বাস্তব রূপটি সহসা যেন তাঁকে এখন চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে এল। যেন সে চীৎকার করে বলছে, অমরেশ ভুল করেছিস, মানুষের দুঃখে মানুষের প্রাণ কাঁদবে, এযে তার প্রাণধর্ম, একে তুই কেমন করে রুখবি! দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়! যা—ওদের ছাড়িয়ে নিয়ে আয়!

অমরেশ বাবুর মাথা ঘুরতে লাগল। যাদের নিয়ে তার সংসার গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে থেকে সুমিত্রা ও অমিতের অনুপস্থিতি যেন একটা প্রকাণ্ড শূন্যতা এনে দিল। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়লেন তাদের সন্ধানে।

থানায় গিয়ে সুমিত্রাকে জামিনে খালাস করতে চাইলেন। সুমিত্রা বেরিয়ে এসে বাবাকে বল্লে—"বাবা, তুমি? ছাড়িয়ে নিতে এসেছ আমাকে? কিন্তু, আমিতো যাবো না। আমার সংগী, যাদের সবাইকে তুমি ধরিয়ে দিয়েছো—তাদের সবাইকে পারবে তুমি ছাড়িয়ে আনতে? আর তারাতো বেরিয়ে আসবে না। তারা শাস্তি গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত। তুমি ফিরে যাও বাবা, প্রার্থনা কর যেন তোমার দেওয়া এ শাস্তি আমাদের জীবনে পরম সার্থকতা এনে দেয়।"

অনুতপ্ত হ'য়ে ফিরে এলেন অমরেশ বাবু। অল্পদিনের মধ্যে মোহও গেল তাঁর ভেংগে। ক্রমশঃ যেন কেমন হয়ে গেলেন। ঘুরতে লাগলেন শহরের বস্তি অঞ্চলে। ভাবলেন, সত্যি এদের কত দুঃখ, কত কষ্ট!

কিছুদিনের ভিতরই সম্পূর্ণ পালটে গেলেন অমরেশ বাবু। বিলিতি পোষাক ছেড়ে ধরলেন একেবারে খদ্দর। দেশে দেশে ঘুরতে লাগলেন। দেশ সম্বন্ধে নানারকম প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করলেন। এখানে ওখানে এবং নানারকম কৃষক সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তার সমস্ত সম্পত্তি আজ দেশের জন্য উৎসর্গ করলেন। বাড়ীতে এখন রোজ সন্ধ্যায় সাহেব-সুবার আনাগোনা, রইল না—অনিলদের মত ছেলেদের আসা যাওয়াও বন্ধ হল। সন্ধ্যার মসগুল একেবারেই আর রইলো না। সেই সংগে সংগে বিশেষ করে বিলিতি জলের নানা রংএর বোতলগুলি একেবারে চিরদিনের মত লোপ পেল। এইভাবে নানারকম পরিবর্তন হ'ল অমরেশবাবুর ও তাঁর বাড়ীর আবহাওয়ার। তিনি ক্রমশঃই জনসাধারণের মধ্যে প্রিয় হ'য়ে উঠতে লাগলেন। একদিন সন্ধ্যায় একটি কৃষক সভায় তিনি বক্তৃতা করছিলেন। সভার শেষে দেখেন, তার পায়ে হাত দিয়ে কয়েকটি ছেলে মেয়ে প্রণাম করলো। তিনি ফিরে চেয়ে দেখলেন, সুমিত্রা, অজিত ও অমিত।

তিনি সকলকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বল্লেন, "আমাকে তোমরা ক্ষমা কর, আমি তোমাদের আশীর্বাদ করি, তোমাদের আদর্শ ফলবতী হ'ক।"

অমিত তখন বল্লো—"আমরা তোমাকে কয়েকদিন ধরে
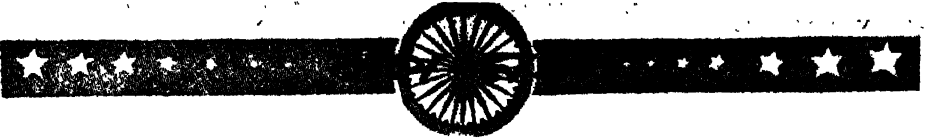
রূপ-মঞ্চ সাহায্য-ভাণ্ডার

সভাপতি ঃ

শ্রীনিতাই চরণ সেন

রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে একটী স্থায়ী সাহায্য-ভাণ্ডার খুলবার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। এই সাহায্য ভাণ্ডারের সংগৃহীত অর্থ পাঠক-সাধারণের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুযায়ীই ব্যয়িত হবে। নিজেদের ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুযায়ীই পাঠক সাধারণ এই সাহায্য-ভাণ্ডারকে পরিপুষ্ট করে তুলতে পারবেন। যাঁরা এই ভাণ্ডারে অর্থ প্রেরণ করবেন, রূপ-মঞ্চ মারফৎ তাঁদের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ ঘোষণা করা হবে। সাহায্য প্রেরণের সময় প্রেরক বা প্রেরিকার নাম, ঠিকানা পরিষ্কার করে লিখে মনি অর্ডার কূপন বা চিঠিতে 'সাহায্য-ভাণ্ডার' কথাটির উল্লেখ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। রূপ-মঞ্চের পৃষ্ঠপোষকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ সেনকে এই সাহায্য ভাণ্ডারের সভাপতি নির্বাচন করা হ'য়েছে। - - - - - -

সম্পাদক, রূপ-মঞ্চ ঃঃ ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫ এই ঠিকানায় সাহায্য ঃ ঃ ঃ ঃ পাঠাতে হবে ঃ ঃ ঃ ঃ

খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিন্তু পাচ্ছিলুম না, বাড়ী থেকেও ঘুরে এসেছি।"

অমরেশবাবু সুমিত্রার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন—"কয়েকদিনের জন্য গ্রামে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা শিক্ষায়তন স্থাপন করবার জন্য চেষ্টা করছিলাম। চলো, আমরা আজ যখন একসংগে মিললাম তখন ওখানের কাজটা এক সংগে শেষ করে আসি।

সুমিত্রার মনটা আনন্দে দুলে উঠলো। আজ তার এত দিনের স্বপ্ন সফল হ'তে যাচ্ছে, সে পারবে অজিতের পাশে দাঁড়িয়ে একসংগে কাজ করতে। আজ আর কোনও রকম সংকোচ তার মনে নেই, কোনও বাধা নেই, সে জয়ী হ'তে পেরেছে।

তখন সকলে মিলে, কৃষক মণ্ডলী থেকে অমরেশবাবুকে ও অজিতকে মাল্যে ভূষিত করলো। কারণ, অজিত ওদের কাছে খুবই পরিচিত, আর ক্লাবের ছেলে-মেয়েরা অমরেশ বাবুকে তাদের সভাপতি করে নিল। (সমাপ্ত)
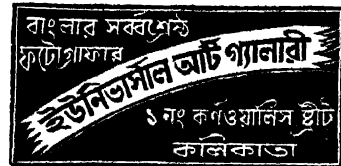
সম্পাদকের দপ্তর
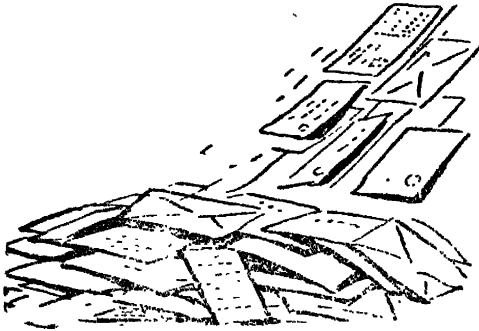
গৌতম বসু (কাতরাসগড়, মানভূম)

(১) সুদীর্ঘ সাতটা বছরের জের টেনে আজ রূপ-মঞ্চ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করেছে। তার নতুন বছরের জন্য রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন আর শুভ কামনা। রূপ-মঞ্চ কোনদিন তার পাঠক সমাজ ও পৃষ্ঠপোষক-সমাজকে নিরাশ করেনি—এর মূলে রয়েছে আপনাদের আন্তরিক সহানুভূতি আর আপ্রাণ চেষ্টা। তাই আপনাদেরও জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। গত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'আমাদের আজকের কথা' বেশ মন দিয়ে পড়লাম। তার মধ্যে জনৈক পাঠকের উক্তি সবচেয়ে আগে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাঁর সম্পর্কে গোটা কয়েক কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। আশাকরি এ প্রগলভতা মাপ করবেন। তাঁর লেখার ভাবার্থ হচ্ছে, রূপ-মঞ্চকে যদি ঠিক মত পরিচালনা করতে না পারেন, তবে যোগ্যলোকের হাতে তার সম্পাদনার ভার ছেড়ে দিন না--! আপনি তাঁকে প্রশংসা করেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে সমর্থন করতে পারি না। তিনি আপনাকে লক্ষ্য করে যে টীকা কেটেছেন—এর মধ্যে সৎসাহস বা আন্তরিকতার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় দুঃসাহস আর স্পর্ধার পরিচয়। আমিও রূপ-মঞ্চের একজন নিয়মিত পাঠক—তাকে সত্যি ভালবাসি। গত তিনবছর ধরে আমি এই পত্রিকা পড়ে আসছি। এর সম্বন্ধে আমার যতটুকু ধারণা জন্মেছে, তা স্পষ্ট করে বলতে পারি। গত কয়েক বছর থেকেই পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া যে এ-পত্রিকা প্রকাশের অনুকূলে ছিলনা—যাঁর বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে, তিনিই তা বুঝতে পারবেন। কতখানি কষ্ট স্বীকার করে যে আপনাদের পত্রিকা প্রকাশ করতে হয়, তা আপনাদের আবেদন নিবেদন দেখলেই বুঝতে পারা যায়। তিনি কি সে সব না জেনে শুনেই এ রকম মন্তব্য করে বসলেন? তিনি আপনার সম্পাদনার মধ্যে এমন কী দোষ-ক্রুটী পেয়েছেন, যার জন্য তাঁর এই কলমবাজী? যোগ্যতা বিচার করবার মত যদি তাঁর সুক্ষ বিচারবুদ্ধি থাকে—তিনি নিজে পারেন, পত্রিকা সম্পাদনার ভার নিন না কেন? যাই বলুন, সব কিছু সহ্য হয়, কিন্তু এই সমস্ত লোকের ফাঁকা বুলি আর মুন্সিয়ানা সহ্যের অতীত।

(২) রূপ-মঞ্চ মারফৎ খবর পেলাম, ভ্যানগার্ড প্রডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র 'সাধারণ মেয়ে' দ্রুত মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তার প্রথম নিবেদন 'জয়যাত্রা' আজও মুক্তি পেল না! কারণটা জানতে পারি কি? (৩) চিত্র অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জীবনী আপনারা পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন বলে জানিয়েছিলেন, তার কী হ'লো—কবে নাগাদ তা পাওয়া যাবে?

●● (১) আপনার অভিনন্দন পরম শ্রদ্ধার সংগেই মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। ব্যর্থতার আঘাতে যখনই আমরা মুষড়ে পড়ি, আপনাদের এই অভিনন্দন আমাদের উৎসাহিত করে—উদ্দীপনার দ্যুতিতে চলার পথকে উদ্ভাসিত করে তোলে। জানি, রূপ মঞ্চ পরিচালনায় যে কঠোর দায়িত্ব আমাদের ওপর রয়েছে,তার গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়—সে দায়িত্ব প্রতিপালনে আমাদের মাঝে কোনদিন নিষ্ঠার অভাব হয়নি—হবেও না। এই নিষ্ঠা ও আপনাদের সকলের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের ত আর কোন সম্বল নেই! কৃতকার্যতার মূলে এই নিষ্ঠা ও সহযোগিতার বাইরেও যা রয়েছে—সেগুলি যদি আমরা আয়ত্তের ভিতর আনতে না পারি—সে দোষ যে আমাদের নয়—একথা

আপনি বা আপনারা বুঝলেও, সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। যাঁরা আমাদের অসুবিধার কথাগুলি দরদ দিয়ে চিন্তা করেন, তাঁরাই আমাদের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ আনেন না—কিন্তু সকলেইত আর দরদী নন! তাই তাঁদেরও আমরা দোষ দেব না—আমাদের বিরুদ্ধে তাঁদের ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করতে চেষ্টা করবো—চেষ্টা করবো আমাদের আন্তরিকতায় তাঁদের অন্তর জয় করতে। একবার—দু'বার যদি আমরা ব্যর্থ হই, আবার চেষ্টা করবো। আমাদের চলার পথে শুধু যে প্রশংসাবাণীই বর্ষিত হবে, এমন আশা করাটা ভুল। নিন্দা ও অপবাদের কণ্টকে যেমনি ক্ষত বিক্ষত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি অভিনন্দনের প্রলেপ দিয়ে সে ক্ষত মুছিয়ে দেবার সম্ভাবনাও কম নেই। আমাদের আন্তরিকতা কতজনের চোখেইত ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতার রূপ নিয়ে ভেসে উঠেছে এবং উঠছে—আমরা যদি তাতে ভেংগে পড়ি—সে পরাজয়ের গ্লানি আমাদের আদর্শকেই কী কলংকিত করে তুলবে না? তাই যাঁদের আমরা জয় করতে পারিনি—যাঁদের দৃষ্টিতে আমাদের আন্তরিকতা ভণ্ডামির রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে—তাঁদের জয় করবার তাঁদের এই সন্দেহের দৃষ্টিকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করবার জন্য আরো বেশী কর্মতৎপরতা নিয়ে আমাদের ঝাপিয়ে পড়তে হবে। নিন্দার বোঝা যদি এতই ভারি হয়ে ওঠে যে, ক্লান্তি ও অবসাদ আমাদের দুর্বল করে তুলবে—তখন আপনাদের উৎসাহ ও প্রেরণায় আমরা সঞ্জিবীত হয়ে উঠবো। আমাদের সামনে এমন কোন বাধা থাকবে না—যা দুর্ভেদ্য। তাই, যাঁরা নিন্দা করেন, করুন—যাঁরা আমাদের অযোগ্য আখ্যা দিয়ে অভিযুক্ত করতে চান—করতে দিন—মহাকালের বুকে রেখে যাবো আমরা আমাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার বিচারের ভার! (২) 'সাধারণ মেয়ে' ইতিমধ্যেই মুক্তিলাভ করেছে। ভ্যানগার্ডের প্রথম চিত্রখানি বহুপূর্বেই সমাপ্ত হয়েছে। 'জয়যাত্রা'র পরিবেশনা স্বত্ব নিয়ে কিছুটা গোলযোগের সৃষ্টি হয়েছিল বলে শুনেছিলাম—অথবা সংশ্লিষ্ট পরিবেশক প্রতিষ্ঠান মুক্তির জন্য কোন প্রেক্ষাগৃহ সংগ্রহ করতে পারেন নি বলেই 'জয়যাত্রা' মুক্তিলাভ করতে পারেনি। (৩) কাগজের সমস্যা মিটে গেলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে পারবো। প্রতি মাসে রূপ-মঞ্চের জন্য কমপক্ষে দেড়শত রিম করে কাগজ লাগে। এই কাগজ সংগ্রহ করতেই যা বেগ পেতে হয়, তার সংবাদত আপনারা রাখেন। তাই রূপ-মঞ্চের চাহিদা মিটিয়ে যদি অতিরিক্ত কাগজ সংগ্রহ করতে পারি, তখনই বলতে পারবো, কোন পর্যন্ত এই পুস্তকগুলি আপনারা পেতে পারবেন।

দ্বিজেন্দ্রকুমার মণ্ডল ও ননোকিশোর-মণ্ডল (বলরাম গলি, চুঁচুড়া)

'প্রিয়তমা' দেখলাম। আশা করে হতাশ হ'তে হলো। অজিত চট্টোপাধ্যায়ের ভাবপ্রবণতার মাত্রাটা বড় বেশী হয়ে গেছে বলে মনে হলো। তবে দোষটা কার ঠিক জানিনে। পরিচালকের নির্দেশ, না অজিত বাবুর নিজের কৃতিত্ব, সেটা বলা কঠিন। এর অভিনয়ের সময় মনে হয়না কোন ছবি দেখছি, মনে হয় যেন সার্কাসের জোকারের জোকারীর ভিতর ডুবে গেছি। এবিষয়ে আপনি কী বলেন? গানগুলি মন্দ লাগলো না। শ্রীপার্থিবের ভাষায় চিত্রজগতের বুলবুল সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠ কানে এলো বলে মনে হল। বিশেষ করে আরো ভাল লাগলো, হেমন্তকুমারের কণ্ঠে গীত গানটি। আরও দেখলাম, শরৎচন্দ্রের 'নববিধান' গল্পের সংগে এর অনেক জায়গায় মিল আছে। এবিষয়ে আপনাদের মত কী?

●● আমার বা আমাদের মত গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রিয়তমা'র সমালোচনা থেকেই জানতে পেরেছেন। আপনারা যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—তাকে তারিফ

না করে পারবো না। আশা করি, এমনি ভাবে আপনাদের দৃষ্টি দিন দিন স্বচ্ছ হয়ে উঠবে। অজিত বাবু অথবা পরিচালক কার দোষ বলা কঠিন। অজিত বাবুকে যদি বলেন, তা হলে উত্তর পাবেন, আমি কী জানি —আমাকে দিয়ে যা করিয়েছে তাই করেছি। আবার পরিচালককে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলবেন, আরে মশায়, আমি কী দিতে চেয়েছিলাম—প্রযোজক ধরে পড়লো—তাই বাধ্য হয়ে দিতে হ'লো। তাই দোষ যে উভয়ের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। যিনি কুরুচির পরিচয় দেন এবং যিনি তার প্রশ্রয় দেন উভয়ই সম দোষে দোষী। গান এবং কাহিনী সম্পর্কেও আপনাদের অভিমতকে অস্বীকার করবো না।

নীলিমা ঘোষ (হুগলী)

(১) দীপ্তি রায় কী শ্রীমতী? (২) বাংলা ছবিতে পরিচালকেরা একটা বিষয়ের প্রতি কিন্তু নজর দেন না—সেটা হচ্ছে পোষাক পরিচ্ছদ। যেমন পেট ভরে খেতে পায়না মুখে বলছে, অথচ পরনে মূল্যবান শাড়ী আর গায়ে গয়নার অভাব নেই।

●● (১) স্বয়ংসিদ্ধা ও সাধারণ মেয়ের দীপ্তি রায় শ্রীমতী। দীপ্তি রায় নামে আর একজন আছেন, তিনি শ্রীমান। 'যা হয়না' চিত্রে তাঁর ঝিলিক মারার কথা ছিল। 'যা হয়না' শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছে কিনা বলতে পারিনা। শ্রীমান দীপ্তি কখনো দীপ্তিকুমার বলে পরিচয় দিচ্ছেন, আবার কখনো কুমারটা বাদ দিয়ে হেঁয়ালি হয়ে থাকছেন। তাই শ্রীমতী দীপ্তির সংগে আমরাও একবার তাঁকে নিয়ে বিপাকে পড়েছিলাম। আপনাদেরও পড়তে হচ্ছে। এই সব মেয়েলি নাম নিয়ে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করছেন, লেজুড় যদি তাঁরা বাদ দিতে চান, দিন, আপত্তি নেই, কিন্তু তা হলে তাঁরা যেন বন্ধনীর মাঝে 'পুং' কথাটি নামের সংগে যোগ করে দেন। আশাকরি তাঁরা আমাদের এ অনুরোধ রাখবেন। (২) পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে বাংলা চিত্রের পরিচালকেরা যে ভুল করেন, সত্যি তা অমার্জনীয়। বাস্তব দৃষ্টিভংগী থেকে বঞ্চিত বলেই এঁরা এই অমার্জনীয় ত্রুটিগুলি করে থাকেন।

'আভিজাত্য' চিত্রে শ্রীমতী মলিনা

লিলি চট্টোপাধ্যায় (ডিউসেট রোড, এলাহাবাদ)

(১) সাধনা বসুকে অনেকদিন দেখিনি। শুনেছিলাম তিনি নিজে 'অজন্তা' নামে একখানি ছবি তুলছেন। তার কী হলো? পরবর্তী কোন ছবিতে তাঁকে দেখতে পাবো? (২) শুনেছি অশোককুমার ও ছায়া দেবী (বড়) ভাই-বোন—কথাটা কী সত্যি?

●● (১) সাধনার মত নৃত্যশিল্পী অজন্তার ধ্যান ভাঙ্গাতে সক্ষম হলেন না। হবেনও যে, তারও কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছিনা। তাঁর ভবিষ্যত শিল্প-জীবন সম্পর্কে এখনও কোন সংবাদ পাইনি। (২) হ্যাঁ—একথা সত্য। এঁরা মাসতুত ভাই বোন।

সন্তোষকুমার শীল (জগন্নাথ সুর লেন, কলিকাতা)

(১) কালো ঘোড়া, মানুষের ভগবান, মায়ের ডাক, ধাত্রীদেবতা ও জয়যাত্রা এই চিত্র ক'খানি কবে কোথায় মুক্তিলাভ করবে? (২) কলকাতায় বর্তমানে কয়টি প্রেক্ষাগৃহ আছে এবং কোনটি শ্রেষ্ঠ।

●● (১) কালো ঘোড়ার পরিবেশনস্বত্ব লাভ করেছেন মুভিস্থান লিঃ। কর্তৃপক্ষ এখনও তার মুক্তির যোগাড় করে উঠতে পারেন নি। মানুষের ভগবান—মানুষের মাঝে এখনও কোন ভগবান খুঁজে পায়নি—যিনি অর্থ দিয়ে চিত্রখানি শেষ করবার জন্ম সাহায্য করবেন। 'মায়ের ডাক' 'সাধারণ মেয়ের' পরই

সম্ভবতঃ রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করবে। 'ধাত্রী দেবতা' বীণা ও বসুশ্রীতে মুক্তিলাভ করবে। মুক্তি দিবস জানতে পারিনি। 'জয়যাত্রা'র যাত্রাপথে কিছুটা বাধা সৃষ্টি হ'য়েছে বলে শুনেছি, তবে মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে চিত্রখানির মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে। (২) বর্তমানে প্রায় ৫১টি প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে। মেট্রো ও লাইট-হাউসকে বাদ দিয়ে 'সোসাইটি' ও 'বসুশ্রী'কে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ দস্তিদার (নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, কলিকাতা)

●● স্বরলিপিসহ গান রূপ-মঞ্চে বর্তমানে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সংগীত সম্বন্ধীয় উপযুক্ত রচনা সাদরে গৃহীত হবে। তবে রূপ-মঞ্চে প্রকাশের জন্য যদি কোন রচনা পাঠাতে চান, প্রতিলিপি রেখে পাঠাবেন এবং রচনার সংগে কোন ডাকটিকেট পাঠাবেন না। কোন রচনা প্রকাশের জন্য নির্বাচিত হ'লে, দু'মাসের ভিতরই আমরা লেখক বা লেখিকাদের জানিয়ে দিয়ে থাকি। অনির্বাচিত হ'লে আমাদের পক্ষে কোন সংবাদ দেওয়া যেমনি সম্ভব নয়— রচনাটি ফেরৎ পাঠাবার ঝুকিও আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। দু'মাসের ভিতর কোন সংবাদ না পেলে রচনাটিকে অমনোনীত বলেই ধরে নিতে হবে। এই সর্তে যদি রাজী থাকেন, রচনা পাঠাতে পারেন।

উর্মিলা সিংহ (সিংহগড়, কলিকাতা)

(১) কবিগুরুর 'ধন নয় মান নয়…করেছিনু আশা' কবিতাটি তাঁর কোন বইতে পাওয়া যাবে? (২) 'স্বয়ং সিদ্ধা' চিত্রের নায়িকার গানগুলি কি তিনি নিজে গেয়েছেন?

●● (১) এই 'আশা' কবিতাটি কবিগুরুর নিজের কণ্ঠে রেকর্ডে বাণীবদ্ধ হ'য়ে আছে। তাছাড়া কবিতাটিকে পাবেন রবীন্দ্র রচনাবলীর ১৪শ খণ্ডে, 'পূরবী'র ভিতর।

(২) ইতিপূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হ'য়েছিল। একটু দৃষ্টি রাখলেই আর একই প্রশ্নের পুনরোত্তর দিতে হয় না। শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার গেয়েছিলেন।

অনুরাধা দেবী (দেবনিবাস, বারমামাইন্‌স, টাটানগর)

রূপ-মঞ্চের ১৩৫৫ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় সম্পাদকের দপ্তরে জামসেদপুর নিবাসী হিমাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা লিখেছেন, তা বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে চলা প্রায়ই সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। যেমন ধরুণ, ছবি নিজে না দেখে কি বিচার করা যায়? ফেরিওয়ালা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, যতক্ষণ প্রেক্ষাগৃহের মালিকরা তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ তারা বিক্রয়ের আশায় ঘরের মধ্যে ঘোরা ফেরা করবেই। তারপর বেশী মূল্য দিয়ে টিকেট ক্রয় না করলে হয়ত সময়াভাবে সে বই আর দেখাই হবে না। আমি অবশ্য মফঃস্বলের কথাই বলছি— যেখানে একটা বই এক সপ্তাহ কী দু'সপ্তাহ থাকে। প্রেক্ষাগৃহে যারা হাত তালি দেন বা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকেন, তাদের থামাতে একমাত্র প্রেক্ষাগৃহের মালিকরাই পারেন, যদি তাদের বের করে দেওয়া হয়। পাশে যারা থাকেন, তারা বাধা দিতে গেলে প্রায়ই বচসা এমন কী মারামারি পর্যন্ত হ'য়ে থাকে।

●● আপনি প্রত্যেকটি বিষয়কেই ভিন্ন দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিচার করে দেখেছেন। সেদিক থেকে আপনার বিচারে কোন ভুল নেই। কিন্তু মূলেই অর্থাৎ আপনার এই দৃষ্টিভংগীতেই ভুল থেকে গেছে। যে সমস্ত সমস্যার কথা এখানে তুলেছেন বা ইতিপূর্বে যেগুলি সম্পর্কে আমি উত্তর দিয়েছি—উত্তর দিতে যেয়ে আমি যা বলতে চেয়েছি, আমার বলার মূল উদ্দেশ্য আপনার চোখে হয়ত ধরা পড়েনি— তাই এবিষয়ে একটু পরিষ্কার করে বলতেই চেষ্টা করবো। দীর্ঘদিন পরবশতার মাঝে থেকে আমরা যে বড্ড পরনির্ভরশীল হ'য়ে উঠেছি, একথা কী আর অস্বীকার করতে পারবেন? এই পরনির্ভরশীলতা এত নিচে আমাদের টেনে নামিয়েছে যে, কোন বিষয়ে নিজেদের কতটুকু শক্তি আছে, তাও আমরা পরিমাপ করতে পাচ্ছি না। আমাদের শ্রদ্ধেয় দর্শক সাধারণও এই পরনির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত নন। তাঁদের এই আত্মবিস্মৃতির মোহজাল থেকে আত্মসচেতন করে তোলাই রূপ-মঞ্চের সর্বপ্রথম কর্তব্য। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া' বলে একটা প্রবাদ আছে। দর্শকসাধারণ এই পরের ওপর নির্ভর না করে নিজেদের ভিতর যতটুকু শক্তি আছে, তার যাতে

প্রয়োগ করতে পারেন—সেই শক্তির উন্মেষ যাতে হয়, তাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। যেমন ধরুণ, কোন চিত্রের সমালোচনায় রূপ-মঞ্চ অথবা অন্যান্য পত্র-পত্রিকা কী বল্ল না বল্ল, অন্ধের মত সেই বলাকে মেনে না নিয়ে একখানি ছবি দেখে নিজেদের বিচার শক্তির দ্বারা তার গুণাগুণ স্থির করে নিতে হবে। তারপর অন্যের বলার সংগে নিজের ধারণাকে মিলিয়ে নিয়ে দেখতে হবে, কে ঠিক বা কে বে-ঠিক বল্ল। যদি এই বিচার শক্তি জন্মে ওঠে—তখন চিত্রশিল্পের উন্নতিতেও যেমনি আপনারা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন, চিত্র-শিল্প সম্পর্কিত পত্র-পত্রিকাকেও ঠিক পথে পরিচালনা করতে পারবেন। কী করে—সেটা প্রথমে বলে নিচ্ছি। যখন এই বিচার শক্তি আপনার জন্মে উঠবে, ছবি দেখে তার নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় অংশগুলি সম্পর্কে আপনার পারিপার্শ্বিক দর্শকদের অবহিত করে তুলতে পারবেন। কোন কুরুচিপূর্ণ বা ক্ষতিকর চিত্র দেখে এসে পারিপার্শ্বিক দর্শকদের ঐ ছবির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দৃঢ়তার সংগে নিবৃত্ত হ'তে বলতে পারবেন। পত্র-পত্রিকায় ঐ ধরণের ছবির বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করতে পারবেন। এমনিভাবে প্রত্যেকটি আত্মসচেতনশীল দর্শকেরা যদি পত্র-পত্রিকা মারফৎ তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেন (অবশ্য যদি পত্র-পত্রিকার মত ভ্রান্ত হয়), তাহ'লে কর্তৃপক্ষের নজরে পড়বে। তাঁরা দর্শকদের চাহিদা সম্পর্কে একটা আঁচ পাবেন এবং এই ভাবে সমবেত প্রতিবাদের জন্য নিন্দনীয় চিত্রগুলিকে যদি পর পর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়—তখন কর্তৃপক্ষ ঐ ধরণের চিত্র নির্মাণ থেকে বিরত হবেন। পত্র-পত্রিকা সম্পর্কেও আপনাদের এই পন্থা অনুসরণ করে চলতে বলবো। যদি কোন পত্র-পত্রিকা চিত্র সমালোচনার সময় কর্তৃপক্ষের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়েন, আপনারাই তাঁদের চাবুক মেরে সচেতন করে তুলতে পারবেন। চিত্রের সমালোচনা বা গুণাগুণ বিচারের সময়ও একটা বিষয় লক্ষ্য করবার আছে। কোন চিত্র হয়ত আপনার ভাল লাগলো না। এই ভাললাগা বা না-লাগা পরস্পরের রুচির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। একথা হয়ত অস্বীকার করতে পারবেন না যে, প্রকৃত 'রুচি' বলতে আমরা যা বুঝি, তা সকলের মাঝেই এক। তাই যেটুকু বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়, তা রুচির জন্য নয়, ব্যক্তির জন্য। জল যেমন বর্ণহীন —যে পাত্রে রাখুন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, রুচিও ঠিক তাই। ব্যক্তির বিভিন্নতার জন্য রুচির বিভিন্নতা দেখতে পাই। ব্যক্তিরা যদি খাঁটি হন, তখন আর তাঁদের মাঝে রুচির বিভিন্নতা দেখতে পাবো না। কোন ছবির ভাল লাগা আর না-লাগা সম্পর্কেও এমনিভাবে মিল দেখতে পাবো। বাড়ীতে যদি একাধিকজন কোন ছবি দেখবার জন্য উৎসুক থাকেন—তখন এরূপ বিশ্বাস-

মুক্তিপ্রাপ্ত অরক্ষণীয়া চিত্রে শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী

যোগ্য কাউকে আগে পাঠিয়ে ছবিটির গুণাগুণ জেনে নেবেন। অথবা আশপাশের কারোর কাছ থেকে ছবিটি সম্পর্কে একটু আঁচ নিয়ে দেখতে যাওয়াই কী উচিত নয়? যদি আপনার বা আপনাদের ভাল লাগে, তবে অন্যকে দেখতে বলবেন, নইলে তাঁদের দেখা থেকে নিবৃত্ত করবেন। ঠিক অনুরূপভাবে আপনিও যদি চলেন, তাহ'লে নিরাশ হবার আশংকাটা খুব কম থাকে। অবশ্য প্রথম যাঁরা যাবেন, তাঁদের নিরাশ হবার ঝুঁকি নিতেই হবে। তারপর ছবির ভিতর যদি সত্যই চলবার মত মালমশলা থাকে, সে ছবি কোন প্রেক্ষাগৃহ থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যায় না। একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে চড়া দাম দিয়েও প্রবেশমূল্য সংগ্রহ করতে হয় না। এবার ধরুণ, প্রেক্ষাগৃহে ফেরিওয়ালাদের কথা। প্রথমেই বলেছি, পরের উপর নির্ভরশীল হ'য়ে না থেকে নিজেদের শক্তিকে আগে প্রয়োগ করতে হবে। আমরা যদি বেশীরভাগ দর্শক একটু সংযমী হ'য়ে উঠি—অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেমন পান, বিড়ি, সিগারেট এগুলি সংগে নিয়ে যাই—তাহ'লে প্রেক্ষাগৃহে ওগুলি কিনবার ত কোন প্রয়োজনই থাকেনা! এবং যাঁরা এগুলির অনুরোক্ত, তাঁরা যে সংগে সংগে রাখেন সে বিষয়েওত কোন সন্দেহ নেই। কিনবার প্রয়োজন হয় ফুরিয়ে গেলে,তাই প্রয়োজন মত সংগে নিয়ে গেলেই হ'লো! তাছাড়া ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে এগুলি কেনেন কারা? যাঁরা হয়ত সারা জীবন বিড়িই টেনে যাচ্ছেন—সিনেমা দেখতে যেয়ে সিগারেটে টান না মারলে যেন মর্যাদা হানি হবে বলে মনে করেন, এরূপ লোকেরাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ফেরিওয়ালাদের কাছ থেকে কিনে থাকেন। আর কেনেন তাঁরা, সিনেমা, বা থিয়েটার দেখতে যেয়ে ওখান থেকে কিছু কেনাকেই যাঁরা রেওয়াজ বা আভিজাত্য বলে মনে করেন। ঠিক এই মনোবৃত্তি নিয়ে আইসক্রীম বা অন্যান্য দ্রব্যাদিও কিনতে দেখি। সত্যকার রুচিবান দর্শকেরা যে এ দলে নেই, তা হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু তাঁরা এতদিন নিষ্ক্রীয় থেকে এসেছেন। এগুলিকে বিরক্তিকর মনে হ'লেও, বাধা দেন নি বা প্রতিবাদ করেননি। তাই, তাঁদের আজ সক্রীয় হ'য়ে উঠতে হবে। যদি কেউ এরূপ বাধা দেন, তবে দেখবেন, তাঁর দলই ভারি হ'য়ে উঠবে অর্থাৎ তাঁর আশ পাশে সমর্থকের অভাব হবে না। এবং কোন চিত্র দেখতে দেখতে যারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন, তাঁদেরও এমনি ভাবে বাধা দিতে হবে। সম্প্রতি ব্যক্তিগতভাবে এরূপ দু'টী ঘটনার সংগে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম—সেকথা এখানে উল্লেখ কচ্ছি। কিছুদিন পূর্বে আর, ডবলিউ, এ, সির সাহায্যকল্পে শ্রীরঙ্গম নাট্য-মঞ্চে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের পেশাদার শিল্পীদের সহযোগিতায় ধাত্রীপান্না ও দেবদাস নাটকাভিনয় হয়। ধাত্রীপান্নার অভিনয় রজনীর কথা। লোকে লোকারণ্য। অভিনয়ও হচ্ছে খুব উচ্চাঙ্গের। বনবীর ও পান্নার ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করছেন, ছবি বিশ্বাস ও সরযূ দেবী। আমার পার্শ্বে বসে আছেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ও আরো অনেকে। আমাদের সাত আট সারি পেছনে এক বয়স্ক ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরে যেন কী বগবগ কচ্ছিলেন। আমাদের ঠিক পিছনের সারিতে বসেছিলেন এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে। বাংলা নাট্যাভিনয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্ত তাঁরা 'ধাত্রীপান্না' দেখতে এসেছিলেন। আমি তাঁদের শিল্পীদের পরিচয় ও আনুসংগিক বিষয়গুলি ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম আস্তে আস্তে, ফাঁকে ফাঁকে—যাতে অপরের কোন অসুবিধা না হয় অথচ তাঁরা বাংলার নাট্যাভিনয় সম্পর্কে একটা উঁচু ধারণা নিয়ে যেতে পারেন। নাট্যাচার্যের সংগেও তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। পিছনের ঐ বুড়ো ভদ্রলোকটীর বগবগানীর প্রতি মাদ্রাজী ভদ্রলোকটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবককে এ বিষয়ে খোঁজ নিতে অনুরোধ জানাই। স্বেচ্ছাসেবকটি এসে আমায় জানালেন, ভদ্রলোকটি মত্ত অবস্থায় এসেছেন এবং নিজের মনে আবোল-তাবোল বকছেন। নিষেধ করলেও শুনছেন না—আরও রুখে উঠছেন। টিকেট কেটে এসেছেন তাই স্বেচ্ছাসেবক বন্ধুটি ভদ্রলোকটিকে কিছু বলতে পাচ্ছেন না—আশপাশের নাট্যামোদীরাও নন। ঐ বড়জোর দু'একবার বলছেন: আঃ দাদা থামুন না! নাট্যাচার্য আমার দিকে তাকিয়ে
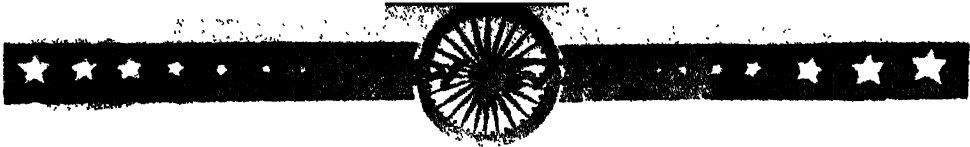
বল্লেন : দ্রব্যগুণের প্রক্রিয়া—একটু উঠে যেয়ে দেখোতো! আমি হামাগুড়ি দিয়ে ভদ্রলোকের কাছে গেলাম এবং অনুনয় বিনয় করে উঠে যেতে বল্লাম। তিনি সোজা মাটি পেয়ে রুখে উঠলেন। আমি তখন দাঁড়িয়ে তাঁকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য তাঁর একখানি হাত ধরলাম। কয়েক সারি পিছন থেকে এক ভদ্রলোক হাক দিলেন : ও লম্বাদা, বসে পড়ুন। আমি সেদিকে কর্ণপাত না করে ভদ্রলোক যখন কিছুতেই উঠতে রাজী হলেন না, তখন সবলে টান মারলাম। পেছনের ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। তিনি জামার আস্তানা গুটিয়ে তেড়ে এসে বল্লেন : আচ্ছা লোকত আপনি—অযথা একটা ভদ্রলোককে 'হেরাস' কচ্ছেন। আমি একটুকুও ভয় পেলাম না—যদিও দেহের আকারে তিনি আমার চেয়ে ভারীই ছিলেন—তবু তাঁর মত অন্ততঃ ছ'জন দেহধারীকে কাৎ করবার শক্তি এ 'লম্বাদা'র আছে এটুকু জানতাম। কারণ, ছোট বেলায় বদ খেয়ালই বলুন আর যাই বলুন—স্বদেশীযুগের পাণ্ডাদের কাছ থেকে এই কাৎ করবার শক্তি একটু আয়ত্ত করেছিলাম এবং তার পরীক্ষাও দু'একবার যে না দিতে হ'য়েছে তা নয়। তাই ভদ্রলোকের আস্ফালনে ভয় না পেয়ে উত্তর দিলাম : অযথা যে কিছু কচ্ছিনা তা বাইরে এলে জানতে পারবেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সংগী পেয়ে আরো রুখে উঠলেন—আমি তখন একটান মেরে তাঁকে টেনে তুললাম। আস্ফালনকারী ভদ্রলোকের দৃঢ়মুষ্টি উদ্যত হ'য়ে উঠলো আমার ওপর—আমার হাত আটকা থাকাতে পায়ের সাহায্য নিতে হ'লো এবং সংগে সংগে ভদ্রলোক 'পপাত ধরণীতলে'। আমি মদমত্ত ভদ্রলোকটিকে নিয়ে বাইরে এলাম। মুহূর্তের মাঝে হৈ-চৈ পড়ে গেল—অভিনয়েও বাধা পড়লো। কিন্তু প্রকৃত তথ্যও প্রকাশ হ'য়ে পড়তে দেরী লাগলো না। তখন অভিনয় ব্যাহত হবার জন্যও যে ক্ষতি স্বীকার করতে হ'য়েছিল নাট্যামোদীদের, সে ক্ষতি তাঁরা খুশীমনে মেনে নিলেন। ঐ আস্ফালনকারী ভদ্রলোকটিও সমস্ত তথ্য জেনে পরে আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে অভিনন্দন

পর্দার বাইরে পাহাড়ী সান্যালের অনেকদিন আগেকার প্রতিকৃতি।
নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

জানিয়ে গেলেন—আমিও তাঁকে আঘাত দিয়েছি বলে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। ঠিক এরূপ না হ'লেও এই ধরণের আর একটি ঘটনা ঘটেছিল কিছুদিন পূর্বে বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহে। ৫-৪৫ মিনিটে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত একখানি বাংলা ছবি দেখতে গেছি। দোতলার ড্রেস সারকেল-এর—টিকেট কিনেছি। খুব ভিড়। ছবি আরম্ভ হলো—আমার আশপাশে এবং সামনে অনেকে বসেছেন—সংগে তাঁদের বন্ধুবান্ধব ও পরিজনবর্গ। ঠিক আমার সামনের সারিতে এসে বসলেন দু'জন ভদ্রলোক দু'পাশে এবং মাঝখানে দু'জন বিবাহিতা অল্পবয়সী ভদ্রমহিলা। ছবি দেখতে দেখতে তাঁদের মনের উচ্ছ্বাসের এতই বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিল যে, আশপাশের প্রত্যেকজন দর্শক বিরক্ত বোধ কচ্ছিলেন। ভদ্রমহিলা দু'জন ভদ্রলোক দু'টীকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আশপাশের অনেকের প্রতিবাদ-গুঞ্জন কানে আসতে লাগলো—অথচ দৃঢ়ভাবে কেউ প্রতিবাদও করছেন না। অপ্রীতিকর কাজটির দায়িত্ব এবারেও আমাকে নিতে হ'লো—কোন একটী দৃশ্যে হাসির উচ্ছ্বাসে তাঁরা এতই ফেটে পড়লেন যে, নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারলুম না। আমি কঠিন স্বরে বলে উঠলাম: উচ্ছ্বাসটাকে আপাততঃ চেপে রাখুন! ভদ্রমহিলা দু'জন আমার দিকে তাকালেন—সংগে সংগে ভদ্রলোক দু'জনও কটমট করে। আমি আবার বল্লাম: ভদ্র পরিবেশের মাঝে এসেছেন—একটুখানি ভদ্রতার পরিচয় দিন!" ব্যস, শেষ পর্যন্ত তাঁরা আর বিন্দুমাত্রও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। এই উচ্ছ্বাসের প্রতিবাদ বা প্রতিকার প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা কখনও স্বহস্তে নিতে পারেন না। কারণ, তাঁরা কিছু বল্লেই দর্শকদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে। অন্যায় হ'লেও তখন দর্শকেরা অন্যায়ের পক্ষই সমর্থন করে রুখে দাঁড়ান। এর প্রমাণও যথেষ্ট দেখেছি। তাই এ দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের দর্শকদেরই। আসুন, অপরে কী করলো না করলো, তার সমালোচনা না করে আমরা নিজেরা যতটুকু করতে পারি, তার জন্য সচেতন হ'য়ে উঠি।

যোগেন্দ্র মোহন সেন (কুমার পাড়া, নৈহাটি)

●● শিশির মিত্রের স্থলে 'মনে ছিল আশা' চিত্রের সমালোচনায় কিশোর মিত্র মুদ্রিত হ'য়েছে। ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন।

মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় ও নকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা)

(১) একখানি বাংলা ছবি তুলতে কত টাকা খরচ পড়ে?

(২) ভারতী দেবী প্রথম কোন চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন?

(৩) সুমিত্রা দেবী ও সন্ধ্যারাণীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা?

●● (১) যুদ্ধের বাজারেত তিন লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ অবধি উঠেছিল। বর্তমানে দেড় লক্ষতে এসে প্রায় দাঁড়িয়েছে। এই পরিমাণকে এক লক্ষের ভিতর টেনে আনতে হবে—অবশ্য অনেকে আনছেনও। (২) সম্ভবতঃ ডাক্তার চিত্রে (৩) দু'জনেই প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী। তবে সুমিত্রার সংযত অভিনয়ের প্রশংসা না করে পারবো না। সুমিত্রার আভিজাত্যের কাছে সন্ধ্যারাণী তাঁর স্থূলতা নিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না বলেই আমার বিশ্বাস। সম্প্রতি সুমিত্রার 'প্রতিবাদে'র অভিনয় দেখে আরো খুশী হ'য়েছি।

অরুণ মুখোপাধ্যায় (চৌধুরী বাগান লেন, হাওড়া)

●● কাননদেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্স সম্পর্কিত সংবাদ গত সংখ্যায়ই দেখতে পেয়েছেন। তাঁর বাড়ীর ঠিকানা দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

সরোজ কুমার চট্টোপাধ্যায় (কাঁচড়াপাড়া)

আমাদের বাংলা দেশের চিত্র জগতে সকলের চেয়ে সুন্দর অভিনেতা ও সুন্দরী অভিনেত্রী কে কে?

●● বর্তমানে পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের চেহারা আমায় খুশী করেছে—প্রদীপ বটব্যালের নামও এপ্রসংগে বলা যেতে পারে। অভিনেত্রীদের ভিতর সুমিত্রার নাম করা যেতে পারে।

উজ্জ্বল শীল (বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● অনিয়মানুবর্তিতার অভিযোগ থেকে আমরা যে আজকাল রূপ-মঞ্চকে মুক্ত করে আনছি, আশা করি একথা স্বীকার করবেন। লতিকা মল্লিক বর্তমানে কোন ছবিতে অভিনয় করছে বলে সংবাদ পাইনি। হয়ত সে পড়াশুনা অথবা পারিবারিক জীবন নিয়ে ব্যস্ত আছে।

অরুণ প্রকাশ সেনগুপ্ত (রায় পাড়া, ঢাকুরিয়া)

●● মীরা সরকার এবং মীরা মিশ্র দু'জনেই দুই আই, সি-এস এর পত্নী। তবে শ্রীমতী মিশ্রের স্বামী কিছুদিন পূর্বে দিল্লীতে মারা যান। আপনার অন্যান্য প্রশ্ন এই বিভাগেই পরে পাঠাবেন। মণিদীপার পক্ষে পৃথকভাবে ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

রওসন আলি বিশ্বাস (কুষ্টিয়া)

●● তুমি সবে মাত্র সপ্তম শ্রেণীতে প'ড়ছো—পড়াশুনা শেষ করবার পূর্বে অন্য কোন দিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। তাই, যদি তোমার ভিতর কোন অভিনয়-স্পৃহা জেগে থাকে'ত, আপাততঃ তাকে দমিয়ে রাখো।

মণ্টু ঘোষ (শিলচর, আসাম)

স্বর্গতঃ দেবী মুখোপাধ্যায়ের সংগে কী সুমিত্রা দেবীর বিবাহ হ'য়েছিল ?

●● হ্যাঁ।

মীরা বসু (আমবাগান রোড, জামসেদপুর)

●● সুমিত্রা দেবীকে দেবী চৌধুরাণীর নাম ভূমিকায় দেখতে পাবেন।

মাষ্টার ষ্ট্যানলি (আঁটপুর, ২৪পরগণা)

(১) জনপ্রিয় অভিনেতা অশোক কুমারের উপাধি কী ? (২) সন্ধ্যারাণীর বর্তমান ঠিকানা কি ? স্বপ্ন ও সাধনার গানগুলি কি তিনি নিজে গেয়েছিলেন।

●● (১) অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। (২) সন্ধ্যারাণীর ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠলো না। সন্ধ্যারাণী সম্পর্কিত অন্যান্য কৌতূহল যথাসময়ে তাঁর জীবনীতে প্রকাশ করা হবে। স্বপ্ন ও সাধনার গানগুলি তিনি নিজে গান নি।

বারীন, অমল ও অশোক (গিরীশ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)

রূপ-মঞ্চ আমাদের কাছে এত ভাল লেগেছে কেন বলুত ত ?

●● এ প্রশ্নের উত্তর আপনারাই দিতে পারবেন !

বসুমিত্র প্রযোজিত 'কালোছায়া' চিত্রে শিশির মিত্র। প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় চিত্রখানি গৃহীত হচ্ছে।

সন্তোষকুমার নন্দী (শালগলি, চুঁচুড়া)

(১) শুনিয়াছিলাম 'চন্দ্রশেখর' চিত্রের হিন্দি তোলা হইবে। তাহার কী হইল ? যদি তোলা হয় দেবকী বাবুই কী তাহার পরিচালনা করিবেন ? (২) প্রিয়তমা চিত্রে যিনি ইন্দু মুখুজ্যের স্ত্রীর ভূমিকাভিনয় করিয়াছেন তাঁহার নাম কী ? (৩) অলকানন্দার প্রদীপ কুমারকে কি আর কোন চিত্রে দেখিতে পাইব ?

●● (১) চন্দ্রশেখর চিত্রের হিন্দি সংস্করণ বাংলা সংস্করণের সংগে সংগেই গৃহীত হয়েছিল, কয়েকখানি সংগীত পুনঃগ্রহণের ও অন্যান্য যে কাজ বাকী ছিল, তাও সমাপ্ত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বসুই হিন্দি সংস্করণ পরিচালনা করেছেন। (২) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা রায়। (৩) দেবী চৌধুরাণী চিত্রে প্রদীপ বটব্যালকে আবার দেখতে পাবেন।

সরোজকুমার মুখোপাধ্যায় (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা)

●● ছুটির দিন বাদে যে কোনদিন ১০-১১টার ভিতর আমার সংগে দেখা করে আলাপ করে যেতে পারেন। তবে আমি আপনাকে কোন পথ বাতলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনা।

শারদীয়া সংখ্যা
রূপ-মঞ্চ
১৩৫৫

যদি এখন প্রচুর সময় হাতে আছে, তবু অন্যান্য বারের চেয়ে রূপ-মঞ্চকে আরো সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে হ'লে শারদীয়া সংখ্যার প্রস্তুতি এখন থেকেই আমাদের সুরু করতে হবে। কোন কোন শিল্পীর জীবনী ও প্রতিকৃতি—কোন কোন সাহিত্যিকের গল্প, কোন কোন বিশেষজ্ঞদের রচনা এবং চিত্র ও নাট্যজগত সম্পর্কে কোন ধরণের প্রবন্ধ পাঠকসমাজ শারদীয়া রূপমঞ্চে দেখতে চান—আশা করি অবিলম্বে তা লিখে জানাবেন। শারদীয়া সংখ্যার জন্য যদি বিশেষ কোন পরিকল্পনার কথা পাঠক-সাধারণ চিন্তা করে থাকেন, তাও ব্যক্ত করবেন। তাছাড়া রূপ-মঞ্চের এই বিশেষ সংখ্যার রূপ-বিন্যাসে পাঠকসাধারণ যাতে সক্রীয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন, এজন্য শারদীয়া সংখ্যার সম্পাদনা কার্যে পাঠকসাধারণের ভিতর থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে সুযোগ দেওয়া হবে। অবশ্য এ বিষয়ে স্থানীয় পাঠকসাধারণের পক্ষেই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হবে। তাই এ বিষয়ে যারা আগ্রহশীল, তাঁদের নাম, ঠিকানা, বয়স, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও সাহিত্য-প্রীতি সম্পর্কে একটু আভাস দিয়ে নিম্ন ঠিকানায় অনতিবিলম্বে পত্র লিখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যাঁরা নির্বাচিত হবেন—তাঁরা তাঁদের অবসর ফাঁকে এসেই আমাদের উপদেশ দিয়ে যাবেন এবং সম্পাদনা কার্যে অংশ গ্রহণ করবেন।

বিনীত—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, রূপ-মঞ্চ
৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫

ধরণীধর চক্রবর্তী (সার্কুলার রোড, রাচি)

●● অশোককুমার সংক্রান্ত আপনার প্রশ্নের উত্তর এই বিভাগে অন্যত্র খুঁজে পাবেন।

সোমনাথ ভট্টাচার্য (বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা)

●● আপনি ১০-১১টার ভিতর দেখা করতে পারেন।

মনোজ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চাননতলা-নৈহাটি ২৪, পরগণা)

●● 'রাই'র জন্য বা 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদনার জন্য অভিনন্দন জানিয়েই আপনাদের কর্তব্য শেষ বলে মনে করবেন না—এই অভিনন্দনের যাতে মর্যাদা রক্ষা করে চলতে পারি, সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। শিল্পী হিসাবে যতটুকু আত্মীয়তা, তাছাড়া নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের সংগে আর কোন আত্মীয়তা নেই তবে মঞ্চ ও চিত্রজগতের পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে—এই দুই জগতের প্রত্যেক শিল্পী, কর্মী, বিশেষজ্ঞ ও কর্তৃপক্ষদের আমি নিজের পরম আত্মীয় বলেই মনে করি। নির্ধারিত সময়ে দেখা করলে চিত্রগ্রহণ দেখাবার ব্যবস্থা করে দিতে চেষ্টা করবো।

শ্রীকালীপদ নন্দী (মালদহ)

কলিকাতায় কতগুলি ষ্টুডিও আছে এবং বর্তমানে কোন কোন নতুন ষ্টুডিও নির্মিত হচ্ছে!

●● (১—২) নিউথিয়েটার্স লিঃ। ৩: ইন্দ্রপুরী, ৪। কালী ফিল্মস ষ্টুডিও, ৫। অরোরা ফিল্ম ষ্টুডিও। ৬। শ্রীভারতী লক্ষ্মী ষ্টুডিও। ৭। ইন্দ্রলোক ষ্টুডিও ৮। ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও। ৯। বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিও। ১০। ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিও। এই ষ্টুডিওগুলিতে বর্তমানে কাজ চলছে। তাছাড়া কানন দেবীর প্রভৃতির প্রচেষ্টায় একটী এবং রূপশ্রী লিঃ-এর প্রচেষ্টায় আর একটী গড়ে উঠছে। অন্য কোন সংবাদ এখনও পাইনি—পেলে জানাবো।

শান্তিপ্রসাদ দাস (ষষ্ঠিতলা, ব্যারাকপুর)

●● 'প্রলয় ঝঞ্ঝা বজ্র হানিছে' গানটি সত্য চৌধুরীই গেয়েছেন—।

আজকে যাঁরা ঝিলিক মেরে যায়—

প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায় কেবলই পরিচিত শিল্পীদের মুখ প্রতিভাত হ'য়ে উঠছে—বারবার পরিচিতদের দেখতে দেখতে বাঙ্গালী দর্শক সাধারণের চোখ ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে। পরিচিত শিল্প-গোষ্ঠীর অভিনয় নৈপুণ্যে যে ভাঁটা পড়েছে তা নয়, বরং পূর্বের চেয়ে তাদের অভিনয়ের মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাতেও দর্শক সাধারণের মন ভরছে না: বিভিন্ন চরিত্রকে বিভিন্ন রূপে রসে রূপায়িত করে তুললেও—দর্শকসাধারণের চোখে তা একঘেয়েমীর ছাপ থেকে মুক্ত হতে পাচ্ছে না। নারীত্বের বিভিন্ন রূপকে শ্রীমতী মলিনা তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে যতই বিভিন্ন ভাবে ফুটিয়ে তুলুন না কেন—সে বিভিন্নতাকে ছাড়িয়ে মলিনার নিজস্ব সত্বাটাই দর্শক সাধারণের চোখে ভেসে উঠছে। দোষটা দর্শকসাধারণের দৃষ্টিশক্তিরও নয় বা পরিচিত শিল্প-গোষ্ঠীরও নয়। বিভিন্ন নারী চরিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেখা দিলেও, নারীত্বের যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য প্রতিটি নারী চরিত্রে রয়েছে—সেই বৈশিষ্ট্য এবং শিল্পীর নিজস্ব সত্বার বৈশিষ্ট্য প্রতিবারেই প্রতিটি চরিত্রে ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। এই জন্যই পুরোন শিল্পীদের দেখতে দেখতে দর্শক সাধারণের চোখ ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে। এই জন্যই প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও পুরোনদের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। আজকে যাঁদের জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে দেখতে পাই, আগামী দিনে নতুন শিল্পীর দল তাঁদের সে স্থান দখল করে বসেন। নতুনের যখন আগমন হয়—এই আগমন-মুহূর্তে খুব কম নতুনই আলোড়নের সৃষ্টি করতে পারেন। যাঁরা পারেন, তাঁদের প্রতিভার অতুলনীয় ঔজ্জ্বল্যের কাছে মাথা না নুইয়ে পারবো না। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নতুন আসে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা নিয়ে—ব্রীড়ানত বধূর মত ধীরে ধীরে তাঁর এই সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হ'য়ে ওঠে। অবশ্য একথাও সংগে সংগে বলবো, এই প্রতিভার ঘুম ভাঙানোর জন্য সোনার কাঠির স্পর্শের দরকার। নিপুণ যাদুকরের হাতে তার যষ্টিটি যেমন অদ্ভুত প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে—অলীক হলেও দর্শকদের অভিভূত করে তোলে, তেমনি উপযুক্ত লোকের হাতে সুপ্ত প্রতিভাও অদ্ভুত বিকাশ লাভ করে এবং সে বিকাশ যাদুকরের মায়াজালের মত অলীকও নয় বা ক্ষণস্থায়ীও নয়—সে প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য সূর্য কিরণের মতই তেজোদীপ্ত ও শাশ্বত: এই বিকাশের সুযোগ না পেয়ে কত প্রতিভাই যে অন্তরালে মুখ লুকিয়েছে—তার নজির খুঁজতে বেশী বেগ পেতে হবে না। আবার সুযোগ পেয়েও প্রতিভার অভাবে কতজন যে আমাদের কাছে পীড়াদায়ক হ'য়ে উঠেছেন—তার দৃষ্টান্তও কম মিলবে না! তাই, নতুন যখন আসে, অন্ততঃ অপরিচয়ের জড়তাটুকু কাটিয়ে উঠবার সুযোগ তাঁকে দিতে হবে। প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায় যখনই কোন নতুন ঝিলিক মেরে ওঠেন—তাঁর এই প্রথম ঝিলিকে যদি আমাদের চোখের পরদা একটু টনটনিয়ে ওঠে—প্রথম প্রথম সে টনটনানি সহ্য করে নিতে হবে বৈ কী? হয়ত এমন কোন বাধাবিপত্তি ছিল—ছিল এমন কোন রহস্য, যেজন্য স্বাভাবিক পথ বেয়ে সুষ্ঠু রূপ নিয়ে ঐ ঝিলিক আমাদের চোখের সামনে প্রতিভাত হ'তে পারেনি। একটু অনুকম্পা—একটু সহনশীলতা—একটু দরদ দিয়ে আমরা যদি কোন নবাগত বা নবাগতার প্রথম প্রকাশকে বিচার করি—হয়ত তার ভবিষ্যত শিল্পজীবন এরই রস-সিঞ্চনে সুগম হ'য়ে উঠবে। বর্তমানের বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে হয়ত বা সে একদিন তাঁর পূর্ণ প্রকাশে আমাদের চোখে স্নিগ্ধ অঞ্জনের প্রলেপ মাখিয়ে বর্তমানের অস্পষ্টতাকে কাটিয়ে দিতে পারবে। পারবে সে আমাদের বর্তমানের ক্লান্তি দূর করে নতুনের দলে উপযুক্ত মর্যাদায় আসন সংগ্রহ করে নিতে। এমনি একজন নতুনের সংগে আজ আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। তাঁর ভীরু পদক্ষেপ আপনাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করেছে কিনা
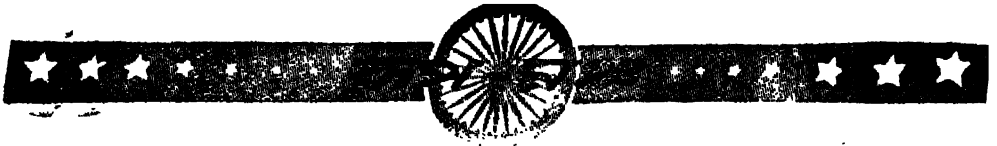
জানিনা। যদি করেও থাকে, সে ভীকতাকে বড় করে স্থান দেবেন না। অপরিচিত পথে সে পা বাড়িয়েছে—অপরিচয়ের জড়তা তার চলার গতিকে বারবার ব্যাহত-ত করবেই। তার এস্ত পদক্ষেপ আপনাদের মনটাকে সন্দেহের দোলায় দোল খাইয়েত নেবেই! নতুন যাত্রী সে, কিন্তু আপনারাত নতুন নন! আপনারা দেখেছেন এই পথে এমনি কত নতুনের আসা যাওয়া! এমনি ত্রস্তপদের পদধ্বনি কতবার আপনাদের মনে সন্দেহ জাগিয়েছে—আবার সে সন্দেহ মুছে দিতেও সক্ষম হ'য়েছে। নিন্দার বোঝা দিয়ে আজকে যার যাত্রাপথকে রুদ্ধ করতে চান—প্রশংসার অভিনন্দনে কালকে তাকে ধন্য করে তুলবেন না, এমন কথা কী নিশ্চয় করে বলতে পারেন? বয়সের দিক দিয়ে সাবালিকত্ব লাভ করলেও, অভিজ্ঞতার দিক থেকে এখনও যে নাবালিকা। একথা আর অস্বীকার করি কী করে!

বাংলা ১৩ই পৌষ, ১৩৩৩ সাল—ইংরেজী সম্ভবতঃ ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতাতেই এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তার জন্ম হয়। পৈতৃক অবস্থা সচ্ছল থাকলেও অসচ্ছলতার ভিতর দিয়েই তাকে প্রতিপালিত হ'য়ে উঠতে হয়। কারণ, এর পিতা যে পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছিলেন—তাকে আর শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে রাখতে পারেন নি। ধীরে ধীরে সে সম্পদের কোঠা শূন্য হ'য়ে আসে। পিতামাতার একটী মাত্র সন্তান কিন্তু এই একটী সন্তানকেও শেষ পর্যন্ত প্রতিপালন করবার ক্ষমতা পিতার ছিল না! অভাব ও অনাটনের ভিতর দিয়ে তবু সে বড় হ'য়ে ওঠে—যেমনিভাবে বেশীর ভাগ বাঙ্গালী পরিবারের ছেলে মেয়েদের বড় হ'য়ে উঠতে হয়। তবু তার গান বাজনার দিকে ঝোঁক - ঝোঁক তার পড়াশুনার দিকে। দরিদ্র হ'লেও কোন পিতা সন্তানের এই উৎসাহে বাধা দিতে পারেন না। বুঝবার মত বয়স যখন হ'লো, সংসারের অভাব-অভিযোগ বালিকা মনে গভীরভাবে দাগ কাটতে থাকে। কেমন করে—কবে মুক্তি পাবে তাদের এই সংসারটি অভাব অভিযোগের হাত থেকে! মুক্তির কী কোন পথ আছে? থাকলে কোথায় সে পথ? বালিকা নিজের মনেই জিজ্ঞাসা করে এ প্রশ্ন! উত্তর পায় না। উত্তর দেবার মত তখনও যে তার মনটি পাকা হ'য়ে ওঠেনি। তাই চুপ করে থাকে। অভাব অভিযোগের চাপে গুমরে গুমরে ওঠা মনের গুমট ভাবকে দমিয়ে রেখে পড়াশুনায় মন দেয়—গান বাজনার ভিতর লিপ্ত থেকে মনের সমস্ত প্রশ্নকে আপাততঃ চাপা দিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। সময়ের সংগে বছরে বছরে বেড়ে ওঠে। মনে মনে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়: আমিত বাপ মায়ের একাধারে ছেলে ও মেয়ে—আর একটু বড় হ'য়ে আমিই দূর করবো সংসারের সকল অনাটন। তার জন্য উপযুক্ত হ'য়ে উঠতে হবে। বর্তমানে না পারি—ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে নিতে দোষ কী!" তাই পড়াশুনায় বেশী করে মন বসায় গান-বাজনা আগ্রহ করে শিখতে থাকে। বিদ্যালয়ের আনন্দানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। আবৃত্তি, সংগীত ও অভিনয়ে একাধিকবার নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে পুরস্কার লাভ করে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষা ধাপে ধাপে কৃতকার্যতার সংগে উতরিয়ে দশম শ্রেণীতে এসে উঠলো। আর একটা বছর বাদে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারবে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারলে অন্ততঃ একটা চাকরি বাকরি যোগাড় করে নিতে পারবে। সেই আশায় গভীর মনোনিবেশের সংগে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে। কিন্তু সংসারের অবস্থা যেন দিন দিনই শোচনীয়তর হ'য়ে উঠতে লাগলো। যেমন করে হউক তার বাবা এতদিন সংসারটাকে চালিয়ে নিয়ে আসছিলেন—কিন্তু আর তিনি চালিয়ে নিতে পারছেন না। সম্পূর্ণ অচল অবস্থার মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। শুধু তিনিই নন—কত সংসারের কত পিতা—ভ্রাতা—স্বামী ও অভিভাবকেরাই না এমনি অচল অবস্থার সম্মুখীন হ'লেন!

১৩৫০—তার করাল রূপ নিয়ে সমস্ত বাংলাকে গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হ'লো। তার জঠরাগ্নিতে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেল কত পরিবার! তার লেলিহান জিহ্বার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে জুঝবার মত শক্তিও পেলনা কতজন! পিতৃপুরুষের ভিটে বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হ'লো—সারা
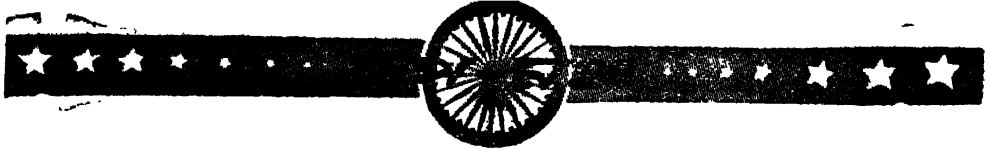
জীবন কেটেছে যে গ্রামের মাটি আঁকড়ে থেকে—সে গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে—দেশ দেশান্তরে—নগর-উপনগরে ছড়িয়ে পড়তে হ'লো। মাথার উপরে অসীম আকাশের শূন্যতা—জঠরে ক্ষুধার জ্বালা—চোখের সামনে বিরাট অনিশ্চয়তা—পায়ের নিচে দিগন্ত প্রসারিত আশ্রয়হীন পথ। কোন আশা নেই মাথা গুজবার—কোন সংস্থান নেই ক্ষুধার জ্বালাকে নিবৃত্ত করবার। 'অন্ন দাও—অন্ন দাও' বলে কত অন্নপূর্ণাই না আজ অন্নের জন্য ভিক্ষায় বেরিয়েছে! দেবাদিদেব মহাদেবের দলও আজ ক্ষুধার তাড়নায় 'হা অন্ন-হা অন্ন'—করে পথে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে দেবে অন্ন? অন্নপূর্ণাদের হাতেই যে ভিক্ষার ঝুলি! খালে—ডোবায়—রাস্তাঘাটে—নর্দমা ও ডাষ্টবিনে কার্তিক-গণেশ আর লক্ষ্মী-সরস্বতীর দল খেতে না পেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে পড়ে রয়েছে! ওরা নির্যাতিতের দল—তবু আজন্ম মাতৃভাণ্ডারের সঞ্চিত অন্ন অপরের মুখেই তুলে দিয়ে এসেছে! ওরা নিজেরা না খেতে পেয়ে মরে গেল—কিন্তু রেখে গেল ওদের কংকালসার দেহগুলি পশুপক্ষির ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। বালিকা বইয়ের পাতা উলটে যায়—ঘরের ও বাইরের ক্ষুধার জ্বালা ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তবু ও বইয়ের পাতা উলটে যায়। পরীক্ষার-পড়া পড়ে নেবার জন্য নয়—দারিদ্রের এই নির্মম সত্তাকে কবি কোন রূপে রসে তাঁর কল্পনায় রূপায়িত করে তুলেছেন—তারই সংগে মিলিয়ে নিতে, কবির কাব্যেও কী আজ সান্ত্বনা মিলবে না? ও পড়ে:

"হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছো মহান!
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীষ্টের সম্মান।"

ও থেমে পড়ে। সান্ত্বনা কিছুটা পায় বৈকী! ছুটে গিয়ে বাবাকে বলে: বাবা!"

ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর আসে: কী?"

ধীরে ধীরে ও বলে: একটা কথা বলবো বাবা, রাগ করবে না ত?"

"বলো কী বলবে?"—বাবা আশ্বাস দেন। ও বলে, "আমি বলছিলাম কী—সিনেমাতেই নেমে যাইনা কেন?"

পিতার ক্ষীণকণ্ঠ হঠাৎ যেন বজ্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠে। তিনি বলেন, "কী, কী বল্লে?"

ও তবু ওর বলা থেকে নিরস্ত হয় না: দোষ কী! আজকাল ত অনেক মেয়েরাই নামছেন?"

বাবা উত্তর দেন: নামুন! তোমার আপাততঃ নামতে হবে না। আমি না থাকলে যা হয় করো।" ও আর প্রতিবাদ করে না। অসহায় পিতার বেদনার ভার বাড়িয়ে তুলতে চায় না। দিন যায়—।

দিন যাবার মত করে যেতে চায় না। কিন্তু ওর বাবাকে চলে যেতে হয়। মা চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন। কন্যার কান্না আসে না। অব্যক্ত বেদনা কবির ভাষার উপর ভর দিয়ে মনের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে।

"ও' নয়ন ভবি রুদ্র হান অগ্নি-বাণ,
আসে রাজ্যে মহামারী দুর্ভিক্ষ তুফান।
প্রমোদ কানন পুড়ে, উড়ে অট্টালিকা,—
তোমার আইনে শুধু মৃত্যু-দণ্ড লিখা।"

প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার শেষ আশাটুকুও নির্বাপিত হ'য়ে গেল। সংসারের ভার বইবারও আর কেউ রইল না। রইল তার সামনে মাত্র একটা পথই খোলা—মৃত্যুবরণ করে তার বাবা হয়ত সেই পথেরই নির্দেশ দিয়ে গেলেন! বিধবা মা'ও সায় দিয়ে বল্লেন: আর উপায়ই বা কী আছে! যদি সিনেমায় উন্নতি করতে পারবি মনে করিস, তবে চেষ্টা করে দেখ।" চেষ্টা করতে করতে অরোরা ফিল্ম করপোরেশনে একটা সুযোগ মিলে গেল—অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের সংগে চুক্তিবদ্ধাও হ'য়ে পড়লো। এ বিষয়ে ওর এক দাদা স্বর্গতঃ তারা গাঙ্গুলী খুবই সাহায্য করেছিলেন। তিনিই ওকে নিয়ে যান অরোরায় এবং সেখানে পরিচালক চিত্ত বসু ও কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সংগে ওর পরিচয় হ'য়ে ওঠে। কিন্তু টাকার পরিমাণটা এতই কম হ'লো যে, বাধ্য হয়ে তাকে এ চুক্তি ভংগ করতে হ'লো। অবশ্য এজন্য কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র দোষ নেই। তারপর ঘোরাঘুরি করতে করতে রূপশ্রী লিঃ-এর সংস্পর্শে এলো—রূপশ্রীর সংগে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লো। শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জের পরিচালনায় রূপশ্রীর 'মৌচাকে ঢিল' চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেল। কিন্তু সুযোগ পেলনা তার প্রতিভা বিকাশের। কারণ, রূপশ্রীর 'নদনদী' চিত্রে

ওকে নায়িকার ভূমিকাভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হবে বলে কথা ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত নন্দনদীর চিত্ররূপ-গ্রহণে নানান বাধা দেখা যায়। এর পর চুক্তিবদ্ধা হ'য়ে পড়ে লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের সংগে। চিত্র জগতের আনাগোনার প্রথম থেকেই রূপ-মঞ্চের গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হয়। প্রতিমাসে রূপ-মঞ্চের জন্য আগ্রহ করে থাকে। লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্সের 'আমার দেশ' চিত্রে অভিনয় করতে করতে বুঝতে পারে—ভাগ্য তার নিতান্তই খারাপ। দ্বিতীয়বারও সে হয়ত পারবেনা দর্শকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কিত রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্যমূলক রচনা মনযোগ দিয়ে পড়ে—পড়ে অভিনয়ে জ্ঞানার্জন করবার জন্য অভিনয়-সক্রান্ত আরো অনেক বই। প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনা—তবু দমে যায়না। দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে মর্মোদ্ধারে মেতে যায়। যে নির্দেশ পায়, ঘরে বসে তা অনুশীলন করে চলে। রূপ মঞ্চে এক এক জন শিল্পীর জীবনী প্রকাশিত হয়—মঞ্চে ও চিত্রে এক একজন শিল্পীর অভিনয়ে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে ওঠে—ও ভাবে, ওর জীবনেও এমনি কৃতকার্যতা আসবে কবে! অনেক ভেবে একটা চিঠি লিখে দিল রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের কাছে। ও লিখলো: ইতিপূর্বে আপনার কাছে আর কোন চিঠি লিখিনি। রূপ-মঞ্চের ভিতর দিয়ে আপনাকে জেনেছি—সেই জানার দাবী নিয়েই লিখছি, আমি একজন নবাগতা শিল্পী—দু'একখানা ছবিতে অভিনয় করবার সুযোগও পেয়েছি—কিন্তু এমন কোন সুযোগ পাচ্ছিনা, যাতে আমার অভিনেত্রী-জীবন গৌরবদীপ্ত হয়ে উঠতে পারে। তাই আপনাকে লিখছি, যদি এমন কোন সুযোগ করে দেন, কৃতজ্ঞ থাকবো। রূপ-মঞ্চের গ্রাহক-গ্রাহিকার তালিকায় আমার নাম দেখতে পাবেন। সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিনীতা—অলকা দেবী।

'আমার দেশ' আত্মপ্রকাশ করলো। চিত্রখানি সম্পূর্ণ রূপেই ব্যর্থ হলো। এই ব্যর্থতার ঝুকি সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের ঘাড়েও কিছুটা এসে পড়লো। শ্রীমতী অলকাও এই ঝুকি গ্রহণ থেকে বাদ পড়লো না।

এমনি সময় দু'খানা ছবি পাঠিয়ে দেবার জন্য সম্পাদকের কাছ থেকে চিঠি এলো। অলকা রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে এসে সম্পাদকের কাছ দু'খানা ছবি দিয়ে গেল। সম্পাদক নিশ্চিত করে কোন আশার কথা দিতে পারলেন না—চেষ্টা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কোয়ালিটি ফিল্মস-এর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দুর্গা বসুমল্লিকের তত্বাবধানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুনীল বসুমল্লিকের প্রযোজনায় নবনির্মিত 'ওরিয়েণ্ট পিকচার্স' নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের ওপর তাঁদের প্রথম চিত্রের কাহিনী রচনা ও পরিচালনার ভার দিলেন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত শুধু রূপ-মঞ্চ সম্পাদকেরই নিকটতম বন্ধু নন, রূপ-মঞ্চ-রও তিনি একজন পরম হিতৈষী বন্ধু। রূপ-মঞ্চের প্রথম জন্ম থেকেই তিনি তাঁর সংগে জড়িত রয়েছেন। দেবনারায়ণ বাবু তাঁর 'বিচারক' চিত্রের জন্য নায়িকা খুঁজতে লাগলেন। সম্পাদককে বলতে তিনি অলকা দেবীর খোঁজ দিলেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাবসু মল্লিক ও দেবনারায়ণ গুপ্ত অলকা দেবীকে দেখতে গেলেন। তাঁরা খুবই খুশী হ'লেন শ্রীমতী অলকাকে দেখে এবং বিচারকের নায়িকার ভূমিকায় গ্রহণ করতে অভিমত ব্যক্ত করলেন। শুধু তাই নয়—তাঁরা শ্রীমতী অলকাকে নিজস্ব শিল্পীরূপে গ্রহণ করতেও চাইলেন। সমস্যা দাঁড়ালো পারিশ্রমিকের পরিমাণ নিয়ে। অর্থের প্রয়োজন থাকলেও শিল্প-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রয়োজনীয়তাই শ্রীমতী অলকার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল। এ বিষয়ে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের পরামর্শই সে মাথা পেতে গ্রহণ করলো। কোয়ালিটি ফিল্মস এর নিজস্ব শিল্পীরূপে শ্রীমতী অলকা চুক্তিবদ্ধা হয়ে গেল এবং ওরিয়েণ্ট-পিকচার্সের 'বিচারক' চিত্রের নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবে বলেও স্থিরিকৃত হয়ে গেল। বিচারকের প্রাথমিক কাজ আরম্ভ হলো। ইতিপূর্বে চিত্রপরিচালক শৈলজানন্দের সংগেও শ্রীমতী অলকা দেখা করেছিল কিন্তু তিনি তখন পর্যন্তও কোন সুযোগ দিয়ে উঠতে পারেন নি। কোয়ালিটি ফিল্মস-এর সংগে চুক্তিবদ্ধা হবার পরই পরিচালক শৈলজানন্দ তাঁর 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' চিত্রে অলকাকে গ্রহণ করবার অভিলাষ জ্ঞাপন করলেন। এই সুযোগ গ্রহণে—অলকার সামনে আইনগত বাধা দেখা দিল। অথচ শৈলজানন্দের মত পরিচালকের অধীনে অভিনয় করবার সুযোগটাকেও জীবনের কম বড় সুযোগ বলে মনে করলো না। শৈলজানন্দের কাছে সমস্ত বিষয় খুলে বল্ল। তিনি কোয়ালিটি ফিল্মস এর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দুর্গাবসুমল্লিকের কাছে অলকার জন্য অনুমতি চাইলেন। শ্রীযুক্ত মল্লিক অবিবেচক লোক নন। তিনি নিজের স্বার্থের চেয়ে তাঁর শিল্পীর স্বার্থকেই বড় করে দেখলেন এবং পরিচালক শৈলজানন্দের অধীনে শ্রীমতী অলকা অনেক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে, এই কথা চিন্তা করেই বিনা দ্বিধায় 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' চিত্রে অলকাকে অভিনয় করবার অনুমতি দিলেন। অলকা 'ঘুমিয়ে আছে গ্রামে' বেশ বড় একটী চরিত্রে অভিনয় করবার সুযোগই পেল। অহীন্দ্র চৌধুরীর বিধবা বোনের ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে হয়। এবারও অলকার দুর্ভাগ্য বলতে হবে। 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' পরিচালক শৈলজানন্দের ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভার সাক্ষ্য রূপেই আত্মপ্রকাশ করলো। শৈলজানন্দের মত পরিচালক দর্শক সাধারণকে 'ঘুমিয়ে আছে গ্রামের' মত চিত্রোপহার দিতে পারেন, দর্শকসমাজ এই অবিশ্বাসযোগ্য সত্যকে বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে পারলেন না। সত্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, এইজন্যই ক্ষুব্ধমনে 'ঘুমিয়ে আছে গ্রামকে' শৈলজানন্দের ক্ষয়িষ্ণু প্রতিভার অবদান বলেই মেনে নিতে হলো। 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম' চিত্রখানি যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন—শ্রীমতী অলকার অভিনয় তাঁদের নিরাশ করেনি—বরং আর যেসব নতুনদের সংগে এই চিত্রে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে—তাঁদের চেয়ে শ্রীমতী অলকাই প্রশংসার ভাগটা বেশী কুড়িয়ে নিয়েছে। বিচারকের কাজ সুরু হলো। নায়িকার চরিত্রটি রূপায়িত করে তুলবার দায়িত্ব দেওয়া হলো অলকাকে। এবিষয়ে পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত

এবং শ্রীযুক্ত দুর্গা বসুমল্লিকের দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারবো না। কারণ, অনেকে উক্ত ভূমিকাটি অন্য কোন খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রীর উপর ন্যস্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এঁরা সকলের অভিমত উপেক্ষা করে নিজেদের দায়িত্বে একজন নবাগতাকে যে সুযোগ দিলেন, তার প্রশংসা করবো বৈ কী! এই প্রসংগে শ্রীযুক্ত বসুমল্লিকের পূর্বেকার দূরদৃষ্টি সম্পর্কে একটু উল্লেখ করতে চাই। কোয়ালিটি ফিল্মস-এর পরিবেশনাধীনে পি, আর, প্রোডাকসন যখন শরৎচন্দ্রের পরিণীতাকে চিত্রে রূপায়িত করে তুলতে মনস্থ করেন—শ্রীযুক্ত-বসুমল্লিকের আগ্রহেই শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীকে নায়িকার ভূমিকায় গ্রহণ করা হয়। শ্রীমতী সন্ধ্যার সে নির্বাচন যে দর্শক সাধারণকে অখুশী করেনি—আশা করি সকলেই তা স্বীকার করবেন। বিচারকের চিত্রগ্রহণ সুরু করবার পূর্বে পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর নির্বাচিত নতুন শিল্পীদের নিয়ে রিহাসেল দিতে বসেন। চরিত্রগুলি পরিষ্কার করে সকলকে বুঝিয়ে দিয়ে অভিনয়-মহলা প্রসংগে যাঁর যে দুর্বলতা চোখে পড়ে, শ্রীযুক্ত গুপ্ত তা সংশোধন করে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টায় শিল্পীদের সাহায্য করেন। শ্রীমতী অলকা অন্যান্য শিল্পীদের মতই তাই পরিচালক গুপ্তের আন্তরিকতার প্রশংসা না করে পারেনা। সে প্রাণ ঢেলে দেয় চরিত্রটীর উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায়। বিচারকের চিত্রগ্রহণের কাজ আরম্ভ হয়—অলকার অভিনয়ে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেই মুগ্ধ না হয়ে পারেন না। পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর পরিশ্রমকে স্বার্থক বলেই মনে করেন। বিচারকের চিত্রগ্রহণের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে। প্রাক-প্রদর্শনীতে চিত্রখানি দেখবার যাঁদের সুযোগ হয়েছে—তাঁরা সকলেই অলকার অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। এই প্রশংসা অলকাকে ততটা খুশী করতে পারেনি-বরং তাঁর মনে ভীতিরই সঞ্চার করেছে। অলকা মনে করে, এঁদের এই প্রশংসা সত্যিকারের প্রশংসা নয়—এঁরাই সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বোচ্চ বিচারক নন—এঁদের প্রশংসার বাণীকে সে সশ্রদ্ধ ভাবে গ্রহণ করলেও—ভয়-ব্যাকুল মন নিয়ে তাঁদের রায়ের জন্যই অপেক্ষা কচ্ছে—সর্বোচ্চ বিচারালয়ের যাঁরা সর্বোচ্চ বিচারক অর্থাৎ বাংলার শ্রদ্ধেয় দর্শক-সাধারণ। 'বিচারকে'র সত্যকার বিচারের ভার তাঁদেরই হাতে। বিচারকের বিচার করে—বিচারক-এ অলকার অভিনয়ের বিচার করে তাঁরা যে রায় দেবেন—সে রায়ে অলকাকে যেটুকু প্রশংসা তাঁরা করবেন—সেই প্রশংসাকেই অভিনেত্রী জীবনে পরম পাওয়া বলেই অলকা গ্রহণ করবে। তাই যতক্ষণ না 'বিচারক' তাঁর বিচারকমণ্ডলীর সামনে ধরা দিচ্ছে, ততক্ষণ শংকিত মন নিয়েই অলকাকে কাটাতে হবে।

'পথ নির্দেশ' বলে একটী রেখা-নাট্যেও অলকা অভিনয় করেছে। তা ছাড়া বেতারের নাট্যাভিনয়েও সে মাঝে মাঝে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এজন্য শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কাছে সে খুবই কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত ভদ্রের কাছ থেকে অভিনয় সম্পর্কে যে শিক্ষা অলকা পেয়েছে—তার অভিনেত্রী জীবনে সে পাওয়া পরম পাওয়া রূপেই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। বেতারের নাট্যাভিনয়ে সরযূবালা প্রভৃতি যে সব প্রখ্যাতা শিল্পীদের সংস্পর্শে অলকা এসেছে—অভিনয় সম্পর্কে তাঁদের কাছ থেকে অলকা অনেক কিছুই জেনে নিতে পেরেছে। যাঁর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পারে—যতটুকু শিখতে পারে—অলকা সে সুযোগকে বিন্দুমাত্র অবহেলা করে না। তাঁকে যে এখন বহু জানতে হবে, বহু শিখতে হবে—তাকে যে হ'তে হবে খুব উঁচুদরের একজন শিল্পী। দর্শকসাধারণের প্রশংসা সে দু'হাত দিয়ে কুড়িয়ে নেবে—এই প্রশংসা কুড়িয়ে নেবার মত তাকে দিন দিনই যোগ্য থেকে যোগ্যতর হয়ে উঠতে হবে। অভিনয়কে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করলেও—আর্থিক কৃচ্ছতার জন্য চিত্র-জগতে পা বাড়ালেও—অভিনয়-জীবনে অলকা অর্থটাকেই বড় করে দেখেনি। শিল্পজীবনের উৎকর্ষকে সে কোনদিনই আর্থিক সাফল্যের সংগে তুলনা করে
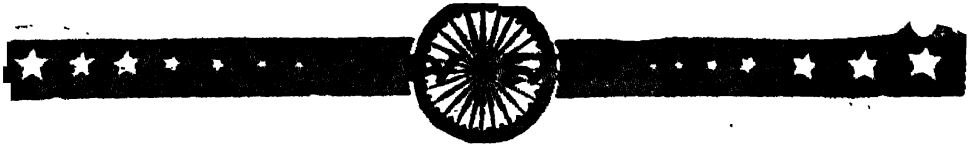
দেখেনি—দেখবেও না। সে দুর্ভাগ্য যদি কোনদিন তাঁর ওপর ভর করে শিল্পজগত থেকে বিদায় নিয়ে সে দুর্ভাগ্যের বোঝাকে এড়িয়ে যেতেও অলকা দ্বিধা করবে না। শিল্পীরূপে বড় হবে—নিজের যতটুকু প্রতিভা আছে—সে তাই নিয়ে আত্মনিয়োগ করবে শিল্পের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে—যতটুকু শক্তি হবে—শিল্পের উন্নতিতেই সে তাঁর সমস্ত সাধনাকে নিয়োজিত করবে। সেজন্য অলকা মিনতি জানায়—তাঁদের কাছে, আরো যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন শিল্পক্ষেত্রে। যাঁরা তার পূর্বে এসেছেন—যাঁরা তাঁর সংগে নেমেছেন—ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন—যাঁদের আগমনের পদধ্বনি অস্পষ্টতার বুকে এখনও লুকিয়ে আছে--সকলকেই উদ্দেশ্য করে অলকা এই মিনতি জানাতে চায়। এ তাঁর স্পর্ধার বাণী নয়—চিত্রজগতের একজন নগণ্য শিল্পীর অন্তরের আশা-আকাঙ্খার কথা। প্রতিভা ও অভিজ্ঞতায় যাঁরা শিল্পজগতে সকলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁদেরই এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে অলকা অনুরোধ জানায়—আর অনুরোধ জানায় ত্রস্ত পদক্ষেপে যাঁরা চিত্রজগতে পা-বাড়াচ্ছে, তাঁদের সহানুভূতির সংগে কাছে টেনে নিতে—তাঁদের সুচিন্তিত উপদেশ দিয়ে এঁদের অজানা পথে সাহায্য করতে। নইলে চিত্রজগতে বর্তমানের পরিবেশের মাঝে কোন নতুনই সুষ্ঠুভাবে চলতে পারবেন না। কোন নবাগত বা নবাগতা যাতে তাঁর মর্যাদা বাঁচিয়ে চলতে পারেন, সেজন্যও লক্ষ্য রাখতে অলকা অনুরোধ জানায়। অভিনেত্রীদের ভিতর চন্দ্রাবতী, মলিনা ও সরযূর অভিনয় প্রতিভা অলকাকে মুগ্ধ করে। অভিনেতাদের ভিতর ছবি বিশ্বাস ও অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয়-নৈপুণ্যকে সে অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারে না। স্বর্গতঃ দেবী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ও অলকার খুব ভাল লাগতো।

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের রচনাবলী একাধিক বার অলকা পড়েছে—তাছাড়া যে কোন বাংলা বই তাঁর পড়তে ভাল লাগে এবং অবসর সময় তাঁর কাটে পড়াশুনার ভিতর দিয়ে। অলকা গান গাইতে জানে এবং এ বিষয়ে আরো নিজেকে উপযুক্ত করে তুলছে। সকালে উঠে দৈনিক সংবাদ পত্রের পাতা না উলটে গেলে অলকার মনে অনেক খানিই খুঁত থেকে যায়। দেশবিদেশের বিভিন্ন খবরাখবর এবং রাজনৈতিক সমস্যা সে আগ্রহের সংগে পড়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক মতবাদ অলকার সাধারণ মনকে যতখানি আকৃষ্ট করে, আর কোন নেতা বা তাঁদের মতবাদ ততখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ধীর এবং শান্ত চরিত্রেই অলকা অভিনয় করতে ভালবাসে—তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রও ঠিক এরই অনুগামী। শ্রীমতী মলিনার ভিতর যে শান্ত-সমাহিত ভাব পরিলক্ষিত হয়—অলকার চেহারার ভিতর তারই ছাপ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে; বরং মলিনার চেয়েও তাঁর চেহারায় বেশী স্নিগ্ধতার আভাষ পাওয়া যায়। দেহের মেদাধিক্যের জন্য অলকা খুবই চিন্তিত এবং এজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলছে। তাছাড়া দেহের সৌন্দর্য বজায় রাখবার জন্য মেয়েদের জন্য যে ব্যায়াম প্রয়োজন, অলকা তাও মেনে চলছে। রূপ-মঞ্চের সে বহুদিন থেকেই গ্রাহিকা। শিল্পজীবনে রূপ-মঞ্চ মারফৎ অনেক কিছুই শিখতে পেরেছে বলে অলকা মনে করে। বছর তিনেক পূর্বে অলকার বিয়ে হ'য়েছে। অলকার শিল্পজীবনে তাঁর স্বামীর পূর্ণসম্মতি ও সহযোগিতা রয়েছে।

—শ্রীপার্থিব

টুকরো খবর

শ্রীপার্থিবের দপ্তর

রূপ মঞ্চের শ্রীপার্থিবের দপ্তরটি সম্পর্কে পাঠকসাধারণকে নতুন করে কিছু বলতে হবে না—কারণ, এই বিভাগটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা থেকেই আমরা বুঝতে পারি, শ্রীপার্থিবের দপ্তরটির প্রতি তাঁদের কতখানি সমর্থন রয়েছে। কিন্তু তবু এ-বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ আমাদের কাছে এসে স্তূপীকৃত হচ্ছে। প্রথম দফায় অভিযোগ আসছে তাঁদেরই কাছ থেকে—যাঁদের কথাই এই বিভাগে স্থান পেয়ে থাকে। তাঁদের অভিযোগ সত্যই আমাদের কাছে মর্মদায়ক। দ্বিতীয় দফায় অভিযোগ আসছে এমন সব নীতিবিদদের কাছ থেকে—যারা ন্যায়ের মুখোস পরে আজীবন অন্যায় করে আসছেন; যারা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য জাতির মহত্তর স্বার্থকে আজীবন পদদলিত করে আসছেন—এদের অভিযোগ মোটেই আমাদের বিচলিত করেনি। কারণ, এই সব নীতিবিদদের ফাঁকা বুলি—আমাদের কাছে অপরিচিত নয়—তাদের স্বার্থান্ধ কার্যকলাপ—তাদের মনের নীচতা বহুবার আমাদের কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠেছে। তবু এই দুই দফা অভিযোগ সম্পর্কে দুই দলের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে, তা আমরা খণ্ডন করতেই চেষ্টা করবো। প্রথম দফায় যাঁরা অভিযোগ করেন—তাঁরা চিত্র ও নাট্যজগতের শিল্পী ও কর্মীর দল অর্থাৎ যাঁদের জন্যই শ্রীপার্থিবের দপ্তরটি খোলা হ'য়েছে। তাঁরা অভিযোগ আনেন যে, এই সাক্ষাৎকার প্রসংগে ও জীবনী প্রকাশে আমরা নাকি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকি। রূপ-মঞ্চের সংগে যাঁদের মাখামাখিটা বেশী রয়েছে, তাঁদেরই জীবনী নাকি প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে। এই অভিযোগ যে কত বড় ভ্রান্ত তা যাঁদের জীবনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হ'য়েছে, তাঁদের ভিতরও যাঁরা একদিন এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন, তাঁরাই তার সাক্ষ্য দিতে পারবেন। অভিযোগ খণ্ডন করতে যেয়ে আমরা শুধু এই টুকুই বলতে পারি, ইতিপূর্বে যাঁদের জীবনী প্রকাশিত হ'য়েছে—ঐ জীবনী বা সাক্ষাৎকারের পূর্বে তাঁদের অনেকের সংগেই আমাদের চাক্ষুষ পরিচয়ও ছিলনা। তাই, মাখামাখির কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ বিষয়ে যাঁদের কাছ থেকে আগ্রহ এবং সহযোগিতার পরিচয় পেয়ে থাকি—তাঁদেরই কাছে হাজির হই। তবে একথা পূর্বেও বলেছি, এখনও বলতে চাই, চিত্র ও নাট্যজগতের প্রতিজন শিল্পী, কর্মী, বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীদের জন্যই রূপ-মঞ্চের এই বিভাগটি খোলা আছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে দর্শকদের যেমনি জানবার আগ্রহ রয়েছে—তেমনি এই জীবনী প্রকাশে সংশ্লিষ্টদের স্বার্থও যে কম জড়িত নেই, আশা করি তা তাঁরা অস্বীকার করতে পারবেন না এবং তাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই রূপ-মঞ্চে এই বিভাগটির প্রবর্তন করা হয়। কারণ, প্রথমতঃ জাতীয় জীবনে আমাদের চিত্র ও নাট্যজগতের যে উল্লেখ-যোগ্য দান আছে—তা আমাদের তথাকথিত জাতীয়তা-বাদীর দল স্বীকারই করতে চান না। কাগজ কলমের সাহায্যে তাঁদের বড় বড় বুলি মাঝে মাঝে হয়ত প্রচার করে থাকেন কিন্তু কার্যতঃ সে বুলির অন্তসারশূন্যতা সহজেই ধরা পড়ে যায়। তাঁদের কেউ কেউ আবার চিত্র ও নাট্যশিল্পের সম্ভাব্যের কথা স্বীকার করলেও—চিত্র ও নাট্যজগতের সেবায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করে আছেন—তাঁদের সেই সেবার মর্যাদা দিতে নারাজ। স্বীকার করি, চিত্র ও নাট্যজগতের বর্তমান কর্মীরা এর আশানুরূপ রূপ-বিন্যাসে কৃতকার্য হ'য়ে উঠতে পারেন নি—কিন্তু এই অকৃত-কার্যতার বোঝার সবখানিই তাঁদের ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন? আর কেউ কী এর জন্য দায়ী নন? যাঁরা এঁদের অকৃতকার্যতার দোষারোপ করেন, তাঁরা তাঁদের ক্ষেত্রে কতটুকু কৃতকার্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন? এঁদের কাছ থেকে আমাদের শিল্পীদের যে অবহেলা—যে অমর্যাদা কুড়িয়ে নিতে হয়—তারই দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁদের সেবার আদর্শকে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করবার জন্যই শ্রীপার্থিবের দপ্তরটি প্রবর্তন করা হ'য়েছে। চিত্র ও নাট্য-জগতের কথা নিয়ে রূপ-মঞ্চ গড়ে উঠেছে—চিত্র ও নাট্য-জগতের সমস্ত গৌরব ও অগৌরব থেকে রূপ-মঞ্চ নিজেকে দূরে রাখতে পারেনা। এর অগৌরবে রূপ-মঞ্চ যেমন ব্যথিত হয়, গৌরবে তেমনি গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠে।

অগৌরবের বোঝা থেকে মুক্তি পাবার জন্য যেমনি নির্মম ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অবহিত করে তোলে—তেমনি তাঁদের গৌরবের কথাও বড় করে বলতে যেয়ে তাঁদের সেবার আদর্শকেই উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তোলে। সমশ্রেণীর সমবেদনাশীল পত্রিকার বিরুদ্ধে এরূপ অলীক অভিযোগ যদি চিত্র ও নাট্য-জগতের বন্ধুরা আনেন তাতে তাঁদের আত্মঘাতী নীতির পরিচয়ই প্রকাশ পাবে। শ্রীপার্থিবের দপ্তর এর বিরুদ্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে, সহযোগিতার মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁদের সচেতন হ'তে অনুরোধ জানাবো। ভবিষ্যতে তাঁরা যাতে এই অলীক অভিযোগও আনতে না পারেন, এজন্য এখন থেকে আমরা কতগুলি নিয়মকানুন অনুসরণ করে এই সাক্ষাৎকার ও জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করবো। (১) এই ব্যবস্থামত নতুন এবং পুরাতন এই দুই শ্রেণীতে চিত্র ও নাট্যজগতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আমরা ভাগ করে নিতে চাই। (ক) নতুন বলতে যিনি সবেমাত্র প্রবেশ করেছেন আর (খ) পুরাতন বলতে যাঁরা বহুপূর্বেই পা বাড়িয়ে চিত্র ও নাট্যজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন অথবা এর সেবা করে এসেছেন। (২) দ্বিতীয়তঃ, এই দুই শ্রেণীর যাঁরা শ্রীপার্থিব দপ্তর সম্পর্কে আগ্রহশীল, তাঁরা তাঁদের নাম, ঠিকানা জানিয়ে সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমরা তাঁদের এই সম্মতি-পত্রগুলিকে ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে তালিকাভুক্ত করে নেবো এবং ঐ ক্রমিক সংখ্যানুযায়ী সাক্ষাতের এবং জীবনী প্রকাশের ব্যবস্থা করবো। (৩) তৃতীয়তঃ ঐ ক্রমিক সংখ্যানুসারে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে আমরা সাক্ষাতের কথা জানিয়ে চিঠি দেবো—অন্ততঃ একসপ্তাহ পূর্বে তাঁরা তাঁদের সুবিধামত সাক্ষাতের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করে আমাদের কাছে উত্তর পাঠাবেন। (৪) চতুর্থতঃ আমাদের সুবিধামত যেমনি এই সাক্ষাৎকার প্রসংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, তেমনি তাঁদের সুবিধামত তাঁদের নির্বাচিত স্থানে যেতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। তবে কোন প্রয়োগশালায় চিত্রগ্রহণের ফাঁকে এই সাক্ষাৎকার কোন সময়ই অনুষ্ঠিত হবে না। আশা করি, পরস্পরের সুবিধার জন্য চিত্র ও নাট্যজগতের শিল্পী ও কর্মীরা তাঁদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি জানিয়ে আমাদের তালিকাভুক্ত হ'য়ে থাকতে দ্বিধা করবেন না। অলীক অমর্যাদার কথা চিন্তা করে যদি তাঁরা এই তালিকাভুক্ত হ'য়ে থাকতে আগ্রহ প্রকাশ না করেন—তাহ'লে তাঁদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে না—পাওয়া যাবে আত্মম্ভরিতার পরিচয় এবং সেক্ষেত্রে যে অলীক অভিযোগও তাঁরা আজ আনছেন, তার ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করতে আমাদের আর মাথা খুঁড়তে হবে না—তাঁদের অসহযোগিতার মনোবৃত্তিই প্রমাণ স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। তখন আমরা আমাদের বর্তমান পন্থা অনুসরণ করেই চলতে বাধ্য হবো। দ্বিতীয় দফায় যাঁরা অভিযোগ আনেন, এবার তাঁদের সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলবো। পূর্বেই বলেছি, এদের অভিযোগে মোটেই আমরা বিচলিত নই। এরা নিজেদের মন-মুকুরের ছায়ার সংগে মিলিয়ে সমস্ত বিশ্বটাকেই বিচার করে থাকেন। নিজেদের স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতার মানদণ্ডে অপরের আন্তরিকতাকে পরিমাপ করবার শক্তি এদের নেই। তবু তাদের স্বরূপ প্রকাশ্যে উদ্ঘাটনের জন্য তাদের অভিযোগের উত্তর দেবো। এরা অভিযোগ আনেন এই বলে যে, শ্রীপার্থিবের দপ্তরে এদের অর্থাৎ চিত্র ও নাট্যজগতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 'ডেমিগড' বা খুঁদে দেবতা বলে আঁকা হয়—যে মর্যাদা এঁরা পাবার উপযুক্ত নন—তার চেয়েও বেশী মর্যাদা এঁদের দেওয়া হয় এবং এঁদের নিয়ে শ্রীপার্থিবের এ বাড়াবাড়িটা শুধু অতিরঞ্জিত নয়—অমার্জনীয়ও।" —শ্রীপার্থিবের দপ্তর প্রবর্তনের সপক্ষে যেকথা ইতিপূর্বে বলা হ'য়েছে—এঁদের অভিযোগের উত্তর তারই ভিতর কিছুটা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেকথা মূলতঃ বলা হ'য়েছে চিত্র ও নাট্যজগতের দরদীদের অর্থাৎ চিত্র ও নাট্যামোদীদের উদ্দেশ্য করে, যাতে তাঁরাও এই বিশ্ব-নিন্দুকদের ঢক্কা নিনাদে প্রভাবান্বিত হ'য়ে না পড়েন এইজন্যই এবং এই পরশ্রীকাতরদের অভিযোগের উত্তর একটু কড়া কথাতেই দিতে চাই—যাতে তারা অনধিকার চর্চায় ভবিষ্যতে হস্তক্ষেপ করতে না আসেন। প্রথম কথা,
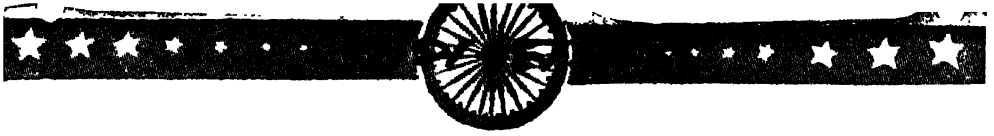
চিত্র ও নাট্যজগত এবং এর সংশ্লিষ্ট কর্মী ও তাঁদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তাঁদেরই বলবার অধিকার আছে, যাঁরা এর বা এঁদের শুধু গৌরবের অংশেই ভাগ বসাতে আসবেন না—অগৌরবের বোঝাও ভাগাভাগি করে নিতে আসবেন। এঁদের দুর্বলতাকে যাঁরা নিজেদেরই দুর্বলতা বলে মনে করবেন এবং তা শুধরে নেবার জন্য যেমনি সমালোচনা করবেন—তেমনি সংশোধনের জন্য নিজেরাও অগ্রসর হ'য়ে আসবেন। ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব কর্মজীবনের উপর খানিকটা প্রতিফলিত হ'লেও, কর্মজীবনকে বিচার করতে হ'লে ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে আনা মোটেই সমীচীন নয়—আশা করি একথা সকলেই স্বীকার করবেন। তবু কেন আমাদের সমাজ-প্রবক্তারা আমাদের চিত্র ও নাট্যজগতের বন্ধুদের শিল্প জীবনের সমালোচনা প্রসংগে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনকে টেনে আনতে চান?—স্বীকার করি, এঁদের ব্যক্তিগত জীবন কলুষমুক্ত নয়—কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁদের সম্পর্কেও যদি আমরা একটু কৌতূহলী হ'য়ে উঠি—তখন প্রদীপের নীচে যে জমাট অন্ধকার ধরা পড়বে, তাকে এরা অস্বীকার করবেন কী করে? বরং চিত্রজগতের বন্ধুদের চেনা যায়—তাঁদের দুর্বলতাগুলি তাঁরা মিথ্যা নৈতিবাদের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে চাননা—কিন্তু এদের চেনা যায়না—এরা নৈতিবাদের মুখোস প'রে চলাফেরা করে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন অন্যায় করতেও এদের বিবেকে বাধে না। তাই যদি তারা আমাদের চিত্রজগতের বন্ধুদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি থেকে বিরত না হ'ন, তাদেরও ছোবল মারতে আমরা ইতস্ততঃ করবো না।

শ্রীপার্থিবের দপ্তর যাঁরা রীতিমত পড়ে থাকেন, তাঁরাই লক্ষ্য করে থাকবেন—এমন সব সমস্যা অনেক সময় আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সামনে তুলে ধরি, যেগুলি নিয়ে তাঁরা কোনদিন ভেবে দেখেননি—তাই অনেক সময় অনেককে ব্যঙ্গোক্তি করতে শুনি, অমুক দেবী রাজনীতি নিয়ে কী বলেছেন, পড়ে দেখ—অমুকে রবীন্দ্র-সাহিত্য নিয়েই বা কী বলেছেন, দেখেছো! ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অনেকের বা অমুক দেবীর রাজনীতি বা রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে বলবার কী কোন অধিকার নেই? অধিকারের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না- তাই উত্তর আসা স্বাভাবিক—উপযুক্ততা কোথায়! সকলের যে নেই, এ কথা আমরা মেনে নেবো না—যাঁদের নেই তাঁদের সম্পর্কেও আমরা সচেতন আছি এবং আছি বলেই তাঁদের এসব বিষয়ে সচেতন করে তুলবার জন্যই এই সমস্যাগুলি তাঁদের সামনে তুলে ধরি, যাতে তাঁদের দুর্বলতা তাঁদের মনে দোলা দেয় এবং তাঁরা এসবের প্রতি যত্নবান হ'য়ে ওঠেন। প্রথমেই বলেছি. চিত্র ও নাট্যজগতের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সেবা ও আন্তরিকতাকে উপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করবার উদ্দেশ্যেই এই বিভাগটির প্রবর্তন—তাই এই বিভাগে তাঁদের উজ্জ্বল দিকটাকেই উজ্জ্বলতর করে তোলা হয়—তাঁদের দুর্বলতা আবিষ্কার শ্রীপার্থিবের দপ্তরের গণ্ডির ভিতর পড়ে না—সেজন্য সম্পাদকের দপ্তর সম্পাদকীয় ও সমালোচনা বিভাগ রয়েছে।

ষ্টুডিও সংবাদ অথবা চিত্রসংবাদ

রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত ষ্টুডিও সংবাদ অথবা চিত্রসংবাদ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মহল থেকে প্রায়ই অভিযোগ শুনতে পাই। এ সম্পর্কেও আমাদের কিছু বলবার আছে—এ-বলাটা পাঠকসাধারণ বা তথাকথিত নীতিবিদদের উদ্দেশ্য করে নয়—এ-বলাটা চিত্রজগতের কর্তৃপক্ষদের উদ্দেশ্য করেই।

রূপ-মঞ্চের আবির্ভাব চিত্রজগতের শত্রুরূপে নয়—মিত্ররূপেই এবং রূপ-মঞ্চ নিজেকে এঁদেরই একজন বলেই মনে করে। তবু রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষরা তার নির্মম নিরপেক্ষ সমালোচনার জন্য মাঝে মাঝে ভুল করে থাকেন। এই ভুলের আশংকা মনে জেগেছিল বলেই রূপ-মঞ্চের প্রথম প্রকাশ থেকেই তার দুটি রূপ সম্পর্কেই কর্তৃপক্ষদের আমরা অবহিত করে তুলতে চেয়েছি—অনেককে পেরেছি, অনেককে পারিনি। পারার জন্য সৌভাগ্য এবং না-পারার জন্য দুর্ভাগ্য বলেই মনে করবো। দুর্ভাগ্যের হাত থেকে

মুক্তি পেতে চাই বলেই নতুন করে আবার পুরোন কথার অবতারণা করতে হচ্ছে। রূপ মঞ্চের এই দুইটি রূপ হচ্ছে (১) লালন ও (২) তাড়ন। (১) চিত্র ও নাট্যজগতের সামনে যখনই যে সমস্যা দেখা দেবে—বাইরের যে বিরুদ্ধ মনোভাব এদের অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দাঁড়াতে চাইবে রূপ-মঞ্চ তার লালনের রূপ-টি নিয়ে সেক্ষেত্রে অগ্রসর হবে এবং জনসাধারণের মন থেকে চিত্র ও নাট্যজগত সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব দূর করতে আপ্রাণ সংগ্রাম করে যাবে। তাছাড়া কর্তৃপক্ষদের কর্ম তৎপরতা সম্পর্কে জনসাধারণকে ওয়াকিফহাল করে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। (২) দ্বিতীয় রূপটি হচ্ছে তাড়নের। চিত্র ও নাট্যজগতে যে কোন দুর্বলতা যখনই মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে—তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সংশোধন করবার জন্য রূপ-মঞ্চ সক্রীয় অংশ গ্রহণ করবে। এই দুইটী রূপ মূলতঃ ব্যক্ত হ'য়ে থাকে প্রচার ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে। কর্তৃপক্ষদের যা অভিযোগ তা এই প্রচার কার্যের বিরুদ্ধেই। এই প্রচার কার্য সাধারণতঃ আমাদের দিক থেকে রূপ পেয়ে থাকে কোন চিত্রের সংবাদ-পরিবেশনা ও চিত্রমুদ্রণের ভিতর দিয়ে। আর কর্তৃপক্ষের দিক থেকে রূপ পেয়ে থাকে বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে। কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অভিযোগ করেন যে, এই সংবাদ পরিবেশনা কার্যে আমরা নাকি পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিয়ে থাকি। যার প্রকৃত নগ্নরূপটি হ'লো—কোন সংখ্যায় কোন প্রতিষ্ঠানের সংবাদ একটু বেশী স্থান নিয়ে যদি পরিবেশিত হয়—যাঁদের সংবাদ ততখানি স্থান নিয়ে পরিবেশিত হয় না তাদের ঈর্ষা বা পরশ্রীকাতরতা অভিযোগের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। অথচ এবিষয়ে গলদ যে তাঁদেরই, তা বলাই বাহুল্য এবং সে গলদ সংশোধনে তাঁদের মোটেই তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই এবিষয়ে একটু বিশদভাবে আলোচনা করতে চাই। চিত্রজগতের যে কোন কর্তৃপক্ষের জন্য কোন চিত্র-নির্মাণারম্ভ থেকে মুক্তির পূর্ব পর্যন্ত উক্ত চিত্রের প্রচার কার্যের জন্য রূপ-মঞ্চ তার চিত্রসংবাদ অথবা ষ্টুডিও সংবাদ বিভাগটি তুলে ধরে। নির্মীয়মান চিত্র সম্পর্কে দর্শকসাধারণের মনকে আগ্রহান্বিত করে তুলবার উদ্দেশ্যেই কর্তৃপক্ষদের এই সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হ'চ্ছে, এই সুযোগ গ্রহণ নিয়ে। সুযোগ দিলেই হয় না—সুযোগ গ্রহণ করবার উপযুক্ততাও থাকা চাই। এই সুযোগ গ্রহণের উপযুক্ততা যাঁদের ভিতর পরিলক্ষিত হয়না, তাঁরাই ঈর্ষান্বিত হ'য়ে ওঠেন তাঁদের উপর, যাদের সুযোগ গ্রহণের উপযুক্ততা পূর্ণ ভাবেই রয়েছে। তখন ঈর্ষায় প্রকৃত সত্যকে বিচার করতে না পেরে আমাদের পক্ষপাতিত্বের দোহাই দিয়ে বিষ ঝাড়তে আরম্ভ করেন। এঁদের অনুপযুক্ততার কথা যে কোন পত্র-পত্রিকাই স্বীকার করবেন। পাঠকসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরাও একটু আভাষ দিচ্ছি। রূপ-মঞ্চে কোন চিত্র সম্পর্কে দুই প্রকারের সংবাদ পরিবেশিত হ'য়ে থাকে। একটা সংক্ষিপ্ত আকারে আর একটা বিশদ আকারে। সংক্ষিপ্ত সংবাদে কোন ছবির পরিচালক, প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপের ভিতরই সংবাদ পরিবেশন করা হ'য়ে থাকে। আর বিশদভাবে যখন পরিবেশিত হয়, তখন কোন চিত্রের দৃশ্যপটে উপস্থিত থেকে সেই বিশেষ দৃশ্য নিয়ে অথবা ছবিটির কোন বিশেষ প্রচারযোগ্য অংশ নিয়ে কাহিনী অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়ে চিত্রটি সম্পর্কে দর্শকসাধারণের মনকে কৌতুহলী করে তোলা হয়। কখনও এই সংবাদ আমরা লিখে থাকি কখনও কর্তৃপক্ষরাও লিখে থাকেন। এই বিশদভাবে সংবাদ পরিবেশনে কর্তৃপক্ষের যেমন বৃহত্তর স্বার্থও সাধিত হ'য়ে থাকে, পাঠক-পাঠিকারাও তেমনি সংক্ষিপ্ত সংবাদের একঘেয়েমী থেকে রেহাই পেয়ে থাকেন। সংক্ষিপ্ত এবং বিশদ সংবাদ পরিবেশনে—উভয় ক্ষেত্রেই দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের। কারণ, যিনি যত সুষ্ঠু প্রচার কার্য করে তাঁর ছবির প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারবেন—তাঁর পকেটেই তত বেশী অর্থাগম হবে এবং সে অর্থ থেকে কাগজওয়ালাদের নিশ্চয়ই তাঁরা ভাগ দেবেন না! তাই কোন ছবির প্রচারের দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রচারসচিব থাকা প্রয়োজন এবং অনেকে রাখেনও। পত্র-পত্রিকার সহযোগিতায় এবং প্রচার সচিবের নৈপুণ্যেই কোন চিত্রের সুষ্ঠু
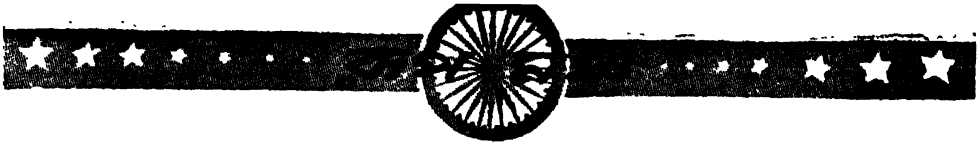
প্রচার কার্য হওয়া সম্ভব হ'লেও, আবার একথাও বলতে হবে, যদি প্রযোজক সম্ভায় কিস্তিমাৎ করতে না চান। পত্র-পত্রিকাগুলিকে কোন চিত্র সম্পর্কে সংবাদ সরবরাহ করবার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট চিত্র প্রতিষ্ঠানের। যিনি যতবেশী নিপুণ প্রচারবিদ হবেন, তিনিই তত সুষ্ঠুভাবে তাঁর চিত্রের সংবাদ সরবরাহ করতে পারবেন। সুনিপুণ প্রচারবিদের সংবাদ সরবরাহের ভিতর সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট ভাবেই পরিলক্ষিত হয় এবং পত্রপত্রিকাগুলি যে এই নিপুণ প্রচারবিদের সংবাদকেই অগ্রে স্থান দেবেন, তার বিরুদ্ধেও কিছু বলবার আছে বলে মনে করিনা। কিন্তু এই নিপুণ প্রচারবিদদের সংখ্যা খুবই কম—যাঁরা আছেন, তাঁদের পারিশ্রমিক একটু বেশী দিতে হয় বলে কর্তৃপক্ষরা এব্যাপারটা একাবারে নমঃনমঃ করে সেরে ফেলতে চান। তাই এই প্রচারকার্যের দায়িত্ব চাপিয়ে এমন লোকদের বহাল করা হয়ে থাকে, যারা ইংরেজীতে দূরের কথা, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বাংলায়ও পুরো একটা বাক্য শুদ্ধ করে লিখতে পারেন না। এখনেও তার প্রতিটি বাক্যে অন্ততঃ দু'তিনটি অশুদ্ধ বানান চোখে পড়াও অস্বাভাবিক নয়। এদের দিয়ে শুধু প্রচার নয় —'শিবের গীত থেকে ধানভানা' সবই করিয়ে নেওয়া হ'য়ে থাকে। অন্যান্য পত্রপত্রিকার কথা থাক, রূপ-মঞ্চে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদগুলি তৈরী করে থাকেন রূপ-মঞ্চের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা। এমন কী মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনও তৈরী করে দিতে হয়, বিনা পারিশ্রমিকে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েও যদি অভিযোগ শুনতে হয়, তখন 'বলমা তারা দাঁড়াই কোথা' ছাড়া আর কী আমাদের বলবার থাকে? পাঠক-পাঠিকাদের বিশ্বাসের জন্য চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির তথাকথিত প্রচারবিদদের বিদ্যার নমুনা এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কোন ধরণের প্রচারবিদ আছেন, তার নামোল্লেখ ও তাদের প্রচার-রচনা হুবহু তুলে দিয়ে জলন্ত দৃষ্টান্ত দিতে পারতাম কিন্তু সহজ ভদ্রতার খাতিরেই তাথেকে আমরা বিরত হলাম। শুধু এই প্রচারবিদদের দুর্বলতার কথাই যে বলার আছে তা নয়, অনেক সময় এ বিষয়ে পরিচালকদের ভাষাজ্ঞানও আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। অথচ তবু তাঁরা হুমকি দিতে ছাড়েন না। অযোগ্যদের এই আস্ফালন অনতিবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। তাই তাদের নামোল্লেখ না করে সাধারণভাবেই আমরা সতর্ক করে দিতে চাই। যদি যোগ্যতা থাকে, তাঁরা তার পরিচয় দিন, নইলে অযথা অযোগ্যতার দম্ভ নিয়ে যেন লাফালাফি না করেন। এবার বলি বিশদভাবে সংবাদ পরিবেশনের কথা। রূপ-মঞ্চই এই ধরণের সংবাদ প্রথম প্রবর্তন করে। আজ বিশদভাবে সংবাদ পরিবেশনা শুধু যে পাঠক-সাধারণের দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছে, তা নয়—চিত্রজগতের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও আকর্ষণ করেছে প্রথম প্রথম আমরা নিজেরা উপস্থিত থেকে এই ধরনের সংবাদ নিজেরাই রচনা করে দিতাম (এখনও দিয়ে থাকি)। যে কয় পৃষ্ঠা ধরে এই ধরণের সংবাদ মুদ্রিত হ'য়ে থাকে—বিজ্ঞাপণের হারের সংগে সমতা রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষদের সংগে পরামর্শ করে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যার একটা মূল্য ধার্য করা হ'য়ে থাকে। যাঁরা এই ধরণের সংবাদ পরিবেশনে রচনা ও ব্যয়ভার বহন করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন —সহযোগিতার সর্বপ্রকার মনোবৃত্তি নিয়েই তাঁদের জন্য এই ধরণের সংবাদ পরিবেশন করা হ'য়ে থাকে এবং এর ভিতর কোন লুকোচুরিও নেই, ধাপ্পাবাজীও নেই। এই সুযোগও প্রত্যেকের জন্যই উন্মুক্ত থাকে। সংক্ষিপ্ত সংবাদের ভিতর সামান্য কয়েকজন শিল্পীর প্রচার কার্য করে যে সব পরিচালক বা প্রযোজক খুশী হন না—চিত্র নির্মাণের যে গোষ্ঠি নিয়ে তিনি বা তাঁরা কাজে নেমেছেন, সেই গোষ্ঠির প্রচার কার্য করবার উদারতা যাঁদের আছে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁরাই এই বিশদ সংবাদ পরিবেশনের সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছ থেকে যে সহযোগিতা লাভ করেন, তার মূল্য—আর্থিক খরচের তুলনায় অনেক বেশী। সে দূরদৃষ্টি যাঁদের নেই—তাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহও প্রকাশ করবেন না। অথচ যাঁদের আছে এবং যাঁরা এ বিষয়ে আগ্রহশীল, তাঁদের সংবাদ পরিবেশন দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবেন। তাঁরা জ্বলে মরুন আপত্তি নেই, কিন্তু আমাদের সে জ্বালার ভিতর টেনে নিতে চান কেন? যদি তাঁরা এই জ্বালার হাত থেকে রেহাই পেতে চান—এবিষয়ে সম্মতি থাকলে পূর্বে থেকে

আমাদের জানালেই আমরা সে জালা নিবারণের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করবো।

প্রতিবাদ (সমালোচনা)

গত ১৯শে জুন থেকে নিউ থিয়েটার্সের বাংলা বাণীচিত্র 'প্রতিবাদ' একযোগে চিত্রা ও রূপালী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে। প্রতিবাদের পরিচালনা, কাহিনী রচনা ও সংগীত পরিচালনা করেছেন যথাক্রমে হেমচন্দ্র চন্দ্র, বিনয় চট্টোপাধ্যায় ও পঙ্কজ কুমার মল্লিক। আলোক চিত্র গ্রহণ, শব্দ গ্রহণ এবং শিল্প নির্দেশনার দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে সুধীন মজুমদার, শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সৌরেন সেনের উপর। সম্পাদনা করেছেন সুবোধ মিত্র এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ৺দেবী মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কালী সরকার, চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা, ভারতী প্রভৃতি আরো অনেকে। 'প্রতিবাদ' অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করেছে।

প্রতিবাদের নির্মাণ-সংবাদ বহুদিন পূর্বেই ঘোষিত হ'য়েছিল। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রচার উদ্দেশ্যে 'প্রতিবাদ' নির্মিত হচ্ছে বলে যুদ্ধের সময়ই ঘোষণা করা হ'য়েছিল বলে মনে হয়। দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পর 'প্রতিবাদ' অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে বলে প্রচার। কিন্তু প্রতিবাদের মূল উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হ'য়েছে, একথা পরম বেদনার সংগেই বলতে হয়। অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, অপূর্ব চিত্রগ্রহণ প্রভৃতি অন্যান্য দিক থেকে 'প্রতিবাদে'র সার্থকতা আমরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নেবো—বাংলা ছায়াজগতে নিউ থিয়েটার্সের মর্যাদা প্রতিবাদ অক্ষুন্নই রেখেছে একথাও অস্বীকার করবো না। কিন্তু যে আদর্শ নিয়ে—যে বিষয়বস্তু নিয়ে 'প্রতিবাদ' প্রতিবাদ জানাতে চেয়েছিল, প্রতিবাদের এই মূল উদ্দেশ্য আর শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি—তাই সেদিক থেকে প্রতিবাদকে স্বীকার করে নেবো কী করে? শুধু মহাত্মা গান্ধী নন, সভ্যতার প্রথম যুগ থেকে ভারতের আত্মা সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টায়ই নিয়োজিত হ'য়ে এসেছে—'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই সত্যকেই বারবার তুলে ধরেছে আমাদের সামনে—যখনই অলীক ভেদাভেদের মোহজালে আচ্ছন্ন হ'য়ে আমরা এই প্রকৃত সত্যকে ভুলতে বসেছি। ভগবান শ্রীরাম অনার্য গুহক-চণ্ডালকে বন্ধুত্বের আবরণে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বুদ্ধ-শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব কবীরা এই সত্যেরই জয়গানে আজন্ম কাটিয়ে দিয়েছেন—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব ও স্বামী বিবেকানন্দের মাঝে সেই শাশ্বত সত্যের ধারা-প্রবাহিত হ'য়ে এসে মহাত্মা গান্ধীর মাঝে রূপলাভ করেছিল। যখনই আমরা এই সত্যকে ভুলে যেতে বসেছি, তখনই এমন কোন যুগ প্রবর্তক—এমন কোন মহাপুরুষ—এমন কোন সত্যদ্রষ্টা ঋষির আবির্ভাব হ'য়েছে আমাদের দেশে, যাঁরা আমাদের বিভ্রান্ত গতিপথ থেকে ফিরিয়ে এনে সত্যকার পথ নির্দেশ দিয়েছেন—যাঁরা আমাদের দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা দূর করে - অন্ধকারের মাঝে ঠিক পথে চলবার জন্য আমাদের অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ সাধন করেছেন। অস্পৃশ্যতা এবং সামাজিক ভেদাভেদ আমাদের জাতীয় জীবনকে কতখানি দুর্বিসহ করে তুলেছে—তা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই আর বিশদ ভাবে বলতে হবে না। এই দুর্বিসহ যন্ত্রনার হাত থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীকে আমরণ সংগ্রাম করে যেতে দেখেছি—তবু আজও আমরা এর হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। শেষ পর্যন্ত অন্যান্য মহাপুরুষের মতই গান্ধীজীকে তাঁর আদর্শের জন্য আত্মাহুতি দিতে হ'লো। কিন্তু তবু আমাদের মনের অন্ধত্ব ঘুচলো কোথায়? আজও এই অস্পৃশ্যতা ও ভেদাভেদ আমাদের সমাজজীবন থেকে দূর হ'য়ে যায়নি। তাই এব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেককে সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে। মহাত্মাজী এবং তাঁর পূর্বতম মহাপুরুষেরা যে পথ নির্দেশ দিয়ে গেছেন—সেই পথ নির্দেশ অনুযায়ীই আমাদের চলতে হবে। জাতি গঠনে—কোন আদর্শ প্রচারে চলচ্চিত্রের সম্ভাবনা প্রচুর। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সম্ভাবনার প্রতি আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র প্রযোজকদের লক্ষ্য খুবই কম। নিউ থিয়েটার্স লিঃ দীর্ঘ দিন ধরে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সেবা করে আসছেন—এই সেবার কথা চিন্তা করেই বাঙ্গালী দর্শকসমাজ যদি বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের
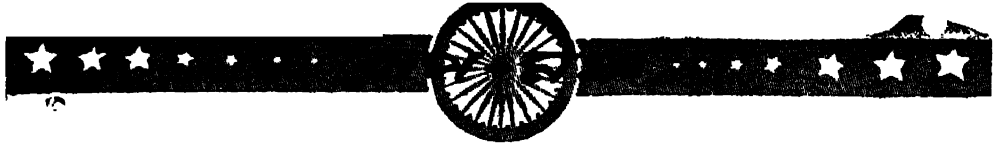
নির্দেশকের গৌরবে তাঁদের ভূষিত করেন, তাতে অপরের হিংসা করবার কোন যুক্তিসংগত কারন নেই। চলচ্চিত্রের মারফৎ জাতির এক বিরাট সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় নিউ থিয়েটার্সের 'প্রতিবাদ' চিত্রখানি নতুন করে নিউ-থিয়েটার্সের জন্য জাতির শ্রদ্ধালাভ করবে। নিউথিয়েটার্সের এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্য সে শ্রদ্ধা আমরাও দিতে কার্পণ্য করবো না। কিন্তু প্রশংসনীয় হ'লেও, এই প্রচেষ্টা যে সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পারেনি, সেজন্য বেদনাও আমাদের কম নয়। প্রতিবাদের কাহিনীর একটু আভাস দিলেই আমাদের অভিযোগের এই সত্যতা প্রমাণিত হবে। প্রতিবাদের প্রধান নায়ক জমিদার বেণীপ্রসাদ। তারই জমিদারীর এলাকাভুক্ত থেকে একটী অস্পৃশ্য পিতৃমাতৃহীন শিশুকে নিয়ে এসে বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। তার স্ত্রী লাবণ্যও স্বামীর মহত্তর আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে শিশুটিকে বুকে টেনে নিলেন। শিশুটি বড় হ'য়ে উঠতে লাগলো। তার নাম রাখা হ'লো মালতী এবং বেণীপ্রসাদের নিজের মেয়ে মাধবীর সংগেই প্রতিপালিত হ'তে লাগলো। মাধবী ও মালতী এক সংগে খেলা করে--তাদের সাথে বালক রঞ্জনকেও দেখা যায়। বেণীপ্রসাদের গৃহ দেবতার পূজার ভার তাদের কুলগুরুর উপর। তিনি সনাতন পন্থী এবং জাতিবিচার মেনে চলেন—তিনি মালতীর প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে প্রতিবাদস্বরূপ বেণীপ্রসাদকে পরিত্যাগ করেন। বেণীপ্রসাদ তাতেও তাঁর আদর্শ থেকে বিচলিত হ'লেন না। বরং অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য সক্রীয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং কোন একটী মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকারের দাবী নিয়ে যখন অন্যান্যদের সংগে উপস্থিত হন, তখন মন্দির কর্তৃপক্ষের লোকদের দ্বারা আহত হন এবং মারা যান। বেণীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী তাঁর আদর্শের জন্য কাজ করে যান। মালতী মানুষ হ'তে থাকে গায়ে, বেণীপ্রসাদের স্ত্রীর কাছে। মাধবী কলকাতায় মামার কাছে থেকে পড়াশুনা করে। আর রঞ্জন পড়াশুনা শেষ করে গ্রামেই ফিরে আসে এবং তাকে দেখতে পাই বেণী-প্রসাদের কুলদেবতার ভার নিয়ে থাকতে। মাধবী ও রঞ্জন পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের দু'জনের বিয়ে হবে একথা তারাও যেমন জানতো, মাধবীর মা লাবণ্য দেবীও একদিন রঞ্জনকে তা জানিয়ে দিলেন। এদিকে মালতীর মনে অলক্ষ্যে রঞ্জন স্থান করে নিয়েছিল। মালতী মাধবীর সংগে একবার কলকাতায় এলো—সেখানে পরিচিত হয়ে উঠলো মাধবীর মামার একনৈক সহকারীর সংগে। মানুষ হিসাবে তাঁকে মালতীর খুবই ভাল লাগলো। তিনি মালতীকে একদিন তাঁদের বাড়ী নিয়ে গেলেন এবং মালতীকে বিবাহ করবেন বলে প্রস্তাব করলেন। মালতী কোন উত্তর না দিয়ে কলকাতার বাড়ীতে চলে এলো এবং সেখান থেকে সেই দিনই আবার চলে এলো তাদের দেশের বাড়ীতে—যেখানে তার রঞ্জন রয়েছে। মালতীর মনে এই কথাই বার বার উঁকি মারতে লাগলো, যদি এমনি কারোর সংগে নিজের জীবনকে জড়িয়ে নিতে হয়, ত এজনের সংগেই সম্ভব এবং সে রঞ্জন ছাড়া আর কেউ নয়। রঞ্জনের কাছে মালতী তার হৃদয়ের গুপ্ত কথা প্রকাশ করলো এবং তারও ধারনা ছিল, রঞ্জন এতে রাজী না হয়ে পারে না। রঞ্জন যথাসম্ভব মালতীকে এড়িয়ে যেতে লাগলো কিন্তু তার সারল্য ও বিশ্বাসকে কোন মতেই রঞ্জন অবহেলা করতে পারলো না। ব্যাপারটা মাধবীর কানে গেল। রঞ্জন মাধবীকে সমস্ত খুলে বল্ল। মালতীকে বিয়ে করবার জন্য মাধবী রঞ্জনকে অনুরোধ করলো এবং তার বাবার আদর্শের কথা উল্লেখ করে এই অনুরোধ প্রতিপালন করবার জন্য তার দৃঢ়তাও ব্যক্ত করলো। তারপর মাধবী দক্ষিণ ভারতে না কোথাকার কোন মন্দিরে হরি-জনদের প্রবেশাধিকারের সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে রওনা হলো। মাধবীদের বাড়ী ঝুলন উৎসবে মুখরিত—মাধবী ফিরে এলো তার কাজ সেরে। রঞ্জন এক ফাঁকে মালতীকে তার প্রকৃত পরিচয় বলে দিল। যে ব্রাহ্মণ্যত্ব নিয়ে মালতী এতদিন গর্ব করে এসেছে, সে ব্রাহ্মণ্যত্বে তার কোন অধিকার নেই--এই কথা জানতে পেরে মালতী সকলের অসাক্ষাতে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করলো। রঞ্জনের সংগে মাধবীর মিলনের আর কোন বাধা রইল না—

চিত্রে তা না দেখালেও, অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না। কিছুদিন পরের ঝুলন উৎসবের দৃশ্য দিয়েই চিত্রটিকে আরম্ভ করা হয়েছে এবং ফ্লাস ব্যাক' টেকনিকে চিত্রের কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। কাহিনীর অবাস্তবতার কথা যদি আমরা বাদও দি', তবু যে সমস্যা নিয়ে কাহিনীর অবতারণা, সে সমস্যা যে মালতীর আত্মহত্যার সংগে সংগেই ব্যর্থ হয়ে গেল, একথা কাহিনীকার কোনমতেই অস্বীকার করতে পারবেন না। মূল উদ্দেশ্য যেখানে ব্যর্থ হলো, সেখানে শাখাপ্রশাখার সার্থকতা কী করে স্বীকার করবো! তারপর বহু অসম্ভব ঘটনাকে এমনি ভাবে সম্ভব বলে কাহিনীকার চালিয়ে দিতে চেয়েছেন—যাতে তাঁর বক্তব্য একাধিক স্থানে অসামঞ্জস রূপেতো দেখা দিয়েছেই, অধিকন্তু কাহিনীর গতি নিয়ন্ত্রণে তাঁর অক্ষমতার পরিচয়ই ফুটে উঠেছে। মালতী চরিত্রটির কথাই প্রথম বলি। কারণ, তাকে নিয়েই সমস্যাটি কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে। মালতীকে বেণীপ্রসাদ ঝড় জলের রাত্রে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে এলেন—মালতী বড় হয়ে উঠতে লাগলো—। ছয় সাত বছরের পূর্বে তার পরিচয় বেণীপ্রসাদের কুলগুরুও জানতে পারলেন না। রঞ্জন বলবার পূর্বে মালতী তার সত্যকার পরিচয় আবিষ্কার করতে পারেনি, একে হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে। বেণীপ্রসাদের জমিদারী ভুক্ত এলাকা থেকেই মালতীকে আনা হয়েছিল এবং বেণীপ্রসাদের বাড়ীতেই সে প্রতিপালিত হ'তে লাগলো অথচ গাঁয়ের কেউই মালতীর সত্যকার পরিচয় জানতে পারলো না—। ছ' সাত বছর পর গুরুদেবের মুখ থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে, মালতীর জন্মরহস্য অপ্রকাশিত রয়নি। গ্রাম সম্পর্কে যদি কাহিনীকারের বিন্দুমাত্রও অভিজ্ঞতা থাকতো, তবে মালতীর পরিচয় ছ' সাত বছর অবধি তিনি গ্রামবাসীদের কাছে অনাবিষ্কৃত রাখতে পারতেন না। আজীবন গ্রামে কাটিয়ে নিজের জীবন-রহস্য মালতী জানতে পারলো না—এটা আরও অসম্ভব। তারপর মালতীকে সরিয়ে দেবার সংগে সংগেইত মূল বিষয় গেল ধূলিসাৎ হয়ে। এই মূল উদ্দেশ্য যেজন্য ব্যর্থ হয়েছে, তা হচ্ছে একটা সমস্যা থেকে আর একটা সমস্যার অবতারণা করবার সহজ লোভ কাহিনীকার সম্বরণ করতে পারেন নি। তিনি চেয়েছিলেন, বিভিন্ন ঘটনা স্রোতের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন সংঘাতের সৃষ্টি করে দর্শক সাধারণের মনকে সবসময়ই সম্পূর্ণ চিত্রটার সংগে দোদুল্যমান অবস্থায় রাখতে—তার এই প্রচেষ্টাকে প্রশংসাই করতাম, যদি তিনি মূলকে এই বিভিন্ন সমস্যার ভিতর দিয়ে নিয়ে যেয়েও ঠিক রাখতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি পারেন নি। এজন্য আরো বেশী শক্তিমত্তার প্রয়োজন। দর্শক মনকে অবিশ্রান্ত ভাবে ঘটনা ও সমস্যায় অভিভূত করে রাখবার জন্যই মালতীকে ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা করে তুললেন - তার পরিচয় অস্বাভাবিক ভাবে গোপন রেখে—রঞ্জন, মাধবী এবং মালতীকে নিয়ে আর এক সমস্যার অবতারণা করলেন। মাধবীর পোষাক পরিচ্ছদের বাহার দেখাতে যেয়ে তাকে বাংলা থেকে যদি দূরে হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দাবী জানাতে না নিয়ে যেতেন, তবেই বুদ্ধিমানের কাজ করতেন। মাধবীর কী বাংলাতে অস্পৃশ্য আন্দোলন বিষয়ে কোন কিছু করবার ছিল না? মাধবীর যাওয়া এবং আসা এতই অকস্মাৎ ঘটেছে যে, তাতে তার হরিজনদের প্রতি আন্তরিকতা ফুটে উঠেনি—ফুটে উঠেছে তার রঞ্জন-বিচ্ছেদের জ্বালা নিবারণের ইচ্ছা এবং পরিচালক বা কাহিনীকারের ঠিক প্রয়োজনমত আবার তাকে ঘুরিয়ে আনার সহজ উপায়। সবই যেন

ইলেকট্রিক সুইচ টিপে চালান হয়েছে। অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে কাহিনীকারের কতটুকু জ্ঞান জন্মেছে, তার প্রতি যদি দর্শক সাধারণ সন্দিহান হয়ে উঠেন, তাহ'লেও তাঁদের দোষ দেব না —। কারণ, এক মন্দিরের প্রবেশাধিকারের দাবী ছাড়া অস্পৃশ্যদের আর কোন অধিকারের দাবীই বর্তমান চিত্রে স্বীকৃত হয় নি। মন্দিরে প্রবেশাধিকার ত একটা তুচ্ছ ব্যাপার। অন্তর থেকে যখন ভেদাভেদ দূর হবে, তখন ও সমস্যাটার আপনা থেকেই সমাধান হয়ে যাবে। তারপর বেণীপ্রসাদ প্রভৃতিকে মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন করতে দেখি বাংলা দেশে ওরূপ আন্দোলন হ'লেও, তার রূপ অন্য ধরণের। সে-ধরণ সম্পর্কেও কাহিনীকারের বা পরিচালকের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইনি।

রঞ্জনের মত শিক্ষিত ছেলে গ্রামে এসে মন্দিরের ভার নেবে, বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ ছেলে মেলা দায়। মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক এই দুই যুগের সমন্বয়ে রঞ্জনকে গড়ে তোলা হয়েছে। বঙ্কিমসাহিত্যে এরূপ চরিত্র বহু মিলবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোন যুগের কথা নিয়ে তাঁর সাহিত্য রচনা করেছেন, সেটা আর একবার দেখে নেবার জন্য কাহিনীকারকে বঙ্কিমের রচনাবলী একটু গভীর মনোনিবেশের সংগে পাঠ করতে অনুরোধ জানাব, যাতে ভবিষ্যতে তিনি এই ধরণের ভুল আমাদের সামনে তুলে না ধরেন। ঝুলন উৎসবের নাম দিয়ে রাবীন্দ্রিক ঢং-এ যে নৃত্যগীতোৎসব দেখান হয়েছে—তাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারবো না। আচ্ছা, এই পরিচালক বা কাহিনীকাররা হঠাৎ এত জেঠা হয়ে উঠলেন কেন? এক একটি প্রতিষ্ঠানের উপর তাঁরা আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছেন বলে কী মনে করেন যে, তাঁরা বাংলার দর্শক সমাজকে আবোল-আবোল দিয়েই বিভ্রান্ত করতে পারবেন? তাঁদের স্পষ্ট করে একথা জানিয়ে দিতে চাই যে, অজ্ঞতার দম্ভে তাঁরা যে-সত্যকে আবিষ্কার করতে আজও সফলকাম হয়ে উঠতে পারেননি—সে অজ্ঞতার অন্ধকার বাংলার দর্শক সমাজ বহুদিন কাটিয়ে এসেছেন। বাংলার কোন ঝুলন উৎসবে ওরূপ নৃত্য গীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, শ্রদ্ধেয় পরিচালক বা কাহিনীকারের কাছে তার হদিসটা পাওয়া যাবে কী? ও দৃশ্যটির কোন নিন্দা করছি না, কিন্তু যে পরিবেশের মাঝে ঐ নৃত্যগীতোৎসবটি সংযোজিত হয়েছে—সেই সংযোজনার সামঞ্জস্যহীনতার কথাই বলতে চাই। ঐ দৃশ্যকে দেখতে দেখতে কল্পনায় জেগে উঠছে, বৃন্দাবনের দ্বাপর যুগের উৎসবের কথা। মনে হয়েছে, যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সখিগণ নিয়ে বর্তমান যুগে উৎসবে মেতে উঠেছেন বেণীপ্রসাদের বাড়ীতে! বেণীপ্রসাদের বিগ্রহ দেখে সন্দেহের কোনই অবকাশ থাকে না যে, তাঁদের পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সেই কুলদেবতার পূজারীও যে বৈষ্ণব হবেন, তাই বা অস্বীকার করবো কী করে! কিন্তু এই কুলগুরুর চরিত্রটি অন্যভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে! অবশ্য এজন্য পরিচালক বা কাহিনীকারকে দায়ী করবো না, দায়ী করবো কুলগুরুর ভূমিকায় যে অভিনেতাটি অভিনয় করেছেন অর্থাৎ মোহন মজুমদার ওরফে পার্থ মজুমদারকে। তিনি অভিনয় করেন নি—গরজিয়েছেন বলা চলে।

প্রতিবাদে তবু হেমচন্দ্র চন্দ্রের পরিচালন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করবো। তাঁর ব্যর্থতার মূলে কাহিনীর উদ্দেশ্যহীনতা এবং সামঞ্জস্যহীনতাই মূলতঃ দায়ী।

অভিনয়ে বেণীপ্রসাদ, লাবণ্য, মানবী ও মালতীর ভূমিকায় যথাক্রমে ৮ দেবী মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রাবতী, সুমিত্রা দেবী ও ভারতীর খুবই প্রশংসা করবো। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মামাবাবু এবং পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের রঞ্জনও আমাদের খুশী করেছে। কালী সরকারের অভিনয় আধিক্য দোষে দুষ্ট। তাছাড়া তাঁর গলার স্বরও স্পষ্ট নয়। অন্যান্য ভূমিকা একরূপ। সংগীত পরিচালনা খুশী করলেও, সংগীতের সংগে সংশ্লিষ্ট শিল্পীরা অভিব্যক্তির সমতা রেখে চলতে পারেন নি। কাহিনীর অভিযোগ বাদ দিয়ে 'প্রতিবাদ' হার চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ, দৃশ্য রচনা ও অন্যান্য আংগিক উৎকর্ষে নিউথিয়েটার্সের সুনাম যে অক্ষুন্ন রেখেছে, এ কথা না বলে পারবো না। —শ্রীপার্থিব।

স্বর্ণসীতা (সমালোচনা)

ভালো একটা গল্পের ভাগ্যে যে কি ব্যর্থ ও বিকৃত পরিণতি থাকতে পারে, তার পরিচয় পেলাম এই

সে'দিন, মৃন্ময়ী পিকচার্সের 'স্বর্ণসীতা' দেখতে গিয়ে। "স্বর্ণসীতা" আধুনিক বাংলার শক্তিমান গল্প লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এক সার্থক সৃষ্টি। তাই "স্বর্ণসীতার" চিত্রগ্রহণের প্রথম দিন থেকেই আমার মত অনেকেরই ঔৎসুক্য জড়িয়ে থাকা স্বাভাবিক এ ছবির সাথে। অবশ্য আরও একটা কারণ আছে এর। "স্বর্ণসীতার" পরিচালকের পদে নাম দেখেছিলাম অসিত কুমার ঘোষের, যিনি সুদূর হলিউড্ থেকে চলচ্চিত্র বিষয়ে বিশেষভাবে শিক্ষিত হ'য়ে স্বদেশে ফিরেছেন। তাই অনেক আশা ছিল মৃন্ময়ী পিকচার্সের 'স্বর্ণসীতার' ওপর। কিন্তু আজ এই কথা বল্লেই আমার সব বলা হয়ে যায় যে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যে "স্বর্ণসীতা" একদিন প্রচুর পরিতৃপ্তি দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলো, তাঁর অনেক বেশী আমাদের হতাশ করেছে আজকের এই অসিতকুমার ঘোষের "স্বর্ণসীতা"। একই 'স্বর্ণসীতা' দু'জনে রূপায়িত করেছেন দু'ভাবে। একজন তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন কালির আখরে—আর একজন তাকে মূর্ত ক'রে তুলতে চেয়েছেন, সেলুলয়েডের ওপরে। এদিক থেকে "স্বর্ণসীতা"কে অধিকতর জীবন্ত করে তোলার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিলেন শেষোক্তজনই বেশী। অথচ দুঃখের কথা, তিনি সে সুযোগের মর্যাদা রাখতে পারেন নি। সাধারণতঃ দক্ষ পরিচালক আমরা বলবো তাঁকে, যিনি তাঁর কাহিনীর আখ্যানভাগ, স্বকীয় প্রয়োগ কলাকুশলতায় অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে দর্শক সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করতে পারেন। ক্যামেরার ভেতর দিয়ে পরিচালক তাঁর গল্প কিভাবে বলতে সক্ষম হলেন না হলেন, প্রধানতঃ তারই ওপর নির্ভর করে তাঁর সাফল্য-অসাফল্য। এই গল্প-বলার ব্যাপারে "স্বর্ণসীতা"র পরিচালক অসিতকুমার ঘোষ একেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর চিত্রনাট্য কোথাও এতটুকু জমাট বেঁধে উঠতে পারেনি—কোথাও সক্ষম হয়নি দর্শকমনকে এতটুকু আন্দোলিত করতে। অথচ "স্বর্ণসীতা" একটি প্রথম শ্রেণীর অতি উঁচুদরের কাহিনী—এমন একটা ভালো কাহিনীর কত প্রচুর উপাদান ছিল একটা উৎকৃষ্ট চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হবার। কিন্তু যা হবার ছিল, তা' আর হ'য়ে ওঠেনি হলিউড প্রত্যাগত অসিত কুমার ঘোষের হাতে।

"স্বর্ণসীতা"র ক্যামেরা ও সাউণ্ডের কাজ দেখে মনে হচ্ছিল বারবার, এই কি হলিউড খ্যাত পরিচালকের নির্দেশিত ছবি? স্বীকার করি, "স্বর্ণসীতার" ক্যামেরাম্যান অথবা শব্দযন্ত্রীর কোনটাই অসিতকুমার ঘোষ নিজে ছিলেন না—তবু যে রাজ্যে তিনি সবার উপরে অর্থাৎ যেখানে তিনি প্রধান নির্দেশক, সেখানে কি তিনি একটিবারের জন্যও অনুসন্ধানে অগ্রণী হননি যে, তাঁর ছবিতে ক্যামেরা ও সাউণ্ড কি রকম কাজ করছে না করছে? "স্বর্ণসীতা" দেখতে দেখতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি এই ভেবে যে, হলিউড-খ্যাত একজন পরিচালকের ছবির সাউণ্ড ও ক্যামেরার কাজ এত জঘন্য হতে পারে কি করে? বিশেষভাবে ছবির সারাটা প্রথমার্ধে ক্যামেরা ও সাউণ্ড
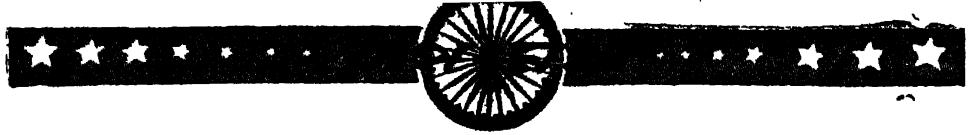
এত নিকৃষ্ট যে, প্রেক্ষাগৃহের দর্শক তাঁদের বিরক্তি ও হতাশার চূড়ান্ত পরিচয় দিতে এতটুকু পশ্চাৎপদ হননি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ক্যামেরা ও সাউণ্ড কিছুটা উন্নতির পরিচয় দিতে পেরেছে, কিন্তু তখন, যাকে বলে এক কথায় "too late." "স্বর্ণসীতা"র ব্যর্থতার জন্য বহুলাংশে দায়ী তার ক্যামেরা ও সাউণ্ড, এ কথা আর কেউ বলুক না বলুক—আমরা বলবোই। অভিনয়ের দিক থেকে বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় নায়ক অরুণের ভূমিকায় অবতীর্ণ নবাগত অবনী মজুমদারের কথা। তাঁর অভিনয় মনকে মোটেই স্পর্শ করে না—কেমন যেন একটা প্রাণহীনতার ছাপ তাঁর অভিনয়ে, দরদের একান্ত অভাব। বাংলার এক প্রখ্যাত পরিচালক-অভিনেতার চেহারার সাথে তাঁর চেহারার বেশ সাদৃশ্য অনুভব করলাম—এমন কি সেই পরিচালক-অভিনেতার হাবভাব, চালচলন, বাচন ভংগী পর্যন্ত সবসময়ে অনুকরণ করেছেন আলোচ্য নবাগত অভিনেতাটি। এটা মোটেই আশার কথা নয়—অন্ততঃ একজন নবাগতের পক্ষে তো নয়ই, যিনি কিনা প্রতিষ্ঠিত হবার প্রত্যাশা রাখেন। সোমনাথের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টচার্য মোটামুটি অভিনয় করেছেন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সোমনাথ" আরও কঠোর, আরও পৌরুষোদীপ্ত। এ সবের অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে রাধামোহন ভট্টাচার্যের অভিনয়ে। গীতশ্রীর অনুপমা অনুল্লেখ্য—অনুপমা চরিত্রটি সম্যকরূপে উপলব্ধিই করতে পারেননি তিনি। প্রমীলারূপে প্রমীলা ত্রিবেদীর অভিনয় সাধারণ শ্রেণীর। এক কথায় "স্বর্ণসীতা"য় কারোর অভিনয়ই চিত্তগ্রাহী পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে নি। সংগীত পরিচালনা করেছেন সুবল দাশগুপ্ত। তিনিও গতানুগতিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

তবু আমরা চির আশাবাদী। অসিতকুমার ঘোষ সুশিক্ষিত প্রগতিশীল দৃষ্টিসম্পন্ন তরুণ চিত্রপরিচালক। বাংলা ছবি তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছুই দাবী করবার অপেক্ষা রাখে। আশাকরি, তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা বর্তমানের গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম হবে। —ভুলু গুপ্ত

সাহারা (সমালোচনা)

কিছুদিন পূর্বে সাহারার আয়ু কলিকাতা মহানগরীর থেকে শেষ হয়ে গিয়েছে। সাহারার সমালোচনা করবার পূর্বে একটি কথা বলা প্রয়োজন,—কোন চিত্র পরিচালনা করবার পূর্বে পরিচালকের বোঝা উচিত যে,পরিচালনার গুরু দায়িত্ব সম্পাদনের শক্তি তাঁর আছে কিনা? একটা বা দু'টা চিত্রে সহকারী পরিচালকের কাজ করে পরিচালক হওয়া যায় না। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, তাঁদের চিত্র-জীবনের প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায় যে, তারা দিনের পরদিন সহকারীর কাজ করে এসেছেন এবং এই সাধনাই আজ তাঁদের প্রথম শ্রেণীর পরিচালক করে তুলেছে। যাঁরা একটা দুটা চিত্রে সহকারীর কাজ করে নিজেকে পরিচালকের উপযুক্ত বলে মনে করে কাজ করেন, তাঁরা কৃতি পরিচালকদের মধ্যে নিজেদের স্থান কবে নিতে পারেন না—আবার সহকারী হয়ে আগের স্থানেও ফিরে যেতে পারেন না—অবস্থাটা হয়ে পড়ে বাদুড়ের মতন। যে সব সহকারী পরিচালক পরিচালনা করতে এসে নিজেদের অনুপযুক্ততা বুঝতে পেরে কাজ শেখবার জন্য আবার সহকারী পরিচালকের কাজ করেন, লোকে তাঁদের নিন্দা করলেও, আমরা তাঁদের প্রশংসা করব। কারণ, নিজেদের দুর্বলতা স্বীকার করে তা শুধরে নেবার এই প্রচেষ্টায় সাহসিকতার পরিচয়ই আছে। সাহারা রঙ্গশ্রী কথা চিত্রের প্রথম চিত্র। প্রযোজনা—সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ। কাহিনী—বিনয় ঘোষ। সংলাপ—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সুর—খগেন দাশগুপ্ত। চিত্রায়ণ—মুরারী ঘোষ। শব্দায়ণ—শিশির চট্টোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা সুনীল মজুমদার। ভূমিকায়—অহীন্দ্র, বিপিন, সাধন, সন্তোষ,তুলসী, আশু, অহি, জহর রায়, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, আশা, প্রভা, নিভাননী এবং আর অনেকে। প্রিজিন্ ভ্যান্ থেকে পালাল উদয় রায়। পুলিশ বাহিনী সারা দেশ তোলপাড় করে তুলল তার সন্ধানে। কলিকাতার ডিটেকটিভ ইন্স্পেকটার বিকাশ বোস তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়ায় উদয়কে। কবিশেখর যদুনাথ মিত্রের মেয়ে মানসী বিকাশের ভাবী বধূ—সে জিজ্ঞাসা করে এতে তোমার লাভ কি? বিকাশ হাসে। বলে শিকারের আনন্দ! স্কুল মিস্ট্রেস্ নমিতা সেনের সংগে কনক রায়ের আলাপ হয়। ছন্নছাড়া কনক রায়ের কাছে পৃথিবী গেল বদলে। কনক অর্থবানদের

নিস্বঃ করে সর্বহারাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করে—আর স্বপ্ন দেখে নমিতার প্রেমে হারান দিনগুলোকে আবার নূতন করে ফিরে পাওয়ার। বিকাশ নমিতাকে জানায়, কনক রায়ের আসল নাম উদয় রায়—সে আমাদের শত্রু—ওয়াণ্টেড-ক্রিমিনাল। নমিতা পাথর হয়ে যায়। উদয়ের তাসের ঘর ভেংগে পড়ে। বিকাশ উদয়কে গ্রেপ্তার করে। উদয়ের সাজা হয়।

উদয় দোষী বটে কিন্তু সে নিজের জন্য চুরি ডাকাতি করে না, ধনীর অর্থ নিয়ে গরীবকে দান করে। যার চরিত্র এরূপ মহৎ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে দিয়ে সামান্য যাত্রাদলের অধিকারীর পকেট মারান বা সামান্য পকেটমারের উপার্জিত অর্থে ভাগ বসান সম্পূর্ণ হাস্যাস্পদ। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরির দৃশ্যটা বড়ই ছেলেমানুষি—উদয় চোখমারতেই খাজাঞ্চি ব্যাঙ্কের টাকা উদয়ের হাতে তুলে দিলে, এওকি সম্ভব? নমিতার সংগে উদয়ের প্রথম আলাপ বড় অদ্ভুত। কলিকাতা সহরে রাস্তার উপর ভাংগা গাড়ী এতদিন রাখা যায় না। গাড়ীর অবস্থা দেখে মনে হল ৬ মাস থেকে গাড়ীটা পড়ে আছে এবং সেই গাড়ীতে দুটী অচেনা তরুণ ও তরুণী সারা রাত কাটিয়ে দিল। এরূপ দোষ ত্রুটী অনেক আছে। কাহিনীকার উদয়কে মহৎ চরিত্ররূপে সৃষ্টি করবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, উদয়ের কার্যকলাপের মধ্যে মহত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাহিনী, সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার মধ্যে একমাত্র নারায়ণ বাবুর সংলাপকেই কিছুটা প্রশংসা করা চলে। অভিনয়ের মধ্যে সন্ধ্যা ও বিপিনের অভিনয় ভাল। সাধন কোন ভাল পরিচালকের হাতে পড়লে নাম করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয়। জহর রায় কমিকের ধারা বদলেছেন বলে ধন্যবাদ। আলোক শিল্পীর কাজ ভাল নয়—রাত্রের দৃশ্যগুলি বলে না দিলে ছবি দেখে বোঝা যায় না। শব্দ ও সুর কাজ চলে যাবার মত। 'সাহারা' তার নামমাহাত্ম্য বজায় রেখেছে অর্থাৎ সাহারা মরুভূমির কথা মনে হতে যেমন পথিকদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি হ'য়, চিত্রজগতের কোন হিতাকাঙ্খীর মনে সাহারা সেই বিভীষিকাই সৃষ্টি করবে।

—মহেন্দ্র গুপ্ত

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন

নবগঠিত চিত্রপ্রতিষ্ঠান বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র 'সাক্ষীগোপাল'-এর শুভ মহরৎ উৎসব গত ৩রা আষাঢ় বরাহনগরস্থিত ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়। সভাপতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে নট-ঋষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বর্তমান বাংলা চিত্রজগতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা করেন। সাক্ষীগোপালের কাহিনীকার ও অন্যতম পরিচালক গৌর সী প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে তার যাত্রাপথে উপস্থিত সুধীজনের শুভেচ্ছা কামনা করেন। সভাপতি তাঁর অভিভাষণে একখানি চিত্রের নির্মাণমূলে প্রতিজন কর্মীর যে অবদান রয়েছে, প্রত্যেকের সেই অবদানকে স্বীকার করতে ও উপযুক্ত মর্যাদা দিতে এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠান মারফৎ প্রত্যেক শিল্প-পতিদের কাছেই আবেদন করেন এবং যে দুর্নীতি ও অসাধুতা চিত্রজগতে বাসা বেঁধেছে, তার প্রতিও কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি দিতে অনুরোধ জানান। প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন। উৎসব শেষে কর্তৃপক্ষ উপস্থিত অতিথিদের জলযোগে আপ্যায়িত করেন। বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রযোজক শ্রীযুক্ত বলাই পাচাল, এবং তাঁর অপর দুই ভ্রাতা কানাই পাচাল ও গৌর নিতাই পাচাল এবং অমল হালদার সবসময়ই অতিথিদের প্রতি যত্নবান ছিলেন।

সাক্ষীগোপাল-এর কাহিনী সংগৃহীত হ'য়েছে চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত সাক্ষীগোপালের মাহাত্ম্য নিয়ে।

শ্রী:গৌর সী ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় চিত্রখানি গৃহীত হবে। সাক্ষীগোপালের সংগীত পরিচালনা ও চিত্র-গ্রহণ করবেন যথাক্রমে বলাই চট্টোপাধ্যায় ও শচীন দাশ-গুপ্ত। ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রখানি গৃহীত হবে। সাক্ষীগোপালের বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণা দেবী, গৌর সী, দুলাল দত্ত, বলাই চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, বলাই, হারাধন ধারা, অমর মান্না (এঃ) প্রভৃতি আরো অনেকে।

বসুমিত্র

নবগঠিত বসুমিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র গড়ে উঠেছে খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটী রহস্যমূলক কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্রখানির নামকরণ করা হয়েছে 'কালোছায়া'। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় 'কালো-ছায়া'র চিত্রগ্রহণের কাজ ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে সুরু হয়েছে। 'কালোছায়া'র বিভিন্নাংশে দেখা যাবে ধীরাজ ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, সিপ্রা দেবী, শুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেককে।

ওরিয়েণ্ট পিকচার্স

ওরিয়েণ্ট পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন 'বিচারক' এর চিত্রগ্রহণের দু'একটী টুকিটাকি কাজ যা বাকী ছিল, পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ইতিমধ্যেই তা শেষ করে ফেলেছেন। এই টুকিটাকি কাজটুকু সেরে নেবার সময় আমরা বিচারকের দৃশ্যপটে যেয়ে হাজির হয়েছিলাম। আগামী সংখ্যায় সে সম্পর্কে বিশদভাবে বলবার ইচ্ছা রইল। ওদিন শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী (ছোট), অলকা দেবী, মাষ্টার খোকা ও কুমারী গীতাকে নিয়ে কয়েকটি টুকিটাকি দৃশ্যগ্রহণ করা হয়। আমাদের সাংবাদিক বন্ধু চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত এবং নবীন শব্দযন্ত্রী চাটুদাকে পরিচালক গুপ্তের টুকিটাকির চাপে খুবই ব্যস্ততার ভিতর দিয়েও দিন কাটাতে হয়। আমাদেরও বন্দী অবস্থায় বেলা বারোটা থেকে রাত দশটা অবধি কাটাতে হয়েছিল বিচারকের দৃশ্যপটে।

আজাদ চিত্রপট লিঃ

বৃহৎ বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হককে চেয়ারম্যান করে এই নবনির্মিত চিত্র প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। চিত্রশিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের কর্ম-তৎপরতা রূপায়িত হ'য়ে উঠবে বলে প্রকাশ। চিত্রশিল্পী সুরেশ দাসও এঁদের পরিচালক মণ্ডলীতে যোগদান করেছেন। তাছাড়া আরও গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন। আশাকরি এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের নব প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে উঠবে।

সুধা প্রডাকসন

এদের প্রথম চিত্র ভগ্নদেউল এর নাম পরিবর্তন করে 'প্রতিরোধ' রাখা হ'য়েছে। ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সংগীত শিল্পী জহর মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় চিত্রখানির কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। প্রতিরোধের সুররচনার দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন। প্রতিরোধের কাহিনী রচনা ও পরি-চালনা ভার নিয়েছেন খগেন রায়। নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে নৌকাডুবি খ্যাতা মীরা সরকারকে। আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন রামসিং তাঁর দলবল নিয়ে এই চিত্রে কাজ করছেন বলে প্রকাশ।

রঙ্গরাখী পিকচার্স

গত ৩০শে জুন এদের প্রথম চিত্র 'বীরেশ লাহিড়ী'র মহরৎ উৎসব ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে।

মানসী ফিল্মস লিঃ

উষারাণীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে এদের প্রথম চিত্র 'পাওয়া না-পাওয়ার' প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হ'য়েছে। চিত্রখানির গান, সংলাপ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন রমেন চৌধুরী। সুর-সংযোজনার ভার নিয়েছেন কালোবরণ। পাওয়া না-পাওয়া পরিচালনা করবেন রমেন চৌধুরী ও মাণিক চক্রবর্তী।

বনহুগলী যুবক সংঘ ও শীতলা অপেরাপার্টি

গত ২৫শে বৈশাখ এঁদের উদ্যোগে 'হিরণ্যাক্ষ' নাটক অভিনীত হয়। শম্ভুচরণ ভট্টাচার্যের তত্বাবধানে ও শীতল চন্দ্র আওনের প্রযোজনায় অভিনয় সর্বাংগসুন্দর হ'য়েছিল। প্রত্যেক অভিনেতাই দক্ষতার পরিচয় দেন এবং এঁদের পরবর্তী আকর্ষণ "হরিশ্চন্দ্র" নাটক শীঘ্রই মঞ্চস্থ হবে। সংগীত পরিচালনা করছেন মহাদেব দত্ত।

সোসাইটি ডি ওয়েষ্ট

গত ১১ই আষাঢ় সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্তৃক নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত প্রণীত 'গৈরিক-পতাকা' নাটক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। অভিনয়টি সব দিক দিয়ে খুবই হৃদয়-গ্রাহী হ'য়েছিল।

বেঙ্গল ইয়ং মেম্বার্স এসোশিয়েশন এ্যাণ্ড লাইব্রেরী

গত ১৭ই জুন ইউনিভারসিটি ইনসটিটিউট হ'লে সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্তৃক সমিতির অন্যতম সভ্য সুকুমার দত্ত রচিত 'শতাব্দীর পর' নাটক অভিনীত হয়। অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল এবং এই প্রসংগে কালীপদ চক্রবর্ত্তী, বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী, মাধব বসুমল্লিক, বৈদ্যনাথ দে, অশুতোষ মুখুজ্জে, সুধীর মুখুজ্জে ও সীতানাথ গাঙ্গুলীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সংগীত সম্মীলনী

এই প্রতিষ্ঠানটি বহুদিন থেকেই কৃষ্টিমূলক কার্যে আত্ম-নিয়োগ করে আসছেন। সম্প্রতি এরা উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও করেছেন। এই বিদ্যালয়টির সংগে বহু গুণী শিল্পী জড়িত রয়েছেন। তার ভিতর নাম করা যেতে পারে নির্মল চন্দ্র বড়াল, সুখেন্দু গোস্বামী, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, মিহির কিরণ ভট্টাচার্য, জিতেন্দ্র মোহন সেন, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, নৃপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী, মিঃ ম্যাকমাহন, গোপাল ব্রজবাসী, অনিল রায়চৌধুরী, নবদ্বীপ ব্রজবাসী, ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেব, সতীশচন্দ্র দত্ত, অনাদি প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, গীতশ্রী প্রতিমা দাশগুপ্তা প্রভৃতি আরো অনেকের। তাছাড়া শ্রীবীরেন ভদ্রের অধীনে এবং ধ্রুব চক্রবর্তীর অর্কেষ্ট্রার সহযোগিতায় নাট্যশিল্প ও বাণীবিজ্ঞান বিভাগও খোলা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ৪, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বিদ্যালয়টির সম্পাদিকা হ'লেন শ্রীইলা মিত্র।

মণিলাল শ্রীবাস্তব প্রযোজিত দেবারু

শ্রীমণিলাল শ্রীবাস্তবের প্রযোজনায় চারুচন্দ্র দত্ত আই, সি, এস-এর গল্প অবলম্বনে 'দেবারু' চিত্রখানি পরিচালনা করবেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী বিভূতি দাস। ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রখানি গৃহীত হবে এবং এর নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী পদ্মা দেবীকে দেখা যাবে বলে প্রকাশ।

ডায়মণ্ড পিকচার্স লিঃ (বম্বে)

বহুদিন বাদে দেবীকারাণী এদের 'অন্যায়' চিত্রে অভিনয় করছেন। শুধু দেবীকারাণীই নন, এই চিত্রে বম্বে টকীজের প্রাক্তন গোষ্ঠীর অনেককেই বিভিন্নাংশে দেখা যাবে। চিত্রখানির প্রযোজনা এবং পরিচালনা করছেন জে, এস, কাশ্যপ। অভিনয়াংশে দেখা যাবে অশোককুমার, কিশোর সাহু, মমতাজ আলি ও আরো অনেককে।

অঞ্জলি পিকচার্স

একটী সংবাদে প্রকাশ, প্রখ্যাতা নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু অঞ্জলি পিকচার্সের একখানি চিত্রে অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছেন এবং সংবাদে আরও প্রকাশ, চিত্রখানি নাকি পরিচালনা করবেন প্রবীণ সুরশিল্পী রাইচাঁদ বড়াল।

উদয়ের পথে খ্যাত জ্যোতির্ময় রায়

উদয়ের পথে খ্যাত কাহিনীকার জ্যোতির্ময় রায়ে নতুন চিত্র 'দিনের পর দিন' তাঁরই প্রযোজনায় গৃহীত হবে বলে প্রকাশ। 'দিনের পর দিন' শ্রীযুক্ত রায়ের একটী মূল কাহিনীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে। বিভিন্নাংশে দেখা যাবে বিনতা রায়, অপর্ণা দেবী, বিকাশ রায় প্রভৃতিকে। সুর-সংযোজনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

তারাশঙ্করের সন্দীপন পাঠশালা

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা' অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ন্যাশান্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠছে। সন্দীপন পাঠশালার বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন মীরা সরকার, সাধন সরকার, সিধু গাঙ্গুলী, অমিতা বসু প্রভৃতি আরো অনেকে।

ভ্যানগার্ড প্রডাকসন

ভ্যান গার্ড প্রডাকসনের বাংলা বাণীচিত্র 'সাধারণ মেয়ে' গত ১লা জুলাই রূপবাণী ও ৯ই জুলাই নবনির্মিত ইন্দিরা প্রেক্ষগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন নীরেন লাহিড়ী। সাধারণ মেয়ের কাহিনী রচনা করেছেন পাঁচু-গোপাল মুখোপধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, নীতিশ মুখুজ্জে,

শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, প্রতাপ মুখুজ্জে, তারা কুমার ভাদুড়ী, দীপ্তি রায়, সুপ্রভা মুখুজ্জে, সুহাসিনী, কমলা প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। আগামী সংখ্যায় 'সাধারণ মেয়ের' সমালোচনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

কল্পচিত্র মন্দির

নবীন প্রযোজক ভূতনাথ বিশ্বাসের প্রযোজনায় কল্প চিত্র মন্দিরের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন 'ওরে যাত্রী' মুক্তির দিন গুনছে। সংগ্রাম-খ্যাত কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের কাহিনীকে কেন্দ্র করে চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন কৃতি চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরী। নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা তার পূর্ণ বিকাশ নিয়ে 'ওরে যাত্রা' চিত্রে দর্শক সমাজের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। তার বিপরীত ভূমিকায় দীপক মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে বলে প্রকাশ। ওরে যাত্রীর সুর সংযোজনা করেছেন কালীপদ সেন, চিত্র গ্রহণ করেছেন—সাংবাদিক চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত এবং চিত্র গ্রহণে তিনি যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রকাশ। অন্যান্য অভিনয়াংশে আছেন কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য, রেণুকা রায়, নমিতা, প্রভা, প্রীতিধারা, উত্তম, জ্যোতি, ডি, জি, নবদ্বীপ, হরিদাস, মষ্টার সত্য ও লক্ষ্মী, অমল প্রভৃতি।

অরক্ষণীয়া

পি, আর প্রডাকসনের 'অরক্ষণীয়া' গত ১৫শে জুন এক যোগে শ্রী, পূরবী ও উজ্জলায় মুক্তিলাভ করেছে। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মর্মস্পর্শী সমাজ আলেখ্য—অরক্ষণীয়াকে ভিত্তি করেই চিত্রখানি গৃহীত হয়েছে। 'অরক্ষণীয়া' পরিচালনা করেছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। সুর সংযোজনা করেছেন জ্ঞান ঘোষ এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সন্ধ্যারাণী, নীলিমা, রবীন মজুমদার প্রভৃতি। চিত্রখানি ডি, লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করেছে।

শুভ পরিণয়

গত ২০শে জৈষ্ঠ খ্যাতনামা চিত্র সাংবাদিক ও প্রচার বিদ শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দীপেন্দ্রনাথ সান্যালের সহিত রাজসাহী জেলার শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর মৈত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুকা দেবীর শুভ পরিণয় উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। এতদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত সান্যাল ২৯, এলগিন রোডে এক প্রীতি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং চিত্র জগতের শিল্পী, প্রযোজক, সাংবাদিক ও বিভিন্ন কর্মী উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করেন। আমরা নবদম্পতির শুভ জীবন কামনা করি।

বিশ্ববার্ত্তা : (সাপ্তাহিক)

সম্পাদক : শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। বার্ষিক মূল্য—৬৲। প্রতিসংখ্যা : ৶৹ আনা। ৭৪।৪, গরচা রোড, বিশ্ববার্তা প্রেস থেকে সম্পাদক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। আমরা এই নতুন পত্রিকাটির সাফল্য কামনা করি।

বাঁধ ভেঙে দাও

নাট্যকার মন্মথ চৌধুরীর নতুন নাটিকা। মূল্য : একটাকা। প্রাপ্তিস্থান : ডি, এম, লাইব্রেরী, কলিকাতা। মন্মথ বাবুর অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকখানিও আমাদের খুশী করেছে। সৌখীন সম্প্রদায়ের ভিতর 'বাঁধ ভেঙে দাও'র প্রচার কামনা করি।

পাইকপাড়া তরুণের দল

পাইকপাড়া নৈশ বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে মদন চক্রবর্তী লিখিত 'হ'লো নাকো আর প্রতিকার' নাটকটি শীঘ্রই অভিনীত হবে। গত ২৫শে মে, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ সিংহ ও ক্ষিতীশ উপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে উক্ত নাটকের মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। নাটকটি পরিচালনা করবেন প্রেমাংশু বসু এবং সুর সংযোজনা করবেন বাদল মিত্র।

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ

কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছিল। এঁদের পরিচালক মণ্ডলীতে ছিলেন স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম মেয়র সুধীর রায়চৌধুরী—সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী নীরোদ চন্দ্র ঘোষ ও বলাই দত্ত, প্রখ্যাত স্বর্ণব্যবসায়ী স্বর্গতঃ বি, সরকারের অন্যতম পৌত্র জগৎজ্যোতি সরকার (রাঙাদা), সুপ্রসিদ্ধ বি, কে,

চিত্র জগতে
ভূমিকায়:
নরেশ মিত্র • বিমান
হরিধন • তুলসী চক্র
এস কুমার • অমর
চৌধুরী • হেম গুপ্ত
বানীব্রত • গীতশ্রী
মনিকা ঘোষ • রেবা
বসু • শ্রীমতী মুখার্জি
চলন্তিকা
চিত্র প্রতিষ্ঠানের
মাটি ও মানুষ
গল্প • চিত্রনাট্য • পরিচালনা • সুধীর বন্ধু
সঙ্গীত পরিচালনা — খগেন দাশগুপ্ত
প্রধান যন্ত্র-শিল্পী — বিভূতি দাস
আলোক চিত্রশিল্পী — দিব্যেন্দু ঘোষ
শব্দ-যন্ত্র-শিল্পী — পরিতোষ বসু
শিল্প-নির্দেশক — শুভ মুখার্জি
S. DEY STUDIO
পূর্ণশ্রী : রূপম : আলোছায়া : ঝরণা ও নবরূপমে প্রদর্শিত হচ্ছে
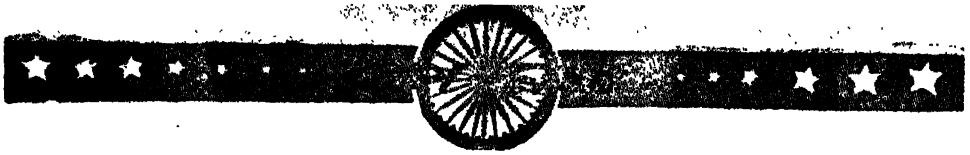
পাল এ্যাণ্ড কোম্পানীর অন্যতম কর্ণধার নিতাই চরণ পাল, প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্যাভিনেতা ও পরিচালক ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি আরো অনেকে। জনপ্রিয় নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের একটি কাহিনীকে অবলম্বন করে এঁদের প্রথম ছবি 'শুধু ছবি' বিধায়ক ভট্টাচার্যের পরিচালনায়ই গড়ে উঠবার কথা ছিল। 'শুধু ছবি'র মহরৎ উৎসবও অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এতদূর অগ্রসর হয়েও সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর প্রথম প্রচেষ্টা দুর্ভাগ্য বশতঃ আর সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। এ অসাফল্যের সংবাদে যারা ব্যঙ্গের হাসি হেসে ছিলেন, তাদের জ্ঞাতার্থে কর্তৃপক্ষ যে যে কারণে 'শুধু ছবি' চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠতে পারেনি, তা বিশদ ভাবে আমাদের জানিয়েছেন। প্রথমতঃ কালিকা নাট্য-মঞ্চের সংগে নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের যে আইনগত বিরোধ চলেছে, তা অমীমাংসিত অবস্থাতেই ছিল। মূলতঃ এই জন্যই 'শুধু ছবি'কে চিত্রে রূপায়িত করে তুলতে পারা যায়নি। দ্বিতীয়তঃ চিত্র প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম যাঁদের উৎ-সাহ ও উদ্দীপনায় গড়ে ওঠে—তাঁদের কয়েকজনের শেষ পর্যন্ত সেই উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় না। তাই আভ্যন্তরীন পরিচালনা বিষয়েও কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে। সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলী লিঃ-এর কার্যালয় ১৩, আপার সার্কুলার রোড হ'তে বর্তমানে ৩৩এ, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র রোড, টালীগঞ্জে স্থানান্তরীত করা হয়েছে।

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও জমিদার চন্দ্রকান্ত বণিক মহা-শয় তাঁর আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা এবং কার্যকরী সামর্থ নিয়ে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীতে যোগদান করে তাঁর আর্থিক সংগতি অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছেন। তাছাড়া প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস ও অক্লান্ত কর্মী অচিন্ত্যকুমার সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর ম্যানেজিং এজেন্টস মেসার্স চিত্র চক্র লিঃ-এ জয়েন্ট ম্যানেজিং ডাইরেক্টরস্ রূপে যোগদান করেছেন এবং বর্তমানে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এই প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলবার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলী লিঃ বাংলার চিত্রামোদী জনসাধারণকে পরম শ্রদ্ধার সংগে জানাচ্ছেন যে, তাঁদের প্রথম চিত্র গড়ে উঠবে দর্শক সাধারণের বিচারে নির্বাচিত ১৩৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে।

বাংলার অসংখ্য চিত্রামোদীদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে যে অভিনেতা ১৩৫৩ সালের জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ভোট পেয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মর্যাদা লাভ করেছেন এবং ইতিপূর্বেও এই সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, বাংলার সেই সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলী লিঃ-এর প্রথম চিত্রটির পরিচালন-দায়িত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন এবং চিত্রটি তাঁরই প্রযোজনায় গৃহীত হবে। শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস এই চিত্রে নতুন একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন। শুনতে পাচ্ছি, পাহাড়ী সান্যালকেও একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন মঞ্চসম্রাজ্ঞী সরযূবালা, দর্শকমন নন্দিতা রেণুকা রায়, চিত্র ও নাট্যজগতের ঋষি নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রবীণ অভিনেতা সন্তোষ সিংহ, সদাচপল জীবেন বসু, অচিন্ত্যকুমার, সমর মিত্র, সুশীল রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, অমল চাকলাদার (এঃ) প্রভৃতি আরো অনেকে। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আগষ্ট মাস থেকে চিত্রগ্রহণ কার্য সুরু হবে।

অবসর প্রাপ্ত প্রবীণ সরকারী কর্মচারী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র চৌধুরী এবং তদীয় পুত্র সরকারী কর্মচারী শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ চৌধুরী তাঁদের কাজের ফাঁকে স্বার্থহীন ভাবে তাঁদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে সাহায্য করছেন। সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলী লিঃ-এর সর্বপ্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠুক, তাই আমরা কামনা করি।

ভাইবোন (সমালোচনা)

সরোজ পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন 'ভাইবোন' গত ২২শে জুন, ইষ্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ এর পরিবেশনায় একযোগে মিনার, ছবিঘর ও বিজলী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করেছে। চিত্রখানির কাহিনী, সংগীত (কথা), সংলাপ, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য এবং প্রযোজনা করেছেন সরোজ চক্রবর্তী। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণী রায়, ধ্রুব

চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত সাক্ষীগোপালের অপূর্ব মাহাত্ম্য নিয়ে বলাই
— পাচাল প্রযোজিত বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন ! —

সাক্ষীগোপাল

পরিচালনা :
চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও
গৌর সী

সাক্ষীগোপাল

সংগীত পরিচালনা :
বলাই চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : গৌর সী * ব্যবস্থাপনা : অমর মান্না (এ্যাঃ)

সাক্ষীগোপাল

পুরী ও ভুবনেশ্বরের মাঝামাঝি বিষ্ণানগর গ্রামে বড় মিশ্র ও ছোটমিশ্র নামে দুই ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বড় মিশ্র ধনী আর ছোট মিশ্র দরিদ্র। দু'জনে একসংগে তীর্থ-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। বড় মিশ্র পথিমধ্যে একটী মন্দিরে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। ছোট মিশ্র প্রাণ ঢেলে সেবা করে তাঁকে আরোগ্য করে তোলেন। সেবার প্রতিদানে নিজের কন্যাকে ছোট মিশ্রকে দান করবেন বলে বড় মিশ্র প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু গৃহে ফিরে এসে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে বড় মিশ্র তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন। বরং তাঁর অনুগত গ্রামবাসীরা সভা ডেকে ছোট মিশ্রকে অপমান করে এবং ব্যঙ্গ করে বলে : মিছেমিছি প্রতিশ্রুতি ভংগের অভিযোগ আনছো কেন ? তোমার মত গরীবের কাছে ও কন্যাদান করতে যাবে কেন ? বেশ, কোন সাক্ষী আছে তোমার ? ছোট মিশ্র চিন্তিত হ'য়ে পড়েন ! তাইত ! কে তার হ'য়ে সাক্ষ্য দেবে। আর সেখানেত আর কেউ ছিল না ! অভিমানে তিনি ছুটে যান সেই দেব মন্দিরে। সাক্ষী একজন আছেন বৈকী ? মাথা খুঁড়তে থাকে দেবতার পায়ে, 'তুমি ছাড়াত আর কোন সাক্ষী ছিল না ! তুমিই শুনেছো সব কথা। তুমি যদি সত্যের প্রতিপালক হও— আমার হ'য়ে কী তুমি সাক্ষ্য দিতে আসবে না ! যদি না আসো—তোমারই পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। 'ছোট মিশ্রের আকুল আর্তনাদে মন্দিরের দেবতা বিচলিত হ'য়ে পড়েন— তিনি যে সত্যই সত্যের প্রতিপালক, সেকথা প্রমাণ করবার জন্য ছোট মিশ্রের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না। এই অপূর্ব দেব-মাহাত্ম্যের কথা নিয়েই গড়ে উঠেছে সাক্ষীগোপালের গল্পাংশ। — — —

★

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে :
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় : ঝর্ণা দেবী : তুলসী চক্র : গৌর সী
দুলাল দত্ত : বলাই চট্টো : অনুপকুমার : বলাই : হারাধন : অমর : প্রভৃতি

—ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রখানির প্রস্তুতি চলছে—

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন : দক্ষিণ ব্যাঁটরা : হাওড়া

চক্রবর্তী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, হাজুবাবু, প্রমীলা ত্রিবেদী, রাজলক্ষ্মী (বড়), সুহাসিনী, উমা গোয়েঙ্কা, প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন গৌর গোস্বামী।

চিত্রখানির নাম দেখে মনে হবে ভাইবোনের পবিত্র স্নেহ ও ভালবাসার কথা নিয়েই 'ভাইবোন' গড়ে উঠেছে। কিন্তু মূলতঃ তা নয়। এতে যে কী নেই, তা বলা কঠিন। মদ আছে—মেয়ে মানুষ আছে—জমিদার আছে—জমিদারের আদর্শবাদী ভাই আছে—গৃহদাহ আছে—আশ্রম আছে—বাবাজী আছে—দারিদ্র্যের শোচনীয়তা আছে—গাডীচাপা আছে—আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন আছে—নেতাজী আছে—বড় বড় গরম গরম 'বক্তিমা' (বক্তৃতা) আছে—ষষ্ঠি ঠাকুরের মহিমা কীর্তন আছে—তাই চিত্রখানির মহিমা কীর্তন করতে যেয়ে যদি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ঘুঙুর পায় দিয়ে বলতে পারতাম, 'ডাহার সহর আছে—লাট সায়েবের বাড়ী আছে—গড়ের মাটের মানুমণ্ট আছে—রাণীজীর মামুরেল আছে—অগরার তাজমহাল আছে—জগন্নাতের মন্দির আছে—কালীঘাটের কালীমা আছে—আউর কত হরেক নকম তাজ্জব আছে—লে—লে বাবু দেখে যা—চইলা গেলে আর পাবি না—'তাহলে হয়ত চিত্রখানির উপর সুবিচার করতে পারতাম। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মাইনে করা প্রচার সচিবই যখন আর তা করতে পাচ্ছেন না, আমরা তাহ'লে আর কী করে করি! তবে প্রাচার পত্র ও বিজ্ঞাপনীতে ভাইবোনের একত্র প্রতিকৃতি দিয়ে তিনি দর্শক সাধারণকে যে কথা প্রচার করতে চাইছেন, আমরা শুধু তার প্রতিবাদ জানিয়ে এই ধাপ্পাবাজীর কবলে যাতে দর্শক-সাধারণ পা না বাড়ান, এজন্য তাঁদের একটু সতর্ক করিয়ে দেবো। প্রথমতঃ অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোন চিত্র নেই বল্লেই চলে—প্রথম যুগে যা দু' একখানা খণ্ড চিত্র নির্মিত হ'য়েছিল, এখনও সেগুলিকেই আমরা নজির রূপে তুলে ধরছি। তারপর পূর্ণাংগ যা' দু'একখানা নির্মিত হ'য়েছে, কেবলমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্কদের কথা চিন্তা করেই যে সেগুলি নির্মিত হয়েছে, এমন কথা বলা চলে না। তবু সে প্রচেষ্টার জন্য প্রযোজকদের আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি এবং ছোটদের কাছে সে চিত্রের অনুমোদন করেছি। আলোচ্য চিত্রের নাম দেখেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের আকৃষ্ট হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তারপর প্রচার কার্যের ধাপ্পাবাজী যাঁরা ধরতে পারবেন না—চিত্রখানিতে ছোটদের উপাদান রয়েছে বলে তাঁদের মনে জাগাও অস্বাভাবিক নয়। অথচ চিত্রখানি ছোটদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তাই অভিভাবকদের আমরা সতর্ক করিয়ে দিতে চাই। আরো বিস্মিত হয়ে যাই, আমাদের সেন্সারবোর্ডের তথাকথিত নীতিবিদ কর্তাদের নীতিজ্ঞানের নমুনা দেখে। জমিদারের বাগান বাড়ীতে নর্তকীর নৃত্য দৃশ্যটীকে তাঁরা কী করে অনুমোদন করলেন! এই নৃত্য দৃশ্যে দু'টী যৌন-কাতর বুভুক্ষিতকে যে উগ্র লালসা নিয়ে নর্তকীর দিকে অগ্রসর হতে দেখি, তা শুধু অশ্লীলই নয়, গর্হিত। এই অশ্লীল ও গর্হিত দৃশ্যটি অনুমোদন করতে আমাদের নীতিবিদদের নীতিতে বাধলোনা! এই নীতিবিদের দলে সীতা দেবী নামে একজন সম্মানিতা মহিলা আছেন—তিনি কে তা সঠিক জানি না তবে তাঁর নীতিজ্ঞানটাই নাকি চিত্র জগতে ইতিমধ্যেই বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে—তিনি যেই হউন, তিনি যে নারী এতে আর সন্দেহ নেই। নারী হয়ে নারীর মুখে 'দিনের বেলা আর সকালের, রাত্রে কেবল মাত্র তোমার' এই সংলাপ কি করে অনুমোদন করেন! তাই সখেদে বলতে ইচ্ছা করে: হায়রে নারী! এই মর্যাদাবোধ নিয়ে সেন্সার বোর্ডে এসেছেন বাঙ্গালী নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে! সমস্ত চিত্রটিই অবাস্তব ঘটনাতে ভরপুর। এই অবাস্তব এবং স্থূলত্ব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত দেখাতে যেয়ে যে মূল বিষয়বস্তু নিয়ে চিত্রখানি গড়ে তুলবার ইচ্ছা কাহিনীকার বা পরিচালকের মনে গোড়ার দিকে দেখতে পেয়েছিলাম, তা আর শেষ অবধি রূপায়িত হ'য়ে উঠতে পারেনি। কারণ, ভাইবোনের এই স্নেহ ও ভালবাসা ফুটিয়ে তুলতে হ'লে মনের যতখানি সূক্ষ্মতার দরকার তা এ ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের ভিতর পরিলক্ষিত হয়নি। তাই স্থূলতা নিয়েই তাঁকে চলতে হ'য়েছে। ভাইকে মানুষ করবার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ জমিদারকে বিয়ে করাও যেমনি বোনের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি অলীক অভিযোগের জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়েও যাওয়াও ঐ ধরনের মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। অথচ

কাহিনীকে জটিল করে তুলবার জন্য এই অস্বাভাবিক ঘটনার আশ্রয় নিতে হ'য়েছে। কোন একটি চরিত্রই বলিষ্ঠভাবে গড়ে ওঠেনি। জমিদারকে ত একটি যৌন-ব্যাধিগ্রস্ত চরিত্র বলা চলে। তার ছোট ভাইকে দিয়ে বড় বড় কথা বলালেও, সেটিও কোন চরিত্রই হ'য়ে ওঠেনি। তবু বোনের মাঝে ভাইকে মানুষ করবার আকাঙ্ক্ষাটা ফুটে উঠেছে, সে-আকাঙ্ক্ষার যদিও কোন কার্যকরী রূপ ফুটে ওঠেনি। যে দারিদ্রের ভিতর দিয়ে তাদের সংগ্রাম মুখর দিনগুলিকে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে, তা স্বাভাবিক পথ বেয়ে আসেনি। ভাই যখন বড় হয়ে উঠলো—সওদাগরী অফিসে কাজ করে যখন সংসারের খরচা কুলিয়ে উঠতে পাচ্ছিল না, তখন তাকে যুদ্ধে যোগদান করতে দেখি—তারপর সে যেয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান করে এবং ফিরে আসে। এরূপ একজন কর্মী ও আদর্শবাদী যুবক ফিরে এসে আবার আর একটি মেয়ের প্রণয়াসক্ত হ'য়ে পড়বে—তার দিদি বা পূর্বতন স্ত্রীর কোন অনুসন্ধান না করে—এটা সম্পূর্ণরূপে চরিত্রটির আদর্শের পরিপন্থী। সে যখন তার দিদির সংগে জমিদার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়, তখন নেহাৎ নাবালকটি ছিল না—তাই ফিরে এসে আশ্রমে এবং সেখানেও অনুসন্ধান করতে পারতো। তারপর—মনিব বাড়ীতে কাজ করতে যেয়ে দিদি যখন তার ভাইকে চিনতে ও দেখতে পারলো, তখন ঝুটো মর্যাদার কথা চিন্তা করে সে ভাইয়ের কাছে ধরা দিল না—এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হ'তে পারে! এমনি হাস্যকর এবং উদ্ভট পরিস্থিতিতে চিত্রটি এতই ভরপুর যে, কোনটাকে রেখে কোনটার উল্লেখ করবো, সে বিষয়ে গুলিয়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। দৃশ্য-সংস্থাপনে এবং স্থান নির্বাচনেও এমনি কাণ্ডজ্ঞানহীনতার পরিচয় পাওয়া গেছে বহু স্থানে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সংগে চিত্র জগতে ইতিপূর্বে আমাদের পরিচয় হয়েছে বলে মনে হয় না। যদি অতীত জীবনে কোনদিন কোন পরিচালকের কলকে সেজে থাকেন, তারই দাবী নিয়ে একাধারে কাহিনী, চিত্রনাট্য, গীত ও সংলাপ রচনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে যে আস্পর্ধার পরিচয় দিয়েছেন, ভবিষ্যতে এই আস্পর্ধার পুনরাবৃত্তির ভিতর যেন তাঁকে না দেখতে পাই। আশ্রমের ভিতর দিয়ে অনাথদের প্রতিপালন করবার যে পরিকল্পনার আভাষ পেয়েছি, চিত্রটি থেকে পৃথকভাবে তার প্রশংসা করবো।

অভিনয়ে প্রমীলা ত্রিবেদী বোনের ভূমিকায় নিজের শক্তিনুযায়ী নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এত ভাল অভিনয় তিনি করেননি। অন্যান্য ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরী, বিমান, সুহাসিনী, ফণী রায়, ধ্রুব চক্রবর্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন নবাগত ও নবাগতাদেরও দেখতে পেয়েছি—তাঁদেরও নিন্দা করবো না। অভিনয় সম্পর্কে আমাদের কাহিনী ও পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে কোন অভিযোগ নেই। সুর-সংযোজনায়ও গৌর গোস্বামীকে প্রশংসা করবো না। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণকেও পরিচালনা ও কাহিনীর অনুপাতে প্রশংসা করা চলে। ভাইবোন সম্পর্কে এই কথাই বলা চলে—চিত্রখানিতে কোন শিল্প-সৃষ্টির পরিচয় পাইনি—পেয়েছি তার জারজ রসের পরিচয়।

—নিতাই চরণ সেন

রূপলেখা পিকচার্স

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত 'বঞ্চিতা'র একটি দৃশ্যে জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

রূপলেখা পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন 'আবর্ত' গড়ে উঠছে নিতাই ভট্টাচার্যের একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন 'বিশ্বকর্মা'। 'বিশ্বকর্মা' কোন ব্যক্তি বিশেষের ছদ্মনাম নয়। চিত্র জগতের কয়েকজন বিশেষজ্ঞরা মিলে এই নামে একটী গোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন। সেই গোষ্ঠীর উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে 'আবর্ত'র পরিচালনার ভার। এই গোষ্ঠীর ভিতর কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যও রয়েছেন। 'আবর্ত'র নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন নৌকাডুবি খ্যাতা মীরা মিশ্র আর তাঁর বিপরীত চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তুলেছেন চক্রবর্তী। সুজিত বাবু রামপ্রসাদ চিত্রে নামভূমিকায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, আশা করি দর্শক সমাজ তা ইতিমধ্যেই ভুলে যান নি। বর্তমান চিত্রে সুজিত বাবু দর্শকসাধারণের অন্তর জয় করে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করবার দাবী রাখেন। আবর্তের অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করছেন রেণুকা, গণনাট্যসঙ্ঘের শম্ভুমিত্র, সন্তোষ সিংহ, অপর্ণা দেবী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালীগুহ, ধীরেন মিত্র প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করছেন কালীপদ সেন। তাঁর সুরের মায়াজাল অতি সহজেই দর্শকদের আকৃষ্ট করবে বলে প্রকাশ। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'আবর্ত' দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। 'আবর্ত' সম্পর্কে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন রমা চক্রবর্তী এম, এ। বাংলা চিত্রজগতে শ্রীমতী চক্রবর্তীর আগমনকে আমরা সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সান সাইন প্রডাকসন

এদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন 'কুহেলিকা'র চিত্র গ্রহণের কাজ ইন্দ্রপুরীতে দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। ডাঃ জ্যোতিষ রায়ের নতুন ধরনের একটী কাহিনী অবলম্বনে চিত্রটী গড়ে উঠেছে। কুহেলিকা পরিচালনা করছেন রমেশ বসু। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন কাহিনীকার স্বয়ং. কুহেলিকায় বহু নূতনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের আমাদের জানিয়েছেন। চিত্রখানির চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাঁচুগোপাল দাস। এরা সকলেই তরুণ। এদের সমবেত প্রচেষ্টায় 'কুহেলিকা' একখানি সার্থক চিত্ররূপে দেখা দেবে সেই আশাই আমরা কচ্ছি। দিলীপ দে চৌধুরী সহকারী পরিচালক রূপে এবং শিল্প নির্দেশক রূপে কাজ করছেন নরেশ ঘোষ। কুহেলিকার বিভিন্নাংশে দেখা যাবে অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ,

দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, গৌর রায় চৌধুরী, আশু বসু, পঞ্চানন চট্টো, শশী রায়, ননী মজুমদার. বন্দনা দেবী, মুকুলজ্যোতি, মণিকা, রাজলক্ষ্মী, (বড়) প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানির ব্যবস্থাপনা ভার গ্রহণ করেছেন গৌর রায় চৌধুরী। বিজ্ঞ সুরশিল্পী দক্ষিণা মোহন ঠাকুর কুহেলিকার সুর সংযোজনা করছেন।

চিত্রতারকাদের বদান্যতা

প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী কানন দেবী চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের 'ক্যানসার বিভাগে ৫০,০০০ হাজার টাকা দান করেছেন এবং চিত্রপরিচালক ও চরিত্রাভিনেতা অমর মল্লিক ও চির-চঞ্চলা অভিনেত্রী ভারতী—প্রত্যেকে উক্ত হাসপাতালে দান করেছেন পঁচিশ হাজার টাকা করে। আমরা এঁদের এই বদান্যতার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং চিত্র জগতের অন্যান্য শিল্পী ও বন্ধুদেরও এবিষয়ে তৎপর হতে অনুরোধ জানাচ্ছি। আর আমাদের তথাকথিত সমাজ ধুরন্ধরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আমাদের শিল্পীরা শুধু বিলাস ব্যসনেই অর্থ ব্যয় করে থাকেন বলে তাদের যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে, এসব দৃষ্টান্তে তাদের 'বদ্ধমূলে'র মূল কী এখনও নড়ে উঠছে না?

ভারতী চিত্রপীঠ

গত ২৪শে আষাঢ় শুভ রথযাত্রার দিন ভারতী চিত্রপীঠের প্রথম চিত্র 'দাসীপুত্র'র মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানির রচনা ও পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। দাসীপুত্রের চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ করবেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও শিশির চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, সরযূবালা, দেবীপ্রসাদ, শ্যামলাহা, বেনু মিত্র, মণিশ্রীমাণী, মণিকা ঘোষ, প্রভৃতি আরো অনেক।

কীর্তি পিক্‌চার্স

এঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'কামনা'র শুভ মহরৎ গত ২৪শে

আষাঢ়, রথযাত্রার দিন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। 'কামনা'র কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন বোমকেশ হালদার। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন নরেন্দ্রসুন্দর। সংগীত পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন দ্বিজেন চৌধুরী এবং বিভিন্নাংশে দেখা যাবে জহর গাঙ্গুলী, শ্রীমতী ছবি রায়, কণক দেবী, তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী, আশু বসু প্রভৃতিকে।

'প্রতিবাদ' চিত্রের সংগীত সংযোজনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বহু দর্শক ইতিমধ্যেই নিউ থিয়েটার্সের প্রতিবাদ চিত্রের সংগীত সংযোজনার বিরুদ্ধে আমাদের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা এ বিষয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এবং নিউথিয়েটার্সের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দর্শক সাধারণের অভিযোগ যে, ভাব সমুদ্র রবীন্দ্র সংগীতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ—আলোচ্য চিত্রে সংগীত সংযোজনার দোষে সেই ভাবসমুদ্রের যথেষ্ট মর্যাদাহানি হয়েছে। বিশ্বভারতীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্তমান সংখ্যায় আমরা এ বিষয়ে নীরব রইলাম। তাঁদের উত্তর পেলে আগামী সংখ্যায় এনিয়ে বিষদভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রাখি।

শ্রীযুক্ত রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই তরুণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ীর প্রিয় ছাত্র। আমরা রণজিৎ-এর অভিনীত কতকগুলি নাটক দেখেছি এবং এর যে অভিনয় করবার ক্ষমতা আছে এক বাক্যে সকলেই তা স্বীকার করবেন। এর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে বন্দীরে—বলদেব, সরমাতে—তরণী, জাহাঁর ইমানে—জামাল ও সিরাজদ্দৌল্লাতে—দানসা ফকির সত্যই অপূর্ব। রণজিৎ-এর অভিনয়ের মধ্যে কথা বলবার ভংগী ও অভিব্যক্তি দুই অতি সুন্দর। ইনি বেতারেও অভিনয় করেন। বর্তমানে শ্রীরঙ্গমে আছেন এবং আমাদের মনে হয় এই খানে থেকে ইনি শীঘ্রই একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার দক্ষতা অর্জন করবেন। আমরা যদি শীঘ্র রণজিৎকে চিত্রে দেখি তাতে আশ্চর্য হব না। কারণ চিত্রে অভিনয় করবার যোগ্যতা এর সম্পূর্ণ আছে। আমরা কামনা করি এই তরুণ অভিনেতার দিন দিন উন্নতি হউক।

রূপায়ণ চিত্রপ্রতিষ্ঠান

এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী'র চিত্ররূপ সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানির সুর সংযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন খ্যাতনামা নবীন সুরশিল্পী কালীপদ সেন। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, কালীপদ বাবু দেবী চৌধুরাণীর সুর সংযোজনায় অভিনবত্ব ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন। দেবী চৌধুরাণীর নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী। অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে আছেন প্রদীপ বটব্যাল, নীতীশ, উৎপল সেন, শ্রীমতী প্রভা, তুলসী চক্রবর্তী, সুদীপ্তা রায়, রেবা বসু, নিভাননী, উমা গোয়েঙ্কা, মনোরমা, ফনী রায়, নৃপতি, প্রভৃতি আরো অনেক। দেবী চৌধুরাণীর দৃশ্যরচনার ভার গ্রহণ করেছেন বটু সেন, তারক বসু ও সিতেন সেন এবং শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ করছেন যথাক্রমে গৌর দাস ও শৈলেন বসু।
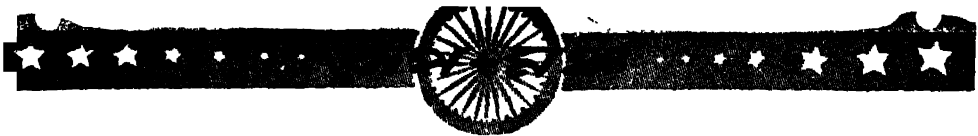
মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠান

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল মহাশয় প্রযোজিত মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম বাংলা বাণী চিত্র গড়ে উঠবে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায় রচিত 'রাই' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র ক'রে। 'রাই' রূপমঞ্চে ধারবাহিক ভাবে প্রকাশিত হ'য়ে শুধু রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজেরই নয়—চিত্র প্রযোজকদের ভিতরও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 'রাই' সমাপ্তির পূর্বেই অনেকে 'রাই'র চিত্ররূপ দিতে অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাঁদের অনেকের মাঝে নিষ্ঠার অভাব পরিলক্ষিত হওয়াতে এবং অনেক ক্ষেত্রে আরোপিত সর্তে স্বীকৃত না হওয়াতে রচয়িতার দিক থেকে আগ্রহ প্রকাশ করা হয় না। বর্তমানে যে সব সর্ত আরোপ করা হয়েছে তার ভিতর (১) সংলাপ রচনার ভার রচয়িতার উপর থাকবে। (২) চিত্রনাট্য রচনায় রচয়িতার অনুমোদন নিতে হবে। (৩) শিল্পী নির্বাচনে যথাসম্ভব পরামর্শ মেনে চলতে হবে এবং রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজ অথবা আগ্রহশীল নূতনদের উপযুক্ততা বিচার করে সুযোগ দিতে হবে।

> 'রাই'র চরিত্রকে পর্দায় রূপায়িত করে তুলবার জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, দীর্ঘাংগী অভিনেত্রীর প্রয়োজন। বয়স আঠারো থেকে বাইশের ভিতর হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবিলম্বে ফটো সহ রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের কাছে আবেদন করুন।

(৪) নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তকে পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। শ্রীযুক্ত পাল নিজেও দেবনারায়ণ গুপ্তকে পূর্বে থেকেই পরিচালক নির্বাচন করে ছিলেন এবং অন্যান্য সর্তাবলী সম্পর্কে তিনি বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন না বরং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। রচয়িতা এবং তাঁর ভিতর আলোচনা প্রসংগে বিন্দুমাত্র মতানৈক্য দেখা দেয় নি। তাই পরস্পরের চুক্তিবদ্ধ হ'তেও কোন বাধা জন্মায় নি। শ্রীযুক্ত পাল নিজের অধ্যবসায় ও সংগ্রামশীলতায় ব্যবসায় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চিত্রজগতেও সম্প্রতি তিনি পা বাড়িয়েছেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কুহেলিকা ও বিচারক চিত্রের সংগেও তিনি জড়িত রয়েছেন। 'রাই' তাঁর সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় সর্ব প্রথম চিত্ররূপে গড়ে উঠবে। আগামী ১৫ই আগষ্ট, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় 'রাই'র শুভ মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। 'রাই'র ভূমিকালিপি নির্বাচন ও অন্যান্য বিষয়ে রূপ মঞ্চের পাঠক সমাজের পরামর্শ যথা সম্ভব মেনে নেওয়া হবে। আশাকরি এবিষয়ে তাঁরা রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে সর্ববিষয়ে সাহায্য করবেন। তাঁদের আগ্রহ এবং সহযোগিতার কথা স্মরণ করেই কালীশ বাবু 'রাই'কে চিত্ররূপ দেবার প্রস্তাবে সম্মত হ'য়েছেন।

রূপ-মঞ্চ পাঠক সমাজের কাছে রূপ-মঞ্চের প্রতিজন কর্মীরই শুধু আন্তরিক আবেদন নয়—রূপ-মঞ্চ সম্পাদকেরও ব্যক্তিগত অনুরোধ। পাঠক সমাজকে সব সময়ই সচেতন থাকতে হবে, যেন রাই'র চিত্ররূপ দিতে যেয়ে কোন রকম ব্যর্থতা দেখা না দেয়—যা ব্যক্তিগত ভাবে রূপ-মঞ্চ সম্পাদক এবং রূপ-মঞ্চকেও স্পর্শ করতে পারে। আমাদের পাঠক-সমাজ থেকে মধুছন্দা নামে ইতিমধ্যেই একজন নবাগতাকে আবিষ্কার করা হয়েছে 'রাই' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকার জন্য। অন্যান্য ভূমিকালিপি পাঠক সাধারণের পরামর্শানুযায়ী নির্বাচন করা হবে। অন্যান্য ভূমিকা, সংগীত পরিচালনা প্রভৃতি সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত ভাবে জানাতে পাবনো বলে আশা রাখি 'রাই'র চিত্ররূপ দিতে যেয়ে পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ও রূপমঞ্চ সম্পাদক একটি শিল্পগোষ্ঠী তৈরী করবেন বলে স্থির করেছেন। এই শিল্পগোষ্ঠীতে একটি চিত্র নির্মাণের জন্য যেসব কর্মী, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজন, তাঁরা প্রত্যেকেই থাকবেন। তাছাড়া থাকবেন প্রযোজক ক্ষিতীশ পাল, সুগায়িকা নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর রায় চৌধুরী, চিত্র শিল্পী অনিল গুপ্ত, রূপ-মঞ্চের কর্মাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডল, সম্পাদকের নিজস্ব সহকারী স্নেহেন্দ্র গুপ্ত ও মহিলা প্রতিনিধি মণিদীপা এবং নবীন সহঃ পরিচালক দিলীপ দে চৌধুরী।

প্রতিবারের মত বৃহত্তর বাংলা ও বৃহত্তর বাংলার বাইরের বাংলা ভাষাভাষী অগণিত দর্শকসমাজের চাহিদা মেটাতে ও প্রতি-যোগিতায় অপ্রতিদ্বন্দী থাকবার জন্য — —

শারদীয়া রূপ-মঞ্চ

১৩৫৮-র

প্র স্তু তি সু রু হ য়ে ছে

●

যে সব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়ে তাঁদের পণ্যের প্রচার কামনা করতে চান, অবিলম্বে রূপ-মঞ্চের বিজ্ঞাপন বিভাগের সংগে তাঁদের যোগাযোগ রক্ষা করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। — — —

●

যে সব চিত্র ও নাট্য প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিগত ভাবে শিল্পী ও বিশেষজ্ঞরা উক্ত সংখ্যায় তাঁদের প্রতিকৃতি মুদ্রণ করতে চান, রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের সংগে ব্যক্তিগত ভাবে এবিষয়ে আগামী ৩০শে আগষ্টের পূর্বে পত্রালাপ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। কারণ এবিষয়ে পূর্ব পরিকল্পিত পন্থানুযায়ী আমাদের নির্বাচনী শেষ করতে হবে —

●

রূপ-মঞ্চ (শারদীয়া) বিজ্ঞাপনী-২

মণিপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায়

প্রথম বাণী চিত্র

"শ্রীশ্রীগোবিন্দজী"

সম্পূর্ণ সরল হিন্দী ও মণিপুরী ভাষায়, মণিপুরী নৃত্যে, গীতে ও অভিনয়ে চিত্র জগতে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবে যাহা ইতিপূর্বে সম্ভব হয় নাই, চিত্রগ্রহণ চলিতেছে।

প্রযোজক :

মণিপুর ন্যাশনাল আর্ট পিকচার্স লিঃ

হেড অফিস :

৩৪।১, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিঃ (১২)

সেণ্ট্রাল অফিস :

ইম্ফল, মণিপুর ষ্টেট।

বাংলা গীতিকাব্যে এক অবিস্মরণীয় প্রচেষ্টা।—

ভারতীয় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পের, একনিষ্ঠ সাধকদের জীবনের ও আদর্শের সম্পূর্ণ অভিনব গীতিরূপ : : :

মানুষের জয়গান

কথা সুর ও স্বরলিপি। রবীন্দ্র নাগ

প্রথম পর্বে আছেন : বুদ্ধদেব, অশোক, কালিদাস, শ্রীচৈতন্য, নানক, মীরাবাঈ, তানসেন, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, চণ্ডীদাস, রামপ্রসাদ, সিরাজদ্দৌলা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, গান্ধী, যতীন, সুভাষচন্দ্র, ক্ষুদিরাম, নজরুল।

প্রথম পর্ব নিঃশেষিত প্রায়
দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

প্রকাশক :

এন, এম, রায়চৌধুরী কোং লিঃ

৭২, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রথমারম্ভ

শুক্রবার

২৩শে জুলাই

উ ত্ত রা

পরিবেশন—

বোম্বে পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটর্স

ব ঞ্চি তা

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি পরিচালিত

বাংলা সবাক চিত্র, তার শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের জনপ্রিয়তার মান-বিচারের ষষ্ঠ বার্ষিক নির্বাচনী-পত্র। ১৩৫৪ সালে মুক্তি প্রাপ্ত বাংলা চিত্র, তার শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের জনপ্রিয়তা বিচারে আপনি আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

বাংলা ছায়াছবির প্রত্যেক দর্শকেরই এই জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার অধিকার আছে।

★

— ১৩৫৪ সালের প্রতিযোগিতামূলক চিত্রগুলি —

১। নার্স সিসি। ২। রাত্রি। ৩। রায়চৌধুরী। ৪। চোরাবালি। ৫। ঝড়ের পর। ৬। পূর্বরাগ। ৭। দেশের দাবী। ৮। মুক্তির বন্ধন। ৯। রামপ্রসাদ। ১০। অলকানন্দা। ১১। বর্মার পথে। ১২। নৌকাডুবি। ১৩। দুই বন্ধু। ১৪। স্বয়ং সিদ্ধা। ১৫। স্বপ্ন ও সাধনা। ১৬। চন্দ্রশেখর। ১৭। নতুন খবর। ১৮। রামের সুমতি। ১৯। ঘরোয়া। ২০। ঘুমিয়ে আছে গ্রাম। ২১। শেষ নিবেদন। ২২। শাঁখা সিঁদুর। ২৩। অভিযোগ ২৪। চলার পথে। ২৫। আমার দেশ। — — —

— নির্বাচনী বিষয় —

১। তিনখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র—

....

২। শ্রেষ্ঠ মৌলিক কাহিনী—

....

৩। শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপ (চিত্রনাট্য)

....

৪। শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রহণ—

....

৫। শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রহণ—

....

৬। শ্রেষ্ঠ দৃশ্যরচনা—

....

৭। শ্রেষ্ঠ গান –(কথা)

....

৮। শ্রেষ্ঠ সুর সংযোজনা—

....

৯। শ্রেষ্ঠ তিনজন অভিনেতা—

....

১০। শ্রেষ্ঠা তিনজন অভিনেত্রী—

....

১১। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—

....

নাম... ... ...

ঠিকানা ... ...পেশা ... ...

লিখে এই নির্বাচনী পত্র পূর্ণ করে আগামী ৩০শে আগষ্টের ভিতর খামের মুখ বন্ধ করে 'নির্বাচনী পত্র' উপরে লিখে ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫, সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিন। —

দর্শকসাধারণের বিচারে নির্বাচিত ১৩৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র-কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যের সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটী সামাজিক আলেখ্যকে চিত্ররূপায়িত করে রূপলেখা পিকচার্স চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানাবে। — —

আবর্ত

আবর্ত

আ ব র্ত

চিত্রনাট্য—রমা চক্রবর্তী

কাহিনীর অভিনবত্বে আংগিকের দর্শন মাধুর্যে সুষ্ঠ অভিনয় ও অপূর্ব সুর-মূর্চ্ছনায় আবর্ত দর্শকমনে আলোড়ন-সৃষ্টির দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। — —

কাহিনী ও সংলাপ :
নিতাই ভট্টাচার্য

সংগীত পরিচালনা :
কালীপদ সেন

প্রযোজনা :
রূপলেখা পিকচার্স

প রি চা ল না ঃ ঃ বি শ্ব ক র্মা

বিশ্বকর্মা কোন ব্যক্তি বিশেষের ছদ্মনাম নয়—চিত্রজগতের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ—কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য প্রভৃতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে এই শিল্পগোষ্ঠীটি। এঁদের সমবেত অভিজ্ঞতা ও সৃজনী-প্রতিভায় আবর্ত রূপায়িত হ'য়ে উঠছে।

●

আবর্ত-র নাটকীয় ঘূর্ণিপাকে নায়ক ও নায়িকার চরিত্রে যথাক্রমে দেখা যাবে রামপ্রসাদ-খ্যাত সুজিত চক্রবর্তী ও নৌকাডুবি-খ্যাতা বিদুষী অভিনেত্রী মীরা মিশ্রকে।

অন্যান্যাংশে আছেন :

রেণুকা রায় • অপর্ণা দেবী • মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য • সন্তোষ সিংহ
ভারতীয় গণনাট্য সংঘের শম্ভু মিত্র • বীরেন মিত্র • কালী গুহ
তা ছা ড়া ন তু ন-পু রা ত ন আ রো অ নে কে।

●

— ই ন্দ্র পু রী ষ্টু ডি ও তে 'আ ব র্ত' দ্রু ত স মা প্তি র প থে —

সদাচঞ্চল জীবেন বসু——————”

শ্রীমতী কানন দেবী : অনির্বাণ চিত্রে।

শ্রাবণ
১৩৫৫
★

রূপ-মঞ্চ

অষ্টম-বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা

বেতাল-জগত-(২)

গত সংখ্যার রূপ-মঞ্চে বেতার জগতের বেতাল-বলা নিয়ে আলোচনা সুরু করেছি। পরম আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, বেতার জগতের বেতাল চলাটাই যে চাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—আমাদের এই অভিযোগকে সমর্থন করে বহু পাঠক পাঠিকা—বেতার শ্রোতা—শিল্পী ও সুধীব্যক্তিরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। তাঁরা আরো অনুরোধ করেছেন, বেতার জগতের 'বেতাল বলা' নিয়ে আমরা যে বলা সুরু করেছি যতক্ষণ না বেতার কেন্দ্রের বেতাল-বলা বন্ধ হয়, ততক্ষণ যেন আমরা আমাদের বলা বন্ধ না করি। কিন্তু কথা হচ্ছে, "দিল্লী অনেক দূর"। আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ কী সেখানে যেয়ে পৌঁছুতে পারবে? পারবে না বলে হতাশ হ'য়ে হাহুতাশ করলে চলবে না—রূপ মঞ্চের কণ্ঠ ক্ষীণ—আমার কণ্ঠ ক্ষীণ—আপনার কণ্ঠ ক্ষীণ—। কিন্তু আমাদের সকলের সমবেত কণ্ঠত ক্ষীণ নয়! একসংগে আসুনত, আমরা সুর মিলিয়ে হাক দি যেমন হাক দিয়েছি অতীতে—যে হাক সাত সমুদ্র তের নদীর পাড়ে বেনিয়া বৃটিশ রাজশক্তির বেতাল চালকে বন্ধ করে দিয়েছে দু'শত বছরের পুঁজিপাটা ছেড়ে লোটা কম্বল নিয়ে সুর সুর করে ল্যাজ গুটিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। আসুন, আমরা সমবেত ভাবে তেমনি হাক দি—আপনি শিল্পী—সাংবাদিক সাহিত্যিক—সমালোচক—বেতার শ্রোতা,—আপনি যাই হউন না কেন—আপনার নিজস্ব সত্বায় ডাক দিন—ব্যক্তিগত সত্বা সমবেত শক্তির সংগে মিলিয়ে দিলে যে মহাশক্তির সৃষ্টি হবে—সেই সমবেত শক্তির কণ্ঠ-নিনাদ অতি সহজেই দিল্লীর হর্ম্যমালাকে কম্পিত করে তুলবে। দিল্লী আর তখন অনেক দূরে থাকবে না। গত সংখ্যায় কেবল একটি বিভাগের বেতাল বলা সম্পর্কে বলে অন্যান্য বিভাগের বলা ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। যতক্ষণ না আমরা সুর মিলিয়ে নিতে পাচ্ছি,ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য-গুলি ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে—এই সুর মেলাতেই আমাদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ থাক। সুরসাগর জগন্ময় মিত্র আমাদের সংগে সুর মেলানোর আগ্রহ জানিয়ে ১৮।৮।৪৮ তারিখের পত্রে যে অভিযোগ এনেছেন, এখানে তা উধৃত করছি; তিনি লিখেছেন: পনেরই আগষ্ট যে পয়লা এপ্রিল নয়, সেটা কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের মুরব্বীরা বোধ হয় জানেন না। জানলে আমার সংগে এবং বেতার শ্রোতৃবৃন্দের সংগে এমন রসিকতা নিশ্চয়ই করতেন না। পনেরই তারিখের "বেতার জগতে" হঠাৎ দেখি আমার নাম 'নজরুল-গীতির' অনুষ্ঠানে—সময় দিয়েছেন ৫-৩০ মিনিটে। অবাক হলাম বেতার জগত দেখে। প্রথমতঃ আমার কথা নেওয়ার ভদ্রতা এঁদের জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ আমি কণ্ট্রাক্ট না করা সত্ত্বেও আমার নাম দিয়ে লোককে ঠকাবার চেষ্টা করাটা আইনত অপরাধ মনে করি। অন্য যে কোন দিনে এ রকম ইতরামি রসিকতায় হয়ত না হাসলেও উপেক্ষা করতাম। কিন্তু ঐ দিনটিতে, বিশেষ ক'রে ভারতের স্বাধীনতা লাভের দিনে ছ্যাবলামির মাত্রাটা সহ্য করা অসহনীয় নয় কি?

সমাপ্তির পথে—

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত
ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের

দেবী চৌধুরাণী

পরিচালনা : সতীশ দাশগুপ্ত

●

বঙ্কিমচন্দ্রের মানস প্রতিমা
দেবী চৌধুরাণীকে
রূপায়িত করে তুলছেন
শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী

●

অন্যান্য ভূমিকায় :

প্রভা ∘ সুদীপ্তা রায় ∘ রেবা বসু
নিভাননী ∘ মনোরমা ∘ উমা গোয়েঙ্কা
প্রদীপ বটব্যাল ∘ উৎপল সেন ∘ নীতীশ
ফণী রায় ∘ উপেন চট্টো ∘ তুলসী চক্রঃ
নৃপতি ও আরো অনেকে।

●

চিত্রশিল্পী—শৈলেন বসু ∘ শব্দযন্ত্রী—
গৌর দাস ∘ শিল্পনির্দেশনা—বটু সেন,
তারক বসু, ক্ষিতীন সেন

●

কালীপদ সেনের সংগীত
পরিচালনা বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে ধরা দেবে।

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান

গত মে মাস থেকে আমার সংগে কলিকাতা বেতারের সম্পর্ক নেই। কেবল দলাদলি, স্বজন পোষা নোংরামি আর শিল্পীদের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেবার একটা সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাই। বহুবার বলা সত্ত্বেও ফল কিছু হয় নি আজ পর্যন্ত।

দুর্গতি আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। সে অনেক কথা—পর পর সে সকল প্রকাশ করবার বাসনা রইল। আপনার বহুল-প্রচারিত পত্রিকা মারফত উপস্থিতের অবস্থাটা আমার শ্রোতাদের জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন বোধে উপরে জানিয়ে দিলাম। শ্রোতারা যেন না ভাবেন যে, আমি কথা দিয়েও বেতার কর্তৃপক্ষকে ও আমার শ্রোতাদের কোন অজুহাত দেখিয়ে স্বাধীনতা উৎসবের দিনে কথার খেলাপ করেছি—সেটা নাকি বেতার কর্তৃপক্ষ চালাকির দ্বারা প্রমাণ করার ষড়যন্ত্র করছেন। দোষ যে আমার নয়, তার প্রমাণ আমি দিলাম। এখন বাকীটুকু বিচারের ভার বেতার শ্রোতাদের ওপরই ছেড়ে দিলাম। আর এই সংগে দিল্লীর উর্দ্ধতন কর্মচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে করে কলিকাতা কেন্দ্র হতে যথা সম্ভব শীঘ্র এইরূপ নোংরামি লোপ পায় এবং তাদের বক্তব্য জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হয়। তারপর আইনের কাছে এঁরা কি কৈফিয়ত দেন, তার ব্যবস্থা নিজ হাতেই গ্রহণ করবার মনস্থ করেছি।"

আশা করি কলিকাতার বেতার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যাঁদের যে কোন অভিযোগ আছে—তাঁরা এমনি ভাবে তা পেশ করবেন। তারপর সমবেত দাবী নিয়ে আমরা উপস্থিত হব।

—সম্পাদক—রূঃ মঃ।

শারদীয়া রূপ-মঞ্চে—

বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনি আপনার পণ্যের প্রচার বৃদ্ধি

'সকলি গড়ল ভেল'

[সেন্সার বোর্ড—৩]

★

রূপ-মঞ্চের অষ্টমবর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় পশ্চিম বাংলা ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের স্বেচ্ছাচারিতার কথা উল্লেখ করে আমরা প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। আমরা চেয়েছি, যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পটি আজ বাংলার শিল্পক্ষেত্রে যতটুকু স্থান অধিকার করে নিতে পেরেছে, বাংলার সেই অগণিত দর্শকসমাজকে সচেতন করে তুলতে। একমাত্র তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও সহানুভূতিতে দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্প তবু খানিকটা পুষ্টিলাভ করতে সমর্থ হ'য়েছে। জন্মের প্রথম দিন থেকেই দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পটিকে শুধু বৈদেশিক সরকারের ঘৃণা ও অবহেলাই কুড়িয়ে নিতে হয়নি—দেশীয় সমাজ ধুরন্ধরদের লাঞ্ছনাও তাকে কম সইতে হয়নি। বৈদেশিক সরকার সব সময়ই তাদের খড়্গ উঁচিয়ে রেখেছিল এই শিল্পটির ওপর। কোন সত্য কথাই একে বলতে দেয়নি—দেয়নি সুষ্ঠু রূপ নিয়ে বিকশিত হ'য়ে উঠতে। জাতির মর্ম বেদনাকে ব্যক্ত করবার পথকেও রুদ্ধ করে রেখেছিল—সেন্সারবোর্ডের কঠিন কাঠামোয় বন্ধন জর্জরিত এর আত্মাকে ফেলেছিল পঙ্গু করে। তাই কত সম্ভাবনাই না ব্যর্থ হ'য়ে যেতে দেখেছি আমরা! আমরা, যারা প্রথম দিন থেকে এই শিল্পটিকে ভাল বেসেছিলাম—চলচ্চিত্র শিল্পের মারফৎ জাতির সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেছিলাম—শত অবিচার ও অন্যায়েও তবু মুসড়ে পড়িনি। আমরা অবহেলিত ও নিন্দিত বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের পূজারীর দল—সমাজের চোখে ঘৃণিত চলচ্চিত্র-সাংবাদিক—সাহিত্যিক—প্রযোজক—পরিবেশক—প্রদর্শক—দর্শক—পরিচালক—শিল্পী—বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরা—সকলের শত ঘৃণা ও লাঞ্ছনা কুড়িয়ে নিয়েও আমাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি। "সকল কাটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে"—এই আশাই যে আমাদের সমস্ত হৃদয় ভরিয়ে রেখেছিল। স্বাধীনতা সূর্যের দীপ্ত আভায় আমাদের সকল আশা-মুকুল মুকুলিত হ'য়ে উঠবে—! কিন্তু হায়! সকলি গড়ল ভেল! যাঁদের নেতৃত্বে বৈদেশিক শাসন ক্ষমতার মূলে আমরা আঘাত হেনে এসেছি—তাঁরাই আজ দেশের শাসন পরিচালনার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন—অথচ তাঁদেরই হাতে আমাদের মহত্তর স্বার্থ আঘাত খেয়ে ধূলায় লুটিয়ে পড়ছে—এর চেয়ে মর্মদায়ক আর কী থাকতে পারে! কাঁদুনী গেয়ে লাভ নেই। চোখের জলে চরণ ধুইয়ে পাষাণ দেবতার মৌন-মুখ মুখরিত হ'য়ে ওঠে,এ প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে—কিন্তু মানুষ-দেবতাকে কেউ বিচলিত করতে পেরেছে বলে শুনিনি। অবশ্য বাঙ্গালী বধূদের সম্পর্কেও এরূপ জনশ্রুতি আছে—চোখের জলে তাঁরা নাকি অনেক সময় দু'একখানা গয়না ও শাড়ী আদায় করতে সমর্থা হন—তবে তাও বর্তমানে নয়। তাঁরাও আজকাল স্বাধীকারের দাবী জানাতে শিখেছেন। তাই, চোখের জলে আমরাও কারোর চরণ ভিজাতে যাবো না। স্বাধীকারের দাবী নিয়েই আমরা উপস্থিত হবো—যতক্ষণ এ দাবী স্বীকৃত না হবে—আমরা আমাদের আদর্শে থাকবো অবিচলিত।

হায়দ্রাবাদ বা কাশ্মীর সম্পর্কে আমরা যদি কিছু বলতে যেতাম, জাতীয় সরকার অনধিকার চর্চা বলে আমাদের সে-বলাকে দাবীয়ে রাখতে পারতেন। কিন্তু চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কে আমাদের কোন বলা বা দাবীকে তাঁরা কোন মতেই দূরে ঠেলে দিতে পারবেন না। কারণ, তাঁদের যে কোন ব্যক্তির চেয়ে এ-সম্পর্কে বলবার অধিকার ও যোগ্যতা আমাদের ঢের বেশী আছে।

গত দুই সংখ্যার রূপ-মঞ্চে বর্তমান সেন্সারবোর্ডের কাঠামো কী রূপ হওয়া উচিত, তা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। শুধু আলোচনাই নয়—এ বিষয়ে পশ্চিম বাংলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুক্ত বিধান চন্দ্র রায় এবং স্বরাষ্ট্রসচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়কে ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়েও অবহিত করে তুলতে চেয়েছি। জানিনা, তাঁদের কাছ থেকে কতখানি সাড়া পাবো। তবে এই প্রবন্ধ লিখবার সময় পর্যন্তও (২৮শে শ্রাবণ—৫৫) তাঁদের কাছ
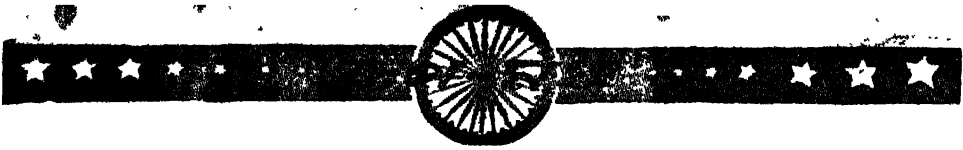
থেকে কোন উত্তর পাইনি। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলা সেন্সার বোর্ড অনুমোদিত একটা সাবকমিটি সেন্সার সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেছেন। এই সাব-কমিটিতে ছিলেন : (১) শ্রী জে, সি, গুপ্ত, (২) শ্রী পি, এস, মাথুর, (৩) শ্রী এইচ, ঘোষচৌধুরী। প্রথমেই চলচ্চিত্র সম্পর্কে এঁদের বলবার অধিকারের প্রশ্ন ওঠে। (১) শ্রীযুক্ত জে, সি, গুপ্ত—কংগ্রেস নেতা ও নিপুণ আইনজ্ঞ বলে আমাদের কাছে পরিচিত। কলিকাতা করপোরেশনের সংগেও জড়িত ছিলেন—আর ছিলেন বা আছেন সেন্সার বোর্ডের সভ্য রূপে। অতীতের এবং বর্তমানের সেন্সারবোর্ডের চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান গরিমাত আর আমাদের অজানা নেই! (২) শ্রী পি, এস, মাথুর—সম্ভবতঃ পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁরই বা কী অভিজ্ঞতা আছে! বড়জোর সরকারের তরফ থেকে ইতিপূর্বে যে সব প্রচারমূলক চিত্র প্রস্তুত করানো হ'য়েছে, তাই নিয়ে কিছুটা ঘাটাঘাটি করে থাকতে পারেন। আর এই ভদ্রলোকের বাঙ্গালী বিদ্বেষ মনোভাব সম্পর্কে একাধিক বার আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে। আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রগুলি সরকারী বিজ্ঞাপনের মোহে সেকথা বলতে কোন সময়ই সাহসী হননি। ব্যক্তিগতভাবে আমরাও শ্রীযুক্ত মাথুরের বাঙ্গালী-বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি। একথাও বলে রাখা ভাল যে, আমরা বিজ্ঞাপনের উমেদারী নিয়ে কোনদিন তাঁর কাছে হাজির হইনি। আমাদের অভিযোগকে অকাট্য বলে মেনে নিতেও বলছি না! পশ্চিম বাংলা সরকার এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে পারেন। (৩) তৃতীয় ব্যক্তিটি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই, তবে তিনি যে দিগগজ নন, একথা হলফ করে বলতে পারি। শুধু আমাদের বলাতেই যে আমাদের পাঠকসমাজকে বিশ্বাস করতে বলছি তা নয়—এঁরা যে খসড়াটি তৈরী করেছেন, তা পড়লে চিত্রশিল্প সম্পর্কে একটু ওয়াকীফহাল যে কোন ব্যক্তি এঁদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধিটা পরিমাপ করতে পারবেন। একটা রুগ্নশিশুকে সুন্দর ও মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদে সাজিয়ে দিলে যেমনি তার স্বাস্থ্যহীনতাকে ঢাকা যায় না—এঁদের খসড়াটিও তেমনি ব্যর্থপ্রচেষ্টারূপেই দেখা দিয়েছে। তাছাড়া আরও একটা উপমার সংগে এই খসড়াটির তুলনা দেওয়া যেতে পারে—গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দিয়ে গাছটিকে বাঁচানোর প্রচেষ্টায় যেমনি মূর্খতা ছাড়া আর কিছুর পরিচয় মেলে না—এই খসড়াটির ভিতর ঠিক তদ্রূপ মূর্খতারই পরিচয় মিলবে। বড় বড় আদর্শবাদের বুলি আছে—চিত্র শিল্পকে রাতারাতি বিরাট কিছুতে পরিণত করবার স্পৃহা আছে—সরকারী তহবিলকে ফাঁপিয়ে তুলবার পন্থা আছে—কিন্তু নেই শুধু মূলবস্তুটি, অর্থাৎ কার্যকরী পন্থাটি। তাই মনে হয়, পেনগুইন সংস্করণের দু'একখানা বই ঘাটাঘাটি করে অনেক মেহনৎ করে খসড়াটি রচিত হ'য়েছে। দেশ-বিদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের নজিরও সভারা তুলে ধরে নিজেদের জ্ঞান-গরিমার পরিচয় দিতে চেয়েছেন।

কূপমণ্ডূক সরকারী মহল হয়ত এই জ্ঞানগরিমার তারিফ করতে পারেন, কিন্তু অতল সমুদ্রের মাঝে যাঁরা রত্নসংগ্রহে আজীবন নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছেন, তাঁদের কাছে এর কোন গরিমাই ধরা পড়বে না—একমাত্র এঁদের অজ্ঞতা ও স্পর্ধা ছাড়া। এঁদের এই জ্ঞানগরিমার অন্তসার-শূন্যতার কথা উল্লেখ করবার পূর্বে চিত্র শিল্প সম্পর্কে এঁদের খসড়ায় যে সব বাধা নিষেধ আরোপ করবার কথা প্রকাশ পেয়েছে, সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নিচ্ছি। এই খসড়ায় প্রত্যেক ষ্টুডিওকে চিত্র নির্মাণের জন্য রেজিষ্ট্রিকৃত এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত হ'তে হবে। ষ্টুডিওগুলির পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া স্বাস্থ্য সম্মত হওয়া চাই—অগ্নি-বিপদের

সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকা চাই—শিল্পী ও কর্মীদের কাজের সময় নির্দিষ্টভাবে বেঁধে দেওয়া চাই—তাছাড়া ষ্টুডিওতে শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কলাকুশলী ও যন্ত্রবিদ থাকা চাই—এছাড়া আরো বিশদভাবে পরিকল্পনা পেশ করা হবে বলে কমিটি আভাস দিয়েছেন। ষ্টুডিও যে এই সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলছেন. সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সার্টিফিকেটও নিয়ে রাখতে হবে। তাছাড়া যদি কোন ষ্টুডিওতে ফিল্ম লেবরেটরি থাকে, তার জন্যও পৃথকভাবে লাইসেন্স নিতে হবে। কোন প্রযোজক যদি চিত্র নির্মাণ করতে চান—তাঁকেও লাইসেন্স নিতে হবে এবং পূর্বে থেকে চিত্রকাহিনী—সংলাপ—গান (কথা) প্রভৃতি বোর্ডকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত ষ্টুডিওতেই যে চিত্রখানি গ্রহণ করা হবে, বোর্ডকে সে প্রতিশ্রুতিও দিতে হবে। চিত্রের প্রচার কার্যের জন্য যে সব পুস্তিকা রচনা করা হবে—প্রচার পত্র, ষ্টীল ফটো, স্লাইড ও বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত সবকিছুই বোর্ডকে দেখিয়ে অনুমোদন করে নিতে হবে। প্রত্যেক চিত্রশিল্পী,শব্দযন্ত্রী ও অন্যান্যদেরও লাইসেন্স নিতে হইবে। এবং শিল্পীদের বেলায়ও এই নিয়ম প্রয়োগ করা হবে বলে শুনতে পাচ্ছি। খসড়ায় যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করা হ'য়েছে, সংক্ষেপেই তার মূল হ'লো এই। এখন কথা হচ্ছে, বোর্ড কী শুধু এই লাইসেন্স প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হ'য়েই থাকবেন! আর লাইসেন্স দিতে হ'লে উপযুক্ততা বিচার করে দিতে হবে তো! সেই উপযুক্ততা বিচার করবে কে? বোর্ডের সভ্যদের কী সে যোগ্যতা আছে? আর কথা হচ্ছে, বোর্ড লাইসেন্স দেবেন কাদের? শব্দযন্ত্রী, চিত্রশিল্পী ও বিশেষজ্ঞ হ'তে হ'লে যে শিক্ষার প্রয়োজন,সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েত লাইসেন্স দিতে হবে! সেই শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আভাষই এই বর্তমান খসড়ায় নেই। মনে করুন, নীতিন বসু, বিমল রায়, অজয় কর, বিভূতি দাস, সুরেশ দাস, বিভূতি লাহা, প্রবোধ দাস, সুধীশ ঘটক, অজিত সেন, প্রমথেশ বড়ুয়া, নীরেন লাহিড়ী, অতুল চট্টোপাধ্যায়, যতীন দত্ত, গৌর দাস, শম্ভু সিং, জে, ডি, ইরাণী, মুকুল বসু, প্রভৃতি চিত্রজগতের আরো খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে জে, সি, গুপ্ত, সীতা দেবী, এস, সি, রায়, পি, এস, মাথুর, এইচ, ঘোষচৌধুরী প্রভৃতি এই ধরণের বোদ্ধাদের কাছে: এর চেয়ে বাতুলতা আর কী থাকতে পারে! আমাদের বি, এন, সরকার, মুরলী চাটুজ্জে এঁদের দৌড়তে হবে এই সব সবজান্তাদের কাছে যোগ্যতার সার্টিফিকেট আনতে। শিশিরকুমার, অহীন্দ্র, নরেশ, মনোরঞ্জন, ছবি বিশ্বাস, সরযূ, প্রভা, মলিনা, কানন, কমল, জহর, নির্মলেন্দু, সুনন্দা এঁরা সাড়ম্বরে সেন্সার বোর্ডের অভিনয়-বোদ্ধাদের দোর গোড়ায় দাঁড়াবেন অভিনয় কুশলতার পরীক্ষা দিতে। সব লেখকরা ছুটবেন গল্প নিয়ে—গীতকাররা ছুটবেন গান নিয়ে—প্রচার সচিবেরা—চিত্রশিল্পীরা সবাইকে ছুটতে হবে সবজান্তাদের কাছে। তবু ভাল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁদের আমরা আগেই হারিয়েছি!

সেন্সার বোর্ডের পরিকল্পনাকে তারিফ করতাম, যদি তাঁরা মূল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সমগ্র চিত্রশিল্পটি যদি জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে যায়---তাই আমরা সবচেয়ে বেশী কামনা করবো। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের পুরোভাগে সীতা দেবী, জে, সি, গুপ্ত, পি, এস, মাথুরের দলকে রাখলে চলবে না। এর পুরোভাগে দীর্ঘদিন যাঁরা চিত্রশিল্পের সংগে জড়িত রয়েছেন, তাঁদেরই রাখতে হবে। এবং এই নিয়ন্ত্রণ করতে হ'লে মূলের দিকে আগে দৃষ্টি দিতে হবে। বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর কার্যকালে এই সেন্সারবোর্ড গড়ে উঠেছিল, তাঁদেরই স্বার্থের কথা চিন্তা করে—শিল্পটির স্বার্থে নয়। সেন্সারবোর্ডের প্রধান ও একমাত্র বল্লেও অত্যুক্তি হবে না—কর্তব্য ছিল—শাসকগোষ্ঠির স্বার্থবিরোধী কোন কিছু চিত্র মারফৎ যাতে প্রচারিত না হয়, তা লক্ষ্য করবার। আমাদের আশা আকাঙ্খার কোন বাণী যাতে মূর্ত হ'য়ে না উঠতে পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখবার। বৃটিশ প্রভুদের কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে। দেশের শাসনভার আজ দেশবাসীর হাতে। দেশবাসীর আস্থা ও শ্রদ্ধার্জন করে যাঁরা ধন্য হ'য়েছেন, তাঁরাই দেশবাসীর প্রতিনিধিস্বরূপ রাষ্ট্র পরিচালনা কচ্ছেন। তাই দেশীয় কোন শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশের পথে দেশীয় সরকারের কোন

বাধা নিষেধ আরোপ করবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না। আর বাধানিষেধের মাঝে কোন শিল্পই সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে না। এ যুগের বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষী জর্জ বার্ণাড শ' 'সেন্সারসিপ' সম্পর্কে যেকথা বলেছেন তা এখানে উল্লেখ করতে চাই : "All censorship exists to prevent anyone from challenging conceptions and existing institution. All progress is initiated by challenging current conceptions and executed by supplanting existing institutions. Consequently the first condition of progress is the removal of censorships. There is the whole case against censorship in a nutshell."—George Bernard Shaw.

শুধু শ'ই নন, এ বিষয়ে আর একজন মনীষী থিওডোর রুজভেল্ট-এর অভিমতও পণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : "Selling the public whatever the public will buy—a theory of conduct which would justify the existence of every keeper of an opium den, of every foul creature who ministers to the vices of mankind."—Theodore Roosevelt. এঁদের অভিমত উদ্ধৃত করে সেন্সারবোর্ডের বিলোপ সাধনের পক্ষে আমরা কোমর বেঁধে লাগতে চাইনা, কারণ, বাধানিষেধ তখনই উঠে যাওয়া সম্ভব, যখন জনসাধারণের মন (public-mind) খুব উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারে। তবে শিল্প সৃষ্টির মূলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের মন যে জনসাধারণের মনের চেয়ে অনেক উঁচুতে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই স্রষ্টাদের সৃষ্টির পথে এমন কোন বাধানিষেধ থাকা উচিত নয়, যাতে সৃষ্টির বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে তাই সেন্সারসিপ গড়ে ওঠে—শিল্পের সংগে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়েই। সোভিয়েট রাশিয়াতে সমস্ত শিল্পটাই সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে। আর এই নিয়ন্ত্রণের পুরোভাগে শিল্পের বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরাই রয়েছেন। সেন্সার বোর্ডের সামনে দুই রকমের কর্মপদ্ধতি আছে। বর্তমানের মত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে একমাত্র ছাড়পত্র-প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করে যেতে পারেন, অথবা সক্রীয় অংশ গ্রহণ করে চিত্রশিল্পের আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারেন। স্বাধীনতা লাভ করবার পর শেষোক্ত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতেই সেন্সার বোর্ডকে আমরা দেখতে চাই। প্রথমোক্ত কর্মপদ্ধতি অনুসারে তাঁরা মূলত: তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন চিত্রকে ছাড়পত্র দিতে পারেন। (১) ধর্ম : কোন ধর্মের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়েছে কিনা অথবা কোন ধর্মের মূল আদর্শকে বিকৃতভাবে রূপায়িত করা হয়েছে কিনা। (২) রাজনীতি : রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কিছু প্রচার করা হয়েছে কিনা—(প্রচার অর্থে সমালোচনা নয়। কারণ, রাষ্ট্রের সত্ত্বাই যদি কোন দুর্বলতা থাকে, সে সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ ভাবে সমালোচনা করবার অধিকার প্রত্যেক অধিবাসীরই আছে। তাছাড়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিবিশেষের রাজনীতি মতবাদকে কখনই দমিয়ে রাখা যায় না—তা সম্পূর্ণ গণতন্ত্রবিরোধী। রাষ্ট্রকে ঠিক পথে পরিচালনা করবার জন্য যদি কোন স্বার্থ-হীন সমালোচনা করা হয়, তবে তাকে কোন মতেই অস্বীকার করা চলবে না। শত্রুভাবাপন্ন কোন দেশের বা রাষ্ট্রের প্রচার কার্য যাতে না হয়। (৩) সমাজ : সামাজিক নীতিবিরুদ্ধ কোন কিছু যাতে প্রচার করা না হয়—সভ্যতা ও রুচির পরিপন্থী অথবা অশ্লীল কিছু যাতে স্থান না পায়—মোটকথা মানব ধর্মের সাধারণ সত্যকে যাতে অস্বীকার করা না হয়—সামাজিক সংস্কার সাধন ও প্রগতি অথবা সামাজিক বিপ্লবের নামে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা যাতে প্রচারিত না হয়।

সেন্সার বোর্ডের দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ চিত্রশিল্পের উন্নতিতে সক্রীয় অংশ গ্রহণ—অথবা চলচ্চিত্রশিল্পের নিয়ন্তার রূপই
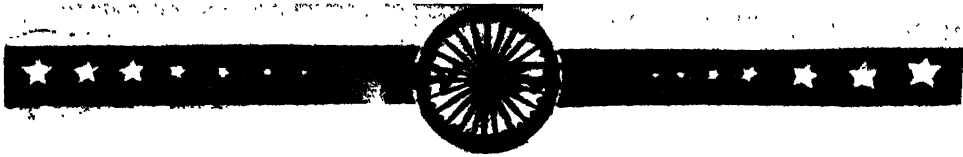
আজ আমরা কামনা করি। সেন্সার বোর্ডের এই রূপ বিকশিত হ'য়ে উঠলে সাবকমিটির খসড়ায় যে সব বাধা-নিষেধের কথা রয়েছে, তা আপনা থেকেই কার্যকরী হ'তে বাধ্য এবং তাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণও থাকবে না। কিন্তু সেন্সার বোর্ড যদি এই রূপ নিয়ে প্রকটিত হতে চান—তাহ'লে সবাগ্রে তাকে দৃষ্টি দিতে হবে মূল সমস্যার প্রতি। যে সমস্যা আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পকে এতদিন দাবীয়ে রেখেছে—যে সমস্যা সেন্সার বোর্ডের সাব কমিটির দিগগজ সভ্যদের মনে একটুকু দোলা দেয় নি। এই সমস্যার সমাধান করতে হ'লে সরকারের নিজস্ব একটা প্রয়োগশালার প্রয়োজন —এই প্রয়োগশালাকে ঘিরে থাকবে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য বিদ্যালয়—গবেষণাগার ও লাইব্রেরী। আগ্রহশীল যুবক যুবতীদের ভাবীকালের জন্য চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এই অভাব পূরণ না করে চলচ্চিত্রশিল্প সম্পর্কে কোন পরিকল্পনাই সেন্সার বোর্ড গ্রহণ করতে পারেন না। কারণ, তাতে বরং দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে। অর্থাৎ যে বিষয়গুলি বোর্ডের অনুমোদন লাভ করবার কথা সাবকমিটি উল্লেখ করেছেন —তাতে ব্যক্তিগত ভাবেও যেমনি কারোর মান বৃদ্ধি হবে না, সমষ্টিগত ভাবে শিল্পটিরও কোন উন্নতির সম্ভাবনা নেই। একমাত্র সরকারী তহবিলে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারীদের পকেটে কিছু অর্থাগম হতে পারে। সেন্সার বোর্ডের সাবকমিটির মাননীয় সভ্যরা চলচ্চিত্রের গুণগানে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছেন দেখে খুবই খুসী হলাম। তবু ভাল যে, এতদিন বাদে তাঁদের চৈতন্যোদয় হয়েছে। তাঁরা খসড়া রচনা প্রসংগে সোভিয়েট রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সেন্সার-পদ্ধতি ও চলচ্চিত্র শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। এই উল্লেখে একদিকে খুসীই হ'য়েছি এই জন্য যে, কর্তারা 'পেনগুইন' সিরিজের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত দু'এক খানা বইয়ের পাতা উলটিয়েছেন যা হউক! ঐ পাতা উলটিয়ে যাবার ভিতরই যে তাঁদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রয়েছে – এবং বিষয়টিকে তলিয়ে দেখেননি এজন্য দুঃখিত হবার কথা থাকলেও আমরা হইনি—কারণ, তাঁদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আমরা আশা করতে পারি না।

১৯১২ খৃঃ 'দি ব্রিটিশ বোর্ড অফ ফিল্ম সেন্সারস' (The British Board of Film Censors) বৃটেনের চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের উদ্যোগেই গড়ে উঠে। অবশ্য তার পূর্বেই ১৯০৯ খৃঃ সিনেমাটোগ্রাফ এ্যাক্ট বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্পটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং যখন মার্কিণ চিত্রের সম্মুখ প্রতিযোগিতায় বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্প বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়—বৃটিশ সরকার এই সমস্যা থেকে দেশের চলচ্চিত্র শিল্পকে রক্ষা করবার জন্য একাধিক বার আইন প্রণয়ন করেছেন এবং সক্রীয় সাহায্য করেছেন। কিন্তু আজ হিন্দি ও ইংরেজী ছবির প্রতিযোগিতার মাঝে বাংলা ছবিকে যে দিন দিন পিছু হটতে হচ্ছে, তা থেকে বাংলা চিত্রশিল্পকে রক্ষা করবার কোন ইংগিতই সাবকমিটির খসড়ায় আমরা পাই নি। সাবকমিটি আমেরিকার সেন্সার পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। আমেরিকাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সেন্সারসিপ গড়ে উঠে ১৯১ খৃঃ। তবে আমেরিকার চলচ্চিত্র শিল্প 'মোশন পিকচার্স প্রডিউসার্স এ্যাণ্ড ডিসট্রিবিউটর্স অফ আমেরিকা' (Motion Picture Producers & Distributors of America) প্রতিষ্ঠানটি মারফৎ নিজস্ব সেন্সারসিপ প্রবর্তন করে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। আমেরিকান হেস অফিসের নিয়ম পদ্ধতি সাবকমিটিকে বেশী আকৃষ্ট করেছে বলে মনে হয়। "All scripts are submitted to the Hays office before they are shot, and all finished films must get a code seal before general release." কিন্তু মার্কিণ চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতির মূলে হেস অফিসের যে দায়িত্ব রয়েছে এবং তাঁরা সে দায়িত্ব যেভাবে প্রতিপালন করে, আমাদের সেন্সারবোর্ডও যে তাদেরই পদাংকানুসরণ করে চলবেন, তার প্রতিশ্রুতি কোথায়? আর প্রতিশ্রুতি দিলেইত হলো না। পূর্বে তাঁদের তৈরী হ'য়ে নিতে হবে। সেন্সারবোর্ডটিকে সুপরিকল্পিত ও সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত করে তবে তার হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। "The Hays office also acts as liasion between trade & public. It is a goodwill agency. It seeks out
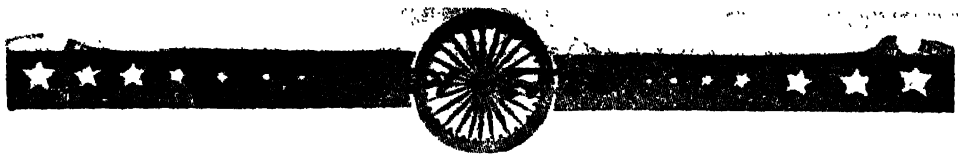
what is honourable in the Americans public's intentions towards the cinema and encourages what is best and cleanest."

তাই হেস অফিসের নজির দেখিয়ে লাভ নেই। হেস অফিসের উপযুক্ততা অর্জন করে তবে কাজে নামতে হবে। ফ্রান্সের চলচ্চিত্র শিল্প ফ্রেঞ্চ সরকারের Ministry of 'Information-এর কর্তৃত্বে গঠিত Comite' d'Organisation de l' Industrie du Cine'ma (C.O.I.C.) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে; এবং চলচ্চিত্রে শিক্ষা দেবার জন্য ফ্রেঞ্চ সরকার দুইটী বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করে থাকেন। চেকোশ্লোভাকিয়া ১৯৪৫ খৃঃ তার চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করে নিয়েছে এবং Czeck Ministry of Information দ্বারা তার চলচ্চিত্রশিল্পটি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পের কথাও সাব কমিটি উল্লেখ করেছেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্পর্কে দু' একটী কথা বলে আমরা আলোচনা শেষ করবো। সাবকমিটি নিজেদের খসড়ার সপক্ষে বলতে যেয়ে বলেছেন: Our suggestion might sound revolutionary at first sight—might as well be described to litarian in some sections. There would be strong opposition from an influential moneyed group. But in the face of all this threat and opposition we propose to control film production in all stages, to completely eliminate the slightest chance of production of unhealthy pictures and at the same time see that the exploitation of the few does not impair the artistic side of the film industry and that it provide scope for research and development and employment to the largest possible number of progressive educated men and women from respectable families."

এই উক্তির ভিতর শুধু যে সমালোচকদের চোখ রাঙ্গানো হয়েছে তা নয়—'প্রগ্রেসিফ এডুকেটেড' প্রভৃতি বাছা বাছা শব্দগুলি প্রয়োগ করে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু অনুপযুক্তের এই স্পর্ধা ও আস্ফালন সহ্য করতে আমরা রাজী নই, একথাও স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে সাবকমিটির সভ্যদের যদি অনুশীলন ক্ষমতার পরিচয় পেতাম, তবে এই শিল্পটিকে জাতীয়করণ করবার পরিকল্পনা নিয়েই তাঁদের উপস্থিত হ'তে দেখতাম। এবং আমেরিকার হেস অফিসের নজির তুলে না ধরে সোভিয়েট রাষ্ট্রের চলচ্চিত্রের বিধি ব্যবস্থার ছকেই দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে গড়ে তুলবার পরিকল্পনা পেশ করতেন। আর কেবল মাত্র কোন বিশেষ প্রদেশে পরিকল্পনা গ্রহণ করলেই হবে না, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সমগ্র ভারত গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই সে পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সোভিয়েট সরকার শুধু চলচ্চিত্র শিল্পের উপর কর্তৃত্বই করেন না—সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প যা আজ সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে—তা সোভিয়েট সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম থেকেই চলচ্চিত্র শিল্পটি রাষ্ট্রনেতা এবং জনসাধারণের স্বীকৃতি লাভ করে যেমনি ধন্য হয়েছে, তেমনি রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতায় আশাতীত উন্নতি লাভ করেছে। চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে লেনিনের উক্তি উধৃত কচ্ছি: "The motion picture is the most important of the arts to the Soviet State." বর্তমান কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং জোসেফ ষ্টালিন ব্যক্তিগত ভাবেও চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতিতে দৃষ্টি রেখেছেন। সমগ্র শিল্পটিই 'কমিসারিয়াট অফ এডুকেশন' এর কর্তৃত্বে।

কর্তৃত্ব বলতে তাঁরা কম্যুনিষ্ট পার্টির 'বিরুদ্ধ-বলাকে' সংযত করবার জন্যই নেই—তাঁরা শিল্পটির সর্বপ্রকার উন্নতির মূলেই রয়েছেন। সংগে সংগে একথাও বলবো, সোভিয়েট রাষ্ট্রের ভাবী উত্তরাধিকারী এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের এই শিল্পটি মারফৎ গড়ে তুলবার প্রতিও 'কমিসারিয়েট অফ এডুকেশন' এর কম লক্ষ্য নেই। শিল্পের প্রযোজক, শিল্পী, বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় বিভিন্ন অংশ গ্রহণ করছেন -রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন। সোভিয়েট পারলিয়ামেণ্ট-এ চিত্রশিল্পের বহু বিশেষজ্ঞদের দেখতে পাওয়া যাবে। 'ডেপুটি অফ দি বালটিক' এর অভিনেতা চেরকাসোভ (Cherkassov) বিপ্লবের প্রথম যুগে পেট্রোগ্রেড সোভিয়েটের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খৃঃ লেনিনগ্রাদ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে সুপ্রিম সোভিয়েটেও তাঁকে নির্বাচিত হ'তে দেখি। জর্জিয়া থেকে সোভিয়েট পারলিয়ামেণ্ট-এ প্রযোজক চিয়াওরেলীর (Chiaurali) নির্বাচনও এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য—উল্লেখযোগ্য শুধু এঁরাই নন—আরো অনেকেই রয়েছেন। ৬'শজনেরও অধিক সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের কর্মীরা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ডোভজেঙ্কো, পুডভকীন, কোজিয়াণ্টসেভ, ট্রৌউবার্গ, চিয়াওরেলী, আলেকজান্ড্রোভ প্রভৃতি আরো অনেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষ নাগরিকের সম্মানে সম্মানিত হ'য়েছেন। প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী অরলোভা 'অর্ডার অফ লেনিন' 'অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার অফ লেবার' প্রভৃতি সম্মানে ভূষিতা হয়েছেন। আর আমাদের এখানে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে চলচ্চিত্রসেবীদের যে স্থান, সেকথা উল্লেখ করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় সোভিয়েট সরকার চলচ্চিত্রের যান্ত্রিক গোড়াপত্তনের দিকেই বেশী দৃষ্টি দেন এবং সাফল্য লাভ করেন। এর পর প্রতিটি পরিকল্পনাতেই চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ স্থান লাভ করে। কম্যুনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশনেও নূতন পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হবার সময় চলচ্চিত্র শিল্পের সর্ব বিষয়ে উন্নতিসাধনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। মস্কো, কিয়েভ, তিব্লীসি, লেনিনগ্রাদ, প্রভৃতি স্থানে আধুনিক বিরাট বিরাট প্রয়োগশালা রয়েছে। তাছাড়া মস্কোতে 'দি ষ্টেট ইন্সটিটিউট অফ সিনেমাট্রোগ্রাফীতে' প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, লেখক, শিল্পী, বিশেষজ্ঞ যন্ত্রবিদ প্রভৃতিদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট প্রয়োগশালা, যন্ত্রাগার মহলাঘর, চিত্রাগার, ও গবেষণাগারও রয়েছে। প্রতিভা-সম্পন্ন আগ্রহশীল যুবক যুবতীদের সামনে এগুলির দ্বার অবারিত। এখানে শুধু অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থাই নেই—শিক্ষার সময় ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভাতাও নির্দিষ্ট রয়েছে। উপযুক্ততা অর্জন করে এঁরাই পরবর্তী কালে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। লেনিনগ্রাদেও এরূপ শিক্ষায়তন আছে। তাছাড়া মস্কোতে পৃথক একটি বিরাট গবেষণাগারও রয়েছে। স্টেরিসকোপ ফিল্ম, উন্নত ধরণের ক্যামেরা, প্রদর্শক যন্ত্র, প্রভৃতির গবেষণায় এখানে বহু মনীষী ও শিক্ষাবিদ নিমগ্ন আছেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পটি সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীন এবং রাষ্ট্রের প্রতিনিধিস্বরূপ। যাঁদের উপর এই কর্তৃত্ব—চিত্রশিল্পে তাঁরা সবাই এক একজন দিকপাল। নতুনদের শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে যেমনি, তেমনি কোন অনভিজ্ঞই চিত্রশিল্পে নাক গলাতে পারে না। শ্রীজে, সি, গুপ্ত, শ্রীপি, এস, মাথুর, শ্রী এইচ ঘোষচৌধুরীর মত কোন আনাড়ীকে দিয়ে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা তৈরী করাবার মত দুর্বুদ্ধির পরিচয় শুধু সোভিয়েট সরকার কেন—যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্ত রাজ্যের সরকার বা শিল্পপতিদের মাঝেও আমরা দেখতে পাইনা। সেখানকার সেন্সারবোর্ডে আমাদের এখানকার মত দিগগজদের মোটেই স্থান নেই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, জাতীয় সরকার সমগ্র শিল্পটিকে নিজস্ব কর্তৃত্বাধানেই গ্রহণ করুন অথবা বর্তমান ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপরই ছেড়ে দিয়ে আংশিক কর্তৃত্ব

করতে চান—সে কর্তৃত্বে শিল্পের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরই গ্রহণ করতে হবে। এবং সাবকমিটি রচিত পরিকল্পনা কোন মতেই গ্রহণ করতে পারেন না, যতক্ষণ না সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা দেবার জন্য চলচ্চিত্র বিদ্যালয় স্থাপন করছেন। এই বিদ্যালয়ে শুধু যন্ত্রবিদদের শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই চলবে না—অভিনেতা—অভিনেত্রী—সংগীত-শিল্পী—প্রযোজক, পরিচালক ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। সরকার যদি তা না করতে পারেন, তবে সেন্সারসিপ সম্পর্কে অধ্যাপক উইলিয়ম লিওন ফেলপস (Prof. William Lyon Phelps) এর উক্তি উর্দ্ধৃত করে সরকারকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই: 'It should be remembered that if censorship should be established and we pass under arbitrary, and irresponsible tyranny, it will not be the fault of the prudes or the reformers or the bigots. It will be the fault of those who destroy freedom by their selfish excesses. Excess leads to prohibitions ··Put the blame where it should justify fall, on those who wrote so abominably that in order to silence them the army of wise and high minded authors had to wear fetters." আশা করি চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পূর্বে কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক জাতীয় সরকারের শুভ বুদ্ধির উদ্রেক হবে। নইলে স্বাধীনতা লাভ করবার পরও সখেদে বলতে হবে, "সকলি গড়ল ভেল।" জয়হিন্দ। —কালীশ মুখোপাধ্যায়

নট ও নাট্যকার

(প্রবন্ধ)

শ্রীমৃণাল কান্তি রায়

★

কথাটা একরকম স্বীকৃতই হয়ে গেছে যে, রঙ্গমঞ্চ জাহান্নামে গেছে। সুধী-সমাজে এ বিষয়েও দ্বিমত নেই যে, এই 'জাহান্নামের' হাত থেকে একে বাঁচানো একান্ত ভাবেই প্রয়োজন—শুধু জাতীয় শিল্প ব'লেই নয়, অনাগত দিনের অভিনব সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য হাতিয়ার হিসাবেও বটে। নজীর হিসাবে সামনে ধরা হোয়েচে আদর্শের কল্পলোক রাশিয়াকে, সেখানকার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের ওপর রঙ্গালয়ের বহুল প্রভাবকে! আজ নিঃশেষে খুইয়ে বসলেও, রঙ্গালয়ের আদর্শ আমাদেরও একদিন ছিল এবং স্ব-মহিমায় ভাস্বর হোয়েই ছিল। কাজেই 'আকালের' হাত থেকে বাংলার রঙ্গমঞ্চকে বাঁচাতে হলে আজ 'বিকল্প উপায়' হিসেবে অতীত নাট্য-ইতিহাস আলোচনা করাও অসংগত হবে না।

'সোভিয়েট নাট্যমঞ্চ'র ভূমিকা লিখতে গিয়ে প্রবীণ নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত রঙ্গালয়ের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে বলচেন,—"আজ থিয়েটারের বৈঠকখানায় বসে কেবলই শুনি সিনেমার কণ্ট্র্যাক্টের কথা, স্যুটিংএর তারিখ নিয়ে সিনেমার প্রোডাকশান্ ম্যানেজার আর অভিনেতার কথার কারসাজি, ইন্‌কাম ট্যাক্স উকিলের পরামর্শ। শুনি আর ভাবি, আমাদের শেষ, এদের সুরু।" কথাটা সত্যি হ'লেও বোধ হয় শেষ সত্যি নয়। যন্ত্রশিল্পের দৌরাত্ম্য যে নাট্যকলাকে আজ বিপর্যস্ত করেছে—এ অভিযোগ প্রবীণ-নবীন, কাঁচা-পাকা সবার মুখেই শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই কি শেষ কথা? না এর ভেতর নিজের ওপর আস্থাহীন, পরাজিতের খানিকটা ঈর্ষাকাতর নিশ্বাসের উত্তাপও আছে? অপর দেশের কথা জানিনে, কিন্তু এদেশের নাট্যমঞ্চ একটুও যদি স্বস্থ থাকতো, তবে এদেশের সিনেমা-শিল্প এতই কি উচ্চ স্তরের যাতে, তার সংগে প্রতিযোগিতা করতে পারে? দু'একটা সুদুর্লভ ছবি ছাড়া সিনেমাতেই বা আমরা কি রস পাচ্ছি? ভাল শিল্পী? ভাল গল্প?? ভাল টেকনিক??? কোনটা পাই? আর সোভিয়েট রাশিয়াতেই যে অত নাট্যমঞ্চের ছড়াছড়ি, সেখানেই কি রঙ্গালয়ের পথ ছেড়ে দিতে সিনেমাশিল্পকে সরে দাঁড়াতে হোয়েছে? আমাদের তো মনে হয়, যুগের দাবী যদি মেটান যায়, নতুন রস বিভিন্ন পাত্রে যদি পরিবেশন করা যায় তবে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসতেই পারে না। কেননা, রসগ্রহণের ক্ষমতা মানুষের দৈহিক ক্ষিদের মত নয়!—শুধু পরিবেশন করবার ক্ষমতা থাকা চাই।

রঙ্গমঞ্চ নাট্যকার, নট ও নাট্যামোদীর মিলন স্থল। প্রথম দু'পক্ষ দেন রসের যোগান, তৃতীয় পক্ষ শুধু রসগ্রাহী। আজ রঙ্গমঞ্চ যদি শুষ্ক মরুভূমি হোয়ে গিয়ে থাকে তবে দোষ নিশ্চয়ই বেশীটা রসের যোগানদারদের। সত্যিই তাই! রঙ্গালয় আজ মরেছে। কেননা ভাল নাটকও নেই, ভাল নটও নেই। নাট্যকার দোষ দিচ্ছেন,—কি জন্যে লিখবো; নট অভিযোগ করছেন, কি অভিনয় করবো! অথচ সমস্যাটা কেউ খুলে বলছে না যে, ভাল নাটক ও ভাল নট দুটোই পরস্পর মুখাপেক্ষী। একথাটা সত্যি যে, নট অপেক্ষা নাট্যকারের অভাব বেশী। কেননা আধুনিক কালে একাধিক নিম্নস্তরের নাটক শুধু অভিনয়ের গুণে উৎরে গেছে। এ নজির থাকলেও, খারাপ অভিনয়ের জন্যে ভাল নাটক মার খেয়ে গেছে—এ অভিযোগ করা যাবে না। তবু একথা মানতে হবেই যে, শিল্পীরও অভাব বড় কম নয়।

শিল্পী আজকাল পাওয়া যাচ্চে না একথা ঠিক, কিন্তু তার চেয়েও ঠিক যে, শিল্পী আজকাল তৈরী করা যাচ্চে না। ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অভিনয় শিক্ষা' বইয়ে এক জায়গায় বলেছেন, 'লাল কালিতে এ কথা লিখে রেখে দিন যে, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, নরেশ মিত্র নির্মলেন্দুর সংগে সংগেই বাংলার নাট্যমঞ্চ লোপ পাবে।' অভিনয় যে একটা শিক্ষা সাপেক্ষ জিনিষ, এ কথা অভিমানী নবীন শিল্পীরা সর্বতোভাবে অস্বীকার করচেন। বিশিষ্ট নিজস্ব ধরণ দেখাতে সবাই তৎপর। এমন বহু অভিনয়েচ্ছুক তরুণকেই জানি, যাঁরা প্রধান ভূমিকায় chance পেলেন না,

বলে ও line ছেড়ে দিলেন। পার্শ্ব চরিত্রে নাকি ক্ষমতা দেখাবার Scopeই নেই, কি হবে যেয়ে? আবার যাঁরা অভিনয়কে জীবিকারূপে গ্রহণ করেছেন,তাঁরা শুধু নিজেদের জীবিকাটুকুই দেখেছেন, জীবনকে দেখেন নি। অভিজ্ঞ নাট্য পরিচালক 'মহেন্দ্র গুপ্ত' বলছেন, 'নাটক হবে কি? রিহার্সেলে'র পাঁচদিনের মধ্যে তিনদিন কেউ এলেন না। যদি বা এলেন, তবে সর্বক্ষণ ঐ Last Bus কটায় চলে যাবে, তারই গবেষণা করতে লাগলেন! অভিনয়ের অংশ নয় বলে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতা কোন অভিনেতাকে কোনদিন আবৃত্তি করতে শুনলুম না।" 'সোভিয়েট নাট্যমঞ্চে' বর্ণিত ক্যামার্ণী থিয়েটারের স্কুলের চতুর্বার্ষিক শিক্ষাপদ্ধতির কথা তো ছেড়েই দিতে হয়,—নিছক আনন্দ দানের উদ্দেশ্যে সাধারণ অভিনয়ের জন্য চরিত্রোপলব্ধি যে কতটা শিক্ষা-সাপেক্ষ অর্ধেন্দু মুস্তাফি, শিশির কুমারের হাতে যাঁরা তৈরী হোয়েছেন তাঁরাই তা স্বীকার করবেন।

আজকাল 'ভোলামষ্টার,' 'ধাত্রীপান্না' কি ঐরকম দুটো একটা উৎরে যাওয়া নাটক যাঁরা দেখতে যান,তাঁরাই জানেন, দর্শকগণ কিসের আশায় রঙ্গালয়ে ভিড় করেন। পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায় যাঁদের নির্বাচন করা হয়, তাঁদের না থাকে যোগ্যতা, না থাকে ভব্যতা। এলোমেলো ভংগীতে অসংযত চলাফেরায়, অশ্লীল কণ্ঠব্যাদনে,—না থাকে উদ্দেশ্য, না হয় চরিত্রের সামান্যতম রূপায়ণ। দর্শকদেরও কোন অভিযোগ নেই। রুদ্ধনিশ্বাসে ঐ অহীন্দ্র চৌধুরী অথবা ছবি বিশ্বাসের ভূমিকাটুকু দেখে যান। ব্যস। বাকী সময় বেজার হোয়ে ভুড়ি মারেন আর হাই তুলেন! অথচ রঙ্গমঞ্চ বলে সত্যিই যখন জিনিষ ছিল, তখন এই পার্শ্ব চরিত্রের প্রতিই নাকি সবচেয়ে জোর দেওয়া হোত। অর্ধেন্দু মুস্তাফী এই নির্বাচন পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজ এসবের কোন তাগিদই নেই। সবাই জেনে ফেলেছে যে, নাটক দেখতে,ঘটনাসংঘাত বুঝতে সংক্ষেপে নাট্যকারের সংগে পরিচিত হোতে দর্শক আজ আসে না,—আসে কোন বিশিষ্ট অভিনেতার দক্ষতা দেখতে। দর্শকদের জিজ্ঞাসা করুন,দেখবেন শতকরা ৩০ জনই নাট্যকারের নাম জানে না, এমন কি বলতেও পারবে না,৪র্থ দৃশ্যের ঐ টিকিওলা লোকটা কেন জমিদারের পা' ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছে। অথচ কেন এমন হয়?...আগেকার দিনে প্রাণ ছিল রঙ্গালয়ের! তখন, নাট্যমঞ্চ যে নট, নাট্যকারের ও দর্শকের এজমালী সম্পত্তি এ বোধটি জাগ্রত ছিল, আজ সে বোধ চলে গেছে। শম্ভু মিত্র শোনাচ্ছেন,—"ভাল নাটক দুষ্প্রাপ্য হোলে এ অবনতি অনিবার্য। মঞ্চ এখন যেন একা অভিনেতার সম্পত্তি হোয়ে উঠছে। আর নাটকগুলো হোচ্ছেন তাঁদের Exhibitionism এর উপলক্ষ্য মাত্র।" নাটক পাওয়া যাচ্ছেন', পরোয়া নেই। দর্শক আর মাথাও ঘামায় না। তাই নাট্যাচার্যকে আজও special attraction দিতে হয় আলমগীরের ভূমিকায়; মহেন্দ্র গুপ্তকে কোমর বেঁধে লাগতে হয় 'রাজসিংহের' নতুন নাট্যরূপ দিতে।

অথচ নাটকই বা পাওয়া যাবে না কেন? উত্তর হোল, সাহিত্যিকের আভিজাত্য বোধ! উঁচুদরের প্রতিভা মঞ্চের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য পেশ করতে সম্পূর্ণ উদাসীন। কেন? এর উত্তর নেই। প্রমথনাথ বিশীর মতে, বাংলা সাহিত্যে নাকি 'দুই পুরুষ' 'মানময়ী গার্লস্কুল' ছাড়া নাটক নেই। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয় যে, সত্যিই যদি তাই হয় (সন্দেহের অবকাশ নিশ্চই আছে) তবে প্রকৃত নাট্য-কার দুজনের কেউই নাট্যমঞ্চের সংগে সংশ্লিষ্ট নেই (অবশ্য একজন মৃত)। লক্ষ্য করে দেখেছি, কেমন যেন সবাইয়ের মধ্যে সযত্নে এড়াবার একটা ভাব। প্রবোধকুমার সান্যাল তো স্পষ্টই বলে দিলেন, "নাটক লিখিনে কেন? নাট্যমঞ্চের society, তথাকথিত অভিনেতাদের সংস্পর্শের নরককুণ্ডের কথা মনে হোলেই বমি উঠে আসে।"

'লক্ষ লক্ষ দর্শকের কল্পনাকে জ্বালিয়ে দিয়ে, শিক্ষা সংস্কৃতির একটা অসহ্য ঔজ্বল্য নিয়ে, রঙ্গালয় একদিন বাংলায় বেঁচে ছিল। সেদিন নাটক ছিল, নাট্যকার ছিল, কিন্তু সে থাকার মূলে ছিল গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, শিশির কুমারের সংগে রঙ্গালয়ের ঘনিষ্ট যোগ। প্রতিভা গেছে আজ সরে। সাংস্কৃতিক জীবনধারা থেকে রঙ্গমঞ্চ হোয়ে গেছে বিচ্ছিন্ন।—অকাল মৃত্যুর দিকে তাই সে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে।

গত কয়েক বছরে সাহিত্যে. শুধু সাহিত্যে কেন, কলায়
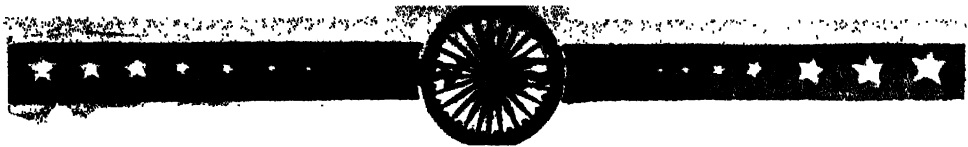
অন্য সকল ক্ষেত্রেই রূপান্তর ঘটেছে দ্রুতভাবে, এত দ্রুত ভাবে যে, এর developement অনুসরণ করা কঠিন। বহির্মুখী শিল্প হোয়ে যাচ্ছে অন্তর্মুখী। কাব্যে-- সূক্ষ্ম ভাবের প্রাধান্য, Lyricএর তন্ময়তা; গল্পে, উপন্যাসে,—গল্পাংশের ঘটনা সমাবেশের ওপর তাচ্ছিল্য, ক্ষুদ্র চরিত্র বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম মনস্তত্বের কারিকুরি; চিত্রে —অল্প সংযত রেখার ব্যঞ্জনা ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে অযথা রঙের বাহুল্যকে; অর্ধ-পরিস্ফুট অর্ধ-ব্যক্ত ভাবকে দর্শক পুরিয়ে নিচ্ছে নিজের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে' কল্পনার তুলি বুলিয়ে।

আর্টের পরিপূর্ণতার দায়িত্ব লেখক পাঠক, শিল্পী-দর্শক ভাগাভাগি করে নিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছে। স্রষ্টা আজ অর্ধেক বলেন, সমজদার হেসে তা পুরিয়ে নেন। নাটকের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা যেন নাট্যকাররা অনুভব করেন। tragedy, comedyর সংজ্ঞা পালটে গেছে, নাটকের আবশ্যকীয় গুণাগুণ (criteria) সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। কয়েকজনের কুণ্ঠিত ভীরু প্রচেষ্টা কয়েকটা সত্যিকারের এ যুগের নাটক রচনাও করেছে কিন্তু অন্য সকল ক্ষেত্রের মত এ বিষয়ে দ্রুত রূপান্তর ঘটাতে তাঁরা ভয় পেয়েছেন। কেননা এই বিশিষ্ট শিল্পটার (নাট্যশিল্প) সমজদারদের ওপর তাঁদের আস্থা নেই। 'দেখছ না'—বললেন কোন সাহিত্যিক বন্ধু, 'রবীন্দ্রকাব্যের এত appreciation, শরৎচন্দ্রের চরিত্র-দৃষ্টির এত প্রশংসা, নন্দলাল,গোপাল ঘোষের ছবির ব্যঞ্জনার এত কদর, অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রধান রূপক নাটক-গুলোর যথাযত অভিনয় আজ পর্যন্ত হোল না? ডাকঘর, অচলায়তন, অরূপরতন—সার্থক অভিনয় বা এসবের জনপ্রিয়তা শান্তিনিকেতন ছাড়া দেখলে কোথাও? নাটক তো লিখবে! কে অভিনয় করবে, আর কার কাছেই বা কোরবে।

কথাটা সত্যি! উপন্যাস, কাব্য, ছবি এসবের আবেদন যে স্তরের রুচি অথবা রসিকের কাছে, নাটকের আবেদন ঠিক সে স্তরের নয়। কিন্তু এই স্তরকে উন্নতি করবার দায়িত্বও কি স্রষ্টার নয়? অপেক্ষাকৃত লঘু পথ্য দিয়ে দর্শকের অসুস্থ দুর্বল রুচিকে সুস্থ করবার দায়িত্ব নাট্যকার কি নেবেন না আজকে?

তা হলে কি ধরণের নাটক চাই?—উত্তর দেবে আমাদের রঙ্গালয়ের অতীত ইতিহাস,—কোন্ কোন্ সময়ে কি দিয়েছে, এ প্রশ্নের আলোচনা। 'থিয়েটার আজ জাহান্নামে গেছে'—এ কথার তাৎপর্য এই যে, নিশ্চই এককালে থিয়েটার এখানে নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই অতীত মহিমা আলোচনা করতে গেলে, এই সত্যই প্রতিভাত হোয়ে উঠবে যে, সেই নাটকগুলোই যুগান্তর এনেছিল যেগুলি তৎকালীন সাংস্কৃতিক জীবনধারার রসে পুষ্ট হোয়েছিল। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনধারা এক একটা বিশিষ্ট সময়ে এক একটা বিশিষ্ট খাতে বয়। কখনও রাষ্ট্রীক শোষণ সেখানে কালো ছায়া ফেলে, কখনও সামাজিক চেতনার সেখানে ঘূর্ণি ওঠে, কখনও ধর্মের প্লাবনে সেখানে

চকুল ভেসে যায়, কখনও বা দেশপ্রেমের আবেগে তা ফেনিল হয়ে ওঠে। এই বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন রসধারায় সিঞ্চিত হোয়ে নাটক দিয়েছে দর্শকের মনে অফুরন্ত রসের যোগান। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ,' গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' 'সরোজিনী' অমৃতলালের প্রহসন (বাবু, একাকার, কালাপানি) ইত্যাদি দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' 'দুর্গাদাস' 'মেবার পতন' (কয়েকটা নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম আছে) 'সীতা' 'রমা' সবাই এক একটা বিশিষ্ট যুগে, বিশিষ্ট ভাবের প্রতিনিধি।

আজকের এই বিশিষ্ট ভাবটি কি ?—ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাঙ্গালীর বিশিষ্ট ভাবধারাটি আজ পৃথিবীর মানুষের ভাবধারার স্রোতে এসে হারিয়ে গেছে এবং সে স্রোত অত্যাচারিতের দীর্ঘ লাঞ্ছনায় বিষাক্ত ক্ষুব্ধ নিশ্বাসে উদ্দাম, শোষিতের অপমানে ও অসন্তোষে ফেনিল, আবর্তময়।...তাই 'পুণ্যোদক নির্ঝরিণী তীরে স্নিগ্ধচ্ছায়া তরুতলে বসে মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহগাথা ছেড়ে যেমন কবিকে বলতে হয়—

'ওরা চিরকাল, টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে, বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে
ওরা কাজ করে, নগরে প্রান্তরে ॥'

তেমনি নাট্যকারকে বুঝতে হবে যে, 'অরূপরতন' 'ডাকঘর' আজকের মত মাথায় থাক্। এদের শাশ্বত মর্যাদা কেউ অস্বীকার করবে না ; কিন্তু আজকে শুধু আজকেরই নাটক লিখতে হবে, সত্য, নিত্য সাহিত্যের লোভ ত্যাগ করে। আজকের দিনটি শুধু তাদের জন্যেই, যারা আগামী কালে প্রতিষ্ঠা করবে শাশ্বত শিল্প। Yeats এর ভাষায়—নাটক লেখা ; এমন নাটক যা "Should tell them either of their (Mass's) own life or of that life of poetry where everyman can see his image." শুধু তাই নয়! তার টেকনিকও হোক্ তাদের পক্ষে সুপরিপাট্য।

এই-ই হোল আজকের চাহিদার মুটামুটি খসড়া।

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

শিব ভট্টাচার্য

★

মঞ্চ ও চিত্রনাট্যের তফাৎ আজও বাংলাদেশের পরিচালক মণ্ডলী বুঝে উঠতে বোধহয় পারেন নি,তাই সুষ্ঠু পরিচালনার সন্ধান দর্শক সমাজ আজও পায়নি। প্রথম শ্রেণীর নাটক আমাদের আছে, প্রথম শ্রেণীর পরিচালকও আমাদের আছে কিন্তু তবুও কেন আজ আমাদের চিত্রশিল্প এতটা পেছিয়ে, বাস্তবিকই সেটা আজ আমাদের কাছে সমস্যা! অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ভাল নাটক আর ভাল পরিচালকই একখানা চিত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়,কারণ নাটকের ঠিক যথাযথ রূপ চিত্রে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আর নয় বলেই নাটককে চিত্রে রূপায়িত করতে গেলে প্রয়োজন হয় চিত্রনাট্যের। এমনকি নাটক বস্তুটাই এই চিত্রনাট্যের পক্ষে অপ্রয়োজনীয়, কারণ, নাটক না হলেও শুধু কোন কাহিনী বা গল্পের Plotকে চিত্রনাট্যে রূপায়িত করে সংলাপ ও দৃশ্য বণ্টনের (Dialogues and division) সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ চিত্র গড়ে তোলা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের চিত্র পরিচালক গোষ্ঠী বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই চিত্রনাট্য নামক প্রধান বস্তুটাকে একেবারেই অবহেলা ক'রে, মেতে থাকেন বহু অপ্রয়োজনীয় এবং অবান্তর ব্যাপার নিয়ে।

তার জন্যেই, আমরা যখন প্রেক্ষাগৃহের বাইরে আসি, তখনই সর্বপ্রথম আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, চিত্রটির বক্তব্য কি ছিল? বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়—কাহিনী—খাপছাড়া, সংলাপ—অত্যন্ত দুর্বল, বক্তব্য বিষয় একরকম দুর্বোধ্যই বলা চলে। কারণ, সবগুলোই নির্ভর করে কাহিনীটার সুষ্ঠু চিত্রনাট্য রচনার উপর।

চিত্রনাট্যকার আমাদের দেশে ২।১ জন ছাড়া নেই বললেই চলে; আর চিত্রনাট্যকার তৈরী হওয়ারও কোন চেষ্টাই আমাদের নেই। এই বস্তুটাকে পরিচালক গোষ্ঠী এতই হেয় মনে করেন যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের ভেতর সাহিত্যিক মনোবৃত্তির অভাব সত্ত্বেও ঐ বস্তুটা তাঁরাই করে থাকেন। এর জন্যে কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজনকে তাঁরা অস্বীকারই করে থাকেন। কিন্তু একথা ঠিক যে, নাটকের জন্য যেমন নাট্যকারের প্রয়োজন, পরিচালনার জন্য যেমন পরিচালকের প্রয়োজন, ঠিক তেমনি চিত্রনাট্যের জন্য প্রয়োজন চিত্রনাট্যকারের। তাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যখন চিত্রনাট্যকারের আসন গ্রহণ করেন, তখনই পাই পরিচালনায় গলদ। কোথাও দেখি, তথাকথিত চিত্রনাট্যকারেরা তাঁদের অনভিজ্ঞতাকে চাপা দেওয়ার জন্য এমন কতকগুলি দৃশ্য বা কাহিনীর মাঝে এমন কোনও Suspense'এর সৃষ্টি করেন, যেটা শেষ পর্যন্ত Suspenseই থেকে যায়। আর তারই জন্যে চিত্রের বক্তব্য বিষয়টিও থেকে যায় দুর্বোধ্য।

কাজেই, এই সমস্ত ত্রুটী ও দোষমুক্ত একখানি চিত্র দর্শক সমাজকে দিতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে যে, চিত্রনাট্য বা Scenario বস্তুটি কি? চিত্রনাট্যই হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে একখানি পূর্ণাংগ চিত্র যা আমরা পর্দায় দেখি। কাগজ থেকে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত মাত্র। যে কোন চিত্রোপযোগী কাহিনীকে বা উপন্যাসকে প্রথমে সংক্ষিপ্তাকারে (Synopsis form) পরিণত করা হয়, তারপর তাতে প্রয়োজনীয় সংলাপ এবং দৃশ্যের অবতারণা করা হয় (Adaptationwork). অনেক সময় মূল কাহিনী ছাড়াও অতিরিক্ত দৃশ্য এতে সংযোজিত করার প্রয়োজন হয় চিত্রের প্রবাহ (Mobility) এবং অভিনয়ের গতি এবং সমতা (Speed & tempo) রক্ষার জন্যে। তারপর প্রয়োজন হয় পরিচালকের, তাঁর সংগে পরামর্শ করে ঐ চিত্রনাট্যের কয়েকটি Sequence এ বিভক্ত করা হয়। Sequence হচ্ছে—থিয়েটারে যেমন আমরা দেখি কয়েকটি দৃশ্য নিয়ে একটি অংক বা কাহিনীতে আমরা যেমন পাই পরিচ্ছেদ, তেমনি চিত্রনাট্যেও থাকে এক বা বহু দৃশ্য নিয়ে এক একটি Sequence.

সাধারণতঃ Sepuence শেষ হয় Climax' এর উপর। যেমন ধরুন,—"একটি লোক স্ত্রীর সংগে সামান্য মনোমালিন্য হওয়ায় উত্তেজিত অবস্থায় বসে ভাবছে তার ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থা—একটি বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই ঘরে ইঁদুরের

সন্ধানে, লোকটির যত রাগ পড়ল গিয়ে সেই বেড়ালটির উপর, ভদ্রলোক একখানা বই বা নিদেন পক্ষে একটা Ash-tray ছুঁড়ে মারলেন বেড়ালটিকে, যেটা হয়তো বেড়ালের পরিবর্তে আঘাত করলো তাঁরই সম্বন্ধীকে যিনি এইমাত্র ঘরে ঢুকলেন।" একে বলে Climax বা Highspot. Sequence'এর হলো শেষ। এটি একটি সরস climax-এর উদাহরণ মাত্র। আরো নানা রকমে climax-এর সৃষ্টি হ'তে পারে। সাধারণ কথায় কোন নাটকীয় মুহূর্তকে (dramatic moment) কে climax বলা হয়। চিত্রনাট্যকারের লক্ষ্যরাখা উচিত যে, খুব বেশী Sequence যেন দর্শকমনকে পীড়া না দেয়। Sequence এর শেষ বা আরম্ভ আমরা বুঝতে পারি Fade out দেখে। পর্দার Drop হলো এই Fade out (ছবি থেকে ক্রমশঃ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যাওয়া)। পুনরায় আর একটি Sequence আমরা আরম্ভ করি ঠিক এরই বিপরীত উপায়ে অর্থাৎ Fade in করে (সম্পূর্ণ অন্ধকার থেকে ছবি ফুটে উঠে)।

তার পরই আসে Continuity—অর্থাৎ চিত্রনাট্যটিকে ভেংগে কতকগুলি Shots'এ পরিণত করা হয়। অর্থাৎ কোথায় Camera বসিয়ে কি ভাবে ছবি তোলা হবে (Camera actions and Camera angles) তারই বিস্তৃত বিবরণ। কাহিনীর গতি, চিত্রের প্রবাহ এবং অভিনয়ে সমতা যাতে রক্ষিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা Continuity লেখকের একটি প্রধান এবং প্রয়োজনীয় কর্তব্য এবং এই Continuity চিত্রনাট্যের একটি প্রধান অংশ। ওদেশে Bess Meredyth হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা উচ্চ-বেতনভোগী Continuity লেখক। এর জন্যে যদিও আলাদা লোক ওদেশে আছে, তবু এ কাজটি সাধারণত পরিচালকেরাই করে থাকেন। আমাদের এখানে Continuity writer বলে আলাদা কোন লোক নেই। পরিচালকদের অবশ্য উল্লিখিত প্রত্যেকটি বিষয়েই ভাল জ্ঞান থাকা উচিত, তা নাহ'লে যত ভাল চিত্রনাট্য বা Continuity লেখা হউক না কেন, সবই নষ্ট হয়ে যাবে। যা আজকাল আমাদের বাংলা চিত্র জগতে হচ্ছে।

যাই হোক, এখন যে চিত্রনাট্যটি তৈরী হলো, তাকেই আমরা Scenario বা Script বলে থাকি। এরই ওপরে ছবির সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে। পরিচালকদের প্রধান কাজ হলো একটি উত্তম Scenario তৈরী করানো বা করা। কাহিনী অনুযায়ী এক বা বহু নাট্যকার প্রয়োজন হয়। Paramount Stuudio'র "Horse Feathers" নামক ছবিটির জন্যে ১৪জন চিত্রনাট্যকার প্রয়োজন হয়েছিল। ওদেশ চিত্রনাট্যকার হিসাবে S. J. Perelman, Howard Estabrook, Richard Schayer, George Marion Junior, Sam Mintz এবং James Hilton (Random Harvest, Lost Horizon এবং Passionate Year নির্মাতা) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এখন, সব কিছু মিলিয়ে যে সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য তৈরী হলো, তাকে আমরা Scenerio বা Script বলি। এই Script এর উপরই ছবির সাফল্য নির্ভর করে। এই অতি প্রয়োজনীয় চিত্রনাট্যের দিকেই যদি পরিচালক মণ্ডলী কোনরূপ লক্ষ্য না রাখেন, তাহলে ভালো মানের (Standard) ছবি আশা করা আমাদের মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ্যাডেল্‌ফি-নাটকীয় ঐতিহ্য স্রষ্টা

লেখক:—ডব্‌লিউ ম্যাকুইন পোপ্‌

—

বিভিন্ন প্রকৃতির লোক বিভিন্ন কারণে রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু 'এ্যাডেলফি'র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। রঙ্গমঞ্চে স্বীয় কন্যার প্রতিষ্ঠা অর্জনের সাহায্যের জন্য জনৈক পিতা এই রঙ্গমঞ্চটীর প্রতিষ্ঠা করেন।

জন স্কট নিজে অভিনেতা ছিলেন না। অথবা এই ব্যবসার সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁহার কন্যার রক্তেও এই জাতীয় কোন প্রতিভা মিশ্রিত ছিল না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই, তাঁহার কন্যা অভিনয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। স্কটের ছিল তৈল ও রংএর ব্যবসা। লণ্ডনের ষ্ট্রাণ্ডে তিনি ব্যবসা করিতেন এবং কাপড় ধোয়া একরকম নীল আবিষ্কার করিয়া তাহার সাহায্যে তিনি প্রভূত অর্থ-উপার্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহারা পিতা পুত্রী দুইজনেই অভিনয় দর্শনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অভিনেতাদের সংগ পছন্দ করিতেন। কন্যার প্রতিভা সম্বন্ধে পিতার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তাই স্কট তাঁহার দোকানের কাছাকাছি একটি জীর্ণ সম্পত্তি খরিদ করিয়া সেখানে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করেন। ইহার আখ্যা দেওয়া হইল 'স্যান্স পেরেইল'। ১৮০৬ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে, ১০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে এই রঙ্গমঞ্চের তিনি উদ্বোধন করেন।

অনেক সময়ে স্কটের কন্যাই অভিনেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণের বস্তু থাকিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর 'রুথ ড্রে পার' এর সমকক্ষ হইবার ইচ্ছা তাঁহার বলবতী ছিল। তিনি নিজেই সংগীত লিখিতেন, কথা সাজাইতেন এবং সর্বশেষ অনুষ্ঠান আতসবাজির পরিকল্পনা করিতেন।

স্কট ছিলেন 'বিজিনেস ম্যানেজার' এবং দর্শনী সংগ্রাহক। রঙ্গমঞ্চে সর্বদাই দর্শকের ভিড় থাকিত। কাজেই তাঁহাদের লাভও ছিল প্রচুর। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্কট অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের নিকট লভ্যাংশ পাইবার অধিকারে ২৫০০০ পাউণ্ড মূল্যে ইহা বিক্রয় করেন।

নূতন তত্ত্বাবধায়কের হস্তে এই সম্পত্তির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং এই রঙ্গমঞ্চের নূতন নামাকরণ হয় 'এ্যাডেলফি'। পিয়ার্স ইগানস সম্পাদিত 'টম এণ্ড জেরি অর লাইফ ইন লণ্ডন' নাক গ্রন্থ নাটকে রূপান্তরিত হইয়া এখানে অভিনীত হইলে তাঁহাদের প্রচুর লাভ হয়। এই নাটকের প্রযোজনা এমন সুন্দর হইয়াছিল এবং নাটকীয় চরিত্রগুলি এমনই বাস্তব হইয়াছিল যে, ইহা দেখিবার জন্য সহরের সমস্ত লোক এখানে জড় হইত। ধর্মীয় ও অধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাইয়াও লোকদিগকে নিবৃত্ত করিতে পারিত না। লর্ড চেম্বারলেনের নিকট ইহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য আবেদন প্রেরিত হইল। তিনি স্বয়ং অভিনয় দেখিতে গেলেন। অভিনয় দেখিয়া তিনি এতই মুগ্ধ হইলেন যে, পরের রাত্রিতে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে অভিনয় প্রদর্শন করিতে লইয়া গেলেন। আরও দশটী রঙ্গমঞ্চে এই একই অভিনয় চলিতে লাগিল।

ক্রমশঃই খ্যাতনামা অভিনেতৃগণ 'এ্যাডেলফি'তে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। টি,পি, কুক্ (যিনি একদা নাবিক ছিলেন এবং সেণ্ট ভিন্সেণ্ট যুদ্ধের সৈনিক ছিলেন) টায়রন পাওয়ার, ম্যাদাম সিলেসটী প্রভৃতি লব্ধ প্রতিষ্ঠ নট ও নটী-দের সম্মেলনে রঙ্গমঞ্চের খ্যাতি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এডওয়ার্ড রাইট নামক ব্যঙ্গ অভিনেতা দর্শকদের এতই প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইবার সংগে সংগেই দর্শকদের উচ্চহাস্যে অভিনয় কক্ষ নিনাদিত হইয়া উঠিত।

বেঞ্জামিন ওয়েবষ্টার 'হে মার্কেট' ত্যাগ করিয়া এ্যাডেলফি পরিচালনা করিতে অগ্রসর হইলেন এবং থিয়েটারে গীত নাট্যের প্রচলন করিলেন। তাঁহার গীতনাট্যগুলির প্রায় সবগুলিই ছিল জে, বি, বাকষ্টোরের রচিত। এই বইগুলি সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই

আরম্ভ হইল থিয়েটার জগতের যুগান্তকারী 'ডিওন বুসিকল্ট' এর 'দি অক্টোরুন' এবং 'দি কুলেন বন' নামক গীতিনাট্য। ওয়েবষ্টারের পরেই আবির্ভূত হইলেন এফ, বি, চ্যাটারণ। আমেরিকা হইতে 'জোসেফ জেফারসন্' আসিলেন এবং 'রিপভ্যানউইংকল' অভিনয় করিলেন। 'রয়াল কার্ল রোসা' অপেরা কোম্পানী লণ্ডনে এই প্রথমবার 'দি মেরি ওয়াইভস অব উইণ্ডসর' নামক নি কোলেইর অপেরা প্রদর্শন করেন।

জে এ্যাণ্ড আর গ্যাট্টির সুযোগ্য পরিচালনায় রঙ্গমঞ্চে আবার গীতিনাট্য বহুপ্রচলন আরম্ভ হইল এবং "এ্যাডেলফি নাটক" নাট্য জগতে এক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিল। এ্যাডেলফির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শুভানুধ্যায়ী এবং ইহার সর্বোত্তম "হিরো" উইলিয়ম টেরিস (সাধারণত ব্রিজি বিল বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত) বুলইন কোর্ট নামক স্থানে কোনও উন্মাদের ছুরিকাঘাতে নিহত হইলে সমগ্র বৃটেন তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

১৯০১ সালে রঙ্গমঞ্চটী নূতন করিয়া নির্মাণ করা হয় (বহু বার ইহাকে বড় করা হইয়াছে এবং বদলানো হইয়াছে)। এবং ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া নিউ সেঞ্চুরি থিয়েটার রাখা হয়। কিন্তু জনসাধারণের প্রবল আপত্তিতে আবার সেই পুরাতন এ্যাডেল্‌ফি নামই রাখা হয়।

১৯১০ সালে স্বনামধন্য এডওয়ার্ডস ইহাকে গীতি প্রধান মিলনেচ্ছুক নাটকের আবাস ভূমিতে পরিণত করেন। প্রথমেই তিনি সর্বজন প্রিয় 'কোয়েকার গার্ল' অভিনয় করান। ইহাতে 'গার্টিমিলার' এবং 'জোসেফ কয়েন' অভিনয় করেন। তাহার পর হইতেই গীতি প্রধান অভিনয় ইহার প্রধান আকর্ষণের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় স্যার আলফ্রেড বাটের পরিচালনাধীনে এবং বিখ্যাত হাস্যরসিক ডবলিউ, এইচ, বেরির সহযোগিতায় 'দি বয়' 'হুজ হুপার' প্রভৃতি বহু নাটক অশেষ সাফল্যের সহিত এখানে অভিনীত হয়।

সম্পাদকের দপ্তর

এ, বি, এম, মৈনুদ্দিন মিঞা (জেইল রোড, যশোহর)

শ্রীমতী যমুনা দেবী কী চিত্র জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন ? রেণুকা, সন্ধ্যা, পূর্ণিমা ও বনানী এঁদের অভিনয়ের মানানুসারে সাজিয়ে দিন !

●● না। সন্ধ্যা, রেণুকা, পূর্ণিমা ও বনানী।

মালতী মিত্র ও আরতি মিত্র (নীল কমল কুণ্ডু লেন, হাওড়া)

রূপ-মঞ্চের অষ্টম বর্ষে পদার্পণে আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি জানাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কি, রূপ-মঞ্চ ক্রমশঃই যেন আমাদের কাছে ভয়ংকর লোভনীয় হয়ে উঠছে। এই প্রসংগে আপনাকে, শ্রীপার্থিব, মণিদীপা ও অন্যান্য কর্মীদের আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 'রাই'র সমাপ্তির জন্য অপেক্ষা করছিলাম, সত্যি 'রাই' আমাদের মুগ্ধ করেছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'রাই' রচনা করলেন, আমাদের মতে তা সফল হয়েছে। ভবিষ্যতে আপনার এরূপ আর একখানা উপন্যাস রূপ-মঞ্চ মারফৎ প্রকাশ করলে খুশী হ'বো। তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

●● আপনাদের অভিনন্দন আমরা সকলেই মাথা পেতে নিয়েছি। প্রতি বছরই যাতে রূপ-মঞ্চকে উন্নততর করে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারি, সেজন্য সচেষ্ট থাকবো। 'রাই'র জন্য আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শারদীয়া সংখ্যার পর থেকে 'আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি' নাম দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রাম্য পটভূমিকায় আর একখানা উপন্যাস লিখবার ইচ্ছা আছে।

গৌর মাল্লিক (ইছাপুর, ২৪ পরগণা)

আজকাল কোন ছবির 'প্রোগ্রাম' অথবা 'টাইটেল' এ কেবলমাত্র শিল্পীদের নামই পাওয়া যায়। কে কোন ভূমিকায় অভিনয় করলেন, তা দেওয়া হয় না। এতে আমাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়।

●● দর্শক সাধারণের যে অসুবিধার কথা আপনি উল্লেখ করছেন,তা আমরাও স্বীকার করি। দর্শক হিসাবেই শুধু নয়, সাংবাদিক হিসাবে আমাদেরও এজন্য অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। পুরোন শিল্পীদের সময় হয়ত এই অসুবিধাটা ততটা অনুভূত হয় না,যতটা হয় নবাগত ও নবাগতাদের বেলায়। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষদের অবহিত করে তুলবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

অশোক রায় (গরিফা)

'এ্যামেচার' কথাটি অনেক শিল্পীদের নামের পাশে দেখতে পাই। যাঁদের নামের পাশে এই 'এ্যামেচার' কথাটি থাকে, তাঁরা কী টাকা নিয়ে অভিনয় করেন না ?

●● 'এ্যামেচার কথাটির অর্থ অবশ্য তাই বোঝাই—কিন্তু চিত্রজগতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই 'এ্যামেচার'ধারীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পেশাদারদের চেয়েও বেশী আদায় করে থাকেন। শুধু সরকারী বা অন্য কোন বিধিকে ফাঁকি দেবার জন্যই নামের পেছনে এই 'এ্যাঃ' কথাটি যোগ করে দেওয়া হয়।

প্রাণ রঞ্জন ভট্টাচার্য (ডিকসন লেন, কলিকাতা)

(১) রূপ-মঞ্চের অষ্টম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় পাহাড়ী সান্যালের জীবনী প্রকাশ করে তাঁর সম্বন্ধে পাঠক সাধারণের কৌতুহল মিটিয়েছেন। শ্রীপার্থিব লিখেছেন, পাহাড়ী লক্ষ্ণৌর হ্যারিস মিউজিক কলেজে সংগীত শিক্ষার জন্য ভরতি হন—কলেজটির নাম ভুলবশতঃ মরিসের স্থলে হ্যারিস হয়নি ত ? (২) সম্প্রতি সরোজ পিকচার্সের 'ভাই বোন' দেখলাম। ছবিটি অত্যন্ত বাজে হয়েছে। অধিকাংশ দর্শকই বইটির উপর বিরক্ত হয়ে প্রদর্শনী শেষ হবার পূর্বেই

প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ করেছেন। ফিল্ম সেন্সার থাকা সত্ত্বেও এরকম বাজে বই কেন দেখাবার জন্য ছাড়পত্র দেওয়া হয়, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারলাম না। বইটি তুলতে দেখলাম ১০'৯৪২ ফিট ফিল্ম খরচ হয়েছে—এরকম সস্তা দরের গান ও বড় বড় বুলি আউড়ে কী পরিচালক কিস্তিমাৎ করতে চান না কি? আশা করি এসম্বন্ধে আপনার মতামত জানাবেন।

●● (১) মুদ্রণের ভুলবশতঃ 'মরিস' স্থলে হ্যারিস হ'য়েছে: কলেজটির নাম মরিস মিউজিক কলেজ। (২) 'ভাইবোন' সম্পর্কে আমাদের মতামত গত 'আষাঢ়' সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে। চিত্রখানিতে পরিচালক বা কাহিনীকারের যা পরিচয় ফুটে উঠেছে—তাত চিত্রখানি দেখেই বুঝতে পেরেছেন। তাছাড়া সেন্সার বোর্ডের নীতিবিদদের নীতিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠার পরিচয়ও পেয়েছেন আশা করি। আপনারা দর্শক সমাজ যদি এমনিভাবে সচেতন হ'য়ে ওঠেন—বাংলা ছবির মান উন্নততর হ'তে বাধ্য। আর যেসব তথাকথিত নীতিবিদরা আমাদের উপর মুরুব্বীয়ানা করতে চান—তাদের মুখোস খুলে দিয়ে সত্যকার রূপটি জনসাধারণের কাছে আমরা তুলে ধরতে সক্ষম হবো এবং পরীক্ষা করে দেখতে পাবো—ভাওতা দিয়ে কতদিন তারা আমাদের উপরে মুরুব্বীয়ানা করতে পারেন!

এস, এম, হায়দার (মির্জাবাজার, মেদিনীপুর)

(১) অভিনয়ের দিক থেকে সিপ্রা ও বনানীর ভিতর কে শ্রেষ্ঠা? (২) রেণুকা রায় কি মঞ্চজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন।

●● (১) এপর্যন্ত বনানী চৌধুরী ও সিপ্রা দেবীর যে কয়খানি অভিনীত চিত্র দেখেছি—তা থেকে দু'জনের অভিনয়ের মানের তুলনা করতে গেলে—শ্রীমতী সিপ্রার সপক্ষে রায় না দিয়ে পারবো না। (২) শ্রীমতী রেণুকা কোনদিনই মঞ্চ শিল্পী ছিলেন না। দু'একবার তিনি মঞ্চে অভিনয় করেছেন। আপনি সম্ভবতঃ পর্দার অর্থাৎ চিত্রজগতের কথাই মনে করেছেন। যদি তাই করে থাকেন, তবে তার উত্তর দিতে যেয়ে বলতে হয়, শ্রীমতী রেণুকাকে কিছুদিন পূর্বে কোন চিত্রে না দেখতে পেলেও তিনি চিত্রজগত থেকে বিদায় নেননি। বর্তমানে তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করছেন। এর কয়েকখানির কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। আগামী যেকয়টী চিত্রে শ্রীমতী রেণুকাকে দেখতে পাবেন, তার ভিতর নাম করা যেতে পারে ওরে যাত্রী, সমাপিকা, রং বেরং, বিস্মৃতি, তরুণের স্বপ্নও সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীর প্রথম ছবি।

নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা)।

●● শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের বর্তমান প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে পারিনি। কিছুদিন পূর্বে অভিনেতা কমল মিত্রের বাড়ীতে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হ'য়েছিল। আজকাল বেশীর ভাগ সময় তিনি বম্বেতে কাটান। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। তাঁর বম্বের বা কলকাতার ঠিকানা সঠিক আমাদের জানা নেই।

নীলরতন মাইতি (কাঁথি, মেদিনীপুর)

(১) শুভা প্রডাকসনের 'যুগের দাবী' কোনদিন পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবে কি? (২) এরা ফিল্মসের সরোজ রায় চৌধুরীর 'মহাকাল'-এর চিত্রগ্রহণ কার্য শেষ হবে কবে?

●● (১) এ বিষয়ে আমরা কিছু বলতে পারি না। তবে এত টাকা খরচ করে কর্তৃপক্ষ কেন যে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে আছেন বুঝতে পাচ্ছিনা। (২) সরোজ রায়চৌধুরীর 'মহাকালের' চিত্রগ্রহণের কাজও আপাততঃ বন্ধ আছে। আর্থিক সমস্যা 'মহাকালের' গতিপথকেও রুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে। কারণ, শুনতে পাচ্ছি 'মহাকালের' প্রাক্তন কর্তৃপক্ষ কয়েকজন ধনীর কাছে যাতায়াত কচ্ছেন।

সুশীল কুমার নস্কর (মাকড়দহ, হাওড়া)

(১) বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'দৃষ্টিদানের' সমালোচনায় দেখলাম হেমাঙ্গিনীর ভূমিকায় অমিতা দেবী অভিনয় করেছেন। ইতিপূর্বে অমিতা বসুর সংগে কয়েকটি চিত্রে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে। কিন্তু অমিতা দেবী কী নবাগতা? (২) বর্তমানে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত
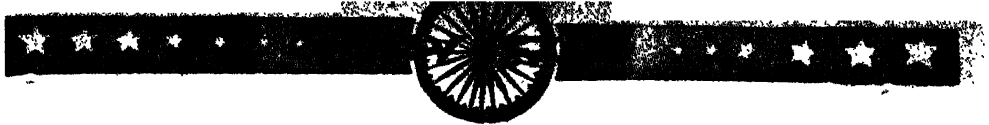
বিচারক ছাড়া আর কোন চিত্র পরিচালনা করছেন কি? দয়া করে তাঁর ঠিকানাটা জানাবেন?

●● (১) দৃষ্টিদানের অমিতা দেবীই অমিতা বসু। ইতি-পূর্বে বহু চিত্রে তাঁর সংগে আপনাদের পরিচয় হ'য়েছে। নৃত্যশিল্পীরূপেই একে বেশীর ভাগ চিত্রে দেখতে পেয়ে থাকেন। ইনি নবাগতা নন। অমিতা দেবী নামে আর একজন চিত্রজগতে পা বাড়িয়েছিলেন—তাঁর সংগে আপনাদের পরিচয় হ'য়েছিল "দ্বন্দ্ব" চিত্রে। (২) ৮ই জুলাই দেবনারায়ণ গুপ্ত 'দাসীপুত্র' চিত্রের মহরৎ করেছেন। চিত্রখানি সম্পর্কে গত সংখ্যার সংবাদ পরিবেশনের মাঝেই সমস্ত সংবাদ দেখতে পেয়েছেন। দেবনারায়ণ বাবুর পরবর্তী চিত্র গড়ে উঠবে 'রাই'কে কেন্দ্র করে তাঁর ঠিকানা দেবনারায়ণ গুপ্ত, ২৯, ফকির চক্রবর্তী লেন, কলিকাতা।

কানাই লাল দত্ত (গোহাটি, আসাম,)

(১) কানন বালা কী পর্দায় নিজে গেয়ে থাকেন?

(২) কানন দেবী সম্প্রতি যে ষ্টুডিও করেছেন, তাতে যে চিত্রটি সুরু হবে তার নাম কি এবং কানন দেবীর প্রযোজনায় যে চিত্রটি গড়ে উঠবে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী অজয় করের পরিচালনায় সেই চিত্রটির নাম কি?

●● (১). কানন দেবীর নিজের কণ্ঠই তাঁর অভিনীত চিত্রে শুনে থাকেন। (২) কানন দেবী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় যে ষ্টুডিওটি গড়ে উঠছে, সে.স্টুডিওতে কোন চিত্রটি প্রথম সুরু হয়েছে,সে সম্পর্কে আমরা কোন সংবাদ পাইনি—পেলে জানাবো। তবে এই ষ্টুডিওটির নাম হ'য়েছে 'ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও' এবং ইতিমধ্যে কয়েকটি চিত্রের কাজ এখানে সুরু হ'য়েছে। কানন দেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'অনন্যা'র (শেষ পর্যন্ত চিত্রটির নাম 'অনন্যা'ই স্থিরীকৃত হ'লো) চিত্র গ্রহণ কার্য সুরু হয়েছে কালীফিল্ম ষ্টুডিওতে। প্রথমে শ্রীযুক্ত অজয় করেরই চিত্রখানি পরিচালনা করবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'অনন্যা'র পরিচালনা ভার দেওয়া হয়েছে যাঁর হাতে, তিনি 'সব্যসাচী' এই ছদ্ম নাম নিয়ে চিত্রখানি পরিচালনা করবেন। শ্রীযুক্ত করের ওপর দেওয়া হয়েছে চিত্র গ্রহণের ভার।
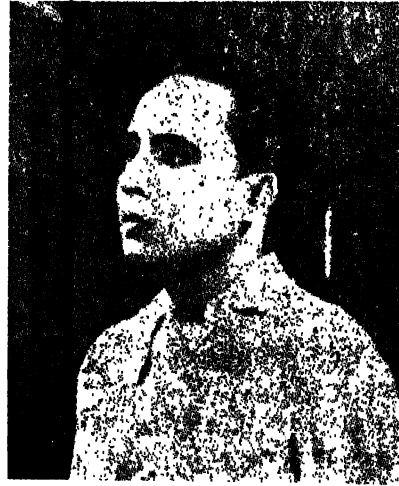
'কুহেলিকা' চিত্রে গৌর রায় চৌধুরী

বিমল চন্দ্র দাস (মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রথম চিত্রের মহরৎ আমার পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত হ'লেও তাঁদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে আমার কোন হাত নেই—আর আমি তাঁদের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে নিতে যাবোই বা কেন? তাঁদের সাক্ষীগোপালের ভূমিকালিপি বহু পূর্বেই বন্টিত হ'য়ে গেছে। তাছাড়া আপনি এখনও ছাত্র—পাঠ্যাবস্থায় এদিকে পা না বাড়ালেই ভাল করবেন। তাই, আপনার বিষয়ে কিছু করতে পরবো না বলে দুঃখিত।

বিশ্বনাথ বসু (উত্তরপাড়া লেন, কসবা ঢাকুরিয়া)

(১) শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা কি অবসর গ্রহণ করেছেন?

(২) কুমারী গীতশ্রী সর্বপ্রথম কোন চিত্রে অভিনয় করেন?

●● (১) না। বেচু সিংহ পরিচালিত 'বীরেশ লাহিড়ী' চিত্রে তাঁকে দেখতে পাবেন (২) সম্ভবতঃ মুক্তির বন্ধন চিত্রে।

ধূমকেতু (বেণীমিত্র লেন, শিবপুর হাওড়া)

●● আপনার প্রথম প্রশ্নে শ্রীমতী আরতি মজুমদার সম্পর্কে যে রুচি বিগর্হিত উক্তি করেছেন, রূপ-মঞ্চের পাতায়

তা প্রকাশ করে যেমনি আপনার স্বরূপ প্রকাশ করতে চাই না, তেমনি রূপমঞ্চের পাতাকে কলংকিত করতেও চাই না। রূপমঞ্চের পাঠক সমাজ সম্পর্কে আমরা খুবই গর্বিত—কিন্তু আপনার মত পাঠকও যে রূপমঞ্চের আছে, এজন্য কম অনুতপ্ত নই। জানি না আপনার ধূমকেতু নামটি পিতৃদত্ত না নিজ আবিষ্কৃত—যাই হউক না কেন—নাম মাহাত্ম্য বলতে হবে। চিত্র ও নাট্যজগতের শিল্পী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যত তীব্র সমালোচনাই করিনা কেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অসম্মানকর উক্তি রূপ-মঞ্চও যেমন বরদাস্ত করবে না, তাঁর পাঠক সমাজও নয়। মনের নীচতা দূর করে যেদিন সুরুচির পরিচয় দিতে পারবেন, সেদিন প্রশ্ন করলে উত্তর পাবেন।

বিজয় কুমার বর্মণ (নূতন পাড়া, জলপাইগুড়ি)

গত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অন্য দু'জনের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আপনি Duplicator Device এর সাহায্যে ছবি তুলবার কথা বলেছেন। আমার মনে হয়, এর থেকে সহজ পথ আছে। Duplicator Device এর সাহায্যে ছবি তুলতে গেলে প্রথম লেন্সের অর্ধেক ঢেকে ছবি তুলতে হবে। পরে আবার খোলা অংশটুকু ঢেকে বাকী অর্ধেক দিয়ে ছবি তুলতে হবে। এতে একটু অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ প্রথমে ছবি তুলবার পর খোলা অংশটুকু ঢেকে নিয়ে ছবি তুলতে হবে। এই খোলা অর্ধেক দ্বিতীয়বার ঢাকবার সময় যদি ঠিকমত ঢাকা না পড়ে, তবে ছবি ঠিক উঠবে না। যদি একটু কম ঢাকা পড়ে মাঝখানে একটা কালো লম্বা দাগ থেকে যাবে। আবার যদি একটু বেশী ঢাকা পড়ে, তবে মাঝখানে একটু বাদ পড়ে যাবে। তাই সাধারণ চিত্র গ্রহণ করবার কাজে Duplicator Device দিয়ে ছবি তোলা বোধ হয় সহজ হবে না। সহজ পথটির উল্লেখ কচ্ছি। প্রথম একখানা কালো পর্দা ঝুলিয়ে নিতে হবে। এর পর ক্যামেরাটিকে এমন ভাবে বসাতে হবে, যাতে করে কালো পর্দা ছাড়া আর কিছু লেন্সের মধ্যে না পড়ে। অর্থাৎ না ওঠে। এবার পর্দার সামনে একটা টেবিল রেখে ও টেবিলে একধারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে ছবি তুলুন। এর পর টেবিল ও ক্যামেরা না সরিয়ে টেবিলের অন্যদিকে এসে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আর একবার ছবি নিন। আর কিছু করবার নেই। Film Developed হ'লে দেখতে পাবেন, টেবিলের দুধারে দাঁড়িয়ে অথবা বসে আছেন। এই ভাবে কালো পর্দা ঝুলিয়ে ৩।৪ বার পর্যন্ত নিজের ছবি একই plate-এ তোলা সম্ভব। ছবি তুলবার সময় একটা জিনিষ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ক্যামেরা ও টেবিল একটুও যেন না নড়ে। একটু এদিক ওদিক হ'লে কিন্তু ছবি খারাপ হয়ে যাবে।

●● আপনার পন্থাটি আমি কোন দিন অনুসরণ করে দেখিনি—আগ্রহশীলদের জন্যে আপনার পন্থাটিকেও পরীক্ষা করে দেখতে বলি। তবে কথা কী জানেন, সবটা নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। Duplicator Device এর সাহায্যে চিত্র গ্রহণ যাঁদের ধাতস্ত হয়ে গেছে, তাঁদের পক্ষে আবার পন্থাটি অসুবিধার সৃষ্টি করবে। যাই হউক না কেন, যিনি যেটায় সুবিধা পান, তিনি সেটাই অনুসরণ করতে পারেন।

আব্দুল গণি খাঁ (সাতক্ষীরা কোর্টএলাকা, খুলনা)

●● মফস্বঃল থেকে পড়াশুনা বজায় রেখে আপনার আকাঙ্খাকে কোনমতেই পূর্ণ করতে পারবেন না। আর একটা অনিশ্চিত আশায় ওখান থেকে কলকাতায় চলে আসবেন—সে বিষয়েও আমি পরামর্শ দিতে পারিনা। বরং ওখানেই স্থানীয় কোন শিক্ষকের কাছে সংগীত চর্চা করুন—উচ্চশিক্ষার জন্য যখন কলকাতায় আসবেন, তখন এ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

বিশ্বনাথ দাস (মালদহ)

●● কানন দেবী সম্পর্কে যা শুনেছেন, তা সত্য। তবে এ বিষয়ে বিস্তারীত কিছু আমরা আলোচনা করতে চাইনা। কারণ বিষয়টি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

বেবী বসু (চুচুঁড়া)

●● অভিনন্দনের জন্য ধন্যবাদ। মলিনা দেবীর জীবনী বহুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল, সন্ধ্যারাণীর জীবনী পূজোর পরে দেখতে পাবেন। কারণ, ৬ মাসের ভিতর তাঁর সংগে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নেই।
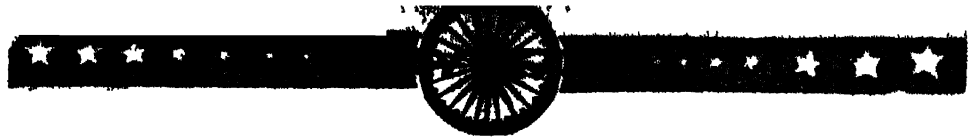
পূর্ণিকা সেন, শান্তি সিংহ, নীলিমা গুপ্ত, ডলি ও ইরা হাজরা

●● তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উপন্যাসটির দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপ দেবার কথা ছিল—তা আপাততঃ বন্ধ আছে। দেবনারায়ণ বাবুর ঠিকানা এই সংখ্যায় অন্যত্র দেখুন। গত ৮ই জুলাই 'দাদাপ' নামে ভারতী চিত্রপটের প্রথম চিত্রের মহরৎ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে চিত্রখানি দেবনারায়ণ গুপ্তর পরিচালনায় গৃহীত হবে। দেবনারায়ণ বাবুর পরবর্তী চিত্র 'বাই'।

ধীরেন হালদার (লিনটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

প্রডিউসারের কাজ শেখবার জন্য কোন ষ্টুডিওতে ব্যবস্থা আছে কী?

●● চিত্রজগতের প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেই প্রযোজনা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে তার আর প্রয়োজন হয়না। টাকা থাকলেই যে কোন লোক প্রযোজক হ'তে পারেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের কোন সুযোগও নেই—শিক্ষার ব্যবস্থাত দূরের কথা।

অনিল কুমার (নয়া বস্তি, জলপাইগুড়ি)

●● ব্যক্তিগত ভাবে কারোর জন্যই আমি উমেদারী করতে পারিনা। সাধারণ ভাবে সমস্ত নতুনদের জন্যই আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত থাকে। তাই আপনার অনুরোধ রাখতে পারলুমনা বলে দুঃখিত।

অঞ্জলি গুপ্তা (কলিকাতা)

●● 'রামের সুমতির' সুরধ্বনী আর দৃষ্টিদানের ছোট কুমু একই মেয়ে নয়। রামের সুমতিতে অভিনয় করেছে কুমারী শুভ্রা আর দৃষ্টিদানে কেতকী। কুমারী কেতকী শ্রীমতী প্রভার মেয়ে।

অনিমা দত্ত (শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

★★ শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল তাঁর কোন প্রতিকৃতি প্রকাশ করতে রাজী নন। তাই তাঁর জীবনীর সংগেও কোন ছবি দেওয়া যায়নি। ভবিষ্যতে চেষ্টা করবো।

'কুহেলিকা' চিত্রে মুকুল জ্যোতি

সন্তু সেন, চারু রায় প্রভৃতির জীবনী ও প্রতিকৃতি প্রকাশে সচেষ্ট থাকবো।

বিমলকান্তি পাল ও পশুপতি দত্ত (সেওড়াফুলি হুগলী)

●● রূপমঞ্চ যে আজকাল নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আশা করি তা স্বীকার করবেন।

সন্তোষ কুমার ঘোষ ও বীণা চৌধুরী (সবজী বাগান লেন, কলিকাতা)

●● কানন দেবী সম্পর্কে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়ই সব কিছু জানতে পেরেছেন আশা করি, কমল মিত্রের ঠিকানা একাধিকবার প্রকাশ করা হয়েছে। যখনই কোন সংখ্যায় কোন শিল্পীর ঠিকানা প্রকাশ করা হয়, পৃথক একটি খাতায় যদি তা টুকে রাখেন, তবে আর এই অসুবিধায় পড়তে হয় না। কমল মিত্রের ঠিকানা ২১৩, বি, ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দুর্গাচরণ ঘোষ (বীরচাঁদ গোঁসাই লেন, কলিকাতা)

আচ্ছা মেয়েরা দেখতে বেশী সুন্দর না ছেলেরা?

●● মেয়েদের চোখে ছেলেরা এবং ছেলেদের চোখে

মেয়েরাই বেশী সুন্দর বলে মনে হয়। তবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে সাধারণ ভাবে ছেলেরাই সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন।

জয়শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলিকাতা)

আমাদের বাড়ীতে একটী 'হোম মুভি' কেনা হ'য়েছে। কীভাবে একটী ছোট গল্পকে চিত্র রূপায়িত করতে পারি, এ বিষয়ে আপনি কিছুটা সাহায্য করবেন কী ?

●● আপনারা কোন ধরণের ছবি তুলতে চান, জানালে এ বিষয়ে সাহায্য করা সহজ হবে। তাছাড়া এভাবে সম্পাদকীয় দপ্তর মারফৎ কতটুকুই বা সাহায্য করা যেতে পারে! আপনি পড়াশুনা কতটুকু করেছেন জানিনা। যদি উচ্চ শিক্ষা লাভ করে থাকেন, তাহ'লে এবিষয়ে ইংরেজীতে ভাল ভাল বই আছে, সেগুলি পড়লে অনেকটা সুবিধা হবে। নিজে যদি উচ্চশিক্ষা লাভ না করে থাকেন, তাহ'লে বাড়ীর অন্য কারোর দ্বারা পড়িয়ে নিতে পারেন। এবিষয়ে হারবার্ট সি, ম্যাকে, এফ, আর, পি, এস প্রণীত 'মুভি-মেকিং ফর দি বিগিনার্স' বইখানি (Movie Making for the Beginners by Herbert C. Mckey, F. R. P. S) আমি সর্বপ্রথম অনুমোদন করবো। যদি বইখানি সংগ্রহ করতে না পারেন, তাহ'লে কয়েকটি বিষয় মোটামুটিভাবে আমি উল্লেখ কচ্ছি। এ-গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

(১) যে বিষয় নিয়ে ছবিটি তৈরী করতে চান, সে বিষয়টি আগে মনে মনে ঠিক করে নিন। (২) ঐ বিষয়টির বা আখ্যানভাগটির সংক্ষিপ্ত খসড়া তৈরী করে ফেলুন। (৩) আখ্যানভাগটির যে যে স্থানে বিশেষ ঘাত-প্রতিঘাত চোখে পড়বে—সেই ঘটনা-সংঘাতগুলিকে পৃথক পৃথক অনুচ্ছেদে উল্লেখ করে—কাহিনীটী এমনিভাবে আর একবার সম্পূর্ণ ভাবে লিখে যান। (৪) চিত্রগ্রহণের উপযোগী করে আবার বিভিন্ন দৃশ্যে ভাগ করে কাহিনীটি লিখুন। (৫) এবার কার্যকরী চিত্রনাট্যটী রচনা করুন। (৬) কোন কোন দৃশ্য কী কী পরিবেশের মাঝে গড়ে উঠেছে এবার সেগুলি লিখে ফেলুন। (৭) এবার লোকেশন বা স্থান নির্বাচন করুন। অর্থাৎ ঘটনাগুলি ঘটেছে কোথায়? (৮) যে কয়টী চরিত্র আপনার কাহিনীতে রয়েছে—কাকে কোনটি দেবেন না দেবেন—সে ভূমিকা-লিপি তৈরী ক'রে ফেলুন। (৯) ভূমিকা নির্বাচনের পর সাধারণভাবে মহলা দিন। (১০) আবার একটু মহলা দিয়ে নিন। (১১) কোন দৃশ্যটী কতটুকু সময়ের ভিতর শেষ করতে হবে সেবিষয়ে একবার মহলা দিয়ে নিন। (১২) চিত্রনাট্যটী এবার আর একবার দেখে নিন। (১৩) কি কি জিনিষ পত্র, পোষাক পরিচ্ছদ ও আনুসংগিক লাগতে পারে তার একটা তালিকা ক'রে ফেলুন। (১৪) এবার চিত্রগ্রহণ কাজ সুরু করে দিতে পারেন। (১৫) চিত্র-গ্রহণ শেষ হ'লে একবার দেখে নিন ছবিটা। (১৬) কোন অংশ অতিরিক্ত গ্রহণ করা হ'য়েছে বা কোনটা অপ্রয়োজনীয় সেগুলি কেটে বাদ দিন। (১৭) এবার টাইটলিং অর্থাৎ শিরোনামা লিখুন। (১৮) দেখুনত কোথাও কাহিনীটা ঝুলে গেল কিনা! অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে 'টেম্পো' বলি, তা ঠিক আছে কি না! (১৯) শেষ বারের মত সম্পাদনা করে নিন। (২০) সময় ও দিন ঠিক করে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের এবার ছবিটি দেখিয়ে দিন। পূর্বে থেকে জানালে আমিও যেয়ে হাজির হবো আপনার ছবি দেখতে।

সুপ্রীতি মজুমদার (শোভাবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

আমি রূপ-মঞ্চের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হবার নিয়ম জানিনা—জানালে টাকা পাঠিয়ে দেবো। আচ্ছা ছন্দা দেবীর আসল নাম কি সন্ধ্যা এবং সুমিত্রা দেবীর লিলি? এঁদের দুজনের ঠিকানা জানাবেন কি?

●● আপনার চিঠিতে 'বাড়ীর নম্বর' নেই, তাই গ্রাহক হবার নিয়মাবলী ডাকযোগে পাঠানো সম্ভব হ'লো না। নাম, ঠিকানা সহ আট টাকা পাঠিয়ে দিলেই আপনাকে গ্রাহিকা করে নেওয়া হবে। শ্রীমতী ছন্দার আসল নাম সন্ধ্যা এবং সুমিত্রার নাম লিলি। ঠিকানা দিতে পারবো না বলে দুঃখিত।

ইন্দু সেন (নিমু গোস্বামী লেন, কলিকাতা)

●● আপনি বর্তমানে রূপ-মঞ্চ সাহায্য ভাণ্ডারে সাহায্য প্রেরণ করতে পারেন।

দেবাশীষ দাশগুপ্ত (গলফ্ ক্লাব রোড, টালীগঞ্জ)
'অলকানন্দা'র প্রদীপ কুমার ও শান্তির দুলাল দত্ত এঁদের খবর কী ?

●● প্রদীপ কুমারকে দেবী চৌধুরাণী চিত্রে এবং দুলাল দত্তকে বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের সাক্ষীগোপাল চিত্রে দেখতে পাবেন।

স্বদেশ কুমার দাশগুপ্ত (নলিন সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
(১) হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও জগন্ময় মিত্র এঁদের দু'জনের ভিতর কার গলা আপনার ভাল লাগে ? পূর্ণিমা দেবী কি চিত্র জগৎ হ'তে বিদায় নিয়েছেন ?

●● (১) হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। (২) সাময়িক ভাবে তাঁকে চিত্রজগতে দেখতে পাচ্ছেন না, তা'বলে তিনি বিদায় নেন নি। বর্তমানে ষ্টার রঙ্গমঞ্চের সংগে তিনি জড়িত।

প্রণতি নাহা (আর. এইচ, গার্লস কলেজ, গৌহাটি)
আজকাল ছবির যেন অন্ত নেই, কিন্তু সবই যেন একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে কিশোর কিশোরীদের শিক্ষণীয় কিছুই এসব ছবিতে থাকে না বা কেবলমাত্র তাদের কথা চিন্তা করেও কোন ছবি নির্মিত হয় না। এই কিশোর কিশোরীরাই স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মন নিয়ে জগতের কল্যাণ কাজ করে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দেশীয় প্রযোজকদের নিকট কি আমরা কিশোর কিশোরীদের উপযোগী শিক্ষনীয় চিত্র আশা করতে পারি না ? এবিষয়ে হয়ত রূপমঞ্চের পাঠক সমাজ আমার সংগে একমত হবেন।

●● নিশ্চয়ই। ইতিপূর্বে বহু পাঠক পাঠিকা কিশোরোপযোগী চলচ্চিত্রের জন্য রূপমঞ্চ মারফৎ তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আপনার অভিমতের সংগে তাঁরা সব সময়েই সুর মিলিয়ে আছেন। আমাদের এই সমবেত ধ্বনি চিত্রজগতের কর্তৃপক্ষদের একদিন সচেতন করে তুলতে নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে। সেই সুদিনের অপেক্ষাতেই আছি।

অঞ্জলি বিশ্বাস (পাণিহাটি, ২৪ পরগণা)

●● আপনার প্রশ্নগুলির বেশীর ভাগের অন্যের মারফৎ উত্তর দেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যারাণী সম্পর্কে যা জানতে চেয়েছেন, তা তাঁর জীবনী প্রকাশের পূর্বে জানাতে পারবো না এবং এই জীবনী পূজোর আগে প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

রমেন্দ্র নাথ শীল (বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● (১) 'স্বর্ণ-সীতা' সম্পর্কে গত সংখ্যায় যে সমালোচনা প্রকাশ করা হয়েছে, আশাকরি তা আপনাদের খুশী করেছে। 'সাত সমুদ্র তের নদী পার' হয়ে ভদ্রলোক যে কি শিখতে গিয়েছিলেন বুঝি না। 'স্বর্ণসীতা' যদি তাঁর শিক্ষার পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে—তাহ'লে দরকার নেই আমাদের এই সব শিক্ষিতদের—এতদিনই যখন অশিক্ষিতদের নিয়ে কাটলো—আরো কিছুদিন কাটিয়ে দিতে পারবো। (২) নিউথিয়েটার্সে'র সংবাদ কম যায় বলে যে অভিযোগ জানিয়েছেন, সে অভিযোগ আমাদের প্রাপ্য নয়। নিজস্ব প্রচার বিভাগ থাকা সত্বেও নিউথিয়েটার্স তাঁদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সংবাদ পাঠাবার কোন প্রয়োজনই বোধ করেন না। তাঁরা হয়ত মনে করেন, পত্র পত্রিকারা উপযাচক হয়ে তাঁদের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াবে একটু সংবাদ-প্রসাদ নিতে এবং এই সংবাদ-প্রসাদ সংগ্রহ করে নিজেদের কৃতার্থ মনে করবেন। যেসব পত্র-পত্রিকা কৃতার্থ হ'তে চান, আমরা তাঁদের দলে নেই।

বিজয় কুমার পাল (চন্দননগর)
ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি ফুট পিছু দু'আনা করিয়া পাকিস্থান সরকার যে নতুন প্রমোদ কর ধার্য করিয়াছেন, তাহাতে কী শিল্পটীর সমূহ বিপদের ইংগীত পাওয়া যায় না ? পশ্চিম বাংলায় স্থানীয় ভাষায় গৃহীত চিত্রের বিপুল ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে বাঙ্গালী চিত্র পরিচালকেরা ও প্রযোজকেরা সচেতন আছেন কি ?

●● বর্তমানে অবশ্য দু'আনা স্থলে পাকিস্থান সরকার ফুট প্রতি দু'পয়সা আমদানী শুল্ক ধার্য করেছেন। তবু সমস্যাটির সমাধান হয় নি—এবিষয়ে গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা বিষদভাবে আলোচনা করেছি। আশাকরি দেখে

থাকবেন। স্থানীয় চিত্র ব্যবসায়ীরা এবং পাকিস্থানের চিত্র ব্যবসায়ীরাও এবিষয়ে অবহিত আছেন।

অরুণ কুমার শর্মা ও প্রতুল দাস (ইনার সার্কেল রোড, জামসেদপুর)

রাধামোহন কি চিত্রজগৎ হতে বিদায় নিয়েছেন ?

●● কেন ? এই সেদিনও তাকে 'স্বর্ণসীতা' চিত্রে দেখতে পেয়েছেন। রাধামোহন অভিনীত সি, আই, ডি, চিত্রখানাও মুক্তির প্রতীক্ষায় আছে। তাছাড়া তাঁকে আরো কয়েকখানি চিত্রে দেখতে পাবেন।

বিষ্ণুমোহন ধর ও লালচাঁদ দত্ত

●● প্রিয়তমার সমালোচনা গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এবং সাহারার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আপনারা জানতে চেয়েছেন, অভিনেতা সাধন সরকারের উপাধি সরকার কি না ?—আপনাদের ধর ও দত্ত উপাধিতে কি কোন সন্দেহ আছে ? নিতান্ত ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করে অযথা এই বিভাগের স্থান কেড়ে নেন কেন ? অথচ যদি এধরণের প্রশ্নের উত্তর না দি' অমনি তিন পাতা চিঠি দিয়ে অভিযোগ করতে দ্বিধা করবেন না, আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেই না বলে। আশা করি ভবিষ্যতে এধরণের প্রশ্ন আর করবেন না।

সারদা প্রসাদ দাস (বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জি লেন, হাওড়া)

পাহাড়ী সান্যালের জীবনী যখন জানাইলেন, তাঁর কলিকাতার বাড়ীর ঠিকানাটা যদি জানাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সংগে ব্যক্তিগত ভাবে আলাপ করিতে পারিতাম। কারণ, শ্রীপার্থিব মারফৎ জানিতে পারিলাম, তিনি খুব সদালাপী ও অমায়িক।

●● শ্রীযুক্ত সান্যাল বম্বে থেকে ফিরে এসে কোন বাড়ী না পেয়ে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে উঠেছিলেন—সেখান থেকে আবার আর একটি হোটেলে অস্থায়ীভাবে আছেন। তাই তাঁর ঠিকানা দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনি। যদি আপনি বা আপনারা তাঁর সংগে আলাপ করতে চান,তবে এই ঠিকানায় পত্র দিতে বা দেখা করতে পারেন : পাহাড়ী সান্যাল, ভ্যানগার্ড প্রডাকসন, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, টালিগঞ্জ।

সান্ত্বনা গুপ্তা (ধানবাদ, মানভূম)

জ্যৈষ্ঠমাসের রূপ-মঞ্চ যে কাগজের মোড়কে পাঠিয়েছিলেন, তাতে দেখলাম রূপ-মঞ্চের কোন পুরোন সংখ্যার কাগজ দিয়ে ঐ কাজ সেরেছেন। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই পুরানো রূপ-মঞ্চ নষ্ট হয় ? সেগুলি কি আপনারা বিক্রয় করেন ? যদি করে থাকেন, তাহ'লে কিরকম দাম ?

●● রূপ-মঞ্চ পুরোন সংখ্যা নষ্ট করা হয় না। তা তুলে রেখে দেওয়া হয়—পরে যাঁরা চান,তাঁদের কাছে বিক্রয় করা হয় এবং এজন্য অতিরিক্ত কোন মূল্য নেওয়া হয় না। রূপ-মঞ্চ-র কাগজ দিয়ে যে মোড়ক করা হয়েছে, তা কোন বাঁধাই বই নষ্ট করে নয়। দেবীস্মৃতি সংখ্যাটা ছাপাবার সময় ভুল করে একই ফরমা (আট পাতা) দু'বার ছাপা হয়। সেই অতিরিক্ত মুদ্রিত কাগজটা মোড়কের কাজে লাগানো হয়েছে।

সংগীতের মর্মবাণী

উৎপল রায়

★

ছন্দোবদ্ধ ভাষার সুরে প্রকাশিত হইলে তাহাকে সংগীত অথবা চলিত কথায় গান বলিয়া থাকি। গান শুনিতে ভালবাসেন না এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে বেশী নাই। কোন মনীষী বলিয়া গিয়াছেন যে, গান ও ফুল যাহার ভাল লাগে না সে আর যাহাই হউক, মানুষ নয়। মহাকবি কালিদাস সংগীত বিদ্যাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ঋষিরা বলিতেন, 'গানাৎ পরতরং নহি।'

কয়েক বৎসর পূর্বে আমাদের মধ্যে গানের প্রচলন খুব বেশী ছিল না। তখন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভিতর ইহা সীমাবদ্ধ ছিল এবং 'গাইয়ে' 'বাজিয়ে' বলিতে আমরা একটি বিশেষ শ্রেণী মনে করিতাম। অভিনয় দেখিয়া আমরা আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই পাইতে পারি, সময়ে সময়ে পাইয়াও থাকি; কিন্তু অভিনেতৃগণকে নিজেদের মধ্যে সাধারণ মানুষ মনে না করিয়া তাঁহাদের ভাল মন্দ উভয়ই বিশেষ চক্ষে দেখিয়া থাকি। 'গান বাজনা করিলে ছেলে বখাটে হইয়া যায়' 'মেয়েদের তো কথাই নাই' এই মনোভাবেরও অভাব ছিল না। সুখের বিষয়, সে যুগ আমরা পার হইয়া আসিয়াছি। এখন গানের প্রচলন ও আদর সর্বত্রই। সংগীত শিল্পিগণ আমাদের অধিক আদর সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

সংগীত সাধনার বস্তু। ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ও মনের ঐকান্তিক চেষ্টা না থাকিলে ইহা আয়ত্তে আসে না। ঈশ্বরদত্ত শক্তির প্রয়োজন এই জন্য যে, সুর, তাল বোধ শুধু কাহারও শিক্ষাদানে পাওয়া যায় না। নিজের মধ্যে উহা নিহিত থাকিলে শিক্ষাদ্বারা মার্জিত ও উন্নত হয়; যেমন তর্ক করিবার শক্তি নিজের প্রকৃতিগত না হইলে অপরের শিক্ষায় তাহা সম্ভব হয় না। পাহাড় ও সমুদ্র দেখিলে যেমন ভগবানের বিরাট রূপের ধারণা করা যায়, ভাবযুক্ত বিশুদ্ধ সংগীতে তাঁহার মধুর রূপের আভাষ পাইতে পারি। আমাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সকল স্তব-স্তোত্র আছে তাহা গানেরই রূপান্তর। 'সাম' শব্দের অর্থ গীত হওয়া। প্রাচীন ভারতে ওঁকার সহযোগে সামগান গীত হইত। সামবেদের উপবেদ ভরত মুনি প্রবর্তিত গান্ধর্বোবেদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। "চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমানুত্তমং।" এই চৌষট্টি কলার প্রথমেই আমরা পাই গীতম্, বদ্যম্, নৃত্যম্ নাট্যম্, আলেখ্যম্ ইত্যাদি। "গীতং বাদ্যং নর্তনঞ্চ ত্রয়ং সংগীত মুচ্যতে।" সাধারণতঃ সংগীত বলিতে আমরা কণ্ঠ সংগীত বুঝিয়া থাকি। যন্ত্র সংগীতকেও সংগীতের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যাইতে পারে। শাস্ত্রমতে গদই সংগীতের মূল। ঈশ্বর লাভের যে কয়েকটি পথের নির্দেশ আছে ইহা তাহাদের অন্যতম। "জপকোটী গুণং ধ্যানং ধ্যানকোটী গুণং লয়ঃ। লয়কোটী গুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥" মানুষ অনেক সময় গভীর শোকও ইহার মধুর পরশ ও প্রভাবে ভুলিয়া যায়। এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ কবিতা ও গানের ভিতরেই কবিরা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা সকলেই জানি পিতামহ ব্রহ্মা, সৃষ্টিকর্তা। বিষ্ণু, ত্রিভুবন পালনকারী এবং প্রলয়রূপী মহাকাল বিনাশ কর্তা। কিন্তু এই যে মধুর সংগীত তাহা মহাকালই সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত প্রথম সুরই প্রথম সংগীত, যেমন বাল্মীকি রচিত ছন্দোবদ্ধ ভাষাই প্রথম শ্লোক বা কবিতা। মহাদেবের নামানুসারে সেই সুর বা রাগ ভৈরব নামে পরিচিত। সংগীতের প্রচার সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে, ব্রহ্মা মহাদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ভরত, নারদ, তুম্বুরু, হুহু ও রম্ভা এই পাঁচজন ব্রহ্মার শিষ্য হন এবং সংগীত প্রচার করিয়াছেন। সংগীত পারিজাতের মতে কিন্তু অন্যরূপ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, বাল্মীকির রামায়ণ গান হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত সংগীতের যে একটি প্রবহমান ধারা বহিয়া আসিয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। প্রধানতঃ সাতটি শুদ্ধ স্বর লইয়া সংগীতের উৎপত্তি। এই সাতটি স্বরের উৎপত্তি স্থল সাতটি জন্তুর কণ্ঠস্বর। স—ময়ূর, ঋ—বৃষ, গা—অজ, ম—ক্রৌঞ্চ, প—কোকিল, ধ—কুঞ্জর ও নি—অশ্ব কণ্ঠস্বর

হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই সাতটি স্বরের অধিষ্ঠাতৃ দেব-দেবী আছেন। সা—অগ্নি, ঋ—ব্রহ্মা, গ—সরস্বতী, ম—মহাদেব, প—লক্ষ্মী, ধ—গণেশ, নি—সূর্য। প্রধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনীর কথাই আমরা জানি। বর্তমানে যে সকল সুর আমরা শুনিতে পাই, তাহা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি রচনা করিয়াছেন। সুরের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াই তাহাতে পুরুষত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রাগ ও রাগিনীর জন্ম এই ভাবেই।

আমাদের অধিকাংশ পুরুষের মত এই সকল রাগেরও এক বা একাধিক স্ত্রী বর্তমান। ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই ছয়টি প্রধান রাগের ছয়টি করিয়া আশ্রিতা রাগিনী আছে, যাহাদের ঐ সকল রাগের পত্নী বলা হইয়া থাকে। যেমন ভৈরবের ভৈরবী, গুজরী, রামকিরী, গুণকিরী, বাংগালী ও সৈন্ধবী। এই সকল রাগ রাগিনীর পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা প্রভৃতি বহু সুরের নাম পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাদের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কতকগুলি রাগ অথবা রাগিনীকে কেন্দ্র করিয়া তার কোন একটি বিশেষ রূপ বেশী বিস্তার করা হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারা সেই রাগ রাগিনীর আরোহী অবরোহী সামান্য পরিবর্তন হইলেও সেই সুরের মৌলিকত্ব পরিবর্তন হয় না। এই ভাবেও অনেক সুরের সৃষ্টি হইয়াছে। সারংকে অবলম্বন করিয়া শুধ্ (শুদ্ধ) সারং ছাড়াও বড়হংসসারং রক্তহংসসারং, মধুমাধবীসারং হরিদাসীসারং প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দুইটি সুরের মিশ্রনেও আর একটি সুরের জন্ম হইয়াছে। আবার সংগীত বিজ্ঞানের নিয়ম বজায় রাখিয়া সা রে গা মা ইত্যাদি বিভিন্ন **permutation** ও **combination** করিয়া অনেক নতুন সুর আমরা পাইতে পারি। শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল ইসলাম এই ভাবে কতকগুলি রাগ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সংগীত শাস্ত্র মন্থন করিয়া কতকগুলি লুপ্ত রাগও উদ্ধার করিয়াছেন। এখন সুর হইতে গানে আসা যাক্। মার্গসংগীত অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় যাহাকে উচ্চাংগ সংগীত বলা যায় তাহা কোন একটি সুরকে অবলম্বন করিয়া গাওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে সুরের প্রকৃতি অনুযায়ী গানের প্রকৃতি রচিত হয় এবং সেই ভাবে গাহিলেই অধিক শ্রুতিমধুর হয়। ধ্রুপদ ও ধামার গম্ভীর স্বরে এবং নারী অপেক্ষা পুরুষের কণ্ঠেই শুনিতে ভাল লাগে। সুতরাং গম্ভীর প্রকৃতির কোন রাগ (যেমন) দরবারীতেই ভাল লাগে। অথচ পিলু বা খাম্বাজে ঠুংরীই ভাল সোনায়। ঠুংরীতে সব সময় সুরের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হয় না। খেয়ালে কিন্তু সুরের বিশুদ্ধতা নিখুঁত হওয়া চাই। গানের ভাষাতে যেমন বুঝা যায় তাহার ভাব দুঃখের, সুখের বা অন্য কোন অনুভূতির; সেইরূপ কোন কোন সুর শুনিলেই মনে এক এক রকম ভাবের সৃষ্টি হয়। পুরিয়া এবং পুরবীতে একটা বিষাদের ভাব পাওয়া যায়, আবার বসন্ত বা বাহার শুনিলেই একটা আনন্দ উৎসবের আভাষ প্রতিভাত হয়। সংগীত শাস্ত্রে এইজন্য কোন সুর কোন ঋতুতে গাওয়া উচিত তাহার নির্দেশ দেওয়া আছে। এমন কি দিন বা রাত্রির কোন সময়ে কি সুর গাহিলে ভাল হয় তাহাও নির্দিষ্ট করা আছে। সুরের প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াই এই সকল নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ধ্রুপদে গমকের কাজ বেশী, খেয়ালে অবশ্য প্রায় সব রকম গলার কাজ প্রয়োজন হয় তবে রাগের প্রকাশভংগী অনুযায়ী তান্ ও বাট নেওয়া দেওয়া দরকার। ঠুংরীতে ছোট ছোট মূর্চ্ছনা শুনিতে ভালই লাগে। মীড়ের প্রাধান্য ও সুরের বৈচিত্র্যই ইহার বিশেষত্ব।

উচ্চাংগ সংগীতকে সুরপ্রধান বলা যাইতে পারে। কারণ, ইহাতে কথা অপেক্ষা সুরের প্রাধান্যই বেশী। বাণী ও সুর এই দুই-ই গানের প্রাণ। তবে গায়কের কণ্ঠে যদি রাগ রাগিনীর অপরূপ বৈচিত্র্য নানা রূপে রসে প্রকাশ পায়, তাহা উচ্চাংগ সংগীত হইলেও সেখানে সুরের ঐশ্বর্য এত বেশী যে, ভাষার দৈন্য মনেই আসে না। আমার মনে হয়, ঠিক এই কারণেই বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের জলসায় এমন অনেক ব্যক্তি রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করিয়া উচ্চাংগ সংগীতে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ ভাবে খেয়াল বা ঐ জাতীয় কিছু শুনিলেই কানে আঙুল দেন। আবার এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা (যাহা কবিতা হিসাবেই লেখা) গান হিসাবে জনপ্রিয় হইয়াছে। এখানে ভাষার ঐশ্বর্য সুরকে আবৃত করিয়াছে। অবশ্য

আমি বলিতে চাই না যে, জনপ্রিয়তাই সংগীতের চরম উৎকর্ষ। তাহা হইলে আধুনিক ছায়াচিত্রের ও বাণীবদ্ধ সংগীতকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইত। উচ্চাংগ সংগীতে গানের বাণী সুরের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকটা এই কারণেই ইহা সমধিক জনসমাদর লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহাকে জনপ্রিয় ও জীবিত রাখিতে হইলে আরও সহজ ও সরল ভাবে সাধারণের মধ্যে পরিবেশন করিতে হইবে। বর্তমানে আধুনিক ও অন্যান্য লঘুচালের গানের প্রচলনই বেশী। উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা ও চর্চা করিবার মত একাগ্রসাধনা ও ধৈর্য খুব অল্প শিক্ষার্থীর মধ্যেই দেখা যায়। সুতরাং কয়েকজন গুণী ব্যক্তির মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইবে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অল্প কয়েকজন পণ্ডিতের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ায় ক্রমশঃলুপ্ত হইতে বসিয়াছে; আর তাহা হইতে পুষ্ট বাংলা সাহিত্য একটি সার্বজনীন আবেদন লইয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে চলিয়াছে। বর্তমান-যুগের সংগীত ও উচ্চাংগ সংগীতের রসধারায় পুষ্ট হইলে ক্রমশ উন্নত ও সর্বজনপ্রিয় হইবে।

অপর যে সকল সংগীতের সহিত আমরা পরিচিত তাহার বেশীর ভাগই ভাবপ্রধান অর্থাৎ সুরের অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্যই ইহার মধ্যে বেশী। যেমন কীর্তন, রামপ্রসাদী, শ্যামাসংগীত, ভাটিয়ালী, বাউল, ভাওয়াইয়া, গম্ভীরা প্রভৃতি, ইহাদের সুরে তেমন বেশী কিছু বৈচিত্র্য দেখা যায় না। এই সব গান দরদী গায়কের কণ্ঠে গীত হইলে আমাদের মর্মস্থল স্পর্শ করে। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে যে, সাধারণতঃ এই প্রকার গানের ভাষা অলঙ্কার বহুল সাহিত্যিক ভাষা নয় বরং সহজ সরল কথার মধ্য দিয়াই হৃদয়ের ভাবকে প্রকাশ করা হইয়াছে। গায়কের কৃতিত্ব সুরের বৈচিত্র্য প্রকাশে নয়, অন্তরের ভাব দিয়া গানের ভাষাকে প্রাণদান করায়। কীর্তন শ্রবণে শ্রীকৃষ্ণের অপরূপ লীলার কথাই মনে হয়। রামপ্রসাদী গানে ভক্তিভাবই জাগিয়া উঠে। ভজনের ভাবমাধুর্য চাপা না দিয়া যদি তাহা উচ্চাংগ সংগীতের ধরণে গাওয়া যায় তবে ভালই লাগে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তাল ও সুর উভয়ের মধ্যেই যেন একটি সংগতি থাকে একটা আর একটাকে যেন ছাপাইয়া না যায়। এই সংগতি কিছুটা আমরা রবীন্দ্রসংগীতে পাইয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ মনের বিভিন্ন ভাব, প্রকৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ লীলা তাঁহার অমর ভাষার সাহায্যে বিভিন্ন সুর ও তালের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

সাধনা না করিলে কোন প্রকার গানই ভাল ভাবে গাহিতে পারা যায় না। আজকাল 'আধুনিক গান' নামক এক প্রকার গানের সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ ভাবে ইহা গাহিতে বিশেষ সাধনা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না বলিয়া অনেকেই আজকাল গায়ক পদবাচ্য হইতেছেন। এই আধুনিক গান না সুরপ্রধান—না ভাবপ্রধান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হয় যে, ইহারা সমঝদারের রাজপথ দিয়া যাইতে না পারিয়া অনাড়ি পাড়ার গলি দিয়া যাতায়াত করে। আধুনিক গানের সুরের কোন একটি নির্দিষ্ট ভংগী বা ধারা নেই,—ভাষাও বেশ ভাবসমৃদ্ধ নয়। সুতরাং হাল্কা কথা ও সস্তা সুরের সাহায্যে যে আধুনিক গানের পরিচয় আমরা পাইতেছি; আপাত শ্রুতিমধুর হইলেও (অবশ্য মাত্র এক শ্রেণীর কাছে) তাহা সংগীত রসজ্ঞদিগকে সন্তুষ্ট করিতে অক্ষম। যাহার ভিতরে কোন শাঁস নাই, এমন জিনিষের বাহিরে চাকচিক্য থাকিলেও তাহা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না এবং দর্শকসাধারণের মনোযোগও বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। আধুনিক গান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা বলা চলে। ইহার মধ্যে যেটুকু রস আছে তাহা বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার ভাষা আরও উন্নত হওয়া প্রয়োজন; সুরও উচ্চাংগ সংগীতের রসধারায় পুষ্ট না হইলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না। তখন ইহার অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সুতরাং যেদিন আধুনিক গানের ভাষা ভাবপূর্ণ, সুর বিজ্ঞানসম্মত হইবে এবং উচ্চাংগ সংগীত তাহার জটিলতার শিখর হইতে নামিয়া সহজ সরল ও স্বচ্ছভাবে প্রবাহিত হইবে, সেদিন সংগীত একটা সার্বজনীন আবেদন লইয়া সকলের কাছে উপস্থিত হইবে! তখন সংগীতের চর্চা আরও বিস্তৃত হইবে এবং সকলেই সর্বপ্রকার সংগীতের রসধারায় স্নিগ্ধ হইয়া প্রীত হইবেন।—

স্বপ্ন ও বাস্তব

(ছোট গল্প)

সন্তোষ ঘোষ

বৃষ্টির শব্দে রঞ্জনের ঘুম ভেংগে গেল। তার পাশে সুলতা ঘুমোচ্ছিল। রঞ্জন তার গায়ে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে ডাকল, 'ওগো শুনছ'! সুলতা জেগে উঠল। রঞ্জনের বুকের মধ্যে মুখ রেখে সুলতা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ ক'রে বলল, 'ঘুমটা ভাঙ্গালে তো। কি অভ্যাস বাপু তোমার, একটু বৃষ্টি পড়তে না পড়তেই ঘুম ভেংগে যাবে, আর যতক্ষণ বৃষ্টি পড়বে তত-ক্ষণ সমানে জেগে থাকবে'। রঞ্জন হাসিমুখে বলল, 'কি করি বল, এতকালের অভ্যাস কি সহজে ছাড়া যায়। আর ঘুম ভাঙ্গলেই মনে হয়, তোমায় জাগিয়ে দি। তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়!' সুলতা দুহাত দিয়ে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'না না, তুমি বেশ কর আমায় জাগিয়ে দাও। আমার ভারি ভাল লাগে। তারপর গলায় একটা অদ্ভুত মিষ্টতা নিয়ে এসে বলল, 'ওগো শুনছ, চলনা একটু ছাদে গিয়ে বেড়িয়ে আসি। লক্ষীটি চলনা!' রঞ্জন হাসি-মুখে উত্তর দিল, 'পাগল নাকি, এই না সেদিন তোমার জ্বর হল, আবার আজ বৃষ্টিতে ভিজতে চাইছ! 'সুলতা আবদারের সুরে বলল, 'কোথায় জ্বর, ওকে কি জ্বর বলে না কি! একটু গা গরম হয়েছে কি না হয়েছে, অমনি তুমি গোটা তিনেক ডাক্তার নিয়ে এসে হাজির করলে। যাই বল বাপু, তোমার একটু বাড়াবাড়ি আছে।'

রঞ্জন ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছি ডাক্তার এনেছি। এবার তো তিনজনকে মাত্র এনেছি, আর একবার গা গরম হোক না, তেত্রিশজন ডাকব।' সুলতা স্বামীকে আরো জড়িয়ে ধরে বলল, 'ওগো রাগ করলে নাকি! আমি তোমাকে ঠাট্টা ক'রে ব'ললাম, আর তুমি সেটা Seriously নিলে। লক্ষীটি রাগ করো না, এবার আমার অসুখ করলে তিনজন কেন, তিনশ তেত্রিশজনকে ডেকো! কেমন খুশী তো! ওগো একটু ওঠনা, ছাদে না যাই, জানালার ধারে তো দাঁড়াতে পারি?'

জানালার ধারে এসে দুজনে পাশাপাশি দাঁড়াল। বাইরে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের মধ্যে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুরু গুরু মেঘের ডাক সহরের নিস্তব্ধতা ভংগ করছে। বর্ষা রাতের অন্ধকারে মহানগরীকে অদ্ভুত মায়াময় মনে হচ্ছে।

রঞ্জন আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা লতা আমার যদি অসুখ করে তুমি কি করবে!' সুলতা ডানহাত দিয়ে রঞ্জনের মুখটা চেপে ধরে বলল, 'ওগো অমন কথা বল না, তোমার অসুখ ক'রলে আমি এক মুহূর্ত ও বাঁচব না, কেন তুমি অমন অলক্ষণে কথা ব'ললে বল'। তারপর তার কি কান্না।

রঞ্জন কিছুতেই তাকে ভুলাতে পারে না। সে কেবলই বলতে থাকে, 'কেন তুমি অমন কথা ব'ললে বল, আমার সর্বনাশ করে তোমার লাভ কি? রঞ্জন অনেক কষ্টে তাকে ভোলাল। তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হ'ল যে, সে কোন দিন মরবে না আর তার কোনদিন কোনরকম অসুখ ক'রবে না। তারা দুজনে আবার বিছানায় এসে শুলো। সুলতা স্বামীর গলা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। রঞ্জনের চোখে ঘুম আসে না। সুলতার মুখের দিকে চেয়ে সে ভাবতে লাগল, না কথাটা বলা তার ঠিক হয় নি। বেচারী বড় আঘাত পেয়েছে। তার মনে পড়ল যে, আফিসে যাবার সময় সুলতা রোজ কি রকম করে। আফিসে যাবার সময় রোজই তাকে আটকাবে, একশবার জিজ্ঞাসা করবে যে, সে কখন ফিরে আসবে। কোনদিন যদি রঞ্জন দেরী করে আসে, তাহলে আর তার রক্ষা নাই। সুলতা কান্নাকাটি করে একবারে অস্থির হয়ে উঠে। রঞ্জন ভাবে, সুলতার মত ভালবাসতে বোধ হয় কোন মেয়ে পারে না। তার বেশ একটু গর্ব বোধ হয়।

* * * *

'ডাক্তার বাবু কেমন দেখলেন', সুলতা উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করল। ডাক্তার বাবু সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, দেখুন আপনি তো বুদ্ধিমতি মেয়ে, ভয় পাবেন না, আমার যতদূর মনে হচ্ছে, রঞ্জন বাবুর টি,বি হয়েছে। অবশ্য এক্সরে না করা পর্যন্ত এসম্পর্কে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যাবে না।' মুহূর্তের মধ্যে সুলতার মুখটা একবারে

রূপলেখা পিকচার্সের প্রথম ছবি আবর্ত-এ রেণুকা রায়।

রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে স্খলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার বাবু তা হ'লে কি হবে, আমি কি করব।' ডাক্তার বাবু তাকে সাহস দিয়ে বললেন, 'ভয়ের কোন কারণ নাই, টি, বি যদি হয়েও থাকে, এখন প্রথম অবস্থা, সেরে যাবে।' সুলতা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'ডাক্তার বাবু রোগটা কি খুব ছোঁয়াচে?' ডাক্তার বাবু বললেন, 'হ্যাঁ তা একটু ছোঁয়াচে বটেই, তবে সাবধানে থাকলে কিছুই হয় না।' সুলতা ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল। ডাক্তার বাবু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে চলে গেলেন।

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে সুলতার বাবা এসে সুলতাকে নিয়ে চলে গেলেন। সুলতা তাকে কোন সংবাদ দিয়ে ছিল। সুলতার চলে যাবার সংবাদ রঞ্জন জানল না। সে তখন ঘুমোচ্ছিল। গভীর রাতে বৃষ্টির শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে পাশে তাকিয়ে দেখল, সুলতা নাই, একটা চিঠি পড়ে রয়েছে। চিঠিটা প'ড়ে রঞ্জন বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘের অন্তরালে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘুমন্ত সহরের বুকের উপর অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি নেমেছে।

মেঠোসুর

[চলচ্চিত্র কাহিনী]

গৌর সী

●

রসপুরের ৩০ ঘর বাসিন্দার দই চিঁড়ের দরকার হলে ছোট খাটো খিট্‌ খিটে মেজাজ চক্রধরের শরণাপন্ন হতে হয়, তেমনি ধারা ডাল, ডাল, ঝাল, মশলার নিত্য নৈমিত্তিক সামগ্রীর চাহিদা মেটায় লম্বা চওড়া গুঁপো তারানাথ।

তারানাথ আর চক্রধর মানে চাল আর চিড়ের মধ্যে সাপে নেউলে সম্বন্ধ। কত বৎসরের সে সম্বন্ধ সেটা বলা শক্ত। তবে তারানাথ বলে, চক্রধরের যেমন স্বভাব, তেমনি চেহারা। বিক্রী করেও তাই চিড়ে। আর চক্রধর বলে, তারানাথের চালের মধ্যে কাঁকর আর আটার মধ্যে বজ্জরা, ব্যেটা যেমন কিপটে নাম করেছো কি হাঁড়ি ফাটে! দুজনার মুখ দেখা-দেখি বন্ধ। হঠাৎ যদি রাস্তা ঘাটে মুখো মুখি হয়ে যায়, চক্রধর জিব বার করে মুখ ভ্যাংচায়· তারানাথ চোখ পাকিয়ে গোঁফে দেয় তা! কিন্তু সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছে সারা গ্রামের মধ্যে ঐ একটি ময়রার দোকান আর ঐ একটিমাত্র মুদীখানার দোকান চক্রধরের বিকালে আটা না হলে খাওয়াই হয় না আর মাসের মধ্যে ২২ দিন তারানাথের রান্নার ঝঞ্ঝাট এড়াতে ফলারের ব্যবস্থা করতে হয়।

তারানাথের সংসারের মধ্যে ঐ এক ছেলে ফ্যালারাম। চমৎকার চেহারা! বছর বাইশ বয়স···বোকা বোকা ভাব সদাই যেন আনমনা।

চক্রধরের বৌয়ের নাম পার্বতী। চিররুগ্না, তাই নিঃশ্বাস ফেলে চক্রধর বলে—"ভগবান পার কর—চিঁড়ে বেচে ওর পারের কড়ি যোগাই কেমন করে!...আর মেয়েটাও হয়েছে কি সৃষ্টিছাড়া ...বাউণ্ডুলে, টো টো করে বাইরে ঘোরে আর খাবার সময় ঘরে আসে!" চক্রধর নিজের গালেই চর মেরে বলে—"হায় হায় কি কুক্ষণেই ওর নাম শান্তি রেখেছিলুম!"

শান্তি তখন চৌধুরীদের পোড়ো বাগানে ফলন্ত পেয়ারা গাছটার শির ডগায় উঠে পাকা পেয়ারার সন্ধানে ডালে ডালে ঝুলছে...শেষে মহা বিরক্ত হয়ে বলে আপন মনেই —"এই মাত্র দেখলুম ঐখানে ঝুলছে পাকাটা আর বোকাটা গাছেও চাপবে না বলতেও পারে না কোনখানে রয়েছে—" নিচের দিকে চেয়ে বলে—"দেখতে পাচ্ছনা? পাকা পেয়ারা দেখতে আমার খোঁপার দিকে চেয়ে আছ?"

নিচে কোঁচার খুটে কোঁচর ভর্তি পেয়ারা ধরে ফ্যালারাম ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে করে চেয়ে আছে সত্যি শান্তির মুখের দিকে।

মেয়েটা যে দস্যি, সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ নেই। যেমনি ডাকাবোকু তেমনি মতলুবী।

বাপ তাকে ফ্যালাদের বাড়ী যেতে বারণ করে দিলেও লুকিয়ে গিয়ে ফ্যালাকে পাখীর বাচ্চা, পাকা পেয়ারার লোভ দেখিয়ে দোকান হতে সরিয়ে আনে।··ফ্যালা না থাকলে শান্তির এবাগান ওবাগান থেকে চুরি করা ফল খেতে ভাল লাগে না···বনফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতে ছিঁড়ে ফেলে দেয়··

শুধু তাই নয়, তারা জ্যেঠামহাশয়ের কাছে গিয়ে নালিশ করে ·· তাকে রামায়ণ পড়িয়ে শুনিয়ে আসে...কোন কোন দিন ভাতও রান্না করে দিয়ে আসে।

চক্রধর আর তারানাথের মধ্যে মন কষাকষি থাকলেও ফ্যালা আর শান্তির মধ্যে তেমনি ছিল ভাব। বাপদের মধ্যে ঝগড়া তাদের মিলনের কোন বাধাই সৃষ্টি করতে পারেনি। তার কারণ, চক্রধর ফ্যালার শান্ত নিরীহ গোবেচারী ভাবে বিশেষ করে তার চমৎকার চেহারাটী দেখে তার খিটু খিটে মেজাজের অলক্ষ্যেই তাকে স্নেহ করতে সুরু করে—কল্পনায় অন্তরের অন্তস্থলে তার চঞ্চলা নিষ্কর্মা ভবঘুরে মেয়েটির পতিরূপে ফ্যালাকে বসিয়ে নিশ্চিন্ত হবার দুর্বার একটা আকাঙ্খা হত। তারানাথও শান্তির মধ্যে নিজের ছন্নছাড়া সংসারটাকে আবার শ্রীমণ্ডিত করে তোলবার ইচ্ছাটা প্রবল হলেও জোর করেই চেপে রাখত চক্রধরের কথা ভেবে। শান্তি তার বাপের আর তারা জ্যেঠামশার দুর্বলতা টের পেয়েছিল। তাই তাদের দিয়ে মজা করতেও ছাড়ত না। ফ্যালার সংগে গল্প করতে করতে ধরা পড়লে সে তার
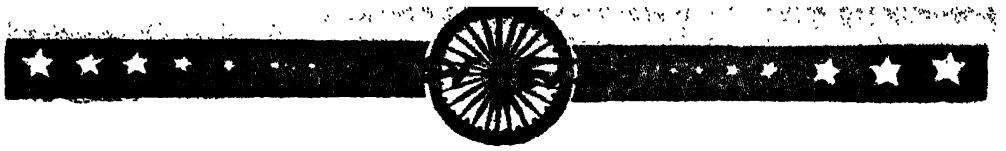
বাপকে জানিয়ে দিত, জ্যেঠামশায় এই একটু আগে তার নামে সব কি বলছিল। আর চক্রধর মেয়ের কথা ভুলে লাফিয়ে উঠে তারানাথের কাছে গিয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে সুরু করত!

দূর থেকে শান্তি আর ফ্যালা দাঁড়িয়ে মজা দেখত—আর হাসত।

ছেলে বেলা থেকে একই গ্রামে পাশাপাশি থেকে এই দুটী ছেলে আর মেয়ে বেড়ে উঠেছিল। বাড়ের সংগে সংগে শান্তির মনে এসেছিল পরিবর্তন…সে নতুন চোখে ফ্যালার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে থাকত…ছেলে বেলার সহচর সহসা কি করে যে তার মনের মধ্যে নতুন মূর্তি নিয়ে আসন পেতে বসলো, সে কথায় আশ্চর্য হলেও সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো ফ্যালার সান্নিধ্যে এসে…ফ্যালাকে না দেখলে তার দিনটি যেত বিফল হয়ে…ফুটি ফুটি করেও সে ফুটতে পারত না…ভাবলেশহীন ফ্যালার মুখের দিকে চেয়ে সে মাঝে মাঝে রেগেও যেত, ভাবত—ফ্যালাদা কি! কেন সে তাকে নতুন কথা শুনায় না · কেন সে তার দিকে নতুন চোখে চেয়ে দেখে না!

আজ সারা দেহে তার যে যৌবনের বসন্ত ফুটে উঠেছে, সেটার সন্ধান কেন সে দেয় না! ··তাই সে নানা ভাবে বিদ্রুপ করে…নানা ভাবে ফ্যালার ঘুমন্ত যৌবনকে জাগিয়ে তুলতে সে চেষ্টা করে…আকারে ইংগিতে—ভাবে ভংগিমায়—কথায় শান্তি তার মনের কথা বোঝাতে চায়, ফ্যালা কিন্তু জানে না…ভীরু দুর্বল মন নিয়ে শান্তির বলিষ্ঠ প্রাণধারার মধ্যে নিজকে যেন হারিয়ে ফেলেছিল।

সেদিন সিংহীদের বাগানে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে যে কাণ্ডটী হয়েছিল তাতে করে অন্য ছেলে হলে কি করত জানা না থাকলেও, ফ্যালা কিন্তু নামের সার্থকতা রেখে শান্তিকে আরও রাগিয়ে দিয়েছিল। শান্তি যখন শির-ডালে পেয়ারা খুঁজতে ব্যস্ত আর নিচে দাঁড়িয়ে ফ্যালা ফ্যালফেলিয়ে শুধু শান্তির বকুনি হজম করছিল, সেই সময় বাগানের মালী দূর থেকে হুঙ্কার দিয়ে এগিয়ে আসবার উপক্রমেই ফ্যালা বলে উঠে—"মালী, মালী আসছে—লাফিয়ে পড় শান্তি!"

শান্তি নিচের দিকে চেয়ে বলে—"লাফাই কি করে?"

দূরের দিকে চেয়ে ফ্যালা বলে দারুণ ভয়ে—"চোখ বুঝে—শীগ্গীর…এসে পড়লো!"

মরিয়া হয়ে প্রাণের দায়ে শান্তি লাফিয়ে পড়ে নিচের দিকে। চোখ যখন চাইলে সে, তখন ফ্যালার বুকে মানে ফ্যালা তাকে লুফে নিয়েছে। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা কয় না…পৃথিবী—পেয়ারা মালীর ভয় এক মুহূর্তের জন্য তাদের জগত থেকে কর্পূরের মত উবে গেল…শান্তি প্রতি মুহূর্তে আশা করছিল ফ্যালাদা এমন একটি কাণ্ড করবে যেটা হবে তার সারা জীবনের পাথেয় কিন্তু বোকা ফ্যালা তাকে ধরে শুধু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে…

ভয়নাক রাগ হয়ে শান্তি চোখ মেলে দেখে—সহসা কনুইয়ের ঠেলা মেরে নিচে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফ্যালার দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিয়ে দেখে বলে ধমকের সুরে—"হ্যা করে দাড়িয়ে মুখের দিকে কি দেখছ বোকারাম, পালাও না!"

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একটা নির্জন জায়গায় এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে শান্তি বলে—"যাও, যাও আমার পেছনে পেছনে আসতে হবে না!"

সভয়ে ফ্যালা বলে—"বারে আমাব কি দোষ!"

তার দিকে চেয়ে সক্রোধে শান্তি বলে—"ছি ছি বেটাছেলে এত বোকা হয়!"

ফ্যালা মুখ কাচুমাচু করে ঘার চুলকোতে থাকে। শান্তি আবার বলে রাগ হয়েই—"মেয়েছেলের পেছনে পেছনে হ্যাদার মত ঘুরতে লজ্জা করে না তোমার!"

তারপর তার দিকে জ্বালাময় দৃষ্টি ফেলে লম্বা লম্বা পা বাড়িয়ে সে চলে যায়। ফ্যালা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—সে বুঝতেই পারে না শান্তির কেন রাগ হ'লো!

শান্তির রাগ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকে না, আবার সে বাড়ী থেকে লুকিয়ে চলে আসে…তারানাথের কাছে এসে বড় ভাল মেয়ের মত চুপটী করে বসে। শান্তিকে কাছে পেয়ে তারানাথ হাতে পায় স্বর্গ, বলে—"দুদিন আসা হয়নি কেন শুনি?"

শান্তি বলে—"বাবা আসতে দেননি।"

চোখ পাকিয়ে তারানাথ বলে—"মেরে ব্যাটাকে দেব ছিঁড়ে
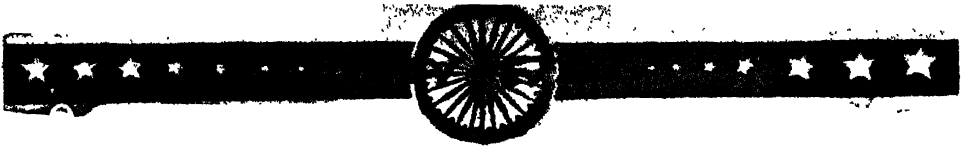
চেপ্টা করে! --সভায় যায় তেরে, মেয়েকে যায় তেড়ে . বাইরে পারে না ঘরে গিয়ে তোর ওপর তম্বী করা একদিন বাঁট্‌কুলের দেব ঘুচিয়ে।"

তারানাথের দাঁত কড়মড় করতে থাকে। শান্তির মজা লাগে। বলে—"বাবার সংগে তুমি কিন্তু পারবে না জেঠামশায়!"

তারানাথ বলে চোখ পাকিয়ে—"এক হাতে টুটা ধরে বন্ বন্ ঘুরিয়ে দিতে পারি তা জানিস!"

বাইরে থেকে ডাক আসে "শান্তি—এই মুখপুড়ি শান্তি!"

শান্তি চমকে বলে- "এই রে বাবা এসে পড়েছে, কর এবার চিঁড়ে চেপ্টা!"

চক্রধর মেয়েকে খুঁজতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে দু'জনকে দেখে তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলে—"আমরণ, এইখানে বুঝি আড্ডা করেছ? চলে আয় বলছি—"

তারানাথ বলে—"যাবে কেন শুনি?"

চক্রধর মুখ ভেংচে বলে—"চোথরাও হারামজাদা!"

শান্তির কথা দুজনে ভুলে যায়। সুরু হয় দুজনের ঝগড়া... রাস্তার লোক জমে যায়...শান্তি পা টিপে টিপে সরে পড়ে। তাদের এই ঝগড়ায় পাড়ার লোকও বুঝতে পারে না কেন ...কিসের এই ঝগড়া ঝাটী?...তবু মজা দেখতে তারাও পরস্পরকে লাগিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারে না।

তারানাথ তামাকের নিমন্ত্রণ করে ডেকে খরিদ্দারদের বলে —"আটা কি রকম খাচ্ছ হে আজকাল?

খদ্দের বলে—"চমৎকার, চমৎকার, রুটী নয়ত যেন এক একটী ফুলবড়ী।"

তারানাথ বলে "একটু ভেজাল পাবে না ভাই—একটী একটী করে গম বেছে যাতায় ভাংগিয়ে তোমাদের হাতে তুলে দি—"

হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বলে উঠে—"আর হতভাগা চক্রধরটা কি বলে জান?"

খদ্দের বলে সহর্ষে—"চক্রধরও দেখছি তোমার পেছনে লেগেই আছে—"

তারানাথ হুঙ্কার ছেড়ে বলে—"দিতুম সেদিন এক ঘুসীতে মাথাটা চিঁড়ে চেপ্টা করে—আমার খদ্দের ভাংগিয়ে বেড়াচ্ছে ...লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি চালে দিই কাঁকর...আটায় দিই বজরা...আর ও কি করে...ধানের গায়ে গুড় মাখিয়ে বলে মুড়কি...চামড়ার টুক্‌রোর মত চিঁড়ে বিক্রী করে—ব্যাটা তেমনি চিঁড়ের মত শুকিয়েওত যাচ্ছে—"

ওদিকে চক্রধর তার ঘরে ফ্যালাকে দেখে বলে—"শান্তিটা গেল কোথায়?"

ফ্যালা বলে—"জানি না ত'!"

চক্রধর বলে—"তুমি জানবে কি করে শুনি...হাতে কি? কি হাতে?"

ফ্যালা বলে ভয়ে ভয়ে—"কাকীমার জন্যে ওষুধ এনেছি—

পার্বতী বলে—"দেখছত, নিজের মেয়ে পাড়ায় পাড়ায় টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ফ্যালা আমার সেবা করছে...!"

চক্রধর বলে--"সোনার চাঁদ ছেলে...তুমি ছিলে বাবা, তাই রক্ষে আর কিছু না হ'ক ওষুধটাত পাচ্ছে"—তারপর সজোরে হুঁকায় টান মেরে বলে—"আর আমার হয়েছে একটা হতচ্ছারা হাড় হাবাতে বাউণ্ডুলে মেয়ে!...মেয়েছেলে গাধার পিঠে চাপে কি করে বাবা!"

ফ্যালা চমকে উঠে বলে—"আজ্ঞে কার কথা বলছেন কাকাবাবু!"

চক্রধর বলে—"ঐ শান্তি হতভাগীর কথা...ছি ছি কি দজ্জাল মেয়ে হল বলত বাবা!"

ফ্যালারাম ঘরে যেতে পা বাড়ায়। চক্রধর বলে—"যাচ্ছো কেন শুনি?"

ফ্যালা বলে—"বাবার শরীরটা কদিন ভাল যাচ্ছে না—"

চক্রধর ফোঁস করে ওঠে—"বাবার শরীর ভাল না—তা আমি কি করবো!"

ফ্যালা বলে--"তাই বলছিলুম -"

চক্রধর চেঁচিয়ে বলে—"শরীর খারাপ! দশটা বাঘে খেতে পারে না...বিট্‌কেলে বদমায়েস...আমায় বলে চোর...দেব একদিন চড়্ চড়্ করে গোঁফ জোড়া ছিঁড়ে...শরীর খারাপ!"

পার্বতী বলে—"তা ফ্যালাকে ওরকম করছ কেন?"

গর্জন করে চক্রধর বলে—"না বলবে না...আমি চোর ওব্যাটা কি..? জোচ্চর..খুনে, আটার সংগে ভুষী

মিশিয়ে গোটা গায়ের পেট খারাপ করে দিয়েছে...বেটা পয়সা পিসাচ!"

এত মনোমালিন্য এত যে "আকচা আকচী" তবু এর দোকানের আটা না হলে চক্রধরের খাওয়াই হয় না আর ওর দোকানের চিঁড়ে না হলে তারানাথের মাসের মধ্যে বাইশ দিন উপোস দিতে হয়।

একটা ঘটনায় চক্রধর আর তারানাথের মনোমালিন্য উঠলো চরমে। পার্বতীর পীড়া পীড়িতে চক্রধর শান্তির বিয়ের ব্যবস্থা করে অনিচ্ছায়। ফ্যালার সংগে শান্তির বিয়ে হলে সব চেয়ে খুসী হত চক্রধর কিন্তু তারানাথের কথা ভেবে সেই ইচ্ছাটা দমন করেই সে মধু চৌধুরীর ছেলের সংগে শান্তির বিয়ের পাকাপাকি করে···তারানাথের কাছে খবরটা কিন্তু গেল ফাঁস হয়ে। সে বিয়েতে দিল ভাঙচি···বিয়ে ভেংগে গেল···চক্রধর গেল ভীষণ রেগে···ছুটে তারানাথের কাছে গেল...দুজনের সুরু হলো গালাগালি—হাতাহাতি হ'তে হ'তে হল না বটে, কিন্তু চক্রধর শাসিয়ে এল—"তোমার বাড় যদি না ভাংগি ত' আমার নাম চক্রধর নয়।"

তারানাথ বলে গোঁফে তা দিয়ে—"যারে বেটা যা··বিষ নেই তার কুলোপানা চক্কোর! একটা মাতালের সংগে মেয়ের বিয়ে দিতে গেছলে হতভাগা!"

এমনি ভাবেই রামপুরের এই কটী প্রাণীর জীবন চলে কেটে! বাপ মায়ের অলক্ষ্যে দুটী প্রাণ বনফুলের মত আপনা আপনি ফুটে রূপে গন্ধে রসে ভরে উঠলেও কেউ সন্ধান পায় না।...শান্তির বুকের অসীম শূন্যতার কথা ফ্যালাও বোঝে না...তার বাপ মাও বোঝে না···দিন রাত শুধু মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে শান্তির বুকে গভীর শূন্যতা নেমে আসে।

সহরে তারানাথ প্রতি মাসেই যায়...গিয়ে কিনে আনে তার দোকানের আবশ্যকীয় জিনিষ পত্তোর। এবার শরীর ভাল নয় বলে ফ্যালাকে পাঠালে সহরে। ফ্যালা কখনও সহরে যায় না···যাবার আগে লুকিয়ে সে শান্তির সংগে দেখা করে গেল।

শান্তি তাকে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে বলে—"খুব সাবধানে থেক ফ্যালাদা!"

রূপলেখা পিকচার্সের আবর্ত চিত্রে অর্পণা দেবী

ফ্যালা বলে—"তোমার জন্যে নীলাম্বরী শাড়ী আনবো কিনে।"

শান্তি বলে আনমনে—"না।"

ফ্যালা বলে—"তবে কি আনবো বল?

শান্তি বলে—"এ সময় না যাওয়াই ভাল, সহরে নাকি মারামারি হচ্ছে হিন্দু মুসলমানে—"

ফ্যালা বলে হেসে—"সে থেমে গেছে···বললেনা ত' কি চাই তোমার?"

অনেক ভেবে শান্তি বলে—"তোমার একটা ছবি তুলে এন...ফুলবাগানের মধ্যে চেয়ারে বসে পকেটে রুমাল দিয়ে বাবুর মত ছবিটা তুলিও টেরী কেটে চোখে একটা চশমা দিও—জানো?"

ফ্যালা সম্মতি জানিয়ে চলে যায়। তারপর গমনপথের দিকে চেয়ে শান্তির চোখে আসে জল নেমে।

দু'দিন বাদে ফ্যালা ফিরে এল...ষ্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে নয়—রহিমের গরুর গাড়ী করে···সংগে আছে দুটি স্বেচ্ছা-সেবক···তার দেরী দেখে তারানাথ আর শান্তি আকুলি ব্যাকুলি কচ্ছিল...পথের দিকে চেয়ে থাকত...কেন দেরী করছে সেই নিয়ে দুজনের চলতো কত জল্পনা কল্পনা···আজ গরুর গাড়ী দেখে তারানাথ ক্ষেপে গিয়ে বলে···"তাহলেই ব্যবসা করেছে ..৩০ টাকার মাল আনতে গরুর গাড়ী চেপে বাবুয়ানী করা...আসুক একবার ঘরে—!"

কাছে এসে স্বেচ্ছাসেবক দুটী গরুর গাড়ী থেকে ফ্যালার অচৈতন্য ব্যাণ্ডেজ করা দেহটা ধরাধরি করে নামালে···

তারানাথের পা টলছিল...সর্বাংগ থর থর করছিল—স্বেচ্ছা-সেবক দুটী বলে—"ভয় নেই, দু'একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে···"

তারানাথের প্রাণে বাজছিল হাজার প্রাণের গুণগুণানী···তার মধ্যে ছেলে দুটীর গলার শব্দ ভেসে ওঠে অস্পষ্ট ভাবে—

—"হাঙ্গামা কাল থেকেই আবার সুরু হয়ে গেছে...হাস-পাতালে জায়গা নেই, তাই বাধ্য হয়ে রেখে যাচ্ছি—"

তারানাথ রাস্তার উপরেই আছড়ে পড়ে মূর্চ্ছিত হয়ে। সে খবর গাঁয়ের বুকে তুললে ঝড়···সবাই আসে ছুটে ফ্যালাকে দেখতে···সবার মুখে ঐ এক কথা—"ফ্যালাকে গুণ্ডারা ছুরী মেরেছে···!"

শান্তির কানেও এ কথাটা গেল। পাগলের মত সে ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গেল···চক্রধর তার হাত চেপে ধরে রুক্ষ কণ্ঠে বলে—"খবরদার, তার ওখানে গেছ কি তোমার মাথা আমি একদম গুঁড়িয়ে দেব!"

পার্বতী চোখের জল মুছতে মুছতে বলে—"কি করছ তুমি ...এই বিপদের সময় ঝগরাটাই হলো বড়···দাও ওকে ছেড়ে···তুমিও চল!"

দাঁত খিঁচিয়ে চক্রধর বলে—"কি, আমি যাবো সেই খুনেটার বাড়ী...মজা করে নিজে বসে রইল আর ছেলেটাকে পাঠালে যমের মুখে···তার মুখ দেখবো আমি—!"

সে হাত ছেড়ে দেয়···শান্তি ছাড়া পেয়ে ছুটলো...পার্বতীও কাঁদতে কাঁদতে বেড়িয়ে গেল। সেই দিকে চেয়ে বিকৃত কণ্ঠে চক্রধর বলে—"আমার কচুটা, আমি ওসবে নেই... আমি ওসবে নেই!"

তারপর চললো সেবা শান্তির...সব ভুলে সে শুধু ঐকান্তিক ভাবে ফ্যালার সেবা করে চললো···পার্বতীও নিজের অসুখের কথা ভুলে দিনে পঞ্চাশবার এসে ফ্যালার মূর্চ্ছিত-প্রায় দেহটার পাশে বসে থাকত! তারানাথের কথা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। একজায়গায় বসে শুধু আকুল ভাবে বিছানায় ছেলের মুখের দিকে চেয়ে থাকত···খেতে দিলে খেত না—কেউ কথা কইলে কথার উত্তর দিত না··শুধু বড় বড় চোখ করে তার দিকে চেয়ে থাকত। রাত্রে ঘরের আশে পাশে কার পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যেত···কে যেন অধৈর্য ভাবে পায়চারী করছে···দরজা পর্যন্ত এসে থমকে যেত সে পদধ্বনি! (আগামীবারে সমাপ্য)

সদাচপল জীবেন বসু—

★

রবিবার ২৫শে জুলাই—সকাল সাতটায় সম্পাদক তলপ করেছেন তাঁর বাড়ীতে—শুধু আমাকেই নয়, কর্মাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডল ও তাঁর নিজস্ব সহকারী শ্রীমান মহেন্দ্র গুপ্তকেও। আমাকে কেবল বলে দিলেন, আমার 'লেজার বুকটা' নিয়ে যেতে। 'লেজার বুকটা'র একটু ইতিহাস আছে। আমার দপ্তরের বাঁধানো খাতাটিকে ঐ নামেই ওরা অভিহিত করে থাকেন। কারণ, ওর ভিতর নাকি সব কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়। লেজার বুক নিয়ে হাজির হ'তে বলায় উদ্দেশ্যটাকে অনুমান করে নিতে বেশী বেগ পেতে হ'লো না। তবে মনে খটকা লেগে গেল—কার জন্য প্রয়োজন হবে ঐ খাতাটির? কারণ, গত সংখ্যা মুদ্রণের শেষমুহূর্তেও আমি কারো সংস্পর্শে আসতে পারিনি—পারিনি আমার নিজের শৈথিল্যের জন্য নয়—সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আত্মম্ভরিতার জন্য। শ্রীপার্থিবের দপ্তর সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে যে অভিযোগ আসে, গত সংখ্যার সংবাদ পরিবেশনের ভিতর—আমাদের ভারপ্রাপ্ত সদস্য এ বিষয়ে যথাসম্ভব তার উত্তর দিয়েছেন এবং যে পরিকল্পনানুযায়ী আমরা এখন থেকে শিল্পী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাতের ব্যবস্থা কচ্ছি—সেই অনুযায়ীই সংশ্লিষ্টদের কাছে পত্র পাঠানো হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এঁদের ভিতর অনেকে আমাদের পত্রের উত্তর দেবার সৌজন্যটুকুরও পরিচয় দিতে পারেননি—দুঃখ হয়, আবার এঁরাই যখন আসেন অভিযোগ নিয়ে। সবাই যে এ দলের নন, তার প্রমাণ পেলাম তখন, যখন সম্পাদক 'লেজার বুক' নিয়ে আমার হাজির হ'তে বল্লেন।

আমরা বসে কয়েক কাপ কফি শেষ করবার পর একটা ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে প্রথমেই বেরিয়ে এলো শ্রীমান কমল চাটুজ্জে—আমরা যাকে কমল চা' বলি। তাঁর পিছনে পিছনে হেলতে দুলতে যিনি এলেন—বহু চিত্রে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ হ'লেও ইতিপূর্বে আলাপ করবার সুযোগ হ'য়ে ওঠেনি। সম্পাদকেরও নয়—তাই কমল চা' ওর সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে যখন বলতে যাচ্ছিল: জীবেন দা' মানে জীবেন বসু" আমি বাধা দিয়ে বল্লাম: থাক, ওর পরিচয় আর দিতে হবে না—চলুন আমরা যেয়ে ভিতরে বসি। রবিবার—ভিড় জমে উঠলে আর রক্ষা নেই।" আমরা যেয়ে বসলাম। রাস্তার ধারে ঘর—রাস্তা দিয়ে কত প্রয়োজনে কতজনেই না যাতায়াত কচ্ছেন। কেউ বাজারে চলেছেন হাতে থলি—কারোর হাতে রাশন কার্ড—কেউ চলেছেন কয়লার দোকানের উদ্দেশ্যে—সকলেই একবার করে জানলার কাছে উঁকি মেরে যাচ্ছেন—পাড়ার ভায়াস্থানীয় বন্ধুরা গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকে এসে আমাদের চোখে চোখে চোখ মেরে যেতে লাগলেন। সরস কৌতুকে জীবেন বসু মুহূর্তের মাঝেই আমাদের জমিয়ে ফেল্লেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে, এপ্রিল মাসে, ৭বি বেলতলা রোডের পৈতৃক বাড়ীতে অভিনেতা জীবেন বসুর জন্ম হয়। শ্রীযুক্ত বসুর পিতা স্বর্গতঃ ডাঃ যতীন্দ্র নাথ বসু ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মারা যান। বারোটি ভাই-বোনের ভিতর একজন অল্প বয়সেই মারা যায়। বাকী ১১ জনের ভিতর জীবেন সপ্তম। জীবনের বাল্যবয়সের শিক্ষা আরম্ভ হয় সেণ্টমেরী স্কুলে। সেখান থেকে পদ্মপুকুর স্কুলে প্রবেশিকা পরীক্ষার সংগে সংগেই জীবেনের উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত হয়। জীবেন যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, তখন সর্বপ্রথম নাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে। এই অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের সংকটত্রাণ সমিতির সাহায্যকল্পে। এই অভিনয় থেকেই অভিনয়ের প্রতি জীবেন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে। কবিগুরুর 'বিসর্জন' নাটকটী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে অভিনীত হ'য়েছিল এবং জীবেন আত্মপ্রকাশ করেছিল 'কানুর' ভূমিকায়। 'কানু'র চরিত্রাভিনয়ে যতটুকু কৃতিত্ব দেখাবার ছিল—জীবেন তাতে কোন দুর্বলতারই পরিচয় দেয়নি। পাঠ্যাবস্থায় মেধাবী ছাত্র বলে জীবেন শুধু আত্মীয়-স্বজনের প্রশংসা ও উৎসাহই পায়নি—বিদ্যালয়ে ও ছাত্র-মহলেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং শিক্ষকদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হ'য়েছিল। প্রতিটি পরীক্ষাতেই সে দ্বিতীয়
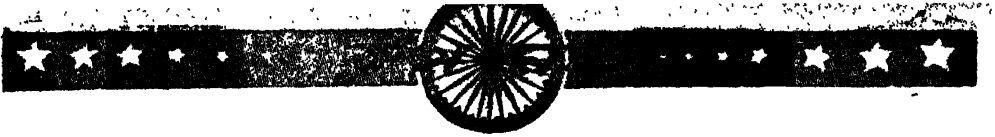
অথবা তৃতীয় স্থান লাভ করতো। কিন্তু পাঠ্যাবস্থায় অভিনয় স্পৃহা তাঁর মনে এতই প্রবল হ'য়ে উঠতে থাকে যে, ধীরে ধীরে পড়াশুনার চেয়ে অভিনয়ের প্রতিই সে গভীর মনোনিবেশ করতে থাকে। প্রথম শ্রেণীতে উঠবার সংগে সংগেই সে চলচ্চিত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন নির্বাক ছায়াছবির যুগ। জীবেন সর্বপ্রথম "আঁখিজল' চিত্রে অংশ গ্রহণ করে। 'আঁখিজল' যথাক্রমে প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছিলেন বেহালার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র রায় এবং দাস ষ্টুডিওর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস। জীবেনের পরবর্তী নির্বাক ছবি 'বৃন্দাবন ধাম'। 'বৃন্দাবন ধাম' পরিচালনা করেন স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল। সম্ভবতঃ এই চিত্রখানি শেষ পর্যন্ত আর আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি। বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে পালিয়ে জীবেন এতদিন অভিনয় করে আসতো। বাড়ীর অনেকেই এবিষয়ে কোন খোঁজ রাখতেন না। কিন্তু বিষয়টি আর বেশী দিন চাপা থাকেনি। ধীরে ধীরে আত্মীয় স্বজনের কানে যেয়ে ওঠে। জীবেনের বাবাও সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পেরে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন। জীবেনকে সামনে ডেকে একদিন খুব ধমকে বললেন: তোমার যে এত গুণ হ'য়েছে, তাত জানতাম না! যাক বাবা! দরকার নেই তোমার পড়ে। যেটুকু করেছো খুব হ'য়েছে—তোমার দৌড়টা বুঝলাম। আর অযথা আমার অন্ন ধ্বংস করে লাভ নেই—এবার অন্নের যোগাড়ে লেগে পড়ো।" জীবেনের এক দাদা 'নিউমেটিক ষ্টুল কম্পানী' নামে একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন—জীবেন এখানেই বাবা এবং দাদার ইচ্ছায় শিক্ষানবীশ রূপে যোগদান করলো। ছোট বেলা থেকেই মেধাবী ছাত্র বলে যেমনি সকলের প্রশংসা পেয়ে জীবেন ধন্য হ'য়ে উঠেছিল, তেমনি 'গোঁয়ার গোবিন্দ' বিশেষণেও ভূষিত হ'য়ে ওঠে। অবশ্য তাঁর এই গোঁয়ার্তুমী কোনদিনই কোন হীন কার্যের ভিতর দিয়ে বিকশিত হ'য়ে ওঠেনি। জীবেনের সমবয়সী ছেলেরা যে দুঃসাহসিক কার্যে পিছু হ'টে যেত—সে সব ক্ষেত্রে জীবেন সকলকে ঠেলে যেয়ে পুরোভাগে দাঁড়াতো। যে কাজ অন্যের পক্ষে বিরাট সমস্যা রূপে দেখা দিত, জীবেন অতি সহজেই তার সমাধান করে ফেলতো। তাই স্বার্থপরদের ভাষায় যাকে বলা হ'য়ে থাকে, 'বেগার খাটুনী'—সে খাটুনীতে কোন সময়ই জীবেন পিছু হটতো না। সকলের সকল বোঝা সহাস্যে খুশী মনে জীবেন মাথা পেতে গ্রহণ করতো। জীবেনের চরিত্রের আর একটী দিক ছোট বেলা থেকেই যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—সেটি হ'লো কোন অন্যায়ই কোনদিন সে সহ্য করতে পারতো না। স্বজাতি প্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতি এই সময় থেকেই জীবেনের মনটাকে জুড়ে বসে। দেশ এবং দেশবাসী সম্পর্কে কোন প্রকার অসম্মানকর উক্তি সে সহ্য করতে পারতো না। রুদ্র মূর্তি নিয়ে সে-অসম্মানের সামনে রুখে দাঁড়াতো। এর পরম বিকাশ দেখতে পাওয়া যায় তাঁর কর্ম জীবনে। যে বৈদেশিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে জীবেন এবং তাঁর দাদা কাজ করতেন, সেখানে 'গোয়েই' নামে এক উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ মিঃ গোয়েইর আত্মীয় ছিলেন। মিঃ গোয়েইর কথাবার্তা ও ব্যবহারে বাঙ্গালী বিদ্বেষী মনোভাব প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক বাঙ্গালী কর্মচারীদেরই খুব পীড়া দিত। কিন্তু চাকরীর মায়ায় কেউ কোন দিন তার প্রতিবাদ করতে সাহসী হন নি। জীবেন প্রথম প্রথম মিঃ গোয়েইর হাবভাব শুধু লক্ষ্য করে চলতো, মিঃ গোয়েইর সংস্পর্শে যখনই আসতো, ইচ্ছা করেই 'থোড়াই কেয়ার করি' এই ভাবটা তাঁর ব্যবহারে ফুটিয়ে তুলতো। একদিন মিঃ গোয়েইর বাঙ্গালী বিদ্বেষী মনোভাব যখন চরম রূপ নিয়ে জীবেনের কাছে ধরা দিল—জীবেন উদ্যত মুষ্টিতে চোখ রাঙিয়ে তাকে শাসিয়ে বললো: সাবধান, ফের যদি মুখ সামলে কথা না বলো—তোমায় উচিত শিক্ষা দেবো।" মিঃ গোয়েই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো—"ব্যাটা ভেতো বাঙ্গালীর বাচ্চা, তার তেজ দেখো।"

জীবেন নিজেকে আর সামলে নিতে পারলো না। দেহ ও মনে যতখানি শক্তি সংগ্রহ করতে পারলো—বিনা দ্বিধায় মিঃ গোয়েইর উপর প্রয়োগ করলো। বলাই বৃথা, চাকরীটি আর তাঁর রইল না। বাড়ীতে-গ্যাঁট হ'য়ে এসে বসে পড়লো। প্রায় এক বছর তাঁকে ভূতের ব্যাগার খেটেই কাটাতে হ'লো। এই সময় তাঁর বাবাও অসুস্থ

হ'য়ে পড়েন। তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হন জীবেন 'ভূতের বেগারে'র মাঝেও অসুস্থ পিতার সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিল। উদার উচ্ছৃঙ্খল ছেলের ঐকান্তিক সেবা ও পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে রোগাক্রান্ত পিতার পাণ্ডুর চোখ দুটী জলে ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে তিনি শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। সে নিশ্বাস তাঁকে পরম শান্তিই এনে দেয় ১ ৭২ খৃষ্টাব্দে জীবেনের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর জীবেন নবনাট্য মন্দিরে যোগদান করে।

শিল্প জীবনের প্রবেশ পথে জীবেনকে সব সময়ই তাঁর ভাগ্য সাহায্য করে এসেছে। যে বাধা বিপত্তি অনেকের সামনে অবরোধের রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, জীবেনের অভিনেতা জীবনের প্রবেশ পথে কোন দিনই এমন কোন বিরাট বাধা দেখা দেয়নি। বরং প্রতিটি সুযোগই সহজ ভাবে এসে যেন তাঁর সামনে ধরা দিয়েছে। নির্বাক যুগেও তাই নাট্য মঞ্চে যোগদানের সুযোগ থেকে জীবেন বঞ্চিত হয়নি তখন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে কেবল মাত্র নব নাট্য মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন শুধু কলিকাতাই নয়, সমগ্র বাংলা দেশ শিশির-প্রতিভায় ঝলমলিয়ে উঠেছে— ভারতের বিভিন্ন স্থানেও শিশিরকুমারের নাট্য প্রতিভার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। নবনাট্যমন্দিরে 'সীতা'র অভিনয় মহানগরীর জনসমুদ্রকে আন্দোলিত করে তুলেছে। জীবেন একদিন ট্রামে চড়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিল—সীতার প্রাচীরপত্র তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—নব নাট্য-মন্দিরের কাছে আসতেই ট্রাম থেকে নেমে পড়লো। নাট্য মঞ্চের প্রবেশ পথ দিয়ে নিছক খেয়ালের বশবর্তী হয়েই পা বাড়ালো। শিশির কুমারের অন্যতম ভ্রাতা ঋষি ভাদুড়ী মহাশয়ের সংগে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ হ'লো। জীবেন তাঁকে বল্ল: আমি নাট্যাচার্যের সংগে দেখা করতে চাই।" ঋষিবাবু একটা স্লিপে তাঁর নাম লিখে দিতে বল্লেন। জীবেন নাট্যাচার্যের সংগে সাক্ষাৎ করবার অনুমতি চেয়ে কম্পিত হস্তে তার নাম লিখে দিল। কিছুক্ষণ বাদে একটা লোক এসে স্লিপটি ওর হাতে দিয়ে গেল। নাট্যাচার্য জীবেনকে ডেকে পাঠালেন— এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে পরের দিন সাক্ষাত করতে বললেন। পরের দিন যথানির্দিষ্ট সময়ে জীবেন শিশির কুমারের কাছে যেয়ে হাজির হ'লো। সেখানে বহুজন পরিবৃত হ'য়ে নাট্যাচার্যকে দেখতে পেল। নাট্যজগতের বহু প্রখ্যাত জনকেই জীবেন সেখানে চিনতে পারলো জীবেন এক পাশে চুপটি করে বসে রইল কিছুক্ষণ বাদে অন্যান্যেরা চলে যাবার পর শিশিরকুমার জীবেনকে ডেকে বল্লেন: মনে করেছো আমি তোমায় লক্ষ্য করিনি কেমন! আমি সব লক্ষ্য করেছি জীবন কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করলো। শিশিরকুমার জীবেনকে রিহার্সেল রুমে নিয়ে তাঁর সামনে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি মঞ্চে অভিনয় করতে চাইছো কেন? না না সে হ'তে পারে না—এত অল্প বয়সে এদিকে আসা ত উচিৎ হবে না আমি তোমায় এপথে নামাতে পারবো না। জীবেন নাছোড়বান্দা— সাক্ষাতের সুযোগ যখন মিলেছে, তখন কী আর ছাড়ে! ও নানাভাবে শিশির কুমারকে বোঝাতে চাইলে যে এ পথে সে উন্নতি করতে পারবে—আর তার এতে কোন খারাপই হবে না—যদি শিশিরকুমার ওকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন তবে নিশ্চয়ই সে উন্নতি লাভ করবে। শিশির কুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন: কোন কবিতা মুখস্ত আছে?

জীবেন উত্তর দিল: আছে নাট্যাচার্য বল্লেন: আবৃত্তি করতো! জীবন কবিগুরুর "শিবাজী" কবিতাটি আবৃত্তি করলো। আবৃত্তির পর শিশিরকুমার জীবেনকে মাঝে মাঝে আসবার ও মহলা শুনবার পরামর্শ দিলেন। তখন জীবেনের বয়স মাত্র ষোল বৎসর, তাই শিশির কুমারকে প্রণাম জানিয়ে জীবেন যখন চলে আসছিল, নাট্যাচার্য আবার তাকে হুসিয়ার করে দিয়ে বল্লেন: দেখো, এত কম বয়সে তুমি এদিকে আসো, আমি তা চাই না। বাড়ী যেয়ে ভেবে দেখ।"

একবৎসর ধরে জীবেন শিশির কুমারের কাছে যাতায়াত করতে থাকে। শিশিরকুমার কাজের মাঝেও ওকে লক্ষ্য করেন। কাজের ফাঁকে ওকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। জীবেনের

নিষ্ঠা ও আগ্রহ হয়ত শিশির কুমারকে খুশী করতে পেরেছিল, তাই একবৎসর বাদে নিজ সম্প্রদায়ে তাকে গ্রহণ করলেন। এবং হাত খরচা বাবদ জীবেনের ভাতা ঠিক করে দিলেন মাসিক কুড়ি টাকা করে। জীবেন প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পায় 'সীতা' নাটকের ভরত চরিত্রে এবং আরো বিভিন্ন নাটকে ছোট ছোট অংশ গ্রহণ করতে থাকে। তার ভিতর সরমা, বিজয়া, শ্যামা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্যামা নাটকে জীবেন একটি বড় ভূমিকাভিনয়ের সুযোগ লাভ করে। এবং তার অভিনয় শিশির কুমারের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় না। যোগাযোগ ও বীতিমত নাটক অভিনীত হবার পর নব নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যায়। জীবেন এই দুই নাটকেও অংশ গ্রহণ করেছিল। নব নাট্যমন্দির বন্ধ হয়ে যাওয়াতেও জীবেন নিজেকে শিশিরকুমারের সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় নি। এই সময় শিশির-সাম্প্রদায় ভ্রাম্যমান নাট্য-সম্প্রদায়ে রূপান্তরীত হয়। কিছু দিনের জন্য জীবেন এই ভ্রাম্যমান অবস্থাতেও শিশিরসম্প্রদায়ের সংগে জড়িত ছিল। অভিনেতা জীবনের প্রারম্ভ থেকে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর জীবেনের কেটেছে শিশিরকুমার ও তাঁর সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। অভিনেতা জীবনে যতটুকু অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য জীবেন আয়ত্ত করেছে, সেজন্য সে তার শ্রদ্ধেয় বড়দা—নাট্যাচার্য শিশির কুমারের কাছেই কৃতজ্ঞ। নূতন ভাবে শিশিরকুমার যখন শ্রীরঙ্গমের উদ্বোধন করলেন, জীবেন তখনও তাঁর সংগে যোগদান করতে বিন্দু-মাত্র শৈথিল্যের পরিচয় দেয় নি। এখানে জীবনরঙ্গ, উড়োচিঠি, মাইকেল, তাইতো প্রভৃতি নতুন নাটকে এবং অন্যান্য পুরোন নাটকে অংশ গ্রহণ করে। উড়োচিঠি নাটকে ধীরেশের ভূমিকায় জীবেন যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে এই চরিত্রটি তাঁকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। শ্রীরঙ্গম থেকে জীবেন মিনার্ভা নাট্যমঞ্চে যোগদান করে এবং সীতারাম, রাষ্ট্র বিপ্লব, ধাত্রী-পান্না, গৈরিক পতাকা প্রভৃতি আরো বহু পুরোন নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে নাট্যামোদীদের প্রশংসার্জন করে। সবাক চিত্রে জীবেন সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে অন্নপূর্ণার মন্দিরে। নির্বাক চিত্রে ঘোরাঘুরি করে নিজেই নিজের সুযোগ সংগ্রহ করে নিয়েছিল। সবাক যুগে জীবেনকে সর্বপ্রথম সুযোগ দেন শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্তী। তিনকড়ি বাবু জীবেনের পিতৃবন্ধু। জীবেনদের বাড়ীর কাছেই তিনি থাকেন। তাছাড়া জীবেনকে তিনি স্নেহ করেনও যথেষ্ট —আদর করে তাকে 'জীব' বলে ডাকেন। একদিন তিনি বল্লেন, জীব অভিনয়-টভিনয় ত কচ্ছ—চল তোমায় সবাক চিত্রে নামিয়ে দি।" জীবেন কী আর দ্বিধা করবে! নেমে গেল 'অন্নপূর্ণার মন্দির' চিত্রে। এরপর থেকেই পরপর অভিনয় করতে থাকে। জীবেনের অভিনীত চিত্রগুলির ভিতর নাম করা যেতে পারে অন্নপূর্ণার মন্দির, দস্তুরমত টকী, হাল বাংলা, পরশমনি, রিক্তা, পরাজয় (এই সর্ব-প্রথম জীবেন নিউ থিয়েটার্সের চিত্রে অভিনয় করে), মালাবদল, ব্যবধান, শাপমুক্তি, কবি জয়দেব, প্রতিশোধ, মায়ের প্রাণ, শ্রীরাধা, গরমিল, পরিণীতা, মহাকবি কালিদাস, অভিসার, দাবী, পাপের পথে, সমাধান, অল স্টার ট্রাজেডি, উদয়ের পথে, প্রতিকার, বিরিঞ্চিবাবা, বিদেশিনী, শেষরক্ষা, সন্ধ্যা, কতদূর, পথ বেঁধে দিল, এই তো জীবন, নতুন বৌ, সংগ্রাম, সাত নম্বর বাড়ী, স্বপ্ন ও সাধনা, পূর্বরাগ, স্বর্ণসীতা, বঞ্চিতা, স্যার শঙ্করনাথ, তপোভঙ্গ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমানে যেসব চিত্রে জীবেন অভিনয় করছে তার ভিতর উল্লেখযোগ্য পদ্মাপ্রমত্তা নদী, প্রতিরোধ, মন্ত্রমুগ্ধ প্রভৃতি। নিউ থিয়েটার্সের অঞ্জনগড় চিত্রেও জীবেন অভিনয় করেছে—চিত্রখানির কাজ সমাপ্ত হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রে যতগুলি চরিত্রে জীবেন অভিনয় করেছে, সংগ্রামের চরিত্রটাই তাঁকে খুশী করেছে বেশী। তাছাড়া আরো অনেক চরিত্রেই অভিনয় করে জীবেন তৃপ্তি পেয়েছে—আবার অর্থের জন্য এমন অনেক চরিত্রেও তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছে—যেসব চরিত্রে অভিনয় করতে তাঁর মন মোটেই সায় দেয়নি। কৌতুকরসসিক্তিত অথবা 'সিরিও কমিক' চরিত্রে অভিনয় করতে সাধারণতঃ জীবেনের ভাল লাগে। অন্নপূর্ণার মন্দির চিত্রে অভিনয় করে জীবেন সর্বসমেত পারিশ্রমিক বাবদ পায় মাত্র দশ টাকা। একখানি

চিত্রে অভিনয় করবার পারিশ্রমিক এই দশটাকা থেকে প্রায় পাঁচ হাজারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আর মাসিক আয় গড়পড়তায় দাঁড়িয়েছিল ৩,৫০০ হাজার থেকে প্রায় ৭০০০ টাকায়। পুরোন গোষ্ঠীর পরিচালকদের ভিতর জীবেন প্রমথেশ বড়ুয়ার অকুণ্ঠ প্রশংসা করে—তাঁর পরিচালনাধীনে কাজ করে জীবেন খুব খুশী হয়েছে। পরিচালক দেবকী বসুকেও জীবেনের ভাল লাগে। নতুন পরিচালক গোষ্ঠীর ভিতর বিমল রায় ও অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা জীবেনকে খুশী করে। অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথা বলতে যেয়ে জীবেন বলে: অর্ধেন্দু নিজে একজন অভিনেতা ছিল বলে তাঁর পরিচালিত চিত্রে অভিনয়ে খুব কমই খুঁত দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া তাঁর নির্বাচিত শিল্পীরা যথেষ্ট সাহায্য পেয়ে থাকেন অর্ধেন্দুর কাছ থেকে অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে। অবশ্য প্রবীণ ও অভিজ্ঞদের কথা বাদ দিয়েই বলছি। নতুন এবং মাঝারীদের অভিনয়ে যদি কোথাও কোন দুর্বলতা চোখে পড়ে, অর্ধেন্দু তা শুধরে দিতে মোটেই গাফিলতি করেন না। ব্যক্তিগতভাবে আমিও তাঁর কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।" শিশিরকুমারের প্রতি জীবেনের গভীর শ্রদ্ধার কথা পূর্বেই বলেছি। জীবেন শিশিরকুমারকে বড়দা বলে ডাকে। শুধু লৌকিকতার জন্যই নয়—শিশিরকুমারকে সর্ববিষয়ে জ্যেষ্ঠের মতই সে সম্মান করে। অভিনয় প্রতিভার বাইরেও মানুষ শিশিরকুমার জীবেনের কম শ্রদ্ধা অর্জন করেননি। দীর্ঘদিন শিশিরকুমারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে জীবেন তাঁকে নানাভাবে দেখবার ও বিশ্লেষণ করবার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সব সময়ই মানুষ শিশিরকুমার সবকিছুর ঊর্ধ্বে থেকে জীবেনের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। তাই তাঁর সম্পর্কে কোন কিছু বলতে যেয়ে মুখের কথা দিয়ে জীবেন সে বলাকে শেষ করতে চায় না। অন্তরের জিনিষ, অন্তরেই চেপে রাখতে চায়।

কম মাইনের শিল্পী ও কর্মিদের প্রতি জীবেনের আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে। তাঁদের সুখ-দুঃখ জীবেনের মনে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিল্পীদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য সে জীবনবীমা বা ঐ ধরণের কোন সংস্থানের পক্ষপাতি। কারণ, বৃদ্ধ বয়সে অথবা রোগাক্রান্ত হয়ে অনেক সময় অনেক শিল্পীকে যে শোচনীয়তার সম্মুখীন হ'তে হয়, ব্যক্তিগতভাবে একাধিকবার সে শোচনীয় পরিস্থিতি পরিলক্ষণ করবার দুর্ভাগ্য জীবেনের হয়েছে বলেই, সে অনুরূপ কোন সংস্থানের পক্ষপাতি। এই প্রসংগে সে স্বর্গত সুহাস কর নামে একজন শিল্পীকে শোচনীয় ভাবে মারা যেতে দেখেছে—সে কথা উল্লেখ করে। স্বর্গত কর নব নাট্য মন্দির থেকেই শিশির সম্প্রদায়ের সংগে জড়িত ছিলেন এবং বিভিন্ন নাটকে ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতেন। দীর্ঘদিন তিনি শিশির সম্প্রদায়ে অভিনয় করেন। অল্প উপার্জনে সংসার চলতো না—তারপর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। বিনা চিকিৎসায়—বিনা পথ্যে নিজের জীবন তিলে তিলে বিসর্জন দিলেন। দু'বৎসরের মাইনে তাঁর তখনও বাকী পড়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে। দেহটাকে যতক্ষণ টেনে চলবার শক্তি ছিল—শেষ দিন পর্যন্ত ভিক্ষুকের মত প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিশির কুমারের অন্যতম ভ্রাতা ঋষি ভাদুড়ীর কাছে—কারণ, এসব বিষয়ে সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁর উপরই ন্যাস্ত ছিল। এবং শিশির বাবুর কানে এসব কথা পৌছবার কোন উপায়ই থাকতো না অনেক সময়। পুরো দু'বছরের মাহিনা বাকী থাকা সত্বেও বার বার সুহাসকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আসতে হ'য়েছে। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে নিজেকে সপে দিয়ে সমস্ত যন্ত্রণা থেকে সুহাস রেহাই পেয়ে যান। শিল্পীদের এই শোচনীয় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই জীবেন শিল্পী সংঘের প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে যথেষ্ট আগ্রহ এবং কর্মতৎপরতার পরিচয় দেয়। কিন্তু শিল্পী সংঘের প্রচেষ্টায় আরো অনেক শিল্পীর মত জীবেনেরও যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। অভিনেতাদের ভিতর ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় জীবেনকে খুবই খুশী করে। অভিনেত্রীদের ভিতর মলিনার অভিনয় নৈপুণ্যে জীবেন মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। বাংলা ছবি জীবেন খুব কমই দেখে—এমন কী নিজের অভিনীত অনেক ছবিও সে দেখে উঠতে পারেনি। ইংরেজী ছবির সে একজন পোকা। কোন ভাল ইংরেজী ছবিই জীবেনের অদেখা থাকে না। জীবেনের 'হবি'র মধ্যে ইংরেজী ছবি দেখা আর বই
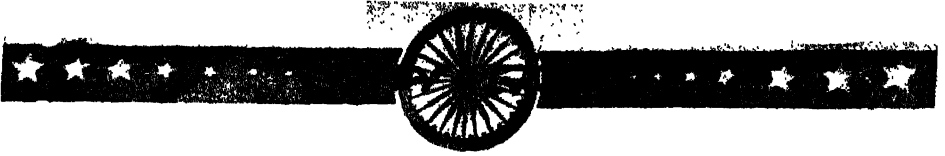
পড়া। খেলাধূলার ভিতর ছোট বেলায় জীবেনের ক্রিকেটের প্রতি ভয়ানক ঝোঁক ছিল। বন্ধু-বান্ধব মহলে এ বিষয়ে সুনামও অর্জন করেছিল। কিন্তু বর্তমানে তাঁর খেলাধূলার প্রতি কোন আকর্ষণই নেই। বরং অভিনয়ের বাইরে ব্যবসায়ী বুদ্ধি জীবেনের মাথায় আজকাল একটু আধটু খেলছে। গ্রাণ্ট ষ্ট্রীটে সে একটী ছোট কাপড়ের দোকান ক্রয় করেছে এবং তা থেকে পকেটে বেশ কিছু যাওয়া আসা করে। দোকানটি দেখাশুনা করে জীবেনের ছোটভাই। রাজনীতির কচকচানী জীবেনের পছন্দ হয় না। সে সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তাই বলে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্যকলাপ মোটেই অনু-মোদন করে না। গান্ধীবাদে শ্রদ্ধা থাকলেও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মতবাদ জীবেন ভালবাসে। রাজ-নীতির সংগে যদিও জীবেনের কোন যোগাযোগ নেই—তবু পাড়ার বিভিন্ন নীতির সংগে সে জড়িত। তাঁকে এক কথায় পাড়ার পাণ্ডা বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। পাড়ার যে কোন কাজে সব সময় সে এক পায়ে খাড়া থাকে।

নতুন শিল্পীদের প্রতি জীবেনের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। কিন্তু শুধু শিল্পীদের সুযোগ দেওয়াতেই সে খুশী নয়—অভিনয় সম্পর্কে তাঁদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবার জীবেন পক্ষপাতি এবং এজন্য রূপমঞ্চের পরিকল্পিত 'নাট্য-বিদ্যালয়'-এর সাফল্য কামনা করে। সংগীতে জীবেনের ততখানি আগ্রহ নেই। তবে মাঝে মাঝে গান তাঁর ভাল লাগে এবং বর্তমান সংগীত পরিচালকদের ভিতর রবীন চাটুজ্জের সুর তাঁর মন ভরিয়ে দেয়—সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠ মাধুর্যের সে অকুণ্ঠ প্রশংসা করে।

সদালাপী ও নিরভিমান হ'লেও সকলের সংগে আড্ডা দিতে জীবেনের ভাল লাগে না। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলতে চিত্রজগতে কেবলমাত্র অভিনেতা কমল মিত্র ও চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। এঁদের সংগে গল্প গুজবে সারাদিন না খেয়ে কাটিয়ে দিতেও জীবেনের অসুবিধা হয় না। সমস্ত হৈ চৈ থেকে অবসর সময়ে এই তিনটি মন হৈ-চৈ-এ মেতে থেকে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে। জীবেন একজন নিরা-মিষাশী—তাই বলে মাছ মাংস খেলে জাত যাবে—এমন কোন গোঁড়ামীর বশবর্তী নয়। মাছ সে মোটেই খায় না, মাংস মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে খেয়ে থাকে। পান দোষ জীবেনের মোটেই নেই—পান খায়ও না—পান করেও না—এমন কী চা'ও নয়। জীবেন এখন পর্যন্ত বিয়ে করেনি। বিবাহিত জীবনের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। পরিজনবর্গের ভিতর সে সর্বজনপ্রিয়।

জীবেন রূপ-মঞ্চের একজন নিয়মিত পাঠক ও গ্রাহক। নিজের প্রতি তাঁর যতখানি বিশ্বাস আছে—রূপমঞ্চের প্রতিও ততখানিই তাঁর বিশ্বাস। তাই রূপ-মঞ্চের প্রশং-সাকে যেমনি সশ্রদ্ধ ভাবে মাথা পেতে নেয়—রূপ-মঞ্চের নিন্দাবাদ তাঁর কাছে তেমনি ততখানি গুরুত্বপূর্ণ।

—শ্রীপার্থিব।

সমালোচনা, চিত্রসংবাদ ও নানাকথা

কালিন্দী—

কয়েক বৎসর পূর্বে বোধ হয় কোন ছাত্র-সমাজের অভিনয়ের জন্য 'কালিন্দী' উপন্যাসটি নাটকে রূপায়িত হয়েছিল, এবং এই অভিনয় দেখবার জন্য আমি আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এই অভিনয় দেখে যে অতৃপ্তি নিয়েই ঘরে ফিরেছিলাম, তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, উপন্যাসটির নাটকীয় রূপান্তর সাধনটী পর্যাপ্ত ও যথাযথ হয়নি।

কালিন্দী উপন্যাসটি পড়বার ও সমালোচনা করার সময় আমার মনে হয়েছিল যে, এর মধ্যে নাটকীয় সম্ভাবনা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও উপন্যাসের মধ্যে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে নি। অবশ্য উপন্যাসে নাটকীয় রস যদি পূর্ণ ভাবে ঘনীভূত না হয়, তাতে উপন্যাস হিসাবে তার বিশেষ অপরাধ হয় না। কিন্তু নাট্যরূপ দেবার সময়ই এর এই ত্রুটি ও অপূর্ণতা বিশেষ করে চোখে ঠেকে। অতীতকালে উপন্যাসটির এই নাটকীয় রূপ দেখেই আমি এই ত্রুটি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম।

কালিন্দী উপন্যাসে যে বিষয়ে নাটকীয় অপূর্ণতা বিশেষ ভাবে লক্ষ্যগোচর হয়, তা হচ্ছে, কালিন্দীর চরের কেন্দ্রীয়তা বিশেষ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেনি। হার্ডির "Return of the Native" উপন্যাসে Egdon Heathএর যে ক্রূর, নির্মম সাংকেতিকতা ফুটে উঠেছে, কালিন্দীর চরের সম্বন্ধেও লেখকের অনুরূপ পরিকল্পনাটী মাঝে মধ্যে ব্যঞ্জিত হলেও নিশ্ছিদ্র অনবদ্য সমগ্রতা লাভ করতে পারেনি। কালিন্দীর চরে যে চক্রবর্তী পরিবারের অদৃষ্টের নিয়তি নির্দিষ্ট, শোকাবহ পরীক্ষা ক্ষেত্র, পরিবারের ইতিহাসের সহিত নিগূঢ়, অমোঘ বন্ধনে জড়িত, এক অতন্দ্র ন্যায় বিধানের অভ্রপ্রতিষ্ঠার লীলাভূমি—এই সত্যের আভাস উপন্যাসের মধ্যে একটী স্বপ্রকাশ ভাস্বরতা লাভ করেনি। চর থেকে সাঁওতালদের উচ্ছেদ, সারীর অবমাননা, কল-ওয়ালার ঔদ্ধত্য ও যথেচ্ছাচার—এই সমস্তবিচ্ছিন্ন সূত্রগুলিকে গ্রন্থিবদ্ধ করা হয় নি। অহীনের বৈপ্লবিক দলে যোগও চরের মাটির সংগে সংশ্লিষ্টরূপে দেখান হয় নি। তার সাঁওতাল প্রদত্ত অভিধান 'রাঙ্গা ঠাকুরের নাতি রাঙ্গা বাবুও' তার তপ্ত কাঞ্চননিভ গৌরবর্ণ ছাড়া তার অন্তঃপ্রকৃতির কোন নিগূঢ়তর পরিচয় বহন করে না। তারপর চক্রবর্তী পরিবারের সমস্ত দুর্দশা যে রামেশ্বরের মহাপাতকের অপ্রতিবিধেয় ফল, উভয়ের মধ্যে যে অমোঘ কার্য কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান তারও ইংগিত, বিশেষতঃ রামেশ্বরের পূর্ব ইতিহাস, উপন্যাসে অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এই সম্বন্ধে ক্ষীণ আভাস আমাদের মনে মাঝে মধ্যে জেগে ওঠে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় প্রতীতিতে পরিণত হয় না। কেন্দ্রসংহতির অপরিস্ফুটতা, বিচ্ছিন্ন সূত্রের গ্রন্থন-শৈথিল্য ও অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের ভিড় উপন্যাসে অন্তর্নিহিত নাট্যরসটীর ঘনীভূত হবার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে।

সুতরাং পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রসূত খানিকটা সংশয় নিয়েই ষ্টারে এই নবপর্যায়ের নাট্যরূপ দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে পুলকিত বিস্ময়ের সংগে আবিষ্কার করলাম যে, আমার সমস্ত আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে উপন্যাসের সমস্ত দুর্বলতাকে পরিহার করেছেন ও এর নাটকীয় উপাদানগুলিকে পূর্ণমাত্রায় প্রকট করে তুলেছেন। নিপুণ মণিকার যেমন খনির মণিকে পরিষ্কৃত করে তার উজ্জ্বলতাকে পরিস্ফুট করেন ও এ থেকে নূতন রকমের অলঙ্কার গড়ে তোলেন, লেখকও অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে উপন্যাসকে সুষ্ঠু-ভাবে নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। যাহা অপস্ফুট ছিল, তা পরিস্ফুট হয়েছে; যা শিথিল ছিল তা দৃঢ়বদ্ধ সংহতির হেতু হয়েছে; যা অসম্বদ্ধ ছিল তা নিবিড় সংশ্লেষে আখ্যায়িকার মর্মবাণীর অংগীভূত হয়েছে। নাট্যকার উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস বিশেষ সাহসিকতার সহিত নিজ উদ্দেশ্য অনুযায়ী আমূল পরিবর্তন করেছেন। উপন্যাসের ঘটনাবলীর মন্থরপাদচারণা ও বিসর্পিত অগ্রগতি নাটকে দ্রুততর প্রাণবেগচঞ্চল হয়ে উঠেছে;—অবান্তরের বর্জনে ও স্থির লক্ষ্যের আকর্ষণে নাটক গতিবেগ ও কেন্দ্রমুখীনতা আহরণ করেছে।

নাটকটীর আরম্ভ হয়েছে সাঁওতালদের নৃত্যগীত দিয়ে। উপন্যাসে সাঁওতালরা অনেকটা অনাবশ্যক প্রক্ষেপ মাত্র।

চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত সাক্ষীগোপালের অপূর্ব মাহাত্ম্য নিয়ে বলাই
... পাচাল প্রযোজিত বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন! —

সাক্ষীগোপাল

পরিচালনা :

চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও
গৌর সী

সংগীত পরিচালনা :

বলাই চট্টোপাধ্যায়

সাক্ষীগোপাল

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : গৌর সী * ব্যবস্থাপনা : অমর মান্না (এ্যাঃ)

●

সাক্ষীগোপাল

পুরী ও ভুবনেশ্বরের মাঝামাঝি বিস্তানগর গ্রামে বড় মিশ্র ও ছোটমিশ্র নামে দুই ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বড় মিশ্র ধনী আর ছোট মিশ্র দরিদ্র। দু'জনে একসংগে তীর্থ-পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। বড় মিশ্র পথিমধ্যে একটী মন্দিরে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। ছোট মিশ্র প্রাণ ঢেলে সেবা করে তাঁকে আরোগ্য করে তোলেন। সেবার প্রতিদানে নিজের কন্যাকে ছোট মিশ্রকে দান করবেন বলে বড় মিশ্র প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু গৃহে ফিরে এসে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদেব পরামর্শে বড় মিশ্র তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন। বরং তাঁর অনুগত গ্রামবাসীরা সভা ডেকে ছোট মিশ্রকে অপমান করে এবং ব্যঙ্গ করে বলে : মিছেমিছি প্রতিশ্রুতি ভংগের অভিযোগ আনছো কেন? তোমার মত গরীবের কাছে ও কন্যাদান করতে যাবে কেন? বেশ, কোন সাক্ষী আছে তোমার? ছোট মিশ্র চিন্তিত হ'য়ে পড়েন! তাইত! কে তার হ'য়ে সাক্ষ্য দেবে। আর সেখানেত আর কেউ ছিল না! অভিমানে তিনি ছুটে যান সেই দেব মন্দিরে। সাক্ষী একজন আছেন বৈকী? মাথা খুঁড়তে থাকে দেবতার পায়ে, 'তুমি ছাড়াত আর কোন সাক্ষী ছিল না! তুমিই শুনেছো সব কথা। তুমি যদি সত্যের প্রতিপালক হও--আমার হ'য়ে কী তুমি সাক্ষ্য দিতে আসবে না! যদি না আসো—তোমারই পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো। 'ছোট মিশ্রের আকুল আর্তনাদে মন্দিরের দেবতা বিচলিত হ'য়ে পড়েন — তিনি যে সত্যই সত্যের প্রতিপালক, সেকথা প্রমাণ করবার জন্য ছোট মিশ্রের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না। এই অপূর্ব দেব-মাহাত্ম্যের কথা নিয়েই গড়ে উঠেছে সাক্ষীগোপালের গল্পাংশ। — — —

★

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে :

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় : ঝর্ণা দেবী : তুলসী চক্র : গৌর সী
দুলাল দত্ত : বলাই চট্টো : অনুপকুমার : বলাই : হারাধন : অমর : প্রভৃতি

—ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রখানির প্রস্তুতি চলছে—

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন : দক্ষিণ ব্যাঁটরা : হাওড়া

উপন্যাসের মূল ঘটনার সংগে এদের যোগসূত্র অতি সামান্য। কলওয়ালার চক্রান্তে তারা চর ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়েছে বিনা প্রতিবাদে; সারীকে রেখে গিয়েছে আপনাদের পরাজয় কলঙ্কের চিহ্ন স্বরূপ। চর তাদিকে যেমন নিরাসক্ত ভাবে আকর্ষণ করছিল, তেমনি নির্মম ভাবে প্রত্যাখান করেছে। নাটকে কিন্তু চরের মাটির সংগে তাদের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয় নি। তাদের অপহৃত নারীমর্যাদা কলঙ্কিত জীবন থেকে মৃত্যুর পাবন ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সাঁওতালরা নির্বিবাদে স্থান ত্যাগ না করে প্রতিশোধ নিয়েছে। রাঙাবাবুর সংগে তাদের সম্বন্ধ অকস্মাৎ উৎসারিত ভাবাবেশমূলক ভিত্তি থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র রক্তদানের নিবিড় আত্মীয়তায় উন্নীত হয়েছে। যবনিকার অন্তরাল থেকে ধ্বনিত বাঁশীর সুর যেন নাটকের আকাশে বাতাসে সর্বনাশ আমন্ত্রণের মন্ত্ররূপে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ঔপন্যাসিক আকৃষ্ট হয়েছিল সাঁওতাল জীবন যাত্রার অপরিচিত চিত্র সৌন্দর্যে। নাট্যকার এর বিস্ফোরক শক্তিকে নাটকের কাজে লাগিয়েছে।

দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটেছে কালিন্দীর চরের কেন্দ্রিকতা ও অভিশপ্ত প্রেরণা নিয়ে। এটি উপন্যাসে অস্ফুট ছিল, নাটকে স্পষ্ট হয়েছে। এই চরেই শ্বাসরোধ করে নিহত রাধারাণীর মৃতদেহ প্রোথিত হয়েছে—এই খানেই যে মহাপাতকের অনিবার্য প্রায়শ্চিত্ত নাটকে রূপায়িত হয়েছে তারও বীজ উপ্ত ও অঙ্কুরিত হয়েছে। বালুকা প্রোথিত কঙ্কণের পুনঃরুদ্ধার নিয়তির অমোঘ বিধানের স্মারক ও প্রতীক। এই চরের জন্য বাদপ্রতিবাদে মহীন্দ্রর দীপান্তর। সারীর রক্তপ্লাবিত ও প্রতিহিংসার লেলিহান অগ্নিজিহ্বার দ্বারা বেষ্টিত এই চরের মাটিতেই অহীন্দ্রের আত্মোৎসর্গ ও রামেশ্বরের কর্মফলের নিঃশেষে ক্ষয়। অহীন্দ্রের বৈপ্লবিক কর্মপন্থাকে নাট্যকার কলিকাতার বৈশিষ্ট্যহীন প্রতিবেশ থেকে চরের নিয়তি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে স্থানান্তরীত করে এর ক্রূর, অশুভ সাঙ্কেতিক প্রভাবটি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। কালিন্দীর চর নাটকের মধ্যে সত্যই দৈবরক্ষিত মাইনের মত চক্রবর্তী পরিবারের ভাগ্যতরীকে বার বার ফুটো করে কালগর্ভে নিমজ্জিত করেছে।

রামেশ্বরের অনির্দেশ্য পূর্ব-ইতিহাস উপন্যাসের ছায়ারূপ পরিত্যাগ করে নাটকে কায়ারূপ পরিগ্রহ করেছে। তার মহাপাতকের রোমাঞ্চকর কাহিনীটী তার অসুস্থ মনোবিকারের অতিরঞ্জিত বিভীষিকার মধ্য দিয়ে আগ্নেয় অক্ষরে ফুটে উঠেছে। তার সংস্কৃত কাব্যানুরাগের অনুশীলন নাটকের সংক্ষিপ্ত অবসর ও একান্ততর প্রয়োজনের দ্বারা আয়তনে খর্ব হয়ে তার ভাষার আলঙ্কারিক আতিশয্যে নিজ চিহ্ন মুদ্রিত করেছে। এই অলঙ্কার বহুল, শব্দাড়ম্বর মুখর ভাষার মাধ্যমে তার মনের বিকৃত উত্তেজনা, তার কলুষক্লিষ্ট পূর্বস্মৃতির আর্তনাদ চমৎকার সার্থক অভিব্যক্তি পেয়েছে। নাটকের প্রয়োগ কৌশলে ও নটের অভিনয় নৈপুণ্যে এই চরিত্রটী ছায়াময় প্রেতমূর্তি হতে তীক্ষ্ণ ব্যস্তবতায় উন্নীত হয়েছে।

উপন্যাসটির নাটকীয় অপূর্ণতার একটা প্রমাণ এই যে, একে পূর্ণ নাট্যরূপ দিতে নাট্যকারের অনেক নূতন ঘটনা সংযোজন করতে হয়েছে। নাটকের পরিসমাপ্তিটী এই নূতন সংযোজনার দৃষ্টান্ত। উপন্যাসে অহীন্দ্র নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই সন্ত্রাসবাদের জালে জড়িয়ে গিয়েছে, তার কলিকাতা প্রবাস কালে সমস্ত পরিবারের অগোচরে এই মানস বিপর্যয়টী ঘটেছে। নাটকে সারীর প্রতি অত্যাচারই তাকে এই রক্তাক্ত বিপদ সঙ্কুল পথের পথিক করেছে। ফুলশয্যার রাতে নববিবাহিতা পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণের দৃশ্যটী তার সঙ্কল্পকে করুণ রসে অভিষিক্ত করেছে। সারীর হত্যা, সাঁওতালদের প্রতিহিংসা, অহীন্দ্রের এই অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ, ও পুলিশের দ্বারা গ্রেপ্তার,—এ সমস্তই উপন্যাসের অন্তঃরুদ্ধ আবেগ ও অপরিণত সম্ভাবনাকে বাইরের রূপ দিয়েছে, অস্পষ্ট নীহারিকাকে জ্যোতির্ময় নক্ষত্র মণ্ডলীর সুনির্দিষ্ট রশ্মীবিকীরণে নিয়োজিত করেছে। এইরূপে নাট্যকার নীতিচক্রের পূর্ণ আবর্তন দেখিয়ে পাঠকের মনের প্রত্যাশার প্রমোদহীন পরিতৃপ্তি ঘটিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক চরিত্র সমূহও নাটকীয় পরিবর্তনের মধ্যে নিজ নিজ যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। সাঁওতাল গোষ্ঠী ঘটনার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে অগ্রসর হয়ে তার কেন্দ্রস্থলের

কাছাকাছি সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উপন্যাসে ইন্দ্ররায়ের অতি প্রাধান্য নাটকে সঙ্গত ভাবেই সঙ্কুচিত হয়েছে। সে প্রতি-নায়কের গৌরবময় আসন থেকে নেমে এসে গৌণ চরিত্রের অপেক্ষাকৃত অখ্যাত পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। সেখানে তার আস্ফালন যত, তার কার্যকারিতা তার চেয়ে অনেক কম ছিল; তার বর্ষণ তার গর্জনের অনুরূপ হয়নি। উপন্যাসে ইন্দ্র রায় পাঠকের মনোযোগ অতিরিক্ত মাত্রায় আকর্ষণ করে দৈবাহত চক্রবর্তী পরিবারের কাহিনীর প্রতি তাকে খানিকটা অমনোযোগী করেছিল—এইজন্য তার অন্তর্নিহিত রসটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে সম্পূর্ণ জমাট বাঁধতে পারেনি। নাটকে এই ত্রুটির সংশোধন হয়েছে। অচিন্ত্যবাবু ও শূলপাণি অপ্রাসংগিক থেকে খানিকটা প্রাসংগিকতায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা নাটকের গতিবেগকে কিয়ৎপরিমাণে বর্ধিত করেছে। কমল মাঝিও নাটকের করুণ রস উদ্দীপনে সহায়তা করেছে। উপন্যাসের এই গৌণ চরিত্রগুলির সার্থক প্রয়োগ নাট্যকারের কলাকুশলতার চমৎকার নিদর্শন।

পরিশেষে বাংলা সাহিত্যের একখানি সুপরিচিত উপন্যাসকে এমন অনবদ্য নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য নাট্যকার মহেন্দ্রগুপ্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি কেবল ঔপন্যাসিকের হস্ত-লিপিতে দাগা বুলান নাই, গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত উপন্যাসের মর্মগত নাটকীয় সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেছেন ও প্রশংসনীয় সাহসিকতার সংগে সমস্ত ঘটনা পরম্পরাকে নূতন ভাবে সাজিয়ে এই সম্ভাবনাকে সার্থক করে তুলেছেন। এই নাটকের প্রতি দৃশ্যে দৈবের নিদারুণ অভিশাপের নিগূঢ়লীলা আমাদের অনুভূতিকে আবিষ্ট করেছে। আমরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে যেন একটা অবশ্যম্ভাবী বজ্রপাতের প্রতীক্ষা করেছি। সমস্ত ঘটনাবলী ব্যূহবদ্ধ সৈন্যদলের ন্যায় অনিবার্য পরিণতির দিকে দ্রুত, অথচ নিয়মিত পদক্ষেপে ছুটে চলেছে।

অভিনয়ও নাট্যকৌশলের সংগে সমান তালে পা ফেলে দর্শক-বৃন্দকে এক মোহময় পরিবেশের মধ্যে নিশ্চল করে রেখেছে। নাট্যকার নিজে "রামেশ্বরের" দুরূহ অংশে অবতীর্ণ হয়ে সুষ্ঠু অভিনয়ের দ্বারা তার মনোবিকারের ছবিটা পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ও নাটকের রচনা ও প্রয়োগকৌশল এই উভয়বিধ ক্ষেত্রেই যে তিনি সমান কৃতিত্বের অধিকারী তা দেখিয়েছেন। সাঁওতালগোষ্ঠীর রূপায়ণে রূপসজ্জা, বাচনভংগী উভয়দিকেই স্বাভাবিকতার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। অন্যান্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীবৃন্দও স্ব স্ব অংশ চমৎকারভাবে সম্পাদন করে অভিনয়কে সর্বাংগসুন্দর করে তুলেছেন। নাট্যামোদিগণ যে এই নাটকের অভিনয় দেখে তাঁদের রসবোধের পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করবেন, এ আশ্বাস অকুণ্ঠিত ভাবে তাঁদের দেওয়া যায়। আধুনিক রঙ্গমঞ্চে কালিন্দী যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ দাঁড়াবে, এই অভিমত তার দীর্ঘ কালব্যাপী জনপ্রিয়তা দ্বারা সমর্থিত হবে এই প্রত্যাশাই মনে পোষণ করি। —ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধারণ মেয়ে—

পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী। কাহিনী: পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা: রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায়: ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, তারা ভাদুড়ী, নীতিশ মুখুজ্জে, দীপ্তি রায়, সুপ্রভা, কমলা, কানু বন্দ্যোঃ, হুগ্না, তুলসী প্রভৃতি আরো অনেকে।

ভ্যানগার্ড প্রডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'সাধারণ মেয়ে' গত ১লা জুলাই রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহে এবং ৮ই জুলাই সহরের দক্ষিণভাগে নব নির্মিত প্রেক্ষাগৃহ 'ইন্দিরা'তে মুক্তিলাভ করেছিল। বর্তমান বাংলা ছায়াজগতে যে কয়জন চিত্র পরিচালক তাঁদের প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগী ও উল্লেখযোগ্য শিল্পমনের পরিচয় দিয়ে চিত্রজগতের বন্ধুদের ও চিত্রামোদীদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছেন—তাঁদের ভিতর শ্রীযুক্ত নীরেন লাহিড়ী অন্যতম। তিনি তাঁর প্রতিটি চিত্রেই গতানুগতিক ভাবধারা থেকে নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করে থাকেন। তাই নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় যখনই কোন চিত্র-নির্মাণের সংবাদ ঘোষিত
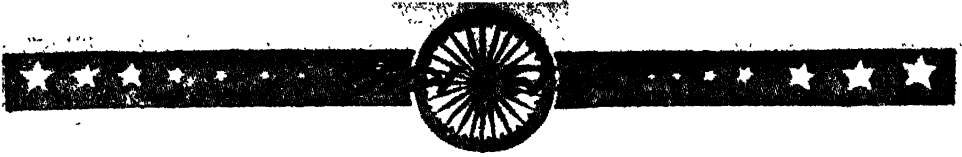
হয়, দর্শকসাধারণের মন স্বতঃই উৎসুক হ'য়ে ওঠে নতুন কিছু পাবার আশায়। 'ভ্যানগার্ডের' প্রথম চিত্র 'জয়-যাত্রা'র কাজ ইতিপূর্বেই সমাপ্ত হ'যে গেছে। সম্ভবতঃ আগামী পূজা মরসুমে চিত্রখানি দর্শকেরা দেখবার সুযোগ পাবেন। ওয়াকীফহাল মহল থেকে প্রচারিত, 'জয়যাত্রা' প্রথম শ্রেণীর চিত্রের দাবী নিয়েই আত্মপ্রকাশ করবে। ভ্যানগার্ডের দ্বিতীয় চিত্র 'সাধারণ মেয়ে' সে দাবী করলে—তার সবখানি দাবী আমরা স্বীকার করে নিতে পারবো না—পরম বেদনার সংগে একথা বলবো।

সাধারণ মেয়ে গড়ে উঠেছে এক অসাধারণ মেয়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামশীল কাহিনী নিয়ে—আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে—যা প্রত্যেক মেয়েকেই তার আদর্শের দ্যুতিতে উদ্বুদ্ধ করবে—আত্ম সচেতন করে তুলবে। এজন্য সাধারণ মেয়েকে তার অসাধারণত্বের জন্য প্রথমেই অভিনন্দন জানিয়ে নেবো। কিন্তু সংগে সংগে একথাও বলবো—এই আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা নারীত্বের স্বাভাবিক প্রেরণা থেকে আসেনি—এসেছে অভিমান ও জেদ থেকে এবং এই নারী চরিত্রকে অসাধারণ করে আঁকবার জন্য তার বিপরীত পুরুষ চরিত্রটি অসম্ভব রূপে দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। অথচ তার ভিতর প্রচুর সম্ভাবনা ছিল। দুইকেই সবলভাবে দাঁড় করানো যেত। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যতই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মূল নারী চরিত্রটিকে নিয়ে যাবার প্রয়াস ফুটে উঠুক না কেন—তা যে মূলতঃ মিলনের আকাঙ্খাতেই নিয়োজিত, একথা অস্বীকার করবো কী করে? সমগ্র কাহিনীটীতে আর একটী দুর্বলতা—যা সব চেয়ে বড় হ'য়ে ধরা পড়ে, তা হ'চ্ছে মূল কাহিনীর প্রয়োজনে অন্যান্য চরিত্র-গুলি যেন আসেনি—সেগুলির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই কাহিনীর সংগে সংযোগ করা হ'য়েছে। দুর্গাপূজার প্রতিমা গড়বার সময় কুমোরেরা যে পন্থা অনুসরণ করে—অর্থাৎ প্রথম হয়ত মূল দেহটি গড়লো—তারপর হাত দিল—পা দিল এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ পৃথক ভাবে তৈরী করে সংযোগ করে দিল। বর্তমান কাহিনীটীও ঠিক অনুরূপ পন্থায় রচিত হ'য়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু কুমোরদের একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে এই যে, তারা মূলদেহটাকে আগে তৈরী করে নেয়। এবং অন্যান্য অংগ প্রত্যংগ সংযোজনার পর সংমিশ্রণের প্রতি খুবই যত্নবান থাকে। এখানে সেই যত্ন নেওয়াটায় যেন ফাঁক থেকে গেছে অনেকখানি। তাই পৃথক ভাবে বিচার করে দেখতে গেলে, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, জহর, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রগুলি খুবই প্রশংসনীয় হ'য়ে উঠেছে সৃষ্টির দিক থেকে, কিন্তু মূল কাহিনীর কথা যখন চিন্তা করি—তখন এগুলির সংগে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ততখানি চোখে পড়ে না।

তাছাড়া সাধারণ মেয়ের আর একটী দুর্বলতা সহজেই চোখে পড়ে—এর চরিত্রগুলি স্রষ্টার স্বতঃনিসৃত সৃজনী প্রতিভা থেকে জন্মলাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি—নিজেরাই নিজেদের যেন প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে কোমর বেঁধে লেগেছে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত গ্রাম্য মুচির চরিত্রটীর মুখে বড় বড় কথা চরিত্রটীর বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। তাছাড়া সমগ্র চিত্রখানিতে এত কথা বলানো হ'য়েছে, যা কোনমতে মন মেনে নিতে চায় না। মেয়েদের কার্যকরী কর্মপদ্ধতি বাস্তব দৃষ্টিভংগী অনুসৃত নয়। নায়িকার পিতার মৃত্যু দৃশ্যে—অতবড় একখানি গান বাস্তব দৃষ্টিভংগী থেকে সমর্থন করতে পারি না। চিত্রের পরিণতি নিতান্ত সহজ এবং সস্তা—যা নীরেন লাহিড়ীর কাছ থকে আশা করিনি।

অভিনয়ে প্রথমেই মনে জাগে ছবি বিশ্বাস ও পাহাড়ী সান্যালের কথা। শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যালের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করতে হয়। নারী চরিত্রের ভিতর সুপ্রভা মুখো-পাধ্যায়কে সর্বাগ্রে প্রশংসা করবো। জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সন্দেহ নেই কিন্তু একঘেয়েমি থেকে তা মুক্ত নয়। তারা ভাদুড়ী ও নীতীশ মুখো-পাধ্যায়ের অভিনয়ে মঞ্চের প্রভাব চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে বার বার আঘাত করেছে। নায়িকা চরিত্রে শ্রীমতী দীপ্তি রায় আশানুরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শনে সমর্থা হননি। অন্যান্য চরিত্র একরূপ। সংগীতে রবীন চাটুজ্জেকে প্রশংসা করবো। সংগীত সুগীত হ'য়েছে। চিত্র গ্রহণ—শব্দ গ্রহণ প্রশংসনীয়।

—শ্রীলভদ্র

স্বাধীনতা উৎসব মুখরিত দিবসে সহস্রাধিক সুধীজনের উপস্থিতিতে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'রাই'র শুভ মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে পৌরাহিত্য করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১৫ই আগষ্ট, রবিবার, ১৯৪৮, বেলা ৩ ঘটিকায়, মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র নিবেদন 'রাই'র শুভ মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। অনুষ্ঠান প্রারম্ভে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রীতেন এ্যাণ্ড কোঃ-র শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায় (হাবুদা)। রূপ-মঞ্চ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কালীশ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'রাই' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করেই বর্তমান চিত্রখানি গড়ে উঠা চিত্রখানির প্রযোজনা ও পরিচালনা করছেন যথাক্রমে ক্ষিতীশচন্দ্র পাল ও নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করবেন কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ-খ্যাত সুকৃতি সেন—যাঁর অভ্যুদয় নৃত্য গীতাভিনয় জাতীয় জীবনে এক ইতিহাস রচনা করেছে। চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে সাংবাদিক চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্তের উপর। দৃশ্যপট রচনার জন্য মনোনীত করা হ'য়েছে প্রবীণ শিল্প-নির্দেশক বটু সেনের সুযোগ্য শিষ্য নবীন শিল্পী নরেশ ঘোষের উপর এবং শিল্পসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় তত্ত্বাবধান করছেন প্রখ্যাত শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বাধীনতা উৎসব মুখরিত শুভ দিনটিতে যথানির্দিষ্ট সময়ে মহরৎ উৎসব আরম্ভ হয়। পূর্বে থেকেই নবীন শিল্পী নরেশ ঘোষ মাননীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপবেশনের জন্য একটী পৃথক সুদৃশ্য মঞ্চ তৈরী করে রেখেছিলেন। মঞ্চটির পশ্চাদপটের উপরে তুলির আঁচড়ে অংকিত পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের ফাঁক দিয়ে আকাশের গাঢ় নীল—উপস্থিত সুধীজনের চোখে নীলাঞ্জন বুলিয়ে দিচ্ছিল—তারই সামনে আমাদের গৌরবদীপ্ত জাতীয় পতাকা তখন পর্যন্ত উত্তোলিত হবার অপেক্ষায় ছিল। মঞ্চের সামনে শিল্পী অনিল গুপ্ত তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে 'মুভি ক্যামেরা' সহ প্রস্তুত ছিলেন—সমস্ত অনুষ্ঠানটির চিত্র গ্রহণের জন্ত। তারই পেছনে

শ্রীমতী মুকুল মাননীয় অতিথিদের মাল্যভূষিত করে। এরই নাম নিয়ে চিত্র প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। মুকুল প্রযোজক ক্ষিতীশ বাবুর একমাত্র কন্যা।

সহস্রাধিক সুধীজনের উপস্থিতিতে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর সর্ববৃহৎ মেঝটি মুহূর্তের মাঝে ভরে উঠেছিল। বেতার, চিত্র ও নাট্য জগতের সর্বজনপ্রিয় ও খ্যাত শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র উপস্থিত সুধীবৃন্দের কয়েকজনকে নিয়ে মঞ্চে উপস্থিত হলেন। শ্রীযুক্ত ভদ্র মাইকের সামনে এগিয়ে এসে উপস্থিত সুধীজনকে উদ্দেশ্য করে সর্বপ্রথম বল্লেন: আপনাদের অনুমতি নিয়ে আজকের অনুষ্ঠানে ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ কচ্ছি—আর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে আহ্বান জানাচ্ছি চিত্রজগতের সর্বজন পরিচিত শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়কে। যুগান্তর পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী শ্রীযুক্ত ভদ্রের এই

বিস্ময়ের পর বিস্ময় ✱ রোমাঞ্চের পর রোমাঞ্চ

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

কালোছায়া

ভূমিকায়

শিপ্রা দেবী ঃ শিশির মিত্র ঃ ধীরাজ
ভট্টাচার্য ঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
নবদ্বীপ ঃ হরিদাস ঃ নৃপেন্দ্র প্রভৃতি

প্রেক্ষাগৃহের সুখাসনে আয়েস ক'রে দেখবার নয়, আসনে তটস্থ হয়ে বসে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখবার মত রোমহর্ষক ছবি হল 'কালোছায়া'। এ ছবি লিখতে ও তুলতে পারতেন পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায়, কোনান ডয়েল আর এডগার ওয়ালেসের পরামর্শ নিয়ে, কিন্তু তাঁরা কেউই আজ বেঁচে নেই। তাই তাঁদের অভাবে এ ছবি তুলেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। — — — — — — —

যত ফুট ছবি ✱ তত ফুট

প্রস্তাব সমর্থন করেন—সংগে সংগে জনসাধারণের করতালি ধ্বনিতে তা অভিনন্দিত হ'য়ে ওঠে। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্য দিয়ে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসী'র আশা ও আকাঙ্খার প্রতীক জাতীয় পতাকা প্রয়োগশালার নীলিমার বুকে উড্ডীন থেকে সত্য, সাম্য ও অহিংসার—নতুন করে জয় ঘোষণা করে। সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দ আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত সুকৃতি সেনের আবেগময় কণ্ঠের উন্মাদনী সংগীতের রেশ কিছুক্ষণের জন্য সকলকে অভিভূত করে রাখে। সমস্ত অনুষ্ঠানটির 'মুভি সট্' নেবার জন্য চিত্র শিল্পী অনিল গুপ্ত তাঁর ছায়াধর যন্ত্রটী নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন—সংগীতের মাঝে তিনি নিজেকে এতখানি হারিয়ে ফেলেন যে, এই মুহূর্তটিকে তাঁর ছায়াধর যন্ত্রে ধরে রাখবার কথা ভুলেই গেলেন। সূত্রধর রূপে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবার দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছিল—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উপর—তিনি এবার সভাপতির অনুমতি নিয়ে কাহিনী-কারকে ডাকলেন পরিচালক ও প্রযোজকের হাতে চিত্রনাট্যটি সমর্পণ করতে। মঞ্চোপরি এসে কাহিনীকার দাঁড়ালেন। চিত্রকাহিনীটি প্রদান করবার পূর্বে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী ও সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলবার জন্য তিনি মাইকের সামনে যেয়ে দাঁড়ালেন: তাঁর আবেগময়ী কণ্ঠস্বর মাইকের ভিতর দিয়ে সকলের কানে ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো:—

"শ্রদ্ধেয় সভাপতি, উপস্থিত শুভাকাঙ্খী ও চিত্রজগতের বন্ধুবর্গ!,

স্বাধীনতা উৎসব মুখরিত আজকের এই শুভ দিনটিতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অস্পৃশ্যা বিজয়িনী নারীর নূতন পথে পা বাড়াবার শুভ মুহূর্তটি আপনাদের উপস্থিতিতে ধন্য হ'য়ে উঠেছে—আপনাদের প্রণাম জানাবার পূর্বে, প্রণাম জানাই তাঁদের—যাঁদের আজীবন সংগ্রাম দ্বিশতাব্দীর বন্ধন জর্জরিত ভারতের আত্মাকে মুক্তি দিতে পেরেছে। প্রণাম জানাই সেইসব মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিকদের উদ্দেশ্যে—যাঁদের আত্মবলিদানে বৈদেশিক সরকারের সকল উৎপীড়ন ও অত্যাচার আজ আশীর্বাদরূপে আমাদের মাথায় ঝরে পড়ছে। অন্ধকারার পাষাণ প্রাচীর যাঁদের আদর্শের দ্যুতিতে একদিন ঝলমলিয়ে উঠেছিল—ফাঁসির মঞ্চ যাঁদের পুণ্য পদরেণুতে উঠেছিল ধন্য হয়ে—প্রণাম জানাই আরো শত সহস্র শহিদদের—যাঁদের নির্দেশিত পথচুম্বন করে সে সংগ্রামে যোগদান করবার সৌভাগ্য আমাদেরও হ'য়েছিল। প্রণাম গ্রহণ করুন আপনারা—আমার নিজের তরফ থেকে—প্রযোজক ও সকল চিত্র প্রতিষ্ঠানের শিল্প-গোষ্ঠীর তরফ থেকে।

আজ এই উৎসব মুখরিত পরিবেশের মাঝে তাঁদের কথাই সব প্রথম মনে পড়ছে—যাঁরা এই কাহিনীটির সংগে প্রচ্ছন্ন ভাবে জড়িত রয়েছেন। অনিবার্য কারণ বশত তাঁরা এই উৎসবে উপস্থিত হ'তে পারেন নি। তাঁরা ফরিদপুরের বিপ্লবী নেতা পূর্ণ দাস, যতীন ভট্টাচার্য ও তাঁদের বিপ্লবী কর্মীদল। তাঁরা শুধু আমার মনেই নয়—এখানে এমন আরো অনেকে উপস্থিত আছেন—যাঁদের
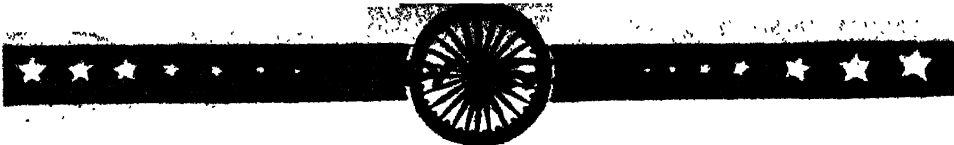
মনেও প্রথম আগুন জ্বালিয়ে ছিলেন আমার কাহিনীর নায়িকা—বল্লভপুর গাঁয়ের কলবর মাঝির মেয়ে রাই—তাঁদেরই বিপ্লবের শিখার ধন্যা হ'য়ে উঠেছে। তাই, স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই হোতাদের অনুপস্থিতিতে আজকের এই উৎসব মুখরিত পরিবেশের মাঝেও আমি বেদনা অনুভব কচ্ছি। সান্ত্বনা আমার এই—তাঁদের আদর্শ আজও আমার মাঝে জীবন্ত আছে—সে আদর্শের স্পন্দন আমার মত এখানে উপস্থিত আরো অনেকেই অন্তরে অনুভব করেন। সেই সর্বত্যাগী ফকিরেবদল—আজও বল্লভপুরের মত পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—সেখানকার জঞ্জাল অপসারণে—আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লেও—তাঁদের আশীর্বাদ থেকে যে বঞ্চিত হবো না—সে বিশ্বাস আমার আছে।

অবজ্ঞাত—অনাদৃত চিত্রজগতের আমি একজন নগণ্য সাংবাদিক—আমার 'রাই'র শুভ মহরৎ উপলক্ষ্যে পুরোহিতের আসনে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন একজন সুধী ব্যক্তিকে পেয়েছি—যাঁর পরিচয় দিতে যেয়ে আমি দৃষ্টতার প্রকাশ করতে চাই না। তাঁকে শুধু এইটুকুই বলবো—তিনি পুরোহিতের আসন গ্রহণ করে ব্যক্তিগতভাবে শুধু আমাকেই ধন্য করেননি—সমগ্র চিত্রশিল্পটিই সুধী সমাজের স্বীকৃতি পেয়ে ধন্য হয়ে উঠলো। এই 'স্বীকৃতি'কে পরম পাওয়া বলেই মাথা পেতে গ্রহণ করলাম। স্থায়ী প্রতিষ্ঠার মোহ কাটিয়ে প্রথম যেদিন চলচ্চিত্র সাংবাদিক জগতে পা বাড়াই—সেদিন আমার সামনে শুধু বিরাট অনিশ্চয়তাই ছিল না—আত্মীয় স্বজন, তথাকথিত নীতিবিদ শুভানুধ্যায়ীদের অবজ্ঞা ও ঘৃণায় কম মুসড়ে পড়তে হয় নি। আমি 'গোল্লায় গেছি' বলে তাদের সহানুভূতি বাক্যেও কম জর্জরিত হ'তে হয় নি। সেদিন আত্মীয় স্বজনের ভিতর থেকে কেবল মাত্র একজনের স্নেহ ও প্রেরণাই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল—যিনি আমারই মত স্থায়ী যশ ও প্রতিষ্ঠার মোহ কাটিয়ে সুভাষচন্দ্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে ফরোয়ার্ড—লিবার্টি—বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায়

সুভাষচন্দ্রের নির্দেশেই সাংবাদিক জীবন সুরু করেন। সুভাষচন্দ্রের অধীনে বিশ্বস্ত সৈনিকের দায়িত্ব নিয়ে সকল বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে—তিনি কাজ করেছেন, তাঁর কথাও এই প্রসংগে উল্লেখ করতে চাই—তিনি আমার অগ্রজ শ্রীঅমূল্য মুখোপাধ্যায়। আর আমার সেই সংগ্রাম মুখর দিনগুলিতে যে সব বন্ধুবান্ধবকে বন্ধুর পথে পেয়েছিলাম—তাঁদের মধ্যে দেবনারায়ণ গুপ্ত অন্যতম। আমার প্রথম কাহিনীকে চিত্ররূপায়িত করবার দায়িত্ব তাই আমি বন্ধুবর দেবনারায়ণের হস্তে সমর্পণ করেছি। দেবনারায়ণের নিষ্ঠার পরিচয় আমি পেয়েছি- তাঁর নৈপুণ্য বিশ্লেষণে আমি দৃকপাত করিনি—আপনারা আশীর্বাদ করুন, যেন তাঁর এই নিষ্ঠা সাফল্যের জয়টীকায় মহিমমণ্ডিত হ'য়ে ওঠে। প্রযোজক রূপে যাঁকে পেয়েছি, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ পাল, তাঁর অতীত জীবনও কেটেছে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে—তাই হয়ত তাঁর সংগে আমাদের মিলনের পথটা সহজ হ'য়ে উঠেছে। যে কয়টা বছর চিত্রশিল্পের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছি—এর গৌরব অগৌরব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারিনি। এর দুর্বলতা যথেষ্ট পীড়াদায়ক,সন্দেহ নেই—কিন্তু এর সম্ভাবনা যে যথেষ্ট আশাপ্রদ, তাই বা অস্বীকার করবো কী করে? কিছুদিন পূর্বে কোন একটি পত্রিকায় একটা বিদ্যালয়ের সন্নিকটে নতুন একটা চিত্রগৃহ নির্মিত হচ্ছে বলে কঠোর মন্তব্য আমার মত অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি—এথেকেই বুঝতে পারি, চিত্রশিল্প সম্পর্কে আমাদের সমাজবিদদের ধারণা কতখানি ভ্রান্ত। চিত্রগৃহ ও মঞ্চগৃহ যে বিলাস-ব্যাসনের আড্ডাখানাই নয়—এধারণা আজও তাঁদের মন থেকে দূরীভূত হ'লো না। হবার মত কোন পরিচয়ও আমরা হয়ত দিতে পারিনি। কিন্তু সে না-পারার বোঝা শুধু আমাদের ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন? সমাজবিদদের কী কোন দায়িত্ব নেই। না থাক, আমরা তাঁদের ঘাড়ে কোন দায়িত্বের বোঝা চাপাতে যাবো না—শুধু বিনীতভাবে অনুরোধ করবো—কচকচানিটা বন্ধ রেখে, সময় দাও—সুযোগ দাও আমাদের! আমাদের চিত্রগৃহ ও মঞ্চগৃহ অদূর ভবিষ্যতে যে প্রমোদগৃহ থেকে শিক্ষাগৃহে রূপান্তরিত হ'যে উঠবে—সে প্রতিশ্রুতি তাঁদের আমরা দিতে পারি। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগন থেকে যে সুধী ব্যক্তিকে পৌরহিত্য করতে আমরা সাদর আহ্বান জানিয়ে আমাদের প্রয়োগশালায় নিয়ে এসেছি—এমন দিন আসবে, যেদিন এই প্রয়োগশালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা অর্জন করে আজকের নীতিবিদদের চোখে ধাঁধাঁর সৃষ্টি করবে। সেদিন এই প্রয়োগশালা থেকে—শিশির কুমার—অহীন্দ্র—পাহাড়ী—মনোরঞ্জন— নির্মলেন্দু—ছবি—নরেশ—জহর—কমল—কানন—মলিনা— সরযু—প্রভা—গৌর দাস—নীরেন লাহিড়ী—বড়ুয়া—দেবকী বসু—শৈলজানন্দ—প্রেমেন্দ্র মিত্র— নিতাই ভট্টাচার্য—নীতীন বসু—রাই বড়াল—বিমল রায়— অতুল চাটুজ্জে—বিভূতি লাহা—অজয় কর—বিভূতি দাস — প্রবোধ দাস—যতীন দত্ত—সুধাংশ ঘটক—অজিত সেন—সুরেশ দাস—সুবোধ মিত্র—বীরেন সরকার—মুরলী চাটুজ্জে প্রভৃতি ঘৃণিত অবহেলিত চলচ্চিত্রসেবীর দল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাংগনে যে এমনি অতিথিরূপে আহূত হবেন—সে আশাও আমাদের দুরাশা নয়। এজন্য আশার স্বপ্নে বিভোর থাকলেই চলবে না—আমাদের প্রস্তুত হযে নিতে হবে। দোষ আমরা শুধু অন্যের ঘাড়েই চাপাই—আমাদেরও যে দোষ রয়েছে, তা সংশোধনের প্রচেষ্টা কয়-জনের মাঝে দেখতে পাই? বাঙ্গালী চরিত্রের সবচেয়ে দুরপনেয় কলংক—আমরা বাইরের কাছে যতখানি উদার,

ভিতরে ততখানি অনুদার। আমরা পরকে আপন বলে কাছে টেনে নেই, আপনকে পর বলে দূরে ঠেলে রাখি। বাঙ্গালী চরিত্রের এই কলংক বেশী মাত্রায় চিত্র জগতে সংক্রামিত। এই আত্মঘাতী নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হবে- চিত্র ও নাট্যজগতের একজন নগণ্য সেবীও আমাদের পরম আত্মীয়, একথা মনে রাখতে হবে। একখানি চিত্র বা নাটকের সার্থকতার মূলে তাঁদের প্রত্যেকের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। কারোর এই অবদানকে কখনই যেন আমরা অস্বীকার না করি। বাইরে থেকে যখনই কারোর উপর কোন আঘাত আসবে—সে আঘাত আমার নিজের উপর—সমগ্র চিত্র ও নাট্যশিল্পটির উপরে এসেছে—তাই যেন আমরা মনে করি। আমাদের যে অন্যায়—যে অপরাধ রয়েছে, তার বিচার ও সংশোধনের দায়িত্ব আমরা নিজেরাই গ্রহণ করে অপরের সামনে যেন সমবেতভাবে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারি।

সম্পাদনা করতে করতে কচকচানীটা হয়ত অভ্যাস থেকে বদভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে - তাই, আপনাদের যে বিরক্তির সৃষ্টি করেছি, সেজন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। শিশির স্নাত ধরণীর আশীর্বাদের মত আপনাদের আশীর্বাদ সিঞ্চনে নব প্রতিষ্ঠিত মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠানের যাত্রাপথ সহজ ও স্নিগ্ধ হ'য়ে উঠুক। জয় হিন্দ।"

কাহিনীকারের বক্তব্য শেষ হবার পর তিনি সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দের অনুমতি নিয়ে চিত্রনাট্যটী প্রযোজক ক্ষিতীশ চন্দ্র পালের হস্তে সমর্পণ করলেন। ক্ষিতিশ বাবু সকলের আশীর্বাদ কামনা করে পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের হস্তে সেটি প্রদান করেন। সুধীবৃন্দের করতালি ধ্বনি আশীর্বাদের রূপ নিয়ে ধ্বনিত হয়ে উঠলো। চিত্রাভিনেতা ডাঃ হরেন মুখোপাধ্যায় বাংলার চিত্র ও নাট্যজগত সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে এই নব প্রতিষ্ঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠানের শুভ কামনা জানালেন। সভাপতি ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবার মাইকের সামনে এগিয়ে এলেন: তিনি তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় চলচ্চিত্র শিল্পের বিচিত্র পরিবেশ এবং এর সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, এই রহস্যময় বৈজ্ঞানিক শিল্পটী মানব কল্যাণে কত ভাবেই না নিয়োজিত হ'তে পারে। অদূর ভবিষ্যতে এই প্রয়োগ-শালা যে শিক্ষাকেন্দ্রে রূপায়িত হবে - কাহিনীকারের এই উক্তিকেই শুধু তিনি সমর্থন করেন না—এই শিল্পটী যে জাতির কৃষ্টি ও শিক্ষার বাহকরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে, সে সম্ভাবনার কথাও দৃঢ়তার সংগে উল্লেখ করেন। 'রাই'র চিত্ররূপের সাফল্য কামনা করে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

কাহিনীকার, পরিচালক ও নব প্রতিষ্ঠিত মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে সভাপতি তার ভাষণ শেষ করলেন। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবার সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে যেয়ে বল্লেন: আমি আমার নিজের তরফ থেকে, কাহিনীকার, পরিচালক ও প্রযোজকদের তরফ থেকে মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সুধীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যে দিনটিতে 'রাই'র মহরৎ উৎসবের আয়োজন করেছেন, সে নির্বাচন যেমনি লক্ষ্য করবার—তেমনি লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে, 'রাই'র কাহিনীকার ও পরিচালকের নির্বাচন। এঁরা দু'জনেই নবীন—দু'জনেই সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। এঁরা যে শিল্পগোষ্ঠী তৈরী করেছেন,
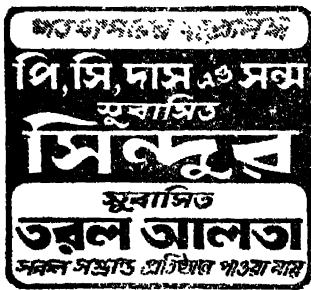
সেখানেও নবীনের সমাবেশ। নবীনদের প্রচেষ্টা আপনাদের সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছায় সাফল্য মণ্ডিত হয়ে উঠুক, তাই আমি কামনা করি। জয়-হিন্দ ও বন্দেমাতরম ধ্বনির ভিতর দিয়ে শ্রীযুক্ত ভদ্র তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। সভা ভংগ হলো। সভাশেষে কর্তৃপক্ষ আগন্তুকদের ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির মুভিসট গ্রহণ করেন চিত্র শিল্পী অনিল গুপ্ত। তার সহকর্মীরা তাকে সাহচর্য দিয়ে সাহায্য করেন। পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের নির্দেশে সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। তারা মুখোপাধ্যায়, দিলীপ দে চৌধুরী, স্নেহেন্দু গুপ্ত, পুষ্পকেতু মণ্ডল, প্রদ্যোত মিত্র, গৌর রায়চৌধুরী, অমল সরকার, বিমল চাটুজ্জে, চিত্র সম্পাদক রবীন দাস, প্রভৃতি প্রত্যেকে অনুষ্ঠান পরিচালনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কৌতুকাভিনেতা আশু বসুর উপর ছিল আগন্তুকদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তিনি তা সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করেন। উপস্থিতদের ভিতর সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত মুরলী কান্ত দাস, সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত বিনয় সেন, সুবল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, গোপাল ভৌমিক, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়, (হাবুদা), কবি শৈলেন রায়, অখিল নিয়োগী, পাহাড়ী সান্যাল, অসিত বরণমুখোপাধ্যায়, চিত্র সম্পাদক ও পরিচালক রাজেন চৌধুরী, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিতাই সেন, দাক্ষিণা মোহন ঠাকুর, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, নবদ্বীপ হালদার, মীরা মিশ্র, বাণী সান্যাল, পুষ্প সান্যাল, জাহানারা বেগম, দেবীপ্রসাদ চৌধুরী, শব্দযন্ত্রী গৌর দাস, সুস্মিত চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যেন ঘোষ, রামকৃষ্ণশাস্ত্রী, অমূল্য মুখোপাধ্যায়, ইন্দু সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সরোজ চক্রবর্তী, সুনীল বসু মল্লিক, ডাঃ বিমল বসু প্রভৃতি আরো অনেকে ছিলেন। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর কর্মাধ্যক্ষ অজিত সেন ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে উপস্থিত থেকে সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেছিলেন—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর সর্ববৃহৎ ফ্লোরটি এই অনুষ্ঠানের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। রূপ মঞ্চের বহু পাঠক-পাঠিকা অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন। নাট্যাচার্য শিশির কুমার, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডাঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, মুরলী চট্টোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, অভিনেতা ছবি বিশ্বাস, ডাঃ পতুপ গুপ্ত, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও কাহিনীকারকে ব্যক্তিগত ভাবে শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ প্রেরণ করেন। তাছাড়া সন্ধ্যা দেবী, মলিনা, জহর গাঙ্গুলী, ফণী রায়, রবি রায়, কমল মিত্র প্রভৃতি অন্যান্য অভিনেতারাও অনিবার্য কারণ বশতঃ উপস্থিত থাকতে না পারায় 'রাই'র সাফল্য কামনা করে সংবাদ পাঠান। আগামী অক্টোবর মাস থেকে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'রাই'র চিত্রগ্রহণ কাজ সুরু হবে। ইতিমধ্যে পরিচালক তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে চিত্রনাট্য, সংলাপ ও অন্যান্য আনুসংগিক কাজগুলি শেষ করে নেবেন। রূপ মঞ্চের তরফ থেকে 'রাই'র বিভিন্ন ভূমিকালিপির জন্য যাঁদের নেওয়া হবে—তাঁদের যথা সময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাই মহরৎ হয়ে যাবার জন্য তাঁরা যেন উতলা না হন। পুরোন শিল্পগোষ্ঠীর ভিতর থেকে সম্ভবতঃ থাকবেন ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরযূ দেবী, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, আশু বসু, শ্যাম লাহা, মণি শ্রীমানি, কমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। নতুনদের ভিতর মধুছন্দা রায়, বন্দিতা সান্যাল, বাণী সান্যাল, মমতা বিজলানী প্রভৃতি আরো অনেকে থাকবেন। সংগীত পরিচালনা করবেন সুকৃতি সেন, চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উদীয়মান চিত্র শিল্পী অনিল গুপ্তের উপর। সম্পাদনার জন্য গ্রহণ করা হ'য়েছে চিত্র সম্পাদক রবীন দাসকে।

★ ★ রাই—ঘোষণা (২) ★ ★

মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় 'রাই' চিত্রে রূপায়িত হ'য়ে উঠছে। গত ১৫ই আগষ্ট, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'রাই'র শুভ মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে 'রাই'র চিত্রগ্রহণ কার্য শুরু হবে। তার পূর্বে, কতগুলি বিষয় সম্পর্কে চিত্র-জগতের বন্ধুদের মনে ও আমাদের পাঠকসমাজের মনে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—তা খণ্ডন করতে চাই। প্রথমেই বলে রাখি, একমাত্র কাহিনীর সম্পর্ক ছাড়া 'রাই'র চিত্রগ্রহণ বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই বা কাহিনীকার ব্যতীত অন্য কোন ভাবে আমি জড়িত নেই। চিত্ররূপায়নে আমার কাহিনীর মর্যাদা যাতে ক্ষুন্ন না হয়, সেই স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখেই কায়িক পরিশ্রম ও পরামর্শ দ্বারা আমি কর্তৃপক্ষকে আমার শক্তি অনুযায়ী সাহায্য কচ্ছি। কাহিনীর স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমাকে যেটুকু অংশ গ্রহণ করতে হচ্ছে—তাতে 'রূপ-মঞ্চে'র সম্পাদক হিসাবে আমার কোন অন্যায় থাকতে পারে বলে মনে করি না। এবং এতে 'রূপ মঞ্চে'র উপর কোন ঝুঁকি আসবে বলে যাঁরা মনে কচ্ছেন তাঁরা ভ্রান্ত অভিমত পোষণ করেন ছাড়া আর কী বলবো। যেটুকু অংশ আমাকে গ্রহণ করতে হচ্ছে, রূপ-মঞ্চের পাঠকসমাজের পরামর্শে এবং অনুরোধেই আমি তা কচ্ছি। এমন কী ভূমিকা নির্বাচনে আমি তাদের পরামর্শ অনুযায়ীই পরিকল্পনা পেশ করেছি। ভূমিকা নির্বাচনে পাঠক-সাধারণ থেকে যে সব শিল্পীদের অনুমোদন এসেছে তাও এখানে উল্লেখ কচ্ছি। যেমন: শিবশঙ্কর (নায়কের দাদা)—ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, মানারঞ্জন ভট্টাচার্য। দেবশঙ্কর—(নায়ক)—অসিতবরণ, প্রদীপ কুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়। সুনন্দা (শিবশঙ্করের স্ত্রী)—সরযূ দেবী, মলিনা। মেজকর্তা- (গাঁয়ের জমিদার)—ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সন্তোষ সিংহ, কেষ্টধন। হলধর—(নায়িকার পিতা)—রবি রায়। রাই (নায়িকা)—মীরা মিশ্র, ভারতী, দীপ্তি রায়, সিপ্রা দেবী। নাসির-তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, মণি শ্রীমানি। মোহন—কানু বন্দ্যোঃ, কমল চাটুজ্জে, নবদ্বীপ হালদার। দং—সন্তোষ সিংহ, অজিত চক্র। ডাঃ দে—ডাঃ হরেন, দেবী চৌধুরী। নায়কের মামা (সি, আই, ডি)—শ্যাম লাহা। জেলেবৌ—(নায়িকার মা)—প্রভা, নিভাননী। বিশেষ চরিত্রগুলিতে পাঠকসাধারণের তরফ থেকে এই অনুমোদন এসেছে। কর্তৃপক্ষের আর্থিক সংগতির কথা এবং উল্লিখিত শিল্পীদের সহযোগিতার কথা চিন্তা করে ভূমিকা নির্বাচন করতে হবে: এবং নতুনদের ভিতর যদি উপযুক্ত বা উপযুক্ততার সন্ধান মেলে, তাঁদেরও গ্রহণ করা হবে। এই ভূমিকা নির্বাচনে কাহিনীর স্বার্থও কম জড়িত নেই। তাই, পরোক্ষভাবে আমাকে থাকতে হচ্ছে। এজন্য চিত্র প্রযোজনার সংগে আমি জড়িত বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা মোটেই উচিত হবে না। 'রাই' লোক সংগীত ও জাতীয় সংগীত-প্রধান কাহিনী—তাই তার সংগীত পরিচালনায় সুকৃতি সেনের নির্বাচন শুধু আমার ইচ্ছাতেই সাধিত হয়নি- পরিচালক ও দর্শকসাধারণের অনুমোদনও সাহায্য করেছে। চিত্রজগতের বন্ধুদের এবং পাঠকসমাজকে আর একটা কথা বলে রাখছি, 'রাই' যখন চিত্ররূপ গ্রহণ করে আত্মপ্রকাশ করবে তার সমালোচনা প্রসংগে রূপ-মঞ্চের নিরপেক্ষতার পরিচয় তাঁরা আর একবার যাচাই করে নিতে পারবেন। সে সমালোচনায় রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের কাহিনী বলেও 'রাই' রেহাই পাবে না, সত্যি যদি তার দুর্বলতা ধরা পড়ে।

—বিনীত, **কালীশ মুখোপাধ্যায়**

"দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার লংঘিতে হবে রাত্রী নিশিথে, যাত্রীরা হুসিয়ার !"

রামপুরের বিপত্নীক ও ধনাঢ্য জমিদার রাজকুমার রায় নিঃসন্তান। বংশধরের অভাবে তিনি স্বীয় ভ্রাতস্পুত্র চন্দ্রনাথ রায়কে দত্তক নেন এবং বংশধরের আশায় উমাতারার সংগে চন্দ্রনাথের বিবাহ দেন। বিবাহের পাঁচ বছর পরেও উমাতারার কোন সন্তান না হওয়ায় রাজকুমার রায় মনে করেন—উমাতারা বন্ধ্যা। তাই তিনি চন্দ্রনাথ এবং উমাতারা দুজনকেই ডেকে বলেন যে, তাদের যখন সন্তান হ'লোনা তখন হয় চন্দ্রনাথকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করতে হবে— নয়

'ওরে যাত্রী'র নবীন পরিচালক রাজেন চৌধুরী, 'ওরে যাত্রী'র সম্পাদনা কার্যে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় এই চিত্রখানি গৃহীত হয়

তিনি পুনরায় দত্তক পুত্র গ্রহণ করবেন। যদিও চন্দ্রনাথের বিবাহে মত ছিলনা—তবুও উমাতারার অনুরোধে চন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে বাধ্য হয়। কারণ, বিবাহ না করলে জমিদার রাজকুমার দত্তক নেবেন—আর তার ফলে চন্দ্রনাথ হবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত—যা উমাতারা মোটেই সহ্য করতে চায় না। নয়নতারার সংগে চন্দ্রনাথের বিবাহ হ'য়ে গেল। ফুলশয্যার রাত্রে উমাতারা বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তখনও সে জানতো না যে, তার গর্ভে ছিল চন্দ্রনাথের ঔরসজাত সন্তান। পথ চলতে গিয়ে উমাতারার দেখা হলো নার্সবেশী মহামায়ার সাথে। সে

ছিল উমার দাইমা—যার কোলে উমা মায়ের পেট থেকে পড়ে শিশুকাল অতিবাহিত করেছিল। এই মহামায়ার বাড়ীতেই উমা পেল আশ্রয়। এইখানেই একদিন মহামায়া আবিষ্কার করলো যে, উমা সন্তানের জননী। যথাকালে উমাতারা একটি সুসন্তান প্রসব করলো। এই ছেলেই শেখর নামে পরিচিত—যদিও মহামায়া চন্দ্রনাথের নামের সংগে মিলিয়ে এর নাম রেখেছিল চন্দ্রশেখর। চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় স্ত্রী নয়নতারাও রামপুরে যথাসময়ে একটি পুত্র
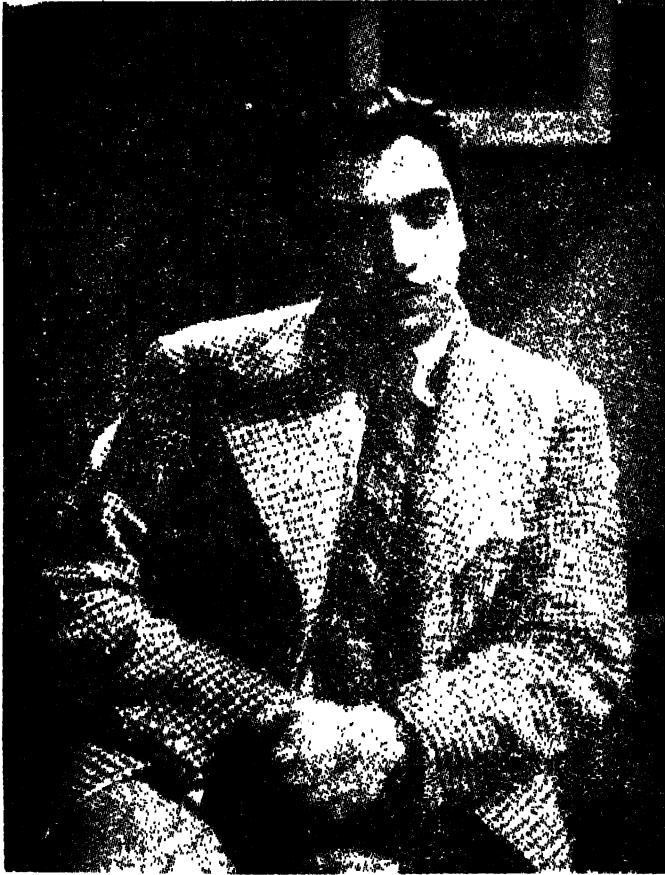
দীপক মুখোপাধ্যায় 'ওরে যাত্রী'র শেখর চরিত্রটীকে রূপায়িত করে তুলেছেন

সন্তান প্রসব করে। জমিদার উমাতারার নামের সংগে মিলিয়ে এর নাম রাখলো উমাশঙ্কর। আদর আর টাকার কোলেই শঙ্কর মানুষ হ'তে লাগলো। একদিন রাজকুমার শঙ্করকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে কলকাতায় এনে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিল। উমা তখন নার্সের পেশা নিয়ে মহামায়ার আশ্রয়েই আছে। মহামায়া শেখরকে নিজের নাতীর মতোই স্নেহ করত। সেও তাকে লেখা পড়া শেখাবার জন্যে স্কুলে ভর্তি করতে গেল সেই স্কুলে, যেখানে শঙ্করও ভর্তি হলো। কিন্তু এরা কেউ জানলো না যে, এরা দুজনে একই পিতার সন্তান। দুজনে একসংগে লেখা পড়া করে

ম্যাট্রিক, আই, এস-সি পাশ করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে দুজনেই ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু সব পরীক্ষায়ই শেখর প্রথম আর শঙ্কর দ্বিতীয়। লেখা পড়া ছাড়াও শেখরের মন ছিল বৈপ্লবিক চিন্তায় ভরপুর। সে ছিল দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন একনিষ্ঠ সেবক। তাই তার গতিবিধির ওপর পুলিশের ছিল সতর্ক দৃষ্টি। যোগমায়া (বামুনদিদি) নামে মহামায়ার এক দিদি ছিলেন। এদেরও রামপুরেই বাড়ী ছিল এবং জমিদার

শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা প্রস্ফুটিত শতদলের মত তার অভিনয় দক্ষতায় 'ওরে যাত্রী'র শতদল চরিত্রটী বিকাশ লাভ করেছে।

পরিবারের সংগে বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। যোগমায়া আর মহামায়া এই দুই বোনেরই একসংগে একই বরের সংগে বিয়ে হয়। যোগমায়ার বয়স বার, মহামায়ার বয়েস দশ আর বরের বয়েস পঞ্চাশ। বর পছন্দ হয়নি বলে চিরকালের মত বাড়ী থেকে চলে এসে নার্সের পেশা নিয়েই মহামায়া তার জীবন অতিবাহিত করছে—আর (যোগমায়া) বামুনদিদি তার পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে দেশের বাড়ী রামপুরেই থেকে যান। তারা উভয়েই বিধবা এবং বামুনদিদি বৃদ্ধা।
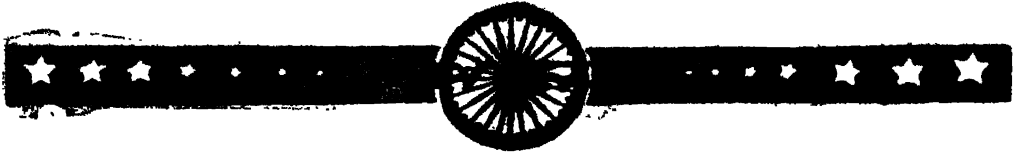
এদের উভয়েরই বড় সতীনের নাতনী শতদল। বামুনদিদি তাকে নিজের কাছে রেখেই মানুষ করেছে। মনে মনে তার বাসনা ছিল জমিদারের নাতী শঙ্করের সংগে শতদলের বিবাহ দেয়। তিনি নিজে সে কথা শঙ্করকে জানায়। বামুন দিদির দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে শঙ্কর প্রেম নিবেদন করলো শতদলের কাছে। কিন্তু সে হলো প্রত্যাখ্যাত—কারণ শতদল জানতো যে, মেডিকেল কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল মেজর ব্যানার্জির মেয়ে ডলীর সংগে শঙ্করের বিবাহের প্রায় সব ঠিক। এই বিবাহ ছাড়া বামুনদিদির আর একটা বাসনা ছিল—নিজের খুদ কুঁড়ো যা ছিল, সবই তিনি শতদলের নামে লেখাপড়া করে দিয়ে যেতে চান। আর একাজ করবার জন্য একজন বিশ্বাসী লোক চেয়ে সে চিঠি লিখলো মহামায়াকে। মহামায়া পাঠালো শেখরকে। শেখর গেলো রামপুরে মহামায়ার দিদি বামুনদিদির কাছে। সেখানে তার পরিচয় হলো শতদলের সংগে। সহসা চন্দ্রনাথ পড়ে যেয়ে সজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। রাজকুমার আর শঙ্কর তখন কলকাতায়। নতুন বৌ নয়নতারা বাড়ীর পুরানো চাকর রামহরিকে পাঠায় শতদলের কাছে এই আশায় যে, হয়ত সে এসে চন্দ্রনাথের চিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত করতে পারবে। শতদল খবর পেয়ে শেখরকে নিয়ে গেল জমিদার বাড়ী চন্দ্রনাথের চিকিৎসা করতে। এই শেখর প্রথম তার পিত্রালয়ে প্রবেশ করল—যদিও সে জানতো না যে, এই তার পিতৃভূমি। সারাদিন এবং রাত্রি চন্দ্রনাথের রোগশয্যার পাশে বসে শেখর তাকে একটু সুস্থ করে তোলে। পরদিন ভোরে নতুনবৌ নয়নতারা—শেখর আর শতদলকে চা খাওয়াবার জন্য ডেকে নিয়ে যায় পাশের ঘরে—যে ঘরে থাকতো উমা, আর যে ঘর সে চলে যাওয়ার পর থেকে বন্ধই থাকতো। এইখানেই শেখর দেখতে পায় দেওয়ালে টাঙ্গান তার মায়ের ছবি এবং সবই সে বুঝতে পারলো। রামপুর ছেড়ে তখনই সে চলে এলো কলকাতায়—আর মাকে বললে তার রামপুরের অভিজ্ঞতার কথা। শঙ্কর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেত গেল এবং সেখান থেকেই সে আই-এম এস-এ যোগ দিয়ে মিলিটারী সার্ভিসে নাম লিখিয়ে এলো—যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার আগে পর্যন্ত মেডিকেল কলেজের সংশ্লিষ্টই ছিল। শঙ্কর যখন বিদেশে, তখন সহসা বামুনদিদি পরলোক যাত্রা করায় শতদল এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই সময় শেখর তাকে তার সত্যিকারের পরিচয় দিয়ে—তাকে আমন্ত্রণ জানায় তার পথের সাথী হতে। শতদল যেন অকুলে কূল পেল। সে রামপুর ছেড়ে চলে এল শেখরের আশ্রয়ে। শেখর তাকে নার্সিং শিখবার জন্যে দিল মেডিকেল কলেজে। এর কিছুকাল পরে দেশব্যাপী যুদ্ধের রণদামামা উঠলো বেজে। শেখরের বৈপ্লবিক কাজকর্মও তখন বিপুল উৎসাহের সংগেই চলছিল। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি তার ওপর আগে থেকেই ছিল—এখন তাদের দৃষ্টিটা হয়ে ওঠে খুব তীব্র। সহসা একদিন মেডিকেল কলেজে নার্স বেশী শতদলের সংগে শঙ্করের দেখা হ'ল। তখনও শঙ্কর বামুনদিদির পুরানো কথার সূত্র ধরে সে তার প্রেম নিবেদন করে শতদলের কাছে—আর হয় প্রত্যাখাত। শঙ্কর তখন চলে যায় মেজরের চাকরী নিয়ে—ব্রিটিশ বাহিনীর পক্ষে মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে। এর কিছুকাল পরে শেখরের সহকর্মীরা সব ধরা পড়লো পুলিশের হাতে। শেখরেরও তখন ফেরার হওয়া ছাড়া আর অন্য গতি ছিল না। তাই সে নেতাজীর আজাদ হিন্দ সৈন্যের দলভুক্ত হয়ে পাড়ি মারল ভারতবর্ষের বাইরে। আর এই যাত্রায় শতদল হলো তার সাথী। এরা চলে যাবার পর ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট দৈনিকপত্র মারফত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাল যে, ডাঃ শেখর রায় ও সবিতা রায় (ওরফে শতদল) রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী—অভিযুক্ত হয়ে ফেরারী হয়েছে। তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে ১০০০০৲ টাকা পুরস্কার মিলবে।

মণিপুরের যুদ্ধক্ষেত্রে একদিকে বৃটিশবাহিনী আর একদিকে আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যখন সংঘর্ষ হয়—তখন মেজর বেশী শঙ্করকে ব্রিটিশবাহিনীর পক্ষে দেখতে পাওয়া গেল। আর একদিকে শেখরকে পাওয়া গেল আজাদ হিন্দ সৈন্যের নায়ক হিসাবে। উভয় দলে সংঘর্ষের ফলে—মেজর বেশী শঙ্কর আহত হয়। শেখর তাকে নার্স সবিতার (ওরফে শতদল) হাঁসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দিল। শেখর যখন শঙ্করের চিকিৎসায় ব্যস্ত, তখন নেতাজীর
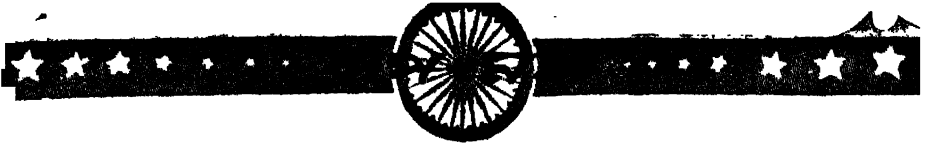
কাছ থেকে হুকুম এল যে, ছয় লক্ষ এমেরিকান, ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্য মণিপুরের আজাদ হিন্দ বাহিনীকে ঘিরে ফেলেছে। তাদের পালিয়ে যাবার কোন পথ নেই। তাই নেতাজী তাদের অযথা প্রাণক্ষয় করতে নিষেধ করে আত্মরক্ষা করতে বলেছেন। কিন্তু শেখর সেদিকে না গিয়ে শঙ্করকে বুকে নিয়ে হেঁটে কিছুপথ অতিক্রম করে ব্রিটিশবাহিনীর গুর্খা রেজিমেন্টের ছাউনিতে যাবার নির্দেশ দিয়ে মাত্র চারিশত আজাদ হিন্দ সৈন্য আর সামান্য কিছু অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে বিষাণপুরের ইংরেজ শিবির আক্রমণ করলো। সেই যুদ্ধে আজাদ হিন্দ সৈন্যের হয় সম্পূর্ণ পরাজয়। শেখর গুরুতরভাবে আহত হয়ে নার্স সবিতার (ওরফে শতদল) কাঁধে ভর করে ধীরে ধীরে আসামের পার্বত্য ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করে স্বীয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হলো। কখনও হেঁটে, কখনও ট্রেনে, কখনও ষ্টিমারে এই ভাবে এসে তারা ভারতবর্ষের সীমান্তে পৌঁছল। এইখানে তারা পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং একটা হোটেলে আশ্রয় নেয়। শঙ্কর দেশে ফিরে স্বগ্রামে রামপুরে আছে। জমিদার রাজকুমার রায় খুব অসুস্থ। তাই তার সেবা করবার জন্য শঙ্কর একজন নার্স চেয়ে টেলিফোন করে মহামায়ার কাছে। মহামায়া তখন অনুপস্থিত। টেলিফোন ধরে উমা এবং জানতে পারে তার শ্বশুর রাজকুমার রায় অসুস্থ। অন্য কোন নার্স তখন না থাকায় উমাতারাই তাঁর সেবা করবার জন্য রামপুরে যায় শঙ্করের আহ্বানে। যাবার সময় মহামায়ার নামে চিঠি লিখে রেখে যায় যে, সে রামপুরে শ্বশুরের সেবা করতে গেল। শেখর আর শতদল হোটেলে আছে। পুলিশ তাদের ধরিয়ে দেবার জন্য পুনরায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, সেটা তারা দেখতে পায়। শেখর শতদলকে তার কাছ থেকে সরে যেতে বলে শঙ্করের আশ্রয়ে। কিন্তু শতদল অস্বীকার করে। তখন উভয়েই যায় শঙ্করের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যাবার আগে শেখর তার মার সংগে দেখা করতে যেয়ে জানতে পারে যে, সে শঙ্করদের বাড়ী গেছে। তারা উভয়েই রামপুরে গেল।

শঙ্কর তখন রাজকুমারের পার্শ্বে বসে ছিল—আর সেখানে ছিল নতুনবৌ নয়নতারা ও নার্সবেশী উমাতারা। হঠাৎ শেখর আর শতদলের আগমন সংবাদ পেয়ে শঙ্কর চলে যায় নীচে তাদের কাছে। এদিকে রাজকুমার একটু আত্মস্থ হয়ে উঠে উমাকে চিনতে পারেন কিন্তু তিনি আর সে আঘাত সহ্য করতে না পেরে পরলোক যাত্রা করলেন। উমাও তখন সে বাড়ী ছেড়ে চলে এল। চন্দ্রনাথ ছিল বিদেশে। রাজকুমারের অসুস্থতার খবর পেয়ে সে ফিরল রামপুরে। বাড়ীতে যখন প্রবেশ করে—তখন নার্সবেশী উমার সংগে দেখা। কিন্তু আশ্চর্য—সেও উমাকে চিনতে পারলো না। উমা চলে গেল। এদিকে শঙ্কর নীচের ঘরে তখন শেখরের সংগে তার ঠাকুরদা রাজকুমারের অসুখের জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করে—শেখরকে দেখাবার জন্যে শেখর আর শতদলকে নিয়ে রাজকুমারের কক্ষে এসে হাজির হয়। কিন্তু শেখর সে ঘরে আসবার আগেই রাজকুমারের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়ে গেছে। নতুনবৌ নয়নতারা তখন সকলকে বলে যে, কলকাতা থেকে যে নার্স এসেছিল—সেও বলে গেল যে, মরবার আগে উনি বুঝে গেছেন যে, উমাতারা ফিরে এসেছে।

শেখর তখন সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে সুরু করে তার যাত্রা। শতদল এতক্ষণ এই নাটকীয় দৃশ্যের দর্শক হিসাবেই রাজকুমারের কক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজকুমার মরে গেল—উমাতারা নার্স হয়ে এসেছিল—সেও চলে গেল। শেখরও চলে গেল। সে এখন কি করে? ভাই ভাইকে চিনলো না, বাবা ছেলেকে চিনলো না। সহসা তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ছুটতে লাগলো শেখরের পিছে পিছে! বোধ হয় এ যাত্রায় তাদের শেষ নেই।

নতুন যাত্রা পথের ইংগিতের ভিতর 'ওরে যাত্রী'র কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বাংলা চিত্র জগতের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য কালির আঁচড়ে ওরে যাত্রীর যাত্রীযুগলের যে পথ নির্দেশ দিয়েছেন—তাকে সেলুলয়েডের ফিতেয় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন কৃতি চিত্রসম্পাদক ও পরিচালক রাজেন চৌধুরী। সুরের মূর্চ্ছনায় 'ওরে

যাত্রী'র বন্ধুর পথকে সহজ ও সুন্দর করে তুলেছেন সুরস্রষ্টা কালীপদ সেন। বিভিন্ন যাত্রীর চরিত্রকে পর্দায় রূপায়িত করেছেন দীপক মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, প্রভা, রেণুকা, নমিতা, জ্যোতি, ধীরেন গাঙ্গুলী, প্রীতিধারা, উত্তম, হরিদাস সত্য, লক্ষ্মী, সুশান্ত, কল্যাণী, অমল ও আরো অনেকে। তাছাড়া আছেন কাহিনীকার নিতাই ভটাচার্য। ছায়াধর যন্ত্রের মারফৎ এঁদের এই রূপায়নকে সেলুলয়েডে রূপান্তরিত করবার দায়িত্ব ছিল কৃতি সাংবাদিক চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্তের ওপর। প্রযুক্তির মূলে রয়েছেন কল্প চিত্র মন্দির। তত্ত্বাবধানে ছিলেন তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আর জনসাধারণের কাছে 'ওরে যাত্রী'কে তুলে ধরবার দায়িত্ব নিয়েছেন বম্বে পিকচার্স ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ। জনসাধারণের স্বীকৃতির উপরই এঁদের সকলের সকল প্রচেষ্টার সার্থকতা নির্ভর করছে সেই মহাপরীক্ষার জন্য এঁরা উদ্বিগ্ন মন নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

ওরে যাত্রীর নবীন প্রযোজক ভূতনাথ বিশ্বাস

খেলাধুলা নিয়েই মেতে থাকতেন। মনস্থির করে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চালাবার মত স্থিরতা কোনদিন নিজেই নিজের মাঝে দেখতে পাননি। ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাস। এর এক জনৈক বন্ধু একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী ভূতনাথবাবুর কাছে এসে বল্লেন: আমি চিত্র ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করতে চাই—আমার এই প্রতিষ্ঠানে অংশীদাররূপে তোমাকে থাকতে হবে। ভূতনাথ বাবুর মনেও মাঝে মাঝে একরূপ একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার বাসনা উঁকি মারতো। কিন্তু নিজের ওপর ততখানি বিশ্বাস ছিলনা বলে এ বিষয়ে আর অগ্রসর হননি। বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হ'তে স্বীকৃত হন। বন্ধুবর ও ভূতনাথবাবুর ভিতর অংশ সংক্রান্ত বিষয়ে দলিল অবধি তৈরী হ'য়ে গেল শুধু রেজিষ্ট্রি করা বাকি রয়ে গেল। অথচ আনুসংগিক কাজ এগিয়ে গেল অনেকদূর। ওরা কাহিনার জন্য নিতাই ভট্টাচার্যের কাছে গিয়ে হাজির হ'লেন। কাহিনী নির্বাচনের পালা শেষ হ'লো। পরিচালকও নির্বাচিত হ'লেন। সংগে সংগে শিল্পী নির্বাচনও সুরু হ'য়ে গেল। কোন কোন শিল্পীকে অগ্রিম মূল্য দিয়ে চুক্তিও করা হ'লো। সমস্যা দেখা দিল—নায়িকা নির্বাচন নিয়ে। বন্ধুবর সন্ধ্যারাণীকে নির্বাচনের জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন, এবং এ দায়িত্ব তাকেই দেওয়া হ'লো। সন্ধ্যারাণীকে অগ্রিম অর্থ দিয়ে চুক্তি করতে বন্ধুবরকে ভূতনাথবাবু অনুরোধ করলেন। কিন্তু এই সন্ধ্যারাণীর নির্বাচন নিয়েই গণ্ডগোল দেখা গেল। নির্বাচনের সময় তার আর পাত্তা পাওয়া যায় না। এদিকে মহরতের তারিখ ৫ই নভেম্বর স্থিরিকৃত হ'য়েছিল। ৪ঠা রাত ৮টা অবধি বন্ধুবর সন্ধ্যারাণীকে চুক্তিবদ্ধা করতে পারলেন না। তখন ভূতনাথবাবু তাঁর চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় অনুভা গুপ্তাকে নির্বাচন করলেন। চুক্তি সম্পাদনে যে অর্থ ব্যয়িত হ'লো, সবই ভূতনাথবাবু নিজের ট্যাঁক থেকে দিলেন। অর্থের সময় বন্ধুবর এক কপর্দকও ব্যয় করলেন না। ভূতনাথবাবুর প্রায় পনেরো হাজার টাকা ব্যয়িত হ'লো আনুসংগিক ব্যাপারে। তখন বন্ধুবর অংশীদাররূপে থাকতে তার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন

ভূতনাথবাবুর অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠলো। এতবড় ঝুঁকি গ্রহণ করবার ক্ষমতা সত্যিই তাঁর হবে কিনা—সেকথা চিন্তা করে তিনি অত্যন্ত ভেবে পড়লেন। যে সব বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ভূতনাথবাবু কাজ আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা ভূতনাথ বাবুকে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করলেন। কিন্তু ভূতনাথ বাবুর মনে তখন জেদও দেখা দিল যেমনি, তেমনি পনেরো হাজার টাকার কথাও তাঁকে কম পীড়া দিল না। তাই তিনি অগ্রসর না হ'য়ে পারলেন না। সম্পূর্ণ একক ঝুঁকিতে সহকর্মীদের নিয়ে একটী গোষ্ঠী তৈরী করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সকলের ঐকান্তিক পরিশ্রম ও চেষ্টায় কলাচিত্র মন্দিরের প্রথম চিত্র নিবেদন 'ওরে যাত্রী'র চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হ'লো। ষ্টুডিও মহলে প্রাক-প্রদর্শনীতে যাঁরাই 'ওরে যাত্রী' দেখেছেন, প্রশংসা না করে পারেননি। 'ওরে যাত্রী' তার নবীন যাত্রীদের কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্যের কথা বলবার জন্য মুক্তির দিন গুনছে। দর্শকসাধারণের অভিনন্দনে 'ওরে যাত্রী' ধন্য হ'য়ে উঠলেই, তার নবীন যাত্রীদলের সকল পরিশ্রম সার্থক হ'য়ে উঠবে!

নয়নতারার রূপ-সজ্জায় শ্রীমতী রেণুকা।

পরিচালক রাজেন চৌধুরী

ছেলে বেলায় সখ ছিল ছবিতে অভিনয় করবার। কিন্তু সে সখ কোন দিন পূর্ণ হয়নি আর বাকী জীবনে হয়ত হবেও না। কারণ, বহু চেষ্টা করেও তার কোন উপায় করতে পারেননি। বেশীর ভাগ সময় এও দেখেছেন যে, পরিচালক মহাশয়রা নতুনদের সংগে দেখা করাও দরকার মনে করতেন না। তখন অভিনয় করার সখ ছেড়ে ছবির কাজ শিখবার চেষ্টা দেখতে লাগলেন।

১৯৪৩ সালে সহপাঠী শ্রীভোলা আঢ্যের (চিত্র সম্পাদক) সাহায্যে রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে সম্পাদকের চতুর্থ সহকারী হিসাবে প্রবেশ করেন এবং বিনা বেতনেই কাজ আরম্ভ করেন। এই রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে প্রবেশলাভ করবার জন্যে রাজেনবাবুকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তিনি কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন যে, তিনি সম্পাদনার কাজ জানেন। কিন্তু তখন এ কাজ কিছুই জানতেন না। বেশীদিন এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাজেনবাবুকে থাকতে হলো না—কারণ, প্রবেশ লাভের তিন চার দিন পরেই রাধা ফিল্মের কর্মসচিব শ্রীযুক্ত হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ধরা পড়ে যান। এইখানে একটু বলে রাখতে হচ্ছে এই যে, হরিপদবাবুর বাহ্যিক দশাটা যতখানি কঠিন ছিল—তাঁর অন্তরটা ছিল ততোখানি সরস তিনি রাজেনবাবুর উপর রাগ না করে সহজভাবে হেসেই ভাল করে কাজ শেখবার উপদেশ দিলেন। সেই সময় শ্রীজ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "দক্ষ-যজ্ঞ" ছবি তোলা হচ্ছিল। আর সম্পাদনা গৃহে শ্রীযুত চারু রায়ের "রাজনটী বসন্তসেনার" সম্পাদনা চলছিল। শ্রীযুক্ত চারু রায় প্রথম থেকেই রাজেনবাবুকে স্নেহের চোখে দেখেছিলেন—আর তিনি যখন শুনলেন যে, রাজেনবাবু বিনা বেতনে কাজ শিখছেন, তখন তিনি সে কথা স্বর্গীয় চিত্ত ঘোষকে যেয়ে বলেন। তাঁরা দুজনে পরামর্শ করে মাসিক পাঁচ টাকা বেতন ঠিক করে দেন। অবশ্য এই টাকাটা তাঁরা তাঁদের পকেট থেকে দিতেন কিনা তা আজও জানা যায়নি। এর পরের মাসেই ষ্টুডিও অফিসে রাজেনবাবুর ডাক পড়লো।

সেইদিনই একটা কাজে ভুল করেছিলেন। ভাবলেন কাজটা বুঝি তাঁর গেল। ভয়ে ভয়ে যেয়ে হাজির হলেন ষ্টুডিও অফিসে - তৎকালীন কর্মসচিব হরিপদবাবুর সামনে। রাজেনবাবুকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, কাজকর্ম শিক্ষা কতদূর হলো। তিনি দেখতে চান যে, তিন চার মাসের মধ্যে রাজেনবাবু স্বাধীনভাবে চিত্র সম্পাদনা করতে পারেন কিনা। আরও জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর মাসিক পনেরো টাকা হিসাবে বেতন ধার্য করা হয়েছে। তিনি সংগে সংগেই পনেরটি টাকা দেন। আজ যে রাজেনবাবু আপনাদের সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছেন, এটা শুধু শ্রীযুত হরিপদ বাবুর দয়াতেই সম্ভব হয়েছিল এবং এর জন্য তিনি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এর পর থেকেই পূর্ণ উদ্দমে কাজ করতে আরম্ভ করেন এবং সত্যিই তিন থেকে চার মাসের মধ্যেই চিত্ত ঘোষের পরিচালিত একখানা মাদ্রাজী ছবির ট্রেলার সম্পাদনা করেন। এর পর রাধা ফিল্মে প্রায় আড়াই বছর কাজ করেন আর এই সময়ের মধ্যে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে চতুর্থ সহকারী থেকে প্রথম সহকারীতে উন্নীত হন। এখান থেকে যান দেবদত্ত ষ্টুডিওতে। সেখানেও কিছুদিন সহকারী হয়ে কাজ করার পর সম্পাদক হয়ে প্রথম কাজ করেন "পথ-ভুলে", "কাঞ্চনী" আরও কয়েকখানি অবাঙ্গালা ছবিতে।

শ্রীযুত ধীরেন গাঙ্গুলী এর পর তাঁর সহকারী আর চিত্র সম্পাদক করে নিয়ে আসেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে। তারপর নিউ টকিজে এবং সেখানে 'দাবী' এবং আরও কয়েকখানা ছবি করেন। এর পর এইখানে হেমন্ত গুপ্তের অসমাপ্ত চিত্র "বন্দিতা" ছবি প্রথমে পরিচালনা করেন। তারপর এস. কে, প্রোডাকসানের হয়ে 'সংগ্রামের' টেক-নিকাল উপদেষ্টা ও সম্পাদনার কাজ করেন। তা ছাড়া "দেশের দাবীর" সম্পাদনাও করেন। "দুঃখে যাদের জীবন গড়া" পরিচালক শ্রীসতীশ দাশগুপ্ত অসমাপ্ত রেখে চলে যান। রাজেনবাবুর ঘাড়েই সেটা শেষ করবার দায়িত্ব এসে পড়ে। সতীশ বাবুর পরিত্যক্ত অসমাপ্ত চিত্রের পরিচালনা এবং সম্পাদনার কাজ শেষ করেন। যদিও রাজেনবাবু বা সতীশবাবু কারও নামে সেটা বাহির হয়নি। হিমাদ্রি চৌধুরীর নাম দিয়ে ছবিখানি আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে সেটা একটা কল্পিত নাম।

১৯৪৭ সালে চিত্র কলা মন্দির লিঃ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হয়ে রাজেনবাবু চলে যান লাহোর। তাদের 'রূপরেখা' চিত্রের চিত্র সম্পাদক ও টেকনিকাল উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবার জন্যই যান। সেখানকার কাজ শেষ করে এসেই "ওরে যাত্রীর" পরিচলনার ভার পান। সেই চিত্র "ওরে যাত্রীকে" আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ভুল ত্রুটির জন্য আপনারা মার্জনা করে প্রকৃত রায় দেবেন আশা করি।

চিত্রশিল্পী শ্রীঅনিল গুপ্ত

শ্রীঅনিল গুপ্ত ১৯৪০ সালের শেষদিকে চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন এবং ভারত পত্রি-কার তৎকালীন চলচ্চিত্র সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার বন্দ্যো-পাধ্যায় তাঁকে অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের মালিক স্বর্গীয় অনাদি নাথ বসুর নিকট নিয়ে যান এবং সুশীলবাবুর সাহায্যেই তিনি চিত্র জগতে প্রবেশ করেন এবং ফটো-গ্রাফীর কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। অরোরাতে তিনি চিত্রশিল্পী শ্রীঅশোক সেন এবং শ্রীবঙ্কু রায়ের নিকট কাজ শিখতে থাকেন। তাঁর শিক্ষা লাভে বঙ্কুবাবু তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

১৯৪১ সালে খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীঅজিত সেন অরোরায় যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত সেন পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদারের 'অভয়ের বিয়ে'র চিত্রগ্রহণ করেন। অনিল বাবু তাঁর সহকারীরূপে কাজ করবার সুযোগ লাভ করেন। এই সুযোগই তাঁকে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের সন্ধান দেয়। ১৯৪২ সালে শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (হারুদা) ও শ্রীসুশীল মজুমদারের চেষ্টায় তিনি সেন মহাশয়ের সংগে এম, পি, প্রোডাকসন্স এ যোগদান করেন এবং 'যোগাযোগ' বাংলা ও হিন্দি চিত্রে সহকারী হিসাবে কাজ করেন। পরে তিনি ১৯৪৩ হতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এম, পি, প্রোডাকসন্সের কর্মী হিসাবে কালীফিল্মস ষ্টুডিওতে চিত্রশিল্পী শ্রী বিভূতি লাহার সহকারী রূপে বিদেশিনী,
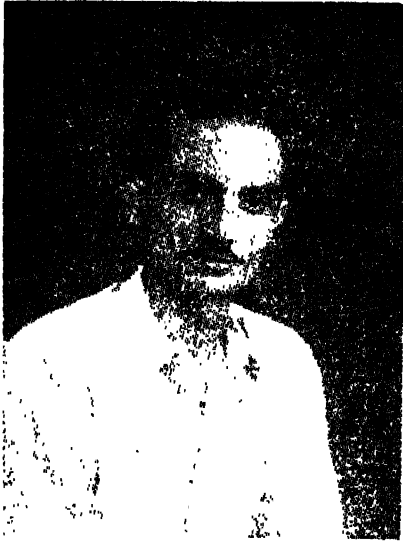
চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত

"পথ ছেড়ে দিল, সাতনম্বর গাড়ী ইত্যাদি চিত্রে কাজ করেন। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে অনেক বাধ বিঘ্ন আসে কিন্তু তিনি সেই সব তুচ্ছ করে তাঁর কাজ করে যান।

১৯৪১ সালে তিনি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে যোগদান করেন। তথায় তিনি 'এই তো জীবন,' 'রাত্রি' ও 'বাপ' (হিন্দি) কথাচিত্রে চিত্রশিল্পী সুরেশ দাসের সহকারী হিসাবে কাজ করেন। ১৯৪৩ সালের শেষে শ্রীযুক্ত দাস তাঁকে প্রথম চিত্রশিল্পী হিসাবে চিত্রগ্রহণের সুযোগ দেন। শ্রী দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালিত ভক্তিমূলক চিত্র 'রাম-প্রসাদ'ই তাঁর প্রথম চিত্র। এই কাজে শ্রীঅজয় কর, শ্রীধীরেন দাশগুপ্ত এবং শ্রীগৌর দাস তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

১৯৪৭-৪৮ সালে তিনি নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্তের 'বিচারক'; চিত্র সম্পাদক ও পরিচালক শ্রীরাজেন্দ্র চৌধুরীর ওরে যাত্রী এবং হিন্দি চিত্র 'শাদি-কে-বাদ' চিত্রের চিত্রের চিত্রগ্রহণ করেন।

বর্তমানে কয়েকটি নূতন চিত্রের তিনি চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তার ভিতর নীরেন লাহিড়ী ও দেবনারায়ণ গুপ্তের 'সংকল্প' ও 'রাত' উল্লেখযোগ্য।

নবীন সুরকার কালীপদ সেন

চিত্রামোদীদের কাছে সুর শিল্পী কালীপদ সেনের নতুন করে পরিচয় দিতে হবে না। একাধিক চিত্রের সুর-সর্জনায় তিনি বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের খুশী করেছেন। 'ভবে যাত্রী'র সুর সংযোজনায় এই নবীন সুরশিল্পী যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন—'ভবে যাত্রী' মুক্তিলাভ করলেই চিত্রামোদীরা সে কৃতিত্বের পরিচয় পাবেন। বয়সে

সুরশিল্পী কালীপদ সেন

নবীন হ'লেও সুর রচনায় শ্রীযুক্ত সেনের দক্ষতা একাধিকবার প্রমাণিত হ'য়েছে। কবি নজরুলের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য কালীপদবাবু লাভ করেছিলেন এবং এই বিরাট প্রতিভার সংস্পর্শে এসে নিজেকে অনেকখানি তৈরী করে নিতে পেরেছেন। কবির কাছে শ্রীযুক্ত সেন এজন্য চিরকৃতজ্ঞ।
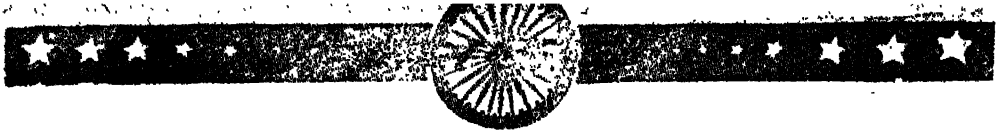
অরক্ষণীয়া—(সমালোচনা) স্থানীয় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেই সর্বশ্রেণীর দর্শকসাধারণের অভিনন্দন লাভ করেছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, শরৎচন্দ্রের এই মর্মস্পর্শী গল্পটীর অন্তর্নিহিত আবেদন রসপিপাসু মনকে একদিন যেমন আলোড়িত করেছিল, চিত্রেও তার এই আবেদন পরিচালক বা শিল্পীদের দ্বারা সম্যক পরিপুষ্টি লাভ করেছে বলে। চিত্রের সাফল্যের মূলে গল্পের যে কতখানি জোর থাকে, তার আর একটা প্রমাণও আমরা পেলাম এই চিত্রে। শরৎচন্দ্রের গার্হস্থ্য ঘাতপ্রতিঘাতমূলক গল্পের মধ্যে "অরক্ষণীয়া" ভাবের গভীরতায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। কাজেই এই গল্পটীর চিত্ররূপের সংবাদে আমাদের মতো আরো অনেকেই উৎসুক হয়েছিলেন। আমাদের এই উৎসুকমন পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। আজকাল চিত্রজগতে যে ভাবে বিখ্যাত লেখকদের লেখার উপর যথেচ্ছাচার চলছে, তার মাঝে "অরক্ষণীয়া" তার পূর্ব রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে বলেই দর্শকসাধারণ একে অভিনন্দন জানিয়েছে তাঁদের অন্তরের। এজন্য পরিচালক ও চিত্রনাট্যকারকে শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অরক্ষণীয়ার অমর কাহিনীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই আশাকরি, দরিদ্র পিতামাতার কালোমেয়ে জ্ঞানদা নীরবে সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো জীবনের প্রতি পদ-ক্ষেপে শুধু আঘাত আর অপমান সহ্য করে এসেছে। তার এই জীবনে একমাত্র আলোকরেখা ছিল তার মা ও বাবার স্নেহ, কিন্তু লোকের মৌখিক বাক্যবাণে এবং দুঃখ দুর্ভাবনা প্রপীড়িত মা বাবাও তাদের মনের ঝাল ঝাড়েন মেয়ের উপর। তাই তার জীবনতরুতে নেই কিশলয়ের সমারোহ,—চতুর্দিকের ঝড় ঝাপটায় হয়তো তার মূলও নড়ে উঠবে। এমনি করেই হয়তো তার জীবনতরু শুকিয়ে যেতো—কিশলয় মুঞ্জরিত হতো না, মুকুলও ফুটে উঠতো না। কিন্তু তার জীবনতরুও একদিন প্রভাতের অরুণিমায় রক্তিম হয়ে উঠলো—প্রণতি জানালো তার মনের মুকুলগুলি সেই দেবতাকে - জ্ঞানদার অতুলদাকে। তার হৃদয়ের রক্তিম অনুরাগ ঐকান্তিকতায়, নিষ্ঠায়, পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সিঞ্চিত হয়ে উঠলো। সাবিত্রীর মতো সেবা দিয়ে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনলো এই কালো মেয়েটীই তার অতুলদাকে—এর প্রতিদানের কথা যেন অতুল কোনদিন না ভুলে যায় এই ছিল তার মায়ের আশীর্বাণী। জ্ঞানদার অন্তরে যে আলো একদিন জ্বলে উঠেছিল—তা আরো উজ্জলতর হয়ে উঠলো—আশার আলোয় তার জীবনের পথরেখা ফুটে উঠলো যখন সে দেখলো মুমূর্ষু পিতার শিয়রে বসে অতুল তার জীবনের ভার নিল। কিন্তু আবার ঘনিয়ে আসে দুর্দিন—অতুল মাধুরীর বাহ্যিক চাকচিক্য সহুরে জৌলুষে,গায়ের কালোমেয়ের অন্তরের আলোকে ভুলে গেল। মোহের অঞ্জনরেখা এলো অতুলের চোখে। জ্ঞানদা এই আঘাতও বুক পেতে সহ্য করে গেলো—তার প্রেমের নিষ্ঠায় সে রইলো অবিচলিত। অবশেষে প্রেমের নিষ্ঠার কাছে মোহের পরাজয় এলো—এই ইংগিত দিয়ে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। কাহিনীর কাঠামোকে বজায় রেখে চিত্রনাট্যে রূপ দেওয়ার মধ্যে নাট্যকারের সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়েছি। দু'একস্থান ছাড়া শরৎচন্দ্রের মূলগল্পটিকে একটুও পরিবর্তিত করা হয়নি—মাধুরীকে মহাকালী পাঠশালার ছাত্রীরূপে না দেখিয়ে কলেজের ছাত্রীরূপে দেখানো এবং অতুলের সংগে তার মেলামেশা গল্পকে ব্যাহত করে নি। অতুলের আদর্শচ্যুতি দেখাতে হলে মাধুরীর সাথে তার প্রেমকে দেখাতে হবে—মূল গল্পে এর আভাষ রয়েছে সুস্পষ্ট। নাট্যকার তাকে বিস্তৃত করেছেন মাত্র। মূল গল্পটী যথাযথ রূপে চিত্রিত করতে যে প্রয়াস ও যত্ন নেওয়া হয়েছে—তা সাফল্যলাভ করেছে পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের আন্তরিকতার জন্য। তাঁর সবল হাতের ছাপ সর্বত্র পরিস্ফুট—এর মূলে রয়েছে তাঁর সংযম ও নিষ্ঠা এবং শরৎ সাহিত্যের প্রতি আন্তরিকতা—তাই তিনি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির উপর নিজের কলমের জবরদস্তি করেন নি।

অভিনয় প্রসংগে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সর্বংসহা জ্ঞানদার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণীর সহজ ও সংযত অভিনয়। তাঁর এই অভিনয় অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রশংসাযোগ্য। জ্ঞানদার চরিত্রটী যে তিনি প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর এই অভিনয়। সাধারণতঃ চাঞ্চল্যপূর্ণ অভিনয়েই আমরা

সন্ধ্যারাণীকে দেখে অভ্যস্ত কিন্তু জ্ঞানদার ভূমিকাতে তাঁকে দেখে তার অভিনয়ের আর একটী অধ্যায় আমাদের চোখে পড়লো—এই অধ্যায়টাই কিন্তু আমার ভাল লেগেছে বেশী। স্বল্প সংলাপের ভিতর দিয়ে ধৈর্য্যের প্রতিমূর্তি জ্ঞানদার শান্ত সমাহিত ভাবটুকু চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনয়ের প্রতি তার আন্তরিক নিষ্ঠার পরিচয়ও এতে পেয়েছি। অতুলের ভূমিকায় রবীন মজুমদার চরিত্রানুযায়ী অভিনয় করেছেন। শেষাংশে মানসিক দ্বন্দ্বের মাঝে অসহায় ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় অতুলের পরিবর্তন সুষ্ঠুরূপ নিয়েছে। এই স্থানে পরিচালকের পরিচালনার প্রশংসা করবো। তাঁর পরই জ্যেঠাইমা স্বর্ণর ভূমিকায় প্রভার অভিনয়ের উল্লেখ করতে হয়। অভিনয় নিপুণা প্রভার অভিনয়ে শরৎচন্দ্রের স্বর্ণমঞ্জরী যথার্থ রূপ নিয়েছে। তাঁর বাচনভংগী, প্রকাশভংগী সব কিছুই কলহপরায়না, স্বার্থ সর্বস্ব স্বর্ণের চরিত্র দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে তুলেছে। জ্ঞানদার মায়ের ভূমিকায় সুপ্রভা মুখুজ্জে, ভামিনী অথবা পোড়াকাঠের ভূমিকায় নিভাননীর অভিনয় চরিত্রগুলির মর্যাদা রেখেছে। "অরক্ষণীয়ার" প্রত্যেকটি ভূমিকাই যথার্থ অভিনীত হ'য়েছে। নবদ্বীপ হালদার, রাণীবালা প্রভৃতি সকলের ভূমিকাই সুঅভিনীত হয়েছে। তবে মাধুরী এবং মাধুরীর মায়ের ভূমিকায় যথাক্রমে নিলীমা দাস তার চেহারায় এবং মীরা দত্ত তার অভিনয়ে দর্শকদের আনন্দ দানে বাধা সৃষ্টি করেছেন। মাধুরীর মা সব সময়েই খানিকটা গুল হাতে করে গামছা নিয়ে ঘাটে যেতেন না—বেশীর ভাগ সময় কাটতো তার নভেল নিয়ে। মীরা দত্তের প্রথম দিকের অভিনয় একঘেয়ে, তবে শেষাংশে তাঁর অভিনয় মন্দ হয় নি। অন্যান্য ছোটখাট ভূমিকাগুলিও ভালই হয়েছে। নবাগত বাণীব্রতের অভিনয়ে ভবিষ্যতের আশা আছে।

চিত্রখানিতে গানের সংখ্যা মাত্র দু'খানি বলে পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যেখানে সেখানে যখন তখন গান জুড়ে দেওয়ার মনোভাব না দেখে সত্যিই খুসী হয়েছি। যে দু'খানা গান দেওয়া হয়েছে, তা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং সংগীত পরিচালক সুরের জন্য

প্রশংসারযোগ্য। আবহসংগীত পরিচালনারও প্রশংসা করবো।

চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয়। এক কথায় বলতে গেলে "অরক্ষণীয়া" সত্যিকারের একখানা ঝরঝরে প্রথম শ্রেণীর বই হয়েছে। পরিচালনার অভিনয়ে দুই একটি ছোটখাট ত্রুটি থাকলেও "অরক্ষণীয়া" সর্বশ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে জ্ঞানদা তার ধৈর্য, অবিচলিত নিষ্ঠা, প্রেম এবং মনের শান্ত সমাহিত ভাব অথচ করুণায় ভরপুর মূর্তিতে দর্শকসাধারণকে অভিভূত করে রাখে। কারোর প্রতি তাই অভিযোগ নেই, অনুযোগ নেই—প্রতি পদক্ষেপে তার জীবনে দেখা দেয় ব্যর্থতা - আশার আশায় যেদিকে ছুটে যায় মরুভূমির রুক্ষতা ছাড়া তার জন্য আর কিছুই থাকে না যাকে অবলম্বন করে সে চায় বেড়ে উঠতে—তাই যায় সরে, সংসারে তার পাওয়া ছিলনা কোন সুখ—শেষ অবলম্বন মাকে হারিয়ে শ্মশানে শোকের প্রতিমূর্তি জ্ঞানদার চিত্র দর্শক মনকে অভিভূত করে দেয়। বিষাদে ভরা এই চিত্রখানি তার অশ্রুর ভরা সম্পদ নিয়ে দর্শকদের সত্যিকারের রস পরিবেশনে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে বলে পরিশেষে আবার পরিচালক এবং শিল্পী গোষ্ঠীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

—মণিদীপা

ভ্রম সংশোধন

ভুলক্রমে দ্বিতীয় প্রবন্ধের শিরোনামায় 'সকল গরল ভেল' স্থলে 'সকল গড়ল ভেল' মুদ্রিত হয়েছে। আশা করি সেজন্য পাঠকসাধারণ ক্ষমা করবেন।

"মাটি ও মানুষ" (সমালোচনা)

"মাটি ও মানুষ"—সুধীরবন্ধু রচিত, পরিচালিত, চন্দ্রিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের নবতম চিত্র নিবেদন।

সুধীরবন্ধুর আলোচ্য ছবির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হ'লো প্রয়োজনাতিরিক্ত পার্থিব ধনসম্পদের জন্য যুগে যুগে মানুষের যে অস্থির ও অশান্ত অভিযান তা'র শেষ কোথায়? একজন মানুষের প্রয়োজন মাত্র সাড়ে তিন হাত মাটির—তবু তা'র আকাঙ্খা আরো অধিক, আরো উদ্দাম। এই যে বাসনা—এই যে লালসা, এর শেষ হ'বে কবে? মানুষের স্বভাবজাত এই পশু মনোবৃত্তির সমস্যাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে চেয়েছেন সুধীরবন্ধু তাঁর "মাটি ও মানুষ" ছবিতে। এ জন্য সুধীরবন্ধুর প্রশংসাই করবো। কাহিনীর বিষয়বস্তুতে কিছুটা অভিনবত্বের পরিচয় দিতে তিনি সত্যিই সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বিষয়বস্তু অভিনব হলেও, তাঁর কাহিনীর আখ্যানভাগ—যার সাহায্যে তিনি মূল বিষয়বস্তু দর্শক সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করবার প্রয়াস করেছেন - নিছক গতানুগতিক। "মাটি ও মানুষ"-এর কাহিনী অতি সাধারণ শ্রেণীর ও মামুলী গয়ায়েব। একই ধরণের ঘটনার সমাবেশে "মাটি ও মানুষ"-এর বিভিন্ন স্তর গ্রথিত হয়েছে ব'লে তা দর্শক মনকে মোটেই স্পর্শ করতে সক্ষম হয় না। এ জন্য কাহিনী হয়েছে একঘেয়ে। বিষয়বস্তুর অনুরূপ অভিনবত্ব ও মৌলিকতা যদি সুধীরবন্ধু কাহিনীর আখ্যানভাগের দিক থেকেও দেখাতে পারতেন তবে "মাটি ও মানুষ" সত্যিকারের সার্থক হয়ে উঠতো। সে ক্ষেত্রে তাঁকে অন্তরের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাতাম। আখ্যানভাগের দৈন্য যে কাহিনীর চমৎকার মূল বিষয়বস্তুকে ব্যর্থ করে দিতে পারে তা'র দৃষ্টান্ত 'মাটি ও মানুষ'।

অভিনয়ের দিক থেকে জমিদার কৃষ্ণচন্দ্রের ভূমিকায় নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। ফণীভূষণের ভূমিকায় হারধন মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য, তবে মাঝে মাঝে তার বাচনভঙ্গী দস্তুরমত মঞ্চ ঘেঁষা। নায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। তিনি নবাগত নন। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি বাংলা ও হিন্দি ছবিতে আমরা তাঁকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। বোম্বেতেও তিনি কিছুদিন ছিলেন। তবু তাঁর অভিনয় ধারার মধ্যে উত্তরোত্তর উন্নতির কোন আশাই পরিলক্ষিত হয় না। মাঝে মাঝে কয়েকটি দৃশ্যে তিনিসুন্দর অভিনয় করেন। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি সম্পূর্ণ নবাগত—এত আড়ষ্ট, এত দ্বিধাগ্রস্ত দেখা যায় তাঁকে, মনে হয় শুধু অভিনই করেছেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর অবহিত হওয়া উচিৎ। অন্যথায় তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমরা সন্দিহান। নায়িকার ভূমিকায়
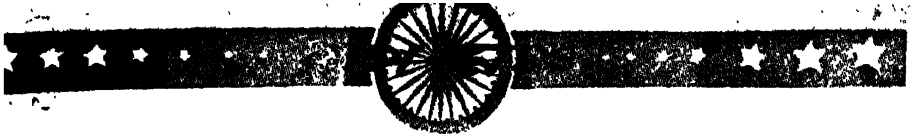
অবতীর্ণা গীতশ্রী সম্পর্কেও কিছু বলবার আছে। এঁর অভিনয় মাঝে মাঝে অতি-অভিনয় দোষে দুষ্ট। অধিকাংশ জায়গায় তাঁর ভাব-ভংগি, ও চলন-বাচনে তিনি এত বেশী দরদ দেন যে, সেগুলি কৃত্রিম বলে মনে হয়। এ দোষ থেকে মুক্ত হতে পারলে তিনি ভালো অভিনেত্রী হতে পারবেন। অন্যান্য ভূমিকা অনুল্লেখ্য।

"মাটি ও মানুষ" -এর সংগীত-পরিচালনা করেছেন খগেন দাশগুপ্ত। ইতিপূর্বে তিনি "সাহারা" ছবির সুরকার হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বাংলা ছবির বিভিন্ন বিভাগে আজ কত অনধিকার প্রবেশকারী যে আনাগোনা করছেন, তা'র কোন সীমা-পরিসীমা নেই। যথার্থ যোগ্যতা যাঁদের আছে, তাঁদের জন্য চিত্রজগতের দ্বার চিরদিনই খোলা আছে এবং থাকবে। কিন্তু তাঁরা কোথায়? তাঁদের ভাগ্যে চিত্রজগতে প্রবেশ করবার সুযোগ সুবিধা কদাচিৎ আসে। তাঁরা অধিকাংশ স্থলেই উপেক্ষিত। কিন্তু যোগ্যতাহীন যাঁরা, তাঁদের তো সুযোগ সুবিধার কোন অভাব দেখি না! তাঁরা একের পর একটা ছবিতে নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন বেশ সহজ ভাবেই। আলোচ্য খগেন দাশগুপ্তও অনধিকার প্রবেশকারীদের দলে। অন্ততঃ "সাহারা" ও "মাটি ও মানুষ" তো তাই প্রমাণ করেছে। বিশ পঁচিশটা বাংলা ও হিন্দি ছবির সুর শুনে যারা কিনা ছবিতে সংগীত পরিচালনা করবার সাহস করেন, তাঁদের স্পর্ধায় স্তম্ভিত হতে হয়। পরিচালনার দিক থেকে সুধীরবন্ধু তাঁর নিজস্ব কোন বৈশিষ্টের পরিচয় দিতে পারেন নি "মাটি ও মানুষ" ছবিতে। ক্যামেরা ও সাউণ্ডের কাজেও যথাযথ।

সুধীরবন্ধু তাঁর পরবর্তী ছবিতে কাহিনীর আখ্যানভাগের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেবেন, এই আশা আমরা করতে পারি কি? কাহিনীর বিষয়বস্তুর দিক থেকে "মাটি ও মানুষ"-এ তাঁর অভিনবত্ব আমাদের মুগ্ধ করেছে—আখ্যানভাগের দিক থেকেও পরবর্তী ছবিতে তাঁর প্রতিভার সম্যক বিকাশ হোক।

—ভুলু গুপ্ত

এস, বি, প্রডাকসন

গত ১৪ই আগষ্ট ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এস, বি, প্রডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'সিংহদ্বার'-এর মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হয়েছে। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটী সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে সিংহদ্বার পরিচালনা করবেন পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। 'সিংহদ্বার'-এর সুর সংযোজনার ভার নিয়েছেন সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায় যিনি দর্শকসাধারণের বিচারে গত ১৩৫৩ সালের প্রতি-যোগিতামূলক চিত্রগুলির ভিতর সুর সংযোজনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন। 'সিংহদ্বার'-এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করবেন—ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, শ্যাম লাহা, প্রভৃতি আরো অনেকে। নায়কের ভূমিকায় পরিচালক নীরেন লাহিড়ী আবিষ্কৃত একজন নবাগত প্রিয়-দর্শন তরুণকে দেখা যাবে। প্রযোজক শ্রীমতী সুনন্দা দেবীও থাকবেন একটী বিশিষ্ট স্ত্রী চরিত্রে। এস, বি প্রডাকসনের প্রথম চিত্র 'দৃষ্টিদানে' অভিনেত্রী এবং প্রযোজক দুই হিসেবেই শ্রীমতী সুনন্দা দর্শক সমাজের যে যে অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে ধন্য হ'য়েছেন - সিংহদ্বার চিত্রে তাঁর সে গৌরব অক্ষুন্ন থাকবে, তাই কামনা করি।

এম, জি, পিকচার্স

পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনা ও পরিচালনায় এম, জি, পিকচার্সের দ্বিতীয় চিত্র 'সিমন্তিনী'র শুভ মহরৎ গত ১৫ই আগষ্ট ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিমন্তিনীর কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত শক্তিপদ রাজগুরু তাঁর রচনার সংগে রূপ-মঞ্চের পাঠকপাঠিকারা বহুদিন থেকেই পরিচিত আছেন।

ভারত জাতীয় প্রতিষ্ঠান

গত ২৭শে আষাঢ় রথযাত্রার দিন ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে এদের প্রথম চিত্র 'সে নিল বিদায়'-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিত্রখানি রচনা ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীজ্যোৎস্নাময় মিত্র। প্রযোজনা করছেন বিনয় রঞ্জন সাহা ও বিষ্ণুচরণ সাহা।

জননী পিকচার্স

বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে এদের 'অশ্রু'র কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন এ, কে, চ্যাটার্জি। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন রাজলক্ষী (বড়), রেবা বসু, নৃপতি প্রভৃতি আরো অনেকে।

আজাদ চিত্রপট লিঃ

নবীন প্রযোজক সাংবাদিক ফকরুল ইসলাম খাঁনের প্রযো-জনায় আজাদ চিত্রপটের প্রথম বাংলা চিত্র 'আলোছায়া'র প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে এসেছে। চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন দর্শকসাধারণের বিচার নির্বাচিত ১৩৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র কাহিনীকার শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচায। 'আলোছায়া'র পরিচালনা ও চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সুরেশ দাসের ওপর।

শ্রীগুরু পিকচার্স

গত ২০শে আগষ্ট ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম চিত্র 'কর্মফল'এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন শ্রীকালীপদ দাস। কাহিনী রচনা করেছেন দুর্গাবতী দেবী।

সন্দীপন পাঠশালা

পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও প্রযোজিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা'র চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। সাধন সরকার সীতারাম পণ্ডিতের ভূমিকাটিকে আপ্রাণ চেষ্টায় যথাযথ রূপ দিতে বিন্দুমাত্র গাফিলতির পরিচয় দিচ্ছেন না। অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা সরকার, সুপ্রভা মুখুজ্জে, অমিতা বসু, প্রদীপ বটব্যাল, সিধু গাঙ্গুলী, কুমার মিত্র, মণি শ্রীমানী, জীবন মুখুজ্জে, শান্তা, বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রভৃতি আরো অনেককে দেখা যাবে। তাছাড়া আরো বহু শিশু অভিনেতার সাক্ষাৎ এই চিত্রে মিলবে। জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সন্দীপন পাঠশালার সুর সংযোজনায় অধিক কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন বলে প্রকাশ। শ্রীঅনন্ত পাল সমস্ত চিত্রখানির প্রস্তুতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।

যুগবানী পিকচার্স লিঃ

গত ২৩শে জুলাই এদের প্রথম চিত্র 'ভাত ও কাপড়ে'র মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। মহরতের পৌরহিত্য করেন শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। 'ভাত ও কাপড়'-এর রচনা ও পরিচালনার ভার নিয়েছেন শ্রীশচীন পাল।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবের শুভ দিনটিতে অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ-এর যে প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় পেয়েছি, তাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারবো না। বাংলার শিশুদর্শক সমাজকে যদি বাংলা চিত্রজগতের কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়—তা অরোরা ফিল্ম্ করপোরেশন। বাংলা ছায়া জগতে তারাই শিশু চিত্রের প্রদর্শক। স্বাধীনতা উৎসব মুখরিত দিনটিতে 'চিত্রা' প্রেক্ষাগৃহে শিশুদের জন্য অরোরা যে অভিনব আয়োজন করেছিল তারও প্রশংসা না করে পারবো না। বাঙ্গালী শিশুদর্শকদের ভিড়ে চিত্রা প্রেক্ষাগৃহটি যে অভিনব রূপে সজ্জিত হ'য়ে উঠেছিল—শিশুদের কলরব মুখরিত তার এই গর্বিনী রূপ দেখে নিউথিয়েটার্সের শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারও বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। সাময়িকভাবে চিত্রা যেন একটী শিশু প্রেক্ষাগৃহে রূপান্তরিত হয়েছিল। কারণ, ওদিনকার প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র শিশুদের উপযোগী খণ্ড চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থাই করা হয়েছিল। অরোরা ফিল্ম্ করপোরেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন খণ্ড চিত্র ওদিন প্রদর্শিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার ওদিনকার এই শিশু মেলায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর অভিভাষণে শিশুদের উদ্দেশ্য করে বলেন; বহু দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। এই স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য স্বাধীন দেশের নাগরিকের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠবার জন্য আরো কত দুঃখ কষ্ট আমাদের সহ করতে হবে। শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। দেশের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য অরোরা ফিল্ম্ করপোরেশন যে অভিনব আয়োজন করেছেন—এজন্য তাঁদের ধন্যবাদ না দিয়ে পারবো না। আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁরা এরূপ আয়োজন করবেন।"

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ওদিনকার ঘটনা ছিল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র কর্তৃক আনন্দমেলার মৌমাছি ও সব পেয়েছির আসরের স্বপনবুড়োকে এক সংগে মাল্য ভূষিত করা। যে সব খণ্ড চিত্র ওদিন দেখানো হয়, তার ভিতর 'জয়তু নেতাজী' থেকে নেতাজীর বক্তৃতা···কবিগুরুর আবৃত্তি—জাতির ভবিষ্যৎ ও সব পেয়েছির আসর—যাতে মণিমেলা ও সব পেয়েছির আসরের বিভিন্ন বিষয় দেখানো হয়। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় 'জয়যাত্রা' এই খণ্ড চিত্র দিয়ে। গত বৎসরের স্বাধীনতা উৎসবের দৃশ্যাবলী নিয়ে এই খণ্ড চিত্রটি গৃহীত হয়। এই অনুষ্ঠান শুধু শিশুদেরই অনুপ্রাণিত ও খুশী করে না—বয়স্ক দর্শকও যারা উপস্থিত ছিলেন—তাঁরাও অকুণ্ঠ প্রশংসায় কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানিয়ে যান।

মায়াপুরী পিকচার্স লিঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম চিত্র তিলোত্তমার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

কবি পরিচালক

আমরা শুনে বিশেষ আনন্দিত হলাম—আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু কবি ও সাহিত্যিক রমেন চৌধুরী মশাই মানসী ফিল্ম্স লিঃ-এর চিত্র পরিচালনার্থ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগে দীর্ঘদিনের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। শ্রীযুক্ত চৌধুরী ইতিপূর্বে চিত্ররূপা, মুভিটেকনিক ও রাধা ফিল্ম্স-এর সংগে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিও, হিজ মাষ্টার্স ভয়েস, কলম্বিয়া, হিন্দুস্থান প্রভৃতির সংগেও যুক্ত আছেন। আমরা শ্রীযুক্ত রমেন চৌধুরীর বর্তমান প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি।

রাঙ্গারাখী পিকচার্স

এদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'বীরেশ লাহিড়ি'র কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে অভিনেতা বেচু সিংহের পরিচালনায় এগিয়ে চলেছে। বীরেশ লাহিড়ির কাহিনী রচনা করেছেন সমর সরকার। আর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন শান্তি গুপ্তা, স্মৃতি বিশ্বাস, বন্দনা দেবী, তারা ভাদুড়ী, দেবীপ্রসাদ, দেবকুমার। সুর-সংযোজনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সত্যদেব চৌধুরী।
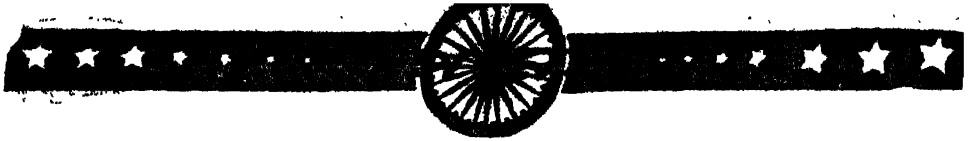
কামিনী পিকচার্স লিঃ

কামিনী পিকচার্স লিঃ-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'তরুণের স্বপ্ন' ২৭শে আগষ্ট থেকে একযোগে রূপবাণী ও ইন্দিরা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। কয়েকজন উদীয়মান আশাবাদী তরুণ 'ভালছবি হয়না' বলে বাংলা চিত্রের যে দুর্ণাম আছে সে দুর্ণাম দূর করবার প্রতিভা নিয়ে বাংলা চিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন কিছুদিন পূর্বে। 'তরুণের স্বপ্ন সে সব উৎসাহী তরুণদের—আশা আকাঙ্খা আন্তরিকতার রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে। চিত্রখানির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়। কাহিনীর অভিনবত্ব ও চিত্রনাট্য রচনার নৈপুণ্য 'তরুণের স্বপ্ন' চিত্রে সহজেই চোখে পড়বে বলে প্রকাশ। যান্ত্রিক কলাকুশলতার দিকেও কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি রেখেছিলেন। বম্বে থেকে চিত্রখানিকে সম্পূর্ণরূপে রিরেকর্ডিং করে আনা হ'য়েছে। চিত্রখানির শব্দ সংযোজনার দায়িত্ব ছিল শব্দযন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় মল্লিকের ওপর। তিনি তার সে দায়িত্ব সম্পাদনে বিন্দুমাত্র গাফিলতির পরিচয় দেন নি। 'তরুণের স্বপ্ন'-এর চিত্র গ্রহণের ভার নিয়েছিলেন প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী সুহৃদ ঘোষ। তার ক্যামেরার যাদুকার্য অতি সহজেই দর্শকদের চোখকে খুসী করবে বলে প্রকাশ। দৃশ্যরচনায় ধীরেন নাগ তার কর্তব্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করেছেন. 'তরুণের স্বপ্ন' –যে তরুণ অভিনেতাটির আশা আকাঙ্খাকে ভর করে প্রথম রূপলাভ করেছিল তিনি পাহাড়ী ঘটক। নায়ক চরিত্রে প্রথম প্রকাশের সংগে সংগেই তিনি দর্শক মনে স্থান জুড়ে নেবেন। 'তরুণের স্বপ্ন-এর অন্যান্য চরিত্রগুলিকে যাঁরা রূপায়িত করে তুলেছেন তাঁদের ভিতর শ্রীমতী রেণুকা রায়, গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য, ফণি রায়, সন্তোষ সিংহ, চিত্রা, রেবা, মণিকা, বেবী কমলেশ, অঞ্জলি সেনগুপ্তা,মাষ্টার শম্ভু, মিহির, শিবকালী, সুশীল রায়, নৃপতি, বলীন সোম, শ্রীহর্ষ, গৌর রায়চৌধুরী, অলক গুপ্ত, প্রভৃতি আরো অনেকে রয়েছেন। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করেছেন সুরশিল্পী কালীপদ সেন।

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীর প্রথম নিবেদন 'যার যেথা ঘর'-এর মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। 'যার যেথা ঘর'-এর কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন প্রখ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। 'যার যেথা ঘর'-এর বিভিন্নাংশে অংশ গ্রহণ করবেন ছবি বিশ্বা, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, শ্যামলাহা, সমর মিত্র, তারা হালদার, অচিন্ত্যকুমার, মীরা সরকার, সরযূবালা, রেণুকা, কেতকী প্রভৃতি আরো অনেক। কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্যকেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। বিভিন্ন শিল্পী ও সাংবাদিক ছাড়া অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাদের ভিতর নাম করা যেতে পারে নারায়ণ সরকার, শৈলেন রায়, সুবোধ মিত্র, (কচি বাবু) জগদীশ চক্রবর্তী, বিমল ঘোষ, অজয় কর, নিমাই ঘোষ,চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমোদ ঘোষ, মাখনলাল দাস, সলিল কুমার জানা, অহি ভূষণ চৌধুরী, ইন্দুভূষণ চৌধুরী, খগেন রায়, প্রভৃতি আরো অনেক।

—উপরে—

শ্রীমতী কানন প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচার্সের 'অনন্যা' চিত্রের নায়িকার রূপ-সজ্জায় শ্রীমতী কানন

—নীচে—

অগ্রদূত পরিচালিত 'সমাপিকা' চিত্রে জহর গঙ্গোপাধ্যায়

—উপরে—

এস, ডি, প্রডাকসনের 'বাঁকা লেখা' চিত্রে সুপ্রভা, কমল মিত্র, অনুপকুমার, জহর ও কানন দেবীকে দেখা যাচ্ছে।

—নীচে—

'অঞ্জনগড়' চিত্রের নায়ক স্বর্গত রাজা গাঙ্গুলী ও অন্য একটী অংশে পারুল কর।

ভাদ্র
১৩৫৫
★

রূপ-মঞ্চ

অষ্টম-বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা

বেতাল-জগত—(৩)

'বেতার জগৎ' সম্পর্কে বে-তাল চলার যে অভিযোগ আমরা উপস্থিত করেছি—তাকে সমর্থন করে রূপ-মঞ্চের বহু পাঠক পাঠিকা এবং বেতার শ্রোতারা বহু চিঠি দিয়েছেন। এমন কি আমাদের সমালোচনায়ও যদি কর্তৃপক্ষের বে-তাল চলা বন্ধ না হয়, তবে মসি ছেড়ে অসি ধরতেও তাঁরা অনুরোধ করেছেন এবং সে অসি-যুদ্ধে দলবেঁধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেও তাঁরা পিছু হটবেন না—তাঁরা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এসে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে সে অসি-যুদ্ধে আমরা আপাততঃ লিপ্ত হবো না—প্রতিপক্ষ অহিংস না হলেও, অন্তত অহিংসার ভান করে থাকেন—এবং গান্ধীজির চেলা বলে এতই ঢাক পিটিয়ে থাকেন যে, অন্ততঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের কাছে তাঁদের প্রমাণ করতে কষ্ট হবে না যে, তাঁরা সব গান্ধীজির অহিংস ভক্ত। গান্ধীজির মৃত্যুতে ক'দিন নাকী সুরে কেঁদে অন্ততঃ সে ভণ্ডতাকে সত্য বলেই প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। তাই, সংগ্রাম আমাদের আপাততঃ মসি নিয়েই করতে হবে। এই মসি সংগ্রামেও যে আমরা নিতান্ত শক্তিহীন, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। কারণ, সমস্ত মসিজীবিদের সাহযোগিতা আমরা পাব—পাঠক পাঠিকা ও বেতার শ্রোতাদের সমর্থনত রয়েছেই। তাছাড়া বেতার জগতের বেতাল তাল ঠোকার ঠোকাঠুকি প্রত্যক্ষ ভাবে যেসব শিল্পী ও সংশ্লিষ্টদের পিঠে পড়েছে—তাঁরাও রয়েছেন আমাদের দলে। গত সংখ্যায় এরূপ একজন ভুক্তভোগী জনপ্রিয় সংগীতজ্ঞ সুরসাগর জগন্ময় মিত্রের যে চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তাই এর সপক্ষে প্রকৃষ্ট নজির এবং একথাও বলে রাখছি তিনি একাই এঁদের ভিতর নন—তাঁর দল অনেক ভারি। কারণ, অনেক দিন থেকেই এই বেতাল ঠোকা ঠুকি সুরু হয়েছে কিনা। আপাততঃ একথা রেখে বে-তাল তাল নিয়ে আলোচনা কচ্ছি।

প্রথম আলোচনা প্রসংগে বেতার জগতের অভিনয় আসর সম্পর্কে দু'চারিটি কথা বলেছিলাম এবং এবিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা পেশ করেছিলাম। এই পরিকল্পনায় একটা কথা উল্লেখ করতে আমাদের ভুল হ'য়ে গিয়েছিল—সেকথা হচ্ছে, নাটকাভিনয়ের সময় নির্ধারণ। পয়তাল্লিশ মিনিট বা এক ঘণ্টায় মঞ্চসাফল্য বা কোন ভাল নাটকের জবাই কার্য অনুমোদন করতে আমরা মোটেই রাজি নই। দেড় থেকে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা একটি পূর্ণাংগ নাটকের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। কর্তৃপক্ষ হয়ত বলবেন: অন্যান্য কেন্দ্রগুলির অনুষ্ঠানলিপির সংগে সমতা রক্ষা করে একসময়ে এতটা সময় নাটকাভিনয়ের জন্য নির্ধারণ করা মোটেই সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা বলবো, নাটকাভিনয়ের স্বার্থের জন্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতেই হবে এবং আর একটা বিষয়ে এই সম্পর্কে দিল্লী কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, তা হচ্ছে সংবাদ পরিবেশন। যখন প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে মেনে নেওয়া হয়েছে, তখন প্রাদেশিক ভাষায় সংবাদ

পরিবেশনের দায়িত্ব প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলির উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত। প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলি সর্বভারতীয় সংবাদ এবং প্রাদেশিক সংবাদ সংগ্রহ করে প্রাদেশিক ভাষায় প্রচার করবেন। সর্বভারতের জন্য দিল্লী কেন্দ্র থেকে শুধু ইংরেজি অথবা যে ভাষা গণপরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রভাষা রূপে পরিগণিত হবে, সেই ভাষায় সংবাদ পরিবেশিত হবে। তাতে প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলি তাঁদের অনুষ্ঠান লিপি রচনায় অনেকটা সুবিধা পাবেন—অন্ততঃ সময় নির্ধারণের দিক থেকে। আর বাসি সংবাদের গঞ্জনা থেকে শ্রোতারাও রেহাই পাবেন। বেতার মারফৎ যদি শ্রোতারা টাটকা খবরই না পান, তবে সে খবরের কী মূল্য আছে? একথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, সংবাদ পত্রে সকালে যে খবরগুলি মুদ্রিত হয়—রাত ৯টায়ও দিল্লী কেন্দ্র সেগুলি থেকে নতুন কোন সংবাদ দিতে পারেন না—যাতে শ্রোতাদের ঔৎসুক্য মিটতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় কোন সংবাদ যা মুখে মুখে স্থানীয় লোকমারফৎ প্রচারিত হয়- তার সত্যতা নিরূপণ করবার জন্য শেষ অনুষ্ঠান লিপি পর্যন্ত বেতার যন্ত্রটি খুলে রাখলেও ঔৎসুক্য মেটে না—এর প্রমাণ বহুবার শ্রোতারা পেয়ে থাকেন। এই সংবাদের জন্য পরের দিন ভোরের পত্রিকাগুলির উপরই শ্রোতাদের নির্ভর করে থাকতে হয়। এবং যখন সংবাদপত্র মারফৎ সংবাদটি পেয়ে তাঁদের ঔৎসুক্য মিটে গেল, তখন হয়ত দিল্লী কেন্দ্র থেকে বেচু বন্দো অথবা বসন্ত ঘোষাল—মুখ খুললেন। সংবাদ সংগ্রহের জন্য সংবাদ পত্রগুলি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন—কেন্দ্রীয় বেতার কেন্দ্রেরও অনুরূপ ব্যবস্থা আছে বলেই ত জানি—তবু কেন তাঁরা টাটকা সংবাদ দিতে পারেন না? এ বিষয়ে তাঁদের আরও তৎপর হওয়া সমীচীন বলেই মনে করি। দিল্লী কেন্দ্র থেকে যে কয়জন ঘোষকের কণ্ঠ শোনা যায়—যে দু'জনের নাম করলাম, তাঁদের কণ্ঠ যে প্রত্যেক শ্রোতার কর্ণপীড়ার উদ্রেক করে—একথাটাও কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়ে এবিষয়ে ব্যবস্থাবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এই দু'জন কি উমেদারীর জোরেই ঘোষকের পদে বহাল হ'য়েছেন? শারদীয়া সংখ্যার পর আবার 'বেতার জগতের' 'বেতাল-চাল' নিয়ে বগ্‌ড়া সুরু করবো—তাই আজকের আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করে 'জয়হিন্দ' বলে বিদায় নিচ্ছি। শ্রীকাঃ

রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজ ও আমার অগণিত বন্ধু বান্ধবদের কাছে বিনিত অনুরোধ—শারদীয়া সংখ্যা রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত না হওয়া অবধি কারোর সংগে ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ বা আলাপ আলোচনা করতে পারবো না বলে তাঁরা যেন আমায় ক্ষমা করেন। সাধারণের সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য বেলা ১০-১১টা অবধি আমার যে সময় নির্ধারিত ছিল, তাও সাময়িক ভাবে বাতিল করে দেওয়া হ'লো। একমাত্র শারদীয়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই বর্তমানে কারো সংগে দেখা বা কথাবার্তা বলতে পারবো। **টেলিফোনে যদি কেউ আমাকে ডাকেন, বেলা ৪টা থেকে ৬টার ভিতরই আমি কথা বলতে পারবো এবং তাও শারদীয়া-সংখ্যা সংক্রান্ত হ'লে, অন্য সময় টেলিফোনে সাড়া দেওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠবে না।** আশা করি রূপ-মঞ্চের শুভানুধ্যায়ীরা শারদীয়া সংখ্যার স্বার্থের কথা চিন্তা করে উক্ত সংখ্যা প্রকাশিত না হওয়া অবধি এ' নিয়ম মেনে চলতে আমায় সাহায্য করবেন—কালীশ মুখোপাধ্যায়

বাংলার রঙ্গালয় ও নাট্যসাহিত্য

ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

★

সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের উপর দিয়ে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে অভূতপূর্ব বিপ্লবের ঝড় ব'য়ে গেছে, তার আলোড়নে পরিবর্তন হ'ল অনেক কিছুর। ভারতবর্ষের বহুধা বিভক্ত জীবন স্রোতের প্রতিধারায় নতুন জীবনের নতুন রস প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা যখন আমাদের রঙ্গালয় ও প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত হই, তখন মনে হয়, জাতীয় জীবনের রসসঞ্চার এই তীর্থ স্থানগুলি কদর্য নরকে পরিণত হতে চলেছে।

একটা কথা আছে, জাতিকে চেনা যায় রঙ্গালয়ের মধ্য দিয়ে। জাতির জীবন অনেকখানি নির্ভর করে রঙ্গালয়ের উপর। কথাটা বিচার করে দেখলে সত্যই ইহা অস্বীকার করা যায় না। জাতীয় জীবনের উন্নতি, অবনতি, আশা, আনন্দ ও বেদনার প্রতিচ্ছায়া ফুটে ওঠে নাটক ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। চলচ্চিত্র বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনে নব প্রেরণা সঞ্চারিত করা যায়, বিপ্লবকে আহ্বান করা যায়, জাতির ইতিহাসকে নবরূপে রূপায়িত করা যায়। বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও শিক্ষা প্রসারের সংগে সংগে রংগালয় বা চলচ্চিত্রের আকর্ষণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে—আজ তাই অন্যান্য স্বাধীন দেশেও চলচ্চিত্রের সমাদর এত বিস্তৃত ও প্রকট।

প্রথমেই চলচ্চিত্রের বর্তমান বিকল অবস্থার কথা বিচার করে দেখতে গেলে অত্যন্ত দুঃখের সংগে একথা বলতে হয় যে, আমাদের দেশে চলচ্চিত্রোপযোগী গল্প বা নাটকের অত্যন্ত অভাব। ভারতবর্ষ দুই শত বৎসরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেংগে আজ স্বাধীনতার দুয়ারে প্রবেশ লাভ করেছে। বিদেশীর শাসনে ও শোষণে, এতদিন ভারতবাসী দারিদ্র, অশিক্ষা, দ্বেষ ও হিংসার সংক্রামক ব্যাধিতে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। আজ যদি এই সদ্যজাগ্রত জাতিকে সত্যকারের সংগঠনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, যদি তার রুগ্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবল করে গড়ে তুলতে হয়, তবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, সুরুচিপূর্ণ ও সংগঠনমূলক জাগরণশীল চিত্র কাহিনীর একান্ত প্রয়োজন।

আজকাল বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে যে সকল বাংলা ছবি দেখান হচ্ছে, সেগুলি কি চলচ্চিত্রোপযোগী কাহিনী? কিংবা রঙ্গালয়ে যে সকল নূতন নাটক অভিনীত হয়ে থাকে, সেগুলি কি এখনকার দিনে সময়োপযোগী বা দেশের গঠন মূলক কাজে কোন উপকারে আসবে—না সহায়তা করবে? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত উপন্যাস বা কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথের গল্প বা উপন্যাস বা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সময়ে সময়ে চলচ্চিত্রোপযোগী করে নিয়ে ছবিতে দেখান হয়ে থাকে, এ অতি সাধুপ্রয়াস এবং সমর্থনীয়, কিন্তু পরিচালকেরা মধ্যে মধ্যে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার ও পাণ্ডিত্যের হাস্যকর পরিচয় দিতে গিয়ে মনীষী লেখকদের প্রতি অমর্যাদাই করে থাকেন। এমন অনেক সুসাহিত্যিক, সুলেখক আছেন, যাঁদের গল্প বা নাটক এখনকার দিনে উপযোগী বলে গ্রহণীয় হতে পারে। কিন্তু তাদের আদর নেই। সামান্য কয়েকজন লেখক বা নাট্যকাররূপে পরিচিত লেখকের লেখনী প্রসূত পুরাতন ধারানুযায়ী লিখিত চলচ্চিত্রের কাহিনী বা নাটক গ্রহণীয় হয়ে থাকে। কতকগুলি পুঁজিবাদী লোক আছেন যাঁরা আজকাল এই ব্যবসায় অগ্রণী হয়েছেন, তাঁরা মনে করেন যে, কতকগুলি নামকরা নটনটী দিয়ে যে কোন জঘন্য জিনিষ অভিনয় করিয়ে দেখাতে পারলেই যখন দর্শকসমাগম হয়ে থাকে, তখন প্রগতিমূলক নাটকের বা গঠনমূলক ছবিরইবা কি প্রয়োজন থাকতে পারে? চলচ্চিত্রের কাহিনীর মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর ভাঁড়ামী বা কোন অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করে দিলেই সাধারণের কাছ থেকে বাহবা পাওয়া যাবে—এই যদি ধারণা হয়ে থাকে, তবে সেটা সম্পূর্ণ ভুল। মানুষের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তাকে ভবিষ্যতে শিক্ষার আলোক

থেকে দূরে রাখা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নয়। অতীতের কালিমা মুছে ফেলে দিয়ে সব কিছুই ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে তুলতে হ'বে। পুরাতন ছেড়ে দিয়ে নূতনের সন্ধান করতে হবে। উপযুক্ত নাট্যকারের অভাব নূতনের দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। বুঝতে হবে--জানতে হবে সাধারণের মনের কথা, দেশের কল্যাণার্থে নিয়োজিত করতে হবে সমস্ত চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে। জাগ্রত জনসমাজ প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে পেতে চায় সত্যকারের আনন্দ ও সেই সংগে ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয়ও করতে চায়। জাতির আগামীদিনের যারা হবে কর্ণধার, যারা জাতিকে গড়ে তুলবে পৃথিবীর মধ্যে একটা আদর্শস্থানীয় করে—সেই নবীন আগন্তুকদের জয় যাত্রার পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে।

আর একটা অভাব যা আজ আমরা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে থাকি—সেটা হচ্ছে যে, এ দেশে বালক বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র কোন কিছুরই বন্দোবস্ত নাই। পৃথিবীর অন্যান্য স্বাধীন দেশে বালক বালিকাদের জন্য আলাদা প্রেক্ষাগৃহ আছে, যেখানে শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন শিক্ষামূলক নাটক, নাটিকা বা চলচ্চিত্র দেখানো হয়ে থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, তেমনিতর একটা স্বতন্ত্র প্রেক্ষাগৃহ সারা বাংলা দেশে, শুধু বাংলা বলি কেন—ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও নাই। এ যে ভারতবাসীর পক্ষে কতবড় কলঙ্কের কথা তা চিন্তা করতেও মাথা নত হয়ে আসে। শিশু-মনকে গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। এই প্রচেষ্টাকে ফলবতী করবার জন্য এগিয়ে আসতে হবে সমস্ত শিক্ষিত সমাজকে। তাদের উপযোগী করে নাটক বা চিত্রকাহিনী রচনা করতে হবে। সংগে সংগে জাতীয় সরকারেরও এ বিষয়ে সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, সত্যই কি এই চলচ্চিত্রের গল্প লেখকের বা রঙ্গালয়ের জন্য নাট্যকারের অভাব? আমি বলবো—"না।" আজকাল অনেক নূতন লেখকের মধ্যে একটা অভিনব দৃষ্টিভংগী ও সংগঠনমূলক

লেখার আভাষ পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের কথা যে, তাঁদের সে লেখার উপযুক্ত মর্যাদা তাঁরা পান না। রঙ্গালয়ের পরিচালকগণ বা সত্ত্বাধিকারীরা বা চলচ্চিত্রের প্রযোজকেরা বা পরিচালকেরা মনে মনে এমন একটা ভুল ধারণা, মিথ্যা পাণ্ডিত্যের গর্ব পোষণ করে থাকেন যে, নূতন লেখকের লেখা ভাল হলেও তা প্রত্যাখাত হয়ে থাকে। আবার চলতি খাতার মুষ্টিমেয় চলতি লেখকের লিখিত চলচ্চিত্রের কাহিনী বা নাটক জঘন্য রুচিহীন, সাধারণের সমক্ষে পরিবেশনের নিতান্ত অনুপোযুক্ত হলেও—সেইগুলি সাদরে অধিক মূল্যের বিনিময়ে গৃহীত হয়ে থাকে। এ থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, তাঁদের ভালমন্দের বিচার শক্তি কতদূর? তার উপর আবার নাটকের পরিচয় ও বিচারের ভার যদি সমগ্র ভাবে নটের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়—তাহলে তার চাইতে আর অতিবড় দুঃখের বিষয় কি থাকতে পারে? নট হ'লেই নাটক লেখা যায় না, আবার নাট্যকার হ'লেই নট হ'তে পারে না, কিন্তু এই উভয় গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিও এ দেশে খুবই কম অথচ আজকাল বিলুপ্ত গৌরব রঙ্গালয়গুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব নটের হাতেই গুরুভার অর্পণ করা হয়। অনেক সময় যদি প্রধান নটের মনের মত ভূমিকা না থাকে, তিনি চক্ষু বুঝে মন্তব্য করে বসেন যে, এ নাটক সুবিধাজনক নয়—এ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হতে পারে না। বর্তমানে রঙ্গালয়ে উক্তপ্রকার নটই সর্বাধিকার নিয়ে একাধিপত্য করছেন। এটা কিন্তু তাঁদের সম্পূর্ণ অনধিকারের চর্চা—একথা স্বীকার করতেই হবে। নটের কর্তব্য—নাটকীয় চরিত্রকে রূপ দিয়ে, ভাব ও দরদ দিয়ে সজীব করে তোলা। নাট্যকারের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ হতে না দেওয়া। আর একটি বিষয় এই প্রসংগে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না বোধ হয় যে, অনেক সময় নাটক রচনা করবার পর নাট্যকারকে রঙ্গালয়ের দোরে দোরে মুরুব্বিদের কাছে সুপারিশ করে বেড়াতে হয়। সুপারিশের যদি জোর থাকে তা'হলে তাঁর লিখিত নাটকখানি গৃহীত হয়। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে প্রত্যাখানই করা হয়ে থাকে। সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরিশ্রম করে একখানি নাটক রচনা করে কোন আত্মসম্মান সম্পন্ন নাট্যকারই এতটা হীনতা বা নীচতা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। এক্ষণে আমাদের কর্তব্য হবে সেই আগামী দিনের অনাগত লেখকদের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত ক'রে তোলা—তাঁদের উৎসাহিত করা।

আমাদের আর একটি বিষয়ও এই সংগে ভাবতে হবে। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও মনীষী ব্যক্তিদের নিয়ে একটী সঙ্ঘ গঠন। তাঁদের কাজ হবে—চলতি বছরের সমস্ত নাটক বা চলচ্চিত্রের কাহিনী বিচার করে দেখা। শ্রেষ্ঠ নাটক সম্বন্ধে তাঁদের বিচারের মতামত পেশ করা। শুধু শ্রেষ্ঠ নাটক বিচার করলেই এ কাজ সম্পূর্ণ হবে না—সেই সংগে সেই নাট্যকারের উপযুক্ত পারিশ্রমিকেরও সুব্যবস্থা করতে হবে। সে পারিশ্রমিক ও সম্মান হবে বিলাতের নোবেল (Noebel) প্রাইজ বা রাশিয়ার ষ্টেলিন (Stalin) প্রাইজের মত, শ্রেষ্ঠ নাটক লেখার জন্য যে প্রতিযোগিতা হবে, তা থেকে লাভবান হবে দর্শকমণ্ডলী—আর লাভবান হবেন রঙ্গালয়ের স্বত্ত্বাধিকারীরা। তাঁরা যদি সম্মিলিত ভাবে এইরূপ প্রস্তাবটিকে আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন এবং অর্থ সাহায্য করে এইরূপ প্রতিষ্ঠানটীকে গোড়ে তোলবার সহায়তা করেন—তা'হলে এইরূপ প্রতিযোগিতার ফলে যে সব সর্বাঙ্গ সুন্দর প্রগতিমূলক ও সংগঠনমূলক নাটক অভিনীত হবে, তাতে তাঁরা যে লাভবান হবেন, একথা আমি জোর করে বলতে পারি। ভারতবর্ষ আজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। অনাহার, অর্ধাহার ও অশিক্ষায় আমরা আজ মেরুদণ্ডহীন। জাতির এই ঘুণধরা জীবনকে আবার নবীন মন্ত্রে সঞ্জীবিত করে তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ স্থানীয় করে গড়ে তোলার দুর্জয় সাহস ও সঙ্কল্প নিয়ে আজ আমাদের এগিয়ে আসতে হবে যার যতটুকু ক্ষমতা আছে, তাই নিয়ে। আজকের এবং আগামী দিনের লেখক, লেখিকা, নাট্যকার, পরিচালক, প্রযোজক, সত্ত্বাধিকারীরা এই মহান মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে জাতিকে সত্যকারের শক্তিশালী করে গড়ে তুলুন এই আমাদের বাসনা। এই প্রচেষ্টার আশু সাফল্য আমাদের কাম্য।

চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত সাক্ষীগোপালের অপূর্ব মাহাত্ম্য নিয়ে বলাই
— পাচাল প্রযোজিত বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন! —

সাক্ষীগোপাল

পরিচালনা :
চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও
গৌর সী

সাক্ষীগোপাল

সংগীত পরিচালনা :
বলাই চট্টোপাধ্যায়

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : গৌর সী * ব্যবস্থাপনা : অমর মান্না (এ্যা:)

●

সাক্ষীগোপাল

পুরী ও ভুবনেশ্বরের মাঝামাঝি বিস্তানগর গ্রামে বড মিশ্র ও ছোটমিশ্র নামে দুই ব্রাহ্মণ বাস করতেন। বড় মিশ্র ধনী আর ছোট মিশ্র দরিদ্র। দু'জনে একসংগে তীর্থ পর্যটনে বেরিয়েছিলেন। বড় মিশ্র পথিমধ্যে একটা মন্দিরে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে পড়েন। ছোট মিশ্র প্রাণ ঢেলে সেবা করে তাঁকে আরোগ্য করে তোলেন। সেবার প্রতিদানে নিজের কন্যাকে ছোট মিশ্রকে দান করবেন বলে বড় মিশ্র প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু গৃহে ফিরে এসে আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে বড় মিশ্র তার প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন; বরং তাঁর অনুগত গ্রামবাসীরা সভা ডেকে ছোট মিশ্রকে অপমান করে এবং ব্যঙ্গ করে বলে : মিছেমিছি প্রতিশ্রুতি ভংগের অভিযোগ আনছো কেন? তোমার মত গরীবের কাছে ও কন্যাদান করতে যাবে কেন? বেশ, কোন সাক্ষী আছে তোমার? ছোট মিশ্র চিন্তিত হ'য়ে পড়েন! তাইত! কে তার হ'য়ে সাক্ষ্য দেবে। আর সেখানেত আর কেউ ছিল না। অভিমানে তিনি ছুটে যান সেই দেব মন্দিরে। সাক্ষী একজন আছেন বৈকী? মাথা খুঁড়তে থাকে দেবতার পায়ে, 'তুমি ছাড়াত আর কোন সাক্ষী ছিল না! তুমিই শুনেছো সব কথা। তুমি যদি সত্যের প্রতিপালক হও— আমার হ'য়ে কী তুমি সাক্ষী দিতে আসবে না! যদি না আসো—তোমারই পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো।' ছোট মিশ্রের আকুল আর্তনাদে মন্দিরের দেবতা বিচলিত হ'য়ে পড়েন— তিনি যে সত্যই সত্যের প্রতিপালক, সেকথা প্রমাণ করবার জন্য ছোট মিশ্রের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারেন না। এই অপূর্ব দেব-মাহাত্ম্যের কথা নিয়েই গড়ে উঠেছে সাক্ষীগোপালের গল্পাংশ। — — —

★

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে :
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় : ঝর্ণা দেবী : তুলসী চক্র : গৌর সী
দুলাল দত্ত : বলাই চট্টো : অনুপকুমার : বলাই : হারাধন : অমর : প্রভৃতি

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে চিত্রখানির প্রস্তুতি চলছে—

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন : দক্ষিণ ব্যাঁটরা : হাওড়া

যুদ্ধোত্তর
জার্মাণির ছায়াচিত্র
মোহিত মোহন চট্টোপাধ্যায়

★

নাজি শাসনের সদাপ অধ্যায়ে জার্মাণ শিল্পের হুকুমবরদারি করেই দিন কেটেছে। তারপর শুরু হ'লো যুদ্ধ—ক'টি বছর জার্মাণির কাটল একটা বীভৎস প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে। দেশের শিল্প আর সংস্কৃতি মানবতার ভগ্নাংশদের দিকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে শুধুই দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর হিংস্রতার আগুন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল।

তারপর এল' ছেচল্লিশ সাল…

বৃটেন আর রাশিয়ার তাঁবের-তদারকে সারা জার্মাণিতে, বিশেষ করে বার্লিনে, আবার নতুন করে শিল্পপ্রচেষ্টার ধুম পড়ে গেল। আবার চিত্রজগতে জাগল কর্মব্যস্ততা, লাগল আলোর ঝলমলানি, উঠল ক্ল্যাপষ্টিকের খটখটানি। অনেকগুলো ছবি তৈরি হয়ে পর্দার বুকে আত্মপ্রকাশ করল। ষ্টুডিওর কারখানা থেকে আরও কত ছবি প্রদর্শনের জন্যে তৈরি হতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই কত নতুন কম্পানি গড়ে উঠল, কত নতুন মুখের দেখা মিলল, এল কত নতুন নতুন পরিচালক, জাদুসৃষ্টিকারী কলাকুশলী। আবার রসের পথে শিল্প পাড়ি জমাল।

তাই আজ আবার জার্মাণির ছবির ধারা আর গতি, প্রকৃতি আর কাহিনী নিয়ে আলোচনা করা যাক, রসের জালে যে শিল্পের প্রস্তুতি আবার চলে তার সমালোচনা।

শিল্পরসজ্ঞেরা কেউই স্বীকার করতে চান না যে, শিল্পের যাচাই হয় চলতি বাজারদরের কষ্টিপাথরে। দর্শকরা হচ্ছেন বিচারক। কোন ছবির দামের দাগ পড়ে তার প্রয়োজনীয়তা আর চলতি রুচির মাপকাঠিতে বিচার করে। কোন্ ছবিকে সমাজ আপন করে নেবে বা কোন ছবিতে সমাজে আসবে প্রতিক্রিয়া তা জানতে হলে পরিচালক আর শিল্পীকে চলতি বাজার দরের মাপকাঠি মানতেই হবে। এটা আলোকের মতই সত্য। চলচ্চিত্রের পেছনে রয়েছে যান্ত্রিক উপাখ্যান। তাই তার জন্মের সংগে সংগেই বাজারে খোঁজ পড়েছে, আর সৃষ্টি হয়েছে বাজার দর। একটা ছবির পেছনে যে খরচটা হয় লাভ সমেত সেটা ফিরে আসবে কিনা সেটা শিল্পপতি ভাববেন বই কি। তাই বেশির ভাগ সময়েই ছবির ভেতর মুখ্য হয় তার দর আর দরের কষাকষি, গৌণ হয়ে যায় দেশ আর প্রগতি, পরিচালকের আদর্শ বা মতবাদ সেখানে হয় নিষ্প্রভ।

অথচ সত্যি কথা বলতে কি, ছবির যতটা শক্তি আছে সাহিত্যের তা নেই। যুগপ্রকৃতি আর সমাজ অন্তরের মধ্যে সেতু রচনায় সাহিত্য বিফল হলেও হতে পারে কিন্তু চিত্র আত্মিক যোগাযোগ স্থাপনে অদ্ভুত ক্ষমতা রাখে।

এই সব ভেবেই জার্মাণির নতুন পরিচালক ও প্রযোজক গোষ্ঠী বাজার দরের সংগে আদর্শের, ব্যবসার সংগে শিল্পের সমন্বয় ঘটাবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে জন্ম নিল বিশেষ শ্রেণীর একটি ছবি—নাম হ'লো তাদের 'ৎসাইৎনাহে'। এই ছবিগুলোর উপকরণ জোগাতে লাগল আশপাশের জীবন আর আজকের ভাঙাচোরা সমাজ,—যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবিই সেলুলয়েডে রূপান্তরিত হ'তে লাগল। তা না হয় হলো, কিন্তু এই যে পরিচালকেরা চিত্রজগতে বিশেষ একটি শ্রেণী সৃষ্টি করলেন এটা কি সারা পৃথিবীর সমাদর পেল? আন্তর্জাতিকতার প্রশ্ন উঠলেই সবার আগে চোখ পড়ে চিত্রের বিষয়বস্তুর ওপর, পারিপার্শ্বিকের সংমিশ্রন ও স্ফুটনের ওপর। জার্মাণির 'ৎসাইৎ' ছবিগুলির বিষয়বস্তু আহরিত হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে জার্মাণির আবহাওয়ার মধ্যে থেকে, তাদের সমস্যা তাদের চরিত্র কোনটিই নির্বিশেষকে নিয়ে কারবার করতে চায় না। তাহলে 'ৎসাইৎ' চিত্রনীতিভ্রষ্ট বই কি। সর্বযুগের সবদেশের সকল মানুষের যে ছবি তার প্রধান লক্ষ্য বিশ্বজনীন আবেদন ফুটিয়ে তোলা,—জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে একই ঝঙ্কার তোলা। চলচ্চিত্রের জন্ম হতেই পরিচালকদের লক্ষ্য থাকে দর্শকদের দিবাস্বপ্নকে ছবির মধ্যে ফুটিয়ে তুলে ছবিটিকে আকর্ষণীয় করা। তাই বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে চলতেই তাঁরা
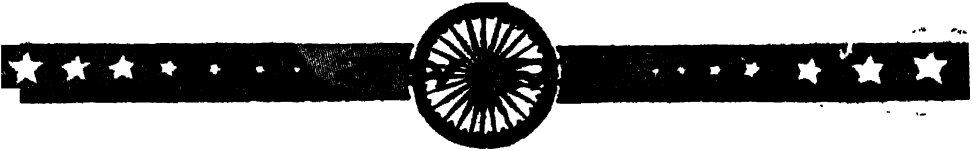
ছিলেন অভ্যস্ত, তাঁদের কাহিনীতে দুঃখের কান্নায় জড়ানো থাকলেই বুঝতে হতো সে-ছবির পরিসমাপ্তি সুখ-মিলনে—'হসাইৎ' ছবি এই সব পুরনো গতানুগতিকতাকে কাটিয়ে বলিষ্ঠরূপে দেখা দিয়েছে কই! 'হসাইনাহে' ছবি অবশ্য দর্শকদের চোখের সামনে বাস্তবের রুক্ষ কঠিন রূপ মেলে ধরে, কিন্তু তার সংগে সব সময়ই তার চেষ্টা চলতে থাকে কী করে নীতিকথা প্রচার করবে—ভবিষ্যতের কল্পনারঙ্গীন ছবি এঁকে কী করে মানুষকে বর্তমান সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখবে।...এটাও আবার অবশ্য স্বীকার্য যে, চিত্র জগতের বাস্তবতা আর কঠিন পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনধারার মধ্যে মূলগত পার্থক্য কোথায় বা কী তা ঠিক করা বড় কম কথা নয়। কিন্তু তাহলেও পরিচালকদের একটু তো মানতেই হবে, চিত্র জগতের কাজ করবার বর্তমানের পশ্চাদপটে, নীতি দিয়ে গড়া কোন অগ্রপটের সেখানে স্থান নেই।

'হসইৎ' ছবির খাঁটী মানে এসব থেকে করা যায়। বর্তমানের আবহাওয়া কণ্টকিত ছবি, আর এই বর্তমান রয়েছে দূর অতীতে। পরিচালকেরা শুধু তাকে বর্তমানের কলাকৌশলে রসিয়ে সাধারণের মাঝে পরিবেষণ করছেন। তাঁদের কাহিনী মনন রাজ্যের গতি-প্রকৃতির ধার ধারে না, বাস্তবকে মানে না। অতীতও যা করেছে, বর্তমানের ছবি 'হসাইৎ'ও তাই করছে—দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরছে রঙের খেলা, তাদের চোখে লাগাচ্ছে দিবাস্বপ্নের আমেজ। তার চরিত্রগুলি বর্তমানকে এড়িয়ে ভবিষ্যৎকে নিয়ে বাঁচে। যুগপ্রতিভার প্রাণ-কল্লোল হতে চিত্র নাট্য রচিত হয় না,—রচিত হয় আদর্শগত উদ্দেশ্যের পরিপোষণে নজির তুলে আর দলিলের সাহায্যে তার প্রমাণ দিয়েছে। বাস্তবের প্রকৃত রূপকে দর্শকদের কাছ হতে সযত্নে সরিয়ে রেখে 'হসাইৎ' বলে, এই ভাবে তোমাদের ভবিষ্যৎকে আবাহন করতে হবে। এই তোমাদের কর্তব্য, আজ তোমাদের কী করা উচিত সে কথা ভাবতে হবে। অথচ কান পাতলে স্পষ্ট শোনা যায়, বিধ্বস্ত জার্মাণির বুকচেরা দীর্ঘশ্বাস—হতাশার আর ব্যর্থতায় তা ভরা। কিন্তু ছবি জার্মাণির দর্শকসাধারণকে সে-কথা জানতে দিয়ে কেবল শোনায় রাশ রাশ শুষ্ক নীতি কথা।

'নতুন জার্মাণির সর্বশেষ সৃষ্টি...'হসাইৎ' ছবি তার উদ্দেশ্য হতে চ্যুত হয়েছে,—কিন্তু তাহলে কিসের ওপর তার গড়ার কাজ চলবে, কী হবে তার মূল কথা। প্রথমেই দরকার নির্ভেজাল বাস্তবকে হাজার হাজার মানুষের সামনে তুলে ধরা। শুধু ইতিহাস বলে গেলেই সর্বাধুনিক ছবি তৈরী হ'লো না, ঐতিহাসিক চিত্রের যে সব ভুলত্রুটি সাহিত্যিক-ক্ষমা লাভ করেছে, সেই সব ভুল করলে সর্বাধুনিক ছবির চলবে না। সবার ওপর সমাজের কোন ভুল খবর বা বিকৃত রূপ যাতে দেশের মধ্যে পরিবেষিত হতে না পাবে সেদিকে সর্বাধুনিক ছবির কড়া নজর রাখতে হবে। আর বর্তমানকে দিতে হবে পুরো সম্মান। কেন না, বর্তমান চিরকালই বর্তমান,—নীতি কথায় তাকে বেঁধে চিত্ররূপ দিতে যাওয়া বোকামি। তাই 'হসাইৎ' ছবিকেও চলতে হবে মানব মনের ধারা ও সংগতির সংগে সংগত করে। দর্শকদের কাছে কেবল জার্মাণির ধ্বংস স্তূপটাকেই বড় করে ধরলে হবে না, যারা মানুষের সব কিছু হারিয়েছে, তারা কী ভাবে সেই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে বাস করছে সেকথাও বলতে হবে। আন্তর্জাতিক সমাদর করতে হলে পরিচালকদের এসব নিয়ে আরও চিন্তা করতে হবে। এতে কোন দেশই ছলাকলা আশ্রয়ের কথা তুলবে না, এতে অন্য দেশের করুণা ভিক্ষাও করা হয় না বা অন্য জাতির সহানুভূতি আকর্ষণের কথাও এখানে আসে না। মোট কথা, সব সময়েই ছবির মধ্যে রাজনীতিক মতবাদ প্রচারের অভ্যাস ছেড়ে দিয়ে কোন রকম আদর্শের আওতায় না গিয়ে আজকের জার্মাণিকে এমন ছবি গড়তে হবে—যার মূল প্রকৃত শিল্পের মাপকাঠিতে বিচার করা হবে।

কিন্তু এসব কথা আজকের জার্মাণি ভাবছে কই! পরিচালকেরা তাঁদের ছবির জন্যে সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডী বেধে

নিয়েছেন। তাই তাঁদের কাহিনীও জার্মাণির ধ্বংস স্তূপকে নিয়ে। জার্মাণির বাইরের দেশগুলি তাঁদের এই নির্বাচনীকে কিছুতেই তারিফ করতে পারে না—ৎসাইৎ তাই জার্মাণির বাইরের সমাদরও পেল না। একথা (Defa) কম্পানি বুঝেছেন। তাঁদের চিত্রগড় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত হলেও, তাঁদের অর্থবল সবার চেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ৎসাইৎ ছবি তৈরী করা থেকে বিরত হয়েছেন। পৃথিবীর বাজারে যদি চাহিদাই না থাকে তো ৎসাইৎ তৈরী করে কী লাভ।

সর্বাধুনিক ছবির মূল নীতিকে আজকের জার্মাণি শুধু যে এড়িয়ে চলেছে তাই নয়, তার সংগে অবহেলাও করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ছবির বিষয়বস্তু যে যুগ থেকেই আহরণ করা হোক না কেন—তা সে প্রাচীন মিশর কি মধ্য যুগ কিংবা নেপোলীও যুগই হোক—তাতে কিছু আসে যায় না। বিশ্বজনীন আবেদন সর্বযুগের ছবিতেই এক। কিন্তু 'ৎসাইৎ' তো তা করছে না। সে কেবল আজগুবি কথা আর একঘেঁয়ে প্যাঁচ কষতেই ব্যস্ত। যা বর্তমান শতাব্দীর সর্বাধুনিক ছবি তাকে এসব কথা ভুলতে হবে! আজকে সমস্যা আর বিশ্বের দাবি জার্মাণির চিত্রশিল্পের রূপ বদলে দিয়েছে, কিন্তু তার অন্তর রাজ্যের পরিবর্তন হলো কোথায়! আজও জার্মাণি তার অতীতের বারটি শোচনীয় বছরের মতো মনে করে যে, মনকে নির্দেশনা দিয়ে গড়ে তোলাই ছবির একমাত্র পরম কর্তব্য। তাই শুধু জার্মাণির ভগ্নস্তূপকে সেলুলয়েডের বুকে ফুটিয়ে তুলেই সে সন্তুষ্ট হতে পারছে না, তার সংগে মতবাদ আর নীতিকথা প্রচারেরও ধূম লাগিয়ে দিয়েছে। ছবি কেবলই প্রচার করছে, দুর্জন শাস্তি পাবেই, সুজন পাবে পুরস্কার, অধ্যবসায়ী হবে সফল…

নাজি শাসনের প্রচারবাতিকই এর জন্যে দায়ী। জার্মাণি আজও তার প্রভাব-মুক্ত হতে পারে নি। আপনা হতেই জার্মাণির মন সেই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, আর শিল্পীরা বিশ্বজনীন চরিত্র হতে হচ্ছেন বঞ্চিত।—জার্মাণির আজ যা মর্মন্তুদ, তা তার দুঃখ দুর্দশা বা বোমা বিধ্বস্ত শহর—গাঁ নয় —তা হচ্ছে সারা জার্মাণিতে মানবতার অসহ্য নির্যাতন। পৃথিবীর সর্বত্রই এর রূপ অভিন্ন। নির্যাতিত মানবতাই অতীতের কালিমা আর অন্যায়ের পারে সারা বিশ্বকে একই প্রেমবন্ধনে বাঁধতে সমর্থ হবে। বিশ্বজনীন ছবি গড়তে হবে বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে সম্বল করে। যদি প্রকৃতই বর্তমানের ছবি তৈরী করতে হয়, তাহলে বারেকের জন্যেও নির্যাতিত মানবাত্মার কথা ভুললে চলবে না। 'ৎসাইৎনাহে' ছবির কাঠামো যদি তারই ওপর রচিত হয়, তাহলে তার পরিচালক প্রযোজকদেরও পৃথিবীর বাজার নিয়ে আর মোটেই মাথা ঘামাতে হয় না।

শিল্পের চলতি বাজার দর ঠিক করতে হলে প্রথমেই যে শিল্পের নিজস্ব মূল্যের কথা ওঠে, এটা খুবই সত্যি কথা। শিল্পের আংগিক আর কাঠামো আর সাফল্য সম্বন্ধে যেখানে সন্দেহের অবকাশ, সেখানে বাজার দর নিয়ে মনেতে প্রশ্ন জাগবেই। দর্শকদের হৃদয়তন্ত্রীতে বারেকের জন্যে আগ্রহ আর অনুসন্ধিৎসার সুর জাগান যায়—কিন্তু সেইটে তো আর মানবাত্মার অন্তর নোঙরানো আবেদনের পরিবর্তে চিরকালের জন্য ধরে রাখা যায় না। ভগ্নস্তূপ আর তার সংগে মাঝে মাঝে কিছু কিছু আত্মাবনতির কাহিনী বললেই তো আর 'ৎসাইৎনাহে' ছবির সংগে বর্তমানের কাজ কারবার চুকল না। তারা বরং ছবির শিল্প মূল্যের অবনতি ঘটায় আর আন্তর্জাতিক সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু জার্মাণির আজকের পরিচালক ও শিল্পপতিরা সেকথা মোটেই ভাবছেন না। একথাও তারা জানেন না যে, তাঁদের ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভংগির পরিবর্তনের প্রযোজন। তাঁরা শেষে করবেন কি, 'ৎসাইৎ' ছবি তেমন পয়সা না দিলেও তা তোলা থেকে বিরত হয়ে আবার সেই কাহিনীর জন্যে পুরনো উপন্যাস-গল্পের পাতা উল্টাবেন, প্রগতির সংগে তাল রেখে ছবি তোলার যে ঝঞ্ঝাট আর দায়িত্ব, তা এড়িয়ে গিয়ে আবার সেই একঘেঁয়ে প্রেম-বিরহ, ঠাট্টা-বিদ্রুপ আর ন্যাকামি নিয়ে মেতে উঠবেন। বিশ্বের মানবাত্মা আবার ব্যর্থতার সম্মুখীন। আবার পৃথিবী শুনবে সেই পুরনো কথা, বাস্তব বড় এক ঘেঁয়ে—মনকে তা বড় ধাক্কা দেয়। 'ৎসাইৎ' ছবির পরিচালক প্রযোজকদের ব্যর্থতায় এই কথাই আবার প্রমাণিত হবে যে, খাঁটি বাস্তবকে নিয়ে ছবির বাজার চলতে পারে না। কিন্তু ভুল কার?

সিপ্রা দেবী

প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত বসু মিত্র প্রযোজিত 'কালোছায়া' চিত্রের বিশিষ্টাংশে।
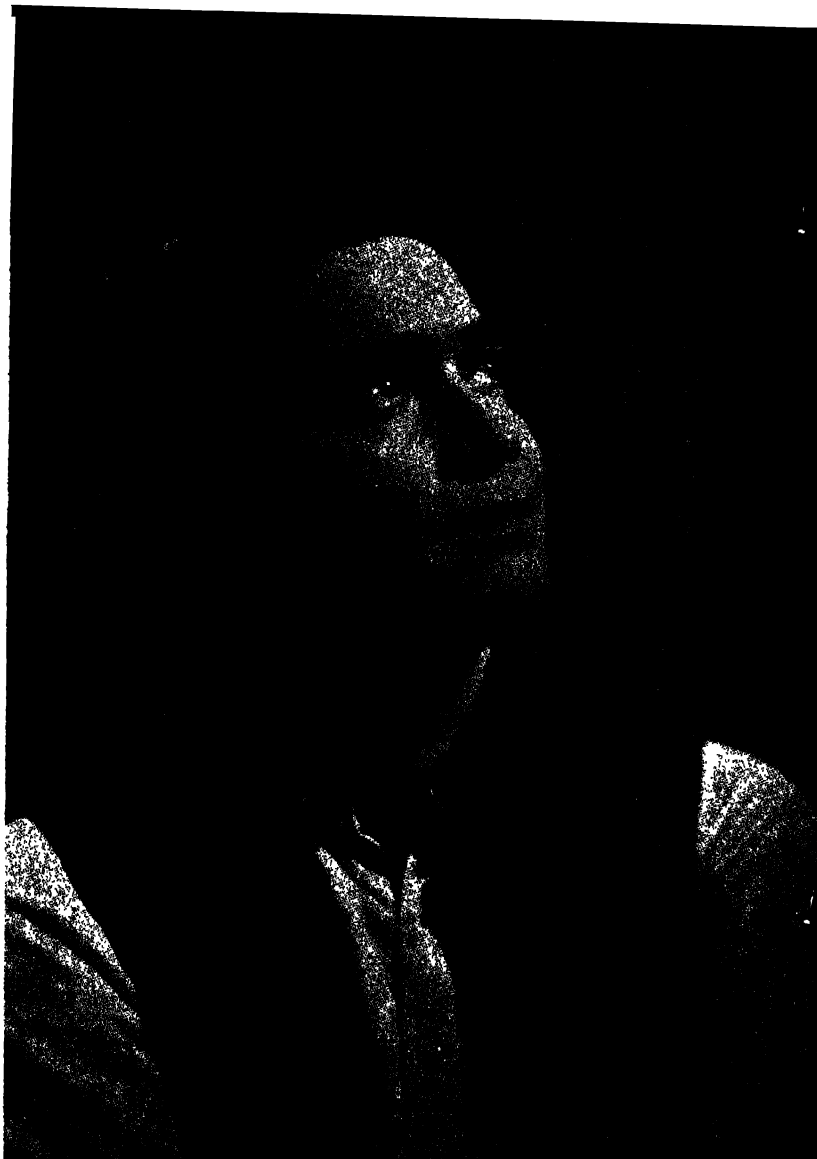
সুজিত চক্রবর্তী

রূপ-লেখা পিকচার্স প্রযোজিত 'আবর্ত'-এ নায়কের রূপ-সজ্জায়।

রূপ-মঞ্চ : ভাদ্র-সংখ্যা : ১৩৫৫।

মেঠোসুর

(২)

[চলচ্চিত্র কাহিনী]

গৌর সাঁ

বর্তমান গল্পটির লেখকের সংগে রূপ-মঞ্চের পাঠক সাধারণের পরিচয় না থাকলেও, ইতিপূর্বে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেছে। নাট্যকার হিসাবেও এঁর সংগে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় হ'য়েছে। তাছাড়া নিজে একজন যশস্বী সৌখীন অভিনেতা। চলচ্চিত্র জগতের সংগেও বহুদিন থেকে জড়িত আছেন। সম্প্রতি এঁর আর একটি কাহিনী 'সাক্ষী গোপাল' চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও এঁর যুগ্ম পরিচালনায় বলাই পাচালের প্রযোজনায় চিত্র রূপায়িত হ'য়ে উঠছে। বর্তমান কাহিনীটিও শীঘ্র চলচ্চিত্রে দেখা যাবে বলে আশা করতে পারেন।

সে পদধ্বনির রহস্য তাদের কাছে অজানাই রয়ে গেল... গৃহবাসীদের অন্তরাত্মা শুধু উন্মুখ আগ্রহে নিবদ্ধ রইল ফ্যালার ব্যাণ্ডেজ করা বুকটির দিকে...কষ্ট সাধ্য নিঃশ্বাসে শুধু ওঠানামা করছে। পাড়ার ডাক্তার এসেছিল সন্ধ্যার আগে আর একবার আসবার কথা বলে গেলেও আর সে আসেনি...

ভোরের দিকে ফ্যালা চোখ মেলে চাইলে...ঘোলাটে সে দৃষ্টি...একটা অস্ফুট যন্ত্রণাধ্বনি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর সে দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে শান্তির হেঁট হওয়া মুখটীর উপর স্থির হয়ে রইল। অস্ফুট স্বরে ফ্যালা ডাকলে-- "শান্তি!"—বলেই ম্লান হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল।

সে হাসি দেখে শান্তির বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠতে থাকে চোখে হু হু করে জল গড়িয়ে আসে... প্রাণে প্রাণে তা রোধ করতে করতে সে আরো হেঁট হয়ে ফ্যালার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায়..দু'জনের নিঃশ্বাস দু'জনের মুখে এসে লাগে!

গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে শান্তি বলে - "ফ্যালাদা!"

ফ্যালা মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বলে—"ফটোটা পকেটে আছে নাও...!"

শান্তি হাত বাড়িয়ে পকেট থেকে ফটোটা বার করে দেখে যেমনটি সে বলেছিল ঠিক তেমনিধারাই তোলা! ফ্যালা ধীরে ধীরে বলছে—"ছবিটা তুলে দেখতে দেখতে রাস্তা চলছিলুম হঠাৎ একটা চেঁচামেচি উঠলো। কে যেন বললে, "পালাও পালাও" কিছু বুঝবার আগেই পেছন থেকে "উঃ উঃ!—"

পাশ থেকে পার্বতী বলে ওঠে—"মিছরির জল খাবে বাবা!" ফ্যালার দৃষ্টি পড়ল অশ্রুভারাক্রান্ত পার্বতীর শুকনো মুখটার উপর ..মৃদু হাসলে—

পার্বতী হেঁট হয়ে তার মুখে দিল জল.. সে জল গলার ভেতরে গেল না। ঠোটের পাশ দিয়ে বাইরে এসে পড়লো। পার্বতীর চোখে ভেসে উঠলো—ফ্যালার দৃষ্টিতে প্রাণ গেছে হারিয়ে--কাঁচের মত ঘোলাটে দৃষ্টিটা শান্তির মুখের উপর নিবদ্ধ.. অচঞ্চল...স্থির!...হাসিটুকু তখনও লেগে আছে তার ঠোঁটে ফ্যালা মূর্চ্ছিত হয়ে গেছে!

পার্বতী চিৎকার করে উঠে—"ওগো একি হলো!"

"- ফ্যালা, ফ্যালা, ও বাবা কথা ক'...কথা ক'।"

শান্তি কাঁদলো না...এক ফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে পড়লো না.. পাথরের খোদা মূর্তির মত স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি নিয়ে ফ্যালার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে রইল ..সেই মুখের ওপর ভেসে উঠল—দুটা বালক বালিকা ছোটাছুটি করছে... সাঁতার কাটছে.. গাছে চড়ছে ..নীল ক্ষেতের বুকে আলসে ধরে চলছে...বাঁধের ওপর কাঁধ ধরাধরি করে গান গেয়ে চলছে ..হঠাৎ সে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে...যে জলে ভেজা সে সব দৃশ্য...কুয়াসায় সব যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—!

তারানাথ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় তারপর ফ্যালার মুখের দিকে চেয়ে বিকৃত কণ্ঠে—"আমি...আমি কি করবো—?"

বাইরের পদশব্দ এবার দরজার কাছে এসে থামে...ধীরে ধীরে বন্ধ দরজা খুলে যায়...

ঘরের অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় দরজা ধরে চক্রধর কম্পিত কণ্ঠে ডাকে—"তারানাথ ..তারানাথ—!"

তারানাথ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে…চক্রধর তারানাথের কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে বলে—"ভয়কি, ভয়কি, ফ্যালা যদি ছেড়েই যাবেরে তারা, আমার শান্তি থাকবে তোর কাছে…চিরজীবনের মত তোর কাছে ছেড়ে দিয়ে যাবো—!"

এই ব্যাথাঘন ক্ষণটি তিক্ত অতীতের কথা ভুলিয়ে দিয়ে তাদের আপন করে দিলে!

শান্তি এক সময় তাদের অলক্ষ্যে উঠে গেল ঘরের বাইরের দিকে…তার কথা ঘরের কটী প্রাণী গেলো ভুলে। ঘণ্টা দুই বাদে ফ্যালা যখন চোখ চাইল তখন শান্তির কথা তাদের মনে পড়ল।

উন্মাদের মত তারানাথ ছুটে গেল বাইরে শান্তিকে ডাকতে ডাকতে…"ওরে শান্তি, ফ্যালা চোখ চেয়েছে…চোখ চেয়েছে—!"

হঠাৎ ছুটতে ছুটতে তারানাথ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে! এক পরম দৃশ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠে…অন্ধকারে উঠোনের তুলসীর বেদীতলে শান্তি উপুড় হয়ে পড়ে আছে…একরাশ মাথার চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠে…একটী হাত প্রসারিত হয়ে বেদীকে স্পর্শ করে আছে…গভীর স্তব্ধতার বুকে ধ্যানস্থা গৌরীর মত আত্মসমাহিতা হয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে…ধীরে ধীরে তারানাথ গিয়ে শান্তির পিঠে হাত রাখলে ক্ষণিকের জন্য। শান্তির শরীর কেঁপে উঠে—

তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে শান্তি বলে—"ঠাকুর…!"

গাঢ় কম্পিত কণ্ঠে তারানাথ বলছে—"তোর ঠাকুর মুখ রক্ষে করেছে মা…চোখ চেয়েছে, ফ্যালা চোখ চেয়েছে!"

তারপর দিন ও রাত কোথা দিয়ে যে কেটে যায় সে বারতা শান্তির কাছে অজানাই রয়ে গেল তার ধ্যান ভাঙাতে কারুর সাহসও হলো না…ফ্যালার কাছে থেকে কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, কারুর দিকে না চেয়ে…কোন কথা কানে না তুলে সে সেবা করে চলে ঐকান্তিকভাবে।

ধীরে ধীরে ফ্যালা আসে আরোগ্যের পথে…সে উঠে বসতে চায় শান্তির দেহে ভর দিয়ে সে তাদের সামনের ছোট বাগানটীতে সকাল বিকাল ঘুরে বেড়ায়…শান্তির কালিপড়া চোখের কোলে দুঃসহ তপস্যার ব্যাথা জমা হতে থাকে।

শান্তি এখানে রয়ে গেল বটে কিন্তু চক্রধর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে গলা ফুলিয়ে বলে—"আমার শান্তি ছিল তাই ছেলেটা বাঁচলো, নইলে খুনেটা ত' ওকে মেরেই ফেলেছিল।"

রোজ রোজ এই কথাটা শুনতে শুনতে তারানাথ গেল ক্ষেপে… তার রাগ উঠলো চরমে যেদিন রাস্তার ওপর বেগুন কিনতে অনেকগুলি লোক এসে জুটেছিল। সেখানে ছিল চক্রধরও। চক্রধর শান্তির সেবার কথা…তারানাথের বোকামীর কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে হাসাহাসি করছিল…

চক্রধর বলছে চেঁচিয়ে—"তারানাথটাকে দিতুম ফাঁসীতে লটকে…বেটা বড্ড বেঁচে গেছে!"

ভিড় ঠেলে সামনে এসে তারানাথ বলে—"ফাঁসী কেন—কিসের জন্যে ফাঁসী হত শুনি?"

চক্রধর বলে দাঁত খিঁচিয়ে—"খুনে বলে ধরিয়ে দিতুম…গোঁফ চেঁচে মাথা কামিয়ে ফাঁসীতে ঝুলিয়ে দিত!"

তারানাথ বলে—"রাখে হরি মারে কে? ফাঁড়া ছিল কেটে গেল তোর জন্যে বাঁচলো না কিরে হতভাগা!"

চক্রধর মহাক্রোধে বলে—"শোন, শোন নেমোকহারামবেটার কথা শোন…শান্তি যেই গেল তাইত ছোঁড়াটা এ যাত্রা বেঁচে গেল—"

সক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তারানাথ বলে—"খালি শান্তি আর শান্তি…শান্তি কি অমনি এসেছে না কিরে বাঁদর।"

চীৎকার করে চক্রধর বলে—"তবে কিসের জন্যে এসেছে শুনি?"

হাতের মুঠো সামনে ঘোরাতে ঘোরাতে তারানাথ বলে—"ভালবাসার জন্যে সবাই আসেরে ছুঁচো…পিরীত কাকে বলে জানোনা গাধা—!"
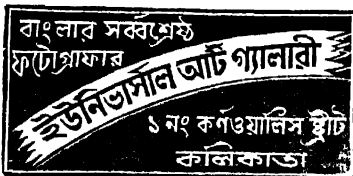
আশেপাশের লোক হেসে ওঠে—চক্রধর ঘুসী পাকিয়ে এগিয়ে যায় সক্রোধে—তারপর তারানাথের দিকে যেয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়…ক্ষণিক স্তব্ধ থেকে আহত কণ্ঠে বলে—"এ কথা বলতে তোর মুখ আটকে গেল না !"

রাগের মাথায় হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে তারানাথও চমকে উঠেছিল…সে চক্রধরের চোখের দিকে চাইতে পারলে না – মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

শান্তির হাত ধরে সেইদিনই চক্রধর তাকে নিজের ঘরে নিয়ে এল।

চক্রধর যতটা মর্মাহত হয়েছিল, তারানাথ তার চেয়েও বেশী হল লজ্জিত। রাগের মাথায় চক্রধরকে সায়েস্তা করতে গিয়ে সে যে শান্তিকে অপমান করে বসবে, বলবার আগে পর্যন্ত সে কথা সে ভাবতেই পারেনি…কিন্তু কথাটা উচ্চারিত হবার সংগে সংগে দারুণ লজ্জা ও ঘৃণায় নিজেকেই সে বার বার ধিক্কার দিতে থাকে। চক্রধর ভেতরে ভেতরে গঞ্জের নিধু আড়তদারের সংগেই শান্তির বিয়ের পাকাপাকি করে ফেললো। এই বিয়ে শুভ না হলেও চক্রধর জানত এই বিয়ে ভাঙিয়ে দেবার সাহস তারানাথের হবে না। শুধু তাই নয়, সকলকে তাক্ লাগিয়ে দেবার প্রলোভন সে দমন করতে পারলে না।

নিধুর অগাধ পয়সা…গুড় আর কাঠের ব্যবসা করে সে যেমন লক্ষ্মীকে পেছমোড়া করে বাঁধতে পেরেছিল, তেমনি ধারা তার ৬০ বছর বয়সকে কলপ মাখিয়ে থমকে দিয়ে বাধানো দাঁতে হাসিকে বাঁধতে পেরেছিল। উপর্যুপরি তিন তিনবার বিয়ে করেও যখন বংশরক্ষা অসম্ভব হয়ে উঠল, ঘটক মারফৎ নিধুর কানে ঐ দজ্জাল মেয়ে শান্তির কথা ওঠে…শুধু ওঠা নয়, তার রূপ আর স্বাস্থ্য যে তার মনবাসনা পূর্ণ করতে পারবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'য়ে অনেকদিন ধরেই চক্রধরের কাছে লোক পাঠিয়ে ব্যর্থ হবার পরমুহূর্তে চক্রধর নিজেই এসে তার কন্যার পানি গ্রহণের জন্য নিধুকে অনুরোধ করে বসল !…হাঁফানীতে ভুগলেও সেদিন নিধু হাফানীর কথা ভুলে সিধে হয়ে বসল… চক্রধরের অনুরোধ ত' রক্ষা করবার সম্মতি দিলেই, তার ওপর সাহস দিল বিয়ের রাত্রে সংগে থাকবে নামজাদা পশ্চিমা দারোয়ানের দল আর ১৫০টী বরযাত্রী। বিয়ে ভাঙাবার সাহস কারুর হবে না।…যাবার সময় চক্রধরের হাতে গুঁজে দিল নিধু একতাড়া নোট…বলে—"বিয়ের খরচ কর। ধুমধাম ওপক্ষ থেকেও হওয়া দরকার।"

চক্রধর পাড়াময় হৈ হৈ করে বেড়াতে লাগল—তারানাথের মত পাঁচটা চাকর শুধু বরের জল তোলে…তিন মহল বাড়ী একটা হাতীও আছে…হাতীর শুঁড়টা সাদা—দিগ্গজের বাজা বরের মেসোমশায় …হুঁ হুঁ বাবা, বলে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে না…এবার ভাংচি দিক না তারানাথ। কি রকম বাপের ব্যাটা বোঝা যাবে !"—

গ্রামশুদ্ধ লোক অবাক হয়ে যায়…চক্রধরের হুংকার আর বরের ঐশ্বর্যের কথা শুনে চোখ তাদের কপালে না উঠলেও কোটর থেকে বেড়িয়ে আসে !

ফ্যালার কানেও কথাটা উঠল। প্রথমে সে বিশ্বাসই করতে পারলে না কথাটা,– একটা বুড়ো থুত্থুড়ের সংগে শান্তির বিয়ে হবে ! সে ভাবলে সবাই বুঝি তাকে রহস্য করছে… লুকিয়ে শান্তিকে সে জিজ্ঞেসা করে।

শান্তি গম্ভীর হয়ে বলে—"বয়সে কি আসে যায়, তার যা টাকা আছে তোমাদের গ্রামটাকে কিনে নিতে পাবে।"

ফ্যালা স্তম্ভিতের মত বলে —"টাকাটাই হলো বড় ?"

শান্তি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—"কেন নয়। আজ যদি আমার বাবা বড়লোক হতেন, তাহলে সাহস হ'ত তোমাদের আমার নামে বদনাম দিতে—বাবাকে অপমান করতে ?"

"শান্তি" মৃদু কণ্ঠে ফ্যালা বলে শান্তির দিকে চেয়ে—"আমার বাবা'ত মিথ্যে কথা বলেনি শান্তি !"

একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বলে—" "বেরোও এখান থেকে– তুমি শুদ্ধ আমাকে অপমান করতে এসেছ আমি তোমায় ভালবাসি কিনা এই কথাটা পাকা করে নিতে এসেছ ?"

মর্মাহতভাবে ফ্যালা বলে – "শান্তি !"

সক্রোধে শান্তি চলে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে— "বড়লোকের বউ হব…আমার বাবার অবস্থা ভাল হবে— এটা তোমরা চাওনা তা জানি, কিন্তু এ বিয়ে কেউ
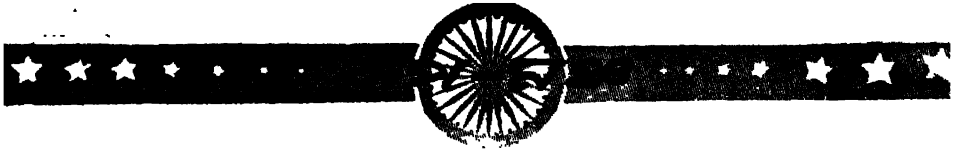
ভাঙতে পারবে না। তুমিও না, তোমার বাবাও না!" সক্রোধে শান্তি চলে যায়।

ফ্যালার মুখটা মুহূর্তের জন্যে সাদা কাগজের মত হয়ে গেল। তারপর যা তার সারা জীবনের ছিল অজানা, সেই ক্রোধ এল ঢেউ তুলে গর্জে ফোঁস ফোঁস। দারুণ ক্রোধে তার সর্বাংগ থর থর করে কেঁপে উঠল—চোখ দুটো তার জ্বালা করতে থাকে। মনে মনে সে একটা ভয়ানক প্রতীক্ষা করে বসলো!

ঘরে ঘরে গিয়ে চক্রধর নিমন্ত্রণ করে আসে হৈ হৈ করে সমান তালে···বিয়ের কদিন আগে থেকেই ঘর-দোর-বাড়ী পরিষ্কার করতে লোক লাগায়। বাড়ীর সামনে বসায় রসুনচৌকী ভিন গাঁ থেকে ভারে ভারে বাজার, মশলা ঘি ময়দা আসতে থাকে। সে সব জিনিষ তারানাথের দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে পথচারীদের ডেকে বলে—"এ তারানাথের পচা ভুসী নয় বুঝেছ—সহরের এক নম্বরের ময়দা।" তারপর চেঁচিয়ে বলে—"দিক না ভাঙচি, হুঁ হুঁ বাবা, এ বড় শক্ত ঘানী, বর নিজে বলেছে, কেউ যদি চালাকী করে চাবকে পিঠ লাল করে দেবে!'

সবার নিমন্ত্রণ হয়। হয়না শুধু তারানাথ আর ফ্যালার। পার্বতী অনুযোগ করে বলে—"ফ্যালার কি দোষ?"

শান্তি বলে—"না মা, তুমি কিছু বলো না। বাবা যা করছেন, ঠিকই করছেন।"

তারানাথ সবই লক্ষ্য করে। কিন্তু তার মুখ যেন কে সীসে দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে···কোন কথা কয়না। চক্রধরের লাফালাফি পাড়াপ্রতিবেশীদের আনন্দ উৎসাহ তার মনে কোন সাড়া জাগায় না···হাসি তার মুখ থেকে গেছে মুছে। ফ্যালাকে একদিন শুধু বলেছিল গাঢ় স্বরে—"মেয়েটাকে হারামজাদা জবাই করছে রে!"

ফ্যালা বড় ঘরে থাকে না শুধু মাঠে ঘাটে বাঁধে আর কালীয়াদহে ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মত। পৃথিবীতে যেন তার কেউ নেই···ঘরে থাকতে পারে না···কানে বাজে রসুনচৌকীর একটানা সুরটা···পাড়ায় থাকতে পারে না। খালি শুনতে পায় শান্তির বিয়ের কথা···তার ভাবী বরের ঐশ্বর্যের কথা···।

হঠাৎ ফ্যালাকে একদিন দেখা গেল বিশু বাগদীর আড্ডায়··সেখানে তখন তাড়ী আর অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নিয়ে বিশুর আড্ডা উঠেছে জমে···

তাকে দেখে বিশু টলতে টলতে উঠে এল। একটা তাল পাতার ছাউনী তলে ফ্যালা তাকে টেনে নিয়ে এল।

ভেতরে গিয়ে বিশু বলে জড়িত কণ্ঠে—"কি ব্যাপার দা ঠাকুর?"

ফ্যালা বলে—"ঝাঁপটা টেনে দাও!"

বিশু ঝাঁপটা দিলে ফেলে···বাইরে থেকে তাদের আর দেখা গেল না।

আজ বিয়ে।

সমস্ত দিন চক্রধরের বাড়ী থেকে ভেনের ধোঁয়া উঠতে থাকে। তালপুকুর থেকে বড় বড় মাছও উঠতে থাকে··· অন্দরের কোলাহল বাইরের নহবৎকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

এয়োরা নতুন গামছায় মুখ ঢেকে শান্তিকে নিকটবর্তী "কুমীর মারা" পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেল। ঘাটে স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ শান্তির নজর পড়ল তারাপাড়ে খেজুর গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ফ্যালা একদৃষ্টে তাকে দেখছে। পার্শ্ববর্তিনী বধূ বলে—"ফ্যালাদার চেহারা হয়েছে দেখনা!" আর একজন বলে—"হবে না কেন···বাগদী পাড়াতেইত পড়ে থাকে···সেখানে যে সব কিছুই পাওয়া যায়।

সবাই হেসে ওঠে।

শান্তির চোখে ভেসে ওঠে—ফ্যালার ভয়ঙ্কর মূর্তি!—মাথার চুল উড়ছে···চোখ দুটো লাল···সারা মুখটা কঠিন আর রুক্ষ হয়ে আছে।
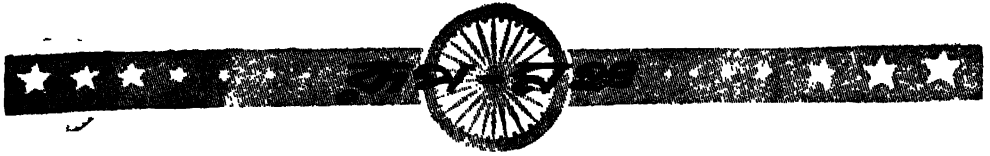
বাঁধের কোল ঘেঁসে সন্ধ্যার সময় কতকগুলো পাল্কী আসতে থাকে রসপুরের দিকে। বিশেষ পাল্কীটার সংগে আছে চারজন দীর্ঘকায় পশ্চিমা দারোয়ান···তারপর বরের পাল্কীর পেছনে পেছনে আরও আসে কতকগুলি পাল্কী · তাতে আছে বরযাত্রীর দল। অবশেষে লেঠেল আর ভৃত্যের দল। লাটী আর আতসবাজী জ্বালাতে জ্বালাতে এগিয়ে চলে। বমের আওয়াজে আর আকাশে আতসবাজীর রঙের খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে·· সংগে সংগে গোটা রসপুরটাই চঞ্চল হয়ে ওঠে···বর আসছে—।"

চক্রধর মাণিক আর হারুকে লণ্ঠন দিয়ে বলে "যা বাবা মাণিক, রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে আয় ··বেলতলার বাঁকে দাঁড়াবি, সেখান থেকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আয়।"

মাণিক আর হারু আলো নিয়ে ছুটলো।

অন্দরে মেয়ে মহলে চাঞ্চল্য গেল বেড়ে···শান্তির বন্ধুরা ঠাট্টা করলেও শান্তি গম্ভীর হয়েই রইল।

নির্জন মেঠোপথ ধরে বর নিয়ে শোভাযাত্রীর দল এগিয়ে আসে। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোয় সেই জনহীন মাঠটা যেন বিভীষিকার রাজ্য বলে মনে হয়। তার গাঢ় স্তব্ধতার রাজ্যে কটি মানুষের কলরোল উঠে ক্ষণিকের জন্য তাকে যেন সচেতন করে দিলে। বাঁকের মুখে এসে শোভাযাত্রীর দল থমকে দাঁড়ালো।

মশালের আলো গিয়ে লেগেছে বরের পাল্কীতে—গলাবাড়িয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বর বলে—"নিয়ে যাবার লোক পাঠায় নি?"

একজন বরযাত্রী বলে—"কনের বাড়ী থেকে অগ্রদূতের আসবার কথা ছিল বটে কিন্তু কারুর টিকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না—"

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বলে—"আসছে···আসছে।" দেখা গেল সেই অন্ধকারে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দু'জন দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে আসতে একজন বলে সবিনয়ে—"আজ্ঞে আসুন আপনারা, চক্রধরবাবুর বাড়ী থেকে আসছি।"

মশালের আলো পড়েছে ঐ দুজন রসপুরবাসীর ওপর:

একজনের হাতে লণ্ঠন আর একজনের হাতে দুহাত লম্বা পাকা বাঁশের লাঠি।

লণ্ঠনধারী অল্পবয়স্কটি বলে—"একটু দেরী হয়ে গেছে, ক্ষমা করুন···আসুন চলে আসুন সব!"

তারা পথ দেখিয়ে আনে। আগে চলে পেছনে চলে বর ও বরযাত্রীর দল—হাসি আর ঠাট্টা তামাসা করতে করতে।

সেই নির্জন অন্ধকারময় পথম রাতের মৃদুমন্দ হাওয়ায় বরের চোখ ঘুমে আসে জড়িয়ে।

কিছু দূর যেয়ে বরযাত্রীর দল রাস্তা ছেড়ে পাশের মাঠে নেমে পড়ে।

বরযাত্রীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে ·"এদিকে কোথায় হে?"

অগ্রদূতের মধ্যে অল্পবয়স্কটী বলে—"আজ্ঞে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবার হুকুম আছে। রাস্তা দিয়ে গেলে ঘুর হয়ে যাবে। তাই চট করে নিয়ে যাবার জন্যে এই সিধে রাস্তা ধরেছি!"

মানিক আর হারু বেলতলায় এসে দেখে, বরের দল রাস্তা ছেড়ে "কাগখালি"র মাঠে নেমেছে। তারা চমকে উঠল—ও মাঠে এসময় ওরা নামল কেন? ও মাঠটার যে একটা বদনাম আছে ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা· রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ওখানে কেন গেল? তারা চঞ্চল হয়ে উঠল।

মানিক বলে—"উপায়?"

হারু বলে—"রাস্তা ভুল করেছে।"

মানিক বলে—"চেঁচিয়ে ডাকবো?"

ভয়ে ভয়ে হারু বলে—"চুপ, পাশে যদি কেউ ঘাপটি মেরে থাকেত' শুনতে পাবে।"

ঠিক এই সময় একটা বিকট চিৎকার ধ্বনি উঠল—সম্মিলিত হুঙ্কারও—"মারো মা'রা—কেটে ফেল্—জয় মা কালী—"

মানিক আর হারু তাদের লণ্ঠন দিলে নিভিয়ে।

মানিক বলে—"ছোট!"

হারু বলে—"না, ছুটলে দেখতে পাবে।"

সভয়ে মানিক বলে—"তা হ'লে?"

হারু বলে—"ধান ক্ষেতে ঢোক্।"

উঁচু রাস্তা ছেড়ে তারা হুড়মুড় করে পাশে নেমে জল ও কাদা ভেঙে ধানের ক্ষেতে লুকিয়ে থাকে।···চীৎকার, হুঙ্কার

যন্ত্রণার কাতর ধ্বনি- লাঠি ঠোকার শব্দ · পাপ্‌ড়ী ছোড়ার হিস্ হিস্ শব্দে মানিক আর হারু ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে আর দুজনে জড়া জড়ি ক রে এ ওর পেটে মুখ লুকিয়ে গোঁ গোঁ করে।

হঠাৎ ছুটে আসার পদশব্দে তারা চমকে মুখ তুলে দেখে সেই অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় একজন চেলীপরা বুড়ো ঊর্ধ্ব-শ্বাসে ছুটে আসছে···তার জামা ছিড়ে গেছে···পরিধান বস্ত্র খুলে গেছে···সেটিকে কোন রকমে ধরে ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে মানিকদেব কাছে রাস্তাব ওপর এসে আছড়ে পড়ল সংগে সংগে তার পিঠের ওপর একটা কালো দীর্ঘ ছায়া লাফিয়ে পড়ল।

আর্তনাদ করে বুড়ো বর বলে—"ওরে বাবা মরে গেছি··· মরে গেছি···প্রাণে মারিসনি—যা চাইবি তাই দেবে—!"

সেই দীর্ঘ ছায়াটি বুড়োর ঘাড় ধরে সিধে দাঁড় করিয়ে চটাচট্ খালি চড় মারে একবার এগালে আবার মুখ ঘুরিয়ে অন্য গালে···"

চাঁদের আলো তার গালে এসে পড়েছে...সেই দিকে চেয়ে সভয়ে মানিক বলে—"ফ্যালারে!"

হারু তার মুখ চেপে ধরে বলে—"চুপ!"

চড় মারতে মারতে ফ্যালা বলে দাঁতে দাঁত চেপে—"বয়স কত?"

বর বলে- "সোত্তোর বাবা!"

আর একটি বিরাশী শিকার চড় হাঁকিয়ে ফ্যালা বলে—"যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছ তার বয়স?"

কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো বর বলে—"দেখিনি বাবা, শুনেছি ষোল!

ফ্যালা কর্কশ স্বরে বলে—"গঙ্গাযাত্রী বুড়ো, কাল যদি পটল তোল মেয়েটার কি হবে ভেবে দেখেছ একবার—!"

···আবার চড়াচড় চড়াৎ শব্দ হতে থাকে—বুড়ো বলির পাঁঠার মত যন্ত্রনায় চীৎকার করতে থাকে।

তাকে টানতে টানতে ফ্যালা আবার কাগখালির মাঠের দিকে চলে গেল।
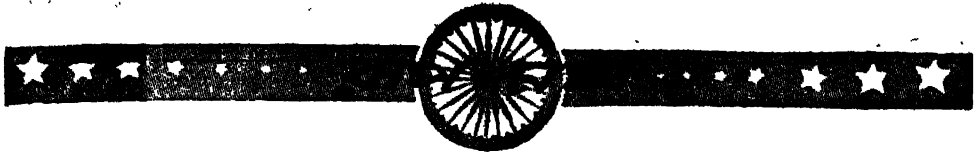
ফ্যালা চলে যাবার পর কতগুলো লোক ছুটে পালাতে লাগলো। কারুর গায়ে জামা নেই—কারুর শুধু জামা কাপড় নেই···কেউ কাঁদছে···কেউ শুধু প্রাণপণ ছুটছে ··
ভয়ে ভয়ে মানিক আর হারু হামাগুড়ি দিয়ে ক্ষেত ছেড়ে রাস্তায় উঠল। কাঁপতে কাঁপতে রাস্তায় এসে একবার কাগখালি মাঠের দিকে সভয়ে আড়চোখে দেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলো গ্রামে!

দাবানলের মত চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল, বর আর বরযাত্রীদের উপর ডাকাত পড়েছে আর সে ডাকাতি করেছে ফ্যালা!

সবাই হায় হায় করে ওঠে···চক্রধর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে···অন্দরে উঠল কান্নার রোল···পার্বতী ঘন ঘন মূর্চ্ছা যায়...শান্তির মুখ হয়ে উঠল আরো গম্ভীর!—ক্রোধে তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে। সহসা চক্রধর উঠে দাঁড়াল···চীৎকার করে বললে—"এ সব তারানাথের কাজ ···তাকে খুন করবো···ফাঁসী যেতে হয় সেভী আচ্ছা—হারামজাদার মাথা ফাটিয়ে দেব!" উঠোন থেকে একটা প্রকাণ্ড বাঁশ টানতে টানতে সে তারানাথের বাড়ীর দিকে ছুটলো···হৈ হৈ করে প্রতিবেশীরাও তার পিছু নিল।

তারানাথ তখন লাফাচ্ছে আর মহাস্ফূর্তিতে শূন্যে হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে বলছে—"জিতারও বাবা, জিতারও! বাপকা বেটা ···ঠিক হ্যায়···দিয়েছ সব ভণ্ডুল করে···এইত চাই·· ব্যাটা চামচিকে কেমন জব্দ—!" বলে আপন মনেই হা হা করে হাসতে থাকে।

টলতে টলতে ফ্যালা এসে দাঁড়াল। দারুণ উত্তেজনার মধ্যে যে কাজ এইমাত্র করে এল কাজের শেষে গভীর অবসন্নতায় তার দেহ ও মন ক্লান্তিতে উঠেছে ভরে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একবার তার রক্তাক্ত চোখ দুটো তুলে আলোকজ্জ্বল স্তব্ধ বিয়ে বাড়ীটার দিকে চাইলে। তারানাথ এগিয়ে এসে সহর্ষে তার পিঠে চাপড় মেরে বলে—"ঠিক হ্যায় এইত চাই—"

ফ্যালা বলে আনমনে—"বিয়ে না হলে কি হয় বাবা?"
তারানাথ বলে হেসে—লগ্নভ্রষ্টা মেয়ে বিধবার মত থাকবে ··ব্যাটা যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর হয়েছে"—বলেই হাসতে থাকে পাগলের মত।
বাঁশ টানতে টানতে চক্রধর এসে দাঁড়াল—তারপর বিকৃত কণ্ঠে বলে—"বাপ ব্যাটায় দাঁড়িয়ে হাসছ—দাঁড়াও হাসি বার করছি—!" বলে বাঁশ তুলতে চেষ্টা করে ··
সহসা পেছন দিক থেকে ফ্যালার কাঁধে কে হাত রাখে। চমকে উঠে ফ্যালা পেছন ফিরে দেখে পার্বতী ইংগিত করে তাকে নিঃশব্দে চলে আসতে বলছে···ফ্যালা চুপ করে থাকে।
পার্বতী তার হাত ধরে একরকম টানতে টানতেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।
তারানাথ আর চক্রধর তখন বাঁশটা ধরে কাড়াকাড়ি করছে ···প্রতিবেশীরা তাদের উৎসাহ দিচ্ছে···কেউ ওদের লক্ষ্য করলে না।
সহসা তাদের সচকিত করে ঘন ঘন শাঁকের আওয়াজ উঠলো বিয়ে বাড়ী থেকে।
ঝগড়া ভুলে মুহূর্তের জন্য তারা গভীর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। তারপর চক্রধর ছুটলো বলতে বলতে—"কি হলরে ·· কি হলরে?" প্রতিবেশীরাও ছুটলো। একা কিয়ৎক্ষণ তারানাথ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলে—"ফ্যালা কোথা গেল...ফ্যালা?" তারপর সক্রোধে ছুটলো বিয়ে বাড়ীর দিকে।
বিয়ে হয়ে গেছে। বর বধুর শুভ দৃষ্টির জন্যে তাদের মাথায় ও আসে পাশে শুভ্র চাদরে ঢেকে দিয়ে সবাই হাসি তামাসা করছে···
চক্রধর হাতে হাত ঘসতে ঘসতে পরমানন্দে বলছে—"ভাঙা, বিয়ে, ভাঙা, এবার···ঘাঘু ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখনিত···!"
তারানাথ উন্মাদের মত ছুটে এসে বলে—"ফ্যালা, ওরে ফ্যালা—!"
চক্রধর এগিয়ে এসে বলে—"খবরদার, চ্যাঁচাস্নি শুভ-দৃষ্টি হ'চ্ছে—"
থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে—এই ব্যাপার দেখেই সহসা তারানাথ লাফিয়ে পড়ে—"ধ্যাৎতারি তোর শুভদৃষ্টি"—চাদর ধরে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলতেই দেখা গেল···ফ্যালার গলায়

শান্তি মালা পরিয়ে দিচ্ছে—! এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তারানাথ চিৎকার করে উঠে—"না, না কক্ষনো নয়···এ: বিয়ে হবে না, হতে দেব না ..এই ফ্যালা উঠে আয়!" দৃঢ়মুষ্টিতে ফ্যালার হাতটা চেপে ধরে তারানাথ চলে যেতে ঘুরে দাঁড়ায়।

সহসা তারানাথ অনুভব করে একটা সুকোমল হাত এসে তার মুষ্টির উপর পড়েছে···কে যেন অস্ফুট স্বরে ডাকলে "···বাবা!"

সবিস্ময়ে তারানাথ ঘুরে দাঁড়াল। তার দৃষ্টি পড়ল শান্তির মুখের ওপর···ঢল ঢলে চন্দন লিপ্ত সে মুখ·· তার সীমন্তে ফুটে উঠেছে গাঢ় লাল সিঁদুরের আল্পনা ..তার ডাগর দু'চোখে রাজ্যের ভয় এসে থম থম করছে · তারানাথের হাতের মুঠিটা শিথিল হয়ে গেল···মাথা নিচু করে ক্লান্তস্বরে তারানাথ বলে—"বা বাধা দেব না···আমারি হার হয়েছে মা···আমারি হার হয়েছে—!"

তার কাঁধে হাত রেখে চক্রধর গাঢ়স্বরে বলে—"হেরেও তুই জিতে গেলি তারানাথ। এক সংগে ছেলে আর মেয়ে পেলি...আর আমি জিতে গিয়ে দেউলে হয়ে গেলুম—!"

এক মুহূর্ত সবার চোখ জলে টলমল করে ওঠে। সামলে নিয়ে চক্রধর চেঁচিয়ে বলে—"কই গো শান্তির মা, বর বউকে বাসরে নিয়ে যাও।"

শাঁকের ধ্বনি আবার নবোৎসাহে বেজে উঠে...বরকে কাঁধে করে···বউকে কোলে করে তারা চলে বাসরের দিকে ···চেলী আর বেনারসীতে বাঁধা গাঁট ছড়াটা শূন্যে ঝুলতে থাকে।

শেষ পক্তি শেষ হয়ে গেল...সহরের ১লা নম্বর ধ্বংস করে মহানন্দে সবাই চলে গেল যে যার ঘরে···ছাদনা তলায় ঘিয়ের প্রদীপটা শুধু জ্বল জ্বল করে জ্বলে—রকে বসেছে খেতে চক্রধর আর তারানাথ, নিজে পার্বতী পরিবেশন করছে ঈষৎ ঘোমটা টেনে। ইছেপুরের থক থকে মিষ্টি দই নিয়ে দুজনের মধ্যে বুঝি আবার হাতাহাতি হয়—চক্রধর দইয়ের ভাঁড় তুলে বলে—"খা, খেয়ে দেখ, জন্মো সার্থক হয়ে যাবে—"

তারানাথ বলে—"আরে যারে যা···দই? হ্যাঁ দই খেয়েছিলুম বটে সোনাচকের···তোমায় বলবো কি বৌদি, কাটারীর চোপ মার খটাং—,এক ইঞ্চি বসাতে পারবে না ...আর একি তোর দই—?"

সক্রোধে চক্রধর বলে—"দই নয়ত কি?

তারানাথ বলে—"ঘোল, ঘোল—"

সক্রোধে চক্রধর উঠে দাঁড়ায় ভাঁড় নিয়ে, বুঝিবা তার মাথায় ঢালে। তারানাথও উঠে দাঁড়ায়...পার্বতী সরে দাঁড়ায়···হঠাৎ তারানাথ ভাঁড়ের মধ্যে হাত দিয়ে এক খামচা তুলে মুখে দিয়ে বিস্ময়ে বলে—"নারে মন্দ নয়···বেড়ে জিনিষ ত!" বলেই আসনে বসে পড়ে।

চক্রধর বসতে বসতে হেসে বলে—"তবে, বললেন্ত' ইয়ারকি করবি...খা···খা···লুচী দিয়ে খা···হুঁ হুঁ বাবা এ আর তোর পচা আটা নয়—১লা নম্বরের বুঝেছিস্—?"

তারানাথ লুচী কামড়ানো বন্ধ রেখে বলে—"ফের আটার কথা!"

আবার বুঝি লাগে।

এই সময় পার্বতী দিলে তারানাথের পাতে ভাত আর চক্রধরের পাতে চিঁড়ে।

তারানাথ বলে—"একি ভাত?"

চক্রধর বলে- "একি চিঁড়ে?"

পার্বতী ঘোমটার আড়াল থেকে বলে—"হুঁ চাল আর চিঁড়ে—!"

দুজনে হেসে উঠে। তারানাথ বলে—"এবার থেকে ফ্যালা আর শান্তি মায়ের হাতে উঠল চাল আর চিঁড়ে আর আমরা দুজনে কি করবো ভাই চকু?" চক্রধর একেবারে গলে গিয়ে বলে--"বাড়ীতে কি আর থাকবো, হাত ধরাধরি করে শুধু বেড়াবো!"

পার্বতী বলে—"আমার ব্যবস্থা কি করে যাবে গো?"

চক্রধর হেসে বলে—"ছিনু একজন, এখন হলুম দুজন··· দুজনে তোমার ব্যাবস্থা করতে পারবো না...কি বল ভাই তারু!"

পার্বতী মুখ ভেংচে বলে—"আহা কথার ছিরি দেখ না!"

চক্রধর আর তারানাথ এক সংগে হেসে উঠে···প্রাণখোলা সে হাসির শব্দ গিয়ে বড় বধূর কানে বাজে। (শেষ)

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসে

(বড় গল্প)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

★

এম, এ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বীরেশ পাশ করতে পারেনি। অথচ এই এম, এ, পরীক্ষাটাকে কেন্দ্র করে সে তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষাতে বীরেশ দশটাকা জলপানি পেয়েছিল। আই, এ পরীক্ষাতেও প্রথম দশজনের ভিতর তার নাম ছিল। বি, এ, পরীক্ষাতে আশানুরূপ ফল না হলেও অর্থনীতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স তার ছিল। মনে করেছিল, এম, এ-টার সময় একটু খেটে সেটা শুধরে নেবে। কিন্তু এম, এ, টাতে উত্তীর্ণদের ভিতর তার নামই খুঁজে পেল না। এই অকৃতকার্যতার বোঝা বীরেশ বইবে কেমন করে? বীরেশের এই অকৃতকার্যতা শুধু তার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্খাই ধুলিসাৎ করে দেয়নি—তাকে ঘিরে তার মা—দাদা—বৌদি—ছোট বোন শিখা যে স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছিল—তাও ধুলিসাৎ করে দিল। বীরেশের এই অকৃতকার্যতার কথা যখন তাঁদের কানে যেয়ে পৌছবে—নিষ্ঠুর নিয়তির এই নির্মম পরিহাস কেমন করে তাঁরা সহ্য করবেন! সিনেট হল থেকে অন্যান্য ছাত্রদের পাশ কাটিয়ে কলেজ স্কোয়ারের একটী নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বীরেশ চুপটি করে বসেছিল। কিন্তু এখানেও বেশীক্ষণ বসে থাকা বীরেশের পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠলো। ভ্রমণার্থীদের ভিড়ে কলেজ স্কোয়ারটা ধীরে ধীরে ভরে উঠেছে—কলেজ স্কোয়ারের জলাশয়টা সাতারুদের ভিড়ে কিলবিল কচ্ছে। ওদের উচ্ছলতায় বদ্ধ জলাশয়টি যেন হাপিয়ে উঠেছে। এমনি উচ্ছলতায় সারাটা জীবন কাটিয়ে দেবার স্বপ্নেই বীরেশ ভরপুর ছিল। জীবনের সমস্ত বাধাবিপত্তিকে ডিঙ্গিয়ে সে তার উচ্ছল ছন্দে ছুটে চলবে—এই ইচ্ছা অহরহ বীরেশের মনকে ভরিয়ে রেখেছিল। এতদিন চলেও এসেছে তাই। বাবা মারা যাবার পর দারিদ্রের সংগে তাকে কম লড়াই করতে হয় নি। কিন্তু কোন দিন সে নিমমতায় বীরেশ ভেংগে পড়ে নি। দারিদ্রকে সে জয় করতে পারে নি, একথা সত্য। তবু চিরদিন দারিদ্রের কাছে নিজের পরাজয়কে সে উপেক্ষা করে এসেছে। কিন্তু আজকের পরাজয় যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমনি অগৌরব কোনদিন তাকে স্পর্শ করতে পারে নি—তাই প্রথম দংশনের জ্বালায় সে সম্পূর্ণ ভেংগে পড়েছে: বীরেশ অন্যমনস্ক ভাবে চিন্তা কচ্ছিল। সে খেয়ালই করেনি, কখন তার পার্শ্বে এক পৌঢ় ও পৌঢ়া এসে বসেছেন। বীরেশের চমক ভাঙল তাঁদের কথোপকথনে; পৌঢ় ভদ্রলোকটি সম্ভবত তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলছেন: সলিলের উপর মাত্র একজন ছেলে। জানতাম, ও এমনি ফলই করবে। অযথা সেই চুঁচুঁড়া থেকে কষ্ট করে আসবার কী দরকার ছিল?" পৌঢ়ার গর্বিত উত্তর বীরেশের কানে এলো: মায়ের মন, তোমরা কী করে বুঝবে! সেই কখন তোমরা খবর দিতে—আমি ছটফট করতাম। নিজের চোখে দেখে গেলাম, নিশ্চিন্ত।" মায়ের মনের উদ্বিগ্নতা বীরেশকে আরো বিচলিত করে তুললো। এমনি অধৈর্য মন নিয়ে ওর মাও ওর পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। সলিলের নাম বীরেশ শুনেছে। দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, দিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সলিল। সলিলের এই কৃতকার্যতায় তার মা-বাপের আনন্দের অবধি নেই। যতখানি আনন্দ আজ এঁদের অন্তর উপচে পড়ছে, ঠিক ততখানি বেদনায় এঁরা মুষড়ে পড়তেন, যদি পুত্রের অকৃতকার্যতার সংবাদ নিয়ে যেতে হ'তো। যে বেদনায় মুষড়ে পড়তে হবে বীরেশের মা'কে - দাদা—বৌদি ও বোন শিখাকে। ওরা দু'জনে আরো নানান কথা বলছিলেন—সলিলের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে। তাকে বিলেতই পাঠানো হবে—এরকম রত্নকে এখানে রেখে নষ্ট করা উচিত হবে না। কষ্ট তাঁদের হবে, তবু ছেলের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে কষ্ট তাঁদের সহ্য করতেই হবে। এঁরা কথা বলছিলেন আর মাঝে মাঝে বীরেশের দিকে তাকাচ্ছিলেন। বীরেশের মনে হতে লাগলো, যেন, ওরা ওর অকৃতকার্যতার কথা জেনে ফেলেছেন। যেন ব্যঙ্গ করে ওকে বলছেন: এই দেখ,

আমাদের সলিল কেমন ফল করলো! আর তুমি—ধিক, —শতধিক তোমাকে! বীরেশ ওদের দিকে আর চাইতে পারে না। চাইতে পারে না বীরেশ কোন দিকেই। যেন চতুর্দিক থেকে ব্যঙ্গবাণ ওর দিকে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। না—আর এক মুহূর্তও বীরেশ এই লোক সমাবেশের মাঝে থাকতে পারবে না। ও উঠে পড়ে। গোলদীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের উদ্দেশ্যে চলে। ট্রাম ধরতে হবে তাকে। কিন্তু ট্রামেওত লোক গিজগিজ কচ্ছে! বীরেশ আবার পিছনের দিকে ফিরে দাঁড়ায়। মেসেই ফিরে যেয়ে দরজা দিয়ে পড়ে থাকবে। হঠাৎ দৃষ্টি যায় কলেজ স্কোয়ারের ঘড়িটার দিকে। এখনও দশটা বাজেনি। মেসেও ত ফিরে যাবার উপায় নেই! সেখানে সকলেই এখন জিজ্ঞাসা করবে: কিরে—কী—কী খবর?" ও তার কী উত্তর দিবে? বীরেশ আরপুলি লেন ধরে প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটে পড়ে, মেডিক্যাল কলেজের দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে অগ্রসর হতে থাকে। সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউর ওপর বিকট আওয়াজ করে একটা মটর দাঁড়িয়ে পড়ে। সংগে সংগে "You bloody rascal" বীরেশকে উদ্দেশ্য করে মধুর বাণী বর্ষিত হ'য়ে ওঠে। সত্যি, ড্রাইভার যদি সময় মত ব্রেক না কষতো—আজ ঐ মটরের নিচে রাস্তার সংগে নিষ্পেষিত হ'য়ে যেত বীরেশ। তাই ওর ভাল ছিল! বেঁচেই বা তার লাভ কি? খানিকক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে থেকে বীরেশ আবার পথ চলে। গঙ্গার পাড় ধরে দক্ষিণমুখী হাঁটা ধরলো বীরেশ। আউট-ট্রাম ঘাট পার হয়ে একটা নির্জন স্থান পেল। স্থানটা সত্যিই নির্জন। একটা ঝাকড়া গাছ বেশ খানিকটা ছায়া বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—বীরেশ ওর গুড়িতে যেয়ে বসলো। অনেকটা পথ হেটে এসেছে বীরেশ। ঝুকের মাথায় খেয়ালই করে নি। বড্ড ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। অদূরে আউট-ট্রাম ঘাটের জেঠিগুলি ঘেসে সারবন্দে জাহাজগুলি দাঁড়িয়ে আছে। কোনটা থেকে ঝপাঝপ জলের শব্দ—কোনটা থেকে হুইসিলের আওয়াজ বীরেশের কানে ভেসে আসছে। গঙ্গার উদার বক্ষের উপর দিয়ে মালবাহী জাহাজ ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। ফেরি ষ্টীমারগুলি তর তর বেগে যাত্রী নিয়ে পারাপারে ব্যস্ত রয়েছে। খেয়া নৌকোগুলি গঙ্গার ঢেউয়ের সংগে সংগে নেচে নেচে এগিয়ে চলেছে। একটা ঢেউ আসছে—মনে হচ্ছে, মাঝি বুঝি আর টাল সামলাতে পারলো না! কিন্তু শেষ অবধি টাল সামলে নিয়ে আবার তর তর বেগে ছুটে চলে। মানুষের জীবন-টাও ঠিক এমনি। তরঙ্গমালার মত কত বাধা বিপত্তিই না জীবনের গতিবেগকে রুদ্ধ করে দাঁড়ায়! সে বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হ'তে বীরেশ কোন দিনই ভয় পায় নি। কিন্তু এমনি অগৌরব কোন দিন তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। না, কিছুতেই বীরেশ এই লজ্জা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। ঐ অতল সলিল সমাধিতে তার সমস্ত লজ্জা—সমস্ত অগৌরব মিশে যাক—যাক ভেসে যাক। বীরেশ দাঁড়িয়ে পড়ে। নীচের দিকে তাকায়। গঙ্গার জলরাশি কেমনভাবে তার তীরকে চুম্বন করে যাচ্ছে—ঐ নিষ্কলঙ্ক মাটিকে চুম্বন করে তরঙ্গ মিশে যাবে ঐ তরঙ্গমালার সংগে। বীরেশ নীচে নেমে আসে। ঢেউগুলি তীরকে চুম্বন করে যাবার সময়—বীরেশকে হাতছানি দিয়ে যায়—বীরেশের সমস্ত দেহটা শিহরিত হয়ে ওঠে—। ওরা ডাক দিয়ে মাঝ গঙ্গায় পৌছে যায়—বীরেশ ওদের পিছু পিছু যায়নি দেখে আবার ছুটে আসে। গঙ্গার ঊর্মিমালা এক সংগে মিশে বিরাট শক্তি নিয়ে এবার বীরেশকে নিতে আসে। শো শো শব্দ করে ওরা তীরবেগে ছুটে আসে—না, এবার বীরেশ সাড়া না দিয়ে পারবে না—বীরেশকে ভাসিয়ে নেবার জন্য ওরা তীরের সংগে উঁচু হয়ে আছাড় খায়—ঊর্মিমালার বারিকণা কতক ছিটকে যেয়ে শূন্যে মিশে যায়—কতক গঙ্গার তীরে ছড়িয়ে পড়ে তীরকে ধুইয়ে নিয়ে আবার গঙ্গায় মেশে। না—বীরেশকে ওরা নিয়ে যেতে পারেনি—নিয়ে যেতে এসেছিল—বীরেশ ওদের ডাকে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুতও ছিল—কিন্তু ঐ ঢেউয়ের সংগে সংগে আর একখানি মুখচ্ছবি বীরেশের চোখের সামনে ভেসে উঠলো—সে মুখচ্ছবির আকুল আর্তনাদ: না—না, বীরেশ, অমন কাজটি করিস না।" বীরেশের সমস্ত সংকল্প ভেংগে দিল। সে মুখচ্ছবি বীরেশের মায়ের!—ঢেউয়ের জলে বীরেশের জামা কাপড় খানিকটা ভিজে গেল—ঢেউটা

চলে গেলে ও মূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল গঙ্গার উদার বক্ষের দিকে। শান্ত—সমাহিত গঙ্গা। ওর মনের চাঞ্চল্যও থেমে গেছে। মুহূর্তের চাঞ্চল্যে কি ভুলটাই না করতে বসেছিল বীরেশ!

* * * * *

বীরেশের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার সিমপুর গ্রামে। বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম থেকে সিমপুর বেশী দূরে নয়। বীরেশের বাবা কয়েক বছর হ'লো মারা গেছেন। মসলার কারবার ছিল তাঁর। সাবেকী এন্ট্রান্স পাশ ছিলেন তিনি। অতি সহজেই তখন একটা বড় দেখে সরকারী চাকরী যোগাড় করে নিতে পারতেন। কিন্তু ইচ্ছা করেই তিনি তা নেননি। সামান্য পুঁজি পাটা নিয়ে মসলার কারবার আরম্ভ করেন। কাছে-ধারে থেকে ধনে, হলুদ, লঙ্কা, জিরে প্রভৃতি কিনে কলকাতায় চালান দিতেন। ধীরে ধীরে ব্যবসা প্রসার লাভ করে। তিনি বড় বড় নৌকো বোঝাই করে খুলনা—যশোহর থেকে মাল আমদানী করতে থাকেন আর শ্যামবাজারের ঘাটে মহাজনদের কাছে মাল বিক্রী করে দেন। মহাজনদের কাছে সুনাম তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁর শিক্ষার জন্য মহাজনেরা তাঁকে খাতিরও করতো যথেষ্ট। অর্থও তিনি কামিয়ে ছিলেন মন্দ নয়। তবে সঞ্চয় খুব বেশী ছিল না। গাঁয়ের স্কুলটার জন্য অনেক টাকা দিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের নামে দেশে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু শেষ অবধি সে ইচ্ছা আর তাঁর পূর্ণ হয়নি। ব্যবসায়ে ঘা খেলেন একবার সাংঘাতিক। দু'খানা মাল বোঝাই বড় নৌকা ভাঙরের খালে ডুবে যায়। মহাজনদের কাছে দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সঞ্চিত অর্থ এবং কিছু স্থাবর সম্পত্তি বিক্রী করে দেনাগুলি পরিশোধ করেন। কেবল বার্মাস্থিত তাঁর বন্ধু ধনী ব্যবসায়ী মিঃ হিতেন চৌধুরীর কাছেই কয়েক হাজার টাকা দেনা থেকে যায়। বয়সও হ'য়েছিল। তাছাড়া চিন্তায় চিন্তায় বীরেশের বাবা অঘোরনাথের দেহ এবং মন দুইই ভেংগে পড়ে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতে তিনি মারা যান। বীরেশের দাদা বি, এ, পাশ করে গাঁয়ের স্কুলেই শিক্ষকতা কচ্ছিলেন—বীরেশ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। সংসারের সমস্ত ঝুঁকি এসে পড়ে বীরেশের দাদা সতীশের ওপর। অথচ স্কুলের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। তাছাড়া অঘোরনাথের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে সতীশকে বিয়েও দিয়েছিলেন। শিখার বয়স তখন আট নয় বছরের হবে। বীরেশ এত দিন কলেজ হোষ্টেলে থেকে পড়াশুনা করতো। তাকে চলে আসতে হ'লো—অল্প খরচার মেসে। নিজের পড়াশুনার খরচ টিউসনী করে নিজেকেই চালিয়ে নিতে হ'লো—অধিকন্তু বাড়ীতেও মাঝে মাঝে সাহায্য না করলে চলে না।

* * * * *

সতীশের স্কুলে যাবার সময় হ'য়েছে—পুত্রবধূ ভাত বেড়ে নিয়ে অপেক্ষা করছে—বীরেশের মা সৌদামিনী দেবী ডাকছেন: ও বীরেশ—বীরেশ—খেতে আয়!—"
শিখা বড় ঘরে ছিল। ছুটতে ছুটতে এসে বলে: মা বীরেশ, বীরেশ করেই গেল—কোথায় তোমার বীরেশ!" সৌদামিনী আশ্চর্য হয়ে বলেন: কোথায় আমি বীরেশের কথা বল্লাম!

তুই কানেও একটু বেশী শুনিস!" ততক্ষণ সতীশ বড় ঘর থেকে খড়ম পায়ে দিয়ে মুচকি হাসতে হাসতে মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মায়ের কথা শেষ হবার সংগে সংগেই হাসতে হাসতে বলে: মা—তুমি একবার নও, দুবার ডেকেছো বীরেশকে।" সৌদামিনী এবার অপ্রস্তুত হ'য়ে যান। তবু এদের কথায় আস্থা স্থাপন করতে পারেন না। কারণ, বীরেশের কথা নিয়ে এরা অহরহই তাঁকে এমনি ক্ষেপিয়ে নেয়। তাই পুত্রবধূ সুলতাকে জিজ্ঞাসা করেন: তাই নাকি বৌমা!" সুলতা মাথা নেড়ে সায় দেয়। সতীশ ততক্ষণে খাবার আসনে বসে। সৌদামিনী নিজের মনেই বলতে থাকেন: তা' হবে! মনটা সকাল থেকেই ছেলেটার জন্য কেমন যেন কচ্ছে! আজত ওর ফল বেরোবে - কী করলো—কে জানে?"

ঘর থেকে সতীশ বলে ওঠে—"তাই বলো! তোমার কিছু ভাবনা নেই। বিকেলেই হয়ত টেলিগ্রাম আসবে। পাশ ও ঠিকই করবে। তোমার বীরেশ সত্যই রত্ন মা—ঠাট্টা কচ্ছি না।" সৌদামিনী খুশী হন মনে মনে। আশ্বস্তও হন। কিন্তু মায়ের মন; সন্তানের কোন অমঙ্গল চিন্তায় অস্থির হ'য়ে ওঠে! অনেক কথাই তাঁর আজ মনে পড়ে। কী বুকভরা আশাই না তাঁর স্বামী পোষণ করতেন সন্তানদের প্রতি! ওদের গায়ে একটু কুটোর আঁচড়ও লাগতে দিতেন না। ওরা মানুষ হবে—বিদ্যাসাগরের দেশের ছেলে—তাঁর আশীর্বাদ মাথায় করে দেশ দেশান্ত থেকে শিক্ষা পেয়ে ফিরে আসবে দেশে—দেশের বুকের অশিক্ষা দূর করবে। সতীশকে দিয়েছেন গায়ের স্কুলে। বীরেশ আরো বেশী শিক্ষা পেয়ে গায়ে একটা কলেজ প্রতিষ্ঠা করবে—সেই মহাত্মার নামে। কিন্তু ভগবান সে আশা আর পুরণ হ'তে দিলেন কোথায়? স্বামী মারা যাবার পর যে দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে দিয়ে কেটেছে—নিজে কখনও পৈতে কেটে বিক্রী করেছেন—ঘরের লক্ষী কাঁথা সেলাই করেও কম সাহায্য করেনি। তবু বীরেশকে পড়াশুনা ছেড়ে চাকরী করতে দেননি। সৌদামিনীর দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। ততক্ষণ সতীশের খাওয়া হ'য়ে যায়। সতীশের খড়মের আওয়াজ পেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নিজকে সংযত করে নেন। সতীশ মুখ ধুতে যাবার সময় মাকে লক্ষ্য করে আর একবার বলে: কিছু ভেবোনা মা। ভাবছো কেন অযথা! খবর এলো বলে।"

* * * * *

বীরেশ ট্রামেই ফিরে আসে মেসে। অফিসের বাবুরা কাজে চলে গেছেন। চাকরবাকরগুলি খেতে বসেছে। চুপি চুপি সিড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরে চলে আসে বীরেশ। সিড়ির পাশেই তার ঘর। তালা খুলে ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দেয়! গায়ে থেকে জামা কাপড় খুলে দঁড়িতে রেখে দেয়। কাপড়টা ছেড়ে লুঙ্গিটা পরে। কুঁজোটা থেকে দু' গ্লাস জল ঢেলে ঢক ঢক করে খেয়ে নেয় এক নিঃশ্বাসে। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ে। ক্লান্তিতে ভেংগে পড়েছে বীরেশ। কিন্তু তবু তার সান্ত্বনা—জীবনের দুর্বলতম মুহূর্তকে সে জয় করতে পেরেছে।—ক্ষণিকের দুর্বলতায় কী ভুলটাই না সে করতে বসেছিল! আর এ অগৌরবের জন্য সেই বা কতখানি দায়ী! বি, এ পড়বার সময়ই তার বাবা মারা যান। বীরেশকে হোষ্টেল ছেড়ে ভূপেনের মেসে আসতে হয়; মেস খরচা, কলেজের মাইনে, বই-পত্র ইত্যাদি নিজের সমস্ত খরচা চালিয়ে বাড়ীতেও কিছু কিছু অর্থ সাহায্য না করলে চলতো না। এজন্য বীরেশকে দু'বেলা ছাত্রছাত্রী পড়াতে হয়েছে। এম, এ, পড়বার সময়—দুর্ভিক্ষের ঝড় সমস্ত বাংলাকে বিধ্বস্ত করে দেয়—বীরেশকে টিউশনী ছাড়াও সংবাদপত্রে রাত জেগে কাজ করতে হয়েছে। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে তাদের সংসারটিকে বাঁচাতে যেয়ে যা কিছু আয় করেছে বীরেশ—মেস-ইউনিভারসিটির মাইনে ও সামান্য হাত খরচা রেখে সবই দাদাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। একখানা বইও বীরেশ কিনে পড়তে পারেনি। সবদিন ক্লাসও করতে পারেনি। যে সপ্তাহে তার দিনের বেলা ডিউটি পড়েছে—ক্লাস কামাই করা ছাড়া গত্যন্তর থাকতো না। তবু বীরেশ পরীক্ষাটা দিয়েছিল এই ভেবে, অন্ততঃ পাশটা করে যাবে। নইলে আর হয়ত পরীক্ষাই দেওয়া হবে না। পাশ সে করতে পারেনি—এ না-পারার জন্য সে আর কতটুকু দায়ী—দায়ী হয়ত অন্ন

কারণগুলিই। যে কারণগুলি শুধু বীরেশকেই নয়—বীরেশের মত মধ্যবিত্ত পরিবারের কত ছেলের আশাদীপ্ত ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথকেই না রুদ্ধ করে দাঁড়ায়!

"বাবু ভাত দিয়ে যাবো!" মেসের চাকর মধু এসে কড়া নেড়ে জিজ্ঞাসা করে। বীরেশের চিন্তায় বাধা পড়ে। সে ঘরের ভিতর থেকেই জবাব দেয়: না, আমি খেয়ে এসেছি।"

মধু চলে যায়। কোনবাবু না খেলে ওদের ভাবনাও নেই—লোকসানও নেই। বরং সে বাবুর ভাগটা ভাগাভাগি করে খাওয়া চলে। বীরেশ বিছানা থেকে উঠে—একটা খাতা ও কলম বের করে চিঠি লিখতে বসে মায়ের কাছে। খাটের সামনের জানলাটা খুলে দিয়ে বসে। শ্রীশ্রীচরণেষু—মা, পর্যন্ত লিখে বীরেশের কলম চলে না। কলম ধরে ও সামনের দিকে তাকায়। হাত চারেক ব্যবধানে আর একটি বাড়ী ওদের মেস বাড়ীর সংগে পাল্লা দিয়ে উঠেছে। বাড়ীটা এক ধনী কাচ ব্যবসায়ীর। তাঁরা ৬।৭টী ভাই হবেন। মেঝটি থাকেন ঠিক বীরেশদের ঘরের সামনাসামনি। তার সাত আট বছরের মেয়ে পুতুলের সংগে বীরেশের খুব ভাব। দুপুর বেলা ক্লাস বা ডিউটি না থাকলে বীরেশের সাথে সে ভাব জমাতে জানালার ধারে এসে বসে থাকে। আজও অনেকক্ষণ ধরে সে জানালার ধারে বসেছিল। বীরেশ ঘরে ঢুকেছে, পুতুল তা দেখেছে। এতক্ষণ কেটে গেল—তাকে ডাক দেয় নি, তাই অভিমান করে জানালা বন্ধ করে ফাঁক দিয়ে বীরেশকে লক্ষ্য কচ্ছিল পুতুল। বীরেশ জানালা খুলতেই পুতুল শব্দ করে জানলাটা বন্ধ করে দেয়। বীরেশ মনে করে পুতুলের বাবা ঘরে ঢুকছেন বুঝি। তাই ও ওরও জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে লিখতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে পুতুল জানালা খুলে বীরেশকে লক্ষ্য করে বলে: কেমন জব্দ।" বীরেশ লিখতে সুরু করেছিল। লেখা বন্ধ করে আবার জানালাটা খুলে পুতুলের দিকে তাকায় হাসিমুখে। পুতুলের বিজয়িনী রূপ। সে আবার "কেমন জব্দ বলে" হেসে ওঠে। পুতুলের সে হাসি বীরেশের মনের সমস্ত জ্বালা যেন মুহূর্তে দূর করে দেয়—বীরেশও ওর হাসির সংগে যোগ না দিয়ে পারে না। পুতুলের চাতুরীর কাছে সত্যই আজ বীরেশ পরাজিত। বীরেশের আজ পরাজয়েরই পালা। কিন্তু এই পরাজয়ে বীরেশের মনে কোন ক্ষোভ হয়না—বরং পুতুল খুশী হ'তে পেরেছে জেনেই বীরেশ তৃপ্ত। বীরেশ কী যেন বলতে যাবে, অমনি পুতুলদের ঘর থেকে কঠিন স্বর ভেসে আসে: "বার বার বলেছিনা—জানালা খুলবি না!" বীরেশ বুঝতে পারে, এবার সত্য সত্যই পালে বাঘ পড়েছে। সে জানালাটা বন্ধ করে আবার অসমাপ্ত চিঠিটা লিখবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়। কানটা খাড়া করে রাখে পুতুলদের ঘরের উদ্দেশ্যে। পুতুল জানালাটা সংগে সংগে ভেজিয়ে ঘর থেকে ছুট দিয়েছে। তার বাবা এসে ছিটকানি দিতে দিতে বীরেশের ঘরের প্রতি লক্ষ্য করে বলতে থাকে: যত সব মা তাড়ানো—বাপ খেদানো ইতরের আড্ডা হয়েছে!" ভিতর থেকে ধীর প্রতিবাদের সুর বীরেশের কানে আসে: ভদ্রলোকের ছেলেদের নামে কী বলছ যা-তা"—সংগে সংগে জবাব ওঠে: ভদ্রলোক না ভদ্রলোক। ভদ্রলোক হ'লে মেয়েদের সংগে ফষ্টি-নষ্টি করে নাকি?" পুতুলের মা উত্তর দেন:
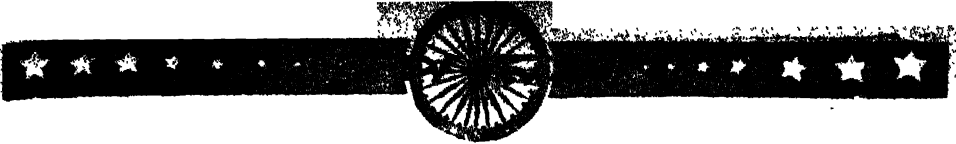
মেয়ে তবু তোমার সোমত্ত নয়"—পুতুলের বাবা একটু স্বর চড়িয়ে বলেন : তার লক্ষ্য যে মেয়ে, তাই বা কি করে বলবো ?" পুতুলের মা এই ইংগিত বুঝতে পারেন না, এমন নয়। তাই "ছি: ছি:" বলে তিনি চুপ করেন। বীরেশও লজ্জায় মরে যায়। ও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে : না, কিছুতেই আর পুতুলের ডাকে জানালা খুলবে না। বীরেশ তাড়াতাড়ি চিঠিটা লিখে মধুকে ডেকে Post করে দিতে বলে।

* * * * *

সতীশ স্কুল ছুটির পর একবার পোষ্ট অফিসটা ঘুরে যখন বাড়ীতে ফিরলো, সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। স্ত্রী সুলতা তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাদীপ জালিয়ে প্রণাম করছে। এই দৃশ্যে সতীশ মুগ্ধ না হয়ে পারলো না। প্রত্যহই সন্ধ্যা হ'লে স্ত্রী তুলসীমঞ্চে প্রণাম জানায় নত হ'য়ে। তবু এই চির পুরাতন মুহূর্ত'টি চির নূতন বলে মনে হয় সতীশের কাছে। এত অভাব—এত অভিযোগ—তবু গায়ে যখন সন্ধ্যা নামে —প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে যখন প্রদীপ জ্বলে ওঠে—মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিতে যখন চারিদিক কম্পিত হ'য়ে ওঠে—এই ক্ষণিকের মাধুর্য শুধু সতীশের মন থেকেই নয়—গায়ের সকলের মন থেকেই সকল বেদনা মুছিয়ে দিয়ে যেন স্নিগ্ধ অঞ্জনের প্রলেপ মাখিয়ে দেয়। তাইত এরা শত অভাব অভিযোগকে উপেক্ষা করে আজও গায়ের মাটি আকড়ে পড়ে আছে। সতীশ জুতো খুলে প্রণাম জানায় পশ্চিমের গোধুলি আকাশকে। সৌদামিনী দেবী সন্ধ্যা করতে ঠাকুর ঘরে যাচ্ছিলেন--সতীশকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন—"তোর যে এত দেরী হ'লো।"

সতীশ মুচকী হেসে বলে : তা কী তুমি বোঝনি মা ! পোষ্ট অফিস হ'য়ে এলাম—"

সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করেন : "তা, খবর পেলি কিছু ?"

সতীশ উত্তর দেয় : না—হয়তো আজ টেলিগ্রাম করতে পারে নি।"

"যা, হাত পা ধো গে" বলে সৌদামিনী দেবী ঠাকুর ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

দু'দিন বাদে যখন বীরেশের চিঠি এলো—সতীশ ভাবলো, মাকে জানাবে না—অথবা মিছে কথা বলে দেবে যে, বীরেশ পাশ করেছে। কিন্তু এর কোনটাই তার পক্ষে করা সম্ভব হ'লো না। তবে এই দু'দিনের ব্যবধানে সকলের মনই খানিকটা সামলে গিয়েছিল। তাই, যেদিন বিকেলের ডাকে চিঠি এলো, সেদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সৌদামিনী দেবী সতীশকে বলেন : আমার মনটা যেন কেমন কচ্ছে রে !"

সতীশের নিজের মনেও এ সন্দেহ উকি মেরেছিল। তাই মাকে বলে : পাশ করুক ফেল করুক, একটা সংবাদ দেবেত ! গাধাটা যে কী হচ্ছে দিন দিন।"

সৌদামিনী বলেন : অসুখ বিসুখ করলো কি না কে জানে ! দরকার নেই আমার পাশের সংবাদে। এখন ভাল থাকলেই হয়।" বিকেলের ডাকে বীরেশের চিঠি আসে। সতীশ চিঠিটা সুলতার হাতে দিয়ে মাকে বলে : এম্‌, এ পরীক্ষা কী সোজা কথা—টিউশানী করে—চাকরী করে কী আর পড়া চলে। সংসারের ভাবনা ভেবে কতটুকু আর পড়াশুনা করতে পেরেছে !" সুলতা চিঠিটা খুলে পড়তে থাকে। সৌদামিনী দেবী টাকুতে সুতো কাটছিলেন--শিখা মাথা নিচু করে পাজ কচ্ছিল। সতীশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে : তোমার এই বীরেশ যদি কোন বড় লোকের ঘরে জন্মাতো—দেখতে একটা ডিপটি হ'য়ে আসতো। নইলে ওর যা মাথা—না, আমাদের ঘরের ছেলেদের কিছুই হবার যো নেই—গরীবের প্রতি ভগবানের অভিশাপ মা, অভিশাপ !" বলে সতীশ ঘরের ভিতর চলে যায়।

* * * * *

এদিকে বীরেশকে লক্ষ্য করে তার রুম-মেট রমেশবাবুও বলেন : নারে—না। আমাদের ঘরের ছেলেদের কিছুই হবার যো নেই। হবে কোত্থেকে ! সংসারের চিন্তেই করবে, না— নিজের চিন্তা করবে।" জামাটা খুলে দঁড়ির পর রেখে রমেশবাবু বীরেশের পাশে এসে বসে পিঠ চাপড়ে বলেন : নে, আর ভাবিস নে। চুরি করেছিস—না ডাকাতি করেছিস ! বাপ-দাদার পয়সায়ও পড়িসনি।" বীরেশ ম্লান হাসি হেসে 'না' বলে একবার শরীরটা ঝাড়া দিয়ে

নেয়। রমেশবাবু তাঁর জীবনের ব্যর্থতার কথা বীরেশকে বলে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন। বিয়ে করেননি বলে কত জনে তাঁর সম্পর্কে কত সমালোচনা করে কিন্তু সত্তর পঁচাত্তর টাকার মাইনের চাকরী করে ৭।৮ জন লোককে প্রতিপালন করে কী করে সে বিয়ে করে! কোন আশা আকাঙ্খার কথাও বাদই দিতে হয়। কিছু হ'লো না জীবনে—কিছুই করতে পারলাম না। রমেশবাবু তাঁর জীবনের অনেক কথা বলে যান। বলে যান, তাঁর জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা যা সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। মুহূর্তে রমেশবাবু যেন বীরেশের সমবয়সী বন্ধু হ'য়ে উঠেছেন। বীরেশ অবাক হয়ে যায়। এতদিন একই ঘরে এই লোকটিকে নিয়ে সে কাটিয়ে আসছে—অথচ এত কথা কোনদিন সে শোনেনি। কথা রমেশবাবু সকলের সাথেই খুব কম বলেন। মেসে নানান ধরণের নানান বয়সের লোক রয়েছে। প্রয়োজনে সকলের সাথেই রমেশবাবু কথা বলেন। অথচ প্রয়োজনের বাইরে তাঁর মুখ থেকে একটী কথাও বেরোয় না। ছুটির দিনে কোনদিন মেসে থাকেন না। অফিস থেকে এসেও না। কী কাজ করেন—কাজের পর কোথায় যান—কেউ তা জানেনা। তাই মেসের অনেকেই রমেশবাবুর প্রতি অনেক কৌতূহলই পোষণ করেন। বীরেশেরও যে মনে কৌতূহল জাগেনি, এমন নয়। কিন্তু রমেশদার সংগে দীর্ঘদিন একই ঘরে কাটিয়েও, সে রমেশদা সম্পর্কে অন্যান্যদের চেয়ে একটুকুও বেশী জানতে পারেনি। রমেশদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয়নি। তবু রমেশদার প্রতি তার শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। রমেশদাকে অভিভাবকের মতই মেনে চলতো সে। রমেশদা বীরেশ সম্পর্কে কোনদিন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নি। কিন্তু বীরেশের যেন কেন মনে হ'তো, রমেশদা তার সব কথাই জানেন। আজকের আলোচনায় আরো তা প্রমাণিত হলো।

পরীক্ষার ফল বেরোবার পর থেকেই বীরেশ এ ক'দিন তার রমেশদাকে এড়িয়ে চলেছে। আজ রমেশদা চলে যাবার পর মেসে ফিরে চৌকীর ওপর রমেশদার লেখা এক চিরকুট দেখতে পায়। তাতে তিনি বীরেশকে অবশ্য অবশ্য সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করতে বলে গেছেন। বীরেশের আজ থেকে এক সপ্তাহের জন্য 'নাইট ডিউটি' পড়েছে। তবু সে রমেশদার জন্য অপেক্ষা না করে পারেনি। কথা বার্তা হ'য়ে যাবার পর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রমেশদাই বলেন: সাতটা বেজে গেছে। তোর তো ডিউটি রয়েছে। যা, কাজে ফাঁকি দিস না। ওটা যেন না হারায়।" বীরেশ জামা কাপড় পরে তৈরী হ'য়ে নেয়। রমেশ দাও উঠে বলেন: চল এক সংগেই বেরোই।"

* * * * *

বীরেশের পিতৃবন্ধু মিঃ চৌধুরী জাপানীরা বর্মা আক্রমণ করবার পরই হাটা পথে কলকাতার চলে আসেন তাঁর স্ত্রীও একমাত্র মেয়ে বিনতাকে নিয়ে। বহু ধনসম্পত্তি তাঁর নষ্ট হ'য়েছে। কিছুদিন ছিলেন আসামের এক রেফিউজি ক্যাম্পে— তারপর সেখান থেকে নিজের কলকাতার বাড়ীতে এসে উঠেছেন। বর্মার ব্যবসা ছাড়াও কলকাতায় মিঃ চৌধুরীর এক আড়ৎ ছিল--তাই কোন রকমে টাল সামলে নিতে পেরেছেন। ব্যবসায়ের ভিতর দিয়েই অঘোরনাথ আর মিঃ চৌধুরীর বন্ধুত্ব জমে ওঠে। মিঃ চৌধুরীর পড়াশুনা বিশেষ ছিল না--তবে দীর্ঘদিন বার্মায় থাকাতে এবং বহুলোকের সংস্পর্শে আসাতে—নিজেকে তিনি এমনি ভাবে তৈরী করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর শিক্ষাকে পরিমাপ করা কারোর পক্ষেই সম্ভব হ'তো না। তাঁর জীবনের সংগেও জড়িয়ে আছে এক পরম বেদনাময় ইতিহাস। ছোট বেলায় বাপ-মা দুইই মারা যায়। মামা বাড়ীতে অনাদরে প্রতিপালিত হ'তে থাকেন। সপ্তম শ্রেণীতে তখন পড়তেন। ভাত কাপড়টা না দেবার মতই মামা দিতেন—আর তার বিনিময়ে মামার সংসারের কাপড় কাচা থেকে গরু রাখা, ছেলেধরা সবকিছুই মিঃ চৌধুরীকে করতে হ'তো। প্রবেশিকা পরীক্ষাটা উত্তীর্ণ হবার আশায় সব কিছু দুঃখ কষ্ট মিঃ চৌধুরী সহ্য করে ছিলেন। কিন্তু স্কুলের মাইনেটাও
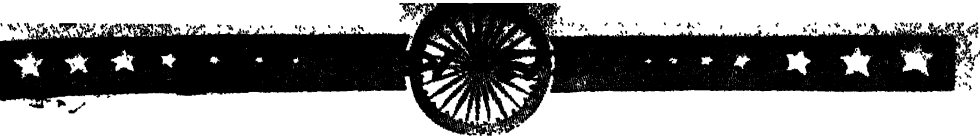
সেবার মিঃ চৌধুরীর মাম বাকী বেখে দেন, যেজন্য মিঃ চৌধুরীকে স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়া হয় না। মিঃ চৌধুরীর বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর হবে। দুঃখে ও অভিমানে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন—কলকাতা থেকে বার্মাগামী এক জাহাজে 'বয়ের' কাজ নিয়ে রেঙ্গুনে চলে যান। সেখানে নানান দুঃখ কষ্ট সহ্য করে—কখনও ফেরীওয়ালার কাজ করে—সুতোরের কাজ করে শেষে এক বর্মী ভদ্রলোকের চালের আড়তে কাজ যোগাড় করে নেন। নিজের কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে এই ভদ্রলোকের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হ'য়ে ওঠেন। স্বাধীনভাবে নিজে একটা মসলাপাতির আমদানী রপ্তানীর কারবার খোলেন। মিঃ চৌধুরী তখন পূর্ণ বয়স্ক যুবক। বর্মী ভদ্রলোক এই সময় রোগাক্রান্ত হ'য়ে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে বর্মী ভদ্রলোক স্ত্রীর নামে কিছু টাকা ও বসত বাড়ীটা লিখে দিয়ে যান আর মিঃ চৌধুরীর হাতে তুলে দেন নিজের একমাত্র কন্যা ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটিকে। কয়েক বছর বাদে স্ত্রীটিও মারা যান—তখন মিঃ চৌধুরীর কন্যাটি বছর তিনেকের হবে। বৃদ্ধা তার সমস্ত সম্পত্তি নাতনীর নামেই লিখে দেন। ধীরে ধীরে মিঃ চৌধুরী কলকাতায় এক আড়ৎ খোলেন। মেয়ের নামে বাড়ীও কেনেন একটা। নিজে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করতে পারেননি বলে মিঃ চৌধুরীর মনে কম দুঃখ ছিল না। তাই শিক্ষা ও শিক্ষিতদের প্রতি তাঁর অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা ছিল। মেয়েটিকে তিনি শিক্ষা দিতে বিন্দুমাত্র গাফিলতি করেননি। বার্মা থেকেই বিনতা ম্যাট্রিক পাশ করে আই, এ পড়তে সুরু করে। বিনতা যেবার আই, এ, পরীক্ষার্থিনী—সেবারই বার্মা আক্রান্ত হয়—মিঃ চৌধুরীর দোকানটি বোমাবিধ্বস্ত হ'য়ে যায়। কিছু নগদ টাকা সংগে নিয়ে মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে আসেন। অঘোরনাথের মৃত্যু সংবাদ মিঃ চৌধুরী বীরেশের চিঠি থেকেই জানতে পেরেছিলেন। ভাঙরের খালে নৌকাডুবির সংবাদ এবং মিঃ চৌধুরীর কাছে বাপের যে দেনা ছিল, তা পরিশোধ করবার প্রতিশ্রুতির কথা দিয়ে বীরেশই মিঃ চৌধুরীকে চিঠি লিখেছিল। মিঃ চৌধুরী সমবেদনা জানিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন—সেই সংগে দেনার জন্য ব্যস্ত না হ'তেও বীরেশকে লিখেছিলেন। এই সূত্রে মাঝে মাঝে বীরেশের সংগে পত্রালাপ হ'তো তাঁর। অঘোরনাথ যে তাঁর পরিবার-বর্গের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারেনি—এ ধারণা মিঃ চৌধুরীও যেমন মনে স্থান দিতে পারেননি, তেমনি পারিবারিক সুখ দুঃখের কথাও বীরেশ কোনদিন মিঃ চৌধুরীকে জানায়নি। বীরেশের মেধা সম্পর্কে অঘোরনাথের কাছ থেকেই মিঃ চৌধুরী সবকিছু জানতে পেরেছিলেন এবং বীরেশের প্রতি অঘোরনাথ যে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তাও যে না জানতেন, এমন নয়। না দেখেই বীরেশের প্রতি উচ্চ ধারণার সংগে সংগে মিঃ চৌধুরীর মমত্ব জন্মে ওঠে। তাই বার্মা থেকে প্রায়ই তাকে ভালভাবে পড়াশুনা করতে উপদেশ দিয়ে চিঠি লিখতেন। কলকাতায় এসে মিঃ চৌধুরী প্রথমে বীরেশকেই ডেকে পাঠান। বীরেশ তার সারাদিনের ব্যস্ততার মাঝেও চৌধুরী পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য করে। বীরেশের পরামর্শেই মেয়ে বিনতাকে মিঃ চৌধুরী স্কটিশচার্চ কলেজে ভর্তি করিয়ে দেন এবং মিঃ চৌধুরীর অনুরোধে বীরেশ মাঝে মাঝে এসে তাকে পড়াশুনায় সাহায্যও করতো। মিসেস চৌধুরী বর্মী মেয়ে হ'লেও মিঃ চৌধুরীর সংস্পর্শে এবং সাহায্যে একাবারে বাঙ্গালী বধূ হ'য়ে উঠেছিলেন। বিনতাও বাপের মতই গড়ে উঠেছিল। প্রথম দর্শনে মিসেস চৌধুরী ও বিনতাকে বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কিছু বলে কারোর সন্দেহ করবার কোন কারণ থাকতো না। যেটুকু অবাঙ্গালীর ছাপ তাঁদের চেহারা ও কথাবার্তায় ধরা পড়তো—তা দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার জন্যই। তবে মিসেস চৌধুরী বাংলাটা মোটেই লিখতে পারতেন না। বিনতা লিখতেও পারতো, বলতেও পারতো—কিন্তু তার কাঁচা হাতের লেখা বাংলা ভাষায় তার দক্ষতা সম্পর্কে বেশ সন্দেহের সৃষ্টি করতো। প্রথম প্রথম বীরেশও অবাক হয়ে যেত। তাই বিনতার নতুন করে আবার হস্তাক্ষর লেখা সুরু হয় বীরেশের কাছে। বীরেশ অনেক সময় বিনতাকে বলতো: আজন্ম রয়েছেন বার্মা মুলুকে, আপনার আর দোষ কী? নিজের দেশে যখন এসেছেন, নিজের

ভাষাটা আয়ত্ত করুন।" বিনতা নিজের দুর্বলতাকে আপ্রাণ শুধরে নিতে চেষ্টা করতো।

মিঃ চৌধুরী কলকাতায় বীরেশের সান্নিধ্যে এসে চিঠি পত্র মারফৎ বীরেশদের বাড়ীর সংগেও পরিচিত হ'য়ে উঠেছিলেন। প্রথমেই তিনি বীরেশের মার কাছে একবার চিঠি লেখেন: বৌদি, অঘোরনাথ বেঁচে থাকতে আর পরিচিত হ'বার সৌভাগ্য হ'লো না। আজ অঘোরনাথ নেই—সে বেদনা আমারও কম নয়। আপনিত আর আমন্ত্রণ জানাবেন না। এত কাছে যখন এসেছি, একবার জ্বালাতন করে আসবো।" সৌদামিনীও সতীশকে দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে তার জবাব দিয়েছিলেন। এমনি ভাবে বীরেশদের বাড়ীর সংগেও মিঃ চৌধুরীর হৃদ্যতা জমে উঠেছিল। মিঃ চৌধুরীর সংগে বীরেশদের পরিবারের হৃদ্যতার কথা বীরেশের রমেশদা জানতেন এবং এতবড একজন ধনী হিতাকাঙ্খী থাকা সত্ত্বেও বীরেশ যে তাঁর কাছে কোনদিন প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ায়নি, বীরেশের এই আত্মমর্যাদাজ্ঞানে রমেশদা আরো বেশী খুশী হ'য়েছিলেন বীরেশের প্রতি।

* * *

বীরেশের পরীক্ষার ফল বের হবার বেশ কয়েকদিন পর। সন্ধ্যা সাতটা হবে। রমেশবাবু ঘর বন্ধ করে কেবল বেরোবেন—আঠারো উনিশ বছরের একটী মেয়ে একটী চাকরকে সংগে করে এসে তাঁদের ঘরের সামনে উপস্থিত হ'লো। রমেশবাবুকে দেখেই মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে: বীরেশবাবু কোন ঘরে থাকেন?"

রমেশবাবু উত্তর দেন: এই ঘরে—কিন্তু সেত নেই।"

'ও' বলে মেয়েটি চলে যেতে পা বাড়ায়।

রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করেন: কোন দরকার থাকেত আমায় বলে যেতে পারো।"

মেয়েটী ফিরে বলে: ও, আপনিই বুঝি বীরেশদার রমেশদা!" রমেশবাবু হেসে বলেন: ঠিক ধরেছোত! আর তুমি বুঝি মিঃ চৌধুরীর মেয়ে বিনতা?"

বিনতাও এবার না হেসে পারেনা। তারপর বলে: বীরেশদার এ ক'দিন আর দেখা নেই। হয়ত পরীক্ষায় ফেল করে লজ্জায় যেতে পাচ্ছেন না। এদিকে তাঁর মা, চিন্তিত হ'য়ে খোঁজ করবার জন্য বাবার কাছে চিঠি দিয়েছেন—সেই পরীক্ষার খবর জানানো ছাড়া আর কোন চিঠিই নাকি দেন নি।"

রমেশবাবু বলেন: পাগল! একদম পাগল! তুমি কাল দুপুরের দিকে এসো, ওর দেখা পাবে। আমিও দেখা হ'লে বলে রাখবো।"

পরের দিন দুপুর বেলা বীরেশ খাওয়া দাওয়া-করে একটু ভাত-ঘুম দিয়ে নিচ্ছিল। দু'তিনবার কড়ানাড়ার শব্দে সচকিত হ'য়ে দরজা খুলতেই বিনতাকে দেখতে পায়। বিনতা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করে: ঘুমোচ্ছিলেন বুঝি?" বীরেশ উত্তর দেয়: রাত জাগতে হবেত?"

বিনতা দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিল: বীরেশকে লক্ষ্য করে বলে: বসতে বলবেন, না বাইরে থেকেই চলে যাবো?"

বীরেশ বলে: "ও হো' ভুলেই গেছি। কিন্তু বসবে কোথায়? এসো, ভিতরে এসো দরজাটা ভেজিয়ে।"

চৌকীর ওপর পা ঝুলিয়ে দু'জনে বসে কথা বলতে থাকে। বীরেশ বালিসটা টেনে নিয়ে কনুইতে ভর দিয়ে বিনতাকে জিজ্ঞাসা করে: তারপর, হঠাৎ চলে এলে। খুঁজে বের করলে কী করে?" বিনতা সগর্বে বলে: বার্মামুলুকে এতদিন কাটিয়ে এসেছি সেখানকার অলি-গলির কাছে এ গলিত কিছুই নয়। সে থাক। কী পাগল বলুনত আপনি! পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন নি, তাতে কী হ'য়েছে আর একবার নয় দেবেন। তাই বলে, আমাদের বাড়ী যাওয়াও বন্ধ করেছেন—মায়ের কাছেও সেই একখানা চিঠি দিয়ে আর চিঠিপত্র লিখছেন না—চিঠি দিয়েও কোন উত্তর না পেয়ে তিনিত ভেবে ভেবে অস্থির! আপনার মায়ের জন্যই আমাকে আসতে হ'লো। নইলে আপনার মুখদর্শনের সৌভাগ্য আর হ'তো কোথায়?"

বীরেশ প্রায় বলেই ফেলেছিল: শুধু মায়ের প্রয়োজনেই! কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে: মুখ দেখাবার মত কাজ আর করতে পারলাম কৈ"—বীরেশ আরো যেন কী বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ দরজাটা এক ধাক্কা খেয়ে খুলে যায়। সচকিত হয়ে বীরেশ সেদিকে চাইতেই অবাক হ'য়ে বলে: একী, রীতা!"
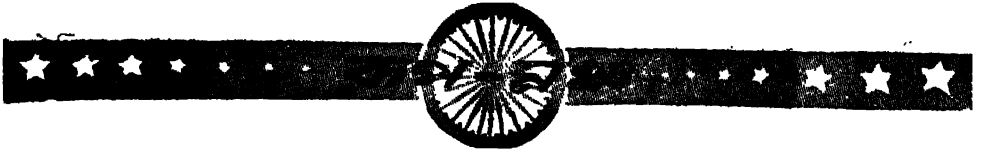
রীতা বিনতার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বক্রভাবে জিজ্ঞাসা করে: কেন, সন্দেহ হচ্ছে নাকি?"

বীরেশ বলে: সন্দেহ না হলেও, আশ্চর্য লাগছে বৈকী? তা বসো—"

রীতা উত্তর দেয়: না থাক। তোমাদের আলাপে ব্যাঘাত জন্মালুম।" রীতা আর একবার বিনতার দিকে তাকায়। বীরেশ সংগে সংগে বলে: ও—তোমার সংগে পরিচয় করিয়ে দি।"

রীতা বাধা দিয়ে বলে: না, তার আর প্রয়োজন হবে না। এইতো তোমার পুতুল!" বীরেশ আর একটু হ'লে হেসে উঠেছিল প্রায়। কিন্তু রগড় দেখবার জন্য হাসি চেপে রেখে উত্তর দেয়: হ্যাঁ।" বিনতা বীরেশের দিকে উৎসুক দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। বীরেশ তাকে চোখ ইশারায় চুপ করতে বলে। রীতা নিশ্চিত হ'য়ে এবার মন্তব্য করে: "এই জন্যই পরীক্ষায়"—

বীরেশ বাকীটুকু কেড়ে নিয়ে বলে: পাশ করতে পারিনি। তা, তুমিত 2nd Class পেয়েছো। বিলেত যাবে না কি?" রীতা কঠিন স্বরে উত্তর দেয়: সে পরামর্শের জন্য আসিনি - আজ পনেরো দিন প্রায় পড়াতে যাও না– অত গাফিলতি করলে আমার পক্ষে টিউশানি রাখা দায় হবে। তাই বলতে এসেছি। আমি চল্লাম।" রীতা বাইরে পা বাড়ায়। বীরেশ রীতাকে শুনিয়ে বিনতাকে বলে: চলো পুতুল, তোমাদের বাড়ীটা ঘুরেই আসি—।" রীতা সিড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে যায়। বিনতা ফ্যাল ফ্যাল করে বীরেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। জামা গায় দিতে দিতে বীরেশ বলে: আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ, কেমন! এই হ'লো রীতা--আমার সংগে এম, এ দিয়েছিল—2nd Class পেয়েছে। খুব বড়লোকের মেয়ে। ওরই ছোট ভাইকে পড়াই। তোমাদের স্কটিশেই 3rd year-এ পড়ে।" বিনতার মনে তবু হেয়ালী থেকে যায়। পুতুল—তাহলে পুতুল কে? কিন্তু কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেও পারে না। বিনতার কৌতূহলী দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বীরেশ বলে: আর পুতুল—থাকনা পুতুলের কথা আপাততঃ। সময় এলে বলা যাবে।" ঘরের তালা বন্ধ করে বিনতার সংগে বীরেশ তাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে পড়ে।

রীতাদের বাড়ীর টিউশনীটি আর বীরেশ ধরে রাখতে পারে নি। সে জন্যে তার কোন আপসোসও নেই। বীরেশ মনে মনে স্থির করে নিয়েছে, যদি ছাত্রই পড়াতে হয়, তবে মাইনে নিয়ে পড়াবে না। রমেশদার পাঠশালাতেই বেগার খাটবে। রমেশদা রোজ সন্ধ্যাবেলাতে কোথায় যান, সে সম্পর্কে বীরেশের মনে যথেষ্ট কৌতূহল জমে উঠেছিল। কিন্তু কোন দিন এসম্পর্কে রমেশদাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারে নি। রমেশদা নিজেই এর মাঝে একদিন সন্ধ্যায় বীরেশকে বল্লেন: চল, তোকে আজ একটা জায়গায় নিয়ে যাই।" নিতান্ত অনুগত ছেলের মত বীরেশ তার রমেশদাকে অনুসরণ করে চলে। বেশীদূর তাকে চলতে হয় না। সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট দিয়ে কেশব সেন ষ্ট্রীটে পড়ে পূবমুখী কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই ডানদিকে একটা বস্তির গলি দিয়ে প্রবেশ করে। গলির মুখে কয়েকটি লোক বসে বিড়ি ফুঁকছিল। রমেশদাকে দেখেই তারা বিড়ি লুকিয়ে নেয়। রমেশদা কোন কথা না বলেই ভিতরে প্রবেশ করেন। বীরেশও তার পিছু পিছু যায়। বীরেশ আশ্চয হ'য়ে নিজের মনে নিজেই জিজ্ঞাসা করে: এ কোথায় আনলেন রমেশদা তাকে! এখানে রমেশদার কী কাজ থাকতে পারে! প্রথম একটা ঘরে রমেশদা ঢুকলেন বীরেশকে নিয়ে। ছোট খোলার ঘর। দরজাটা ভেজানো ছিল—ভিতরে টিপ টিপ করে একটা হ্যারিকেনের আলো জ্বলছে। রমেশদার সংগে সংগে বীরেশও ভিতরে ঢুকলো। ঘরের চালটা খুব নিঁচু। প্রায় মাথায় ঠেকে। একটা খাটিয়া পাতা রয়েছে। আর দু'টো বেড়ার কোন ঘেসে ঝুলান রয়েছে একটা নারকেলের দঁড়ি। রমেশদা খাটিয়ার ওপর বসে জামা খুলতে খুলতে বীরেশকে বলেন: আয়, বসবি একটু।" বীরেশ খাটিয়ার ওপর তার রমেশদার পাশে বসে। রমেশদা জামাটা খুলে দঁড়ির উপর রেখে হাক দেন: নিতু, ও নিতু।" সংগে সংগে উত্তর আসে: যাই বাবু!" কিছুক্ষণ বাদেই নিতু দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। অন্ধকারে তার মুখখানা ভাল করে বুঝতে পারে না বীরেশ। রমেশদা

বলেন : দু'গ্লাস চা আনতো ভাই।" রমেশদা বলেন: অবাক হ'য়ে যাচ্ছিস, নারে? রোজ সন্ধ্যায় তোর রমেশদা কোথায় যান—তা জানবার জন্য মনেত কতদিন কৌতূহল জেগেছে—আজ সব টের পাবি।" বীরেশ কোন কথা বলেনা। কিছুক্ষণ বাদে নিতু দু'গ্লাস চা এনে সামনে ধরে। রমেশদা একটা হাতে নিয়ে বীরেশকে বলেন: নে, চা খা'।" বীরেশ নিতুর হাত থেকে চায়ের গ্লাসটা নেয়। এবার নিতুকে সে খানিকটা পরিষ্কার করে বুঝতে পারে। বছর চল্লিশ বয়স হবে নিতুর—বেশ মোটা সোটা বলিষ্ঠ গঠন। একটা চোখ নেই। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে রমেশদা নিতুকে বলেন: এই বাবুকে চিনে রাখ নিতু। আমার ভাই হয় সম্পর্কে। আমার মেসেই থাকে। আমি মাঝে মাঝে কামাই করলে ইনিও আসতে পারেন।" নিতু 'যে আজ্ঞে' বলে মাথা নাড়ে। চা খাওয়া শেষ হ'লে চারটে পয়সা গ্লাসে রেখে রমেশবাবু বীরেশকে বলেন: নে ওঠ—কেন আসি এখানে দেখে যাবি। তোকেওত আসতে হবে মাঝে মাঝে।" বীরেশকে নিয়ে রমেশবাবু কিছুদূর এগিয়ে আর একটি চালাঘরে আসেন। ঘরটার তিন দিক ঘেরা—একদিক খোলা। সারা ঘরটায় সতরঞ্জি বিছানো—আর তার উপর ছোট-বড় ছেলে-মেয়ে নানান বয়সী পড়ুয়ার দল। বীরেশের তখুনী ইচ্ছা হয়, তার রমেশদার পদধূলি নিয়ে মাথায় দেয় —হউক না রমেশদার কায়স্থের ঘরে জন্ম, কিন্তু তার ব্রাহ্মণত্ব যে কত উর্ধ্বে'—তা বীরেশ পরিমাপ করতেও পারে না। রমেশদার ভয়ে প্রণাম করতেও পারে না বীরেশ। ছেলে মানুষী বলে অমনি এক বকুনি দিয়ে বসবেন হয়ত। তাই বীরেশ নিজের অন্তরে অন্তরেই প্রণাম জানায় এই আদর্শবাদী মহাপ্রাণটিকে। দু'ঘণ্টা ধরে রমেশদা এদের নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। বীরেশ কেবল পাশে বসে লক্ষ্য করে গেল চুপটি করে। সম্পূর্ণ আধুনিকপন্থা অনুসরণ করেই রমেশবাবু এদের পড়ালেন। ছোটদের আগেই ছেড়ে দিলেন—যাবার সময় নিজের পকেট থেকে লজেন্সের ঠোঙ্গা বের করে তাদের যার যার হাতে লজেন্স গুজে দিলেন। সকলকে ছুটি দিয়ে আবার ফিরে এলেন সেই ছোট ঘরটিতে। নিতু আগেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তাকে আর দু'গ্লাস চা আনতে বল্লেন। তারপর খাটিয়ার ওপর বসে জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে চড়ালেন। বীরেশ অনেকক্ষণ বাদে এবার মুখ খুললো: কতদিন এই পাঠশালা বসিয়েছেন?"

রমেশদা উত্তর দেন: তা বছর দশেক হ'লো প্রায়।"

বীরেশ ভয়ে ভয়ে বলে: কোন ফল পেয়েছেন?"

রমেশদা জবাব দেন: পাইনি! এই দশ বছরে এখানকার অন্ততঃ একশ' জন ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে।" বীরেশের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। 'হা' করে চেয়ে থাকে ওর রমেশদার পানে। রমেশবাবু বলতে থাকেন: এই যে নিতুকে দেখছিস! তুই হয়ত জানিস না—আমি কাজ করি এক পেট্রোল কম্পানীতে। নিতু সেখানকার একজন মিস্ত্রী। গাড়ী সারাতে যেয়ে ওর চোখটা নষ্ট হ'য়ে গেছে। ওর ছেলেই আমার হাতের প্রথম ছাত্র। বি, এ, পাশ করে সে এখন আমাদের কম্পানীরই একজন ইন্সপেক্টর।"

বীরেশ জিজ্ঞাসা করে: সে থাকে কোথায়?"

রমেশদা উত্তর দেন: এখানেই! ঐ গলিতে ঢুকতেই ডান দিকের বাড়ীটা নিতুর! এইত গতবার ছেলের বিয়ে দিয়েছে। এখনত এই বস্তীর অবস্থা ভাল দেখছিস। আগে কী এর কম ছিল নাকি!" বীরেশ চুপ করে শুনে যায়। "তোরাত বস্তীর লোকেদের সম্পর্কে কত কথাই শুনে থাকিস, দিনরাত নেশাভাঙ করে—কত কী! এই বস্তী থেকে একটা লোককেও বের করতে পারবি না যে, নেশা করে।" নিতু এর মাঝে চায়ের গ্লাস এনে সামনে ধরে। তাকে লক্ষ্য করে রমেশবাবু বলেন: "এই যে নিতু, কম টাকা উড়িয়েছে
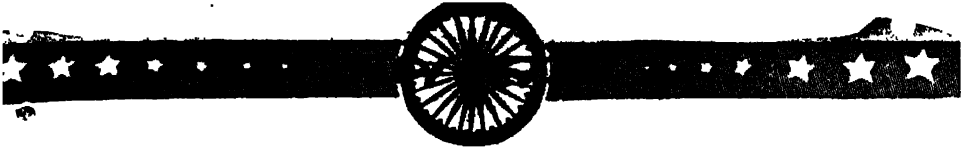
নাকি নেশা-ভাঙ-এ! এখন এনেদেত ওকে। এক কলকে গাঁজা টানাতেও পারবি না।" নিতু লজ্জায় মাথা নত করে। চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গেলে রমেশবাবু আবার চারটে পয়সা বের করে দেন নিতুকে। নিতু পয়সা ও গ্লাসটা নিয়ে চলে যায়। রমেশবাবু দেবুকে জিজ্ঞাসা করেন: তা, তুই কী করবি ভেবেছিস? পরীক্ষাটা কী আবার দিবি?"

বীরেশ হতাশ ভাবে উত্তর দেয়: দিয়ে আর কী করবো? পড়াশুনা না করতে পাবলে পরীক্ষা দিয়ে লাভ কী?"

রমেশবাবু বলেন: এক কাজ কর, টিউসনী ফিউসনী করে দরকার নেই। শুধু কাগজের চাকরীটাই রাখ। শুনছি এরই ভিতর তোর সুনাম হয়েছে। আর ওটার দরকার আছে। আচ্ছা করে চাবুক মারতে হবে। দুর্নীতিতে দেশটা ছেয়ে গেছে—! এটাকে রেখে পড়াশুনা চালিয়ে য—। বাড়ীতে লিখেদে, একটু কষ্ট করে একটা বছর চালিয়ে নিতে। যদি বেধে যাস, আমি আছি। লজ্জা করিস না কিছু জানাতে।"

রমেশ বাবু লক্ষ্য করছেন, বীরেশ কী যেন বলবে বলবে বলেও বলতে পাচ্ছে না। তাই জিজ্ঞাসা করেন: কী, কিছু বলবি নাকি?" বীরেশ উত্তর দেয়: হ্যাঁ, আপনার এই ঘরটা আমায় দিন।"

রমেশ বাবু আশ্চর্য হ'য়ে বলেন: "মানে"! বীরেশ উত্তর দেয়: মানে, আমি এখানে এসে থাকবো। আপনার পড়ুয়াদের দলে নাম লেখাতে চাই। আর তা ছাড়া একটু অজ্ঞাতবাসের দরকার?"

রমেশবাবু বলেন: থাকতে পারবি ত এখানে!" বীরেশ উত্তর দেয়: খুব।"

"বেশ, তাহলে পোটলা পুটলি নিয়ে চলে আয়।" বলে রমেশবাবু উঠে দাঁড়ান। নিতুকে ডেকে বলেন: "আমরা যাচ্ছি। অনেক রাত হ'য়ে গেছে।"

মেছুয়াবাজারের এ বস্তীটা বীরেশদের মেসটা থেকে খুব বেশী দূরের রাস্তা নয়। রাস্তায় আরো নানান কথা বলতে বলতে ওরা যখন মেসে ফিরলো, অনেকেরই খাওয়া দাওয়া তখন শেষ হয়ে এসেছে। সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই পাশের ঘরের সিধু বাবু জিজ্ঞাসা করেন: এত রাত্রে! সিনেমায় গিয়েছিলেন বুঝি দু'জনে?"

রমেশদা উত্তর দেন: হ্যাঁ, সিধু দা—একটা ভাল ছবি বীরেশকে দেখিয়ে নিয়ে এলাম।"

* * * *

বীরেশ মেস ছেড়ে তার রমেশদার বস্তীর এই ঘর খানাতেই এসে উঠেছে। প্রথম প্রথম ভারী অসুবিধা হ'তো তার। দিনের বেলা বাইরে বেরোতে পারতো না—পরিচিত কেউ দেখে ফেলবে বলে। গলির মুখে রাস্তার ধারে লোকজন কেউ আছে কিনা—আগে থেকে কাউকে দিয়ে খবর নিয়ে তবে বেরোতো। ধীরে ধীরে এই সংকোচ অবশ্য বীরেশের কেটে যায়। বীরেশের চিঠিপত্র মেসের ঠিকানাতেই আসে। কোন দিন রমেশদা নিয়ে আসেন, আবার মাঝে মাঝে বীরেশও মেসে যায়। মাকে চিঠি লিখেছে: নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারিত বাড়ী যাবো—নইলে কবে তোমাদের সাথে দেখা হবে, বলতে পারি না।" বীরেশের মা প্রথম প্রথম কাঁদাকাটি করে চিঠি লিখলেন বীরেশকে—একবার আসবার জন্য—কিন্তু বীরেশ তার কোন সাড়া না দেওয়াতে সতীশ মাকে বুঝিয়ে শান্ত করে। মায়ের মন সে সান্ত্বনায় শান্ত হয় না। আড়ালে আবডালে সন্তানের জন্য শুধু চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারটা আরো ঘোরালো হ'য়ে দাঁড়ালো—বীরেশদের গ্রামের দু'চারজন কলকাতা থেকে গিয়ে সতীশকে বলতে লাগলো: ভাইটা তোমার গোল্লায় গেছে। এই সেদিন রাতে তাকে যেখানে ঢুকতে দেখলাম"—বলে ইংগিতে বাকীটুকু আভাষ দেয়। প্রথম যার কাছ থেকে সতীশ এই কথা শোনে, তাকে ত মারতেই উদ্যত হ'য়েছিল—সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলে। কিন্তু ধীরে ধীরে আরো কয়েকজনের কাছ থেকে কথাটা যখন কানে আসতে লাগলো—সতীশ নিতান্ত অমূলক বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারলো না। তবু তাদের সামনে দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানাতো, ধমক দিয়ে বলতো: বেশ, আমার ভাই যাই হোক, তা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।" কিন্তু ঘরে এসে স্ত্রী সুলতার কাছে অভিমানভরে নিজের পুঞ্জীভূত ব্যথা প্রকাশ
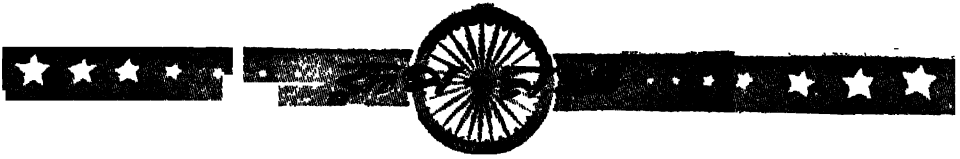
না করে পারতো না। বীরেশকে উদ্দেশ্য করে বলতো : গাধাটা শেষ কালে এই হ'লো! এত আশা—শেষকালে—" সতীশ আর কিছু বলতে পারতো না—ভাইয়ের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর স্নেহ কতদিনই না অশ্রুর রূপ নিয়ে ঝরে পড়েছে! মাকে এসম্পর্কে কিছু না বললেও—তাঁর কানেও এসব কথা যে না উঠতো এমন নয়। আগে কলকাতা থেকে কেউ গ্রামে গেলে সৌদামিনী দেবী তাকে ডেকে পাঠিয়ে ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করতেন—এখন সেরকম কেউ সামনে এসে হাজির হলেও সৌদামিনী দেবী এড়িয়ে যান।

এদিকে বীরেশদের কাগজের যিনি রাত্রির ভার নিয়ে ছিলেন, তিনি অন্য কাগজে চলে যাওয়াতে সম্পাদক এ-গুরু-দায়িত্বের জন্য বীরেশকেই একমাত্র উপযুক্ত বলে মালিকের কাছে অনুমোদন করেন। বীরেশের রচনা ও কর্মশক্তি সম্পর্কে বহুপূর্বেই তিনি যোগ্যতার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাই দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টা লিখবার ভার তিনি তাকেই দিয়েছিলেন। সম্প্রতি শিক্ষা-সংক্রান্ত ও অর্থনীতি বিষয়ক বীরেশের কতগুলি মৌলিক প্রবন্ধ শুধু কাগজের সম্পাদক ও মালিকের দৃষ্টিই আকর্ষণ করে না—বহু সুধীজনের প্রশংসা পেয়েও ধন্য হয়। বীরেশ সানন্দে এ গুরুভার নিতে স্বীকৃত হ'লো—তবে মালিক চলে গেলে সম্পাদকের কাছে সে যে এম, এ, পরীক্ষাটার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে সেকথা খুলে বলল : এবং পরীক্ষার সময় কয়েকমাসের ছুটির আবেদন জানিয়ে রাখলো। সম্পাদক ত উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন : তুমি একথা আগে বলনি কেন? তাহলে একটা বছর নষ্ট হয়ে যেত না তোমার। নিশ্চয় ছুটি পাবে। আর কাজের চাপ যাতে তোমার ওপর হালকা হয়, সেদিকেও আমি দৃষ্টি রাখবো।" বীরেশ সম্পাদকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসে। গভীর কৃতজ্ঞতায় সম্পাদকের প্রতি তার মনটা ভরে ওঠে। অথচ এই লোকটির বিরুদ্ধে সে কত কথাই না শুনতে পেয়েছে!

মিঃ চৌধুরীদের বাড়ীতেও বীরেশ যাতায়াতটা খুবই কমিয়ে দিয়েছিল। মেসে থাকেনা সেকথা জানিয়ে দিলেও কোথায় থাকে সে ঠিকানা সে দেয়নি। ঠিকানার কথা অবশ্য বিনতাই জিজ্ঞাসা করেছিল। তাই ঠিকানাটা না দেওয়াতে বীরেশের প্রতি অভিমানটা তারই হ'য়েছিল বেশী। পুতুলের রহস্যও তার মনে মাঝে মাঝে যে উঁকি না মারতো এমন নয়।

ক্লাসটা বীরেশ রীতিমতই করে। পরিচিত ছেলেদের অনেকের সংগে দেখা সাক্ষাতেও হয়—কথাবার্তাও বলে। তবে খুব কম। যতটা পারে সকলকে সে এড়িয়েই চলে। বন্ধুর ভিতর রমেশদা আর নিতু। এদেরই সাথে যেটুকু কথা-বার্তা হয়। মাঝে মাঝে রমেশদার সংগে বসে ক্লাস নেয়। আর সব সময়ই কাটে বীরেশের পড়াশুনায়। পরীক্ষাটা শেষ পর্যন্ত বীরেশ দিয়েই দিল। পরীক্ষার পর যেদিন কাজে যোগদান করলো, সম্পাদক ওকে দেখে ত অবাক : একী চেহারা হয়েছে তোমার! নাও, আরো কি দিন ছুটি নাও। বিশ্রাম করে আসো।" বীরেশ উত্তর দেয় : এতদিন কাজে না এসে দম বন্ধ হ'য়ে মরবার উপক্রম হয়েছিল। আর ছুটি নিতে পারবো না।" সম্পাদক তখন তাকে নাইট ডিউটি থেকে মুক্তি দিয়ে দেন। বিকেলে এসে কেবল দ্বিতীয় সম্পাদকীয়টা লিখে দিয়ে যেতে বলেন।

*   *   *   *

বীরেশ সম্পর্কে এত কথাই সিমপুরে যেয়ে রটতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত বীরেশের মায়ের পক্ষে গায়ে টেকা কঠিন হয়ে উঠলো। তিনি বারবার তাকে কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্য সতীশকে অনুরোধ করতে থাকেন। সতীশ স্কুলের কাজ ফেলে মাকে নিয়ে কলকাতায় আসবার মোটেই সুযোগ খুঁজে পায় না। মায়ের উদ্বিগ্নতায় অগত্যা তাকে আনতেই হয়। মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতেই সতীশ তার মাকে নিয়ে এসে উঠলো। মিঃ চৌধুরী সব কথা শুনলেন। তিনিও বীরেশ সম্বন্ধে কোন অভিযোগই স্বীকার করে নিতে পারলেন না।
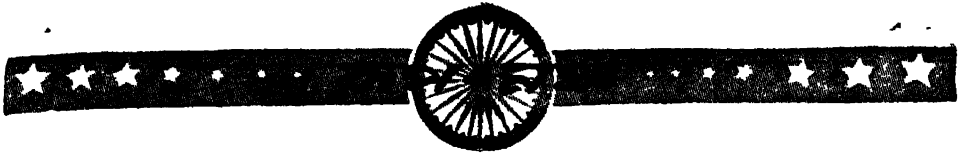
রমেশবাবুর কথা মিঃ চৌধুরী মেয়ের মুখ থেকেই প্রথম শুনেছিলেন। দু'একবার তাঁরে সংগে দেখা-সাক্ষাৎও হয়েছিল তিনি যে বীরেশের একজন পরম শুভানুধ্যায়ী এ কথাও বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সতীশকে পাঠিয়ে দিলেন তার কাছে। বিনতা নানানভাবে বীরেশের মাকে প্রবোধ দেয়—এতদিন গায়ে ছেলের বিরুদ্ধে শুনতে শুনতে মায়ের মন মরমে মরে গিয়েছিল·· আজ অনেকদিন বাদে বিনতার কাছে ছেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তাঁর অন্তর পরম তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। ছেলে কাছে নেই—মাতৃমনের সমস্ত উচ্ছ্বাস বিনতাকে ঘিরেই উপছে পড়ে। তিনি বিনতাকে কাছে টেনে মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। সোহাগ করে বলেন: তুই আমার লক্ষ্মী মা, তুই যতখানি আমার বীরেশকে চিনেছিস, আর কেউ ততখানি চেনেনি। বল, ওদের ভাল করে বল। তোকে টেনে নিয়ে যাবো আমি সিমপুরে—সেখানকার লোকগুলিকে চিৎকার করে বলবি—আমার বীরেশ কী?" বলতে বলতে সৌদামিনী দেবী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠেন। বিনতারও চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। সৌদামিনী দেবী একটু প্রকৃতস্থ হয়ে বলেন: ওরা যে যাই বলুক - আমিত জানি আমার ছেলেকে।"

"নিশ্চয় জানেন" বলে রমেশবাবু সৌদামিনী দেবীকে প্রণাম করেন। সৌদামিনী দেবী চোখের জল মুছে ফেলে নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নেন। এতগুলি লোকের সামনে আজ ধরা পড়ে গেছেন। বিনতা "রমেশদা" বলে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। সতীশ মাকে বলে: মা, এই সেই রমেশবাবু —তোমার বীরেশের রমেশদা।"

সৌদামিনী: বোস বাবা, বোস" বলে নিজের পাশটাই দেখিয়ে দেন রমেশবাবুকে।

রমেশবাবুকে বলেন: বীরেশ কী আপনার সেই ছেলে! লোকের কথায় কেন কান দিয়েছেন?"

রমেশবাবু পূর্বে থেকেই বীরেশের পরীক্ষার কথাটা তাঁর পরিচিত অধ্যাপক বন্ধুদের মারফৎ জানতে পেরেছিলেন। সেকথা আলোচনা প্রসংগে প্রকাশ করলেন না। শুধু বল্লেন: আপনার বীরেশ যে সত্যই রত্ন, দু'দিন বাদেই তা বুঝতে পারবেন। পরশু সকালে আমি আপনাকে নিয়ে যাবো।" বলে রমেশবাবু বিদায় নিচ্ছিলেন।

সৌদামিনী দেবী ব্যাকুল কণ্ঠে বলেন: তুমি উঠছো কেন বাবা!"

রমেশবাবু উত্তর দেন: আমার যে কাজ আছে মা!"

সৌদামিনী দেবী বলেন: তা থাক। তুমি আমাকে বীরেশের কাছে নিয়ে চলো—"

রমেশবাবু বলেন: আমি বলছি, সে ভালই আছে। এসছেন যখন সে আসবেই। পরশুই তাকে দেখতে পাবেন।"

বিনতা উত্তর দেয়: মা, রমেশদা নিশ্চয়ই কোন মতলব আটছেন।"

সত্যিই, রমেশবাবু একটা মতলব আটছিলেন। বিনতার কাছে ধরা পড়ে গেছেন, তাই ওকে বলে ওঠেন: বড্ড দুষ্টু তুই।" সৌদামিনী দেবী বলেন: না বাবা, ওকে না দেখা অবধি আমার আর মন স্থির থাকবে না। তুমি আমাকে আজই নিয়ে চলো।" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেশবাবু বলেন: বেশ চলুন তাহলে।" বিনতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন: তুমিও যাবে নাকি বিনতা?"

বিনতা উত্তর দেয়: যদি নেন।"

রমেশবাবু বলেন: বড্ড যে বিনয়ের অবতার! নাও, নাও তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।" রমেশবাবুকে একটু চিন্তিত দেখা যায়: পকেটে হাত দিয়ে দেখেন, খুব বেশী কিছু নেই। আমতা আমতা করে সৌদামিনী দেবীকে বলেন: মা, অনেকদিন বাদে ছেলেকে দেখতে যাচ্ছেন—সংগে কিছু মিষ্টি নিতে হবে যে!" সতীশ মুচকী হেসে বলে: তা যে সিমপুর থেকেই বয়ে নিয়ে আসতে হ'য়েছে।"

রমেশ বাবু বলেন: কিন্তু সেত একা বীরেশের জন্য—ওখানে যে আরো অনেক বীরেশ রয়েছে। ওতে কী আর কুলোবে?"

"মোটেই কুলোবে না—চলুন রাস্তা থেকে মিষ্টি নিয়ে যাওয়া যাবে।"

"আরে আপনি কখন এলেন?" বলে রমেশবাবু মিঃ চৌধুরীকে নমস্কার করেন। বিনতা এর মাঝে তৈরী হ'য়ে এসেছে। বাবাকে দেখে জিজ্ঞাসা করে: তুমিও যাবে নাকি বাবা?"
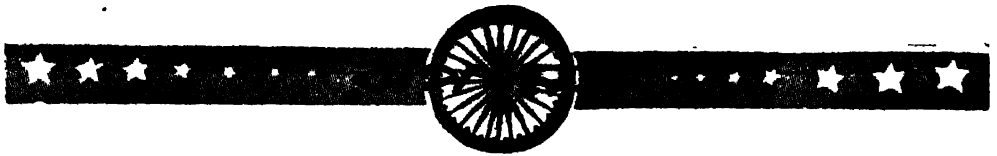
মিঃ চৌধুরী মিনতির স্বরে বলেন : তোমরা যদি নাও।" 'হো হো' করে এক সংগে সকলেই হেসে ওঠেন। সতীশ আর মিসেস চৌধুরীকে বাড়ীতে রেখে ওরা সব গাড়ী করে বেরিয়ে পড়েন। চিত্তরঞ্জন এ্যাভেনিউ আর বিবেকানন্দ রোডের সংগম স্থলের কাছাকাছি বিনতাদের বাড়ী—মাঝ পথে গাড়ী থামিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে নেন মিঃ চৌধুরী। রমেশবাবুর নির্দেশে কেশব সেন ষ্ট্রীটের ওপর বস্তার গলির মুখে যখন গাড়ী এসে থামলো—রাত তখন প্রায় আটটা হবে। রমেশবাবুকে নামতে দেখেই নিতু ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করে : আজ এত দেরী—সংগে এঁরা! কি ব্যাপার !"

রমেশবাবু বলেন : চলো অনেক ব্যাপার আছে। বীরেশ কোথায় ?"

নিতু উত্তর দেয় : পড়ার ঘরে।"

রমেশবাবু নিতুর কানে কানে বলেন : বীরেশের মা এসেছেন—আগেই কিছু বলো না।" নিতু পেছন ফিরে একবার প্রণাম করে নেয়। পড়ার ঘর থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে রমেশবাবু সৌদামিনী দেবীকে বলেন : মা - চিনতে পাচ্ছেন আপনার ছেলেকে ?"

শুধু সৌদামিনী দেবীই নন—তিরিশ চল্লিশজন পড়ুয়ার মাঝে বীরেশকে ওভাবে দেখতে পেয়ে সকলেরই চোখ ঝলসে যায়—বিস্ময়ে পুলকিত হ'য়ে ওঠেন। সৌদামিনী দেবীর মনে ভেসে ওঠে তাঁর স্বর্গত স্বামীর অন্তরের কথা : তিনিত এই চেয়েছিলেন ! বিদ্যাসাগরের দেশের ছেলে তিনি—তিনি চেয়েছিলেন বিদ্যার আলোকে সকলের মনের অন্ধকার দূর করতে। দরিদ্র গ্রামবাসীর সামনে উচ্চ শিক্ষার পথ সহজ করে দিতে, সেই মহাপুরুষের নামে একটি কলেজ স্থাপন করতে।

সৌদামিনী দেবীর সামনে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্য—বিরাট অট্টালিকা—অধ্যয়নরত ছাত্রদের ভিড়ে ভেংগে পড়েছে—আর তার দায়িত্ব নিয়ে বসে আছে—তাঁরই ছেলে বীরেশ—যার নামে কত অলীক কুৎসাই না তিনি শুনেছেন ! রমেশ বাবুর ডাকে সৌদামিনী দেবীর চমক ভাংগে : মা, আসুন এবার।"

ওরা বাইরে জুতো রেখে ঘরের ভিতর যেয়ে দাঁড়ান। বীরেশ ত হতবাক—! উঠে এসে মাকে প্রণাম করে। সৌদামিনী দেবী পুত্রকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন—আস পাশ থেকে অনেক মেয়েরা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। নিতুর ইংগিতে পড়ুয়ার দল ঠেলাঠেলি করে সৌদামিনী দেবীর পায়ের ধুলো নেয়। মিষ্টির ঝাকাটা মিঃ চৌধুরী সৌদামিনী দেবীর সামনে ধরেন। তিনি হাত ভরে মিষ্টি তুলে পড়ুয়াদের হাত ভরিয়ে দেন। রমেশবাবু পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে বলেন : আজ মা তোমাদের দেখতে এসেছেন, তাই ছুটি।" মেয়েদের ভিতর নিতুর বৌকে দেখতে পেয়ে বলেন : বৌমা, এই মিষ্টি গুলি তুমি মেয়েদের ভাগ করে দাও।" তারপর ওদের নিয়ে চলে আসেন। আসবার সময় ছোট ঘরটার কাছে বীরেশ দাঁড়িয়ে বলে : মা, আমার ঘর দেখে যাও"—সকলেই ঘরের ভিতর যেয়ে ঢোকেন। খাটিয়া, দঁড়ি ছাড়া একটা কেরোসিন কাঠের টেবিল—একধারে একটা কুঁজো আর আলমারী একটা—এই আসবাবপত্রগুলি বীরেশ আসবার পর বেড়েছিল। আলমারীটা সেগুন কাঠেরই তৈরী—দু'-দিক তার কাঁচে ঘেরা। কাঁচগুলি বেশীরভাগই ভেংগে গেছে—তবু উপরের কারুকার্য দেখে মনে হবে—যখন এর যৌবন ছিল, তখন এর রোসনাইও কম ছিল না। আলমারীটার গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বীরেশ তার মাকে বলে : মা, চাকরীর প্রথম টাকা দিয়ে নিতু এই আলমারীটা কিনেছিল। কোন দিন ও এই আলমারীটা ঘর ছাড়া করেনি। এমনকী, ওর ছেলে সারাবার জন্য দোকানে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল—ও তাও দেয়নি ফিরে পাবেনা বলে। আর যেদিন আমি এখানে এলাম—তার কয়েকদিন পরে এই আলমারীটা ও আমাকে বই রাখতে দিয়ে গেল। আর বলেছে, ওটা নাকি আমায়
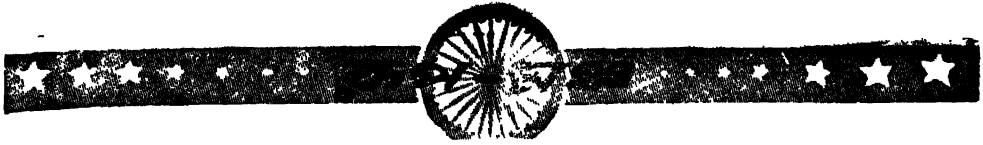
স্বত্ব ত্যাগ করেই দিয়েছে। আমিও কী ভেবেছি জান মা, এটাকে দেশে নিয়ে যাবো—সহরের এই কলংকিত মাটিতে ওর এই দানের অবমাননা আমি করতে পারবো না। যদি ভগবান কোনদিন বিদ্যাসাগরের নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে দেন—নিতুর এই দান সেই কলেজ ভবনেই রাখবো। কলেজের ভাণ্ডারের উদ্বোধন হবে নিতুর এই আলমারী দিয়ে—" ঘর হ্যারিকেনের অস্পষ্ট আলোর এক ফালি নিতুর মুখের উপর এসে পড়েছে—সে আলোতে রমেশবাবু দেখতে পান, তার নষ্ট চোখটা কেঁপে উঠছে—আর ভাল চোখটা থেকে মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু জল গড়িয়ে পড়ছে।—

ওরা চলে যান। নিতু কিছুক্ষণ ওদের গতিপথের দিকে চেয়ে থেকে—তারপর একগ্লাস জল নিয়ে রমেশবাবুদের ছোট ঘরটায় ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়—নিজের পরণের কাপড় ভিজিয়ে আলমারীটার গায়ের কত দিনের লাগা ময়লাগুলি তুলে দিতে থাকে।

* * * * *

দু'দিন বাদে সিনেট হ'লের ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ঠেলে রমেশবাবু বীরেশের মা'র হাত ধরে এগিয়ে চলেছেন। পেছনে বিনতা। কয়েকটা দেয়ালের গায়ে উঁকি মেরে রমেশবাবু আর একটার কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে বিনতা ও সৌদামিনী দেবীকে ডাকলেন। ভিড়ের জন্য তারা এগোতে পাচ্ছিলেন না। রমেশবাবু অনুরোধ করতেই ভিড়কারীরা ওদের একটু রাস্তা করে দিল। বিনতাকে লক্ষ্য করে রমেশবাবু বল্লেন: এই নামটা পড়ে মাকে বুঝিয়ে দাও।" বিনতা মুহূর্তের জন্য অভিভূত হ'য়ে যায়। তার চোখ মুখে সেকি আনন্দের অপূর্ব বিকাশ! রমেশবাবুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সৌদামিনী দেবীকে বলে: জ্যেঠিমা, এই যে, বীরেশদার নাম দেখুন, সকলের ওপরে! এম, এ,তে প্রথম হয়েছেন।" সৌদামিনী দেবী ইংরেজী পড়তে জানেন না—তবু দেয়ালের গায়ে টাঙানো কাগজে মুদ্রিত ছেলের নামটার উপর হাত বুলিয়ে নেন।

ওরা সরাসরি চলে আসেন বিনতাদের বাড়ীতেই। সেখানে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। সৌদামিনী দেবী বিনতার মা সবাই রমেশবাবুকে খেয়ে যেতে বলেন। অফিসের বেলা হ'য়ে যাবে বলে তিনি রাত্রে একসংগে খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

বীরেশ বিনতাদের বাড়ী থেকেই অফিসে যায়। বিনতার আর এ ক'দিন কলেজে যাওয়া হয় না। দুপুরে খাওয়ার পর মিসেস চৌধুরী ও সৌদামিনী দেবী গল্পগুজব করতে থাকেন। বিনতাকে লক্ষ্য করে বীরেশের মা বলেন: তোমার মেয়েটাকে কিন্তু আমায় দিতে হবে ভাই!"

মিসেস চৌধুরী বলেন: বেশত, আপনার আপত্তি হবে না ত?"

বিস্মিত ভাবে সৌদামিনী দেবী বলেন: কেন?"

মিসেস চৌধুরী উত্তর দেন: আমার বাবা যে বর্মী ছিলেন—?"

সৌদামিনী দেবী বলেন: আমি সব জানি।"

মিঃ চৌধুরী পাশের ঘরে শুয়েছিলেন। উঠে এসে বলেন: তাহলে বৌদি, আমার একটা আর্জি আছে!"

সৌদামিনী দেবী বলেন: পেশ করুন।"

"দাদার ইচ্ছা আমরা সকলে মিলে পূর্ণ করবো। বিনতার নামে কিছু টাকা আছে—সেটা কলেজ ফাণ্ডেই আমি দিতে চাই ওদের যৌতুক স্বরূপ। কলেজের কাজও আরম্ভ হতে থাক আর এর মাঝে আমার বিনতা মাও এম, এ-টা পাশ করে নিক। তারপর এক সংগে লেগে যাক দু'জনে।"

সৌদামিনী দেবী উত্তর দেন: আর্জি মঞ্জুর।"

* * * * *

বিকেলের দিকে সকাল সকাল অফিস থেকে ফিরে বীরেশ বিনতাকে বল্ল: চটপট তৈরী হ'য়ে নাওত: —"

বিনতা উত্তর দেয়: কেন বলুনত!"

বীরেশ বলে: চল মেসে একবার দেখা সাক্ষাৎ করে আসি। রমেনদার কাছ থেকে চাবি রেখে দিয়েছি।"

বিনতা বলে: তা, আমি যাবো কেন?

বীরেশ উত্তর দেয়: আঃ, চলোই না!"

ওরা দু'জনে বেরিয়ে পড়ে। মেসের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই মধু ও ভূপেন বলে: বাবু, মিষ্টি খাবো কবে!"—বীরেশ উত্তর দেয়: ও, এরই মধ্যে জেনে ফেলেছো!—
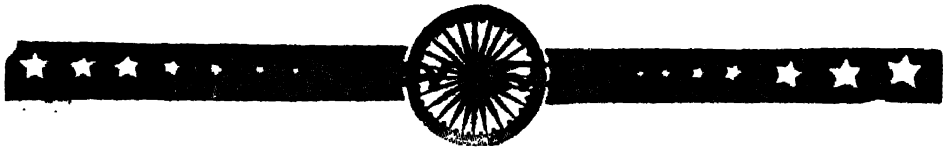
হবে, হবে।" বলে ঘর খুলে ওরা ভিতরে যায়। জানালাটা খুলে বীরেশ ডাকে: "এ পুতুল, পুতুল!" পুতুল ঘরে ছিল না। তার মা চাপা গলায় হাক দেন: পুতুল, দেখ, তোকে কে ডাকছে!" বীরেশ পুতুলের মায়ের গলা বুঝতে পারে। বিনতা বলে: ও এইজন্য! আচ্ছা লোকত!" বীরেশ বলে: বাঃ আমার পুতুলের সংগে পরিচয় করিয়ে দি!" পুতুল এসে জানালায় দাঁড়ায়। অনেক দিনের অ-দেখায় প্রথমে খানিকটা সংকোচের জন্য কথা বলতে পারে না। হঠাৎ বীরেশ এবং তার সংগে একটি মেয়েকে দেখে পুতুল হতবাক হ'য়ে যায়। পুতুলের মা জানালার ধার থেকে ফিস ফিসিয়ে বলেন: কথা বল— তোর বীরেশবাবু যে!"

পুতুল সংকোচের ভাব কাটিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে: সংগে তোমার কে!—"

বীরেশ বলে: তুমি বলোত?"—

পুতুল উত্তর দেয়: আমি কি জানি!"

বীরেশ আস্তে আস্তে বলে: বৌ!" বিনতা বীরেশের দিকে চোখ পাকিয়ে তাকায়।

পুতুল জিজ্ঞাসা করে: ঘোমটা দেয়নি কেন? সিঁদুর নেই কপালে!"

বীরেশ উত্তর দেয়: সিঁদুর দিতে ভুলে গেছে। তাড়াতাড়ি তোমায় দেখতে এসেছে কিনা!" পুতুল ভাবে হয়ত তাই।

খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করে: ঘোমটা বুঝি পড়ে গেছে?" বীরেশ উত্তর দেয়: হ্যাঁ, পড়ে গেছে, আবার দিয়ে নিচ্ছে। ফিস ফিসিয়ে বিনতাকে বলে: দাওনা একটু ঘোমটাটা!" বিনতা আবার চোখ রাঙায়। বীরেশ নিজেই বিনতার মাথায় কাপড়টা দিয়ে বলে: এই দেখ, দিয়েছে।" তারপর বিনতাকে বলে: সত্যি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।"

পুতুলের বাবার হাক শোনা যায়—বীরেশ দেয়ালের আড়ালে একটু সরে দাঁড়ায়। পুতুলের মা জানালার কাছে বিনতার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ান। পুতুলের বাবা ঘরে ঢুকেই মুচকি হেসে বেরিয়ে যান। আজ আর জানালা বন্ধ করতে আসেন না। বীরেশ নির্নিমেষ নয়নে এতক্ষণ বিনতার দিকেই চেয়েছিল। সত্যি, তাকে কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে! ঘোর হয়ে এসেছে, নিচে কয়লার উনোনে আঁচ দিয়েছে—তার ধুয়ো জানালা দিয়ে এসে বিনতার মুখে লাগছে—এই ধূমায়িত পরিবেশের মাঝে বীরেশের চোখের সামনে ফুটে ওঠে আর একখানি মুখ। সে মুখের সংগে পুতুলের যেন অনেকখানি সাদৃশ্য রয়েছে। এমনি সময়, এমনি ঘোমটা টেনে হয়ত তিনি এখন তুলসী মঞ্চে প্রদীপ জালিয়ে প্রণাম কচ্ছেন সে মুখ—বীরেশের বৌদির মুখ—সেই পবিত্রতার সংগে বিনতার হুবহু সাদৃশ্যে বীরেশ মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না। বীরেশের চিন্তায় বাধা পড়ে—বিনতাও লজ্জায় জড়সড় হ'য়ে পড়ে—রমেশদা বলতে বলতে প্রবেশ করেন: দু'জনে কী কচ্ছিস? আলোটাও জ্বালাতে পারিস নি।" ধরা যখন পড়েই গেছে—ওরা দু'জনে এক সংগে ধড়মড় করে খুশীর মেজাজে রমেশদাকে প্রণাম করে। রমেশদা বলেন: আরে থাক, থাক। চল—মাসীমারা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।" তালা বন্ধ করে সকলেই ওরা মেস ছাড়িয়ে রাস্তায় নামে বিনতাদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে। তখন সত্যিই হয়ত, সিমপুরের প্রতি ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দীপ জ্বলে উঠেছে! (সমাপ্ত)।

সম্পাদকের দপ্তর

[চিঠি-পত্রের জবাব দেবার পূর্বে আমার পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশ্য করে কয়েকটি কথা বলে নিতে চাই। চিঠির থলি খুলে পরপর কয়েকখানা এমন চিঠি হাতে উঠেছে যে, এ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব কচ্ছি। এই চিঠিগুলির বেশীর ভাগ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছে শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে। অমুকে বিবাহিতা কি না—অমুকের স্বামীর নাম অমুক কি না? অমুকের সংগে অমুকের বিবাহ হ'য়েছে কিনা—শুনলাম অমুক দেবীর স্বামীর সংগে তাঁর বেশ মন কষাকষি চলছে—সংবাদটি সত্য কি না। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই ধরণের এবং আরো এমন রুচিবিগর্হিত প্রশ্ন শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করা হ'য়েছে যা থেকে এইসব পাঠক-পাঠিকাদের রুচি সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ জেগেছে। তাই তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, ভবিষ্যতে এই ধরণের প্রশ্ন করে রূপ মঞ্চের সমগ্র পাঠক সমাজের রুচিকে যেন তাঁরা আঘাত না করেন। এই সস্তা কৌতূহল যদি তাঁরা দমিয়ে রাখতে না পারেন—তবে রূপ-মঞ্চ পড়া থেকে তাঁদের নিবৃত্ত হ'তে অনুরোধ জানাবো। আমাদের বহু শিল্পীদের পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত জীবন যে গৌরবোজ্জল নয়—তা আমরাও জানি, পাঠক সাধারণও জানেন। যাঁদের যে দুর্বলতার কথা আমরা জানি—সে দুর্বলতার জন্য যাঁরা নিজেরাও সবটা দায়ি নন—সে দুর্বলতার কথা এড়িয়ে যাওয়ার ভিতরই উদারতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্বলতার কথা নিয়ে ঘাটাঘাটি করা যেমনি প্রশংসনীয় নয়, তেমনি তাতে পাঠকসাধারণের মনের নীচতার কথাই প্রমাণিত হয়। তাই আশা করি ভবিষ্যতে এই ধরণের দুর্বলতা নিয়ে কেউ কোনদিন কোন প্রশ্ন তুলবেন না। বীরভূম থেকে জনৈকা পাঠিকা জনৈকা 'প্রখ্যাতা' অভিনেত্রী সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন: অমুক অভিনেত্রীর স্বামীর মৃত্যুর কারণ নাকি অমুক অভিনেত্রীই। তাঁর প্রথম স্বামীত জীবিত। দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি প্রথমের কাছে ফিরে গেছেন—না আবার অন্য কাউকে বিবাহ কচ্ছেন! একজন 'নারী' সম্পর্কে আর একজন নারীর এই কৌতূহলকে মোটেই সমর্থন করতে পারি না। হয়ত উক্ত অভিনেত্রীটির জীবনের সংগে এমন কোন বিষাদময় ইতিহাস জড়িয়ে আছে যেজন্য, ঠিক স্বাভাবিক পথ বেয়ে তিনি চলতে পারেন নি—এজন্য তাঁর দুর্বলতাকে এড়িয়ে যাওয়াই কী বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়! শিল্পীদের ব্যক্তিগত—পারিবারিক বা বিবাহিত জীবন সম্পর্কে যদি গৌরবোজ্জল কিছু প্রকাশ করবার থাকে এবং তাঁরা তা প্রকাশ করতে অনুমতি দেন—রূপ-মঞ্চের পাতায় আমরা যথাসময়েই তা পরিবেশন করবো। তাই, আশা করি এই ধরণের একজনের ব্যক্তিগত—পারিবারিক বা বিবাহিত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি রূপ মঞ্চের পাতায় দেখে অন্য সকলের সম্পর্কেও অনুরূপ বিষয়গুলিরূপ-মঞ্চের পাতায় দেখতে- পাঠক সাধারণ কৌতূহলী হ'য়ে উঠবেন না। প্রকাশযোগ্য হ'লে আমরা নিজেরাই প্রকাশ করবো—এবিষয়ে পাঠকসাধারণ নিজেদের কৌতূহলকে দমিয়ে রাখবেন বর্তমান সংখ্যায় অল্প সংখ্যক চিঠির জবাব দিয়ে পূজার পরবর্তী সংখ্যার অপেক্ষায় রইলাম।]
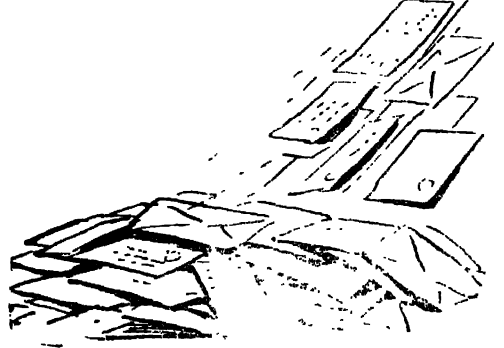
রেবা চট্টোপাধ্যায় (কালী কুণ্ডু লেন, হাওড়া)

পরিচালক, নায়ক এবং নায়িকাদের যে অর্থ দেওয়া হয়—তা অস্বাভাবিক। অবশ্য আমি কারোর প্রতি কটাক্ষ করে কোন কিছু বলছিনা—মোটামুটিভাবে ছবির ব্যয়-বাহুল্য কমানো যায় কি না, তাই বলতে চাইছি। অবশ্য ছবির নিজস্ব প্রয়োজন মিটিয়ে। কারণ, দরিদ্র এবং নিপীড়িত জনসাধারণের নিকট সুলভে আনন্দ পরিবেশন করবার দিন আজ এসেছে। আর সিনেমা কর্তৃপক্ষ এবং শিল্পীরা সমবেতভাবে চেষ্টা করলেই তা সম্ভব হবে। অবশ্য জাতীয় সরকারেরও চলচ্চিত্র শিল্পটির ওপর দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য নৈ কী ?

●● কয়েকজন পরিচালক ও শিল্পী যাঁরা বেশী পারিশ্রমিক নিয়ে কাজ করতেন, তাঁরা তাঁদের এই হার অনেকটা কমিয়ে নিয়েছেন। উপযুক্ত নতুন শিল্পী ও পরিচালকদের আগমনে এই হার আরো কমে আসবে। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি জাতীয় সরকারের কর্তব্যের কথা আপনার মত আমিও অস্বীকার করবো না।

সাধন, মৃণাল, সন্তু, মাণিক ও কল্পনা (ষ্টেশন রোড, ডিব্রুগড়, আসাম)

কার্টুন চিত্রের কাহিনীকার ও পরিচালক কে ? চিত্রখানি কবে মুক্তিলাভ করবে ?

●● পৃথ্বিশ ভট্টাচার্য ও ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়। 'কারটুন'-এর মুক্তির দিবস জানতে পারিনি। ডি, জি পরিচালিত 'জীবন-যুদ্ধ' চিত্রখানিও মুক্তির দিন গুনছে। প্রেক্ষাগৃহের সমস্যা ছাড়া ডি, জি, প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্রগুলির সামনে আর একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে—আমাদের মত আরো এতই পাওনাদারদের ডি, জি 'কলা' দেখিয়েছেন যে, যদি চিত্রমুক্তি হবার সংগে সংগে কোর্টের অনুমতি নিয়ে তাঁকে আবার তেমনি কলা দেখিয়ে আমরাও বিক্রয় লব্ধ অর্থ ভাগাভাগি করেনি—তবে 'কারটুন' চিত্রের সামনে এই সমস্যা নেই, কারণ চিত্রখানি অন্য এক ধনীর প্রযোজনায় গৃহীত হ'য়েছে বলে শুনেছি। তবু মুক্তিলাভ করতে পাচ্ছে না কেন, বুঝতে পাচ্ছি না।

এম, ডি, আলাউদ্দিন (ফরিদপুর হাইস্কুল, ফরিদপুর)

মলিনা ও পদ্মাদেবীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা ?

●● মলিনা পদ্মাদেবীর চেয়ে অনেকগুণ বেশী প্রতিভা সম্পন্না শিল্পী। তাই বলে পদ্মাদেবীও কম প্রতিভা সম্পন্না নন।

অমিয় কুমার পাল (রাণাঘাট)

আমার এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, চন্দ্রশেখর বইটি হিন্দিতেও গৃহীত হ'য়েছে। এ কথা কি সত্য ?

●● হ্যাঁ।

নীরোদ পাল (গোহাটি)

রবীন মজুমদার বাঙ্গালী কি না—

●● খোট্টার মত কাটখোট্টাত তাঁর চেহারা নয় !
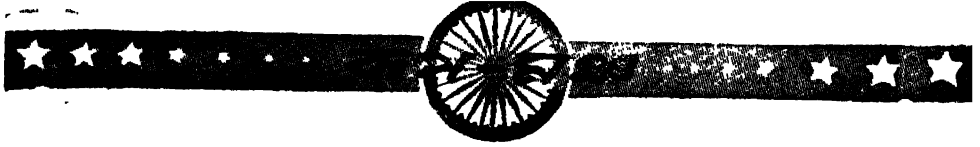
কুমারী মিনতি মুখোপাধ্যায় (আনন্দ চাটুজ্জে লেন, বাগবাজার)
'সাধারণ মেয়ে' চিত্রে 'দাঁড়াও দোস্ত একটু শোন 'গানখানি' কে গেয়েছেন ?

●● ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য।

আভা গাঙ্গুলী (পুরুলিয়া, রাঁচি)
শ্রীমতী মীরা সরকার উপস্থিত কোথায় এবং কী কী ছবিতে অভিনয় করছেন ? তাঁর ঠিকানা কি ?

●● শ্রীমতী মীরা সরকার বর্তমানে কলিকাতাতেই আছেন। তাঁর ঠিকানা দিতে পারবো না বলে দুঃখিত। তিনি বিধায়ক ভট্টাচার্য পরিচালিত 'কৃষ্ণাকাবেরী', ছবি বিশ্বাস পরিচালিত 'যার যেথা ঘর' খগেন রায় পরিচালিত 'প্রতিরোধ' চিত্রে অভিনয় করছেন।

যুগল কিশোর পাল (কৈলাস দাস লেন, কলিকাতা)
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কি স্বর্গতঃ অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ?

●● না।

রতীশ চন্দ্র ধর (স্মৃতিভূষণ লেন, কলিকাতা)
ফণী রায়েরর ঊনিশ বিশের খবর কি ?

●● আগামী শারদীয়া রূপ-মঞ্চে ফণী রায় আপনাদের জন্য 'দিল্লীকা লাড্ডু' পরিবেশন করবেন। তার ভিতরই এসম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন।

অরুণকুমার (বেহারী চক্রবর্তী লেন, হাওড়া)
'প্রতিবাদ' চিত্রে কুল পুরোহিত এবং 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রে উমার পিতার ভূমিকায় কে-কে অভিনয় করেছেন।

●● প্রতিবাদ চিত্রে কুল পুরোহিতের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মোহন মজুমদার ওরফে পার্থ মজুমদার আর সাধারণ মেয়ে চিত্রে উমার পিতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শিশিরকুমারের অন্যতম ভাতা তারা ভাদুড়ী

এম. রহমন (মাঝদিয়া, নদীয়া)

●● অক্টোবরের শেষের দিক থেকে 'রাই'র চিত্র গ্রহণ কার্য সুরু হবে। সময় মত এ বিষয়ে রূপমঞ্চে বিজ্ঞপ্তি দেখতে পাবেন। এবং রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজ যাতে 'রাই'র দৃশ্য পটে উপস্থিত থাকবার সুযোগ পান, সে বিষয়ে আমি নিশ্চয় ব্যবস্থা করবো। আপনিও তখন অনুসন্ধান করবেন।

অশোক, নিমাই, বারীন (গিরীশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া)
(১) সিংহদ্বার, সংসার চিত্রে নায়ক নায়িকার ভূমিকায় কে কে অভিনয় করছেন ?
(২) রবীন মজুমদার ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভিতর কার অভিনয় আপনার ভালো লাগে ?

●● (১) সংসার চিত্রে সন্ধ্যারাণী ও প্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায় নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছিলেন বলে শুনেছিলাম। সংসার চিত্রের আর কোন খোঁজই পাচ্ছি না। সিংহদ্বার চিত্রের সংবাদ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে। নায়ক নায়িকার ভূমিকায় সুনন্দা দেবী ও একজন নবাগতকে দেখতে পাবেন।

কার্তিক ও ঝর্ণা সেনগুপ্তা (বালী, বাদামতলা)
উৎপলা সেন ও সুপ্রীতি ঘোষ কি দুই বোন ?

●● না। উৎপলা সেনের এক বোনের কণ্ঠ অবশ্য কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে শুনে থাকেন। তাঁর নাম লিলি ঘোষ। তিনি অভিনয় ও সংগীতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া ঘোষণাও করেন।

কাশীনাথ শেঠ (অম্বিকা কুণ্ডু লেন, হাওড়া)
বড়ুয়া সাহেব ও যমুনার আর কি চিত্রজগতে আবির্ভাব হইবার আশা আছে ?

●● নিশ্চয়ই। আপনারা শুনে খুশী হবেন, কলকাতার ডাক্তাররা শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে পরীক্ষা করে টি, বি, হয়েছে বলে রায় দিয়েছিলেন—যেজন্য শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে হয় কিছুদিন পূর্বে। কিন্তু সেখানকার ডাক্তাররা পরীক্ষা করে এখানকার ডাক্তারদের পাগল বলেই উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁরা টি, বি,র কোন লক্ষণই দেখতে পান নি। একেই বলে চিকিৎসা বিভ্রাট ! আমাদের ডাক্তার-প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার রায় এ সংবাদে সমধর্মীদের কী বলবেন জানি না ! তবে সংবাদটাতে আমরা খুশীই হ'য়েছি।

বড়ুয়া সাহেব ফিরে আসুন ভগ্নস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে—আবার নিশ্চয়ই আমরা তাঁকে চিত্র জগতে দেখতে পাবো।

তপতী বসু (শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী লেন, কলিকাতা)

আপনি বেতার সম্পর্কে শ্রোতাদের অভিযোগ নিয়ে যে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট সম্পাদকীয় লিখেছেন, তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার স্বকীয় গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের বন্ধু মহলে খুব আলোচিত হয় এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এজন্য যদি সক্রিয় আন্দোলনের প্রয়োজন হয়, আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সংঘ শক্তি দিয়ে আপনার পার্শ্বে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এরই সাথে আরও একটা অভিযোগ আছে, যার জন্য খুবই মর্মাহত হয়েছি। বেতার কর্তৃপক্ষের কাছে 'নাটক নির্বাচনের' জন্য যে নামের সুপারিশ করেছেন, তার মাঝে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাম নাই কেন? তিনি কি এ বিষয়ে কারও চেয়ে কম অভিজ্ঞ ব্যক্তি?

●● আপনি এবং আপনার বন্ধু-মহল আমার এবং রূপ-মঞ্চের তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনাদের সকলের শক্তিতেই রূপ-মঞ্চ শক্তিশালী। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যখনই রূপ-মঞ্চ কোন সংগ্রামে লিপ্ত হয়, আপনাদের ব্যক্তিগত শক্তি এবং সংঘ শক্তির উৎস থেকেই সে সকল প্রেরণা লাভ করে। তবু নতুন করে এই আনুগত্য প্রকাশের প্রয়োজন আছে বৈকি! তাই আপনাদের আর একবার অভিনন্দন জানিয়ে বলছি—নিশ্চয়ই ডাকবো আপনাদের—এবং সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবেন। শিশির কুমারের নাম আমার প্রদত্ত নামের তালিকার ভিতর নেই বলে আপনারা অভিযোগ করেছেন। অভিযোগ সত্য। কিন্তু শিশির কুমারের নাম নেই বলে তাঁর উপযুক্ততায় কোন সন্দেহই উঠতে পারে না। বর্তমান বাংলা দেশের যে কোন নট—যে কোন নাট্যকার—এমনকি যে কোন শিক্ষাব্রতীর চেয়ে শিশিরকুমারের স্থান অনেক উর্দ্ধে, শিশিরকুমার সম্পর্কে এই আমার ব্যক্তিগত মনোভাব। তাঁর গোষ্ঠীতে তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ। তবু তাঁর নাম উক্ত গোষ্ঠীর ভিতর উল্লেখ করিনি—বাস্তব অসুবিধার কথা চিন্তা করেই।

সমালোচনা, চিত্রসংবাদ ও নানাকথা

ভুলিনাই—

ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ-এর প্রথম চিত্র 'ভুলিনাই' গড়ে উঠেছে খ্যাতনামা সাহিত্যিক মনোজ বসুর 'ভুলিনাই' উপন্যাস খানিকে কেন্দ্র করে। কাহিনীকার নিজেই চিত্রোপযোগী সংলাপ রচনা করেছেন। তাছাড়া মূল উপন্যাসের চিত্ররূপ দিতে যেয়ে যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হ'য়েছে, তা তিনি নিজেই করেছেন। তাই উপন্যাসখানির সংগে হুবহু মিল দেখতে না পেয়ে—পাঠক বা দর্শকসমাজের বিরূপ হবার কোন সংগত কারণ নেই। 'ভুলিনাই' উপন্যাসে মনোজবাবুর মূল বক্তব্য যা ছিল—চিত্র-রূপে তাত ব্যাহতই হয়নি—অধিকন্তু সে বক্তব্য আরো স্বচ্ছ ও বাস্তব দৃষ্টিভংগীপ্রসূত রূপেই দেখা দিয়েছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ। তদানীন্তন বাংলার শাসন কর্তা লর্ড কার্জনের কুখ্যাত বঙ্গ-ভংগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলার বুকে যে বিপ্লবের শিখা জ্বলে উঠেছিল, যাতে আত্মাহুতি দিল বাংলার শত শত প্রাণশক্তি—যাঁদের মৃতদেহের উপর দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সোপান রচিত হ'লো—ফাঁসির মঞ্চে—দ্বীপান্তরের নির্বাসনে—কারা প্রাচীরের অন্ধকারে—হাসিমুখে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়ে—স্বাধীনতা লাভের জন্য সুপ্ত জাতিকে যাঁরা জাগ্রত করে দিয়ে গেল—সেই সর্বত্যাগী শহিদদের কথাই 'ভুলিনাই' মনে করিয়ে দেয়। আজ স্বাধীনতা লাভের পর তাঁদের কথা যাতে আমরা না ভুলি—সেই আবেদন নিয়েই 'ভুলিনাই'র আবির্ভাব। 'ভুলিনাই' আমাদের অতীতের এক চির-স্মরণীয় অধ্যায়কে নতুনরূপে জীবন্ত করে তুলে ধরেছে আমাদের সামনে—অতীতের দুঃখ-কষ্ট—বেদনা ও লাঞ্ছনার ছবি দেখতে দেখতে আজ পরম আনন্দের দিনেও কোন বাঙ্গালীর পক্ষেই অশ্রু সম্বরণ করা সহজ সাধ্য নয়। 'ভুলিনাই' জাতির সামনে বিগত যুগের এক বিস্ময়কর গৌরবদীপ্ত অধ্যায়কে তুলে ধরেছে—তাই তার সার্থকতাকে অস্বীকার করবে, এমন কৃতঘ্ন বাঙ্গালীদর্শক থাকতে পারেন বলে আমরা বিশ্বাস করি না। ঠিক এমনি ভাবেই সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প-রাশিয়ার নব জন্মলাভের পর তার দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল জারতন্ত্রের স্বৈরাচারের ছবি। অতীতের সেই বেদনাময় কাহিনী সমস্ত অত্যাচার ও নিপীড়ন থেকে মুক্তিলাভ করে প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায় যখন নবজন্মলব্ধ রাশিয়ার জনসাধারণ দেখেছে—তখন তাঁরাও চোখের জল না মুছে পারেনি। তাই বাংলা চিত্রজগতে 'ভুলিনাই' নিছক একটী নতুন চিত্রপ্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কথা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেনি—সে বাংলা চিত্রজগতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে—তাই সমগ্র বাঙ্গালী দর্শক সমাজের পক্ষ থেকে আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই—ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিমিটেডকে—কাহিনীকার মনোজ বসু—প্রযোজক, চিত্র-নাট্যকার ও পরিচালক হেমেন গুপ্তকে—শিল্পী, বিশেষজ্ঞ ও প্রতিজন কর্মীকে—যাঁরা চিত্রখানির সংগে জড়িত ছিলেন। আর জানাই পরিবেশক প্রতিষ্ঠান অজন্তা ফিল্ম ডিসট্রিবিউটার্সকে। পৃথকভাবে কোন শিল্পী বা কর্মীকে আমরা অভিনন্দন জানাতে চাই না—আমরা মনে করি, সকলের সমবেত প্রচেষ্টায়ই এরূপ সার্থক সৃষ্টির সম্ভব হ'য়েছে। এর নির্মাণ মূলে কার দক্ষতা বেশী—কার কম সে বাকবিতণ্ডার ভিতরও আমরা যেতে চাই না। যাঁর যতটুকু দান আছে, তাকেই আমরা স্বীকার করে নিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর এই সংগে আমরাও বলছি—'ভুলিনাই' যাঁদের কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে—তাঁদের আমরা কোনদিনই ভুলিনি—ভুলতে পারি না—পারবোও না। তাঁদের কী ভোলা যায়! না ভুলতে পারবো!

—শ্রীপার্থিব

"বিচারক"—সুনীল বসু মল্লিক প্রযোজিত ওরিয়েণ্ট পিকচার্সের প্রথম প্রচেষ্টা—"বিচারক"। সম্প্রতি মিনার-বিজলী- ছবিঘরে মাত্র কয়েক সপ্তাহের প্রদর্শনী অন্তে একে বিদায় নিতে হয়েছে।

"বিচারক"-এর কাহিনী রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। দেবনারায়ণ বাবু যশস্বী নাট্যকার। বাংলার অপরাজেয় কথা সাহিত্যিক ও উপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের কয়েকটি মূল কাহিনী নাট্যকারে রূপায়িত করে তিনি সুধীজন ও সাধারণের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও তাঁর প্রতিষ্ঠা আছে। তাই তাঁর কাছ থেকে ভালো কাহিনীই আমরা আশা করেছিলাম। কিন্তু আজ আমদের একথা বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই যে, "বিচারক এর কাহিনী আমাদের হতাশ করেছে। অন্ততঃ একথা বলবো কাহিনীর যা সম্ভাবনা ছিল চিত্ররূপে তা ব্যর্থ হয়েছে।

"বিচারক" দেবনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পরিচালিত ছবি। ইতিপূর্বে তাঁর "রামপ্রসাদ" আমরা দেখেছি। "রামপ্রসাদ"-এর কাহিনী দেবনারায়ণ বাবুর মৌলিক রচনা নয়। কাজেই নিজস্ব কাহিনীর প্রথম পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি "বিচারক" চিত্রে। কিন্তু সে সুযোগের তিনি সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। সদ্ব্যবহার করতে পারলে "বিচারক" তার ব্যর্থ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতো না।

"বিচারক" ছবির অভিনয়-অংশ অত্যন্ত দুর্বল। নায়কের ভূমিকায় নবাগত দেবীপ্রসাদ চৌধুরী একেবারে অচল। জানি না একে দেবনারায়ণ বাবু নির্বাচিত করেছিলেন কেন! নায়কোচিত কোন যোগ্যতাই এঁর মাঝে খুঁজে পেলুম না। নায়িকার ভূমিকায় দেখলাম অলকা দেবীকে। ইনিও কোন কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন না। স্থান বিশেষে ইনি শুধু অভিনয়ই ক'রে গেছেন। তবু মনে হয়, কয়েকটি বিশেষ ভূমিকায় ইনি হয়তো সাফল্য লাভ করতে পারবেন। বিচারক স্বরজিৎ রায়ের বেশে অহীন্দ্র চৌধুরীও মনে কোন রেখাপাত করতে সক্ষম হন নি। এর কারণ কি? পারিপার্শ্বিক অবস্থা না অন্য কিছু? উল্লেখ করবার মত একজনেরও অভিনয় দেখা যায় নি "বিচারক" ছবিতে।

চিত্র পরিচালনায়ও দেবনারায়ণ বাবুর কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পেলাম না। স্বকীয় কোনো বৈশিষ্ট্য যে পরিচালক তাঁর ছবিতে উপস্থাপিত করতে পারেন না, তাঁকে সাধারণ শ্রেণী থেকে পৃথক করা যায় না কোনোক্রমেই।

"বিচারক"-এর সুর সংযোজনা করেছেন জনৈক পূর্ণ মুখোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টি করবার মত কতখানি দক্ষতা এর আছে, সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান। এঁকেই বা দেবনারায়ণ বাবু নিয়োগ করলেন কি করে! না কি প্রযোজকের প্রসাদ পুষ্ট কোনও সুযোগ সন্ধানী, স্বার্থান্বেষী সৌভাগ্যভাগ ইনি। নইলে ইনি কি করে সুযোগ পেতে পারেন? এই তো বিচার।

'বিচারক"-এ ক্যামেরার কাজ যিনি করেছেন, তাঁরও প্রশংসা করা চলে না। সাউণ্ডের কাজ আরও খারাপ। বাস্তবিক, সমসাময়িক প্রায় প্রতিটি বাংলা ছবির সাউণ্ড ও ক্যামেরার কাজ দর্শক শ্রবণ ও নয়নকে পীড়িত করে তুলেছে অবর্ণনীয়রূপে। যে ছবির সাউণ্ড ও ক্যামেরার কাজ ব্যর্থ, সে ছবি অন্য প্রতিটি বিষয়ে হাজার গুণে ভালো হলেও, কখনোই দর্শক সমাজ কর্তৃক গৃহীত হতে পারে না, এ সাধারণ কথাটি ভুলে গেলে চলবে কেন?

"বিচারক"-এর দৃশ্যসজ্জা সম্বন্ধে একটি কথার উল্লেখ না না করে পারলাম না। গত কয়েক বছরের মধ্যে এত নিকৃষ্টতম দৃশ্যসজ্জা কোনো ছবিতে দেখেছি বলে মনে হয় না।

পরিশেষে "বিচারক" ছবির যাঁরা কর্ণধার, তাঁদের সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করে আমাদের সমালোচনা শেষ করবো। আমাদের দেশে আজো এমন অনেক প্রযোজকমণ্ডলী আছেন, যাঁরা কিনা এখনও সস্তায় কিস্তিমাত করতে চান। "বিচারক" ছবি দেখে মনে হলো, এ ছবিতে খরচ খরচা
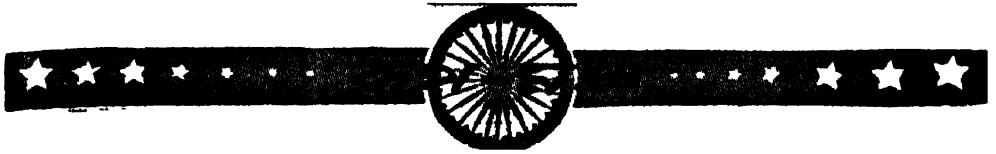
হয়েছে বড় জোর ৫০।৬০,০০০ টাকা। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকায় "বিচারক"-এর মত বই যে আজকের দিনে হতে পারে এবং তার বেশী কিছু নয়, সেই কথা বোধ করি কর্ণধারদের মগজে এখন প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে।

—ভুলু গুপ্ত

পরলোকে চিত্রাভিনেতা রাজা গাঙ্গুলী

নবাগত চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত পরমেশ গাঙ্গুলী (ওরফে রাজা গাঙ্গুলী) গত ২রা ভাদ্র, বুধবার, এক শোচনীয় দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৫ বৎসর। শ্রীযুক্ত বিমল রায়ের পরিচালনায় খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর 'অঞ্জনগড়' চিত্রে নায়কেব ভূমিকায় সম্প্রতি তিনি অবতীর্ণ হন। 'অঞ্জনগড়' চিত্রের কাজ সমাপ্ত হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে। গত ১লা ভাদ্র, মঙ্গলবার, একটী স্টোভ জ্বালাবার সময় ফেটে যেয়ে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীর দেহের বহুস্থান অগ্নিদগ্ধ হয়। তাঁকে ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরীত করা হয়—সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলীর, ৯, ডাঃ সুরেশ সরকার রোডস্থিত ভবনে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, একটী পুত্র ও একটী কন্যা রেখে গেছেন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারকে বাঙ্গালী দর্শকসমাজের তরফ থেকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি—এবং বাংলা ছায়া জগতের এক উদীয়মান শিল্পীর এই শোচনীয় মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা কচ্ছি।

পরলোকে প্রবীণ অভিনেতা প্রফুল্ল দাস

গত ৪ঠা ভাদ্র, শুক্রবার রাত্রি ২-১৫ মিনিটের সময় চিত্র ও মঞ্চের বিশিষ্ট প্রবীণ অভিনেতা—শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দাস (হাজু বাবু) বেরী বেরী রোগে আক্রান্ত হ'য়ে তাঁর ৩২, সুরি লেনস্থিত বাসভবনে মারা গেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে হাজুবাবু খুব অমায়িক, নিরভিমান ও রসিক লোক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা নাট্যমঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগৎ একজন প্রবীণ চরিত্রাভিনেতাকে হারালো। আমরা বাঙ্গালী চিত্র ও নাট্যামোদীদের পক্ষ থেকে মৃতের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানিয়ে—ভগবানের কাছে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা কচ্ছি।

পশ্চিম বঙ্গে ফিল্মের খতিয়ান

গত ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হয়েছে সেই বৎসর বাংলার ফিল্ম সেন্সার বোর্ড মোট ১৫,৯১,১৪৬ ফুট চিত্ররূপায়িত ফিল্ম প্রদর্শনের সার্টিফিকেট দিয়েছেন। উক্ত ফিল্মের মধ্যে আমেরিকান ফিল্মগুলির দৈর্ঘ্য ৬,৮৮,২০৪ ফুট, ভারতীয় ইউনিয়নে অবস্থিত ষ্টুডিওগুলিতে ভারতীয় ফিল্মগুলির দৈর্ঘ্য ৫,৯০,৬৫০ ফুট, ব্রিটিশ ফিল্মসমূহ ২,৯১,৩৪৩

নবাগতা উমাশঙ্কর বসু। 'ভুলি নাই' প্রভৃতি কয়েকটি চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন—আগামী বহু চিত্রেই এই প্রিয়দর্শন যুবককে দেখতে পাওয়া যাবে।

রূপ-মঞ্চের অষ্টম বার্ষিক শারদীয়া-সংখ্যার প্রস্তুতিতে রূপ-মঞ্চের কর্মীরা অন্যান্যবারের চেয়েও বেশী উদ্যম নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছেন—সে উদ্যমের সার্থকতা প্রমাণ করতে

পূজার পূর্বেই পাঠকসমাজকে অভিবাদন জানাবে।

মূল্য :
প্রতি সংখ্যা
আড়াই টাকা

ডাকযোগে :
দু' টাকা বারো আনা

ভি, পি, যোগে কোন কাগজ পাঠানো হবে না—পূর্বে থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকবার জন্য মণি-অর্ডার যোগে অথবা ব্যক্তিগতভাবে কার্যালয়ে এসে টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। মফঃস্বলে রূপ-মঞ্চের সরবরাহক অথবা এজেণ্টবর্গ নিজেদের চাহিদার সংগে পূর্ব থেকেই যেন মূল্য পাঠিয়ে দেন। — — — — — — —

রচনা সম্ভারে—মুদ্রণ পরিপাট্যে ও চিত্র সৌন্দর্যে অন্যান্যবারের চেয়ে সুষ্ঠু রূপ নিয়ে এবারের শারদীয়া সংখ্যা আত্মপ্রকাশ করবে—এ প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে পারি। — — —

রচনাসম্ভারে যাঁদের আশা করতে পারেন :

ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ∘ অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য ∘ প্রবোধ সান্যাল ∘ মন্মথ রায় ∘ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ∘ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র ∘ শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত ∘ নীরেন লাহিড়ী ∘ যামিনী কান্ত সেন, ∘ নরেন্দ্র দেব ∘ শক্তিপদ রাজগুরু ∘ গোপাল ভৌমিক ∘ পঙ্কজ দত্ত ∘ নির্মল ঘোষ দেবনারায়ণ গুপ্ত ∘ পশুপতি চট্টোঃ ∘ ধীরেন মিত্র ∘ সুকৃতি সেন ∘ যতীন দত্ত ∘ বিভূতি লাহা ধনঞ্জয় ∘ জগন্ময় ∘ দক্ষিণা ঠাকুর ∘ কালীপদ সেন ∘ কমল দাশগুপ্ত ∘ অনাদি দস্তিদার নিতাই ভট্টাচার্য ∘ হেমন্ত ∘ অসিতবরণ ∘ মহেন্দ্র গুপ্ত ∘ ছবি বিশ্বাস ∘ ফণীন্দ্র পাল ∘ পাহাড়ী সান্যাল ∘ সুধীরেন্দ্র সান্যাল ∘ ডাঃ প্রতুল গুপ্ত ∘ অহীন্দ্র চৌধুরী ∘ অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রবীন চট্টোপাধ্যায় ∘ নিতাই সেন ∘ রবীন দাস ∘ রাজেন চৌধুরী ∘ প্রেমেন্দ্র মিত্র ∘ সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ∘ অনিল গুপ্ত ∘ পৃথ্বিশ ভট্টাচার্য ∘ নৃত্যলাল বর্মণ প্রভৃতি আরো অনেকে।

জীবনী :— সুনন্দা দেবী ∘ মীরা মিশ্র ∘ ফণী রায় ∘ দীপক মুখোপাধ্যায়

চিত্র :—সুনন্দা ∘ মীরা মিশ্র ∘ কানন দেবী ∘ মধুছন্দা ∘ রেণুকা রায় ∘ পরাগ সরকার ∘ ঝর্ণা অলকা ∘ মলিনা ∘ ফণী রায় ∘ মহেন্দ্র গুপ্ত ∘ ছবি বিশ্বাস ∘ কমল মিত্র রমিতা সান্যাল ∘ অসিতবরণ ∘ দীপক ∘ পাহাড়ী ∘ সরযূ দেবী ∘ দীপ্তি রায় সন্ধ্যারাণী ∘ নবাগতা স্বাগতা দেবী ∘ মঞ্জুলিকা দেবী প্রভৃতি আরো অনেকের

মার্কিণ নাট্য-মঞ্চ ও সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্পর্কে দু'টী পৃথক বিভাগ এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ
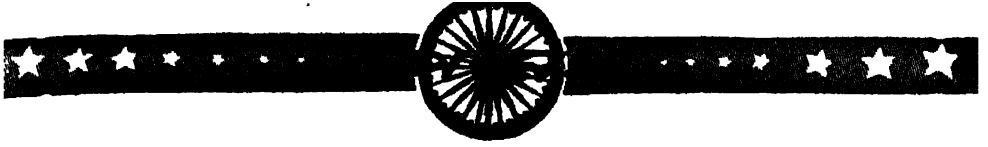
ফুট এবং অন্যান্য দেশীয় ফিল্ম ২০,৯৪৯ ফুট। এই বৎসর বোর্ড ১৪৩ খানি পূর্ণাংগ চিত্রের সার্টিফিকেট দেন। তার ভিতর ৭০খানি আমেরিকায় প্রস্তুত, ৪৮ খানি ভারতীয় ইউনিয়নে প্রস্তুত, ২৩ খানি ব্রিটেনে প্রস্তুত এবং ২খানি অন্যান্য দেশে প্রস্তুত। নানা বিষয় সংক্রান্ত ছোট ছোট মোট ২৬৯ খানি ছবি প্রদর্শনের জন্য অনুমোদন করা হয়, তন্মধ্যে ১৪২ খানি আমেরিকায় প্রস্তুত, ৮৪ খানি ব্রিটেনে, ৩৮ খানি ভারতীয় ইউনিয়নে এবং ৫ খানি অন্যান্য দেশে প্রস্তুত। ৪৪খানি শিক্ষামূলক চিত্রের মধ্যে ৩২খানি ব্রিটিশ ষ্টুডিওতে নির্মিত। ২৫ খানি ছোট নাট্যচিত্রের সবগুলিই আমেরিকায় প্রস্তুত।

আলোচ্য বৎসরে অশ্লীলতা ও অন্যান্য কারণে পশ্চিমবঙ্গে ৬৩খানি ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়। তন্মধ্যে ছয়খানি ভারতে প্রস্তুত এবং ৫৭ খানি বিদেশীয় চিত্র। এ ছাড়া আরও ৯৬ খানি ফিল্মের উপর (তন্মধ্যে ২৪ খানি ভারতীয় ও ৭২ খানি বিদেশীয়) পূর্ব হতেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হ'য়েছে।

গত ৩১শে মার্চ কলকাতার চিত্রগৃহের সংখ্যা ছিল তেষট্টিটি এবং কলকাতায় বাইরে পশ্চিমবঙ্গে ১০৮টি।

কল্পচিত্র মন্দির

ভূতনাথ বিশ্বাস প্রযোজিত কল্পচিত্র মন্দির-এর প্রথম চিত্র নিবেদন 'ওরে যাত্রী' কৃতি চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরীর পরিচালনায় গৃহীত হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে। 'ওরে যাত্রী'র কাহিনী রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য—কাহিনীকারকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকাতেও দেখা যাবে। তাছাড়া রয়েছেন দীপক মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, রেণুকা রায়, প্রভা, নমিতা, জ্যোতি, ধীরেন গাঙ্গুলী, প্রীতিধারা, উত্তম, হরিধন, কল্যাণী, সত্য, লক্ষ্মী, অমল প্রভৃতি আরো অনেকে। ওরে যাত্রীর সুর সংযোজনা করেছেন কালীপদ সেন। চিত্র গ্রহণ করেছেন অনিল গুপ্ত। সম্ভবতঃ পূজাবকাশে 'ওরে যাত্রী' বম্বে পিকচার্স ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ-এর পরিবেশনায় একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

পরলোকে প্রবীণ অভিনেতা মণি ঘোষ

কিছুদিন পূর্বে চিত্র ও নাট্য মঞ্চের প্রবীণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত মণি ঘোষ পরলোক গমন করেছেন। বহু নাটক ও চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রকে সুষ্ঠু রূপদান করে স্বর্গতঃ ঘোষ বাঙ্গালী চিত্র ও নাট্যপ্রিয়দের প্রশংসা ভাজন হয়েছিলেন। আমরা স্বর্গতঃ ঘোষের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে তাঁর মৃত্যুতে চিত্র ও নাট্যপ্রিয়দের তরফ থেকে গভীর শোক প্রকাশ কচ্ছি।

সুধা প্রডাকসন

সুধা প্রডাকসনের প্রথম চিত্র নিবেদন 'প্রতিরোধ' শ্রীযুক্ত খগেন রায়ের পরিচালনায় ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। প্রতিরোধের বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, কমল মিত্র, ইন্দু মুখুজ্জে, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কৃষ্ণধন, অহী সান্যাল, জীবেন বসু, মধুসূদন, পূর্ণ চাটুজ্জে, পূর্ণ চৌধুরী, মীরা সরকার, রেবা দেবী, রেণুকা রায়, আরতি দাস, অলকা ও আরো অনেকে।

রূপায়ন চিত্র প্রতিষ্ঠান

রূপায়ন চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত প্রথম চিত্র দিবেন 'দেবী

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ :
শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য

শ্রেষ্ঠাংশে
রেণুকা, গৌরা,
সুজিত

সুরশিল্পী :
শ্রীকালীপদ সেন

পরিচালনা :
বিশ্বকর্ম্মা

: : : : : অগ্যান্য ভূমিকায় : : : : :
অপর্ণা, মনোরঞ্জন, সন্তোষ, শম্ভু মিত্র,
বীরেন মিত্র, সন্তোশ ও স্বপনকুমার।

●

মুক্তিপথে!!!

চৌধুরাণী'র চিত্র গ্রহণের কাজ সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সমাপ্তির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শেষ অবধি একটি বিশেষ ভূমিকার জন্য কর্তৃপক্ষ বাংলার প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্যাভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'দেবী-চৌধুরাণী'র দৃশ্যপটটি এতই আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল যে, শুধু ষ্টুডিওর লোকই নয়—বাইরের বহু দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে উক্ত দৃশ্যপটটি ভরে উঠেছিল। এই দৃশ্যপটটি এতটা আকর্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল—দেবী চৌধুরাণীর বজরার জন্য। বজরাটির নির্মাণ পরিকল্পনা, তার নিখুঁত কারুকার্য খচিত ভিতর ও বহিরাংগ যে কোন আগন্তুকদের খুশী না করে পারেনি এবং প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষ ও শিল্পনির্দেশক বটু সেনকে এজন্য ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। বজরাটি নির্মাণের জন্য কর্তৃপক্ষ অর্থ ব্যয়েও মোটেই কার্পণ্যের পরিচয় দেননি। চিত্রশিল্পী শৈলেন বসু, শিল্প নির্দেশক ও তাঁর সহকর্মী তারক বসু এবং ক্ষিতীন সেনের এই সার্থক সৃষ্টিকে সুচতুর ভাবে তার ছায়াধর যন্ত্রে আটকে রেখেছেন—তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় দেবী চৌধুরাণী মুক্তিলাভ করলেই দর্শকসাধারণ জানতে পারবেন। দেবী চৌধুরাণীর শব্দ গ্রহণের দায়িত্ব নিয়েছেন প্রবীণ ও দক্ষ শব্দযন্ত্রী গৌরদাস। এবং সুরসংযোজনা করছেন কালীপদ সেন। আরো প্রকাশ, প্রবীণ ও খ্যাতনামা পরিচালক প্রফুল্ল রায়—চিত্রজগতে শিল্পী, কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের যিনি মরমী বন্ধু—যাঁর পাণ্ডিত্য একাধিকবার অনেকের কাছেই প্রমাণিত হয়েছে—তিনিও নানান পরামর্শ দিয়ে কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করছেন। সংবাদটি যদি সত্য হয়—কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো।

মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠান

নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত পূজাবকাশের পর সম্ভবতঃ অক্টোবরের শেষের দিক থেকে তাঁর 'রাই' চিত্রের কাজ আরম্ভ করবেন। বর্তমানে তিনি কাহিনীকার কালীশ মুখোপাধ্যায়, সংগীত পরিচালক সুকৃতি সেন—চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত—চিত্র সম্পাদক রবীন দাস প্রভৃতিকে নিয়ে চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনায় ব্যস্ত আছেন। প্রায় সাতশতেরও অধিক অভিনয়েচ্ছুকরা 'রাই' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য আবেদন করেছেন। এঁদের ভিতর থেকে অন্ততঃ পনেরো জন ছেলে ও পাঁচজন মেয়েকে 'রাই' চিত্রে সুযোগ দেওয়া হবে। চিত্রনাট্যটি সম্পূর্ণ রূপে রচিত হ'লেই আবেদনকারী ও কারিণীদের নির্বাচন পর্ব শেষ করা হবে। পুরোন গোষ্ঠীর ভিতর থেকে সম্ভবতঃ ছবি বিশ্বাস, কমল

মিত্র, সরযূ দেবী, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, মণি শ্রীমাণী, দেবীপ্রসাদ, অলকা দেবী, কমল চাটুজ্জে, শ্যামলাহা ও আশু বসুকে গ্রহণ করা হবে, তাছাড়া পুরোন গোষ্ঠীর ভিতর আরো হয়ত অনেকে থাকবেন। চিত্রনাট্যটি রচিত না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই স্থির করা সম্ভব হবে না। 'নায়িকা' 'রাই' চরিত্রের জন্য এখনও সেরূপ উপযুক্তা কোন নবাগতার সন্ধান পাওয়া যায় নি। তাই, এই চরিত্রটির জন্য এখনও আবেদন গ্রহণ করা হবে। আবেদনের সংগে ফটো পাঠাতে বিশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে। অন্যান্য ভূমিকার জন্য আর কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এবং যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। নির্বাচনের ফলাফল রূপ-মঞ্চ মারফৎ যথাসময়ে জানিয়ে দেওয়া হবে। 'রাই' প্রযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র পাল এবং তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেছেন গৌর মোহন রায়চৌধুরী।

শ্রীমতী পিকচার্স

শ্রীমতী কানন দেবীর নিজের প্রযোজনায় 'অনন্যা' নামে যে চিত্রখানি কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে সমাপ্তির পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে, তার কাহিনী একটি নারীর শিল্পমনের প্রতি আঘাতের এক বেদনা-বিক্ষুব্ধ মর্মস্পর্শী ইতিহাস। পৃথিবীতে অনেক সংসারেই নর ও নারীর সুকুমার-বৃত্তির ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচার চলে। মনের আকাশে রঙের প্রাচুর্য মুছে যায়। হৃদয় যায় শুকিয়ে। অন্তরের গভীরে ব্যর্থতা ও নিষ্ফলতা জীবনকে মরুভূমির মত ধূসর করে দেয়। তবু বেঁচে থাকতে হয়—সুদূর একটি ক্ষীণ আশা নিজের জীবনের রুদ্ধ বাতায়নের সঙ্কীর্ণ ছিদ্র পথে আলোর স্বপ্ন রচনা করে। সেই আলোর দিকে চেয়ে যে মেয়ে পৃথিবীর সকল বেদনাকে উপেক্ষা করে, লাঞ্ছনা, অত্যাচারকে ভয় করেনা—সে অনন্যা। সেই 'অনন্যার' ভূমিকায় শ্রীমতী কানন দেবীর আত্মপ্রকাশ সার্থক হবে বলে বিশ্বাস করি। অন্যান্য চরিত্রে অনুভা গুপ্তা, রেবা দেবী, বিজলী, পূর্ণেন্দু, ভূজঙ্গ, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, বিমান বন্দ্যো, বিকাশ রায়, হরিধন প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সব্যসাচী পরিচালনা কচ্ছেন। সুনির্বাচিত রবীন্দ্র সংগীত চিত্র খানিকে সমৃদ্ধ করবে।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স

শিবু ডাক্তার কি চিরদিনই বস্তিবাসী আর কুলিদের ডাক্তার ছিল! আত্মভোলা অদ্ভুত মানুষ। যে স্বপ্নের সৌধ বহুদিন পূর্বে এক যুবকের মনে গড়ে উঠেছিল, বিধাতার অভিশাপে তা' চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ভাঙা চোরা সেই স্বপ্নের টুকরোগুলি আজও বিস্মৃত দিবসের তার হতে অকস্মাৎ হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে।

চুরি করে শিবু ডাক্তার সুজিতার গান শুনতে গিয়ে ধরা পড়ে। শুধু সুজিতার কাছে ধরা পড়লে কোন ক্ষতি ছিল না, সে ধরা পড়েছে নিজের কাছে—অতীতের মেধাবী ডাক্তার শিবব্রত রায় জীবনে যে স্বপ্ন দেখেছিল, রাজনৈতিক কারণে নির্বাসিত' আন্দামানের নির্জনতায় তার সমাধি হয়ে গিয়েছে।

নিতাই ভট্টাচার্য রচিত কাহিনী 'সমাপিকা'র চিত্ররূপ গঠন কচ্ছেন 'অগ্রদূত' পরিচালক মণ্ডলী। 'সমাপিকা' চিত্র কাহিনীর মধ্যে সুজিতা ও ডাক্তার শিবব্রত রায়ের চরিত্র দুইটি হৃদয়রহস্যের সন্ধান দেয়। সুজিতার ভূমিকায় সুনন্দার মত শক্তিময়ী অভিনেত্রীর নির্বাচন কতখানি প্রয়োজন, তা ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন।

আত্মভোলা আদর্শবাদী যুবকের চরিত্রে জহর গাঙ্গুলীর জুড়ি সহজে মেলে না।

ভারতী চিত্রপীঠ

ভারতী চিত্র পীঠ প্রযোজিত প্রথম বাংলা চিত্র 'দাসীপুত্রের' কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। 'দাসীপুত্রে'র কাহিনীটিও দেবনারায়ণ বাবুই রচনা করেছেন। দাসীপুত্রের বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, দীপক, সরযূবালা, রাণীবালা, মণিকা ঘোষ, শ্যামলাহা, মণি শ্রীমাণী, নবদ্বীপ হালদার, দেবী চৌধুরী, আশু বসু প্রভৃতি আরো অনেকে। সংগীত পরিচালনা করছেন বিভূতি দত্ত।

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন

বলাই পাচাল প্রযোজিত বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের ভক্তি-

মূলক চিত্র সাক্ষীগোপালের কাজ ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। চিত্রখানি চিত্ত মুখোপাধ্যায় ও গৌর সীর যুগ্ম পরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে। সংগীত পরিচালনা করছেন বলাই চট্টোপাধ্যায় এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ঝর্ণা, সুপ্রভা, তুলসী চক্রঃ, গৌর সী, দুলাল দত্ত, বলাই চট্টো, অনুপ কুমার, হারাধন, অমর প্রভৃতি আরো অনেক।
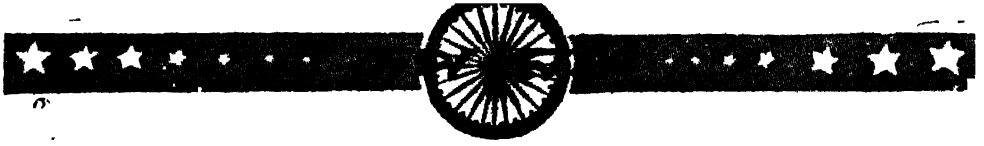
বসুমিত্র

বসুমিত্র প্রযোজিত প্রথম রহস্যমূলক চিত্র 'কালোছায়া'র কাজ ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে প্রখ্যাত সাহিত্যিক-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচালনায় সমাপ্ত হয়েছে। কালোছায়া শ্রীযুক্ত মিত্রেরই একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপ্রা দেবী, নবদ্বীপ হালদার, হরিদাস, নৃপেন্দ্র, প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসু।

এম, পি, প্রডাকসন্স

সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এদের অনির্বাণ চিত্রখানি সহরের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করছে। শারদীয়া সংখ্যার পরবর্তী সংখ্যায় অনির্বাণের সমালোচনা প্রকাশ করা হবে। অনির্বাণের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন কানন দেবী, কৃষ্ণচন্দ্র, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, নরেশ মিত্র, প্রভৃতি আরো অনেকে।

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ

প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্যাভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসের প্রযোজনায় এদের প্রথম চিত্র 'যার যেথা ঘর'-এর কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুরু হ'য়েছে। 'যার যেথা ঘর'-এর কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য এবং চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস। অক্লান্ত কর্মী অচিন্ত্য কুমার বেরা নানাদিক নিয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে সাহায্য করছেন এবং শ্রীযুক্ত তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেছেন। 'যার যেথা ঘর'-এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন শ্রীযুক্ত বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, শ্যামলাহা, সমর মিত্র, তারা হালদার, অচিন্ত্যকুমার, মীরা সরকার, সরযূবালা রেণুকা রায় কেতকী, প্রভৃতি আরো অনেকে।

সাহায্যাভিনয়

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষা কল্পে ব্যারাকপুর স্যার সুরেন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনায় নটগুরু শিশিরকুমারের পৌরহিত্যে ১৩ই সেপ্টেম্বর স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরীর সীতা নাটকাভিনয় হয়। এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ছবি বিশ্বাস, বিপিন গুপ্ত, মিহির ভট্টাচার্য, সরযূবালা, প্রভা, শ্রীকুমার, নাট্যকার মন্মথ রায় প্রভৃতি আরো অনেকে।

বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন

গত ১৭ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর কলেজের বার্ষিক প্রীতি-সম্মেলন ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযতীন্দ্র কিশোর চৌধুরী। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কলেজের ছাত্রগণ কর্তৃক ৺অপরেশচন্দ্রের ইরাণের রাণী নাটকাভিনয় হয়। অভিনয় সর্বাংগ সুন্দর হয়েছিল। তার ভিতর ধীরেন পাল, অলোক চাঁদ মিত্র, ইন্দ্র চক্রবর্তী, শেখর মৈত্র, গোপাল কোলে, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, প্রভৃতির অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন চপলাকান্ত ভট্টাচার্য। কলেজ ইউনিয়নের সম্পাদক চিত্ত চৌধুরী ও নাট্যসম্পাদক পুলকময় ঘোষ সমবেত অতিথিদের প্রতি সব সময় যত্নবান ছিলেন।

:রমিতা দেবী: রূপ-মঞ্চ আবিষ্কৃত একটী নতুন মুখ। 'রাই' চিত্রে প্রথম চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানাবেন। রূপ-মঞ্চ : শারদীয়া-সংখ্যা : ১৩৫৫

উদীয়মান অভিনেতা সুজিত চক্রবর্তী

শ্রীমতী মীরা মিশ্র
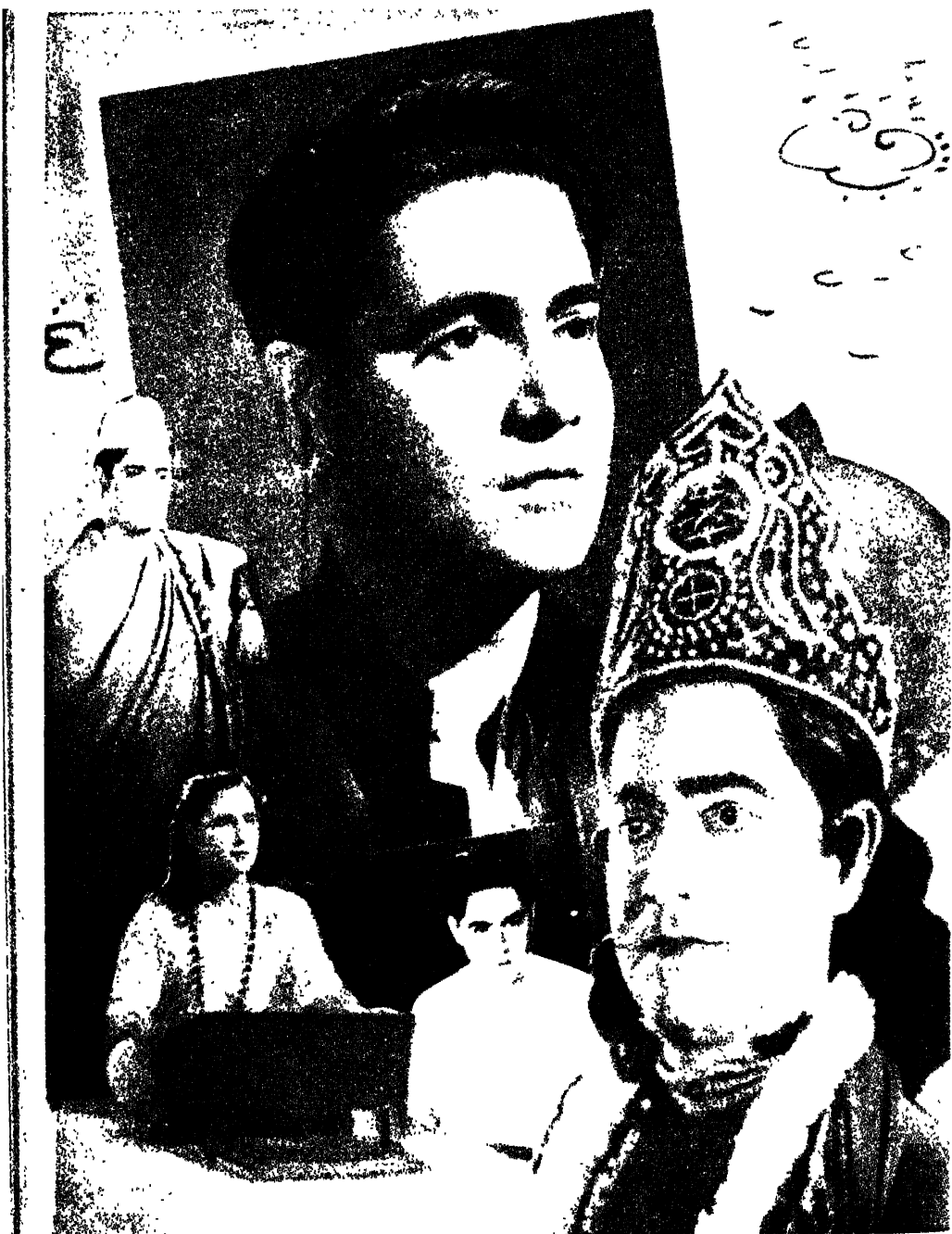
—শ্রীমতী বিনতা রায়—

"দিনের পর দিন" চিত্রে নায়িকার ভূমিকাটিকে রূপায়িত করে তুলছেন। চিত্রখানির কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করছেন জ্যোতির্ময় রায়।

— — — কায়েদে আজম জিন্নাহ — — —

যাঁর মৃত্যুতে পাকিস্থানের অধিবাসীদের সংগে একাত্ম হ'য়ে আমরাও বেদনা অনুভব করেছি—শুধু পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল বল্লে তাঁকে অসম্মান করা হবে—তিনি ছিলেন পাকিস্থানের স্রষ্টা ও সর্বজনপ্রিয় নেতা।

স্কেচ :: সুশীল বন্দ্যো :: শারদীয়া রূপ-মঞ্চ :: ১৩৫৫

— — মৌলানা আবুল কালাম আজাদ — —

পাণ্ডিত্য ও ত্যাগে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতের সর্বজনপ্রিয় নেতা—নিরক্ষর জনসমাজকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করবার গুরু দায়িত্ব নিয়ে আছেন। আমাদের চলচ্চিত্র ও নাট্য-মঞ্চকে শিক্ষার কাজে লাগানো হউক, সেই আবেদনই কচ্ছি তাঁর কাছে। — —

স্কেচ : সুশীল বন্দ্যো :: রূপ-মঞ্চ :: শারদীয়া সংখ্যা :: ১৩৫৫
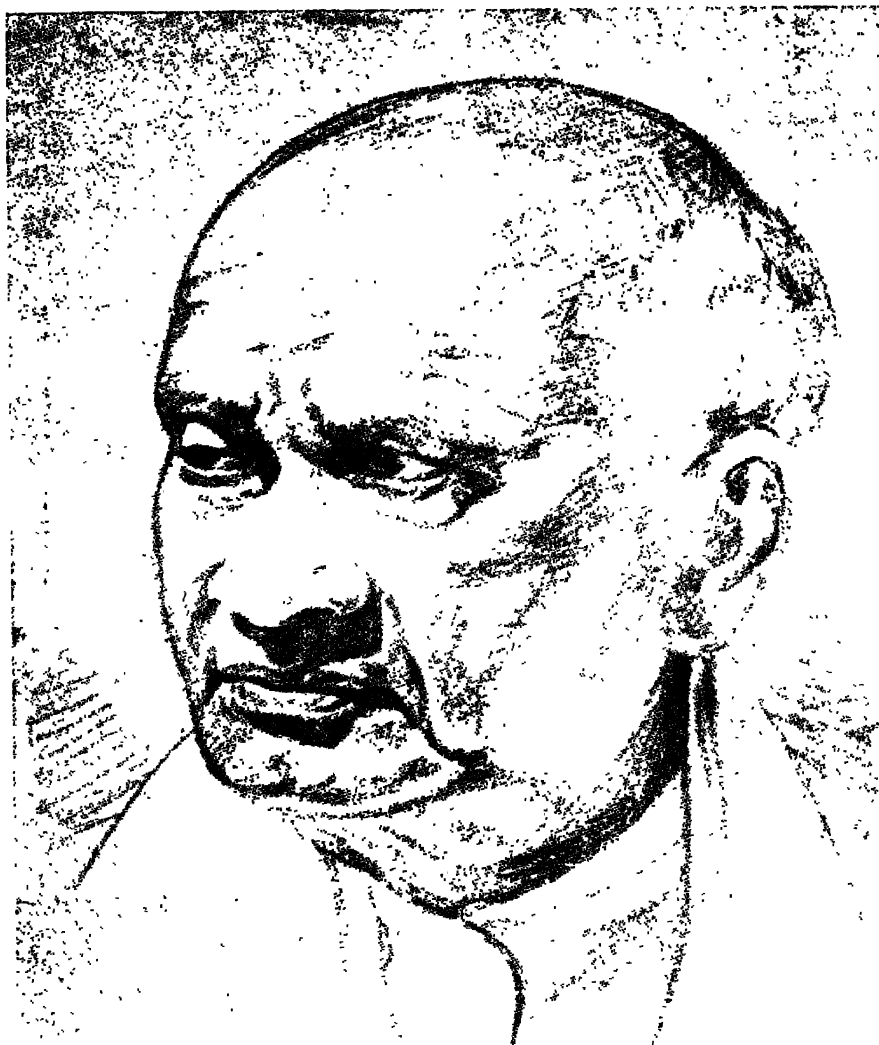
— — সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল — —

কর্মনিষ্ঠা ও সংগ্রামে দৃঢ়চিত্তের পরিচয় দিয়ে সমস্ত ভারতবাসীর কাছে 'লৌহ-মানুষ' রূপে শ্রদ্ধেয়। কেন্দ্রীয় জাতীয় সরকারের প্রধান উপ-মন্ত্রী। স্বরাষ্ট্র ও বেতার বিভাগের গুরু দায়িত্ব এঁর হাতে। বেতার জগতের অনাচার লৌহ হস্তে দমন করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছি এঁর কাছে।

স্কেচ : সুশীল বন্দ্যো : : রূপ-মঞ্চ : : শারদীয়া-সংখ্যা : : ১৩৫৫

: : : : : উপরে : : : : :

বাদিকে : স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপাল—বাংলার প্রাক্তন প্রদেশপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারিয়া। ডানদিকে : ভারতের শেষ বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন অফ বার্মা—ভারতীয়দের মন থেকে ইংরেজ-বিদ্বেষ মনোভাব দূরীকরণের জন্য সমস্ত বৃটিশ জাতির আজীবন যাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। — — —

: : : : : নীচে : : : : :

খাজা নাজিমুদ্দিন : পূর্ব বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী—বর্তমানে পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারেল

●

উপরে বাদিকে : রূপ-মঞ্চের পৃষ্ঠ-পোষক মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য অমূল্য মুখোপাধ্যায়। ডান দিকে : রূপ-মঞ্চ কর্মী-দের সর্বজনপ্রিয় 'দাদাভাই' ও পৃষ্ঠ-পোষক মণ্ডলীর সভ্য শচীন্দ্রনাথ ঘোষ। নীচে বাদিকে : লেখক ও সমালোচক গোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী। ডানদিকে : রূপ-মঞ্চের আইনজ্ঞ শ্রীশ ভৌমিক।
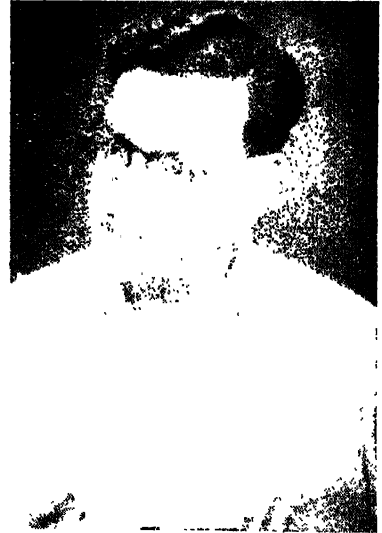
উপরে বাঁদিকে : রূপ-মঞ্চের পরম হিতৈষী পাকিস্থান গণপরিষদের কংগ্রেস মনোনীত সভ্য বিরাটচন্দ্র মণ্ডল। ডানদিকে : রূপ মঞ্চ সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম সভ্য ডাঃ বিমল বসু। নীচে বাঁদিকে ও ডানদিকে যথাক্রমে প্রদ্যোত মিত্র ও শৈলেশ মুখোঃ।

শিল্পী—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়
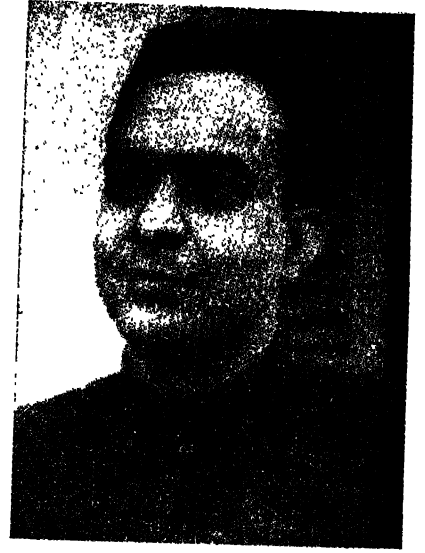
রূপ-মঞ্চ : সম্পাদক

সম্পাদকের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি স্নেহেন্দ্র গুপ্ত (বিন্টু)

রূপ-মঞ্চ : কর্মাধ্যক্ষ—পুষ্পকেতু মণ্ডল

মাণিক প্রসাদ শা' রূপ মঞ্চের রঙীন চিত্র মুদ্রণের ভার নিয়ে — — আছেন — —
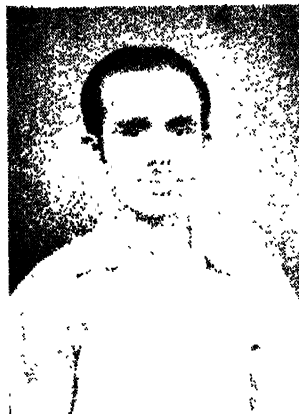
বীরেন্দ্র প্রসাদ শা'—রূপ-মঞ্চের উৎসাহী সভ্য। রঙীন চিত্র মুদ্রণের ভার নিয়ে আছেন।

মদন চক্রবর্তী আমাদের প্রাক্তন সহকর্মী— দূরে গেলেও রূপ-মঞ্চের সংগে তাঁর যোগ সূত্র রয়েছে অচ্ছেদ্য। — — — —

খগেন্দ্রনাথ মিত্র। ব্লক সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে আছেন।

রূপ-মঞ্চ

শারদীয়া ঃ*ঃ অষ্টম-বর্ষ ঃ*ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা ঃ*ঃ ১৩৫৫

আমাদের আজকের কথা

আজকের কথায় আর কোন কচ্‌কচানী নয়, ভারত ও পাকিস্থানের সর্ব-সাধারণের উদ্দেশ্যে ঈদ ও শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি—'রূপ-মঞ্চে'র পৃষ্ঠপোষকবর্গ, পাঠকসমাজ, লেখকগোষ্ঠী ও কর্ম্মসংঘের তরফ থেকে। সুন্দর হউক, মধুর হউক, তাঁদের জীবন। যাক—ভেসে যাক—ধুয়ে যাক—মুছে যাক অন্তরের যত বেদনা ও মালিন্য—ক্লান্তি ও অবসাদ।

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়,

সম্পাদক ঃঃ রূপ-মঞ্চ।

স্বাধীন নাট্যশালা

শচীন সেনগুপ্ত

★

আমি স্বাধীন ভারতের নাট্যকার।

—আপনাকে অভিনন্দন জানাই।

—কিন্তু শুরুতেই আপনাকে একটা কথা শুনিয়ে দিতে চাই।

—বলুন।

—আপনাদের মতো বাজে নাটক আমি লিখব না।

—আমাদের চেয়ে ভালো নাটক যদি আপনি লেখেন, আমি হিংসা করব না।

—আপনার কি ধারণা আপনারা ভালো নাটক লিখেছেন?

—আমার নিজের সাফাই গাইব না, সৌজন্যে আর শিষ্টাচারে বাধে। কিন্তু বাংলা-সাহিত্যে ভালো নাটক আছে একথা ততদিনই বলব, যতদিন মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ, অবাঙ্গালী সাব্যস্ত না হন এবং প্রমাণিত না হয়, তাঁরা যে-ভাষায় নাটক রচনা করেছেন, সে ভাষা বাংলা ভাষা নয়।

—তাই নাকি!

—নিশ্চয়।

—তারপর!

—তারপরও যাঁরা নাটক রচনা করেছেন, যেমন অপরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, নিশিকান্ত, মন্মথ রায়, রবীন্দ্র মৈত্র, জলধর চট্টোপাধ্যায়, শরৎ ঘোষ, তারাশঙ্কর, বনফুল, বিজন ভট্টাচার্য, মনোজমোহন, মহেন্দ্র গুপ্ত, তাঁদের কোন নাটকই যে ভালো নাটক হয়নি, এমন কথাই বা কেন বলব?

—কিন্তু জানেন ত অনেক সমালোচকই বলে থাকেন, বাংলা সাহিত্যে কাব্য, ছোট-গল্প, উপন্যাস যেমন উন্নত হয়েছে, নাটক তেমন হয়নি।

—হাঁ, এই ধরণের মন্তব্য সাময়িক কাগজে দেখতে পাই, বেতারেও মাঝে মাঝে শুনি বটে!

—তাঁরা কি মিথ্যে কথা বলেন?

—তাঁরা বলেন তাঁদের কথা, নাটকের কথা তাঁরাত বলেন না। ওপিনিয়ন মাত্রেই যে সত্য, একথা মানব কেন?

—তার মানেইত আপনি বলতে চান, তাঁরা যা বলেন, তা সত্য নয়।

—অনেকে মিলে একটা কথা বল্লেই কি তা সত্যি হয়ে ওঠে?

—তাঁরা যা বলেন, তার পেছনে যুক্তিও থাকে।

—যথা?

—একজন বার্ণাড শ', একজন ইউজিন ও'নীল, কি এদেশে জন্মেচে?

—না।

—তবে?

—একজন পার্ল বাক, একজন টমাস ম্যান কি এদেশে জন্মেচে?

—না।

—তবে?

—একথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে তারাশঙ্কর, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উপন্যাসকে যতদূর এগিয়ে নিয়েচেন, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র যেমন কবিতাকে এগিয়ে নিয়েচেন, আপনাদের কেউ তেমন নাটককে এগিয়ে নিতে পারেননি।

—ওঁরা আমার বন্ধু। আমি ওদের গুণমুগ্ধ। তাই ওঁদের খর্ব করতে চাই না। কিন্তু জানতে চাই, ওই তারাশঙ্কর মৌলিক নাটকও রচনা করেচেন, বুদ্ধদেবও তাই। কিন্তু তাঁদের নাট্য-সৃষ্টি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয়না কেন? উপন্যাসে কবিতায় যে প্রগতির পরিচয় দিয়ে তাঁরা আপনাদেরকে প্রফুল্ল করে তুলেচেন, নাটকে সে প্রগতির পরিচয় আপনারা কেন পাচ্ছেন না? যদি পেতেন, তাহলে তাঁদেরই দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নিশ্চিতই বলতেন যে, উপন্যাস কবিতার মতো নাট্যসাহিত্যকেও তাঁরা এগিয়ে নিয়ে চলেচেন। কিন্তু তা ত আপনারা বলেন না। কেন বলেন না?

—এই জন্যেই বলিনা যে, তাঁদের নাট্যরচনা, অনুরোধে ঢেঁকী গেলা, সৃষ্টির আন্তরিক প্রয়াস নয়।

—আপনি তাঁদেরকে ছোট করচেন। আমি তাঁদেরকে
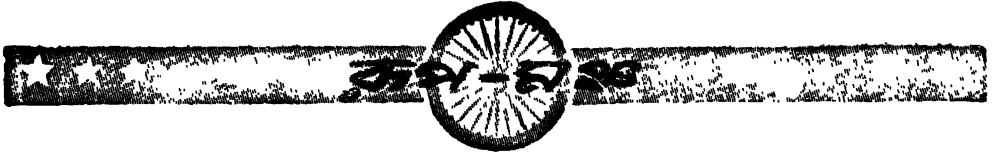
জানি। নাটকের নবরূপ দেবার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের কারু চেয়ে কম নয়। তাঁরা নাটক রচনা করেছেন শুধু ওই কারণে, প্লাকার্ডে নাম দেখবার লোভে নয়।

—তবে তাঁরা উপন্যাস কবিতার মতো উন্নত নাটক লেখেন না কেন?

- লেখেন; কিন্তু আপনারা তা মানেন না। আপনারা নাট্য সমালোচনা করবার সময় বার্ণার্ড শ', ইউজিন ও' নীল দেখান, কিন্তু নাটক দেখবার সময় দলে দলে ছুটে যান 'মিশরকুমারী', 'বঙ্গেবর্গী' দেখতে এমনকি তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' দেখে যে আনন্দ পান, তার সিকিও পান না—তাঁরই 'বিংশশতাব্দী' দেখে। যদিও 'দুই পুরুষের' চেয়ে 'বিংশ শতাব্দী' প্রগতিশীল নাট্যপ্রয়াস। কথাটা কি জানেন?

—আপনি বলচেন, আপনিই বলুন।

—কবি আর উপন্যাস-লেখক উঁচুতে উঠতে চাইলে নিজেদের সাধনা দিয়েই তা পারেন, কিন্তু নাটক রচয়িতা একা উঠতে পারেন না। তাঁকে উঠতে হলে দর্শকদেরকে নিয়ে, অভিনেতৃদেরকে নিয়ে উঠতে হয়। সেই কারণেই তারাশঙ্কর বুদ্ধদেবকে উপন্যাসে কবিতায় যেমন অগ্রগামী দেখা যায়, নাট্যসাহিত্যে তেমন দেখা যায় না। তাঁদের সৃষ্টিতে ত্রুটি থাকবার কথা নয়। একই ক্ষমতা নিয়ে তাঁরা উপন্যাস-কবিতাও লেখেন, নাটকও লেখেন, কিন্তু আপনারা প্রথম দুইটির যে রূপ দেখে খুসি হন, শেষেরটির সে রূপ দেখে খুসি হন না।

—আপনি তাহলে বলতে চান দর্শকরা প্রগতিশীল না হলে

করণ দেওয়ান ও নিগার সুলতানা রঞ্জিত মুভিটোনের 'মিট্টিকী খিলওনা' চিত্রে।
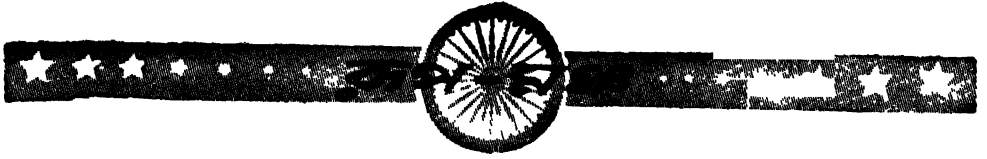
নাটকও প্রগতিশীল হবে না?

-- যদি বলি খুব অন্যায় বলব না।

—আমরা স্বাধীন ভারতের নাট্যকাররা দর্শকদেরকেই, অর্থাৎ দেশের দশজনকেই, উন্নত করতে চাই।

—খুব ভালো কথা।

—তাই চাই বলেই আপনাদের মতো আমরা ঐতিহাসিক নাটক লিখবনা, জমিদারের কাহিনী নিয়ে নাটক লিখব না, দালাল শ্রেণীর সুখ-দুঃখের কাহিনী নিয়েও নাটক লিখবনা, পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে ত' নয়ই!

তবে কি নাটক লিখবেন আপনারা?

—গণ-নাট্য।

—খুব ভালো কথা। আমি গণ-নাট্য সংঘের সভাপতি, তারস্বরে প্রচার করব, আপনার নাটকই আসল নাটক।

— আমার নাটক যাতে অভিনীত হয়, তার ব্যবস্থা করে দেবেন?

- কোলকাতার মঞ্চে?

নিশ্চয়ই।

পারব না।

- কেন?

—মঞ্চমালিকরা তা চাইবেন না, শহরের দর্শকরাও না।

—তা হলে আপনাকে গণনাট্য সংঘের সভাপতি করে লাভ কি হোলো?

—আমারও ত ওই প্রশ্ন। সংঘ নায়কদের বলেছিলাম, কোন লাভই হবেনা তাঁদের। তাঁরা বল্লেন, লাভের প্রত্যাশী তাঁরা নন।

– গণ নাট্যের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা নেই!

—কে বল্লে নেই? ছেলেবেলায়, মানে কৈশোরে, যখন পাড়াগাঁয়ে থাকতাম, তখন যাত্রা শুনতাম (দেখতামও বটে), যৌবনে এই কোলকাতার বাজারে বাজারে বারোয়ারীতলায় যত যাত্রা হতো, রাতভোর দাঁড়িয়ে বসে তাও শুনতাম।

—এখন?

-- এখন আর যাই না।

—কেন?

—এখনকার যাত্রার পালা আর অভিনয় থিয়েটারের নকল-নবিশী করে বলে।

—সে ত উন্নতিই হয়েচে।

—না, অবনতিই ঘটেচে। আগেকার মতো পালা আর জমে না।

—থিয়েটার জমে, আর থিয়েটারের নকল-নবিশী করে যাত্রা জমে না?

—ঠিক তাই।

—দুর্বোধ্য!

—থিয়েটারের টেক্‌নিক আর যাত্রার টেক্‌নিক এক নয়, আসরও এক ধরণের নয়, দর্শকও এক শ্রেণীর নয়।

—কিন্তু আপনারই সিরাজদ্দৌলা কত রাত যাত্রার আসর জমিয়েচে তা জানেন?

—শুনেচি হাজার হাজার রাত। কিন্তু আপনি হয়ত জানেন না, কেন তা জমাতে পেরেচে।

আপনিই বলুন কেন তা পারল।

—এই জন্যই পারল যে, আমার সিরাজদ্দৌলা আসলে যাত্রার টেক্‌নিকে লেখা। অর্থাৎ ভাবা দিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে, সর্বসাধারণের মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে নাট্যরস জমিয়ে তোলা। এ ধরণের নাটক থিয়েটারে যাত্রায় দুয়েতেই চলে। কিন্তু আমার 'ঝড়ের রাতে' বা 'তটিনীর বিচার' থিয়েটারে চল্লেও, যাত্রার আসরে অচল থাকবে।

—কেন?

—ওর বিষয়বস্তুর সংগে, ওর অভিনয়ের সংগে, ওর নাট্য-রূপের সংগে জনসাধারণের পরিচয় নেই বলে। আমার 'ঝড়ের রাতে' বা 'তটিনীর বিচার' ইংরেজী নাটকের অনুবাদও নয়, বিদেশী নাটক থেকে চুরি করাও নয় তবে বিদেশী নাট্যরূপের অনুকরণ নিশ্চিত। ও দু'খানি নাটকের পাত্র পাত্রীরা যে বেশ ভূষায় সেজে দেখা দেয়, যে ধরণে যে ভাষায়, যে-সব কথা-বার্তা বলে, ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের লোকেরা ছাড়া কেউ তাতে কৌতূহলের কিছু খুঁজে পায় না। কাজেই দেশের শতকরা নিরেনব্বই জন লোক ও-নাটকে রসের সন্ধান পায় না। কিন্তু যাত্রার 'সুরথ উদ্ধার' বা 'অভিমন্যু বধ' অত্যন্ত কঠিন ভাষায় রচিত

হলেও, দেশের শতকরা নিরেনব্বই জন লোক তাতে রসের সন্ধান পায়। 'নবান্ন'কে যাত্রার আসরে ফেলে সে আসর জমাবে, কিন্তু 'অভ্যুদয়'কে সেখানে নিয়ে গেলে শহরে পাওয়া সম্মানের অধিকারী সে হবে না।

—আলোচনাকে জটিল করে তুলচেন।

—না, জটিল গ্রন্থিগুলি খুলে দেবার চেষ্টা করচি। একটু-খানি মনোযোগ দিতে হবে।

—বলুন। দেখি কতক্ষণ ধৈর্য ধরে শোনা যায়।

—আমাদের থিয়েটার আমাদের দেশের নাট্য ঐতিহ্য নিয়ে প্রথমে গড়ে ওঠেনি। ওকে আমদানি করা হয়েচে বিদেশ থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও থিয়েটার একেবারে বিদেশী রূপ ধরতে পারেনি। ইংরেজী আমলে যাঁরা সাহেবীয়ানা করতে চাইতেন, তাঁরা যেমন পুরো সাহেব হতে পারেননি, তেমন থিয়েটারও পুরো বিদেশী হতে পারেনি। এই কিছুটা স্বদেশী আর কিছুটা বিদেশী ধাঁচে চলতে হয়েচে বলে সে নিজস্ব একটা গতি পায়নি। তাকে সব সময়েই ঠেলে ঠেলে চালাতে হয়েচে।

—কারা চালিয়েচে?

—সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, নাট্যকাররা, দর্শকরা, অভি-নেতৃরা। কেউ কেউ চেয়েচেন একে প্রাচীন সমাজের পোষক করে তুলতে, কেউ কেউ চেয়েচেন, একে নবীন-সামাজিকদের রুচি অনুসারে গড়ে তুলতে। যখনই থিয়েটার ঝুঁকে পড়েচে প্রাচীন সমাজের দিকে, তখনই তা সংখ্যাগুরুদের সমর্থন পেয়েচে। আর যখনই নবীন সমাজের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করেচে, তখনই সংখ্যাগুরুরা দূর থেকে থিয়েটারকে অভিবাদন জানিয়েচে। কিন্তু থিয়েটার প্রাচীন-নবীন কাউকে ত্যাগ করতে চায়নি বলে সে 'টামাকও খেয়েচে, ডুড্‌ও খেয়েচে'। একই থিয়েটারে যাত্রার পালার উপযোগী নাটক অভিনীত হবার পরই হয়ত ইবসেনী-টেক্‌নিকের অনুকরণে রচিত নাটক অভিনীত হয়েচে, আবার কোন থিয়েটার ধার করা আর্ট থিয়েটার নাম ধরেও মাটির ঘোড়া দিয়ে রথ টানিয়ে, কাগজে তৈরি হাতীর ওপর যোদ্ধা চড়িয়ে আর্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েচে।

—আপনারাও ত এই অনাচারের সহায়তা করেচেন।

—করিচি। কিন্তু আমরা বিদ্রোহের পতাকা হাতে নিয়েই এগিয়ে এসেচি। সে পতাকা সব সময়ে উঁচু রাখতে পারিনি।

—আপনারাও ত আপোষ করেচেন।

—করিচি। যেমন আপনারাও আপোষে স্বাধীনতা নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেচেন। যে বিপ্লব স্বাধীনতার আগে ঘটবে বলে সবাই আশা করেছিলেন, সে বিপ্লবের দাবী জাতি পূর্ণ করতে পারল না বলেই জাতি আপোষ করতে বাধ্য হোলো, একথা আপনি মানবেন কি না জানি না, কিন্তু আমি জানি একথা মিথ্যে নয়। কিন্তু স্বাধীনতা এসেচে বলে বিপ্লব যে আসবে না, এমন কথা কোন চিন্তাশীল লোকই বলবে না। তাঁরা এই কথাই বলবেন যে, স্বাধীনতার সুযোগ নিয়েই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

—রাজনীতির কথা ছেড়ে দিয়ে নাট্যশালার কথাই বলুন।
—তা বলা যায় না, বলা উচিতও নয়। রাষ্ট্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অর্থ, জাতির নাট্যশালারও বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কেননা নাট্যশালা হচ্ছে জাতির দর্পণ।
—নাট্যশালার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অর্থ কি?
—দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনা যেমন ব্রিটেনের দিক থেকে, তেমন রাশিয়ার দিক থেকেও।
—তাও কি সম্ভব?
—নিশ্চয়ই সম্ভব। পিপল্‌স থিয়েটার এ দেশে সমাজের সংগে যেমন করে মিশে গিয়েছিল, তেমন করে আর কোন দেশের সমাজের সংগে মিশে যাবার অবসর এখনো পায়নি।
—যাত্রা কীর্তন প্রভৃতির কথা বলচেন ত।
—তাই বলচি।
—আপনার মতে তাহলে থিয়েটার থাকা উচিত নয়।
—না, আমার মত তা নয়। থিয়েটারও থাকবে। কিন্তু তা থাকবে কেবল মাত্র বিদগ্ধ জনের জন্য। যাত্রা কীর্তন থাকবে সকলের জন্য।
—আপনি তা হলে শ্রেণীবিহীন সমাজের কথা চিন্তা করতে পারেন না।
—শ্রেণীবিহীন সমাজের কথা এ প্রসংগে তুলবেন না। কেননা বিদগ্ধজন তাঁদের থিয়েটারকে শোষণের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন না। মনে রাখবেন, আমি ধনিকের থিয়েটারের কথা বলচি না, ধনতান্ত্রিকদের কথাও বলচি না। আমি বলচি বিদগ্ধ জনের থিয়েটার। আমি মনে করি, সে থিয়েটারও পিপল্‌স থিয়েটারেরই একটা রূপ। কেননা, বিদগ্ধজনও জনগণেরই একটা অংশ এবং শ্রেণীবিহীন সমাজেও শ্রমিকে বিদগ্ধজনে পার্থক্য থাকবে।
—আপনি ধান ভানতে শিবের গীত গাইছেন।
—সত্যই শিবের গীত গাইছি। থিয়েটার যাত্রা এই শিবকে হারিয়েচে বলেই সুন্দর হতে পারচে না। শিব হ'চ্ছে জাতির সংগে সংযোগ। সে সংযোগ থিয়েটার এক রকম করে করবে, যাত্রা করবে আর একরকম করে। জাতির পক্ষে দুটোরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুটোকে একাকার করতে যাঁরা চাইবেন, তাঁরা শিব গড়তে বসে বানরই গড়বেন। স্বাধীন ভারতের নাট্যকার আপনারা, গণ-নাট্য করুন, প্রচারধর্মী নাটক লিখুন, বাস্তবকে মঞ্চে রূপায়িত করুন, কিছু আপত্তি নেই, কিন্তু মানুষের মন যাতে প্রসারিত হতে পারে, মানুষ যাতে সুন্দরকে মর্যাদা দিতে পারে, অজানাকে জানবার জন্য আগ্রহান্বিত হতে পারে, তার দিকেও দৃষ্টি রাখবেন আর মনে রাখবেন, সব মানুষকে এক ছাঁচে ঢেলে একটা জাতি গড়বার চেষ্টা করলে প্রথম কিছুদিন মানুষ তাতে মেতে উঠলেও, একদিন বিদ্রোহ করবেই। স্বাধীনতা মানুষকে স্বাধীন থাকবার প্রেরণা দেয়, একথা ভুলবেন না। স্বাধীন মানুষের সেই স্বাধীনতা প্রকাশ পাবে তার সকল সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, নাট্যশালারও ভিতর দিয়ে।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প

কালীশ মুখোপাধ্যায়

★

সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ইতিহাস—সোভিয়েট নাট্য-মঞ্চের মতই রাশিয়ার গণবিপ্লবের সংগে জড়িয়ে রয়েছে। যে বিপ্লব জার স্বৈরাতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করে শুধু রাশিয়ার গণসমাজকেই মুক্তি গঙ্গায় অবগাহনের সুযোগ এনে দেয়নি—রাশিয়ার বিজ্ঞান, শিল্পকলা সব কিছুরই মালিন্য দূর করে সদ্যস্নাতা পবিত্রবালার সৌন্দর্য ও মাধুর্যে বিশ্বের জনসমাজকে বিমুগ্ধ করবার সুযোগও এনে দিয়েছে। জারের আমলে যে শুষ্ককায় ক্ষীণরেখা রাশিয়ার শিল্প-কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির কলংকের কথাই ঘোষণা করতো—বিপ্লবের বন্যায় সে কালিমা মুছে গিয়ে দুকুল প্লাবিত স্রোতস্বিনীর পরিপূর্ণতা নিয়ে রাশিয়ার গৌরবের কথা পৌঁছে দিল দেশ দেশান্তরে। অন্যান্য শিল্প কলার মতই জারের আমলে রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্প ছিল অনুল্লেখযোগ্য। যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত হ'তে দেখা যেত, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার চাপে তার প্রাণধারাও এসেছিল শুকিয়ে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত রাশিয়াতেও জারের আমলে চলচ্চিত্র শিল্পকে গ্রহণ করা হ'য়েছিল সস্তা চিত্তবিনোদন ও আর্থিক সাফল্যের মাধ্যম হিসাবে। তাই সস্তা মার্কিণ ও জার্মাণ চিত্র আমদানী করেই দর্শক সাধারণকে খুশী রাখা হ'তো। রুশ-চিত্রও যে দু'চারখানা নির্মিত না হ'তো, এমন নয়। তবে সেগুলি তদানীন্তন বিশ্ব চলচ্চিত্রের দরবারেও ছিল নগণ্য। তাই বলতে গেলে সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই রাশিয়ার চলচ্চিত্রের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। মুষ্টিমেয় যে কয়জন চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও চলচ্চিত্রবিদ জারের আমলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিলেন—বহ্নিমান গণ-বিপ্লবের সংগে সংগে তাঁদের বেশীর ভাগই রাশিয়া পরিত্যাগ করে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লেন। এঁদের ভিতর কেবলমাত্র প্রোটো-জানোভ (Protozanov)-এরই নাম করা যেতে পারে, যিনি দেশের এই বিপদের সময় দেশ ছেড়ে কোথাও যাননি—অধিকন্তু বিপ্লবীদের সংগে এসে দাঁড়ালেন নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে। প্রোটোজানোভ জার আমলের একজন খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক। তাঁর নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠানও ছিল। মস্কো এবং খানস্‌ক্লোনকোভ-এ অবস্থিত তিনি নিজস্ব তাঁর চিত্র প্রতিষ্ঠানও তুলে দিলেন বিপ্লবীদের হাতে। আর নিজে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সংগে সংগে একজন চলচ্চিত্র-বিশেষজ্ঞ রূপে কাজ করতে লাগলেন সোভিয়েট সরকারের অধীনে।

সোভিয়েট সরকারের কর্তৃত্বাধীনে প্রথম চিত্র নির্মিত হয় ১৯১৮ খৃঃ-এ লুনারকাস্কি (কমিসারিয়াট অফ এডুকেশন) লিখিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দেশে চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দ অবধি বিপ্লবের বিভিন্ন দৃশ্য—দুর্ভিক্ষ—মে-ডে সংক্রান্ত উৎসব প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই খণ্ডচিত্র নির্মিত হ'তে থাকে। এই প্রসংগে ডিজিগা ভেরোটোভ (Dziga Verotov)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ১৯১৯ খৃষ্টাব্দেই 'দি ষ্টেট ইন্সটিটিউট অফ সিনেমার' (The State Institute of Cinema) প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মিঃ গারডিন (বর্তমানে পিপলস্‌ সিনেমা আর্টিষ্ট অফ দি রিপাবলিক সম্মানে ভূষিত হ'য়েছেন।) কুলেসোভ সম্প্রদায়ের (Kuleshov) সহযোগিতায় বহু খণ্ডচিত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন।

সোভিয়েট চলচ্চিত্র সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করবার পূর্বে যে কথাটি তার সম্পর্কে বলে নেওয়া দরকার বলে মনে করি, তা হচ্ছে—সোভিয়েট সরকারের বিশেষ দৃষ্টিভংগীর পরিপ্রেক্ষিতে এর যে রূপ রূপায়িত হ'য়ে উঠেছে—সেই বৈশিষ্ট্যটুকু। পৃথিবীর অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশে মঞ্চ ও চিত্রশিল্পকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হ'য়েছে বিলাস-ব্যসন ও চিত্ত-বিনোদনের মাধ্যম হিসাবে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার কথাই স্বতন্ত্র। সেখানে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে গ্রহণ করা হ'য়েছে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে - নিরক্ষর জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ও কৃষ্টির বাণী পৌঁছে দিতে। মঞ্চ নিয়ে বিশদভাবে ধারাবাহিক আলোচনা রূপ মঞ্চে ইতি-পূর্বে করা হ'য়েছে। বর্তমান প্রসংগ সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্রকে নিয়েই। তাই সেই সম্পর্কেই বলছি। চল-

চিত্রকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে শিক্ষা প্রাংগনে—চাষীর খামারে—তাকে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে দুর-দুরান্তর পার্বত্য ও সমতলাঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে। অবশ্য আনন্দ পরিবেশনের দিকটাকেও যে অবহেলা করা হ'য়েছে তা নয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় চলচ্চিত্র শিল্প এতখানি উন্নত ও মর্যাদা সম্পন্ন এইজন্য যে, সোভিয়েটের চিন্তানায়ক ও রাষ্ট্রনায়কেরা রাষ্ট্রের প্রথম জন্ম থেকেই চলচ্চিত্র-শিল্পের ব্যাপক সম্ভাব্যের কথা যেমনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন, তেমনি তাকে রাষ্ট্র ও জনসাধারণের কাজে লাগাতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বপ্রধান হোতা ও সর্বজনপ্রিয় নেতা লেনিনও চলচ্চিত্রের সম্ভাব্যের কথা বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনিও দৃঢভাবে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শুধু তাঁর নিজের অভিমতই ব্যক্ত ক'রে যাননি—সোভিয়েট সরকারের মনোভাবও ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যে : "For us the most important of all the arts is the Cinema." ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই উক্তি করেন। বর্তমান রাশিয়ার কর্ণধার জোসেফ স্ট্যালিন বলেন : "The Cinema in the hands of the Soviet power represents a great force." সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম খ্যাতনামা পরিচালক ও অভিনেতা পুডোভকিন্‌কেও স্ট্যালিনের কথায় সায় দিয়ে বলতে শুনি : The great international art of cinematography." অধ্যাপক আইসেনস্টাইনের অভিমতও প্রণিধানযোগ্য : "We say that the screen is of all arts the most popular in the Soviet Union." এই উক্তি তিনি বছর দশেক বাদে করেন, যখন সোভিয়েট চলচ্চিত্র সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এতো গেল সোভিয়েট রাশিয়ার চিন্তানায়ক ও নেতৃস্থানীয়দের কথা। সোভিয়েট রাশিয়ার জনসাধারণ চলচ্চিত্রকে কী ভাবে গ্রহণ করেছে—অধ্যাপক আইসেনস্টাইন তাঁর 'দি সিনেমা' প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে বহু নিদর্শন উপস্থিত করেছেন—এখানে তা থেকে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি। একবার সংবাদপত্রে প্রচারিত হ'লো যে, অধ্যাপক আইসেনস্টাইন 'আলেকজাণ্ডার নেভস্কী'কে চিত্ররূপায়িত ক'রে তুলতে অগ্রসর হ'য়েছেন। সংবাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে হাজার হাজার লোক তাঁদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপককে চিঠি লিখলেন। এই সহযোগিতার ভিতর চলচ্চিত্রে সুযোগ পাবার কোন অনুনয়-বিনয় ছিল না—বা অন্য কোন স্বার্থও জড়িত ছিল না—তাদের সহযোগিতার মূলে ছিল চিত্রখানিকে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য আংগিক দিক থেকে নিখুঁত রূপায়ণের সদিচ্ছা। তাই এঁরা সবাই বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য ও 'আলেকজাণ্ডার নেভস্কী'র সংগে জড়িত বিভিন্ন ঘটনার কথা অধ্যাপককে জানিয়ে দিলেন। এঁদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে এগুলির সংগে জড়িত ছিলেন। শুধু আইসেনস্টাইনই নন—অন্যান্য প্রযোজক ও পরিচালকেরাও এমনি সহযোগিতা লাভ ক'রে থাকেন রাশিয়ার জনসাধারণের কাছ থেকে। প্রযোজক, পরিচালক ছাড়াও শিল্পীরাও জনসাধারণের কাছ থেকে নানান উপদেশপূর্ণ চিঠিপত্রাদি পেয়ে থাকেন। প্রত্যেক দেশেই অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাঁদের "Fan" বা বাতিকগ্রস্ত গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে নানান ধরণের চিঠিপত্র ও উপহার পেয়ে থাকেন। মার্কিণ দেশে এই বাতিক সবচেয়ে উগ্র রূপ নিয়েছে। সেখানে বাতিকগ্রস্ত গুণগ্রাহীদের জ্বালায় প্রকাশ্য স্থানে কোন শিল্পীদের উপস্থিতি এক বিপদজনক অবস্থা। রাস্তা দিয়ে দ্রুত বেগে কোন শিল্পী মটর হাঁকিয়ে গেলেও—আরও দ্রুততর বেগে মটর নিয়ে তাঁর পিছু ধাওয়া ক'রে দু'টো কথা বলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা অনেকের মাঝেই দেখা যায়। 'গ্রিটা গার্বো' কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন—প্রচলিত আছে, তিনি যে পুকুরে স্নান করতেন—গার্বোর পরিচারিকা সে জল উচ্চ মূল্যে তাঁর গুণগ্রাহীদের কাছে বিক্রী ক'রে বেশ মোটা অর্থ কামিয়ে নিয়েছিল। মার্কিণ দেশের শিল্পীরা প্রতিদিন তাঁদের গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে যে পরিমাণ পত্রাদি পেয়ে থাকেন—যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিও নাকি তত সংখ্যক চিঠি পান না। সুদূর মার্কিণ দেশীয় এই বাতিক আমাদের দেশের কতকাংশ দর্শকদেরও সংক্রামিত করে তুলেছে। এঁরা বাবা, কাকা, মামা, দাদা, মা, দিদি, মাসীমা প্রভৃতি সম্পর্কে শিল্পীদের সম্বোধন করে পত্রাদি লিখে নিজেদের
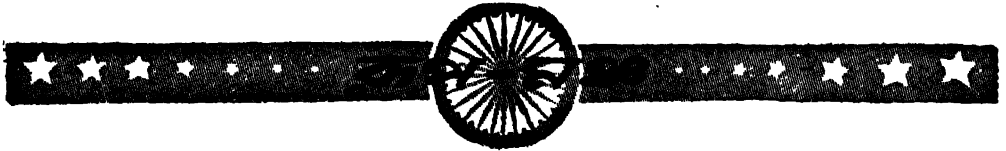
অন্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করে থাকেন। একজন নগণ্য চলচ্চিত্র সাংবাদিক হিসাবে বর্তমান প্রবন্ধের লেখকও এরূপ সম্বোধন থেকে বাদ পড়েন না এবং এঁদের ঝুক্কিও খানিকটা বহন করতে হয় বৈকী! বাতিকগ্রস্ত গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে যে সব চিঠিপত্রাদি 'রূপ-মঞ্চ' কার্যালয়ে আসে, তার বহু নমুনা রক্ষিত আছে এবং চিত্র-জগতের বহু শিল্পী ও বন্ধুরা এগুলি প্রায়ই দেখে যেয়ে থাকেন। সোভিয়েট রাশিয়ার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা তাদের গুণগ্রাহী বা জন-সমাজের কাছ থেকে যে ধরণের চিঠি পত্রাদি পেয়ে থাকেন—তার ধরণই আলাদা। যেমন মনে করুন, কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী কোন একটী গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য নির্বাচিত বা নির্বাচিতা হলেন। অমনি তিনি জনসাধারণের কাছ থেকে ভুরি ভুরি উপদেশপূর্ণ চিঠি পেতে থাকেন, কী করে উক্ত চরিত্রটিকে নিখুঁত রূপায়ণে সার্থক করে তুলতে পারবেন—কোন ডাক্তারের ভূমিকা যদি কাউকে রূপায়িত করে তুলতে হয়, তিনি ডাক্তারদের কাছ থেকে নানান পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়ে থাকেন। আবার যিনি নার্সের ভূমিকাভিনয় করেন নার্সদের কাছ থেকেও অনুরূপ কম সাহায্য তিনি পান না। সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতমা প্রখ্যাতা অভিনেত্রী লিউবা অরলোভা যখন 'ভলগা ভলগা' চিত্রে একটী মিল-মেয়ের চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্বাচিতা হলেন—তখন বিভিন্ন রিপাবলিক থেকে বিভিন্ন মিল-মেয়েরা নানান উপদেশ দিয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। এত গেল কোন চিত্র নির্মাণে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা। ছবি নির্মিত হ'য়ে যখন মুক্তি লাভ করে,
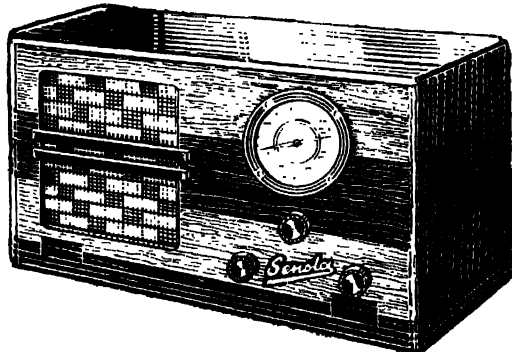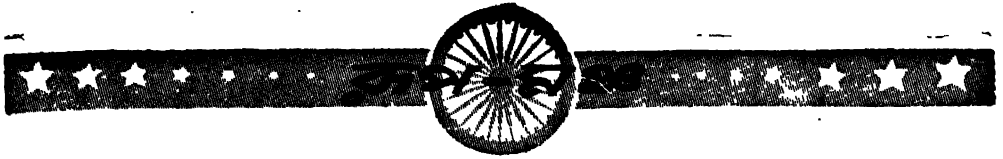
তার দুর্বলতা ধরা পড়লে জনসাধারণ যেমনি তীব্র সমালোচনা করেন, তেমনি সাফল্যে অভিনন্দন পাঠিয়ে কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিতও করে তোলেন।

সোভিয়েট গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সংগে সংগেই সোভিয়েট সরকার চিত্র-শিল্পটিকে নিখুঁত রূপে গড়ে তুলতে বিন্দুমাত্র গাফিলতির পরিচয় দেন নি। প্রতিটি পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ স্থান লাভ করেছে। চলচ্চিত্র শিল্পের যান্ত্রিক ও শিল্পমানের উন্নতির জন্য সোভিয়েট সরকারকে প্রথম থেকেই আত্মনিয়োগ করতে দেখি। শুধু তাই নয়, চিত্র নির্মিত হবার পর সমস্ত ইউনিয়নের জনসাধারণ যাতে সে চিত্র দ্রুত দেখবার সুযোগ পান, সেজন্যও সোভিয়েট সরকার বিবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। প্রয়োজনবোধে বিমান যোগেও বিভিন্ন রিপাবলিকে ছবি ও প্রদর্শক যন্ত্র পাঠানো হ'য়ে থাকে। সাইবেরিয়ার বনভূমি—এলপাইন অধ্যুষিত ককেসাস, তার্কমেনিয়া, তাজিকিস্তান ও কাজাখাস্তানের সুদূর গ্রামাঞ্চলের জন্যও এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। যেসব স্থানে স্থায়ী চিত্রগৃহ নেই, সেসব স্থানে বহন-যোগ্য প্রদর্শক যন্ত্র পাঠানো হ'য়ে থাকে।

পূর্বেই বলেছি, সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয় করণ করা হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে। সেই থেকে অন্যান্য আরো শিল্প ও ব্যবসায়ের মত চলচ্চিত্র শিল্পটিও সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েট সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পের কাঠামো সম্পর্কে দু'চার কথা বলবো।

(১) **রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব:** সমস্ত চিত্র শিল্পটি রাষ্ট্রের অন্যতম সর্বোচ্চ শক্তি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান 'দি কমিটি অন আর্টস' (The Committee on Arts)-এর অধীনে। 'অল ইউনিয়ন কমিটি ফর সিনেমা এ্যাফেয়ার্স'ই চলচ্চিত্র বিভাগটি তদারক করেন। এবং এর বর্তমান চেয়ারম্যান হ'লেন আইভ্যান বোলসাকোভ (Ivan Bolshakov)।

(২) **প্রয়োগশালা:** প্রত্যেকটি রিপাবলিকে পৃথক পৃথক আধুনিক প্রয়োগশালা বর্তমান। এর ভিতর মস্কোর 'দি মস্কো ষ্টুডিও'টি সর্ববৃহৎ ও সর্বাধিক কর্মমুখর। 'দি মস্কো ষ্টুডিও'তে পৃথক চারটি বৃহৎ বিভাগ রয়েছে। (ক) একটি ইউনিটে কেবলমাত্র পূর্ণাংগ 'ফেচার' ফিল্ম তৈরী হয়। (খ) শিশু চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য রয়েছে একটী পৃথক বিভাগ। কেবলমাত্র ছোটদের উপযোগী চিত্রই এই বিভাগে প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। (গ) সংবাদ চিত্র নির্মাণের জন্য রয়েছে পৃথক আর একটী বিভাগ। (ঘ) কেবলমাত্র কার্টুন চিত্র নির্মিত হ'য়ে থাকে চতুর্থ বিভাগটিতে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে মস্কো স্টুডিও ১৫ খানা পূর্ণাংগ চিত্র নির্মাণ করে—১৯৩১-৩৫-এ নির্মিত হয়েছিল মাত্র চারখানা করে। আর এই প্রযোজনা বিভাগে ৩,০০০এরও বেশী কর্মী নিযুক্ত ছিলেন। সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের মূল সংস্কার সাধন করা হয় ১৯৩৫ খৃঃ-এ। এই পরিকল্পনায় মুখর-চিত্র, নতুন যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থান পায়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে পাঁচটী ফ্যাকটরি ছিল—সেখানে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হতো—ছয়টি ছিল কেমিক্যাল ফ্যাকটরি—এবং আটটি ছিল রসায়নাগার, যেখানে কপি মুদ্রিত হতো। তাছাড়া নতুন প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য ছিল একটি বিলডিং ট্রাষ্ট। দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় মস্কো ও লেনিনগ্রাদে নতুন নতুন প্রয়োগশালা নির্মিত হয় এবং ১২০ খানা পূর্ণাংগ শিক্ষামূলক চিত্র বিশেষভাবে তৈরী করা হয়—সংবাদ চিত্র প্রযোজনায়ও এই সময় যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়। 'দি ষ্টেট ট্রাষ্ট সোইউজকিনোকরোনিকি' (The State Trust Sayuzkinokhroniki) চারটি বৃহৎ বৃহৎ ষ্টুডিও নিয়ে গঠিত। এই চারটি মস্কো, লেনিনগ্রাদ, খারকোভ এবং রোসতোভে অবস্থিত। তাছাড়া আরো তেরটি ষ্টুডিও বিভিন্ন রিপাব্লিক ও প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনায় সংবাদ-চিত্রের জন্য কিয়েভ, খারাকোভস্ক এবং আলমা আতাতেও নতুন স্টুডিও গড়ে উঠে। ১৯৩৫ খৃঃ-এ সংবাদ চিত্রের সংখ্যা যেখানে ছিল ৬০০, ১৯৩৭ খৃঃ-এ তার সংখ্যা হাজারের উপরে যেয়ে দাঁড়ায়।

(৩) **ষ্টক ও এ্যাপারেটাস:** পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হবার পূর্বে সোভিয়েট সরকার বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানী করতেন। প্রথম পঞ্চম বার্ষিকীতে
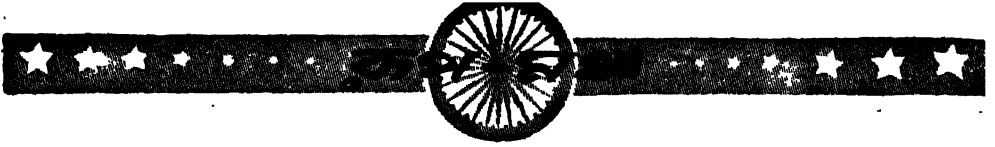
এই কাঁচামাল উৎপাদনের জন্য দুটী ষ্টক ষ্টুডিও নির্মিত হয়। ১৯৩৫ খৃঃ-এ এই ষ্টুডিওতে ১০০ মিলিয়ান মিটার কাঁচামাল এক বৎসরে তৈরী হয়। ১৯৩৭ খৃঃ-এ নতুন আর একটী এরূপ ষ্টুডিও নির্মিত হয় কাজান-এ এবং উৎপন্নের পরিমাণ ২০০ মিলিয়ান মিটারে যেয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা ৩২০ মিলিয়ান মিটারে পৌঁছে। এবং এই বৎসর কাঁচা ফিল্ম উৎপাদনে পৃথিবীর বাজারে সোভিয়েট রাশিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করে। অর্থাৎ আমেরিকা ও জার্মাণীর পরই তার স্থান। নির্মিত ছবির মুদ্রণের জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টরী রয়েছে একথা পূর্বেই বলেছি। ১৯৩৬ খৃঃ-এ কাজান এবং পুসকিনোতে আরো দু'টী এরূপ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়।

এবং যুদ্ধের পূর্বে এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলির মুদ্রণ ক্ষমতা যেয়ে দাঁড়ায়ে ২৫০ মিলিয়ান মিটারে অর্থাৎ ১০০,০০০ পূর্ণাংগ দৈর্ঘ চিত্রে।

(৪) সিনেমা ফ্যাক্টরী ঃ সিনেমার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য লেনিনগ্রাদ, ওডেসা ও কুইভিসেভ-এ ইতিপূর্বে বৃহৎ কারখানা নির্মিত হ'য়েছিল। মস্কোতে আবার একটি বৃহৎ 'Experimental Factory Institute' নির্মাণ করা হ'লো যন্ত্রপাতিগুলি পরীক্ষা করবার জন্য এবং গবেষণা কার্য চালানোর জন্য। ১৯৩৫ খৃঃ-এ ৩০,০০০টি স্থায়ীও ভ্রাম্যমান প্রদর্শক যন্ত্র ছিল। এর ভিতর ১০,২০০টি বিভিন্ন সহরে এবং ১৯৮০০টি গ্রামাঞ্চলে নিয়োজিত ছিল। অবশ্য বিদ্যালয় ও রেড-আর্মিরগুলি এর ভিতর ধরা হয়নি। তৃতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনাতে ৫০,০০০ ষ্ট্যাণ্ডার্ড,৪০,০০০ সাব-ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রদর্শক যন্ত্র দেখতে পাই। এই প্রসংগে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যা উল্লেখ কচ্ছি। ১৯২৮—৩১০,০০০,০০০; ১৯৩৫ - ৬২৫,০০০,০০০; ১৯৩৬—৭১০,০০০,০০০; ১৯৩৯—৯৫০,০০০,০০০ এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যাকে ২,৭০০ মিলিয়ানে বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। অবশ্য যুদ্ধের দরুণ তা অনেকখানি ব্যাহত হ'য়ে পড়ে।

(৫) রঙীন চিত্র ঃ ১৯৩২ খৃঃ থেকে 'Soviet Cinema Research Institute' রঙীন চিত্র নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বপ্রথম রঙীন চিত্র হ'লো: 'Nightangle, Little Nightangle'. The road to life-এর প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক Nikolai Ekk-ই এই চিত্রখানি পরিচালনা করেন। এই চিত্রখানিতে দুইটি রং ব্যবহার করা হয়। The Little Hunchbacked Horse-ও এই প্রসংগে উল্লেখ করতে হয়। এরপর তিনটি রং ব্যবহার করা হয় আইভ্যান নিকুলিন পরিচালিত Russian Sailor চিত্রে। রঙীন চিত্রের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়া অনেকখানি সাফল্যের পথে এগিয়ে গেছে।

(৬) শিক্ষা ঃ চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা দেবার জন্য সোভিয়েট সরকারের বিন্দুমাত্র গাফিলতি পরিলক্ষিত হয় না। মস্কো এবং লেনিনগ্রাদের 'Higher Institutes of the Cinema' প্রতি বছরে চিত্রশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের উপযোগী ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শিক্ষা গ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের কোন ব্যয়ভারই বহন করতে হয় না—অধিকন্তু নিজেদের ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত মাসোহারা পেয়ে থাকেন সরকার থেকে, যাতে আর্থিক কৃচ্ছতা তাঁদের শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধক হ'য়ে না দাঁড়ায়।

(৭) সেন্সারসিপ ঃ কোন ছবি নির্মিত হ'য়ে পরিবেশিত হবার পূর্বে একটি বিশেষ কমিশনকে দেখানো হয়। ছবিখানি দেখে উক্ত কমিশনের সভ্যরা বিচার ক'রে দেখেন, চিত্রখানিতে সোভিয়েট সাধারণতন্ত্রের নিয়মপদ্ধতির বিরুদ্ধে কোন কিছু স্থান পেয়েছে কিনা অথবা জনসাধারণের নীতিবিরুদ্ধ কিছু আছে কিনা? [(1) Does it transgress the constitution of the U.S.S.R.? (2) Does it offend public morality?] এই 'কমিশন' ইচ্ছা করলে ছবিটির যে কোন অংশ অথবা সম্পূর্ণভাবেই চিত্রটিকে নাকচ ক'রে দিতে পারেন। আবার কোন্ অংশ কী ভাবে সংযোগ ক'রতে হবে, সে বিষয়েও পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ক্রেমলিনের দায়িত্বশীল সরকারী কর্মচারাদেরও ছবি দেখানো হ'য়ে থাকে। তারপর শিল্পী, কর্মী ও বিশেষজ্ঞ
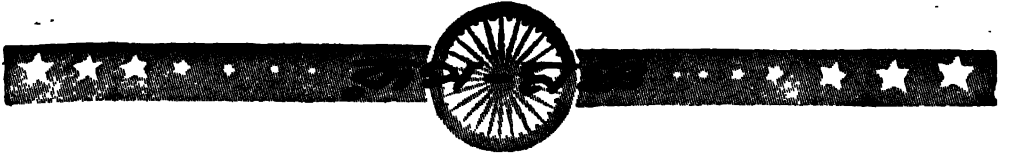
এবং ফিল্ম্-ক্লাবের সভ্যদের ছবিখানি দেখানো হয়। তাঁরা যান্ত্রিক ও কলাকুশলতার দিক থেকে কোন ত্রুটি থাকলে সেগুলি শুধরে নিতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তারপর চিত্রখানি যায় Distribution Trust এর হাতে। ছবির পরিবেশন এবং প্রদর্শন এঁদের হাতে। কোথায় কবে কী ভাবে ছবিখানিকে দেখাতে হবে, সে ব্যবস্থাও এঁরাই ক'রে থাকেন কত সংখ্যক ছবি মুদ্রণের প্রয়োজন—এঁরাই তা' স্থির ক'রে copy factory-কে জানিয়ে দেন। এক সংগে সাধারণতঃ ১০০ থেকে ২৭০ খানি অবধি একখানা ছবির মুদ্রণ করা হয়ে থাকে। মস্কোর পাঁচটি চিত্রগৃহ কেবল 'কমিটি অন আর্টস'এর প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে—বাকী সবই এই Distribution Trust-এর অধীনে।

(৮) **প্রদর্শনী**ঃ দিনে দশ থেকে বারোটি অবধি প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ ক'রে বিশ্রামের দিনে অর্থাৎ মাসের ১লা, ৬ই, ১২ই, ১৮ই ও ২৪শে অধিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। প্রদর্শনীর পূর্বে প্রেক্ষাগৃহে জাজব্যাণ্ড অথবা বালালাইকা ব্যাণ্ড অথবা অর্কেষ্ট্রাও বাজানো হ'য়ে থাকে। এবং এক একটি প্রদর্শনীর মাঝে ২০ থেকে ৩০ মিনিট বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে।

(৯) **প্রচার-কার্য**ঃ কোন নতুন ছবি মুক্তিলাভ করবার সময় বিশেষ কিছু প্রচার করা হয় না সেই চিত্র সম্পর্কে। কেবলমাত্র সংবাদপত্র ও অন্যান্য পত্রিকা মারফৎ ছবিটির ঘোষণা করা হয়। তবে চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট করবার জন্য নানাভাবে প্রচার কার্য চালানো হয়। এজন্য বহু প্রচারমূলক চিত্রও গ্রহণ করা হয়।

(১০) **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**ঃ যুদ্ধের দরুণ অন্যান্য শিল্প-কলার মতই সোভিয়েট রাশিয়ার চলচ্চিত্র-শিল্পেরও অগ্রগতি অনেকখানি রুদ্ধ হ'য়েছিল। যুদ্ধের টাল সামলে নিয়ে সোভিয়েট সরকার আবার পূর্ণোদ্যমে এর সংস্কারের দিকে আত্মনিয়োগ করেছেন। এবং ১০৪৫ খৃঃ এ যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হ'য়েছিল, ইতিমধ্যেই তাতে অনেকটা কৃতকার্যতা লাভ করেছেন। ১৯৪৫ খৃঃ থেকেই ষ্টুডিওগুলি আবার কর্মমুখর হ'য়ে ওঠে। আলেকজাণ্ডার টুপলার, মার্ক ডোনস্কোই, গ্রিগরী কোজিণ্টসেভ, লিওনিড ট্রাউবার্গ, লিওনিড্ লুকোভ, প্যাভেল নিলিন, বরিস গোরবাটোভ, ভ্যাসিলিয়েভ ব্রাদার্স, জিওর্জি এম্‌ডিড্যানিস, সিকো ভোলিভজে, মিখেইল রোম, সার্জি আইসেনস্‌টেইন, সার্জি উটকোভিচ, সার্জি বোরোডিন, ইভ্‌সেভোলোভ্ পুড্‌ভকিন, ইগোর লুকোভস্কী,এ, ইসকানডেরোভ, এম, মিকেইয়েলোভ্, মোখাইল চিয়াওরেলি, পিটার প্যাভল্যাস্কো প্রভৃতি চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ও মনীষীবৃন্দ বহু উল্লেখযোগ্য ছবি নির্মাণ করে সোভিয়েট চলচ্চিত্রের মান অনেকখানি উন্নত করেছেন।

সোভিয়েট রাশিয়ায় চলচ্চিত্র শিল্প আজ বিশ্বের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায়, শিক্ষার কাজে, সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের এতখানি বিকাশ পৃথিবীর আর কোন দেশেই সম্ভব হয়নি। এর মূলে রয়েছে যেমনি সোভিয়েট সরকারের দূরদর্শিতা ও অকুণ্ঠ প্রচেষ্টা, তেমনি জনসাধারণের প্রচুর উৎসাহ ও প্রেরণা। শুধু চলচ্চিত্রই যে রাষ্ট্র এবং জনসমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে তা নয়—সেখানে চলচ্চিত্র-সেবীরাও কম সমাদৃত বা সম্মানিত নন। সুপ্রিম সোভিয়েটে চলচ্চিত্র সেবীরা সম্মানিত আসন পেয়ে থাকেন। চেরকাসোভ,চিয়াওরেলী,ডোভজেনকো,পুডভকিন, কোজিনট্‌সেভ্, ট্রাউবার্গ, আলেকজাণ্ড্রোভ, অরলোভা, আইসেনষ্টাইন প্রভৃতি আরো বহু প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞরা রাষ্ট্রের সুউচ্চ সম্মানে ভূষিত হ'য়েছেন।

সামান্য একটি প্রবন্ধে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্পের সব দিক আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমাদের দর্শকসমাজ, জাতীয় সরকার ও রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই মোটামুটি একটি ফিরিস্তি দেওয়া গেল। আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ আজ আর ধূমায়িত নয়—বহ্নিমান হ'য়ে উঠেছে। আশা করি জাতীয় সরকার চলচ্চিত্র শিল্পটিকে জাতীয়করণ করে তার সুষ্ঠু রূপ বিন্যাসে দৃষ্টি দিয়ে—চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ করে তাকে জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির কাজে লাগাবেন।

শ্রীমতী সুনন্দা দেবী

এসোসিয়েটেড পিকচার্সের 'অগ্রদূত' পরিচালিত আগামী বাংলা চিত্র 'সমাপিকা'-র নায়িকার দুইটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, কৃতি ক্যামেরাম্যান বিভূতি লাহা 'রূপ-মঞ্চ' পত্রিকার জন্য বিশেষভাবে একটি নূতন পদ্ধতিতে গ্রহণ করেছেন।

শ্রীমতী রেণুকা রায়ঃ শীঘ্রই বোম্বাইতে হিন্দি চিত্রে অভিনয় করতে যাবেন বলে প্রকাশ। বর্তমান চিত্রটি এরূপ একটী চিত্রের জন্যই গৃহীত।

আমেরিকার নাট্যমঞ্চ

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

★

পাশ্চাত্য নাট্যকলা ও রঙ্গমঞ্চ বিচারের একসময় আমেরিকার যুক্ত রাজ্য সম্বন্ধে কেউ বিশেষ প্রশংসাবাদ করেনি। কারণ, প্রথমতঃ নাট্য-সাহিত্যের দিক হতে আমেরিকার দান বিশেষ রোমাঞ্চকর নয়—মঞ্চ-সৃষ্টির দিক হতেও এ দেশ বিশেষ মৌলিকতা দাবী করতে পারেনি। অথচ ইদানীং আমেরিকাকে বাদ দিয়ে কী তুচ্ছ করে' এ সম্বন্ধে কোন গবেষণা বা আলোচনা সম্ভব হয় না। সকল রাস্তাই দিল্লী গিয়ে পৌঁছে--ভারতবর্ষে এ রকম একটি উক্তি আছে। পশ্চাত্য জগতেও সকল আন্দোলনই আমেরিকা গিয়ে পৌঁছে। ওখানকার সমর্থন শুধু নয়, আর্থিক পরিপুষ্টির সাহায্যে ইউরোপের কলা জগৎ বার বার সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রসংগত বলা যেতে পারে, বিখ্যাত অভিনেত্রী Sarah Bernhardt আমেরিকাতেই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন এবং সে অর্থে তিনি প্যারী নগরীতে একটি থিয়েটার গৃহ নির্মাণ করেন—যাতে তিনি নিজের কৃতিত্ব ও প্রতিভা দেখাবার প্রচুর সুযোগ পান। বস্তুতঃ বহু শিল্পী ও অভিনেতা আমেরিকায় ধনপুষ্ট হয়ে নাট্যমঞ্চের উন্নতি ও গৌরবের জন্য প্রচুর অর্থ দান করে গেছে। কাজেই আমেরিকার নাট্যকলা ও নাট্য-মঞ্চের প্রগতির একটা বিশেষ ও সর্বাংগীন আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

গোড়াতেই বলা দরকার, নাট্য-সাহিত্য বা নাটক রচনা বিষয়ে ইউরোপের বহু পশ্চাতে আমেরিকার স্থান। উচ্চশ্রেণীর সকল নাটকের আদিম জন্মস্থান হচ্ছে ইউরোপ। আয়ার্লেণ্ড (Ireland) নূতন আইরিশ সভ্যতার যে একটা সম্মুখীন হয়, তার অগ্রণী ছিল Yeats, Syuge প্রভৃতি কবিগণ। এঁদের নাট্যকলার গ্রাম্য ঐশ্বর্য ও লৌকিক অলংকরণ অনেকের চিত্তহরণ করেছিল। একসময় আইরিশ নাট্যকার Syugeকে কেউ কেউ সেকস্‌পীয়রের সংগেও তুলনা করেছে। নাট্যজগতে রুষিয়ার দানও অসামান্য। টলষ্টয় ও গর্কির রচনাকে নাট্যরূপ দিয়ে নানা অভিনয় হয়েছে সমগ্র জগতে। তাছাড়া অতি আধুনিক যুগে Andreyev এর নাটকগুলি বাস্তবতার নিষ্ঠুর প্রতিফলনে সমগ্র ইউরোপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, এণ্ড্রেভ মিতরলিঙ্কের মত শুধু বাইরের গতি ও কর্মব্যস্ততার উপর নাট্যকলার ঐশ্বর্য নিহিত করতে চাননি। V. V. Brusyanin বলেন: "In this respect Andreyev is closely aken to Maeterlinck in whose plays dramatic collisions are not marked by enternal actions, but the problems that characterise the life of the soul with its premonetions, yearnings and searchings are brought in concrete forms before the footlight. এণ্ড্রেভের মনস্তাত্বিক নাটক Black Maskers ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যে অপূর্ব দান। Scandinaviaর ইবসেনের নাম সারা ইউরোপে এক সময় এক কল্লোল উত্থাপন করে। Strindberg এর নামও এক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে উল্লেখ করতে হয়। সমগ্র ইউরোপই নাট্যসাহিত্যের বিচিত্র উপচারে নাট্যমঞ্চকে ঐশ্বর্যপূর্ণ করে।

জার্মানীর Hauptmann এর নাম বিশ্ববিদিত। Suderman ও Wedekind এর নাট্যকলা রোমাঞ্চকর বাস্তবতা ও রহস্যে ওতঃপ্রোত। ফরাসীর Brieun এর নাটক একটা নূতন দিকদর্শনের সূচনা করে। মিতরলিঙ্ক বেলজিয়ান হলেও তাঁর নাটক ফরাসী সমাজে প্রচলিত ও অভিনন্দিত হয়। তিনি যাকে বলে 'Static' নাটক, তারই প্রবর্তক। উত্তেজনা ও গতিভংগীর বাহুল্যের পরিবর্তে আত্মার স্থিরধীরভাবের দ্যোতক হচ্ছে এ শ্রেণীর নাটক। ইতালীর D. Annzid হবে সে দেশের চরম প্রতিনিধি। স্পেনে Echegaray খ্যাতিলাভ করেছে। ইংলণ্ডের Pinero, Galsworthy ও বার্ণাড শ' প্রচুর আত্মপ্রচার করেছে। অথচ এই বিরাট আয়োজনের ভিতর আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বিশেষ দান নেই। একমাত্র O' Neillই এক্ষেত্রে আমেরিকার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি। বস্তুতঃ আমেরিকা মুখ্যতঃ ইউরোপকে অনুকরণ করেই নিজেদের নাটক ও মঞ্চকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। একজন

বিশেষজ্ঞ বলেছেন : -"The drama has in the main continued the servile imitation of European models." আমেরিকার নাট্যকারদের ভিতর অন্য কয়েক জনের নাম করা যেতে পারে—যথা Brouson, Howard, Thomas প্রভৃতি। Hot আমেরিকার জীবনকে নাট্যরূপ দিতে অনেকটা সফল হ'য়েছে বলতে হয়। এ সব নাট্যকার ছাড়া আরও প্রশংসার যোগ্য যেসব নাট্যকার আছেন, তাঁদের ভিতর Thomas, Sheldon, Walter ও Moody নাম করা চলে।

সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হলেও যুক্তরাষ্ট্রের কুসংস্কার ও প্রগতিবিরুদ্ধ মনোবৃত্তিও সামান্য ছিল না। নানা বাধা ও প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়ে এখানকার বিরাট ও বিপুল নাট্যসম্ভার ও প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতের ইতিহাস একদিক হতে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। অথচ সম্প্রতি তা যে আকার ধারণ করেছে, তাতে সমগ্র জগতের বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছে। Newyork ইদানীং নাট্য ও মঞ্চ ব্যাপারে আমেরিকার সভ্যতার কেন্দ্র। এখানে Great Whitewayতে দু'লক্ষ লোক নাট্যাভিনয় দেখে এবং প্রতিদিন দশলক্ষ লোক সিনেমা দেখে। ১৯৩০ সালে নিউইয়র্কের জনসংখ্যা ছিল ৬,৯৩০,৪৪৬। এ বিরাট জনসমুদ্র কর্তৃক অভ্যর্থিত ও নন্দিত হয়ে আমেরিকার নাট্যচর্চা ধন্য হয়। ইউরোপের কোথাও এরকম কিছু কেউ কল্পনাও করতে পারেনা।

আমেরিকায় ষাট বছর আগে থিয়েটার দেখাকে একটা পাপ মনে করা হ'ত। অনেকে একথা শুনে বিস্মিত হবেন, কিন্তু যা' বাস্তব, তা' উপন্যাস হ'তেও অনেক সময় অধিক আশ্চর্য ব্যাপার। একজন সমালোচক বলেছেন : "The lowest, the most depraved and the ungodly made the audience"। সে গেছে এক যুগ। ভিক্টোরিয়া যুগের অতিরিক্ত শ্লীলতাবোধ ও puritanism বা পবিত্রতার হিড়িক সেকালে পাদরীদের উৎসাহে সমর্থিত হয়ে দেশকে একেবারে আমোদ প্রমোদের বিরোধী করে। লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে—ইউরোপ হ'তে বহুদূরে অবস্থিত আমেরিকাতেও এ বাতিক ভাল রকমেই প্রকাশ পায়। আমেরিকার বিপ্লবের সময় কংগ্রেস আইন পাশ করে থিয়েটারে অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন এ বিশ্বাস সকলের হয় যে, ঈশ্বর সমগ্র দেশের প্রতি অভিনয়রূপ পাপাচার দেখে বিমুখ হবেন, কাজেই তা বন্ধ করা দরকার। একজন প্রসিদ্ধ লেখক বলেন : "During the revolutionary period theatres were closed by an act of Congress—for ungodly amusement if stopped would please God."

এদেশেও থিয়েটারকে পাপের ব্যাপার বলে মনে করা হয় এবং নীতিবাদীরা কখনও থিয়েটারে যাওয়া একসময় অনুমোদন করেননি। অভিভাবকেরা ছেলেদের ও যুবকদের থিয়েটারে যাওয়া নিষিদ্ধ করে। এমন কি কিছুকাল আগে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর নিজের একখানি নাটকের অভিনয় দেখতে যান ষ্টার থিয়েটারে—তখন স্থলবিশেষ হ'তে বিশেষ প্রতিবাদ ওঠে। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আহূত হয়ে বর্তমান লেখকও তাঁর সংগে অভিনয় দেখতে যান। অতিরিক্ত রুচিবাগীশ যুগের ইতিহাস আমেরিকায় নানাভাবে কাজ করেছে। ক্রমশঃ তা আলোচিত হবে: গোড়াতে একটু আদিম ইতিহাসের কথা লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রের অভিনয়ের কোন সুস্পষ্ট ইতিহাসই নেই। ১৭৪৯ সালে এডিসনের Cato নাটক অভিনীত হয় ফিলেডেলফিয়াতে (Philadelphia)। ফলে সকল অভিনেতাদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং সতর্ক করে বলে দেওয়া হয়, আর যেন কোন অভিনয় না করে। এই পার্টিটি পরে চলে যায় Newyorkএ এবং সে স্থানে Rip Van Dam নামক এক নাগরিকের গৃহের একটি প্রকোষ্ঠে প্রায় একবৎসর অভিনয় চালায় (মার্চ ১৭৫০—জুলাই ১৭৫১)। এদের প্রথম অভিনীত নাটক ছিল Richard III। তখনকার বিখ্যাত অভিনেতা Kean, Richardএর পার্ট অভিনয় করে। এ জায়গায় পনেরটি নাটক ও নয়টি প্রহসন (farce) অভিনীত হয়। এ হ'ল আমেরিকার নাট্যাভিনয়ের সূত্রপাত।

এরপর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে Annapolis এ "Virginean

Comedians" নামক একটি দল অভিনয় সুরু করে। Kean এদলে যোগদান করে। এ বছর লণ্ডন হ'তে একটা comedy কোম্পানী আসে লুইস হ্যালামের অধীনে। এরা "Merchant of Venice" এবং "Othello" অভিনয় করে আমেরিকাবাসীদের মুগ্ধ করে। নব্য অভিনেতা Malone সাইলক (Shylock) ও লিয়ারের (Lear) পার্ট ভূমিকাভিনয় করে এবং Rigby রিচার্ড ও রোমিওর ভূমিকায় দর্শকদের চিত্তবিনোদন করে। নিউ-ইয়র্ক হ'তে এই অভিনেতার দল ফিলেডেলফিয়াতে যায় এবং সেখানে পঁচিশটি অভিনয় করে সকলের অনুমোদন ও প্রশংসা লাভ করে।

আমেরিকার ইতিহাসে এসব অভিনয় হ'ল নাট্যকলা চর্চার ভূমিকার মত। ইউরোপ হ'তে সমাগত নানা জাতীয় লোকের সম্মিলনে আমেরিকার নব্য জাতি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। এরা সকলেই এ যুগে সৌন্দর্যভোগে নিজেদের একটা রসগত ঐক্য অনুভব করে। নানা বাধার ভিতর দিয়ে এসব থিয়েটারের দলগুলিকে অগ্রসর হ'তে হয়। নিষ্কণ্টক পথ এদের সামনে কখনও উপস্থিত হয়নি। বস্তুতঃ সে যুগে ইউরোপ হ'তে বহু পশ্চাৎপদ ছিল আমেরিকার যুক্তরাজ্য।

লুইস হ্যালামের নাম আমেরিকার নাট্যকলার ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। হ্যালামের (Hallam) মৃত্যুর পর David Douglas এই অভিনেতার স্ত্রীকে বিবাহ করে' এক নূতন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে। সেখানে এই মহিলা একজন প্রধান অভিনেত্রী হন। Douglas নিউ ইয়র্ক ও ফিলেডেলফিয়াতে থিয়েটার চালায় ও এ বিষয়ে গভর্ণর Dennyর অনুমতি লাভ করে। তবুও পথ কণ্টকহীন হয়নি। ১৭৬০ সালের ১লা জানুয়ারী, এ প্রদেশে একটা আইন প্রবর্তিত করে থিয়েটার করা নিষিদ্ধ হয়। ডগলাস তারপর চলে যায় Annapolis—Providence ও New post-এ। নিউইয়র্কে আর একটি থিয়েটার পার্টি তৈরী করে অভিনয় আরম্ভ করেন ১৭৬১—'৬২ সালে।

১৭৬৫।৬৬ সালে নিউইয়র্কে একটা আমেরিকার গঠিত কোম্পানী চলতে থাকে এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও চলে comedians দের অভিনয়। প্রশ্ন হবে, এসব প্রাচীন অভিনয় কলার আদর্শ কি ছিল? সেকালে ইউরোপে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল একটা প্রথা—তা ক্রমশঃ তারকা প্রথানামে (star-system) খ্যাতিলাভ করেছে। ইদানীং ইউরোপে দু'রকমের অভিনয়কলার আদর্শ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। একটিতে (star-system) নায়ক ও নায়িকাকে বাড়িয়ে তোলা হয় এবং অন্যান্য সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নিম্নে স্থান দেওয়া হয়। যাতে প্রধান নায়কের অভিনয় প্রাধান্য লাভ করে সেজন্য মঞ্চের উপর যা কিছু অভিনয় হবে, সব কিছুই তাকে ফুটিয়ে তুলতে ও তার মহিমা বাড়াবার দিকে সকলের বিশেষ সাধনা হয়। নায়ক Sir Beerbhoom Tree যখন ষ্টেজে আসবে বিশেষ কোন ভূমিকা নিয়ে, তখন চারিদিকে করতালি দেওয়া হবে অন্যান্য সকল অভিনেতারা তার নিকট হয়ে যাবে খর্ব। সকলে মিলে তাঁকে উপরে তুলতে পারলেই তাদের কর্তব্য শেষ হল। একে pyramidal system ও বলা হয়। Pyramid-এ যেমন সকল অংশ ও উপকরণ উপরিস্থিত সমুচ্চতম একটা বিন্দুর প্রতিষ্ঠার জন্য কল্পিত—ওই একটি মাত্র বিন্দুকে মাথায় নিয়ে যেমন সমগ্র রচনাটিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, এখানেও তেমনি প্রধান অভিনেতাকে মাথায় করে সকলে নিজের প্রতিষ্ঠা খোঁজে। নায়ক মঞ্চের উপর এলে আর সকলে চুপ ও নিস্পন্দ হয়ে যায়। বাংলা দেশেও এই star system চলে ইংলণ্ডের অনুকরণে। অমর দত্ত, গিরীশ ঘোষ প্রভৃতি এই ধারাই এখানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

অপরদিকে ইউরোপে ইংলণ্ড ছাড়া অন্যত্র star-system চলে না। সেখানে প্রত্যেক অভিনেতাই স্বপ্রধান। প্রত্যেকেই স্বাধীন ও সমান মর্যাদায় অভিনয় করে। মুটের ভূমিকাই গ্রহণ করুক বা রাজার চরিত্রাভিনয়ই করুক, সকলেই সমান। সকলে মিলে একটা সমবায়গত সম্পূর্ণতা ও সমষ্টি সৃষ্টি করে। এজন্য কোন অভিনেতা মঞ্চের উপর এলে সেখানে করতালি দেওয়ার নিয়ম নেই—তাতে নাট্য-কলার ঐক্য ভংগ হয়ে যায়। নাট্যলক্ষ্মী সকল অভিনেতা-

দের রচিত শতদলের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে কাকেও বাড়িয়ে তোলা চলেনা। সকলে মিলে ঐক্যের সৃষ্টি করবে এর ভিতর কোন সামান্য অংশও যদি নির্ভুলভাবে অভিনীত না হয়, তবে নাটকের সামগ্রিকরূপের ছন্দ পতন হয়। এটা হলো চাক্রিক পদ্ধতি (circle)। নাটক সমাপ্তির পরই করতালি দেওয়ার রীতি এক্ষেত্রে প্রচলিত।

আমেরিকায় গোড়া হতেই ইংলণ্ডের অনুকরণে star-systemই প্রভাব বিস্তার করেছে। ১৭৯০ সালে Mrs. Whitlock বোষ্টন থিয়েটারে তারকা হিসেবে অভিনয় করেছিল বার রাত্তির। তিনি প্রায় দেড়হাজার টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে জর্জ ফ্রেডারিক কুকই সব চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন: "He was the first English actor of reputation who came to America to play the leading roles of tragedy and comedy"। কাজেই ইংরাজের হাতেই আমেরিকার হাতে খড়ি হয় এ বিষয়ে। কিন্তু এ প্রভাব বেশীদিন থাকেনা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই আদর্শ (star-system) চলতে থাকে। কুক Philadelphia, New york ও Boston এ অভিনয় করে' আমেরিকাকে চমৎকৃত করে। Star হিসেবে এই অভিনেতার আরো খবর নেওয়া প্রয়োজন। তিনি উন চল্লিশ রজনী অভিনয় করেন। এক রাত্রির অভিনয়ের জন্য তাঁর সব চেয়ে অধিক বেতন একবার দাঁড়িয়েছিল ৪০০০ টাকায় এবং সব চেয়ে কম যে রাত্রি পান, তা' ছিল ১২০০ টাকা। এ যুগে তারকার খ্যাতি ছিল Holman, Incledon ও Phillips এর উপার্জন। এদের পরবর্তী ছিল Wallacks, Henry ও James এর উপার্জন। এর পরের যুগের তারকাদের নাম হচ্ছে Booth ও Mcready [১৮২০-৩০] এবং Kemble ও C. Kean [১৮৩০-৪০]। Power ও Anderson এর স্থান এর পরে। সবচেয়ে প্রাধান্য অধিক ছিল E. Forrest ও C. Cushman এর। আমেরিকার বর্তমানের বিপুল নাট্যাভিনয়ের আয়োজন ও অগণিত নাট্যমঞ্চের আবির্ভাব হ'তে ধারণা করাই কঠিন হয় যে,উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এ আয়োজন কত সামান্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে মাত্র দশটি থিয়েটার ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮০০ হতে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত এর সংখ্যা দাঁড়ায় কুড়িটিতে—সব ক'টিই নিউ ইয়র্কে ছিল। এর ভিতর পার্ক রঙ্গমঞ্চই সব চেয়ে বিখ্যাত ছিল। ফিলেডেলফিয়ার Watnut street ও Arch থিয়েটার, বোষ্টনের Warrent, National ও Eagle থিয়েটার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিমে মাত্র পঞ্চাশটি থিয়েটার ছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এ যুগে এ বিষয়ের সামান্যতা দেখে বিস্ময় জন্মে। এতে প্রমাণিত হয়, সমগ্র জাতির জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীতে মোটেই হয় নি। আমেরিকা বহুকাল পরেই নাট্যমঞ্চের বিরাট রূপের সহিত পরিচিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ইউরোপীয় প্রভাবে যুক্তরাষ্ট্রে বালকোচিত star-system অনুষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে এখনও মান্ধাতার আমলের এই system ছাড়া আর কিছু কেউ ভাবতেই পারে না। এ সময় থিয়েটারগুলি আমেরিকায় stock কোম্পানীগুলিকে নিযুক্ত করতে থাকে stock কোম্পানীতে অভিনয়ের রীতিই স্বতন্ত্র। এ কোম্পানীতে অভিনয় কালে কোন কথা বলুক আর নাই বলুক, প্রত্যেককেই কিছু না কিছু কাজ অভিনয়ের দিক হতে করতে হবে। কেউ চুপচাপ ও দাঁড়িয়ে থাকে না। ষ্টক কোম্পানীতে প্রত্যেক অভিনেতাকেই নির্বাকভাবে চলাফেরা বা হস্তপদ সঞ্চালনের দ্বারা কিছু অভিনয় করতেই হয়। এটাই হ'ল বাস্তবতা—একজন কথা বলতে থাকলে আর সকলেই নিস্পন্দ ও বাক্যহীন হয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত থাকবে, এ রকম অবস্থা একটা অবাস্তব ব্যাপার। বর্তমান শতাব্দী এই আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছে সর্বত্র। কোন বিশেষজ্ঞ বলেন: "In a stock company any actor on the stage is acting all time wheather he has any speech or not, while in a star one, when the star is speaking, the players have awestruck immobility".

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যুক্তরাষ্ট্রে একটা নিঃশব্দ জাগরণ

হয়। সকলেই নাট্যকলা ও মঞ্চের প্রভাব যে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর তা' স্বীকার করতে সুরু করে। তখন ভ্রাম্যমান কোম্পানীর প্রাদুর্ভাব হয় প্রচুর। ফলে Maine হতে California পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে অসংখ্য থিয়েটারগৃহ নির্মিত হয়। সকলের আগ্রহ চলন্ত (travelling) কোম্পানীগুলি এসব গৃহে এসে যেন অভিনয় করে। এমন করে রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃতির সূত্রপাত হয় আমেরিকাতে। এ ক্ষেত্রে আরও কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়। অভিনেতারা কোন দল প্রতিষ্ঠা করে তার ভিতর অভিনয় কলার উৎকর্ষের ব্যবস্থা করতে পারে সন্দেহ নেই। কিন্তু আর্থিক সফলতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হ'তে পারলে অভিনয়কলার উন্নতিসাধন অসম্ভব। এই সন্ধিস্থলে স্বতন্ত্র ম্যানেজার নিযুক্ত করা প্রয়োজন হয়। এসব ম্যানেজার কোম্পানীর আর্থিক দিককে প্রচুর সফলতার দিকে নিয়ে গেছে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে। ওরা অভিনয়ের ধার ধারে না। কিন্তু যাতে করে দর্শকদের আনুকূল্য নানাদিক হ'তে অটুট থাকে, সেদিকে খরতর দৃষ্টি রাখে। ফলে আমেরিকার থিয়েটারগুলি প্রচুর লাভবান হয়েছে। Starদের ওরা গ্রহণ করে থিয়েটার চালায়। কর্মসূচী বিভিন্ন করে ম্যানেজারের একাড নিজেদের সিদ্ধি অটুট রেখেছে। অনেক দেশে ব্যবসার দিক হ'তে রঙ্গমঞ্চগুলির পরিচালনা হয়না বলে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বার বার নতুন কোম্পানীর সৃষ্টি হতে থাকে। আমেরিকাতে এরকম ব্যাপার অসম্ভব হয়েছে।

আমেরিকায় বিখ্যাত অভিনেতাদের আয়ের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হ'তে হয়। জগতের কোথাও অভিনেতারা এরকম আয় আশা করতে পারে না। এজন্য অনেক অভিনেতারা জনহিতকর বহু কাজ করে গেছে। আমেরিকার নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এসব কথা উল্লেখ করা অপরিহার্য। এ বিষয় নিয়ে আমেরিকাবাসী গৌরব করতে ইতস্ততঃ করেনা। অভিনেতা Edwin Forrest প্রচুর ধনসম্পত্তি করে ফিলেডেলফিয়ার নিকটে বয়স্ক অভিনেতাদের জন্য একটা আশ্রম রচনা করে। এ আশ্রমটি Forrest Home নামে পরিচিত। অভিনেতা Cushman আঠার লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রেখে মারা যায়। বিখ্যাত অভিনেতা Edwin Booth একুশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি অর্জন করে এবং ছয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে "Players Club"এর প্রতিষ্ঠা করে সকল অভিনেতাদের একটি পরম কল্যাণ সাধন করে। অভিনেত্রী Mary Anderson পনের লক্ষ টাকা উপায় করে বিবাহ করে J. Jeffreson ত্রিশ লক্ষ টাকা উপার্জন করে। বিখ্যাত অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্টের কথা বলা হয়েছে। T. Salvin ইতালীয় অভিনেতাদের ভিতর সবচেয়ে অধিক ধনী হয়ে পড়ে। চার্লি চ্যাপলিন প্রতি বৎসর ত্রিশ লক্ষ টাকা অর্জন করে। এ রকমের ধনসঞ্চয় পৃথিবীর ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে।

আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে ক্রমশঃই অভিনেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্তুতঃ পৃথিবীর আর কোথাও এত অধিক সংখ্যক অভিনেতা দেখা যায় না। ১৮৮৮ সালে এদের সংখ্যা ছিল ৪,৫০০—সম্প্রতি এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০,০০০ হাজার। Vaudeville সিনেমা অভিনেতা এবং থিয়েটার কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত অন্যান্য সকলের সংখ্যা ইদানীং প্রায় ১,৫০,০০০ হবে এরূপ অনুমান করা হয়েছে। এদের জন্য বহু ক্লাব সৃষ্ট হয়েছে। কাজেই অভিনেতাদের সামাজিকভাবে মেশামিশির কোন অসুবিধা আর নেই। এসব ক্লাবের কয়েকটি নাম দেওয়া যেতে পারে:— যেমন, Friar's Club, Players Club, Green room Club, The Lambs' Club—এসবের সংখ্যা অগণিত।

এই স্ফীতি এবং ব্যাপক সমর্থনের ভিতরও একেবারে নিষ্কণ্টকভাবে নাট্যকলা চর্চা সম্ভব হয় নি। অবশ্য নাট্যকর্তাদের দোষ এক্ষেত্রে কখনও ছিলনা একথা বলা চলে না। অশ্লীল নাটক অভিনয় বন্ধ করার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হয় ১৯২১ সালে। থিয়েটারের নাম করে দুর্নীতির প্রশ্রয় কোন শাসন কর্তাই দিতে পারে না। ফলে এ সময় একটি নতুন আইনের সৃষ্টি হয়। তার নাম হচ্ছে Theatre Padlock Law। এই আইনের সাহায্যে যে কোন থিয়েটারকে (দোষী সাব্যস্ত হলে) এক বছরের
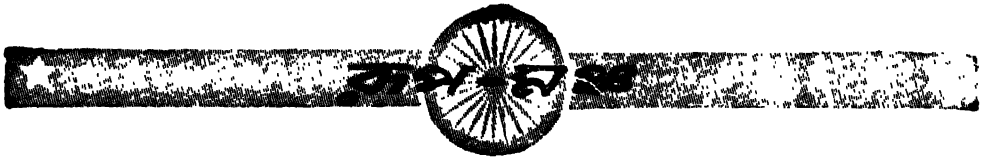
জন্য বন্ধ করার অধিকার গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করে। ইউ-রোপের Nude-movementএর প্রভাবে একটা আন্তর্জাতিক শিথিলতা এসময় কতকটা সর্বব্যাপী হয়। এজন্য বহু অভিনেতা ও ম্যানেজার অভিযুক্ত হয় এবং শাস্তি পায়।

যদিও নাট্যকলা ও মঞ্চের আদর্শের দিক হতে আমেরিকা ইউরোপের অনুসরণ করেছে মাত্র, তবুও কোন কোন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রচুর প্রতিপত্তি লাভ করেছে। অভিনেতার দিক হতে কয়েকজন বিখ্যাত অভিনেতাদের নাম করতে হয়। Henry Miller অন্য যে কোন অভিনেতা অপেক্ষা অধিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে নানা নাটকীয় চরিত্রের। এঁর মৃত্যু হয় ১৯২৬ সালে। P. Basker ও James Hackett ও প্রসিদ্ধ অভিনেতা ছিল। Hackett আন্তর্জাতিক সম্মান লাভ করেন নিজের কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয়ের জন্য। London এর Aldwych থিয়েটারে তিনি Macbeth অভিনয় করেন। তাতে ওর খ্যাতি সারা ইউরোপে বিস্তৃত হয়। বিস্ময়ের বিষয়, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই অভিনেতাকে অভি-নয়ের জন্য ফ্রান্সে আমন্ত্রণ করেন। তিনি প্যারিতে Odeon থিয়েটারে Macbeth অভিনয় করে' গভর্ণমেণ্ট দত্ত "Cross of the legion of honour" পান! নিউ ইয়র্কে ফিরে তিনি এ সম্মানের জন্য একটা সাধারণের অভ্যর্থনা লাভ করেন এবং এ সহরের "Freedom"এর সম্মান তাঁকে দেওয়া হয়।

কাজেই বর্তমান যুগে আমেরিকার অভিনেতাদের কুনো বলবার উপায় নেই। যদিও জার্মানীতে Reinhardt ও ইংলণ্ডে Barker এবং রুষিয়ায় Meirhold যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, সে রকম কিছু আন্দোলন আমেরিকায় সম্ভব হয়নি, তবু সাহিত্যিক এবং মননশীল নাট্যচর্চার জন্য অসংখ্য থিয়েটার যে সৃষ্টি হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

১৯৩৮ সালে নিউ ইয়র্কে ৭০০ থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণনা করে দেখা হয়। এর ভিতর অপেরা, কনসার্ট, মিউজিক্যাল কমিডি এবং সিনেমাও আছে। এসব থিয়ে-টারে দশলক্ষ লোকের বসবার স্থান ছিল। এতে প্রমাণিত হয়, কতবড় বিরাট জনতা প্রতিদিন নিউইয়র্কের অভিনয় গৃহগুলিতে গমন করে। অনেক থিয়েটারকে ইদানীং Cinema House এ পরিবর্তিত করা হয়েছে; অনেক Side Show এর ব্যবস্থাও করা হয় ছবি দেখার মধ্যে মধ্যে।

Brooklyn এর দুর্ঘটনার পর আমেরিকার বড় সহরগুলিতে যেসব থিয়েটার গৃহ নতুন তৈরী হয়েছে, সেগুলি নিরাপদ হওয়ার দিক হতে চূড়ান্ত সৃষ্টি। বিশেষতঃ নিউ-ইয়র্কের রঙ্গমঞ্চগুলি দর্শকদের সুখ সুবিধা বর্ধন এবং বিপদ আপদের বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ করার কাজে তুলনাহীন।

খাঁটি সংস্কারের দিক হ'তেও ইউরোপে যেসব আন্দোলন রঙ্গমঞ্চকে উন্নীত করতে অগ্রসর হয়ে নাট্যক্রিয়াকে নতুন দিকে নিয়ে গেছে, সে সব আমেরিকাতেও প্রচুর সমর্থন লাভ করেছে। ইউরোপের Reform Theatre গুলি চেষ্টা করেছে, যাতে রঙ্গমঞ্চের যাকে বলে "Peepshow" প্রকৃতি, তা' দূর করতে। প্রাথমিক ইতালায় মঞ্চ তৈরী হয় একটা বাকসের একটা দিকের আবরণ খুলে ফেললে যেরকম হয়, কতকটা সেরকম। অর্থাৎ তা দর্শক হ'তে বহুদূরে অবস্থিত এবং সামনের proscenium এর সাহায্যে একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার হিসেবেই রচিত হ'ত। এর ফলে দর্শকেরা অভিনেতাদের সহিত কোন ঘনিষ্ঠতার ব্যবস্থা না থাকলে নাট্যরসের সৃষ্টি হয় না। প্রাচ্যজগতে দর্শকেরা সব জায়গায় অভিনেতাদের ঘিরেই বসে। নাট্যমঞ্চটি দর্শকদের ভিতরেই কল্পিত হয়। জার্মানীতে Reinhardt প্রভৃতি সংস্কারকগণ এজন্য সামনের পর্দা একেবারে বর্জন করে। দর্শকগণ প্রেক্ষাগৃহে এসেই রঙ্গমঞ্চকে মুক্ত অবস্থায় দেখতে পায়। এভাবে নানা সংস্কার করা হয়েছে ইউরোপীয় অভিনয় মঞ্চকে। আমেরিকাতেও Reinhardt গিয়ে মঞ্চজগতের বিরাট সংস্কার করে। ইউরোপে যা সম্ভব হয়নি, অতি বৃহৎভাবে তা আমেরিকাতে সম্ভব করে। Gordon Craig যে সব কল্পনাকে রূপদান করতে ইউ-রোপে অগ্রসর হয়, সেরকম ব্যবস্থা ক্রমশঃ আমেরিকাতেও গ্রহণ করা হয়। রঙ্গমঞ্চে Synthesis of music,
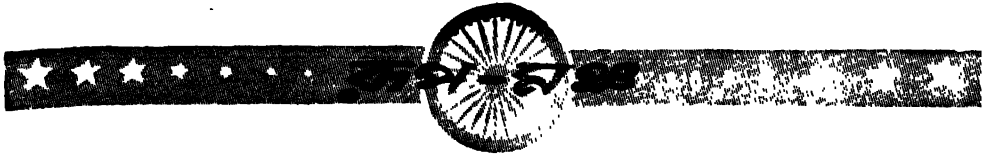
chart and colour হয়েছে ইউরোপে। এর প্রবর্তক ছিল Wagner। এই আদর্শে সংগীত, আবৃত্তি ও বর্ণ ব্যবহারকে পরস্পর বিরোধী না করে নাট্যমঞ্চে সংগত করা হয়েছিল। অর্থাৎ যখন যে সব ঘটনা যে বিশিষ্টভাব ফুটিয়ে তোলে, সংগীতকে তারই প্রকৃতি অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়, না হলে রসগত বিরোধ ঘটে। করুণ রসের দৃশ্যে বীররসের দ্যোতক কোন সংগীত ব্যবহার ভুল। আবার তখন ষ্টেজে এরূপ রঙের ব্যবহার করতে হবে দৃশ্যপটে এবং আলোক বিচ্ছুরণে যা'তে করে অন্য ভাবের উদ্রেক না হয়। এইভাবে একটা অন্তরঙ্গ সামঞ্জস্যের জন্য মঞ্চ সংস্কারকেরা বিশেষ চেষ্টা করে ইউরোপে। এই সব প্রতিটি চেষ্টা যুক্তরাজ্যেও কার্যকরী করা হয়। Max Reinhardt আমেরিকাতে ও Symbolic দৃশ্যের প্রবর্তন করেন যাতে কয়েকটি রূপকের সাহায্যে সমগ্র দৃশ্য মূর্তিমান হ'ত। আধুনিক সংস্কারকগণ একথা টের পেয়েছিল যে, রঙ্গমঞ্চকে হুবহু প্রাকৃতিক রচনার একটা নকল ছবি করা চলে না। অরণ্য দেখাতে হলে আস্ত জঙ্গল কেটে একটা ছোটখাট বনের সৃষ্টি করা যায়না। অতি সংক্ষেপে কয়েকটি রূপকের সাহায্যে সে ভাবে উদ্দীপিত করতে হয়। তেমনি প্রাচীন কোন দৃশ্য দেখাতে হলে তাকে প্রত্ন দ্রব্যাদির একটি যাদুঘরে পরিণত করা যায় না। ইউরোপে অনেক সময় আধুনিক পদ্ধতি নিয়ে ও সেক্সপীয়রের অভিনয় হয়েছে।

আবার অতিরিক্ত যন্ত্রপাতির জটিলতা দূর করতে ইউরোপ বারবার অগ্রসর হয়েছে। ইউরোপের Cabaret থিয়েটার গুলির সৃষ্টি হয় এই আদর্শে। ক্রমশঃ আরও গভীর দিক হ'তে নাট্য সংস্কার চলতে থাকে। বার বার নতুন অংক ও দৃশ্য অবতারণা করলে থিয়েটারে রসভংগ ঘটে-- একটা রসের বিচিত্র গতিভংগীর ধারাকে ছিন্ন করা হয়। এজন্য Herr Savits জার্মানীতে non-stop সেক্সপীয়রের অভিনয় করেছে। এটাও অত্যধিক যন্ত্রপাতির বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। মঞ্চেরও নানা রূপ ক্রমশঃ দেখা গেছে। Revolving মঞ্চ, Sinking মঞ্চ প্রভৃতি নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে দৃশ্যপটের বিচিত্র সম্পাদন করতে। সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশে এসব সাধনাও মূর্তিমান হয়েছে। কাজেই আমেরিকাতেও এসব আদর্শের বোঝাপড়া হয়েছে প্রচুর।

আমেরিকায় রঙ্গমঞ্চের ব্যবসার দিকটা দেখবার জন্য স্বতন্ত্র ম্যানেজার থাকাতে যাঁরা এসব পরিবর্তন ও পরিবর্ধন নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের টাকাপয়সার ব্যাপার একেবারে ভাবতে হয়নি। এ জন্য আমেরিকার রঙ্গমঞ্চ কোন কালেই আর্থিক দিক হ'তে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। রঙ্গমঞ্চকে এতটা লাভবান আর কোন দেশ করতে পারেনি। রুশিয়ায় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে প্রচুর টাকা দান করে থাকে—আমেরিকায় তা' প্রয়োজন হয়না মোটেই। বৃহত্তর নিউইয়র্ক সহরের থিয়েটার গুলিতে বসবার আসনের সংখ্যা একত্র করলে দেখা যায় যে, প্রতিরাত্রে তাতে চল্লিশ লক্ষ লোক বসতে পারে। এজন্য থিয়েটারগুলির উপার্জনও হয় প্রচুর। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা এবং মঞ্চপ্রবর্তকগণ আমেরিকায় না আসলে প্রচুর অর্থ উপার্জনই করতে পারেনা। এখানকার Capitol, Rivoli, Rialto, Paramount ও Roxy থিয়েটারে বসবার আসনের সংখ্যা হচ্ছে ৫২২৬ করে। Radio City Music Hall এ আসনের সংখ্যা ৫৯৪৫। এ সবের বিরাটত্ব এ যুগের বিপুল সৌন্দর্য স্পৃহা এবং নাট্যগত রসভোগের সুবিস্তৃত সংকল্পকেই প্রকাশ করে।

আমেরিকায় Reinhardt এর বিরাট চেষ্টার কথা উল্লেখ করা গেছে। আধুনিক যুগে যুক্তরাষ্ট্রের অফুরন্ত আর্থিক আনুকূল্যে এখানে যে সব অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অন্যত্র তার তুলনা পাওয়া কঠিন। সব চেয়ে স্মরণীয় ছিল "The Miracle" নামক আটটি দৃশ্যে প্রযুক্ত জমকাল নাটকখানি। এর প্রয়োগ কর্তা ছিল F. R. Comstock। Century Theatre এ এর অভিনয় হয় ১৯২৪ সালে। পূর্ববর্তী সকল দেশের সকল অভিনয়কে এ নাট্যপ্রচেষ্টা হতশ্রী করে দেয়। একটা সমগ্র season এ নাটকখানি অবিরত চলতে থাকে। দর্শকের ভিড় একদিনের জন্যও কমেনি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তারপর একে বাইরের অন্যান্য জায়গায় অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। Reinhardt এজন্য একটা সাধারণ মঞ্চকে এমনিভাবে

রূপান্তরিত করেন যা, থিয়েটারের ইতিহাসে কখনও হয়নি। টাকার অভাব এজন্য কোন বাধা কোন কালে দান করেনি। অজস্র অর্থ ব্যয় করে যা' করা হয়, তা হয়ে পড়ে অনেকটা অপার্থিব ও অকল্পিত। এই নতুন সৃষ্টির stage setting হয়েছিল অসাধারণ এবং অনেকটা অসম্ভব রকমের। একটা মঞ্চকে এক রাত্রিতে যেন একটা মধ্যযুগের বিরাট গির্জায় রূপান্তরিত করা হয়। মধ্যযুগের গির্জা বলতে যে বিরাট সৃষ্টি বোঝায়, তাতে কিছুমাত্র কৃপণতা দেখান হয়নি। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য স্তম্ভ রচিত হয়েছিল—প্রত্যেকটির উচ্চতা ছিল প্রায় পঞ্চাশ ফুট অর্থাৎ একখানি পাঁচ ছয় তলা বাড়ীর সমান। খিলান দেওয়া অত্যুচ্চ দেয়ালগুলিও সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করে। এর বেদীকে করা হয় ত্রিশ ফুট উঁচু। পঞ্চাশ ফুট উঁচু কাচের জানালাকে রঙীন নক্সায় পূর্ণ করা হয়। মধ্যযুগের গির্জায় রঙীন কাচের তৈরী জানালাগুলি এক সৌন্দর্যের মরীচিকা সৃষ্টি করে থাকে। একটা সাধারণ থিয়েটারে এসব ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারকে রূপায়িত করা অলৌকিক কাণ্ড এবং ঐতিহাসিক সৃষ্টিই হয়েছিল। উঁচু গ্যালারিতে অর্কেষ্ট্রা রাখা হয়েছিল। এসব কাগজে তৈরী হয়নি মোটেই। N. B. Feddes ছিল এর নক্সাকারক—দুনিয়ার কোন নাট্যমঞ্চই এর ঐশ্বর্যের পদাংককে চলতে পারেনি। সমগ্র মঞ্চটিতে ব্যয় হয় বার লক্ষ টাকা।

The Miracle দৃশ্যনাট্যখানি অভিনয়ে অনেক নতুন ব্যাপারের অবতারণা করা হয়, যা যুক্তরাজ্যে একটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ব্যাপার হয়। শুধু তা নয়—যাতে নাট্যমঞ্চ সংস্কার বিষয়ে আমেরিকায় নতুন চিন্তার আবির্ভাব হয়, সে বিষয়েও রাইনহার্ট বিশেষ চেষ্টা করেন। ইউরোপীয় মঞ্চগুলি একটা বাক্সের আকারে তৈরী বলে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলি তাতে করে হয়েছে দর্শক হতে রক্ষিত একটা দূরের ব্যাপারের মত। Peepshow এর মত দর্শকদের অসংলগ্নভাবেই এরকমের অভিনয়কে দেখতে হয়। চৈনিক থিয়েটারেও অভিনেতারা অনেক সময় দর্শকদের ভিতর এসে পড়ে। এদেশের যাত্রাগানে দর্শকেরা অভিনেতাদের ঘিরে বসে। রুষিয়ায় অনেক সময় অভিনেতারা দর্শকদের ভিতর ছুটে এসে পড়ে। তাতে অভিনেতা ও দর্শকদের ভিতর দূরত্ব ঘুচে যায়। এই দূরত্ব অন্তর্হিত করা এক সময়ে ইউরোপীয় নাট্যমঞ্চের একটা প্রধান সমস্যা হয়ে পড়ে।

রাইনহার্ট (Reinhardt) এক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব কৌশল সৃষ্টি করেন। তিনি Miracle নাটকে সামনের proscenium টিই দূর করেন। দর্শকেরা এসেই দেখতে পায় সামনের কোন দৃশ্যপট! যবনিকা একটা বিভেদ দূরত্ব বা এক্ষেত্রে কোথাও সৃষ্টি করেনি। অভিনয় আরম্ভ করার বহুপূর্বে প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করার আয়োজন ও ব্যবস্থা চলতে থাকে। একটা বিরাট গির্জাকে মনের সামনে উপস্থিত করতে হলে কয়েকটা বিরাট স্তম্ভ ও খিলানের সারি তৈরী করলেই সুসমাপ্ত হয় না—তার ভিতর একটা বহুমুখী চলন্ত আয়োজন ও গতিবিধিকেও সুস্পষ্ট করতে হয়, যাতে সকলের মনে হয় একটি জীবন্ত ও আচার-অর্চনাপুষ্ট ধর্ম সাধনার স্থানের সামনেই এসে পড়েছে। তাই নাটকীয় ঘটনাপ্রসংগ উত্থাপিত হওয়ার পূর্বেই নানা আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানে এই সকল গির্জাকে ভরপুর করা হয়। মাঝে মাঝে Church-এর ধারাবাহী ঘণ্টা বাজাতে থাকে—তাতে সকলের মনে হয় যেন তারা একটা গির্জার ভিতরই বসে আছে। সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের বার বার ভিতরে বাইরে যাওয়া আসার দৃশ্যকে উপস্থিত করা হয় মাঝে মাঝে। আবার মঞ্চের ভিতরে অনেকটা দূরে একটি প্রকাণ্ড বেদীর উপর ম্যাডোনার মূর্তির বিরাটত্ব এবং সৌন্দর্যও ছিল এত অতুলনীয় যে, দর্শকেরা তাকে একটি 'wander image' বলে ব্যাখ্যা করেছিল। সব মিলে এক অঘটন ঘটন করা সম্ভব হয়েছিল। মূল অভিনেতারা মঞ্চের উপর আসবার আগেই ভূমিকাস্বরূপ এ রকম আর একটি অভিনয়ের ব্যবস্থা আগেকার সমস্ত সংস্কার ও ধারণাকেই বিপর্যস্ত করে। তাতে 'Intimacy'র সকল সমস্যারই পূরণ হয়ে যায়। এরকম ব্যবস্থা Reinherdt এর প্রযোজনায় সম্ভব হয়েছিল। শুধু বিরাট আয়োজন করে' অন্ধকারে যন্ত্র ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ প্রযোজনা সকলকে বিস্মিত করেনি। যন্ত্রের
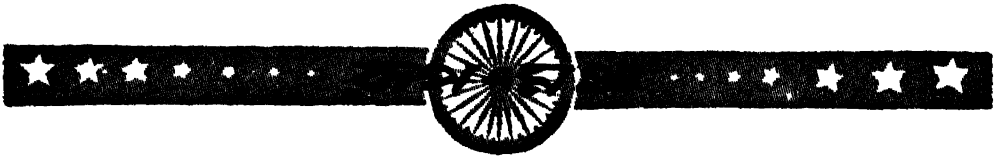
স্থান নাট্যমঞ্চে সামান্য। সব কিছু মিলে যাতে প্রতিপাদ্য ব্যাপারের সফলতা ঘনীভূত করে—তাই দেখতে হয় ভাল করে। শুধু অর্থব্যয়ই এ বিষয়ে একমাত্র কাজ নয়। "The Miracle" অভিনয়ে প্রধান অভিনেতা ছিল আট জন এবং সহকারী অভিনেতাদের সংখ্যা ছিল ৭০০। এই বিরাট অভিনয়ের ঐশ্বর্য অভিনেতাদের সংখ্যা হ'তেই কতকটা ধারণা করা যায়।

বস্তুতঃ আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের অসামান্য দুঃসাহস দেখে অবাক হতে হয়। সকল দিক হতেই ইদানীং আমেরিকাকে পরাজয় করা কঠিন হয়েছে। নাট্যমঞ্চের উপর ছয় সাত শত অভিনেতা উপস্থিত করা একটা কল্পনাতীত ব্যাপার। অবশ্য চলচ্চিত্রে তার চেয়ে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত হয়ে থাকে—কিন্তু তা' মঞ্চে সম্ভব নয়—বাস্তব মাঠে, ঘাটে বা সমুদ্রতীরে। এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। শুধু অতিকায় কিছু সৃষ্টি করে মঞ্চ প্রযোজকেরা তুষ্ট হয়নি · তার ভিতর সংস্কারের দিক হ'তে বহু নূতন পথ কাটা হয়েছে।

আমেরিকার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস অতি অল্পকালের। এক সময় রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কে পাপের ব্যাপার মনে করা হয়েছে—অভিনেতাদের কারারুদ্ধও করা হয়েছে। আজ কি পরিবর্তনই না যুক্তরাষ্ট্রে উপস্থিত হয়েছে। তবুও আরও অনেক আছে অভিনয় কলার—যার পরিপূরণ এখনও বাকি। প্রাচ্যের পুতুল অভিনয় এক সময় ইউরোপকে বিশেষভাবে অভিভূত করে। পুতুল অভিনয়ে অভিনেতার কোন অত্যুক্তিই সম্ভব হয় না—শুধু গতি ও ধ্বনির ভিতর দিয়ে একমাত্র নাট্যমঞ্চকে ঘনীভূত করা হয়। ইউরোপেও এ শ্রেণীর অভিনয়ের উদ্যোগও সুরু হয়। মুখোসের সাহায্যে অভিনয় তিব্বত, যবদ্বীপ, দক্ষিণ ভারত ও লঙ্কাদ্বীপে প্রচলিত। এ রকম অভিনয়েরও একটা বিরাট ভবিষ্যৎ আছে। ইউরোপে কতকটা প্রসার এক সময়এ অভিনয়ের হয়েছিল। 'Masked dance'ও কিছুকাল সমাদর লাভ করে।

গীতিনৃত্যে (opera) যুক্তরাজ্য বেশী এগিয়ে যেতে পারেনি। J. Dent বলছেন: "In the United States opera has been mainly foreign in spite of determined efforts especially in recent passes to found a negative school of American Opera" জার্মানী, ফ্রান্স বা ইতালীর কল্পনা সার্থক ও প্রেরণা যুক্তরাজ্য কখনও লাভ করে নি। Dr. Peray Scholes বলেন: "But the sad truth must be told that neither the United States nor Britain can point to one single example of opera that stand in the regular repertory of the world's opera houses".

কিন্তু যুক্তরাজ্যে এ বিষয়ে ইদানীং বিশেষ চেষ্টাও যে চলেছে তা' স্বীকৃত হচ্ছে। অর্থের অভাব যে দেশে নেই, সে দেশে ভাল কিছু করার পথ রুদ্ধ নয়, যদিও সম্পদই সব কিছু সব সময় সৃষ্টি করতে পারে না। ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধেও মিঃ Dent বলেন: London has now become the centre of world's music but mainly in the commercial sense. It is outside London that new experiments are tried. Opera still lags behind and foreign visitors are astonished to find that we have nothing to compare with Stockholem or Copenhagen" সামান্য দেশেই অসামান্যের উদ্বোধন হচ্ছে এটাই হ'ল বিস্ময়ের বিষয়। তবুও আমেরিকায় যে নূতন সাধনা হচ্ছে, তাকে তুচ্ছ করার যো নেই। সম্প্রতি সকল জাতি আমেরিকায় গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। আমেরিকা সকলকে দেখতে চায়, শুনতে চায়—আমেরিকার ডলার জগতের প্রভু হয়েছে। তাই চিন্তার প্রধান শিবিরও সম্প্রতি আমেরিকায় রচিত হচ্ছে। সকল দেশের সৌন্দর্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের মহারথীরা আমেরিকায় উপস্থিত হয়ে জ্ঞানচর্চা সুরু করেছে। আমেরিকাও সম্প্রতি কোন বিষয়ে কোন দিকে অলস নয়। য়্যাটম বোমা জার্মানীর আবিষ্কার হলেও তা ফলিত হয়েছে আমেরিকার ডলারের সাহায্যে। মিঃ Dent বলছেন "Never the less there certainly is a definite movement now on the United States towards Opera in English—and it will bear fruit in time; meanwhile we might do some thing over here to give native American opera a trial".

দেখা যাচ্ছে যুক্তরাজ্যের শক্তিকে আজ কেউ অস্বীকার করতে পারছে না।

জাতীয় সংগীত কি ও কেন

শ্রীসুকৃতি সেন

কোনও বিতর্কমূলক আলোচনায় হৈ হৈ ক'রে যোগদান করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। বিশেষ করে সেই বিতর্ক যদি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ও ইতিহাস চলতিপ্রথা ও হৃদয় বৃত্তির বহির্ভূত হয়। তবুও রূপ-মঞ্চ সম্পাদক-বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে এই আলোচনায় যোগদান করতে হ'ল।

জাতীয় সংগীত জাতীয় জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। সমবেত প্রচেষ্টার একটি ফল লাভ করা শুধু জাতীয় সংগীতের দ্বারাই সম্ভব। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে একত্রে গীত একটি গানের কথা, সুর ও তাল যদি একত্রে ব'য়ে চলে, তবে লক্ষ লক্ষ হৃদয় এক সূত্রে গ্রথিত হতে পারে। একটি জাতীয় সংগীত সমবেত কণ্ঠে গাইবার সময় একে অন্যের উপর নির্ভর করে, এতে Sense of individuality অর্থাৎ আত্ম-বৈশিষ্ট্যের চেতনা বা অহংকার দূরীভূত হ'তে পারে। সত্যিকারের সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের বীজ এইখান থেকেই উপ্ত হ'তে পারে।

সুরচিত, সুষ্ঠু ও সহজ সুর-সংযোজনায় যে গান দেশের লোকের মনকে ও দেশকে গড়ে তুলবার উৎসাহে উদ্বুদ্ধ করে এবং দেশের সম্মানের জন্য আত্মবলিদানের চেতনায় প্রাণবন্ত করে, তাই হচ্ছে সত্যিকারের জাতীয় সংগীত।

কিন্তু জাতীয় সরকারের সম্মান বৃদ্ধির জন্য একটী পতাকার মতো জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করা যখন থেকে ঠিক হ'ল, তখন থেকেই প্রত্যেক দেশ তার নিজের নিজের জাতীয় সংগীত প্রথানুযায়ী ঠিক করল।

গত ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের পূণ্য দিনে আমরা বৈদেশিক শাসনমুক্ত হ'য়েছি। তার পরে হঠাৎ আমাদের মাথায় টনক নড়ে উঠল যে, আমাদের জাতীয় সংগীত কি হ'বে। সদ্য-মোহমুক্ত দেশবাসী হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীর মত কপালে হাত দিয়ে ভাবতে বসে গেল,—সত্যিই ত! আমাদের জাতীয় সংগীত কি হ'বে? ভুলে গেছে কি তাঁরা পরাধীনতার দিনগুলোর কথা? যখন একটী গানের একটী কথা সমগ্র ভারতবর্ষের শিরদাঁড়াকে সোজা ক'রে রেখেছিল! মাতৃবন্দনার একটি গানকে বৈদেশিক সরকারকে আইন করে গাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল। শুধু 'মাকে বন্দনা করি' এই ধ্বনির জন্য লাঠি, বন্দুক, জেল ও অসহনীয় অত্যাচারগুলোকে বৈদেশিক সরকার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত। আন্দোলনের জোয়ার যখন লাগতো সহরে সহরে, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে, তখন ঐ একটী ধ্বনিই আমাদের চিনিয়ে দিত যে, ধ্বনিকারীরা আমাদের স্বদেশবাসী ও সহ-যোদ্ধা। আন্দোলনের মাঝে পুলিশের লাঠি পড়ছে মাথায়। সত্যাগ্রহী ভারতবাসী চিৎকার করে বলছে 'বন্দেমাতরম্'। ফাঁসির দড়ি গলায় পরে শেষ নিঃশ্বাসের সংগে ভারতবাসী উচ্চারণ করেছে 'বন্দেমাতরম্'। সেই 'বন্দেমাতরম্' সংগীত কেন যে ভারত-বর্ষের জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচিত হ'তে পারছে না, কেন যে দেশ জুড়ে এত বিতর্কের সৃষ্টি, সে কথা আমাদের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র করলেন রচনা, আর সেই থেকে এল দেশের লোকের মনে স্বাদেশীকতা ও স্বরাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা। ভারতের জাতীয় মহসভার (Indian National Congress) ৬০ বৎসরের যুদ্ধের মধ্যে 'বন্দেমাতরম' গানটি একটী অবিচ্ছেদ্য অংগ। ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলকাতায়। বিডন উদ্যানে। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন বোম্বাইয়ের একজন বিচক্ষণ উকিল রহিমতুল্লা সিয়ানী। এই বিডন উদ্যানেই কংগ্রেসের অধিবেশনে 'বন্দেমাতরম' প্রথম গীত হয় পরিপূর্ণভাবে। শুভ্র বস্ত্র পরিধান করে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই গানটি গেয়েছিলেন! একে ত 'বন্দেমাতরম্' গান, তার ওপর গায়ক সুধাকণ্ঠ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—সভায় জনগনের মধ্যে যেন কথা ও সুরের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হ'ল। ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হতেই বঙ্গদর্শনের সূচনায় সর্বপ্রথম ভারতীয় সর্ব-জাতীয় সম্মিলন, ভারতীয় ঐক্যের বাণী সমুদ্ভূত হ'য়েছিল। এর পরে তিনি 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে 'বন্দেমাতরম্' গান রচনা করেছিলেন। এইখানে 'বন্দেমাতরম' এর সময়কার
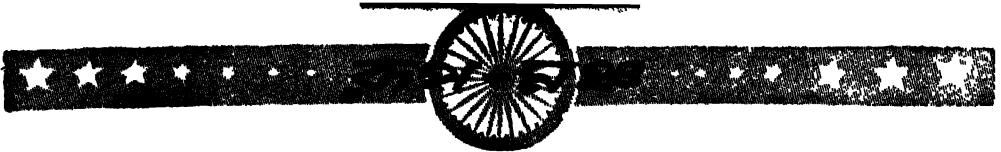
ইংরাজ শাসনের একটু অবস্থা জানা আবশ্যক। ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত লর্ড লিটন ভারতবর্ষের গভর্ণর ছিলেন এবং 'ডিস্‌রেলি'র প্রকৃত শিষ্যরূপে ভারতবর্ষে রুদ্র সাম্রাজ্য-নীতি প্রবর্তন করে ভারতবাসীকে উত্যক্ত মথিত দলিত ও পীড়িত করেছিলেন। সর্বাপেক্ষা বেশী আহত হয় বঙ্গ-দেশের অধিবাসীরা। তাই বাংলাতেই রুদ্রনীতির পরিণাম —জনশক্তির জাগরণ হয় খুব বেশী। ডিস্‌রেলি ও স্যালিসবারী, এলেনবরা ও লিটন সেই রক্ষণশীলদেরই অগ্রণী ছিলেন। আর এই দল ভারতবাসীকে দাস ও ভারতবর্ষকে বিজিত দেশ ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারত না। এই নীতির প্রত্যুত্তরেই বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী 'আনন্দমঠ' আর এই অমর সংগীত 'বন্দেমাতরম্'। এ গান শুনে অনেকে নাকি প্রথমে উপহাস করেছিলেন কিন্তু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন আর জানতেন বলেই প্রকাশ করতেন যে—একদিন এই গানে ভারতের আকাশ বাতাস বিকম্পিত হ'বে। আর মাটি ধুলো হ'তে আরম্ভ করে গাছের পাতা পর্যন্ত কাঁপতে থাকবে।

বহুদিন, বহুবৎসর, বহুযুগ ধরে ভারতের আকাশে বাতাসে এই গান ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হ'য়ে এসেছে আর আজ এই গান বাদ দেবার কথা কারও কারও মনে জাগল কেন? প্রথমতঃ জেগেছিল, কোনো কোনো ইংরাজ প্রোষিত মুসলমান ভারতীয়ের মনে যে, এব গানে পৌত্তলিকতার ছোঁয়াচ আছে। বিশেষ ক'রে,—

'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণীং' ইত্যাদিতে।

পরে তাই দেশনেতারা মুসলমান বন্ধুদের মনে আঘাত না লাগে এই ভেবে গানটীকে কেটে অর্ধেক করে দিলেন। 'বন্দেমাতরম' কোনোদিনই ধর্মতাত্ত্বিক ছিল না। এ গান চিরদিনই রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ছিল। যাই হোক, 'রিপুদল বারিণীং মাতরম্' পর্যন্ত রেখে নেতারা ও মুসলমান বন্ধুরা আমাদের গানটী সহজে মুখস্ত করার পন্থা বার করে দিয়েছিলেন।

এ গান যে রাষ্ট্রতাত্ত্বিক তা মহাত্মা গান্ধীর একটি বক্তৃতাংশ থেকেই বোঝা যায়। তিনি নিজেই নিজের বক্তৃতার 'রিপোর্ট লিখে নিজেকে (He) অর্থাৎ তিনি করে লিখেছিলেন।

"He (অর্থাৎ গান্ধীজী নিজে) then came to 'Bande-Mataram'. This was no religious cry. It was a purely political cry. The Congress had to examine it. A reference was made to Gurudev (রবীন্দ্রনাথ) about it. And both Hindu and Muslim members of the Congress Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection. And he pleaded that they should be sung together by all on due occassion. It should never be a chat to insult or offend Muslims. It was to be remembered it was the cry that had fired political Bengal. Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry on their lips. Though therefore he felt strongly about Bande Mataram as an ode to Mother India He advised his League friends to refer the matter to the League High Command. He should be surprised if in view of the growing friendliness between Hindus and Muslims the League High Command objected to the prescribed lines of Bande Mataram the national song and the national cry of Bengal which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was so far as he was (I am) aware acclaimed by both the Hindus and Muslims of Bengal."

ভারতের শ্রেষ্ঠ মহামানবের বক্তৃতাংশ থেকে এটুকু বোঝা নিশ্চয়ই গেল যে, 'বন্দেমাতরম্' গান জাতীয় সংগীত হ'বার উপযোগী।

এখন দ্বিতীয় আপত্তি এল বর্তমান ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে যে, 'বন্দেমাতরম্' গানকে নাকি কোনো সুর-কারের কাছে সহজ সুর করতে দেওয়ার পর সেই সুরকার,
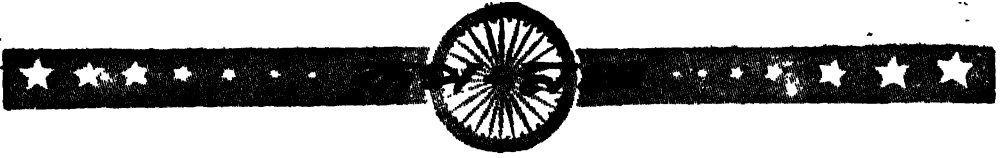
এ গানের সহজ ছন্দ ও সুর হ'তে পারে না ব'লে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাই 'ব্যাণ্ডে'র সুরে 'বন্দেমাতরম্' সম্ভব নয় বলেই এ গানকে বাদ দেওয়ার কথা গণপরিষদ চিন্তা করে ঠিক করবেন।

ভারতবর্ষ গানের দেশ। এই গানের দেশের সুর-শিল্পীদের এভাবে অপমান করা উচিত কিনা তাই প্রশ্ন? সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এত উচ্চস্তরের সুর-শিল্পী থাক্‌তে 'বন্দেমাতরম্' গানের সহজ ছন্দে সুর হয় না একথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি আমি। তার প্রমাণ স্বরূপ বাংলা দেশ থেকে আমাদের কয়েকজন সুর-শিল্পীর ও বিভিন্ন প্রদেশের আরও অনেক সুর শিল্পীদের দিয়ে 'বন্দেমাতরম্' গানের সহজ সুর করিয়ে বেতার কেন্দ্রগুলি দিল্লীতে কতকগুলো রেকর্ড পাঠিয়েছেন। বহুদিন হল। খবর অবশ্য আজও পর্যন্ত কিছুই পাইনি। পাব কিনা তাও বলতে পারি না।

তারপর এলো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'জনগন মন অধিনায়ক' গানটী। অনবদ্য কথা, ছন্দ ও সুরে এগান প্রত্যেকে খুব সহজেই গাইতে পারবে। কিন্তু কথা ত তা নয়, কথা হচ্ছে চল্‌তি প্রথা (tradition) নিয়ে। ইংলণ্ডে 'God save our Gracious King' রচনার দিক থেকে খুব যে বেশী উঁচু স্তরের তা আমি মানি না। তার কাছে অন্যান্য প্রচুর ভালো রচনা ব্রিটেনে পাওয়া যেতো, ছিলও, কিন্তু তাঁ'দের ক্ষমতা হয় নি চল্‌তি প্রথাকে উল্টে দিতে।

'জনগণ' গানটি সমবেত কণ্ঠে গীত হবার জন্য একটি প্রথম শ্রেণীর সংগীত। কিন্তু সহজ লোকেরা 'জনগণ মন অধিনায়ক' কে ঠিক চিনতে পারে না। তাই প্রশ্ন করে এই 'জনগণ মন অধিনায়ক রাজ্যেশ্বর' কে? অনেকে আবার প্রমাদ বশতঃ বলে থাকে যে, রবীন্দ্রনাথের এ গানটী ভারত সম্রাটের ভারতে আগমনোপলক্ষে স্তুতিবাদ হিসাবে রচিত। সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, রবীন্দ্রনাথ যে সম্রাটের স্তুতিবাদ রচনা করবেন, এ ধারণা অত্যন্ত স্থূল ও ভ্রমাত্মক। কবিগুরুর কলম দিয়ে আর যাই বেরুক, সম্রাটের স্তুতিগান বেরুবে না এটা ধ্রুব সত্য।

এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠায় কবিগুরু একখানা চিঠি বিচিত্রা সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট পাঠিয়ে ছিলেন। তাই থেকে কিছু উদ্ধৃত করলাম।

"কল্যানীয়েষু, শান্তিনিকেতন,

সে বৎসর ভারত সম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল। রাজসরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোন বন্ধু, সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শুনে বিস্মিত হ'য়েছিলুম, সেই বিস্ময়ের সংগে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল। তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানে সেই ভারত ভাগ্যবিধাতার জয় ঘোষণা করেছি। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চির সারথি, যিনি জনগণের অন্তর্যামী পথ পরিচায়ক, সেই যুগ যুগান্তরের মানবভাগ্য রথচালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ কোন জর্জ'ই কোনক্রমেই হ'তে পারে না, সে কথা রাজভক্ত বন্ধু অনুভব করেছিলেন। কেন না তাঁর ভক্তি যতই থাক, বুদ্ধির অভাব ছিল না। এ গান বিশেষ ভাবে কংগ্রেসের জন্য লিখিত হয়নি।......"

সুতরাং 'জনগণ' গানটী সম্বন্ধে এ ধরণের আপত্তি টিক্‌তে পারে না।

তবে কথা হচ্ছে tradition (চল্‌তি প্রথা) নিয়ে। তাকে পাল্‌টাতে পারে এমন শক্তিমান কেউ নেই। তাই 'জনগণ' অতি সুষ্ঠু গান হলেও 'বন্দেমাতরম্'ই যে ভারতের জাতীয় সংগীত হওয়া উচিত, এ সম্বন্ধে আমি দৃঢ়মত। আর সর্বশেষ আমি ভারতের নেতাদের জানাতে চাই যে, যে কোনও রকম challange গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত। অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম্' গানের যে ধরণের সুর নেতারা চান, বাংলা দেশের সুর-শিল্পীরা সেই ধরণের সুরই করে দিতে পারবেন। বাংলাদেশে বুদ্ধিমান সুর-শিল্পীর অভাব নেই। আমি আশা করি বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণীর সুর-শিল্পী যাঁরা আছেন, তাঁরা আমার সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে একই কথা বল্‌বেন।
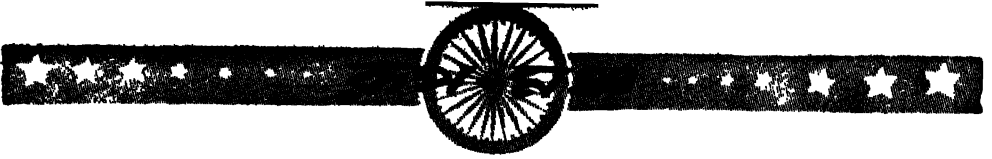
ভারতের জাতীয় সংগীত

ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

★

ভারত সরকার মধ্যবর্তীকালের জন্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "জনগণ মন অধিনায়ক" গানটিকে জাতীয় সংগীত (National anthem) হিসেবে প্রচলিত করার জন্য অনুমোদন করেছেন। স্বভাবতঃই এ অনুমোদন জাতীয়তাবাদী নাগরিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি ও আপামর জনসাধারণের ভিতর বিরুদ্ধ মতবাদের ও বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছে। বিরোধিতা এবং সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর লেখনী প্রসূত "বন্দেমাতরম" গানটিকে নিয়ে। প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ আমাদের দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার নিকট "বন্দেমাতরম"ই একমাত্র জাতীয় সংগীতরূপে সমালোচনাহীন স্বীকৃতি পেয়েছিল। অবশ্য বন্দেমাতরম গানটিকে বিভিন্ন সুরকার বিভিন্ন সুরে রূপায়িত করেছিলেন। আমাদের দেশ যখন দাসত্বের পংকে নিমগ্ন, জাতি যখন আত্মবিস্মৃত ও ভারতীয় মানবজীবন যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, তখন যুগ প্রবর্তক বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠ হতে নিঃসৃত হল এক অশ্রুতপূর্ব অচিন্ত্যনীয় মহামন্ত্রপূত মাতৃবন্দনা। এ যাদুমন্ত্র "বন্দেমাতরম" গানে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। বন্দেমাতরমের যাদুস্পর্শে ভারতের সুপ্ত ও লুপ্ত চেতনা অলঙ্ঘনীয় জড়তা ছেড়ে মুক্তির নেশায় তার বিকাশের পথ খুঁজে নিল দুর্নিবার গতিতে। একথা ঐতিহাসিক সত্য যে, জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার বীজ অংকুরিত হয়েছিল এ বন্দেমাতরমের মন্ত্রশক্তি হতেই। আমাদের অতি প্রিয় "বন্দেমাতরম" মন্ত্র জাতির চিত্তে যে মুক্তির উন্মাদনা ও শক্তির চেতনা এনে দিয়েছিল, তার প্রভাব বোধহয় অপরাপর দেশের জাতীয় সংগীতকেও হার মানিয়ে দেয়।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে শক্তি বীর সৈনিকদের আত্মবলি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল—যে শক্তি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও স্বদেশী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল—যে শক্তি অগণিত জনসাধারণকে লাঞ্ছনা ভোগের ও ফাঁসির রঙ্গমঞ্চে আত্মদানের প্রেরণা জুগিয়েছিল—তার আধারই হল আমাদের বহু গীতোচ্চারিত "বন্দেমাতরম"। আজও বন্দেমাতরম ধ্বনি আসমুদ্র হিমাচলের অধিবাসী প্রতিটি নরনারীর হৃদয়ে এক অপূর্ব শ্রদ্ধাবিজড়িত পবিত্র ভাবের উদ্রেক করে। আজও বন্দেমাতরম ধ্বনি (Slogan) অত্যাচারীদের পাষাণ হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করে ও অত্যাচারিতদের দুর্বল হৃদয়ে জাগায় অসম সাহস ও মহা উন্মাদনা। ভারতীয়দের কাছে "বন্দেমাতরম" শুধু একটী সুর সম্বলিত গানই নয়—সংগ্রামশীল জাতির কাছে এ একটি পবিত্র ভাবমূর্তি পরিগ্রাহী যাদুমন্ত্র বিশেষ। কাজেই, এ হেন ইতিহাস স্বীকৃত ও স্বতঃস্ফূর্ত "বন্দেমাতরম" গানকে জাতীয় সংগীতের মর্যাদা না দিয়ে জাতীয় সরকার "জনগণ-মন-অধিনায়ক" গানটিকে জাতীয় সংগীত হিসেবে অনুমোদন করাতে যে স্বভাবতঃই জনগণের চিত্ত বিক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হবে এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। আর এ অবিবেচনাপ্রসূত ব্যবস্থায় ভারতের জন-গণ-মন যে, ভারত-ভাগ্যবিধাতার উপর খুব প্রসন্ন হবে না, এটা সখেদেই বলতে হচ্ছে। যদিও এ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে অন্তর্বর্তী কালের জন্যই করা হয়েছে, তথাপি এ খুবই বেদনাদায়ক—নৈরাশ্যজনক ও অপ্রত্যাশিত। ভবিষ্যতে যে, "বন্দেমাতরম" গানকেই জাতীয় সংগীত হিসেবে গণ্য করা হবে, তারও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ভারত সরকারের তরফ হতে দেওয়া হয়নি।

অবশ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত "জন গণ মন-অধিনায়ক" গানটি যে অতি উচ্চাংগের সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। এ গানখানিও জনপ্রিয় এবং জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার প্রেরণায় সমৃদ্ধ। এ ক্ষেত্রে এ কথা স্পষ্ট ভাবেই বলে রাখা দরকার যে, "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানখানাকে বাতিল করে "বন্দেমাতরম" কে জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করার দাবী আমরা যারা করছি, তারা কেউ রবীন্দ্রনাথের গানকে এ সূত্রে অশ্রদ্ধা বা তুলনামূলক বিচারে খাট করতে চাই না। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক পটভূমিকায় জাতীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ও সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্যই "বন্দে মাতরম"কে জাতীয় সংগীত বলে গণ্য করার জোরাল দাবী জানাচ্ছি।
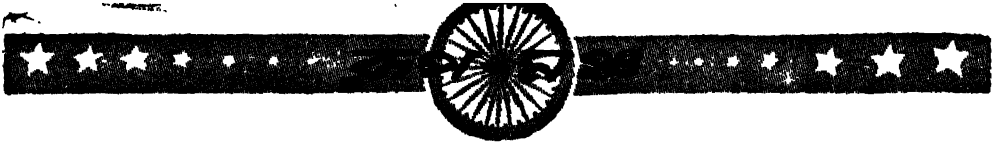
"জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানটির সমর্থকদের আমরা সবিনয়ে বলতে চাই যে, "বন্দেমাতরম" গানকে জাতীয় সংগীত হিসেবে না পাবার দুঃখও বড় কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভাকে তথা তাঁদের গানকে এ ক্ষেত্রে বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আর এখানে তার প্রয়োজনীয়তাও নেই—বরং "জন-গণ মন-অধিনায়ক" ও "বন্দেমাতরম" গানকে কেন্দ্র করে অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হবার জমি তৈরী করে দিয়ে ভারত সরকারই সরাসরি ভাবে দায়ী ও অপ্রীতিভাজন হয়েছেন বললে এতটুকু সত্যের অপলাপ হবে না। এ প্রসংগে এটা উল্লেখ করা উচিৎ যে, বিশ্বকবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও "বন্দেমাতরম"কে মহামন্ত্রের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

"বন্দেমাতরম"কে বাতিল করতে গিয়ে "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানের স্বপক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল যে অন্যতম যুক্তির অবতারণা করেছেন,—তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও অসার। তিনি যুক্তি (একে যুক্তি না বলে অজুহাতই বলা সমীচীন) দেখিয়েছেন যে, "বন্দেমাতরম" গানের সুর সমবেত ভাবে—মানে অর্কেষ্ট্রার পদ্ধতিতে সামরিক ভংগীতে গাইবার আদৌ উপযোগী নয়। পণ্ডিতজীর এ অজুহাত কোনও বুদ্ধিজীবির গ্রহণীয় হবে না, এ বলাই বাহুল্য। এর কারণ এই যে, "বন্দেমাতরম" গানখানা এতকাল যাবৎ একক, দ্বৈত ও যৌথভাবেই সুগীত হয়ে আসছে। অর্কেষ্ট্রা সহযোগেও এ গানখানা যে সুশ্রুত হয়েছে তার নজিরও যথেষ্ট রয়েছে।

আর অহিংসবাদী মহাত্মাজীর মন্ত্রশিষ্যের মুখ হতে সামরিক সুর-প্রীতি যেন কেমন বেমানান মনে হয়। সুরের দিক থেকে বা সম্মিলিত কণ্ঠে গাইবার জন্য বন্দেমাতরম গানে কোনও ব্যবহারিক অসুবিধা (Technical difficulty) ঘটলে সেখানে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন আমরা সব সময়েই হৃষ্টচিত্তে মেনে নেবো নিশ্চয়ই—যেমন করে সব ভারতীয়েরা মেনেছিল "বন্দেমাতরম" গানের পৌত্তলিকতা গন্ধযুক্ত পঙক্তি ব্যবচ্ছেদের সময়।

আর "জন-গণ-মন-অধিনায়ক" গানের সুরই যে সমবেত ভাবে সামরিক সংগীতে গাইবার উপযোগী, তারও কোন অকাট্য প্রমাণ নেই,—বরং এতে বিদেশী সুরের আদলই প্রকট হয়ে রয়েছে। জাতীয় সংগীতে বিদেশী সুরের প্রভাব যে শুধু বিসদৃশই, তা নয়—বরং তা আত্মবঞ্চনার নামান্তর ও দেউলে নীতির পরিচায়ক—একথা সুরকার রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ও তাঁর গানের উৎসাহী হয়েও নির্ভয়ে বলা চলে! "বন্দেমাতরম"কে জাতীয় সংগীত হিসাবে প্রচলিত করবার স্বপক্ষে গান্ধিজীও মত দিয়েছিলেন—বাহুল্য বোধে এখানে তাঁর উক্তির সবই উপস্থিত না করে শুধু "বন্দেমাতরমের" সুর সম্পর্কে তাঁর মনোজ্ঞ মন্তব্য আংশিক আকারে তুলে দিচ্ছি, যা দিয়ে সুষ্ঠু ভাবে প্রমাণ করতে সাহায্য করবে যে, তিনি "বন্দেমাতরম"-কেই জাতীয় সংগীত রূপে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন তাঁর স্বভাব সুলভ সরল ভাষায়,—"There should be one universal notation for "VandeMataram" if it was to stir millions it must be sung by millions in one tune and mood." এটা খুবই সুখের বিষয় যে, ভারত সরকারের এ হৃদয়হীন সিদ্ধান্তে আমাদের দেশের শিক্ষাসংস্কৃতিবানদের ও দেশ হিতৈষীদের সজাগ দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে। আর এ নিয়ে দেশের সর্বত্র প্রতিবাদের তুমুল ঝড় উঠেছে।

এ সম্পর্কে আমাদের দেশের প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রিয় নাগরিকের কাছে আকুল আহ্বান জানাতে চাই যে,—তাঁরা যেন তাঁদের প্রিয় জাতীয় সংগীতকে সরকারী সমর্থনে ভারতের স্থায়ী জাতীয় সংগীত হিসেবে গণ্য করার কাজে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁদের ন্যায়সংগত দাবী প্রতিষ্ঠা করেন। পরিশেষে গণপরিষদের সদস্য ও আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের শুভ বুদ্ধির কাছে আমাদের করুণ আবেদন এই যে, ভারতের জাতীয় সংগীত নির্ধারণের কাজে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে, তখন যেন তা সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে জন-গণ-মনের মতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেই করা হয়।
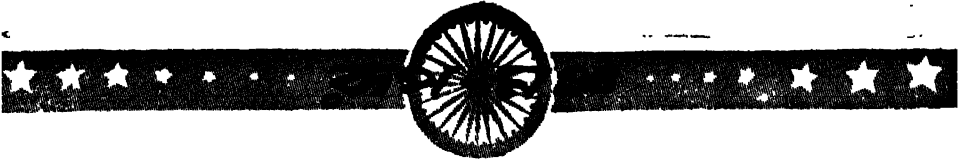
জাতীয় সংগীত সম্পর্কে আমার মতামত

ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য

★

শিল্পী হিসেবে আমারও যে একটা মতের মূল্য আছে, জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে কিছু লিখতে বসে সেটা বুঝবার সুযোগ পেলাম। সুযোগদাতা কালীশবাবুকে তাই আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাচ্ছি।

মাত্র কিছুদিন আগে আমরা, বাঙালীরা, বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফলই পাওয়া যায়নি। আমার মনে হয়, আজ কিন্তু আমরা সেই রকমই একটা দিন পেয়েছি নিজেদের দাবী জানাবার। কারণ, যে দুটি জাতীয় সংগীত আজ এতবড় একটা সমস্যা এনেছে, একমাত্র বাঙালীই তা সম্পূর্ণ নিজের ব'লে দাবী করতে পারে। জাতীয় সংগীত, তাই জাতীয়তাবোধের খাতিরে আমি আমার নিজস্ব মতামত এ সম্বন্ধে জানাচ্ছি।

কার্যক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধেরও আবার সীমা আছে। পেরিয়ে গেলেই রাজনীতির সংগে দেখা হবেই। ভয় সেখানেই কিন্তু তবুও একথা ব'লব, "বন্দেমাতরম্" না হ'য়ে "জনগণ মন অধিনায়ক" এটাই হবে জাতীয় সংগীত এ নির্দেশ যাঁরা দিয়েছেন, মাপকাটি তাঁদের হাতে। তাই, জাতীয় সংগীতের নামে একটা বিজাতীয়ভাবের সৃষ্টির চেষ্টা, এর মধ্যে ধরা পড়ে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার মত।

আমি আগেই বলেছি, "বন্দেমাতরম" এবং "জনগণ মন অধিনায়ক" মানে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ—এঁরা বাঙালী, এঁরা বাঙলার। বাঙলার তথা ভারতবর্ষের জাতীয়তার ইতিহাসে এঁদের দাম সবার আগে, এ কথা অনিবার্য সত্য। বাঙলা চিরদুর্ভাগা, "ভাল খেলিয়াও পরাজিত"এর মত।

বাঙালী হ'য়ে এঁদের একজনকে রেখে আর একজনকে আমরা ফেলতে পারিনা এই সুযোগ নিয়েই নির্দেশকরা নির্দেশ দিয়ে খালাস হলেন আর আমরা, উৎকট ভক্তরা, "কেউ বিশ্বকবির জয়", কেউ "সাহিত্য সম্রাটের জয়" ব'লে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি ক'রে চ'লেছি। অথচ মুশকিল, গান দু'টোর যে কোন একটাকে আমাদের বেছে নিতে হবে। তাই আমার মতে, আমাদের জিনিষে আমাদের কোন দাবীর প্রয়োজন যাঁরা বোধ করেননি, তাঁদের নির্দেশ মেনে নেবার আগে, যুক্তিতর্কের বিনিময়ে আমরা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে কিছু ক'রতে পারব ব'লে আশা করছি।

পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করার দীক্ষা যাঁরাই নিয়েছিলেন, "বন্দেমাতরম"ই ছিল তাঁদের মন্ত্র। এই "বন্দে মাতরম"ই এতদিন বিদেশী শাসকদের শোষণ কার্যে, অনেক সহায়তা ক'রে এসেছে।

বর্তমান ভারতের শাসন কার্যের ভার যাঁদের হাতে, এঁদেরই নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য বহু স্বাধীনচেতা যুবক ছুটে এসেছিল তাঁদের ঘর ছেড়ে। তাঁদের মুখে ছিল "বন্দে মাতরম", মনে ছিল বিদ্রোহের আগুন। তাই বহু মা'কে হ'তে হ'য়েছে সন্তানহারা, বহু স্ত্রী'কে হ'তে হ'য়েছে স্বামীহারা। বৈদেশিক শাসন এবং শোষণ নীতির অবসানের একমাত্র কারণ, এই মা-বোনদেরই দীর্ঘশ্বাস। ভারত আজ স্বাধীন। বৈদেশিক উৎপীড়িত নেতৃত্ব আজ স্বাধীন জনগণের কর্তৃত্বের সুযোগ এনে দিয়েছে। স্বাধীন ভারতের চল্লিশ কোটি জনগণের জীবন মরণ সমস্যা হাতে নিয়ে এঁরা সে সুযোগের অপব্যবহার করছেন।

কর্তৃপক্ষ ব'লেই এঁরা আমাদের থেকে বেশী বুদ্ধি ধরেন, তাই "বন্দেমাতরম" গানটির মধ্যে আজ এঁরা দেখতে পেয়েছেন, কবি শুধু বাঙলারই জয়গান করেছেন। অথচ তাই বা কেমন ক'রে হবে। বেঁচে থাক "পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ।" শুধু তাই নয়। "জনগণ মন অধিনায়ক" নির্দিষ্ট যখন কেউই নন,......দেখাই যাক না।

অতএব দু'টোর এইটাই জাতীয় সংগীত হিসাবে বহাল হ'য়ে গেল। কবির কল্পনার অমর্যাদা ক'রে, বাস্তবটাকে নিয়ে টানাটানি ক'রেই এঁরা ক্ষান্ত হ'লেন না, নিজেদের সুবিধার জন্য রাষ্ট্রভাষার অজুহাতে গানটিকে নিজেদের সংস্করণে ফেলে, কবির অস্তিত্বটাকেও আড়াল ক'রে রেখে দিয়েছেন।

কিন্তু তা হ'তে আমরা দেব না। জাতীয় সংগীত "বন্দে-মাতরম"ই হোক অথবা "জনগণ মন অধিনায়ক"ই হোক,
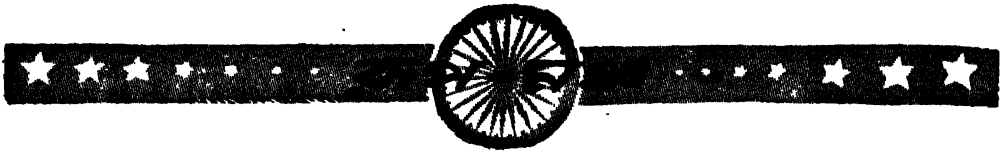
ভাষার অমর্যাদা না ক'রে তা সব সময়ে বাঙলা ভাষাতেই সবাইকে গাইতে হবে, এই আমাদের দাবীর কথা।

তবুও আমাদের অনুরোধের কথা জানাতে আমরা ভুলব না, "বন্দে মাতরম"কে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করতে। আমরা শক্তির পূজারী, শক্তিকে মাতৃভাবেই গ্রহণ ক'রে এসেছি। আমাদের দেশের বহু নেতা, পরাধীন ভারতে থেকে, বিদেশীদের কাছে 'Mother India, Mother India' ব'লে ভাবাবেশে করুণা ভিক্ষা ক'রে এসেছেন। আর আজ স্বাধীন ভারতকে "বন্দে মাতরম" বলতে কোথায় যে তাঁদের মর্যাদা হানি হচ্ছে বুঝতে পারি না।

স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত

জগন্ময় মিত্র, সুর-সাগর

★

মস্ত বড় সমস্যা আজ দাঁড়িয়েছে ভারতের জাতীয়-সংগীত নিয়ে। "বন্দেমাতরম্" ? না—"জন-গণ-মন-অধিনায়ক" ? ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছেন 'জনগণ' গানটীকেই মধ্য-বর্তী কালের জন্য জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হোক। কিন্তু পণ্ডিত জহরলাল নে'হরু যেদিন বল্লেন, "Indian National song is still to be written," শুনে আমরা স্তম্ভিত হ'লাম। স্তম্ভিত হ'লাম এই জন্য যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হওয়া অবধি, তাই কেন, তারও আগে হতে আমরা শুনে আসছি, "বন্দেমাতরম্"কেই স্বাধীনতা সংগ্রামের মন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যা কিছু অনুপ্রেরণা, স্বদেশ-প্রেমিকতা আমাদের দেশে যুগিয়েছে এই বন্দেমাতরম সংগীত। ভারতের পরাধীনতার মর্মস্পর্শী ইতিহাস যখন রচিত হবে, স্বর্ণাক্ষরে তাতে কি লেখা থাকবে না যে, প্রত্যেক দেশপ্রেমিক "বন্দেমাতরম" বাণী উচ্চারণ করেই কারাবরণ করেছিলেন, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই "বন্দেমাতরম" উচ্চারণ করেই শত শত শহীদের কণ্ঠ নীরব হ'য়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামকে জয় যুক্ত করার জন্য আমাদের কত ভাই এই বন্দেমাতরম ধ্বনী কণ্ঠে নিয়ে হাসতে হাসতে বৃটিশের বন্দুকের গুলি সগৌরবে বক্ষে ধারণ করেছেন। বন্দেমাতরমের আশীর্বাদ আজ ফলবতী হয়েছে—ভারত আজ স্বাধীন। "বন্দেমাতরম" দেশমাতার পূজা-মন্ত্র। আমরা জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃরূপে পূজা করতেই অভ্যস্ত, দেশমাতার বন্দনা ছলে কোন দেশ-নায়কের বন্দনা গান আমরা কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি। তাই আজ 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' কোন নেতার বন্দনা গানে আমরা প্রস্তুত নই। কবিগুরু নিজেই তাঁর চিঠিতে একথা পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন যে, এ গান তিনি দেশের কোন নেতাকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেন নি, এই গানে তিনি সম্বোধন করেছেন "যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীর চির সারথিকে" এইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ গান দেশ মাতৃকার বন্দনা গান নয়। অতএব স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত বলতে আমরা, তথা সারা ভারতবাসী দেশ-মাতৃকার বন্দনা করতে "বন্দেমাতরম"কেই জাতীয় সংগীত বলে মেনে নিয়েছি এবং অনন্তকাল মেনে নেব।

—"বন্দেমাতরম্"।

জাতীয় সংগীত

নিত্যগোপাল বর্মণ

"বন্দেমাতরম্" ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানলব্ধ মন্ত্র। অর্ধ শতাব্দী যাবৎ এই শক্তিমন্ত্র কোটি কোটি ভারতবাসীকে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে।

সমগ্র গানটির ভিতর দিয়ে শক্তি, ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও কৃষ্টি সম্পন্ন স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন ভারতের গৌরবোজ্জল ছবিই ফুটে উঠেছে। আজ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীত রূপে যে গান সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠিত অভিনন্দন পেয়ে এসেছে—কী দুর্ভাগ্যের বিষয়—সেই গানকে জাতীয় সংগীতের আসনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ দ্বিধা বোধ করছেন।

বিরুদ্ধবাদিগণ গানের অন্তর্নিহিত ভাব সম্পর্কে যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা নিতান্ত ছেলেমানুষী। অন্য আপত্তি হ'ল গানের সুর সম্পর্কে। 'বন্দেমাতরম্' গানের প্রচলিত

জহর মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত সুধা প্রডাকসনের 'প্রতিরোধ' চিত্রে কমল মিত্র ও মীরা সরকারকে দেখা যাচ্ছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন খগেন রায়।
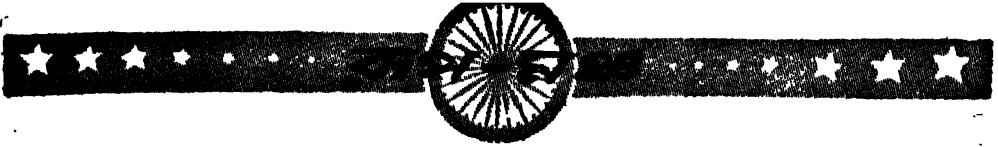
সুর সমবেত কণ্ঠ-সংগীত রূপে গীত হওয়ার যোগ্য নয়। এই হেতু ভারতের বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত মহলে "জন-গণ" গানটি ঐ ভাবে গীত হয়। ফলে উহা দেশী বিদেশী সকলের নিকট থেকেই সম্বর্ধনা লাভ করে। কাজেই সর্বত্র সরকারী অনুষ্ঠানে "জন গণ" গানটি সমবেত ভাবে জাতীয় সংগীত রূপে গাওয়া উচিত। এই হল কর্তাদের মত। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই 'বন্দে-মাতরম' গানের যে সুর চলে এসেছে, বর্তমান কালেও অনেকে মোটামুটি সেই সুরেই গানটি গেয়ে থাকেন। অনুরূপ ধরণের একটি সুর রবীন্দ্র-নাথও দিয়েছিলেন। ওঁঙ্কার নাথজী ও একটি আবেদন-শীল সুরে. এই গানটির রেকর্ড করেছেন। এই সকল বিভিন্ন সুরের প্রত্যেকটিই গানের ভাবধারার সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে রচনা করবার ফলে অনেকটা প্রার্থনা মূলক হয়েছে সত্য; কিন্তু ঐক্যতান বাদ্য সহযোগে সমবেত ভাবে গাওয়ার উপযোগী একটি ছন্দোবদ্ধ সুরও যে 'বন্দে-মাতরম্' গানে দেওয়া যেতে পারে, তিমিরবরণ তা' প্রমাণিত করেছেন। সেই সুর সকলের মনঃপূত না হলে, সর্ববাদী-সম্মত একটি ভাবময়, মনোজ্ঞ অথচ অর্কেষ্ট্রা যোগে সমবেত কণ্ঠে গাওয়ার উপযোগী সুর দেওয়া অসম্ভব কিছুই নয়।

চিত্রশিল্পে সম্পাদকীয় দপ্তর

রবীন দাস

★

বিজ্ঞানের ছনিয়ায় চিত্রশিল্প একটি অপূর্ব দান। আধুনিক জগত এই বিজ্ঞানকে তার বাহনরূপে কাজে লাগিয়ে শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য এবং কৃষ্টিকে সহজেই অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই যে চিত্রশিল্প-বিজ্ঞান,—এর দায়িত্ব অনেকখানি এবং যাঁরা এই চিত্রশিল্প সংগঠনের পেছনে রয়েছেন, তাঁদেরও দায়িত্ব যে কতোখানি তা সহজেই অনুমেয়। পর্দার ওপরে সাফল্যের দায়িত্ব যাঁদের রয়েছে, তাঁদের আপনারা অনেককেই চেনেন। কিন্তু পর্দার পেছনে থেকে যাঁরা এই পর্দার ওপরের মানুষদের সাফল্যকে এগিয়ে দেন, তাঁদের হয়তো সকলকে আপনারা চেনেন না। চিত্র-সম্পাদক এই দলেরই একজন।

ছায়াছবি দেখিয়ে লোককে আনন্দ দেওয়া—কোন বন্ধুকে খুশী মনে ভোজের আসরে নিমন্ত্রণ করার মত। নিমন্ত্রণের আহ্বান হ'চ্ছে এর প্রচার বিভাগ— আর পরিবেশন করাটা সম্পাদনা। তৈরী ছবির পরিবেশন মানে ডিষ্ট্রীবিউশন — কিন্তু তৈরীর পথে চিত্রশিল্পের কলার পরিবেশন হ'চ্ছে সম্পাদনা। অর্থাৎ ভোজের থালায় কখন কোন সুখাদ্যটুকু পরিবেশন করলে ভোক্তার সব থেকে বেশী পরিতৃপ্তি হবে, চিত্র-সম্পাদকের কাজ সেইটাই। ভোজের আসরে এতো বড় দায়িত্ব যাঁর, তাঁকে আমরা কতোটুকুই বা চিনি? যাঁরা একটু আধটু জানেন—তাঁরা হয়তো ভাবেন, সম্পাদকরা 'জয়েনার'; —মানে ছবির সংগে ছবি জুড়ে যাওয়াটাই তাঁদের কাজ। কিন্তু অন্যান্য দেশে এই সম্পাদকদের স্থান অনেক উঁচুতে। তাঁদের কাছে সম্পাদক 'সৃষ্টিকর্ত্তা' ও 'যাদুকর' আখ্যা পেয়ে থাকেন। যশের মালা পরিচালকের সংগে তাঁদের গলায়ও জড়িয়ে যায়—কেননা, এঁদের হাতের ছোঁয়া পেয়ে ছবির হাত-পা কাটা অংশগুলো এক হ'য়ে নির্জীব কাগজের ওপর লেখা কাহিনীটুকুকে পর্দার ওপর সজীব ক'রে তোলে।

এ হেন যে সম্পাদনা—এর বিষয় সঠিক বুৎপত্তি লাভ করা সত্যিই একটি সাধনার বস্তু। কারণ, বিজ্ঞানসম্মত বই যা এর রসানুভূতির দিকে আলোক-সম্পাত করতে পারে—তা বোধ হয় পৃথিবীর বাজারে এখনো প্রকাশিত হয়নি। যা আছে, তা এর যান্ত্রিক বিশ্লেষণ মানে, সত্যি কথা ব'লতে গেলে সম্পাদনার গোড়ার কথা নিয়েই লেখা। তাহ'লেই এই অ-আ-ক-খ টুকুকেই সম্বল ক'রে কেউ যদি সম্পাদক হবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তবে তিনি সত্যিই ভুল ক'রবেন। কারণ, সম্পাদক হ'তে গেলে চাই বিচক্ষণতা থেকে পাওয়া রসবোধ।

এই প্রসংগে বলা যেতে পারে যে, সত্যিকারের সম্পাদকের কাজের সমালোচনা করাটাও একটি কঠিন কাজ। সাধারণ সমালোচকেরা সম্পাদনার বিষয় আলোচনা ক'রতে গিয়ে অনেক সময় হাস্যকর প্রসংগের অবতারণা ক'রে থাকেন। যেমন, 'ছবিটা out-synce. হ'লো কেন', 'লাফাচ্ছে কেন' বা 'তাড়াতাড়ি চলছে কেন'? কিম্বা কোন দাগী সমালোচক এক হাত নিয়ে মন্তব্য করলেন,—'ছবিটায় আর একটু কাঁচি চালালে ভাল হ'তো।' এই পর্যায়ের সমালোচকদের কথা আলোচনা ক'রতে গিয়ে যীশুখৃষ্টের ভাষায় ব'লতে হয়, 'প্রভু, এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি ব'লছে।' কেননা, এঁরা কেউই জানেন না, ছবি কি ভাবে কাটতে হয় এবং কি ভাবে ওই আলোচিত চিত্রটিকে কেটে সম্পাদক তাঁর টাইম ফ্যাক্টর, অ্যাকশন কন্‌টিনিউটি, ভিস্যুয়াল শক্, সাউণ্ড জার্ক, রিদিম্ ইত্যাদি বাঁচিয়েছেন। সমালোচনাটা আমাদের দেশে মুড়ি-চাল ভাজার সামিল। এই সমালোচকেরাই যদি চিত্র সম্পাদনা কি এবং তা কতো গুরুত্বপূর্ণ জেনে এ সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতেন, তাহ'লে তাঁদের অনেকেরই রসনা স্তব্ধ হ'য়ে যেতো—কিম্বা ফাউণ্টেনপেনের কালি শুকিয়ে যেতো নিঃসন্দেহে।

সম্পাদকের কাজ ছবি তোলা হ'য়ে যাওয়ার পর। তোলা ছবিগুলি যখন তাঁর কাছে এলো, তিনি সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে
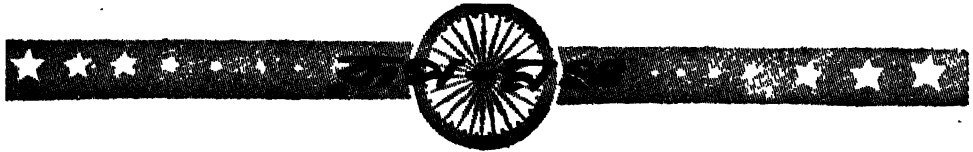
সাজিয়ে দিলেন। এই তোলা ছবির গল্পটুকুকে পরিবেশন করতে গিয়ে তিনি যদি নতুন কিছুর প্রয়োজন বোধ করেন, তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর মনেই থেকে যায়। কারণ, তাঁর প্রয়োজন বোধে ছবি পরিবেশন করানো অন্যেরা প্রায়ই অসম্মানজনক কাজ বলে মনে করে থাকেন। এই অন্যেরা কারা ?

যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। কালোবাজারীরা এখন চিত্র সমুদ্রে টোপ ফেলছেন তাঁদের কালো হাতের খেলা আর একবার দেখবার জন্যে। এঁদেরই কেউ হয়তো ছবির বাজারে একদা দেখা দিলেন প্রডিউসার-ডাইরেক্টর রূপে। ইনি হয়তো ইতিপূর্বে কোনদিন ষ্টুডিওর দরজা মাড়াননি—এমন কি জীবনে কোনদিন স্যুটিং পর্যন্ত দেখেন নি। এঁদের নিজস্ব জ্ঞান থেকে গৃহীত হয়ে যে-ছবি সম্পাদকের হাতে এসে পেঁছায়, তাকে সুষ্ঠুভাবে সাজানোর দুঃসাধ্য প্রচেষ্টায় নাজেহাল হ'য়ে যখন বেচারী সম্পাদক বিরক্তি প্রকাশের চেষ্টা করেন—পাশে বসে তখন এই সমস্ত পরিচালকদের মুখ থেকে হরেক রকম অস্বস্তির বাণী শোনা যায়। যথা—এই-বারটা ভাই, কোন রকমে ঠিক ক'রে দাও—পরের বার-তোমাদের রাজা করে দোব।' কিন্তু রাজা করবার আগেই ছবি যখন মার খেয়ে ফিরে এলো দর্শকদের কাছ থেকে—তখন একযোগে সমালোচক এবং প্রডিউসার-ডাইরেক্টরের দল দোষারোপ করতে থাকেন সম্পাদকের ওপর। ছবির সাফল্যের জন্যে চিত্র গ্রহণকে দায়ী না করে সাজানোটাকেই দায়ী করা হ'য়ে থাকে। এমনি মজার ব্যাপার—বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার কর্তৃপক্ষ এবং চাঁই সমালোচকবৃন্দ এই শ্রেণীর পরিচালকদের ছবির মহরতের শুভ মুহূর্ত থেকে আরম্ভ ক'রে ছবি শেষ হ'য়ে দর্শক সাধারণের কাছ থেকে মার খেয়ে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত মাথায় ক'রে নিয়ে নাচতে থাকেন। জানি না, কেন এবং কি স্বার্থে! অথচ এই পত্রিকাওয়ালারাই আবার ন্যায়রত্ন সেজে এঁদের মাটিতে মিশিয়ে দিতে কিছুমাত্র কসুর করেন না সময় বিশেষে এবং এঁদের সংগে সংগে সম্পাদক ও সেই চিত্রের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মীরাও বাদ পড়েন না সেই অপবাদ থেকে।

এই তো গেল আনাড়ী পরিচালক এবং ভুঁইফোড় প্রতিষ্ঠানের ছবির কথা। এ ছাড়া, প্রখ্যাত পরিচালক এবং খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ধরণের মনোভাব দেখা যায় যা, মোটেই প্রশংসা-যোগ্য নয়। তাঁরা মনে করেন, তাঁরা যা করেছেন বা ভেবেছেন—তার ওপর আর কিছু ভাববার বা করবার নেই—থাকতে পারে না। সম্পাদকের 'সাজেসান' বা চিন্তার কোন মূল্যই তাঁরা দেন না—দিতে চান না।

এমনিতর নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে সম্পাদকদের এগিয়ে যেতে হয় তাঁদের সুনাম এবং যোগ্যতা বজায় রেখে। যে কোন সম্পাদকেরই কতকগুলো জিনিষ বিশেষভাবে থাকা প্রয়োজন। সুশিক্ষা তার মধ্যে প্রধান জিনিষ। তাছাড়া ড্রামা সেন্স, শিল্পবোধ, চোখ এবং কানের যথেষ্ট তীক্ষ্ণতা এবং ভাষার ওপর বেশ খানিকটা দখল। সুরের যেমন তাল-লয় আছে—কথা বলার মধ্যেও তেমনি একটা স্বাভাবিক তাল-লয় বা সহজ ছন্দ বিন্যাস আছে। ভাষার এই মাত্রা-জ্ঞান সম্পাদনার কাজে বিশেষ ভাবে থাকা প্রয়োজন।

সম্পাদনার সংগে চিত্র জগতের অন্যান্য যে সমস্ত বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ র'য়েছে—যেমন, রসায়নাগার, ক্যামেরা, সাউণ্ড ইত্যাদি, সেগুলি সম্পর্কেও সম্পাদকের একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিৎ। না হ'লে তাঁর কাজের পদে পদে ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাবে অজস্র। সিনেমা জগতের অধিকাংশ লোকেরই সম্পাদনা শেখবার একটা আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু উপযুক্ত ভাবে শিক্ষার অভাবে 'অল্প-শিক্ষা ভয়ঙ্করী' রূপ প্রকাশ পায় তাঁদের কথায়-বার্তায়, কাজে এবং কর্মে। স্বল্প শিক্ষিত এই শ্রেণীর কর্মীবৃন্দের দ্বারা চিত্রশিল্পের সমূহ ক্ষতিরই সম্ভাবনা। ছবির মালিকেরা এঁদের বাক্-চাতুর্যে ভুলে অল্প টাকায় কাজ উদ্ধারের আশায় তাঁদের হাতে ছবির দায়িত্ব তুলে দিয়ে একাধারে এই শিল্পের এবং সম্পাদক-সম্প্রদায় উভয়েরই ক্ষতি করে থাকেন।

এই প্রসংগে আরও একটি কথা সম্পাদকদেরও সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, সব সময় তাঁরাই যা ব'লবেন, তাও সঠিক নাও হ'তে পারে। তার চেয়ে কোন উন্নত ধরণের শিল্প-

বোধের পরিচয় পরিচালক বা সংশ্লিষ্ট কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে সেটুকুকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করার মত উদারতা সম্পাদকের থাকা প্রয়োজন।
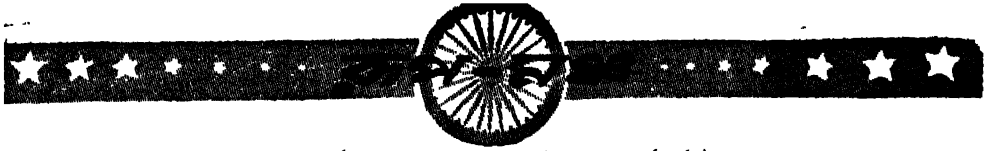
সম্পাদনা কি এবং কি ভাবে তা সম্পাদিত হ'য়ে থাকে—কাগজে-কলমে অল্প কথায় তা বোঝান খুব সহজসাধ্য কাজ নয়। তাছাড়া, বিষয়টি এতই কার্যকরী-জ্ঞানের (Technical knowledge) ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, সাধারণের কাছে তা উপভোগ্য না হওয়ারই সম্ভাবনা। তবু এই প্রবন্ধে তার কিছুটা আভাষ আমি দিতে চেষ্টা করবো।

কোন কাহিনীকে চিত্ররূপ দিতে হ'লে প্রথমে কাহিনীটির একটা সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। এই চিত্রনাট্য হ'চ্ছে, গল্পটি স্থান-কাল-পাত্র এবং সমতা অনুসারে নানা দৃশ্যে ভাগ ক'রে পর পর সাজানো। আবার সেই দৃশ্যগুলিকে কয়েকটি সট্ বা খণ্ড দৃশ্যে ভাগ করে নেওয়া। কাহিনীকে এই ভাবে দৃশ্য বা খণ্ড-দৃশ্যে ভাগ করার সময় টাইম-স্পেস, তাল-লয়, পাঙ্কচুয়েশন, ভিস্যুয়াল সক্, সাউণ্ড জার্ক, এ্যাকশন কণ্টিনিউটি, অভিনয়ের সমতা এবং আরো বহু প্রকার টেকনিক্যাল জার্কের দিকে লক্ষ্য করা প্রয়োজন এবং সেই মত চিত্র গ্রহণ করা উচিত। এক একটি সট্ যদিও পর্দার ওপর মাত্র কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী হয়, তবু এই ক্ষণস্থায়ী ছোট ছোট সট্গুলিকে সঠিক ভাবে দর্শকদের কাছে পরিবেশন করার জন্যে একাধিক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এর পেছনে দিন রাত উঠে পড়ে লেগে আছেন। এই কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেন না, সামান্য একটু ভুলের জন্যে সট্গুলি জোড়া লাগাবার পর দেখা যায়—বার বার চোখের ওপর ধাক্কা দিতে থাকে। ফলে দর্শকদের কাছে ছবিটি মোটেই উপভোগ্য হয় না।

প্রশ্ন করতে পারেন—প্রয়োজন কি দৃশ্যগুলিকে ছোট ছোট সটে ভাগ করার - যখন তাতে এত ঝুঁকি? এক সংগে সমস্ত দৃশ্যটি তুলে নিলেই তো মিটে যায় সমস্ত ঝামেলা! উত্তরে ব'লবো—'Visual variety is one of the main technical features of film making.' নানা কোণ থেকে একটার পর একটা ছবি এসে দর্শকের চোখ এবং মনকে ছবির সংগে মিশিয়ে দেয়। একই জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে এক সংগে সমস্ত দৃশ্যটা তুলে গেলে কিছুক্ষণ দেখার পরই দর্শকের ক্লান্তি আসবে। পুতুল নাচের মত নাটকের পাত্র পাত্রীরা যাবে আসবে এবং হাত পা নেড়ে কথা বললে ছবিটা একঘেয়ে এবং অস্বস্তিকর ব'লে মনে হতে বাধ্য। কিন্তু টুকরো টুকরো ক'রে নেওয়ার ফলে ছবির কথা ভুলে দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ব'সে ছবিটা সত্যি বলে মনে ক'রতে থাকেন। গল্পের ঘটনা অনুযায়ী তাঁদের চোখে ফুটে ওঠে কখন হাসি, কখন কান্না, কখন বা রাগ-বিদ্বেষ।

কাহিনীর টুকরো টুকরো তোলা অংশগুলি রসায়নাগার থেকে পরিস্ফুটিত হ'য়ে সম্পাদকের হাতে আসার পর কি ভাবে সম্পাদক তাকে সাজিয়ে দর্শকদের কাছে তুলে ধরেন, এইবার সেই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। সংক্ষেপে ব'লতে হবে এইজন্যে যে, বিষয়টি এতই বিরাট এবং ব্যাপক—যার বিস্তৃত বিবরণে স্থানাভাব ঘটতে
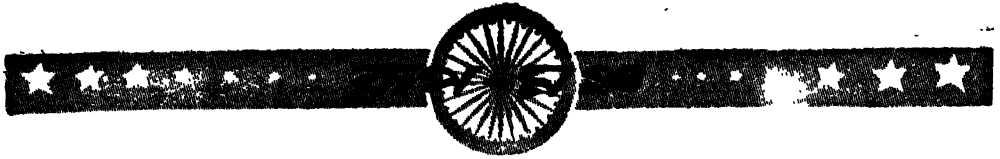
পারে হয় তো। এ সম্বন্ধে সাধারণের আগ্রহ থাকলে ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে আরো অনেক কথা জানানো যাবে। আজ সামান্য কয়েকটি কথায় কিছুটা আভাষ এ সম্বন্ধে আপনাদের দিয়ে রাখি এখানে।

মনে করুন একটা দৃশ্যের কথা। রাম বহুদিন পরে বিদেশ থেকে ফিরছে। ভাই লক্ষ্মণ তাঁকে ষ্টেশনে নিতে এসেছে। সেখানে তাঁদের উভয়ের মিলন হ'লো।

ঘটনাটির চিত্রনাট্য করা হ'লো এই ভাবে :—

ঠাকুরগাঁ রেল স্টেশন। ট্রেন আসার আগে স্টেশনের কর্ম-ব্যস্ততা। ফেরিওয়ালারা ফেরি ক'রছে। পান-বিড়ি চা ইত্যাদি ফেরি করবার সম্মিলিত মৃদু কোলাহল। অপেক্ষমান যাত্রীর দল ব্যস্তভাবে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রছে। মাঝে মাঝে দূরে লাইনের দিকে তাকিয়ে দেখছে ট্রেন আসছে কিনা। লক্ষ্মণও তার মধ্যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। পরণে ধুতি ও ছাপা ছিটের মেরজাই। মেরজাইটি সদ্য পাট ভাংগা। হাসি হাসি মুখে পান চিবোচ্ছে ও মাঝে মাঝে দু'হাত দিয়ে জামার কোঁচান অংশগুলি সমান ক'রতে চেষ্টা ক'রছে। হঠাৎ ঘণ্টা পড়লো! সকলে আরো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো—কোলাহলও কিঞ্চিৎ বেড়ে গেল! দূরে ডিষ্ট্রান সিগ্‌নাল ছাড়িয়ে —আরো দূরে ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিল। ট্রেন ক্রমশঃ এগিয়ে এসে স্টেশনে প্রবেশ ক'রলে। রাম একটা কামরা থেকে নেমে আশে-পাশে তাকিয়ে হঠাৎ লক্ষ্মণকে দেখে মৃদু হেসে তার কাছে এগিয়ে এলো। লক্ষ্মণও রামকে দেখলো। সে তার সঙ্‌ সাজা পোষাকের জন্যে একটু লজ্জা অনুভব ক'রলো মনে মনে। রামের পরণে খদ্দরের হাতকাটা পাঞ্জাবী, কোমরে বাঁধা কাপড়। লক্ষ্মণ এগিয়ে গিয়ে দাদার পদধূলি নিল। রাম তাকে জড়িয়ে ধরলে বুকে—চোখে জল। ট্রেন চলে গেল স্টেশন ছেড়ে। রাম চারিদিকে তাকিয়ে প্রাণ ভরে একবার নিশ্বাস নিলো —তারপর একটি মাত্র কথা উচ্চারণ করলো—"চল"।

এই ঘটনাটির আরো বহু রকম চিত্রনাট্য ক'রতে পারেন বহু পরিচালক তাঁদের নিজস্ব কল্পনা-শক্তির তারতম্য অনুসারে। কিন্তু চিত্র গ্রহণের সময় হয়তো সম্পূর্ণভাবে সেই চিত্রনাট্যকে অনুসরণ করা সম্ভব নাও হ'তে পারে। কারণ, ট্রেন বা রেল কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়—পরিচালকের ইচ্ছা বা আদেশ অনুসারে সব সময় তাকে চালানো যায় না। সেক্ষেত্রে কার্যকালে উপস্থিত বিশেষজ্ঞরা চিত্রনাট্য ছাড়াও ঘটনাটিকে প্রকাশ করার মত সহজ প্রাপ্য অন্য কতকগুলি ছবি নিয়েও সম্পাদকের হাতে তুলে দেন। সম্পাদক তখন সেগুলিকে দিয়েই ঘটনাটুকুকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন।

চিত্রনাট্যটি থেকে পরিচালকেরা তৈরী করেন সুটিং স্ক্রিপ্ট্ অর্থাৎ যা থেকে কার্যস্থলে চিত্রগ্রহণ করা হয়। কার্যস্থলটিকে আবার কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে নিয়ে সেই সেই স্থানের গ্রহণীয় অংশগুলিকে স্ক্রিপ্ট্ থেকে আলাদা করে তৈরী হ'লো Divisional-chart বা বিভাগীয় তালিকা। উপরোক্ত ঘটনাটির বিভাগীয় তালিকা হবে এই রকম :—

১ম সট্—লঙ্ সট্—রেল লাইন ও ডিষ্ট্রান সিগ্‌নাল। শূন্য রেল লাইন খাঁ খাঁ ক'রছে।

৩য় ও ৫ম সট্—লঙ্ সট্—রেল লাইন ও ডিষ্ট্রান সিগ্‌ন্যাল। দূরে ট্রেণ আসছে।

৭ম সট্—লঙ্ সট্—ট্রেন ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে।

৯ম সট্— — —ট্রেনের চাকা ঘুরতে ঘুরতে আস্তে আস্তে থেমে যায়।

১০ম ও ১১শ সট্—হুঁইশিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলো।

এই গেল একদিকের কাজ। অন্য দিক থেকে নিতে হবে।

২য় সট্—ষ্টেশন ঠাকুর গাঁ। লোকজন ও অন্যান্য ষ্টেশনের পরিবেশ।

৪র্থ সট্—ষ্টেশনের একাংশ। যেখানে ফেরিওয়ালারা ফেরি ক'রছে।

৬ষ্ঠ সট্—ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর। পাশে ঘণ্টা, ওজন করার যন্ত্র ইত্যাদি।

৮ম সট্—ষ্টেশনের অন্য দিক। সেখানে টিকিট কালেক্টর টিকিট নিচ্ছে এবং লোকজন যাতায়াত ক'রছে।

৯এ সট্—ট্রেন আসার কিম্বা ছাড়ার ঘণ্টা প'ড়লো।

৮এ সট্—যাত্রীরা ট্রেনের আসার পথের দিকে তাকালো।

৮বি সট্—৮ম সটের জায়গায়। লক্ষ্মণ তাকালো। লজ্জায়
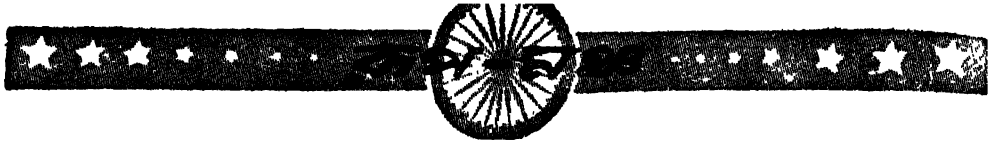
চোখ নামিয়ে এগিয়ে এলো। রামের সংগে দেখা হ'লো এবং পায়ের ধূলো নিলো। রাম তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। পরে 'চল' ব'লে দুজনে বেরিয়ে গেল।

৩নং দিক থেকে নিতে হবে একটি মাত্র সট্—একখানি কামরা। রাম বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে লক্ষ্মণকে দেখলো—মৃদু হেসে গাড়ী থেকে নেমে লক্ষ্মণের দিকে এগিয়ে গেল।

এই ভাবে ছবি তোলা হবার পর রসায়নাগার থেকে পরিস্ফুটিত হ'য়ে সেগুলি সম্পাদকের কাছে এলো। তিনি তাকে Continuity Sheet দেখে নম্বর অনুযায়ী ভাগ করে নিলেন প্রথমে। ছবি এবং শব্দের দু'টি আলাদা আলাদা ফিল্ম্ জোড়া মিলিয়ে টেবিলের ওপর রেখে চিত্রনাট্য থেকে দৃশ্যটি আর একবার ভাল করে পড়ে দেখলেন। ঐ দৃশ্যটি কাহিনীর কোন্ অংশে, কিভাবে আসছে তা তিনি বেশ করে ভেবে ঐ সট্গুলি থেকেই চিত্রনাট্য অনুসারে সাজানো ছাড়াও ভালভাবে গল্পকে বলা সম্ভব কিনা চিন্তা ক'রতে লাগলেন। এইভাবে একে একে তিনি সট্গুলি সমস্ত Moviola-এ (ছবি দেখা এবং শব্দ শোনার একটি ছোট যন্ত্র) চালিয়ে গেলেন। গৃহীত ছবির ২নং সট্টিই ছবির আরম্ভের পক্ষে ভাল বলে মনে হ'লো তাঁর কাছে। সিঙ্ক্-নাইজারে ফেলে শব্দ এবং ছবিকে পাশাপাশি মিলিয়ে তিনি বাড়তি অংশগুলি কেটে সট্টি জুড়ে দিলেন তখন। যে সট্টি এইমাত্র তিনি ছবিতে জুড়লেন পরিচালক সেটিকে গ্রহণ করেছিলেন এইভাবে :—

ঠাকুর গাঁ ষ্টেশনের উপরিভাগ—ক্যামেরা ধীরে ধীরে নীচে ষ্টেশন মাস্টারের ঘরের কাছে নামলো—ভেতর থেকে পয়েন্টস্ম্যান বেরিয়ে এসে ডান দিকে এগিয়ে চললো—ক্যামেরাও তার সংগে সংগে এগিয়ে গিয়ে সমস্ত ষ্টেশনের পরিবেশটিকে দেখাতে লাগলো—ফেরিওয়ালাদের কাছে এসে ক্যামেরা থেমে গেলো—সেখানে লক্ষ্মণ বসেছিল, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাঁ দিকে বেরিয়ে গেলো। এই পর্যন্তই প্রয়োজন সম্পাদকের। বাকীটা তিনি কেটে ফেলে দিলেন।

তারপর ধরলেন ৮নং সট্। আগের মতই শব্দ ও ছবি পাশাপাশি মিলিয়ে সেটিকে তিনি এই ২নং সট্টির পর জুড়ে দিলেন। ৮নং সট্টি ছিল—ষ্টেশন গেট—টিকিট কালেক্টর যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করছেন—ভিড়ের মধ্য থেকে ডান দিক দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে লক্ষ্মণ প্রবেশ ক'রলে—এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এবং জামার ওপর সযত্নে হাত বোলাতে বোলাতে বাঁ দিকে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল—ঘরের ভেতরের বড় ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে মুখে কি যেন একটা ছোট্ট আওয়াজ করে সে দূরে লাইনের দিকে তাকালো—ষ্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে সহকারী ষ্টেশন মাষ্টার বেরিয়ে এসে বাঁদিকে তাকিয়ে পয়েন্টস্ম্যানকে ঘণ্টা দিতে ব'ললেন।

এইবার ৪নং সট্। ফেরিওয়ালাদের কাছে পয়েন্টস্ম্যান ব'সেছিল—সহকারী মাষ্টার মশাইয়ের কথা শুনে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লে।

তারপর সম্পাদক বিভিন্ন সট্ থেকে টুকরা টুকরা কিছু
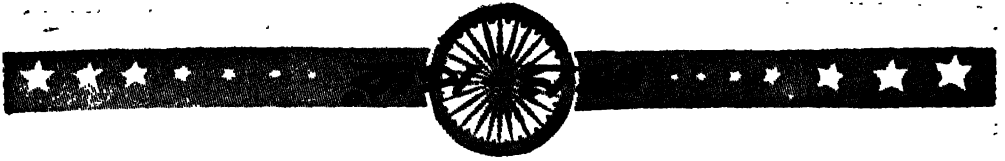
অংশ নিয়ে ট্রেন আসার আগে যাত্রীদের মধ্যে যে উত্তেজনা দেখা যায় তা দর্শকদের মনেও সৃষ্টি করবার চেষ্টা করলেন।

তার পরের সট্‌গুলি হ'লো এই রকম :—

ঘণ্টা পড়লো।

সকলে বাঁদিকে ডিষ্ট্রান সিগ্‌ন্যালের দিকে তাকালো।

লক্ষ্মণও সেদিকে তাকালো। কিন্তু সর্বনাশ! লক্ষ্মণ যে ভুল করে ছবির ডানদিকে তাকিয়ে আছে! এখন উপায়? সম্পাদক তো আর ছবির মুণ্ড ঘোরাতে পারেন না! ছবিটি যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের জিনিষটা সংগে সংগে লক্ষ্য করা উচিৎ ছিল। আরে—এই তো! লক্ষ্য বোধ হয় তাঁরা তখনই করেছিলেন—তাই, Take Two অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আবার ঐ ছবিটি ঠিক করে লক্ষ্মণকে বাঁ দিকে তাকিয়ে নিয়েছেন। যাক্—বাঁচা গেল।

ঘণ্টা বাজা থেকে সকলের ট্রেনের দিকে তাকানোর সময় ৫।৬ সেকেণ্ড—অর্থাৎ এক কি দেড় সেকেণ্ডে ৪।৫টি সট্ এখানে জুড়তে হবে একবার লাইন—একবার লোকজনের যাতায়াত—দর্শকদের যাতে মনে হয় ট্রেনের জন্যে সবাই উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে।

ট্রেন আসা থেকে ট্রেন ষ্টেশনে এসে থামা পর্যন্ত এইভাবে সাজাতে হবে :—

২নং সট্—লাইন ও ডিষ্ট্রান সিগ্‌ন্যাল। দূরে ট্রেনের ধোঁয়া। ২, ৪, ৬, ৮, ৮এ, ৮বি নম্বরের সেটের কিছু কিছু অংশ। যার দ্বারা যাত্রীদের ট্রেন দেখার পরের মনোভাব প্রকাশ পায়।

৬নং সট্ থেকে লক্ষ্মণের উদ্বিগ্ন ভাব।

৮নং সটের টিকিট কালেক্টরের কর্ম ব্যস্ততা।

৪নং সটের পয়েণ্টস্‌ম্যানের তৎপরতা।

এরপর দেওয়া যাক্ ৯নং সটের ট্রেনের চাকার গতি ধীরে ধীরে এসে স্থির হ'য়ে গেল। ইঞ্জিনের দীর্ঘশ্বাস শোনা যেতে লাগলো।

ফের লাগানো হ'লো ৬নং সটের খানিকটা।

ভীষণ হট্টগোলের মধ্যে লক্ষ্মণ রামকে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে দেখতে পেলে দূরে একটি কামরার দরজায়।

সম্পাদককে এরপর দেখাতে হবে রাম-লক্ষ্মণের মিলন—ট্রেনের ষ্টেশন পরিত্যাগ এবং উভয়ের ষ্টেশন ছেড়ে চলে যাওয়া। তিনি সাজালেন :—

কামরার ওপর থেকে রাম লক্ষ্মণকে দেখতে পেলে।

লক্ষ্মণ এগিয়ে গেল রামের দিকে।

রাম ও লক্ষ্মণ দুদিক থেকে এসে মিলিত হ'লো। রাম লক্ষ্মণের পোষাক দেখে একটু মৃদু হাসলে। লক্ষ্মণ লজ্জিত দৃষ্টিতে তাঁর পদধূলি নিলে। রাম তাকে গভীর স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধ'রলে।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা পড়লো।

ইঞ্জিনের হুইসিল বাজলো।

ট্রেন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে ষ্টেশন ছেড়ে। কল-কোলাহল তখন যেন একেবারেই থেমে গেছে মনে হ'চ্ছে।

রাম ও লক্ষ্মণ তখনও দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। তাদেরই পাশ দিয়ে ট্রেণের শেষ কামরাটিও চলে গেল ষ্টেশন ছেড়ে। ট্রেনের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল দূরে—দূরান্তরে। রাম একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে লক্ষণকে বললে—"চল"। তারা ধীরে ধীরে চলে গেল ষ্টেশনের বাইরে।

এখন আপনারা হয়তো বুঝতে পারলেন, ছোট একটি দৃশ্যকে চিত্রনাট্য ক'রে এবং তা থেকে চিত্র গ্রহণের পর সম্পাদকের কাঁচিতে কি ভাবে, কতো ধৈর্যের সংগে নানা রকমে কার্যকরী আইন বাঁচিয়ে পর্দার ওপর সাধারণের কাছে তুলে ধরা হয়। সটের পর সট্ সাজিয়ে যেমন একটি দৃশ্যকে সম্পাদক সম্পূর্ণ করার জন্য প্রাণপাত করেন, তেমনি ঐভাবে আরো গভীর চিন্তার দ্বারা দৃশ্যের পর দৃশ্যকে সাজিয়ে তিনি সম্পূর্ণ কাহিনীকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে সচেষ্ট থাকেন সর্বদাই।

জনসাধারণের অজ্ঞাতে যে কোন ছবির জন্যে এবং এই শিল্পের সর্বাংগীন উন্নতির জন্যে একজন চিত্র সম্পাদক দিনের পর দিন কি অমানুষিক পরিশ্রম করেন, তা যে কোন ব্যক্তি অন্ততঃ কিছুক্ষণ যদি এসে লক্ষ্য করেন সম্পাদকের কার্য-পদ্ধতি, তাঁদের কার্যক্ষেত্রের একান্তে দাঁড়িয়ে কোনদিন—তা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। চিত্রজগতের
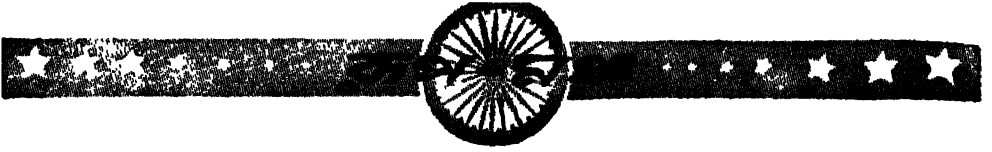
অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের কারো চেয়ে কোন অংশেই এঁরা যে তুচ্ছ নন—ছোট নন, একথা সত্যি হলেও, সর্বসাধারণের কাছ থেকে সত্যিকারে মর্যাদা আজো এদেশের চিত্র সম্পাদকেরা পান না। এর জন্যে দায়ী যেমন চিত্র সম্পাদনা সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতাজনিত অবহেলা—তেমনি কিছুটা নিজেদের ইচ্ছাকৃত অপরাধও। বহু সম্পাদক আছেন যাঁরা, সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বে আসবার আগেই

লাফিয়ে পড়েন সম্পাদনার কাজে। আনকোরা নতুন পরিচালকের দল নিজেদের ছিদ্রপথ গোপন করার চেষ্টায় এঁদের কোন রকম যাঁচাই না করেই কাজের ভার দিয়ে দেন আনন্দর সংগে। তারপর ছবির ভবিষ্যৎ যখন পর্যবসিত হয় গভীর অন্ধকারে—তখন সমস্ত সম্পাদক-সম্প্রদায়কেই দায়ী হ'তে হয় এর জন্যে অনেকখানি। এজন্য একজন নগন্য সম্পাদক হিসাবে সকলের কাছেই আমার সবিনয় অনুরোধ, সম্পাদক হিসাবে যাঁরা আসবেন বা এসেছেন এই চিত্র জগতে, তাঁরা তাঁদের গুরুদায়িত্বের কথা যেন কোন ক্রমেই বিস্মৃত না হন। শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই—নিজেদের কাজের পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা কখনই যেন এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন।

চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্যে আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এই শিল্প সংশ্লিষ্ট কর্মীদের একতা ও সহযোগিতার মনোভাব। সম্পাদক সম্প্রদায়ের মধ্যেও তা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। পরস্পরের জন্য পরস্পরের সহানুভূতি বোধ এবং সমবেদনা অনুভব একান্তই থাকা উচিৎ সকলের মধ্যে।

চিত্র-শিল্প আজ এগিয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে—এগিয়ে চলেছে এর প্রতিটি বিভাগের উৎকর্ষ—আর সেই সংগে সম্পাদকীয় বিভাগও। তাই এই বিভাগের প্রত্যেকটি কর্মীর মনে রাখা উচিৎ, তাঁদের দায়িত্ব এবং মর্যাদার কথা। অন্য সব দেশের মতই এদেশের সম্পাদকেরাও অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের যথাযথ মূল্য পাবেন। কিন্তু সেই পাওয়ার পথকে আমাদের অযোগ্যতার অন্ধকারে যেন না আচ্ছন্ন করে নেয়।

এদেশের জাতীয় সরকার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত চিত্র শিল্পকে হয়তো জাতীয় শিল্পে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন কিম্বা করবেন। এই শিল্পের অন্য সব বিভাগের সংগে সম্পাদনা বিভাগের উন্নতির কথাও তখন তাঁদের ভুলে গেলে চলবে না। কারণ, ছায়াচিত্রের প্রাণ হচ্ছে এই সম্পাদনা। সম্পাদনার কাজে আরও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ও ব্যবস্থা তাঁদের করা উচিৎ, সম্পাদকদের—তথা সমস্ত চিত্র শিল্পের উন্নতির জন্যে।

শ্রীমতী লীলা দাশগুপ্তা: সর্বহারা চিত্রের নায়িকা। আগামী বহু চিত্রে এঁর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। রূপ-মঞ্চ : শারদীয়া সংখ্যা : ১৩৫৫

দেবকীবসু প্রযোজি
পরিচালিত ‘ক
চিত্রে নী নি
মু ঙঃ ওর
রূপ-মঞ্চ:শারদীয়

চিত্র-সম্পাদনা ও চিত্র-সম্পাদক

রাজেন চৌধুরী

●

চিত্র-সম্পাদনা ছায়াছবির প্রস্তুতির একটা প্রধান অংশ—যদিও আমাদের দেশের পরিচালক বা প্রযোজকেরা সে দিকে মোটেই দৃষ্টি দেন না। কারণ, আমাদের দেশে এই-সব চিত্র-সম্পাদককে সহৃদয় পরিচালক মহাশয়রা 'Joiner' বলে থাকেন। অথচ সত্যি কথা বলতে কি—এই ছায়া-ছবির সাফল্য বহুলাংশে চিত্র-সম্পাদনার ওপরেই নির্ভর করে। যদিও পরিচালক বা প্রযোজক মহাশয়গণ একথা স্বীকার করতে চান না।

ছবি তুলবার সময় শব্দ এবং ছবি দুইটাই পৃথক পৃথক ভাবে তোলা হয়। তারপর সেই 'exposed picture and Sound Negative' পরিস্ফুটনের জন্য পাঠান হয় রসায়নাগারে। রসায়নাগারে পরিস্ফুটনের কার্য সমাধা হলে পর সেই 'negative' যায় সম্পাদকের টেবিলে। মঞ্চের নাটকের যেমন অংক ও দৃশ্য থাকে—চিত্রনাটকেরও ঠিক সেই রকম নম্বর থাকে। আর প্রত্যেকটি দৃশ্যের ছবি তোলবার সময় আবার তাকে অনেক ছোট ছোট টুকরা করে তুলতে হয়—সেই টুকরাগুলিকে ঠিক রাখবার জন্য নম্বর দিতে হয়। এই টুকরাগুলোর যখন চিত্রগ্রহণ করা হয়, তখন ইহা ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ ১ নম্বর হতে শেষ পর্যন্ত নেওয়া হয় না। কাজের সুবিধার জন্য ১নং টুকরার পর ৫নং, ২নং টুকরার পর ৮নং, ৩নং টুকরার পর ৬ নম্বর এই রকম ভাবে নিতে হয়। সম্পাদকের কাছে যখন ঐ Negative আসে তখন ঠিক ঐ অবস্থায় আসে। সম্পাদককে এর প্রত্যেকটি টুকরা কেটে পৃথক পৃথক ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে পর পর জুড়ে দিতে হয়! অবশ্য Picture negative ও Sound negative এক সংগে Synchronise করে এ কাজ করতে হয়। ছবি তুলবার সময় দুইটি বাহুযুক্ত একটি কাষ্ঠফলক শিল্পীর সামনে ধরা হয়, যার ওপর দৃশ্য ও টুকরার নম্বর লেখা থাকে। এই কাষ্ঠ-ফলককে বলে clap-stick। প্রথম অবস্থায় এর বাহু দুটি ফাঁক হয়ে থাকে। পরিচালক চিত্রগ্রহণের সময় Camera ও Sound চালু করতে এই clap stick-man দৃশ্য এবং টুকরোর নম্বর মুখে বলেন এবং clap stick এর বাহু দুইটি একত্রিত করে স্থান ত্যাগ করেন। ঐ কাষ্ঠফলকের বাহু দুইটি একত্রিত করবার সময় যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা Sound Cameraর ভিতর দিয়ে Sound-negativeএ ওঠে এবং একই সময় Picture-negativeএ তার ছবি ওঠে। clap stick-man অপসৃত হলে শিল্পীরা তাঁদের বক্তব্য সমাধা করলে clap-stick-man আবার এসে ঐ cla-pstickএর বাহু দুইটি ফাঁক করে আবার একত্রিত করেন এবং তাতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাও Sound Cameraর ভিতর দিয়ে Picture Cameraর ভিতর দিয়ে Picture negativeএ ওঠে। এইভাবেই প্রত্যেকটি shot নিতে হয়। সম্পাদক সম্পাদনার সময় উক্ত Picture-negative এবং Sound-negative পর পর সাজিয়ে Sychronise করেন। মানে ছবির সংগে তার শব্দ মিলিয়ে নেন। এই গেল প্রথম অবস্থা—অর্থাৎ ছবির প্রথমে এবং শেষে যে clap-stick নেওয়া হয়েছে, তা রেখে শুধু Synchronise করা হল। দ্বিতীয় অবস্থায় ঐ clap-stick গুলি সব কেটে ফেলে দৃশ্যের পর দৃশ্য ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়ে জুড়তে হয়—টুকরার পর টুকরা, দৃশ্যের পর দৃশ্য এবং অংকের পর অংক। এক দৃশ্যের শেষ, অপর দৃশ্যের প্রারম্ভে জোড়া একটু হাঙ্গামা বিশেষ। অর্থাৎ গানের যেমন একটা লয় আছে—কথা বলারও তেমনি একটা লয় আছে। সম্পাদককেও সেই লয় বুঝে কেটে জুড়তে হয়। যেমন ধরুণ, এক দৃশ্য আরম্ভ হয়েছে দুঃখে, বা প্রেমে। কাজেই পূর্বদৃশ্য যেখানে রাগারাগিতে শেষ হয়েছে, তার সংগে পরের দৃশ্যের দুঃখ বা প্রেমের ছন্দ মিলবে কেমন করে! কাজেই এদের ছন্দ বজায় রেখে কাটতে ও জুড়তে হয়। তা ছাড়া চিত্র-গৃহের রূপালী পর্দার পিছনে যে লাউডস্পিকার আছে,
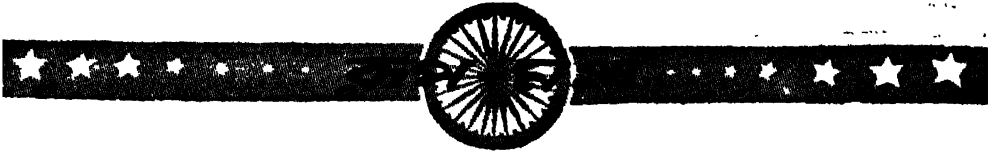
তা হতে শব্দ নির্গত হয়ে আমাদের কানে কত দ্রুত গতিতে এসে প্রবেশ করে এবং একটা কথা শোনার কতক্ষণ পরে তার উত্তর আমরা শুনবো, এটাও জানা থাকা দরকার। কারণ, কোন Gap না দিয়ে কেবল কেটে জুড়ে দিলে' কোন কথাই আমরা বুঝতে পারবো না। কোন কোন সময় পরিচালক তাঁর গল্পের বক্তব্য হয় ভাল করে বলতে পারেননি—তাও সম্পাদকের সম্পাদনার কৃতিত্বে ফুটিয়ে তোলা যায়। তবে তারও একটা সীমা আছে। পরিচালক ছেলে গড়তে গিয়ে যদি মেয়ে গড়েন, তবে তাকে সম্পাদক ঠেকাঠুকা দিয়ে ছেলে করতে পারেন। কিন্তু শিব গড়তে যেয়ে যদি বাঁদর গড়ে ফেলেন, তবে আর তাকে শিব করা যায় না। আপনারা বোধ হয় অনেকেই দেখে থাকবেন যে, মারাঠী ভাষায় ছবি তোলা হয়েছে—পরে তাকে হিন্দি ভাষাতে রূপায়িত করা হয়েছে। এ সবগুলি সম্পাদকের কাজ। একে বলে Dubbing-Process. কোন ছবিতে একটি সুন্দর মেয়ে ভাল সুন্দর অভিনয় করেছে—কিন্তু তাঁর ভাষা অতি কদর্য। এর মুখের কদর্য-ভাষাকে সুন্দর ভাষায় পরিণত করা যায় সম্পাদকের dub-bing-sound লাগানোর গুণে। সম্পাদককে অল্পবিস্তর সমস্ত বিভাগের কাজ জানতে হয় এবং পরিচালকের চেয়ে তাঁর দায়িত্ব কিছু কম নয়—যদিও আমাদের দেশের পরিচালকরা সম্পাদককে কেবল 'Cutter ও Joiner' বলেই অবজ্ঞা করে থাকেন। অনেক সময় পরিচালক মহাশয়রা ভাবের আবেশে অনেক কিছু shot নিয়ে থাকেন—আর সেগুলি লাগাতে গেলে হয় ছবির মূল কাহিনী উবে যায়, না হয় ছবির অব্যাহত গতি বিনষ্ট হয়। সম্পাদককে সেই সব Shot কাট ছাঁট করে ছবির মূল কাহিনী এবং গতি বজায় রেখে দর্শকদের দর্শনোপযোগী করতে হয়।

আপনারা চিত্রগৃহে যে ছবি দেখেন, তাতে পরিচালক, চিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী রসায়নিক ইত্যাদি সকলের মতন সম্পাদকের দায়িত্ব অনেকখানি। কারণ, এঁদের হাতেই ছবির ভাল মন্দ অনেকখানি নির্ভর করে। কিন্তু পরিচালকরা তাঁদের স্বার্থহানীর ভয়ে—সম্পাদকদের অবজ্ঞার চোখেই দেখে থাকেন এবং সম্পাদকদের দায়িত্ব কিছুই নেই, এটা ও বলে থাকেন। কোন কোন পরিচালককে এও বলতে শোনা গেছে যে, সম্পাদকের করবার কিছুই নেই—তাঁর যা চিত্রনাট্য আছে—খালি clap-stick কেটে জুড়ে দিলেই তাঁর সম্পাদনা হয়ে যাবে। এই সব পরিচালকেরা প্রযোজকদের কাছে নিজেদের স্থান এত উচ্চে করে তুলেছেন। কিন্তু প্রযোজকেরাও একটু ভেবে যাঁচাই করে দেখেন না যে, কার স্থান কোথায়। যদি ছবি বাজারে দর্শকেরা পছন্দ করেন, তবে পরিচালকের আস্ফালনের ঠেলায় অস্থির। যেন তিনি নিজেই সব জিনিষের স্রষ্টা। তাতে আর কারও দান কিছুই নেই। কেবল বলতে পারেননা যে, তিনি নিজেই কাঁচা ফিল্ম, ক্যামেরা, বৈদ্যুতিক আলো, কাঁচি ও কেমিক্যাল। কিন্তু এইটুকু বলতে কার্পণ্য করেন না যে, যাঁরা এই সব কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁরা সব Bogus—ভাগ্যিস তিনি নিজে ছিলেন, তাই সব দিক রক্ষে পেয়েছে। আর যদি নিজের অক্ষমতার দোষে ছবিটি দর্শক সাধারণ পছন্দ না করেন, তবে সব কিছু দোষ ঐ পরিচালক মহাশয় অপরের ঘাড়ে চাপাতেও কুণ্ঠিত হন না। এমন কি চিত্র-সম্পাদককেও তিনি বাদ দেন না। বলেন, ভাল ভাল shot নিয়েছিলেন—সম্পাদক তা কেটে বাদ দিয়েছে। উল্টো পাল্টা সিন সাজিয়েছে। সমস্ত দোষটাই সম্পাদকের ঘাড়ে চাপান। অথচ এ কথাটা কতখানি বাজে, তা আপনারা জানেন না। কারণ, চিত্রগৃহে প্রথম মুক্তি পাবার আগে ছবিটি পরিচালক, প্রযোজক বহুবার নিজেরা দেখে থাকেন। কই তখন তো তাঁরা কিছু বলেন না যে, shot বাদ দেওয়া হয়েছে বা উলটো পাল্টা সাজান হয়েছে বরং অনেক সময় সম্পাদনার তারিফ করতেই শোনা যায়। সম্পাদক ছবির পরিচালকের সংগে পরামর্শ করেই সম্পাদনা করে থাকেন। আর কোন সম্পাদকই ছবিকে মার খাওয়াবার চেষ্টা করেন না। বরং ছবি কিসে ভাল হবে তার চেষ্টা করেন—কারণ, সম্পাদককেও করে খেতে হবে। সম্পাদকেরা যে সামান্য ভুল না করেন, এমন নয়। তবে তা এমন কিছু মারাত্মক হয় না। তবে সে ভুল ত্রুটির জন্য তাঁদের খুব দোষ দেওয়াও যায় না—কারণ, তাঁরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা পান না।

অর্থাৎ যাঁর প্রাপ্য ৫৲—তাঁকে দিলেন ১।০। এ বিষয়ে পরিচালকরাও বেশ উদাসীন—তাঁরা নিজেদের পেট ভরিয়ে নেন—আর তাঁর সহকর্মীরা কি পেল বা না পেল তাতে, তাঁদের কিছু আসে যায় না। প্রযোজক মহাশয়দের সকলকেই বলতে শোনা যায় যে, এটা আমাদের প্রথম ছবি। এটাকে ১।০ করে নিয়ে কোন রকমে দাঁড় করে দিন। পরের ছবিতে নিশ্চয়ই ৫৲ টাকা দেবো। আর ঐ সব প্রযোজকদের সংগে পরিচালক মহাশয় গোপনে পো ধরেন, যেন পরের ছবির বেলা ঐ পরিচালক বা সম্পাদকের সংগে কোন সম্পর্ক না রাখেন। সামনে কিন্তু মুখের কথায় মন ভরিয়ে দেন। যাই হউক, তবুও পরের ছবির আশায় সম্পাদক ঐ ৫৲ স্থানে ১।০ কাজ করতে রাজী হন। কিন্তু ঐ ১।০ তাঁর পেট ভরে না। কারণ, ঐ ১।০ শেষের এক সিকি কোন প্রযোজকের কাছ থেকে পাওয়া যায়, কখনও আবার পাওয়া যায় না। কাজেই ঐ ৫৲ টাকা পূর্ণ করবার জন্য তাঁকে ৪।৫ খানা ছবির সম্পাদনার কাজ এক সংগে করতে হয়। তা না হলে সম্পাদকের পেট চলে না। যাঁদের মাথায় এত আর্থিক অনটনের চাপ পড়ে, তাঁদের পক্ষে কোন কাজ নির্ভুল ভাবে করা সম্ভব নয়। তবে ইচ্ছা করে কোন সম্পাদক কারো ছবি খারাপ করেন না। প্রযোজক মহাশয়েরা যেখানে একটা ছবি করতে ২।৩ লাখ টাকা খরচ করে থাকেন—সেখানে সম্পাদককে কিছু বেশী টাকা দিলে তাঁদের লোকসান হয় না আর তাতে তাঁদের এমন কিছু খরচও বাড়ে না। এ যেন ঠিক মরাকে নেড়া করে ওজন কমাবার মত। যেখানে তাঁরা লাখ লাখ টাকা খরচ করছেন, সেখানে সম্পাদকের সামান্য ৮০০।৯০০৲ টাকা কমিয়ে তাঁরা মনে করেন, অনেক খরচ বাঁচিয়েছেন। আমার মনে হয়, চিত্র সম্পাদকেরা একত্রিত হয়ে যদি তাঁদের প্রাপ্য টাকার একটা মান ঠিক করে নেন, তাহলে এই সব অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রযোজক মহাশয়দের ছবি করতেও হবে—সম্পাদকও নিতে হবে। সম্পাদকের মান ঠিক থাকলে প্রযোজকেরা তাঁদের ক্ষমতা অনুযায়ী সম্পাদক নিয়ে নেবেন—তাতে দর নিয়ে টানা হেঁচড়া করতে হয় না। পরিশেষে আর একটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করবো। প্রযোজক মহাশয়রা চিত্র-শিল্পের ব্যবসা করতে এসে সম্পাদকদের পয়সা দিতে যেন গায়ে জ্বর আসে এবং অনেক ক্ষেত্রে এও দেখা গেছে, প্রাপ্য টাকা আদায় করার জন্য প্রযোজক মহাশয়দের বাড়ী দৌড়াতে হয়। বেশীর ভাগ সময়েতেই দেখতে পাওয়া যায় যে, তাঁরা পাওনাদার এড়াবার জন্য বাড়ী থেকেও বলেন, নেই। বেশীর ভাগ স্থলেই এই অবস্থায় সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীদের পড়তে হয়। ছবির বাজারে যাঁরা ব্যবসা করতে আসেন, তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন তাঁদের অবস্থা বুঝে কাজ করেন—তাতে তাঁরাও ঠকবেন না—আর কর্মীরাও ঠকবে না।
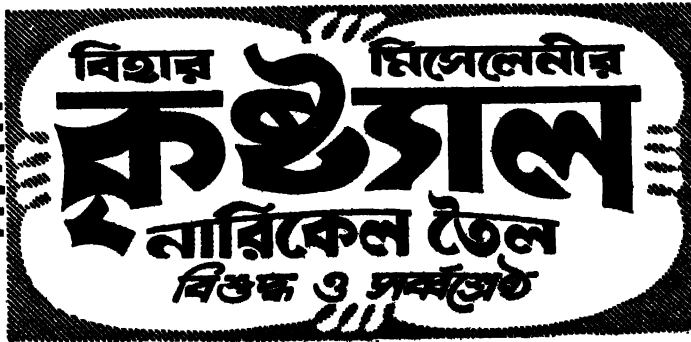
খণ্ডিত বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প

নীরেন লাহিড়ী

★

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে, অখণ্ড ভারত বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য হইবার কথা—চলচ্চিত্রের এক পরিচালকের এ বিষয়ে হঠাৎ কি বলিবার থাকিতে পারে এবং বলিলেও তাহার কি মূল্য আছে।

মূল্য আছে কিনা তাহার বিচার করিবার অধিকার আমার নাই—আমি শুধু এই বলিতে চাই যে, এই দ্বিবিধ খণ্ডিত দর্শক-মনজগতে নাকি পছন্দ অপছন্দ ভাল লাগা এবং না লাগা রাতারাতি বদলাইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষ বিভক্ত হইবার সংগে সংগেই এই মতামত রীতিমতভাবে চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ী মহলে বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে। এই মতামত পরীক্ষা ফলপ্রসূত কিনা জানি না। পুরাপুরি বাংলা দেশকে আমরাও কিছু কিছু চিনিতাম বলিয়া বিশ্বাস ছিল; কিন্তু যে পরিমাণ যুক্তিতর্কের জোরে ইঁহারা একই ছবিকে প্রায় দুই রকম প্রকারে প্রকাশ করিবার প্রয়াস করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় যে, খেচরান্ন তৈয়ারী করিবার বদ অভ্যাস আমার মত দুর্বলচিত্ত মানুষের মধ্যেও কিছুদিন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইল। রাজনীতিক্ষেত্রে কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রে বিপরীত মনোভাব থাকিবার সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যাহা জীবনের মূল ঘাত-প্রতিঘাত, হর্ষ-বিষাদ শুধু এই সব লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বর্জন করিয়া যাহা গৌণ, শুধু তাহারই বিচার হইবে, ইহা কেমন কথা। কোন দেশের রাজনৈতিক মহল, কোন ঘটনা সেই দেশের লোকের রসোপলব্ধির বিচার বুদ্ধিকে সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করিতে পারে, কিন্তু বদলাইয়া দিতে পারে না। রাজনীতি বা ধর্ম প্রচার চলচ্চিত্রের মূল কথা নয়, মূল কথা রসসৃষ্টি। এই রসসৃষ্টি নির্ভর করে সর্বজন স্বীকৃত কতকগুলি অনুভূতির উপর।

মানুষের এই সব অনুভূতি দেশ কালের ব্যবধানকে স্বীকার করে না। তাই বৃটিশ শাসনের অধীনে থাকিয়াও আমরা বৃটিশ ছবি দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতে কুণ্ঠিত হই নাই। আমেরিকার জীবনযাত্রার সহিত এ দেশের লোকের জীবনযাত্রার রীতিনীতির আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও, আজও আমরা আমেরিকান ছবি দেখিয়া আনন্দ বোধ করিতেছি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই কথা যেমন সত্য, আমাদের দেশের গণ্ডীর মধ্যেও সেই কথা সমানভাবেই সত্য—তা দেশ যত খণ্ডেই বিভক্ত হইয়া যাক না কেন। আজিকার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন, ভাল ছবি তৈরী করা দেশের একখণ্ডে তৈরী ছবি আর একখণ্ডে চলিবে কিনা, সেই চিন্তাটাই বড় হওয়া উচিত নয়। সত্যকার ভাল ছবি যদি তৈরী করা যায়, খণ্ডিত বাংলাচিত্র তাহার সাফল্যের পথ রোধ করিতে পারিবে না।

বাংলা রংগমঞ্চের উন্নতি

শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র
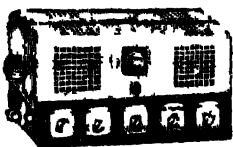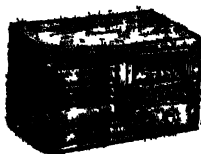
বাংলা রংগমঞ্চের উন্নতি সম্বন্ধে লেখার জন্য রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের কাছ থেকে তাগিদ পেয়েছি। কিন্তু এ বিষয়ে লিখে যে কিছু ফল হবে, তা মনে হয় না—কারণ, ক্রমশ: বেশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, রংগমঞ্চকে সমৃদ্ধ ক'রে তোলবার আগ্রহ শিল্পী বা রংগ-ব্যবসায়ীর মধ্যে বিলুপ্ত প্রায়। রংগমঞ্চের সংস্পর্শে দীর্ঘকাল কাটিয়ে 'আমার ধারণা হয়েছে যে, এই শিল্পটির শ্রী ও প্রসার তাঁরাই বর্ধিত করতে পারবেন, যাঁরা এর জন্য কঠোর আত্মত্যাগ করতে স্বীকৃত হবেন। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা ও রংগমঞ্চের প্রতি অসীম দরদ সম্পন্ন গুণী শিল্পীরা পয়সাটাকেই জীবনের শেষ কাম্য বলে যদি না মনে ক'রে এখানে কাজ করেন, তবে কিছু কাজ হতে পারে। তা না হ'লে, এর উন্নতির আশা ছেড়ে দিন, অস্তিত্ব রক্ষার আশাই অল্প। বর্তমানে থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যে সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন হয়, সেটা আবার থিয়েটারের স্বাভাবিক বেঁচে থাকার পক্ষে প্রতিকূল। কারণ, ক্ষণিক উত্তেজনাকর অবস্থা ঘটিয়ে দর্শক আকর্ষণের এ প্রচেষ্টা বরাবর শুভ হ'তে পারে না।

বাংলাদেশে রংগমঞ্চ প্রকৃত পক্ষে একটা সম্পদ—পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে রংগমঞ্চ যেমন আদৃত হয়,তেমনি ভারতের এই প্রদেশে গত একশত বৎসর ধরে রংগমঞ্চ সেই সমাদর পেয়ে আসছে। এই রংগমঞ্চকে গড়ে তুলেছিলেন যাঁরা, তাঁরা বাংগলার রংগরসিক তথা সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র। উনবিংশ শতাব্দীতে গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকারেরা বাংলা দেশে যে অবস্থার মাঝে রংগমঞ্চকে গড়েছিলেন, তার পর্যালোচনা করলেই বেশ বোঝা যায় যে, কতখানি ত্যাগ স্বীকার করলে তবে জাতির মধ্যে একটি বড় প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত করা যায়। আজকের যুগেও রংগমঞ্চকে বাঁচাতে গেলে সেইরূপ কয়েকজন নিঃস্বার্থ কর্মির প্রয়োজন। রংগমঞ্চ যে সত্যই একটা বড় জিনিষ এবং কলাশিল্পের ক্ষেত্রে রঙ্গাভিনয়ের মর্যাদা ও গাম্ভীর্য যে শ্রেষ্ঠ, এইটি অনুধাবন না করতে পারলে এর প্রতি কারুর প্রীতি জাগা অসম্ভব। বর্তমানে তারই অভাব দেখি আমাদের নাট্যশালায় এবং সেইজন্য মাঝে মাঝে হতাশ হ'য়ে পড়তে হয়।

দুঃসহ অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে সে যুগে নাট্যশালাকে গড়ে তুলতে হয়েছিল, আজ অভিনয়ের পক্ষে সেরূপ ধরণের বাধা নেই বটে কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর বাধা এসে দাঁড়িয়েছে। সে বাধা সিনেমার প্রলোভন। অর্থ ও প্রচার অতি অল্প আয়াসে মাত্র রূপের জোরে সিনেমায় পাওয়া যায় কিন্তু থিয়েটারে শুধু চেহারা দেখিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে সমাদর লাভ করা কঠিন। রংগমঞ্চে অভিনয়ের শক্তি দেখানোর ওপরেই শিল্পীর মর্যাদা নির্ভর করে, সিনেমায় অতখানি কড়াকড়ি নেই। রংগমঞ্চে শিল্পীর যে স্বাধীনতা আছে, সিনেমায় সে স্বাধীনতা তার পক্ষে কল্পনা করা দুঃসাধ্য। কারণ সিনেমা শিল্পের রস মাত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ওপরই নির্ভর করে না—তার জন্য বহুজনের বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক। তাই প্রকৃত যাঁরা শিল্পী হবেন, তাঁরা অর্থের জন্য যতই সিনেমা করুন, রংগমঞ্চকে বাদ দিয়ে চ'লতে পারবেন না।

আমি বলবো, রংগমঞ্চ যে জাতীয় সম্পদ, এটা লোককে বোঝানো দরকার সর্বাগ্রে। বর্তমানে সেরূপ প্রচারকার্য খুব অল্পই হয়। এখন প্রশ্ন এই যে, এ-সব কার্য করা যাঁদের কর্তব্য, তাঁরা যে নির্বাক। সত্যকথা, কিন্তু রংগমঞ্চের উন্নতি করতে গেলে এই মূক ব্যক্তিদের সরিয়ে নূতন ব্যক্তিদের নবোৎসাহে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে। তবে রংগমঞ্চের উন্নতি সার্থকতা লাভ করতে পারবে—কিন্তু সর্বাগ্রে চাই নিষ্ঠাবান্ কর্মী, ব্যবসায়ী ও গুণীশিল্পীর দল—তাঁরা আজ কোথায়?

একশো বছর ধরে বাংলা রংগমঞ্চ এই যে এত বাধা বিপত্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—এইটেই বিচিত্র, কিন্তু দাঁড়াতে পারতো না যদি বাংলার দর্শকসাধারণ অভিনয়ের অনুরাগী না হ'ত। বাংলা নাট্যশালার ম্লান দীপগুলিকে দর্শকরাই মাঝে মাঝে

উজ্জ্বল করে দিয়ে এসেছেন কিন্তু নাট্যশালা সেই সুযোগ নিয়ে যেরূপ পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকটিত করে তুলতে পারতো, তা করেনি।

রংগমঞ্চের উন্নতির কথা ভাববার আগে সংক্ষেপে বাংলা রংগালয়ের ক্রম পরিণতি কি ভাবে হয়েছে এবং কি অবস্থায় এসে এখন দাঁড়িয়েছে, তা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। অর্দ্ধেন্দু-গিরিশ-অমৃতলাল প্রমুখ শ্রেষ্ঠ রংগবিদ্‌দের আমলে আমরা দেখি স্থায়ী কোন রংগমঞ্চ নেই, লোকের বাড়ীর আনাচে-কানাচে তাঁরা অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। অভিনেত্রী নিয়ে প্রকাশ্যে অভিনয়ের সাহস তখনও হয়নি। পরে স্থায়ী রংগমঞ্চ গড়ে মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে এবং তদানীন্তন সামাজিক বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে তাঁরা পাশ্চাত্য ধারায় রংগমঞ্চের শ্রী ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করলেন। মাইকেল স্বয়ং, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ রায়, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতির নাট্যরচনা সম্পদে রংগমঞ্চ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হ'তে লাগলো। সারারাত্রি দীর্ঘক্ষণ ধরে অভিনয় না চললে সে যুগের দর্শকদের মনস্তুষ্টি হ'ত না। দীর্ঘ নাটক, অকারণ সংগীত ও নৃত্যগীতাদির বাহুল্য ও প্রত্যেক চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করার জন্য বহু দৃশ্যের অবতারণা করতেই হ'ত। প্রথমে মূল নাটক ও তৎসহ একটি প্রহসন বা গীতিনাট্য জুড়ে দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। সে যুগে থিয়েটার দেখতে চট্‌ করে কেউ রাজী হ'তেন না, শুচীবায়ুগ্রস্ত লোকদের অভাব ছিলনা দেশে কিন্তু কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পৃষ্ঠপোষকতা করায় ক্রমশঃ রংগমঞ্চ স্থায়িত্ব লাভ করতে থাকে। এই সময় আর এক ধনী সম্প্রদায় ছিলেন, যাঁরা 'থিয়েটারের' কাপ্তেন বলে পরিচিত হতেন, তাঁদের দ্বারা থিয়েটারের অন্যদিক থেকে উন্নতি হ'ত না কিন্তু আর্থিক দিকটা পুষ্ট হ'ত খুবই।

পৌরাণিক, সামাজিক ও গীতিনাট্যের চাহিদা ছিল সে যুগে খুবই বেশী। তারপর ক'লকাতায় দু'তিনটি রংগমঞ্চ স্থায়ীভাবে গড়ে উঠলো এবং দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকাররা আর এক নতুন ভংগীর আমদানি করলেন রংগালয়ে। এই সময় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও রংগমঞ্চের নাটকাভিনয়ে আগ্রহ দেখাতে লাগলেন এবং বাংলা রংগমঞ্চকে আবার একটি নূতন প্রতিঘাত দিয়ে যিনি একে আরও কিছুদূর টেনে নিয়ে গেলেন, তাঁর নাম অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। কলকাতার অভিজাত বংশীয় কোন ব্যক্তি যে পেশাদার রংগমঞ্চে অবতীর্ণ হতে পারেন, তা ছিল লোকের কল্পনাতীত। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই কল্পনাতীত ঘটনাকেই বাস্তবে রূপান্তরিত করলেন। তাঁর আবির্ভাবে কলকাতার অভিজাত মহলে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল এবং এটা সত্য, তিনি শুধু তাঁর আভিজাত্য নিয়েই এলেন না, রংগমঞ্চকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য যত প্রকার আয়োজন করা যায়, তা করলেন। তাঁর পূর্ববর্তিরা ও সমসাময়িকরা নিজেদের সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম ক'রে রংগালয়কে বাঁচাবার জন্য মই ঘাড়ে নিয়ে প্ল্যাকার্ড লাগানো থেকে টিকিট বিক্রি সবই করেছেন। এখন অমরেন্দ্রনাথ নবভাবে রংগালয়কে জনপ্রিয় করতে লাগলেন এবং তিনি তখনই বুঝেছিলেন যে, শুধু থিয়েটারের জাকজমক বাড়ালেই হবে না—এর প্রচার চাই। তাই রংগালয়, নাট্যমন্দির প্রভৃতি পত্রিকা বার করে, উপহার বিতরণ করিয়ে, রংগালয়কে আকর্ষণীয় করে তুলতে একেলে ও সেকেলে কোন পদ্ধতি প্রয়োগের ত্রুটী করেন নি। এককালে বাংলাদেশে অমর দত্ত মহাশয় যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তা এ যুগের বহু অভিনেতার ঈর্ষার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে থিয়েটারের প্রচার কিভাবে করতে হয় এবং অভিনয়ের দৃশ্যপট, সাজ পোষাক কিরূপ ঝলমলে করতে হয়—তা অমরেন্দ্রনাথ প্রথম প্রদর্শন করলেন। অমরেন্দ্রবাবুর যুগকে পেশাদারী রংগালয়ের ক্রমাভিব্যক্তির দ্বিতীয় স্তর হিসেবে গণ্য করা যায়। তারপর অপরেশ চন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও ভূপেন্দ্রনাথ, বাংলা রঙ্গমঞ্চের খোরাক যোগাতে থাকেন এবং সেই সময় স্বর্গীয় মনমোহন পাঁড়ে ও উপেন্দ্রকুমার মিত্র প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত রংগালয় পরিচালনা করতে থাকেন। দানিবাবু, হাঁদুবাবু, কুঞ্জবাবু, প্রিয়বাবু, হীরালালবাবু, কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতি শিল্পিগণ রংগমঞ্চকে এক ধারায় টেনে নিয়ে যান। তাঁদের যুগশেষে রংগমঞ্চের অবস্থা পড়ে আসে এবং প্রকৃতপক্ষে রংগমঞ্চ যে আর বাঁচবে, সে আশা করতে পারা
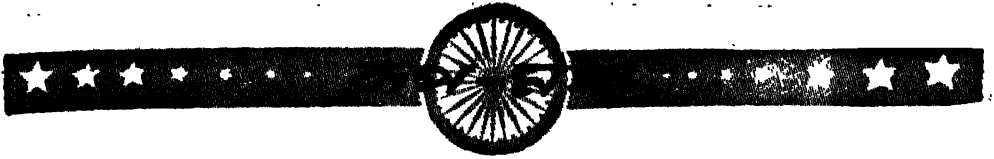
যায়নি। ইতিমধ্যে গৈরিশি নাটকের পদ্ধতিতে নাটক রচনা করবার রীতি বদলাতে সুরু করেছিল এবং দ্বিজেন্দ্র-লাল ক্ষীরোদপ্রসাদকে অনুসরণ করেই নাটক রচিত হ'তে লাগলো। ইতিমধ্যে নাটকের সময় ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত করা হ'তে লাগলো। তথাপি এত পরিবর্তনের মধ্যেও বাংলা রংগালয়ে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেনি। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নিয়ে ও আর্ট থিয়েটার্স 'কর্ণার্জুন' নিয়ে অবতীর্ণ হবার পর থেকে নাট্যালয়ের মধ্যে ও বাহিরে একটা সাড়া পড়ে গেল।

প্রকৃত পক্ষে আর্ট থিয়েটার্স ও শিশিরকুমার যেন একটা নূতন প্রাণের স্পর্শে নাট্যশালাকে সঞ্জীবিত ক'রে তুললেন। পুরাতন পদ্ধতিতে অভিনয়ের প্রথা পরিবর্তিত ক'রে দিলেন প্রথম শিশিরকুমার। তার কিছু পরেই নরেশ মিত্র ও রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির অভিনয় জগতে আবির্ভাব হ'ল নূতন রূপে। এরপরে তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা যখন আর্ট থিয়েটারে আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন অভিনয় জগতে এক নূতন উদ্দীপনা সুরু হ'ল। নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতি, অভিনয় ধারা, সাজ সজ্জা সব কিছুর মধ্যেই একটা নূতন সুর পাওয়া গেল। নাট্য মন্দিরে শিশিরকুমার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, রবি রায়, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও কয়েকটি নবীন অভিনেতা ও অপরদিকে আর্ট থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দর্শকদের কাছে এক বিচিত্র রূপ নিয়ে দেখা দিলে। নাটকের রূপের কিন্তু খুব বেশী অদল বদল হ'ল না। অপরেশচন্দ্র ও ভূপেন্দ্রনাথই রংগালয়কে রসদ যোগাতে লাগলেন, পরে যোগেশচন্দ্র কতকগুলি নাটক লেখেন।

এরপরের পর্যায়ে সতু সেন বাংলা রংগমঞ্চে ঘূর্ণায়মান দৃশ্য-পটের ও নূতন আলোক সম্পাতের কৌশল দেখিয়ে আর এক ধাপ উন্নতির দিকে রংগমঞ্চকে উঠিয়ে দিলেন। তার-পরে আবার চললো যথারীতি অভিনয়ের ধারা। প্রাচীন উৎসাহ ক্রমশঃ মন্দীভূত হ'য়ে এল।

তারপরের পর্যায়ে রঙমহলে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, দুর্গাদাসও এই প্রবন্ধের লেখক রংগমঞ্চকে কিরূপভাবে নূতন ধারায় চালিত করা যায়, তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনা সুরু করেন, এবং শচীন্দ্রনাথই প্রথম নাটকের সময়কে অতি সংক্ষেপ করে নাট্য-রচনা রীতির পরিবর্তন ঘটান। এ যুগে পাশ্চাত্য নাটকের সংগে তাল রেখে শচীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিতে নাটক রচনা সুরু করলেন, তাই আধুনিক নাট্য-রচনা রীতি ব'লে স্বীকৃত হ'ল এবং শচীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে দুর্গাদাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ অভিনেতৃবর্গ অভিনয় ক'রে ও প্রথমোক্ত দুইজন প্রযোজনায় যথেষ্ট কৌশল দেখিয়ে প্রাণবন্ত ক'রে তুললেন। তারপর সেই ধারাই চলে আসছে। অবশ্য এর মধ্যে দুর্গাদাস, সতু সেন, কালীপ্রসাদ ঘোষ, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রভৃতি কলাশিল্পিগণ বিভিন্ন ধরণের প্রয়োগ পদ্ধতি দেখিয়ে সাধারণকে চমৎকৃত করেন। বিধায়ক ও জলধর চট্টোপাধ্যায়ের কতকগুলি নাটক এই সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে, পরে মহেন্দ্র গুপ্তও রংগমঞ্চকে একটা নির্দিষ্ট রীতিতে পরিচালনা করতে থাকেন।

পেশাদারী রংগমঞ্চের এই একটি মোটামুটি ইতিহাস। অবশ্য বিশদভাবে ব'লতে গেলে বহু ব্যাপারের অবতারণা করতে হয়, এবং তা একটি প্রবন্ধে ব'লে শেষ করা যায় না। যাই হ'ক, ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে করতে আমরা যেখানে এসে ঠেকেছি, সেখানে এসে আর কোন নবভাবের বা উদ্দীপনার সাড়া পাচ্ছি না। ক্রমশঃ আবার দেখছি, রংগমঞ্চের আয়ু যেন ক্ষীণ হ'য়ে আসছে।

এর কারণ অবশ্য অনেকগুলি। প্রথমতঃ বাঙালীর আয়ত্বে রংগমঞ্চের প্রেক্ষাগৃহ আছে মাত্র দুটি, বাকী অবাঙালীর। নতুনভাবে, আধুনিকতম ভংগীতে একটি প্রেক্ষাগৃহও এ-যাবৎ আর নির্মিত হ'ল না। অথচ সহরের প্রতি রাস্তায় সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ রচিত হ'বার পক্ষে কোন বাধা ঘটলো না। পুরাতন রংগমঞ্চ তবু পাল্লা দিয়ে চলতে পারলো, তার কারণ, বাঙালী রংগালয়কে সত্যি ভালবাসে এবং একটু আনন্দকর নাটক অভিনীত হচ্ছে সংবাদ পেলে, সে সর্বাগ্রে সেখানে ছুটে যায় তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে। অ-বাঙালী মালিকদের কোন দায়িত্ব নেই রংগমঞ্চকে তাল

করার। তাই তারা রংগমঞ্চকে সুসংস্কৃত করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করলো না ও বাঙালী প্রেক্ষাগৃহের মালিক যাঁরা, তাঁরা নাটক অভিনয়ের চেয়ে নিজেদের ভাড়ার টাকার পরিমাণটা বুঝলেন অ-বাঙালীদেরই মত, তাই তাঁরাও এগোলেন না এর সংস্কারে। বরং সকলেই ভাড়া বৃদ্ধি করতে লাগলেন অযৌক্তিক ভাবে। এইভাবে রংগালয় নিষ্পেষিত হ'তে লাগলো। নতুন রংগালয় তো তৈরীই হ'ল না এ পর্যন্ত।

এরপর রংগালয়ের যাঁরা মালিক হ'লেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই রংগালয়কে ব্যবসায়িক রীতিতে চালাতে চাইলেন না। আপন খেয়াল খুশী মত যথেচ্ছাচার করতে লাগলেন। যা বিক্রী হ'ল, তার চেয়ে নানা দিক দিয়ে খরচা বাড়তে সুরু করলো এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে এঁরা কোন নীতি না অনুসরণ করে চলতে আরম্ভ করলেন। শিল্পীদের খুশীমত কাজ এবং খুশীমত চাহিদা কারণে অকারণে এত বর্ধিত হ'ল যে, রঙ্গজগত ভবিষ্যতে দাঁড়াতে পারবে কি না বলে সন্দেহ হ'তে লাগলো। যুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতি খানিকটা ধাক্কা সামলালে কিন্তু তারপরের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ ব'লে মনে হ'ল না।

এখন দেখা যাচ্ছে, বাড়ীর মালিকদের খেয়াল খুশীমত ভাড়া বৃদ্ধি, শিল্পীদের অসম্ভব মজুরী বৃদ্ধি ও মালিকদের অব্যবসায়ীর মত আক্কেল রংগমঞ্চকে ক্রমশঃ বিলুপ্তির পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করছে। উপরন্তু নাটক রচনার ক্ষেত্র সংকুচিত হ'য়ে এসেছে এবং একটা নির্দিষ্ট চক্রের বাইরে গিয়ে পরীক্ষামূলক ভাবে কোন নাটক অভিনয় করার সুযোগ মিলছে এখানে খুবই অল্প। তার ফলে নবীন নাট্যকারদের বা প্রবীণ নাট্যকারদের নবীন নাটক নিয়ে পরীক্ষা করানো খুবই শক্ত হ'য়ে পড়ছে। রংগালয়ের উন্নতির জন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নাট্যকারের। কিন্তু নাট্যকারদের আমদানীই খুব কম এবং সু-সাহিত্যিকদের নাটক রচনার প্রতি আগ্রহই দেখা যাচ্ছে অতি অল্প। যতদিন না রংগমঞ্চের বাধা স্বরূপ যে কারণগুলি দাঁড়িয়ে আছে, তা দূর করার জন্য সুদূর প্রসারী কল্পনা নিয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী, শিল্পী ও নাট্যকার এগিয়ে আসবেন, ততদিন পর্যন্ত আমাদের রংগমঞ্চ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রংগমঞ্চের সংগে সমান ভাবে পাল্লা দিয়ে চ'লতে পারবে না।

গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বাংলার রংগমঞ্চ স্রষ্টারা একদিন নিজেদের মান, সম্ভ্রম, সামাজিক পদমর্যাদা সমস্ত বলি দিয়ে রংগমঞ্চকে স্থায়ী করার জন্য যেমন শহীদ হ'য়েছিলেন, তেমনি এ-যুগে ঐ রকম ভালবাসা নিয়ে যদি কয়েকজন শক্তিমান শিল্পী সত্যিকারের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা সমেত রংগমঞ্চে এসে দেখা দেন, তাহ'লে বাংলা রংগমঞ্চ আবার এক নূতন রূপে বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারে।

শ্রীমতী মধুছন্দা রায়

পাহাড় দেশ থেকে ইংরেজ মিশনারীরা এক সময় বাংলায় বহু মেয়েকে নিয়ে আসতো—
রাই' চিত্রের এরূপ একটী চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য পাহাড় দেশ থেকেই আবিষ্কার
র! হ'য়েছে শ্রীমতী রায়কে। স্বামী বাঙ্গালী হ'লেও, জন্ম পাহাড় অঞ্চলের অবাঙ্গালীর
র—বাংলা ভাষা তাই জানতেনই না বলা চলে। 'রাই' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য
তী রায় বিপুল আগ্রহ নিয়ে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের নির্দেশে বাংলা শিক্ষা আরম্ভ করেন
মালা' থেকে। আজ মধুছন্দা যেমনি বাংলায় কথা বলতে পারেন, তেমনি
লিখতেও পারেন। দার্জিলিং-এ নিজের বাড়ীতে বসে তাঁর এই সাধনা চলছে—
রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে ও পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের কাছে ইতিমধ্যেই শ্রীমতী রায়
বাংলায় একাধিক চিঠি লিখে তাঁর সাধনার কথা জানিয়েছেন।

দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত দাসীপুত্র চিত্রে সরযূবালা, দীপক, সন্তোষ সিংহ, দেবীপ্রসাদ, মণিকা ও প্রীতিধারা। রূপ-মঞ্চ : শারদীয়া-সংখ্যা : ১৩৫৫

স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ

নরেন্দ্র দেব

★

ক্ষুদ্র এই পশ্চিম বঙ্গের একপ্রান্তে বসে স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ বিচার করা কঠিন। আলোচনা করা আরও কঠিন। কারণ, ভারত প্রকৃতই স্বাধীন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে জনসাধারণের মনে একটা সংশয় রয়ে গেছে। তার উপর বাংলার ফিল্ম সেন্সর বোর্ড সম্প্রতি যে নূতন প্রস্তাবটি করেছেন, যে কোনও স্বাধীন দেশ একরকম অন্যায় আব্দার করতে লজ্জাবোধ করতেন। বিদেশীর শাসনপাশ মুক্ত হয়ে আমাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে যেন সেই তপ্তকটাহ থেকে আগুনের মধ্যে এসে পড়া! ব্রিটিশ বাঁশ গুলির চেয়ে দেশী কঞ্চিরা বেশী দড়ো হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি তাঁরা একখানি জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধ প্রচারমূলক চিত্র থেকে অহিংসা বিরোধী অংশগুলি কেটে বাদ দিতে চিত্র নির্মাতাদের বাধ্য করেছেন! অথচ, সরকারী দপ্তর থেকেই তোলা কাশ্মীর অভিযানের সামরিক চিত্র—হানাদার ও পাকিস্থানী আক্রমণ থেকে কাশ্মীর রক্ষার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর দুঃসাহসিক ও দুর্ধর্ষ যুদ্ধের ছবি দেখানো হচ্ছে! সুতরাং স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ কী দাঁড়াবে, সেটা খামখেয়ালী কর্তাদের মর্জির উপরই অনেকখানি নির্ভর করছে। আমরা শুধু কী হ'লে ভাল হয় বা কী হওয়া উচিত এই টুকুই মাত্র কল্পনা করতে পারি। কারণ, শ্বেতাংগ বুরোক্র্যাটদের চেয়ে আমাদের কৃষ্ণাংগ বুরোক্র্যাটরা ভয়াবহ হয়ে উঠেছেন বেশী! ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সভ্যতার কাঠামো অনেকটা এক ছাঁচের হলেও, শিক্ষা—সংস্কৃতি—ধর্ম-বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির পার্থক্যের জন্য রুচি ও রসবোধের একটা যে সুস্পষ্ট বিভেদ বিদ্যমান, এটা অনস্বীকার্য। ভাষার তফাৎ ও সাজ পোষাকের তফাৎ সত্ত্বেও দেখা যায় যে, একমাত্র শিল্পকলার আদর্শ নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে বিশেষ কোন বিরোধ নেই, কেননা শিল্পের আবেদন সার্বজনীন। চলচ্চিত্র যদিও এখনও ঠিক চারু-কলার সমগোত্রীয় হয়ে উঠতে পারে নি, তবু এটি শিল্প বলেই গণ্য হয়। সুতরাং সর্বভারতে এর সমরূপ হওয়া হয়ত অসম্ভব নয় এই মাত্র বলা চলে। তবে, তার মধ্যেও একটা বড 'যদি' আছে। অর্থাৎ, যদি স্বাধীন ভারত প্রাদেশিকতার প্রশ্রয় না দিয়ে, 'একধর্ম-রাজ্য পাশে' না হোক,—অন্ততঃ 'এক চিত্র বর্ম-পাশে' আবদ্ধ হতে চায়। কিন্তু তা কি হবে? পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন ভারতের যে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ধনপতিরা, ভোগ বিলাসের ও আরাম আয়েসের দিক থেকে তাঁদের রুচি, প্রকৃতি ও চালচলন অনেকটা একরকম বটে; তাঁদের অসুস্থ মানসিকতার যে রূপটি আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যেও একটা সাধারণ ঐক্য চোখে পড়ে। স্বাধীনতা তাঁদের কাছে আজ অবাঞ্ছিত ও যথাচিত ভাবেই এসে পড়েছে—এসে পড়েছে যেন অভিজাত সম্প্রদায়ের চিরাভ্যস্ত সৌখীন বিলাসেরই একটা নূতন উপকরণ হিসাবে। তাই খদ্দরের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা রাতারাতি রেশমি নিশানে রূপান্তরিত হয়েছে! দেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতির কোন বালাই তাঁদের ছিল না এবং এখনও নেই। দুঃখী মধ্যবিত্ত পরিবার ও সর্বহারাদের বেদনা, তাদের মর্মান্তিক অভাব ও শোচনীয় দারিদ্র্য সম্বন্ধে এঁদের কিছু কিছু পরিচয় থাকলেও, এঁরা সে বিষয়ে চিরদিনই উদাসীন। দেশের দুর্ভাগা মানুষগুলোর চেয়েও এঁদের কাছে ঢের বেশী মূল্যবান ও প্রিয় এঁদের কুকুর, ঘোড়া, মোটরকার ও রেফ্রিজারেটার।

এঁদের মধ্যে অনেকেই চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে মূলধন যুগিয়ে টাকা খাটাচ্ছেন তাঁদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়াবার নির্দোষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আজকাল বড় বড় পরিচালক ও সিনেমা স্টারেরাও অনেকেই প্রায় এঁদের নাগাল ধরে ফেলেছেন। গাড়ী, বাড়ী, বাগান, হিলস্টেশন, হোটেল, ক্লাব স্ফূর্তি আমোদ ইত্যাদি নিয়ে এঁরা ক্যাপিটালিষ্টদের জীবনযাত্রার অনুকরণ করাটাই জীবনের চরম ও পরম সার্থকতা মনে করেন।

অতএব একথা মিথ্যা নয় যে, স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্র সম্বন্ধে এঁরা সকলেই কেবল সেইটুকু মাত্রই স্বার্থ-সচেতন, যেটুকুর দ্বারা স্বাধীনতাকে 'একসপ্লয়েট' ক'রে বক্স অফিসে ভিড় বাড়ানো চলে! ছবির মালিক এবং নায়ক-নায়িকারা ও পরিচালকবৃন্দের এ অবস্থা হ'লেও, মূল কাহিনী লেখক এবং কোন কোন চিত্রনাট্যকারের মধ্যেও হয়ত ব্যক্তিগতভাবে কিছু দেশপ্রেমের বীজাণু থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু আদর্শ স্বরূপ তাঁরা যে সেটা গ্রহণ করছেন, এমন কথা জোর করে বলা চলে না। কতকটা শ্রেণী-সংগ্রামের বর্তমান তরংগ প্রভাবে—এই দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলনপ্রসূত সস্তার স্বাদেশিকতার ঢেউকে তাঁরা সুবিধা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পিঠ ছেঁড়া পাঞ্জাবী ঢেকে একটি খদ্দরের জহর জ্যাকেট আর তৈলহীন রুক্ষ মাথায় একটা গান্ধী টুপী পরলেই দারিদ্রকে অনেকটা শ্রদ্ধেয় করে তোলা যায় দেখে, তাঁরা সবই এমন কি 'সেটে'র এক্সট্রা-হ্যাও পর্যন্ত হরিজন সেজেছেন। কিন্তু এদের মনস্তত্ত্ব যদি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাহলে ওর মধ্যেও একস্প্লয়েটমেণ্টের' প্রচ্ছন্ন বিষ পাওয়া যাবে। সুতরাং স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ যে সহসা একটা রূপান্তর গ্রহণ করবে এ আশা দুরাশা মাত্র। যে শিল্পের গোড়ায় গলদ অর্থাৎ আমাদের চলচ্চিত্র জন্মলাভ করেছে যে সূতিকাগারে, সেখানে তার প্রসূতি থেকে ধাত্রী পর্যন্ত কারুরই মধ্যে স্বাধীনতা, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা, স্বাধীন মানুষের মনোবৃত্তিজাত স্বাধীন চিন্তাধারা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই. অনধীনতার আদর্শে চলচ্চিত্র সাহায্যে ভবিষ্যৎ ভারতে নূতন মানুষ গড়ে তোলার তাগিদ এঁদের কারুরই নেই। তবে, এধরণের ছবি একখানি তুললে যদি যথেষ্ট পয়সা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে অবশ্য এঁদের আপত্তি হবে না।

তথাপি দেখা গেছে ১৯৭২ সালের আগষ্ট আন্দোলন এবং পরবর্তী আজাদ হিন্দ ফৌজের বিরাট আলোড়নের পর দেশের আবহাওয়ায় এমন একটা স্বাধীনতার উগ্র উন্মাদনা সঞ্চারিত হয়েছিল, যার দুর্বার তরংগ স্রোতে সিনেমা ষ্টুডিও-গুলি পর্যন্ত বেশ একটু সচকিত হয়ে উঠেছিল; এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম স্বরূপ পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে একাধিক দেশাত্মবোধ উদ্দীপক চলচ্চিত্রকে ছবিঘর-গুলির পর্দার উপর দেশ প্রেমের ছায়া ফেলতে দেখা গেছে। কিন্তু, এ থেকে যদি কেউ এরূপ অনুমান করেন যে, এদেশের চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি সেই বাঞ্ছিত শুভ মুহূর্তে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়েছেন এবং চলচ্চিত্রের সাহায্যে দেশবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বোধিত করবার মহৎ ব্রত গ্রহণ করেছেন, তা হ'লে অত্যন্ত ভুল করবেন। শহরের সন্দেশ ওয়ালারা ঠিক যে ব্যবসায় বুদ্ধির প্যাঁচে 'জয়হিন্দ' সন্দেশ বানিয়েছিলেন এবং কাপড় ওয়ালারা 'বন্দেমাতরম' শাড়ী বুনিয়েছিলেন, এও ঠিক সেই মনোবৃত্তি থেকেই করা। 'পপুলার' জিনিষের কারবার করে দু'পয়সা লুটে নেওয়াই এর চরম লক্ষ্য ও পরম উদ্দেশ্য। উপরন্তু এই সংগে ফাঁকতালে কিছু স্বাদেশিকতাও করে নেওয়া হয়, সেটা উপরি লাভ।

অবশ্য এজন্য তাঁদের দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি ছবিরই কারবার, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস নয়। আর, কারবারের প্রথম উদ্দেশ্যই হল লাভের অংক বাড়ানো। তাই চোরা কারবারিদের বিবেকও বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না পাঁচটাকা জোড়া কাপড় পনেরটাকায় বেচতে—আইন-অনুমোদিত বেশ্যাবৃত্তির ন্যায় প্রত্যেক কারবারই একদিক থেকে বিচার করে দেখলে মনে হবে, ক্রেতাদের পকেট মারবার লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছুই নয়। 'পড়তা-হিসাবে-লাভ' রূপ (reasonable profit) আইনের ফাঁকিতে যদি পাঁচ টাকার জিনিষ ছয়টাকায় বেচলে কোন অপরাধ না হয়, তবে পনেরটাকায় বেচলেই বা দোষ হবে কেন? কাজেই কালোবাজার যেমন দিন দিন ফেঁপে উঠেছে, সেই অনুপাতে চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানও বেঙের ছাতার মত মাসে মাসে অসংখ্য গজিয়ে উঠছে এবং রাম শ্যাম যদু ইত্যাদি অযোগ্য পরিচালকের দল অবাধে তৃতীয় শ্রেণীর ছবি তুলে, চটকদার বিজ্ঞাপনের ভাওতা দিয়ে, কিছুদিনের জন্য দর্শক ঠকানো কারবার করছেন। সামরিক ও অসামরিক উভয় ব্যবসায়ে চোরা কারবারীদের অতিরিক্ত মুনাফালব্ধ টাকা এসেই যে চলচ্চিত্রের বাজারকে
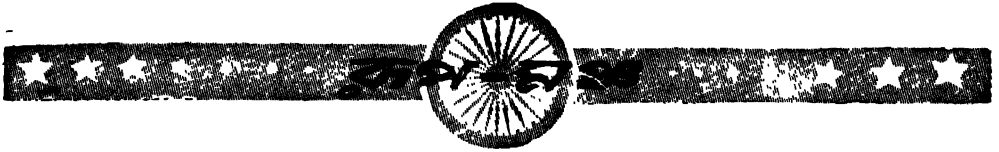
ফাঁপিয়ে তুলেছে, এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। তাঁরা নাকি ছবি তুলে ও দেখিয়ে আরও বেশী টাকা করতে চান। তা তাঁরা মনের আনন্দে করুন, কারণ যোগ্যতা দেখাতে না পারলে কেউই ধোপে টিকবে না! তবে দুঃখের বিষয় এই যে, দরিদ্র দেশের অনেকগুলো টাকা তাঁরা বৃথা অপব্যয় করে উড়িয়ে দিচ্ছেন এবং চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারের পথে অলঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। স্বাধীন ভারত নিয়ে একটু বেশীরকম বাড়াবাড়ি এঁদের মধ্যেই দেখা যায়। যেসব দেশাত্মবোধক চিত্র এ পর্যন্ত দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, সেগুলিকে মোটামুটি তিনটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের অনুবর্তী ব'লে সনাক্ত করা যায়। কোনও কোনও ছবি কংগ্রেস অনুসৃত অহিংস গান্ধীবাদের অনুবর্তী, কোনও কোনও ছবি নেতাজীর সম্পূর্ণ বামপন্থী এবং কোনও কোনও ছবি প্রচ্ছন্ন ভাবে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের আদর্শ প্রচারের জন্য রচিত।

এ ছবিগুলির অধিকাংশই পরাধীন ভারতের অবদান এবং অধিকাংশই তৃতীয় শ্রেণীর ছবি হওয়া সত্ত্বেও দেশানুরাগের চন্দনলিপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছিল বলে জনসাধারণ কর্তৃক সমাদরেই গৃহীত হয়েছে। সুতরাং ব্যবসায়ের দিক থেকে এই শ্রেণীর ছবিগুলি চিত্র-মান অনুযায়ী খেলো হ'লেও, আর্থিক সাফল্যলাভ করেছিল। কোনো কোনো ছবির পরিচালক আবার সব দলের ও সব মতের দর্শকদের সন্তুষ্ট করবার চেষ্টায় ছবির মধ্যে গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের স্তবগানের সংগে সর্বহারাদেরও বাদ দেন নি। তাঁদেরও লক্ষ্মীলাভের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। সুতরাং, স্বাদেশিকতায় অনুরঞ্জিত নব নব চিত্রের আবির্ভাব সম্ভাবনা রুদ্ধ হয় নি। চিত্রে বীরপূজাও সুরু হয়েছে। মারাঠি পণ্ডিত রামশাস্ত্রী, ডাঃ কোর্টনিস প্রভৃতি চিত্র এই শ্রেণীর। স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ নিয়ে প্রথম পর্যায় দেখা দিয়েছে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কাহিনী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'র পর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কাহিনী চিত্রবদ্ধ হচ্ছে। ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন-চিত্রও প্রস্তুতির পথে। শোনা যাচ্ছে, বাংলার বাল্মীকি-মহাকবি মাইকেল মধুসূদনও শীঘ্রই চিত্রলোকে আবির্ভূত হবেন। স্বাধীন ভারতের ছবির রাজ্যে সব চেয়ে বৃহৎ কথা হল, মহাত্মা গান্ধীর বিরাট জীবন-চিত্র। আমেরিকা ও ভারতবর্ষের মধ্যে হয়ত প্রতিযোগিতা হবে এই চিত্র নিয়ে। কংগ্রেসের দাবী অনুসারে যিনি এই স্বাধীন ভারতের স্রষ্টা অহিংস সংগ্রামের সেই নির্ভীক নায়ক, অসহযোগ আন্দোলনের অদম্য নেতা, বিদেশী শাসকের অন্যায় বিধি বিধানের চিরবিরোধী, সেই আইনঅমান্যকারী বিদ্রোহী, সাম্প্রদায়িক মিলনের অকপট প্রচারক, জাতিভেদের বিরুদ্ধবাদী ও দেশের কল্যাণে বার বার কারাবরণকারী দৃঢ় সংকল্প মহাপুরুষ—পরিণত বয়সে যিনি তাঁর মূঢ় দেশবাসীর হস্তেই নিহত হয়েছেন, তাঁর বিচিত্র জীবন ও অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপ স্বাধীন ভারতের চিত্র জগতে একটা নূতন পরিচ্ছেদ সংযোগ করবে বলে আশা করা যায়।

ভারত যদিও আজ কাগজে কলমে স্বাধীন হ'য়ে থাকে, ভারতবাসী কিন্তু আজও স্বাধীন হয়নি। ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সংস্কারে, চরিত্রে ও চিন্তায় আছে সে সনাতনপন্থী। জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি নানা মনুষ্যত্ব বিরোধী আচার অনুষ্ঠানে ও অন্ধ-বিশ্বাসের নাগপাশে সে বন্দী। সোভিয়েট রাশিয়াকে গড়ে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছে সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প। আবার রাশিয়ার চলচ্চিত্র শিল্পকেও অল্পদিনের মধ্যেই বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট। এই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ফলে সেখানে উভয় পক্ষই অশেষ উপকৃত হয়েছে। স্বাধীন ভারতকেও গড়ে তোলবার জন্য প্রয়োজন রয়েছে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রসার ও উৎকর্ষের। কিন্তু, ভারত সরকার দুর্ভাগ্যক্রমে এই চিত্রশিল্পকে অত্যন্ত অবজ্ঞার চোখে দেখছেন! চিত্র-প্রদর্শনীর জন্য নূতন গৃহ নির্মাণে অনুমতি দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছেন। দেখা যাচ্ছে একান্ত ভাবে রেডিয়োর ভক্ত হ'য়ে উঠেছেন তাঁরা। ভারতবর্ষের চতুর্দিকে তাঁরা নূতন নূতন ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন খুলেছেন। স্বাধীনতার 'বাণী' রূপ নিয়েই তাঁরা খুশী। 'রূপবাণী'কে তাই অবহেলা করেছেন।

কেবল মাত্র বচনে মাৎ করবার দিন যে দ্রুত চলে যাচ্ছে, এই সব বৃদ্ধ বাক্যবীরেরা সে সম্বন্ধে সচেতন নন দেখা যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের অপরিমিত শক্তি সম্বন্ধে এঁদের ধারণা যে বিশেষ কিছু নেই, তাও বোঝা যাচ্ছে—এঁদের এই চিত্র-বিরোধী অনুশাসন থেকে।

এঁদের কে বুঝিয়ে দেবে যে, ভবিষ্যৎ জাতিকে গড়ে তুলবার জন্য স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে নেবার প্রয়োজন হ'য়েছে। ভারত সরকারের কর্তব্য আজ সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে এগিয়ে আসা এবং দেশ ও জাতি গঠনের এই বিপুল শক্তি সম্পন্ন শিল্পটিকে ভারতের জাতীয় উন্নতির কাজে লাগানো। একে আজ সমাজতন্ত্রের আদর্শানুকূলে এমন এক বলিষ্ঠ সুন্দর রূপ দিতে হ'বে, যাতে প্রগতিবান বিশ্বের আসন্ন সাম্যবাদমুখী গণজাগরণের সংগে এর কোনও বিরোধ না বাধে। পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রের গণবিধ্বংসী প্রচেষ্টাকে নিষ্ফল করে দেবার উপযোগী ক'রে তুলতে হলে এই চলচ্চিত্র শিল্পকে ভারত সরকারের পক্ষপুটে আশ্রয় দেওয়া দরকার, কারণ, পূর্বেই বলেছি, এর জনক দরিদ্র হ'লেও, এ ধনিকের প্রতি-পালিত এক বিলাসী শিল্প। দেশযজ্ঞের পুরহিতের হস্তে হোক এর সংস্কার। স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের রূপ হোক 'এক পৃথিবীর'—'এক পরিবারের' রূপ। মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, অবজ্ঞা দূর করে দিক, উচ্ছেদ করুক সম্রাজ্যবাদী শোষণ নীতি। জাতি বর্ণ ও শ্রেণীভেদ নিঃশেষ করে দিক মানুষের সমাজ থেকে। স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্রের পটভূমিকা হোক এমনি বিরাট—এমনি বিশাল। তার সমস্যা হোক সর্ব মানবের জীবন সমস্যা, তার কাহিনী হোক নিখিল ভুবনের আখ্যায়িকা—যার আবেদন হবে বিশ্বজনীন। স্বাধীন ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রকৃত চারু চিত্রকলা করে তুলবে যে শক্তিশালী শিল্পীরা ও কল্পনাকুশল পরিচালকগণ—স্বাধীন ভারত তাঁদেরই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে রয়েছে।

ছায়া ছবির গল্প

শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য

★

বাংলার ছায়া ছবির বিরুদ্ধে অভিযোগ ধুমায়িত নয়—একেবারে বহ্নিমান হয়ে উঠেছে—এমন কি সরকার পর্যন্ত একটা আইন প্রণয়ন করতে চলেছেন। অবশ্য আইনের দ্বারা ডজন ডজন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সৃষ্টি করা যায় না—একথা বুঝবার মত লোক সরকার পক্ষে কেউ নেই, একথা বলা ঠিক হবে না, তবে আইন অন্য উদ্দেশ্যমূলকও হ'তে পারে। সর্বসাধারণ বাংলা ছবি সম্বন্ধে অত্যন্ত হীন মত পোষণ করেন এবং উপেক্ষার সংগে মন্তব্য করেন। কারণ বিনা কার্য হয় না,—বাংলা ছবির অধঃপতন দেখে কতক বিরক্তিতে—কতক অভিমানে এমনি বলেন। এর কারণ, বাংলা ছবির গল্প দর্শকদের মনে রেখাপাত করে না। গল্পের দুর্বলতা বলবার বা দেখাবার ভংগীর অসামঞ্জস্যতা ছবিকে অন্তঃসার শূন্য একটা হিজি বিজিতে পরিণত করে। যে কোন ছবিই হোক, তা যদি দর্শকের মনে আঘাত করে, তা সফলতা অর্জন করবেই।

দর্শকরা জানেন না, কি ভাবে ছবির গল্প মনোনীত করা হয়। যাঁরা প্রখ্যাত লেখকের উপন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁরা বেঁচে যান। কিন্তু প্রযোজকগণ, যাঁরা কেউ লোহায়, কেউ চাউলে টাকা করেছেন, তাঁরা ছবি করতে বসে পরিচালকের উপর দিয়ে গল্পের বিচার আরম্ভ করেন—ফলে গল্প যা হয়, তা বোঝা কঠিন নয়। কেউ বা নিজেই একটী দৃশ্য লিখে বলেন, এটা বসিয়ে দিতে হয়, কেউ বা স্বকল্পিত গল্পের একটী রূপ দেন। কাহিনী ও পরিচালনা—অমুক, প্রায়ই আপনারা দেখেন এর অর্থ এই নয় যে, কাহিনী সত্যই তাঁর। অনেক ক্ষেত্রেই শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ তাঁর। এক প্রযোজক একটী গল্প শুনিয়ে আমাকে চিত্রনাট্য ও সংলাপ যোজনা করতে বলেন,—আমি তাঁকে 'ওটা গল্পই নয়' বলে কাজ করতে অসমর্থতা জানাই। তাঁর কথা,—পঞ্চাশখানা ভাল ভাল ছবির ভাল ভাল দৃশ্য একত্রিত করেছি—এ কেন গল্প হবে না! সেই কথাই বিচার্য—পাঁচ বছরের শিশু থেকে আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সকলেই একটা না একটা গল্প বলতে পারেন বা রচনা করতে পারেন কিন্তু লিখে নাম করেন দু'চারজন। গল্প লেখাটা খুবই সোজা, এমনি ধারণা হওয়া সর্বসাধারণের পক্ষে খুব অন্যায় নয়। কিন্তু কি উপাদানে গল্প হয় এবং কেন হয় না একথা চুলচিরে বিচার করা যায় না। কারণ, গল্পের কোন সংজ্ঞা নেই। যা রসোত্তীর্ণ হয়, তাই গল্প বললে কথাটা সঠিক হয় না। কারণ, কথাটাই আপেক্ষিক। একের কাছে যা খুব ভাল গল্প, অন্যের কাছে তাই অত্যন্ত খারাপ। কাজেই রসোত্তীর্ণ কথাটারও কোন সংজ্ঞা নেই। এখানে বিশেষজ্ঞের মতই মত—উপান্তর নেই। গল্প-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, সর্বপ্রথম জাতক হিতোপদেশ, বা ব্যালাড ও গ্রীকড্রামা ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে সৃষ্ট হয়। আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তার সৃষ্টি—তারপর রামায়ণ ও মহাভারত থেকে বঙ্কিম পর্যন্ত সেই আদর্শবাদই চলে এসেছে। ইউরোপে,-ডষ্টেয়ভস্কি, থ্যাকারে, ইবসেন, আনাতোলফ্রাঁর পূর্ব পর্যন্ত একই ধারায় সাহিত্য সৃষ্টি চলেছে—আদর্শবাদের সূক্ষ্মতায় তার পরিণতি। তারপর আরম্ভ হ'য়েছে মনস্তত্ত্বমূলক গল্প (বাস্তব কথা ইচ্ছাকৃত ভাবে ব্যবহার করলাম না) মুপাশা, ব্যালজাক, জোলা, ন্যুটহামসুণ, গলস্‌ওয়ার্দি, সুডারম্যান, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত চলেছে এই ধারা—তারপর Art for Arts' sake ধুয়া ধরেও হেনরী, সমারসেটমম প্রভৃতি লিখে চলেছেন। মানুষের মনকে যা দোলা দেয়, তাই রসোত্তীর্ণ। কিন্তু একটা বিষয়ে সবই একমত যে, মানুষের হৃদয় তন্ত্রীতে যা আঘাত করে না,—তা গল্প নয়। সাহিত্য যুগে যুগে নানা ভাবে এই অনুভূতির তন্ত্রীকে আঘাত করে তাকে সচেতন ও সমাজোপযোগী করে তুলেছে। এই সাহিত্যের দান। কেউ জ্যান্ত মানুষ পুড়িয়ে খায় শুনলে আমরা আৎকে উঠি—এই অনুভূতির উৎকর্ষই সাহিত্যের দান।

জানি গল্প মিথ্যা, একটা কল্পনা মাত্র তথাপি তা পড়ে বা পর্দায় দেখে আমরা হাসি বা কাঁদি কেন? মনস্তত্ত্ব এর

জবাব দেবে। মন-বিজ্ঞান বলে,—মানুষের 'না পাওয়া,' 'অতৃপ্ত আকাঙ্খা' লেখার ভিতর তৃপ্তি পায়। জগতে যা পাইনি তাই পেতে চাই আমরা গল্পে—সেই পরিতোষ পাওয়ার জন্যেই মানুষ গল্প বলে, শোনে। যখন গল্প দেখি বা শুনি তখন আমার আমি থাকি না—নায়ক হ'য়ে নায়িকাকে লাভ করি। দত্তায় নরেন্দ্র হয়ে বিজয়াকে লাভ করি,—আনন্দ হয়। দুঃখ বিলাসী মন দুঃখ পেয়েও আনন্দ পায়। এই যে Identification এই দর্শকের মনকে প্রক্ষিপ্ত করে দুঃখ সুখের স্রোতে ভাষিয়ে দেয়।

অতএব সর্বসাধারণের অন্তরের এই 'না পাওয়ার' বেদনা যে গল্পে মূর্ত হ'য়ে উঠবে, সেই গল্পই সমধিক হৃদয় জয় করবে। জগতে আমাদের বহু না পাওয়া আছে—অর্থ, বিত্ত, নারী, সম্মান, খ্যাতি কত কি ? কিন্তু মন বিজ্ঞান বলে, মানুষের প্রধানতম সহজ প্রবৃত্তি (Inspirent) দুইটি, একটি Self-preservation একটি Self procreation. যত কিছু না পাওয়া তার মূলে এখানকার অতৃপ্তি বর্তমান। জগতে সুন্দরী সংগিনী লাভ করি নি (যেহেতু সুন্দরীর সংখ্যা কম) তাই যখন দেখি, কোন নায়ক পেয়েছে, তখন আমি আনন্দ পাই। কারণ, সেটা Identification এর ফলে আমারই পাওয়া হয়। গরীব যখন বড় লোকের বিরুদ্ধে অভিযানে জয়লাভ করে, তখন আনন্দিত হই। এমনি ভাবে আমার না পাওয়াকে পাই— পেত চাই গল্পে, সাহিত্যে, পর্দায়।

এত সংক্ষেপে ব্যাপারটা সুস্পষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়, তাই হয়ত স্পষ্ট হয়নি। তবে এই যদি সাহিত্যের ইতিহাস ও বিজ্ঞান হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাহিত্য একটা অনুভূতির সৃষ্টি, অন্তরের সৃষ্টি, তা জুড়ে তেড়ে করা সম্ভব নয়। জীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি গল্পে যখন রূপায়িত হয় এবং সে রূপায়ন ভাষার ভাবে অন্যের মনকে আন্দোলিত করতে পারে, তখনই তা রসোত্তীর্ণ বলা হয়।

অনেকে দেখেছেন, কতকগুলি লোক বড্ড মিথ্যে গল্প করে —আমার জমিদারী আছে, অমুক ছাত্রী আমাকে ভালবেসে আকুলি বিকুলি করছে ইত্যাদি। এর কারণ, তার মনের 'না পাওয়াকে' এমনি ভাবে পাওয়ার আনন্দ দিয়ে ভুলিয়ে রাখে। এটাও সত্যিকার সৃষ্টি, কিন্তু তাকে আমরা মিথ্যা গল্প বলে উপহাস করি। কারণ, এটা ব্যক্তিগত এবং এই মিথ্যা গল্প সাহিত্যই হ'য়ে ওঠে যখন তা সার্বজনীন হয়। সার্বজনীনতা তার একটা বিশেষ ধর্ম। কারণ সেই গুণই বেশীর ভাগ লোকের অন্তরে আঘাত করে।

সাহিত্যে ও ছায়া ছবির গল্পের মাঝে একটি পার্থক্য আছে একথা অনেকে বলেন। কথাটা সত্য, কারণ সাহিত্য সূক্ষ্ম, ছায়া ছবি স্থূল। কালির আখর মানুষের মনের যত গভীর প্রদেশে আঘাত করতে পারে, ছবি ও অভিনয় তা পারে না, কারণ তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কাজেই স্থূল জগতের অন্তরালে যে মনোজগৎ আছে, সেখানে প্রবেশাধিকার তার থাকা সম্ভব নয়। ছায়া ছবির গল্প এই স্থূল ভাবে আকর্ষণীয় ও আবেগসম্পন্ন হওয়া দরকার।

ছবি দেখি কেন বা গল্প পড়ি কেন ? আনন্দের জন্যে। কিন্তু তা নয়,—বই পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বালিশ ভিজে গেছে, তবুও বলি বেশ। মন-বিজ্ঞান অনুসারে বলা যায়, আমরা আমদের primary instinct এর পরিপূর্ণতা খুঁজি এবং তা যেখানে পাই, তাকেই প্রশংসা করি।

ছায়াছবির ভাল গল্প কি—যা বেশী পয়সা দেয়। অর্থাৎ যা বেশী লোকের ভাল লাগে—তার মানে যা বেশী লোকের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করে। সভ্য হওয়া কথাটার অর্থ আমাদের আদিম প্রবৃত্তির সংযম। যে শিশু অন্যের বাড়ীতে গিয়ে খাওয়ার ইচ্ছাকে দমন করতে পারে, তাকে বলি সভ্য, যে হাত পেতে বসে—তাকে বলি অসভ্য। এখানে ইচ্ছাটা বর্তমান,—একটা প্রকাশিত অন্যটা সংযত। শিশুর মত মনে আমাদের ক্ষুধা রয়ে গেছে, কিন্তু সমাজ ও সভ্যতার খাতিরে তা বলি না। সেই না বলা আকাঙ্খাটাকে পরিপূর্ণ দেখলে আনন্দ হয়। যখন দেখি, গরীব বড় লোককে খুব একচোট শোনালে, তখন খুশী হই। বড়লোকের মেয়ে গরীব ছেলের প্রেমে পড়লে তখন আনন্দিত হই, ঘরের স্ত্রী আদর্শ স্ত্রী হয়ে উঠলে, তখন তৃপ্তি পাই। এই একই কারণে দেখি গরীব ছেলে মামার মোটরের মিথ্যা গল্প করে, যে ভালবাসা পায়নি—সেই গল্প করে যে, পাড়ায় মেয়েরা তার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে, যে সম্মান পায়নি সেই গল্প করে—অমুক স্থানে তার কি আদর !

কিন্তু এখানে একটা কথা আছে—মানুষ পুরাতন গল্প শুনতে চায় না। নতুন কিছু তারা চায়। কারণ, ব্যাপারটা প্রকৃত পক্ষে ছেলে ভুলানো। ছেলেপুলে যতক্ষণ বেলুন পায় না, ততক্ষণ পর্যন্ত বেলুনের জন্য কাঁদে, যখন পায় তখন পুতুল চায়। আমরাও তেমনি একই দ্রব্য নিত্য পেতে চাই না। নতুন কিছু চাই কিন্তু সবই খেলনা—তার প্রকার ভেদ। সেই জন্যই আদিম কাল থেকে সমস্ত কাব্য, সাহিত্য, গল্পের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, একটি ছেলে ও একটি মেয়ের ভালবাসা হ'য়েছিল তারপর হয় তারা মিলেছে—নয় তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। সবই খেলনা, কিন্তু তার রূপ আলাদা—কাজেই মানুষের গল্পের বিষয় বস্তুটা খুব বেশী বদলায়নি কিন্তু তার রূপ বদলেছে—তার অনুভূতি বদলায়নি—কিন্তু তার গভীরতা পাওয়ার বা চাওয়ার ভংগি বদলেছে (একমাত্র intellectual সাহিত্য ছাড়া)।

পয়সার দিক থেকে সাফল্য চাইলে তাই সূক্ষ্ম বস্তুর প্রয়োজন হয় না, তা সাধারণের স্থূলমনের উপযোগী হওয়া চাই। এখানে স্থূলতা কথাটা আপেক্ষিক,—কালকের জগতে যা সূক্ষ্ম ছিল, আজ তা স্থূলত্ব প্রাপ্ত হয়েছে,—কারণ মানুষের মন প্রগতিসম্পন্ন। ষ্টুডিও মহলে তাই বলা হয়, সূক্ষ্ম গল্পের প্রয়োজন নেই—কিন্তু তারা সাধারণ মনের অগ্রগতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। সেকালের স্থূল গল্পকে একালে আরোপ ক'রে বেকুব হন। সিনেমার গল্পে সাফল্য লাভ করতে হলে তাই দেশের সর্বসাধারণের মনের একটা পরিমাপ করা দরকার। বাংলা ছবি অধঃপতিত এই অর্থে যে, তাঁরা সাধারণের অগ্রগতির হিসাব রাখেন নি। তাঁরা তাঁদেরকে অত্যন্ত অবুঝ মনে করে, অত্যন্ত স্থূলবস্তু দিয়ে চিত্ত জয় করতে গিয়েছেন। ফলে অত্যন্ত ঠকেছেন।

সম্প্রতি একখানা আমেরিকান বইতে পড়লাম, সেখানে গল্প নির্বাচনের জন্য একটা দপ্তরত আছেই, তা ছাড়া mass-mind এর trend বা মনোবৃত্তির ধারা নির্ধারণ করবার জন্যে মনবিজ্ঞানীরা আছেন। তাঁরা সেটাকে নির্ণয় করে বলে দিলে সেই ধারা অনুযায়ী গল্প নির্বাচিত হয়। তাঁরা সেই গল্পটা সমগ্র পৃথিবীতে পরিবেশন করেন এবং টাকা যথেষ্টই লুটে থাকেন। ছবিও বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে বিভিন্নভাবে নির্বাচিত হয়। আমেরিকা আমেরিকাই—বাংলা নয়। কিন্তু বাংলায় ছবিটা হয় বাতিকে। মাছ ধরা, ফুটবল খেলা দেখা প্রভৃতির মত সিনেমায় বাতিকগ্রস্ত যাঁরা—তাঁরা একটু বাতিক পরিতৃপ্তির আশায় ষ্টুডিওতে যান। কুলোকের খপ্পরে পড়লে সর্বস্বান্ত হন, ভাললোকের হাতে পড়লে হয়ত বা বেঁচে যান। ব্যবসায় হিসাবে বাংলার ছবি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না—তাই তার ত্রুটি বিচ্যুতি অসংখ্য।

গল্প নির্বাচন সাধারণতঃ প্রযোজকের খেয়ালের উপর নির্ভর করে। পরিচালক অনেক সময় উদরান্নের জন্যে নিরুপায়ের মত সেটাকে মেনে নেন। এবং অভিনেতাগণ যা হয় কিছু হাতিয়ে নেন—কারণ সম্পর্কটি মাত্র কয়েক মাসের—কাজেই লুটের প্রতিই লক্ষ্যটা বেশী থাকে।

একই গল্প কারও ভাল লাগে, কারও লাগে না তার কারণ. তার মনের গঠন। কাজেই মানুষ মাত্রেই বিভিন্ন temperament নিয়ে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই অল্প বিস্তর pervent—এ ক্ষেত্রে যে-কোন একজনের মতামতের উপর গল্প নির্বাচনের ভয় যথেষ্ট। দেশের সমস্ত লোক যদি বলেন, এ কবিতাটা খারাপ এবং রবীন্দ্রনাথ বলেন ভাল,তবে রবীন্দ্রনাথের একটি ভোটেরই জোর বেশী হবে। কারণ, তিনি বিশেষজ্ঞ—যাঁরা সারাজীবন গল্পের স্বরূপ নিয়ে একটুও মাথা ঘামাননি, সাহিত্যের ঘারও মাড়াননি—তাঁরা অর্থের ঔদ্ধত্যে, অহঙ্কারের অজ্ঞানতায় ও কর্তৃত্বের মোহে যদি বিশেষজ্ঞ হ'য়ে দাঁড়ান, তবে তার ফল ভয়াবহ হবেই। তাই বাংলা ছবির ভয়াবহ পতন হয়েছে—প্রযোজকের permission অনুযায়ী নির্বাচিত গল্প অন্যের মনকে আনন্দ দিতে পারবে না।

সমালোচনা মানে শত্রুতা নয়—সংশোধন। বাংলা ছায়াছবি ভারতের, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হয়নি বলেই আমাদের ক্ষোভ। তাই গালাগালি দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু উদ্দেশ্য তাকে ভাল করা। যতদূর বলা হ'য়েছে, তাতে এটুকু বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সাধারণের অতৃপ্ত আকাঙ্খার তৃপ্তি যে গল্পে হবে, সে গল্পটার সাফল্য অনুমান করা যায়। তার মধ্যে সাধারণের চিন্তাধারার আনুকূল্য থাকলে আরও ভাল।
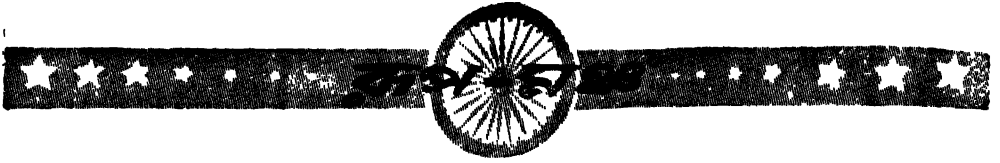
যখন কালোবাজারের বিরুদ্ধে সাধারণের মন উত্যক্ত হ'য়ে উঠেছিল, তখন তার গল্প টাকা দিয়েছে। এখনও সে উত্তাপ কাটে নি কিন্তু তাই বলে দ্বিতীয় ছবি চল্‌বে না। কারণ, তা পুরোনো। কিন্তু আদিম যুগে মানুষ ভালবেসে পায় নি, আজও পাচ্ছে না—এই না পাওয়ার উপর রচিত গল্প সর্ব-কালের। কিন্তু চাওয়া ও পাওয়ায় রূপ ভিন্ন এবং সেই রূপ সম্বন্ধে অবহিত হচ্ছেন কৃতি সাহিত্যিক, যেহেতু তার কৃতিত্বই সেই রূপ নির্ধারণের প্রমাণ। সেই জন্যেই দেখা যায়, নামকরা কোন সাহিত্যিকের গল্প একেবারে মার খায়নি—(অবশ্য তাকে ক্ষত বিক্ষত করে একেবারে চেনবার অযোগ্য করে না তুললে।) ভাল সাহিত্যিকের গল্প মার খেয়েছে তখনই, যখন তিনি ধরাকে সরা জ্ঞানে তুচ্ছ করেছেন। পৃথিবীটা বৃহৎ, সবার মত সংকীর্ণ নয় এটা অবহিত হওয়া তাই প্রয়োজন—সাধারণকে চিনে রাখা তাই অত্যাবশ্যক।

বাঙালী সর্বসাধারণের কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যকে তাই বিচার করা প্রয়োজন—(১) বাংলার সাহিত্য সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী (২) তার ঐতিহ্য ভারতীয় ঐতিহ্য হতে পৃথক (৩) তার শিল্প কোমলতা ও সুন্দরসবোধের পরিচায়ক (৪) তার ভাস্কর্য ভারতীয় চারুকলা হতে বিভিন্ন (৫) বাংলার সংগীত বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। অক্ষয় মৈত্র এ সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন।

এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, বাংলার মাটির গুণে বাঙ্গালী জাতির রসবোধ উচ্চাংগের। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি এবং তীক্ষ্ণধী। একথা যদি আমরা স্বীকার করি, তবে গল্প নির্বাচনেও স্বীকার করতে হবে। বাঙালী মনের খোরাক চায়—আদর্শবাদের খেয়ালে অতীতে বহু ভুল সে করেছে, আজও করছে। কাজেই আদর্শবাদী জাতি নিছক একটি কাহিনীকে কখনই উপলব্ধি করতে চাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা সত্যিকার হৃদয়াবেগসম্পন্ন হয়। অধিকন্তু বাঙালী ভাব-প্রবণ জাতি। কাজেই কাহিনীর গতি ও প্রকৃতি হৃদয়ের অনুগামী হওয়া প্রয়োজন। বাঙালী আদর্শের জন্যে প্রাণ দিয়েছে—অর্থের জন্যে দেয় নি।

দর্শক সর্বদেশেই বিভিন্ন শ্রেণীর। পাঠকও তেমনি। কেউ রোমাঞ্চকর গল্পের পাঠক, কেউ উচ্চাংগের উপন্যাস-পাঠক ইত্যাদি। G. B. Shaw থেকে H. G. Wells ও Willium de quex এর পাঠক চিরকালই বেশী। কিন্তু তা হ'লেও একটা কথা সত্য যে, যা সত্যিকার ভাল, তা সকলেরই ভাল লাগে যদি তা বোধগম্য হয়—যেমন চার্লির 'সিটি লাইটস্' সকলেরই ভাল লাগে। যদিও সকলেই একভাবে তাকে অনুভব করে না। প্রকৃতপক্ষে যে গল্প মানুষের মনের গভীর তলদেশ স্পর্শ করে, তা সকলেরই ভাল লাগে।

পূর্বে গল্পের plot থাকাটা আবশ্যকীয় ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই। এখন মনের সংঘাত বা পারিপার্শ্বিকতার সংগে সংঘাতের কাহিনীই গভীরতা নিয়ে ভাল গল্পে পরিণত হয়। ষ্টুডিওতে ঘটনাবহুল গল্প চাওয়া হয়—অর্থাৎ সব plot এর প্রাধান্য আছে। কিন্তু জনসাধারণ সে যুগ উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে—এখন তাঁরা স্থূল ঘটনার চেয়ে মানব মনের সংঘাত প্রতিক্রিয়ার কাহিনীই বেশী ভালবাসে। কারণ, সেটা অনুভব করবার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সে অর্জন করেছে। বর্তমানে নাম করা লেখকের গল্পের সারাংশ ঘটনা করে বল্‌তে গেলে দেখা যায়, তার ঘটনাই নেই—plot ও নেই। শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলের' ঘটনা কি? ঘটনা সেখানে তুচ্ছ কিন্তু বিন্দুর হৃদয়ের অনুভূতিই অপূর্ব গভীরতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে—Queet flows the Don এর মত বৃহৎ উপন্যাসেও কোন plot বা ঘটনাপ্রধান সারাংশ নেই। এই ধরণের গল্প বা কাহিনীর মূল কথা delineation বা রচনার ব্যঞ্জনাবৃত্তি যা নির্ভর করে লেখকের শক্তির উপর। সামান্য একটা ঘটনাকে ব'লবার ভংগীতে বৃহৎ ও রোমাঞ্চকর করে তোলা যায়। তারপরে ব্যস্ততার যুগে
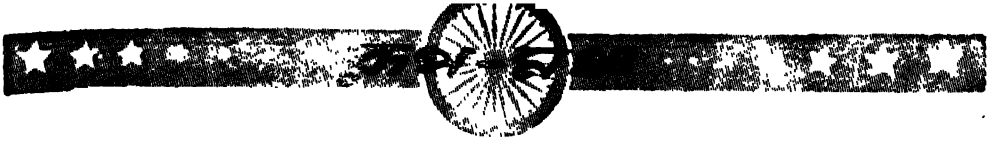
পাঠকের মনকে চট্ করে কৌতূহলী না করতে পারলে পাঠক তা পড়তে চায় না। কাদম্বরী আজকার যুগে পড়বার ধৈর্য কারও নেই, ভাগবৎগীতাও শুনবার অবসর নেই কিন্তু তা শোনাতে যদি হয়, তবে কৌশলে শোনাতে হ'বে। ধরুন যদি "কাননবালার জীবনের ইতিহাস আপনারা জানেন না, কিন্তু আমার জানবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল" বলে আরম্ভ করি এবং তারপর গীতা ব্যাখ্যা করি তবে তা শুনবেন বলে আশা করা যায়। তবে শেষ পর্যন্ত কাননবালার জীবনেতিহাসের হয়ত কিছু থাকবে এই পর্যন্ত।

যাই হোক, মিথ্যাবাদীর বানানো গল্প, সাহিত্যিকের মূল্যবান গল্প সম্ভার সবতারই মূল—কল্পনাচারী মানব মনের অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তিই সৃষ্টি করেছে তার সাহিত্য—তাই দিয়েছে তারে সৃষ্টির আনন্দ, জীবনের আনন্দ। তথাপি সব গল্পই গল্প হ'য়ে দাঁড়ায়নি। তার কারণ, তা অন্যের মনকে আঘাত করে নি। ছায়াছবির গল্পেরও প্রধান কথা তাই—সে গল্পও মানুষের মনকে আঘাত করা চাই। ব'লবার medium বিভিন্ন হ'লেও, তা মূলত: এক এবং প্রকাশের ভংগীই তার রস সৃষ্টি করে।

প্রযোজক পরিচালকের হঠকারিতা বা অন্ধত্ব সাধারণের মতামতের আগুনে পুড়ে ছাই হ'তে বাধ্য। বাংলা ছবি যে রকম ভাবে লোকসানী ব্যবসা হ'য়ে উঠেছিল, বর্তমানে তা আর হবে না। কারণ, ঠেকে তারা শিখেছেন যে, সাধারণকে ভোলানো খুব শক্ত কাজ। তবে প্রকৃত উন্নতি করার হ'লে ধনিকদের পক্ষে প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত চিত্র প্রতিষ্ঠানে যোগদান করাই উচিত এবং উন্নতি করবো বলেই আশা উচিত। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যোগদানের সময় এসেছে—কারণ, ছায়াছবির দায়িত্ব অনেক। যাঁরা বর্তমানে এঁর কর্ণধার, তাঁরা এ দায়িত্ব পালন করেন নি, করতে পারেন নি। ভবিষ্যতের কর্মিগণ জাতির প্রতি সে দায়িত্ব পালন করবেন বলে আশা করি।

পুঁথি

(গল্প)

শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য

★

বহুদিনের পুরাতন একখানা পুঁথি। এ ঘরের অসংখ্য জিনিষ ও ঘর কন্নার নাতিবৃহৎ আয়োজনের মধ্যে ধূলি মাখানো একখানা কয়েক পাতার পুঁথি যেন অমর হয়ে বেঁচে আছে।

বহুদিন পর আজ জ্ঞানদা সেখানা নামিয়ে আনেন। ধুলোবালি ঝেড়ে সেটাকে পরিচ্ছন্ন করে ছেলের সামনে ধপ করে ফেলে দিয়ে বললেন : নাও, পড়ো এখানা—।

ছেলে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকাল—। একখানা নূতন পুস্তকের আশায় সে প্রতীক্ষা করছিল। একখানা নূতন পুস্তক তার মলাটে বহু বর্ণের ছবি, অক্ষরগুলো ঝরঝরে, নূতন কাগজের গন্ধ নাকে নিয়ে সে আরাম পাবে। কিন্তু যা বেড়োলো, তা নিতান্তই পুরাতন। অক্ষরগুলো অস্পষ্ট ভাপসা গন্ধে তার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

কিন্তু মা আবার বললেন : এ বই শেষ করো। তারপর অন্য বই—।

তীর্থযাত্রী দুর্গম পথের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর, পথ চলতে আরম্ভ করলো। এ ক'পাতা শেষ করতে তার আর ক'দিনই বা লাগবে—।

কিন্তু এ বইয়ের একটা ইতিহাস আছে—

পিতৃপুরুষের ভিটি-মাটি ছেড়ে মহানগরীর রাজপথে এসে দাঁড়ানোর মধ্যে একটা বেদনাদায়ক রোমাঞ্চ আছে—। জ্ঞানদা রোমাঞ্চিত হল—। এমন কি, মহানগরীর এক নিভৃত কুঠুরীতে আলো বাতাসহীন অন্তঃপুরে মহারাণী হয়ে উঠবার গৌরবকেও সে অস্বীকার করতে পারল না।

তাই একদা সন্ধ্যায় জ্ঞানদা হোঁচট খেতে খেতে তার নূতন সংসারে এসে প্রবেশ করল—, একটি কেরোসিনের বাতি মিট মিট করছে, তারই কৃপণ আলোতে নূতন সংসারের অকিঞ্চিতকর আয়োজন, একটা সুটকেস, বেডিং, লণ্ঠন ও ছাতা—জ্ঞানদার আজও বেশ মনে আছে—।

পাশের ঘরের বারান্দায় একজন পশ্চিমা স্ত্রীলোক উনুনে আঁচ দিয়ে সামনে বসে আছে। জ্ঞানদা তাকে দেখেছে —কিন্তু, একটিবার মাত্র, তারপর আবার নিজের কাজে মন দিয়েছে।

সামনের উঠানে সমস্ত বাড়ীর আবর্জনা, উনুনের ছাই, তরি তরকারীর খোসা, মাছের আঁইস ও পচা ভাত—জ্ঞানদার এ ও মনে আছে!

দোতলা থেকে কয়েকখানা শাড়ী ঝুলছে এবং যে সমস্ত আলো তাদের ঘরে পৌঁছবে বলে বহুদূর থেকে এসেছে, তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে—।

জ্ঞানদার দম আটকে যাচ্ছে। সমস্ত বাড়ীতে বিভৎস কলরব শুনা যাচ্ছে। ছেলেদের ক্রন্দন, বৃদ্ধদের বিলাপ, ও যুবকদের আর্তনাদ সমভাবেই চলছে—।

বিপরীত দিকের একখানা ঘরে কয়েকটি লোক একটি গ্রামোফন নিয়ে হল্লা করছে—।

এর মধ্যে ভীত ও সংকিত পদক্ষেপে জ্ঞানদা এসে প্রবেশ করল। এই তার নূতন সংসার, নূতন জীবন—। এখানে যা কিছু জীর্ণ ও আবর্জনাময়, তাকে দূরে ফেলে দিয়ে নূতনকে আহ্বান জানাবে জ্ঞানদা। কালই বাড়ীটিকে সে পরিচ্ছন্ন করে তুলবে। লোকগুলোকে শান্ত ভাবে কথা বলতে শিখাবে সে।

স্বামীর পদ শব্দ শুনে জ্ঞানদা সচকিত হয়ে উঠল। ঘরের গুমোট আবহাওয়াকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে স্বামী চিৎকার করে বললেন : জ্ঞানদা, খুব পরিপাটি করে ডিম ও মাংসের কারী বসিয়ে দাও। দেখো, অযত্নে যেন নষ্ট না হয়।

জ্ঞানদা ভীত ও সংকাকুল দৃষ্টিতে তাকাল। বিয়ের রাত্রিতে স্বামীর যে কণ্ঠস্বর শুনেছে, আজ তা কোথায়—? কণ্ঠস্বরে এমন কর্কশতা সে দিন ছিল না—।

ধপ্ করে জ্ঞানদার সামনে পুঁটলিটা ফেলে দিয়ে স্বামী অন্য কাজে বেরিয়ে গেলেন—। কিন্তু ইতিমধ্যে বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা ঘরের সামনে আনাগোনা আরম্ভ করেছে—। তার ডিমের কারীর গন্ধ পেয়েছে কিনা, তাই—।

জ্ঞানদা তাদের দিকে লক্ষ্য করেছে বা করে নাই। বিবাহের রাত্রিতে স্বামীর যে জীবনোজ্জল রূপ সে
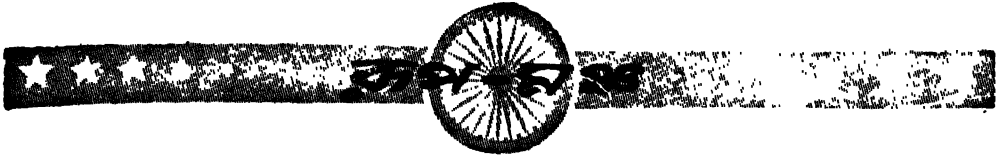
দেখেছিল, তার সাথে অদ্যকার রূঢ় ও অমার্জিত স্বামীর তুলনা করে সে যেন অনেকটা দিশাহারা হয়ে উঠল।

অনেক রাত্রিতে স্বামী ফিরে আসলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ একজন নূতন মানুষের রূপ নিয়ে। আহারে বসে সে চিৎকার করে উঠল: এভাবে বিলি-বণ্টন, দান-পত্র এখানে চলবে না, জ্ঞানদা। সাবধান, এই আমি শেষবার জানিয়ে দিলাম তোমাকে।"

ঘরে একটি মাত্র কেরোসিনের প্রদীপ ক্ষীণ শিখায় জ্বলছে। সে শিখাটিকে কেন্দ্র করেই যা একটু আলো—তা ছাড়া, চতুর্দিকে অন্ধকার কেন স্তরে স্তরে জমাট বেধে রয়েছে। জ্ঞানদার অসহায় দৃষ্টি সে অন্ধকারের পাষাণ প্রাচীর থেকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসল।

কিন্তু স্বামী আবার চিৎকার করে উঠলেন। বললেন: মলিনাদিকে শীঘ্র এক ডিস মাংস দিয়ে এসো, জ্ঞানদা। তাকে না দিলে আমার মুখে কিছুই যে ভাল লাগে না।"

মলিনাদিকে বা তার সংগে স্বামীর কি সম্বন্ধ রয়েছে, জ্ঞানদা তা বুঝতে পারল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু, নেশার ঘোরে অর্ধ উন্মত্ত স্বামী জ্ঞানদার এ কৌতূহলকে আর বাড়িয়ে তুলল না। কথাটি সে বে-মালুম বিস্মৃত হ'ল।

গভীর রাত্রিতে জ্ঞানদা এসে স্বামীর শিয়রে দাঁড়াল। বড় অসহায় মনে হল স্বামীকে। এই একটু আগে ঘরের মেঝেতে উচ্ছিষ্ট ও বমি নিকাতে গিয়ে স্বামীর প্রতি যে বিরূপতা ও অশ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল, আজ এ মুহূর্তে বিছানার এক পাশে দাঁড়িয়ে সে ভাবটা সম্পূর্ণ বিলুপ হয়ে জ্ঞানদার মন সহানুভূতি ও বেদনায় মর্মরিত হয়ে উঠল। স্বামীকে সে জড়িয়ে ধরতে গেল, কিন্তু পারল না।

পরদিন কথা প্রসংগে স্বামী সে কথাটি বললেন। বললেন: একটা জায়গায় আমার অপরিসীম দুর্বলতা, জ্ঞানদা! ভেবেছিলাম, তোমাকে সে কথা বলব না। কিন্তু, আজই হউক বা দুদিন পরই হউক, সে কথাটি তোমার অজানা থাকবে না।

জ্ঞানদা বাধা দিয়ে বলল: থাকুক সে কথা। আমার কাছে জীবনের একটি দিনই সত্য—যেদিন তোমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সেদিন অজস্র মিথ্যার মধ্যেও একটি সত্য ছিল। সত্যটি এই যে, তুমি আমাকে ভালবেসেছ।"

এর পর তাদের আর কোন কথা হল না। জ্ঞানদা স্বামীর দিকে চায়ের কাপটি এগিয়ে দিল।

স্বামী সেদিন নূতন শাড়ী নিয়ে এসেছেন। রঙ ও বুনানী দুটাই জ্ঞানদার পছন্দ হয়েছে। কোথা থেকে কি দরে এটা সংগ্রহ করা হয়েছে, স্বামীকে সে প্রশ্ন করতেই ধমক দিয়ে উঠলেন। বললেন বিদ্রূপ করে: দোকান সাজিয়ে বসার কোন সংকল্প আছে বলে ত কোন দিন জানাও নাই।"

ধমক খেয়ে জ্ঞানদা চুপ করল। কিন্তু ঘরের বহু এলো-মেলো ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যে আর একটি জিনিষ এসে জমা হল। সপ্তবর্ণের একটা দ্বীপ। কাপড় খানার ভাঁজ খুলে দেখল সে একবার, দুইবার ও বহুবার। ইচ্ছা হল, এ কাপড় খানা এই মুহূর্তেই সে পরিধান করবে, নূতন করে সেজে উঠবে। নব পরিণীতা বধূর কল্যাণী রূপ নিয়ে কয়েক বৎসর আগে যেমন করে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেভাবেই আজও আবার দাঁড়াবে। বলবে, তুমি আমাকে নাও—আবার।

জ্ঞানদা ধীরে ধীরে শাড়ীখানা পরল। আয়নায় নিজের মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নিল। তারপর ধীরে নম্র পদবিক্ষেপে স্বামীর বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু স্বামীকে সে বিছানায় পেল না।

জ্ঞানদার জীবনের এই একটি দিন।

পরদিন সকালের দিকে একজন লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। তার প্রতিটি পদবিক্ষেপে সংকা, পৃথিবীর অনড় প্রকৃতির উপরও যেন তার বিশ্বাস নাই। বহুদিনের জীর্ণ ও মলিন একখানা কাপড় তার পরনে রয়েছে। একটু সামনে এগিয়ে গেলে দেখা যায়, তার চোখ দুটি কোটরগত —দুটি আগুনের গোলা সেখানে জ্বলছে।

জ্ঞানদা তাকে চিনতে পারল, এ তার স্বামী।

স্বামী কম্পিত পদক্ষেপে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাকের উপর থেকে শাড়িখানা নামিয়ে নিয়ে জ্ঞানদার দিকে না তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন: এ কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট করলে কে?"
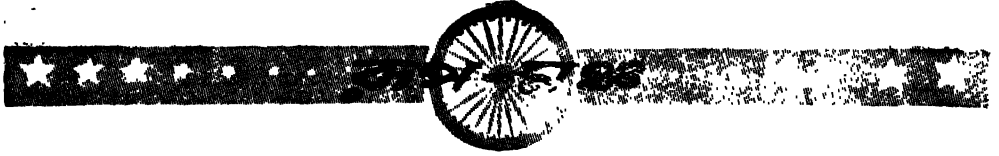
হঠাৎ জ্ঞানদার মুখ থেকে কোন কথাই বের হল না। কিছুক্ষণ পর সেটির দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে সে বলল: ওটা যে অন্যের জন্য আনা হয়েছে, সেটা আমি বুঝতে পারি নাই।"

স্বামী কিছু জবাব দিলেন না, এমন কি, জ্ঞানদাকে তিরস্কারও করলেন না। কাপড়খানা বগল দাবা করে একটি নর-কঙ্কাল কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু, সন্ধ্যাবেলা একজন মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকের কাঁধে ভর করে স্বামী এসে দাঁড়ালেন। অপরিচিতা একটি স্ত্রীলোকের আবির্ভাবে জ্ঞানদা সরে দাঁড়াল।

কিন্তু মলিনা মোটেই সংকোচ প্রকাশ করল না। জ্ঞানদার স্বামীকে জ্ঞানদার হাতে তুলে দিয়ে সে তিরস্কার করে বলল: আশ্চর্য লোক তুমি, সারাদিন যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াবে, তবু ভুলেও কি একটু খোঁজ করতে নাই?"

জ্ঞানদা স্বামীকে হাত ধরে বিছানায় নিয়ে গেল। বিছানায় তাঁকে শুইয়ে দিয়ে সে একবার ভাল করে মলিনার দিকে তাকাতে যাবে। কিন্তু, মলিনাই আবার কথা বলল। বলল: সারাদিন পার্কে, ফুটপাতে ঘুরে বেড়াবে, লোকের গাঁইট কেটে পয়সা সংগ্রহ করবে, বাজে লোকের আড্ডায় গিয়ে নেশা করবে, বেশ্যাবাড়ী গিয়ে ঢলাঢলি করবে, একি তুমি চোখেও দেখ না?"

জ্ঞানদার ইচ্ছা হল সে সমস্ত কিছু স্বীকার করে নেয়। ইচ্ছা হল মলিনাকে জানিয়ে দেয় যে, সমস্ত কিছু জেনেও স্বামীকে বেঁধে রাখবার মন্ত্রট সে জানে না। অপরিসীম অসহায়তায় সে এই অপরিচিতার দিকে তাকাল।

মলিনাকে একখানা আসন সে বিছিয়ে দিতে যাবে, কিন্তু মলিনাই বাধা দিয়ে বলল: কিছু প্রয়োজন নাই—আমি চললাম।"

মলিনা সত্য সত্যই বেরিয়ে গেল। কিন্তু, দু' পা গিয়েই কি একটা কথা মনে হ'তে সে ফিরে আসল। মুখে তার তীক্ষ্ণ ও মৃদু হাসি। বলল: আমার পরিচয় সম্পর্কে তোমার মনে হয়ত একটা কৌতূহল থাকবে। কিন্তু, সে কৌতূহল আমি দূর করিই বা কি ভাবে? তোমার স্বামীর সংগে আমার সম্পর্কটা যদি মুখ ফুটে বলি একবার, তবে তোমার সমস্ত জীবন বিষ হয়ে উঠবে। তাই, সে কথা বলব না। কিন্তু, আজ যখন আমার দাবী শেষ হয়ে গেল, তখন তোমার দাবীটি জানাতে তুমি বিন্দুমাত্র সংকোচ করো না জ্ঞানদা।"

মলিনা ঠিক যে পথে যে ভাবে এসেছিল, ঠিক সে পথে সে ভাবেই বেড়িয়ে গেল। এখানে এ মুহূর্তে যে জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেল এবং আর একটি অধ্যায় আরম্ভ হল, সে কথা মনে করে মলিনার মনে যে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার নিঃশঙ্ক ও সুনিশ্চিত পদক্ষেপ দেখে কিছুমাত্র অনুমান করা গেল না।

স্তব্ধ, চিন্তিত ও হৃদয়ের অপরিসীম আলোড়নে মৌন জ্ঞানদা স্বামীর শিয়রে গিয়ে বসল এবং অতি সন্তর্পণে স্বামীর কপালে নিজের হাতখানা রাখল।

চোখ বুজে থেকেই স্বামী জানতে চাইলেন: মলিনাদি তাহলে চলেই গেলেন?"

জ্ঞানদা এ প্রশ্নের কোন জবাব দিল না—দিতে পারল না। ইতিমধ্যে কয়েক মিনিট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেল। স্বামী আপন মনেই বলে চললেন: সে চলে গেল। কিন্তু, একটা অদ্ভুত প্রতিশ্রুতি আদায় না করে সে গেল না।"

পরদিন অপেক্ষাকৃত সুস্থতা বোধ করে স্বামী উঠে বসলেন। জ্ঞানদাকে কাছে টেনে নিয়ে তার হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন: মলিনাকে বলেছিলাম তুমি দুটি দিন সবুর করো'—তারপর তোমাকে যে কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারব। কিন্তু কেন তাকে এ কথা বলেছিলাম জান?"

স্বামী বালিশের তলা হতে এক জোড়া দুল বের করে জ্ঞানদার সামনে রাখল। বলল: এ দুটো পড়লে তোমাকে সুন্দর, অতি সুন্দর মানাবে। কিন্তু মলিনাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আর কাদায় পড়ে মাতামাতি করব না। সমস্ত ধুয়ে মুছে বিশুদ্ধ হয়ে উঠব এবং পৃথিবীর দশজনের ন্যায় এগিয়ে চলব। কিন্তু তা কি সম্ভব?"

জ্ঞানদা তৎক্ষণাৎ আয়নার কাছে যেয়ে দাঁড়াল। না, তাকে বেশ সুন্দর মানিয়েছে। দশ বৎসর পূর্বেকার বিবাহের প্রথম রাত্রির নিজের চেহারাটা মনে আনতে চেষ্টা করল

জ্ঞানদা। কিন্তু অকস্মাৎ নিজের দিকে তাকিয়ে সে চিন্তিত হয়ে উঠল। একটা নব জীবনের মর্মর শুনতে পাচ্ছে সে। হ্যাঁ, তাকে কেন্দ্র করেই নূতন ইতিহাস রচিত হচ্ছে, মহাসমুদ্রে প্রবাল দ্বীপের আবির্ভাব। জ্ঞানদা সে প্রত্যাসন্ন আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানাল। জ্ঞানদা আজ শুধু জ্ঞানদাই নয়—আরও একজন।

জ্ঞানদা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল। স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে যেন একটা শান্ত ও সমাহিত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। মনে হল, এই তার আসল রূপ। মনে হল. একেই সে ভালবেসেছিল একদিন এবং একেই সে আজও ভালবাসতে পারে।

জ্ঞানদার দিকে তাকিয়ে তার স্বামী সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রশ্ন করল: একটা নূতন জীবন আরম্ভ করলে হয় না? দু'জনে মিলে একটি নূতন ইতিহাস? মলিনাকে আমি কিন্তু সে প্রতিশ্রুতিই দিয়েছি।"

জ্ঞানদা বাধা দিয়ে রোমাঞ্চিত কণ্ঠে বলল: দু'জন নয়—তিনজন।"

জীবনের এগুলি অতি তুচ্ছ ঘটনা। এগুলি মরে যায়—ঝরে পড়বে বলেই এগুলির জন্ম। জ্ঞানদা তা জানে। তথাপি অরণ্য যেদিন মর্মরিত হয়ে উঠে, আকাশের কানায় কানায় কালো-মেঘের সমারোহ আরম্ভ হয়, তখন নিতান্ত অনাহুত ভাবেই জ্ঞানদার কাছে কথাগুলি ধরা দেয়। বলে, আমরা মরি নাই। জীবনের সহস্র অগৌরব, লাঞ্ছনা ও বিবেক-দংশনের মধ্যে স্বামী যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, জ্ঞানদা সেদিন একটুও চোখের জল ফেলে নাই! বরং তার মনে হয়েছিল, এই ভালো। স্বামীকে মুক্ত করে দিয়ে সেও মুক্ত হয়ে উঠল।

কয়েক দিন পর এক অসতর্ক মুহূর্তে একটি পুঁটলি তার হাতে পড়ল। সযত্নে রক্ষিত এই জিনিষটির কথা স্বামী তাকে একদিনও বলেন নাই। জ্ঞানদা ফস করে সেটি খুলে ফেলল—কিন্তু, কিছু না' শিশুপাঠ্য একখানা পুঁথি।

ছেঁড়া মাদুরে বসে ছেলেটি আজ বইখানা পড়ছে। সযত্নে বানান করে, প্রতিটি অক্ষর মনে গেঁথে সে পড়ছে। তার কাছে এগুলি নিরস ও অর্থহীন। তথাপি এগুলি তাকে পড়তে হবে। তারপর একদিন আসবে নূতন পুঁথি,—সেদিনের দিকে চোখ রেখে সে আজ দীর্ঘ মরুযাত্রায় বেরিয়েছে।

কিন্তু এই পুঁথি,—স্বামীর চৌযবৃত্তির একটি বিচ্ছিন্ন ইতিহাস। অশুচি একটি আবর্জনা স্তূপ ছাড়া এ আর কিছুই নয়। এর স্পর্শে তার সমস্ত জীবন বিষিয়ে উঠতে পারে। তার শিরায় শিরায় প্রতি নিঃশ্বাসে বিষ সঞ্চারিত হয়ে তাকে নিঃস্ব ও ফতুর করে দিতে পারে। জ্ঞানদা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। ছুটে এসে ছেলেকে এক চড় মেরে কাত করে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল: রেখে দাও ওটা,—ও বই ছুঁয়ো না তুমি।"

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসতেই জ্ঞানদা দেখল, মলিনা এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে করুণ নম্রতা। বলল: তোমার এ বৈধব্য দশা দেখব, এ আমি জানতাম। তাই না সেদিন এমন মুক্ত হস্তে তোমার স্বামীকে তোমার হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম। তুমি ভাবলে মলিনাদির প্রাণ কতই না উদার! কিন্তু, সে যে কত বড় মিথ্যা!"

মলিনা ওপাশের দেয়াল ঘেঁসে মেঝের উপর বসল। তার প্রসন্ন ও অমলিন দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে জ্ঞানদা পরম বিস্ময়ের সংগে প্রশ্ন করল: কি বলছ তুমি! তুমি সেদিন যা বলেছিলে বা যা করেছিলে তার সবই মিথ্যা ছিল!"

মলিনা স্থির দৃষ্টিতে জ্ঞানদার দিকে তাকিয়ে অসংকোচে বলল: হাঁ, মিথ্যা বই কি! জানতাম, তাকে বেঁধে রাখবার শক্তি তোমার নাই।"

অকস্মাৎ অদূরে ছেলেটির দিকে দৃষ্টি পড়তেই মলিনা বিস্মিত কণ্ঠে বলল: ও, তোমার ছেলে! এ কথাত আমি ঘুণাক্ষরেও জানতাম না।"

মলিনা উঠে গেল। মেঝের উপর পা বিছিয়ে বসে ছেলেটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে জ্ঞানদাকে বলল: তোমার সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই ত সেদিন এতটা উদারতা দেখাতে পেরেছিলাম!"

মলিনার বুকের উপর ছেলেটি শুয়ে আছে, যেন এক গুচ্ছ
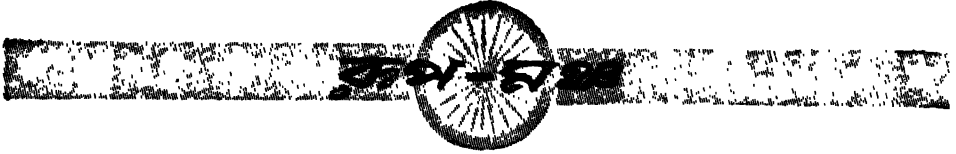
পুষ্পস্তবক। মলিনা তাকে আদর করল, চুমো খেল, পুষ্পস্তবকটিকে নিষ্ঠুর ভাবে নিষ্পেষণ করে তার মাতৃ-হৃদয় শিহরিত হয়ে উঠল। জীবনে তার এই নূতন অভিজ্ঞতা, এক নূতন পৃথিবীর সমুদ্রতটে দাঁড়িয়ে সে সম্মুখের অনন্ত অনিশ্চয়তাকে ভালবেসে ফেলল।

কিন্তু, অকস্মাৎ জ্ঞানদার দিকে তাকিয়ে তার হৃদয় থমকে দাঁড়াল। জ্ঞানদার দুটি চোখে আগুন জ্বলছে, অপরিসীম হিংস্রতার আগুন যেন মলিনাকে নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করে দেবে বলে ঠিকরে পড়তে চাইছে।

ধীরে ধীরে ছেলেটিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে মলিনা উঠে দাঁড়াল। অসহায় রিক্ত কণ্ঠে সে বলল: আমি চললাম,—এখানে আর অপেক্ষা করা চলে না।"

মলিনা বেরিয়ে গেল। এমনিভাবে আর একদিনও যখন সে বেড়িয়ে গিয়েছিল, তখন জ্ঞানদার মনে হয়েছিল, মলিনা কেন আর একটু দেরী করল না? কিন্তু আজ এক মুহূর্ত পূর্বে মলিনার যে পিশাচী মূর্তি সে দেখেছে, তারপর তাকে ফিরে ডাকবার সাহস তার মোটেই রইল না।

কিন্তু, অকস্মাৎ গভীর বেদনায় ও সহানুভূতিতে জ্ঞানদার চোখ থেকে বিন্দু বিন্দু জল নেমে আসল। এক হাতে সে জল মুছে ফেলে ছেলেকে বুকে টেনে সান্ত্বনা দিয়ে 'মা' বললেন: তোমার জন্য নূতন পুঁথি—ভাবী সুন্দর—কালই আনিয়ে দোবো। সত্যি, দোবো তোমাকে।"

এস, ডি, প্রডাকসনের 'বাঁকালেখা' চিত্রে কানন দেবীকে দেখা যাচ্ছে

ফেলে আসা পথ

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

★

কলেজের সোস্যাল উপলক্ষ্যে মহা ধূমধাম। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র প্রদীপ গান গেয়ে চলেছে। নিজেরই রচনা করা একটা গান, গলাও তেমনি মিষ্টি! ভগবান যেন দুহাত দিয়ে করুণা তাকে ঢেলে দিয়েছেন। যেমনি রচনা, তেমনি গলা, সবকিছু মিলে বেশ একটা গানের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। সমবেত সকলেই মুগ্ধ হ'য়ে শুনে চলেছে! গান থামতেই অভিনন্দন জানান কলেজের অধ্যক্ষ এবং ছাত্ররা সকলেই। প্রদীপ নিজের প্রতিভায় নিজেই যেন লজ্জা বোধ করে।

রাত্রি হ'যে গেছে, বার হয়ে আসতেই পিছনে চেয়ে দেখে, আসছে লতিকা, ঘাম মুছতে মুছতে এগিয়ে আসছে। নীরবে এসে পাশে দাঁড়াল।

—"ওরে বাপরে, কথাই কইবে না নাকি? ঐ ওরকম গান আমি গাইতে বা লিখতে পারলে কথাই কইতাম না।"

হাসে প্রদীপ, এগিয়ে চলে দু'জনে বাসের জন্য।

হঠাৎ ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাকতেই একটু চমকে ওঠে প্রদীপ। লতিকার ডাকে ট্যাক্সিখানা এসে থামল।

—"চল, বাসের ভিড়ের চেয়ে ট্যাক্সিতেই ভাল।"

একটু ইতঃস্তত: করে উঠল প্রদীপ। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলে গাড়ীখানা দক্ষিণ দিকে।

নীরবে বসে থাকে প্রদীপ। কটা বছর হ'তেই দেখে আসছে লতিকাকে। ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতরই হয়েছে তারা। এনিয়ে ক্লাশে অনেক কথাই উঠেছিল, তবু কান দেয়নি লতিকা। প্রদীপ অবশ্য এড়াতে চেয়েছিল, কিন্তু পারেনি, কোন এক মোহের বশেই সে সায় দিয়েছিল লতিকার মনের সংগে।

গাড়ীখানা ছুটে চলেছে রেড রোডের উপর দিয়ে। নির্জন রাত্রি, সারা মন যেন প্রদীপের নেশায় ভরে ওঠে। অনুভব করে, লতিকার হাতখানা তার মুঠোয়।

"এ্যাই, চুপ করে রইলে যে!"

—"ভাবছি এ যাত্রার যদি শেষ না হয়?"

হাসে লতিকা প্রদীপের কথায়।

রাস্তার বাঁকে নেমে পড়ল প্রদীপ, লতিকা ছাড়বেনা, তাদের বাড়ী যেতেই হবে! কিন্তু রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। কাল নিশ্চয়ই আসবে কোন রকমে, নেমে পড়ল প্রদীপ। দূর হতে লতিকা দেখিয়ে দেয়, তাদের বাড়ীটা! "ওই যে তিনখানা বাড়ীর পরই লাল বাড়ীটা!"

সকাল হতেই প্রদীপের মনটা বার বার নাড়া দেয় লতিকাদের বাড়ী আসতে, কথা দিয়েছে—না এলে খারাপ দেখায়।

এই তার প্রথম আসা। এর আগে কখনও সে লতিকাদের বাড়ী আসে নি! হ্যাঁ, এইটাই বটে! লালরং এর বাড়ীটা, অনেক কালের একটা পুরোনো নিমগাছের সমবয়সীই হবে। রংটা ফিকে হয়ে গেছে। জায়গায় জায়গায় চুণ বালি ছাড়া!

কড়া নাড়তেই বুড়ি ঝি এসে দরজা খুলে দিল, "কাকে চাই?" একটু অপ্রস্তুতই হ'য়ে পড়ে প্রদীপ। কোনরকমে দরকারটা জানিয়ে ফেলতে, বুড়ি তার মুখের দিকে একটু চেয়ে কি ভেবে নিয়ে গেল, বাইরের ঘরে বসিয়ে খবর দিতে গেল দিদিমণিকে।

চারিদিকে চেয়ে একটু বিস্মিতই হ'য়ে ওঠে প্রদীপ। দেওয়ালে দেশবিদেশের বড় বড় গায়কদের ছবি, তানপুরা, সেতার, পাখোয়াজ ইত্যাদি ছড়ান ফরাসের উপর। বেশ যে একটা চর্চা আছে—ঘরওয়ানা আছে গানের এখানে—সেটা অনুভব করে প্রদীপ। অথচ লতিকাকে দেখে এসব কিছুরই পরিচয় সে পায় নি।

আপন মনে সময় কাটাবার জন্যই সে আলাপ করতে থাকে তানপুরাটায়, কতক্ষণ আলাপ করেছিল জানেনা, হঠাৎ পিছন ফিরতেই দেখতে পায় একজন অন্ধ, পাশে একটি মেয়ে তন্ময় হ'য়ে শুনছে—"থামলে কেন?"

অন্ধ এগিয়ে আসে তার দিকে। সস্নেহ দুহাত বুলিয়ে
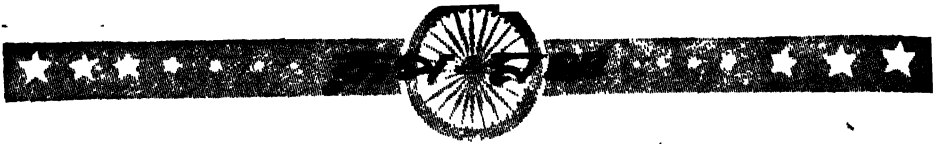
আশীর্বাদ করে প্রদীপকে—"এ পথ ছেড় না বাবা, ভগবানের অসীম করুণা তোমার উপর, অনেকদিন থেকে খুঁজছি—কাউকে দিয়ে যাব আমার সারা জীবনের সঞ্চয়, একা নমি' নয়, আরও অনেককে—! যাক ভগবান এনে দিয়েছেন তোমায়—"

প্রদীপ একটু আশ্চর্য হ'য়ে যায়, নমিতাও। হঠাৎ লতিকার প্রবেশে ব্যাপারটা বুঝতে পারে, হেসে ফেলে—"যাক্ দাদু শিষ্য তা'হলে জুটিয়ে নিয়েছ! রাস্তার লোক ধরে ধরে গান শিখোও।"

বলে বুড়ো—"থাম লতিকা—এমন প্রতিভা—"

পরিচয়টা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হ'য়ে ওঠে!

দিন যায়। নিষ্ঠা ভরে প্রদীপ চর্চা করে চলে! অন্ধ দীপক সেনের কাছে গানের সুর, কত সাধকের নিষ্ঠায় গড়ে তোলা সুর লহরী।

নমিতার সংগে এই ঘনিষ্ঠতা, এখানে—ওখানে, এ বৈঠকে—সে বৈঠকে গান গাইতে যাওয়াটা কেমন যেন পছন্দ করেনা লতিকা। অনুভব করে কোথায় যেন একটা অবহেলা জমেছে তার জন্য প্রদীপের মনে! দাদুর উপরেই রাগ হয়।

কলেজের Test পরীক্ষায় প্রদীপের যা Result হ'ল, ত মোটেই আশাপ্রদ নয়। বাড়ীতেও কথা শুনতে হয় তাকে! সেদিন লতিকা বলে বসে, "এমনি হৈ চৈ করে নিজের পড়াশোনাও বন্ধ করবে নাকি?"

উত্তর দেয় প্রদীপ—"পড়েই বা কি হবে? কেরাণীগিরিতো? তার চেয়ে দেখিই না গান শিখে যদি কিছু হয়?"

ব্যাপারটা সমস্ত শুনে অন্ধ দাদু খুব এক চোট হাসতে থাকেন! নমিতা তানপুরাটা থামিয়ে দিদির দিকে চেয়ে থাকে অবাক হ'য়ে। অন্ধ হাসতে হাসতে বলে—

"এরই মধ্যে কি লতুদির শাসন সুরু হয়ে গেল নাকি?"

বলে লতিকা—"না দাদু, ও পড়াশোনা ছেড়েই দিয়েছে, নির্ঘাৎ ফেল করবে?"

"গানের বাজারে ও যে ফার্ষ্ট হবে দিদি,—শুনেছিস সেদিন আলোয়ারের মহারাজার বৈঠকে ওর গান?"

বুড়োর কোন কথাই শুনতে চায় না লতিকা, এনিয়ে। প্রদীপ একটু পড়া শোনায় মন দেয়, বাধ্য হ'য়েই—বাড়ীর তাড়াতেও। কিন্তু তবু ও লুকিয়ে লুকিয়ে গানের চর্চা করে, ছাড়তে পারে না।

কদিন হতে প্রদীপ এ বাড়ী আসেনি! অন্ধ দীপকবাবু অনুভব করেন কার অভাব। গান গেয়েও সুখ পান না, মাঝে মাঝে আলাপ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

'এ জায়গাটার কাজ কিন্তু প্রদীপের গলায় চমৎকার আসত!" আবার গান ধরেন, পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করেন—

"প্রদীপের কোন খবর জানিস নমি?"

বিরক্ত হয়ে ওঠে নমিতা! এত কি হয়ে উঠেছে প্রদীপ যে, একবার এ বাড়ীতে আসতে পারে না, অন্ধ গুরুর খবরটা নিতেও! তবু দীপকবাবুর অন্তর হতে প্রদীপের জন্য স্নেহ এতটুকুও কমে না।

নমিতার সংগে সর্বদা মেলামেশা—গান—তার রচনা—সুরকে কেন্দ্র করে অবাধ মেলামেশাটাই ঠেকেছিল লতিকার চোখে, সেইটাকেই এড়াবার পন্থা বার করেছিল সে। সেদিন নির্জন চাঁদনী রাতে·····গঙ্গার ধারে বসে সত্যই সে রাত্রের রেশ ভুলতে পারে না লতিকা: তারা ঘর বাধতে চায়,—দুজনে দুজনকে পেতে চায়,—প্রদীপকে সামাজিক মানুষ হতে হবে, সেখানে উচ্ছাস নাই—কাব্য নাই। আছে কঠোর বাস্তব! সামনের পরীক্ষায় ভাল ভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে তাকে! এই কটামাস সে অন্য কোন দিকে মন দেবে না—পড়বে! তারপর ত সারা জীবন গান গেয়ে কাটাবার জন্য পড়ে আছে! নীরবে কথাটা শোনে প্রদীপ! লতিকার চোখে কোন স্বপ্ননীড়ের মায়া!

দাদু অনুভব করে, কোথায় যেন সত্যই একটা ভাংগন ধরেছে দুই বোনের মধ্যে! ব্যাপারটা এত গুরুতর করে তোলে লতিকাই! সেদিন কি একটা বই দেখতে এসেছে নমিতা! কোন এক জার্মান সুরকারের জীবনী নিয়ে ছবিটা! ব্যর্থ জীবনের সমস্ত করুণ রস যেন ধ্বনিত হ'য়ে ওঠে আজও তার রচিত সুরজালের সংগে। মৃত্যুর পর যার অসমাপ্ত কাজ—সেই সুরবিজ্ঞানের মায়া দেশের জনমনের মধ্যে পরিচিত করবার ভার তুলে নেয় তার যোগ্যা স্ত্রী!······যে রচনা একদিন ছিল সামান্য পরিসীমার
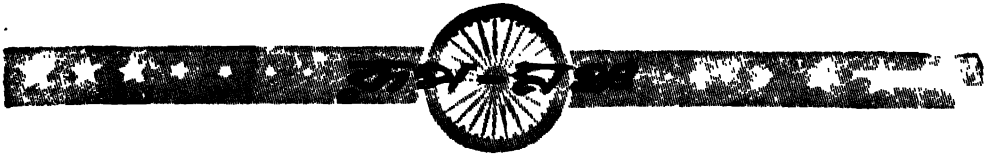
মধ্যে সমাপ্ত—তা ব্যপ্ত হল দিক দিগন্তরে—দেশ দেশান্তরে।

সারাটা মনে নাড়া দেয় নমিতার—তার শিল্পমন খুঁজে পায় সুরবিস্তারের কোন নূতনতম বর্ণবিন্যাস! ভিড় ঠেলে বাইরে লবিতে এসে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে যায় প্রদীপের সংগে। সেও বার হয়ে আসছে ছবি দেখে!

"আপনি—?"

এগিয়ে আসে নমিতা!—"আমাদিকে ভুলেই গেলেন নাকি? দাদু কত নাম করে আপনার!"

"পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি! আর কটা দিন, তার পরেই আবার পুরোদমে সুরু করা যাবে।"

এগিয়ে চলে দুজনে নির্জন কার্জন পার্কটার দিকে! রাত্রি হ'য়ে গেছে! পাশাপাশি দু'জনকে বসে নিবিষ্টমনে গল্প, হাসাহাসি করতে দেখেই বেশ চমকে ওঠে লতিকা! কি একটা কাজে আসছিল ওপথ দিয়ে, প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি, কিন্তু ক্রমশঃ বিশ্বাসই করতে হয়। বোনের এই নির্লজ্জ ব্যবহারে বেশ একটু রাগই হয়, তখনকার মত রাগটা চেপে নীরবে তাদের অজ্ঞাতেই ট্রামে উঠে বসে! মাথাটা যেন দগ্ দগ্ করছে।

বাড়ী ফিরতেই ব্যাপারটা ক্রমশঃ ঘনিয়ে ওঠে। দিদির কথায় জবাব দেয় না নমিতা। "এত রাত অবধি কোথা ছিলি?"

"একটু কাজে-!"

কথা কাটাকাটি হতে ক্রমশঃ সত্য কথাটাই বলে ফেলে লতিকা। নমিতা দিদির কথাতে স্তম্ভিত হয়ে যায়। এ ইংগিতের অর্থ বোঝে সে!

বোনদের কথা শুনে উঠে আসছিল অন্ধ উপরের দিকে, তার কানেও কথাটা যায়, নমিতা যার তার সংগে নাকি রোজই বেড়াতে বার হয়।

দিদির কথায় মা-বাবা মরা মেয়ে সত্যিই আজ আঘাত অনুভব করে। নমিতা, অশ্রু সজল চোখে বার হ'য়ে আসে, সামনেই দাদুকে দেখে কেঁদে ফেলে—"এ সব মিথ্যে—মিথ্যে দাদু! তুমি বিশ্বাস কর! তুমি বিশ্বাস কর!"

অন্ধ নাতনীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

পরীক্ষার ফল বার হয়েছে! লতিকার এত পরিশ্রম আজ সার্থক,—প্রদীপ সসম্মানে পাশ করেছে!……লতিকারই যেন আনন্দ সব চেয়ে বেশী! খবরটা শোনে অন্ধ দীপক,—দীর্ঘশ্বাস ফেলে! পাশটাই হল প্রদীপের কাছে সবচেয়ে বেশী, ভগবানের করুণার এতবড় দান সে অগ্রাহ্য করে গেল!

সমস্ত অন্তরের দুঃখ উজাড় করে অন্ধ নমিতার কাছে! সামান্য পাওয়ার আশায়—একজনের অন্ধমোহে আজ প্রদীপ নিজের প্রতিভার অপমান করল--অপমৃত্যু ঘটাল তার শিল্পী জীবনের! এর জন্য দায়ী হয়ত লতিকাই!

চুপ করে থাকে নমিতা।

লতিকার প্রদীপ আজ স্বপ্ন দেখে নূতন এক স্বপ্ননীড়ের, যেখানে থাকবে তারা দুজন, কোন কোলাহল নাই—থাকবে দুজনকে পাওয়ার অনাবিল তৃপ্তি।

অন্ধ দীপকের হাত থেকে সেদিন তানপুরা পড়ে যায়—যেদিন শুনল তারা দুজনে বিয়ে করবে—তারা ঘর বাঁধবে!……প্রদীপের প্রতিভা আজ কি সত্যই নিঃশেষ হয়ে গেছে!……এ যে তারই অপমান।

কোন কথা বলে না বুড়ো, বুক বেঁধে আশীর্বাদ করে—প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে—ওরা সুখী হোক।

কিন্তু চোখের জল রাখতে পারে না।

"নমিতা, সবাই ছেড়ে গেল আমাকে, আশা ছিল প্রদীপ হবে আমার প্রতিভার ধারক, কিন্তু এ পথ তার নয়, আমার সাধনা ব্যর্থ ই রয়ে যাবে।"

অন্ধের কথায় নমিতার চোখ ভিজে আসে! বলে—"তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না দাদু! কোনদিন কোন প্রলোভনই আমায় তোমার পথ থেকে টেনে নিয়ে যেতে পারবে না! পারবে না!"

……বৃদ্ধের চোখের জল তবু বাধা মানে না!……

নমিতা দাদুর সমস্ত দুঃখ—ব্যথা ভুলিয়ে দিতেই যেন গানের সাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়।

লতিকা নিজের হাতে গড়া সংসারে সেই কর্ত্রী! দিনান্তের
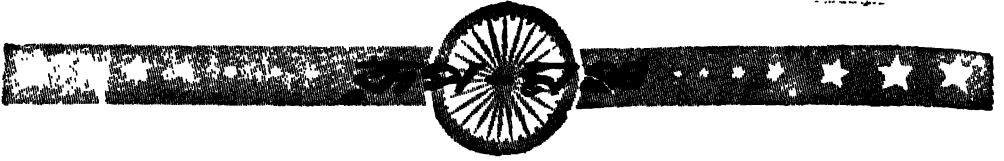
কর্মক্লান্ততার পর প্রদীপ যেন নিজেকে ফিরে পায়, লতিকার সেবায়—সাধারণ কেরাণীর সংসার! তবুও বেশ ঝিমঝাম! গান গাওয়া ছেড়েই দিয়েছে! লতিকাই তার মনের সমস্ত খানি জুড়ে বসে আছে। সেখানে অন্ত কিছুরই প্রবেশ নাই! মাঝে মাঝে রেডিওটা খুলতেই গান ভেসে আসে—প্রদীপের শিল্পমনের মধ্যে মৃত কে যেন জেগে উঠতে থাকে! সেদিন গান ভেসে আসছে, খুব পরিচিত এক কণ্ঠ! হ্যাঁ—নমিতার গলাই! তন্ময় হয়ে শুনছে! রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে এসে দাঁড়ায় লতিকা! সর্বদাই চীৎকার তার নাকি ভাল লাগে না!

ক্রমশঃ বাগানের গাছে আসে চাঁপার রাশি, রজনীগন্ধার স্তবক—তাদের সংসারে আসছে কোন অনাগত লোকের দৈবশিশু,······লতিকার সারা দেহে মাতৃত্বের জোয়ার! অনুভব ক'রে—কে যেন আসছে—যাকে তার শরীরের বৃত্ত কণিকা দিয়ে পুষে আসছে—সারামনে তাদের স্বপ্নের ছোয়া।

একে একে প্রিয়জন যারা ছিল তারা চলে গেল। প্রদীপ—লতিকা,—যায় গান গাইবার গলা পর্যন্ত! বুড়ো অন্ধ দীপক যেন দিন গুনছে মৃত্যুর! গলার চিকিৎসা করেও কোন কিছু হয় নি, আজ নমিতা গান গায়—কত স্মৃতি ভারাক্রান্ত তার গান—বুড়ো শোনে—আর অন্ধ চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে আসে অশ্রু! তার সাধনা—তার গুরুদত্ত অমূল্য সম্পদ হয়ত রেখে যেতে পারবে কিছু এই নমিতার মধ্যেই!

শেষ দিন ঘনিয়ে আসে বুড়োর, বিকারের ঘোরে সে যেন আবার স্বপ্ন দেখে সেই খ্যাতিময় গাইয়ে দীপকের কথা! যোধপুর—বরোদা—যওশলমীর ষ্টেটের সভাগায়ক দীপক সেন,—তার কোন চিহ্নই কি থাকবে না তার মৃত্যুর পর! মৃত্যুপথ যাত্রী অন্ধ শিল্পীকে সান্ত্বনা দেয় নমিতা—"জীবনের সমস্ত সুখ—বিলাস—প্রলোভন তুচ্ছ করে তোমার ব্রত সফল করব দাদু। তুমি শুনে যাও, তোমার অপূর্ণ কাজ ব্যর্থ হ'তে আমি দোব না!"

শেষ বারের মত মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে যায়, অন্ধ চোখের কোল দুটো জলধারায় চিক্ চিক্ করে ওঠে! সবশেষ হ'য়ে গেল বুড়োর! কেঁদে ওঠে নমিতা!

সেইদিনই জন্ম নিল কার ঘরে এক দেবশিশু! প্রদীপ অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে, লতিকা সদ্যজাত শিশুর ক্রন্দনে যেন সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। নমিতা সব হারাল,—লতিকাদের সংসার ভরে উঠল ফুলে ফলে।

দিন যায় নমিতার একনিষ্ঠ সাধনা আজ সফল হতে চলেছে, কাগজে কাগজে তার নাম—রেকর্ড—রেডিও সর্বত্রই তার খ্যাতি।······দেশ দেশান্তরের রাজ সভা হতে তার আমন্ত্রণ! প্রদীপের মনে এসেছে অতৃপ্তির ছোয়া। দিনান্তের ছকে বাধা জীবনই কি সে চেয়েছিল! মৃত্যুকালে অন্ধ দীপকের ব্যাকুল আবেদন যেন তার সারা মনকে আজও ব্যথাতুর করে তোলে! ······সেদিন লক্ষ্ণৌ রেডিওতে গাইছে নমিতা······প্রদীপের মনে যেন হাহাকার করে ওঠে কোন ব্যর্থ শিল্পী!

রাত্রি হয়ে গেছে! লতিকা যেন ফুরিয়ে আসছে, কয়েক মাস হতেই ধীরে ধীরে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে আসছে তার দেহ। মনে নেমেছে ক্লান্তি ও অতৃপ্তির রাশি! সামান্য অবহেলা নিয়েই প্রদীপকে শুনিয়ে দেয় দু' চার কথা! পরক্ষণেই বুঝতে পারে, কমাস হ'তে সে কেবল সংসারে অশান্তিরই সৃষ্টি করে এসেছে। ভরিয়ে দিতে পেরেছে কি প্রদীপের মন আগেকার মত আনন্দের কানায় কানায়! হয়ত সেই অতৃপ্তিই এনেছে তাদের দুজনের মধ্যে এই অশান্তির ছায়া—তাদের সুখের সংসার ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে উদ্যত হয়েছে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেংগে যায় লতিকার, দেখে, পাশে প্রদীপের বিছানা শূন্য, ভেসে আসে কার আলাপের সুর,—নির্জন নিশীথ রাত্রে—একা প্রদীপের সামনে বসে বসে প্রদীপ আলাপ করছে—বেহাগের তান! তাকে বাধা দেয় না লতিকা, দূরে দাঁড়িয়ে থাকে সে।·····

দুরন্ত শিশুই যেন নিঃশেষ করে দিয়েছে লতিকাকে! দীর্ঘ দিন ক্রমাগত ভুগে চলেছে লতিকা, মেজাজ খিটখিটে হওয়াই স্বাভাবিক, সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আঘাত দিয়ে বসে লতিকা স্বামীকে—তার সামান্যতম রোজকার ······যা রোগের চিকিৎসা চালাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়।
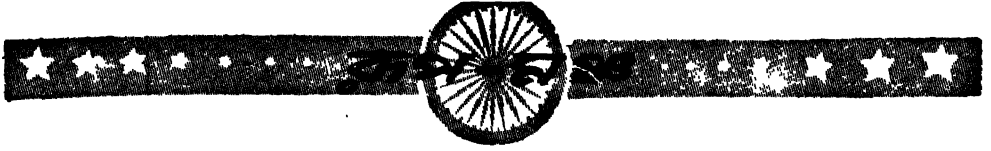
ডাক্তারদের মতে রোগটা ক্ষয়রোগই, এর থেকে মুক্তি পাবার ঠিক উপায় আজও তাদের সঠিক জানার বাইরে, উপদেশ দেন তাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে ফেলতেই হবে, নইলে তার সারাত দূরের কথা—প্রদীপ বা খোকন দুজনকেও সংক্রামিত করতে পারে এ রোগ।

কথাটা শুনেই লতিকা আর্তনাদ করে ওঠে। তার নিজের হাতে গড়া সংসার—প্রদীপ—যার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করে নিজেই টেনে এনেছিল এই নীড় বাধবার বাসনায়—তাদের সেই ছোট্ট ঘর—তার খোকন সব কিছুকে ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে বাইরে। সারা মন তার হাহাকার করে ওঠে! না—না! এত বড় অভিশাপ কেন তার জীবন বিষিয়ে দেবে? কি অপরাধ সে করেছে!

তার ভগবানের কাছে কোন জবাবই মেলে না। যারা পৃথিবীতে তার সবচেয়ে প্রিয়—সব চেয়ে আপন! যা দেরে নিয়েই তার জগৎ সম্পূর্ণ......তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে লতিকা, ফিরে আসবে কিনা জানেনা—হয়ত সব আশা ভরসা আনন্দের শেষ হ'য়ে গেল আজ। প্রদীপের চোখেও জল। খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে লতিকার সারা অন্তর।

তবু যেতে হল তাকে। লতিকার জন্ম এক স্যানাটোরিয়ামে সিট ঠিক করে ফেল্ল প্রদীপ! আজ সে চলে গেল।

নারী হ'য়ে নারীর এই সর্বস্বহারাণোর ব্যথা অনুভব করতে পারে নমিতা, দিদি প্রাণ দিয়ে ভালবাসত যাদের—সেই স্বামী—তার খোকন—তার নিজের হাতে গড়া সংসার এসব ছেড়ে তাকে চলে যেতে হচ্ছে! দিদি যে নমিতাকে এড়িয়েই চলতে চাইত এতদিন! আজ অসহায় অবস্থায় তার হাতেই আত্মসমর্পণ করতে হ'লো। এছাড়া পথ লতিকার নেই!

"তুই এদিকে দেখিস নমি, যদি আর ফিরে না আসি—আমার খোকন যেন তোর স্নেহ থেকে বঞ্চিত না হয়। আমি তোকে আঘাত দিয়েছি সত্যি, ওত কিছু করে নি!"

দিদি কথায় সান্ত্বনা দেয়। নমিতা! এ তার কর্তব্য! আজ রোগজীর্ণ দিদিকে এ আশ্বাস সে দেয়।

দিন কেটে চলে: নমিতাই পূর্ণ করে খোকনের কাছে মায়ের অভাব! খোকন জ্ঞান হওয়া অবধিই তাকে দেখে আসছে—মা বলে তাকেই! হাসে প্রদীপ! শান্ত সংসারের পরিবেশে প্রদীপ আবার গানের চর্চা সুরু করে—নমিতার কাছেই! বেশ জমে ওঠে তাদের আসর!

......আজ রেকর্ড—কাল রেডিও! নমিতা যেন হাঁফিয়ে ওঠে, নিজের জন্য সামান্য একটুকুও সময় নাই,...... খোকনকে নিয়ে বেড়াতে যাবে, বাগানে একটু ছুটোছুটি করবে তারও উপায় নাই, কোন ষ্টেটের ম্যানেজার এসেছেন গাড়ী নিয়ে—বিশেষ করে এ-ছোটখাট রাজকুমার কিছুদিন থেকেই নমিতার পিঁছু ঘুরছেন, সে তার গানে একেবারে মুগ্ধ, আত্মহারা!......নানা প্রকারে নিবেদন করেছেন তার অন্তরের ভালবাসা—দরকার হলে চাই কি বিয়ে করেও স্ত্রীর অধিকার দিতে পারেন।

নমিতার অন্তরে মাঝে মাঝে কে যেন সাড়া দিয়েছে কুমার বাহাদুরের প্রেমের মূল্য দিতে। তারা যদি এমনি ঘরই বাধে, দোষ কি? ধন, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি কোন কিছুরই ত অভাব থাকবে না।

খোকন উপর হতে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে......ঝকঝকে নূতন গাড়ী হ'তে মামণি নেমে আসছে! একদিন জিজ্ঞাসাই করে বসে খোকন—"ও কে মামণি, গাড়ী নিয়ে আসে! আমিও যাব বেড়াতে।"

খোকনের কদিন হ'তেই জ্বর!......নমিতারও সময় নাই, গান, তারপর ওই কুমার বাহাদুরের পাল্লা! প্রদীপ সারাদিনের কাজের পরে বাড়ী ফিরেই দেখে ছেলেটা জ্বরে ধুকছে—মুখে জল দেবার কেউ নাই। ঝি চাকর কোথায় গেছে বোধ হয়। সারা গায়ে যেন আগুন ছুটছে! ডাক্তারবাবু এসে ছেলেটাকে দেখেই বিস্মিত হ'য়ে যান! ম্যানিনজাইটিস-এ টার্ণ নিতে পারে—উপযুক্ত নার্সিং না হলে—

কেই বা করবে নার্সিং! প্রদীপ কিছু দিন হতে লক্ষ্য করেছে নমিতার এই পরিবর্তন। তার কাছ হতে এর বেশী আশা করাই অন্যায়। নমিতা তার সংসারে তার সন্তানের জন্য দিনরাত্রি পরিশ্রম করবে কেন? কি দাবী তার আছে!

ডাক্তারের পরামর্শ মত তখুনিই একটা নার্সিং হোমে পাঠিয়ে

দেয় খোকনকে। সেখানে তার কোন সেবা যত্নের ত্রুটি হবে না, বেশ থাকবে। চিকিৎসাও হবে ঠিকমত।

সেদিন নমিতার বাড়ী ফিরতে অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে। বাড়ীটা নির্জন, যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। কুমার বাহাদুরের গাড়ীখানা বাড়ী পৌঁছে দিয়েই চলে যায়।

বাড়ীতে আলো নাই, সিড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছিল, সামনে প্রদীপকে দেখে দাঁড়াল। "খোকন, কেমন আছে?"

প্রদীপ উত্তর দেয়: তাকে নার্সিং হোমে পাঠানো হ'য়েছে।" উত্তর টা শুনেই চমকে যায় নমিতা। কেন, কেন তাকে নার্সিং হোমে পাঠান হ'ল! ধীর অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বরে প্রদীপের দুঃখ আজ অনুভব করে নমিতা—

"তোমার উপর অন্যায় এ অধিকারটুকু জোর করে আদায় করবার কোন দাবীই আমার নাই নমিতা। তোমার জীবন আছে—খ্যাতি আছে—ইচ্ছা আছে কামনা আছে। তাকে বাধা দেবার কোন অধিকারই ত আমার নাই। এখানে হয়ত তার ঠিক সেবা যত্ন হয়ে উঠবেনা। তুমিও ব্যস্ত —তাই তাকে নার্সিং হোমে পাঠালাম।"

......চুপ করে থাকে নমিতা। আজকের অপরাধ তার সত্যাই সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নিজের দিকে চেয়ে দেখে, সে এত স্বার্থপর হয়ে গেছে!

পরদিন সকাল হতেই দেখে প্রদীপ নমিতা একেবারে বদলে গেছে। ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে—বিছানা করে ডাক্তারকে খবর দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে। কালকের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে করবেই। হাসে মাত্র প্রদীপ। মেয়েরা এত শীঘ্র বদলায়—আশ্চর্য না হয়ে পারে না পুরুষে।

খোকনকে জোর করেই নমিতা নিয়ে এসেছে নার্সিং হোম হতে বাড়ীতে। তার সেবাতেই দিন রাত্রি লেগে রয়েছে। হাসে প্রদীপ—গান গাওয়া ছেড়ে নার্স'ই হবে নাকি।

কদিনই কুমার বাহাদুর লোক—গাড়ী পাঠিয়েও নমিতাকে নিয়ে যেতে পারেন নি, সেদিন খবর নিতে নিজেই এসেছেন, চাকরের সংগে তাকে উপরেই—খোকনের ঘরে ডেকে পাঠাল নমিতা। ঘরে ঢুকেই কুমার বাহাদুর একটু বিস্মিত হন। সেবাপরায়না এক নারী মূর্তি বসে এতদিনের চেষ্টা— এতদিনের ব্যাকুল আগ্রহে কুমার বাহাদুর যাকে স্ত্রী রূপেই পাবার আশা করেছিলেন, নমিতা আজ এতদিনপর তার জবাব দেয়।

"আমার উত্তর আজ নিয়ে যান কুমার বাহাদুর, আমারও সংসার আছে—ছেলে আছে। তাদের কাছে আমার শ্রদ্ধা সম্মানের আসনটুকু নষ্ট করে দেবেন না?"

স্তব্ধ হয়ে যান কুমার বাহাদুর, এসব তিনি জানতেন না। "আমাকে মাপ করো তুমি, এসব কথা আগে কেন আমায় জানাও নি!" সত্যাই আমি দুঃখিত। আমায় ক্ষমা করো তুমি।"

নেমে গেলেন তিনি।......পাশের ঘরে প্রদীপ শুনছিল এদের কথা, কুমার বাহাদুর নেমে যেতেই তাড়াতাড়ি করে এসে ঘরে ঢুকল, সেও স্তম্ভিত হ'য়ে গেছে —"ও কে?"

স্বপ্নাবিষ্টের মত বলে নমিতা—"রামপুর ষ্টেটের কুমার সাহেব আশা করেছিলেন, আমাকে রাজরাণী করবার—তা আমার বরাতে কি ছাই রাজরাণী হবার আশা আছে? দিলাম ভাগিয়ে।"

অবাক হয়ে যায় প্রদীপ! এত বড় সৌভাগ্য আজ নিজের জেদের বশে দুহাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল নমিতা! একি করল সে! "—কিসের আশায় আজ তোমার এই সর্বনাশ করলে নমিতা?"

"—ও কিছু না, খেয়াল।" ঘরের মধ্য হতে খোকনের ডাক শুনেই চলে যায় নমিতা—"এই যে বাবা!"

অতি সাধারণ হালকা হাস্যমুখর নারী সে, আজ যেন কোন কিছুই ঘটেনি।

চুণার ফোর্টের পাশে বিন্ধ্যাচল যেখান হতে সবে পৃথিবীর বুক হতে মাথা তুলতে সুরু করেছে—তার গায়ের কাছেই বিশাল বাড়ীটা। অদূরে গঙ্গার দেওয়ার। এক পাশে চলে গেছে বিন্ধ্যাচলরেঞ্জ-অন্য পাশে নীল ছায়াচ্ছন্ন গঙ্গার তীর রেখা—জলরাশি।

ক্রমশঃ সেরে চলেছে লতিকা! জরও আর আসেনি। কিছুদিন হতে ওজনও বেড়েছে বেশ! স্যানাটোরিয়ামের বাগানে রাশি রাশি গোলাপ ফুলের মত অম্লান হাসি যেন তাকে ঘিরে রেখেছে।

বাড়ী থেকে নিয়মিত চিঠি পায়। সকলেই বেশ আছে।

মাঝে মাঝে রেডিওতে শোনে নমিতার গান। হঠাৎ প্রদীপের গান শুনেই কেমন যেন চিন্তামগ্ন হয়ে যায় সে। প্রদীপকে কি আবার গানের নেশা পেয়ে বসেছে—এ হয়ত নমিতারই জন্য।

সকলেই প্রায় লক্ষ্য করে লতিকার এই ভাবান্তর। ডাক্তার নিষেধ করেন বিশেষ কিছু না ভাবতে, শরীরের পক্ষে ক্ষতিকরই হতে পারে। তার যেন নিজের চিন্তা করবারও কিছু নাই।

কদিন হতে রোজই ডাকের পথ চেয়ে থাকে, কোন চিঠি পত্র নাই বাড়ী হতে। সবকিছু মিলিয়ে বেশ একটা অশান্তিরই সৃষ্টি হয় মনে।

নমিতা ঠিকই করেছিল কিন্তু হিসেবে একটুখানি ভুল করেছিল, সেদিন প্রদীপের সামনেও স্বামীস্ত্রীর অভিনয় করতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই সে জড়িয়ে পড়েছিল, খোকনকে কেন্দ্র করে।

খোকন সেরে উঠেছে। হাসপাতাল হ'তে খবর আসছে—ডাক্তারের রিপোর্ট—লতিকার আবার জ্বর আসছে—বেড়েছে তার রোগ! প্রদীপ এনিয়ে আর মাথা ঘামাতে পারে না। নিজেকে তিলে তিলে বিনষ্ট করে কোন কাজে আসবে—সে বুঝতেই পারে না! সেও মানুষ—তারও ইচ্ছা আছে, কামনা আছে। নমিতাকে সেত ভালবাসে, নমিতা ও খোকনকে ছেড়ে থাকতে পারেনা, তবে কেন তারা ঘর বাঁধতে পারে না।

নমিতা প্রতিবাদ করে দৃঢ়ভাবে,—"এ হ'তেই পারেনা, দিদির কাছ হতে তার হাতে গড়া সংসার—তার খোকন এসব কিছুই ছিনিয়ে নিতে সে পারবে না, কিছুতেই না।"

নিজের দুর্বলতা অনুভব করে নমিতা, নিজেকে তার বিশ্বাস নাই। যে কোন মুহূর্তে হয়ত এমনি কোন অপ্রিয় কাজই সে করে বসবে, এর আগে হতেই সাবধান হওয়া উচিত।

দিদির শরীরের অবস্থাও খারাপ, খোকনেরও চেঞ্জে যাওয়া দরকার—তছাড়া দিন কতক কলকাতার এ আবহাওয়া হতে দূরে থাকাই প্রয়োজন, নানাদিক বিবেচনা করে শেষ কালে নমিতা চেঞ্জেই যাওয়ার ব্যবস্থা করে।

খোকনের বেশ ভাল লাগে জায়গাটা। একদিকে পাহাড়—শুধু পাহাড়—বিন্ধ্যাচলের বিস্তীর্ণ পর্বত সীমা—অন্য দিকে গঙ্গার নীল জলরাশি, লাল মাটির বুকে ছবির মত সাজান বাড়ীগুলো।

মির্জাপুরের কাছাকাছি জায়গাতে বাড়ীখানা বেশ লাগে প্রদীপের। উঁচু রাস্তাটা নীচের ঘন আমবনের মধ্য দিয়ে গিয়ে এঁকেবেঁকে উঠেছে পাহাড়ে, কয়েকখানা বাড়ী দিন-কতক বেশ আনন্দেই কাটবে।

সেদিন হঠাৎ স্যানাটোরিয়ামে গিয়ে হাজির হতেই সকলেই বিস্মিত হ'যে যায়, বিখ্যাত গায়িকা নমিতা দেবীকে দেখে ডাক্তার—রোগী—নার্স সকলেই, সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হয়ে যায় লতিকা।

প্রদীপকে দেখবে এ আশাই করেনি, সংগে খোকন বেশ বড় হয়েছে, নমিতাকে 'মা' বলে ডাকছে। সে ত তাকেই মা বলে জানে।

লতিকাকে মা বলে ডাকতে -তার কাছে আসতে কেমন যেন ভয় পায় –ছুটে পালিয়েই গেল নমিতার কাছে।

এ প্রহসন সহজ ভাবে নেয় না লতিকা: প্রদীপ যে নিজে এবং তার ছেলেকেও পর করে তুলেছে, এইটাই বড় হয়ে ওঠে তার চোখে। এ নিয়ে আঘাতও দিতে ছাড়ে না স্বামীকে।

স্যানাটোরিয়ামের বার্ষিক উৎসবেও তাদিকে ছাড়েনা। নমিতাকে গাইতে হয়।

উৎসব শেষ হতে রাত্রি হয়ে যায়। নমিতা প্রদীপকে খুঁজতে খুঁজতে বাগানের দিক্ হতে তার কণ্ঠস্বর পেয়ে এগিয়ে যায়।

আজ লতিকা যেন সমস্ত কাজেরই কৈফিয়ৎ দাবী করে।

কিন্তু প্রদীপ বোঝাতে পারে না—অন্যায় সে কোনখানে করেছে,—খোকনের জন্য নমিতা আজ সর্বস্ব ত্যাগ করেছে।

"—করুক, কিন্তু আমি আমার সংসার—সন্তান—কেন ত্যাগ করব?—"

এ প্রশ্নের উত্তর নাই, কোন রকমে বার হয়ে আসে প্রদীপ। দূর হতে লক্ষ্য করে নমিতা তাকে কেন্দ্র করেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জমা হয়েছে এই বিক্ষোভ—এই অশান্তি।
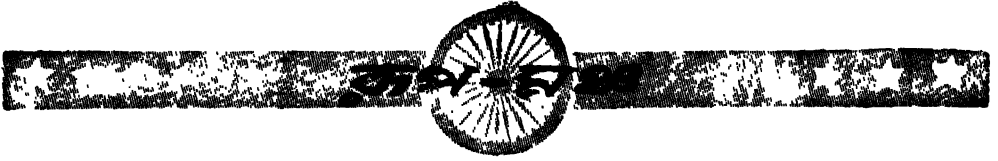
বার হয়ে আসছে নমিতা,—কয়েকদিন হতেই একটা ঘটনা দেখে আসছে, একটি নার্স রোজই আসেন, তার একমাত্র সন্তানকে দেখতে! আজ তার মুমূর্ষ অবস্থা,—স্বামী গেছেন এই দুরারোগ্য ব্যাধিতেই—তাদের একমাত্র সন্তান সেও আজ মৃত্যু শয্যায়,—তবু মুখের প্রসন্নতা তার মুছে যায় নি।

কোন এক অনির্বাণ জ্যোতির সন্ধান সে পেয়েছে—যা আজ সবহারাণোর দিনেও তাকে প্রসন্ন করে রেখেছে। নির্বিকার চিত্তে সে নিজের মুমূর্ষ সন্তানের সংগে সমানভাবে আরও পাঁচজন রোগীকে অক্লান্ত সেবা করে চলেছে।

নমিতার কথায় হাসে মাত্র মলিনভাবে, "কাজের মধ্যেই সান্ত্বনা পেয়েছি দিদি, সেবা ছাড়া আর ত আমার জীবন কাটাবার কোন পথই নাই, এদের মধ্যেই আমি খুঁজে পাব আমার হারাণ স্বামী-পুত্রকে।"

কথাটা মনে দোলা দেয় নমিতার। ত্যাগ করেই সে পেয়েছে চরম শান্তির পথ। তার মনের এই অশান্তি কেবল নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,—দিদি—প্রদীপ সকলকে কেন্দ্র করেই এ অশান্তি। কিন্তু কেন? এ চাওয়ার শেষ কি নাই!

আজ মনে পড়ে কোথায় এসে সে দাঁড়িয়েছে। দাদুর মৃত্যুর সময়ে মনে পড়ে, সে বলেছিল তাঁকে—কথা দিয়েছিল মৃত্যুপথ যাত্রী স্রষ্টাকে—তাঁর সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখবে সে।

কি করেছে তার জন্য। নিজের কামনা—তার স্বার্থপরতাকে ঘিরে চলেছে নিজের কাছে প্রবঞ্চনা।

প্রদীপও আজ নমিতার ভাবান্তর দেখে চমকে যায়। খোকন বার বার ডেকেও সাড়া পায় না—"মা—মামণি"।

সারা রাত্রি ঘুমুতে পারে না নমিতা। একি করতে চলেছে সে। প্রদীপকে কেন সে এ পথে এনেছে। আজও ফেরবার পথ আছে।

সকাল বেলাতেই চলেছে নমিতা একা,—স্যানাটোরিয়ামের দিকে। মনে চিন্তার রাশি, এ অপরাধের বোঝা সে বইবে কেমন করে। দিদির কাছে সত্যই সে অপরাধী।

রাত্রি হতে লতিকার জ্বর বেড়েছে। ডাক্তারও সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন। কোন উত্তেজনাই এর কারণ। প্রবেশ করে নমিতা। কাল রাত্রেই মারা গেছে নার্সের ছেলেটি, নার্স কিন্তু যথারীতি ডিউটিতে এসেছে। মুখে তেমনি ম্লান মধুর হাসি। অবাক হয়ে যায় নমিতা।

লতিকা শুয়ে রয়েছে—মলিন পাংশু চেহারা, নমিতার ডাকে ফিরে চাইল।—আজ নমিতার মুখে একথা শুনবে-আশা করেনি। নমিতা আজ ভুল বুঝতে পেরেছে, এ পথ তার পথ নয়। দিদির সংসারে এমনিতর এক অশান্তি সৃষ্টি করার অপরাধ তার জীবনের বোঝা ভারাক্রান্তই করে তুলবে।

আজ তাই তার পথ আলাদা করে নিতে চায়। কোনদিন সে আসবে না তাদের জীবনে। আজ তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

চেয়ে থাকে লতিকা। মা বাবা মরা বোন, এতটুকু হতে তাকে মানুষ করেছে আজ তাকে কি সে একটু ঠাই দিতে পারে না, যে তার জন্য নীরবে সবকিছু ত্যাগ করে সরে গেল।

"নমি—নমি—।"

নমিতা ততক্ষণ বার হয়ে গেছে স্যানাটোরিয়াম হতে। এগিয়ে চলেছে সে, কোথায় যাবে জানে না।—হঠাৎ রাস্তার বাঁকে লোকের জনতা এবং একটা আধ পরিচিত তার দাদুর গানের সুর শুনে এগিয়ে যায়—গাইছে একটা মুসাফির।

স্তম্ভিত হ'য়ে শোনে নমিতা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার দাদুই যেন গাইছে গানখানা।—এ মুসাফির দেশ-দেশান্তরে যে ঘুরে বেড়ায় সে ত দাদুর গানের প্রসার করেছে।

আর সে।

নিজেকেই অপরাধী বোধ হয়।

প্রদীপ বাড়ীতে বাগানে কোথাও খুঁজে পায় না। চায়ের আসরে নমিতা নেই। বার হয়ে পড়ে হাসপাতালের দিকে।

লতিকা অবাক হয়ে যায়—এ সময় প্রদীপকে দেখে। আজ প্রদীপের সমস্ত কথায় রাগ করে না লতিকা। মলিনভাবে হাসে—"নমি যে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে আমাকে তোমার কাছে
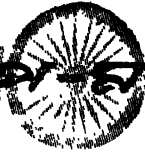
দিয়ে গেল, তার দয়া নিয়েই জীবন ভরে উঠবে আমার, তাকে ফেরাতে পারলাম না, বোন হয়ে—বোনের সবচেয়ে শত্রু হয়েছিলাম কি না—তাই এই শাস্তি।"

প্রদীপ চুপ করে শোনে কথাগুলো। যে জীবনের সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য একদিনে দূর করে চলে যেতে পারে, তাকে ফেরান যায় না। সেদিন কুমার সাহেবকেও সে ত ফিরিয়ে দিয়েছিল।—লতিকার চোখে আজ জল।

—"সারা জীবন ভুল বুঝে দুঃখই দিলাম তাকে, ভুল শোধরাবার কোন সুযোগই সে দিলে না।"

কয়েকদিন কেটে গেছে। নমিতার কোন সংবাদই পায় নি তারা। স্যানাটোরিয়ামের বাগানে সবে রয়েছে। লতিকা, কদিন বেশ ভাল আছে। আর জ্বর টর না হলে আশা করা যায় সেরে উঠবে। প্রদীপ কি একটা বই পড়ে শোনাচ্ছে তাকে। খোকন গাছের ডালে প্রজাপতি ধরতে ব্যস্ত।

হঠাৎ রেডিওটা বেজে ওঠে। দিল্লী কেন্দ্র হতে।

"—বহুদিন পর বিখ্যাত গায়িকা নমিতা দেবী আজ হতে নিয়মিত ভাবে গাইবেন।"

কথাটা শুনেই সকলেই সকচিত হয়ে ওঠে। খোকন এগিয়ে আসে গানের সুর শুনে। প্রদীপ—লতিকা উৎকর্ণ হয়ে শোনে গানটা—তার দাদুর প্রিয় গান। মিয়া কি মল্লার রাগিণীতে—

"যো তুখায়া দিল মেরি
উহি হ্যায় আপনা,
চল্ মুসাফির থাড়ে থাড়ে কিউ
রাহীপর শোচনা—"

খোকন এগিয়ে চলে রেডিওর দিকে, প্রদীপ তন্ময় হ'য়ে শুনছে। লতিকার চোখে জল। নমিতা আজ তার হারাণ পথ খুঁজে পেয়েছে—দাদুর দেখান সেই পথ—যে পথ হারিয়ে গিয়ে নিজের প্রতিভার অপমানই সে করেছিল।

শ্রীমতী সুনন্দা দেবী

●

মধ্য কলিতাতার একটী বাড়ী। বাড়ীর আবহাওয়া আভিজাত্যপূর্ণ—বনেদী বড়লোক গৃহস্বামী। বাড়ীর বাইরেকার এবং ভিতরের সাজসজ্জা বনেদী আভিজাত্যেরই পরিচয় দিচ্ছে—ছোট্ট অথচ সজ্জিত এই বাড়ীটীতে কিন্তু সাংসারিক বাঁধুনি নেই মোটেই। তিনটী ভাই এর মালিক —বড় দুই ভাই বিয়ে করেছেন কিন্তু সংসারিক বন্ধন যেন কাউকে বাধতে পারে না। যে যাঁর ইচ্ছামত চলছেন বাধা দেওয়ার কেউ নেই—উপদেশ দেওয়ারও কেউ নেই। এমনি আবহাওয়ায় ছোট বৌটী কিছুতেই পারে না নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে—মাত্র ১৩ বছর বয়স—সাংসারিক অভিজ্ঞতাও বিশেষ কিছু নেই। এই বয়সে মা এবং ঠাকুরমাকে যে ভাবে সংসার তরনীর হাল ধরতে দেখেছে—সেটুকু অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পারে, এই সংসাটীর অসহায় অবস্থা—কিন্তু কি করবে সে? কতটুকু সাধ্য তার এই আবহাওয়ার পরিবর্তনে? তবু সে স্থির থাকতে পারে না -ছেলেবেলাকার দিনগুলি যে মধুর পরিবেশের মাঝে তার কেটেছে—তার স্মৃতি তাকে আরো দোলা দেয়। আহিরিটোলায় মামাবাড়ীতে ১৩২৭ সনে, ১৮ই শ্রাবনের বাদল ধারার মাঝে তার জন্ম। সকলের আশীর্বাদ সিঞ্চনে তার জীবনের আরম্ভ। মা বাবার প্রথম সন্তান সে—মামাবড়ীতেও তার আদরের সীমা ছিল না। দাদামশাই প্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিলেত ফেরৎ এবং বেশীর ভাগ সময় বিলেতে কাটিয়েছেন—তাঁর বাড়ীও তাই বিলেতী আদব কায়দায় পূর্ণ, তিনি তাঁর আদরের ফুটফুটে নাতনীটাকে তাই বিলেতী কায়দাতে গড়ে তুলতে চাইলেন—নাতনীকে রাখলেন নিজের কাছে। তাঁর ছিল একটী ফিল্ম কোম্পানী। দাদুর কোলে চড়ে নাতনী ইলা "নিদ্রিত ভগবানে" একটু অভিনয়ও করে—সে দিন বোধ হয় ইলার ভাগ্যবিধাতা তার ভবিষ্যৎকে নির্দিষ্ট করে দিয়ে ছিলেন। ইলার বাবা জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন আবার ঠিক দাদুর বিপরীত ধরণের মানুষ—বালীগঞ্জে থাকেন—কমলালয় লিমিটেডের একজন অংশীদার তিনি—স্বচ্ছল অবস্থা কিন্তু তিনি বিলেতী চাল চলনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁর মা—ইলার ঠাকুর মা নাতনীকে তাই শিবপূজা এবং পুনি পুকুর ব্রত করাতেন—এভাবে ইলা মহাকালী পাঠশালা ও লরেটোর মাঝে পড়ে দুটোকেই নিজস্ব করে গ্রহণ করলো। মামাবাড়ীতে বিলেতী আবহাওয়া থাকলেও তারা বংশানুক্রমিক দুর্গাপূজা করতে বাদ দিতেন না—এই দুর্গাপূজার একটা মধুর স্মৃতি ইলাকে এই বধূ জীবনেও মাঝে মাঝে উন্মনা করে দেয়। সে হচ্ছে তার কুমারী পূজা। দুর্গাপূজার অষ্টমীদিন তাকে শুদ্ধস্নাতা কুমারী রূপে পূজা করা হতো—ইলা নিজেকে তখন মহিমময়ী রূপে কল্পনা করতো—তার মনও এই পবিত্র পরিবেশে প্রভাবিত হতো। কি এক অজানা আকর্ষণে তার মন এই পূজার অধিকারিণী মায়ের পায়ে নিজকে সমর্পণ করতো। ছোট বেলার শিবপূজা ও কুমারী পূজা তার স্মৃতির ভাণ্ডারে আজো জমা হয়ে আছে। বিয়ের পর শ্বশুর বাড়িতে ঠাকুর-দেবতার পূজা অর্চনা না দেখে তার ছোট্ট মনটি আরো খারাপ হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকে নাচ, গান, অভিনয়ে সে সমান ক্ষতা দেখিয়েছে লেখা-পড়ার সাথে সাথে। Duff School-এর ছাত্রী যখন সে, তখন সেখানকার পুরস্কার বিতরণী সভায় নাচ গানের prize তারই অধিকারে থাকতো। বাবাও মেয়ের এই দক্ষতাকে উৎসাহ দিতেন—বাড়ীতে মাঝে মাঝে পারিবারিক সম্মেলনে এই মেয়েটি দর্শক ও শ্রোতাদের প্রশংসা পেতো—তাছাড়া রামমোহন লাইব্রেরীতে নানা অনুষ্ঠানেও ইলা অংশ গ্রহণ করেছে।

যখন ইলার বিয়ে হয়—তখন সে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে—কিন্তু তার মনে নারীর সেই শাশ্বত পূজারিণী রূপ গভীর ভাবে অংকিত হয়ে রয়েছে। তাই, দেবতা বর্জিত আবহাওয়ায় সে হাফিয়ে উঠলো—অনেক ভেবে চিন্তে সে অসীম সাহসে এই সংসারের ভার মাথায় নিতে স্থির করলো। সংসারে শ্বশুর শাশুড়ী ছিলেন না—ভাসুর এবং বড় জা ছিলেন অত্যন্ত ভাল মানুষ। প্রথম দিন থেকেই বড় জা তাকে ছোট বোন ও বন্ধু রূপে গ্রহণ করে—ব্যক্তিত্বহীন এবং অতি
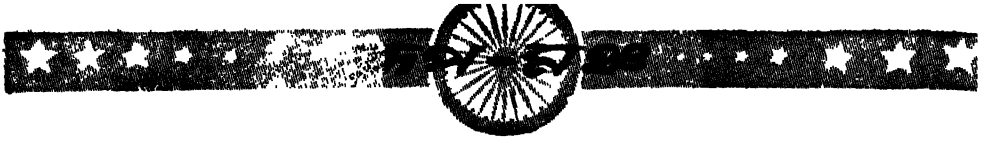
ভালমানুষ অথচ সংসারিক অভিজ্ঞতা ছিলনা বলে এ পর্যন্ত তিনি সংসারটিকে গুছাতে পারেন নি—ইলা যখন তাঁকে নিজের অভিপ্রায় জানালো—তিনি সানন্দে ছোট জা'র হাতে সংসারটাকে ছেড়ে দিলেন। স্বামী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্ত্রীর স্থির বুদ্ধির যে পরিচয় পেয়েছিলেন, তাতে নিশ্চিন্ত হয়েই তার হাতে সব ভার দিয়ে যেন নিস্কৃতি পেলেন। এত দিনে যেন বাড়ীটা হাফছেড়ে বাঁচলো—ঠাকুর ঘর উঠলো তেতলার এক কোণে—প্রতি সকাল সন্ধ্যায় ধূপধূনোর গন্ধ বাড়ীতে অপূর্ব ভাবের সৃষ্টি করলো। হিন্দুদের পরিচিত ও মজ্জাগত বস্তুটাকে পেয়ে বাড়ীটিও যেন ঝলমলিয়ে উঠলো। সংসারের মাঝেও শৃঙ্খলা এলো। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ইলা সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করলো—শুধু তাতেই সে ক্ষান্ত হলো না। তাঁদের জীবিকার্জনের উপায় ছিল একটা কাপড়ের দোকান। তার হিসাব নিকাশের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখলো—স্বামীর কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খবর সে রাখতো। এই ভাবে চললো কয়েক বছর—সুসামঞ্জস্যতা এলো সব দিকে। ইলা ইতিমধ্যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেছে। একদিকে যেমন সংসারকে সে নিয়মিত করে তুলেছে, তেমনি অপরদিকে নিজেকেও শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়ে নিয়ে চলেছে। সারাদিন নানা কাজকর্মে সে মেতে থাকে—তারই অবসরে তাকে দেখা যায় একাগ্র মনে বই নিয়ে বসে থাকতে। ছোট বেলা থেকেই সে একগুঁয়ে ও জেদী—যে কাজ সে একবার করবে বলে মনে করে, তাকে সে সফল করে তুলবেই। বধূ জীবনেও এই জেদ এবং দৃঢ়চিত্ততা তাকে প্রত্যেক কাজে জয়ী করে তুললো। সংসারের আত্মীয় স্বজন, ঝি, ঠাকুর, চাকর সকলেই "ছোটমা"র নির্দেশকে আদেশ বলে বলে মানে—তাকে ভালও বাসে। তারা জানে, ছোট বৌটীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতটুকু ত্রুটিও এড়িয়ে যেতে পারে না। তারাও তাই প্রাণপণে সংযত হতে চেষ্টা করে। ইলার ব্যক্তিত্বে ও দক্ষতায় এতদিনের আবর্জনাস্তূপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে সংসারটা যেন হাফছেড়ে বাঁচল। এতটুকু ছোট্ট মেয়েটার ভিতর এত শক্তি লুকিয়ে ছিল—কেউ ভাবতেই পারে না—তার স্বামীও আজ স্ত্রীর চরিত্রের একটা নূতন দিক যেন দেখতে পেলেন। স্ত্রীর দৃঢ়তার পরিচয় পেলেও ইলা যে এতখানি শক্তিময়ী তা সত্যিই তিনি এর আগে বুঝতে পারেন নি। স্ত্রীকে একদিন বল্লেন—"আচ্ছা ইলা, যদি কোনদিন কোন দৈববিপাকে সংসারে বিপদ ঘনিয়ে আসে, সেদিনও কি এমনি দৃঢ়ভাবে তার হাল ধরতে পারবে না?" ইলা বলে—"ভগবান সেরকম দুর্দিন যেন না দেন—তবু বলি, এটুকু বিশ্বাস আমার আছে যে, আমি কারোর সাহায্য নেব না—নিজে একটুও ভেংগে পড়বো না। সেদিনও দেখো, সংসারে আমি ঠিক এক ভাবেই আছি।" মনে মনে আশ্বস্ত হন স্বামী। কিন্তু ইলার মনে একটা খোঁজ থেকে যায়—কেন একথা বল্লেন? জিজ্ঞেসও করে—উত্তর পায়: না, এমনি পরীক্ষা করছিলাম,—লোকের কাছেতো দেবীত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছো—তা সত্যিই না ঠুনকো, তাই যাঁচাই করে নিলাম।"

বিয়ের পর তিন বছর কেটে গেছে—ইলা এখন শুধু বৌ নয়। সে এখন মা। একটী ছোট্ট শিশুর কলকাকলীতে বাড়ীখানি মুখর হয়ে উঠেছে। মাতৃত্বের আশীর্বাদে ইলার জীবনের যেন আর একটা দিক উজ্জল হয়ে দেখা দিল। জীবনের রঙীন দিনগুলি হাস্যমুখর পরিবেশের ভিতর দিয়ে বয়ে চল্লো—ইলা মাঝে মাঝে বসে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে—ছেলে নিয়ে—স্বামী নিয়ে সে আজ পরিপূর্ণ সুখী। সবাইর ভালবাসা, স্নেহ, ভক্তি, প্রেম সে পেয়েছে—এতখানি পাওয়া সব মেয়ের ভাগ্যেই হয়ে উঠে না! ভবিষ্যতের মাঝে তার আরো আকাঙ্খা লুকিয়ে আছে—যে স্বপ্নসৌধ গড়ে তুলেছে তা কি সত্যি হয়ে উঠবে না? ছেলেকে কি ভাবে গড়ে তুলবে এখন থেকেই সে তার জল্পনা কল্পনা করে—হ্যাঁ, ছেলে হবে ঠিক তার কাকার মতো—যে কাকাকে ইলা ছোট বেলা থেকে আদর্শ হিসাবে পূজা করে—তাদের বাড়ীতে তিনিইতো সবচেয়ে শিক্ষিত, ইলার খোকা হবে তাঁর মত শিক্ষিত, উদারমনা!

এদিকে ওদের দোকানে নানা বিপর্যয়ে ধীরে ধীরে আর্থিক অবনতি দেখা দেয়। মহাজনদের দেনা বেড়েই চলে। ব্যবসায়ের মধ্যে ফাঁক দেখা দিল—যে কোন সময়ে তা অতল গহ্বরে সবকিছু
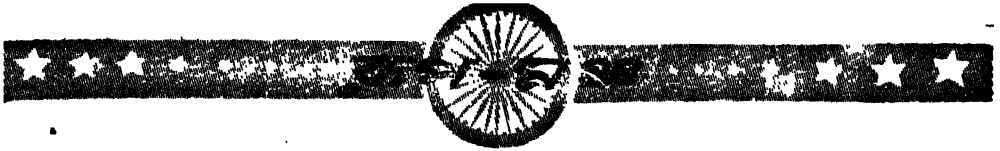
টেনে নেবে। ইলার স্বামী সুধীরবাবু সতর্কতার সংগে এই দুঃসংবাদটী ইলার কাছে গোপন করেন—মাঝে মাঝে চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখা যায় তাঁকে। ইলার প্রশ্নের উত্তরে ম্লান হাসি হেসে বলেন : ব্যবসায়ের নানাদিক চিন্তা করতে তো হয়।"

মন্থর গতিতে ব্যবসা এগিয়ে চলে—সাংসারিক খরচের সময়ে ইলা তা বুঝতেও পারে—বুঝতে পারে ব্যবসা এখন মন্দা, তবু বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলেছে—সহজে অন্য কেউ ধরতে পারবে না যে, সত্যিই এদের দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। ইলার কাছে দোকানের আর্থিক অবস্থার কথা অজানা থাকে না—তবু সে ভাবে, ব্যবসায়ে লাভ লোকসান তো হয়ই—এখন অবস্থা মন্দা হলেও, ভাল হতে কতক্ষণ?

ইলাদের জীবনের গতি মন্থরভাবে আরো দুটী বছর এগিয়ে গেছে—ইতিমধ্যে ইলার একটী মেয়েও হয়েছে—খোকা তার ছোট্ট খেলার সাথীকে পেয়ে ভারি খুসী। মাঝে মাঝে আবার মায়ের কোল ভাগাভাগি হয়ে গেল বলে ক্ষুণ্ণও হয়—কোথা থেকে কে এসে মাকে অধিকার করেছে—একচ্ছত্র আধিপত্যে আবার এ কি উৎপাত! তবু খেলার পুতুলটিকে পেয়ে বলতে গেলে সে খুসীই। এমনি সময়ে একদিন সন্ধ্যায় কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক এসে সুধীর বাবুকে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাত দশটার পর তিনি ফিরেই ইলাকে বল্লেন : এখুনি এই বাড়ী ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে যেতে—এবাড়ীতে তাদের আর অধিকার নেই। ইলা হতবাক্ হয়ে পড়লেও নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললো—কিসের জন্য তাদের যেতে হবে—তা না জেনে সে যাবে না—বাপের বাড়ীতে বিবাহিত জীবনের এই কয়টী বছরে একমাসও গিয়ে সে থাকেনি। তার হাতে গড়া সংসার, ঘর দোর ছেড়ে সে কোথায় যাবে? সে যাবেনা। স্বামী উত্তর দেন—তা'হবার উপায় নেই,—দোকানের অনেক দেনা হয়েছে মহাজনদের কাছে—তারা কাল খবর পেয়ে এ বাড়ী দখল করতে ছুটে আস্‌বে—এ রাত্রের মধ্যে সবাইকে সব জিনিষপত্র নিয়ে অন্য কোথাও সরে যেতে হবে।"

নিরুপায় হলেও এই চরম আঘাতের জন্য ইলা প্রস্তুত ছিল না—তার বড় সাধের গড়া—নিজের হাতে সাজানো এই সংসার। প্রত্যেকটী ঘরের প্রতিটী কোণে তার হাতের ছাপ রয়েছে—নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের পছন্দ মত করে সে তার ঘর তৈরী করেছে সাজিয়ে। তাকে ছাড়া যেমন সংসারকে কল্পনা করা যায় না—তেমনি সংসারকে ছাড়াও সে থাকতে পারে না। সংসারের অস্থিমজ্জায় সে মিশে রয়েছে—এ যে তার প্রাণ নিংড়ানো রসে সিঞ্চিত—জন্মের মত এই বাড়ী ছেড়ে যাওয়া—এবাড়ী আর তাদের নয়—একথা ইলা ভাবতেও পারে না—তার সারা দেহ অব্যক্ত বেদনায় গুমরিয়ে ওঠে। মিনতি করে স্বামীকে—"এই রাত্রিটা আমাকে আমার ঘরে থাকতে দাও—আমি ভোর রাত্রে চলে যাবো—মহাজনরা আসবার আগেই। রাত্রিটুকু ভরে আমি শেষবারের মত সব কিছু দেখেনি—এর প্রাণের স্পন্দনটুকু অনুভব করতে দাও।" ইলার বেদনায় স্বামীও ব্যথা পান—এই সংসার, বাড়ীঘর ছেড়ে যেতে তাঁরও কি কম ব্যথা লাগছে? মা বাবার স্নেহ স্মৃতিতে ভরে আছে বাড়ীটী। পিতৃপুরুষদের আশীর্বাদে তাঁদের জীবন এখানেই আরম্ভ হয়—এদের প্রতিটি ইট কাঠও যে তাঁদের স্মৃতি বহন করছে। এ তাদের আকাঙ্খিত ধন—তবু নিয়তির কঠোর বিধানে একে ছেড়ে যেতে হবে—মন চাইবে না সত্যি—তবু নিয়তি তাকে ঠেলে নিয়ে যাবে। ইলা সে রাতটুকু জেগেই কাটিয়ে দেয়। আবার নূতন করে সব কিছু দেখে নেয়—এই তো তার ঠাকুর ঘর—ছোট্ট অথচ কি পবিত্র! ঠাকুরের কাছে প্রণাম করে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ইলা—সমস্ত বিয়োগ ব্যথা ঝর্ ঝর্ করে ঝড়ে পড়ে দেবতার পায়ে—কি অপরাধে এতবড় শাস্তি তার? ঠাকুর কি জানেন না, জ্ঞানতঃ সে কোন অপরাধ করে নি? তবু তার জীবনের প্রারম্ভে আজ একি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা এলো। ভোরের বেলায় সূর্যের আলোক ঢেকে ঘন অন্ধকার ঘিরে এলো কেন? এই অন্ধকারে সে কি পথ খুঁজে পাবে? আবার কি নূতন আলোকে তার জীবন অভিষিক্ত হয়ে উঠবে? তার শিশু দুটী—পুষ্পস্তবকের মতো যারা আজ তার জীবন পাত্রে ফুটে উঠেছে—তারাওতো নিষ্পাপ—তাদের ভবিষ্যতের পথ এভাবে রুদ্ধ হলো কেন—
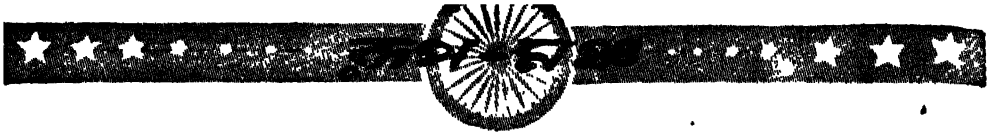
কেন তাদের সামনে আজ দুঃখ ঘনিয়ে এলো? পাষাণ ঠাকুর তাঁর পূজারিণীর দুঃখেও অবিচলিত পাষাণই হয়ে রইলো। প্রণাম করে ঠাকুরকে বুকে নিয়ে ইলা চোখের জল মুছে ফেলে—জোর করে শক্তি আনে মনে—ঠাকুরই রইবেন সাথে সাথে। ভয় কি? একদিন তিনি পথ দেখাবেনই—তিনিই তো পৃথিবীর আঁধার দূর করে আলো দেন—প্রয়োজন বোধে তিনিই পৃথিবীর বুকে আবার আঁধার টেনে আনেন। এজন্যই আজ ইলার মাঝেও তিনি এমনি আঁধার ভরা দুর্যোগের রাত্রি এনেছেন। তাঁর হাতের স্পর্শে আজকের কালো আগামী দিনে আলো হয়ে ফুটে উঠবেই। বার বার করে ঘরের প্রতিটী জিনিষ ইলা দেখে নেয়—প্রত্যেক ঘরে সে যেন কার অব্যক্ত কান্না শুনতে পায়—ওরাও কি ইলার মতই আজ গুমড়ে গুমড়ে কাঁদছে? ওদের হৃদয়ের তন্ত্রীতেও কি ওরই মত বেদনার সুর বেজে উঠছে? ইলার মনে আজ যে আলোড়ন চলেছে, তা কেউ বুঝতে পারবে না। নিজেকে যতই সংযত করতে চাইছে—ততই তার হৃদয় যেন ভেংগে পড়ছে। বাইরে কিন্তু সে স্থির ধীরই রইলো। ক্রমে সব জিনিষ গুছিয়ে পাঠানো হ'লো ইলার বড়জা'র বাপের বাড়ীতে—ওদের বাড়ীর কাছেই সেই বাড়ী। ভোরের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ইলা তার ৬ মাসের শিশুকন্যা ও ছেলেকে নিয়ে স্বামীর সাথে এসে রাস্তায় দাঁড়ালো। শেষবারের মতো একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলো—অস্পষ্ট আলো-আঁধারে ভাল করে দেখতে পেলনা—বাড়ীখানি আবছা দেখাচ্ছে। শুধু কি অন্ধকারেই এমন হচ্ছে—না তার চোখের দৃষ্টিও আজ অশ্রু-ভেজা ঝাপসা হ'চ্ছে? ইলার মনের পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো বাড়ীটাও পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যেন মিশে আছে—ভোরে তার তেতলার ঠাকুরঘরখানি আবার ঝলমলিয়ে উঠবে—কিন্তু তখন তাতে মিশে থাকবেনা ধূপের গন্ধ, ফুলের শোভা আর একটী পূজারিণী বালিকার প্রণাম। ভাবতেও পারেনা ইলা—বারবার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে—শ্বশুর কুলের অশরীরী আত্মা'ও যেন তাকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকছে। কিন্তু তার সাধ্য নেই থাকবার। নইলে, নিজেরই বাড়ী থেকে এভাবে অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে যাবে কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভাবে ইলা, তার প্রথম বধূবেশে এই বাড়ীতে আসবার কথা। আলোর আভায় চির উজ্জ্বল দিনটীতে সকলের সাদর অভ্যর্থনা ও আনন্দ কোলাহলের মাঝে লালচেলীর আড়ালে একটি দুরুদুরু কম্পিত বালিকা স্বামীর হাত ধরে ভীরুপদে এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল—আলোর মালায় বাড়ীখানি যেন হাসছে—সেও যেন এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল। আর আজ—একেবারে বিপরীত দৃশ্য—যেন জীবননাট্যের একটী উজ্জ্বল দৃশ্যের পর কালো যবনিকা পতন—এই যবনিকা কি আবার উঠবে? আবার কি সে সেই আনন্দ-করোজ্জ্বল দিনগুলি ফিরে পাবে? চোখের জল মুছে ইলা মুখ ফিরিয়ে চলতে থাকে। শেষ রাত্রিটুকু বড়জা'র বাপের বাড়ীতে কাটিয়ে পরদিন বাপের বাড়ী চলে গেল। তার এই অদৃষ্টের খেলার কথা কাউকে জানালো না—এমনকি মাকেও নয়। তারপর দু'একদিন পর বালীগঞ্জে ফার্ণরোডে একটী ছোট বাড়ীর একতালা ভাড়া করে ইলা আবার তার সংসার গুছাতে বসলো।

ইলার জীবনের কঠিনতম অধ্যায় আরম্ভ হলো। বিপদের পর বিপদ আসতে লাগলো—এ যেন অদৃষ্টের নির্মম খেলা ইলাকে নিয়ে—ঠিক কোথায় ওকে বসাবে—তার ঠিক না করতে পেরে শুধু স্থান বদ্‌লিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম প্রথম হাতে যা টাকা ছিল তাই দিয়ে এবং ওদেরই অপর দুটী বাড়ীর ভাড়া থেকে একরকম করে চালাতে লাগলো। স্বামীও কোন কাজ যোগাড় করতে পারছেন না—হাতের টাকাও যে ফুরিয়ে আসছে। পাওনাদারের কবলে একে একে দু'খানা বাড়ীই গেল—দোকান তো আগেই চলে গেছে। রাতদিন ইলা যেন চিন্তার খেই খুঁজে পায়না—ক্রমে সে'ও উপার্জনের চেষ্টা করলো। বাড়ীর পাশের দুটী মেয়েকে চামড়ার কাজ ও এসরাজ বাজানো শেখাতে আরম্ভ করলো—১৫৲ টাকা করে মোট ৩০৲ টাকা পাবে। হাতের পুঁজিপাটা নিঃশেষ হ'লো—বাকী রইলো নিজের ও মেয়ের গয়না কখানা। এক এক করে তা'ও বিক্রি করতে লাগলো। কিন্তু তাতেও
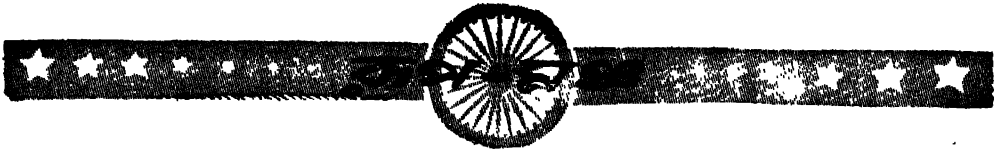
কি সংসার চলে? এমন একটা দিন আসতে লাগলো যা, তার জীবনের চরম দুঃখ নিয়ে এলো—ইলার অনাহারে কতদিন কেটে গেছে তার অবধি নেই—ছেলে ও মেয়ে দুটীকে শুধু গরম জল ছাড়া আর কিছু দিতে পারে নি। মায়ের মনে এযে কতবড় আঘাত—তা'ও ইলা সর্বংসহা ধরিত্রীর মতো সহ্য করলো—কাউকে জানালো না তার দুর্দশার কথা—তার আত্মসম্মানকে এতটুকু হেয় সে করবেনা, স্বামীর দুর্দিনে অন্যের সাহায্য নেওয়া—নিজেরও অসম্মান বৈ কী! লোকের কাছে হাত পেতে নেওয়া সে কল্পনাও করতে পারে না। মা বাবার স্নেহ তার জন্য সব সময় খোলা আছে সে জানে—কিন্তু সেখানেও যে সংকোচ—সে জোর মনে তাদের কাছ থেকে কিছু নিতে পারবে না, স্বামী অনেকবার ইলাকে বলেছেন—"এভাবে আর কতদিন চালাবে—এত দুঃখ কেন সহ্য করছ—চল, বাপের বাড়ী রেখে আসি, আমি যে করে হোক চালিয়ে নেব"—কিন্তু ইলা আহত আত্মাভিমানে গর্জন করে ওঠে—সুসময়েও যেখানে সে কোনদিন যায় নি, আজ অসময়ে তাদের কাছে যাওয়া যে স্বামীকেও অসম্মান করা—এ হয়না, হতে পারেনা। বাবা, ছোট ভাইয়েরা মাঝে মাঝে আসে। খবর নেয়। কিন্তু সঠিক খবর তাঁরা জানতেন না। ইলাও জানাতোনা। একদিন ওর ছোট ভাই এসে হাজির, বেলা তখন ১১টা হবে—ঘরে কিছু নেই—অতএব উনুনেও আগুন নেই। ভাইটী বল্লে—একি রে দিদি, তুই এখনও রান্না করছিস্ না যে?" অম্লান বদনে ইলা উত্তর দেয়: 'আজ আমাদের দুজনের এক বাড়ীতে নেমতন্ন, খুকুদের খাইয়ে নিয়েছি।" হয়তো খুকুদের জুটেছে শুধু গরম জল। দিন তার ধর্ম অনুযায়ী চলে যাচ্ছে—ইলার জীবনের যেন এক একটা যুগ যাচ্ছে। কোথাও একটু আশার আলোও সে দেখতে পায় না। আরো যেন দুর্দৈব ঘনঘটা করে প্রতীক্ষা করে আছে মনে হয়, আর কত সে সহ্য করবে? তার দৃঢ়হাত বুঝি শিথিল হয়ে আসে—কঠোর পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আর কতদিন সে হাল ধরে থাকতে পারবে? এর পরেও কি তুফান আসবে? যদি আসে, তার বড় ঝাপটা সে পারবে তো বুক পেতে নিতে—যাতে তার খোকাখুকুর গায়ে এক ফোঁটাও আঘাত লাগবে না! ঠাকুরের কাছে তারই শক্তি সে প্রার্থনা করে। অবশেষে চরম দুর্দিনই বুঝি এলো।

সুধীর বাবু এবং তার এক বন্ধু বর্তমান বসু-শ্রীর পাশের Isolabella হোটেলটী সর্ব প্রথম খুলতে মনস্থ করেন। সুধীর বাবু ইলাকে বললে, যদি হাজার খানেক টাকা পাওয়া যায় তবে অংশীদার হিসাবে একটা হোটেল তিনি আরম্ভ করেন। ইলা তার এবং মেয়ের শেষ সম্বল গয়নাটুকু বিক্রি করে এবং লক্ষ্মীর ঝাঁপি, ট্রাঙ্কের তলা হাতড়ে কোন রকমে ২০০ টাকা যোগাড় করে নিঃসম্বল হয়ে সব স্বামীর হাতে তুলে দিল। কিন্তু এতো প্রয়োজনের তুলনায় এত কিছুই নয়, অগত্যা আগেকার বাড়ীর সাবেক ফার্ণিচার বিক্রি করে এবং কিছু ধার করে হাজার টাকা যোগাড় করা গেল। হোটেল আরম্ভ হলো। দুই বন্ধুর মধ্যে কার্যক্ষেত্রে সুধীর বাবুকেই দেখা গেল অকুণ্ঠ ভাবে কাজ করতে—কি করে হোটেলটাকে আরো বড় করা যেতে পারে—কি করে সুদৃশ্য করা যেতে পারে সবই সুধীরবাবু স্থির করেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম হোটেলটাকে সাজানো থেকে আরম্ভ করে সব কাজের তদারক করতেন। কিন্তু অতি ভাল মানুষের ভাল হয় না—যখন হোটেলটি খুব জাঁকিয়ে উঠেছে—সুখ্যাতিও হয়েছে—তখন একদিন বন্ধুবরের বাবা বললেন যে, হাজার টাকা সুধীরবাবু দিয়েছেন, তা তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং হোটেলের কোন অংশ আর তাঁর থাকবে না। কাজেও হলো তাই—বন্ধুত্বের খাতিরে হোটেলের আরম্ভ হওয়ার আগে তিনি বন্ধুর সংগে আইনতঃ কোন লেখা-পড়া করে নেননি। কাজেই তাঁর অংশ নেই বললে তখন তা'ই মানতে বাধ্য তিনি। বন্ধুত্বের বিনিময়ে আবার তিনি কপর্দকহীন বেকার হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে আবার আগেকার অবস্থা এলো—মাঝে একটু আশা এলেও, এখন এলো চরম দুর্দিন। দিনের পর দিন না খাওয়া তাদের ধাতস্থ হয়ে এলো। যেদিন জুটতো তা'ও মোটা মোটা লাল চালের ভাত আর একটু শাক চচ্চরি। খুব বেশী
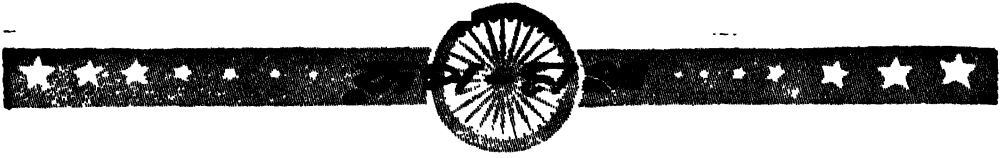
হলে দুটো বিউলির ডালের বড়া। যে স্বামীর ছিল রাজ ভোগ—তাঁর সামনে বসে তাঁকে এসব খাওয়াতে পারতো না ইলা—কোন রকমে ভাতের থালাটি সামনে রেখে পালিয়ে বাঁচতো। ইলাকে শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার ছলে স্বামী বলতেন—"বেশী তরকারী আবার এক সংগে খাওয়া যায় না। এই বেশ ঝরঝরে—আমি ভালও বাসি এভাবে এক তরকারী দিয়ে যত ইচ্ছা ভাত খেতে। যাকে সান্ত্বনা দেবে—সে তখন পাশের ঘরে। স্বামীর সান্ত্বনায় আরো বেশী ভেংগে পড়েছে—স্বামীও তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সাজানো কথা দিয়ে—ইলা কি বুঝতে পারছে না তার অবস্থা—তবে এ ছলনা কেন? শুধু কি ইলারই কষ্ট হচ্ছে যে, তাকে সান্ত্বনা দিতে হবে · এতো সান্ত্বনা দেয় না—এ বাড়ায় শুধু যন্ত্রণা। ইলার চোখের জল বাঁধা মানে না—বাঁধা দেয়ও না সে। তার চোখের জলে সমস্ত অকল্যাণ দূর হোক্—তার বিনিময়ে আবার আসুক হাসি, গান, আনন্দ।

একটি বছর চলে গেছে। এমনি একদিন ওর বাবা এসে হাজির। তিনি এতদিনে শুনতে পেয়েছেন—অভিমান ভরে ইলাকে বলেন: "আমিও কি তোর এতই পর হলাম রে, আমাকে তুই জানাসনি পর্যন্ত। কেন আমার ওখানে গেলি না? এত কষ্ট কেন সহ্য করেছিস? তুই যে আমাদের কত আদরের জিনিষ, আর তোরই ছেলেমেয়ে না খেয়ে থাকে!" ইলা উত্তর দেয় না। বাবার বুকে মুখ গুজে চোখের জলে তাঁর বুক ভিজিয়ে দেয়। এবার বাবা আর কোন আপত্তি শোনেন না। ইলাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। ইলাকে পেয়ে ওর মা, ছোট ভাই, বোন সবাই আনন্দে উচ্ছল। ছোট পাঁচটি ভাই, তিনটী বোন দিদিকে অনেক দিন ধরে পাবে তাই আনন্দে আত্মহারা—দিদির খোকা খুকুকে নিয়ে কারা কারি করে। ওদের দিকে চাইলে ইলা যেন কিসের একটা অজানা ব্যথা পায় মনে—স্বাভাবিক ভাবে ওদের সাথে মিশতে পারে না। দু'একদিন পর সে ঠিক করে গিরিডিতে যাবে কাকার কাছে। মা, বাবাও অমত করলেন না। তবু যদি ওর মন শান্তি পায়! ওর কাকা অনাদি মুখোপাধ্যায় গিরিডিতে কলিয়ারীতে একজন কেমিষ্ট। তিনিই সর্বপ্রথম রাঢ়ীদের ভিতর রাধিকা মোহন মৈত্র বৃত্তি পেয়ে জার্মাণিতে যান—সেখান থেকে ফিরে এসে এই গিরিডিতেই কাজ করছেন।

গিরিডিতে গিয়ে ইলা অনেকটা সুস্থ বোধ করলো। প্রকৃতির শোভার মাঝে ওর মন মুক্ত হরিণীর মত ছুটতে চাইলো। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এই স্থানটি তার ক্ষত বিক্ষত মনকে অনেকখানি তৃপ্তি এনে দিল। তার উপর কাকার স্নেহ ভরা আদর। এই কাকাকে ইলা ভালবাসতো খুব—নিজের জীবনের আদর্শও ছিলেন তিনি। তাঁরই মত ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা ছিল ইলার চরিত্রেরও বৈশিষ্টা। এখানে ইলার কাকার সাহচর্যে, ঝরনার কলতানের সংগে মুক্ত প্রান্তরের উদাস করা ভাবের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দমনে কাটিয়ে দিচ্ছে দিনের পরদিন। কিন্তু এভাবে তো আর চিরদিন চলবে না—এখনও তো তার স্বামী কিছুই করে উঠতে পারছেন না—এর পর কি হবে? এই জিজ্ঞাসা আগেকার মত এখনও মাঝে মাঝে তাকে তীব্র খোঁচা দেয়। চিঠির মাঝেও তার মনের এই প্রশ্ন ভাষা নিয়ে ফুটে উঠতো। ধীরে ধীরে গিরিডিও তার কাছে একঘেয়ে মনে হ'তে লাগলো। এমনি সময়ে স্বামীর চিঠি পেল সে—লিখেছেন ইলার বাবাই তাকে Govt. industrial dept-এ মাসিক ৬০৲ টাকা মাইনেতে একটা কাজ ঠিক করে দিয়েছেন! এই খবর পেয়ে ইলা লিখলো, একটী বাড়ী ঠিক করতে—সে আর গিরিডিতে থাকবে না।

এবার কলকাতা ফিরে এসে আবার ইলা বালীগঞ্জেই বাসা বাঁধলো। ভেবেছিল আবার ধীরে ধীরে সুসময় ফিরে এলো, মাত্র ষাট টাকাতে সে সুনিপুণ হাতে কোনক্রমে সংসার চালাতে লাগলো—কিন্তু তবু যে আর চলে না। বাড়ী ভাড়া—খোকা খুকুও এখন বড় হয়েছে এবং নিজেদের খরচ এই সামান্য টাকাতে কি করে চলে? টেনে টুনে মাসের মাঝামাঝি নিয়ে যাওয়া চলে—কিন্তু আর বাকী কয়দিন কোথা হতে চলবে তা সে বুঝতেই পারে না। নিজের সম্বল বলতে যা ছিল সব কিছুই তো গেছে—অভাবের পাদপূরণ করবার মত কোন জিনিষই
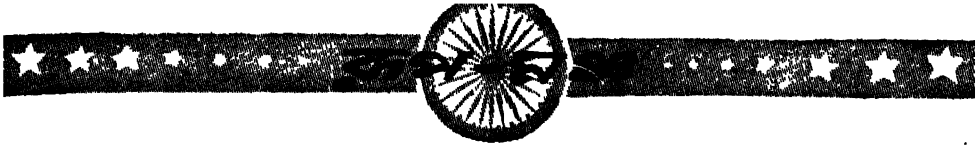
তো আর অবশিষ্ট নেই। ইতিমধ্যে পৃথিবীতেও এক প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে—বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে—জিনিষ পত্রের দাম হয়েছে দ্বিগুণ, জীবন-যাত্রা এক রকম দুরূহ ব্যাপার—আর ইলাদের মতো লোকের তো কোন কথাই নেই। যুদ্ধের আরম্ভ হবার পর দুটী বছর কেটে গেছে—এই দুটী বছর ইলার কি করে যে কেটেছে তা একমাত্র ভগবান জানেন—তবু আজো সে বেচে আছে কিন্তু আর তো চলেনা, মহাযুদ্ধ তার জীবনেও যে মহাযুদ্ধ এনেছে—দুর্দিনের সাথে মরণপণ এই যুদ্ধ ইলার জীবনে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে—এর সীমা রেখা যে দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে, হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলে সূচীভেদ্য অন্ধকারে তা আত্মগোপন করে থাকে। এর প্রতিকারের চিন্তা করে ইলা—নানা-ভাবে চিন্তা করে একটা উপায়ও ঠিক করলো সে। রাত্রিতে স্বামীর কাছে সে তার অভিমত জানালো—সে সিনেমাতে নামবে, যুদ্ধের বাজারে প্রাণ ধারণ করতে হলে তার একটা কিছু করে অর্থোপার্জন করতেই হবে। সিনেমা ব্যবসায়ে শিক্ষিতা ভদ্রঘরের মেয়ে বেশী নেই এবং সিনেমার মালিকরা এইদিকে যে উৎসাহও দেখাচ্ছেন, তাতে মনে হয় অর্থ আসবে যথেষ্ট। ইলার প্রস্তাবে সুধীরবাবু চমকে উঠলেন—এই খেয়াল মাথায় ঢুকলো কি করে! অনেক করে স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইলা তার মত ও পথ স্থির করেছে—সে আর তা থেকে নিবৃত্ত হবেন না। অবশেষে স্ত্রীর জেদের কাছে তিনি হার মানলেন। তবু বললেন, আমাদের সমাজে এখনও অভিনেত্রীদের এতটা মর্যাদা হয়নি যাতে, সিনেমায় নেমে ব্যর্থকাম হলে আবার সমাজ জীবনে স্বাভাবিক ভাবে নিজের মর্যাদা ফিরে পাবে—তখনকার অবস্থা একবার ইলা যেন কল্পনা করে। এই কথায় ইলা একটু দমে গেলেও দৃঢ়ভাবে বলে, "নিজের উপর আমার যে ভাবে বিশ্বাস আছে, তার জোরে এপর্যন্ত পরাজয় স্বীকার হয়নি আমার—আর এই ক্ষেত্রেও তা হবে না। এটুকু বিশ্বাস আমার নিজের উপর আছে" স্ত্রীর এই উক্তিতে অযৌক্তিকতা খুঁজে পেলেন না সুধীরবাবু—তাই অসংকোচে মত দিলেন। এর পর গবেষণা চলতে লাগলো। গন্তব্য স্থান তো ঠিক হয়েছে কিন্তু সঠিক পথ খুঁজে পাবে কার সাহায্যে? ইলার মনে হলো সৌরেন সেনের কথা— কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্সের শিল্প নির্দেশক তিনি—ইলাদের পরিচিত তিনি, ইলা তাঁকে দাদার মতই দেখে। ছোট বোনের আকাঙ্খা তিনি পূরণ করতে পারবেন বলে ইলার মনে হলো। পরদিন ওরা দুজনে সৌরেন সেনের কাছে গেলো। কিন্তু কোন আশা তো দিলেনই না—বরঞ্চ ইলাকে এই পথ থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন। ক্ষুব্ধচিত্তে ইলা ফিরে এলেও তার মন এই পথকেই আকড়ে রইলো দৃঢ় ভাবে। ইলার বাড়ীর কাছেই ছিল পরিচালক বড়ুয়ার অফিস। তিনি তখন "মায়ের প্রাণে"র প্রাথমিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত। ইলা একদিন নিজেই গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করলো—তিনি ইলাকে পরীক্ষা করলেন এবং "মায়ের প্রাণে"র নায়িকার ভূমিকাতেই তাকে সুযোগ দিতে চেষ্টা করবেন বলে কথা দিলেন। কিন্তু তাকে আর সুযোগ দিলেন না—এর সঠিক কারণ অবশ্য ইলা বুঝতেও পারলনা। পর পর দুবার ব্যর্থকাম হলেও ইলা ধৈর্য হারালো না—তার লক্ষ্যতে সে একদিন পৌছবেই। এই সংকল্প নিয়ে সে একদিন পরিচালক সুশীল মজুমদারের বাড়ীতেও হাজির হলো—ইলার দৈহিক গঠন, মুখশ্রী, কণ্ঠস্বর প্রত্যেকটীই সুশীল মজুমদারের সিনেমা উপযোগী বলেই মনে হলো। তিনি তাঁর "প্রতিশোধ" ছবিতে ইলাকে একটি ভূমিকা দেবেন ঠিক করলেন। ইলাও আশ্বস্ত হয়। কিন্তু মাত্র ৫০০৲ টাকা পাবে বলে সে নিরাশ হয়ে পড়লো—টাকা কম বলে নয়—এই পাঁচশত টাকা তো ফুরিয়ে যাবে—তারপর আবার সেই একই অবস্থা—এই ছবির পর যদি আর সে কোন সুযোগ না পায়—তখন কি হবে? মাসিক একটা চুক্তি হলে তার আর কোন ক্ষোভ হতো না—হোক না যে কোন অংকের টাকা! আবার চললো স্বামীর সাথে পরামর্শ—অবশেষে এই চুক্তি মেনে না নেওয়াই স্থির হলো। কিছু দিন যায়—আর কিছুই নেই করবার—যতটা সম্ভব সে করেছে। এর পর আর কিছু না হলে সে নিরুপায়। কোথা থেকেও কোন সাড়া পায় না। এমনি ভাবে চললো কিছু দিন—একদিন

১৭৫০
থেকে
সুপরিচিত
রদারহ্যামস্
সুইস্ লিভার
• আধুনিক গঠন
• নিখুঁত সময়
• মজবুত কলকব্জা
এই তিনটিই বৈশিষ্ট
লিখিলেই ক্যাটলগ পাঠান হয়
সোল এজেন্ট
রায় ব্রাদাস্ এণ্ড কোং
ESTD.1833
৪, মিশন রো এক্সটেনশন, কলিকাতা, ফোন: ক্যাল, ৬৩৪০.

ইলা সৌরেন সেনের কাছ থেকে চিঠি পেলো। তিনি লিখেছেন, যদি এতদিন পরেও তার সিনেমাতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তবে সে যেন সেদিনই বিকেলে নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে যায়। বিকেলবেলা যথারীতি স্বামী-স্ত্রীতে বেড়িয়ে পড়লো। তার সংকল্পের কথা এরা দুজন ছাড়া আত্মীয়স্বজন আর কেউ জানে না—আজও জানলো না।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও। এত বড় ও এত সুন্দর ষ্টুডিও কলকাতায় নেই। এরই একটী ফ্লোরে ভারতের অন্যতম প্রধান পরিচালক নীতিন বসু তাঁর পরিচালনা নৈপুণ্যের সার্থক সৃষ্টি "কাশীনাথে"র চিত্র গ্রহণের তোড়জোড় করছেন—সুযোগ্য ছোট ভাই বিখ্যাত শব্দধর মুকুল বসুও ব্যস্ত ভাবে ঘোরাফিরা করছেন। "কাশীনাথে"র অন্যান্য কর্মী ও শিল্পীরাও আছেন। এমনি পরিবেশের মধ্যে ভয় ও কৌতূহল নিয়ে ইলা এসে দাঁড়াল স্বামী ও সৌরেন সেনের সংগে। ভয় হচ্ছে—তার বুকের মধ্যে দুর দুর করে উঠছে—কি জানি, শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হতে পারবে কি না! তার দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতা এবারও ব্যর্থ হবে কিনা কে জানে! প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর নীতিন বসু ইলাকে "কাশীনাথের" "কমলা"র দুটী সংলাপ আবৃত্তি করতে দিলেন। মনে সাহস এনে দৃঢ়পদে সে এসে মাইকের কাছে দাঁড়ালো—বললো, "শোন, কথা রাখ, যেয়ো না—তোমাকে যেতে দোব না।" শব্দযন্ত্রীর কানে অপূর্ব দরদ ভরা কথাগুলি ভেসে এলো—নীতিনবাবুও প্রশংসা করলেন, উৎসাহ দিলেন। আবার আর একটী গাম্ভীর্য এবং কঠোরতা পূর্ণ সংলাপ ওকে দেওয়া হলো—এবারও শব্দযন্ত্রী শুনতে পেলো এক কণ্ঠস্বর—যার প্রতিটী কথায় দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে যথার্থরূপে—"না, না, এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে না, হতে পারে না।" শেষ পরীক্ষায়ও ইলা সকলকে অবাক করে দিয়ে সফল হলো—সকলেই অবাক হলো তার মধ্যেকার জন্মগত প্রতিভার পরিচয় পেয়ে—"এমনি দরদ দিয়ে—আন্তরিকতা দিয়ে সে পারবে কমলাকে রূপ দিতে—নিশ্চয়ই পারবে।" নীতিনবাবু মন্তব্য করলেন। এর পর ইলা চলে এলো—কথা হল, কাল খবর পাবে।

তার পরদিন সকালেই সৌরেন সেনের এক চিঠি—"আমার চিঠি পেয়েই চলে এসো—মিঃ ব্যানার্জিও যেন আসেন।" আবার ছুটলো ইলা ষ্টুডিওর দিকে। গিয়ে শুনলো, সবাই তার নৈপুণ্যে একমত। কাজেই, তাকেই "কমলা"রূপে গ্রহণ করা হবে। তার নৈপুণ্যের বিনিময়ে সে পাবে মাসিক ২৫০৲ টাকা এবং এক বছর এই মাইনে পাবে। এর পর দু'বছর তাঁকে বিশ্রাম দেওয়া হবে, এর মধ্যে যদি আবার সে এই ষ্টুডিওতে সুযোগ পায় তো কথাই নেই—না পেলে সে তাঁর ইচ্ছা মত অন্য কোন ছবিতে সুযোগ নিতে পারবে। ইলা সানন্দে রাজী হলো—তাঁর এতদিনকার সহনশীলতার পুরস্কার হাতে পেয়ে সে আর কি হাতছাড়া করতে পারে! যে দুর্যোগময় দিন তার জীবনে এসেছে—তাকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে সে তো এমনি একটী আনন্দের দিনের অপেক্ষায়ই ছিল! এই দিনটী তাঁর জীবনের একটী আনন্দময় সম্পদ। তাঁকে প্রথমেই প্রধান নায়িকার ভূমিকা দেবার জন্য অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে বাধাও দিয়েছিলেন, কিন্তু নীতিনবাবু ও মুকুল বসু তাঁর মাঝে যে প্রতিভার জ্যোতি দেখেছিলেন—তাতেই তাঁরা তাঁর মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন—এই জ্যোতিঃকণাই যে একদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের মতো জলে উঠবে, এই ভবিষ্যৎ রূপ তাঁরা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। আর বুঝতে পেরেছিলেন নিউ থিয়েটার্সের সর্বময় কর্তা শ্রীযুক্ত বীরেন সরকার। এই মহাপ্রাণটির প্রতি অন্যান্য শিল্পী ও কর্মীদের মতই সে শ্রদ্ধাশীলা ও কৃতজ্ঞা।

তাঁদের এই অনুমান যে এতটুকু ভুল হয়নি—তা আমরাও সর্বান্তকরণে স্বীকার করবো। এই জ্যোতি এখন সত্যিই পরিপূর্ণ মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ সম্পাতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে প্রাণরসে। সেদিনকার ভীরু কম্পিত অভিনয় পরীক্ষার্থিনী ইলা এখন আমাদের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী। ইংরেজী ১৯৪১ সালে যে একদিন অভিনয়জগতে পা বাড়িয়েছিল—আজ সেখানে তাঁর আসন দর্শক সাধারণের প্রশংসাধন্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

কাশীনাথের "কমলা" রূপে সর্বপ্রথম চিত্র জগতে প্রবেশ করেই তিনি প্রথম ছবিতেই অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে
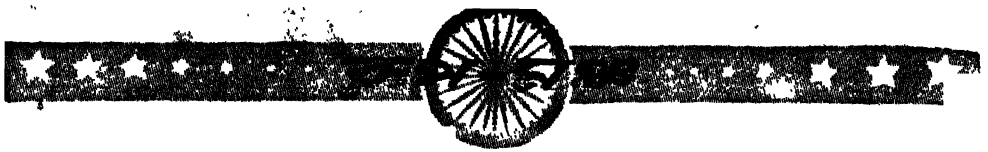
রসিকচিত্তে স্থায়ী আসন গড়ে তুলেছেন—তাঁর এই সিদ্ধির মূলে—সফলতারমূলে রয়েছে তাঁর মধ্যেকার সেই চিরন্তন আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা, যার জন্যে পূর্বজীবনের মহাসংকটময় কালও তিনি কাটিয়ে এসেছেন এমনি সাফল্য লাভ করে। অভিনেত্রী জীবনে তিনি সাতটী বছর কাটিয়েছেন—এর মাঝে আজ পর্যন্ত যতগুলি চরিত্র তিনি রূপায়িত করেছেন, তাতে একটী চরিত্রও ব্যর্থরূপ পায়নি। অধিকন্তু "দম্পতি"তে শাশ্বত নারীত্বের গৌরী-মূর্তি পতিপরায়না স্ত্রী. "দুই পুরুষের" আদর্শবাদী কল্যাণী, "বিরাজবৌ" ছবিতে সহ্নশীলা ক্ষমার প্রতিমূর্তি.বিরাজবৌ—আমাদের চোখের সামানে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে—মনে হয়, এরা বুঝি ঠিক এই রূপেই ছিল—এদের মনে হলে সুনন্দার মহিমাদীপ্ত চেহারাই ফুটে ওঠে অন্তরের মাঝে। এমনি ভাবে এই প্রতিভাময়ী সুনন্দা আমাদের অভিভূত করে তুলেছেন।

হ্যাঁ, সত্যিই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তাঁর বাড়ীতে বসে। তাঁরই মুখে এই অদ্ভুত জীবন কাহিনী শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি একজন প্রতিভাময়ী স্বনামধন্যা শিল্পীর সংগে কথা বলছি। মনে হচ্ছিল তাঁর সেই বধূমূর্তি—তাঁর জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনা যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ করছিলাম বসে বসে। সংগে আমার আরো দুজন সংগী ছিলেন—"রূপ-মঞ্চে"র সম্পাদক স্বয়ং এবং রূপ-মঞ্চ-র অন্যতম প্রতিনিধি স্নেহেন্দ্র গুপ্ত। সম্পাদক অনেক দিন ধরেই মাঝে মাঝে তাগিদ দিচ্ছিলেন—"কই বেতার-জগত তো দেখছি একরকম বয়কটই করেছেন—সংগে সংগে শিল্পী পরিক্রমাটাও বাদ দেবেন নাকি? এদিকে পাঠক-পাঠিকারা যে প্রশ্ন করছেন নানা ভাবে। কি করবেন বলুন তো?" উত্তর দিয়েছিলাম—সত্যি, বেতার জগতের ভূতের কচকচানিতে ওদিকটা সফর করতে বিতৃষ্ণা জাগে—এত বলার পরেও তো তাঁরা ধাতস্ত হয়ে আসছেন না—আমাকে শিল্পী পরিক্রমার ভারটাই দিন। তাঁদের শিল্প-জীবনের অন্তরালে যে সুখ দুঃখ জড়ানো একটী জীবন থাকে, তা আমরা ভুলেই যাই, সেই জীবনটাকে আমি আবার জেনে নেবো—জানাবোও সকলকে।" সম্পাদক বললেন—"তথাস্তু! তাহলে যথা-সময়ে তলব করবো।" যথাসময়ে তলব এলো—তলব শুনে খানিকটা ভয় পেলাম বৈকী! আবার ভালও লাগলো, সুনন্দা দেবীর সাথে সাক্ষাতের কথা শুনে। অভিনেত্রীদের মধ্যে এই শিল্পীটী আপনাদের মতো আমাকেও মুগ্ধ করেছেন—তাঁর মাঝে যে তেজোময় দীপ্ত ভাব আছে, তা আমাকে আরো বেশী আকৃষ্ট করে। চন্দ্রাবতীর পর সুনন্দা দেবীর মাঝেই আমি এই জিনিষটা খুঁজে পেয়েছি—তাই এই দুইজনেই আমার সবচেয়ে অধিক প্রিয় শিল্পী—এঁদের চেহারায় যে দীপ্তভাব, তা শুধু ভাল বাসা জাগায় না, একটুখানি শ্রদ্ধাও তাতে মেশানো থাকে—সুনন্দার চেহারায়, কথার ভংগীতে, চলাফেরায় একটা অতি সংযত ও শীলতাযুক্ত ভাবটাই আমাকে ওর দিকে বেশী আকৃষ্ট করে। তাই সুনন্দাদেবীর মত নামকরা শিল্পীর সম্বন্ধে কৌতূহলজনিত একটা ভয় হলেও, সম্পাদক তাঁর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার যে সুযোগ দিলেন, তাকে গ্রহণ করলাম—মনে মনে সম্পাদককে ধন্যবাদও দিলাম।

৮ই আগষ্ট। বেলা নয়টায় আমরা সুনন্দাদেবীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলাম—মাঝে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে প্রায় দশটাতে গিয়ে হাজির হলাম তাঁর বাড়ীতে। স্নেহেন্দ্র বাবু ছাড়া আমরা তাঁর বাড়ী চিনতাম না—সম্পাদক ও আমি গাড়ীতে রইলাম, স্নেহেন্দ্রবাবু খবর দিতে গেলেন—খানিক বাদেই দরজা খুলে দিয়ে হাসি মুখে এসে দাঁড়ালেন সুনন্দাদেবী স্বয়ং,—হাত দুটি জোড় করে—নমস্কারের ভংগীতে। আমরাও প্রতিনমস্কার করে ঘরে ঢুকলাম—নেহাৎ সাদাসিদে সাজানো ঘরটি—মনে হয়, যেন এটা আমাদেরই মত সাধারণ গৃহস্থবাড়ী—আসবাবের আধিক্য ও জৌলুষ স্থানটিকে ভারাক্রান্ত করেনি। সম্পাদক ও স্নেহেন্দ্র বাবু দুজনে দুটি চেয়ারে স্থান করে নিলেন—আমরা দুজনে একটি সোফায় বসে পড়লাম—সামনে ছোট একটী টেবিল নিলাম। কারণ, আলাপ আলোচনা আবার টুকে নিতে হবে তো! আমাদের আলোচনা ধীরে ধীরে আরম্ভ করলাম। ওকে বললাম,তাঁর জীবনের যে অধ্যায় আমাদের কাছে আজো ঢাকা,তাই বলে যেতে—তিনি আরম্ভ করলেন,

উদীয়মান অভিনেতা দীপক মুখোপাধ্যায়—
[illegible]নাথ বিশ্বাস প্রযোজিত 'ওরে যাত্রী'র প্রধান চরিত্রে

মহেন্দ্র গুপ্ত

নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও অভিনেতা—। স্বর্গ হ'তে বড়, কালিন্দী, রাজসিংহ, প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের বিভিন্ন রূপ-সজ্জায়।
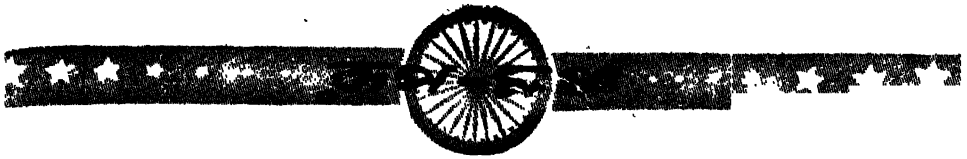
আমিও খাতা টেনে নিলাম। কিন্তু যখন তিনি তাঁর বধূ-জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যান আরম্ভ করলেন, আমি এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে,কলম ছেড়ে একমনে শুনতেই লাগলাম—ঘাত প্রতিঘাতের সংঘাতে ভরা এই জীবনকে তিনি যেভাবে বয়ে এনেছেন—তারই প্রভাবে এই দৃঢ়তার ছাপ তাঁর চেহারাতেও পরিস্ফুট—সম্পাদক ও স্নেহেন্দ্রবাবু দেখলাম আমার মতই একাগ্রচিত্তে তাঁর কাহিনী শুনছেন। সিনেমা জগতে আসার কথা পর্যন্ত বলে সুনন্দাদেবী বললেন, "এবার একটু বিশ্রাম করে নিন—তারপর আবার আর এক অধ্যায় সুরু করব।" আমি বললাম, "এত সুন্দর কাহিনী শুনতে কি বিশ্রামের প্রয়োজন হয়? আপনি বলুন—শেষ পর্যন্ত না শুনে কৌতূহল দমাতে পারব না।" হেসে বললেন—"একটু চা খেয়ে আবার সতেজ কৌতূহলে ভরে নিন মনটাকে—আপনার তো আবার লিখতেও হবে—দুটো কাজ তো আপনার, শোনা এবং লেখা।" বললাম—"এতে যে আনন্দ আছে, তাতে পরিশ্রমকে পরিশ্রম মনে হয় না।—আর এতো যেন জীবন নাট্যের অধ্যায় শুনছি নাট্যকারের কাছ থেকে।" যা হোক্—যথারীতি চা এবং খাবার এলে জলযোগ পর্ব সমাধা করে আবার আরম্ভ হলো আলোচনা পর্ব। এবারকার জীবনের সাথে আমরাও পরিচিত—ভবিষ্যতে তাঁকে আবার 'জয়যাত্রা', 'অঞ্জনগড়' হিন্দি ও বাংলাতে এবং 'সমাপিকা'তে আমরা দেখতে পাব। প্রথম দুটি পূজার পূর্বেই হয়ত মুক্তিলাভ করবে শেষেরটির চিত্রগ্রহণ এখনও চলছে।

এবার পরিক্রমার নিয়মানুযায়ী কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভার দিলাম সম্পাদককে—আমি উত্তরগুলো যথাযথ টুকে নিলাম। ষ্টুডিওর আবহাওয়া ভদ্রঘরের মেয়েদের উপযুক্ত কিনা প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,"এগুলি ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে—ষ্টুডিওর আবহাওয়া কলুষমুক্ত নয় কিন্তু শিল্পীরা যদি নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হন, তাহলে তাতে কোন প্রভাব পড়তে পারে না। এজন্য আমাদের শিল্পীদের মধ্যেই ব্যক্তিত্ববোধ ও আত্মসম্মান-বোধ জাগাতে হবে এবং এজন্য চাই তাঁদের উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে এই দুটি জিনিষ দান করতে পারে।"

সুনন্দাদেবী বলেন যে, তিনি এই পরিবেশে সকলের কাছ থেকে ভগিনীর স্নেহ পেয়ে এসেছেন—এর কারণ তিনি নিজে নিজেকে খেলো করেননি। কাজেই আবহাওয়ার কোন প্রতিক্রিয়াও তাঁর উপর হয়নি। অগ্রদূত শিল্প-গোষ্ঠীর কথা বলতে যেয়ে বলেন: ওদের সংগেত সে রকম পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু ওদের সংগে কাজ করে খুবই আনন্দ পাচ্ছি। আমি হচ্ছি ওদের সাত ভাইর 'চম্পা' বোন।"

নিজের অভিনীত চরিত্রের প্রত্যেকটি তাঁর খুব ভাল লেগেছে, তবে 'বিরাজ বৌ"-র সাথে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেকাংশে মিল রয়েছে বলে এই চরিত্রটি তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁর মনকেও দোলা দিয়েছিল। এই চরিত্রের অভিনয়ে তিনি যেন নিজেকে আবার খুঁজে পেয়েছিলেন। ভালও লেগেছে অভিনয় করতে। যে সব পরিচালকদের অধীনে তিনি অভিনয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে নীতিন বসুকে সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করেন। কিন্তু নীরেন লাহিড়ীর তত্ত্বাবধানে কাজ করতে তাঁর বেশী ভাল লাগে। অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ আসন পান ছবি বিশ্বাস আর অভিনেত্রীদের মধ্যে চন্দ্রাবতী। সুনন্দা দেবীর সংগীত-দক্ষতার সাথে আগেই আমাদের খানিকটা পরিচয় হয়েছে—তিনি এস্রাজ খুব ভালো বাজাতে পারেন—গানও জানেন, তবে ছবিতে একটাও তাঁর গান নয়। সব play back. তিনি এখনও সংগীত সাধনা করেন—বিমলা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে উচ্চাংগ সংগীত শিখতে আরম্ভ করেছেন। সংগীত পরিচালকদের মধ্যে তিনি রাইচাঁদ বড়ালের সংগীত প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করেন। সংগীত শিল্পীদের মধ্যে সুপ্রভা সরকার ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সুরেলা সুমিষ্ট স্বর তাঁকে তৃপ্তি এনে দেয়।

তাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো তর্ক করতে ভয়ানক ভালবাসেন—খেলাধুলা এবং ভয়ানক হৈ চৈর মধ্যে সময় কাটাতে তাঁর খুব ভাল লাগে। তাঁর অবসর সময় কাটে রান্না করে অথবা বই পড়ে। বাড়ীতে তিনি পাকা গৃহিনী এবং বাঙালী হিন্দু ঘরের প্রতিটী বৈশিষ্ট্যই তিনি বজায় রেখেছেন—অভিনেত্রী তিনি ঘরের বাইরে কিন্তু ঘরের মাঝে তিনি পুরোপুরি বাঙালী ঘরের চিরন্তন বধূ। তাঁর এই বধূরূপের
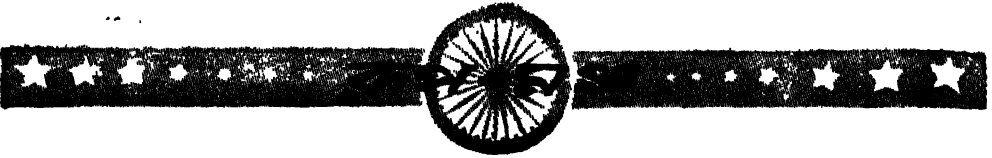
পরিচয় সেদিন যথেষ্ট পেয়েছি—আলাপ আলোচনার সময় মনে হয়েছে, একটি বধুর সংগে বন্ধুত্ব করছি যেন—বন্ধুত্বের সুর প্রতিটি কথায়—নিজের অভিনেত্রী জীবনের স্পর্শও তাতে ছিল না—নিজেকে জাহির করার কোন চেষ্টাও ছিল না তাঁর ব্যবহারে। তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে তাঁর নিজস্ব রূপ আমার কাছে স্বচ্ছ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে—কাজেই এই বন্ধুত্বের স্মৃতি কোনদিন একটুও ম্লান হবে না।

সুনন্দা দেবী আমাদের দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার সাথে সব সময় পরিচিত—প্রতিদিনকার খবরের কাগজের মধ্যে এই খবরটি তিনি সাগ্রহে পড়েন। নেতাজীর মতো উদ্দীনপামর নেতার আজ আমাদের প্রয়োজন—একথা তিনিও স্বীকার করেন। জহরলালের "Discovery of India" পড়ে তাঁর মনে হয়েছে,এরকম বই কি আর দ্বিতীয়টী হবে না? আমাদের অতীত কৃষ্টি, সভ্যতা ও সম্পদের সাথে যেন আবার নূতন যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে এই বইটীর মধ্য দিয়ে। আমাদের আসার সময়েই একটী হকার এসে খবরের কাগজ এবং একখানি "রূপ-মঞ্চ" দিয়ে গেল। বললাম—"রূপ-মঞ্চ সম্বন্ধে আমার আর জিজ্ঞাস্য কিছু নেই, তবু আপনার মুখে এর সমালোচনা শুনতে চাই।" সুনন্দা উত্তরে বলেন—"রূপ-মঞ্চের সমালোচনা রূপ-মঞ্চের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ্—সম্পাদকের দপ্তরের উত্তর—প্রশ্নের যথার্থ হয়। অবান্তর প্রশ্নের উত্তরে এমনি কঠোর উত্তরই দেওয়া দরকার।" এই সময়ে তিনি তাঁর প্রোডাকসন সম্বন্ধে একটি পাঠকের প্রশ্নের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, "এই পাঠকটি জানতে চেয়েছেন, তাঁর এই প্রোডাক্সনের অর্থ কি চোরা কারবারে প্রাপ্ত?" এর উত্তরে তিনি বলেন—এই প্রোডাক্সন তাঁর নামে হলেও এর মূলে তাঁর স্বামীর অর্থ এবং আর একজন বন্ধুর অর্থ রয়েছে। তাঁর স্বামী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় এখন গবর্ণমেণ্টের একজন contractor—প্রযোজনার অর্থ তাঁরই এবং তাঁরই উপার্জিত অর্থে তিনি বালিগঞ্জে নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করছেন। পরিচালিকা হতে চান কিনা, জিজ্ঞেস করলে, বলেন—"ততখানি স্পর্ধা আমার নেই। তবে প্রযোজনা ক্ষেত্রে আমি থাকবো।" তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি "দৃষ্টিদান" দর্শকদের কাছে সমাদর পেয়েছে—বর্তমানে তাঁর দ্বিতীয় চিত্র "সিংহদ্বারে"র মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। পরিচালক নীরেন লাহিড়ী চিত্রখানির পরিচালনার ভার নিয়েছেন নায়িকাও সুনন্দা দেবীই থাকবেন। তিনি তাঁর এই চিত্রে নূতন শিল্পী গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষিত শিক্ষিতাদের শিল্পী জীবনে প্রবেশ করার জন্য তাঁর উৎসাহও আছে যথেষ্ট।

তাঁর সংগে সমান ভাবে যে সন্তান দুটী দুঃখ ভোগ করেছে, তারা এখন কৈশোরের দিকে পা বাড়িয়েছে। ছেলেটীর বয়স এগারো, মেয়েটির নয়—পাটনা কনভেণ্টে থেকে পড়শুনা করে—মাঝে মাঝে মা বাবা তাদের গিয়ে দেখে আসেন। বর্তমান বাড়ীতে স্থানাভাবের জন্য তাদের এখানে রাখেন না—বদ্ধ আবহাওয়ায় তাদের প্রাণশক্তিকে তিনি ঝিমিয়ে পড়তে দিতে চান না। বালীগঞ্জে নিজস্ব বাড়ী তাই অনেকখানি খোলা জায়গা নিয়ে গড়ে তুলছেন—এই বাড়ী নির্মাণ শেষ হলেই সন্তানদের কাছে নিয়ে আসবেন। এদের ছাড়া কোন প্রকারে তাঁর দিন কাটছে। দুষ্টু ছেলেমেয়ের দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি, খেলা, গান প্রভৃতি হৈ চৈ না থাকলে বাড়ীকে প্রাণহীন বলেই মনে হয়।

সেদিনকার মত আলোচনা শেষ হলো। সুনন্দা দেবীর সেদিন আবার ষ্টুডিওতে সুটিং ছিলো—আমরা থাকতে থাকতে ফোনে একবার তাগাদাও এলো। কিন্তু আমাদের আলোচনা ছেড়ে যেতেও ইচ্ছে করছে না—অথচ প্রয়োজন তাগিদ দিচ্ছে—অগত্যা আমরাও উঠে দাঁড়ালাম। সেদিনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম—সুনন্দা দেবী দরজা পর্যন্ত এসে হাসিমুখে বিদায় জানালেন, 'আবার দেখা হবার আশা রাখি' বলে আমরাও বিদায় নিলাম।—মণিদীপা

শ্রীমতী মীরা মিশ্র

★

বনে-মাঠে—ধনীর সুরম্য উদ্যানে—দরিদ্রের কুটীর প্রাংগনে যেখানেই যে পুষ্পকোরক দেখা দিক না কেন, কেউ জানেনা—বলতে পারে না—তার পরিণতি কী? সযত্নে পূজারিণী যে পুষ্পবীথিকাকে আজ সিঞ্চিত করে তুলছে—ভবিষ্যতে যখন তার বৃন্তে বৃন্তে দেখা দেবে পুষ্পকোরক—সেগুলি যখন প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠবে—দেবতার অর্ঘ্যরচনায় অতি যত্নে পূজারিণী তুলে নেবে সেগুলি—সেই অর্ঘ্যরচনার স্বপ্নেই হয়ত সে বিভোর থাকে। কিন্তু তার সে স্বপ্ন যেমন শেষ মুহূর্তে ভেংগে যায়—তেমনি দেবতার পায়ে নিবেদিত হবার পুষ্পকোরকের সৌভাগ্যাকাশ ঘিরে শেষ মুহূর্তে দেখা দেয় কালো মেঘ। পুষ্পগুলি হয়ত দেবতার পায়ে নিবেদিত হবার সুযোগ পায় না—কোন বিলাসিনী নারীর কবরীর শোভাবর্ধন করে সেগুলি হয়ত কামনালুব্ধ পুরুষের চোখে মরিচীকা সৃষ্টির কাজেই নিয়োজিত থাকে। আবার ধনীর প্রমোদ্যানে সতর্ক দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিলাসিনী নারীর শোভাবর্ধনের জ্বালা নিয়ে যে পুষ্পকোরককে প্রস্ফুটিত হ'য়ে উঠতে হয়—শেষ মুহূর্তে ধরিত্রীর বুকে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধন্য হ'য়ে ওঠে—অথবা কোন চঞ্চলা কিশোরী পবিত্র বালার চঞ্চল বেণী যুগলের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনটাও ঠিক এমনি। কেউ জানে না—বলতে পারে না—কোন সীমারেখার মাঝখান দিয়ে কোন জীবন পরিণতি লাভ করবে। বাল্যের অনিশ্চয়তায় যে অস্পষ্ট রেখা ভেসে ওঠে—কৈশোরের চাপল্যে সে অস্পষ্টতা অন্তরূপ নিয়েই হয়ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যৌবনের দীপ্ত তেজে সে রেখা আরো স্পষ্ট ও গভীর হ'য়ে দেখা দিলেও—প্রৌঢ় ও বার্ধক্যে তার গতিবেগ নতুন পথ ধরে ছুটে চললেও আশ্চর্যের কিছু নেই। শ্রীমতী মীরা মিশ্রের জীবনেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখতে পাই না। রূপোর চামচে মুখে করে মীরা জন্মগ্রহণ করে—সম্পদ ও অত্যধিক আহ্লাদের মাঝে দোল খেয়ে জীবনের তেরটি বছর কাটিয়ে দেয় পিতৃগৃহে—কৈশোর ও যৌবনের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে—সলজ্জ ঘোমটার ভিতর দিয়ে যে জীবন-সংগীর সংগে তার মুখোমুখী হ'ল—তিনি যেমনি বিদ্যান, তেমনি উচ্চ পদ-মর্যাদায় আসীন—তেমনি বিচক্ষণ ও রাসভারী। আই, সি, এস, স্বামীর আই, সি, এস পরিবেশের মাঝে নিজেকে মানিয়ে চলবার প্রস্তুতিতে মীরার আত্মনিয়োগ করতে হ'ল বিবাহিত জীবনের সুরু থেকেই। আত্মনিয়োগ থেকে সাধনা বল্লেই হয়ত ভাল হবে। গ্যাট গ্যাট করে চলা—ফড় ফড় করে কথা বলা—দোদুল্যমানা বেণী ও শাড়ীর চমকে গমকে ধাঁধাঁ সৃষ্টি করা—মসলিজ ও পার্টি: পোষাক পরিচ্ছদ ও কথাবার্তায় ঝলমলিয়ে তোলা—এমনি কত কী! কিন্তু শেষ পর্যন্ত অকস্মাৎ— সম্পূর্ণ অকল্পিত এক জগতের হাত ছানিতে মীরা সাড়া না দিয়ে পারলো না। কোনদিন ভাবতেও পারেনি মীরা যে, সে একদিন অভিনেত্রী হ'য়ে উঠবে। ভাবতেও পারেনি বলে মীরা তাঁর অভিনেত্রী জীবনকে—পারিবারিক জীবন থেকে কম ভালবাসে না—পারিবারিক জীবনের হাসি-কান্নাকে যেমনি ভাবে মীরা গ্রহণ করেছে—অভিনয় জীবনের সুখ-দুঃখকেও তেমনি সমান ভাবে মাথা পেতে মীরা গ্রহণ করেছে।

১৯২৪ সালের জুন মাস। কানপুরের এক সম্ভ্রান্ত প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারে—শ্রীমতী মীরা জন্ম গ্রহণ করে। মীরার পিতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র রায় তখন সেখানে একটি বিলেতি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টার পদে বহাল ছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের এরূপ দায়িত্ব পূর্ণ পদে নিযুক্ত হবার গৌরব বাঙ্গালীর ভিতর শ্রীযুক্ত রায়ই সর্বপ্রথম লাভ করেন। শ্রীযুক্ত রায় তাঁর পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা স্বর্গতঃ রায়বাহাদুর গগন চন্দ্র রায় প্রবাসী বাঙ্গালীদের ভিতর খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল এবং স্বামীজি তাঁর জীবনীতে স্বর্গতঃ রায়ের কথা উল্লেখ করে গেছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈদেশিক পর্যবেক্ষক মিঃ রিভেল্ট কারনেস (Rivelt Carnace) তাঁর "Memoris of India" বইতেও স্বর্গতঃ রায়ের কথা একাধিক স্থানে উল্লেখ করে গেছেন। এই রায় পরিবারের আদি বাসস্থান বাঁকুড়া

জেলার লোকপুর-এ। এ অঞ্চলে রায় পরিবারের বেশ খানিকটা জমিদারীও রয়েছে। দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকা সত্ত্বেও দেশের সংগে রায় পরিবারের যোগসূত্র আজও ছিন্ন হয় নি। কানপুরে শ্রীমতী মিশ্রকে বেশীদিন কাটাতে হয় না। পশ্চিমেরই আর একটি সহরে তাঁর বাল্য ও কৈশোরের দিনগুলি কেটে যেতে থাকে। খুব ছোট বয়সে মীরা খুব শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল—টানা টানা চোখ—কোঁকড়ান চুল—আর ঢল ঢলে মুখ দেখে কেউ ওকে আদর না করে পারতো না। ওকে কোলে নিয়ে—কাঁধে নিয়ে—পিঠে চড়িয়ে—উঁচুতে তুলে ধরে—নানান জনে নানান ভাবে আদর করতো—আর ও প্রাণ ভরে নির্বিবাদে সে আদর গ্রহণ করতো। কিন্তু একটু একটু করে বড় হবার সংগে সংগে ওর মেজাজও বিগড়ে যেতে লাগলো। তখন যে কেউ ওকে আদর করতে আসতো, ও মুখ ঘুরিয়ে ছুট দিত। কারোর কোন কথাই যেন মীরার গায়ে সইতো না। খিট খিটে মেজাজ—কোন ভাল কথা শুনলেও খিঁচিয়ে উঠতো। বাড়ীতে বহু লোকজন আসতেন—মীরার বাবার কাছে ও অন্যান্য পরিজনবর্গের কাছে। তাঁরাও যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করতেন—মুখ খিঁচিয়ে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেত মীরা। একদিন ওর বাবার এক বন্ধু এলেন বাড়ীতে। চাকর বাকর বা বাড়ীর আর কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি মীরাকেই অনুনয় করে জিজ্ঞাসা করেন: "মীরা মাইই, দেখোত তোমার বাবা বাড়ী আছেন কি না!" মীরা মারমুখো হ'য়ে ওর বাবার বন্ধুকে জবাব দিয়ে দিল: আমি কারোর মাই-ই নই—বাবা বাড়ীতে আছেন কিনা আমি জানি না! দরকার থাকেত দেখে নিন না! হয়ত আছেন বাড়ীর ভিতর। যান খুজে নিন." ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হ'য়ে উত্তর দেন: আচ্ছা—খুঁজেই নিচ্ছি।" কেউ হয়ত জামাটা ধরে জিজ্ঞাসা করেন: বা খুকু, তোমার জামাটাত বেশ! দেবে আমায়!"

মীরা অমনি একটানে জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে উত্তর দেয়: যান, আপনাকে ভাল বলতে হবে না! বাজারে পাওয়া যায়—দরকার থাকেত টাকা দিয়ে কিনে নেন গে!" একটু একটু করে বড় হবার সংগে সংগে মীরাকে কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে এমনি করেই উত্তর পেতেন। অবশ্য এজন্য মীরাও সম্পূর্ণ দায়ী ছিল না। এই বয়স থেকেই অসুখে ভুগতে ভুগতে তার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল। তবু এরই মধ্য দিয়ে মীরার কৈশোরের দিনগুলি পশ্চিমের সহরে কেটে যেতে লাগলো—সংগে সংগে পড়াশুনাও করতে থাকে।

মীরার তখন তেরো কী চৌদ্দ বছর বয়স হবে। চেলি পরে ঘোমটা টেনে তাকে স্বামীর ঘর করতে যেতে হ'লো। আই, সি, এস স্বামী—কৃপাসিন্ধু মিশ্র নাম—যেমনি বুদ্ধিমান—তেমনি বিচক্ষণ। আর এদিকে মীরা শুধু বয়সের দিক থেকেই নয়, মনের দিক থেকেও অনেক কাঁচা। বলতে গেলে মীরার সত্যকার জীবন সুরু হ'ল এখন থেকেই।

প্রথম প্রথম-ত স্বামীর ঘরে এসে একদম হাঁপিয়েই উঠলো মীরা। পিতৃগৃহে অসংখ্য পরিজনের ভিতর মীরা লালিত পালিত হ'য়েছে- স্বামীগৃহে তার বিপরীত পরিস্থিতির মাঝে নিজেকে কিছুতেই আর খাপ খাইয়ে নিতে পারে না মীরা। এখানে লোকজনের ভিতর একমাত্র তাঁর স্বামী ও চাকর-বাকর। স্বামী অফিসে চলে গেলে কথা বলারও একজন লোক পায় না মীরা। একা একা দু'চোখ বেয়ে তাঁর জল আসে। পড়াশুনায়ও মন বসতে চায় না।

বিয়ে হবার পর স্বামীর ঘরে যখন মীরা প্রথম এলো—তখন তার খুব গর্ব হ'তো। এই যে ঘর—এই যে আসবাব পত্র-এর সর্বময়ী কর্ত্রী আমি—বাঃ কিনা মজা! আবার ভয়ও হ'তো কোন জিনিষপত্র ব্যবহার করতে। কী জানি, স্বামী যদি রাগ করেন! কোন একটা জিনিষ ধরতে যেয়ে ভয় এবং সংকোচে রেখে দিয়ে চলে আসে। স্বামীকে সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করে: আমি অমুক জিনিষটি নিতে পারি কি?" স্বামী অবাক হ'য়ে হেসে উত্তর দেন: তা আবার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে নাকি? সব—সব—সব জিনিষই তোমার। যেমন খুশী ব্যবহার করতে পারবে।" মীরা ভারি খুশী হয়।

স্বামীর কাছ থেকে কোন দিন কোন রূঢ় কথা মীরাকে শুনতে হয় নি। তবু যদি কোনদিন স্বামী হেসে কথা
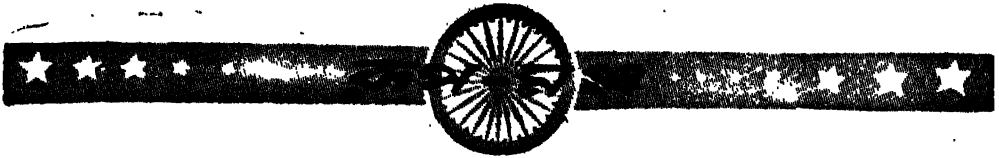
না বলতেন, অভিমানে ফেটে পড়তো মীরা। আর নির্জনে বসে চোখের জলে কাপড় ভিজিয়ে দিত। স্বামী জানতে পেরে সান্ত্বনা দিয়ে প্রকৃতস্থ করে তুলতেন এবং কোন দিন এমন কোন কথা মীরাকে বলতেন না—যাতে অভিমানী স্ত্রীর চোখ সজল হ'য়ে উঠতো। মীরার স্বামী বাংলা, বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। অবসর সময় তাঁর কাটতো কেবল পড়াশুনার ভিতর দিয়ে। স্ত্রীকেও বই পড়ে সময় কাটাতে বলতেন। প্রায়ই মীরাকে লক্ষ্য করে তিনি বলতেন: বই পড়া অভ্যাস কর—বইর মত বন্ধু আর নেই।" স্বামী ভাল ভাল বই এনে দিতেন। সেগুলির প্রতি মীরার আগ্রহ দেখা যেত না। কোথাকার কোন রহস্যমূলক সস্তা উপন্যাস—ভূতুরে গল্পের বই—ভ্রমণ কাহিনী—তিব্বত ফেরতা তান্ত্রিকের অলৌকিক কাহিনী—এই গুলি নিয়েই মীরা মেতে থাকতো। স্বামীও নাছোড়-বান্দা। ধীরে ধীরে এগুলি থেকে—প্রকৃত সাহিত্যের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের দিকে মীরার মন তিনি আকৃষ্ট করতে লাগলেন।

একদিন মীরার স্বামী নিজে একখানা ভাল নামকরা বই পড়তে নিয়ে মীরাকেও একখানা বেছে দিলেন। স্বামীত নিবিষ্ট মনে পড়ে চলেছেন। মীরার চোখই বইয়ের পাতায়। মনটা ঘুরতে লাগলো এখানে সেখানে। কিছুক্ষণ বাদে মীরার চোখও বইয়ের পাতা থেকে যেয়ে পড়লো—দূরে এক উন্মুক্ত প্রাংগনে—যেখানে তার সমবয়সী ছেলে মেয়েরা খেলায় মত্ত ছিল। স্বামী আড়চোখে দেখে নিলেন একবার। তারপর একটু মুচকি হেসে মীরাকে বল্লেন: যাও না তুমি, একটু বেড়িয়েই এসো না। আমি শেষ করেনি বইটা ততক্ষণ।" মীরা তক্ষুণি এক ছুট! খুশীর মেজাজে সমবয়সীদের সংগে যেয়ে মিশে পড়লো। এর পর থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে মীরাকে উপযুক্তা করে গড়ে তুলতে লাগলেন তাঁর স্বামী। মীরারও সব বিষয়ে আগ্রহ দেখা যেতে লাগলো। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে নিল: না, স্বামীর ইচ্ছানুগত নিজেকে নিখুঁত ভাবে গড়ে নিতেই হবে। এখনত আর আমি আগের মত ছেলেমানুষটি নই।" মীরা পড়াশুনায় মনোনিবেশ করলো। বাংলা ও ইংরেজী সাহিত্যের সেরা সেরা বইগুলি পড়ে ফেল্লে। দৈনিক খবরের কাজটি না হ'লে তার চলে না। সাঁতার শিখলো—ঘোড়ায় চড়া শিখলো—মটর চালানো শিখলো—শিখলো শিকার করতে—শিখে নিল অংকন শিল্পটি। অবসর সময়ে বই পড়ে অথবা ছবি আঁকে। আর শিখে নিল আই, সি, এস, মহলে মিশবার চলন ধরণ গুলি। "Perfect Society Lady" যাকে বলে, মীরা তাই হ'য়ে উঠলো। তার এই সাধনা চলে দীর্ঘ সাত আট বছর ধরে। এর মাঝে দু'টি নতুন অতিথি এসে ওদের বিবাহিত জীবনকে মধুরতর করে তুললো। এই নতুন অতিথি দু'জনের একজন ওদের ছেলে আর একজন মেয়ে। এই ক'বছরে স্বামীর সংগে ভারতের বিভিন্ন স্থান মীরা ঘুরে বেড়ালো—বহু অভিজ্ঞতা অর্জন করলো।

সাংসারিক জীবনের সংগে সংগে এবার মীরার আর একটি নতুন জীবন সুরু হ'লো—সেটি হচ্ছে অভিনেত্রী জীবন। স্বামীর সম্মতি এবং আগ্রহেই মীরা অভিনেত্রী জীবনের হাতছানিতে সাড়া দিল—নইলে অভিনেত্রী হবার আকাঙ্খা কোন দিনই তার ছিল না। যে পরিবেশের মাঝে সে বর্দ্ধিতা—এরূপ জীবনের কল্পনাও তার মনে কোন দিনই উঁকি মারে নি। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত ভাবেই এই ঘটনা ঘটে গেল। তবে যেটুকু সম্মতি মীরার দিক থেকে ছিল, তার মূলে কিছুটা ইতিহাস আছে। বম্বে টকিজ কবিগুরুর 'নৌকাডুবি' চিত্ররূপায়িত করবেন বলে ঘোষণা করলেন। পরিচালনার দায়িত্ব দেবার জন্য বাংলা থেকে নেওয়া হ'লো প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও পরিচালক নীতিন বসুকে। নৌকাডুবির বিভিন্ন চরিত্রের জন্য বম্বে টকিজের প্রতিনিধি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর অনুসন্ধান করে বেড়াতে লাগলেন। মীরা ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের কানেও কথাটা গেল। ওরা সবাই উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন 'নৌকা-ডুবি'র চিত্ররূপ দেখবার জন্য। কারণ, নৌকাডুবির সংগে ওদের অতীতের অনেক কথাই যে জড়িয়ে আছে। ওর নায়ক নায়িকা—ওর পরিবেশ—অনেক কিছুই যে ওদের পরিচিত 'নৌকাডুবি'র অংকুর থেকেই। কবিগুরু গাজীপুর সহরে ওদের বাড়ীতে বসেই যে নৌকাডুবি লেখেন। চিত্ররূপায়িত হবার কথা শুনেই 'নৌকাডুবি'কে
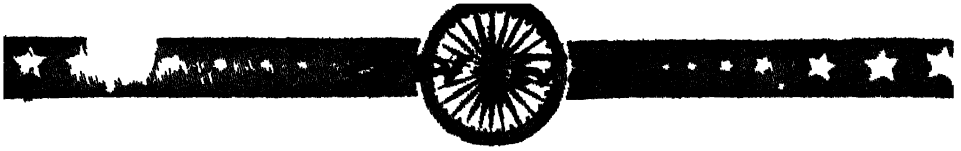
নিয়ে ওরা নিজেদের ভিতর নানান জল্পনা কল্পনা করতে থাকে। আচ্ছা, অমুক চরিত্রটি কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে মানাবে ভাল—অমুককে—না অমুককে। কিন্তু পারবে কি? ধ্যাৎ, অমন চরিত্র নষ্ট করে দেবে যে! মীরা মনে মনে ভাবে: আমিই নেমে যাবো নাকি কোন একটা চরিত্রে। নেমেই যাবো। তাই ভালো।" ও ছুটে গিয়ে স্বামীকে বলে: কি বলো, নেমে যাবো নৌকাড়ুবিতে?" স্বামী উত্তর দেন: আমারত খুবই ইচ্ছা আছে—যদি পারো দোষ কী। আমি খুশী মনেই মত দিচ্ছি।"

মীরা বম্বে টকিজের সংগে চুক্তিবদ্ধা হ'য়ে গেল। নৌকাড়ুবি চিত্রে অন্যতমা নায়িকার ভূমিকায় সর্বপ্রথম সে চিত্রামোদী-দের অভিবাদন জানায়। তাঁর অভিনয় সর্বশ্রেণীর দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ প্রংশসা অর্জন করলো। হিন্দি ও বাংলা উভয় সংস্করণেই মীরা অভিনয় করে—ভারতের সর্বশ্রেণীর দর্শকের মন জুড়ে নিল। নৌকাড়ুবি মুক্তিলাভের পর ওর অভিনয় স্বীকৃতিও যেমনি পেল, আবার ওকে নিয়ে আলো চনাও কম হ'তে লাগলো না। কেউ কেউ বলতে লাগলেন: অভিনয়ত ভালই করেছে, সম্ভাবনাও যথেষ্ট রয়েছে—কিন্তু কথা হচ্ছে, এঁকি আর স্থায়ী ভাবে চিত্র জগতে থাকবে। আই, সি, এস এর স্ত্রী, সখ হয়েছিল—নেমে গেল। পেশাদারী অভিনেত্রী-জীবন গ্রহণ করতে যাবে কেন? 'নৌকাড়ুবি' চিত্রের কাজ শেষ করে মীরা দিল্লীতে চলে আসে। তাঁর স্বামী তখন দিল্লীর যানবাহন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী। মীরা আবার সাংসারিক জীবন নিয়ে মেতে গেল পুরোদমে। আবার যে তাঁকে অভিনয় করতে হবে এমন কোন কিছু মনেও উঁকি মারেনি। দিল্লী থেকে ওরা স্বামী স্ত্রী একবার কলকাতায় বেড়াতে এলো। এবারও ঠিক অবাচিত্ত এবং অকস্মাৎ সুযোগ এলো। এসোসিয়েটেড পিকচার্স প্রযোজিত 'সব্যসাচী' (পথের দাবীর হিন্দি সংস্করণ) চিত্রে সুমিত্রার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য ও চুক্তিবদ্ধা হ'য়ে গেল। আবার স্বামীর সংগে ফিরে গেল দিল্লীতে। কয়েকদিন বেশ কাটলো। কিন্তু দিল্লীতে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে। মানুষের পশু প্রবৃত্তি বিকট রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। সবাই সংকিত। সবাই চিন্তিত। একী বীভৎস রূপ মানুষের। হৃদয় নিয়ে অহেতুক একী ছিনিমিনি খেলা। এযুগের মহামানব মহাত্মা গান্ধী বার বার এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি থেকে মানুষকে নিবৃত্ত হতে বলছেন: গেল গেল, সব রসাতলে গেল—। কিন্তু সে মহাবাণী পশু শক্তি শুনতে রাজী নয়। ধ্বংস যখন আসে, তখন হয়ত এমনি আত্মঘাতী কার্যে মানুষ লিপ্ত হয়। কত নিষ্পাপ প্রাণ পশুশক্তির নিষ্পেষণে নষ্ট হ'য়ে গেল—কত মহামূল্য জীবন অকালে ঝরে গেল সমাজের মহাক্ষতি করে। কত জীবন তরু নির্মূল হ'য়ে গেল—কত জীবনের সামনে মরু-ভূমির ধূসরতা রেখে। শ্রীমতী মীরা মিশ্রকেও এই অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হ'লো। স্বামী তাঁর বিশেষ কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় নিহত হ'লেন। বজ্রাঘাতের মত স্বামীর এই মৃত্যু-সংবাদ মীরাকে দিশেহারা করে ফেললো। যাঁকে আশ্রয় করে সে মঞ্জরিত হ'য়ে উঠেছিল—কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ায় তার সব ক'টি মঞ্জরীই অকস্মাৎ ঝরে গেল। এতবড় আঘাতের জন্য মীরা কোন সময়েই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু আঘাত তাঁকে মেনে নিতেই হ'লো। আঘাতের ব্যথায় তাঁকে মুসড়ে পড়লে চলবে কেন? তাঁর শিশু দু'টীর মুখ চেয়ে সব কিছুই যে তাঁকে সহ্য করতে হবে। জীবন মরুর ওরাই যে আজ মীরার এক-মাত্র আশ্রয় স্থল। ওদের মানুষ করতে হবে। বাপের মতই বড় করে তুলতে হবে ওদের। কষ্ট হলেও মীরা নিজেকে সামলে নেয়।

অভিনেত্রী জীবনকেই সে পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ করলো। সব্যসাচীর কাজ শেষ করে মীরা রূপলেখা পিকচার্সের সংগে চুক্তিবদ্ধা হ'য়ে পড়ে। তাঁদের 'আবর্ত'র নায়িকার ভূমিকাভিনয় সম্প্রতি মীরা শেষ করেছে। বর্তমানে আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সংগে চুক্তিবদ্ধা হ'য়ে পড়েছে এবং 'বাপুনে কহাথা' চিত্রে অভিনয় কচ্ছে। অভিনয় ছাড়াও নিজস্ব প্রযোজক ও পরিবেশক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার পরিকল্পনা মীরার আছে। সুযোগ পেলেই সে এবিষয়ে অগ্রসর হবে। অভিনেত্রী জীবনকে পুরোপুরি গ্রহণ করেও

শ্রীমতী কানন দেবী

এম, পি, প্রডাকসন্সের 'বাঁকা-লেখা'

চিত্রে দেখা যাবে।——————।

শ্রীমতী মঞ্জুলিকা দেবী

চিত্র ও নাট্যে ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করে খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং 'এযুগের মেয়ে' চিত্রে অন্যতমা নায়িকার ভূমিকায় দর্শকসাধারণকে অভিবাদন জানাবেন।
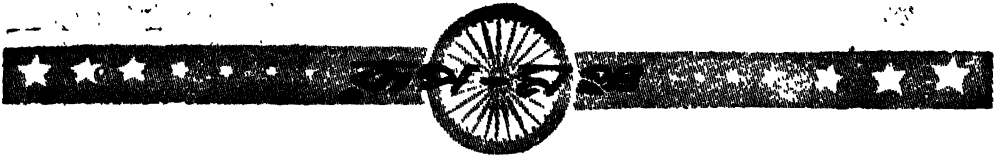
সাংসারিক জীবনের মাধুর্যকে মীরা ভুলতে পারে না। সাংসারিক জীবনের প্রতিটি খুঁটি নাটিই তাঁর কাছে খুবই প্রিয়। কাজের ফাঁকে ছেলেমেয়ে ও আত্মীয় স্বজন পরিবৃতা হয়ে পারিবারিক আলোচনায় কাটিয়ে দিতে মীরার উৎসাহ আগের মতই রয়েছে। বরং ছেলে ও মেয়েকে ঘিরে তার কর্মব্যস্ততা যেন আরো বেড়েছে। কখনও তাঁদের একবেশে সাজিয়ে দিচ্ছে আবার ভাল লাগছে না বলে একটু বাদেই পালটে দিচ্ছে। ঘরোয়া প্রতিটি খুঁটি নাটি বিষয় যেমনি মীরা মন প্রাণ ঢেলে করতে ভালবাসে—তেমনি ভালবাসে ষ্টুডিওর প্রতিটি কাজকর্ম। যখন কোন চরিত্রের রূপসজ্জা নিয়ে মীরা অভিনয়ের জন্য তৈরী হ'য়ে নেয়—উক্ত চরিত্রটির বাইরে তার অস্তিত্বকে অভিনয়ের সময় কোন মতেই মীরা আমল দেয় না। সে নিজেই চরিত্রটির কাছে আত্মসমর্পণ করে সম্পূর্ণভাবে।

গত ১লা আগষ্ট, রবিবার, সন্ধ্যা ছটায়, শ্রীমন বাহাদুর পুষ্পকেতু মণ্ডলকে সংগে নিয়ে শ্রীমতী মিশ্রের মুর এ্যাভিনিউ-স্থিত বাসাবাড়ীতে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী উপস্থিত হই। শ্রীমতী 'মিশ্র অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর ড্রইংরুমে নিয়ে গেলেন। মিষ্টিমুখ ও চা পানান্তে আমাদের আলোচনা সুরু হয়। আধুনিক আসবাব পত্রে ড্রইংরুমটি সুসজ্জিত—কবিগুরু, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মনীষীদের কয়েকখানা প্রতিকৃতি ঘরখানির মর্যাদা অনেকাংশে বৃদ্ধি করেছে। কয়েকটি স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনও অতি যত্নে এক একটী কোণে সংরক্ষণ করা হ'য়েছে আর রয়েছে একটি দেয়ালে শ্রীমতী মিশ্রের বিভিন্ন ভংগীমার কয়েকখানা প্রতিকৃতি। শ্রীমতী মিশ্রের জীবনের খুঁটি নাটি কয়েকটি বিষয় জেনে নেবার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: চিত্রজগতের বর্তমান আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শ্রীমতী মিশ্র বলেন: আগে যেরকম শুনতুম—তার চেয়ে যে অনেক উন্নতি হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর বাইরে থেকে যতখানি শোনা যায়, ভিতরে এলে যে কেউই বুঝতে পারবেন, ততখানি খারাপ কিছুই নয়। তবু এর এখনও সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে বৈকী? বহু শিক্ষিত ও শিক্ষিতারা আজকাল এই শিল্পে যোগদান করেছেন—প্রয়োগশালায় তাঁদের আনাগোনা পূর্বের চেয়ে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে—। এঁদের রুচি ও শিক্ষার ওপর ষ্টুডিও পরিবেশের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। তাই প্রয়োগশালায় যত বেশী সংখ্যক শিক্ষিত ও রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আগমন হবে, এর পরিস্থিতিও সংগে সংগে উন্নততর হ'য়ে উঠবে।"

নতুনদের কথা প্রসংগে শ্রীমতী মিশ্র বলেন: নতুনদের পথ আজকাল অনেকটা সুগম হ'য়েছে। চিত্রশিল্পের প্রতি শিক্ষিত সমাজের আগ্রহও দেখা যাচ্ছে যথেষ্ট। এঁরা যে সমগ্রভাবে চিত্রশিল্পের উন্নতির পরিকল্পনা নিয়েই আত্মনিয়োগ করেছেন, তা নয়। এঁদের অনেকে এসেছেন অর্থের প্রলোভনে—কেউ বা নিছক সখের তাগিদে—কেউ বা অভাবের তাড়নায়। যে তাগিদেই যিনি এসে থাকুন না কেন—তাঁরা যদি অন্ততঃ এইটুকু মনে রাখেন যে, তাঁদের উপর শিল্পের উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে এবং সেই মত যদি চিন্তা ভাবনা করেন, তাহ'লে শিল্পের সংগে সংগে তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্যও সাধিত হবে বৈকী?"

চিত্রশিল্পের সামাজিক মর্যাদার কথা বলতে যেয়ে শ্রীমতী মিশ্র বলেন: অন্যান্য দেশের তুলনায় চলচ্চিত্র শিল্প আমাদের দেশে সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে এখনও তেমনি মর্যাদা লাভ করতে পারেনি—এজন্য চলচ্চিত্র শিল্পের সংগে জড়িত প্রত্যেক শিল্পী, কর্মী ও বিশেষজ্ঞদেরই সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে। সকলের সমবেত চেষ্টায় সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে চলচ্চিত্র শিল্পকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলতে হবে।

চলচ্চিত্রের শিল্পী, বিশেষজ্ঞ ও কর্মীদের উদ্দেশ্য করে শ্রীমতী মিশ্র বলেন: পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতি খুব কমই অনুভূত হয়—বরং ঈর্ষার ভাবটাই পরিলক্ষিত হয় বেশী। এর আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।" শিল্পীদের, বিশেষ করে অভিনেত্রীদের সম্পর্কে মীরা মিশ্র বলেন: দেহচর্চার দিকে এঁরা কেউই দৃষ্টি দেন না। এতে নিজেদের শিল্প-জীবনের অন্ততঃ দশ বছর পরমায়ু নষ্ট করেন। আজ যাঁকে তন্বী বলে দেখা যায়, দু' তিন বছর বাদে তাঁর দেহের স্থুলতা দর্শকদের যথেষ্ট পীড়ার উদ্রেক করে। এজন্য
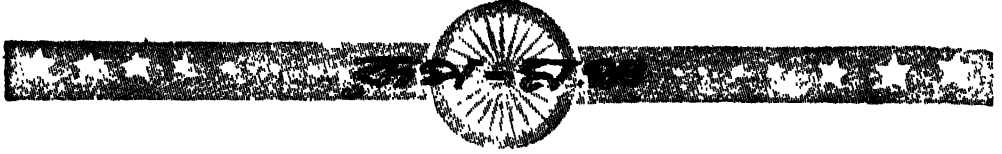
নিয়মিত ব্যায়াম করা প্রয়োজন। ষ্টুডিওতে শিল্পীদের নানান অসুবিধা ভোগ করতে হয়—এই অসুবিধাগুলির ভিতর অবসর সময়ে পুস্তকাদি পড়ে সময় কাটানোর কোন ব্যবস্থা নেই বলে শ্রীমতী মিশ্র এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। ষ্টুডিওতে এমন কোন বিশ্রামাগার থাকার প্রয়োজন, যেখানে দৃশ্য গ্রহণের ফাঁকে শিল্পীরা মিলিত হ'তে পারেন—পরস্পরে গল্পগুজব করে সময়ের ব্যবধান টুকু কাটিয়ে দিতে পারেন। এখানকার প্রয়োগশালাগুলির রূপসজ্জাগার সম্পর্কেও শ্রীমতী মিশ্র অভিযোগ করেন। তিনি বলেন: এগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত।" অভিনেত্রী জীবনে শ্রীমতী মিশ্র যে কয়জন শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের ভিতর শ্রীমতী কাননের ভূয়সী প্রসংসা করেন। শ্রীমতী কাননের অমায়িক ব্যবহার এবং শিল্প-জীবনের বাইরে ব্যক্তিগতভাবেও তাঁর সহজ ও সরল জীবন ধারা তাঁকে খুবই মুগ্ধ করে।

বেলা সাড়ে ছটা থেকে রাত দশটা অবধি আমাদের এই আলোচনা চলে। শ্রীমতী মিশ্রের সংগে পরিচিত হবার পূর্বে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক কথাই কানে এসেছিল। বিশেষ করে আই, সি, এস-এর স্ত্রীর দাম্ভিকতা ও জীবনের জটিলতা সম্পর্কে যথেষ্ট বিরুদ্ধ মনোভাব গড়ে উঠে-ছিল। আলোচনা শেষ হবার পর এই বিরুদ্ধ মনোভাবের কথা ব্যক্ত করে বলে এলাম—যে মনোভাব নিয়ে এসেছিলাম, তার বিরুদ্ধ ধারণাই আপনার সম্পর্কে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। আপনার সংগে আলাপ না হ'লে আপনার সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবই থেকে যেত—আর তাতে আপনার উপর যথেষ্ট অবিচার করা হ'তো।" শ্রীমতী মিশ্র হেসে বল্লেন: এজন্য আমিই বেশী কৃতজ্ঞ—আর নিজের দিক থেকে কষ্ট করে আসার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সংগে 'রূপ-মঞ্চে'র পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও আমার অভিনন্দন পৌছে দেবেন—কারণ, শুধু শিল্পী হিসাবেই নয় —আমিও তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত, তাই।" আমরা সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম।

—শ্রীপার্থিব

শ্রীদীপক মুখোপাধ্যায়

★

ধাপ্পা দিয়েই সেদিন একরকম ধরে আনা হয়েছিল দীপক মুখোপাধ্যায়কে রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের বাড়ীতে। তাঁর দাপটে বাড়ীতে টেকা দায়। পানটা থেকে চুনটুকু খসলে আর উপায় নেই। অমনি বাবুর তর্জন গর্জনে সকলের তটস্থ হ'য়ে উঠতে হবে। এতই গম্ভীর চালের লোকটী যে, ছোট বড় কেউই তাঁর কাছ ঘেসতে সাহস করেন না যখন তখন। তাঁর মেজাজ মত চলতে হবে সবাইকে। অথচ এই মেজাজেরও ঠিক থাকেনা সব সময়। মেজাজটা আগে থেকে আঁচ করে নিয়ে সকলকে কথা বলতে হবে। মা হয়ত জিজ্ঞাসা করলেন : কানু, ভাত দেব !' ওরে বাবা, ধপ করে জ্বলে উঠলেন তিনি : না, যাও। খাবো না এখন।' আবার মা যেদিন ভাত খাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন না— সেদিন হয়ত গলা বাড়িয়ে হাঁক দিল : কী, খেতে-টেতে তোমরা দেবে না কী! পেট যে জ্বলে গেল।' বাড়ীতে যাঁর এত দাপট, বাইরে কিন্তু সে একাবারে মুখচোরা। বাড়ীতে যাঁর চোখ রাঙ্গানোকে সকলে ভয় করে—বাড়ীর বাইরে চোখ তুলে কারোর সংগে কথাও বলতে পারে না। সব সময়ই সকলের মাঝখান থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে থাকতে ভালবাসে। সকলের সাথে মিশতে চায় না—যাঁদের সাথে মেশে, তাঁদের না মজিয়ে ছাড়ে না। অনেকের সম্পর্কে অনেক খবরই রাখে, বলতেও পারে কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই বলতে রাজী নয়। নিজের সম্পর্কে নিজের সামনে যদি কাউকে কিছু বলতে শোনে— প্রথমে পরিহাস বলেই তাকে ধরে নেয়—যদি মনে হয়, সত্যই পরিহাস নয়—তখুনি সে স্থান ত্যাগ করবে। এহেন লোকটি আমাকে যে এড়িয়ে যাবে—তা জানতাম। জানতাম বলেই একটু অন্য উপায় গ্রহণ করতে হলো। একদিন ও এলো রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে—'ওরে যাত্রী'র নবীন প্রযোজক ভূতনাথ বিশ্বাসের সংগে। সম্পাদককে দিয়ে তাঁর বাড়ীতে ওদের আর একদিন আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। গল্পগুজব করে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেবো বলে ওকে বল্লাম। আর ওকে ধরে নিয়ে আসবার দায়িত্ব দিলাম প্রযোজক বন্ধু ভূতনাথ বিশ্বাসকে।

৬ই আগষ্ট, সন্ধ্যা সাতটায় ওরা প্রতিশ্রুতি মত এসে হাজির হলো। শিল্পী সুশীল বাড়ুজ্জে, কর্মাধ্যক্ষ, সম্পাদক-আরো দু'একজন ছিলেন—সত্যি, আমরা গল্প-গুজবে মেতে গেলাম। যাঁর যাঁর রাজনীতি মতবাদ নিয়ে আলোচনা সুরু হ'লো। কেউ সাম্যবাদ-কেউ সমাজতন্ত্রবাদ—কেউ বিপ্লববাদ—কেউ বা অহিংসাবাদ নিয়ে তর্ক করছেন। সকলেই দলগত নীতি আর নেতাদের কিছু না কিছু সমালোচনা করছেনই— প্রথম সুরুতে একজনকে সকলেই এড়িয়ে যাচ্ছিলেন— এড়িয়ে যাচ্ছিলেন অবহেলা করে নয়—তাঁকে এসব আলোচনার মাঝে টেনে আনা ঠিক হবে না মনে করেই। হঠাৎ কে যেন বলে উঠলেন, যাই বলুন, ঐ একটী লোকের পক্ষেই সম্ভব হতো ভারতের সমস্ত জনসাধারণের আস্থায় বলীয়ান হয়ে সকল সমস্যার সমাধান করা। ভারতবিভাগ একমাত্র তাঁর পক্ষেই রোধ করা সম্ভব ছিল। তিনি থাকলে আর বাংলার আজ এই দুর্দশাও হতোনা—এভাবে সর্বত্র মারও খেতে হ'তোনা'—দীপক তাঁর কথার জের টেনে নিয়ে বলে : নিশ্চয়ই, নেতাদের ভিতর ঐ নেতাজী সুভাষচন্দ্রকেই আমি শ্রদ্ধা করি সব চেয়ে বেশী। ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণের পক্ষে যে মতবাদ প্রয়োজন, সুভাষচন্দ্র সেই মতবাদেরই প্রতিষ্ঠা করতেন।"

একটু থেমে দীপক বলে : নাগরিক হিসাবে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধাচরণ আমি করতে চাই না—তাছাড়া আজন্ম যে কংগ্রেসকে ভালবেসে এসেছি—তার আনুগত্যকে অস্বীকারই বা করবো কী করে। কিন্তু কংগ্রেস অনুসৃত বর্তমান নীতিকেও যে সমর্থন করতে পারি না—তাই বা না বলি কী করে! তাই বলতে হয়—রাজনীতি সম্পর্কে আমার নিজের বিশেষ এক নীতি আছে। সকলের সবটুকু সার নিয়ে যাকে গড়ে তুলেছি।"

রাজনীতি ছেড়ে সাহিত্য নিয়ে কিছুটা কচ-কচানি সুরু হলো আমাদের। বাংলা উপন্যাস দীপক রীতিমত পড়ে— যে কোন নতুন সাহিত্যিকের রচনাও আগ্রহ করে পড়ে—
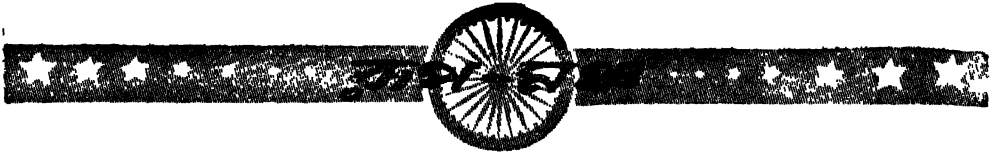
যখনই শুনতে পায় এই নতুনের মাঝে সম্ভাবনার বীজ রয়েছে। তবে বনফুলের রচনা দীপকের যতখানি ভাল লাগে আর কারোরই ততখানি লাগে না। বর্তমান সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর ভিতর বনফুলকেই সে সবচেয়ে শক্তিমান লেখক বলে মনে করে।

ছবি দীপক খুবই দেখে—অবশ্য ইংরেজী ছবিটাই দেখে বেশী। বাংলাও যে না দেখে এমন নয়। মঞ্চাভিনয়ও মাঝে মাঝে দেখে থাকে। বিশেষ করে শিশিরকুমার—অহীন্দ্র—ছবি বিশ্বাস—নরেশ মিত্র—নির্মলেন্দু লাহিড়ী—কমল মিত্র—জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি এঁরা কে কোন ভূমিকাটিকে কী ভাবে রূপায়িত করে তুলেন—এঁদের এই বৈশিষ্ট্যটুকু এবং অভিনয়ের ধারা লক্ষ্য করবার জন্যই দীপক নাট্যাভিনয় দেখতে উপস্থিত হয়। পর্দায় কমল মিত্রের বলিষ্ঠ অভিনয় দীপককে মুগ্ধ করে। অভিনেত্রীদের ভিতর চন্দ্রাবতী ও ভারতীর অভিনয় তাঁর ভাল লাগে। আত্মীয় বলেই নয়—উদীয়মান পরিচালকদের ভিতর অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা দীপককে খুশী করে। তাছাড়া হেমচন্দ্র চন্দ্রের উপরও তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। তাই, মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত চন্দ্রের পরিচালনাধীনে অভিনয় করবার ইচ্ছা দীপকের মনে জাগে। সুযোগ এলে, সে সুযোগকে দীপক পরম আনন্দের সংগেই গ্রহণ করবে। দীপকের অভিনীত চিত্রগুলির ভিতর পূর্বরাগ ও শাখাসিঁদুর মুক্তি লাভ করেছে। ওরে যাত্রী—রাহী (পথের ডাক-এর হিন্দি) মুক্তির দিন গুনছে। নিজের অভিনীত চরিত্রগুলির ভিতর 'ওরে যাত্রী'র চরিত্রটিও যেমনি দীপকের ভাল লেগেছিল—অভিনয় করেও তেমনি খুশী হয়েছে। বর্তমানে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পদ্মা প্রমত্তা নদী' এবং নাট্যকার

দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় 'দাসীপুত্র' চিত্রে দীপক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছে। বাংলা চিত্রজগতের ষ্টুডিওগুলির সর্ব বিষয়ে সংস্কারের প্রয়োজন বলে দীপক মনে করে। তার চেয়েও বেশী মনে করে শিল্পী ও কর্মীদের মনের সংস্কারসাধনকে! এই প্রসংগে দীপক বলে: এঁরা পরস্পরের প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নন। বরং হীন ঈর্ষার ভাব মনে পোষণ করে থাকেন পরস্পরের প্রতি। এই আত্মঘাতী নীতির আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।

চলচ্চিত্রের প্রতি ছোট বেলা থেকেই ঝোঁক ছিল কিনা—এবং কী করে চিত্রজগতে এলো, সেকথা জিজ্ঞাসা করাতে দীপক বলে: কোনদিন কল্পনাও করিনি যে,আমি অভিনেতা হবো এবং আমার অভিনয়ে কোন ক্ষমতা আছে বলে পূর্বেও যেমনি মনে করিনি - বর্তমানেও তেমনি করি না। আমাকে একরকম জোর করেই আমার দাদা অর্থাৎ আপনাদের অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় অভিনয় জগতে নিয়ে এলেন। তিনি নাকি আমার ভিতর কী প্রতিভা দেখতে পেয়েছেন—অথচ আমি আজো তার কোন সন্ধান পেলাম না।" সত্যি, অভিনেতা হবার কোন অভিলাষই দীপকের ছোট বেলায় ছিল না। আবৃত্তি বা ঐ ধরণের অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করলেও—অভিনেতা-জীবন যেন দীপকের নতুন জন্ম। তাই এই নতুন জীবনে নতুন নাম নিয়েই সে আত্মপ্রকাশ করেছে। নইলে তাঁর আসল নাম দীপক নয়—পারিবারিক জীবনে তাঁর নাম হচ্ছে কানাই লাল মুখোপাধ্যায়।

ইংরেজী ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ—সম্ভবত: ২১শে জুলাই, কলকাতাতেই দীপক জন্মগ্রহণ করে। বর্ধমান জেলার বাকুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ মুখুজ্জে বংশ দীপকের পিতৃপুরুষ। দীপকের পিতামহ স্বর্গত: দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় কার্যোপলক্ষে ভাগলপুর যান এবং সেখানেই স্থিতি হ'য়ে বসবাস করতে থাকেন। তিনি সরকারী টাকশালাতে কাজ করতেন—এখানেই তিনি স্বর্গত: দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন।

পরে স্বর্গত: বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।
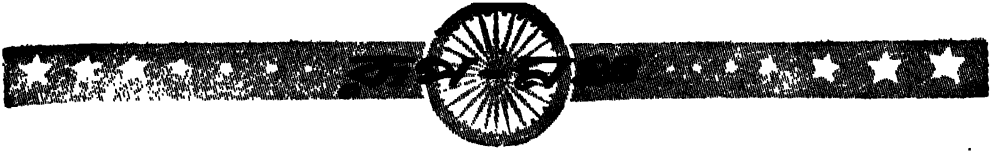
বাংলার অন্যতমা চিত্রাভিনেত্রী সুমিত্রা দেবীর সংগে স্বর্গতঃ দীনবন্ধু বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের সর্বপ্রথম বিয়ে হয়েছিল। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের মত দীপকও তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে—তিনি বর্তমানে জীবিতই আছেন। দীপকের পিতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর পিতার তৃতীয় পুত্র। এবং একজন অবসর প্রাপ্ত পুলিশ-অফিসার। দীপকের বড় জ্যেঠামহাশয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্রই হচ্ছেন উদীয়মান পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। চারজন ভ্রাতা এবং একজন ভগ্নীর ভিতর দীপক সর্ব কনিষ্ঠ। দীপকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক—মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বি, এল, মুখোপাধ্যায়ও একজন কৃতি টেকস্‌টাইল ইঞ্জিনিয়ার। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যখন জার্মানীতে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন—দীপকের এই মধ্যম ভ্রাতা তখন উচ্চশিক্ষার্থে তথায় ছিলেন এবং নেতাজীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান। নিজের কর্মদক্ষতা ও বিশ্বস্ততায় তিনি নেতাজীর খুব প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেন এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের অন্যতম দায়িত্ব সম্পন্ন সভাপদ লাভ করেন। আলীপুর অঞ্চলের ৪২, বর্নফেল্ড রোডে দীপকদের নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। কিন্তু দীপক ছোটবেলা থেকে প্রতিপালিত হ'তে থাকে ৩৬, বর্নফেল্ড রো-এ তাঁর মামাবাড়ীতে। বর্তমানেও সেইখানেই সে থাকে। খিদিরপুর এ্যাকাডেমিতেই দ.পকের বাল্য শিক্ষা আরম্ভ হয়। এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ভরতি হয় রিপণ কলেজে। কলেজ পরিত্যাগ করে সে বয়লার ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাভ করতে থাকে কিছুদিন। তারপর ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে যোগদান করে। ছোটবেলা থেকেই খেলাধুলায় দীপকের ঝোঁকটা ছিল খুব বেশী। প্রতিটি খেলাতেই তাঁর কিছুটা পারদর্শিতা আছে—খেলার দিকে অত্যধিক ঝোঁক থাকার দরুনই সৈনিকের জীবন দীপককে বেশী আকৃষ্ট করে। সৈন্যবিভাগে ভর্তি হ'য়ে প্রথম তাঁকে যেতে হয় আম্বালা। তারপর কার্যোপলক্ষে ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়। কাশ্মীর, জলন্ধর, —ফৈজপুর, মাদ্রাজ, বম্বে, ব্যাঙ্গালোর, কোচীন—সিংহল—আরো বহু জায়গায় দীপক সেনাদলের সংগে ঘুরে বেড়ায়। বহুবার তাঁকে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে—বহুবার তাঁর জীবন যুদ্ধক্ষেত্রে সংকটাপন্ন হ'য়ে উঠেছে। ১৯৪৬ খৃঃ, ২৪শে জুলাই, নিজের ইচ্ছায় সৈন্য বিভাগের কাজে ইস্তাফা দিয়ে সে কলকাতায় চলে আসে। মাসিক ষোল টাকা বেতনে গোলন্দাজ সৈন্য হিসাবে সে প্রথম যোগদান করে। ধীরে ধীরে তাঁর পদোন্নতি হ'তে থাকে এবং যখন সে সৈন্য বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে, তাঁর বেতন দু'শ টাকারও অধিক হ'য়েছিল। বিদায় নেওয়ার পূর্বেই সে ভি, সি, ও (V. C, O.) সম্মানে ভূষিত হয়েছিল। সৈন্য বিভাগ থেকে বিদায় নিয়ে বেশ কিছুদিন নিরিবিলি দিনগুলি কাটিয়ে দেয়। তারপর ভাগ্যান্বেষণে নিয়োজিত থাকে। এই সময় কিছুদিন দালালির কাজও করে কিন্তু কোন সুবিধা করতে পারে না। দীপকের জ্যেঠতাত দাদা পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এই সময় তাঁর পূর্বরাগ চিত্র নিয়ে মেতে পড়েন। দীপককে তিনি তাঁর নতুন চিত্রে নায়কের ভূমিকায় নামাবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেবল মাত্র তাঁর আগ্রহ এবং চেষ্টায় দীপক অভিনেতা জীবনকে গ্রহণ করতে পেরেছে। এজন্য দাদার কাছে সত্যই দীপক কৃতজ্ঞ। অর্ধেন্দুবাবু দীপককে শুধু সুযোগই দেননি—সম্পূর্ণ নূতন এক জগতে একজন নবাগতের পক্ষে যে সব বাধা বিপত্তি থাকা স্বাভাবিক, সেগুলি ডিঙ্গিয়ে চলতেও সাহায্য করেছেন যথেষ্ট। তাছাড়া অভিনয় বিষয়ে অর্ধেন্দু বাবুর কাছ থেকে দীপক যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছে।

দীপক এখন অবিবাহিতই আছে। কোন নেশারই দীপক বশীভূত নয়। সিগারেটও সে খায় না। খাদ্যদ্রব্য বিষয়ে দীপক কোন সংস্কারেরই বশীভূত নয়। আলোচনা করতে করতে রাত হ'য়ে গিয়েছিল--সায়াহ্ন-ভোজটা সম্পাদকের বাড়ীতেই সেরে নিলাম। খাওয়া-দাওয়ার পর ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমিও রিকসায় চাপলাম। রিকসায় একা একা বড্ড হাসি পাচ্ছিল এই মনে করে যে, শারদীয়া সংখ্যা যখন প্রকাশিত হবে—দীপক বাবুর তখন বিস্ময়ের অবধি থাকবে না।

—শ্রীপার্থিব

দিল্লীকা লাড্ডু

ফণী রায়

★

কথায় বলে, "দিল্লীকা লাড্ডু, যো খায়া ও ভি পস্তায়া, যো না খায়া ও ভি পস্তায়া।" হিন্দীর কথা অর্থাৎ বম্বের সিনেমা ষ্টুডিওর কথা—শোনা আছে, নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা তেমন নাই, সুতরাং ওটা বাদ দিয়ে খাস কলিকাতা ও তার আশে পাশের বাংলার ছায়া ছবি তোলবার ষ্টুডিওগুলির কথা বলছি। এই ষ্টুডিওতে ঢুকে ছায়া ছবিতে অভিনয় করার আর্টিষ্ট হওয়া অনেকটা ঐ 'দিল্লীকা লাড্ডুর' মত, যাঁরা হ'য়েছেন, তাঁরাও মুখে না বলুন,মনে মনে যে পস্তায়েছেন—এ কথা নিজের ও আরও দু'পাঁচজনের অভিজ্ঞতা দেখে হলফ করতে পারি। আর যাঁদের এখনও ও সৌভাগ্য (সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য—প্রবন্ধটা আদ্যপান্ত পড়ে সাধারণেই ঠিক করুন) হয় নি, তাঁরাত পস্তাবেনই।

বছর তিন থেকে প্রত্যহ এত ভদ্র যুবকদল সিনেমার আর্টিষ্ট হবার জন্য আমার বাড়ীতে এসে অনুরোধ তথা 'জুলুম' করছেন, এবং দৈনিক ডাকে অন্তত দশ বারো খানি করে পত্র এসে আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে—তা কহতব্য নয়। সত্য কথা বললে তাঁরা তো বিশ্বাস করেনই না, অধিকন্তু মনে করেন—"বেটা, আমাদের ভাগাচ্ছে—পাছে নিজস্বার্থ ক্ষতি হয়...ইত্যাদি।" কিন্তু এটা বোঝেন না—তাঁরা হচ্ছেন সুন্দর, সুঠাম, প্রিয়দর্শন নব্য যুবক, আমি হচ্ছি—যাকে বলে কঙ্কালসার যমেরবাড়ীমুখো কদাকার বুড়ো—তাঁদের দ্বারা আমার কি ক্ষতি হতে পারে?—আমার উপযুক্ত বয়স ও প্রকৃতির চরিত্র তাঁরা পারবেন না এবং পরিচালক মহাশয়ও নির্বাচন করবেন না এবং তাঁদের উপযুক্ত বয়সের চরিত্র অভিনয় এ-হাড়ে আমার দ্বারাও আর কোন সম্ভবনাই নাই, কিন্তু তা বললে কি হয়—"ভবী ভুলিবার নহে।" যত বলি, "বাপধনরা, শক্তি সামর্থ রয়েছে, বয়স রয়েছে, শিক্ষাদিক্ষা করবার দিব্য অবসর রয়েছে, 'আর্টিষ্ট হবার কুহকটি ছেড়ে—যোগ দাওনা কেন—উড়ো জাহাজ সংক্রান্ত নানা রকম 'হাতে নাতে'র কাজে, জাতীয় সংরক্ষণ সৈন্যদলে, পারো'ত কতরকম জাতীয় শিল্প ফেঁদে ফেলো, জলস্থল সমর বিভাগে, দেশী জাহাজ নির্মাণের কাজে ইত্যাদি কত রকম বিষয়ে টেকনিসিয়ান,কেরাণী, সৈন্য আদি, শিক্ষা দিবার জন্য জাতীয় গবর্ণমেণ্ট কাগজে বিজ্ঞাপন ছেড়ে গরু খোঁজাখুঁজি করছেন, যাওনা কেন ঐসবে,—আখের ভাল হবে।" যতই বোঝাই, ততই নাছোড়বান্দা, শেষে ঘুরে ঘুরে নানান রকম সম্পর্কে অম্ল মধুর বিশেষণে ভূষিত করে থাকেন নিশ্চয়ই। তাঁদের এবং সংগে সংগে সাধারণকে প্রকৃত রহস্য জানাতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। আর বাড়ীতে নিত্য ঝামেলা ও পত্রের জবাব দিতে সময় ও মাসিক ৫।৬ টাকার টিকিট খরচার দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া—নতুবা বিদ্যের জাহির' করতে নয়।

যদি প্রতাপাদিত্যের কল্যাণীর ভাষায় কেউ প্রশ্ন করেন: "পোড়া দেশের লোক তোমার কাছেই বা আসে কেন?—" উত্তরে বলতে হয়—'জানি না, কবে বোধ হয় কেউ বাড়ীতে দেখা করতে এলে "Out. Not at Home" 'বাড়ী নেই' —'অসুস্থ' আদি পড়ে ও শুনে ফেরেন না। সকলের সংগেই দেখা করে থাকি এবং চিঠির জবাবও সংগে সংগে দিয়ে থাকি, যেটা শুনেছি আমার সমজাতীয় বৃত্তিজীবিগণ প্রায়ই করেন না —বা করতে পারবেন না।—এইটুকু যদি অপরাধ হয়ে থাকে—হবে, গত্যন্তর কি বলুন?

আগে বলতাম, 'আমি বাপু তো ডিরেক্টর নই'—ইদানিং তাও বলা যায় না, কতকগুলি পরম!—শুভাকাঙ্খী জুটে, ধরে পাকড়ে দিনকতকের জন্য আমায় 'ডিরক্টর' সাজিয়ে ছিল। এখন যত বলি "বাপু, আমার বই টাকার অভাবে বন্ধ হয়ে গেছে, হবার আশা নাই—বুড়ো বয়সে আহাম্মুখী করেছিলুম—বুঝতে ভুল করেছিলুম—ভেবেছিলেম এরা সত্যই বাণিজ্য করতে এসেছে—লাখ তিন চারেকের ভাওতা দিয়েছিল—কার্যক্ষেত্রে নেমে দেখলুম—বাণিজ্যই বটে! তবে অর্থের বা সম্মানের নয়—নারীর—বিষ্ণু বিষ্ণু! যাক সে কথা,লাখ টাকা নয়। মোটের উপর এনেছিলেন
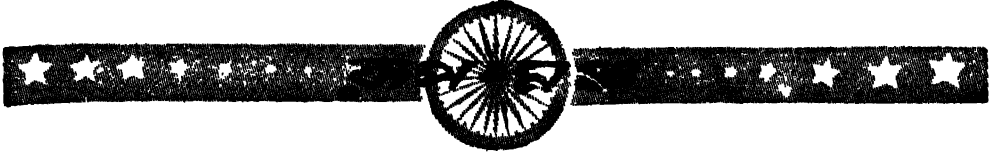
হাজার চল্লিশ, খরচ করেছেন চব্বিশ হাজার—চার হাজার ফুট বইত তৈরী হয়েছিল—বাকী টাকাগুলো নিয়ে নানা রকমে—যাক, সে কথা—যত সব বলি ততই দাপট বেশী। 'বলে দিন না কোথাও—নয় চিঠি দিন্ না, আপনার কথা রাখবেন না কে?—যেন সকলেই আমার—সেই থানা বাড়ীর রেওৎ!" আমার পছন্দ—আর অন্য ডিরেক্টরের পছন্দ যে এক হবে, তারই বা মানে কি? শোনে কে মশাই?

কারণ, সিনেমার ছবি দেখতে দেখতে অনেক যুবক মনে করেন—"হ্যাঁ ভারি তো, এই তো 'সেজে গুজে' কটাই বা কথা বলে গেল—এ আবার এমন কি শক্ত?" পার্শ্বে উপবিষ্ট বন্ধুটি সংগে সংগে সায় দিয়ে বল্লেন—"নিশ্চয়, দিক না আমাদের একবার চান্স', দেখি জহর গাঙ্গুলী, ধীরাজ, অসিত, রবীন, পাহাড়ী সান্যাল-টান্যালকে টেক্কা মারতে পারি কি না—দেবে না যে!—"

তৃতীয় বন্ধুটি—ইনি নিজের উপর আরও বিশ্বাসী, বলে উঠলেন, "আরে দূর্, 'চান্স' দেয় নাযে! দিলে, অশোক, দুর্গাদাস, অহীন, ছবি, শিশির ভাদুড়ীর ওপরও যদি না যেতে পারি" ইত্যাদি।

কিন্তু দু' এক ক্ষেত্রে দেখা গেছে—প্রথম স্যুটিং দিতে যেয়ে কেপে—অনেকেরই মুখের রা সরেনি—দুর্দিনের মাগ্যির ও অভাবের বাজারে অনর্থক ফিলম্ নষ্ট হয়েছে।

আবার খুব পীড়াপীড়িতে ১০।২০ জনকে করে দিয়েও দেখেছি—আরও বিপদ! অন্যান্য পরিচালকদের ধরে পাকড়ে সত্যমিথ্যে অনেক রকম করে বলে, করে দিয়ে প্রতিদান কি পেয়েছি শুনুন—মাস কতক বাদে যখন দেখা হল—পথে বা ষ্টুডিওতে বা যাওয়া আসার গাড়ীতে, স্থান কালের বিচারের ধার তারা ধারেন না,—অমনি শুনতে হয়েছে—"বেশ মশাই! খুব বলে দিয়েছিলেন, আমার চান্সটারই সর্বনাশ করলেন!" অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করি "কি করেছি? কি হ'ল বাপু?" ক্রোধটা আরও চরমে তুলে বল্লেন, "আরে মশাই, মবে (mob) নামিয়েছে।" কেউ বা বলেন, "আরে মশাই এ্যক্টিং না থাকার মধ্যে"। অপরে বল্লেন—"আরে মশাই, যা নিয়েছিল ক'দিন ধরে, ছবি দেখতে গিয়ে দেখি সব বাদ দিয়েছে—পাছে অমুকে মার খায় বলে।" এই অমুকটি হচ্ছেন যে চরিত্রাভিনেতার সংগে অর্থাৎ অহীনবাবু, জহর, ছবি আদি নামকরা—যাঁর সংগে তিনি সামান্য একটা কিছু অংশে নেমেছেন। ডিরেক্টর যে ধনীর টাকা উড়োতে পরিচালনায় নামেন নি—একথা বুঝবে কে? অনুপযুক্ত লোককে বিশেষ বিশেষ চরিত্রে নামান, কি বলে? যেমন উপযুক্ত তেমনি চরিত্রে নামিয়েছেন, তা' বললে কি হয়, আমরা কেউ কি নিজের দুর্বলতা ভাবি? সবাই মনে মনে জানি, আমরা এক একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী—দিগগজ!

যাক্, গৌর চন্দ্রিকা ছেড়ে এবার আসল কথায় আসা যাক। কস্মিনকালেও আমার ছায়াছবিতে অভিনয় অর্থাৎ আর্টিষ্ট হবার ঝোঁক ছিল না। এমন কি পূর্বে কখনও নিজের ফটোগ্রাফই তোলাই নি। যদিও অভিনয় জিনিসটা আমার আজীবনের সাধনা, তবে পেশাদারী থিয়েটারে সাধারণ নটীদের সংগে নয়। কারণ, যে ব্যবসা বাণিজ্যতে দিন গুজরাণ হ'ত, সেটা যাঁদের অনুগ্রহে তাঁরা আজও পর্যন্ত এ জিনিসটা অপাংক্তেয় করেই রেখেছেন। তবু বরাতে যা আছে তাতো হবেই।

বারো বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন সকালে সুপ্রসিদ্ধ নট ও পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত তিনকড়ি চক্রবর্তী মহাশয় আমায় তাঁর বাড়ীতে ডেকে পাঠান্। তিনকড়িবাবুকে আমি বড় ভায়ের মত চিরদিন ভক্তি শ্রদ্ধা করি। তিনি আমার দাদার বন্ধু ও সমবয়সী। পূর্বে প্রায় একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসরকাল বসবাসও এক পাড়ায় ছিল। একসংগে সখের থিয়েটার, যাত্রাও করেছিলাম। সে সখের যাত্রাটি কালে 'আর্ট থিয়েটারে' রূপান্তরিত হয়—সেই যাত্রায় উভয়ে একই দৃশ্যে অভিনয় করেছি। প্রায় চৌদ্দ বৎসরকাল অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর সংগে কোনরূপ আলাপ বা আলোচনাই হয় নি। অবশ্য সম্বন্ধ ছিল—দেখা সাক্ষাৎও মাঝে মাঝে হ'ত—তবে যে যার নিজের ধান্দাতেই ব্যস্ত থাকতাম। হঠাৎ অভিনয়ের কথা উঠতে বললাম—"না দাদা, ও স্ত্রীলোকদের সংগে—" কথা শেষ করতে না দিয়েই বাধা দিয়ে তিনি বল্লেন—"থিয়েটার নয়—থিয়েটার নয়—বায়োস্কোপ।" অনেক কথা
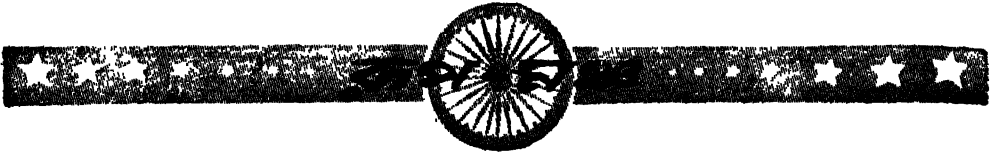
—আশার—উন্নতির—প্রলোভনের—তবুও প্রথম সম্মত হইনি। পরে হতে বাধ্য হলেম। কেন যে হলেম—সে কথা প্রকাশ করতে হলে হয়ত ব্যক্তিবিশেষের আভিজাত্যে আঘাত লাগতে পারে—তাই নিবৃত্ত হলাম। যাই হোক, শুভতিথি—শুভ লগ্নে—ইংরাজী ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি ইংরাজী তারিখটা ঠিক মনে নাই, তবে সেকেলে বাঙালী আমি—বাঙলা তারিখটা মনে না পড়াটাই দোষের—বাংলা ১৩৪২ সনের ২৯শে ফাল্গুন, কালী ফিলম্ ষ্টুডিওতে তিনকড়িবাবুর পরিচালনায় প্রথম সুটিং দিই। সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার! একে বুড়ো, তায় ও 'লাইনে' কেউ কখনো যাওয়া আসা করতেও দেখেনি। এমন একজন এতবড় একটা চরিত্রে প্রথম ঢুকেই অভিনয় করছে—বিস্ময়ে রথযাত্রার মত সকলে চারিধারে ভিড় করে দাঁড়ালো। ষ্টুডিওতে প্রবেশকালে, ছবিগ্রহণের আগে সেজেগুজে এধারে সেধারে বসে বা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় অনেক টীকা টিপ্পনী কানে আসতো—"শ' কার 'ব' কার যুক্ত, যথা—·········বেটা·········রা মরবে, যত আনাড়ীর আমদানী রে—খেলে রে খেলে—আমাদের অন্ন খেলে······" ইত্যাদি···আরও আরও অশ্লীল ভাষণ। ক্রমে জানতে পারলাম, আমি থিয়েটার সিনেমার লোক নই। একদম বাইরের। তাই ওই সব সংক্রান্ত ব্যক্তিদের হিংসায় এত গাত্রদাহ :—ওই রূপ অশ্লীল টীকা টিপ্পনী। এক এক দিন এরূপ অশ্রাব্য শুনতে হয়েছে—যাতে কোন ভদ্রসন্তানের পক্ষে আর ও সংসর্গে থাকা উচিত ছিল না, তবুও খুব ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত 'সুটিং' শেষ করেছিলাম। মায় প্রোপ্রাইটারের পর্যন্ত সন্দেহ ও ভয় ছিল বরাবর—"টাকা গুলো নষ্ট হল বুঝি নতুনলোকদের নিয়ে।" বহুবচন ব্যবহার করলাম। কারণ, আমার সাথে ছবি বিশ্বাস মহাশয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতিও কয়েক ব্যক্তি এই ছবিতে সর্বপ্রথম হাতেখড়ি দিচ্ছিলেন।

যা হউক, এ দিকের এই সব গালাগালি—ভয়—সন্দেহ—অবজ্ঞা—অপমান—মাঝে মাঝে নানা প্রকারের লাঞ্ছনাও আমার পক্ষে মঙ্গলকরই হ'ল। কারণ, সেই 'সর্ব্বকর্ম্ম পরিহরি' আমিও শ্রীহরি স্মরণে দিনরাত প্রাণপণে সাধনা করতে লাগলাম চরিত্রটীকে সম্পূর্ণভাবে রূপ দেবার জন্য। দীর্ঘ পাঁচমাসের সুটিংএর পর ছবিটি সম্পূর্ণ হয়। এই পাঁচমাস কাল আমি তৈল মাখা বন্ধ দিয়েছিলাম, দিনের বেলা আহার করা সেই থেকে একেবারে পরিত্যাগ করেছি। কেননা, পরিচালক মহাশয় ছবিতে সুটিং দেবার আগে আমাকে শিখিয়েছিলেন অনেক কিছুই—সে জন্যে তাঁর কাছে জন্ম জন্ম কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সে গুলি না জানলে প্রথম ছবিতেই আমি অতদূর কৃতকার্য হতে পারতাম না। তিনি বলে দিয়েছিলেন, ছবির অভিনয়ে গ্রামার আছে, তার গোটা আষ্টেক নিয়ম তোমায় বলে দিচ্ছি, মনে রেখ, অনুশীলন কর, কিছুই বাধবে না।" পরে বুঝলাম, কথাগুলো খাঁটি সত্য। সে গ্রামারের 'রুল' অনুসারে বুঝেছিলাম 'ক্যামেরা' মিছে কথা বলে না, খাওয়া না—খাওয়ার মুখের চকচকে বা রুক্ষশুষ্ক ভাব প্রকাশ করবেই। 'মেক-আপ,'এও পরচুলপরা ধরা পড়বেই। সেই জন্য পাঁচ মাস কাল দাড়ি গোঁফ কামাই নি বা মাথার চুল ছাঁটি নি। হাতই দিই নি। স্বভাবে যতটা বাড়ে—তাই বাড়তে দিয়েছি। কারণ, আমাকে সাজতে হয়েছিল তখন খুব গরীব হাঁপানি রুগী,বুড়ো বামুন। পাঁচ মাস কাল ঐ হাঁপানি বাড়িতে অনবরত অভ্যাস করেছি। সেই থেকে আমার হাঁপানি রোগও দাঁড়িয়েছে—মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে থাকে। যাক ছবিটা হলো "অন্নপূর্ণার মন্দির।" ছবিটি মুক্তি পাবার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। প্রোপ্রাইটার, ডিরেক্টর ও সাধারণের ভয় দূর করে 'বক্স অফিস' ভরাতে পেরেছি বলে মনে মনে খুশীও হলুম।

আপনারা বলবেন নিশ্চয়ই—"এই তো, চান্স পেয়েছিলে বলে না—যদি Mob 'সটে' নামতে—কি হত?"

কি হ'ত—তার উত্তর না দিয়ে 'কি হয়েছি' তাই বলি আগে, শুনুন। অত ধন্য ধন্য—এমন দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদপত্র ছিল না—যাতে ধন্য ধন্য সুখ্যাতি এক বাক্যে বাহির হয় নাই। রেডিওতে পর্যন্ত পনের মিনিট ধরে প্রশংসা, লোকের মুখে মুখে সুখ্যাতির তো কথাই নাই—একবাক্যে সবাই প্রশংসা করেছিলেন। তার পুরস্কার কি পেয়েছি—'কি যে' হয়েছি—বলছি।
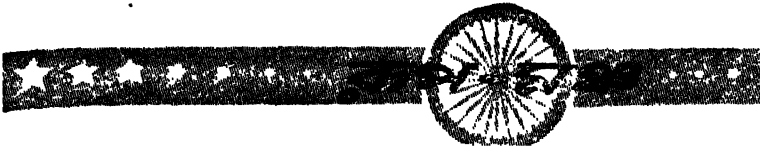
সেই ষ্টুডিওতে সেই ডিরেক্টর সেই প্রোপ্রাইটার পরের বই খানিতে সামান্য একটা চরিত্রে নির্বাচন করে আগের 'কণ্ট্রাক্টের' মোট টাকার অপেক্ষা তিনশত টাকা কম করে ধরে 'কণ্ট্রাক্ট' করতে 'উদ্যত! বুঝুন ব্যাপার! আক্কেল গুনছেন? আমিও গোলামী সেলাম ঠুকে বল্‌লাম,—

"হুজুররা, আমার কি 'প্রোমোশন' হল?" বিরক্তসহ উত্তরটা এল—"বেশী পাবেনা এই যথেষ্ট।" ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ভাব্‌লাম,"তাইতো, তাঁতি কুল বষ্টম কুল দুকুল হারিয়ে এই দুর্মূল্যের বাজারে অকূলে পড়লাম?" তারপর,- কৈ ভায়ারা, যাঁরা চান্স নিতে এখনো ঘুরছেন—মন দিয়ে কথা গুলো পড়ছেন বা শুনছেন তো?

তারপর? তারপর বিষম ষড়যন্ত্র! "ফস করে একটা নতুন আনাড়ী লোক আমাদের ওপর গেল! হল কি!" ইত্যাদির প্রতিক্রিয়াও সংগে সংগে পাঁচটা বছর ধরে আমায় 'নাটা ঝাপ্‌টা' খাইয়েছে। নেহাৎ বেহায়া, দুকান কাটা—আধ পেটা খেয়েও পড়েছিলাম। ছাড়িনি—তবু রক্ষে, দিনের বেলা কিছু খাইনা। পাঁচটা বছর ধরে মশাই 'মাঝে মাঝে' বইতে পার্ট পেয়েছি। কুরাণের টাকা শুনবেন, গড়ে ১০৲ থেকে উর্ধ্বতন দেড়শ' টাকা—সময় চারি মাস। বাঃ চমৎকার। তবু তো সিনেমা আর্টিষ্ট--নামতো বেরিয়েছে? তবে? অপরাধ? ঐ যে আমি থিয়েটার সিনেমা-ওয়ালাদের দলভুক্ত নই, আর একটা বিশেষ দলেরও নই। প্রথমটার চেষ্টা দেখবো—অর্থাৎ পেশাদারী থিয়েটারে ঢুকবো ভাবলাম, কিন্তু অপরটি? এই বয়সে? ছিঃ ছিঃ ছেলেরা বড় হয়েছে, নাতি নাতনীরা 'স্যায়ন' হয়েছে—হবার নয় যে!'

'অবশ্য সাধনার পুরস্কার আছেই।" এই বাক্যটির সত্যতা বুঝলাম যেদিন নতুন পরিচালক শৈলজানন্দ দীর্ঘ আট বৎসর যাবত অন্যত্র শিক্ষানবিশী করে—ছায়াছবির ডিরেকসনের হাতে খড়ি দিতে 'নন্দিনী'কে নিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। এই বিনা চেষ্টার 'ডাক' পেয়ে সব কিছু ভুলে গেলাম।

শৈলজানন্দ বড় একটা খাঁটি সত্য কথা বলে থাকেন, যথা—"অভিনেতা তৈরী হয় না, অভিনেতারাও একটা জাতি বিশেষ—চাতুর্বর্ণের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মত মাতৃগর্ভ থেকে অভিনেতা বর্ণরূপে জন্মে থাকে। আর কথা কইলেই প্রকাশ হয়ে পড়ে, কে অভিনেতা আর কে নয়।"

যাই হোক, শৈলজানন্দ আমাকে অনেক কিছু শেখালেন—অনেক অজানার রহস্য জানালেন। বুঝলাম, ছায়াছবি সম্বন্ধে শৈলজার জ্ঞানের পরিধির সীমা নাই। যতই এই পরিচয় পেতে লাগলাম, ততই তাঁর বাড়ীতে যাওয়াটা ঘনঘন করতে লাগলাম। ফাঁক না দিয়ে ক্রমে প্রত্যহ সকালে—কালীঘাট থেকে শ্যামবাজার—সেখানে ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত থেকে—অনেকের অনেক কিছু মন্তব্য, সমালোচনা আদি শুনে উপদেশ পেয়ে এবং স্যুটিংএর সময় নিত্য হাজির হ'য়ে পরিচালনা সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ আভাষ পেয়েছি। এর আগে অনেক বড় বড় নামজাদা ডিরেকটারদের পরিচালনায় অভিনয় করেছি। এরকম প্রাণ দিয়ে অভিনয় করবার স্বাধীনতা পাই নাই। অন্য কেহ করতে দেনও নাই—যা পেয়েছি 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' আর শৈলজানন্দের পরিচালনার বই গুলিতে অভিনয় করে। শৈলজানন্দই সর্বপ্রথম আমার চুক্তির টাকার হার প্রথম শ্রেণীদের হারে দিতে আরম্ভ করেন। তারপর তাঁর তৃতীয় চিত্র 'শহর থেকে দূরে'তে আমি সে বছরের প্রতিদ্বন্দ্বীতার বিচারে সারা বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করি। তারপর থেকে টাকা, সম্মান, সুনাম বরাবর পেয়ে আসছি। আর বুঝে্‌ছি ছায়াছবিতে অভিনয় করে নাম কেনা—অনেক কিছুর উপর নির্ভর করলেও—ভাগ্যের উপরই বেশী। কারণ, মেকআপ, অভিনয়, সাজসরঞ্জাম দৃশ্যপট আদি ভাল হলেই হয় না। ডিরেকসন, ভাল হওয়া চাই, 'ক্যামেরা', 'শব্দগ্রহণ' লেবরেটরী বা রসায়নাগারের কাজ, এডিটিং এতগুলি ভাল হওয়া চাই—সবার উপর আবার মোট বইএর গল্প আদি ভাল হওয়া চাই। বই—ই যদি হতদৃত হয়—ও সব যত ভাল হোক না—সুনাম হবার নয়। আরও বুঝেছি, সিনেমা আর্টিষ্টের নিজের যখন কিছু করবার শক্তি নাই, তখন অন্ধ বিশ্বাসে ডিরেক্টরকে 'ফলো' করাই ভাল। কি বলছেন? সেখানে তেমনি ডিরেকটর?
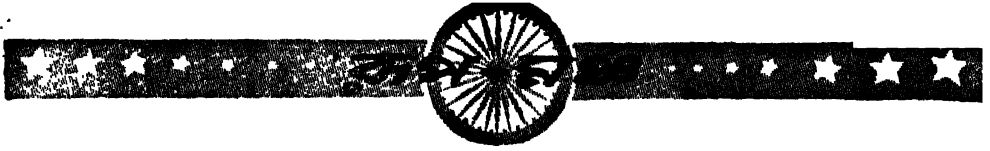
—তার মানেও বুঝেছি, সেখানে গুরুমশায়ের বিদ্যে শিশু শিক্ষা অবধি? সেখানেও দায়ে ঠেকলে (আজকাল পেটের দায় বড় দায়) তাঁর কাছেই পাঠ নিতে হবে। 'বোধোদয়ে'র ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপের মানে গুরু মশাই কথিত তাই দেখা যায় না এমন ছোট্ট টিকিওয়ালা ভগবান,—মানেটা শুনতে হবেই! উপায় কি বলুন!

পারবেন কি আপনারা আমাদের মত সইতে? আমাদের মত ধৈর্য ধরে থাকতে? বড় কমদিন নয়। লম্বা পাঁচ পাঁচটা বছর। একখানা বইয়ে একবার মাত্র দেখা দেওয়া—কথাও একবার মাত্র—"আর আমাকে?" ব্যস। হাসবেন না—সত্য বলছি। আর একখানিতে ওই একবার একটি লাইন—'ওরে ক্যাবলা উঠে পড়',—ব্যস। আর একখানিতে সেজেছি কবিরাজ, নেমেছি একবার। সর্ট'ও দিয়েছি একটি, কথাও কয়েছি এক লাইন। তারপর অন্যগুলিতে ওই রকম মেগদারেরই চরিত্র পেয়েছি—তবে ২।৪ বার নেমেছি, কথাও কয়েছি ২।৪ লাইন। পয়সা সম্বন্ধে আগেই আভাষ দিয়েছি। তাও অনেক স্থলে সম্পূর্ণ উশুল হয়নি, হেঁটে হেঁটে ট্রাম, বাস্ খরচা করে করে যোগদিয়ে যখনই দেখেছি, পাওনার চেয়ে বায়না ভারি'—অর্থাৎ পাথেয় খরচাগুলো যোগ দিলে পাওনাকে অতিক্রম করে—তখনই বাধ্য হ'য়ে রেহাই নিয়েছি—ও রেহাই দিয়েছি।

আর একটা ব্যাপার—বয়স ও স্বভাবের জন্য সেটা জান্‌বার আমার সৌভাগ্য সুযোগ নাই—জানান দিতেও সাম্‌না সাম্‌নি কেউ সাহস করে না। শুনেছি বুঝতেও আঁচে আঁচে পারি, অভাবী—অনাভাবী—সব রকমের ভদ্র-সন্তানরাই সিনেমায় আছেন। অনেকেই নাকি টাকা পয়সা বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন না—অর্থাৎ নিজ সংসারের ব্যয়ে লাগাতে পারেন না, আবার তার উপরেও ঘর থেকে এনে কারুকে কারুকে ষ্টুডিও সংক্রান্তে খরচা করতে হয়। হবে। "মা ঠাক্‌রুণ! দিদি!—অ মেয়ে!" ইত্যাদি সম্বন্ধেই আমি সিনেমা থিয়েটারের মেয়ে আর্টিষ্টে'দের ডেকে থাকি। এবং "বাবা—দাদু" সম্বোধনও শুনে থাকি—সুতরাং ও সব সংক্রান্তের আর বেশী কিছু জানি না। জানাবার পাত্র, পাত্রীইবা ও ক্ষেত্রে কেমন করে সম্ভব? তবে এইটুকু বলতে পারি—"নৈতিক চরিত্রটা নাকি সিনেমায় ঢুকলেই—বিশেষ করে যুবক যুবতীদের ঠুন্‌কো কাঁচের বাসনের মত একটুতেই টুং করে ভেঙে চুরে নষ্ট হয়ে যায়—"পারবেন কি ঠিক রাখতে কি থাকতে?—

পারবেন কি? পারেন তো আসুন, আপনার ভবিষ্যতের সুখ সুবিধে আছেই—যাকে বলে—ফিল্ড্ field চ্যান্স chance। বাঙলা ষ্টুডিও রূপ রত্নখনির তিমির গর্ভে ঢুকে ধৈর্য ধরে খুঁড়তে খুঁড়তে—রত্ন উদ্ধারে লেগে যান। তবে আবার বলছি "দিল্লীকা লাড্ডু" খেয়ে পস্তাবার মত হ'লেও কিল খেয়ে কিল চুরি করে বেমালুম হজম করতে হবে। আমার মত হাটে হাঁড়ি ভেঙে হাস্যাস্পদ হয়ে—অর্থ সম্পদ, মান-সম্ভ্রম হারাবেন না। আমি?—আমার কথা ছেড়ে দিন,—'অন্ধের কিবা রাত্র, কিবা দিন?' আমি এখন যে বয়সে, ত এটা সুখ্যাতি অখ্যাতির বাইরে। আমার ভবিষ্যৎ?—আরে মশাই সেতো কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটের ওপারে। সেখানে ভবিষ্যত বক্তারা গিয়ে আগে ঠিক করে আসুন—এক ইঞ্চি জমি আছে কি না—তবে তো আমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল কি অন্ধকার বাৎলাবেন! আপনাদের ভবিষ্যত যে এপারে—রাজধানীতে—রাজকীয় প্রাসাদের চূড়োয় জল্ জল্ করছে ভবিষ্যত। ভিত দেখলেই—চূড়োর হিতাহিতের খবর বলবেন। সাবধান! পস্তাবেন না—দিল্লীকা লাড্ডুর ব্যাপারে!

বার্ণার্ড শ

গোপাল ভৌমিক

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও চিন্তানায়ক জর্জ বার্ণার্ড শ গত ২৬শে জুলাই তারিখে ৯২ বৎসরে পদার্পণ করেছেন। বিশ্ব সংস্কৃতির ইতিহাসে এ একটি স্মরণীয় ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দী বিংশশতাব্দীকে যে কয়েকজন মহামনীষী ও চিন্তানায়ক উপহার দিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই আজ লোকান্তরিত : টলষ্টয় গেছেন, রোমাঁ রোলাঁ ও এইচ্, জি, ওয়েল্স নেই, রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারিয়েছি কয়েক বৎসর পূর্বে, এই সেদিন মহাত্মা গান্ধী আমাদের ছেড়ে গেছেন। শতাব্দীর শীর্ষে আজও পূর্ণ শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বার্ণার্ড্ শ। সেটা কম সান্ত্বনার কথা নয়। তাঁকে নিয়ে তাই বিশ্ববাসীদের দুর্ভাবনার অন্ত নেই। পৃথিবীতে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলে আজ বিশ্ববাসীরা কান পেতে থাকে শ'র ইংলণ্ডের আবাসস্থল সেণ্ট আয়টলরেন্সের দিকে : তিনি কি বলেন শোনার আশায়। বার্ণার্ড্ শ যখন মানুষ তখন তাঁর নশ্বর দেহকে একদিন না একদিন হারাতে হবে তা আমরা জানি। আর এও জানি যে, ৯২ বৎসরের বৃদ্ধ বার্ণার্ড শ'র বুদ্ধিদীপ্ত মন আজও তরবারির মত শাণিত হলেও তাঁর দেহ অমোঘ প্রাকৃতিক বিধানে ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। তবু মন বলে : শ' আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুন—মানুষের পৃথিবীতে অতি মানুষের আবির্ভাবের যে বাণী তিনি প্রচার করেছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে—তাই সার্থক হয়ে উঠুক তাঁর নিজের জীবনে। তাঁর **Back to Methuselah** নামক নাটকে তিন শতাধিক বৎসরের আয়ুষ্মান যে মানুষের চিত্র তিনি এঁকেছেন, তিনিই আমাদের পৃথিবীতে হোন সেই প্রথম মানুষ। আমরা তাঁর জীবন মরণ নিয়ে যতই চিন্তিত হই না কেন, শ' তাঁর নিজের মৃত্যু নিয়ে কিন্তু আদৌ চিন্তিত নন। মাত্র দুই তিন বৎর পূর্বে তিনি ঘোষণা করেছেন : **My self-love does not make me so mad as to** endure the thought of my living for ever, only a child incapable of comprehending eternity could face such a horror." এই সেদিনও তাঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আফ্রিকার কোন পত্রিকা রসিকতা করে বার্ণার্ড্ শ'র মৃত্যু সংবাদ ছেপেছিল। সংবাদটি বার্ণার্ড্ শ'র গোচরীভূত হওয়ায় তিনি লিখেছিলেন : আমি এখনও মরি নি—অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আছি মাত্র।" জীবনকে শ তীব্র ভাবে ভালবাসেন কিন্তু মৃত্যুকেও তিনি গ্রহণ করেন জীবনেরই একটি অপরিহার্য অংশ রূপে।
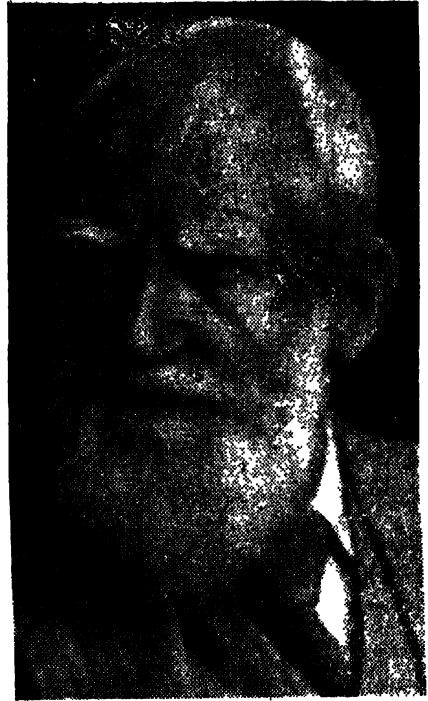
জর্জ বার্ণার্ড শ

১৮৯২ সাল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত বার্ণার্ড্ শ অজস্র নাটক, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গ রচনা লিখেছেন। তারও পূর্বে কয়েক বৎসর কেটেছে তাঁর হাত মক্স করতে। সাংবাদিকতা
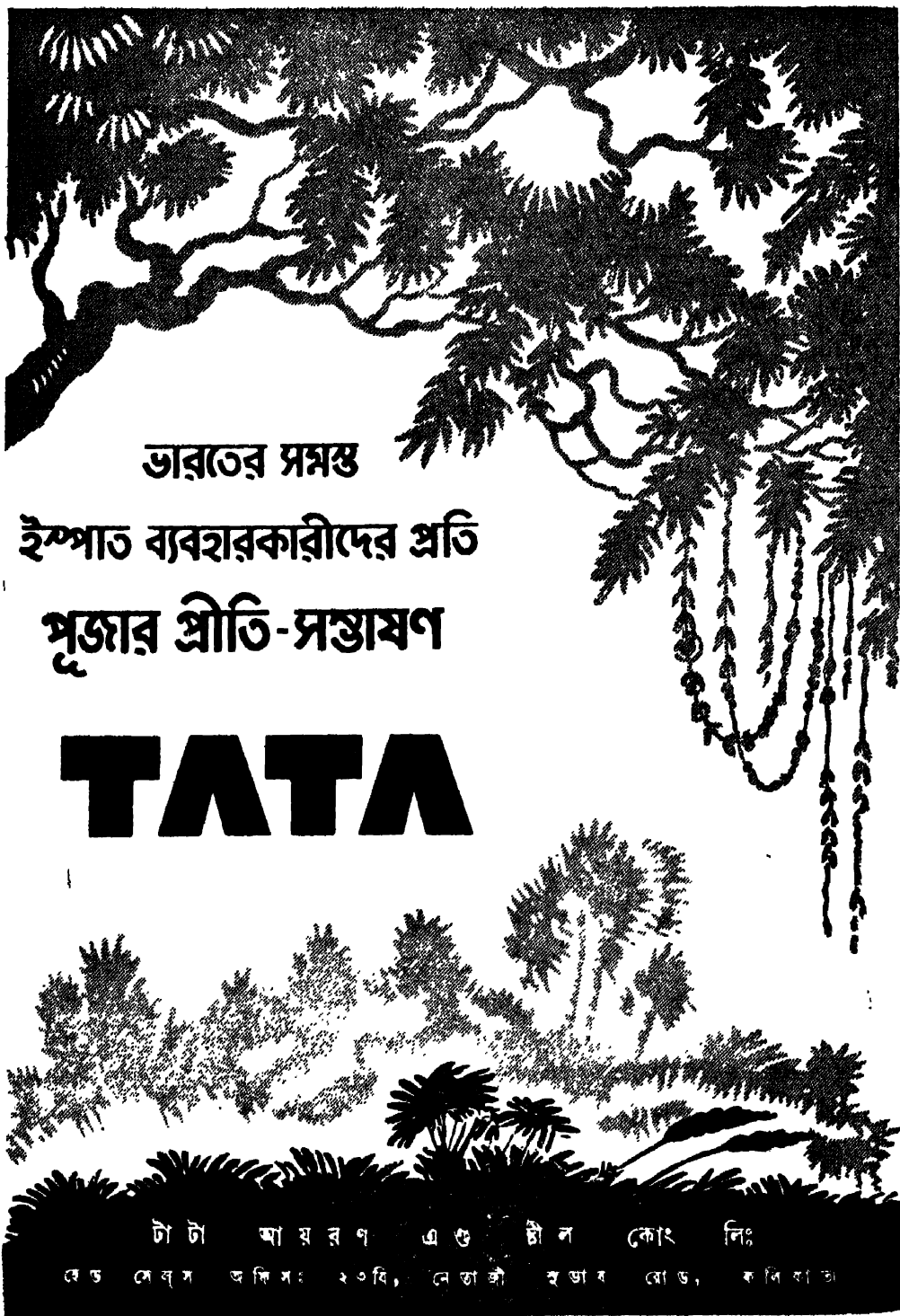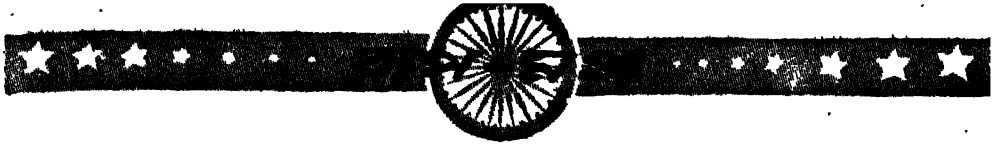
ছিল তাঁর প্রথম উপজীব্য। প্রধানত নাট্য-সমালোচনা ও সংগীত সমালোচনাই তিনি করতেন। আজও সেই সমালোচনার মুল্য একটুও কমে নি। আমাদের রঙ্গমঞ্চে আজ যে একটা গতানুগতিকতার গড্ডালিকা প্রবাহ চলেছে, ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। নাটক লেখা হচ্ছিল এবং অভিনীতও হচ্ছিল। কিন্তু সে নাটক নতুনত্বকামী জনমানবের ক্ষুধার খোরাক যোগাতে পারছিল না। ইউরোপের আধুনিক নাট্য সাহিত্যের জন্মদাতা ইবসেনের নাটক তখন একাধিক ইউরোপীয় দেশে নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত করা সত্ত্বেও সমুদ্র পরিবেষ্টিত ইংল্যাণ্ড সযত্নে তার প্রভাব এড়িয়ে চলছিল। এমন সময় ধূমকেতুর মত এলেন বার্ণার্ড্ শ। তীব্র কণ্ঠের সমালোচনার দ্বারা তিনি একদিকে থিয়েটার জগতের প্রচলিত সংস্কারের গায়ে করতে লাগলেন তীব্র কষাঘাত, অপর দিকে ইবসেনের নতুন নাটকের ভাবধারাকে পরিচিত করাতে লাগলেন ইংল্যাণ্ডবাসীদের কাছে। এই ভাবেই ইংল্যাণ্ডের মঞ্চজগতে এলো নতুন আলোড়ন, কর্মোন্মাদনা। বার্ণার্ড্ শ হলেন তার প্রধান ঋত্বিক। ইংল্যাণ্ডের নাট্য সাহিত্যে বার্ণার্ড্ শ বৈপ্লবিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এলেন। আজও ইংল্যাণ্ডের নাটক সেই ধারা বহন করে চলেছে। একটি ছোট প্রবন্ধে বার্ণার্ড শর বহু বিচিত্র সৃষ্টির আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব। আমি সে দুশ্চেষ্টা করব না। নাট্য সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তাঁর প্রধান কয়েকটি বক্তব্যের সংগে পাঠক পাঠিকাদের পরিচয় করানোর চেষ্টাই শুধু আমি করব।

বিশ বছর বয়স থেকে সুরু করে জীবনের এই ৯২ বৎসর বার্ণার্ড শ'র কেটেছে ইংল্যাণ্ডে। ইংল্যাণ্ড তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হলেও তিনি জাতে কিন্তু আইরিশ। ইংল্যাণ্ডের বুদ্ধিবাদীদের সুতীক্ষ্ণ মনন আর স্বপ্নপ্রিয় আইরিশদের রোমান্টিক রসবোধ এ দুয়ের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখা যায় তাঁর রচনা শৈলীতে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে আয়র্ল্যাণ্ডে শ'র জন্ম। তাঁদের পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তাঁর উপর পিতা ছিলেন মদ্যপ। তাঁর বাল্য ও কৈশোর অনাদর ও অবহেলায় কেটেছিল। বার্ণার্ড শ' নিজে এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তাঁদের পারিবারিক বন্ধন ছিল অত্যন্ত শিথিল। গৃহে কিংবা স্কুলে কোথাও তাঁকে সেভাবে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা হয়নি। বস্তি জীবনের নোংরামি ও কুশ্রীতার সংগে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল অতি শৈশবে। যে দাসীটি তাঁকে সংগে নিয়ে বেড়াতে যেত, সে তাঁকে ভ্রমণের জন্যে কোন উন্মুক্ত খোলা স্থানে না নিয়ে গিয়ে যেত রাজধানী ডাবলিনের বস্তিতে। বস্তিতে দাসীটির আত্মীয় স্বজন থাকত—তাই এ ব্যাপার প্রায়ই ঘটত। পড়াশুনা তাঁকে কেউ না শেখালেও লেখাপড়ার উপর তাঁর অসম্ভব ঝোঁক ছিল এবং দশ বৎসর বয়স হবার পূর্বেই তিনি যে বাইবেল ও সেক্সপীয়রকে কার্যত খুঁটে খেয়েছিলেন, এ কথা শ' নিজেই স্বীকার করেছেন। আর একটি বিষয়েও শিশুকালে তাঁর ব্যুৎপত্তি হয়েছিল—সে হ'ল সংগীত শাস্ত্র। তাঁর মা ছিলেন সংগীত শাস্ত্রে নিপুণা। তাই ১৫ বৎসর বয়েস হবার পূর্বেই বার্ণার্ড শ হ্যাণ্ডেল, মোজার্ট, বিঠোভেন প্রভৃতি ইউরোপীয় বহু সংগীতবিদের সংগীত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জন করেছিলেন। ১৮৭৬ সালে লণ্ডনকে জয় করার দুঃসাহসী পণ নিয়ে বিংশ শতাব্দীর এই সাংস্কৃতিক রাজধানীতে পদার্পণ করেন বিশ বৎসর বয়সের বার্ণার্ড শ। তাঁর পরবর্তী বিশ বছরের লণ্ডন-জীবন দুঃসহ সংগ্রামে পরিপূর্ণ। তাঁর মধ্যে যে অশান্ত শিল্পীর আত্মা কেঁদে মরছিল, তার দাবী মেটাতেই বার্ণার্ড শ'র সব সময় কেটে যেত: জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়াবার সময়ই তিনি পেতেন না। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ বিধানের সেরূপ কোন চেষ্টা যে তিনি করেন নি, একথা শ' নিজে মুখেই স্বীকার করেছেন। শিল্পী পুত্রের খেয়ালের খোরাক যোগানোর জন্য মাকে করতে হত সংগীত শিক্ষকতা। শ বলেছেন: I did not throw myself into the struggle for life. I threw my mother into it. বিরাট প্রতিভাবান পুত্রের কোন কৃতিত্ব পিতাও দেখে যেতে পারেন নি। তার কারণ, তাঁর শিল্পী জীবনের সাফল্য এসেছিল অনেক বিলম্বে—যখন তাঁর বয়েস হয়েছিল ৪০ বৎসরেরও বেশী। শিল্পী জীবনের গোড়ায়
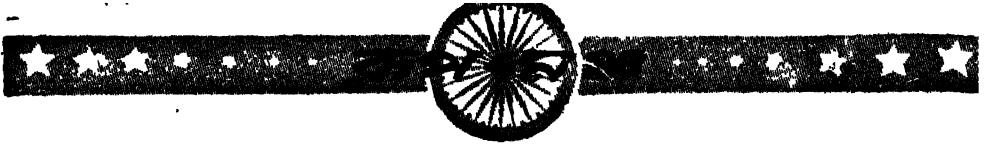
একাধিক সাধারণ উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন, তারই একখানির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন তাঁর এক বন্ধু একটি পত্রিকায়। এই সমালোচনা দেখে অর্থাভাব পীড়িত বৃদ্ধ পিতামাতার পক্ষে যতটা সান্ত্বনা পাওয়া সম্ভব, ততটা সান্ত্বনাই তাঁরা পেয়েছিলেন। এর অধিক কোন সান্ত্বনা পাবার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নি।

যে সুকঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বার্ণার্ড শ'র শিল্পী জীবনের সার্থকতা এসেছে, তা রীতিমত অভাবিতপূর্ব। লণ্ডনে সামান্য মাত্র সাহিত্যিক প্রচেষ্টা অর্জন করতে তাঁর কম পক্ষে বিশ বৎসর সময় লেগেছিল। তাঁর সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায়ের বিস্তৃত খবর জানা যায় না—তবে সে সংগ্রাম যে দুঃসহ হয়েছিল, একথা বলা চলে। তিনি নিজেই আমাদের বলেছেন যে, লণ্ডন জীবনের প্রথম নয় বৎসরে লিখে মাত্র ছয় পাউণ্ড তিনি রোজগার করেছিলেন। পরে তিনি একাধিক সংবাদ পত্রে নাট্য-সমালোচক ও সংগীত-সমালোচকের কাজ নিয়ে জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করেছিলেন। নাট্যকার হবার পূর্বে তিনি হাত দিয়েছিলেন উপন্যাস রচনায় এবং তাঁর চব্বিশ বৎসর বয়েস হবার পূর্বেই তিনি The Irrational Knot নামে উপন্যাস লিখেছিলেন। এর পরে প্রকাশিত হয়েছিল Love Among the Artists, Cashel Byron's Profession এবং The Unsocial Socialist নামক উপন্যাসগুলি। এগুলিকে বিশেষ ভাল উপন্যাস বলা চলে না—তবে তাঁর শিল্পী জীবনের বিবর্তনে এই সব উপন্যাসের মূল্য আছে বৈ কি! তিনি যে একটা বিরাট বুদ্ধিবাদী মন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন, প্রচলিত সংস্কারান্ধ বিশ্বাস ও মতবাদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করাই যে তাঁর কাজ—তাঁর প্রথম বয়সের লেখা এই সব উপন্যাস থেকে এর যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সর্বপ্রকার সংস্কার, বিশ্বাস ও অন্ধ মোহ থেকে তাঁর মন ছিল বিমুক্ত। তিনি নিজের চিন্তা নিজেই করতেন, অন্যে তাঁর হয়ে চিন্তা করে দেবে—এ তিনি মানতে রাজী নন। লণ্ডন জীবনের গোড়ায় তিনি হেনরী জর্জের Progress and Poverty এবং কার্ল মার্ক্সের Das Kapital পড়েছিলেন। ফলে তিনি সোস্যালিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন এবং নব গঠিত ফেবিয়ান সোসাইটিতে যোগ দিয়েছিলেন। এই সূত্রে তৎকালীন ইংল্যাণ্ডের সকল বুদ্ধিবাদীর সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। রাজনৈতিক উৎসাহের প্রাবল্যে তিনি এই সময় হাইড পার্কের জনসভায় বক্তৃতাও দিতেন বলে শোনা যায়। কিন্তু সমাজদ্রোহী রাজনীতিবিদের ভূমিকা গ্রহণের জন্য শ' জন্মান নি—তিনি জন্মেছিলেন মানুষের চিন্তার রাজ্যে বৈপ্লবিক আলোড়ন তোলার জন্যে। তাই হাইড পার্কের মোহ ঘুচতে তাঁর বিলম্ব হয় নি। তৎকালীন সাংবাদিক জগতেও শ' তাঁর গতানুগতিকতার বিরোধী বৈপ্লবিক মতবাদের দ্বারা তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর মতবাদ নিয়ে হাসি ঠাট্টার অন্ত ছিল না। এই সময় তাঁর আর একটি কাজ হয়েছিল তাঁর নাট্যগুরু, ইউরোপে নব নাট্য আন্দোলনের প্রবর্তক ইবসেনের ভাবধারাকে ইংল্যাণ্ডে জনপ্রিয় করা। তাই তিনি The Quintessence of Ibsenism নামক ক্ষুদ্র সমালোচনা পুস্তক লিখেছিলেন। সোস্যালিজম সম্বন্ধেও বহু প্রবন্ধাদি তিনি রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া ছিল তাঁর নির্বিকারে আক্রমণ চালানো। যা কিছু বহুল প্রচলিত, যা কিছুর উপর অন্ধ মানুষের ভক্তি বা বিশ্বাস, তার সব কিছুকেই বার্ণার্ড শ জীবনে তীব্র কষাঘাত করেছেন। তাঁর তীব্র কষাঘাতের হাত থেকে মানব সমাজ ও মানব জীবনের কোন কিছুই বাদ পড়ে নি বলা চলে। তাঁর আক্রমণের বিষয় বস্তুর মধ্যে নীচেরগুলি প্রধান: মাংস খাওয়া, চা খাওয়া, ধূমপান করা, টিকা দেওয়া, ডাক্তারী ব্যবচ্ছেদ, মুক্তিফৌজ, সেক্সপীয়ার প্রীতি, সাম্রাজ্য প্রীতি, প্রচলিত শিক্ষা ও ধর্ম ব্যবস্থা, প্রচলিত যৌননীতি, সামরিক বীরত্ব প্রীতি, ডাক্তার, ধর্মযাজক পার্লামেণ্টের উদার নৈতিক, রক্ষণশীল ও শ্রমিক সদস্য, আয়ার্লাণ্ড ও ভারতের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ডের ব্যবহার, মানুষের প্রেম ও বিবাহগত আদর্শ, মানুষের নীতিজ্ঞান, ইংল্যাণ্ডের বৈদেশীক নীতি প্রভৃতি। আর কত নাম করব। অনেকের ধারণা যে, শ' শুধু নেতিবাচক সমালোচক—দুনিয়াকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিছুই দেন নি। কিন্তু তা সত্য নয়। সমস্ত শিল্পীর মত তিনিও জীবনকে
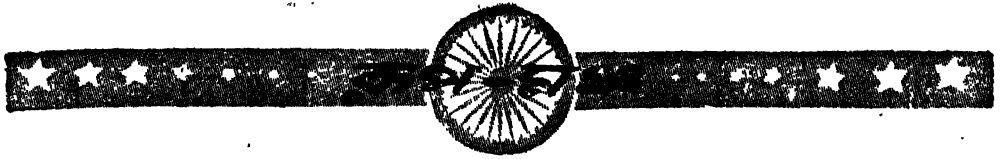
সুন্দর ও সমৃদ্ধই দেখতে চান। তাই জীবনের যা কিছু কুৎসিত ও নিন্দনীয় তাকেই তিনি কঠোর হস্তে আঘাত করেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক সেই কুৎসিতের পূজারী বলেই তিনিও তাঁদের সংগে একমত হবেন—তাঁর মধ্যে এ ভীরুতা বা সংস্কার নেই। তিনি মোহবিমুক্ত মনে সাদা চোখে আমাদের সামজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে আমাদের ভুল ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে সার্থক কোন কিছুই কি নেই? এর পরই আসে বার্ণার্ড শ'র নাট্যজীবনের সাফল্যের কথা। সে ইতিহাস এখানে সবিস্তারে আলোচনা করার চেষ্টা বৃথা। বহু জগতের এবং বহু ধরণের নাটক তিনি লিখেছেন। তার মধ্যে নিচের নাটকগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ : Widowers' Houses, Arms and the Man, Candida, The Devils Disciple, Mrs Warrens Profession, You Never can tell, Caesar and Cleopatra, Man and Supperman, John Bulls other Island, Major Barbara, The Doctors Dilemma, Androcles and the Lion, Pygmallion, Heartbreak House, Back to Methuselah, Saint Joan, The Apple Cart, On the Rocks, Geneva. প্রভৃতি। এ ছাড়া তাঁর বহু একাংকিকা নাটিকাও আছে। এর ফাঁকে ফাঁকে তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা ধারার সমালোচনামূলক গ্রন্থাদিও রচনা করেছেন। তার মধ্যে An Intelligent Womans guide to Socialism এবং Everybodys Palitical what is what প্রসিদ্ধ। তাঁর নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত রূপ (১) সামাজিক ব্যঙ্গ নাট্য রচনায় তিনি অদ্বিতীয়। (২) প্রাচীন যুগের কিংবা মধ্যযুগের ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে তিনি যখন নাটক লিখেছেন তখন আধুনিক বুদ্ধিবাদী মনের সন্ধানী আলো জেলে সে সব চরিত্রের বিচার করেছেন : এ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে প্রচলিত ধারণা আছে তা তিনি পুরোপুরি দিয়েছেন পালটে। (৩) পুরুষ চরিত্রের চেয়ে শ'র নারী চরিত্রগুলি অধিকতর জীবন্ত ও বাস্তব। আধুনিকা নারী নিজের স্বরূপ খুঁজে পাবার পূর্বেই বার্ণার্ড শ' তাঁর নাটকে জীবন্ত করে তুলেছেন। (৪) শ'র নাটক বাস্তব ধর্মী হলেও তর্কপ্রধান একথা আমরা সকলেই জানি। নাটকে কথোপকথনের যে ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছেন তা যে আদর্শ স্থানীয় একথা অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীই এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। তাঁর সংলাপ সহজ, স্বাভাবিক ও বুদ্ধির দীপ্তিতে ধারালো। অতি সহজে তাঁর সংলাপ মনে রাখা চলে। তাঁর দু'টি বিপরীত ধর্মী চরিত্রের মুখে যখন তর্কের তুবড়ি ছুটে, তখন তা প্রায় হাতাহাতি লড়াই-র মতই উপভোগ্য হয়। (৫) সর্বশেষে বার্ণার্ড শ' হলেন প্রচারবাদী নাট্যকার। জীবন সম্বন্ধে তিনি যা ভেবেছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জীবন সম্বন্ধে যে জ্ঞান তিনি অর্জন করেছেন, নাটকের মধ্যে সে কথা প্রচার করতে তিনি আদৌ কুণ্ঠিত নন। সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিতে যাঁরা 'বিশুদ্ধতা'র দোহাই দেন, তাঁরা বার্ণার্ড শ'কে সহজে হজম করতে পারেন না। তার কারণ, বার্ণার্ড শ' সবল কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, শিল্পের জন্যে যে শিল্প তার খাতিরে সামান্য এক কলমও লিখতে তিনি রাজী নন। তথাকথিত 'বিশুদ্ধ' শিল্পবাদীদের সর্বপ্রকার বিরোধিতা সত্ত্বেও বার্ণার্ড শ' আজ বিজয়ী হয়েছেন। সমস্ত পৃথিবী তাঁর প্রতিভার দানকে মাথা পেতে নিতে বাধ্য হয়েছে। ভাবীকালের দরবারে তাঁর সাহিত্যের কতটা টিকবে না টিকবে সে আলোচনা করতে যাওয়া বৃথা। নিরবধি সময় এবং বিপুল পৃথিবীর বিচারে অনেক কিছুরই তো উলট পালট ঘটে যায়। আজকের দিনের সমাজ, সাহিত্য, দর্শন ও শিল্পের উপর বার্ণার্ড শ'র মৌলিক চিন্তার ছাপ ব্যাপক ভাবে পড়েছে—এইটেই কি তাঁর মহত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়? বিরাট বুদ্ধিবাদী মনের অধীশ্বর বার্ণার্ড শ' পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের বুদ্ধির সীমা জানেন বলেই বহু ক্ষেত্রে তিনি সোজাসুজি মানুষের মনের দুয়ারে হানা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করে আশ্রয় নিয়েছেন রঙ্গব্যঙ্গের। তাঁর উদ্দেশ্য এই পথে মানুষকে তাঁর প্রচলিত সংস্কার ও অন্ধ মোহ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। মেশায়ার ভূমিকা নিয়ে যা তিনি সিদ্ধ করতে পারেন নি—তাই তিনি সিদ্ধ করতে চেয়েছেন বিদুষকের ভূমিকা নিয়ে।

মঞ্চ সম্রাজ্ঞী সরযূ দেবী

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর : "যার যেথা ঘর" চিত্রে দেখা যাবে—। চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য।

-কুমারী কেতকী-

মায়ের প্রতিভাকে ম্লান করবার দাবী নিয়ে কেতকী চিত্র ও নাট্য-জগতে পা বাড়িয়েছে। শ্রীমতী প্রভা মেয়ের এই দাবীর সাফল্যের জন্য নিজেও কম চেষ্টা করছেন না। কারণ, এতে তার গৌরবই বাড়বে। 'যার যেথা ঘর'-এ কেতকীকে বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। তাছাড়া মিনার্ভা নাট্য-মঞ্চে শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসের শিক্ষকতায় বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছে।

দুঃখী-দুনিয়া

[নাটিকা]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

★

[প্রডিউসারের অফিস। একটি বড় সেক্রেটারিয়াট্ টেবিল। পাশে টেলিফোন। দেওয়ালে কিছু কিছু বিদেশী অভিনেত্রীদের ছবি। একদিকে একখানা পোস্টার—এই কোম্পানির একখানা ভূতপূর্ব ছবির স্মারক। প্রডিউসার একটা মোটা চুরুট মুখে কতগুলো কাগজপত্র ঘাঁটছেন।

বেয়ারা প্রবেশ করল। একটা কার্ড দিল।]

প্রোডিউসার ॥ (কার্ডটা তুলে দেখে) জল্‌দি বোলাও—

[বেয়ারা বেরিয়ে গেল, প্রোডিউসার দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। লেখক প্রবেশ করলেন। রোগা দীর্ঘদেহ, প্রতিভা-দীপ্ত মুখ। গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবী—আধ ময়লা। সংকুচিত-ভাবেই ঢুকলেন ভদ্রলোক।]

আসুন—আসুন—বসুন—

[নমস্কার করে একটা চেয়ারে সসংকোচে বসলেন ভদ্রলোক]

লেখক ॥ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

প্রোডিউসার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। (একগাল হেসে) আপনার একান্ত গুণমুগ্ধ পাঠক আমি।

লেখক ॥ ধন্যবাদ।

প্রোডিউসার ॥ আপনার 'রাতের আগুন' বইটি পড়লাম মশাই। খাসা লেখা! যেমন ভাষা, তেম্‌নি ভংগি—তেমনি প্লট্—পড়ে আমি স্তম্ভিত!

লেখক ॥ (বিস্মিত) 'রাতের আগুন'! কই, ও নামের কোনো বই তো আমি লিখিনি।

প্রোডিউসার ॥ ওঃ—আপনার লেখা নয়। Sorry! জানেন তো, কত busy লোক আমরা—সব জিনিষ সব সময়ে খেয়াল থাকেনা। (লেখক মৃদু হাসলেন—প্রোডিউসার অপ্রতিভভাবে একটু চুপ করে রইলেন) নিন্—Have a smoke—(সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে দিলেন)।

লেখক ॥ ধন্যবাদ—আমি খাই না।

প্রোডিউসার ॥ খান্ না—Oh, you are good chap—I see!

[বেয়ারা প্রবেশ করল]

বেয়ারা ॥ (প্রডিউসারকে) হুজুর, আপ্‌কো পেগ্—

প্রোডিউসার ॥ (আড় চোখে লেখকের দিকে তাকিয়ে) নেহি—আভি নেহি—

লেখক ॥ (অবস্থাটা উপলব্ধি ক'রে) খান্ না আপনি। সংকোচের কোনো কারণ নেই।

প্রোডিউসার ॥ তব্ লে আও (বেয়ারা যেতে উদ্যত) ঠাহ্‌রো। (লেখকের প্রতি চোখের ভংগি ক'রে) দু' পেগ্?

লেখক ॥ Excuse me ওসব আমার চলেনা।

প্রোডিউসার ॥ (সংকোচটা এক্ষণে কাটিয়ে উঠেছেন) একেবারে কিছুই খাবেন না? তা হলে একটু জিন? জিঞ্জার দিয়ে খান। দিব্যি গোলাপী আমেজ আসবে। মুখে একটুও গন্ধ থাকবে না।

লেখক ॥ আজ্ঞে না।

প্রোডিউসার ॥ তা হলে সুইট্ ভারমাউথ? সেরা জিনিষ মশাই—অ্যাল্‌কোহল্ নেই বললেই চলে—

লেখক ॥ (সভয়ে) না—না, মাপ করবেন।

প্রোডিউসার ॥ সেকি! গল্প লেখেন আপনারা—অথচ একেবারে নিরামিষ! 'মুড্' আনেন কি করে? আমার তো মশাই একটু খেয়ে না নিলে কোনো concentration-ই আসে না।

লেখক ॥ (মৃদু হাস্যে) সকলে এক রকম নয়।

প্রোডিউসার ॥ (বোকার মত হেসে) হে-হে, তা বটে, তা বটে! আপনারা একেবারে আলাদা জগতের জীব মশাই—quite different! (বেয়ারাকে) হাঁ করকে কেয়া দেখতা? যাও—

[বেয়ারা চলে গেল]

লেখক ॥ আপনি যেজন্য আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন, সেটা একটু তাড়াতাড়ি বললে ভালো হয়। আমার আবার কাজ আছে, উঠ্‌তে হবে।
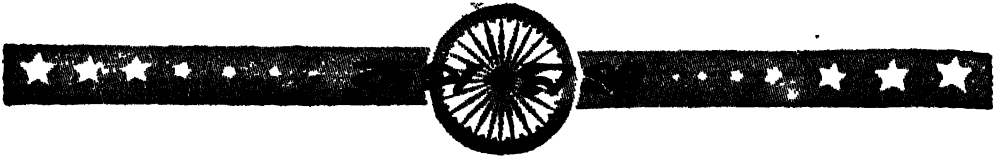
প্রোডিউসার ॥ (ব্যগ্রভাবে) উঠবেন কী রকম ? বসুন—বসুন ! আপনার সংগে যে আমার ভারী দরকারী কথা আছে ।

লেখক ॥ (হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে) বলুন !

[বেয়ারা প্রবেশ করল, টেবিলে পেগ্ রেখে চলে গেল। পেগ্ নিয়ে একটা চুমুক দিলেন প্রোডিউসার।]

প্রোডিউসার ॥ (সামনে ঝুঁকে পড়ে অন্তরংগ ভংগিতে) দেখুন, আপনার লেখার সংগে আমার মনের সম্পূর্ণ মিল আছে। আপনি লেখার ভেতরে বড়লোকদের তীব্র ভাষায় গাল দিয়েছেন। ঠিক করেছেন, দেওয়াই উচিত। এক আধবার নয়, হাজার বার।

লেখক ॥ ধন্যবাদ।

প্রোডিউসার ॥ ধন্যবাদ ! ধন্যবাদ মানে ? আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন কি মশাই, সমস্ত দেশের উচিত আপনাকে—আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া। মশাই, আমি জানি, দেশে গণ-বিপ্লব আসছে, আসছে নতুন যুগ ; আর আপনারা হচ্ছেন সেই বিপ্লবের অগ্রদূত—মানে পায়োনীয়ার। রুশো, কার্ল মার্কস্, ভল্টেয়ার, লেনিন, আরো কে কে লেখক আছেন বলুন দেখি ?

লেখক ॥ অনেকেই আছেন (মৃদু হাসল), কিন্তু তাঁদের কথা থাক্। আমার একটু তাড়া আছে। আমি বরং আজ—

প্রোডিউসার ॥ (শশব্যস্তে) আরে, না-না, সে কি হয় ! আসল কথাই যে আপনাকে বলা হয়নি ! (কথার ভংগিতে বোঝা গেল প্রোডিউসারের যথেষ্ট নেশা হয়েছে, সম্ভবতঃ এইটিই তাঁর তৃতীয় বা চতুর্থ পেগ্) শুনুন। (গলা নামিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে) জানেন মশাই, আমিও আপনাদের দলে।

লেখক ॥ (কৌতুক বোধ করে) সত্যি নাকি ?

প্রোডিউসার ॥ (টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত ক'রে) Exa-a-a-ctly ! না, না, ভয় পাবেন না, সাহিত্য চর্চা আমি করিনা। ওসব কি আর আমাদের পোষায় মশাই ? তবে আমিও চাই গরীবের দুঃখ দূর করতে, বড়লোকের অত্যাচার ঘোচাতে—(শেষের দিকে স্বর দৃঢ় হয়ে উঠল)।

লেখক ॥ সাধু সংকল্প। (ঘড়ির দিকে তাকিয়ে) কিন্তু—

প্রোডিউসার ॥ আরে বসুন না দাদা, অত ব্যস্ত কেন ! (লেখক হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা—প্রোডিউসার এক চুমুকে পেগ্টা নিঃশেষ করলেন) শুনুন. বস্তি দেখেছেন কখনো ?

লেখক ॥ দেখেছি কিছু কিছু।

প্রোডিউসার ॥ (চুরুটে অগ্নিসংযোগ ক'রে) কি দেখেছেন, কতটুকু দেখেছেন ? (চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে) আপনাদের চাইতে আমি ঢের বেশি দেখেছি মশাই। মর্মে মর্মে বুঝেছি সেখানে কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনার ভেতরে মানুষ দিন কাটায়।

লেখক ॥ (সাশ্চর্যে) বটে !

প্রোডিউসার ॥ হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন। (ঢুলু ঢুলু ভাবে) জানেন, টালিগঞ্জে আমার নিজেরই একটা বস্তি ছিল ! আমি বহুবার সেখানে গেছি মশাই। দেখেছি গোরু-ভেড়ার মতো মানুষ কী ভাবে সেখানে দিন কাটায়। কাদা, নোংরামি, ভাঙা ঘর। দু' মিনিট দাঁড়ালে দম বন্ধ হয়ে আসে। অথচ সেখানে বাস করে কারা, জানেন ?

লেখক ॥ আপনিই বলুন।

প্রোডিউসার ॥ (নেশা-ধরা উত্তেজিত গলায়) জানেন, কারা বাস করে ? তারা আমার আপনার মতো ভদ্রলোক নয়—ভালো জামা কাপড় পরতে পায় না। অথচ তারাই হচ্ছে সভ্যতার বনিয়াদ—তারাই হচ্ছে কলকাতার প্রাণ। সকলকে অন্ন জোগায়, অথচ খেতে পায়না, অট্টালিকা গ'ড়ে দেয়, অথচ নিজেদের থাকবার কুঁড়ে জোটে না।

লেখক ॥ (অভিভূত হ'য়ে) বাস্তবিক !

প্রোডিউসার ॥ বিশ্বাস করুন, কী আত্মগ্লানি বোধ করলাম আমি ! এ অন্যায়, নিতান্ত অন্যায়। এর প্রতিবিধান করতেই হবে। বলব কি মশাই, ভাবতে ভাবতে আমার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল।

লেখক ॥ (মুগ্ধভাবে) আপনি নিশ্চয় বস্তির উন্নতি করে দিলেন ?

প্রোডিউসার ॥ (নেশার ঝোঁকে সকরুণ কণ্ঠে) বস্তির উন্নতি! একথা আপনিও বল্লেন স্যার? বস্তি থাকবে কেন at all? কেন এই লাঞ্ছনা সইবে দেশের লোক? যেদিন সারা ভারতবর্ষের সব বস্তিগুলোকে আমরা তুলে দিতে পারব, জানব সেদিনই দেশে সত্যিকারের স্বাধীনতা এসেছে।

লেখক ॥ (চকিত ভাবে) হ্যাঁ—খাঁটি কথাই আপনি বলেছেন।

প্রোডিউসার ॥ বাজে কথা আমি বলিনা মশাই—যা বলি, ভেবেই বলি। দেখুন, পুঁথি পড়ে কথা শেখবার অভ্যেস আমার নেই। নিজে যা দেখি, যা বুঝি, তাই আমার সঞ্চয়।

লেখক ॥ (তেমনি মুগ্ধ ভাবে) চমৎকার!

প্রোডিউসার ॥ (সম্ভবতঃ নেশার আমেজে, অথবা গরীবের দুঃখেও হ'তে পারে—চোখে তাঁর জল এসে গেছে। জামার আস্তিনে চোখ মুছে নিলেন) সত্যি. ভারী কোমল মন আমার। এসব অবিচার অত্যাচার আমাকে ভারী কষ্ট দেয়, বুঝলেন! তাই যারা এর প্রতিবাদ করে, তাদের ভারী শ্রদ্ধা করি আমি। সেই জন্যই তো বলছিলাম. আপনি আমার প্রাণের কথা আঁকড়ে টেনে বের করে ফেলেছেন, আপনি আমার নমস্য।

লেখক ॥ (কিছুক্ষণ বিনীত ও মুগ্ধভাবে চুপ করে থেকে) তা, আমাকে আপনি—(আবার ঘড়ির দিকে তাকালো)

প্রোডিউসার ॥ (চুরুটে টান দিয়ে) আহা, সেই জন্যেই তো আপনাকে আটকে রাখছি। (একটু চুপ করে থেকে) আপনার কিছু সহায়তা চাই যে!

লেখক ॥ সহায়তা! কী সহায়তা?

প্রোডিউসার ॥ সেই কথাই বলছি। মানে—সেজন্য যথা-যোগ্য পারিশ্রমিক দেব আপনাকে। মানে—হে-হে—ঠকবেন না আমার কাছে।

লেখক ॥ (বিস্মিত) কী ব্যাপার বলুন তো?

প্রোডিউসার ॥ (খাঁকারি দিয়ে) বেশ ভালো করে একটা সিনেমার গল্প লিখে দিন। ভুখা মজদুর, পীড়িত—নির্যাতিত - বড়লোকের অত্যাচারে কেমন করে তারা মরে যাচ্ছে, তার একটা জলন্ত ছবি এঁকে দিন দেখি। (একটু চুপ করে) দেখিয়ে দিন শোষণের ভয়ংকর রূপ—

লেখক ॥ (ঘাবড়ে গিয়ে) আপনার বস্তি থেকে ছবি তুলবেন বুঝি? বাস্তবকে ফুটিয়ে তুলবেন?

প্রোডিউসার ॥ বস্তি! (টেবিলে কিল দিয়ে) কোথায় বস্তি! মানুষের এই অপমান—মনুষ্যত্বের এ বিকার—একি সওয়া যায় দাদা? ভারী কোমল প্রাণ আমার—বড় কোমল প্রাণ—(ঢুলু ঢুলু চোখে চেয়ে রইলেন)!

লেখক ॥ তা হলে বস্তির কী হ'ল?

প্রোডিউসার ॥ তুলে দিলাম।

লেখক ॥ তুলে দিলেন!!

প্রোডিউসার ॥ নিশ্চয়! (জোর দিয়ে) উঠতে কী চায়? শেষে পুলিশ ডাকতে হ'ল। ভেঙে-চুরে তারাই সব ব্যবস্থা করে দিলে। আমার থিওরী কি জানেন মশাই? ব্যাধি সারাতে হলে মাঝে মাঝে শল্য প্রয়োগ করতে হয়। সমাজের পক্ষেও সেটা প্রযোজ্য।

লেখক ॥ (একটা অব্যক্ত শব্দ করে) ওঃ!!!

প্রোডিউসার ॥ ওখানে নতুন ষ্টুডিও করেছি—মানে ওই বস্তিটা ভেঙে। লাখ চারেক টাকা বেরিয়ে গেল। যুদ্ধের জন্য যা দাম চড়েছে মশাই, লাখ খানেক গেল। ওখানেই নতুন বই তুলছি আমার—"দুঃখী-দুনিয়া"। লোকে আজকাল এই সবই চায়—বুঝলেন না? তাছাড়া হিন্দি version-ই করব—ওর একটা All-India Market আছে কিনা! লিখবেন গল্প?

লেখক ॥ (স্তব্ধ)।

প্রোডিউসার ॥ (চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে) তা ছাড়া দুর্ভিক্ষেরও একটা ছবি দিতে চাই, খুব excitement হবে। দিন না দাদা, একটা গল্প লিখে। পারিশ্রমিক যা চান—

লেখক ॥ (হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে) গল্প আর আপনার দরকার হবে না—আবার দুর্ভিক্ষ এলো বলে। রাস্তা থেকে ছবি নিলেই চলবে। 'দুঃখী-দুনিয়া' নামটাও সার্থক হবে—অল্প খরচায় ঢের বেশি লাভ করতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার—

[দরজা আছড়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল]

প্রোডিউসার ॥ (খানিক স্তব্ধ বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইলেন, তারপর চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়ে অলস স্বরে বললেন) Nonsense!

— যবনিকা—

বিপ্লবী কানাইলাল

(রেখা-নাট্য)

অধ্যাপক শ্রীনরেশ চক্রবর্তী

★

[শঙ্খধ্বনি]

কথক :—জন্মাষ্টমী তিথি—ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি—পীড়িত মানবের আর্তস্বরে—এমন একটা দিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন—মানুষের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।—১৮৮৭ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর—সেদিনও জন্মাষ্টমী তিথি—চন্দননগরের কংস-কারায়—শত শঙ্খনিনাদে কে সেদিন জন্মগ্রহণ করে? বীর কানাইলাল—। মাতা ব্রজেশ্বরী নাম রাখেন সর্বতোষ—কিন্তু শৃঙ্খলিতা বঙ্গ জননীর পাষাণ-কারার অন্তরালে আর্তবেদনায় জন্মগ্রহণ করে বিপ্লবী কানাইলাল। কৈশোর শেষে পিতার চাকুরী স্থল বোম্বাই ছেড়ে চন্দননগরে পড়েন কানাইলাল—দীক্ষা গ্রহণ করেন স্বদেশী মন্ত্রের। শিক্ষাগুরু শিক্ষক চারুবাবু—। শরীর চর্চা চলতে থাকে কানাই এর। আসে বুঝি তাঁর পরীক্ষার দিন—: পাড়ার রাধা পিসি ডাকেন, কানাই এর মা, ব্রজেশ্বরী দেবীকে—

রাধা :—হ্যাঁগা—কানাই এর মা আছ—?

ব্রজেশ্বরী :—কে, রাধাপিসি! এস, অনেক দিনত দেখি নি,—কোথায় ছিলে এতদিন?

রাধা :—বলি তোমার ছেলে কানাই কোথায় বৌমা?

ব্রজেশ্বরী :—কেন?—

রাধা :—শুনিনাকি খুব পালোয়ানি শিখেছে,—লাঠি খেলে—যুযুৎসুর প্যাঁচ জানে—

ব্রজেশ্বরী :—কেন—কি হয়েছে রাধাপিসি—?

রাধা :—আর রাধাপিসি—ছেলেটি তোমার ওসব না শিখে বাঁশী বাজালেও কাজ দিত,—না হয় তাই শুনে মাঝে মাঝে ছুটে আসতাম—

ব্রজেশ্বরী :—বাঁশী না বাজাতেইত ছুটে এসেছ—।

রাধা :—কি আর করি তোমার ছেলেকে যে ভালবেসে ফেলেছি—বৌমা।

ব্রজেশ্বরী :—তুমি কি মনে করেছ, এই বুড়ী রাধার সংগে আমার কানাই-এর বিয়ে দেব—।

রাধা :—চুলই না হয় দুই একটা পাকতে সুরু করেছে—তা এমন আর কি বুড়ী হয়েছি! না, কানাই-এর মা, গঙ্গার ধারে ঐ বাড়ীগুলোতে ফিরিঙ্গি সাহেবরা যে কি অত্যাচার আরম্ভ করেছে—পোড়া বাংলা দেশের লোকগুলোত কিছু বলবে না—সাহেব কিনা—যেন জুজু—

ব্রজেশ্বরী :—তা কানাই কি করবে—?

রাধা :—তা ওরা সব থাকতে সাহেব প্রকাশ্য রাস্তায় সবাইকে বেত মারবে?

ব্রজেশ্বরী :—বল কি পিসি—

রাধা :—তবে আর বলছি কি? রাম, রাম, রাম,—কি সে মদের গন্ধ—আর পথে পথে হল্লা—যাকে সামনে পায়, তাকেই সপাং সপাং করে বেত মাচ্ছে—

কথক :—কানাইলাল-এর কানে এসংবাদ পৌঁছাতে বাকী থাকে না। বীরদর্পে বেরিয়ে পড়ে কানাইলাল—ঋজু দেহ—চক্ষে ব্যাঘ্রের দৃষ্টি—সাহস-উন্নত বক্ষ—রাজপথে এগিয়ে চলেন কানাইলাল—অদূরে দেখা যায় গঙ্গা—ভেসে আসে বাতাসে—নিরীহ জনতার কাতরতা আর মাতাল সাহেবদের উদ্ধত, অসংগত চীৎকার—

জনতা :—পালা—পালারে—সাহেব আসছেরে, সাহেব—

সাহেব :—এ্যাঁ, তোমলোগ হিয়া হল্লা কাহে করতা হায়—যাও—ভাগ যাও হিয়াছে—

জনতা :—(১) আমি কিছু করিনি বাবা—আমার মাসির অসুখ কিনা—ওষুধ আনতে যাচ্ছি বাবা—

সাহেব :—চোপরাও—জো, হুইপ আচ্ছা করকে ধোলাই করকে ছোড়িয়ে দাও—

(বেতের বাড়ী ও লোকটির চিৎকার)

জনতা :—(১) ওরে বাবা—গেছিরে বাবা—

সাহেব :—বাবা—Father বোলতাহায়—হাঃ-হাঃ-হঃ (হাসি)

কানাই :—থাম, থাম বলছি সাহেব—

সাহেব :—Who are you? তুমি কোন আছ?

কানাই :—আমি যেই হইনা কেন—বেত নামাও—তোমরা
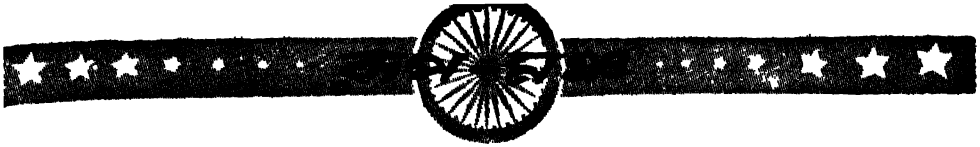
মা স্বাধীন দেশের সভ্য সাহেব—লজ্জা করে না রাস্তার উপরে মদ খেয়ে এমন হৈ হল্লা করতে—?

সাহেব :—হামরা রাজ্য জিতিয়া লইয়াছে, হামরা যা খুসী তা করতে পারে—।

কানাই :—না, তা করতে পার না—

সাহেব :—আলবৎ করতে পারে—

কানাই :—What do you think, তোমরা রাস্তা দিয়ে বেত মারতে মারতে যাবে, আর আমরা হাতও উঠাতে পারব না—

সাহেব :—Don't bark, you dogs,—

কানাই :—Shut up, dogs, এদেশে যে বাঘও থাকে, দেখে যাও সাহেব—

সাহেব :—Jo! Whip, বেত লাগাও—।

কানাই :—বেত লাগাবে, না? ঘুসিয়ে তোমাদের আমি——

সাহেব :—ও: ও: ও: No more, No more, Please—we go, we go, হামরা এমন আর করবে না—হামরা যাবে—হামরা যাবে—

কানাই :—যাও সাহেব—হ্যাঁ শুনে যাও—সে দিনের আর বেশী দেরী নেই—এই দেশ থেকেই তোমাদের যেতে হবে—মাথা মুড়ে, ঘোল ঢেলে—গাধায় চড়িয়ে—তবে তোমাদের সেদিন বিদায় দেব—। এটা বাংলা দেশ—তা যেন মনে থাকে—।

কথক:—বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজের অত্যাচার বাংলায় করেছিল অগ্নিযুগের সৃষ্টি—। ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জন, ফুলার, কিংসফোর্ড-এর অপকীর্তি—কালো অক্ষরে লেখা আছে—। সাগর গর্জনে—তরুণ বাংলা সেদিন এদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায়—নগরে নগরে স্থাপিত হয় গুপ্ত সমিতি। চন্দননগরে এসে লাগে এর ঢেউ—। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র,—রবীন্দ্রনাথের তেজদীপ্তি—উদাত্ত আহ্বান,—অন্যদিকে অরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতির—রক্তের রাখী উৎসব—। কলকাতায় গুপ্তসংঘে যোগদান করবেন মনস্থ করেন কানাইলাল,—এমন সময় এক উড়ো চিঠি এসে পৌঁছায় তাঁর হাতে—

মা :—কানাই—ও কানাই—

কানাই :—মা—

মা :—তোর একখানা চিঠি, এই নে—হ্যারে তোর বি, এ, পাশের খবর বেরুল?

কানাই :—দুই এক দিনের মধ্যেই পাওয়া যাবে—।

মা :—ঠাকুর এখন ভালোয় ভালোয় পাশ করিয়ে দিলে হয়—।

রাধা :—তোমার যে কি কথা বৌমা—কানাই কি ফেল করবার ছেলে নাকি?

মা :—এস রাধাপিসি—না তাই বলছিলাম—দেখনা ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে ছেলের কি চেহারা হয়েছে—।

রাধা :—সে আমি বলে দিচ্ছি বৌমা—কানাই তোমার খুব বড় লোক হবে—চাকুরী করে কত টাকা আনবে,—লাল টুকটুকে বৌ আসবে—হ্যারে কানাই—না হয় কুঁজো দাসী হয়েই থাকব তোর কাছে—পছন্দ হয় না বুঝি—?

কানাই:—তা জান না বুঝি রাধুঠাকুমা—আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।

মা ও রাধা—(হাসি)

মা :—এস রাধাপিসি, আমরা ঘরে গিয়ে বসি—

রাধা :—চল—চল।

কথক :—মায়ের মন আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—কানাই তার বড়লোক হবে। কিন্তু কানাইলাল কি করেন—নিভৃত কক্ষে—চিঠি খুলে পড়েন কানাইলাল—কার এ চিঠি—কেন এ চিঠি—আবার পড়েন তিনি সেই চিঠি—:—

কানাই :—"কানাইলাল,
যদি তুমি সত্যই দেশ সেবক হও, দেশহিতে জীবন বলি দেবার স্পর্ধা রাখ, তবে আগামী অমাবস্যার-দ্বিপ্রহর নিশিথে—শ্মশানের বটবৃক্ষমূলে আমার সংগে দেখা করো—"
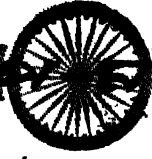
অমাবস্যার দুপুর রাত্রে শ্মশানে যেতে হবে—চিঠিতে কোন নাম নেই! কে দিল এই চিঠি—

[বারটা বাজিল]

কথক :—বারটা বেজে গেল—অমাবস্যার তিথির রাত্রি ভেদ করে—কে ঐ চলেছে যাত্রী? সম্মুখে বুঝি ধ্রুবতারা পথ দেখায়,—শ্মশানের ভেজাগন্ধ পাওয়া যায়,—নিস্তব্ধ আঁধার রাত্রি যেন কথা বলে। মাঝে মাঝে ঝি ঝি শব্দ—দূরে কুকুরের ডাক—প্রোথিত শব নিয়ে কাড়াকাড়ি করে শৃগালের দল।—ভীমা ভয়ঙ্করী কালী মূর্তি কি দানব দলনীরূপে দেখা দিয়েছেন—? কানাইলাল বটবৃক্ষের তলায় উপস্থিত হন—একটী কাল মূর্তি তাঁর সম্মুখে এসে হাজির হলো—।

মতিলাল :—তোমার এত দেরী হলো যে—

কানাই :—শ্মশানের ভূত ত আর অফিসের কেরাণী নয়। তোমাকে আমি চিনেছি—।

মতিলান :—এত তাড়াতাড়ি চিনলে?

কানাই :—অন্ধকারেইত লোকের আসল পরিচয় মতিলাল—। দিনের আলোয় যা ঢাকা থাকে, রাতের অন্ধকারে তা প্রকাশ পায়—

মতিলাল :—শ্মশানে আসতে তোমার ভয় করল না কানাই?

কানাই : সারা বাংলা দেশইত মহা শ্মশান হয়েছে—শ্মশানেইত আমাদের কাজ—এই শ্মশানেইত আমরা শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করব মতিলাল।

মতিলাল :—শোন, যে জন্য তোমায় ডেকেছি—।

কানাই :—শ্মশানে আসবার মত সাহস আছে কিনা—?

মতিলাল :—না, তিনটে সাহেব যে একা ঘায়েল করতে পারে—তাঁর সাহসের অভাব নেই—সে কথা আমি জানি—। তবে চন্দননগরে ফরাসীরা যে ইংরেজের চেয়েও বেশী অত্যাচারী হ'য়ে উঠল—। তুমি আমাকে এ বিষয়ে কি সাহায্য করতে পার? তারই জন্যে তোমাকে ডেকেছি—।

কানাই :—শুনেছি ওদের অত্যাচারের কথা—

[দূরে শোনা গেল—আগুন—আগুন—আগুন—জল, জল আন—জল—]

মতিলাল :—কানাই, চন্দননগরে আগুন লেগেছে—আগুন!

কানাই :—ও আগুন শুধু চন্দননগরে নয় মতিলাল—সারা ভারতের ভাগ্যাকাশে আজ আগুনের লেলিহান শিখা—। দেখ্‌ছো না সারা শ্মশান আগুনের ঝলকে লাল হয়ে গেল—চারিদিকে শ্মশান শৃগালের উৎসব,—গঙ্গার অর্ধে বুকে জাগে বালুর চড়া। জল চাই মতিলাল—এ আগুন নেবাবার জল চাই—

মতিলাল :—তাইত কানাই, কোথায় জল—কোথায় পাই জল—।

রাধা :—জল না জোঠে বুকের রক্ত ত আছে কানাই—

কানাই :—রাধা ঠাকুমা—?

রাধা :—দেনা তোর কোমরের ছোড়াখানা—বুকের রক্ত ঢেলে দেই—। রক্ত দিয়েও এ আগুন তোরা নিভাতে পারবি নে কানাই?

কানাই :—কোন চিন্তা নেই মতিলাল—ভারতব্যাপী ব্রিটিশের এই অত্যাচারের মহাবহ্নি আমরা বুকের রক্ত দিয়ে নিভিয়ে দেব। রাধা ঠাকুমা—তোমাকে প্রণাম করি। তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর—মহাশ্মশানের মিলন ভূমিতে দাঁড়িয়ে তুমিই আমাদের হাতে বেঁধে দাও মরণ বিজয়ী রক্ত রাঙ্গা রাখী—

* * * *

কথক :—বি, এ, পাশ করে কলকাতায় বারীন্দ্রের গুপ্ত-সংঘে যোগদান করেন কানাইলাল—। মাতার আশীর্বাদ নিয়ে তিনি কলকাতায় এলেন—। আর স্বপ্নের মধ্যে সত্য হয়ে রইল মহাশ্মশানের মিলন রাখী। স্বদেশী যুগের অগ্নিশালায়—ইংরাজ ধ্বংসী বোমা তৈরী হয়—। কোথা হ'তে আসে পিস্তল—' ইংরেজের দমননীতির বিরুদ্ধে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দাঁড়ায় বাংলার তরুণ দল—। এমন সময়ে চলে কিংসফোর্ডের হত্যার ষড়যন্ত্র—মজঃফরপুরে যায় প্রফুল্ল চাকী আর ক্ষুদিরাম। কিন্তু ব্যর্থ হয় সে চেষ্টা—আত্মহত্যা

করে প্রফুল্ল,—ফাঁসির কাঠে জীবন দেয় ক্ষুদিরাম—। দেশব্যাপী চলে ব্যাপক খানাতল্লাসি—আর ধরপাকড়। মানিকতলার গুপ্তসমিতির সকলেই ধরা পড়েন—ধরা পড়েন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, হেমচন্দ্র, নরেন গোঁসাই প্রভৃতি আরো অনেকে—। মেদিনীপুরের গুপ্ত সংঘের নেতা সত্যেন্দ্রনাথ—নিরাপদ এবং কানাইলাল—। রাধা এসে ডাকে ব্রজেশ্বরীকে—।

রাধা :—বৌমা আছ—বৌমা—।

মা :—এস রাধা পিসি—শুনেছেত কানাই এর কাণ্ড—।

রাধা :—শুনেছি, তুমি ভেব না বৌমা—।

মা:—না, ভেবেই আর কি করব পিসি—। ওযে শেষে গুপ্ত সংঘে যোগ দেবে তাত ভাবি নি—। কিন্তু আমারত মনে হয় সাহেব মারার মধ্যে ও নেই—হয়ত ওরা ছাড়াই পাবে—।

রাধা :—শুনছি নাকি—নরেন গোঁসাই সরকারের সাক্ষ্য হয়েছে—তাহলেত ওদের অনেক কথা ইংরাজরা জানতে পারবে—।

মা :—ওদের মধ্যেও বিশ্বাসঘাতক থাকে রাধা পিসি ?

রাধা :—থাকে না, বিশ্বাসঘাতক আছে বলেইত ইংরেজ রাজত্ব করতে পাচ্ছে।

মা :—কেন, বাংলা দেশে কি এমন ছেলে নেই যে, ঐ বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে শেষ করে দিতে পারে ?

রাধা :—আছে বৈকি !

কথক :—নিশ্চয়ই আছে—। নরেন গোঁসাইএর রাজসাক্ষী হবার কথা—বিপ্লবী দলের সকলেই জানতে পারে। অরবিন্দ, বারীন্দ্র ভাবছিলেন—কি করে নরেন গোঁসাইকে ইহ জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়—এমন সময়ে সত্যেন্দ্র এলেন—অগ্রণী হয়ে হেমচন্দ্র জানালেন তাঁর কথা। অসুখের অছিলায় হাসপাতালে স্থান নিলেন সত্যেন্দ্রনাথ—কিন্তু কোথায় পিস্তল,—পিস্তলের যোগাড় হলো—একটা নয়, দুটো—। কানাইলালের উপর ভার পড়ল—সত্যেন্দ্রকে পিস্তল পৌঁছে দিতে—। পেটের অসুখের ভান করে কানাইলালও শয্যা নিলেন হাঁসপাতালে—। কিন্তু কোথায় নরেন গোঁসাই—বাংলার আর একজন মীরজাফর—। সত্যেনের অনুরোধে হাঁসপাতালে তাঁর সংগে দেখা করতে আসে নরেন—

নরেন:—কেমন আছ ভাই সত্যেন—।

সত্যেন :—নরেন এসেছ—? এস—। তোমার কথাই ভাবছি—। তুমি খুব ভাল কাজ করেছ—আমিও রাজসাক্ষী হব—কিন্তু সাবধান—কেউ যেন জানতে না পারে।

নরেন :—তুমি যদি আমার পাশে দাঁড়াও সত্যেন, তবে আমাদের আর কোন ক্ষতিই হবে না—! দুই জনেই বেঁচে যাব—।

সত্যেন :—বেঁচে যাব না ? আরে ছোঃ ছোঃ—বোমা মেরে কি কখনও দেশ উদ্ধার হয়—তুমি পুলিশকে সব বলে দিয়েছ ত' নরেন—।

নরেন :—অনেক কিছু পুলিশ আমার কাছ থেকে জেনেছে—আগামী কাল আবার Introgation আছে—এবার তুমি যদি আমার Coroborater হও, তবেত সোনায় সোহাগা হয়ে যাবে—

সত্যেন :—ঠিকই বলেছ—সোনায় সোহাগাই হয়েছে। আস্তে কথা বলো—কানাইলাল আবার অসুস্থ হয়ে হাঁসপাতালে আছে—কি জানি কোথা থেকে শুনে ফেলবে—?

নরেন :—না, না, তোমার আর আমার কথা কেউ জানতে পারবে না—

সত্যেন :—না, কেউ জানতে পারবে না—হাঃ হাঃ হাঃ—বিশ্বাসঘাতক—কেউ জানতে পারবে না—কেউ জানতে পারবে না—[পিস্তলের শব্দ]

নরেন :—পুলিশ, পুলিশ, খুন করলে—

সত্যেন :—কানাই, নরেন পালাল—গুলি কর, গুলি কর—
[গুলির শব্দ]

কানাই :—কোথায় পালাবে ? আমি ঠিক আছি সত্যেনদা—কোথায় পালাবে ও— [গুলির শব্দ]

নরেন :—পুলিশ, পুলিশ—সত্যেন, কানাই আমাকে খুন করলে, খুন করলে—
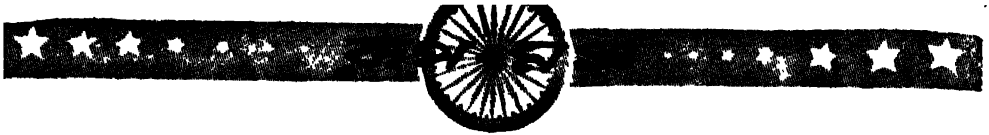
কানাই :—বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরদের আমরা এমন করেই খুন করি। [গুলির শব্দ]

সত্যেন :—গুলি কর, গুলি কর কানাই—ওযে পালাল—।

কানাই :– আর পালাতে পারবে না—

[পর পর পাঁচটা গুলির শব্দ]

নরেন :—ওঃ—ওঃ—সত্যেন—কানাই—ওঃ—

[পাগলা ঘণ্টা ও কোলাহল]

কথক :—বাতাসে ভেসে আসে বুঝি মাতা ব্রজেশ্বরীর অন্তরের কথা—

মা :—কেন, বাংলা দেশে কি এমন ছেলে নেই যে, ঐ বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে শেষ করে দিতে পারে—

* * * *

কথক :—গোঁসাই হত্যা পর্ব শেষ হলো। এল এবার বিচারের পালা—ধৃত কানাইলাল ও সত্যেনকে মেজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হলো। মেজিস্ট্রেট কানাইকে জিজ্ঞাসা করেন—

মেজিস্ট্রেট :—তোমার বিরুদ্ধে যে সকল সাক্ষ্য নেওয়া হলো, সে সম্বন্ধে তুমি কিছু বলতে চাও ?

কানাই :– হাঁা, বলতে চাই। সবই মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ান হয়েছে। গোঁসাইএর হত্যার ব্যাপার শুধু আমি আর সত্যেন দা' জানি—

মেজিস্ট্রেট :—তা'হ'লে তোমরা স্বীকার কচ্ছ, তোমরা নরেন গোঁসাইকে খুন করেছ।

কানাই :—আমি বলতে চাই, আমিই নরেন গোঁসাইকে খুন করেছি—কেন খুন করলাম তার কারণ—হাঁা কারণটা বলা দরকার—নরেন গোঁসাই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক, তার সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।

মেজিস্ট্রেট :—তুমি আর কিছু বলতে চাও।

কানাই :—আর যা বলার সেসনেই ব'লব'।

কথক :—১৯০৮ এর ১০ই সেপ্টেম্বর, সেসনে ধৃত কানাইলাল ও সত্যেন্দ্রনাথের বিচার আরম্ভ হয়। জজ মিঃ এফ আর রো জিজ্ঞাসা করেন কানাইকে।

জজ :—তুমি পিস্তল কোথায় পাইলে ?

কানাই :—ক্ষুদিরামের আত্মা পিস্তল পৌঁছে দিয়ে গেছে।

জজ :—You are too intelligent. However, তুমি কেন নরেন্দ্রকে খুন করিয়াছ ?

কানাই :—সে কথা ত' মেজিস্ট্রেটের কাছেই বলেছি—তবু আবার বলি শুনুন—নরেন গোঁসাই দেশদ্রোহী—তার সমুচিত শাস্তি দিয়েছি।

জজ :—তুমি সাক্ষীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে—

কানাই :—না।

জজ :—কোন কথা প্রত্যাহার করিবে।

কানাই :—পূর্বে বলেছিলাম এই হত্যার জন্য সত্যেনদা ও আমি দায়ী—সেটা আমার ভুল হয়েছিল। আমিই নরেনকে খুন করেছি, সত্যেনদা নির্দোষ। আমার গুলিতেই নরেন মরেছে।

জজ :—আচ্ছা, একথা আমি Note করিয়া লইলাম।

কথক :—সেসনের বিচার শেষ হলো—জুরিরা জজ সাহেবের সংগে একমত হ'লেন—বিচারপতি রায় দিলেন He will be hanged to death.

কানাই :—Hanged to death—ফাঁসি—ফাঁসি কাঠে দড়ি ঝুলিয়ে আমাকে মারবে। জেলে পঁচেত মরব' না—আন্দামানে যেয়ে পশুর মত মরব না—ফাঁসি হয়েছে বেশ হয়েছে—নরেনকে ত' মারতে পেরেছি—আমি যেন দেখতে পেলাম, মা আমাকে পথ দেখিয়ে দিলেন—"ওরে কানাই, ওই যে নরেন পালায়, গুলি কর"। রাধু ঠাকুমা বুক চিরে রক্ত তিলক পরিয়ে দিল। শুধু দাদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদে—কেন, কেন, দাদা কাঁদে—

কনেষ্টবল :—আপনার দাদা আশুবাবু আপনার সংগে দেখা করতে আসবেন।

কানাই :—দাদা—

আশুবাবু :—কানাই—ও হোঃ হোঃ—

কানাই :—কেঁদনা বড়দা—দেশের জন্য মরতে চলেছি—এত আমার মরণ নয়, আমি জীবন পেয়েছি বড়দা—আমি জীবন পেয়েছি—

আশুবাবু :—ওরে আমি যে তা ভাবতে পারিনে। কত
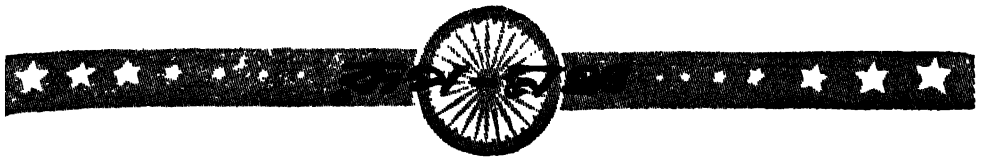
মেরেছি, কত গালমন্দ করেছি—রাখীবন্ধনের দিন তোর পূজার ঘট বাড়ীতে রাখতে দেইনি—কানাই—কানাই, ও হো হো।

ব্রজেশ্বরী :—কেঁদ না আশু—

কানাই :—মা!

ব্রজেশ্বরী—আজ ৯ই নভেম্বর, আজও কানাই আমার ছেলে—সে যে আমারই ছেলে—কাল ১০ই, কাল থেকে ও যে সারা ভারতের! ওকে কেমন করে আমার কোলে বেঁধে রাখব আশু—

আশু :—মাগো—আমার বুকে একবার আয় কানাই—

Warder :—No, you are not orderd to do so.

আশু :—না না, আমাকে তোমরা বাধা দিও না। শুধু একটিবার—একটিবার ওকে আমি বুকে করে রাখব—একটিবার—

Warder :—Alright, finish it.

আশু—কানাই—

কানাই—দাদা—

মাঃ—কানাই!

কানাই :—মা—

মা :—আর একবার ডাক—শুধু আর একবার।

কানাই—মা—মা—মা—[৬টা বাজিল]

কথক :-পরদিন ১০ই নভেম্বর—৬টা বেজে গেল কিন্তু ফাঁসির দড়ি কি বিপ্লবী কানাইলালের জীবন হরণ করতে পেরেছে? চন্দননগরের সেই রাধু পাগলী আজও বুঝি শ্মশানের বটতলায় হাত তালি দিয়ে নেচে নেচে বেড়ায়, আর বলে—

রাধা :—ওরে আমার কানাইএর বাঁশী বেজেছে তাই কংসও মরেছে। ইংরেজ গেছে, ফরাসীও যাবে—আমার কানাই—আমার কানাইলাল—।

(সমাপ্ত)

নারায়ণগড়

(চলচ্চিত্র-কাহিনী)

মন্মথ রায়

★

জীবনের পরম ধন বলে যাকে গভীর আকুতিতে বুকে তুলে নিয়েছিলেন বৃন্দাবন, আজ তাকেই পথের ধুলোয় বার করে দিতে তাঁর একটুও আক্ষেপ নেই। শুধু বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন স্ত্রী মহামায়া। শিশুকাল থেকে যাকে তিনি নিজের ছেলের মতো মানুষ করে তুলেছেন, আজ কোন বুকে মহামায়া তা'কে ঘর ছাড়া হতভাগাদের দলে ঠেলে দেবেন? যত অন্যায়ই করুক অর্জুন—তবু মহামায়া এতখানি কঠোর হতে কোন দিনই পারবেন না।

বৃন্দাবন স্ত্রীর কথা উপেক্ষাও করতে পারেন না—আবার সায় দিতেও তাঁর সংস্কারে বাধে। অর্জুন আর কৃষ্ণা—দু'জনেই কৈশোরের সীমা অতিক্রম করে যৌবনে পা দিয়েছে—কিন্তু তাদের মেলামেশা আর অন্তরংগতা সামাজিক অনুশাসনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেই ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বৃন্দাবনের চোখে তাই অর্জুনের আচার আচরণ ক্রমশঃ বিষবৎ ঠেকছে। কৃষ্ণার সংগে অর্জুনের এই ঘনিষ্ঠতা তিনি পিতা হয়ে কখনই বরদাস্ত করতে পারেন না। এ নিয়ে মহামায়ার সংগে কতদিন কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে বৃন্দাবনের। কিন্তু সব দোষত অর্জুনের নয়—বৃন্দাবন এই সহজ কথাটা কিছুতেই বুঝতে চান না। অর্জুনকে এ বাড়ী থেকে দূর করে দিতে পারলেই যেন তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অথচ অর্জুন আর কৃষ্ণা—কৈশোর অতিক্রম করবার আগে পর্যন্ত তারা ভাই-বোন হিসেবেই খেলা-ধুলো করেছে—হুটোপুটি করেছে। তা'হলে এর আগের ইতিহাসটুকু বলতে হয়।

১২৯৬ সালে মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের রাজা ছিলেন নারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দন পাল। নারায়ণগড়ের অন্তর্গত চন্দনপুরের জোতদার বৃন্দাবন রায়ের অবস্থা খুব সমৃদ্ধ না হলেও—তাঁদের দিন বেশ স্বচ্ছলভাবেই অতিবাহিত হচ্ছিল। তবু স্বামী-স্ত্রীর মনে সুখ ছিল না—শান্তি ছিল না। শ্রীশ্রীগোবিন্দের কৃপায় বিষয়-আশয় তাঁদের মন্দ ছিল না—কিন্তু এসব ভোগ করবে কে? মা'র শূন্য বুক জুড়ে বসবে বংশের দুলাল—কচি একটি ছেলে—এই বাসনা নিয়ে বিগ্রহের পায়ে কত মানৎ করলেন মহামায়া, কত পুজো-আচার আয়োজন করলেন বৃন্দাবন—কিন্তু দেবতার কানে পৌঁছল না—বৃন্দাবনের ব্যথাতুর অন্তরের প্রার্থনা, পাষাণ-বিগ্রহ সাড়া দিল না—সন্তান-কামনাতুর বন্ধ্যা নারীর আকুল আবেদন।

সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো বিগ্রহের বেদীমূলে। বৃন্দাবন মহা ভাবনায় পড়লেন। সম্পত্তি ভোগ করবার যদি কেউ না থাকে—তবে কী হবে এই জোত-জমি দিয়ে! তার চেয়ে স্বামী-স্ত্রী কোন আশ্রমে গিয়ে বাকী দিন ভগবানের নাম-কীর্তন করে কাটিয়ে দিলেই ত পারেন! কিন্তু বংশলোপের ভয়ে এ প্রস্তাব কারো মনঃপূত হলো না। বৃন্দাবন হাট করে বাড়ি ফিরছেন, হঠাৎ চমকে উঠলেন পথের ধারে শিশুর ক্রন্দনে। গিয়ে দেখেন, সদ্যজাত এক শিশু পথের ধারে পরিত্যক্ত! খোঁজ করেও যখন তার পিতা মাতার সন্ধান মিল্‌ল না, বুকে তুলে নিলেন সেই অজ্ঞাত কুলশীল শিশু কে। ঘরে ফিরে মহামায়ার বুকে দিয়ে বল্‌লেন, "নাও, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।" সেই শিশুর নামকরণ হল অর্জুন। অর্জুনকে দত্তক গ্রহণ করলেন বৃন্দাবন। মহামায়ার শূন্য বুক এতদিনে সন্তানের কিশোর-চাঞ্চল্যে ঝলমল করে উঠলো। বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ধন পেয়ে পরম তৃপ্তিতে অর্জুনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মহামায়া। মার বুক ভরে আছে ছেলে—বৃন্দাবন এ দৃশ্য দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন—মহামায়ার এমন স্নিগ্ধ, প্রশান্ত রূপ এর আগে আর কখনো দেখেন নি তিনি।

কিন্তু ভগবানের লীলা বোঝা ভার। সবাইকে বিস্মিত করে মহামায়া এক শুভদিনে কন্যা-সন্তানের জননী হোলেন। আবেগে, আনন্দে, সারা বাড়ী যেন কেঁপে উঠলো। মহামায়া মেয়ের নাম রাখলেন কৃষ্ণা। নিজের গর্ভজাত মেয়ে আর পালিত ছেলেকে নিয়ে গড়ে উঠলো তাঁদের নতুন সুখের সংসার—পরিবারের খরচ তাতে বাড়লো—কিন্তু মহামায়া
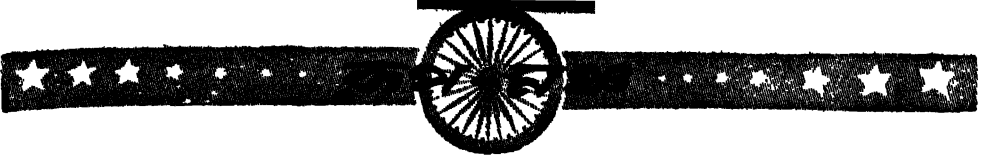
তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হলেন না। দু'জনকেই তিনি অন্তরের সবটুকু স্নেহ ঢেলে দিয়ে বড় করে তুললেন।

সময়ের পাখায় ভর করে দিন এগিয়ে চললো সাম্‌নের দিকে—ঠিক যেন উড়ন্ত পাখীর মতো।—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর—দেখতে দেখতে পনেরটি বৎসর যেন একটা অবিচ্ছিন্ন আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে কেটে গেলো।

কৃষ্ণা এখন বড় হয়েছে—তা'র তনুশ্রীতে যৌবনের লজ্জা ও লাবণ্য—অর্জুন আগের মতোই দুরন্ত আছে। কৃষ্ণার সংগে হুটোপুটি যে তাকে আর মানায় না—একথাটা বুঝলেও মনকে শাসন করতে পারে না অর্জুন। দুপুরে গরু নিয়ে মাঠে যায় অর্জুন—এই সময়টা কৃষ্ণার বড্ড ফাঁকা ঠেকে। সে তখন আপন মনে মৃন্ময়পাত্রে মণ্ডল রচনা করে আর ভাবে—অর্জুনদা হয়ত এই উদাস দুপুরে বসে বাঁশী বাজাচ্ছে—গরুগুলো কোন দিকে ছুটে বেড়াচ্ছে, সেদিকে বুঝি তার কোন খেয়ালই নেই। হঠাৎ পেছন থেকে কে চুলের ডগা ধরে টান মারে। চমকে পেছন ফিরে কৃষ্ণা দেখে—অর্জুন দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে।

"বাবা দেখলে আর রক্ষে থাকবে না।" ভয়ে ভয়ে বলে কৃষ্ণা।

"অর্জুনদাকে তুই এতই বোকা পেয়েছিস্? বাবা গেছে নায়েবের সংগে বকেয়া খাজনা মুকুবের আর্জি নিয়ে। ফিরতে তাঁর অনেক দেরী। আর মা যদি এসে পড়ে ত বলিস্—বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল, তাই জল খেতে এসেছিল।"

জোরে হাসাটা নিরাপদ নয় জেনেও কৃষ্ণা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

"জল খাবার জন্যে দু'কোশ পথ হেঁটে বাড়ীতে আসা? কেন—ধারে কাছে একটা দীঘিও ছিল না বুঝি?"

"থাক্—তোকে আর ফপর দালালি করতে হবে না। যাবি নাকি আজ ঘোষপাড়ায় যাত্রা দেখতে! খুব ভালো পালা গাইবে।—"সীতাহরণ"।"

মুখ ভার করে কৃষ্ণা বলে, "বাবা যেতে দিলে ত!"

"খুব করে বায়না ধরলেই পারিস্। তুই যেন কি! বাবার মতেই দুনিয়া চলবে নাকি!"

"আচ্ছা—আচ্ছা—সে পরে হবে খ'ন। যাত্রা গানের ত এখনো অনেক দেরী।"

"কথাটা ভুলিসনে যেন। আমি এখন চলি।"

"দাঁড়াও। নতুন আমের আচার করেছি। একটু খেয়ে দেখনা—কেমন হলো।" একঝলক হাসিতে দীপ্তিমতী হয়ে উঠে কৃষ্ণা।

* * * * *

দুইটি মিলন-উদগ্রীব মন যৌবন-বেদনা-রসে টলমল করতে থাকে। বৃন্দাবনের দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায়নি। তাই তিনি কঠোর আঘাতে এ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে চান—যা একদিন শাখা-পল্লব-প্রসারিত বৃহৎ বনস্পতিতে পরিণত হতে পারে—তা'র বীজকে তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর। অর্জুনকে যে প্রয়োজনে তিনি গ্রহণ করেছিলেন—তা আজ ফুরিয়েছে—তাই অর্জুন আজ তাঁর কাছে অসহ্য বোঝা—অর্জুনের প্রতি মহামায়ার প্রচ্ছন্ন স্নেহ কিন্তু ফল্গুধারার মতোই বয়ে চলেছে। আহা বেচারা—একদিন বন্ধ্যা নারীর মাতৃ-হৃদয়ের আকুল উদ্বেগকে সে-ইত প্রশমিত করেছিল—সে-ইত মহামায়ার বুক ভরে তুলেছিল হাসি কান্না আর চপলতায়।

বৃন্দাবনের বিদ্বেষ ক্রমশঃই বেড়ে চলে। সংসারে চারিটী প্রাণী—খরচ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অথচ আয় সেই পরিমাণেই হ্রাস পাচ্ছে। জমিদারের জুলুম বাড়ছে—খাজনা বকেয়া রাখবার উপায় নেই। এদিকে দুর্দান্ত রঘু ডাকাতের অত্যাচারে প্রায় সমগ্র নারায়ণগড়ের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন বিপর্যস্ত হতে চলেছে। এতে বেশী বিপন্ন হতে হয়েছে সাধারণ গৃহস্থদের। এই অরাজকতার জন্য দেশের আর্থিক বনিয়াদ্ শিথিল হয়ে এসেছে—লোকের দুঃখ দুর্দশার আর অন্ত নেই। তাই নিজের কাঁধ থেকে অর্জুনের বোঝা নামাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৃন্দাবন। মহামায়া মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে আপত্তি করেন: "নিজের পেটে ধরিনি বলে অর্জুন আমার নিজের ছেলের চেয়ে কীসে কম? ওকে আমি বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করে তুলেছি। এ বাড়ীতে কৃষ্ণার যদি দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটে—অর্জুনেরও জুটবে।"
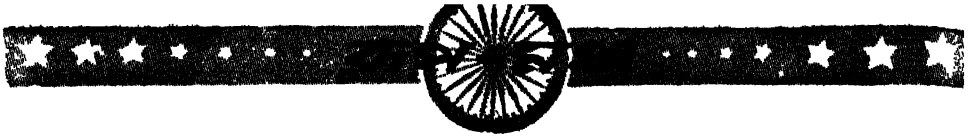
দরাজ কণ্ঠে হেসে জবাব দেন বৃন্দাবন, "লক্ষ্মীর হাতে কারো ভাত মারা যাবে না জানি। কিন্তু ঐ ছেলেটার চাল-চলন আমার চোখে ভালো ঠেকছে না বড় বৌ......"

"ছেলে দুরন্ত বলে" ঝড়ের ঝাপটা থেকে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় অর্জুনকে বাঁচাতে চাইলেন মহামায়া, "কেউ যে ছেলেকে পথে বার করে দেয় না। ওর দোষ থাকে – তা শুধ্‌রাবারই চেষ্টা করা উচিত।"

"ও যে সব সংশোধনের বাইরে বড় বৌ।" "তবু ওই আমার দুঃখের দীপ। সুখের দিনে সে দীপ জ্বালতে না পারি—তাই বলে হেলায় তাকে জলে ভাসিয়ে দেব না।"

বৃন্দাবন চুপ করে যান। মায়ের দাবীতে যখন কথা বলেন মহামায়া—তাঁর বিরুদ্ধে বৈষয়িক যুক্তির জাল বুনতে গলায় তেমন জোর পান না বৃন্দাবন। মনে মনে বলেন বৃন্দাবন—"ছেলে মেয়েদের বেলায় মায়েরা চিরকাল দুর্বল—চিরকালই অন্ধ।"

সংসারের কাজকর্মের চাপ বেশীর ভাগই বহন করতে হয় অর্জুনকে। গরু রাখালি করা, ধান ভাড়ারে তোলা—বাজার করা আর সংগে সংগে ফুটফরমাস্ত আছেই। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চরকীর মতো ঘুরতে হয় অর্জুনকে। দুটো জোয়ান মরদের কাজ একাই করে অর্জুন। মহামায়া মাঝে মাঝে আপসোস করেন, "আহা—খেটে খেটে ছেলেটার শরীর পাত হলো।"

ঈষৎ কড়া সুরেই জবাব দেন বৃন্দাবন :

"আদর দিয়ে দিয়ে আর ছেলেকে ননীর পুতুল বানিয়ো না বড় বৌ। সারাদিন অসুরের মতো খাটতে পারলেই যদি ওর কিছু একটা হিল্লে হয়। আর কাজে মানুষ মরে না – মরে কুঁড়েমিতে।"...

...খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে ঠাকুরঘরে ঊষা-কীর্তন করে অর্জুন আর কৃষ্ণা। কিশোর বয়স থেকেই তারা এক সংগে নাম কীর্তন করে আসছে।

'হরে মুরারে মধুকৈট ভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।'

সারা দিনের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে দু'জনের ঘনিষ্ঠ মেলামেশার এই একমাত্র সুযোগ অর্জুন ও কৃষ্ণার। এতে বৃন্দাবনও আপত্তি করেন না। গোবিন্দের নাম-গানে বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠে। এ প্রথা এই পরিবারে বহুদিন থেকে প্রচলিত। কিন্তু ঐপর্যন্ত। এরপরই অর্জুনের উপর কড়া নজর পড়ে বৃন্দাবনের। তবু সেই কঠোর বাধা-নিষেধ আর তীক্ষ্ণ, সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়েই অর্জুন আর কৃষ্ণা নির্জনে মিলবার সুযোগ ও সুবিধে বেছে নেয়। দু'টি উন্মুখ হৃদয় যেখানে একাত্ম হবার জন্যে দিন গুনছে—গুরুজনের অনুশাসন সেখানে কতটুকু ব্যবধান সৃষ্টি করতে পারে? পশ্চাতের দীঘিতে কলসী কাখে জল তুলতে যায় কৃষ্ণা। হঠাৎ মাথায় টুপ্‌ করে কচি আম পড়তেই হকচকিয়ে যায়। ওপর থেকে গলা বাড়িয়ে অর্জুন বলে, "ভয় পেয়ে কলসীটা যেন ফেলে দিসনে। তাহ'লে আর মাথাটা আস্ত থাকবে না।"

"তুমি ভারী দুষ্টু অর্জুনদা।"

"ঢিল না ছুঁড়ে কচি আম দিলাম বলেই বুঝি দুষ্টুমিটা চোখে ধরা পড়ল?"

"তুমি আজকাল কাজে বড্ড ফাঁকি দিচ্ছ। এই কি আম কুড়োবার সময়? গরুগুলো মাঠে কে নিয়ে যাবে শুনি?"

"ইস্‌—আজকাল যে লাটসাহেবের মতো হুকুম করতে শিখেছিস্‌। আমার খুশী হলে গরু মাঠে নিয়ে যাব—খুশী না হলে আম কুড়োব - না হয় তোর কলসীতে জল এনে দেব।"

"তাই দেবে নাকি? সত্যি, কোমরে আজ বড্ড ব্যথা করছে।"

কৃষ্ণার কলসীটা প্রায় কেড়ে নিয়েই অর্জুন জল আনতে ছুটলো।

...অর্জুন বলে, "পরশুদিন খাওয়া দাওয়ার পর বাবাকে লুকিয়ে আখড়ায় রাধা-কৃষ্ণের পালা শুনতে গিয়েছিলাম। রাধা-কৃষ্ণের গল্প জানিস্‌।"

"গল্প কি গো। সে ত ধর্ম কথা।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঐ ধর্ম-কথা নিয়ে পালা-গান লিখেছে। ভারী মজার বই। কানুর বাঁশী শুনে প্রেম-পাগলিনী রাই ছুটে চলেছে যমুনায় জল আনতে...চল না একদিন শুনে আসি পালা-গান। ধর্ম-কথা শুনলে বাবা বারণ করবেন না।"

* * *
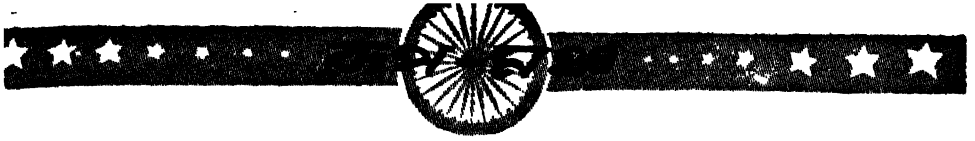
কৃষ্ণার বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লেন বৃন্দাবন। তার এমন সংগতি নেই যে, প্রচুর যৌতুক দিয়ে মেয়েকে সুপাত্রে সম্প্রদান করতে পারেন। গ্রাম-দেশে সোমত্ত মেয়ের বিয়ে না হ'লেই পাড়াপড়শীদের মাঝে গুঞ্জন সুরু হয়। বৃন্দাবন নানা দিকে পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। বৃন্দাবনের প্রতিবেশী বলরাম যা দু'একটা পাত্রের সন্ধান আনলেন —বৃন্দাবনের তা মনঃপূত হল না। তৃতীয়পক্ষ বা বৃদ্ধ পাত্রের হাতে তাঁর একমাত্র কচি মেয়েকে তুলে দিতে পারেন না বৃন্দাবন। বাপ হয়ে হাত-পা বেঁধে মেয়েকে তিনি জলে ফেলে দিতে পারেন না—নাই বা থাক তাঁদের অর্থ-সংগতি, নাই বা থাক প্রচুর বিষয়-আশয়।

বৃন্দাবন বাস্তবিকই বিপন্ন বোধ করলেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দের মনে কী আছে--কে জানে? পতিতপাবন কি তাকে এই কন্যাদায় থেকে মুক্ত করবেন না?

ঠিক তেমনি সময় গোপালের মন্দিরে অন্তরের সবটুকু আকুতি ঢেলে প্রার্থনা নিবেদন করছিল আরও দু'টি তরুণ হৃদয়।

"দয়াময়—আমাদের শৈশবের, খেলা কি শুধু খেলাই থাকবে —তা কি কোন দিন সত্য হবে না ঠাকুর! মানুষের মনের কথাই যদি সব চেয়ে সত্য হয়—তবে তুমি ত জানো নারায়ণ—আমাদের মিলন ছাড়া মুক্তি নেই—বিয়ে ছাড়া আমাদের জীবনের কোন অর্থ নেই।"

"হরে কৃষ্ণ—হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—হরে রাম হরে রাম—রাম রাম—হরে হরে।"

প্রতিদিন উষা কীর্তনের শেষে গোপালের মন্দিরে এই আকুল প্রার্থনা জানায় অর্জুন আর কৃষ্ণা।

কিন্তু মানুষের ব্যাকুল কামনায় বুঝি মন্দিরের পাষাণ দেবতার হৃদয় টলে উঠে না। অথবা প্রেমের পথ কুসুমাকীর্ণ নয় বলেই বুঝি তার সামনে নব নব বাধা ও বিয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর।

অনেকদিনের খাজনা বাকী পড়েছিল বৃন্দাবনের। হলধর নায়েব একদিন তাগিদ দিতে নিজেই এসে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনের বাড়ীতে। সংগে তাঁর পাইক-বরকন্দাজ। বাঘা নায়েব বলে চন্দনপুরে তাঁর খুব নাম-ডাক ছিল। তাঁরই দাপটে লোকে না খেয়ে খাজনা দাখিল করত। ভুঁড়ি দুলিয়ে স্থূলোদর হলধর নায়েব যখন বৃন্দাবনের দরজায় দর্শন দিলেন তখন মনে মনে প্রমাদ গুনলেন বৃন্দাবন। আজকে খাজনা দাখিল করতে না পারলে একটা বে-ইজ্জতী কাণ্ড করে যাবে হলধর নায়েব—চোখে চশমা বলে ত তার কিছু নেই!

"আসুন, আসুন নায়েবমশাই, কী সৌভাগ্য আমার! আপনি পায়ের ধুলো দিয়েছেন!" স্তব্ধ হয়ে চেয়ার এগিয়ে দিলেন বৃন্দাবন।

"থাক্—থাক্—তুমি ব্যস্ত হয়ো না জোতদার। বেশী দেরী করবার সময় আমার নেই। আমাকে অনেক জায়গায় যেতে হবে।"

"তা দয়া করে যখন এসেছেন—তখন তামাক ইচ্ছে করুন।" বলেই তামাক আনতে আদেশ দিলেন বৃন্দাবন।

"তারপর জোতদার—কাজ-কারবার কেমন চলছে? আদায় তহশীলে এমন ভাটা পড়ল কেন?" রূঢ় হবার ভূমিকা রচনা করলেন নায়েব।

বৃন্দাবন জানতেন—এক্ষুণি বকেয়া টাকা পরিশোধের জন্য কড়া তাগিদ দেবেন নায়েব।

আম্‌তা আম্‌তা করে বৃন্দাবন বলেন, "জানেন ত সবই—দেখছেন ত সবই—রঘু ডাকাতের জবরদস্তিতে নৌকা করে ধান চাল চালান দেওয়াত কঠিন হয়ে উঠেছে নায়েব মশাই। টাকা-কড়ির লেন-দেন যে প্রায় বন্ধ হতে বসেছে।"

"কিন্তু ওসব ওজর-আপত্তি ত চাকলাদার শুনবে না জোতদার! তাছাড়া খাজনাপাতি আদায় না হ'লে জমিদার-সরকারেরই বা চলে কি করে?"

এমন সময় পান নিয়ে এল কৃষ্ণা। প্রস্ফুটিত শতদলের মতো এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দেখে নায়েব চমকে উঠলেন।

"এইটি বুঝি তোমার মেয়ে জোতদার। বাঃ, বেশ মেয়েটিত —যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-প্রতিমা। তা মেয়েত ডাগর হতে চলেছে—বিয়েথা'র চেষ্টা করনি।"

সরমে লাল হয়ে তত্‌ক্ষণে অন্তর্হিতা হ'য়েছে কৃষ্ণা। নায়েবের এই অপ্রত্যাশিত প্রশংসাবাণীতে মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে গেলেন বৃন্দাবন।

"দেশের হাল-চাল ত জানেন নায়েব মশাই। মেয়ের জন্য পাত্র জোটানো যে কী কঠিন সমস্যা……তাইতো বলি, ভগবান একরাশ রূপ দিয়েও মেয়েকে পাঠালেন—কিন্তু গরীবের কপালে এত সুখ সইবে কি?"

"তুমি খুব মুসড়ে পড়েছ জোতদার। আগে ত' তুমি এমন ছিলে না। টাকা-কড়ি সব সময় সবার হাতে থাকে না। তাই বলে মনের জোর হারিয়ে হা হুতাশ করতে হবে নাকি? চেষ্টা চরিত্তির কর। তোমার মেয়ে যেরকম সুলক্ষণা—তার ভাগ্যে সুপাত্র আপনি জুটবে।"

মোলায়েম কথায় বৃন্দাবনকে তুষ্ট করে নায়েব উঠলেন। খাজনার কথা ত তুললেনই না—বরং বৃন্দাবনকে নিরাশ না হবার জন্যে বার বার বলে গেলেন: "আমরা থাকতে তোমার ভয় কি জোতদার—তোমার বিপদে কি আমরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখব?"

কোন দিক থেকে যে ঝড় উঠেছিল—আর কেনই যে তা হঠাৎ কেটে গেল—তা'র কোন কারণই খুঁজে পেলেন না বৃন্দাবন। নায়েব হঠাৎ তাঁ'র উপর কেনই বা এত সদয় হ'য়ে উঠলেন? লোকটা বাইরে রুক্ষ হলেও—অন্তর তাঁর সত্যিই পরের দুঃখে কাতর হ'য়ে পড়ে। কিন্তু বলরাম যেদিন নায়েবের কাছ থেকে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলেন—তখন অকুল সমুদ্রে যেন একটুখানি আশ্রয়ের দ্বীপ দেখতে পেলেন বৃন্দাবন। নায়েব বিনা পণে কৃষ্ণার পাণিগ্রহণে প্রস্তুত। হলেনই বা বিপত্নীক—তবু কৃষ্ণা ত তাঁর সুখে থাকবে। আর নায়েবের বয়স এমন কিছু মারাত্মক হয়নি যে, দ্বিতীয়বার বিয়ের সময় পেরিয়ে গেছে। মহামায়া প্রথমে মৃদু আপত্তি করেছিলেন—কিন্তু নিজেদের আর্থিক অবস্থা এবং বৃন্দাবনের আগ্রহ লক্ষ্য করে তিনি আর বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। ভগবানের ইচ্ছায় মেয়েকে তার ভাত কাপড়ের কষ্ট করতে হচ্ছে না শুনলেই তিনি সুখী।

নায়েবের সংগে বিবাহের কথাবার্তা শুরু হয়েছে অবধি কৃষ্ণার মনে আর তিলমাত্র স্বস্তি নেই। নিজের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সে মনে মনে যে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল—তা যে এমনিভাবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—কৃষ্ণা তা কোনদিন অনুমান করতে পারেনি। গোপালের কাছে তার আকুল আবেদনের তা হ'লে কোন ফলই হলো না—পাষাণ বিগ্রহ নারীর প্রার্থনাকে গ্রাহ্যের মধ্যেও আনলেন না।

তবু হাল ছাড়লো না কৃষ্ণা। অর্জুনকে একদিন নিরালায় ডেকে বললে, "সব কথা শুনেছ নিশ্চয়ই।"

"তা আর শুনিনি! তোর নাকি বিয়ে—যার তার সংগে নয়—একেবারে খোদ নায়েবের সংগে। তোর কপাল তাহলে খুলেছে বল!"

"এস কথা নিয়ে মসকড়া করতে তোমার লজ্জা করছে না।"

"বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কেউ গলা জড়িয়ে হাউ মাউ করে কাঁদে বলে ত শুনি নি। এতবড় শুভ সংবাদ—কতবড় বরাত জোর থাকলে তবে নায়েবের সংগে বিয়ে হয়—ভেবে দেখ দিকি্ন।"

"তোমরা কি সত্যিই আমাকে ঐ অসুরটার পায়ে বলি দিতে চাও অর্জুনদা।"

মুহূর্তে আলাপের ধারা বদলে গেলো। অর্জুন গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কেমন যেন করুণা আর আবেগের রঙ লাগলো তার মনে। বিষয়টা ত এই দিক থেকে ভেবে দেখে নি অর্জুন।

কৃষ্ণা বলে, "টাকা আর প্রতিপত্তির জোরেই কি ঐ দোজবর দৈত্য নায়েবটা আমায় অধিকার করবে অর্জুনদা? আর মিথ্যে হয়ে যাবে আমাদের এই মেলা-মেশা, ঘনিষ্ঠতা—উষাকীর্তনের পর গোপালের পায়ে প্রণত হয়ে দু'জনে মিলিত হবার আকুল কামনা?"

"তাইতো—এ সবই কি মিথ্যে হবে—ব্যর্থ হবে—নায়েবের লালসারই শেষ পর্যন্ত জয় হবে?"

বিচলিত হলো অর্জুন। "বাবা যেরকম জিদ্ ধরেছেন—তাঁর মত বদলানো শক্ত হবে কৃষ্ণা।"

"তবু এখনও সময় আছে। তাঁকে সব কথা খুলে বলতে হবে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েও তিনি যেন নায়েবের বিয়ের প্রস্তাবটা ভেংগে দেন।"

"যদি বলেন, আমার মেয়েকে বিয়ে করে খাওয়াবে কি শুনি?"

"যেমন করে পার খাওয়াবে—গরু রাখালি করে—লোকের
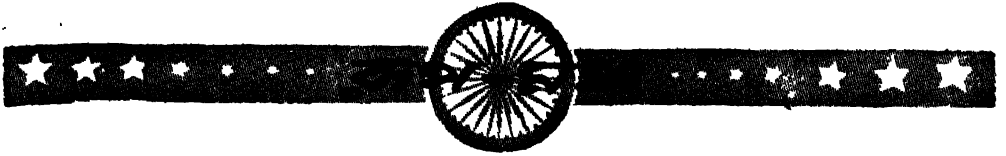
ক্ষেত খামারে কাজ করে—বৌকে ভরণ পোষণের ভার তোমার—তাঁর নয়। যাও—আর দেরী করো না। শেষে বাবার এ ভুল শুধরাবার আর সময় পাবে না তুমি।"

অর্জুন মন স্থির করে ফেললে। সাহসে বুক বেঁধে সে বৃন্দাবনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

"কী দরকার! বলরামকে খবর দাও নি এখনো? এদিকে খাসনকোষণের ফর্দ হাতে নিয়ে বসে আছি আমি।" বৃন্দাবন ঈষৎ উষ্মার সংগে বলছেন।

"আপনাকে একটা কথা বলব বলে এসেছি।"

"কী কথা! বলো—চটপট—যা বলবার। বিয়ের বাজার নিয়ে মরবারও ফুরসৎ পাচ্ছিনে। তারপর তোমাদের যত সব আজে বাজে কথা।"

"এ বিয়ে হ'তে পারে না—এ বিয়েতে কৃষ্ণার মত নেই।"

হঠাৎ বজ্রপাত হলেও এতখানি চমকিত হতেন না বৃন্দাবন। কিন্তু ক্রোধ চেপে গিয়ে তিনি শুধু বললেন, "আমার মতই আমার মেয়ের মত।"

"তাই বলে একটা চল্লিশ বছরের দোজ্‌বরের সংগে ষোল-বছরের মেয়ের বিয়ে হবে—বাপ হয়ে তা'তেই বা আপনি কি করে মত দেবেন?"

"বিয়ের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না অর্জুন। তোমাকে যে কাজের ভার দিয়েছি—তাই করগে! মেয়ের কিসে ভাল হবে—সে আমি বুঝব।"

"কিন্তু গৃহদেবতাকে সাক্ষী রেখে আমরা যে পরস্পর শপথ করেছিলাম—আপনার অনুমতি পেলে—আমাদের বিয়ে হবে।"

এইবার বৃন্দাবনের ধৈর্যের বাঁধ আর মানলো না। ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অর্জুনকে প্রচণ্ড এক চড় মারলেন বৃন্দাবন।

"পাজি, ছুঁচো কোথাকার! ভিখিরির এতখানি স্পর্ধা! আমার অন্নে মানুষ হয়ে আমারই ঘরে দিনে ডাকতি করতে চায়। ইতর, চামার কোথাকার। কালী, কালী।"

বাড়ীর জোয়ান চাকর কালীচরণ ত্রস্তপদে ছুটে এলো। লোকটার চেহারা যেমন বিকট—তেমনি সে নির্মম।

"এই শুয়োরটাকে জুতো-পেটা করে বাড়ীর ত্রি-সীমানা পার করে দিয়ে আয় দিকিন। আর যাতে কোনদিন ভদ্দরলোকের মেয়েদের দিকে কুনজর না দেয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ,—দয়া মায়া আর নয়। দুধকলা দিয়ে কেউটে সাপ পোষবার সখ আর আমার নেই। যা—নিয়ে যা হারামজাদাকে......"

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়। কথা শেষ করবার আগেই ভীমকায় কালী বাগ্দী বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো অসহায় অর্জুনের উপর। সুরু হলো নির্মম নির্যাতন। অর্জুন আত্মরক্ষার জন্যে রুখে দাঁড়াতেই কালীবাগ্দী আরও হিংস্র হয়ে উঠলো।...

সেদিন ছিল দুর্যোগের রাত্রি। অর্জুনের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সংগে তাল রেখেই বোধ করি বিধাতার রুদ্র রোষ বর্ষিত হচ্ছিল ঝড়ের প্রলয় তাণ্ডবে। মনে হচ্ছিল—সারা দুনিয়াটাকে বুঝি দুমড়ে ভেংগে চুরমার করে দেবে এই ঝড়ের দাপট। এমনি এক ঘনবর্ষণ দুর্যোগের রাত্রিতে আশ্রয়চ্যুত হয়ে পথের উপর নির্যাতিত হচ্ছে অর্জুন—একটি প্রাণীও নেই যে, তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে।

হুটোপুটিতে অর্জুনের গায়ের জামা আগেই ছিন্ন ভিন্ন হয়েছিল। হিংস্র কালী বাগ্দী সজোরে তার পরণের কাপড়খানা আকর্ষণ করে প্রভু ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখালে। তারপর গলা ধাক্কা দিয়ে অর্জুনকে রাস্তায় ঠেলে দিয়ে দেউড়ীর ফটক বন্ধ করলে।

মানুষের হিংস্রতা তার অংগ থেকে সভ্যতার শেষ আবরণ টুকু কেড়ে নিয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীর দুর্যোগময়ী নিশীথে আজ সে একা—নিঃস্ব—উলংগ। মানুষের লজ্জা ঢাকবার জন্য মানুষের তৈরী একখণ্ড কাপড়ও তার দেহে নেই—তাই বুঝি সে লজ্জাকে ঢাকবার জন্যে তার চতুর্দিক ঘিরে এই কালো মিশমিশে অন্ধকারের গাঢ় আস্তরণ। নিঃশব্দে, হামাগুড়ি দিয়ে—চতুষ্পদ জন্তুর মতো হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে অর্জুন—কোথায়—তা সে নিজেই জানে না। মানুষ বলে পরিচয় দেবার জন্যে তার অর্থ চাই না—আশ্রয় চাই না—শুধু একখণ্ড কাপড়—লজ্জা ঢাকবার জন্যে একখণ্ড কাপড়।

খানিকটা দূর এগিয়ে অর্জুনের মনে হলো, অদূরে কারা বসে নীচুগলায় আলাপ করছে। একটা গাছের আড়ালে ঠেস
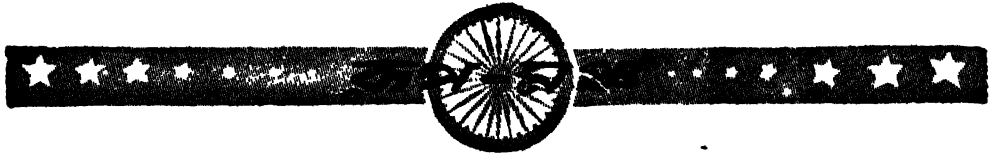
দিয়ে দাঁড়াল অর্জুন। একটা ছাউনির নীচে বসে তিনচার জন লোক হুঁকো টানছে। তারই মিটমিট আলোতে মনে হলো, অর্জুন গ্রামের বাইরে মহানন্দার শ্মশানে এসে পড়েছে। ঝড়ের দাপটে এত দ্রুত যে গ্রাম পেছনে ফেলে এসেছে—তা অর্জুন আন্দাজ করতে পারে নি।

রঘু ডাকাতের শবদাহ নিয়ে তার অনুচররা মহা-সমস্যায় পড়েছে। আকাশ ভেংগে বৃষ্টি নেমেছে। অত্যাচারী রঘু ডাকাতের মৃত্যুর সংগে সংগে পুঞ্জীভূত সব গ্লানি আর কলংক ধুয়ে মুছে দেবার জন্তেই বুঝি বিধাতার করুণাধারা এই প্রবল বর্ষণের রূপ নিয়েছে।

পিণাক বললে, "সর্দারের শব কি সারারাত এমনি পড়ে থাকবে ত্রিশূল?"

ত্রিশূল জবাব দেয়, "কার এমন বুকের পাটা যে, এই দুর্যোগে শ্মশানে রঘু ডাকাতের শব দাহ করতে শ্মশানে তুলবে?"

বিষাণ বলে, "লোকে তাহ'লে টিট্‌কারী দিয়ে বলবে—রঘু ডাকাতের চেলা-চামুণ্ডারা এতই ভীরু যে, ঝড়ের রাত বলে সর্দারের শবদাহ করতে পর্যন্ত তাদের সাহস হলো না। তার চেয়ে চল—আমরা তিন জনেই সর্দারের সব দাহ করব।"

বাধা দিয়ে পিণাক বলে, "চুপ। খোদার ওপর খোদ্‌কারী করতে যাস নে। এত ঝড় নয়—সর্দারের প্রেতাত্মা নিস্ফল আক্রোশে গর্জন করছে।"

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুন সব শুনলে। মুহূর্তে তার মনে আশার একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিল। এইত সুযোগ—জীবনে এমন সুযোগ আর দ্বিতীয়বার আসবে না। তার মনে হলো, প্রলয় ঝঞ্ঝা মুখরিত এই দুর্যোগের রাত্রে বিধাতা যেন তাকে আহ্বান করে বলছেন—মানুষের দেওয়া অপমান আর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এই মুহূর্ত থেকে তুমি ভংকর হও, নির্মম হও।

হামাগুড়ি দিয়ে অর্জুন নিঃশব্দে দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত শ্মশানের কাছে এসে উপস্থিত হলো। শুভ্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত রঘু ডাকাতের মৃতদেহ সৎকারের অপেক্ষায় সেখানে পড়ে আছে। কোনরকম দ্বিধা না করে মৃতদেহের সাদা আচ্ছাদনী দিয়ে নিজের শরীর আবৃত করে অর্জুন অতর্কিতে রঘু ডাকাতের অনুচরদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। এই গভীর রাত্রে অপরিচিত একটি লোককে দেখে অনুচররা অস্ফুট গুঞ্জন করে উঠলো। হাত তুলে অর্জুন আদেশের ভংগীতে বললে, "চলে এসো আমার সংগে।"

"কোথায়?"

"রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো। তার আগেই সর্দারের শব দাহ করে লোকালয়ের সংস্রব ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

"কিন্তু তুমি কে?

"প্রশ্ন করো না। আজ থেকে আমি তোমাদের নতুন সর্দার। রণরংগিনী মা মহাকালীর আদেশ পেয়েই আমি এখানে এসেছি! এসো—তোমরা আমার সংগে।"

অবাক বিস্ময়ে এই দৈব-প্রেরিত পুরুষের অনুগমন করলে রঘু ডাকাতের অনুচররা। 'অলৌকিক পুরুষই বটে' অনুচররা ভাবলে। তা না হ'লে এই গভীর নিশীথে শ্মশানে এসে দাঁড়াবার দুরন্ত সাহস আর কার থাকতে পারে? তাদের মনে হল, তাদের সর্দার যেন নব কলেবর ধারণ করে নব জীবন নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

সেই রাত্রি থেকে সুরু হলো অর্জুনের নতুন জীবন—জীবনের সব কলংক আর পরাজয়ের গ্লানিকে মুছে দেবার জন্তে নতুন অভিযান। নাম নিল রঘু ডাকাত—তার অনুচররা ঘোষণা করল—লোকে জানল—রঘু ডাকাত মরেনি—, তার মৃত্যু নাই।

*   *   *   *

নায়েবের সংগে কৃষ্ণার বিয়ের প্রস্তাবে বৃন্দাবন যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, "তুমি দেখে নিও বলরাম—এইবার বৃন্দাবন হাতে মাথা কাটবে—বৃন্দাবনের ক্ষেতে এবার সোনা ফলবে।" বৃন্দাবনের মেয়ের সংগে হলধর নায়েবের বিয়ে—এই নিয়ে গ্রামে মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হলো।

বৃন্দাবনের প্রতিবেশী মদনগোপাল দেখলে—বলরাম এই বিয়ের ব্যাপারে জোত্‌দারের প্রিয়পাত্র হয়ে তার উপর টেক্কা মারছে। তখন সে এক নতুন চাল দিলে। পণ্ড-পণ্ডিত চাক্‌লাদারের কাছে গিয়ে বৃন্দাবনের মেয়ের রূপ-

উদীয়মান অভিনেতা দেবীপ্রসাদ চৌধুরী

কুহেলিকা, দাসীপুত্র, বিচারক প্রভৃতি কয়েকটি চিত্রের

রূপ-সজ্জায়।

গুণের সুখ্যাতিতে পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে। আর বললে—নায়েব শুধু বকেয়া খাজনা মকুবের লোভ দেখিয়েই বৃন্দাবনকে এই বিয়েতে রাজী করিয়েছে। চাকলাদার একটু এগিয়ে গিয়ে কিছু মূল্য ধরে দিলেই—এ মেয়ে হাত ছাড়া হয় কার সাধ্য। ;চাকলাদারের অধঃস্তন কর্মচারী হয়ে নায়েব তার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবে—তা কিছুতেই হতে পারে না।

ষোড়শী রূপসী মেয়ের কথা শুনেই নারী প্রিয় চাকলাদারের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো। লোভনীয় সর্ত সহ অবিলম্বে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে বৃন্দাবনের বাড়ীতে এসে চাকলাদারের লোক হাজির হলো। বৃন্দাবনের বুঝতে বাকী রইলো না—এ প্রস্তাব নয়—চাকলাদারের আদেশ। কিন্তু বৃন্দাবনের তা'তে খুব বেশী আপত্তি থাকবার কথা নয়। খাজনা মকুব হবে—ঋণের দায়ে বন্ধকাবদ্ধ সব জমি চাক্‌লদার দায়মুক্ত করে দেবেন—বাড়ীতে দালানকোঠা তৈরীর খরচা দেবেন—বৃন্দাবন জোত্‌দারকে আর পায় কে! আনন্দে, উল্লাসে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "এইবার তুমি দেখে নিও মদনগোপাল—আমি পায়ে সবার মাথা কাটব।"

বলরাম দেখলে—তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। কিন্তু মাম্‌লা যখন উঠেছে, তখন হাইকোর্টেই তার নিষ্পত্তি হোক্‌। কথাটা অবিলম্বে পরগণার লম্পট, মদ্যপ জমিদার কন্দর্পনারায়ণের কানে তুললে বলরাম।

মেয়েদের চিরদিন শুধু ভোগের উপকরণ হিসাবেই দেখে এসেছেন কন্দর্পনারায়ণ। তাঁর অতৃপ্ত লালসার বহ্নিশিখায় পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে কত নারীর উদ্ভিন্ন যৌবন। বলরামের প্ররোচনা অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করলো। নায়েবকে হতাশ করে, চাক্‌লাদারকে স্তম্ভিত করে মত্তপ জমিদারই স্বয়ং কৃষ্ণার পাণিপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন।

বৃন্দাবন ত হাতে স্বর্গ পেলেন। অধীর উত্তেজনায় তিনি তুব্‌ড়ীর মতো জ্বলে উঠলেন। "এবার আমাকে আর পায় কে বলরাম—তুমি দেখে নিও—এবার আমি পায়ে মাথা কাটবো।"

বিয়ের শুভলগ্ন এলো। বর অধীর হয়ে উঠেছেন। মুদ্দর্গ, মদ্যপ জমিদারকে দেখেই বৃন্দাবনের সব উত্তেজনা মুহূর্তে উবে গেল। এই বরই কি কৃষ্ণার ভাগ্যে ছিল। এত বিয়ে নয়—বলিদান।

মদের নেশায় চুর হয়ে আছেন জমিদার কন্দর্পনারায়ণ।

"লগ্নের আর কত দেরী হে?" জমিদার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন।

"আজ্ঞে—কনে সাজাতে যা দেরী।"

জড়িত কণ্ঠে জমিদার বলেন, "কী বল্লে—এখনো দেরী? তা হ'লে শ্রেফ্‌ মাথাটা কেটে ফেলতে পারো না!"

"আজ্ঞে—কনের মাথা কাটব!"

কেউ একজন জিজ্ঞেস করে।

"তোমার মুণ্ডু' কনে নয়—ঐ বেটাদের—যারা কনেকে সাজাচ্ছে। কী সাজাবে ছাই—আগে বিয়েটা হয়ে যাক্‌ না ছাই—তারপর যত খুশি সাজাক।"

এমন সময় একজন এসে খবর দিল, পাশের গ্রামের রঘু ডাকাত দলবল নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। শীগ্‌গিরই তারা বিয়ে বাড়ী লুট করতে আসবে। অমনি সাজ সাজ পড়ে গেল। জমিদারের লোকজন রঘু ডাকাতকে রুখতে পাশের গ্রামে ধাওয়া করলে। অর্জুন ওরফে নতুন রঘু ডাকাতের কৌশল সার্থক হলো।

এদিকে অন্তঃপুরে বরকে দেখে বাড়ীর মেয়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। মহামায়া আর চোখের জল আটকে রাখতে পারছেন না।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বৃন্দাবন বলে, "জেনেশুনে মেয়েকে আমি কী করে জলে ফেলে দেব? হায় নারায়ণ—এই তোমার মনে ছিল। আজ যদি অর্জুন থাকত—আমি নিঃসংকোচে তার হাতে কৃষ্ণাকে তুলে দিয়ে শান্তি পেতাম।"

এমন সময় জানলায় ভেসে উঠলো এক ছায়া-মূর্তি।

"আমি অর্জুন"।

"তুমি অর্জুন?" আনন্দে আত্মহারা হয়ে জানলার দিকে ছুটলো বৃন্দাবন। "কৃষ্ণাকে বাঁচাও—ওকে আমি তোমার হাতে সম্প্রদান করছি।"—

"উতলা হবেন না। জমিদারের লোকজন পাশের গ্রাম থেকে ফিরবার আগে আমাদের চন্দনপুরের সীমানা ত্যাগ করতে হবে। পেছনের দেউড়ীতে পাল্কী তৈরী। কৃষ্ণাকে
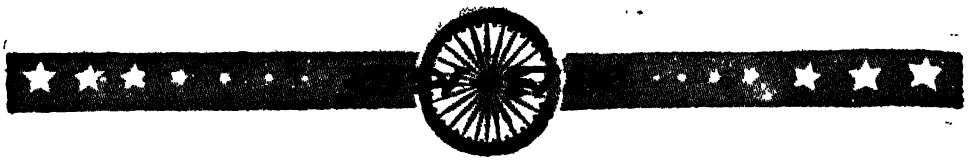
আমি নিয়ে যাচ্ছি—আপনারা নিশ্চিন্ত হোন্। শুধু বলবেন—রঘু ডাকাত কৃষ্ণাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। তা হলেই কেউ আমাদের অনুসরণ করতে সাহস পাবে না।"

সমস্ত ব্যাপারটাই যেন ভোজবাজীর মতো মনে হলো বৃন্দাবনের। তবু ত কৃষ্ণা একটা লম্পট, মদ্যপ জমিদারের লালসার আগুন থেকে রক্ষা পেলো—এইটুকুই বৃন্দাবনের সান্ত্বনা।

* * * *

পাহাড়ের পাদদেশে এক নির্জন অঞ্চলে অর্জুনের নতুন বাড়ী। কৃষ্ণাকে নিয়ে এলো সে এই বাড়ীতে। আসলে লোকচক্ষুর অন্তরালে ডাকাত-সর্দারের প্রধান আড্ডা ছিল এই বাড়ী। কিন্তু রঘু ডাকাতের প্রতি কৃষ্ণার অবিমিশ্র ঘৃণার কথা স্মরণ করে অর্জুন কৃষ্ণাকে বর্তমান কার্যের কোন আভাস দিল না। কৃষ্ণা জানলে—মানুষের কাছ থেকে সারা জীবনে কঠোর ব্যবহার পেয়ে অর্জুনের মন সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। তাই যে চলে এসেছে লোকালয়ের সংস্পর্শশূন্য এই নির্জন অঞ্চলে। চাষবাস করে কোন রকমে তাদের ছোট সংসারের ব্যয় নির্বাহ হলেই বাকী জীবনটা তাদের সুখেই কেটে যাবে।
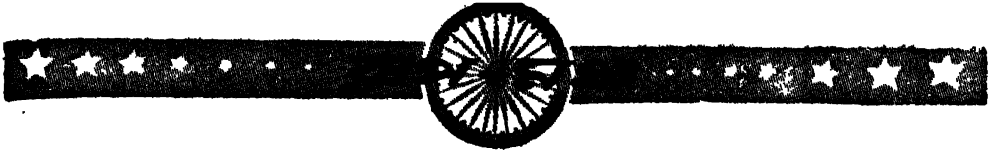
স্বামী আর স্ত্রী—অর্জুন আর কৃষ্ণা—দু'টি মাত্র প্রাণী। রঘু ডাকাতের অত্যাচার ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। মন্দির ধ্বংস করে, বিগ্রহের বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কার অপহরণ করে রঘু ডাকাত সমাজ-জীবনে তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে। অথচ রাজার সৈন্যসামন্তরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এই দুর্ধর্ষ ডাকাতকে দমন করতে পারছে না।

কৃষ্ণা বলে, "মানুষ যে এতবড় পশু হতে পারে—রঘু ডাকাতের কীর্তিকলাপ না জানলে তা কেউ ভাবতেও পারত না।"

প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির সুরে অর্জুন বলে, "রঘু ডাকাত কোনখানেই দুর্বলকে পীড়ন করেনি। শুনেছি লুটের বেশির ভাগ টাকাকড়িই যে গরীবকে বিলিয়ে দেয়।"

"অমন দয়ার অবতার হওয়াও মহাপাপ। ঠাকুরদেবতার গা থেকে অলংকার ছিনিয়ে নিতে যার হাত কাঁপে না—তার আবার গরীবের প্রতি দরদ?"

অর্জুন জবাব দেয় না। প্রসংগটা যে চাপা দিতে চায়। কিন্তু এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মানসিক ব্যবধান গড়ে উঠে। অর্জুন যে ডাকাতি করে—কৃষ্ণার কাছে যদি কোনদিন একথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পায়, তা হ'লে তাদের প্রগাঢ় বন্ধন একমুহূর্তে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—অর্জুন একথা জানে বলেই কৃষ্ণার কাছ থেকে নিজের পরিচয়টা যেন যত্নে গোপন রাখতে চায়। কৃষ্ণা তাকে পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই আনন্দমুখর, হাসি-উচ্ছল কৈশোরের দিনগুলি। সকালে উঠে ঊষা-সংকীর্তন করে বিগ্রহের পদপ্রান্তে দু'জনের আকুল প্রার্থনা—ঠাকুর, এ জীবনে যেন আমাদের মিলনে কেউ বাধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে। ঠাকুর তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন—কিন্তু অর্জুন যেন অনেকটা বদলে গেছে। ঊষা-সংকীর্তনে তার তেমন উৎসাহ নেই—ঠাকুর দেবতার প্রতি তার আগের মতো শ্রদ্ধা নেই।...

* * *

অর্জুনের চাল-চলন কৃষ্ণার মনে সন্দেহের উদ্রেক করলে। চাষ-বাসের কোন উদ্যোগ-আয়োজন নেই—অথচ কীসের নেশায় অর্জুন সারাদিন বাইরে ঘুরে বেড়ায় আর এত টাকাই বা রোজগার করে কোন সূত্রে! অর্জুনকে জিজ্ঞেস করেও কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। কৌশলে এড়িয়ে গেছে অর্জুন।...

একদিনের অপ্রত্যাশিতভাবে কৃষ্ণার সন্দেহ দৃঢ়তর হলো। হঠাৎ মাঝরাতে শব্দ শুনে জেগে উঠলো কৃষ্ণা। বাইরে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে। তারই শব্দ বুঝি। কিন্তু অর্জুন কোথায়?...

পরদিন এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য সৃষ্টি হলো। অর্জুন বলে, "একটা জমি বন্দোবস্তের ব্যাপারেই আমাকে বেরুতে হয়েছিল কৃষ্ণা?"

"এত রাত্রে?"

"জমিটা গোলমেলে—কিন্তু একনাগাড়ে এর চেয়ে ভালো চাষের জমি এ অঞ্চলে আর নেই। অনেক দালাল ঘোরা-ঘুরি করছে—তাই একটু বেশি রাতেই আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।"

কৃষ্ণার মনে তবুও সন্দেহের ছায়া রয়েই গেলো। কিন্তু কে জানতো—এত শীগগির ঝড় উঠবে?..

গভীর রাত্রি। কৃষ্ণার মনে শান্তি নেই। সে ঘুমের ভাণ ক'রে শুয়ে আছে। এমন সময় খুট্ ক'রে শব্দ হ'লো। আড় চোখে তাকিয়ে কৃষ্ণা দেখলে—অর্জুন বেরিয়ে যাচ্ছে। পা টিপে টিপে কৃষ্ণা তা'র অনুসরণ করলে।

পাশের ঘরে প্রবেশ করে কাঠের আবরণ সরিয়ে সুরঙ্ পথে নেবে যাচ্ছে অর্জুন। কৃষ্ণা যে নিজের চোখকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারছে না। সে কি স্বপ্ন দেখছে! তবে কি অর্জুন সেই রঘু ডাকাত—যার নাম শুনলে নারায়ণগড়ের নরনারী আতংকে শিউরে উঠে।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে অর্জুন চলে গেলে পর কৃষ্ণা সুরঙ্ পথে চোরা কুঠুরীতে প্রবেশ করলে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আর লুণ্ঠিত দ্রব্যের সমাবেশ দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো কৃষ্ণা। তাঁর বাড়ীতে ডাকাতদের গুপ্ত আড্ডা—সে এক দুর্দান্ত দস্যুর স্ত্রী.....ঘৃণায় তার শরীর রী রী করে উঠলো।

রাত্রিশেষে অর্জুন ফিরে এসে দেখতে পেল কৃষ্ণা তার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
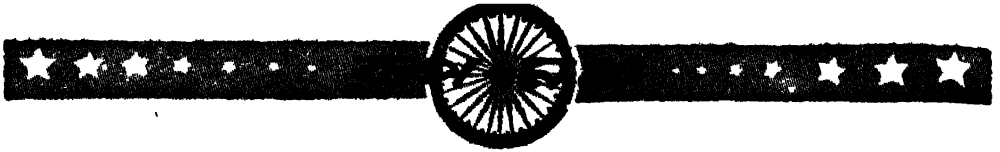
"তুমি—তুমি—তুমি রঘু ডাকাত!" কৃষ্ণা কাঁপতে কাঁপতে অর্জুনকে বলে।

অর্জুন দেখে আজ সে ধরা পড়ে গেছে। মিথ্যা বলে লাভ নেই। কুন্ঠিত হ'য়ে সে বলল—"কিন্তু ডাকাত তো আজ আমি তোমারই জন্তে, কৃষ্ণা।" মুহূর্তকাল থেমে আবার বলে—"ডাকাত না হ'লে তো জমিদারের গ্রাস থেকে তোমাকে আমি রক্ষা ক'রতে পারতাম না।"

"কিন্তু যা অন্যায়—অধর্ম—তাকে আশ্রয় ক'রে সংসার গড়া যায় না। তোমাকে আজ বেছে নিতে হবে কোন্‌টা তুমি চাও—ঐশ্বর্য, না আমাকে!"

"তোমাকে—তোমাকে কৃষ্ণা। তোমার জন্যেই আমি ডাকাত। তোমাকে যদি পাই, তবে আর ডাকাতি কেন!"

"বেশ—তাহ'লে আজ থেকে ডাকাতি তুমি ছেড়ে দেবে।"

"দু'দিন আমাকে সময় দাও। সাংগোপাংগদের সব বুঝিয়ে বলতে হবে তো।"

"বেশ। কিন্তু আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, অন্ততঃ ঊষা কীর্তনের সময় ভগবানকে ডাকবে। পতিতপাবন তিনি, দয়া করবেন। ঐ ঊষা হ'ল। কর শপথ।"

অর্জুন শপথ করল।

দুজনে এক সংগে গেয়ে উঠল—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

* * * *

নারায়ণগড়ের রাজা নারায়ণবল্লভ শ্রীচন্দনপাল প্রজারঞ্জক আর ন্যায়পরায়ণ ব'লে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু রঘু ডাকাতের অত্যাচারে তাঁর খ্যাতির আসন টলে উঠেছিল। প্রজারা রঘু ডাকাতের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। সবার মনেই অসন্তোষ জমা হয়ে উঠেছিল।

রাজা শ্রীচন্দনপাল রঘু ডাকাতকে দমন করবার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন। রঘু ডাকাতের মস্তকের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'লো। কিন্তু রঘু ডাকাতের অনুচররা ছদ্মবেশে সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই লোকে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে একে অন্যের কাছে রাজার এই নতুন আদেশের কথা আলাপ করছিল।

একজন গুপ্তচর এসে অর্জুনের ঘাঁটির খবর সেনাধ্যক্ষের কাছে জানালে। পাহাড়ের পাদদেশে একটা অতি সাধারণ বাড়ীতেই রঘু ডাকাতের আড্ডা। সংবাদের সূত্র ধ'রে রাজার সৈন্যদল বাড়ী ঘেরাও করলে। কিন্তু রঘু ডাকাত বা তার গুপ্ত কুঠরীর কোন সন্ধানই তারা পেলে না। অগত্যা কৃষ্ণাকে তারা বন্দী ক'রে নিয়ে গেল রাজপ্রাসাদে। স্বামীর কোন খবরই দিতে পারলে না কৃষ্ণা। রাজা আদেশ দিলেন—যতদিন না রঘু ডাকাত ধরা পড়ে ততদিন তার স্ত্রী প্রাসাদেই বন্দী থাকবে ঐ নারায়ণের মন্দিরে।"

* * * *

এদিকে অর্জুন কৃষ্ণার সংগে পুরোপুরি মিলনের আশা নিয়ে ফিরে এলো বাড়ীতে। কিন্তু কৃষ্ণা নেই। সব রক্ত মাথায় উঠে গেল অর্জুনের। ডাকাত বলেই কৃষ্ণা তাকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে। তার আগ্রহ, তার আশ্বাস, কৃষ্ণার গা ছুঁয়ে অর্জুনের শপথ—কিছুই বিশ্বাস করেনি কৃষ্ণা। মেয়ে হয়ে তার এত দম্ভ, এত বড় স্পর্ধা। অর্জুন যে তার স্বামী এইটুকু বিবেচনা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে কৃষ্ণা। বেশ—এর প্রতিশোধ নেবে অর্জুন—কঠিন প্রতিশোধ। আজ থেকে সুরু হবে রঘু ডাকাতের বর্বর অত্যাচার—এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার সুরু করবে রঘু ডাকাত—যার ফলে কৃষ্ণাকে ছুটে এসে তার পা জড়িয়ে ক্ষমা চাইতে হবে—আর তখন—তখন ঘৃণাভরে নারীর সেই কাতর প্রার্থনাকে নিষ্ঠুর উল্লাসে প্রত্যাখ্যান করবে অর্জুন।

* * * *

রাত্রির শেষ প্রহরে রাজপ্রাসাদে রঘু ডাকাতের হামলা সুরু হ'লো। সারা প্রাসাদের অধিবাসীরা সুখনিদ্রায় মগ্ন। শুধু খোজা প্রহরীর ভারী বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে রঘু ডাকাতের অনুচররা। রঘু
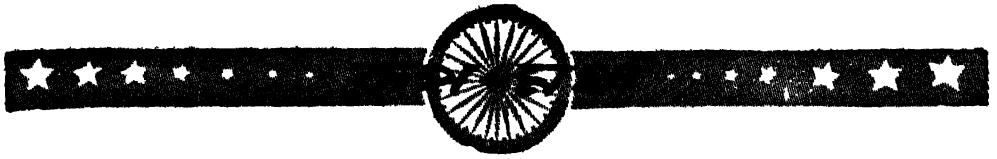
ডাকাত নির্ভয়ে রাজ-অন্তঃপুরে রাজার শয়ন-কক্ষে ঢুকল। কোষাগার থেকে কাপড়, হীরা-জহরৎ, মণি-মাণিক্য আর মূল্যবান অলঙ্কার সব নিঃশেষে লুণ্ঠন ক'রছে। হাতে রয়েছে তার তীক্ষ্ণধার ছোরা। কিন্তু এদিকে যে রাত্রি শেষ হ'য়ে আসছে—ভোরের আলো ফুটবার আর বেশী দেরী নেই—সে খেয়াল ছিল না অর্জুনের। হঠাৎ নারায়ণের মন্দির থেকে পরিচিতকণ্ঠে উষা-কীর্তন শুনল—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।" মুহূর্তের জন্য বিহ্বল হ'য়ে উঠলো অর্জুন। মনের পটে ছবির মতো ভেসে উঠলো অতীতের স্বর্ণরঞ্জিত স্মৃতি। এ স্বর—এ কণ্ঠস্বর তার অতি পরিচিত। আর ডাকাতি ছাড়তে না পারলেও উষা কীর্তনের অংগীকার সে একদিনের জন্যেও ভংগ করেনি। অর্জুনের অনুচররা গুপ্তভাবে প্রাসাদ কক্ষের বাইরে থেকে খোজা প্রহরীদের উপর কড়া নজর রাখছিল। তারা সর্দারের এই দুর্বলতার কথা জানতো। জানালার ফাঁকে মুখ এগিয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কাতর অনুরোধ জানালে ত্রিশূল—"সর্দার—তুমি উষা কীর্তন করে তোমার নিজের বিপদ, সকলের বিপদ ডেকে এনো না। আজকের মতো—শুধু আজকের মতো তুমি আমাদের কথা রাখো।"

সবই ব্যর্থ হ'ল। মুহূর্তে অর্জুন ভুলে গেলো সে রাজ-প্রাসাদে ডাকাতি ক'রতে এসেছে। কৃষ্ণার গা ছুঁয়ে সে যে শপথ করেছে, তা সে ভাঙতে পারে না। হাত থেকে খসে পড়ল তার মহামূল্য রত্নরাজি—স্খলিত হ'লো শাণিত ছুরিকা—ডাকাতের কণ্ঠে উচ্চারিত হ'লো ভগবানের বন্দনা গান—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।" কীর্তনে সচকিত হ'লো রাজ-অন্তঃপুর। রাজ-কোষাগারে উষা-কীর্তন। ছুটে এলো রাজ-প্রহরী—দেহরক্ষীর দল। রাজ-প্রাসাদে মহা চাঞ্চল্য। রঘু ডাকাত ধরা পড়েছে! এই তো মহা সুযোগ। উদ্যত খড়্গ নিয়ে ছুটে এলো ঘাতক। কিন্তু পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন রাজা।

রাজাদেশে থমকে দাঁড়ালো ঘাতক। কীর্তন করতে করতে বিহ্বল কণ্ঠে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলো অর্জুন। রঘু ডাকাতকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছেন রাজা নারায়ণবল্লভ—শ্রীচন্দনপাল—প্রহরীরা এর কারণ না বুঝতে পেরে রাজার সংগে কীর্তনরত অর্জুনের অনুসরণ করলেন।

মন্দির-প্রাংগনে কৃষ্ণার কণ্ঠের সংগে মিলিত হলো অর্জুনের আবেগ-মথিত কণ্ঠস্বর। নারায়ণের মন্দিরে কৃষ্ণা—তার স্ত্রী! অর্জুনের বিস্ময়ের সীমা রইলো না। কিন্তু এর মাঝেও ভগবানের ইংগিত দেখতে পেলে অর্জুন। উষা-কীর্তনের সূত্রেই যার সংগে পরিচয় পরিণত হ'লো পরিণয়ে—উষা কীর্তনের আকর্ষণই অর্জুনকে টেনে আনলো তার হারাণো স্ত্রীর সান্নিধ্যে। আজ থেকে ভগবানের নাম-গানই তার জীবনে একমাত্র সত্য হ'য়ে উঠুক।

কীর্তন শেষ হ'লে অর্জুন বল্লে—"মহারাজ, কীর্তন শেষ হ'য়েছে। এইবার আপনার অভিরুচি অনুযায়ী দণ্ড-বিধান করুন।"

"কিন্তু—তুমিই কি সেই দুঃসাহসী রঘু ডাকাত?"

"হাঁা, মহারাজ—আমিই সেই দুঃসাহসী রঘু ডাকাত—যাকে বন্দী করবার জন্যে আপনি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। আর পাশে যাকে দেখছেন—সে আমারই স্ত্রী কৃষ্ণা।"

আবেগজড়িত কণ্ঠে রাজা বল্লেন—"না, না, তুমি ডাকাত নও, দুর্ধর্ষ দস্যু নও—তুমি ভক্ত—জীবন যাবে একথা জেনেও যে, ভগবানের নাম কণ্ঠে নিতে ভয় পায় না—ডাকাতি তার ছদ্মাবরণ মাত্র। তুমি ভক্ত, তুমি ভক্তোত্তম। সন্দেহের বশে তোমার স্ত্রীকে নজরবন্দী করে রেখেছিলাম বলে তুমি আমাদের ক্ষমা করো—তোমরা আমাদের আশীর্বাদ কর…"

ভক্ত দম্পতির চরণতলে সবাই নত হলেন।

এর পর থেকে রঘু ডাকাতের অত্যাচারের কাহিনী কেউ শুনতে পায়নি। রঘু ডাকাতের জন্মান্তর হলো এই মর্ত-জীবনেই। রাজ্যের দুর্গতদের চোখের জল মোছাবার ভার সে তুলে নিল নিজের হাতে। অর্জুন কৃষ্ণাকে আবার নতুন ক'রে লাভ করলো—তার নতুন কর্ম-সাধনার নতুন জীবনাদর্শে।

বঙ্গখুড়োর জীবনের এক অধ্যায়

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি তখন নটা। প্রায় বারো ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর বাড়ী ফিরে স্নানাদি সেরে একটু জিরোচ্ছি, এমন সময় নূতন চাকরটা এসে বল্লে—বঙ্গবাবু আপনার সংগে দেখা করতে চাইছেন।

—বঙ্গবাবু! সে আবার কে?

—ওহো! আমাদের বঙ্গখুড়ো—সে আর একবার এসেছিল বটে তোমার খোঁজে,—ব'লে উঠলেন আমার সহধর্মিণী!

—বঙ্গখুড়ো! মানে আমাদের ঘি-ওয়ালা?—সে হঠাৎ আমাকে খুঁজছে কেন? আর তার যদি কোনো দারকারই থাকে, সে তো অনায়াসে ওপরে আসতে পারে; নীচে থেকে আমাকে খবর দেবার মানে কি?

নতুন চাকর মোহন তখনও ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে বললে,—বঙ্গখুড়োর সংগে আর একজন কে ভদ্দর লোক রয়েছেন।

—খুড়োর সংগে আবার একজন ভদ্দরলোকও রয়েছেন! চল', দেখি, কি খবর—ব'লে আমি উঠলুম। স্ত্রী বললেন —ওর ঘিয়ের কারবারের অংশীদার হবে, বোধ হয়। নিশ্চয় কিছু টাকা-কাকা ধার, বা কাউকে কিছু পরিচয়পত্র (introduction letter) লিখে দিতে হবে।

ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললুম—দেখাই যাক্, ফলেন পরিচীয়তে।

বৈঠকখানায় ঢুকে অবাক্! আমাদের ঘি-ওলা বঙ্গখুড়ো চেয়ারের ওপর ব'সে আছে!—যে এই দশ বচ্ছর ধ'রে আমাদের বাড়ীতে ভুঁয়ে উবু হয়ে ব'সে ঘি ওজন ক'রে আসছে, এবং পাওনা টাকা চাইতে এসেও ঘরের বাইরে থেকে সাষ্টাংগে প্রণিপাত ক'রে জোড়হাতে বারান্দার মেঝের ব'সে অপেক্ষা করেছে, সে আজ আমার বাড়ীর বৈঠকখানার চেয়ার দখল ক'রে ব'সে থাকবে, এটা একটা অত্যন্ত অভাবনীয় ব্যাপার নয় কি?

কিন্তু আমার চোখ ভুল দেখেনি—সত্যিই শ্রীমান্ বঙ্গচন্দ্র—যদিও তার চেহারাটা আদৌ শ্রীমান্ নয় এবং বয়সেও শ্রীমানদের পর্যায়কে বহুকাল আগেই অতিক্রম ক'রে ষাটের কাছাকাছি পৌঁছেছে—আমার বৈঠকখানার চেয়ারে আড়ষ্ট ভাবে আসীন হয়েছিলেন এবং তাঁর সংগী ভদ্রলোকটির সংগে খুবই নিম্নকণ্ঠে কথাবার্তা কইছিলেন। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে চঞ্চল হয়ে চেয়ার ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করামাত্র অপরিচিত ভদ্রলোকটি ব'লে উঠলেন—বঙ্গবাবু, আপনি হঠাৎ উঠে পড়ছেন কেন? ব'সেই তো কথাবার্তা হবে। বঙ্গচন্দ্র ঢোক গিলে খুবই সমীহ ক'রে বলতে গেল —'আজ্ঞে, মানে—বাবু'—নিমিষে অবস্থা বিবেচনা ক'রে আমাকে অগত্যা বলতেই হ'ল—'তাতে কি হয়েছে? আরে, বস', খুড়ো বস'।'—খুড়ো একবার আমার মুখের দিকে, একবার তার সংগীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকটা যেন মরিয়া হয়েই চেয়ারটার ওপর ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল।—মৃদু হেসে আমি আর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতেই বঙ্গখুড়োর সংগী ভদ্রলোকটি আরম্ভ ক'রে দিলেন—'আপনার সংগে পরিচয় ছিল না; কিন্তু নাম আপনার অনেক শুনেছি। আর বঙ্গবাবু তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।' খুড়োর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বললুম—'খুড়ো আমাকে ভালোবাসে—ওর প্রশংসা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ও আপনাকে হঠাৎ আমার কাছে টেনে নিয়ে এসেছে কেন? আপনার প্রয়োজনটা কি?'

একেবারে আসল বিষয়বস্তুর মুখোমুখী করিয়ে দেওয়ায় ভদ্রলোক বোধ করি একটু ঘাবড়েই গেলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললেন, 'প্রয়োজনের কথাটা পরে বলছি; কিন্তু বঙ্গবাবু তো আমাকে আপনার কাছে আনেননি, আমিই উল্টে ওঁকে জোর ক'রে টেনে এনেছি। উনি বলছিলেন—আমার যেতে সাহস হয় না; বাবু আমার ওপর রাগ করবেন।' একটু অদ্ভুত লাগল কথাটা, বললুম—'তার মানে?' এইবার ভদ্রলোক একটু

ঘাড় চুলকিয়ে নিয়ে হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে আমতা আমতা ক'রে বললেন, 'আমরা একখানা ছবি ক'রতে চাই —আপনার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে, কাজেই—' কথাটা তাঁর মুখে অসমাপ্তই রইল। তাঁর কথার মাঝেই বললুম, 'ভালো কথা। কিন্তু সে যে অনেক খরচার ব্যাপার! আজকাল একখানা ছবি তৈরী ক'রতে কত খরচ পড়ে, সে আন্দাজ আপনার আছে?'

'আজ্ঞে—তা প্রায় ষাট সত্তর হাজার'—

'আজ্ঞে না—খুব কম ক'রেও এক লাখ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের মধ্যে এবং দেড় লাখ টাকার কম হাতে নিয়ে ছবি ক'রতে নামা আমার মতে ধৃষ্টতা'।

—'আজ্ঞে, তবে যে শুনলুম—'

—'শুধু তাই নয়'—তাঁর কথাকে শেষ ক'রতে না দিয়েই বললুম—'আমি যে টাকার অংকটা বললুম, এটা হচ্ছে খুব কম পক্ষে খরচার কথা—একখানা সর্বাংগীন সুন্দর ছবি ক'রতে গেলে খরচা তিন চার লাখে গিয়েও দাঁড়াতে পারে।'

—'এত টাকা খরচ ক'রে ছবি ক'রলে লাভ হবে ব'লে মনে করেন?'

—'লাভ যে হবেই, তার কোনো মানে নেই। ব্যবসা ক'রতে গেলে লাভ লোকসান, দুয়ের কথাই ভাবতে হয়।'

আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, আমাদের বঙ্কখুড়োর চোখ দুটো হয়ে উঠেছে ভাঁটার মতো বড় বড়, আর মুখ হয়ে পড়েছে যৎপরোনাস্তি ফ্যাকাসে।

সংগের ভদ্রলোকটি—তাঁর নাম শুনলাম নবীনবাবু—

—একটু আমতা আমতা ক'রে বললেন, আপনি তো আমাদের রীতিমত ঘাবড়ে দিলেন, স্যার'।

—'আজ্ঞে, তা একটু দিলুম বৈকি! পরে ঘাবড়ানোর চেয়ে আগে ঘাবড়ানো ভালো নয় কি?'

'আমরা ভেবেছিলুম, হাজার ষাটেক টাকা নিজেদের গাঁট থেকে খরচ করব, তারপর 'হাজার ত্রিশ চল্লিশ তো ডিষ্ট্রি-বিউটারের কাছ থেকে পাওয়া যাবেই—'

—'না জিনিষটা অতটা সোজা নয়, কিন্তু খরচাটা করবেন কে? আপনারা দু'জনেই?'

—'আজ্ঞে না, আমার টাকা কোথায়? টাকাটা বঙ্কবাবুই দেবেন—'

বঙ্কখুড়োর গলা থেকে একটা অব্যক্ত আওয়াজ বেরুলো,—অপ্রস্তুতের অভিব্যক্তি!

—'বল' কি খুড়ো! ঘি বিক্রী ক'রে এত টাকা ক'রে ফেলেছ? লাখ-দু'লাখ হবে?'

আমার প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে খুড়ো আমাদের চোরা হাসি হাসতে হাসতে বললে—আজ্ঞে বাবু, মেলিটারীতে ঘি সাপ্লাই করছিলুম কিনা—'

—'তাই বনস্পতি আর কলা-ময়দা চটকানোর শ্রাদ্ধ ক'রে বেশ কিছু মুনাফা হয়েছে!'

—'এখনত আর মেলিটারী নেই, কাজেই সাপ্লাইও বন্ধ। তাই ম্যানেজার বাবু বললেন,—মানে উনিই আমার ম্যানেজার কিনা—উনি বললেন, টাকাগুলোকে খামোকা বসিয়ে না রেখে, ছবির কারবারে নামলে ভালো হয়। তা' আমি আপনার নাম ক'রে বললুম, আমি ওকে চিনি, ছবির কারবার যদি করতেই হয়, তাহলে ওঁকে না জানিয়ে করব না।'

—'বুঝলুম তো সব। কিন্তু বল তো খুড়ো, টাকা তুমি জমিয়েছ কত? লাখ পাঁচেক হবে?'

—'আজ্ঞে না—এই তো সবে ছ'মাস সাপ্লাই করতে পেয়েছি; তাতে কি আর অতো টাকা হয়? মেরে কেটে ষাট-সত্তর হাজার টাকা লাভ করতে পেরেছি।'

কথাটা খুড়ো ঠিক বলেছে কিনা জানবার জন্যে জিজ্ঞেস করলুম—'আচ্ছা, তুমি যে এই ষাট হাজার টাকা ছবির ব্যবসায়ে খরচ করবে বলছ, ধর, ভগবান না করুন, এই সমস্ত টাকাটাই তোমার লোকসান চ'লে গেল, তাহ'লে?'

—'বলেন কি বাবু? তাহ'লে বুক ফেটে ম'রে যাব। এই বয়েসে অত টাকার শোক সামলাতে পারব না।'

—'সত্যি বলছ?'

খুড়ো হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল এবং ততোধিক হঠাৎ হেঁট হয়ে আমার পদস্পর্শ ক'রে বলল—'এই আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবু—আমি কি আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারি, না, কখনো বলেছি?'
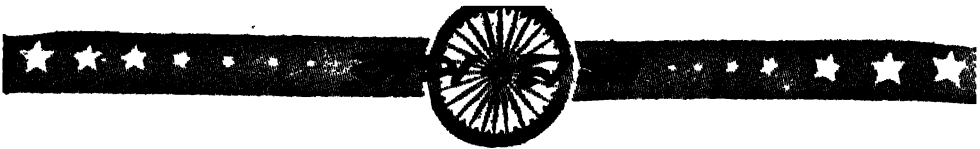
হাসতে হাসতে বললুম, 'আগে কখনো বলনি সত্য।' কিন্তু সম্প্রতি মিলিটারীর স্পর্শ পেয়েছ, তাই ভয় হচ্ছে। মিলিটারী স্পর্শমণি এদেশের যা ছুঁয়েছে, তাকেই সোনা করে তুলেছে কিনা—'

—'আজ্ঞে না বাবু, আপনি বিশ্বাস করুন, সত্তর-পঁচাত্তরের বেশী আমি জমাতে পারিনি।'

আমি গম্ভীর হয়ে গেলুম। খুড়োর মুখের দিকে তাকিয়ে বেশ বুঝতে পারলুম—ও যা বলছে, তা সবটা না হলেও, অনেকখানি সত্য। এবং ওর সম্বন্ধে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বলতে পারি—পয়সা ওর মা-বাপ; একটা ফুটো পয়সার লোকসানও ও জীবনে সহ্য করেনি এবং করতে পারবেও না। আমি খুড়োকে সম্বোধন করে বললুম, দেখ, তোমার যাতে ক্ষতি হয়, সে কাজ আমি তোমায় করতে বলতে পারি না। তোমার যা পুঁজি, তা নিয়ে ছবির কারবারে নামা তোমার উচিত হবে না। যাঁদের বিশ-পঁচিশ লাখ টাকা আছে, আমার মতে, মাত্র তাঁদেরই ছবি করতে উৎসাহী হওয়া চলতে পারে। কারণ, দু'পাঁচ লাখ টাকা লোকসান তাঁদের গায়ে খুব বেশী গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারবে না।—অবশ্য, বেশ বুঝে চলতে পারলে ছবির ব্যবসায়ে লোকসানের চেয়ে লাভের সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু এটা অল্প মূলধনের কারবার নয়। তোমার এখন বয়েস হয়েছে ষাটের ওপর। তোমার জীবনে তুমি যে আর একটা যুদ্ধ দেখতে পাবে এবং সেই যুদ্ধে আবার ক'রে ঘি সাপ্লাই ক'রে আর একবার বড়লোক হবার চেষ্টা করবে, সে দুরাশা করা তোমার পক্ষে অন্যায় হবে। কাজেই এখন তোমার এমন ব্যবসায়ে হাত দেওয়া উচিত, যাতে মাত্র পাঁচ-সাত হাজার টাকা মূলধনের দরকার হয়। আর সেই ব্যবসায়ে তুমি সম্ভব হ'লে এই ভদ্রলোককেই ম্যানেজার রেখ—এটা আমার অনুরোধ।' খুব ক্ষুণ্ণ হয়েই কিনা জানি না, ম্যানেজার নবীন বাবুই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন আগে এবং 'নমস্কার—চলুন বঙ্কবাবু' বলেই সদরের দিকে পা বাড়ালেন। খুড়ো যাবার আগে আর একবার আমার পা ছুঁয়ে বললে, 'ভাগ্যে আপনার কাছে এসেছিলুম; নইলে লোকসানের ধাক্কায় পড়েছিলুম আর কি!—আপনি আমায় বাঁচালেন, বাবু।'

স-ম্যানেজার বঙ্কখুড়োকে বিদায় দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে ভাবলুম, আজ অন্ততঃ একটা ভাল কাজ করেছি—গরীব মানুষ, ফিরি করে বাড়ী বাড়ী ঘি বিক্রী করে, আজও গায়ে ফতুয়া ছাড়া একটি সার্ট চড়াতে পারেনি, বেচারা যুদ্ধের কৃপায় দুটো পয়সার মুখ দেখেছে, তাকে অনর্থক ভাঁওতা দিয়ে ছবির কারবারে নামানো নিতান্তই অপরাধ হ'ত।

* * * *

বেশ কিছুদিন পরে টালিগঞ্জের কোনো ষ্টুডিওর চত্বরে দাঁড়িয়ে দু'পাঁচজন সহকর্মীর সংগে খোসগল্প করছি, এমন সময় বিকট আওয়াজ ক'রতে ক'রতে প্রায় সামনেই এসে দাঁড়ালো একখানা পুরোনো পন্টিয়াক্ গাড়ী। সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলুম, তারই ভিতর থেকে দরজা খুলে নামলেন আমার অতি পরিচিত শ্রীযুক্ত বঙ্কচন্দ্র দাসঘোষ মশাই, তার পেছনে পেছনে সুযোগ্য ম্যানেজার নবীনবাবু এবং আরও কে কে। বঙ্কখুড়োর পরণে আদ্দির ঢিলে হাতা পাঞ্জাবী, দেশী ধুতি এবং গ্লেজ্‌ড্ কিডের নিউকাট্ জুতো। আমার সংগে চোখাচোখি হ'তেই খুড়ো প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল; তারপর মনোবল সংগ্রহ ক'রে এগিয়ে এসে আমার সামনে প্রথম মিছে কথা কইলে, 'মহরতের দিন আপনি এলেন না—শরীরটা খারাপ ছিল বুঝি!'

'-কৈ? নিমন্ত্রণ পত্র তো পাই নি, বঙ্কবাবু।' মুখ দিয়ে ষ্টুডিওর সকলের সামনে খুড়ো কথাটা বার ক'রতে আমার লজ্জা হ'ল। বিস্ময়ে ভান করে খুড়ো বললে, 'সে কি? তা হ'তেই পারে না' ইত্যাদি।

বঙ্কখুড়ো আজ প্রডিউসার! তার ম্যানেজার নবীনবাবু শুধু যে প্রোডাকশন-ম্যানেজার তা নয়; তাঁরই সদ্য লেখা "চলো দিল্লী ফুকারকে" নামে স্বাধীনতার শহীদদের রক্তাক্ত ইতিহাস নিয়েই ফিল্ম উঠছে এবং নবীনবাবুরই প্রিয়-দর্শন জ্যাঠতাত ভাই ঐ ছবির হিরো। শুনলুম, পরিচালনা করছেন কে একজন নতুন ডিরেক্টর; সঞ্জয় পাল তার নাম। 'কৈ, এ নাম তো কখনো শুনিনি'—বলতেই আমার এক সহকারী ব'লে উঠল, সে কি স্যার? আমাদের অরুন্ধতীর ও যে দিনকতক প্রোডাকসন ডিপার্টমেন্টে
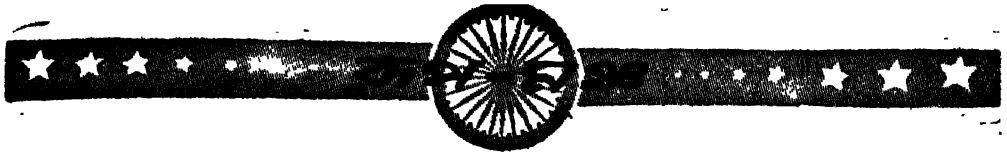
কাজ করেছিল—যাকে আপনি চুরি ধরা পড়তে তাড়িয়ে দিলেন—সেই যে সেই হাবলা—,

—'ওহরি! আমাদের হাবলা—! আমাদের হাবলা হয়েছে ডিরেক্টার সঞ্জয় পাল! ভালো, ভালো—'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ—হাবলা ওঁদের হিরোর খুব বন্ধু কিনা—তাই —'

* * *

যে লোক ইচ্ছে করে মরবে, তাকে বাঁচাবে কে? আমাদের বঙ্গখুড়োরও ইচ্ছামৃত্যু হলো। নশ্বর দেহটাকে তিনি যদি সত্যি সত্যিই ছেড়ে যেতেন, তা'হলে আমি দুঃখিত না হয়ে খুশীই হতুম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা ঘটল, তাতে দুঃখ অনুভব করা ছাড়া উপায় রইল না।

বেশ কিছুদিন ষ্টুডিওকে সরগরম ক'রে বিকট আওয়াজ পন্টিয়াক যাতায়াত করতে লাগল এবং 'চলো দিল্লী কুকারকে'র স্যুটিংও হচ্ছে বলে শোনা গেল—অন্ততঃ হৈ-হল্লা, চা-পান কম চলল না। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ এক দিন সব ভোঁ ভাঁ!—কানে এল, ডিষ্ট্রিবিউটার পাকড়াবার জন্যে যখন যতটা ছবি উঠছে, ততটাকেই যতটা সম্ভব সাজিয়ে প্রিণ্ট ক'রে দেখানো হ'ল, তখন গল্পের কিছুই মাথামুণ্ডু বোঝা গেল না এবং চোরাবাজার থেকে কোন ফগি (foggy) নেগেটিভ্ দিয়ে ছবি তুলায় বেশীর ভাগ জায়গা চোখে ঝাপসা ঠেকছে।—কাজেই বঙ্গচন্দ্র বনে গেলেন বেবাক বুদ্ধু এবং নবীনচন্দ্র সরে পড়লেন—দেশে যে কোঠা বাড়ী সবে তুলতে সুরু করেছেন, তাকেই, শেষ করবার তাগিদে।—টাকা পঁয়ষট্টি হাজার খরচ হয়ে গিয়েছে এবং দেনা চতুর্দিকে-চায়ের দোকান থেকে আরম্ভ করে ট্যাক্সিওয়ালা পর্যন্ত। আরও দিনকতক বাদে কানে এল, আমাদের অতি পরিচিত বঙ্গখুড়ো টাকার শোকে এবং দেনার জ্বালায় পাগল হয়ে গিয়েছেন এবং সম্প্রতি তাঁকে লিলুয়ার কোন্ এক উন্মাদ আশ্রমে রেখে চিকিৎসা চালানো হচ্ছে। এর পরে কি আপনাদের বলতে ইচ্ছে করবে না যে,

শ্রীবঙ্গ খুড়োর চরিত অপূর্ব কথন ;
পশুপতি চট্টো লেখে পড়ে সুধীজন ?

ভাড়া ষ্টুডিওর সেটে—

দেবনারায়ণ গুপ্ত

ছায়াছবির ব্যবসা ক্ষেত্রে আজ বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সকল সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব শুধু এই শিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই নয়—সে দায়িত্ব রাষ্ট্রেরও। "রূপ-মঞ্চ" সম্পাদক এ সম্পর্কে একাধিকবার তাঁর কাগজে আলোচনা করেছেন। সুতরাং সে সম্বন্ধে আমি কোন আলোচনাই করব না। কেবল ষ্টুডিওর সেটে কাজ করতে যে সকল সমস্যা দেখা দেয়, তারই উল্লেখ করব মাত্র।

কলিকাতা সহরে বর্তমানে মোট ষ্টুডিও সংখ্যা দাঁড়িয়েছে—১১টা। এই সকল ষ্টুডিওতে যাঁরা চিত্রগ্রহণের কাজ করেন, তাঁদের বেশীরভাগই ভারাটিয়া। যাঁরা ষ্টুডিও ভাড়া করে কাজ করেন, তাঁদের সকলকেই প্রায় নানারূপ প্রতিবন্ধকতার মাঝে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। ছবি যাতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে না পারলে এই সকল চিত্র প্রতিষ্ঠানকে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। ফলে টাকার অংক বেড়ে যায় সব দিক থেকে। কাজে কাজেই এই শিশু প্রতিষ্ঠানগুলির সত্যিকারের টেক্‌নিকের দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। সেই জন্যে অনেকে গল্পের দিক নজর রেখে ছবি তোলার পক্ষপাতি। তাঁদের ধারণা, গল্প যদি দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পারে, তাহলে সেই গল্পের জোরেই খরচা উঠে আসতে পারে। ফিল্মে কেবলমাত্র গল্প বলার এই অহেতুক ঝোঁক শিল্পকে একদিকে যেমন উৎসাহিত করছে—অপরদিকে তেমনি নানাকারণে নিরুৎসাহিত করে তুলেছে। কেননা, গল্পের রস-মাধুর্যে দর্শকগণ যেমন অভিভূত হয়েছেন, তেমনি কেবলমাত্র গল্প শুনিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে হাল্কা গল্প টেকনিক-এর জোরে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছে। কাজে কাজেই দেখা যাচ্ছে, গল্প এবং টেকনিক দুই-ই ছায়াছবির পক্ষে অনিবার্য। কেবলমাত্র একটী জিনিষের দ্বারায় দর্শকদের ভোলান সম্ভব নয়। কিন্তু ভাড়া ষ্টুডিওতে টেক্‌নিকের যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে ছবি তোলা একপ্রকার অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যেখানে মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে একটী পূর্ণাংগ চিত্রনাট্যের রূপ দিতে হয়, সেখানে টেক্‌নিকের দিকে যথাযথ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয় না। আমাদের দৃষ্টি থাকে সাধারণতঃ কতগুলো সট্ গ্রহণ করা হল এবং কতখানি ফিল্ম Expose করা হল তার দিকে। কিন্তু দৃষ্টিদান করা উচিত সটের স্বাভাবিক গতি ও গুরুত্বের দিকে। যে চিত্র-নাট্য স্বাভাবিক ভাবে রূপায়িত হয় না—সে চিত্র-নাট্য মঞ্চ-ঘেঁসা হয়ে পড়ে। চিত্র-নাট্যের গতি দ্রুত এবং স্বাভাবিক হওয়া প্রয়োজন। এসব ত্রুটী বিচ্যুতি খানিকটা স্বীকৃত অপরাধেরই মত। এ ছাড়া আরও অনেক অসুবিধাকে এড়িয়ে আমাদের সহজ পথের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। যেমন চিত্রনাট্যে একটি সেটের কল্পনা করে লেখক একটী দৃশ্য লিখে দিয়েছেন কিন্তু সেট নির্মাণ করার সময়

দেখা গেল যে, ঐভাবে সেট তৈরী করা সময় সাপেক্ষ। অথচ ঐদিন সুটিং করতে না পারলে প্রযোজককে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবে। এ ক্ষতি স্বীকার এবং সহ্য করার শক্তি প্রযোজকের না থাকায় কল্পনাকে খর্ব করে অনেক সময় কোনরকমে কাজটাকেই শেষ করা হয়। এই কোনরকমে কাজ শেষ করার ফল যে ভাল হয় না, তা সহজেই অনুমেয়।

এই সব অসুবিধা ছাড়া শিল্পীদের নিয়েও অনেক সময় বহু অসুবিধায় পড়তে হয়। যেমন একটী শিল্পী এক সংগে অনেক ছবিতে অভিনয় করছেন, তাঁর কাছ থেকে তারিখ পাওয়ার ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্য অনেক সময় দৃশ্যটীকে বিভক্ত করে লেখা হয় অথবা Counter Shot গ্রহণ করা হয়। এই দুইটী পথই চিত্র গ্রহণ কাজের পক্ষে বিপজ্জনক!
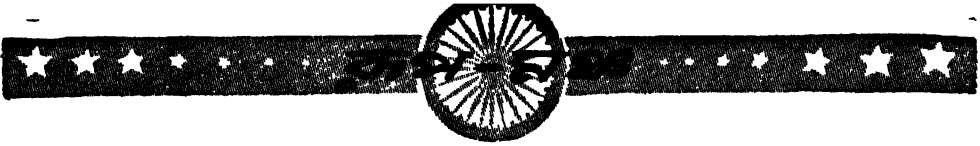
মোটকথা ভাড়া ষ্টুডিও, ভাড়া আর্টিষ্ট নিয়ে যে চিত্র তোলা হয়, তা ভাড়াটিয়া বাড়ীর অবস্থাই প্রাপ্ত হয়। যার ঘর গুলো যথারীতি খাড়া করা থাকলেও—চূণকামের অভাবে শ্রীহীন হয়ে থাকে। এই শ্রী ফেরাতে গেলে যে অর্থ ও যত্নের দরকার, তা বাড়ীওয়ালাও করেন না, ভাড়াটিয়াও করেন না।

এ ছাড়া মারাত্মক ব্যাপার হ'ল, সেটে কাজের সময় অপর দিকে সেট্ নির্মাণের ব্যবস্থা। মিস্ত্রিদের হাতুড়ির আওয়াজ একাধারে পরিচালক ও আর্টিষ্টকে বিব্রত করে তোলে। ষ্টুডিওর মালিক একবারও চিন্তা করেন না যে, ছবির কাজে এই বিরক্তিকর পরিস্থিতি কাজকে কিভাবে ব্যাহত করে।

যাঁরা ছবি দেখে কেবল অসন্তোষই প্রকাশ করেন, যাঁদের কাছে অক্ষমতার জন্যে পদে পদে আমাদের অপ্রস্তুত হতে হয়, তাঁদের কাছে একথা প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাঁরা আমাদের এ ত্রুটী ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন। এ সকল কথা তাঁদের কাছে অকপটে জানানোর উদ্দেশ্য এই যে, মনের গ্লানি, অন্তরের জ্ঞাত পাপকে একটু হাল্কা করার অপচেষ্টা মাত্র।

ছায়া-চিত্রে

অনিল গুপ্ত

ছেলে বেলায় প্রথমে ছায়াছবির খেলা দেখে অদ্ভুত সখ জেগেছিল এর কায়দাটা জানতে। তখন মনে হয়েছিল, কি যেন একটা অসম্ভব ব্যাপার। মাঝখানে কেটে যায় অনেকগুলো বছর বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে।

১৯৩৬ সালে (দিন ঠিক মনে নেই), একদিন সাইকেলে করে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পিছন থেকে একখানা মোটর এসে মারলে ধাক্কা। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম ফুটপাথে। গাড়ীর চালক পালাতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু রাস্তায় একজন চেনা ডাক্তারের সংগে দেখা হ'তেই তিনি গাড়ী জোর করে থামালেন। কথা কাটাকাটি হ'ল খানিকটা। ডাক্তার বললেন—'আপনি চাপা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিলেন।' চালক বললেন, —'নতুন গাড়ী, ব্রেক ঠিক ধরছেনা—তাই দেরী হয়েছে।' আমি তখন থাকতাম বালিগঞ্জে আমার মামার বাড়ীতে। গাড়ীর চালক সে বাড়ীতে গিয়ে হাজির—ঠিকানা কি করে পেলেন তা' ভুলে গেছি--মামার কাছে গিয়ে তিনি আপীল করলেন। খানিক বাদেই আমি বাড়ী গেলাম। আমার অবশ্য চোট বেশী লাগেনি, তবে সাইকেলটি চুরমার হয়ে গিয়েছিল। মামা আমাকে দেখে ভদ্রলোককে রেহাই দিলেন। ভদ্রলোকের সংগে তারপর দুই একটা কথা হতেই জানতে পারলাম, তিনি একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের সহকারী (বর্তমানে নিজেই পরিচালক)। সাপে বর হ'ল ভেবে, তাঁকে আমার ইচ্ছাটা জানালাম। তখন তাঁর অসম্মত হওয়ার উপায় ছিল না। তিনি আমায় ঠিকানা দিলেন, তাঁর সংগে দেখা করতে ষ্টুডিওতে। দেখা একদিন করতে গেলাম। ভেতর থেকে তিনি জানালেন, কাজে ব্যস্ত। এখন সময় হবে না। বুঝলাম, তিনি মোটর চাপা দেওয়ার দায় থেকে যখন রেহাই পেয়েছেন, তখন আমাকে আমল দেওয়ার দায় থেকেও বেঁচেছেন। ক্ষোভ হ'ল মনে। তবু আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, ও মহলের হালচালটাই হয়তো এরকম। কিন্তু জিদটা যেন আরও চেপে গেল। আমার বয়স তখন ১৯।

১৯৩৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় কাজ করতাম। সে সময় আনন্দবাজার পত্রিকার চিত্র সম্পাদক ছিলেন শ্রীযুত সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। সুনীল বাবু লোকের সংগে অদ্ভুত ভাবে মিশতে পারেন। ছবির মহলে তাঁর যাতায়াতও খুব। তাঁকে জানালাম আমার ইচ্ছাটা। তিনি আমাকে অরোরার অনাদি বাবুর কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে সুরু হোলো আমার হাতে খড়ি: আজ ১৯৪৮ সাল। বহু বাধা বিঘ্ন ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কেটেছে এতগুলো বছর। বহু খ্যাত-অখ্যাত শিল্পী, পরিচালক, প্রযোজক প্রভৃতির সংস্পর্শে এসেছি এই দীর্ঘ ৮ বছরে। ছবি তোলার কায়দাটা আয়ত্ত কিছুটা করেছি, সংগে সংগে এ মহলের অনেক আটঘাট, অনেক ব্যবসায়ী বুদ্ধির সংগে পরিচিত হয়েছি। যতই উচ্চস্তরে উঠেছি, ততই শিল্পীর মন নিয়ে চিত্রগ্রহণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছি। গতানুগতিকতা ছাড়িয়ে যাবার সাহসও কোন কোন সময় করেছি। সত্যকারের শিল্পী যাঁরা, তাঁরা তখন তারিফ করেছেন, আবার কেউ কেউ ঈর্ষান্বিত হয়ে ব্যংগ করেছেন। তারিফ যাঁরা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।—ব্যংগ যাঁরা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আমার বিশেষ কোন অভিযোগ নেই; কারণ, ক'জন মানুষ সত্যকারের শিল্পীর উদার মন নিয়ে জন্মে থাকেন?

হালে বাংলা ছবির উন্নতি দ্রুতগতিতে চলেছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। চিত্র মহলের লোকরা এককালে জনসাধারণের নিকট অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত ছিল। আজ জনসাধারণের মধ্যে সত্যসন্ধানী মন যাঁদের, তাঁরা বুঝেছেন, এও একটা আর্ট এবং খুব উচ্চাংগের আর্ট। সমাজের প্রগতির সংগে সংগে এই উপলব্ধিরও প্রগতি চলেছে। তাই বাংলা ছবিও ক্রমেই উন্নততর পর্যায়ে চলেছে! এ হল বাইরের দিক। ভিতরের দিকে থেকে আমার কতকগুলো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা যখন ভাবি, তখন মন বড় খারাপ লাগে। ছবি যাঁরা তোলেন অর্থাৎ
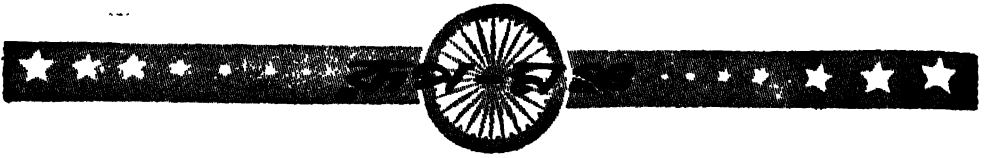
যাঁরা প্রযোজক, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেন বিপুল অর্থাগমের সম্ভাবনা এর ভেতর দেখ্‌তে পাচ্ছেন। অর্থের মোহ যেন এঁদের অনেকের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ছে।

এর জন্য দায়ী শুধু প্রযোজকই নন। নতুন নতুন অনেক পরিচালকের হাতও এতে যথেষ্ট রয়েছে। চিত্রজগতে অল্প কিছুদিন কাজ করার পরেই (অথবা চিত্র-জগতের সংস্পর্শে না এসেই) তাঁদের নিজেদের সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা হয়ে যায়। অথচ তাঁদের অজ্ঞতার পরিচয় নানা ভাবে ফুটে উঠে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—একদিন কোন একটা ছবির মহরতের সময় স্থির-চিত্র (still-photo) নেওয়ার উদ্যোগ করা হচ্ছিল। ছবির পরিচালক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিটা fade-in করে নেবেন, না fade-out করে নেবেন?" ছবি তোলার সব কিছু সম্পর্কে পরিচালকদের যে বেশী অভিজ্ঞতা থাকবে, এটাই সবার ধারণা এবং ছবিকে সর্বাংগ সুন্দর করলে এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে পরিচালক প্রমাণ করে দিলেন, তিনি চিত্র গ্রহণের কিছুই বোঝেন না। পরিচালক হিসাবে তাঁর জানা উচিত ছিল, fade-in এবং fade-out কাকে বলে এবং স্থির-চিত্রে তা হয় কিনা। এই ধরণের অনেক পরিচালক শুধু মুখের জোরে প্রযোজক হিসাবে অনেককে টেনে নিয়ে আসেন। এক্ষেত্রে প্রযোজক পরিচালকদের চেয়ে আরও বেশী অজ্ঞ। তিনি টাকা রোজগার করবেন এই বিশ্বাস নিয়েই আসেন। তিনি হয়তো ছবির কিছু বোঝেন না, বুঝলে হয়তো অজ্ঞ পরিচালকদের আহ্বানে সাড়া দিতেন না। এসব ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ছবি তোলা সুরু হওয়ার কিছুদিন পরেই হয়তো বন্ধ হয়ে গেল। এতে কোন বই অর্ধেকটা হ'ল, কোন বইয়ের সিকি ভাগ হ'ল। প্রযোজকদের কেউ কেউ কিছু টাকা সংগ্রহ করে নেমে পড়েন ছবি তোলার কাজে। তারপর চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায়, টাকা যায় ফুরিয়ে। তিনি আবার নানা জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করলেন, আবার কিছু দিন কাজ চলে আবার থেমে যায়। যাঁরা ধনপতি, তাঁরা এর সুযোগ নিয়ে বিপন্ন প্রযোজকদের কাজ চালিয়ে দিয়ে বেশ কিছু অর্থাগম করবেন। ব্যাপারটা বিশ্লেষণ করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হ'য়ে উঠে। 'ছবি পর্দায় দেখতে পারলেই টাকা উঠে যাবে'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে আসেন সামান্য টাকা নিয়ে। হয়তো ছবি শেষ পর্যন্ত তোলা হ'ল না, অথবা নানা জোড়াতালি দিয়ে হ'ল। কিন্তু মাঝখানে বহুপ্রকারের দুর্নীতির খেলা চল্‌ল। যার টাকা করার সুযোগ আছে, সে টাকা করে, আর যে সাধারণ কর্মী, সে হয়তো তার ন্যায্য প্রাপ্য হতেই বঞ্চিত হ'ল। এই ধরণের দুর্বল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে যেমন বহু দুর্নীতি প্রশ্রয় পেয়েছে, সংগে সংগে ছবির মানও অনেক নেমে গেছে। সব প্রযোজকদের কথা বল্‌ছি নে। বহু প্রযোজক আছেন, যাঁরা সত্যই দরদী মন নিয়ে, শিল্পীর হৃদয় নিয়ে চিত্রজগতে এসেছেন।

আমার মত ছবি যাঁরা তুলে থাকেন, তাঁদের অনেকের অনেক রকমের অভিজ্ঞতাই হয়েছে। কিন্তু মনে হয়, একটা অভিজ্ঞতা সবারই হয়েছে। ধরুন, ষ্টুডিওতে ছবি তোলা হচ্ছে। প্রযোজক নিজে হয়তো ষ্টুডিওর মালিক নন। তাঁকে ষ্টুডিও
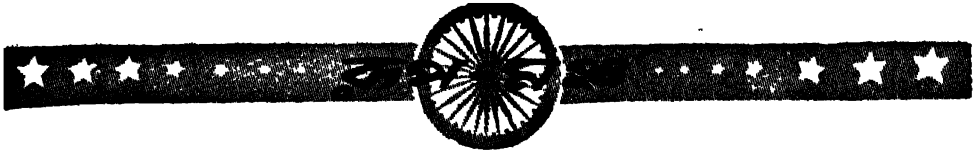
ব্যবহার করার জন্ত দৈনিক ভাড়া গুনতে হয়। পরিচালক চিত্র গ্রহণের উদ্যোগ আয়োজন করছেন। ক্যামেরাম্যানও প্রস্তুত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ক্যামেরাম্যানের উপর তাড়া এলো—'নিন্ নিন্, স্তার, তাড়াতাড়ি করুন।' তাড়া দিলেও কর্মীরা হয়তো তেমন সাড়া না দিয়ে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছেন। আবার হাঁকছেন, 'তাড়াতাড়ি করুন, যে করে হোক আজকের প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে। ভাল কাজ আমার দরকার নেই। ছবি পর্দায় দেখ্‌তে পেলেই হ'ল। ছবি দেখবে মশাই বাঙালী দর্শক, এত আর হলিউডে যাচ্ছে না।' আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য যতটা না সমালোচনা করা, জনসাধারণকে ততটা অবহিত করা। দর্শকের মান যতই উঁচু হতে থাকবে, ততই এ ধরণের কথা বলার সাহসও কমতে থাকবে, সংগে সংগে তাঁরা দর্শকরা কি চান, তা উপলব্ধি করে ছবির আরও উন্নতি করার জন্ত তৎপর হবেন।

আমি সত্যকার শিল্পী হবার চেষ্টা করেছি, কতকগুলো তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনকে ক্ষুব্ধ করলেও আমার চেষ্টা থেকে বিচ্যুত হই নাই বলেই আমি দাবী করি। এই মহলের লোকদের সংস্পর্শ ও সাহচর্য আমাকে আনন্দ দিয়েছে—সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের নানা দুর্বিপাকের মধ্যে আমি এখানে তৃপ্তি পেয়েছি। আমি অনেক বিশিষ্ট পরিচালক, চিত্র-শিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী দেখেছি, যাঁরা সত্যকারের শিল্পীর মন নিয়ে, সন্ধানীর মন নিয়ে এজগতে এসেছেন। তাঁদের পরিচয় আমার অভিজ্ঞতা যেমন বাড়িয়েছে, আমাকে প্রেরণাও তেমন দিয়েছে।

বর্তমানে আমি শ্রীযুত নীরেন লাহিড়ী মহাশয়ের পরিচালনাধীনে কাজ করছি। নীরেন বাবু দরদী শিল্পী। তাঁর সাহচর্য আমার গর্বের বস্তু। মুকুল চিত্র প্রতিষ্ঠানের 'রাই'কে চিত্ররূপ দেওয়ার ভারও কালীশ বাবু ও পরিচালক দেবনারায়ণ বাবু আমার উপর দিয়েছেন। ছবির শ্রেষ্ঠত্বই এঁদের কাম্য। তাঁরা আশা করেন, আমি তাঁদের হতাশ করব না। আমিও সেই আশাই রাখি।

সমাপ্তির পথে!

দেবী চৌধুরাণী

পরিচালনা ঃ সতীশ দাশগুপ্ত

চিত্রশিল্পী—শৈলেন বসু * শব্দযন্ত্রী—গৌর দাস

শিল্পনির্দেশনা—

বটু সেন * তারক বসু * ক্ষিতীন সেন

সংগীত পরিচালনা ঃ কালীপদ সেন

বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে :

ছবি বিশ্বাস • প্রদীপ বটব্যাল • উৎপল সেন
নীতীশ • ফণী রায় • উপেন চট্টো • তুলসী
চক্রবর্তী • নৃপতি • সুমিত্রা দেবী • সুদীপ্তা • স্বাগতা
রেবা বসু • নিভাননী • মনোরমা • উমা
গোয়েঙ্কা • প্র ভৃ তি আ রো অ নে কে

ব্যবস্থাপনায় :

অনিল নিয়োগী • আদিত্য মুখো: • কৈলাশ বাগচি
সহঃ পরিচালনায় : সন্তোষ ভৌমিক • শিব ভট্টাচার্য

রূপায়ণ
চিত্র প্রতিষ্ঠান

শ্রীমতী প্রীতিধারা
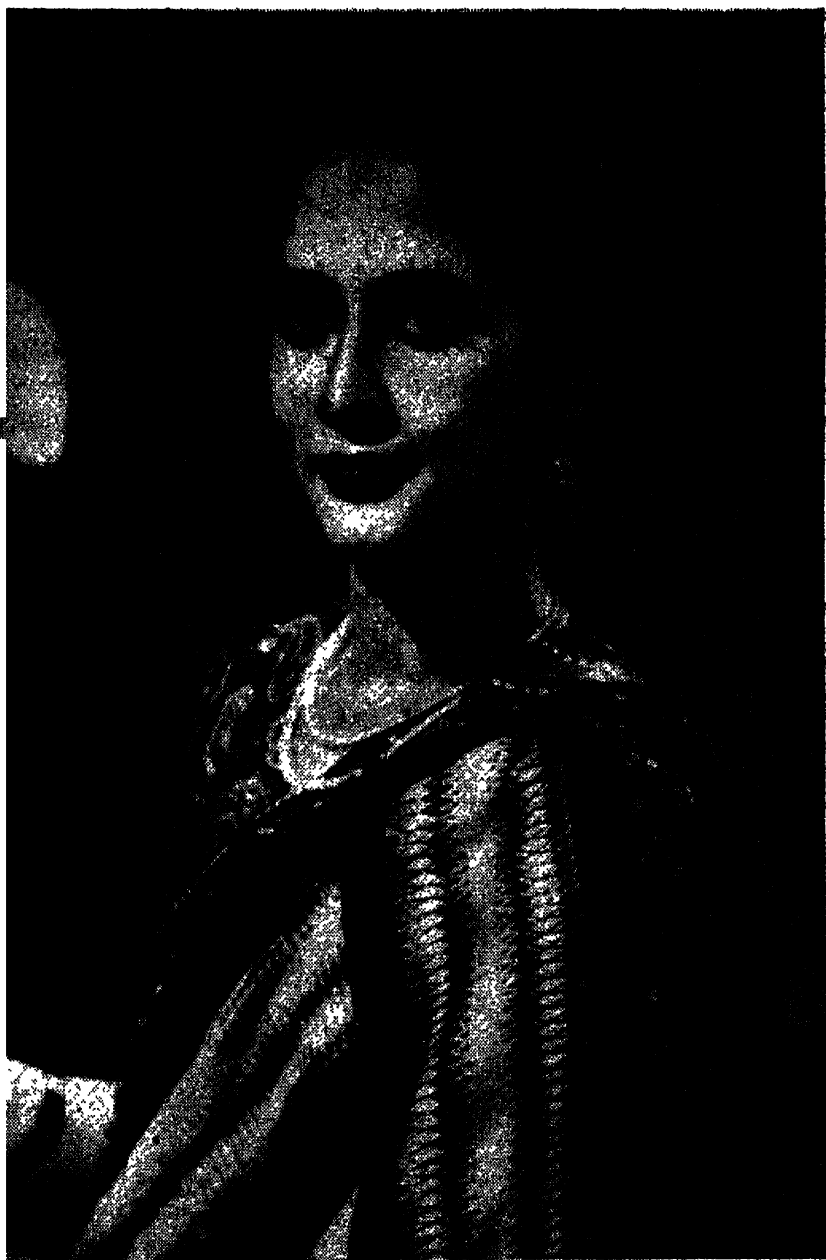
অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত
'পদ্মা প্রমত্তানদী' চিত্রের
রূপ-সজ্জায়।

উপরে বাদিকে : বিধায়ক ভট্টাচার্য পরিচালিত কৃষ্ণা কাবেরী চিত্রে মীরা সরকার। ডানদিকে : মণিপুর ন্যাশনাল আর্ট পিকচার্সের শ্রীশ্রীগোবিন্দজী হিন্দি চিত্রে শংকরী ঘোষ। নীচে : হিরন্ময় সেন পরিচালিত বিভা চিত্রণের রাজমোহনের বৌ চিত্রে জ্যোৎস্না ও দেবীপ্রসাদ।
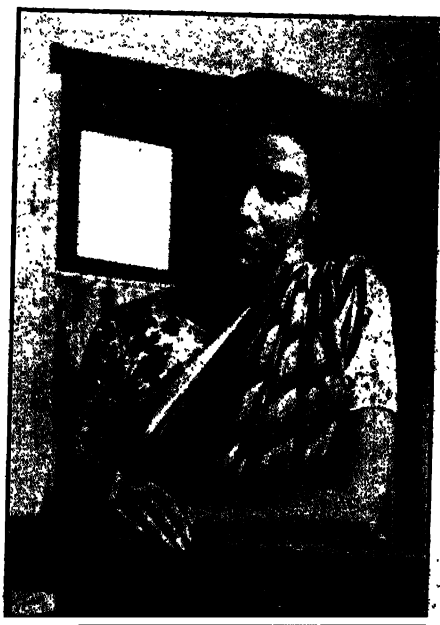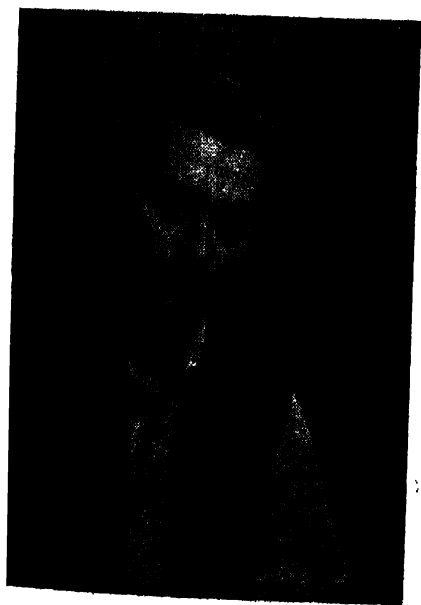
উপরে : যথাক্রমে শিশির মিত্র ও শিপ্রা দেবী—প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত বসুমিত্র-এর কালোছায়া চিত্রে।
নীচে বাদিকে—শ্রীগুরু পিকচার্সের কর্মফল চিত্রে বাণীব্রত। ডানদিকে : সুধা প্রডাকসনের প্রতিরোধ চিত্রে আরতি দাস।

উপরে : বলাই পাচাল প্রযোজিত বিভা প্রোডাকসনের 'সাক্ষীগোপাল' চিত্রে ঝর্ণা ও সুপ্রভা চিত্রখানি পরিচালনা করছেন গৌর সী ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়।

●

নীচে : 'অগ্রদূত' পরিচালকমণ্ডলীর পাঁচজনের মধ্যে ত্রয়ী-কে আমাদের নিজস্ব আলোকচিত্রী ক্যামেরায় ধরেছেন। এঁরা তখন জনপ্রিয় চিত্রনট জহর গাঙ্গুলীর সংগে 'সমাপিকা' চিত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কথাবার্তায় মগ্ন ছিলেন। ত্রয়ীর মধ্যে সবচেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে চিত্রসম্পাদক সন্তোষ গাঙ্গুলী : মাঝখানে তত্ত্বাবধায়ক বিমল ঘোষ এবং পরে আলোকচিত্রী বিভূতি লাহা। বাকী দুজন যতীন দত্ত ও শৈলেন ঘোষাল এখানে অনুপস্থিত — — —

— — — ডান দিকে — — —

কুমারী প্রতিভা বিশ্বাস—বাংলা চিত্র-জগতে রূপ-মঞ্চের আর একটী কিশোরী অভিনেত্রী আবিষ্কার। এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কুমারী প্রতিভার জন্ম। একে প্রথমে দেওয়া হয় প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্যাভিনেতা ছবি বিশ্বাসের কাছে। তিনি তখন কালিকা নাট্য-মঞ্চে ছিলেন—প্রতিভাকে কালিকার শিল্প-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তারপর পাঠানো হয় বিমল ঘোষের কাছে। তিনি একে শ্রীমতী পিকচার্সের অনন্যা চিত্রে সুযোগ দিয়েছেন। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের কৃষ্ণা কাবেরী চিত্রেও অভিনয় করেছে। 'রাই' চিত্রেও তাকে দেখতে পাওয়া যাবে। ··· ···

— — — —বা দিকে— — — —

বেবী কমলেশ কুমারী 'তরুণের স্বপ্ন' চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বালিকা অভিনেত্রীটিকে আগামী অনেক চিত্রেই দেখা যাবে। বেবী কমলেশ যেমনি পড়াশুনা করছে, তেমনি উপযুক্ত অভিনেত্রী হবার জন্য নাচ-গানও শিক্ষা করছে।
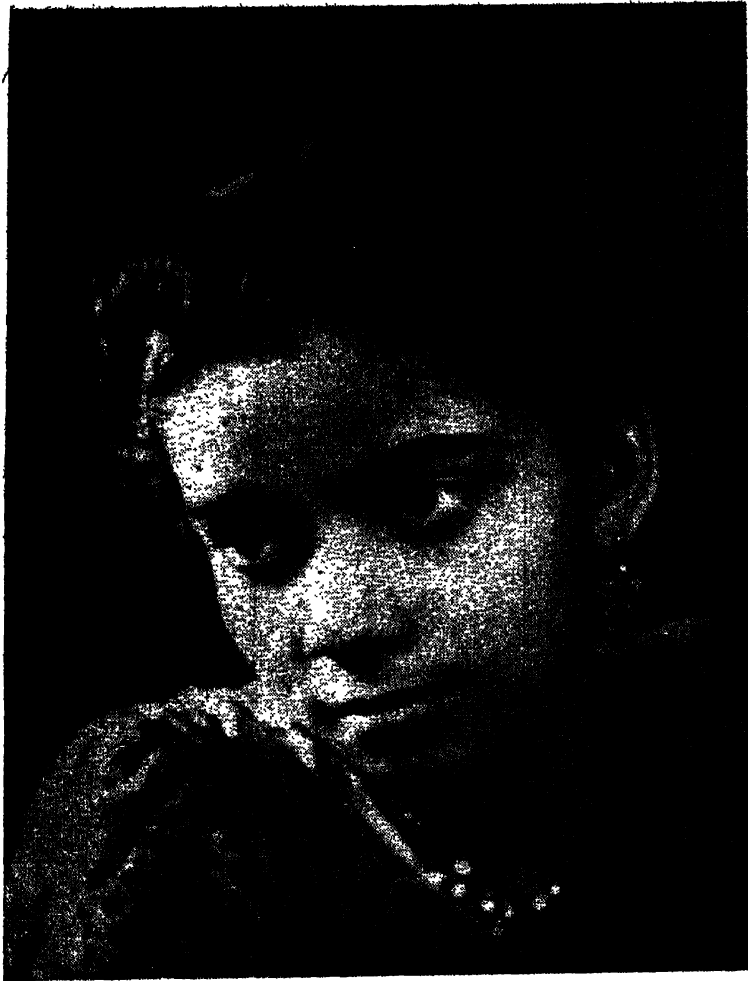
রূপ-মঞ্চের আবিষ্কার আর একটী নতুন কিশোরী অভিনেত্রী শ্রীমতী ইলা।......ইলার কণ্ঠ বেতার মারফৎ আপনারা শুনতে পেয়ে থাকেন। একাধিক চিত্রের প্লে-ব্যাক সংগীতও ইলা গেয়েছে। 'রাই' চিত্রে তাকে প্রথম দেখতে পাওয়া যাবে। বর্তমানে সে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের কাছে সংগীত শিক্ষা করছে।

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা বিশ্বাস
বেচু সিংহ পরিচালিত বীরেশ লাহিড়ী চিত্রে। চিত্রখানি ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে।
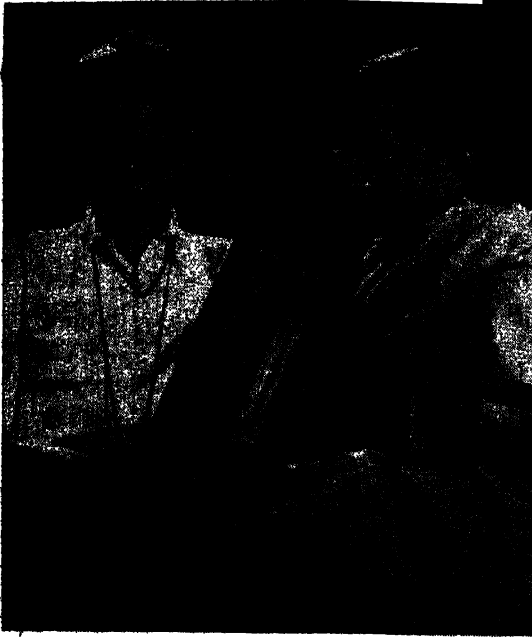
উপরে—দাসীপুত্রের দৃশ্যপটে পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ও চিত্র-শিল্পী অনিল গুপ্তকে চিত্র-নাট্য নিয়ে পরামর্শ করতে দেখা যাচ্ছে।

নীচে—

স্বর্গতা কুমারী রমারাণী বসু

●

রূপ-মঞ্চ

শারদীয়া সংখ্যা

১৩৫৫

●

: : স্বর্গতা কুমারী রমারাণী বসু : :

নিতান্ত অবেলায় একটি ফুল ঝরে গেছে। মাত্র তেরো বছর চার মাস বয়সে চুয়াত্তর দিন টাইফয়েড রোগভোগের পর বৃহস্পতিবার ২রা সেপ্টেম্বর দুপুর সওয়া দু'টার সময় একটি পরিবারে রমারাণীর অকালবিয়োগে যে হাহাকার উঠেছিল, তার বেদনা আমাদেরও গভীরভাবে আলোড়িত ক'রেছে। কুমারী রমারাণী আমাদের পরম বন্ধু প্রচারশিল্পী শ্রীফণীন্দ্র পালের ভাগিনেয়ী। আমরা জানি রমারাণী শুধু তাঁর ভাগ্নি ছিল না, ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র স্নেহের পাত্রী। শুধু তাঁর কেন, রমারাণী তার দাদু-দিদিমা, মাতা-পিতা বৃহৎ সংসারের প্রতিটি আত্মীয়স্বজনের ছিল নয়নমণি। পাড়া-প্রতিবেশী, তার স্কুলের প্রত্যেকটি শিক্ষয়িত্রী ও সহপাঠিনীর কাছে প্রিয়দর্শনী রমারাণী তার মধুর স্বভাবের জন্য একান্ত প্রিয় ছিল। সিনেমা দেখতে সে কি ভালই না বাসত আর সেইজন্যে 'রূপ-মঞ্চ' কাগজের জন্যে প্রতি মাসে তার বড় মামাকে বার বার দিত তাগাদা। দীর্ঘ রোগশয্যায় শিয়রে থাকত 'রূপ-মঞ্চ'। ভাল হয়ে উঠে কোন কোন ছবি দেখতে যাবে তার তালিকা তার প্রস্তুত ছিল—কিন্তু যেখানে সে গেছে সেখানের ছবি হয়তো তার আরও ভাল লাগবে। আজ আনন্দস্বরূপা রমাহারা একটি শোকার্ত সংসারকে সান্ত্বনা জানাবার ভাষা আমাদের নেই।

ব্যাঙের ছাতা

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী

★

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। পথের পাশে এখানে ওখানে,—খড়ের গাদায়, এঁদো পোড়া জায়গায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে কাতারে কাতারে। বর্ষার দান যেমন খাদ্যশস্য, ইলিশ মাছ—ম্যালেরিয়া—তেমনি ব্যাঙের ছাতা। প্রচুর বর্ষণ—ফল ব্যাঙের ছাতা।

যুদ্ধের সময় থেকে আজ অবধি প্রচুর বর্ষণ চলেছে টাকার বাজারে—মুদ্রাস্ফীতির জন্যে। এই মুদ্রা বর্ষণের ফলে আমাদের সিনেমা জগতেও এক শ্রেণীর ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে উঠেছে যাদের নাম—"মরশুমী পরিচালক"। এরা অকারণে এখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছেন দিনের পর দিন,—নিজেদের সুখাদ্য বলে জাহির করে। সাধারণ লোকও সাদা ধপ ধপে রূপ দেখে তাঁদের গলধ্‌করণ করে নাজেহাল হচ্ছেন।

রাস্তার আশে পাশে, দেওয়ালে ল্যাপটানো নিত্য নতুন সিনেমা পোষ্টারের ধমকে লোকের চোখ ট্যারা হতে সুরু করেছে। হয়ত কোনটায় লেখা—"ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে ধনীর দুলালী সুনন্দা হ'ল ভিখারিণী—; কলঙ্কিনী আখ্যা পেল সে কোন পাপে?" অথবা কোনটায় দেখছেন—"চল্লিশ কোটী অর্ধ মৃত নরনারীর প্রতীক হয়ে সর্বত্যাগী সমর বিশ্বের মানবতার দরবারে জানালে তার অভিযোগ। —কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রী…………। পোষ্টারে এই রকম সাত পাঁচ মুখরোচক প্যাঁচ পয়জার দেখে দর্শকমশাইরা হয়ত অনেক আশা নিয়ে ছবি দেখতে এলেন। কিন্তু ছবি দেখতে বসে, ঘন ঘন তাঁদের দেখতে হ'ল প্রোগ্রামে লেখা গল্পের সারাংশটুকু,—ছবির কাহিনী বোঝবার জন্যে। অবশেষে সমাপ্তির পর যখন প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরুলেন, তখন পয়সা আর সময় নষ্ট হওয়ার অজুহাতে এই তথাকথিত উদীয়মান পরিচালক মশায়ের সংগে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করে বসলেন—"ওয়াইফস্ ব্রাদার" বলে।

এখন শুনুন, এইসব মরশুমী পরিচালক মশাইদের সাধনার ইতিহাস! সিনেমার পরিচালনা বিভাগটী বিজ্ঞান এবং কলার সমন্বয় ক্ষেত্র। পরিচালক হ'তে গেলে ফোটগ্রাফী, অডিওগ্রাফী (শব্দানুলেখন), আলোক-বিন্যাস, পরিস্ফুটন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলিও যেমন জানতে হবে,—তেমনি সাহিত্য, নাট্য-সৃষ্টি, অভিনয়, সংগীত, সম্পাদনা ইত্যাদি ব্যাপারেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে। তবেই বুঝুন, কত শক্ত কাজ হচ্ছে এই পরিচালনা; কত সাধনার প্রয়োজন এর পেছনে। মরশুমী পরিচালকেরা এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার ধার ধারেন না। দু' চারটে ইংরেজী ছবি দেখে, অথবা দুএকজন খ্যাত পরিচালকের পেছনে দুচারদিন ঘুরে—তাঁদের পরিচালনার জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে, জামার হাতা গুটিয়ে প্রডিউসর ধরতে বেরিয়ে পড়েন। প্রডিউসর ধরার ব্যাপারটা খুলে বলি।

আমাদের ফিল্ম ষ্টুডিও মহলে একটা কথা খুব চালু আছে;—কথাটা হচ্ছে, প্রডিউসর ফাঁসানো। মানে অর্থোপার্জনেচ্ছু ভদ্রলোককে ছবি তোলার ব্যাপারে দুর্গা বলে ঝুলিয়ে দেওয়া। আর এই অর্থোপার্জনেচ্ছু লোকটী হওয়া চাই আনকোরা নতুন পয়সাওয়ালা লোক, যিনি যুদ্ধের দয়ায় আলটপ্‌কা বেশ কিছু টাকা রোজগার করেছেন এবং যুদ্ধোত্তর কালেও আরও বেশ কিছু রোজগার করতে চান অল্পদিনে এবং অল্প মেহনতে। মরশুমী পরিচালকরা এই রকম অসহায় টাকার বস্তার ওপর আক্রমণ চালান,—কারণ, তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, কোন ঝানু প্রডিউসরের ছবিতে তাঁরা সহকারী পরিচালকের স্থানও পাবেন না। এই আনাড়ী প্রডিউসররূপী নিরীহ ভদ্রলোকটীর কাছে বেশ গুটিকতক মযেন দেওয়া কথা বলে পরিচালক মশাই এমন একটী বেহস্ত রচনা করেন যে, প্রডিউসর মশাই গদগদ হয়ে চেক বই বার করে সই করে ফেলেন আর কি। তখন তাঁকে খেলিয়ে খেলিয়ে ডাঙায় তোলা হয় প্রোডাক্শন যজ্ঞে পরিবেশনের জন্যে। এই ধরণের পরিচালকদের হাতে সদা সর্বদাই
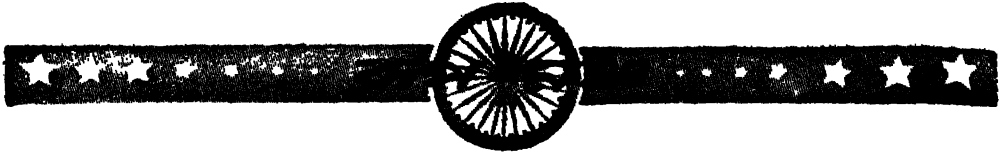
কাহিনী এবং চিত্রনাট্য (?) রেডী করা থাকে। বেশীর ভাগ সময়েই কাহিনী এবং চিত্রনাট্য পরিচালক মশায়ের কলম থেকেই বেরিয়ে আসে। প্রডিউসর যদি বলেন—"কার গল্প নেবেন ঠিক করলেন?" উত্তরে পরিচালক বলেন:

—"অনেকদিন থেকেই একটা অদ্ভুত সিনেমা ষ্টোরী লিখে রেখেছি।—সিনারিও (?) কমপ্লিট্;—একেবারে নতুন থীম্,—মানে দর্শক যা চায়।"

তখন যদি প্রডিউসর বলেন--

"তারাশংকর কিংবা প্রেমন বাবুর কিংবা—"

উত্তরে পরিচালক শুনিয়ে দেন।

"ওঁদের গল্প মশাই, পড়তেই ভাল লাগে—পর্দায় নয়। পর্দার জন্যে অদ্ভুত কিছু একটা না দিলে—"

এই অদ্ভুত কিছু একটা জিনিষ নিয়ে পরিচালক যখন ফ্লোরে (ছবি তোলার আটচালা) ছবি তুলতে আসেন,—তখন তাঁর তড়পানি যায় অনেক কমে। তিনি তখন ক্যামেরাম্যানের পেছনে ঘুরঘুর করে বেড়ান। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়,—শট ডিভিশন্ করিয়ে নেওয়া, ক্যামেরা-ম্যানকে দিয়ে। এখন আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন—"এই মাত্তর যে বল্লেন, তাঁরা চিত্র-নাট্যও একটা রেডী করে রাখেন। তবে আবার শট্ ডিভিশনের কথা ওঠে কেন? ওটা তো করাই থাকে চিত্রনাট্যের ভেতর।" উত্তরে আমি বলব—তাঁদের কাছে একটা খাতা থাকে বটে, যেটাকে তাঁরা চিত্রনাট্য বলে আখ্যা দেন,—সেটা আর কিছুই নয়—কাহিনীটার নাটকীয় রূপ মাত্র। অথচ সিনারিও বা চিত্রনাট্য মানে, কাগজের ওপর সমস্ত ছায়াচিত্রটীর বিশদ্ বর্ণনা;—কোন শটে কোথায় ক্যামেরা বসবে,—কে কোনখান থেকে উঠে কোনখানে দাঁড়াবে,—কোন কথার পর ক্যামেরা কার মুখের দিকে এগিয়ে যাবে,—মানে এক কথায় বলতে গেলে, পর্দার ওপর যা দেখবেন—কাগজের ওপর তারই নিখুঁৎ ছবি;—শুধু ডায়লগ বা সংলাপ দেওয়া একখানি নাটক নয়। মুখ ফুটে বলতে গেলে, আমাদের বাংলা দেশে দুচারজন ছাড়া কোন পরিচালকেরই চিত্রনাট্য বলে কোন জিনিষই থাকে না এবং সত্যিকারের চিত্র-নাট্য যে কী, তা তাঁদের অনেকেই জানেন না—একথা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি,—অথচ এ পোড়া দেশের এমন মজা যে, তাদের—দু' একটা ছবি দুচার বার পয়সা দিয়ে গেছে বলে তাঁদের নামও বড় পরিচালকদের—সংগে—মানে বড়ুয়া, নীতিন বোস, দেবকী বোস, বিমল রায়, হেমচন্দ্র, প্রভৃতি—এঁদের নাম করবার সময়ে উল্লেখ করা হয়। থাকুকে ও প্রসংগ বাদ দিন,—এখন মরশুমী পরিচালক মশায়ের ক্যামেরাম্যান প্রীতির হেতুটা বলি—শট্ ডিভিসন প্রসংগে পরিচালক ফ্লোরে এসে প্রথমেই ক্যামেরা ম্যানকে খুব মোলায়েম করে ডাক্লেন—"সুবোধবাবু, দু' একটা কথা ছিল, একটু আসবেন এদিকে?"

ক্যামেরাম্যান জিগ্যেস করলেন—"ব্যাপারটা কী?"

পরিচালক বল্লেন—"আসুন না একটু শট্ ডিভিশন করা যাক।"

তারপর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন চাকরকে ধমকে সুবোধ বাবুর জন্যে শিগ্গির চা, টোষ্ট আর ডবল ডিমের রাধাবল্লভী আনতে বল্লেন। ক্যামেরাম্যানের হাতে ঐ সংলাপ লেখা খাতাটী গুঁজে দিয়ে পরিচালক মশাই প্রোডাক্‌শন বিভাগের দোষ ক্রটী ধরতে বেরুলেন।

ক্যামেরাম্যান নিজের সুবিধে মত শট ডিভিশন করে দিলেন। পরিচালক মশাই ত' খুব খুশী,—যাক্ একটা গুরুভার তাঁর ঘাড় থেকে নামল। কিন্তু আসলে কতবড় ক্রটী রয়ে গেল, সেটা তাঁর ধারণার বাইরে। সেটা হচ্ছে গল্পের মুড বা ভাবধারা অনুসারে ক্যামেরার মোবিলিটি বা চলাফেরা এবং লেন্স নির্বাচন। ক্যামেরাম্যান (বিশেষ করে ভাড়াটে ষ্টুডিয়োতে যে সমস্ত ক্যামেরাম্যান কাজ করেন), গল্পের আগাগোড়া নিখুঁত ছবি কিছুই জানেন না। তিনি হয়ত নির্ধারিত একটা দৃশ্যের শট ডিভিশন করতে পারেন—কিন্তু সমস্ত গল্পটী আগাগোড়া ভাল ভাবে না জানা থাকলে, তিনি কিছুতেই গল্পের—মুড ঠিক রেখে শট ডিভিশন করতে পারেন না। এবং এই লেন্স নির্বাচন ব্যাপারে পরিচালক ক্যামেরাম্যানের সংগে আলোচনা করবেন—এমন কী তাঁর নিজের দরকার মত লেন্স দিয়েই স্যুট করবেন। একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। ধরুণ, নায়কের দুটো ক্লোজ আপ নিতে হবে দুটো বিভিন্ন দৃশ্যে। একটা দৃশ্যে নায়ক সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়ে ঘরে ফিরেছে,—অনেকদিনই সে ভাল খাবারের মুখ দেখেনি;—তাকে এক থালা ভাল খাবার খেতে দেওয়া হয়েছে;—নায়ক সেই খাবার গুলোর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। নায়কের সেই অনাহার ক্লিষ্ট লোলুপ দৃষ্টির একটি ক্লোজ আপ। দর্শকের মনে ঠিক ভাবে রসের পরিবেশন করতে হলে এই ক্লোজ আপে নায়কের অতি রূঢ় রুক্ষ চেহারা দেখাতে হবে,—ছবিটার মধ্যে একটুও নরম ভাব থাকবে না। নায়কের দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্লোজআপ্ নিতে হবে বিভিন্ন দৃশ্যে—সেখানে নায়ক প্রেম দৃষ্টিতে চেয়ে আছে নায়িকার দিকে। সেখানে নায়ক নায়িকার বিভিন্ন এ্যাংগেল থেকে নেওয়া একাধিক ক্লোজআপ নিয়ে গল্পের ভাবধারা আর রসের পরিবেশন করতে হবে। ছবিটার মধ্যে একটা মায়াময় কোমলতার সৃষ্টি করতে হবে সুষ্ঠু আলোক সম্পাত, সঠিক লেন্স, এবং ডিফিউসন্ (আবছা ভাব নিয়ে আসা) নির্বাচন করে। এই দুরকমের ক্লোজআপ,—একটা কঠিন এবং অন্যটা কোমল,—কি কি লেন্সে নিতে হবে সেটা ক্যামেরা-ম্যানের নিজস্ব ব্যাপার হলেও পরিচালকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে ছবির মুড অনুসারে তা ক্যামেরাম্যানকে নির্দেশ করবার। না হলে ক্যামেরাম্যান কিছুতেই যথাযথ রসের পরিবেশন করতে পারবেন না।

এবার বলি ছায়াছবির নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি বিষয়ে মরশুমী পরিচালকরা কি রকম পেছিয়ে পড়েন উপযুক্ত তালিমের অভাবে। পর্দার অভিনয় অতিশয় সূক্ষ্ম, প্রকাণ্ড পর্দার ওপর ইচ্ছে করলেই অভিনেতাকে প্রকাণ্ড বড় করে দেখান যায় এবং অভিনেতার অল্প একটুকু ঠোঁট বেঁকিয়ে শ্লেষের হাসি বা কটাক্ষ, তার সূক্ষ্ম অভিনয়কে সব দর্শকের কাছেই পৌঁছে দেয়। সেইজন্যেই ছায়াছবির পরি-চালককে খুব বেশী—নজর রাখতে হয় অভিনয়ে সূক্ষ্মতার দিকে এবং ক্যামেরার এ্যাংগেল নির্বাচনের দিকে। ধরুন, দেখাতে হবে একজন আততায়ী প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে একজনকে হত্যা করতে আসছে। নাটকীয় পরিস্থিতি এখানে ভয়ানক জমে উঠেছে এবং ছবি দেখানোর একটুকু ইতর বিশেষ হলেই ড্রামা মার খেয়ে যাবে। পরিচালক মশাইকে এ দৃশ্যে ভীষণ সজাগ থাকতে হবে,—কাকে কি ভাবে কতক্ষণ দেখালে দর্শক মনে প্রকৃত অনুভূতি দেওয়া যাবে। এ দৃশ্যে আততায়ী ও আক্রান্তের মুখের—হাতের ছোরার কয়েকটী ক্ষণস্থায়ী ক্লোজআপ পরপর—বিভিন্ন এ্যাংগেল থেকে দেখিয়ে ড্রামার টেম্পো বা গতি খুব তুলে দেওয়া যায়,—তারপর দেওয়ালের ওপর একটা ছায়া ও ছোরা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসছে দেখিয়ে সদ্যসদ্য (ডাইরেক্ট কাটিংয়ের দ্বারা) আততায়ীকে সামনে রেখে তার ছোরা নিয়ে এগিয়ে আসা,—এবং তার অগ্র-গতির সংগে ক্যামেরার ও আস্তে আস্তে পেছিয়ে আসা ("ফলো ফোকাস্" করে),—যাতে মনে হয় আক্রান্ত যেন ক্যামেরার লেন্স তথা দর্শকই—এই ভাবে শট্ নিলে দর্শক মনে ভীতির সঞ্চার করা যায়।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভুঁইফোড় পরিচালকরা এভাবে শট্ নেন না, কারণ তাঁদের তামিল নেই—এবং শট্ ডিভিশন এমন একজনের হাতে, যিনি গল্পের মাথা মুণ্ডু কিছুই জানেন না।

যাহোক কোন মতে তো ছবিটার চিত্রগ্রহণ শেষ হয়। ছবি যায় সম্পাদকের কাছে। সত্যিকথা বলতে কি, নাম করা সম্পাদকেরা এ সব ছবি সম্পাদনার ভার নেন না তাঁদের সুনাম অক্ষুন্ন রাখবার জন্যে। যে সব সম্পাদক এ ধরণের ভেজিটেবল মার্কা ছবির ভার নেন, তাঁদের যোগ্যতার বিচার আমি করছিনা—তবে বলতে পারি যে, তাঁদের নজর মুখ্যত থাকে অর্থোপার্জনের দিকে,—কারণ এই অর্থনৈতিক দুর্দিনে শুধু সুনামের আশায় বসে থাকলেও চলে না। যাহোক, সম্পাদক ঐ দুর্বল কাহিনীটির খণ্ডিত অংগগুলিকে জোড়াতালি দিয়ে একটা বিকলাংগ মূর্তি তৈরী করেন।

এই ধরণের পরিচালকদের বিষয় আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে হয়—এঁরা নিজেদের ভবিষ্যতের দিকে একটুও তাকান না। ভাল ছায়াচিত্র পরিচালক হওয়া সকলেরই কাম্য। এক সাথে অর্থ এবং সুনামের অধিকারী হওয়া যায় মাত্র একটা ছবি ভালভাবে পরিচালনা করলেই—আর সুনাম আসে রাতারাতি। কিন্তু ছবি যখন খারাপ হয় ভবিষ্যৎও অন্ধকার হয়ে আসে। এ প্রসংগে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দু'একজন পরিচালক পরপর দুতিনটি হোপলেস ছবি বানিয়েও—কি করে আবার পরিচালনার ভার পাচ্ছেন? উত্তরে বলা যায় যে, তিনটে ছবির পর চারটে—বড় জোর—সাড়ে চারটে (মানে আধখানা করে বন্ধ হয়ে যাবে হয়ত)—এবং চতুর্থটীও যদি প্রথম তিনটার মতই খাস্তা হয়, তবে পঞ্চমের আশা অত্যন্ত কম।

গোড়াতেই বলেছি, চিত্রপরিচালনা সত্যই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—আর্ট এবং সায়েন্সের সমন্বয়। প্রডিউসার ফাঁসিয়ে রাতারাতি আবু হোসেন হওয়া 'পেনী ওয়াইজ্জেস' ছাড়া আর কিছুই নয়;—এতে আত্মসম্মান তথা দেশের কৃষ্টির সম্মানকে ছোট করা হয়। ঝুঠো জিনিষ দু' এক দিনই চালু থাকে। ভাল পরিচালক হতে গেলে চাই সাধনা—দু' একদিনের নয়। অন্ততঃ কয়েক বছরের—নইলে ব্যাঙের ছাতার মত বর্ষায় গজিয়ে শরতে বিদায় নিতে হবে।

বাংলা ছবির গতি

পঙ্কজ দত্ত

★

বাংলা ছবির গতি ও প্রকৃতি বর্তমানে কোন পথে চলেছে, সেটা এখন বিচার করবার সময় এসেছে। ব্যবসার দিক থেকে বাংলা ছবি এখনই যে-বাজার করে নিয়েছে, তাতে হিসেবের মধ্যে থেকে ন্যায়সংগত খরচে ছবি তুললে যে কোন ছবি থেকেই লোকসানের আকাঙ্খা দূর হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া বর্তমান রাষ্ট্রের নির্দেশে চিত্রগৃহ নির্মাণ স্থগিদ না হলে প্রদেশময় বাংলা ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র আরও সম্প্রসারণের সুযোগ ছিলো। তবে আজকাল ১৬ মি-মি বা ৩৫ মি-মি উভয়বিধ যন্ত্রের সাহায্যে ভ্রাম্যমান প্রদর্শন-ইউনিট গঠনের যে রকম সহজ এবং সস্তা ব্যবস্থা হ'য়েছে, তার দ্বারা ছবির বাজার প্রদেশের গহনতম স্থলেও সম্প্রসারিত ক'রে দেওয়ার অবারিত সুযোগ পড়ে রয়েছে।

বাংলা ছবিকে দুটো শক্তিশালী প্রতিযোগীর সংগে পাল্লা দিয়ে চলতে হ'চ্ছে। একটি হ'চ্ছে ইংরাজী ছবি, আর অপরটি হিন্দি। ইংরাজী ছবি প্রধানতঃ ভাষার জন্যে এবং বিদেশী বলেই তার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হ'য়ে, ধরতে গেলে, শুধু কলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে গিয়েছে; তবে সেটাও বড় কম নয়। কারণ, কলকাতায় সব মিলিয়ে বছরে যতগুলি ছবি মুক্তিলাভ করে, তার, ১৯৪৭ সালের হিসাবেও দেখা যায়, শতকরা ৮২'১০ খানি ছবিই ছিল বিদেশী। শুধু কলকাতার বাজার ধরলে বিদেশী ছবির প্রদর্শন আগের চেয়ে বরং অনেক বেড়েই গিয়েছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের বিদেশী ছবির পরিমাণ ছিল শতকরা ৫৯ এবং ১৯৪৪-৪৫সালে ছিল ৬১'৮। বাংলা ছবি সে তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে শতকরা ৫ খানা থেকে ১৯৪৭-৪৮ সালে ৮'৯৫-তে এসে দাঁড়িয়ে। বাংলা ছবির গতি এতটা ধীর হ'য়ে পড়ার কারণ কি?

এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'চ্ছে যে, গত দশ বছরের মধ্যে হিন্দি ছবি আনুপাতিক হিসাবে সংখ্যায় ক্রমশঃ কমের দিকেই যাচ্ছে। অর্থাৎ, এই সময়ের মধ্যে কয়েকখানি হিন্দি ছবি এখানে অস্বাভাবিক জনপ্রিয় এমন কি পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘচলার রেকর্ড (কিসমৎ) স্থাপন করতে সমর্থ হ'লেও, সমষ্টিগত ভাবে হিন্দি ছবির সমাদর বাংলার দর্শক-দের কাছে বাংলা বা ইংরেজী ছবির চেয়ে ক্রমশঃই হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু সেই তুলনায় বাংলা ছবির সমাদর যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। মাঝখান থেকে বিদেশী ছবি আসরটা জাঁকিয়ে বসেছে। এই সূত্রে আরও প্রণিধানযোগ্য যে, এখানকার দর্শকদের কাছে হিন্দি ছবি বাংলা ও ইংরেজী ছবির তুলনায় কম আকর্ষণের সৃষ্টি করে। হিন্দি ছবির এই অপসৃত কদর বাংলা ছবি কেন পুরোপুরি আয়ত্ব করে নিতে পারেনি তার কারণটা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

ভারতের চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা ক'রে দেখা যায় যে, কি নির্বাক যুগে আর কি সবাক ছবির যুগে গোড়ার দিকে বাংলা দেশের ছবি সবাইকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পেরেছে স্রেফ ছবির উৎকর্ষের জোরে কিন্তু পর্যাপ্ত ব্যবসাবুদ্ধির অভাবে বম্বের নিকৃষ্ট ছবির চাপেতেই ছবির বাজারে কোণঠাসা হতে বাধ্য হ'য়েছে। নির্বাক যুগের গোড়া থেকে ম্যাডান ভারতময় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু বম্বে যেই তোড়জোড় করে প্রতি-যোগিতায় এসে নামলো, বাংলার ব্যবসায়ীরা তখন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাঙ্মুখ হয়ে আসর ছেড়ে নিজের ঘরে এসে ঢুকলো। সবাক যুগেও এই ব্যাপার ঘটে। প্রথমে বম্বে পূর্ণ দৈর্ঘ সবাক চিত্র (আলমআরা) তোলবার কৃতিত্ব দেখালেও যাবতীয় অসাধারণ কৃতিত্ব বাংলার ছবির দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে 'চণ্ডিদাস' (নিউ থিয়েটার্স, দেবকী বসু) ও দক্ষযজ্ঞ (রাধা, জ্যোতিষ বন্দ্যোঃ) রজত-জয়ন্তী উদযাপন করে ছবির দীর্ঘচলার রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়। ঐ বছরই প্রথম ভারত বিজয়ে সক্ষম হয় 'মীরাবাঈ' (নিউ থিয়েটার্স, দেবকী বসু)। তারপর একের পর একটি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বাংলার তোলা 'পুরণ ভকত' (দেবকী বসু) 'ইহুদি কা লেড়কি (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) 'চণ্ডীদাস' (হিঃ, নীতিন বসু), 'দেবদাস' (বড়ুয়া), ধুপছাঁও (নীতিন), 'ক্রোড়পতি' (হেমচন্দ্র) ভারতীয় চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে
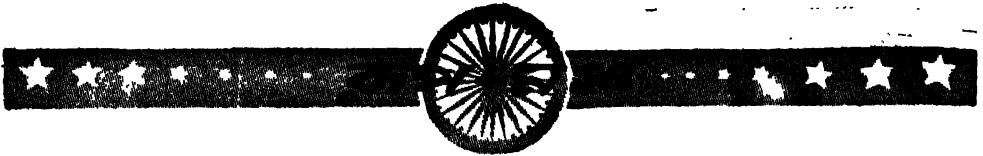
একটানা রাজত্ব করে গিয়েছে। এদিকে কলকাতাতেও এই সময়ের মধ্যে 'সোনার সংসার' (ইষ্ট ইণ্ডিয়া, দেবকী), 'চাঁদ সদাগর' (ভারতলক্ষ্মী, প্রফুল্ল রায়), 'মানময়ী গার্লস স্কুল' (রাধা, জ্যোতিষ বন্দ্যোঃ), 'তরুণী' (কালী ফিল্ম, জ্যোতিষ মুখোঃ), 'পণ্ডিত মশাই' (পপুলার, সতু সেন), প্রভৃতি ছবি-গুলি জনপ্রিয়তার যে রেকর্ড সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, বম্বে বা অন্য কোনস্থানে তোলা ছবিরই তার অর্ধেক পর্যন্ত পৌঁছনও সম্ভব হয়নি। সমগ্র ভারতে এবং সুদূর প্রবাসে সর্বত্রই বাংলার তোলা ছবিরই ছিল যা কিছু সমাদর। বাংলার চিত্র ব্যবসায়ীরা ব্যবসা প্রসারের এই সুযোগকেও উপেক্ষা করে যায়। ভারতে চলচ্চিত্র বাজারের সৃষ্টি এবং তার প্রসারের সম্ভাবনা প্রকাশ বাংলার ছবির দ্বারাই সম্ভব হয়ে উঠলো বটে, কিন্তু বাংলার চিত্র ব্যবসায়ীদের দূরদর্শিতা এবং ব্যবসায়ী-প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও অভিযান-স্পৃহার অভাবের সুযোগে বম্বের ব্যবসায়ীদের পক্ষে বাজারটা দখল করে বসায় বেগ পেতে হলোনা মোটেই। ১৯৩৭ সালে 'অচ্ছুৎ কন্যা' (বম্বে টকিজ) এবং তারপর 'ভাবি' (বম্বেটকিজ), 'অমর জ্যোতি' (প্রভাত) 'গোপালকৃষ্ণ' (প্রভাত), 'কঙ্কন' (বম্বে টকিজ) মিলে শুধু ভারতীয় বাজারেই নয়, এমন কি বাংলা দেশেও বাংলার তোলা ছবির একাধিপত্যকে খর্ব ক'রে দিতে সমর্থ হয়। বম্বের ছবির এই যে অভিযান আরম্ভ হয় 'মঞ্জিল' (বড়ুয়া) 'দিদি' (নীতিন) 'মুক্তি' (বড়ুয়া) 'বিদ্যাপতি' (দেবকী) প্রভৃতি যুগান্তকারী ছবি সত্ত্বেও বাংলার ব্যবসায়ী বম্বের সংগে আর পাল্লা দিয়ে চলতে পারলে না। এখনও আন্ত-প্রাদেশিক বাজারে বছরে কয়েকখানি ক'রে বাংলার ছবি দেখানো যদিও হয়, কিন্তু সমষ্টিগত ব্যবসার দিক থেকে বম্বের তুলনায় তাদের কৃতিত্ব ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। একটা জিনিষ কিন্তু এখনও সুপ্রকটিত দেখা যায়, সেটা হ'চ্ছে, উৎকর্ষের হিসেবে বাংলার ছবির প্রতি সর্বভারতীয় শ্রদ্ধা, যা বাংলার চিত্রব্যবসায়ীরা বিচক্ষণ হ'লে মূলধন রূপে কাজে লাগাতে পারে।

এখন বিচার করে দেখা যাক বাংলা দেশে বাংলা ছবিও যথাযথ ক্ষেত্র দখলে কেন অপারগ হ'য়েছে। ইতিপূর্বেই বলেছি যে, সমগ্র ভারতে বাংলা ছবিই প্রথম দীর্ঘ চলার রেকর্ড স্থাপন করে এবং পর পর 'চণ্ডীদাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'মীরাবাঈ', 'তরুণী', 'চাঁদসদাগর', 'দেবদাস', 'মানময়ী গার্লস স্কুল', 'ভাগ্যচক্র', 'প্রফুল্ল', 'সোনার সংসার', 'দস্তুরমত টকি', 'আলিবাবা' প্রভৃতি দীর্ঘকাল চলে জনপ্রিয়তার যে পরিচয় দেয়, তাতে কলকাতায় বাংলা ছবিকে হটাতে পারবে তা মনেও হয় নি। কিন্তু তাও কি করে হ'লো ১৯৩৮-৪৭ পর্যন্ত দশ বছরের ছবির উৎকর্ষ বিচার ক'রলেই বোঝা যাবে। বাংলা ছবি তরতর করে একদমে এগিয়ে গিয়েছে ১৯৩৭ পর্যন্ত, তারপরের দশ বছরের আনুপাতিক হিসাবে উৎকৃষ্ট ছবির সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যায়।

১৯৩৮ সালে মোট ছবি মুক্তিলাভ করে ১১খানি; উৎকর্ষে উল্লেখযোগ্য অন্তত ৭ খানি—অভিনয় (ভারতলক্ষ্মী মধু বসু), সাথী (এন, টি, ফণী মজুমদার) অভিজ্ঞান (এন, টি, প্রফুল্ল রায়), দেশের মাটি (এন, টি, নীতিন), বিদ্যাপতি (এন, টি, দেবকী) প্রভৃতি অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ৬৩ পার্সেণ্ট !

১৯৩৯ সালে মোট ১৬ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৭ খানি—অধিকার (এন, টি, বড়ুয়া), 'বড়দিদি' (এন, টি, মল্লিক) 'সাপুড়ে' (এন, টি, দেবকী,) 'রজত জয়ন্তী' (এন, টি, বড়ুয়া) 'জীবন মরণ', (এন, টি, নীতিন), 'রিক্তা' (ফিল্ম কর্পোরেশন, সুশীল মজুমদার) 'পরশমণি (ভারতলক্ষ্মী, প্রফুল্ল রায়), ৪৩'৭৫ পার্সেণ্ট।

১৯৪০ সালে মোট ১৬ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৬ খানি—পরাজয় (এন, টি, হেমচন্দ্র) 'ডাক্তার' (এন, টি, ফণী) 'ঠিকাদার' (ভারতলক্ষ্মী, প্রফুল্ল রায়) 'শাপমুক্তি' (কৃষীণ মুভি, বড়ুয়া) 'কুমকুম' (সাগর, মধু বসু) 'রাজকুমারের নির্বাসন' (কমলা টকীজ, সুকুমার দাশগুপ্ত) ৩৭'৫ পার্সেণ্ট।

১৯৪১ সালে মোট ১৯ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৭ খানি—'নর্তকী' (এন, টি, দেবকী বসু), 'পরিচয়' (এন, টি, নীতিন) 'প্রতিশ্রুতি' (এন, টি, হেম), 'প্রতিশোধ' (ফিল্ম কর্পো, সুশীল), 'উত্তরায়ণ' (এম, পি, বড়ুয়া) 'এপার ওপার' (নিউ টকিজ—সুকুমার), রাজনর্তকী (ওয়াদীয়া, মধু বসু) প্রায় ৩৬'৮৪ পার্সেণ্ট।

১৯৪২ সালে মোট ১৭ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৫ খানি—
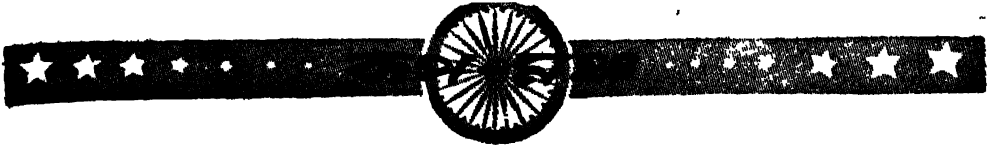
'নারী' (নিউ টকিজ, প্রফুল্ল রায়), 'গরমিল' (নীরেন লাহিড়ী) 'শেষ উত্তর' (এম, পি, বড়ুয়া), 'মীনাক্ষী' (এন,টি, মধু বসু), বন্দী (কে, বি, শৈলজানন্দ)—সাড়ে ২৯ পার্সেণ্ট।

১৯৪৩ সালে মোট ১৮ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৪ খানি—কাশীনাথ (এন, টি, নীতিন), যোগাযোগ (এম, পি, সুশীল) প্রিয় বান্ধবী (এন, টি, সৌম্যেন মুখোঃ), সহর থেকে দূরে (ইষ্টার্ণ টকীজ, শৈলজা)—২২'২ পার্সেণ্ট।

১৯৪৪ সালে মোট ১৩ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৩ খানি—উদয়ের পথে (এন, টি, বিমল রায়), ছদ্মবেশী (ডিলুক্স, অজয় ভট্টাচার্য), বিচার (শ্রী-নীতিন) প্রায় ২৩ পার্সেণ্ট।

১৯৪৫ সালে মোট ১১ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৩ খানি—ভাবীকাল (কে, বি, নীরেন লাহিড়ী), দুইপুরুষ (এন, টি, সুবোধ মিত্র), মানে না মানা (নিউ সেঞ্চুরী, শৈলজানন্দ) ২৭'২৭ পার্সেণ্ট।

১৯৪৬ সালে মোট ১৪ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৩ খানি—'বিরাজ বৌ' (এন, টি, মল্লিক) 'সাতনম্বর বাড়ী (এম, পি, সুকুমার) 'সংগ্রাম (মর্ডান টকীজ, অর্ধেন্দু)—প্রায় সাড়ে ২১ পার্সেণ্ট।

১৯৪৭ সালে মোট ২৮ খানি ; উল্লেখযোগ্য ৫ খানি—অভিযাত্রী (বসুধারা, হেমেন গুপ্ত) নার্স সিসি (এন, টি, সুবোধ মিত্র) স্বয়ংসিদ্ধা (আই, এন, এ, নরেশ মিত্র) নৌকাডুবি (বম্বে টকীজ, নীতিন), চন্দ্রশেখর (পাওনিয়র, দেবকী)—প্রায় ১৭'৮৫ পার্সেণ্ট।

আনুপাতিক হিসাবে বাংলা ছবি উৎকর্ষে যে কিভাবে ধাপে ধাপে নেমে যাচ্ছে ওপরের হিসেব থেকে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। দশ বছরের মধ্যে উৎকর্ষে ৬৩ থেকে একেবারে শতকরা ১৭-তে নেমে যাওয়ার পরও বাংলা ছবি নিয়ে গর্ব করার কি থাকছে তাহলে! তাছাড়া ছবির তালিকা দেখলেও স্পষ্ট বোঝা যাবে যে, বছর যত এগিয়েছে ছবির বিচারের মানও ততো নীচু হয়ে গিয়েছে,তা নাহলে অধিকার, বিদ্যাপতি, জীবন মরণ, প্রতিশ্রুতি-কে যে-হিসেবে উল্লেখ-যোগ্য অবদান বলা যায়, ওদের পাশে স্বয়ংসিদ্ধা, চন্দ্রশেখর, নৌকাডুবিকে উল্লেখ করা যেতো না।

চিত্রক্ষেত্রের প্রসার মূলতঃ নির্ভর করে ছবির উৎকর্ষের মাত্রার ওপরে। বর্তমানে দশ বছর আগের চেয়ে সংখ্যায় বাংলা ছবি প্রায় তিনগুণ দেখান হচ্ছে কিন্তু উৎকর্ষের সৌষ্ঠব না থাকলে শুধু সংখ্যার চাপে বাজার দখল করা যায় না। বাংলার চিত্রব্যবসায়ীরা যদি এবিষয়ে অবহিত না হন, তাহলে বাংলার চিত্রশিল্প নিয়ে গর্ব করবার কিছু তো থাকবেই না, উপরন্তু প্রতিযোগিতার সামনে বাংলা দেশেও বাংলা ছবির আদর বজায় রাখাই মুস্কিল হয়ে উঠবে।
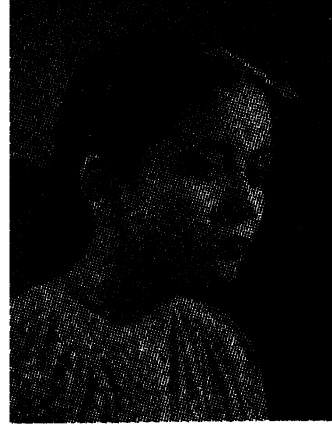
বাঁকালেখায় মীরা দাস

নৃত্যকুশলা বনশ্রী
হীরেন বসু প্রডাকসনের সংগীত মুখর 'বন্‌জারে' হিন্দি চিত্রে। শ্রীযুক্ত বসুই চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন। 'বন্‌জারে' কলিকাতায় মুক্তি প্রতীক্ষায়।

শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার

শিক্ষা, সুরুচি প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অনন্যসাধারণ অভিনয়-দক্ষতা নিয়ে চিত্র-জগতে আত্মপ্রকাশ করছেন। মঞ্চে চাণক্য, জীবানন্দ, রাম, বিপ্রদাস, সুশোভন, মিঃ সেন, দুলাল চাঁদ প্রভৃতি চরিত্র রূপায়ণে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। 'উদয়াচল' এঁরই নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের ছবি।

শ্রীমতী মলয় সরকার
এম, পি, প্রডাকসন প্রযোজিত 'বিদুষীভার্যা' চিত্রে সর্বপ্রথম চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানাবেন। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র।

শ্রীসুখেন্দু বসু

যোসার্ট প্রডাকসনের 'প্রিয়তমা' চিত্রের প্রযোজক রূপেই দর্শক সাধারণের কাছে সর্ব-প্রথম পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। ১৯১৮ খৃঃ-এ বর্ধমান জেলায় জন্ম-গ্রহণ করেন। বাল্য ও উচ্চ শিক্ষা কলিকা-তাতেই লাভ করেন। তাঁর পিতা শ্রীযুত সত্য প্রসন্ন বসু একজন খ্যাতনামা ব্যবসায়ী। নিজের কর্মনিষ্ঠা ও সততার গুণেই তিনি ব্যবসায় উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন। শিক্ষা সমাপ্ত হবার সংগে সংগে সুখেন্দু বাবু নিজেদের কার-বার দেখতে থাকেন। কিন্তু ব্যবসায় তাঁর মন টেকে না। ছোট-বেলা থেকেই তাঁর ঝোঁক চিত্র-শিল্পের প্রতি। কিছুদিনের ভিতরেই তিনি নিউ থিয়েটার্স-এর ছোটাই বাবুর সংস্পর্শে আসেন এবং কয়েকটি চিত্রে ছোট ছোট ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। এর ভিতর 'নারী' 'প্রতিমা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অভিনেতা হবার ইচ্ছা কোনদিনই সুখেন্দু বাবুর ছিল না—তিনি চিত্র-শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করবার জন্যই অভিনেতারূপে যোগদান করেন। ছোটাই বাবুর উৎসাহ এবং প্রেরণায়—বাবা এবং বড় ভাইএর সম্মতিক্রমে চিত্র-প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করেন ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯৪৭-এর, ৫ই জানুয়ারী, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র 'প্রিয়তমার' মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। ১৯৪৮-এর ২১শে মে, বসুশ্রী ও বীণায় 'প্রিয়তমা' মুক্তিলাভ করে জন-প্রিয়তা অর্জন করে। 'প্রিয়তমা'র কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেন শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে সুখেন্দু বাবু তাঁর দ্বিতীয় চিত্রের প্রাথমিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছেন। তিনি আশা করেন দর্শক-সাধারণের আশীর্বাদ থেকে এবারও তিনি বঞ্চিত হবেন না। তাই তাঁদেরই সহানুভূতি সর্বপ্রথম কামনা করেন।

বাণীচিত্রের গান

শ্রীসুবোধ রায়

অত্যুক্তি নয়। গানই হ'ল বাণীচিত্রের মণি-মঞ্জুষা। গল্পের প্রাণ-প্রাচুর্য এবং বর্ণ-বৈচিত্রে আমরা মুগ্ধ হই শুধু গানের জন্যই। শুধু কল্লোলিত প্রাণ স্পন্দন নয়, ছায়া-ছবির মেরুদণ্ডই হ'ল গান। সমগ্র ছবিটাই যদি হয় একটি নয়নাভিরাম স্বচ্ছ দীঘি, গান তারই লীলায়িত লীলাকমল। এই সত্যের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই যখন বিজ্ঞাপনী ভাষায় প্রচারক কিম্বা সমালোচককে বলতে শুনি যে, অমুক ছবির গানই হ'ল প্রথম ও প্রধান আকর্ষণ। তাই বলছিলুম, চলচ্চিত্রের পক্ষে গান শুধু অত্যাবশ্যক নয় অপরিহার্য।...

একথা নিঃসন্দেহ, বাণী চিত্রে গান আজ একটা বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েচে। এবং কি পরিমাণ প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েচে, তার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পূর্ব-বর্তী একাধিক ছবির কথা ও কাহিনী আমরা হয় ত' আজ ভুলে গেছি, কিন্তু ভুলি নাই সেই চির-মধুর চির নূতন গান-গুলি...... "আকাশে চাঁদ ছিল", "আমি বন বুল বুল", "হে বিজয়ী বীর", "মালতী লতা দোলে", "একটি পয়সা দাও গো", "এই কি গো শেষ দান ?" "আমি বনফুল গো" ইত্যাদি আরো কত গান। ছবির গল্পকে সরস সজীব এবং রূপায়িত করবার এই বিস্ময়কর যাদুশক্তি আছে বলেই, গীতিকারের গীত রচনার দায়িত্বও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্রোপযোগী গান রচনা করা কাঁচের পেয়ালা ভাঙার মতোই সহজ ব'লে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা ভ্রান্ত। অন্তর্দৃষ্টি—দরদ—আন্তরিকতা এবং ভাবের গভীরতাই হ'ল গানের সম্পদ। কেবল মাত্র লেখার জন্যই লেখা হ'লে সে লেখার অকাল মৃত্যু হ'তে বাধ্য। গান লিখতে গিয়ে প্রায়শঃই আমরা প্রতিপাদ্য বিষয় যাই ভুলে। বক্তব্যের সম্যক প্রকাশ নেই, ভাবের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা নেই, শুধু কতগুলি সুষ্ঠু শব্দ চয়ন আর বাক্যবিন্যাসের মনোহারিণী বর্ণচ্ছটায় আমরা সস্তায় কিস্তিমাত করি। অল্পে খুশী বিদ্যাভিমানী রস-বেত্তার দল তাইতেই একাধারে লুব্ধ ও মুগ্ধ হ'য়ে যায়।... অথচ আশ্চর্য, সে জন্য আমাদের, মানে গীতিকারের এতোটুকু লজ্জা কিম্বা বিবেকের বালাই নেই। বরঞ্চ উচ্চারিত ভাষায় এবং উন্নাসিক দুঃসাহসীকতায় যা করি, সেটা আত্মবিজ্ঞাপণেরই নামান্তর। এই সীমিত বিচার বিবেচনা আর অপ্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে তবু সদম্ভে চলি আমরা স্পর্ধিত অহংকারে, নির্বোধ আত্মম্ভরিতায়।...দুঃখ হয়, আজকের অধিকাংশ গীতি কবিতাই শুধু জলের আলপানা, কাগজের ফুল, কথার ফুলঝুরি। বুদ্বুদের মতোই উচ্ছল—স্বল্পায়ু আজকের কবিতা। হঠাৎ আলোর ঝলকানি দিয়ে অকস্মাৎ আতসবাজির মতোই হঠাৎ নিভে যায়।.....সেই চাঁদ, সেই চামেলী ফুল, সেই দখিণ বাতাস ...সেই একঘেয়ে চর্বিত চর্বণ, পৌনঃপুনিক, অসম্বদ্ধ প্রলাপের অবতারণা। এক কবিতা আর একটি কবিতার মুখোস নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যর্থ অনুকরণ দেখি কিম্বা অনুরণও শুনি দুইটি ভিন্ন কবির লেখার ভিতর।...এই যে অনুচিকীর্ষু বৃত্তি, এই যে plagiarism, এই যে নির্লজ্জ জঘন্য literary theft এ শুধু সম্ভবপর হ'তে পেরেচে আমাদের সত্যিকার সাধনা, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির অভাবে। ...আমরা নিধিরাম সর্দারের দল উচ্চাংগের রস-রচনায় নিজেদের এক একটি ক্ষুদ্র রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, কিম্বা অজয় ভট্টাচার্য ব'লে মনে করে একটি নির্বিকল্প আনন্দ এবং নিরুপদ্রব আত্মপ্রসাদ অনুভব করি।

আর অতিরঞ্জন নয়, পর্দার অন্তরালেও দেখেচি হাই ব্রাউ আর্টিষ্টরা কি রকম উদ্ধত ভংগীতে পদচারণা করেন...কি নিষ্করুণ অবজ্ঞায় যাঁরা দুর্ভাগ্যক্রমে তখোনো অনুরূপ খ্যাতি অর্জন করতে পারে নি, তাঁদের সংগে দয়া করে কথা বলেন। সম্প্রতি ভালবাসা—সৌহার্দ্য—সখ্যতা কিছু নাই, আছে শুধু রেষারেষি, দলাদলি, পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে চলার সুতীব্র প্রতিযোগিতা।... ..এই যেমন ধরুণ... ষ্টুডিয়োর দরজায় একটা প্যাকার্ড সুপার এই এসে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আর সেই মহিমময় গাড়ী থেকে পালকের মতো লঘু পদক্ষেপে নামলেন অমুক দেবী। মানে বিচ্ছুরিত বিদ্যুল্লতা। জর্জেট হাইহিল, ভ্যানিটি ব্যাগ, সান

গ্লাস, অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি নেই।······অমনি শোনা গেল উচ্চকিতা, উৎকণ্ঠিতা অপেক্ষমানা তরুণী মহলের অস্ফুট গুঞ্জন: "ইস্ গার্বো এলেন, মাটিতে আর পা পড়ে না।" আর একটি কণ্ঠ: "ছিলি বস্তির আস্তাকুঁড়ে আর আজ রিজেণ্ট্ পার্কে দু'বিঘে জমির ওপর···হুঁ একেই বলে বরাত।" আর একটি কৌতূহলী কণ্ঠ: "এ গাড়ীটা আবার কবে কিনলে রে?"..."ওমা তা বুঝি জানিস নে? এটাই ত ঝুনঝুনওয়ালা প্রেজেণ্ট করেচে।"...তাপরের মন্তব্যগুলি আর শ্রবণযোগ্য নয়।...এই হ'ল ষ্টুডিও জীবনের নিগূঢ় অন্তর্লোক, এই তার প্রাত্যহিক প্রতিচ্ছবি। অনিয়ম কিম্বা আর কোন অস্বাস্থ্যকর স্বৈরিতার কথা না হয় বাদই দিলুম। কিন্তু মমত্ব আর আত্মীয়তা বোধের হদিস কোথায়? শুধু দেখি, ঈর্ষা, অসূয়া, তুচ্ছতা আর পরশ্রীকাতরতার বিষ বাষ্পে ষ্টুডিয়োর আবহাওয়া পংকিল—

বিষাক্ত।...একটি ডাক সাইটে বিজিনেস ম্যাগনেট কিম্বা কোন ধনী কণ্টাকটারের ক্রমোন্নতির কথা চিত্র পরিচালক হয় ত অখণ্ড মনোযোগে শুনতে পারেন কিন্তু প্রশংসা করুন ত' অন্য এক চিত্র পরিচালকের? অমনি দেখবেন সে চেহারাই নেই। একেবারে দপ করে জ্বলে উঠচেন। আর একথা অভিনেতা, অভিনেত্রী, ক্যামেরাম্যান, চিত্র-নাট্যকার, সুরশিল্পী এবং গীতিকার সকলের পক্ষেই সমভাবে প্রযোজ্য। সমধর্মী পরস্পরের বৈরী চক্ষুশূল। প্রফেস্যানল জেলাসির এ এক নিকৃষ্টতম উদাহরণ।···নীহার ভঞ্জের "প্রদীপ ও পতঙ্গ" দেখেছ? দৈনিক চারটে শো দিয়েও তিন হপ্তা ধরে হাউস ফুল। কি পেটাই পিটছে।" বল্লেন জনৈক প্রডিউসার। অমনি ডিরেক্টর সাহেব ফোঁস করে উঠলেন: আরে রেখে দাও..."রামা শ্যামা সবাই আজ ডিরেক্টর।···অমন একখানা বই পেয়েছিল তাই—শালা লাইনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।" জনপ্রিয় এক গীতকার মন্তব্য করলেন: "মরীচিকার গানগুলো শুনেচ হে? আহা—কি লেখাই লিখেচে।" উন্নাসিক

ভংগীতে তখুনি আরেকজন বিষ উদ্গীরণ করলেন: "আরে তুমিও যেমন...যতো সব ভুঁইফোড় কবি...ব্যাটা নির্ঘাত চুরি করেছে।"...

সৌজন্য আর শালীনতা বোধ হারিয়ে আমরা অশিক্ষার কোন আদিম বর্বরতায় নেমে এসেচি ভেবে দেখুন। কেন এই ঈর্ষা? একজন সহযোগী—সমধর্মী শিল্পী বন্ধুর বিরুদ্ধে এই একান্ত অশোভন অশিষ্ট উক্তি কেন? কেউ যদি তাঁর সিস্নিগ্ধ মন কিম্বা সত্যিকার কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে থাকেন, তাঁকে শতমুখে প্রশংসা করবার মতো মনের ঔদার্য আমাদের থাকবে না কেন? কেন তাঁকে দেব না আরও উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা? যা তাঁর প্রাপ্য। তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠায় আমাদেরই ত' সর্বাগ্রে এবং সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা উচিত। আমাদের সমবেত চেষ্টায় প্রতিটি রস সৃষ্টি নিখুঁত—সর্বাংগসুন্দর হ'য়ে উঠুক...এই আদর্শই কি কাম্য নয়? রস সৃষ্টি একমাত্র আমাকে দিয়েই সম্ভব, অন্যের পক্ষে সেটা অপচেষ্টা, এ অতি ঘৃণিত—জঘন্য মনোভাবের পরিচায়ক।...

তাই বলছিলুম, আমাদের সার্থান্ধ মন এবং সংকীর্ণ দৃষ্টি কোণকে আজ বদলাতেই হব।...দুর্নীতি আজ সর্বগ্রাসী বুভুক্ষা নিয়ে বাংলার রাজনীতি ও সামাজিক জীবনকে গ্রাস ক'রেচে...সাহিত্যের কমল বনে বিদ্যাদায়িনী, শুচিস্মিতা মঞ্জুভাষিণী কলা লক্ষ্মীও কি তার করাল কবল থেকে রেহাই পাবে না? আবর্জনা জমেছে অনেক। তবু সেই আবর্জনা দূরীকরণে বাংলার প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবি কবি ও শিল্পীর নির্লোভ মন ও নিঃস্বার্থ ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আজ সত্যই গুরুতর হ'য়েচে। শুভার্থীর সদিচ্ছা নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্রের সামগ্রিক পটভূমিকার ওপর আমাদের দৃষ্টি সম্প্রসারণের আবশ্যকতা আজ অনস্বীকার্য।

সে যাই হোক...যা বলছিলুম: গীতকারদের আর একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। কবিতা লেখা আর গ্র্যামোফন, রেডিও কিম্বা সিনেমার গান লেখা এক জিনিষ নয়। কবিতার মধ্যে সুষ্ঠু শব্দ চয়নের অভিনবত্ব ভাষার সাবলীলতা, ভাবের সূক্ষাতিসূক্ষ ব্যঞ্জনা, অলীক স্বপ্ন বিলাসিতা কিম্বা সুনিপুণ বাক্য বিন্যাসের অবকাশ আছে। কিন্তু সিনেমার গান হবে কথা প্রধান। লঘু—সাগসৈ এবং

সংসার চিত্রে রবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণী

অতিরিক্তি মাত্রায় সহজ ভাব ব্যঞ্জক কথা। বাণীচিত্র গানের মর্মবাণী হবে কতকগুলি ছোট হালকা বহুশ্রুত Suggestive কথার সমষ্টি। এক কথায় ছায়া ছবির গানে থাকবে একটি অনায়াস স্বচ্ছতা···একটা সাবলীল স্বচ্ছন্দ সাহজিকতা। ভাবের মসৃণ স্বচ্ছতায় গানের প্রতিটি কথা ফুলের মতো ফুটে উঠবে।···কাজে কাজেই হেলা ফেলায় খালি কতকগুলি মোলায়েম মসৃণ নরম মিষ্টি কথা দিয়ে গান রচনা করলে চলবে না। কবির বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট। রহস্যের ধোঁয়া কিম্বা ভাবের কুঝটিকায় তার যেন শ্বাসরোধ না হয়। জলের মতো স্বচ্ছ আর খর রৌদ্রের মতো উজ্জ্বল ...তবেই কাব্যরচনার সার্থকতা।···

গল্পের গতিকে অল্প বিশ্বস্ততায় অনুসরণ করবে প্রতিটি গান। কেবলমাত্র প্রডিউসর পরিচালক কিম্বা সুরশিল্পীর খেয়াল খুশী কিম্বা নির্দেশানুযায়ী গান রচনা করলে চলবে না। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অনেক সময় অনেক পরিচালক গীতকারের কাছে শুধু কতকগুলি সিচুয়েশন বর্ণনা করেই স্বীয় দায়িত্ব খালাস করেন। অনেক সুরশিল্পী নিজের সুবিধার জন্য আগে ভাগেই গানের একটি কাঠামো পেশ করেন এবং গীতিকারকে সেই কাঠামোর খাঁচে খাঁচে কথা বসিয়ে যাবার সৎ পরামর্শ দিয়ে Film songs made easy-র একটি মোক্ষম পথের সন্ধান দেন। হতভাগ্য গীতকার এই ভাবে গীত রচনায় হারায় তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ আর বিশেষ করে তাঁর লেখার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। আর এ রকম ক্ষেত্রে গানে যদি দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী না হয়, যদি হয় নিষ্প্রাণ—অর্থহীন দোষৈকদর্শিরা সেজন্য কি শুধু গীতকারকেই অপরাধী করবেন?

তারপর কারণে অকারণে নায়ক নায়িকাকে গান গাইতে বাধ্য করানো শুধু অস্বাভাবিক নয়—হাস্য কর। গানের জন্য যে একটি সহজ ও স্বাভাবিক পরিবেশ দরকার এই সহজ কথাটি যে চিত্র পরিচালক কি করে ভুলে যান ভেবে আশ্চর্য লাগে। অনেক সময় দেখেচি প্রণয়ীকে অন্যাসক্ত দেখে প্রণয়িনী গান জুড়ে দিলেন। পুরুষের তাঁবে থাকবো না বলে প্রগতিবাদিনী আধুনিকা প্রকাশ্য রাজপথে দিব্যি নাচের ভংগীতে গান সুরু করলেন। হারমোনিয়ম গলায়

ঝুলিয়ে পুরুষও নেচে নেচে গানে গানে দিলেন তাঁর গানের উত্তর। (বিশ্বাস না হয় "শাখা সিঁদুর" দেখবেন) আর কি অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব! দ্বৈত সংগীত তখুনি নায়ক নায়িকা কি করে Ready made ছাড়েন ভেবে স্তম্ভিত হয়ে যাই। এ দৃশ্য কি সম্ভব না স্বাভাবিক? ...তারপর আরো দেখুন...রোগ শয্যায় মুমূর্ষ যদি বা কিছুদিন বাঁচবার আশা ছিল, নায়িকর বাজখাঁই কণ্ঠ নিঃসৃত বাগেশ্রীর নির্দয় কষাঘাতে সেই নশ্বর দেহ অচিরেই পঞ্চ ভূতে মিশিয়ে গেল। আর এরকম ক্ষেত্রে গান—তা যতোই স্বরচিত এবং সুর সমৃদ্ধিশালী হোক না কেন,নায়িকার পিতার মতো সেও পঞ্চভূতে মিলিয়ে যেতে বাধ্য।...এমন বেহেড্ গাঁজাখুরি দৃশ্য শুধু হিন্দি ছবিতেই সম্ভবপর বলে যাঁদের ধারণা, তাঁদের নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত "সাধারণ মেয়ে" দেখলেই সে ভুল ভেঙে যাবে।—এখানেও চোখে পড়বে সেই অক্ষম ক্রটি। শয্যাকে আশ্রয় করচেন মৃত্যুপথ-যাত্রী পিতা। অতএব তাঁকে গান শুনিয়ে শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে এসে কন্যারূপিণী দীপ্তি রায় হ'লেন পিতৃহন্তা। দীপ্তি রায়ের গান শেষ হবার সংগে সংগেই তাঁর পিতৃদেবও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।..

শুধু কি তাই? আরো কতো অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে আমাদের গান শুনতে হয়।...ধরুন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নেমেছে। আর আমরা দেখলাম নায়কের কোলে বিসর্পিত লীলায় এলিয়ে পড়চে এক মদ-মুকুলিতাক্ষী মেয়ে। তারপর আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখেই সেই আভ্রিয়মানা নায়িকা দিলেন আচমকা এক গান শুনিয়ে। সংগে সংগে নায়কের স-গীত হুঙ্কার। তারপর লুকোচুরি খেলা। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বিলোল কটাক্ষ আর গান। গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলদল সরিয়ে ঘন ঘন ভ্রূবিলাস আর গান। আর নায়কেরও যথারীতি সেই সাংগীতিক আস্ফালন।—লেকের ধারে, পার্কে কিম্বা গড়ের মাঠে এই রকম সংগীত মুখর প্রেমিক প্রেমিকার দর্শন লাভের সৌভাগ্য কি আপনাদের কোন দিন হয়েচে?—কখোনো দেখেচেন এমন অভাবিত—অবাস্তব—অস্বাভাবিক দৃশ্য?—দুঃখ হয়। পরিচালকের এই অবিমৃষ্যকারিতা আর নিরন্ধ নির্বুদ্ধিতার সত্যি কোন ক্ষমা নেই।...

এই সেদিনও 'স্বর্ণসীতায়' দেখলাম, কথা নেই বার্তা নেই, কি খেয়াল হ'ল এক কারারুদ্ধ বন্দী হঠাৎ সুরু করে দিলেন গান। ব্যস..আর যাবে কোথায়? সংগে সংগে সুরু হ'য়ে গেল ঐক্যতান বাদন। কোন্ ঐন্দ্রজালিকের যাদু মন্ত্রে এই অর্কেস্ট্রা পার্টি অদৃশ্য ভাবে যথা সময়ে সেই নিষিদ্ধ কারাগৃহে প্রবেশ লাভ করলো ভেবে হতবাক হ'য়ে যাই। "ভুলিনাই" ছবিতেও এই একই ক্রটি চোখে পড়লো। বোধ হয় চাঁদের কলঙ্কের মতো। গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে শ্রীমতী নিবেদিতা গান গাইছেন—অমনি বেজে উঠলো ভূ-ভারতের যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র। তবু রক্ষে, গানের ভূত নায়ক প্রদীপ কুমারের স্কন্ধে ভর করে নি। করলে এমন ছবিটিকে রসাতলে নিয়ে যেতে বোধ করি এই একটি দৃশ্যই যথেষ্ঠ হতো।...

লোক চক্ষুর অগোচরে আরও ঘটতে দেখেচি: সন্ন্যাসী ফকির কিম্বা নৌকার মাঝি নদীর ধারে কিম্বা গহন অরণ্যে গান গাইছে, অমনি কানে আসে বাঁয়ে তবলার বোল বহুল কলরোল। সঘন—সশব্দ-সক্রিয়।...তবল আর তবলা বাদকে আর দেখতে পাওয়া যায় না।...শুধু গভীর অরণ্য—সীমাহীন আকাশ, ধূ ধূ মাঠ।—এই আজগুবি, একান্ত অস্বাভাবিক ঘটনার অবসান হবে কবে? যা হয় না, হ'তে পারে না, তারই পুনরভিনয় চলবে আরো কতদিন।—

দৃষ্টি ভংগীর আজ আমূল পরিবর্তন দরকার। বাস্তব পরি-প্রেক্ষিতে আজ বিচার করতে হবে প্রতিটি ঘটনা, তা যতোই তুচ্ছ—অকিঞ্চিৎকর হোক না।—বাংলা দেশে বাস্তববাদী শক্তিশালী, গুণী চিত্র পরিচালকের সংখ্যা খুব অল্প নয়।—এবিষয়ে তাঁদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি আজ এখানেই সমাপ্তির দাঁড়ি টানছি।
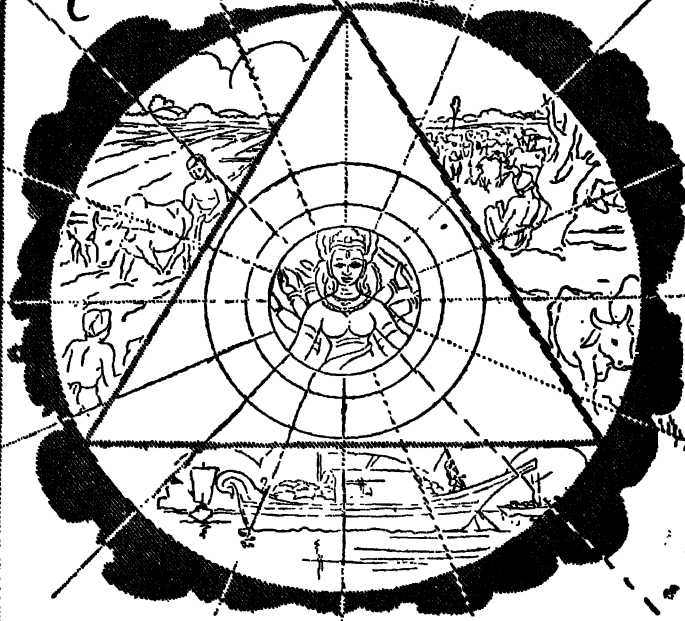
সেই আদিকালে থেকে.....

স্বপ্নদর্শন

ফণীন্দ্র পাল

উত্তর কলিকাতার কোন একটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহের সহিত আমার একটু বেশী সংযোগ আছে। কোন কারণে একদিন সেই ছবিঘরের প্রেক্ষাগৃহে আমাকে সারারাত্রি কাটাইতে হইয়াছিল। জীবনে সেই রাত্রে এক অভূত-পূর্ব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম—ভয়-বিস্ময় জড়িত বিনিদ্র রাত্রির কাহিনী মনে পড়িলেই এখনও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

গভীর রাত্রে সম্পূর্ণ একা কেহ কি কখনও গ্রামের শ্মশানে কাটাইয়াছেন? গভীর দুর্যোগের রাত্রে বায়ুবেগসঞ্চালিত ঘন অরণ্যের মাঝখানে কেহ কি কখনও একাকী পড়িয়াছেন? প্রেতের অট্টহাসির মত শন্ শন্ শব্দ, গাছের মাথার উপর বিদ্যুৎ-শিখার ঝলক, ধারা-বর্ষণের একটানা গোঙানি সকল সাহসকে কেমন যেন অবশ করিয়া আনে। তবু এই দু'টি ভয়ার্ত পরিবেশের মাঝখানে, নিজের সম্বিৎকে হয়তো কোন রকমে ধরিয়া রাখা যায়। কিন্তু গভীর রাত্রের নির্জন প্রেক্ষাগৃহে কিছুক্ষণ থাকিলেই মনে হয় যেন আমি আর ইহজগতে নাই। বাঁচিয়াই আছি কিন্তু সে এক অন্য জগতে। অতি পরিচিত মানুষগুলি ছায়ার জগত হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের ছবির চরিত্রের কথা বলিতেছে—শরীরি অশরীরি তাহাদের কোনরূপই চোখে পড়িতেছে না। শুধু তাহাদের কথা, হাসি, গান, কান্না, দীর্ঘশ্বাস ও প্রতি-বাদের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছি। যাহাদের ছবি রূপালী পর্দায় বছরের পর বছর প্রতিচ্ছায়া ফেলিয়াছে, তাহারাই ভীড় করিয়া আসিয়া হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, গান করিতেছে। নীরব প্রেক্ষাগৃহের প্রতিটি আসনের দর্শকের কলগুঞ্জন তাহার সহিত মিশিয়া সে এক জীবন্ত অন্য জগত সৃষ্টি করিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের মত অহিফেন সেবনের অভ্যাস আমার নাই। আর কোন স্বলপথে বিচরণ করিবার আসক্তিও নাই। সুতরাং জাগিয়া স্বপ্ন দেখিবার মত কোন কারণ ছিল না। রূপালী পর্দার দিকে যতবারই দৃষ্টি পড়ে, সেখানে কেহ নাই—বহুদূর প্রসারিত প্রেক্ষাগৃহের শেষ প্রান্তে শুধু একটি শ্বেত-ছায়া দাঁড়াইয়া আছে, বিধবার মত রিক্ত। মৃদু আলোকে ঘরখানির মধ্যে যেন কতজনের আবছায়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমতী কানন দেবীর কণ্ঠস্বরের একটি গান যেন কানে ভাসিয়া আসিল। অকস্মাৎ কমল মিত্রের গুরুবালি কণ্ঠের সংগে দেবী মুখার্জির গুরু-গম্ভীর স্বরে বাদানুবাদ আমাকে চমকিত করিয়া তুলিল। 'কাশীনাথ' চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী সুনন্দা দেবীর সতেজ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। অসিতবরণও যেন কি বলিল। ইহার পর অকস্মাৎ ঘুঙুরের আওয়াজে ঘর ভরিয়া গেল—শ্রীমতী সাধনা বসু না উদয়শঙ্কর ঠিক করিয়া উঠিবার পূর্বেই শুনিলাম রবীন মজুমদার গান ধরিয়াছে।

ভয়-বিস্ময় শিহরিত মনের সেই অবস্থাতেও যেন একটু বিরক্তই বোধ করিতে লাগিলাম। বিভিন্ন ছবি হইতে নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি এমন ভাবে এক লাইন গান, একটুখানি কথা, খানিকটা হাসির আওয়াজ শুনাইয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। সম্পূর্ণ একটি ছবির কথা, একটানা কোন গান, পুরা একটি দৃশ্যাভিনয় হইলে হয়তো বেশ হইত। কিন্তু এ কি ব্যাপার—গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া যতগুলি ছবি এই প্রেক্ষাগৃহের পর্দায় প্রক্ষেপিত হইয়াছে তাহার সব কথা সকল আওয়াজ কি আজো এই প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে প্রতিধ্বনি হইয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

সারারাত্রি ধরিয়া একা বসিয়া বসিয়া কি এমনি ভৌতিক শব্দ শুনিতে হইবে? নবদ্বীপ হালদারের খন্‌খনে গলার পরই দীপ্তি রায়ের বড় বড় কথা, শ্রীমতী মলিনার স্বাভাবিক অভিনয়ের পরেই, নীতীশ মুখুয্যের নাটুকে কণ্ঠ। ছবি বিশ্বাসের স্বচ্ছন্দ কণ্ঠস্বরের পরেই হয়তো রঞ্জিত রায়ের ভাঁড়ামি সহ্য করিতে হইবে। পাহাড়ী সান্যালের কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইব জহর গাঙ্গুলীর অনুকরণ এবং জহর গাঙ্গুলী নরেশ মিত্রের স্বর নকল করিয়া অনর্গল কথা বলিয়া যাইবে। আর হতভাগ্য আমি বসিয়া বসিয়া এলোমেলো
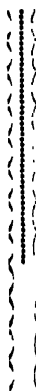
শ্রীযুক্ত কমল মিত্র
পথের দাবীর হিন্দি চিত্ররূপ
'সব্যসাচী' চিত্রে নাম ভূমিকায়

এই শব্দের অরণ্য হইতে কে কোন্ ছবির চরিত্রে এই কথাগুলি বলিয়াছিল, এই গানের এক কলি গাহিয়াছিল তাহা মনে মনে খুঁজিয়া বেড়াইব।

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইব মনে করিতেছিলাম। হয়তো গাত্রোত্থানের সর্বপ্রথম দৈহিক সঞ্চালনেও আমি ঈষৎ নড়িয়া উঠিয়াছিলাম, এমন সময় নারীকণ্ঠস্বর শুনিলাম, "এর আগে বাঙলা ছবি দেখতে দেখতে তোমাকে ত কখন বিরক্তিভরে প্রেক্ষাগৃহ থেকে এমনি [illegible]বে বেরিয়ে যেতে দেখিনি, তবে আজই বা কেন যাবার এ[illegible] প্রয়োজন হ'ল।"

কে এমন করিয়া আমার উদ্দেশে কথা বলিল—কানন দেবী নয়, সুনন্দা দেবীর স্বর এ নয়, সরযু-বালার নয়। সন্ধ্যারাণী কি কোন চিত্রের নায়িকারূপে এই সংলাপটি বলিয়াছিল? কিন্তু এ ধরণের সংলাপ কোন নায়িকা বলিলে প্রেক্ষাগৃহের সকল দর্শকই বোধ হয় এক-যোগে বাহির হইয়া যায়। শ্রীমতী প্রভার কণ্ঠস্বরও নয় বলিয়া মনে হইল।

পুনরায় সেই কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম, "বাঙলা ছবির অধিকাংশই ত এমনি এলোমেলো কথা, গান, ভাঁড়ামি, আদর্শের ন্যাকামি, বড় বড় কথার ফাঁকা আওয়াজ, অসংলগ্ন দৃশ্য, বুদ্ধিমত্তার ভান আর অকারণ মার-প্যাঁচে ভরাট—কিন্তু কোনদিন ত তোমাকে কোন ছবি দেখতে দেখতে উঠে যেতে দেখিনি।"

হতচকিত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। বসিয়া পড়িয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। এই কণ্ঠস্বরও যদি ভৌতিক হয়, তাহা হইলে ত আমার দফা শেষ। ভূত-প্রেতকে বিশ্বাস করিতে রাজী আছি, শুধু প্রাণসংশয় না ঘটিলেই হইল। অর্ধ-অন্ধকারে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি লইয়া এপাশ ওপাশ চাহিতে চাহিতে মহিলা-আসনের দিকে নজর পড়িল। স্বল্পালোকেও তাঁহার গৌরবর্ণের আভা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

তবে কি রাত্রির শো শেষ হইবার পর কোন মহিলা থাকিয়া গিয়াছেন। কি রকম বাড়ীর কেমন মেয়ে! মনে ঠিক করিলাম, চিত্রগৃহের দারোয়ানের জিম্মায় তাঁহাকে রিক্সায় চড়াইয়া বাড়ী পাঠাইয়া দিব। এখন দয়া করিয়া তিনি যদি ঠিকানাটি বলেন। তবে ঠিকানাটি এজগতের বাহিরের কোথাও হইলে বিপদ। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই তিনি বীণ-নিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার কাছে যেতে পারি কি?" সাহস সঞ্চয় করিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, "আসুন।"

তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি চিনি কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি আমাকে চিনতে পারলে না। আমি দেবী কলালক্ষ্মী।"

আমি তৎক্ষণাৎ শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "জননী, বহুদিন পরে স্তিমিত আলোয় তোমাকে হঠাৎ চিনতে পারিনি, আমাকে ক্ষমা কর।"

দেবী বলিলেন, "সে যাক, তোমাদের ছবির সম্বন্ধে আমার কতকগুলি অভিযোগ আছে; সময় আছে কি শোনবার?"

করজোড়ে বলিলাম, "অপরাধ নিও না জননী। রাত্রি এখন অনেক, আমার অত্যন্ত ঘুম পেয়েছে। তাছাড়া আমাকে শুনিয়ে তোমার কি লাভ হবে—যাদের বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগ, তাদের আকাশে তোলাই আমার পেশা। তার চেয়ে এবছর বেঙ্গল ফিল্ম-জার্ণালিষ্ট এসো-সিয়েশনের পুরস্কার-বিতরণী সভায় আবির্ভূতা হয়ে সকলের সম্মুখে তোমার অভিযোগ পেশ করিও। অথবা এবছর 'চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির' ভোট গণনার দিন 'রূপ-মঞ্চ সম্পাদক' শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়কে দয়া করে একবার সাক্ষাৎ দিও। তিনি ব্যস্ত না থাকলে নিশ্চয়ই তোমার অন্তরবেদনা বুঝতে পারবেন।"

দেবী কলালক্ষ্মী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গোপনে বাহিরে নামিয়া অন্ধকারে হারাইয়া গেলেন, শুধু তাঁহার দীর্ঘশ্বাসটুকু হাওয়ায় ঘুরিতে লাগিল।

শুভ-সংবাদ!
চিত্র জগতের কয়েকটি
বিরাট সৃষ্টি
যা চিত্রগৃহকে সর্ব্বদা মুখরিত করে রাখবে
BPC
পূজার প্রীতি-সম্ভাষণ!
"দুসরী-শাদীর" অভাবনীয় সাফল্যের পর
কিষণ মুভিটোনের
ঘর-কী-ইজ্জত
শ্রেষ্ঠাংশে- মমতাজ শান্তি • দিলীপ কুমার
রঞ্জিত এখনও শিখরে
জয়-হনুমান
গণেশ টকীতে নূতন রেকর্ড করিয়াছে
এবং পরে
মিট্টী-কী-খিলওনা
শ্রেষ্ঠাংশে: নীগার • জয়রাজ
আসিতেছে
মানসরোবর পিকচার্সের নিবেদন—
নাও
নীগার • জয়রাজ
অভিনয়ে
পরিবেশক
বম্বে পিকচার্স কর্পোরেশন
১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট • কলিকাতা
RISING ART COTTAGE

— শ্রীমতী মীরা সরকার —

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত

তারাশঙ্কর রচিত 'সন্দীপন পাঠশালায়।'

বিমল রায় পরিচালিত সুবোধ ঘোষ রচিত
'অঞ্জনগড' চিত্রে শ্রীমতী সুনন্দা দেবী

অষ্টম বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা

রূপ-মঞ্চ

কার্তিক
১৩৫৫

আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন

উৎসবের সমারোহ কেটে গেছে—শারদীয়া সংখ্যার জন্য যে কর্মব্যস্ততায় আমরা মেতে পড়েছিলাম—তাও বর্তমানে কিছুটা প্রশমিত। আমাদের পরিশ্রম আপনাদের প্রশংসাবাণীতে সার্থকতা লাভ করেছে—আপনারা আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। উন্নাসিকের মনোবৃত্তি নিয়ে যারা অতীতের মত বর্তমানেও আমাদের সমর্থন করতে পারেননি, অভিনন্দন তাদেরও জানাচ্ছি। বেতার, চিত্র ও নাট্য জগত নিয়ে ইতিপূর্বে যে সব সমস্যা আমাদের সামনে দেখা দিয়েছিল—শারদীয়া-সংখ্যার জন্য সাময়িকভাবে সেগুলিকে সরিয়ে রেখেছিলাম। সেই সমস্যাগুলিকে বর্তমানে নাড়া-চাড়া করতে বসে আরো বহু নতুন সমস্যার ভারে নুইয়ে পড়েছি। একসংগে সবগুলিকে নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই একএকটীর গুরুত্ব বিচার করে পূর্বে ও পরে আমাদের আলোচনায় স্থান করে দিতে চেষ্টা করবো। চিত্রজগতে বর্তমানে যে সমস্যা সব চেয়ে বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে—তা হচ্ছে :

কাঁচা ফিল্ম

কাঁচা ফিল্মের অভাবে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প এক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'য়েছে। এই অভাবের সংগে সংগে যে দুর্নীতি ও অনাচার ধীরে ধীরে দেখা দিয়েছে, তা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। অনেক চিত্র প্রতিষ্ঠান তাঁদের পরিকল্পিত চিত্রের মহরৎ করে—আর বেশীদূর অগ্রসর হ'তে পাচ্ছেন না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান কিছুটা স্যুটিং করে চিত্রগ্রহণের কাজ ফিল্মের অভাবে বাধ্য হয়ে বন্ধ রেখেছেন। আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠান তাঁদের চিত্র সমাপ্ত করেও মুক্তি দিতে পাচ্ছেন না—প্রেক্ষাগৃহের সমস্যা ছাড়াও এই ফিল্মের সমস্যা নতুন করে তাঁদের সামনে দেখা দিয়েছে। ফিল্মের অভাবে মুদ্রণ কার্য সমাধা করতে পাচ্ছেন না এবং প্রয়োজনানুরূপ অধিক সংখ্যক মুদ্রণের জন্য ফিল্ম সংগ্রহ করতে পাচ্ছেন না। এতে প্রতিষ্ঠানগুলিকেই শুধু আর্থিক ঝুকির সম্মুখীনই যে হতে হচ্ছে—তা নয়। তাঁদের সুনাম ও আন্তরিকতাও যথেষ্ট ভাবে ব্যাহত হচ্ছে জনসাধারণের কাছে। কারণ, অসাধু এবং ভুয়ো প্রযোজকদের সংখ্যা ইদানীং এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এরা একটা যৌথ প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে কয়েকশত টাকা ব্যয় করে একজন পরিচালক নির্বাচন করে কোনরকমে একটা মহরৎ করে দিয়েই—জনসাধারণের কাছ থেকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের অংশ বিক্রী করে ভাওতা দিয়ে কয়েক হাজার টাকা কামাই করেই গা ঢাকা দিচ্ছেন। ছবি করবার মনোবৃত্তি এদের অনেকের মাঝেই পরিলক্ষিত হয় না। এদের প্রবঞ্চনার ফাঁদে একাধিকবার পা দিয়ে জনসাধারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হ'য়েছে, মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'লেই যে ছবি হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এদের এই প্রবঞ্চনার বোঝা কুড়িয়ে নিতে হচ্ছে সেই সব প্রযোজকদের—যাঁরা সত্যই চিত্রজগতে আন্তরিকতা নিয়েই প্রবেশ করেছেন, অথচ ফিল্মের অভাবে কার্যকরী ক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে পাচ্ছেন না বলে, অপবাদের বোঝা কুড়িয়ে নিতে
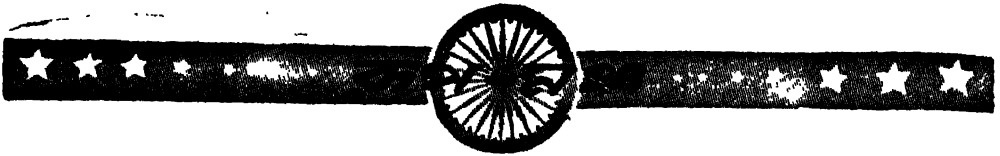
হচ্ছে। এত গেল প্রযোজকদের অবস্থা। শিল্পী ও কর্মীদের ঘাড়েও এর ঝুঁকি খানিকটা এসে পড়েছে। তাঁরা হয়ত চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে রইলেন—কিন্তু চিত্রের কাজ আরম্ভ না হবার দরুন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারলেন না। ফিল্মের অভাব এরই মাঝে শুধু এঁদেরই সামনে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করেনি—বলতে গেলে সমগ্র চিত্রশিল্পটিকেও পঙ্গু করতে উদ্যত হ'য়েছে।

অর্থনীতির চাহিদা এবং সরবরাহ (Demand and supply) উপপাদ্যের স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী—সরবরাহ কম এবং চাহিদা বেশী থাকার দরুণ সরবরাহের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দৌলতে যে চোরাকারবারে আমরা হাত পাকিয়ে নিয়েছি—চিত্র জগতেও তার দরজা দিন দিন প্রসারিত হ'য়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের পূর্বে কোডাক—আগফা, ডুপণ্ট, আন্‌স্‌কো প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের ফিল্ম বাজারে চালু ছিল। এদের ভিতর আগফা এবং কোডাক-কেই প্রথম শ্রেণীর ভিতর ফেলা যেতে পারে। আগফার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারক ছিল জার্মেণী। তিনটি বৃহৎ দেশের চাপে জার্মেণীর যে শোচনীয় অবস্থা হ'য়েছে, তাত দৈনিকের পাতা খুললেই আমরা বুঝতে পারি। আগফার ফ্যাক্টরীটি নাকি পড়েছে রাশিয়ার ভাগে আর তাদের সরবরাহ কেন্দ্রটি পড়েছে আমাদের প্রাক্তন প্রভুদের ভাগে। দু'ইয়ের ঠেলাঠেলিতে আগফাকে আর বহুদিন ভারতের মুখ দেখতে হয়নি। সম্প্রতি একটী খবর পেলাম, আগফা রাশিয়া মারফৎ নাকি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করবে। তবে তা কোন পর্যন্ত—তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ততদিন ভারতীয় চিত্রজগতের শুষ্ক ও আর্ত কণ্ঠ কোডাক বা ডুপণ্ট ভিজিয়ে রাখতে পারবে কিনা বলতে পারি না। যুদ্ধ এবং যুদ্ধ শেষ থেকে এদের পরই অবশ্য চিত্রজগতকে নির্ভর করে আসতে হচ্ছে। চিত্রজগতের চাহিদার অনু-পাতে সরবরাহ আশানুরূপ না থাকার দরুণই এদের নিয়ে কালোবাজার চরম রূপ লাভ করেছে। চাহিদার অনুপাতে সরবরাহ যদি কম থাকে—সরবরাহকারক সরাসরি জড়িত না থাকলেও সেই, সরবরাহ যে সব সুযোগ-সন্ধানীরা সংগ্রহ করতে পারবেন—যুদ্ধের দৌলতে সহজ পন্থার অর্থোপার্জনের নীতিটা প্রয়োগ না করে সংযমের পরিচয় দেবেন, এমন নির্ভুল বলেই চলে। ৬০৲।৬৫৲ টাকার রোল ১৩৫৲। ১৪০৲ থেকে ২৬০৲।২৬৫৲ তে সম্প্রতি উঠেছে বলে খবর পাচ্ছি। আমরা এদিকে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি। অবশ্য ইতিমধ্যেই খবর পেলাম, বাংলা সরকারের দুর্নীতি দমন বিভাগের তৎপরতার জন্য কোন অবাঙ্গালী ষ্টুডিও মালিক—কোন বাঙ্গালী চিত্রশিল্প বিশেষজ্ঞ, কোন বাঙ্গালী স্টুডিও মালিক ও প্রযোজক প্রভৃতি জড়িয়ে পড়েছেন। যদি কিছুদিন পূর্বে প্রাদেশিক সরকার তৎপর হ'য়ে উঠতেন, তবে, সমস্যাটা ইতিমধ্যেই অনেকটা আয়ত্তে আনা যেত। এবং এরাই যে একমাত্র অপরাধী, সরকার যেন তা মনে না করেন। কালো চশমা পরিহিত আরো বহু কালোবাজারী বর্তমানেও চিত্রজগতে বুক ফুলিয়ে চলা ফেরা কচ্ছে। আশা করি তাদেরও মুখোস খুলে দিতে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন। এবং এ বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার শুধু যে আমাদেরই সহযোগিতা আশা করতে পারেন, তা নয়, চিত্রজগতের বহু শুভানুধ্যায়ী ও সং ব্যবসায়ীদের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও আমরা দিতে পারি। কিছুদিন পূর্বে বাংলা চিত্রজগতের কোন খ্যাতিসম্পন্না অভিনেত্রী চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। চিত্র প্রযোজনা থেকে শেষ পর্যন্ত নিবৃত্ত থাকলেও তিনি তাঁর পূর্ব ঘোষিত চিত্রের জন্য প্রয়ো-জনানুরূপ ফিল্ম সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন এবং আমরা এসংবাদও পেয়েছি, ন্যায্য মূল্যে সংগৃহীত সেই ফিল্ম তিনি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন। কোন একটী বৈদেশিক ফিল্ম প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের জনৈক উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী কর্মচারীর অসাধুতার বিরুদ্ধে শুধু আমরা অভিযোগই শুনিনি, চিত্রজগতে তাকে কেন্দ্র করে সর্বজনবিদিত যে গোপন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি —তার প্রতি শুধু সরকারের দৃষ্টিই আকর্ষণ কচ্ছি না—উক্ত প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের উক্ত কর্মচারীকেও এ বিষয়ে সময় থাকতে অবহিত হ'তে বলছি। বর্তমান আলোচনায় উক্ত প্রতিষ্ঠান বা উক্ত কর্মচারীর নামোল্লেখ করে জনসাধারণের কাছে তাদের মুখোস খুলে দেওয়া থেকে
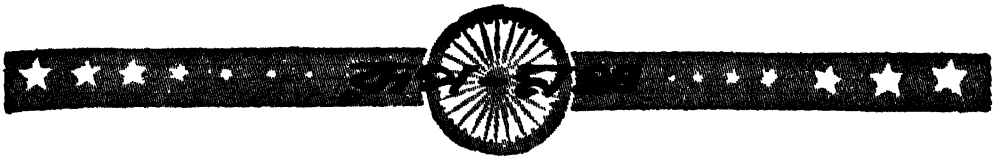
আমরা নিবৃত্ত হচ্ছি এই জন্য যে, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁরা সংশোধিত হয়ে উঠুন।

এখন কথা হচ্ছে, কালোবাজার থেকে এই সব কালোবাজারীদের আবিষ্কার করে তাদের কঠোর শাস্তি বিধান করলেই কী এই সব দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাবে? তা যাবে না, একথা আমরা যেমন জানি—সরকারও তেমনি জানেন। তাহলে চাল,ডাল,কাপড় বা অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে সরকারী কড়াকড়ি বর্তমান, সেসব ক্ষেত্রে কালোবাজারীরা একদম নিশ্চিহ্ন হ'য়েই যেতো। কিন্তু তাত যায় নি—বরং তারা পূর্বের মতই বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করছে। কালোবাজার যদি বন্ধই করতে হয়,তবে সরবরাহের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। চাহিদা এবং সরবরাহের যদি সমতা থাকে তবে মূল্যেও সমতা রক্ষিত হবে। শুধু কাঁচা ফিল্মের সময়ই নয়—সর্ব সময়ে সর্বক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। 'হার্ড-কারেন্সি'র (Hard Currency) দোহাই দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার—যতদিন না আমাদের দেশে কাঁচা ফিল্ম তৈরী হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কাঁচা ফিল্ম আমদানীর পরিমাণ হ্রাস করতে পারেন না। কাঁচা ফিল্মকে বিলাস-ব্যসনের সামগ্রীর মধ্যে ধরলে চলবে না—তাকে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির তালিকাভুক্ত করতে হবে। যে তালিকার ভিতর যন্ত্রপাতি—কাগজপত্র—পুস্তকাদি—ওষুধপত্র—বেতার যন্ত্রাদি প্রভৃতি স্থান পাবে। যেগুলির সত্যই আমাদের অভাব রয়েছে অথচ নিজেদের দেশে প্রস্তুত হচ্ছে না—যতদিন না আমরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠি—ততদিন সেগুলি বিদেশ থেকে আমদানী করতেই হবে। এবং এজন্য জাতীয় সম্পদ ভাণ্ডারকে ঝুঁকি গ্রহণ করা ছাড়া কী উপায় আছে! এগুলির জন্য বেশী অর্থ বিনিয়োগ করে প্রসাধন সামগ্রী—বস্ত্রাদি—ও অন্যান্য বিলাস ব্যসনের উপকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়াই হবে যুক্তি সংগত। কারণ, ওগুলিতে আমরা তবু খানিকটা স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠেছি। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, যে কোন একটি দোকান হাতরালে দেশী প্রসাধন সামগ্রী ও আনুষাংগিকের পরিমাণ থেকে বিদেশীয় দ্রব্যাদিই নজরে পড়ে বেশী। হার্ড কারেন্সীর দোহাই দিয়ে যদি কেন্দ্রীয় সরকার কাঁচা ফিল্ম আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না করেন, তবে সেই পরিমাণকে সমভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। এবং যাতে এই কাঁচা ফিল্ম নিয়ে কালোবাজার না চলতে পারে—সেজন্য কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান করলেই চলবে না—কতকগুলি নিয়ম কানুন বেধে দিতে হবে। যেমন: (১) কোন পূর্ণাংগ ছবির দৈর্ঘ্য বাধ্যতামূলক ভাবে ১১,০০০ ফিটে বেঁধে দেওয়া। (২) প্রতি ছবির উর্ধ্বতম মুদ্রণ সংখ্যা নির্ধারণ। (৩) ব্যক্তিগত বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূলক খণ্ডচিত্র নির্মাণ—কাঁচা ফিল্মের আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হবে। কোন চিত্রের ট্রেইলারকেও এরই গণ্ডির ভিতর ফেলছি এবং বৈদেশিক চিত্রগুলিও যাতে তাদের আগতপ্রায় চিত্রের ট্রেইলার না দেখাতে পারে, তাও নিষিদ্ধ করে দিতে হবে। (৪) আমদানীকৃত কাঁচা ফিল্ম বণ্টনের জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিটি গড়ে তুলতে হবে। এই কমিটিতে থাকবেন সরকারী প্রতিনিধি—চিত্র জগতের প্রতিনিধি—একজন বিশেষজ্ঞ—একজন চলচ্চিত্র সাংবাদিক—একজন ষ্টুডিও মালিক। এঁদের পরামর্শ এবং সুপারিশ অনুযায়ী কাঁচা ফিল্ম আমদানীকারক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে প্রযোজকদের ভিতর কাঁচা ফিল্ম বণ্টন করতে হবে। (৫) কাঁচা ফিল্ম আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রতি তিন মাস অন্তর সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের কাছে হিসাব দাখিল করতে হবে। এই হিসাবে থাকবে মজুত মালের পরিমাণ, তিন মাসে আমদানীকৃত মালের পরিমাণ এবং বণ্টিত মালের পরিমাণ। (৬) যে নিরপেক্ষ বণ্টন কমিটির কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে—কোন প্রতিষ্ঠান যখনই কোন চিত্র নির্মাণের মনস্থ করবেন, তখন সরবরাহকারক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মারফৎ উক্ত কমিটির কাছে প্রয়োজনানুরূপ কাঁচা ফিল্মের জন্য তাঁদের আবেদন করতে হবে। এই আবেদনগুলি পর পর ক্রমিক সংখ্যা দিয়ে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নিরপেক্ষ কমিটির কাছে তুলে ধরবেন। কমিটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানদত্ত হিসাবে কাঁচা ফিল্মের পরিমাণ দেখে—যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে মনে করবেন—ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলির মারফৎ
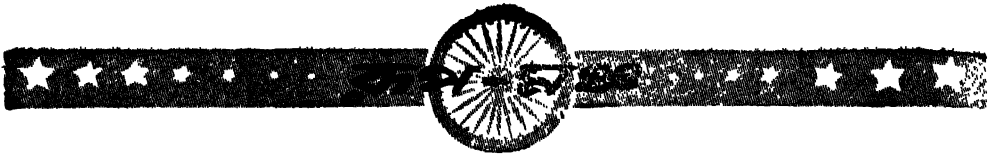
তাঁদের জানিয়ে দেবেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান চিত্র নির্মাণের জন্ম প্রস্তুত আছেন কিনা তাও জানতে চাইবেন। এই 'প্রস্তুত' কথাটির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রস্তুত আছি বল্লেই যে প্রতিষ্ঠানগুলি কাঁচা ফিল্ম পাবেন, তা নয়। যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি—নিয়ন্ত্রণাদেশ বলবৎ থাকার দরুণ অনেক চিত্র প্রতিষ্ঠান নিজ প্রাপ্য 'কোটা' আদায় করে অপরের কাছে বিক্রী করেছেন। এক দুর্নীতি বন্ধ করতে যেয়ে আর এক দুর্নীতি যাতে দেখা না দেয়, সে ব্যবস্থা পূর্বে থেকেই করে নিতে হবে। তাই 'প্রস্তুত থাকা' অর্থে চিত্র নির্মাণেচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলিকে কমিটির কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, তাঁরা চিত্র নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেলেছেন। এবং একখানি চিত্র নির্মাণে যে পরিমাণ খরচ হ'তে পারে, তার অন্ততঃ অর্ধেক অর্থের সংস্থান তাঁদের আছে এবং এর নিশ্চিত প্রমাণ যাঁরা কমিটির কাছে দিতে পারবেন না, তাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য করে পরবর্তী কাউকে অনুমোদন করতে হবে। (৭) এই ভাবে কমিটি কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানকে যখন কাঁচা ফিল্ম সরবরাহ করবার জন্য অনুমোদন করবেন, তখনই ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কমিটি প্রদত্ত অনুমোদন পত্র দেখে কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানের কাছে কাঁচা ফিল্ম বিক্রয় করতে পারবেন। এবং এই অনুমোদন পত্রের ভিতর প্রয়োজনানুরূপ পজেটিভ ও নেগেটিভ দুইয়েরই উল্লেখ থাকবে। (৮) ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তখনই একসংগে সমস্ত মাল কোন চিত্র প্রতিষ্ঠানকে বিক্রয় করতে পারবেন না। কেবলমাত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিষ্ঠানকে এক প্রতিশ্রুতি পত্র লিখে দেবেন—। সেই প্রতিশ্রুতি পত্র দেখিয়ে চিত্র প্রতিষ্ঠান সুযোগ ও সুবিধামত স্থানীয় কোন প্রয়োগশালার সংগে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে ছবির মহরৎ করতে পারবেন এবং চিত্রগ্রহণ কার্য সুরু হ'লে প্রয়োজনানুরূপ ফিল্ম ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে থাকবেন এবং কোনদিন কতখানি ফিল্ম ব্যয়িত হ'লো না হ'লো, তারও হিসাব বণ্টনকারী কমিটির জ্ঞাতার্থে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে দাখিল করবেন। এই প্রসংগে আর একটি কথা বলবার প্রয়োজন। কাঁচা ফিল্ম বণ্টনে ষ্টুডিও মালিকের প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব দেখান চলবে না। ষ্টুডিও মালিকেরা ষ্টুডিওর আনুসংগিক ব্যাপারে যতটুকু প্রয়োজন, কেবলমাত্র ততটুকু কাঁচা ফিল্মই পেতে পারবেন। তাঁদের যদি কাঁচা ফিল্ম বণ্টন করতে হয়, তাহলে প্রযোজক হিসাবে আবেদন করলেই—নচেৎ নয়। এবং কোন চিত্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখনই তাঁরা ফিল্ম সংগ্রহ করবেন, তার বিনিময়ে তাঁদের চিত্র প্রস্তুত করবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। ষ্টুডিও মালিকদের ফিল্মের আবেদনকে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করবার ন্যায় সংগত কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না এই জন্ম যে, আমাদের বেশীরভাগ প্রযোজক, বিশেষ করে বাংলা দেশের প্রযোজকেরা ভাড়া ষ্টুডিওতেই কাজ করেন। তাই, মুষ্টিমেয় ষ্টুডিও মালিকদের তাঁরা মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকুন, তা আমরা চাই না সমষ্টির স্বার্থের কথা চিন্তা করে মুষ্টিমেয়র অভিভাবকত্ব অস্বীকার করাই ন্যায় ও যুক্তিসংগত। বর্তমান আলোচনার পরিসমাপ্তি এখানেই টেনে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং চিত্র ব্যবসায়ীদের মতামতের জন্ম আমরা অপেক্ষা করে রইলাম। —কালীশ মুখোপাধ্যায়

আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি

(উপন্যাস)

কালীশ মুখোপাধ্যায়

●

[এক]

আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি। তিরিশ বছর পূর্বে বসন্তের কলকাকলি মুখরিত ফাল্গুনের এক গোধূলী লগ্নে প্রথম বার বুকে আমি আলো বাতাসের স্পর্শ অনুভব করেছিলাম। আর আজ—আজও ফাল্গুনের আর এক গোধূলি সন্ধ্যায় আমার সেই মাটির মায়ের স্পর্শে সর্বদেহ আমার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো। আমার গলার কিট্‌ব্যাগ আর হাতের ছোট স্যুটকেসটা নামিয়ে আমি নতজানু হ'য়ে তার ভূমিকে চুম্বন করলাম। শীতের কুয়াসা বসন্তের মায়া কাটিয়ে যাই-যাই করেও যেতে পাচ্ছে না—মায়ের আশীর্বাদরূপে বিন্দু বিন্দু বারিকণা আমার মাথায় ঝ'রে পড়তে লাগলো। কে বলে আমার মাটির মা মূক! দীর্ঘদিনের বিরহে কাতর তার অভিমানরুদ্ধ হৃদয়ের স্পন্দন মুহূর্তের মাঝে আমার অভিভূত করে ফেল্‌লো। স্তব্ধ মূঢ়ের মত অপরাধী মন নিয়ে আমি ধূসর শ্যামলীমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। অপরাধী সন্তানের মুমূর্ষ-কাতর ম্লানমুখ আমার মাটির মাকেও বিচলিত না করে পারলোনা। তার অভিমান মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'লো। ব্যাকুল আগ্রহে আমায় বরণ করে নেবার জন্য ঘরে ঘরে মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো—গৃহে গৃহে জ্বলে উঠলো পবিত্র দীপমালা। স্তিমিত সন্ধ্যালোকে অপূর্ব পুলকে আমার হৃদয় স্পন্দিত হ'য়ে উঠলো—এই স্পন্দনকে নিজের ভাষায় রূপ দিয়ে আমি ব্যক্ত করতে পারবো না · যদি বলতে হয়, কবিগুরুর ভাষাতেই বলি: "হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরেরমত নাচে"। দু'তিন ক্রোশ মেঠো রাস্তা পায়ে হেটে এসে ক্লান্তিতে আমি ভেংগে পড়েছিলাম। মুহূর্তে কোথায় গেল আমার সেই ক্লান্তি ও অবসাদ! কিটব্যাগটা আবার ঘাড়ে ঝুলিয়ে নিলাম—স্যুটকেসটা বদ্ধ-মুষ্টিতে ধ'রে দীপ্ত পদে আমি গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম।

উত্তর দক্ষিণ দিকে সমান্তরাল রেখায় অবস্থিত আমার এই ছোট্ট গ্রামখানি। পূর্বদিকে তার বিরাট শস্য-শ্যামল মাঠ। আর গাঁয়ের কোল ঘেঁসেই উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মেঠো রাস্তা। রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'তে কত ছবিই না চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো! কোদাল হাতে করে আমরাই একদিন এই রাস্তা বেঁধে তুলেছিলাম। কোদালীর সেই ঠুংঠাং শব্দ—কর্মব্যস্ত আমাদের হৈ-চৈ—দাগা'দা—বড়কাকার সেই নির্দেশ: "জল্‌দি হাত চালিয়ে, আজকের ভিতর এই জায়গাটা বেঁধে তোলা চাই!" আমায় পাগলা করে তুললো। মাথাটা একটু নাড়া দিয়ে মন থেকে সমস্ত চিন্তার বোঝা দূর ক'রে আমি পা চালিয়ে চল্‌তে লাগলাম। হ্যাঁ, ঐত' আমাদের পুকুরপাড়ের আকাশচুম্বী তালগাছটা অস্পষ্ট রেখায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মাথায় দোদুল্যমান বাবুই পাখীর বাসাগুলি আজো আছে কিনা কে জানে! একজোড়া বুড়ো শকুন-শকুনীর সংগে আমাদের কতই না অন্তরংগতা জন্মে উঠেছিল! কখন তারা এসে তালগাছটার মাথায় ব'সতো, কখন মরার খোঁজে কোথায় বেরিয়ে যেত, সবই আমাদের একদিন জানা ছিল। ওরাও আমাদের চিনে রেখেছিল ভাল ক'রে। বিকেলবেলাটা ওদের উদ্দেশ্য ক'রে আমরা ঢিল ছুঁড়তাম—সে ঢিল মাঝপথ থেকেই ফিরে আসতো। কোনদিন তালগাছের মাথায়ও পৌছুতে পারেনি—তবু ওরা ডানা ঝাপ্‌টা দিয়ে আমাদের কৌতুকে সাড়া না দিয়ে পারতো না। চকিতে মনে পড়ে গেল কুল গাছটার কথা। তালগাছটার গা ঘেঁসেই সেটা বেড়ে উঠেছিল। ওর ডাল ভেংগে যখন কুল ধরতো—কুলগুলি পাকবারও ধৈর্য সইতো না আমাদের। ডাল বেয়ে বেয়ে—ডালের পাতা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে কুল পাড়তাম। গাছের উপরে উঠে নাগালে যেগুলিকে ধরতে পারতাম না—গাছের নীচে দাঁড়িয়ে 'কোটা' দিয়ে সেগুলিকে নাগালে আনতাম। দস্যুর মত এমনি ভাবে গাছটার
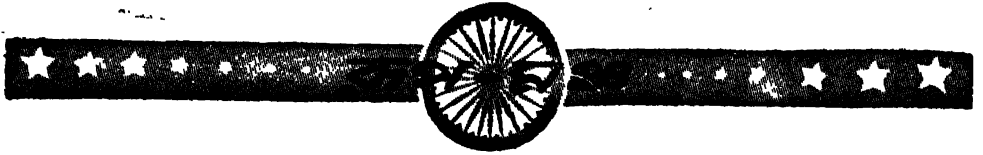
সমস্ত সম্পদ অপহরণ ক'রে তাকে নিঃস্ব ক'রে দিতাম। আমাদের কত জনের কত জ্বালাতনই না সহ্য ক'রতে হ'তো গাছটাকে! কুলের সন্ধানে ওর পাতাগুলি অবধি নেড়া করে দিতাম।

পথ চল্‌তে চল্‌তে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলাম। রাস্তার উঁচু-নীচু মাটিতে হোঁচট্ খেয়ে পড়লাম—হাত থেকে স্যুটকেসটা ছিটকে দূরে পড়ে গেল। পায়ে ব্যথাও পেলাম খানিকটা। নীচু হ'য়ে পা'টায় হাত বুলিয়ে নিচ্ছিলাম। পাশের ক্ষেত থেকে কার কণ্ঠস্বর কানে এলো: "বাবু দেইখ্যা পত্ চইল্‌বেন। লাগ্‌ছে বুঝি! ঠাহর যান, পানি আইনা দি।" লোকটি পাশের জমির আল্ বেয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।.........

আমি তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম: "না, জল আনতে হবে না। লাগেনি বেশী"।

লোকটী উত্তর দিল: "গরুর পাড়ায় পত আর ভাল থাকপার পার্‌ছি না। কইল্‌কাতার থন আইছেন বুঝি?"

আমি 'হ্যাঁ' ব'লে—গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে স্যুটকেসটা খুঁজতে লাগলাম। রাস্তার ধারে খাদের কাছে সেটা প'ড়ে রয়েছে। লোকটিই স্যুটকেসটা তুলে এনে আমার হাতে দিল। আমায় জিজ্ঞাসা করলো: "কোন্ বাড়ী যাবান?"

"বাড়ুয্যে বাড়ী!"

"ঐত' বাড়ী—" লোকটি তালগাছটি দেখিয়ে দিল। আমি ওর নির্দেশটা মেনে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: "তোমার বাড়ীও বুঝি এই গাঁয়ে?"

"জী! ওই খাল ধার আমাগো বাড়ী।"

"কী নাম তোমার?"

"আয়নদ্দিন—"

নামটা শুনে একটু চম্‌কে উঠ্‌লাম। খুব পরিচিত নাম। অস্পষ্ট আলোয় প্রথমটায় চেনা না গেলেও, বুঝতে পারলাম, আমাদের সহপাঠি আইনদ্দিনই বটে। ওকে কিছু না বলে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার আমি পথ চল্‌তে লাগলাম। পথ চলতে চলতে দু'তিনটি লোক পাশ কাটিয়ে চলে গেল। চিন্‌তে পারলাম না তাদের। গাঙ্গুলী বাড়ীর পুকুর পাড় পেরিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের পুকুর পাড়ে এসে উঠলাম। এই জায়গাটায় নিত্য পাগলা উপেনদা'কে ঘিরে আমাদের আড্ডা বসতো। আমাদের জন্য এখানকার মাটিতে কোনদিন দূর্বা ঘাস গজাতে পারেনি—আর আজ সেখানে শুধু দূর্বাই নয়—নানান্ জাতীয় ঘাস আমার হাঁটু অবধি গজিয়ে উঠেছে। তার ভিতর দিয়ে বকুলতলায় এলাম। এখানে ব'সতো বড়দের আড্ডা। আজ আর যে কারোর আড্ডাই বসে না, সেকথা বুঝতে একটুকুও বিলম্ব হ'লনা। অসম্ভব নির্জনতা অনুভব করলাম। বাড়ীতে লোকজন বেশী ছিল না—তা জানতাম, কিন্তু এতটা নির্জনতার মাঝে আমায় প'ড়তে হবে তা ভাবতেও পারিনি। কোন-দিনই ত' এই সময়টায় আমাদের বাড়ীতে লোকজন বেশী থাকতো না—কিন্তু তবু পাড়া প্রতিবেশীদের আনাগোনায় বাড়ীর জমজমাট ভাবে কোন দিন ভাটা পড়েনি। এক-দিন যে শস্যশ্যামলা উর্বর গ্রাম শত শত গ্রামবাসীর সারা বছর ধ'রে অন্ন জুগিয়ে এসেছে—আজ কী তার সে উৎপাদন শক্তি নেই!

কাছারী বাড়ী পেরিয়ে মণ্ডপ ঘরের কাছে আসতেই অতি পুরোন অভ্যাসবশত: জুতো খুলে মণ্ডপ ঘরে প্রণাম করলাম। না, ঘরের ভেতর কে যেন পূজোর আসনে বসে আছেন বলে মনে হ'লো। হয়ত ঠাকুরের বৈকালী হচ্ছে। মনটা একটু আশ্বস্ত হ'লো। পিতৃ-পুরুষের গৃহদেবতা তাহ'লে প্রতিদিন নিয়মিত পূজো পাচ্ছেন। পূজো করবার মত লোক তাহ'লে আজও গাঁয়ে আছে। আমি অন্দর মহলে প্রবেশ করলাম। আমাকে দেখেই যেন একটি ছায়ামূর্তি বেড়ার আড়ালে সরে গেল। যে বাড়ীতে একদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম—যেখানে কেটেছে আমার আশৈশব কৈশোরের দিনগুলি—যৌবনের প্রথম প্রভাতেও যেখানে দাঁড়িয়ে প্রভাত-সূর্যের সংগে কত-দিনই না মুখোমুখী হ'য়েছে— আজ কয়েক বছরের ব্যবধানে সেখানে আমাকে সম্পূর্ণ অপরিচিতের মতই প্রবেশ ক'রতে হ'চ্ছে। এর চেয়ে বিচিত্র—এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি আছে! অন্দর প্রাংগনে এসে আমি হাঁক দিলাম:, "বড়দি, ও বড়দি!"
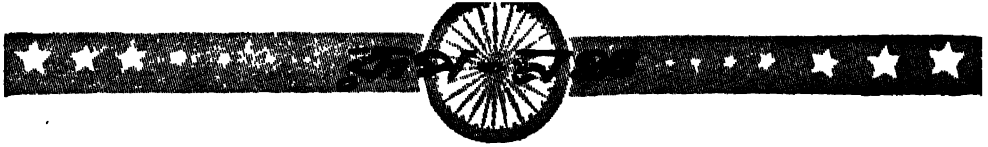
"কেডা—কেডারে" ব'লে পাশের ঘর থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে চিনতে আমার কষ্ট হ'ল না। তিনি আমার ছোট ঠাকুমা। তিনি উঠোনে নেমে এলেন। আমি প্রণাম ক'রে মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বল্লাম: "কী ঠাকুমা, চিনতে পারলে না?"

ঠাকুমা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অসহায়ের মত উত্তর দিলেন: "না বাবা, চোহেও দেহি না—কানেও ভাল হুনি না।"

আমি উত্তর দিলাম: "আমি—আমি তোমাদের পার্থ-সারথী - তোমার ননীচোরা।"

ঠাকুমার এবার চিনতে আর অসুবিধা হ'ল না! তিনি মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সখেদে বল্‌তে লাগলেন: "দ্যাখ আপ্‌নার জন্‌রেও চিনত্যা পারলাম না। পোড়া কপাল! দাদা আমার কত বড় অইছে"—

ধীরে ধীরে বড়দি এসে পাশে দাঁড়ালেন। বল্লেন: ও হরি, তুই! আমিত' চিনতাই পারি নাই।"

বড়দিদিকে প্রণাম করতে করতে বল্লাম: "ও—তুমিই বুঝি চিনতে না পেরে আড়ালে সরে গিয়েছিলে!"

ছোট ঠাকুমা বড়দিকে তিরস্কার ক'রে বল্লেন: "আমার যেন চোক নাই--তুই চিনতে পারলি না ক্যান?"

বড়দি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন: "ও বদলাইয়্যা গ্যাছে কত?"

বড়দি মিছে বলেন নি। সত্যি, আমার চেহারার পরিবর্তনও হ'য়েছে অনেকখানি। সাত-আট বছর পূর্বে বাড়ীতে এসেছিলাম একবার মায়ের অসুখের সংবাদে - পুলিশ পাহারায়। তারপর এই প্রথম এলাম। এই সাত আট বছরের ব্যবধানে—দেশের রূপ যেমনি দিন দিন পাল্‌টে গেছে, তেমনি আমার দেহ এবং মনেও তার ছাপ পড়েছে অনেকখানি। তাই বড়দির আর দোষ কী! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলার পর বড়দি আমার ঘাড়ের কিটব্যাগটা হাতে নিয়ে বল্লেন: "চল্‌, ঘরে চল্‌। কতটা রাস্তা বোঝা নিয়া হাঁইট্যা আইছিস্‌—জিড়াইয়া নে, তারপর কথা কইস্‌।"

আমি বড়দিকে অনুসরণ করে ঘরে যেয়ে ব'সলাম। ছোট ঠাকুমাও এলেন। আমি খাটের উপর বসতেই দশ বারো বছরের একটি ছেলে উপুড় হ'য়ে পায়ের ওপর প'ড়লো। বড়দির দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন: "রাঙ্গা কাকার ছাওয়াল পিণ্টু।"

"ও"—ব'লে আমি এক গভীর দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম—মনের ভিতরটা যেন দুমড়ে নিল। রাঙ্গাকাকা ছোট ঠাকুমার বড় ছেলে। বছর কয়েক হ'লো যক্ষ্মারোগে মারা গেছেন। কী টান্‌টাই না ছিল তাঁর সংসারের ওপর! কল্‌কাতায় কাজ ক'রতেন এটর্ণি অফিসে। সামান্য টাকার চাকরী। দু'বেলা ছাত্র পড়িয়ে কোন রকমে সংসার চালাতেন তিনি। তিলে তিলে সংসারের জন্য বিলিয়ে দিলেন নিজেকে। শেষে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হ'য়ে বিনা চিকিৎসায়—বিনা পথ্যে মারা যান। এই গ্রামকে—এই গ্রামের মাটিকে তিনি এতই ভাল-বেসেছিলেন যে, এরই মাটিতে মিশে যেতে পেরেছেন, মরবার সময় এই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড় ও একমাত্র সান্ত্বনা। পিণ্টু তাঁরই বড় ছেলে। ওকে ছোটবেলায় দেখেছি—ছোট বেলায় দিব্যি ফুটফুটে টুক্‌টুকে ছিল—আর আমরা ওকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে বেড়াতাম। রাঙ্গা কাকার চিন্তায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম। কী যেন বলতেও যাচ্ছিলাম বড়দিকে। ছোট ঠাকুমা সামনে বসে আছেন। তাঁর কথা মনে হ'তেই নিজেকে সামলে নিয়ে—পিণ্টুকে কাছে ডেকে আদর করে বল্লাম: "ব'স দাদু, আমার কাছে এগিয়ে এসে ব'স। আমার কথা তুমি ভুলেই গেছো—কেমন?"

পিণ্টু মাথা নেড়ে অস্বীকার করে। ছোট ঠাকুমা সায় দিয়ে বলেন: "ও তো তোর কতো গল্প কইর্‌য়া বেড়ায়।" পিণ্টুকে আরো আমি কোলের কাছে টেনে নিলাম। আমার কথা ওর মনে থাকবার কথা নয়, কিন্তু ও হয়ত গল্প শুনে শুনেই আমার একটা রূপ কল্পনা ক'রে নিয়েছিল। এমনি ভাবে ওর বয়সের সময় আমরাও অনেককে মনের মাঝে কল্পনা করে নিতাম। পিণ্টুর ভিতর নিজের এই সাদৃশ্যে আমার আরো ভাল লাগলো ওকে। ওর চেহারায় ছোটবেলার সে লালিত্য নেই, বরং অস্বাভাবিক রুক্ষতারই ছাপ পড়েছে। তবু ওর ম্লান মুখখানি আমার
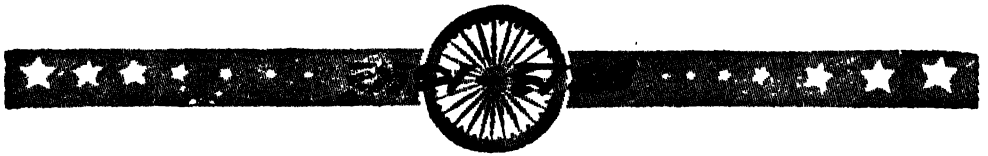
সহানুভূতি আকর্ষণ না করে পারলো না। ও কোন শ্রেণীতে পড়ে—পরীক্ষায় কোন বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারে কিনা—স্কুলে কতজন শিক্ষক আছেন—পুরোন কে কে রয়েছেন—নতুনদের কে কে ভাল পড়ান—অনেক কিছুই ওকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। ওর জড়তা ধীরে ধীরে কেটে যেতে লাগলো। বেশ সপ্রতিভ হ'য়ে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যেই।

গাঁয়ে কোন্ বাড়ী কে কে আছেন না আছেন, আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বড়দি ও ছোট ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। পাশের বাড়ী থেকে দু'চার জন বৌদি-দিদিস্থানীয় কয়েকজন এসে পড়লেন খবর পেয়ে। তাঁদের প্রণাম করে দাদুকে নিয়ে পাড়াটা একবার টহল দিতে চাইলাম। বড়দি বাধা দিয়ে বল্লেন: "শ্রান্ত হইয়্যা আইছিস্, হাত পাও ধুইয়া কিছু মুখে দিয়া নে। আমি আহা ধরাইয়া চাইট্যা ভাতে-ভাত রান্না কইর্যা দি!"

বহুদিন থেকেই সারাদিনের পর রাত্রেই শুধু ভাত খাবার অভ্যাস আমার পেয়ে বসেছিল। ভাতের কথা শুনতেই মনটা ভাতমুখো হ'য়ে উঠলো। পেটেও ক্ষিদের জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। তাই বড়দির কথায় সায় না দিয়ে পারলাম না। কিটব্যাগ থেকে তোয়ালেটা বের করলাম—বের করলাম টর্স লাইটটা। স্যুটকেসটা খুলে কাগজে মোড়া স্লিপারটা বের করে হাতে নিয়ে আবার রেখে দিয়ে বড়দিকে বল্লাম: "ঘরে খড়ম আছে বড়দি!"

বড়দি বল্লেন: "থাকপে না ক্যান? কিন্তু পারবি কী আর খড়ম পায় দিত্যে? কদ্দিন খড়ম পায় দিস না!"

কথাটা বড়দি মিথ্যা বলেননি। তবু খড়মের জন্ম মনটা উস্‌খুস্ করে উঠলো। আমি জিদ ধ'রে বল্লাম: "দাওনা তুমি, এতদিনের অভ্যাস কী কয়েক বছরেই ভুলে যাবো!"

বড়দি খাটের নীচ থেকে সযত্নে রক্ষিত একজোড়া খড়ম আমায় এনে দিলেন। খড়ম জোড়া চিনতেও আমার কষ্ট হ'ল না। আমাদের পদচিহ্ন গভীর ভাবে ওর বুকে এঁকে রয়েছে। বড়দিকে বল্লাম: তুমি ত সোজা লোক নও! এতদিনের খড়ম রেখেছও তো যত্ন করে!"

বড়দি উত্তর দিলেন: "কী করবো—ফেইল্যা দিলে লাভ কী অইত! রাখছিলাম বইল্যা তো তোরে দিতে পারলাম!"

বড়দির প্রতি শ্রদ্ধায় মনটা আমার ভরে উঠলো। অথচ ছোটবেলায় বড়দিকে আমার মোটেই ভাল লাগতো না। রাতদিন তাঁর সংগে ঝগড়া বেধেই থাকতো যে সব বিষয় নিয়ে, তার ভিতর এও একটি। যে কোন জিনিষ বড়দি পোটলা করে রাখতেন—আর আমি তা নষ্ট করে দিতাম। অমনি লেগে যেত বিবাদ। ঠিক যেন পিঠে পীঠির মত। অথচ বড়দি আমার চেয়ে অন্ততঃ পনের ষোল বছরের বড়। আমার বাপ-মায়ের তিনিই প্রথম সন্তান। বহু পরিচিত বহু-দিনের স্মৃতি বিজড়িত খড়ম জোড়া পেয়ে মনটা আমার খুশীতে ভ'রে উঠেছিল। বারান্দায় নামতে নামতে আমি একবার বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। নিষ্প্রাণ কঠিন কাষ্ঠখণ্ড দু'টির হৃদয়ের স্পন্দনও যেন অনুভব করলাম!

বারান্দায় নামতেই বড়দি হাঁক দিলেন: "ওখানেই দাঁড়া। আমি জল আইন্যা দিতেছি। রাত কইর্যা ঘাটে যাইতে অবে না।"

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। বড়দি জল এনে হাজির করে বল্লেন: "ঘাটও তো ঠিক নাই। কাইল দিনের বেলা দেখপি বাড়ীর কী অবস্থা!"

বাড়ীর কী অবস্থা হ'তে পারে, তা আমিও খানিকটা অনুমান করে নিতে পেরেছিলাম। ছোট জলচৌকীতে বসে আমি চোখে মুখে জল দিয়ে হাত পা ধুয়ে নিতে লাগলাম। অদূরে টালির ঘরটার পেছনের নারকেল গাছটার দিকে দৃষ্টি পড়ল! জ্যোৎস্নার আলো যেয়ে পড়েছে সেখানে। সেই আলোতে দেখতে পেলাম, গাছটায় কান্দি কান্দি নারকেলও ঝুলে রয়েছে।

আমার হাত পা ধোয়া হ'য়ে যেতেই ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। খড়মের আওয়াজ শুনে পাশের ঘর থেকে বড়দি হাক দিলেন: পার্থ, এই ঘরে আয়, তোর বিছানা করছি—"

আমি পাশের ঘরে গেলাম। এরই মধ্যে বড়দি বিছানা করে ফেলেছেন। বড়দি বল্লেন: তুই একটু জল খাইয়া গড়া-গড়ি দিয়ানে—আমি ভাত রাইনধা আনি।" আমি খাটের ওপর উঠে বসলাম। ছোট টেবিলটার ওপর বড়দি বাটিতে
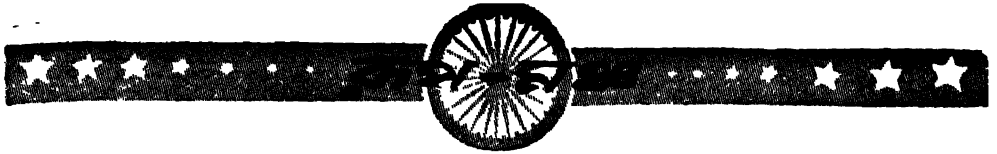
করে নাড়ু, মোয়া ও গ্লাসে করে জল রেখে চলে গেলেন। একটু বাদেই আবার ঘুরে এসে আমার বালিসের কাছে কয়েকখানা বই রেখে বল্লেন : খাইয়া বই পড়—আমি যাই। যদি কিছু লাগে, ডাকিস। আমি রান্না ঘরে আছি। ভূত-নাথটা কোথায় যাত্রা শোনতে গেছে—পোলাপান।” মোষাতে কামর দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম : “ভুতনাথ কে?”

“বাড়ীর কাম করে—রাখাল ছাওয়ালটা” ‘ও’ বলে আমি আবার কাজে লিপ্ত হ’য়ে গেলাম। বড়দি চলে গেলেন। জলযোগ পর্ব শেষ করে শুয়ে পড়ে বইগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে লাগলাম। একসময় যে বইগুলিই অবসর সময়ে পড়তাম, বড়দি সেই বইগুলিই বেছে বেছে দিয়ে গেছেন। এর ভিতর থেকে পেলাম কবিগুরুর চয়নিকা—নজরুলের কয়েকটি বড় বড় কবিতার বই—চণ্ডীদাস বিদ্যা-পতি সংগ্রহ -শকুন্তলা—শঙ্করাচার্যের শ্লোকসমষ্টি—নাটকও পেলাম কয়েকখানা। প্রথমেই বাধানো মলাট উলটে যেতে নজরে পড়লো দ্বিজেন্দ্রলালের ‘চন্দ্রগুপ্ত’। কতদিন যে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে আবৃত্তি করে গেছি—“সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ”—“ঐ বদ্ধস্তূপের ওপর ধূয়ার কুণ্ডলী উঠছে”—“যেদিন সুনীল জলধি হইতে”—আবৃত্ত করতে করতে কত দিন যে চোখের পাতা জলে ভিজে উঠেছে, তার ইয়ত্তা নেই। আজন্ম কৈশোর থেকে যে মাতৃমূর্তির ধ্যান করে আসছিলাম—১৯৪৭-এর আগষ্টে বাস্তব রাজনীতির নির্মম আঘাতে মায়ের যে কল্পনা-মূর্তি ভেংগে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে—কবির ভাষায় যে রূপ বদ্ধ হ’য়ে আছে—তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার মায়ের সেই বিচ্ছিন্ন রূপকে কল্পনায় ধরতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। সমস্ত চেষ্টাই আমার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ’লো। বই গুলি রেখে দিলাম। শিয়রের জানলাটা দিলাম খুলে। চাঁদের আলো এসে বিছানাটায় লুটোপুটি খেতে লাগলো—সেই সংগে বসন্তের সিক্ত ঝির ঝিরে হাওয়াও খানিকটা ঢুকে পড়লো। লেপটাকে গায়ের ওপর টেনে দিলাম। হারিকেনের আলোটা অসহ্য মনে হ’তে লাগলো। ওর শিখাটা একটু কমিয়ে খাটের নিচে রেখে দিলাম। আধো আলো—আধো অন্ধকারে ঘরের প্রতিটি জিনিষ যেন স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম। এই ঘরটাতেই আমি আশৈশব কাটি-য়েছি। খাটটায় হাত বুলিয়ে অনুভব করে নিলাম—হ্যাঁ, সেই পুরোন খাটটাই—মায়ের সংগে এরই ওপর আমার শৈশব ও কৈশোরের দিন কেটেছে। ঘরটার বাইরের রূপ পালটে গেলেও, ভিতরের সব ঠিক তেমনি আগের মতই আছে।

আমার পিতামহ স্বর্গতঃ কৈলাস বাড়ুজ্জে এই ঘরটা প্রথম তুলেছিলেন—এর আকাশচুম্বী টিনের চোঙ দূর গ্রামগ্রামান্তর থেকে দেখা যেত। পূর্বে ঘরটাকে দেখাতো বিরাট ষ্টীমারের মত। বিভিন্ন কুঠরী করা হ’য়েছিল। তার এক এক কুঠরীতে আমরা থাকতাম। পরবর্তী কালে আমার ছোটকাকা এই ঘরটাকে নিচু করে ভেংগে তৈরী করেন। তবে কাঠামোটি ছিল ঠিক একই রকমের—তার সাজসরঞ্জামও কিছু বদলাতে হয় নি। ঠাকুরদা অনেক দিন পূর্বেই মারা যান। আমরা তাঁকে দেখিওনি। এমনকী আমার ছোট কাকাই নাকি তখন চার-পাঁচ মাসের শিশু। ঠাকুরদার বাবা অর্থাৎ আমার প্রপিতামহ স্বর্গতঃ ইন্দ্রনাথ বাড়ুজ্যের নামেই আমাদের গ্রামের নাম ইন্দ্রপুর। আমাদের পরিবারটি পূর্বে বেশ বিত্তশালীই ছিল। প্রপিতামহ এবং পিতামহ যথেষ্ট তালুক ও দেবত্তর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তাঁরা ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ধনের বিকার কোনদিন তাঁদের মাঝে প্রকাশ পায়নি। বরং গায়ের শিক্ষা ও কৃষ্টি তাঁদের ওপর ভর করে পাকা বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠেছিল। তাই আমাদের পরিবারটী অন্যান্য ধনী পরিবারের মত গ্রামবাসীদের অভিশাপ কুড়িয়ে নেয়নি কোনদিন, বরং অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাতেই অভিষিক্ত হয়ে উঠেছিল। ইংরেজী শিক্ষাও সর্বপ্রথম আমাদের পরিবারেই প্রবেশ করেছিল। আমার জ্যেঠামশায় আমাদের মহকুমার ভিতর ছিলেন সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট। ঠাকুমার কাছে গল্প শুনেছি—গ্রাম গ্রামান্তর থেকে তাঁকে নানান জনে দেখতে আসতো। তিনি ‘ডিপটির’ কাজ পেয়েছিলেন। কিন্তু পরিবারের ভিতর অদৃশ্যে কেমন করে বিষরক্ত প্রবেশ করেছিল জানিনা। কলেরায়
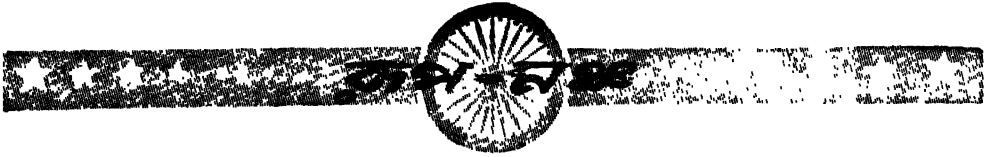
আক্রান্ত হ'য়ে জ্যেঠামশায় সহ প্রায় দশজন কর্মঠ পুরুষ এক সংগে মারা যান। ধীরে ধীরে ভাঙন ধরতে লাগলো। পিতামহ পূর্বেই গতায়ু হ'য়েছিলেন। সংসারের দায়িত্ব পড়লো আমার আর এক জ্যেঠামশায়—বাবার খুড়তাত ভাই সতীশ বাড়ুজ্জের ওপর। তিনিই বিষ সর্প হ'য়ে সংসারে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর রক্তে পরিবারের ভিন্ন রক্ত কী করে প্রবেশ করেছিল জানিনা। সে বিষাক্ত রক্তের উন্মাদনায় গাঁয়ের দরিদ্র জনসাধারণের কত নারীকেই না পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হলো! কলেরার ধাক্কায় পরিবারটিকে যে আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল—সিরাজগঞ্জে পাটের ব্যবসা খুলে আমার বাবা তার খানিকটা তাল সামলে নিয়েছিলেন। কিন্তু সতীশ জ্যেঠার জন্য আবার এমন ধাক্কা এসে লাগলো একদিন, যে, সমগ্র সংসারটি বানচাল হ'য়ে গেল। আমাদের গাঁ থেকে দূরে অবস্থিত এক অনাথা নমশূদ্রের মেয়েকে নিয়ে গাঁয়ের অন্যতম তালুকদার বসন্ত রায়ের সংগে ছোট খাটো 'ট্রোজান ওয়ার' লেগে গেল। তখন আমাদের প্রতিপত্তি ও আর্থিক সামর্থ বসন্ত রায়েদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। জয়মাল্য সতীশ জ্যেঠারই লাভ হ'ল। এমন কী পাইক বরকন্দাজ নিয়ে বসন্ত রায়কে তিনি একদম শেষ করে দিলেন। বসন্ত রায়কে শেষ করলেও, শেষ হোল না সব কিছুর। নরহত্যার অপরাধে জ্যেঠামশায় জড়িয়ে পড়লেন। মামলা রুজু হ'ল। পরিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্য বাবা এলেন মামলা তদ্বির করতে। এক বৎসর ধরে মামলা চললো। জ্যেঠামশায় বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। কিন্তু যে মূল্য দিয়ে বাবা তাঁকে খালাস করে আনলেন—তার খতিয়ান অনেক দিন অবধি পরিবারের আর কেউই জানতে পারলো না।

বাবা ব্যবসা স্থলে ফিরে যান। কয়েক মাস টাকাও পাঠান রীতিমত। তারপর কয়েক মাস তাঁর আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় না। কিছুদিন বাদে হিমালয়ের কোন পাদদেশাঞ্চল থেকে আমার এক কাকার কাছে চিঠি আসে। তাতে তিনি লিখেছিলেন: "মিথ্যা মামলার তদ্বির করে তিনি যে অপরাধ করেছেন, তারই জ্বালা তাঁকে অহর্নিশি পাগলা করে তুলেছে। সংসারের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে পড়েছেন। যেখানে সত্য ও ন্যায়ের কোন স্থান নেই—সে সংসারের প্রতি তাঁর কোন মায়া মমতাও নেই। তিনি আর সংসারে ফিরবেন না।" ছোট বেলা থেকেই বাবা একটু বেশী আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন ছিলেন। জ্যেঠামশায়ের মামলা তদ্বির করে তাঁর পথে যে বাধা ছিল, তাও উন্মুক্ত হ'য়ে গেল। বাবার এক খুড়তাত ভাই, আমাদের বড়কাকা—সংসারের দায়িত্ব এসে চাপলো তাঁর ওপরে। তিনি সংসারের ভার নিয়েই বুঝতে পারলেন—সব চিচিং ফাঁক। শুধু বাবাকেই আত্মবলি দিতে হয়নি, এই মামলার কাছে পরিবারের দেবত্তর সম্পত্তি ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

বাবার গৃহত্যাগের সংবাদ মা এবং ঠাকুমা কী ভাবে গ্রহণ করেছিলেন জানিনা। তখন জানবার মত বয়সও আমার হয়নি। পরিবারের এই কয়েক বছরের সংবাদ আমি বলতে পারবো না। আমার যখন চোখ খুললো—সব কিছু বুঝবার মত বয়স হ'লো—তখন দেখলাম—বিরাট একান্নবর্তী পরিবারটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। আমার নিজের দুই কাকা, কাকীমা, ঠাকুমা, তিন দিদি, দাদা ও ছোট এক ভাইকে নিয়ে আমাদের সংসার। বাইরে থেকে পরিবারের সবই আছে। সেই তিন মহলা বাড়ী, বড় বড় ঘর, মণ্ডপ, কাছারী, আটচালা, দোল-দুর্গোৎসব। কিন্তু অন্তর তার ফাঁপা—একদম নিঃস্ব। দু'ই দিদির বিয়ে হ'য়েছে। দাদা বিদেশে থেকে পড়াশুনা করেন। কাকারা সংসার প্রতিপালনের জন্য সামান্য টাকায় বিদেশে দুই স্কুলে শিক্ষকের চাকরী নিয়েছেন। কিছুদিন বাদে বড়দিও বিধবা হ'য়ে আমাদের বাড়ীতে এসে উঠলেন। বড় হ'য়ে বড়দিকে এই প্রথম আমি দেখলাম। তাই প্রথম থেকেই তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারিনি। আমাদের সংসারে তাঁকে পরগাছা বলেই মনে হ'য়েছিল—বড়দির সংগে আমার দিনরাত ঠোকাঠুকির এও হয়ত একটা কারণ হবে। আজকে যে কামরায় শুয়ে আছি, এই কামরার এই খাটেই—আমার মায়ের দুপাশ জড়িয়ে আমি আর আমার ছোট ভাই জয়ন্ত

শুয়ে থাকতাম। পৈতৃক আমলের ছেড়া শীতল পাটি—ছেড়া মাদুর—তারই উপর পুরোন কাপড় দিয়ে মায়ের নিজের হাতে তৈরী কাঁথা বেছানো থাকতো। মাকে জড়িয়ে গভীর আরামে আমি নিদ্রা যেতাম। পৈতৃক আমলের ছেড়া একটা মশারী ছিল। তার ফাঁক দিয়ে মশার দল বিনা পরিশ্রমে ভিতরে ঢুকে যখন গুনগুনানী আরম্ভ করতো—মা মশারীর বাইরে যেয়ে আলনা থেকে কাপড় এনে সেই পথগুলি বন্ধ করে দিতেন।

গভীর রাত্রে কখন কখন ঘুম ভেংগে যেত। কার চাপা কান্নার শব্দে আমি বিচলিত হ'য়ে উঠতাম। কান্নার উৎপত্তিস্থল আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতাম—কিন্তু অনেকদিন অবধি সফলকাম হ'তে পারি নি। একদিন বেশ বুঝতে পারলাম, আমাদের মশারীর ভিতর থেকেই কান্না আসছে তবে কী জয়ন্ত ভয় পেয়ে কাঁদছে! না—এত জয়ন্তর কান্না নয়। তবে! তবে!! আস্তে আস্তে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তাঁর মুখখানা অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ফিরিয়ে আনলাম আমার দিকে। একি! এযে মায়ের গণ্ডদেশ বেয়েই অঝোর ধারায় উষ্ণ অশ্রু ঝরে পড়ছে—'মা—মামণি' বলে আমি মায়ের মুখের পর মুখ রাখতেই তাঁর বিগলিত অশ্রুধারার স্পর্শে মুহূর্তে আমার রুদ্ধ আবেগ পথ ভেংগে প্রকট হ'য়ে পড়লো। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলাম।

মা নিজেকে সংযত করে আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে লাগলেন: "কীরে, ভয় পেয়েছিস—এইত আমি। ভয় কী, লক্ষ্মী বাবা আমার।" মা যতই আমার কাছে নিজের দুর্বলতার কথা লুকোতে চাইলেন—ততই তাঁর অন্তরের রুদ্ধ বেদনা প্রকট হ'য়ে উঠতে লাগলো—তাঁর প্রতিটি অশ্রু-সিক্ত সান্ত্বনা বাক্যে। তারপর সেদিন কখন মায়ের মুখের ওপর মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বলতে পারি না।

এর পরেও আরো অনেক রাত মাকে কাঁদতে দেখেছি—তবে খুব সতর্ক হ'য়ে কাঁদতেন, যাতে আমি টের না পাই। টের আমি প্রায়ই পেতাম। কোন কোন দিন টের পেয়েও না-পাবার ভান করে শুয়ে থাকতাম। কোন কোনদিন 'মা-মামণি' বলে শুধু মার চোখ ও মুখের ওপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিতাম। মা কোন সময় হাতখানা বুকের মাঝে চেপে ধরতেন—কী আমাকে ঝাপটে কোলের মাঝে টেনে নিতেন। আমি নিশ্চল হ'য়ে পড়ে থাকতাম। ধীরে ধীরে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম।

কোন কোন দিন হাতটা সরিয়ে দিয়েও রাগতভাবে মা বলতেন: "আঃ, জ্বালাতন করিস না। চুপটি করে ঘুমোনা বাপু।"

আমি নাছোড়বান্দার মত জিজ্ঞাসা করতাম: "তুমি কাঁদছো কেন?"

মা উত্তর দিতেন: "বেশ করি। তোর তাতে কি?"

আমি দৃঢ়ভাবে বলতাম: "না, তুমি কাঁদতে পারবে না।"

মা রেগে যেয়ে আমার পিঠে এক চড় মেরে হয়ত জয়ন্তর দিকে ফিরে শুতেন। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকতাম। হয়ত একঘুম দিয়ে উঠে দেখতাম, মা আবার পাশ ফিরে আমায় কোলে টেনে নিয়েছেন। আমি পরম শান্তিতে তাঁর কোলের মাঝে নিজেকে সপে দিতাম।

পুরোন টিনের বেড়ার ছেঁদার ভিতর দিয়ে সূর্যকিরণ আমার গায়ে লাগবার পূর্বেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তাম। মা তার পূর্বেই কাজে লেগে যেতেন। কোনদিন সকালের কাজকর্ম সেরে এসে যদি দেখতেন, আমি তখনও বিছানা ছাড়িনি, আস্তে আস্তে ডাকতেন: "পার্থ—পার্থ, ওঠ—রোদ উঠে গেছে—পড়তে যা।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠতাম। আজও তড়াক করে উঠলাম বড়দির হাঁকে: "পার্থ, ঘুমাইছিস নাকি? আয়, খাইতে আয়, ভাত বারছি।"

ঘুমিয়ে যদিও পড়িনি, তবু ভান করে চোখ মুছতে মুছতে খাটের পর থেকে নেমে বড়দিকে বল্লাম: "চলো।" বড়দি খাটের নীচ থেকে হ্যারিকেনটা বের করে তার শিখাটা বাড়িয়ে দিলেন। ঘরের অর্ধেকটা গোলাকৃতি হয়ে তার শিখায় আলোকিত হ'য়ে উঠলো। কিন্তু তার রক্তাভ শিখার তেজ সহ্য করতে না পেরে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো আস্তে আস্তে যেন বিদায় নিল। আমি বড়দিকে অনুসরণ ক'রে চলতে লাগলাম।

আমাদের ঘরটা উত্তর ও পূর্বের ভিতকে কেন্দ্র করে ঠিক আগের মতই গড়ে উঠেছে। এঘর থেকে ওঘরে বাবান্দা দিয়েই যাতায়াত করতে হয়। উত্তর ভিতের ঘরটা বড় বলে তাকে বড়ঘর বলা হয়। বড়দি এই ঘরেই আসন পেতে আমায় খেতে দিয়েছেন। চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ভিতরে যেতেই কে যেন পদধূলি নিল। বড়দি বল্লেন: এই ভূতনাথ, যাত্রা আজ হয়নি বইল্যা ও তাড়াতাড়ি চইল্যা আইছে।"

আসনে বসতে বসতে বড়দিকে বল্লাম: রান্না ঘরে আসন করলেই পারতে- "

বড়দি উত্তর দিলেন: "শীতের মাঝে আবার কষ্ট কইরা যাবি!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। অথচ ছোট বেলায় শীতের ভয়ে রান্না ঘরে যখন খেতে যেতে চাইতাম না—মা বড়ঘরে ভাত এনে দিলে বড়দিই মুখ ঝামটা দিয়ে বলে উঠতেন: আহ্লাদ দিয়া দিয়া মাথায় উঠাইতেছো তুমি। ফল পাবা।"

বলার সংগে সংগেই আমি গর্জে উঠতাম: বেশ, তোর কীরে পোড়ারমুখী—যা—যা আমার সামনে থেকে - সর্দারী করতে আসছে।" বড়দি গজ গজ করতে করতে সরে পড়তেন। মা শাসনের স্বরে বলতেন: তোর বড় না! দিন দিন যে কী হচ্ছিস!"

ঠাকুমা হয়ত বিছানায় শুয়েই উত্তর দিতেন: তা ওই বা ওর সংগে লাগতে আসে কেন?—" মা আর কোন কথা বলতেন না।

আজ মা নেই। বড়দিই আমায় আদর করে বড়ঘরে খেতে দিয়েছেন। বড়দির এই স্নেহ নির্বাক মুহূর্তের ভিতর দিয়েই আমি অনুভব করতে লাগলাম। বেগুন আর কাচ কলা ভাতে দিয়ে আমি অনেকগুলি ভাত মেখে নিলাম। পুরো একটা কাচালঙ্কাই চটকে নিলাম তার সাথে। লঙ্কাটা বড়দি মেখে দেননি। বুঝলাম, ছোট বেলায় আমি যে ঝাল কম খেতাম—বড়দি এখনও তা ভোলেন নি। এই ঝাল দেওয়া নিয়েও বড়দির সংগে আমার কম ঝগড়া লেগে যেত না। বড়দির বিয়ে হয়েছিল বরিশাল জেলার কোন এক গ্রামে। থাকতেন তিনি নোয়াখালি জেলায় জামাইবাবুর কর্মস্থলে। বরিশাল আর নোয়াখালির সংমিশ্রণে ঝালের মাত্রাটা তিনি এতই চড়িয়ে দিয়েছিলেন যে, ফরিদপুরের সমতা আর তার কাছে টিকে থাকতে পারলো না। স্কুল থেকে ফিরে বিকেলবেলা ঠাকুরমার পাতের প্রসাদের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতাম। বইগুলি যে কোন স্থানে ফেলে রেখে নিরামিশ ঘরে যেয়ে ঢুকতাম। ঠাকুরমার রান্না মা'ই করতেন। কোন কোনদিন ঠাকুমা নিজেও হাতে নিতেন। বড়দি আসবার পর—ঠাকুরমার জুড়ি জুটে গেল—তাই মাকে আর নিরামিশ ঘরে যেতে হয়নি কোন দিন। ঠাকুমাকেও আর বাউলী ধরতে হয়নি বেশী। বুড়ো বয়সে ঠাকুরমার কষ্টটা হয়ত লাঘব হলো একটু—কিন্তু নিরামিশ ঘরের প্রতি আমার আকর্ষণটা ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো। অভাব অনটনের সংসারে বড়দির উপস্থিতি একটা বোঝা বলেই মনে হয়েছিল প্রথম থেকে। তারপর দিন দিন যতই তাঁর সংগে আমার ঠোকাঠুকী লাগতে লাগলো—ততই যেন বড়দি আমার দুই চক্ষের বিষ হয়ে উঠতে লাগলেন। একটু ঝগড়া বাধলেই আমি ঠাকুমা, ছোট ঠাকুমা আরও দু'চারজনকে উদ্দেশ্য করে এবাড়ীতে বড়দির অধিকারের প্রশ্ন তুলতাম। বিয়ে হবার সংগে সংগেই পিতৃগৃহের সংগে মেয়েদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হ'য়ে যায়—জানিনা, এই মতবাদ কেমন করে আমার ভিতর বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছিল। তাই বিজ্ঞ তার্কিকের মত প্রায়ই আমি মন্তব্য করতাম: ও-কেন থাকবে আমাদের বাড়ীতে! ও থাকতে পাবে না এখানে। ও যাক, দূর হ'য়ে যাক ওর শ্বশুর বাড়ী।"

বড়দির প্রতি রাগটা একদিন সপ্তমে চড়ে গেল। আমি সেদিন স্কুল থেকে সবেমাত্র ফিরে মায়ের কাছে যেন কী নিয়ে বায়না ধরেছি। মা আমাকে শান্ত করবার জন্য বল্লেন: যা, দেখ যেয়ে আজ তোর ঠাকুরমার ঘরে চিড়ে-বেগুন রান্না হ'য়েছে—শীগ্‌গির খেয়ে নে।" ঠাকুরমার হাতের চিড়ে-বেগুন আমার খুব প্রিয় ছিল। চিড়ে-বেগুনের নাম শুনে আমার জিব লক লকিয়ে উঠলো। মাকে রেহাই দিয়ে একছুটে নিরামিশ ঘরে যেয়ে
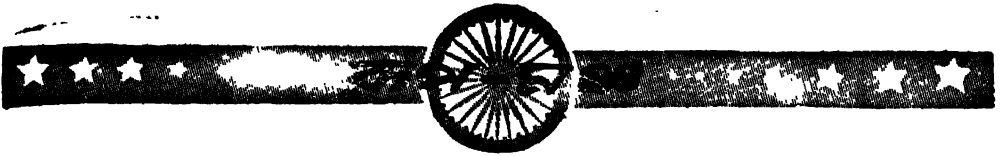
হাজির হলাম। নির্দিষ্ট স্থানে আমার খাবার ঢাকা থাকতো। ঢাকনীটা তুলে বেগুন-চিংড়ে দেখেই এক গাবলা তুলে মুখে দিয়ে ফেল্লাম। সংগে সংগে বিকট চীৎকার করে উঠলাম—"নিশ্চয়ই—ওই পোড়ারমুখী রান্না করেছে—ও ডাইনী—ঝাল দিয়ে আমায় পুড়িয়ে মারবে।"

মা ছুটে এলেন—ছুটে এলেন ঠাকুমা—ওঘর থেকে ছোট ঠাকুমা—আরো অনেকে। বড়দিও অপরাধীর মত এক পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি সমানে চীৎকার কচ্ছি—আর হাত পা আছড়াচ্ছি। ঠাকুমা ও মায়ের গুঞ্জন ওরই ফাঁকে কানে এলো। মাকে উদ্দেশ্য করে ঠাকুমাকে বলতে শুনলাম, "না, ঝালত তেমন হয়নি বৌমা—ও হয়ত মরিচ খাইছে।"

বড়দিকে লক্ষ্য করে বলতে শুনলাম: ও ঝাল খেতে পারে না—লংকা বেছে রাখলে কী হ'তো বাপু!" এবার নিশ্চিত করে বুঝলাম, রান্না তাহলে বড়দি'ই করেছেন। আমি স্বর চড়িয়ে বড়দির উদ্দেশ্যে স্বস্তি বচন সুরু করে দিলাম। ঠাকুমা ঘরে যেয়ে বড় একখানা আখের গুড় বের করে আনলেন: গুড়খানা বারান্দায় রেখে আমায় বল্লেন: দাড়, এই নাও আর ঝাল দেবে না। মুখ ধুইয়া আসো।" আমি গজ গজ করতে করতে গুড়টা হাতের মধ্যে নিলাম। উঠোন থেকে এক ফাঁকে একখণ্ড ইট কুড়িয়ে নিয়েছিলাম—বড়দির অবস্থিতিটা লক্ষ্য করে কপাল তাক করে ছুড়ে মারলাম সেটাকে তারপর ছুট। আমাকে আর পায় কে?

আমার অব্যর্থ লক্ষ্যে বড়দির বা কপাল কেটে দর দর করে রক্ত বেয়ে পড়ছিল। পরে শুনলাম, অনেকক্ষণ অবধি অজ্ঞান হ'য়ে ছিলেন তিনি। বেশী রাত্রে বাড়ী ফিরবার সংগে সংগে মাও বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিলেন আমার পিঠে। তাতেও দুঃখ হল না, যখন শুনলাম, বড়দি খাটের উপর শুয়ে তখনও গোঙাচ্ছে—সে গোঙানী শুনে মায়ের প্রহার পরম তৃপ্তির সংগেই হজম করে নিয়েছিলাম। বড়দির ঘা শুকোতে বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। ঘা শুকিয়ে গেলেও, তাঁর বা কপালে বেশ গভীর দাগ রয়ে গেল।

আমি খেতে খেতে মুখ তুলে তাকালাম বড়দির মুখের দিকে। সে দাগটা আজো হয়ত আছে। হ্যাঁ, হারিকেনের অস্পষ্ট আলোতেও সে দাগটা আমি দেখতে পেলাম। কিন্তু ও কী। বড়দি কাঁদছে নাকি! খাওয়া বন্ধ করে আমি ভাল করে পরখ করে দেখলাম, হ্যা, পিছনের খাটে মাথা হেলিয়ে মুখ ঢেকে বড়দি কাঁদছেন। আমি আস্তে আস্তে ডাকলাম, "বড়দি—বড়দি।"

বড়দি সপ্রতিভ হ'য়ে চোখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলেন: কী, তোর লাগবে নাকি কিছু।"

আমি বল্লাম: না—কিন্তু তুমি কাঁদছো কেন?"

বড়দি সিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন: না কাঁদবো না—কদ্দিন বাদে বাড়ী আইছিস—আর আমি তোর সামনে শুধু ভাতে-ভাত তুইল্যা দিলাম। আইজ মা নাই—কেউ নাই বাড়ীতে—তুই আইছিস—আমারো পোড়া কপাল!"

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলাম: তোমার এই দুঃখ! তুমি একেবারে পাগল!"

থালার কাছে একটা বাটিতে মাছের ঝোলের মত মনে হলো। আমি হাত দিয়ে বুঝলাম, অনুমান মিথ্যে নয়। বড়দিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্লাম: "কেন, এইত মাছ যোগাড় করেছো—"

বড়দি সখেদে উত্তর দিলেন: ওকী আমি যোগাড় করছি—তুই আইছিস শুইন্যা চাটুজ্জাবাড়ীর বৌদি দিয়া গেলেন।"

চাটুজ্জে বাড়ীর বৌদি নিজে যেঁচে এসে দিয়ে যাননি। আমার সামনে ভাতে-ভাত তুলে ধরবার বেদনা সহ্য করতে না পেরেই বড়দি এই শীতের রাত্রে নিজেই উপযাচক হ'য়ে ভিক্ষায় বেরিয়েছিলেন! বড়দির অন্তরে যে এতখানি স্নেহ লুকিয়েছিল, এর আগে তা কোনদিন বুঝতে পারিনি। এই নিঃসন্তান বালবিধবার এতদিনকার অন্তরের রুদ্ধ স্নেহের বহিঃপ্রকাশে আমি মাতৃ-স্নেহের যে পবিত্রতার আস্বাদ পেলাম, তাতে মুগ্ধ ও বিস্মিত না হ'য়ে পারলাম না। বড়দি বড় শুচি বায়ুগ্রস্ত লোক ছিলেন। আমার খাওয়া দাওয়ার পর হয়ত এই এঁটো নিয়ে শীতের রাত্রে তিনি ঘাটে যাবেন। বাসন মেজে নিজে স্নান না ক'রে থাকবেন না। সহানু-

ভূতিতে আমার মনটা ভরে উঠলো। আমি বল্লাম: "তুমি আবার গা ধোবে নাকি?"
বড়দি বললেন: "তাতে কী অইছে?"
আশ্চর্য হ'য়ে আমি বল্লাম: "এই শীতের রাত্রে?"
বড়দি অবাক হ'য়ে বললেন: "তুই যে কী অইছিস্? শীতের রাত্তিরে বুঝি গা ধুইনা? আমাগো অব্যাস আছে।"
এ নিয়ে বড়দিকে আর কিছু বলা বৃথা মনে করে আমি চুপ করে গেলাম। ভাতগুলি প্রায় শেষ করে এনেছি। বড়দি জিজ্ঞাসা করলেন: "আর চাইট্যা ভাত আইন্যা দেবো?"
আমি বল্লাম: "সব খেয়ে ফেল্লাম বলে?"
বড়দি উত্তর দিলেন: "আমি তো কম কইর‍্যা ভাত দিছি। তোর খাওয়া তো জানি। আর, এক সাথে ভাত বাড়লে রাইগ্যা যাবি!"
অন্তরের উচ্ছ্বসিত আবেগকে গোপন করবার জন্য আমি হেসে বল্লাম: "তোমার দেখি সব মনে আছে!"
আমার খাওয়া তখন শেষ হ'য়ে গেছে। ছোট বেলার অভ্যাসবশতঃ থালাটা পরিষ্কার করে তাতে ফুল কাটতে লাগলাম—কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে। তারপর বড়দিকে বল্লাম: "বড়দি, এই ক'বছরে সমস্ত রাগ-অভিমান কোথায় যে ধুয়ে মুছে গেছে।" আর বেশী কিছু বলতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।
ভূতনাথ জলের ঘটিটা এগিয়ে দিল। আমি ঘটিটা টেনে নিয়ে বারান্দার একধারে বসে মুখ ধুয়ে নিলাম। শীতে আমার কষ্ট হবে বলে মুখ-ধোয়ার জলটাও বড়দি গরম করে রেখেছিলেন। মুখ ধুয়ে আমি সোজা চলে এলাম আমার নির্দিষ্ট ঘরে। আলোর সামনে যেন বড়দির সংগে মুখোমুখী হ'য়ে কথা বলার শক্তি আমার রইল না। এসেই আলোটা কমিয়ে নীচে রেখে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ বাদে বড়দি এসে ছোট টেবিলটার ওপর এক গ্লাস জল—আর ছোট রেকাবীতে করে হরিতকী রাখতে রাখতে বল্লেন: "তোর জল রাইখ্যা গেলাম। রেকাবীতে হরতকী কাটা রইল—মুখে দিস—কাইল তোর গুয়ামুরি ভাইজ্যা রাকবো।"
বড়দিদি চলে যেতে যেতে বললেন: "তুই ঘুমাইয়া পড়—আমি আইঠ্যা নিয়া মশারী টানাইয়া দিয়া যাবানে।"

ঘুম আমার হোল না। বড়দির কথাই চিন্তা কচ্ছিলাম। বাপ-মায়ের প্রথম সন্তান। খুব আদরের সন্তানই ছিলেন বড়দি। বড়দির বিয়েতে বাবা খুব খরচ করেছিলেন। জামাই বাবু দারোগা ছিলেন। মারা যাবার পর বড়দি তাঁর ভাসুরের কাছে থাকতেন। বড়জা' অত্যাচার করতো—তাই চিঠি লিখে বাপের বাড়ী চলে আসেন। বড়দি সম্পর্কে এর চেয়ে আর বেশী কিছু অনেকদিন পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি। জানবার কৌতূহলও আমার তেমন ছিল না। বড়দির কথা বলা, কাপড় পরা, হাটা-চলা সব কিছুই আমার কাছে বিরক্তিকর ছিল। বরিশালের রীতি অনুযায়ী দু'বার বেড় দিয়ে তিনি কাপড় পরতেন। আমাদের পরিবারের কথাবার্তার সকলেই খুব প্রশংসা করতো। বড়দির কথাবার্তা অনেক সময় আমরাই অনেক কিছু বুঝতে পারতাম না। আমাদের উদ্দাম উচ্ছ্বাস বারবার বাধা পেত বড়দির কাছে। তারপর হয়ত একটা নতুন খাতা কিনে এনেছি—কাজে লাগেনি বলে তুলে রেখে দিয়েছি সেটাকে। অনেক দিন বাদে তার আর কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। খুঁজতে খুঁজতে হয়ত বড়দির পেটরা থেকেই বেরিয়ে পড়তো। লিখবার সময় কালি কলম হাতের কাছে পাওয়া দায় হ'ত। বড়দিই হয়ত কী কাজে তাকে সরিয়ে রাখতেন। চীৎকার ক'রে হাঁক দিতে তবে চুপি চুপি রেখে যেতেন। সংসারের কাজকর্ম ছাড়া বড়দি সকালে বিকেলে বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন তাঁর নিজস্ব পূজা পার্বণ নিয়ে। পৃথক একটি ঠাকুরের আসন ছিল তাঁর। বহুদিন সে আসন থেকে বাতাসা, আখের গুড় চুরি করে খেলেও, ঠাকুরের মূর্তির দিকে ভালভাবে তাকিয়ে দেখিনি কোনদিন। দুপুরবেলা কী গভীর রাত্রে বড়দিকে দেখতাম পাতার পর পাতা কী যেন লিখে যেতে। অনেকদিন বাদে। তখন কেবল কলেজে ভর্তি হ'য়েছি—গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ীতে এসে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে গেলাম। বড়দি তখন বাড়ী ছিলেন না—তিনি আমার রাঙাদি অর্থাৎ মেজদির শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমার কী দুর্বুদ্ধি মাথায় চেপে গেল। দুপুরবেলা। মা ওরা সবাই তখন খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছেন। বড়দির
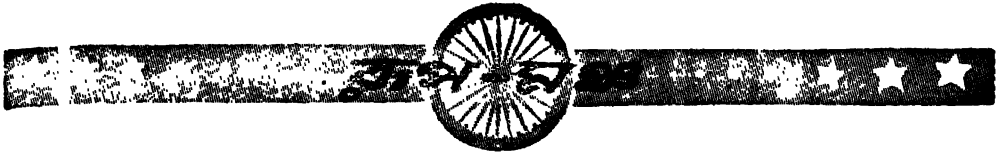
পেটরাটি তন্ন তন্ন করে হাতড়াতে লাগলাম। একদম নিচে কাপড়ে জড়ানো কী একটি পুটলী হাতে ঠেকলো। আমি বের করে নিলাম। দরজা বন্ধ করে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে যেতে লাগলাম। বড়দির হস্তাক্ষর খুবই খারাপ ছিল। তবু আমি ক্ষান্ত হলাম না। বড়দি এত পরিশ্রম করে পাঁচটি খাতা ভরতি করে তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। লিখেছেন একটা ফুটন্ত কলির অকালে ঝরে যাবার ইতিহাস। শুধু বড়দির জীবনই নয়—বাংলা দেশের প্রতিটি ঘরে—প্রতিটি বোনকে হয়ত এমনি অভিশাপ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়। স্বামী গৃহে যখন বড়দি গেলেন, কত আশা, কত আকাঙ্খাই না তাঁর ছিল। কিন্তু কিছুদিন ঘর করবার পর সবই তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে যায়! কিছুদিনের মধ্যেই বড়দি তাঁর পতিদেবতার নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হ'য়ে ওঠেন। এবং এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পান তাঁর নিজের ঘরেই। বড়দির বড়জা'র সংগে তাঁর স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পেরে বড়দি একদিন আত্মহত্যা করবার জন্যও অগ্রসর হ'য়েছিলেন। অবশ্য তিনি কৃতকার্য হ'তে পারেননি। কিছুদিন বাদে স্বামী তাঁকে কর্মস্থলে নিয়ে যান। সেখানেও স্বামীর আর এক রূপে বড়দির বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বেশীরভাগ দিন স্বামী ঘরে ফেরেন গভীর রাতে। ঘরে ফিরেই মদমত্ত অবস্থায় তিনি অত্যাচার চালাতেন বড়দির ওপর। আর বড়দি নীরবে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করে চোখের জলে কাপড় ভেজাতেন। তবু বড়দি তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন - প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন। স্বামী একদিন দুষ্ট রোগ নিয়ে শয্যাশায়ী হ'লেন। বড়দি প্রাণ ঢেলে তাঁর সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। ভারতের শাশ্বত নারীর সেবাপরায়ণতা নিয়ে স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করলেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হ'লো। তবু বড়দির সান্ত্বনা, তাঁর স্বামী মরবার সময় অন্ততঃ তাঁকে ভালবেসে মরতে পেরেছেন। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এই টুকু সান্ত্বনাই রইল বড়দির বাকী জীবনের একমাত্র পাথেয়। তাই সম্বল করে বড়দি পিতৃগৃহে চলে এলেন। বড়দির আত্মকাহিনী পড়তে পড়তে আমার চোখ সজল হ'য়ে উঠেছিল। বড়দির প্রতি যে অন্যায় এতদিন করেছি, তার অনুশোচনায় মনে বৃশ্চিকের জ্বালা অনুভব করতে লাগলাম। যে বড়দিকে কোন দিন আমি সইতে পারতাম না—সেই বড়দির মহিমময়ী রূপের কাছে আমার মন শ্রদ্ধাবনত না হ'য়ে পারলো না। তাঁর ভিতর আমি দেখতে পেলাম আমার সর্বংসহা জননীর প্রতিমূর্তি—ভারতের শাশ্বত নারীর এক অপূর্ব রূপ।

খাতাগুলি যেমন ছিল, তেমনি ভাবে পেটরার ভিতর রেখে দিলাম। বড়দি এখানে ছিলেন না। তাই তাঁর পূজোর আসন একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। আমি আস্তে আস্তে কাপড়টা সরিয়ে ফেল্লাম। রাধা-কৃষ্ণের একটা সুন্দর ছবি চোখে পড়লো—সে ছবির পায়ের কাছে আর এক যুগল মূর্তির ওপর চোখ আমার কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে রইল। এই যুগলমূর্তির সদ্য বিবাহিতা সলজ্জ নারীটিকে আমি চিনতে পারলাম—তিনি আমার বড়দি ছাড়া আর কেউ নন। আর তাঁরই পাশে চেয়ারে উপবেশন করে যে সুপুরুষটি আছেন—অনুমানে বুঝলাম, তিনিই আমার বড়দির পরমারাধ্য পতিদেবতা!

* * * *

দরজা ঠেলে বড়দি ঘরে ঢুকলেন। আমি ঘুমের ভান করে নিশ্চল হ'য়ে পড়ে রইলাম। বড়দি আমার পায়ের কাছে একটা বালিশ রাখলেন—দুপাশে দু'টা কোল বালিস দিলেন। তারপর অতি সন্তর্পণে মশারীটা টাঙিয়ে বিছানার চারধারে গুজে দিয়ে আস্তে আস্তে—পা টিপে টিপে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। আমি মশারীটাকে উঁচু করে প্লেট থেকে হরতকীর কয়েকখণ্ড এনে মুখে দিলাম। আমার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইচ্ছা হ'লো—বড়দিকে ছুটে যেয়ে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদি। কিন্তু তা পারলাম না। মা হ'লে পারতাম। মা এবং বড়দিতে আমার কাছে এইটুকু ব্যবধান। মা যদি থাকতেন, আজও নিঃসংকোচে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কাঁদতে একটুকু আটকাতো না। কিন্তু বড়দির কাছে, শুধু বড়দি কেন, আর কারোর কাছেই এই সংকোচ কোন দিন আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। মায়ের সংগে আর সকলের এই ব্যবধান—আমার সৃষ্ট নয়! আমি লেপটা মাথা অবধি টেনে নিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। (ক্রমশঃ)

তারাশঙ্কর রচিত দেবকী বসু পরিচালিত
চিত্রমায়ার 'কবি' চিত্রে—

—নীলিমা দাস

"অঞ্জনগড়" চিত্রের একটি বিশিষ্ট চরিত্রের
রূপ-সজ্জায় জনপ্রিয় **জীবেন বসু**

জনশিক্ষার উপর নাট্যাভিনয়ের প্রভাব

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

★

নাটক অভিনয়ের প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দরসের পরিবেশন হলেও তার মধ্য দিয়েই যে জনশিক্ষার একটা বিরাট সম্ভাবনা আছে, একথা অস্বীকার করা চলে না। বাংলার নাট্যসমাজ বাঙ্গালীজাতির জনশিক্ষার উপর অতীতকালে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে, বর্তমানেই বা তা কতখানি ক্রিয়াশীল এবং অনাগতকালেই বা তার কতখানি সম্ভাবনার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, তার একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

এ বিষয়ে প্রথমেই একটা অসুবিধা এই যে—নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সকলের একটা মোটামুটি ধারণা থাকলেও, জনশিক্ষা কথাটির অর্থ সকলের কাছে একটা বিশেষ পরিচ্ছন্ন রূপ নিয়ে ধরা দেয় না। যে বিষয়ের ধারণা যত অস্পষ্ট, সে বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং ক্ষেত্র বিশেষে অপব্যাখ্যা—ততই বেশী। হিতোপদেশের কাহিনী অথবা ঈশপের গল্প, কিংবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রাখালগোপালের তুলনামূলক অভিব্যক্তি নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শকদের চোখের সামনে ধরলে, জনশিক্ষার বাহনরূপে তা জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় হবে কি না অথবা ভূগোল শিক্ষার উদ্দেশ্যে আসামের চা বাগান, তিব্বতের তুষার ভূমি অথবা সাহারার মরু-মরীচিকা মঞ্চ বা চিত্রাভিনয়ের বিষয় বস্তু হওয়া সমীচীন হবে কি না—এ বিষয়ে যুক্তি এবং তর্কের ক্ষেত্র অত্যন্ত প্রসারিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে তর্ক অপেক্ষা পরীক্ষার প্রয়োজনই অনেক বেশী। "জন" শব্দটি যে বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশ করে, তা একক নয়—বহুর সমষ্টি। যেখানে বহুর সমাবেশ, সেখানে বিষয়বস্তুও বহু হবে, অত্যন্ত গোঁড়া তার্কিকও একথা অস্বীকার করতে পারে না। নীলের চাষ যদি নাটকের বিষয়বস্তু হ'তে পারে, আসামের চা-বাগান অথবা কয়লার খনিই বা অপাঙক্তেয় হতে যাবে কেন? ঐতিহাসিক নাটক যেমন ইতিহাস শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা হয় না, ভৌগোলিক নাটকও যদি কোনদিন লেখা হয়, নিছক ভূগোলশিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত বলে তা যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে—একথা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রয়োজন কেবল এমন প্রতিভাশালী নাট্যকারের, যার লেখনীর মন্ত্র স্পর্শে কয়লার খনির মালিন্য কোহিনূরের মর্যাদায় চির বরেণ্য হয়ে উঠতে পারে।

জনশিক্ষার মূলকথা হলো, ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মনের প্রসার। শিক্ষার ব্যাপারে এ যেন পাইকারী বাজারের একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার সর্ববাদী-সম্মত ক্ষেত্র হলো পাঠাগার। সে হলো সাধনার ক্ষেত্র; এবং সাধনার পথ সহজ পথ নয় বলেই অল্প সংখ্যক লোকের চিত্তই সে পথে আকৃষ্ট হ'তে পারে। শ্রেণীবদ্ধ অক্ষরের মধ্য থেকে রসগ্রহণ করা সহজ সাধ্য নয় বলেই, সাধারণ মানুষ ও বস্তুটাকে স্বভাবতঃ এড়িয়ে চলতে চায়। কথাটা রূঢ়, কিন্তু সত্য। পক্ষান্তরে অভিনয় হচ্ছে এমন একটি জিনিষ, যার আকর্ষণী শক্তিতে আবালবৃদ্ধবনিতা খবর পাওয়া মাত্র আপনা থেকেই ছুটে আসেন—ডেকে আনবারও প্রয়োজন হয় না। এই অতি লোভনীয় বস্তুটির অভ্যন্তরে জনশিক্ষার বীজ রোপন ক'রে গোপন পথে জনসাধারণের চিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশ করার প্রচেষ্টা সকল দেশে সকল সময়েই হয়েছে এবং আমাদের বাংলাদেশও তা থেকে বাদ যায় নি।

তবে একটা বড় কথা, পন্থাটি বিশেষ নিপুণতার সংগে গোপন রাখা চাই। অর্থাৎ অভিনয়ের মধ্যে শিক্ষার উদ্দেশ্য খুব বেশীভাবে প্রকট হ'য়ে পড়লে অভিনয়ের সৌন্দর্যহানি ঘটবে এবং সেটা নীতিসুধাপাঠের সামিল হয়ে ক্রমশঃ তার আকর্ষণ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। নাটকের মধ্যেকার শিক্ষনীয় বস্তুটি মানুষের সচেতন মনকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে অবচেতন মনের মধ্যে যাতে চিরস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে, তার জন্য যে বিশেষ প্রতিভাশালী নাট্যকারের প্রয়োজন সবার আগে—সে কথা বলাই বাহুল্য।
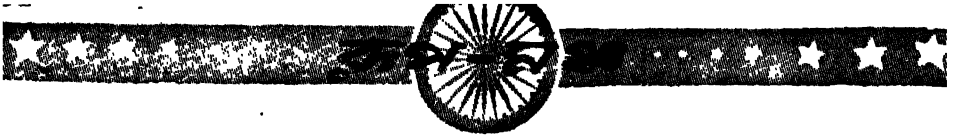
অনেকের ধারণা যে, বাংলা দেশে অভিনয় বস্তুটাই ইংরেজ আমলের একটা নতুন আমদানী। ধারণাটি একেবারেই ভুল—একথা জোরের সহিতই বলা চলে। যাত্রা, কথকতা পাঁচালী প্রভৃতি বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব জিনিষগুলির মধ্যে অভিনয়ের মর্যাদার যেমন অভাব ছিল না—এর মধ্য দিয়ে শিক্ষনীয় বস্তুও ছিল তেমনি প্রচুর। অতি-আধুনিকতার চশমা চোখে দিয়ে অনেকেই আজকাল আমাদের এই সব প্রাচীন উৎসব প্রথাগুলিকে অবজ্ঞা করতে সুরু করেছেন। এটা খুব ক্ষোভের কথা হলেও, এর মধ্যে বড় একটা সান্ত্বনা এই যে—যাঁরা এদের নাম শুনে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁদের অনেকের সংগেই এদের কথনো চাক্ষুস পরিচয় হয় নি। আমাদের জীবনে—বাল্যকালে এদের সংগে যেটুকু পরিচয় ঘটবার সুযোগ হয়েছে—তাতে একথা অন্ততঃ বলা যেতে পারে—তারা ছিল বাংলার একান্ত নিজস্ব। বাহিরের ধার করা চাকচিক্য না থাকলেও তাদের ছিল প্রাণবন্ত অভিনয় এবং উচ্চাংগ সংগীতের অবিমিশ্র ঝংকার, যা আজকালকার বহু শক্তিশালী অভিনয় এবং তৎ সংক্রান্ত সংগীতধারার মধ্যে এতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রসংগক্রমে এইখানে বলা উচিৎ যে, যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, হাফ্-আখড়াই—এ সবগুলিরই বিষয়বস্তু কখনো খুব হাল্কা ধরণের দেখা যায় নি। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পৌরাণিক কাহিনীগুলিই ছিল এদের মূল অবলম্বন।

গান, অভিনয় এবং আবৃত্তির মধ্য দিয়ে শক্তিমান গায়ক এবং অভিনেতার দল দর্শক বা শ্রোতাদের চোখের সম্মুখে এবং মনের মধ্যে এমন একটি অপরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রে তুলতেন—যার ফলে অনেক সময়ই দর্শকসাধারণ বর্তমানের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে, কোন সুদূর অতীতের মধ্যে তাঁদের সমস্ত সত্বা নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে বাধ্য হ'তেন।

সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, বেহুলা প্রভৃতি মহীয়সী রমণীর পাতিব্রত্যের গৌরবময় কাহিনী—কর্ণ এবং শিবিরাজার দানমাহাত্ম্য, পিতার গৌরব বা সুখের জন্ত শ্রীরামচন্দ্র, ভীষ্ম অথবা দেবযানীপুত্র পুরুর অপূর্ব আত্মত্যাগ—বিশ্বামিত্র কিংবা ভগীরথের সাধনায় অতুলনীয় নিষ্ঠা—ধ্রুব ও প্রহ্লাদের প্রেম ও ভক্তির জন্ত অপরিসীম নিগ্রহ—সব কিছু মূর্ত হ'য়ে উঠতো এদের গানে ও কথায়, তরংগিত হয়ে উঠতো হাসি এবং বেদনায়। অভিনয় সমাপ্ত হয়ে যাবার পরেও বহুক্ষণ অবধি শ্রোতা ও দর্শকমণ্ডলী অভিভূত হয়ে থাকতেন। বহুক্ষণ অবধি তাঁদের কানে বাজতো সংগীতের সেই অপূর্ব ঝংকার—চোখের সামনে ভেসে বেড়াতো সেই অনবদ্য অভিনয় ভংগিমা—সমগ্র চিত্ত ডুবে থাকতো সেই অভিনব রসবস্তুটির মধ্যে। ঘরে ফিরে এসে কুলবধূরা সীতা সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে নীরবে কামনা করতেন স্বামীর কল্যাণ, পুরুষরা শিবি ও কর্ণের কথা বারংবার স্মরণ করতেন, আর সন্তানসন্ততিরা শ্রীরামচন্দ্র অথবা ভীষ্মের বিরাট আত্মত্যাগের কথা চিন্তা করে মনে মনে শত সহস্রবার আবৃত্তি করতো—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম ইত্যাদি। অভিনয়ের ভিতর দিয়ে জনশিক্ষার এর চেয়ে বড় সার্থকতার দৃষ্টান্ত জগতে আর কোথাও আছে কিনা বলা কঠিন।

এর পরবর্তীযুগে ইংরেজ সংস্কৃতির অনুকরণ প্রাবল্যে বাংলা দেশে একটা নতুন হাওয়া বইতে সুরু করে। তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ বাংলায় রঙ্গমঞ্চের হয় আবির্ভাব। সৌখীন অভিনেতার দল অগ্রণী হয়ে কাপড়ের উপর আঁকা দৃশ্যপটের সম্মুখে মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে সুরু করেন অভিনয় নতুন পদ্ধতিতে। এঁদের অভিনয়ের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের মূল সুরটি বহুলাংশে বজায় থাকলেও অভিনেতা এবং দর্শকদের মধ্যেকার নিবিড় যোগসূত্রটি এই খানেই প্রথম ছিন্ন হ'য়ে যায়। যবনিকার অন্তরাল দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে সেদিন প্রথম যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল—পরবর্তী যুগে সেই ব্যবধান ক্রমশঃ বিস্তৃতিলাভ করতে করতে বর্তমানের আধুনিকতম অভিনয়ের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন ধারণ করেছে—যার মধ্যে আজ আমরা না পাই অভিনেতাগণের প্রাণময় সান্নিধ্য—না পাই তাঁদের কণ্ঠস্বরের সঞ্জীবতার আনন্দ। কেবলমাত্র অভিনেতার কায়া নয়—তাঁদের কণ্ঠস্বরের মায়াটুকু পর্যন্ত একটা বিকৃত ছায়ারূপ
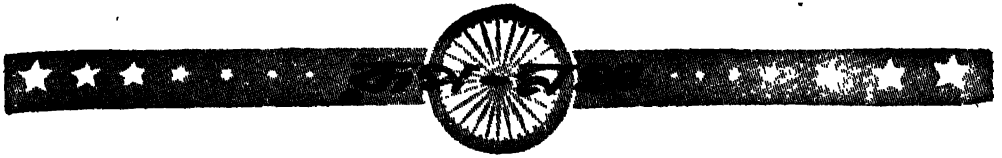
ধরে ব্যঙ্গ করে যায়, আর আমরা নিরঙ্কুশ চিত্তে তাই উপভোগ করে থাকি।

মনে হ'চ্ছে যেন একটু বিষয়ান্তরে এসে পড়েছি। আমরা নবাগত মঞ্চাভিনয়ের আলোচনা প্রসংগে বলছিলাম যে, এই নতুন যুগের সূচনায় মঞ্চ, ছবি আঁকা দৃশ্যপট, এবং জুড়ি-দোহারের গানবর্জন ছাড়া আসলে জিনিসটার বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল বলে জানা যায় নি। পৌরাণিক উপাখ্যান, এবং সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদই অভিনয় হ'তে লাগলো এবং জনশিক্ষার উপাদান হিসাবে নতুন মঞ্চাভিনয়ের মান পুরাতন যাত্রাভিনয়ের প্রায় সমানই রয়ে গেলো। অবশ্য ক্রমশঃ লোকের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন হওয়ার ফলে সে যুগেও আমাদের 'কুলীন কুল' সর্বস্বের মত নাটকের সংগে পরিচয় ঘটলো। কৌলীন্যের ব্যাভিচারকে কশাঘাত করতে এলেন দুঃসাহসী নাট্যকার—দেখাতে চাইলেন অভিনয় রাজ্যে জনশিক্ষার উপাদান কেবল পৌরাণিক যুগেই শেষ হ'য়ে যায় নি, তখনকার বাংগালী সমাজেও তার উপাদান প্রচুর।

তারপর এলো একটা বিপ্লবের যুগ। নাট্য-সাহিত্যে এবং অভিনয় জগতে নতুন যুগের সূচনা হলো পর পর মাইকেল, দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্রকে অবলম্বন করে। মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' বাংলার জনসাধারণকে যতখানি শিক্ষার খোরাক জুগিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিয়েছে তাঁর দুখানি সামাজিক নক্সা—"একেই কি বলে সভ্যতা?" এবং বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" এই দুখানি ব্যঙ্গনাটিকার মধ্যে তখনকার যুগের যে নিখুঁৎ বাস্তবচিত্র পরম নিপুণতার সংগে তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, তাঁর সেই অপূর্ব দানের যথার্থ মর্যাদা আমরা দিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। সমাজ শাসনের কঠিন চাবুকের উপর নাট্যরসের এমন মধুর প্রলেপ দেওয়া মহাকবি মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের চেয়ে সে যুগের আবহাওয়া কম মর্যাদাশীল হয়নি।

মাইকেল যে পথ সুগম করে দিলেন, সে পথের পথিক হলেন দীনবন্ধু। নীলকুঠীর নিষ্ঠুর ব্যাভিচার নীলদর্পণে আরো অনেক বেশী নিষ্ঠুর হয়ে প্রতিফলিত হলো। বাংলার জনসমাজ অভিনয়রসের বিমল আনন্দ উপভোগ করতে নিপীড়িত বাংলার জন্য ফেললে চোখের জল। শত. বক্তৃতায় যে ফল হতো না—কয়েকঘণ্টার অভিনয়ে তার সহস্রগুণ ফল হলো। গঠিত হলো প্রবল জনমত—বাংলার ঘুমন্ত মানুষরা সবাই যেন একযোগে জেগে উঠলো। নীল-কুঠীর নিষ্ঠুর বর্বরতা নীলদর্পণের কঠোর শাসনেই চির-কালের জন্য শায়েস্তা হয়ে গেলো—একথা ব'ললে বোধ করি অত্যুক্তি হবে না।

স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তারপর পড়লেন তাঁর সমসাময়িক শিক্ষিত সমাজকে নিয়ে। বাংগালীর অনুকরণ প্রবণতা তখনকার শিক্ষিত সমাজকে সুরার বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বাংলার বধূরা সেদিন চোখের জলে-বুক ভাসিয়েও

কালোছায়া চিত্রে শিশির, ধীরাজ, গুরুদাস, নবদ্বীপ, তুলসী ও হরিদাস
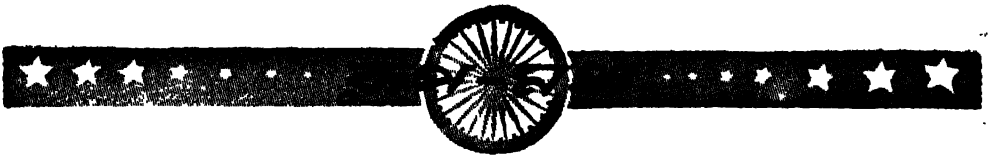
সে অনাচার রোধ করতে পারে নি। স্বামী থাকতেও তারা হলো অনাথা, সধবার গৌরব চিহ্ন সীমন্তে ধারণ করেও বাংলার কুল-লক্ষ্মীরা কার্যতঃ বৈধব্যের বিড়ম্বনায় রুদ্ধগৃহের অন্ধকার কোণে লাঞ্ছিত জীবনের বোঝা বহন করতো। সে বেদনা দীনবন্ধুর দরদী বুকে করলো আঘাত—সে আঘাত তিনি বাংগালী-সমাজকে ফিরিয়ে দিলেন "সধবার একাদশী" দিয়ে। সধবার একাদশীর তাৎপর্য গ্রহণ করে বাংলা দেশে মাদকতা বর্জন কতখানি সম্ভব হয়েছিল জানি না, তবে এ সম্বন্ধে যে একটা প্রবল আন্দোলন হয়েছিল এবং তখনকার যুগের বহুলোকেই নিমচাঁদকে যে মহাকবি মাইকেলের প্রতিলিপি বলে ধারণা ক'রে নিয়েছিলেন—একথা সর্বজনবিদিত।

নাট্যজগতে সত্যকারের যুগান্তর আনেন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র। একাধারে নট ও নাট্যকার হিসাবে বাংলার নাট্যজগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা অতুলনীয়, একথা বললেও তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হলো না। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা নাট্যজগতকে যা দিয়ে গেছে, বাংলার জনসমাজ তা থেকে অনেক শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপাদানে নিজেকে অলঙ্কৃত করতে পেরেছে। গিরিশচন্দ্রের কাছে বাঙ্গালী সমাজের এ ঋণ আজ আমরা অনেকেই স্বীকার করতে চাই না—এটাই চরম দুঃখের কথা। গিরিশচন্দ্রই আমাদের শুনিয়েছেন প্রেম ও শান্তির বাণী বিল্বমঙ্গল, নিমাই সন্ন্যাস, বুদ্ধদেবচরিতে—সাধনার নিষ্ঠা দেখিয়েছেন তপোবল ও শঙ্করাচার্যে—দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন মীরকাশেম, সিরাজদ্দৌলা এবং ছত্রপতি শিবাজীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে। বাঙ্গালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্যজীবনের বহু সমস্যামূলক চিত্র তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে এইখানেই গিরিশচন্দ্রের চরম বিকাশ, এবং আজও তিনি এখানে অপরাজেয়। প্রফুল্ল আজও বাংলার শ্রেষ্ঠ গার্হস্থ্য নাটক হ'য়ে আছে একথা যুক্তি দিয়ে অস্বীকার করা কঠিন। স্বল্পবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের জীবনে কন্যাদায় যে কত বড় অভিসম্পাত, গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' নাটকের অভিনয় সেটা যেভাবে সমাজের ছোট বড় সবাইকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছে, সমাজ সংস্কারকদের অগণিত প্রবন্ধ এবং বক্তৃতায় তা সম্ভব হয়নি। বিধবা বিবাহের সমস্যায় "শাস্তি কি শান্তি" নাটকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপিণী তিনটি বাংলার বিধবাকে পাশাপাশি দেখতে পেলাম। একই চিত্রপটে অবস্থাভেদে একই বস্তুর বিভিন্নরূপের এমন সজীব চিত্র বিরল।

গিরিশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভার বিচার করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। আমার বক্তব্য এই যে, গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাট্যরসের যেমন প্লাবন বয়ে যেত—তার মধ্যে শিক্ষনীয় বস্তুও ছিল তেমনি প্রচুর।

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক যে সব নাট্যকার বাংলার জনসাধারণকে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির পথে অগ্রসর করে দিয়েছেন—তাঁদের মধ্যে রসরাজ অমৃতলাল ছিলেন অগ্রণী।
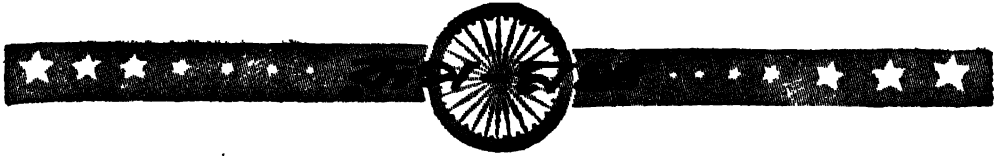
রসরাজের অম্লমধুর অমৃতরসের মধ্যে বাংলা সমাজ অনেক কিছু পেয়েছে, একথা বিস্মৃত হওয়া অকৃতজ্ঞতারই সামিল। তাঁর তরুবালা, খাসদখল, ব্যাপিকা বিদায় প্রভৃতির কথা ভুলে যাবার সময় এখনো আসেনি বলেই আমার বিশ্বাস।

এর পরেই যাঁদের কথা মনে আসে—তাঁরা হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্র লাল এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও গান একদিন বাংলার বুকে একটা বিপ্লব এনে দিয়েছিল। রাজপুতানার বীরভূমি ছিল তাঁর অধিকাংশ নাটকেরই পটভূমিকা। ভাষার তেজস্বিতায় দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলার নাট্যসাহিত্যে একটা বিশেষ ধারার প্রবর্তন করেন। রাণা প্রতাপ ও দুর্গাদাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূর্ব আলেখ্য প্রদর্শন করে তিনি একদিন সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন জাতীয়তাবোধের মধুর উন্মাদনায়। বাংলার বুকে স্বাধীনতার মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলতে যত কিছু সাহায্য করেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক ও গান তার মধ্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে। স্বাধীনতার সাধনায় সাফল্য লাভের সুমধুর সম্ভাবনায় তিনি আমাদের সচেতন করে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—বিফলতার অবসাদে মুহ্যমান হতে তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন। দেশ-প্রেমিক এই দরদী চারণ কবি উদাত্ত কণ্ঠে আমাদের আবার মানুষ হবার গান শুনিয়ে চরম ব্যর্থতার মাঝখানেও সান্ত্বনার মধুর ইংগিতে আমাদের উৎসাহিত করেছেন।

ক্ষীরোদপ্রসাদেরও পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদবিবি প্রভৃতি সেই একই সুরে গাওয়া স্বাধীনতার গান। বাংলার ছেলে প্রতাপকেই তিনি যেন সবার চেয়ে মনোহর করে সাজিয়ে আমাদের সামনে ধরেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ-প্রসাদের দান বাঙ্গালী জাতিকে জাতীয়তার পথে অনেক-খানি অগ্রসর করে দিয়েছে—একথা আমাদের অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করতে হবে।

তারপর? তারপরের আলোচনায় আমাদের কি যে বলবার আছে, তা চিন্তা করেও খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষীরোদপ্রসাদের পরবর্তী যুগ নাট্যজগতে অন্ধকার যুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। সে অন্ধকারে আজও আলোকের রেখাপাত হলো না—অদূর ভবিষ্যতে হবারও কোন সম্ভাবনা দেখছি না।

অপরেশচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত যত নাট্যকারের দর্শন আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে জনশিক্ষার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য নাটকের সংখ্যা মারাত্মক ভাবে অল্প। মন্মথ রায়ের কারাগার এবং শচীনবাবুর সিরাজদ্দৌলা এবং গৈরিক পতাকা ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর বেশী কিছু পেয়েছি কি না সন্দেহ। বর্তমান যুগে সামাজিক নাটক বলে যে সব বস্তু আমাদের চোখের সামনে অভিনীত হচ্ছে—সেগুলি যে বাংলার কোন সমাজের চিত্র, তা অনেক সময় বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। পৌরানিক কাহিনী অপাঙক্তেয় হয়ে পড়েছে—তথাকথিত সামাজিক নাটকে বাংলার সমাজকে খুঁজে পাই না—ঐতিহাসিক নাটকরূপে যাদের দেখা পাই, তারাও অনেকক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যহীন পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই হলো বাংলা নাটকের শোচনীয় বর্তমান। ভবিষ্যৎ ও ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

বর্তমান আলোচনায় আমরা নাটক এবং নাট্যকারদের মান ধার্য করে আলোচনা করেছি। যে সব কুশলী অভিনেতা এবং অভিনেত্রী তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্যে এই সব নাটক সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছিলেন এবং বর্তমান কালে ও করে চলেছেন, তাঁদের কথাও আমরা সংগে সংগে স্মরণ করেছি। নাট্যকার যে প্রতিমা গড়ে তোলেন, অভিনয় শিল্পীরা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন—এই চির সত্য কথাটি ভোলবার কথা নয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যকে আমরা ইচ্ছা ক্রমেই আলোচনার বাইরে রেখেছি—ভুলক্রমে নয়।

চিত্রনাট্য বর্তমান যুগে অভিনয় শিল্পের অনেকখানি স্থান অধিকার করে থাকলেও—এ সম্বন্ধে বর্তমানে নীরব থাকাই সমীচীন বোধ করি। বিখ্যাত উপন্যাসের চিত্ররূপ ছাড়া—নতুন লেখা মূল গল্প নিয়ে যেসব চিত্রনাট্য পর্দার গায়ে দেখা দিয়েছে--তাদের অনেকের পশ্চাতেই সুস্থ সাহিত্যিক পটভূমিকার অভাব লক্ষ্য করেছি। উচ্চাংগের মূল গল্প নিয়ে সুস্থ সবল চিত্রনাট্যের সংখ্যা এত অল্প যে, জনশিক্ষায় তার দান অত্যন্ত নগণ্য বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

উচ্চ সংগীত কেন জনপ্রিয়

নিত্যগোপাল বর্মণ

বেলা তখন সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আমরা তিন বন্ধুতে ছাড়-পত্র দেখিয়ে একটি বিরাট হলঘরে ঢুকে পড়লাম। হঠাৎ ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঘরটিতে তিলধারণেরও স্থান ছিল না। যাকে বলে লোকে লোকারণ্য। কিন্তু অরণ্য একেবারে নিস্তব্ধ। শুধু হাজার হাজার চোখ এক জায়গায় নিবদ্ধ হয়ে আছে আর বিরাট ঘরটি সুমধুর সুরের মায়াজালে ক্ষণে ক্ষণে যেন আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। দূরে মঞ্চের উপর একটি ক্ষুদ্রকায় কালোবরণ মনুষ্য-মূর্তি নিজের মাথার দ্বিগুণ বৃহৎ একটি পাগড়ী পরে অর্ধনিমিলিত নয়নে সংগীত রস পরিবেশন করছেন।

লোকটি আর কেউ নন—পরলোকগত ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ সাহেব। তারিখ—১৯৩৭ সনের ৩রা জানুয়ারী; স্থান—ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট হল। খাঁ সাহেব তোড়ী রাগের বিলম্বিত খেয়াল গাচ্ছিলেন। কী মিষ্টি আওয়াজ! রাগ বিস্তারের কী সুন্দর ভংগি! তিনটি সপ্তকে সুর বিকাশের কী অনায়াস-লব্ধ গতি! খাঁ সাহেবের কণ্ঠ হতে সুরগুলি যেন সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের মত ফুটে বেরুচ্ছিল এবং তিনি যেন খেলা-চ্ছলে নানা ভংগিমায় সজ্জিত করে দেখাচ্ছিলেন। এর পরে তোড়ীর দ্রুনী খেয়াল গেয়ে, শুধ্-আশাবরীর খেয়াল গাইলেন। এতেই আড়াই ঘণ্টা চলে গেল। কিন্তু সময় যে কি ভাবে অতিক্রান্ত হলো হাজার হাজার শ্রোতার কারুরই সে খেয়াল ছিল না। কারণ, এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শ্রোতাদের মাঝ থেকে কোন শব্দ শোনা যায় নি। যাকে বলে আলপিন পড়লেও টের পাওয়া যায়—শ্রোতারা এমনি নিস্তব্ধ ছিলেন। মাঝে মাঝে মুগ্ধ শ্রোতাদের তরফ থেকে মৃদু, 'আহা, আহা' শব্দ শোনা যাচ্ছিল। শেষে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় জোর হস্তে খাঁ সাহেবকে তাঁর রেকর্ডে গীত 'যমুনাকা তীরে' গানটি গাইতে অনুনয় করলেন। খাঁ সাহেব ভৈরবীর এই বিখ্যাত ঠুমরীটি গাইলেন আধ ঘণ্টার উপরে। কখনও খরজ পরিবর্তন করে ভৈরবীর তবিয়ৎ ঠিক রেখে অদ্ভুত ভাবে নানা রাগের আভাস ফুটিয়ে তুলতে মাঝে মাঝে সার্গম গাচ্ছেন। এত সুন্দর সাবলীল অথচ মধুর সার্গম আর কখনও শুনি নাই। গানের শেষে সুর-পাগল ভীষ্মদেব সর্বজনসমক্ষে হঠাৎ খাঁ সাহেবের চরণ ধূলা বার বার মাথায় তুলে নিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

সেই দিনই রাত্রে ওংকারনাথ ঠাকুরের গান ছিল। প্রথমেই তিনি "ঘুংঘটকে পট খোল" দরবারীর ঢিমা চালের গানটী ধরলেন। অতি ধীরে ধীরে দরবারীর গম্ভীর রূপ প্রকাশ করে সুর বিস্তার করলেন। খাদ সপ্তকের খরজ পর্যন্ত নেমে ক্রমশঃ তৃতীয় সপ্তকের প্রায় শেষ পর্যন্ত গেলেন। কণ্ঠ এমনি জোরদার ও মহিমময় যে, সমবেত শ্রোতা স্তব্ধ হয়ে রইলেন। ক্রমশঃ 'রাম' শব্দটি নিয়ে দরবারীর রূপ বজায় রেখে হৃদয়ের স্বতঃউৎসারিত প্রার্থনার সুরে এমন একটি সকরুণ পরিবেশের সৃষ্টি করলেন যে, বন্ধুগণ সহ আমার এবং সমবেত বহু শ্রোতাদের নয়ন অশ্রুপ্লাবিত হল। এর পর তিনি 'পীরনজা' নামক মালকৌষের বিখ্যাত ঢিমা চালের খেয়ালটি গেয়ে, "মুখ মোরমোর' নামক দ্রুনী খেয়ালটি ধরলেন। হঠাৎ আবিষ্কার করলাম যে, তাঁর অন্তরের সেই কারুণ্যঘন আনন্দ আবেশ অন্তর্হিত হয়ে তৎস্থলে আত্মপ্রকাশের উদ্দীপনা এসে প্রবেশ লাভ করেছে। এর পর সুরু হল তানের দুরূহ প্রকাশ এবং তা সংগেব সারেঙ্গীওয়ালা ওস্তাদ মজিদ খাঁ সাহেবের সংগে যেন পাল্লা দিয়ে চললো।

এতে সমবেত শ্রোতা এক নূতন ধরণের আমোদ অনুভব করলেন। এ যেন 'দেখা—যাক—কে হারে—কে—জেতে' গোছের আনন্দ। এতে পণ্ডিতজী তাঁর অসাধারণ সুরে সাধনার পরিচয় দিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তবু মনে হলো যে, এ যেন একজন বিখ্যাত ব্যায়ামবীরের অদ্ভুত পেশীচালনা
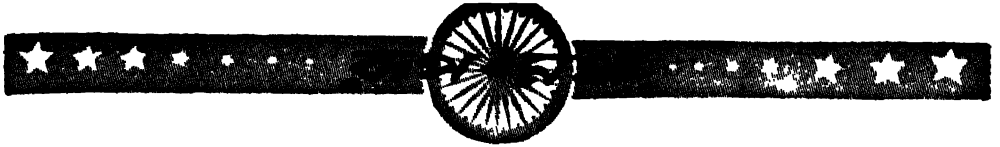
দেখছি। আর খাঁ সাহেবের গান শুনে মনে হচ্ছিল যেন, বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যবিদ উদয়শঙ্করের "ইন্দ্র নৃত্য" দেখছি।

উপরের উদাহরণ দুটি বিশেষ করে মনে রেখে এখন আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের মূলসূত্রে আসা যাক। খাঁ সাহেব এবং পণ্ডিতজীর গান সহস্র শ্রোতা স্তব্ধ হয়ে শুনেছেন। এঁদের মধ্যে এমন শ্রোতাও ছিলেন, যাঁরা উচ্চাংগ সংগীত শুনতে ভালবাসেন না কিন্তু তাঁরাও মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন। এর কারণ হল:—মানুষের মন স্বভাবতঃ সৌন্দর্যপিপাসু। সৌন্দর্যের মাপকাঠি দেশ বিশেষে, সমাজ বিশেষে ও ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের সৌন্দর্য সকলকেই আকর্ষণ করে। তাই প্রকৃত সংগীতশিল্পীর গান তা তিনি ধ্রুপদী, খেয়ালী, ঠুমরীগায়ক, কীর্তনীয়া বা অন্য যে কোন প্রকারের গায়কই হোন—শ্রোতাদের আনন্দের পরিবেশক হবেই।

গায়কের একটি প্রধান আকর্ষণীয় গুণ হল সাধনালব্ধ কণ্ঠ-মাধুর্য। অথচ এমনই দুর্দৈব যে, আমাদের ওস্তাদ সমাজে এতদিন এই কণ্ঠ মাধুর্যের উৎকর্ষ সাধন সম্বন্ধে অবহেলা ও ঔদাসীন্য পুঞ্জীভূত হয়েছিল। খাঁ সাহেব আব্দুল করিমের গানের অসাধারণ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, তাঁর অনুপম কণ্ঠ মাধুর্য। উচ্চাংগ গায়কের আর একটি প্রধান গুন হল দরদী শিল্পীর মন নিয়ে রাগকে অনুভব করে তাকে কণ্ঠের মাধ্যমে নিপুণতার সহিত নানাভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা। প্রকৃত শিক্ষকের কাছে যথাযথভাবে শিক্ষালাভ করে বহু বৎসরের অনলস সাধনার ফলে গায়কের এই ক্ষমতা লাভ হয়।

ইদানীং এমন গায়কের বড়ই অভাব হয়ে পড়েছে। কারো কণ্ঠ আছে শিক্ষা নাই, অথবা শিক্ষা আছে সাধনা নাই, কিম্বা সাধনা আছে কণ্ঠ নাই।

ওদিকে বাংলার জনসাধারণের কথা বলছি। আমাদের দেশের জনসাধারণ হিন্দুস্থানীদের মত উচ্চাঙ্গ সংগীতোন্মুখ (classical-minded) নয়। বম্বের দিকে দেখা যায়, কোন কোন থিয়েটারে রাজা করুণ রসের পার্ট করতে করতে হঠাৎ নির্জলা জয়জয়ন্তী রাগের একটি গান ধরে বসলেন। একজন ভাল ওস্তাদ-গায়ক রাজা সেজেছেন। তিনি গানের ভিতর যথেষ্ট তানকর্তব এনে ঢুকালেন। তাঁর কণ্ঠ সুমিষ্ট হওয়ায় গানও বেশ জমে গেল এবং সংগে সংগে দর্শকরাও ক্ষেপে উঠলো। কারণ, গান থেমে যেতেই শ্রোতাগণ "চালাও, চালাও" বলে চীৎকার সুরু করলো। কাজেই চললো ঘণ্টাখানেক জয়জয়ন্তী রাগের তান বিস্তার। এদিকে যে গোটা দৃশ্যটিই মাটি হয়ে গেল, সেই দিকে কারো দৃক্পাত নাই। গায়কের তারিফ করতে করতে দর্শক-মণ্ডলী গৃহাভিমুখে রওনা দিল। এর থেকে ওদেশের জনসাধারণের অভিনয়-রস-আস্বাদ স্পৃহার পরিচয় পাওয়া না গেলেও, উচ্চসংগীত উন্মুখতার পরিচয় মিলে।

আমাদের দেশের জনসাধারণের মনের গতি এ সম্পর্কে কিন্তু এর বিপরীত। আমরা গানে সুর প্রাধান্য চাই না, ভাব-প্রাধান্য চাই। নিছক সুরবিন্যাসে আকৃষ্ট হলেও তার মধ্যে আমরা ভাবের আবেদন খুঁজি। তাই খাঁ সাহেব আব্দুল করিমের গান আমাদের সব চেয়ে ভাল লাগে এবং তাই পণ্ডিত ওংকারনাথের প্রার্থনামূলক সুরবিস্তারে অশ্রু-সিক্ত হয়েও আমরা তাঁর তান-কসরৎকে পছন্দ করিনা।

উচ্চসংগীতের পরিবেশনে বাংলার জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে হলে বর্তমান ওস্তাদগণকে মরমী শিল্পী হওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। উচ্চাংগ সংগীতের আদর্শচ্যুত না হয়েও রাগরূপের অন্তর্নিহিত ভাবময় সৌন্দর্যকে কণ্ঠের সহায়তায় সুপরিস্ফুট করা যেতে পারে। গায়কদের সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। বর্তমানে বাংলায় যে সকল উচ্চসংগীত কলাবিদ্ আছেন, তাঁদের উচিত দলাদলি ছেড়ে অচিরে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া এবং আরও কি করলে উচ্চ-সংগীত বিস্তৃতভাবে জনপ্রিয় হতে পারে সে সম্বন্ধে চিন্তা, আলোচনা ও কর্মপন্থা নির্দেশ করা।

আজকাল বহু খেয়াল, ঠুমরী, গায়ক যথাযথ শিক্ষা ও সাধনা না করেই নিজেদের নাম প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। অনেকে খুব দ্রুত তান দিতে পারলেই মনে করেন, বড় খেয়াল গায়ক হয়েছেন। দুঃখের বিষয় নামকরা ওস্তাদদের মধ্যেও অনেকে প্রকৃত শিল্পমনের পরিচয় দেন না। এবং সাধারণকে তাঁরা অসমজদার মনে করে দূরে ঠেলে রাখেন। পক্ষান্তরে সাধারণ শ্রোতাও তাঁদের সংগীত
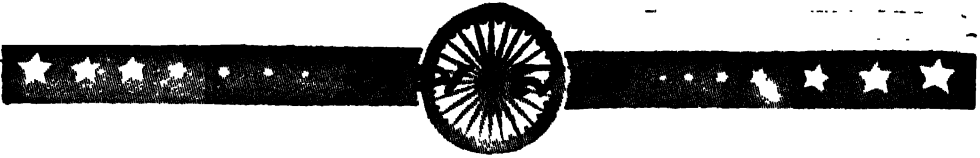
তাচ্ছিল্য করে শোনে না। শুধু দূরে ঠেলে রাখার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই যে তাঁদের উচ্চসংগীতের প্রতি তাচ্ছিল্য আসে তা নয়। আমি বহু লোকের সংগে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করে দেখেছি, সত্যিই তাঁরা উচ্চসংগীতের বিশেষ কিছু বোঝেন না বা বুঝবার চেষ্টাও করেন না। কোন কোন স্থলে শুধু সুকণ্ঠ গায়কের সুর মাধুর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হন মাত্র। তাই উচ্চাংগ গায়ক ও জনসাধারণের মধ্যে সাংগীতিক ব্যবধান আজও সুদূর প্রসারী। আজ হোক, দুদিন পরে হোক এই ব্যবধানের মধ্যে সেতু বন্ধনের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ, আজকালকার 'সদারঙ্গ'দের সেই 'মহম্মদ শা'ও নাই এবং 'বহুভট্ট'দের 'বীরচন্দ্রনরপতি'ও নাই। সংগীতের পৃষ্ঠপোষকদের স্থান মধ্যবিত্ত জনসাধারণ এসে দখল করেছেন।

কাজেই ওস্তাদদের সর্বপ্রথমে গোড়ার ঘর ঠিক করতে হবে। তাঁদের নিজেদেরই অগ্রসর হয়ে এই সেতুবন্ধনের কাজে যোগদান করতে হবে। কাজটি কিন্তু সহজ নয়। বাংলার জনসাধারণের বহু বৎসরের সঞ্চিত সংগীত বিমুখতাকে দূর করতে হলে ওস্তাদদের গতানুগতিক হলে চলবে না। ভারত খ্যাত গুণী ও সংগীত গুরুদের আদর্শ অনুসরণ করে, তাকে বর্তমানের সংগে খাপ খাইয়ে চলতে হবে।

ওস্তাদদের বলতে শুনি যে, উচ্চ সংগীতের সমজদারের সংখ্যা চিরকালই কম। আমরা কিন্তু একে সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। আজ যাঁরা পাকা সমজদার তাঁরাও কদিন সাধারণের পর্যায়েই ছিলেন। প্রকৃত শিল্পীকণ্ঠের উচ্চ সংগীত সাধারণ্যে বিপুলভাবে প্রচারিত হলে, ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের চিত্ত সংগীত রস-মাধুর্যে অল্পাধিক আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং এর ফলে সমজদারের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়েই পারে না।

একথার সত্যতার প্রমাণ বর্তমান ইউরোপীয় সংগীতের ক্ষেত্রে প্রকৃষ্টরূপে পাওয়া যায়। আমাদের ওস্তাদগণ যাদের সাংগীতিক হরিজন আখ্যা দেন, ইউরোপীয় সংগীত কলা-মন্দিরের দ্বার বহুদিন পূর্বেই সেই জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেওয়া হয়। ফলে সেখানকার সংগীত শিল্পরাজ্যে অভাবনীয় যুগপরিবর্তন হয়েছে। ইউরোপীয় যন্ত্রসংগীতের সৌন্দর্যময় অভিনব বিকাশ 'সিম্ফনী' এবং মোজার্ট, ওয়াগ্‌নার প্রভৃতি আধুনিক অপেরা সংগীত রচয়িতাদের মাধুর্যময় সৃষ্টি সেই যুগপরিবর্তনেরই বিস্ময়কর ফল।

আমাদের দেশেও বর্তমান যুগধর্ম অনুসারে উচ্চ সংগীত এতদিনে অনুরূপ ভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেতো, যদি আরো আগে আমরা ভারতীয় সংগীতের মূল্য নির্ধারণে অনভিজ্ঞ ও অনিচ্ছুক বিদেশীদের শাসন মুক্ত হতাম। বর্তমানে দেশ স্বাধীন হয়েছে। উচ্চ সংগীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণকে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের, সাধারণ্যে উচ্চ সংগীতের প্রচারের এবং শিক্ষার্থীদের উচ্চ সংগীত শিক্ষালাভের সহায়তা করা বর্তমান জাতীয় সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। দেশের সহস্র সমস্যায় বিব্রত থাকলেও এদিকে দৃষ্টি না দিলে তাঁদের কর্তব্য হীনতারই পরিচয় মিলবে।

এ সম্পর্কে জাতীয় বেতার প্রতিষ্ঠান, গ্রামোফোন কোম্পানী এবং চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্বও কম নয়। ওস্তাদগণ এদের সকলের সহৃদয় সহযোগিতা লাভ করে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হলে অদূর ভবিষ্যতে যে উচ্চাংগ সংগীতের স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটায় দেশ উদ্ভাসিত হবে, তাতে কোনই সন্দেহ নাই। বারান্তরে উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্চাংগ সংগীত সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় আকাঙ্খা রইলো।

অখণ্ড রস ও নৃত্য

নৃত্যশিল্পী : নরনারায়ণ

সেই সে পরম এক—
আপনারে করি লভিছেন সুখ।
দুইয়ের মিলনাঘাতে বিচিত্র বেদনা ;
নিত্য বর্ণ গন্ধ গীত করিছে রচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই বিশ্ব সৃষ্টির মূল প্রেরণা আনন্দ। আনন্দ বিকাশের ধাপে ধাপে সৃষ্টি স্ফুরিত হয়েছে। সত্যিকার শিল্পী যিনি, তিনি তাঁর অন্তরনিহিত আনন্দ-সংযোগে শিল্প সৃষ্টি করে থাকেন। অর্থাৎ তিনি অন্তর সত্তার মূল প্রকৃতির কল্পনাতে সমস্ত শরীরে ইন্দ্রিয় সত্তাকে ত্যাগ করে এক সেই পরম-কারণ শক্তির উপর আশ্রয়ভূত হন। তখন সেই অখণ্ড চৈতন্য শক্তি বহুভাবে প্রকটিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে থাকেন। সুতরাং, তখনই হয় কল্পনার সৃষ্টি শিল্পীর অন্তরের মধ্যে এবং সেই বিশুদ্ধ অখণ্ড রস-জ্ঞানের পরিপাকের দ্বারা নূতন বিকাশে জগৎ পরমানন্দ লাভ করে। কিন্তু শ্রমিক যে সেই শিল্পকে প্রযোজন লক্ষ্যে কর্ম সৃষ্টি করে। তাকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে ক্লান্ত হতে হয়। কিন্তু রস-শিল্পী আত্ম-প্রসাদের স্বতস্ফূর্তি প্রেরণায় সহস্রবর্ণের সৃজনে রামধনু রচনা করে যাঁর আবেদন মানুষের অন্তরাত্মার গভীরে পৌঁছে তাঁর অখণ্ড রসসত্তাকে নাড়া দিয়ে যায়। যা খণ্ড তাহা কুৎসিৎ ; আর যা অখণ্ড, সামঞ্জস্যপূর্ণ তাহা সুন্দর।

ভারতের আর্য ঋষিগণ এই রস-শিল্পের মূল কল্পারম্ভের মুকুট-মণি। তাহাদের ধ্যান অনুকম্পনের দ্বারা সংগীত, নৃত্য চিত্র পৃথক্ পৃথক্ সত্তায় জগতের মধ্যে রসসৃষ্টি দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে। ক্ষমা, শ্রী ও ধৃতি এ তিনটি অখণ্ড রসের মূল কারক। জগতে যিনি ক্ষমা করতে জানেন না, তিনি মন স্থির করতে পারেন না। মন স্থির না হলে শ্রী ধারণ করতে পারা যায় না, শ্রী অর্থে সুন্দর ও শান্ত। সুতরাং, শান্ত না হলে আসল মূল সত্তার অখণ্ড রস-জ্ঞানের অধিকারী হ'তে পারা যায় না। এবং রসের অধিকারী না হলে পরমানন্দ পাওয়া যায় না। সুতরাং মনস্থির করতে পারলেই সূক্ষ্মভাব কল্পরাজ্যের আশ্রয় নিতে পারে। অখণ্ডরসের অভ্যন্তরে মন রস-সৃষ্টির মূলশক্তির আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। জানবার যা কিছু, তার অজানার কিছু বাকি থাকে না। মন অখণ্ড সত্তার কল্পনাতে নিত্য নূতন ভাবের রস-সৃষ্টিতে জগৎকে প্রকাশ-মান করেন। ভাবরাজ্য পূর্ণ সত্ত্বগুণের মূলাধার। মানুষ কল্পনা শক্তিতে জগতে যা রচনা করে ঐ পূর্ণশক্তিকে আশ্রয় করেই, কিন্তু যখন ঐ কল্পনার দ্বারা বাস্তবে রূপদান করতে থাকেন তখন কিন্তু অবয়ব ঠিক অন্তর শক্তির কল্পনার মত পরিপূর্ণ বিকাশ হলো না, তার কারণ বাস্তব জগৎ সর্বশক্তি অখণ্ডের মত পরিপূর্ণ নয়, সুতরাং বাস্তবের বহু কল্পনারসে দেখা গেল কল্পনার মধ্যে অপূর্ণতা রয়ে যাচ্ছে। অখণ্ড-রসে যা চিন্তা করেছি, বাস্তবে ঠিক ঠিক সেরূপ ভাবে প্রকাশ হলো না। যে নৃত্য মূর্তি, যে সংগীত লহরী, যে চিত্র কল্পনাতে রচনা করেছি, তার উপযুক্ত বাস্তবে ঠিক সেই দেশ কাল পাত্র সংযোগ পাওয়া গেল না। এটাই একটু তারতম্য ঐ সর্বশক্তিমান অখণ্ড সত্তার সহিত। চিরদিন সর্বকালে এ ভাবেই থাকচে ও থাকবে, কারণ অখণ্ডের প্রতি ছবি বাস্তব-কল্পনা, রূপ-কল্পনা, তাহা কালের সহিত লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু অখণ্ড সত্তার রূপ অন্তর বাহিরে সমভাবেই চির বর্তমান থেকে আসছেন। তার কোন বদলান নেই। অখণ্ড রসের কল্পনাতে মনকে নূতন আর একটি মন এসে পরিচালনা কচ্ছেন, মনের পেছনে মন। তেমনি চক্ষুর পেছনে আর একটি অন্তর চক্ষু বা জ্ঞান চক্ষু। তাই স্থূল মানুষকে রূপ ও জ্ঞান দান করছেন, ঐটি ধরবার যত চেষ্টা করবে তত বেশী অখণ্ড রসের মর্ম উপলব্ধি করতে পারা যায়।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের একটি সাধন তত্ত্বে বর্ণনা রয়েছে।

প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল যতক্ষণ ;
দেখিতে আইলা তাহা বৈসে যতক্ষণ।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে হরি হরি ;
প্রেমাবেশে মধ্যে নৃত্য করেন গৌর হরি।

চৈঃ চঃ মধ্যমলীলা।
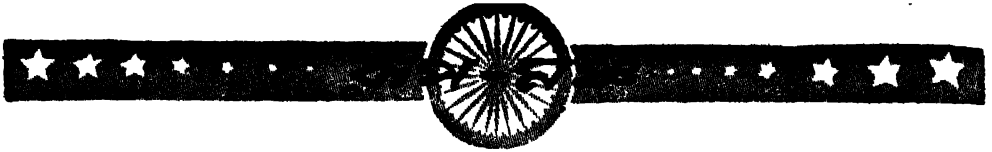
মহাপ্রভুর অন্তরে আনন্দের সতস্ফূর্তি রসের অনুভূতি বিকশিত হয়েছিল, অন্তরংগে করতে তিনি সেই রস আস্বাদন। প্রেম রস সাধারণ সমাজের জন্য নয়। অকৈথব কৃষ্ণ প্রেমা, জীবে তা সম্ভবে না।

প্রেমের কথা বুঝবে কেবা ; প্রেম অর্থে সেবা।

কুমারনাথ—

নটেশ্বর শিব কল্পনার ধ্যানকর্তা নৃত্য সম্বন্ধে যে রূপের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা রয়েছে তার সম্বন্ধে ডাঃ কুমার স্বামী বা গোপীনাথ রাও তাহার গ্রন্থে উল্লেখ করে গেছেন। নটরাজের নৃত্য-মূর্তিগুলির কল্পনা করা ও রূপের বর্ণনা বিষয় ডাঃ নলিনী-কান্ত ভট্টশালী ঢাকা চিত্রশালায় রক্ষিত নৃত্যমূর্তি সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ লিখে গেছেন। তাহাতে নটরাজের অখণ্ড রসের ভাবধারার ব্যাখ্যা রয়েছে। "সামবেদ" স্বরলহরী যুক্ত সংগীত-নৃত্য শাস্ত্রের একটি অধ্যায়। লহরী ও তান সম্বন্ধে সামগান ব্যাখ্যা ইহার মূল সূত্র। নাট্য-শাস্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তণ্ডুমুনির দ্বারা নৃত্য-কল্পনায় ভরতকে উপদেশ দিবার কথা বর্ণনা রয়েছে। তণ্ডুর বিধান অনুসারে যে নৃত্য-কল্পনার দ্বারা উপদেশ দিয়েছেন তা ভরত নাট্যশাস্ত্রে করণ ও অংগহারগুলির ব্যাখ্যাতে বুঝান হয়েছে। ১০৮ প্রকার করণ, ৩২ প্রকার অংগহার নৃত্য-ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়। হস্ত ও পদ ইত্যাদি দ্বারা যে ভংগি প্রকাশ হয় তার মাত্রা ও সমবায়ের নাম করণ ও অংগহার। ঠিক তার অখণ্ডরসের নৃত্য-কল্পনাতে তাণ্ডব নৃত্যে এই করণ ও অংগ-হার প্রকাশ করেছেন। ইহা প্রাচীনকালে নৃত্যের পূর্বরংগ হিসাবে দেখান হতো, এবং এ শুধু পুরুষের দ্বারা হতো ত নহে। চিত্ত স্বর যে পরবর্তি যুগের গোপরসে ১০৮টি করণ ভাস্কর্যে দেখান হয়েছে তা স্ত্রীলোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হতো। শিব যে নৃত্যের অভিনয় করতেন তাহা আমরা শৈবাগমগুলি দেখ্‌লে জান্‌তে পারি। নাট্যশাস্ত্রে কতগুলি করণ ও অংগহার শিবের বিশেষ প্রিয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। একটি নৃত্য আছে যা শিবের দ্বারা বিশেষ অনুষ্ঠিত সেটি রুদ্র নৃত্য এটির বিশেষ নাম নাদণ্ড, এই নাদণ্ড নৃত্যই রুদ্র তাণ্ডব। এ নৃত্যের যে করণ অনুষ্ঠিত হয় তা ভরতের নাট্যশাস্ত্রের "ভুজঙ্গ ত্রাসিতম্‌" নামে খ্যাত।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে এই অখণ্ড রসের ভাব-ধারার নৃত্য-সংগীত ও কবিতাতে অনুভব করেছেন। তাঁর দুই একটি সংগীত ও নৃত্যের রূপ-কল্পনার কথা মনে পড়ে।

'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকের ময়ূরের মত নাচেরে,'

'হে রুদ্র বৈশাখ, ওপারে মেঘের জটা উড়িয়ে দিয়ে নৃত্য করে।' 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন হে নটরাজ।' রবীন্দ্রনাথের এ কবিতাগুলি নৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হতো। সুতরাং সৃষ্টি বিচিত্র লীলার মধ্যে সেই আনন্দ রসধ্বনির রূপ মানুষ জীবনে যত সাধনা দ্বারা ভাবনা করতে পারবে ততই জগৎ আনন্দময় হবে। অনন্ত রসের কল্পনা, অনাহুত ধ্বনী মহাসাগরে আকাশে-বাতাসে সর্ব সময় উত্থিত হচ্ছে। মানুষের জ্ঞান শক্তির দ্বারা সেই অখণ্ড শক্তির ভাবনার অন্তর্নিহিত করতে পারলেই মানুষের অখণ্ড রস-শিল্পের সার্থকতা হবে।

নতীর জন্ম

(গল্প)

নির্মল দত্ত

★

গত দাঙ্গার কথা মনে পড়লে ছন্দসার গা এখনও শিহরিয়া উঠে।

দরিদ্রের ঘরে জন্ম হইয়াছিল ছন্দসার।

পিতার সহিত সে গ্রামের বাড়ীতেই বাস করিত। ছন্দসার পিতা রাজকুমার চক্রবর্ত্তী ছিলেন পুরোহিত। গ্রামের পুরোহিত—তাই অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিল না। সংসারে তিনটী মাত্র প্রাণী—রাজকুমার, ছন্দসা ও তার মাতা। খাবার লোক অল্প বলিয়াই চলিয়া যাইত তাঁহার সংসার।

শৈশবকাল হইতেই ছন্দসার লেখাপড়াও গানের উপর ভয়ানক ঝোঁক ছিল। তাই রাজকুমার চক্রবর্ত্তী কন্যাকে মেয়েদের স্কুলটীতেই ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ছন্দসা সেখানেই লেখাপড়া শিখিত ও তাহার সাথে সাথে সামান্য কিছু গানও শিখিতে সুরু করিল।

মাইনর স্কুল পাশ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ছন্দসা বসিয়াছিল। কি করিবে ভাবিয়া। সহরের কোন স্কুলে পড়িতে যায় এমন আর্থিক সংগতী তাহার পিতার ছিল না। অগত্যা ছন্দসাকে সকল আশার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইল।

ঠিক এমনি সময়ে কালগ্রাসী তেরশ পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। গ্রামে বেশীর ভাগই জেলে—বাগ্দীর বাস। দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া তাহাদের অধিকাংশই ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল। রাজকুমার চক্রবর্ত্তীর সম্মুখে দেখা দিল মহা সংকট। তাঁহার যজমানেরা সকলেই যদি ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল তাহা হইলে তিনি পৌরহিত্য করিবেন কাহাদের লইয়া?

ছন্দসা একদিন বলিল—চল, আমরা কলকাতায় যাই; বাবা! সেখানে নাকি পয়সা পথে পড়ে থাকে, কুড়িয়ে নিতে পারলেই হ'ল। লোকের ত অভাব নেই কলকাতায়। কয়েক ঘর যজমান বেছে নিয়ে তুমি পূজো-অর্চনা ক'রো। আর আমারও পড়াটা তাহ'লে হয়।"

কথাগুলি মন্দ নহে। একেবারে উড়াইয়া দিতে তিনি পারিলেন না।

তাই রাজকুমার বলিলেন—"তা হয় বটে, কিন্তু কলকাতায় গিয়ে থাকব কোথায়?"

"—সে ঠিক জুটে যাবে। কলকাতায় এত লোকের থাকবার জায়গা হচ্ছে,—এত লোকের অন্নসংস্থান হচ্ছে,—আর আমাদের হবে না? কষ্টে সৃষ্টে ক'টা বছর তুমি চালিয়ে দাও। তারপর আমি লেখাপড়া শিখে চাকরী করলেই কষ্ট দূর হবে।"

কন্যার কথায় রাজকুমার অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"সে কিরে? তুই চাকরী করবি কিরে?"

"—কেন, ওই তো শামুদা সেদিন বললে—কলকাতায়—মেয়েরা তো চাকরী করছেই।"

—মেয়ে মানুষের আবার চাকরী! "ব্যংগ হাসি হাসিয়া রাজকুমার বলিলেন:" অবিশ্বাস যেন তাঁহার মন হইতে দূর হইতে চায় না।

কলকাতায় এক মুসলমান পল্লীর ভিতর একটী বস্তিতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া রাজকুমার তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়া বাসা বাঁধিলেন। দেখিতে দেখিতে বস্তির হিন্দুদের ভিতর প্রায় সকলে ও আশে পাশে দুই চারিঘর তাঁহার যজমানও হইয়া গেল। ছন্দসা একটী স্কুলে ভর্তি হইয়া পড়িল। লেখাপড়ার সাথে সাথে সে কোন এক সংগীত বিদ্যালয়ে গিয়া কিছু কিছু গানও শিখিতে লাগিল।

রাজকুমার খুসীই হন। মাঝে মাঝে ছন্দসাকে বলিয়া ফেলেন—"তুই যদি আমার ঘরে না জন্মে কোন বড়লোকের ঘরে জন্মাতিস!"

ছন্দসা উত্তর দেয়—"তা হ'লে কি হোত! বড় লোকের ঘরে জন্মালেই কি মানুষ সব সময়ে বড় হ'তে পারে?"

রাজকুমার আর কোন কথা বলিতে পারেন না। চুপ করিয়া থাকেন।

দিন বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু ভাগ্যে যখন নাই, ছন্দসার তা, সহিবে কেন!
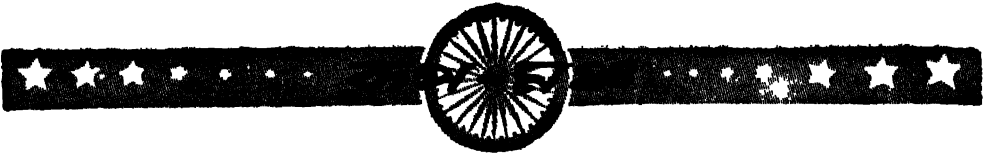
হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়াছে। প্রথম দিন কাটিয়া গেল। এ পাড়ার হিন্দু-মুসলমান উভয়েই আশ্বাস দিয়াছে—যেখানে যাহাই ঘটুক, তাহাদের নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ হইবে না। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত টিকে নাই। বস্তির জলের চৌবাচ্চায় পাশের মুসলমান এক ভদ্রলোকের বড় বাড়ী হইতে কি সব আবর্জনা ফেলিয়াছে। বস্তির সমস্ত অধিবাসীর জলের এই একটী মাত্র ব্যবস্থা—তাই প্রতিবাদ করিতে যাইয়া উভয় পক্ষের মেয়েদের মধ্যে তর্ক বিতর্ক হইতে ঝগড়া এবং ঝগড়া হইতে দাঙ্গার সূত্রপাত হইয়া গেল।

বস্তির প্রায় সকলেই এই দাঙ্গায় মরিয়াছে। রাজকুমার ও তাঁহার স্ত্রীও ইহা হইতে বাদ পড়েন নাই। কেবল বাঁচিয়া গিয়াছিল ছন্দসা। বস্তিতে আগুন ধরিয়া গেলে কেমন করিয়া সে পালাইয়া গিয়া বড় রাস্তায় উঠিয়াছিল এবং সহসা টহলরত মিলিটারী ট্রাকের সাহায্য পাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছিল।

বাঁচিয়া গিয়া ছন্দসার বিপদ যেন আরও বাড়িয়া গেল। দরিদ্র হইলেও এতদিন সে বাপ-মায়ের আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্তে বাস করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে এখন সম্পূর্ণ একা,—নিঃসঙ্গ ও নিরাশ্রয়! এতবড় পৃথিবীতে তাহার আপন বলিতে কেহ আর নাই। তাহার উপর সে নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা তাহার মৃত্যুই শ্রেয় ছিল। ছন্দসা প্রার্থনা করে—হে ভগবান, আমার মৃত্যু দাও। ভগবান ছন্দসার এই প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন কিনা তাহা তিনিই জানেন।

আদ্যপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনিয়া এক পুলিশ অফিসার দয়াপরবশ হইয়া ছন্দসাকে তাহার গৃহে আশ্রয় দিলেন। ছন্দসা আশ্রয় পাইল বটে, কিন্তু তাহার লেখাপড়া বা সংগীত শিক্ষা আর হইয়া উঠিল না। তাহার খুব ইচ্ছা ছিল প্রবেশিকা পরীক্ষাটা অন্ততঃ পাশ করিয়া লইবে· সবই অদৃষ্ট! ছন্দসাকে অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় ঘুরিতে হইল। কিন্তু যেখানেই সে যায়, সেইখানেই সেই
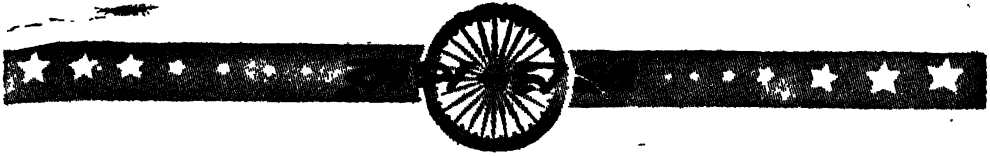
একই প্রশ্ন—কতদূর পড়েছেন, ম্যাট্রিক পাশ করেছেন কিনা, আমাদের একজন গ্রাজুয়েট দরকার ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনিয়া ছন্দসার শুধু হাসিই পায়।

শেষে একদিন সেই পুলিশ অফিসারের পুত্র সুবিজয় রায় ছন্দসাকে বলিল সিনেমায় নামিয়া পড়িতে। সিনেমায় পয়সা আছে। সুবিজয় রায়ের সহিত কোন এক চিত্র প্রতিষ্ঠানের বিশেষ পরিচয় আছে। সে চেষ্টা করিলে একটা কিছু হইয়া যাইতে পারে।

ছন্দসা ভাবিল—মন্দ নয়। গত দুর্ভিক্ষের সময়েও তো তাহাদের গ্রামের কয়েকটী মেয়ে ক্ষুধার তাড়নায় এই সিনেমা লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। সামান্য এই কয়েক বছরে তাহারা বেশ নামও করিয়া ফেলিয়াছে। খবরটা সে কিছুদিন পূর্বে কলকাতায় তাহাদের গ্রামের একটী ছেলের কাছে পাইয়াছিল।

সুবিজয় রায়ের কথায় ছন্দসা রাজী হইয়া গেল।

মহাপ্রস্থান পিকচার্সের মালিক বিশ্বমিত্র সেনের কাছে সুবিজয় ছন্দসাকে সর্বপ্রথম লইয়া গেল। বিশ্বমিত্র সেন সুবিজয়ের বিশেষ পরিচিত। বিশ্বমিত্রের নিকট ছন্দসাকে সে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল—"মেয়েটীকে আপনার কাছে নিয়ে এলাম।"

বিশ্বমিত্র তখন একটী সোফায় বসিয়া ঝিমাইতেছিলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাকে?"

"—এই যে এই মেয়েটীকে।"

"-বাঃ একেবারে বিবি যে! নাম কি?" বলিয়া মদের গ্লাস তুলিয়া পান করিলেন।

বিশ্বমিত্রের এই মন্তব্য শুনিয়া ছন্দসা বা সুবিজয় কেহই সন্তুষ্ট হইল না। চাকুরীর উমেদারী করিতে হইলে নিজের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি কি আসে যায়! ছন্দসা নিজেই আগাইয়া আসিয়া উত্তর দিল—"আমার নাম ছন্দসা।"

"--বিয়ে হয়েছে?"

—না।

"--তা হ'লে চলবে। সিনেমায় অভিনয় করতে চাও?"

—হ্যাঁ।

—তাহলে আমাদের কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে পড়। শিখিয়ে পড়িয়ে আমরা ঠিক করে নেব। মাইনে কিন্তু আপাতঃ দু'শো টাকার বেশী দিতে পারব না।

ছন্দসা হাতে স্বর্গ পাইল। দুই শত টাকাই কি তাহার নিকট কম!

—তা হ'লে একটু বস। ফাইলটা নিয়ে আসি। "আমার সেক্রেটারীটাও এখনও এসে পৌছায় নি।" বলিতে বলিতে তিনি পর্দা তুলিয়া পাশের একটী ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

ছন্দসা বিশ্বমিত্রের পিছন দিকটা পর্যন্তও ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। ভদ্রলোকের বয়স হইয়াছে। মোটামুটি মাথার মাঝখানে একটি বড় টাক। কিন্তু সৌখিনতা একটুও কমে নাই। ঘরটি পরিপাটি করিয়া সাজানো। দেওয়ালে বড় বড় কয়েকখানা ছবি টাঙানো—সবগুলিই প্রায় নারীর—অর্ধনগ্ন। ছোট টেবিলটির উপর মদের বোতল ও কয়েকটি গ্লাস এলোমেলো হইয়া আছে।

বিশ্বমিত্র ফিরিয়া আসিলেন। চুক্তিনামা সই হইয়া গেল। সহি করিল বটে, কিন্তু ছন্দসার মন ঘৃণায় বিষাইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিবার পথে তাই সে সুবিজয়কে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা বলুন তো, সিনেমা লাইনটি কি এই রকম নোংরা?

সুবিজয় হাসিয়া বলিল—মাত্র এইটুকু দেখেই ভয় পেয়ে গেলে?

—আচ্ছা সুবিজয় বাবু, এরা কি ভাল ভাবে থাকতে পারে না?

—প্রথমে হয়তো পারে। কিন্তু এ পথটা এমনি যে, শেষ পর্যন্ত কেউ আর ঠিক হ'য়ে চলতে পারে না।

—কিন্তু আমি ঢুকলে দেখব কেমন ক'রে এরা এমন নোংরামি করে।

সুবিজয় সহসা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল!

ছন্দসা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—হাসলেন যে?

—তোমার কথা শুনে।

—কেন, আমি পারব না।

—কতটুকু?

—অন্ততঃ খানিকটাতো পারব—সেই যথেষ্ট! আমার
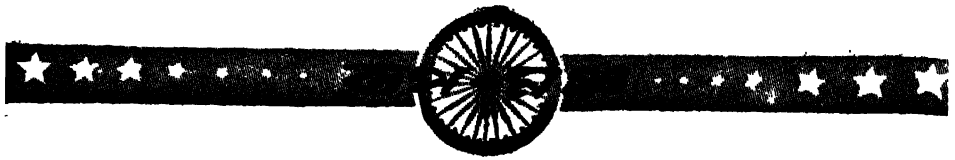
মত সকলেই যদি খানিকটা করে করতে পারে, তা হলেই তো অনেকখানি হ'বে।

—চেষ্টা কর। নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিয়া সুবিজয় একটি সিগারেট ধরাইল।

* * * * *

রিহার্সেল সুরু হইয়াছে।

পরিচালক বলিলেন—দেখুন, মিঃ সেন, শুধু ছন্দসা দেবীকে নিয়েই একটা ইউনিক্ বই তুলব। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ছন্দসা দেবীর প্রতিভা আছে—নাম ক'রে ফেলতে দেরী হবে না।

ছন্দসা একটু হাসিল। মনে মনে বলিল—ভগবান আছেন। সুবিজয় কানে কানে ঠাট্টা করিয়া বলিল—তখন যেন এই হতভাগ্যকে ভুলে যেও না, ছন্দসা!

—পা-গ-ল—ছন্দসা উত্তর দিল।

ছবি উঠিয়া গেল।

সহরে রীতিমত সাড়া পড়িয়া গেল। প্রথম ছবিতেই ছন্দসার নাম দর্শকদের মুখে মুখে। সে নাকি অপূর্ব প্রাণ-ঢালা অভিনয় করিয়াছে এই ছবিতে। অনেক দর্শক নাকি টিকিট না পাইয়া প্রেক্ষাগহ হইতে ফিরিয়া আসে। বিশ্বমিত্র সেন খুশী হইলেন। এতবড় সাফল্য লাভ তাঁহার আর কোন ছবিতেই হয় নাই। ছন্দসাকে তিনি কিছু টাকা বোনাসস্বরূপ দিলেন এবং ভবিষ্যতে ছবির লাভের কিছু অংশ দিতেও প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শেষে ছন্দসার নিকট প্রস্তাব করিলেন—নূতন বাসায় তুমি একলা থাক। হয়ত অনেক অসুবিধা হয়—আমার এখানেই তো নির্বিবাদে থাকতে পার। আমার এ বাড়ীটাও তো কম বড় নয়। তার ওপর আমি তো একাই। তোমার খুব অসুবিধা হবে না।

ছন্দসা উত্তর দিল—আমার একটুও অসুবিধা হচ্ছে না। সুবিজয় বাবু আমার দেখাশুনা করেন।

—হুঁ; সুবিজয় তো করবেই! কিন্তু সুবিজয় বাবু সুবিধের ছেলে নয়, তা জান?

—জেনে আমার লাভ নেই। কারণ, একদিন বিপদে যে আমায় আশ্রয় দিয়েছিল আমার চোখে সে অনেক বড়। অবশ্য আপনিও—আপনিও আমায় চাকুরী দিয়েছেন—সেও আশ্রয় দেওয়ারই সামিল।

—কি যে বল তুমি ছন্দসা! বলিয়া হি হি করিয়া হাসিলেন বিশ্বমিত্র।

একদিন বিশ্বমিত্র ছন্দসাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সেই সংগে রাত্রে খাইবারও নিমন্ত্রণ করিলেন। বিকালের দিকে ছন্দসা আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বমিত্র তাঁহার ঘরে বসিয়াছিলেন। ঘরে ঢুকিতেই ছন্দসাকে তিনি আদর অভ্যর্থনা জানাইয়া বলিলেন—বস।

—আমায় ডেকেছেন কেন বলুন তো? আবার নিমন্ত্রণও?

—হ্যাঁ, কিছু দরকার আছে।

—বলুন।

—দেখ ছন্দসা, তুমি এখন যথেষ্ট নাম করেছ, তোমার খ্যাতি হয়েছে—তাই তোমায় সকলে আদর করে, সম্মান করে, ভালবাসে। তাই তোমার আর এভাবে থাকা নিরাপদ নয়।

—তবে কি ভাবে থাকতে হবে বলুন? ছন্দসা জিজ্ঞাসা করে।

—তোমার এখন বিয়ে করা দরকার।

ছন্দসা আশ্চর্য হইয়া বলিল—বি-য়ে! সে তো সকলে করে—সকলে যা করে, আমি তা করব না।

—কিন্তু বিয়ে করা মেয়েমানুষের ধর্ম!

—আমার সে সময় এখনও হয়নি।

—যথেষ্ট হয়েছে। শোন ছন্দসা, আমি তোমায় ভালবাসি—তাই আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই।

—আপনারা কি সকলেই এই রকম মিঃ সেন! সেদিন পরিচালক শান্তনু দে'ও এই কথা বললেন—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই, ছন্দসা দেবী। আচ্ছা আপনারা কী বলুন তো? রাতদিন 'ভালবাসি' 'ভালবাসি' না ক'রে আপনারা অন্য কোন ভাল কাজ করতে পারেন না? আমাদের দেশের চিত্রশিল্প একঘ'রে হ'য়ে আছে। তাকে এমন ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারেন না—যাতে ক'রে এ শিল্প সমাজের প্রতি ভদ্র ঘরে সমান সম্মান লাভ করবে।
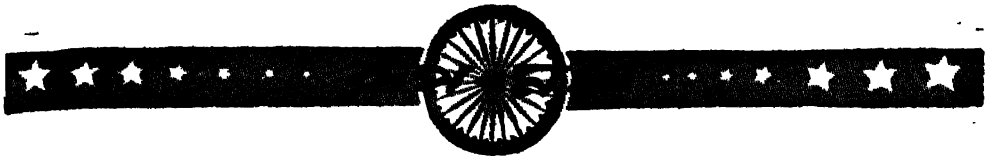
একাজ আপনারা না ক'রলে আর কে করবে?" এতগুলি কথা একসাথে বলিয়া ছন্দসা হাঁপাইতে লাগিল।

বিশ্বমিত্র সেন এইবার রুখিয়া উঠিলেন—দেখ, ওসব বড় বড় কথা এখন রাখ। তোমার যা বর্তমান অবস্থা তাতে সকলেই তোমার দিকে চেয়ে আছে। যে কোনও মুহূর্তে তুমি যে কোনও লোকের ঘরণী হ'য়ে চলে যেতে পার। তাই সমস্যাটা সমাধান আমাকে আগেই ক'রে রাখতে হচ্ছে। আর আমার দাবীও সকলের আগে।

—যেহেতু আপনি আমার চাক্‌রী দিয়েছেন ব'লে।" ব্যংগ করিয়া ছন্দসা বলিল।

—যদি মনে ভাব তবে তাই।

—বেশ তাহ'লে আমিও আমার চুক্তি ভংগ করতে চাই।

—কিন্তু তা আর পারবে না। যে চুক্তি তুমি করেছ তা ভেঙে যেতে তোমার আইনগত বাধা আছে। এমন খেলো চুক্তিনামা আমি কারোর দ্বারা করিয়ে নিই নে।" বলিয়া বিশ্বমিত্র যেন হাসিয়া উঠিলেন।

—তা হ'লে আইনেই দেখা যাবে। বলিয়া ছন্দসা উঠিয়া পড়িল।

—কোথায় যাচ্ছ? যেতে পাবে না। বলিয়া বিশ্বমিত্র দরজা আটকাইয়া ধরিলেন।

—আমাকে আটকাবার ক্ষমতা আপনার নেই—বলিয়া ছন্দসা বিশ্বমিত্রকে জোর করিয়া ঠেলিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

ষ্টুডিওর একটি সেটে ছন্দসার দ্বিতীয় ছবির কাজ হইতেছিল। ছন্দসার মন আজ ভাল ছিল না। তাই সে ঘরের এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

সেটে সট্ লইতে এখনও কিছু দেরী আছে। সুবিজয় ছন্দসার পাশে অনেকক্ষণ হইতেই বসিয়াছিল। সহসা সে বলিয়া বসিল—ছন্দসা, মনে আছে একদিন তোমায় বলেছিলাম, এ হতভাগ্যের কথা হয়ত আর তোমার মনে থাকবে না। এখন তুমি বড় হয়েছ। কিন্তু আমি তোমায় ঠিক আগের মতই ভালবাসি। জানি আমার এ ভালবাসা কোনদিনই সার্থকতায় ভরবে না। তবু আমি তোমায় ঠিক আগের মতই ভালবাসি। তুমি হয়ত বুঝবে না—

কথা শেষ না করিতে দিয়াই ছন্দসা চীৎকার করিয়া উঠিল—যান্ যান্ আমার সামনে থেকে চলে যান। ভালবাসা ছাড়া কি আপনারা কেউ একটা অন্য কথাও জানেন না? আপনারা সকলে মিলে কি আমায় পাগল ক'রে দেবেন?

ছন্দসার এই ব্যবহার সুবিজয় আশা করিতে পারে নাই। তাই নীরবে উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

শট্ লওয়া হইবে। ছন্দসা সেটে গিয়া দাঁড়াইল। পরিচালক ব্যস্ত হইয়া হাঁকিলেন—লাইট্‌স্ লাইট্‌স্। আলো জ্বলিল। পরিচালক আবার হাঁকিলেন—রেডি—সাউণ্ড প্লীজ্।

ছন্দসা অভিনয় করিবে কি রাগে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল।

পরিচালক অবাক হইয়া গেলেন। সকলে হা-হা করিয়া ছুটিয়া আসিল। শট্ লওয়া সেদিন আর হইয়া উঠিল না। ছন্দসাকে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দিয়া সকলে তাহাকে তাহার মোটরে উঠাইয়া দিয়া বাড়ী চলিয়া যাইতে বলিল।

মটরে যাইতে যাইতে ছন্দসা ভাবিতেছিল—তাহার জীবনের কথা। কি দাংগাই না বাধিয়াছিল! তাহাকে নটীর জীবন গ্রহণ করিয়া লইতে হইল! তাহার মত এমনি করিয়া কত নটীরই না জন্ম হইয়াছে। কেহ দুর্ভিক্ষে খাইতে না পাইয়া, কেহ স্বামী পরিত্যক্তা হইয়া, কেহ বা দাংগার কবলে পড়িয়া এই নটীর জীবন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে নটীর জন্ম তো এমনি করিয়াই হয়। স্বেচ্ছায় আর এপথে কয়জন আসে! সকলেই বলে তাহাকে ভালবাসে। পুরুষের এ কি জঘন্য মনোবৃত্তি! সুবিজয়কে আজ সে বকিয়া ভাল করে নাই! যতগুলি লোকের সহিত তাহার এ পর্যন্ত আলাপ হইয়াছে তাহার মধ্যে সুবিজয়ই অনেক শ্রেয়ঃ। সে-ই কোনদিন তাহার নিকট কিছু চাহে নাই। সুবিজয়ও তাহাকে ভালবাসে। বিবাহ যদি করিতেই হয়, তাহাকেই সে করিবে। আজ তাহার বেশী করিয়া তাহার নিজের গ্রামের কথা, তাহার পিতামাতার কথা, তাহার বাল্যজীবনের কথা মনে পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল এই মুহূর্তেই সে অভিনেত্রী জীবন পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যায়। তাহার পর সেখানে গিয়া একটি ছোট্ট সংসার পাতিবে। সে সংসারে থাকিবে সে নিজে আর তার স্বামী ও পুত্র। নিজে হাতে সে
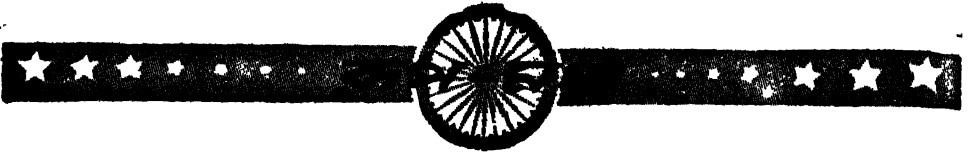
সংসার গুছাইবে। স্বামীর সেবা করিবে, পুত্রের শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে। সেখানে থাকিবে না কোন উপযাচক বা স্তুতিবাদীর দল। সে নিজেই হইবে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী—ছন্দসার চিন্তা বেশীদূর আর অগ্রসর হইতে পারিল না। তাহার মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। তাহার পর আর কিছু মনে নাই।

সর্বাংগ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ছন্দসা শুইয়া আছে। প্রথম চোখ মেলিয়াই দেখিতে পাইল সুবিজয়কে চিন্তিতমুখে তাহার মাথার নিকট বসিয়া থাকিতে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল—আমি কোথায় সুবিজয় বাবু?

—হাসপাতালে। সেদিন আপনার মটর এ্যাক্সিডেন্ট্ হয়েছিল। রাস্তার মোড় ঘুরতে গিয়ে মটরটা উল্টে গিয়েছিল।

—ওঃ।

ছন্দসা আর কিছু না বলিয়া মাথাটা কেবল ফিরাইয়া রহিল।

* * ছন্দসার অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপের দিকে যাইতেছিল। এক সময় ছন্দসা সুবিজয়কে বলিল—আমায় ক্ষমা করবেন সুবিজয় বাবু! আপনি আমার অনেক করেছেন—কিন্তু প্রতিদানে কিছুই দিতে পারিনি। ইচ্ছা ছিল—কিন্তু হ'য়ে ওঠে নি। কেবল অপমানই করেছি।

—ওকথা এখন থাক্ ছন্দসা! বলিয়া সুবিজয় ছন্দসার মাথায় হাত রাখিল।

ছন্দসা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল—এমনি ক'রে নটীর জন্ম যেন আর কারো না হয় সুবিজয় বাবু! একটী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ছন্দসা চোখ বন্ধ করিল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও ছন্দসাকে বাঁচানো যায় নাই। ছন্দসার মৃত্যুর পর সুবিজয়কে কেহ বেশী কথা বলিতে শোনে নাই। শুধু দেখিয়াছে—অভিনেত্রীরা সমাজের কাছে কিভাবে সম্মান পাইতে পারে তাহারই কাজে তাহাকে সকল সময় ব্যস্ত থাকিতে।

বেচুসিংহ পরিচালিত বীরেশ লাহিড়ী চিত্রে অরুণ, স্মৃতিরেখা ও বন্দনা।

বাংলা ছবি ও তার ভবিষ্যৎ

সুখেন্দু বসু

আজকাল প্রায়ই অনেকের মুখে শোনা যায় যে, আর বাংলা ছবি দেখবো না; কারণ বাংলা ছবিতে দেখার মত আর কিছুই নেই যত সব রাবিশ—সব মামুলী কাহিনী আর একঘেয়ে অভিনয়—না আছে অভিনয়ে কোন নৈপুণ্য বা কাহিনীর কোন বৈশিষ্ট্য। অবশ্য সত্যিকারের সামাজিক কাহিনী ছাড়া, কাহিনীর মধ্যে কোন নূতনত্ব বা অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এর যথার্থ কারণ নিয়ে বহুবার বহু রকম ভাবেই আলোচনা হয়ে গেছে কিন্তু এর যথার্থ কারণ আজ অবধি কেউ বোঝবার বা জানবার চেষ্টা করেছেন কিনা জানা নেই। করলেও বোধ হয় কোন উপায় নেই বলে মাথা ঘামান নাই। কিন্তু আমি আজ বাংলা ছবি কোন্ পথে আর তার ভবিষ্যৎ কি—এই নিয়ে আলোচনা করবো। জানি না আমার আলোচনা সকলের ভাল লাগবে কিনা—কিন্তু আমি জানি এ আলোচনা লিখতে গিয়ে হয়তো অতর্কিতে অনেকের উপর দোষারোপ করা হবে। তা হ'লেও সত্যের খাতিরে এটা করা অন্যায় হবে বলে মনে হয় না। কেননা, আজ যাঁরা চলচ্চিত্র জগতের বাইরে, তাঁরা সঠিক জানেন না, কেন ভাল ছবি হয় না এবং কেনই বা প্রযোজকেরা এরকম ছবি করেন—আর ছবি তুলতে এত সময়ই বা লাগে কেন—ছবির মুক্তি পেতে দেরী হয় কেন—কেন নূতন নূতন লোককে পরিচালকের পদে স্থান দেওয়া হয়—ঠিক ঠিক চরিত্র নির্বাচনও হয় না—ভাল ছবি ভাল চিত্রগৃহে মুক্তি না পাবার কারণ এবং যদিই বা ভাল চিত্রগৃহে মুক্তি পায় তো তার চাহিদা থাকা সত্ত্বেও তার স্থায়িত্ব বেশীদিন থাকে না কেন? ইত্যাদি :—

চিত্রশিল্পটি খেলার সামগ্রী বা বিলাসের বস্তু নয়—আজ চিত্র শিল্প পৃথিবীর মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—একথা সকলেই স্বীকার করবেন। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিত্রশিল্পের কি করে উন্নতি করা যায়, তার গবেষণা চলছে এবং চিত্রশিল্পের দ্বারা রাষ্ট্রের এবং দেশের ও দশের কী করে মঙ্গল সাধন করা যায় তা ভেবে দেখবার সময় উপস্থিত হয়েছে। স্বাধীনতার সংগে সংগে যুগের পরিবর্তনও ঘটেছে এবং আমাদেরও অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত এগিয়ে চলতে হবে। আজ সকল সভ্য দেশ ভারতের দিকে চেয়ে আছে—"ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"। আমাদের দেশে নূতন প্রযোজক প্রযোজিত অধিকাংশ ছবিই ভাল হয় না কেন? অভিজ্ঞতা না থাকলে শুধু টাকা থাকলে প্রযোজক হওয়া যায় না। কারণ, তাঁর উপর ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ যিনি ছবির মালিক, অর্থাৎ কিনা যাঁর টাকায় ছবি তৈরী হয়, তিনিই নিজেকে প্রযোজক বলে জাহির করেন। কিন্তু সত্যিকার প্রযোজক হতে হ'লে, যে শিক্ষা, সাধনা এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন—তা অনেকের মধ্যেই থাকে না। প্রথম শ্রেণীর প্রযোজক হ'তে হলে একাধারে অভিজ্ঞতা ও চলচ্চিত্র শিল্পের প্রত্যেক বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা চাই। শুধু খ্যাতির মোহে প্রযোজকের পদ দাবী করলে চলবে না। কি ধরণের গল্প দর্শকসাধারণ পছন্দ করেন এবং তা থেকে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে লাভবান হ'তে পারেন কিনা এসব দীর্ঘদিন এ জগতে কাজ করলে কিম্বা কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকলেই জন্মায়।

আজকাল যখন বাংলা ছবির বাজার একান্ত নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতরেই এবং তাকে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নেমে আসতে হয়েছে—তখন চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলির commercial sense এর অভাব পরিলক্ষিত হওয়ার মানেই হচ্ছে নিজেদের মৃত্যু নিজেরাই ডেকে আনা। আজ এমন দিন এসেছে যে, আমাদের সম্পূর্ণ সচেতন হওয়া উচিত যাতে দর্শকবৃন্দের দিন দিন বাংলা ছবির প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। দর্শকদের রুচির বিরুদ্ধে চিত্র নির্মাণ করলে চলবে না।

আজ আমার সহিত অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, অনেক পরিচালকদের superiority complex এবং খাম-খেয়ালীর দরুণই বাংলা ছবির আজ এই
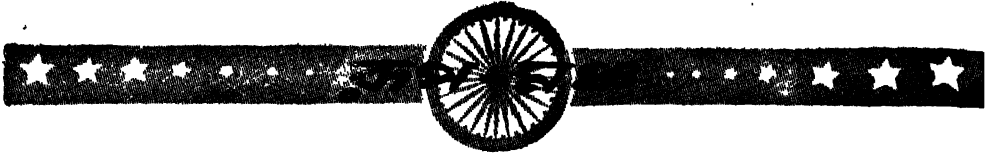
দুরবস্থা। সর্বোপরি অযোগ্য ও অসাধু প্রযোজক এবং অযোগ্য পরিচালকদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে এবং সেই জন্যই বাংলা ছবির মান ক্রমশঃই নিম্নস্তরের হচ্ছে। ছবির মান উন্নত ধরণের করতে হলে প্রত্যেক বিভাগে অভিজ্ঞ ও দায়িত্বসম্পন্ন লোক নিয়োগের প্রয়োজন। এমন লোককে পরিচালক পদে নির্বাচন করা উচিত, যাঁর পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। কিন্তু এমন প্রযোজক যদি হন, যাঁর এ বিষয়ে কিছুই অভিজ্ঞতা নেই, কাকে পরিচালনা দিলে ভাল হয় এবং কিরূপ কাহিনী দর্শক সাধারণ পছন্দ করেন ইত্যাদি—তাঁর চিত্র ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ না করাই উচিত।

টাকার স্বচ্ছলতা ব্যতিরেকে চিত্র ব্যবসায় নামাও উচিত নয়। ছবি তৈরী করার পূর্বে মোট ছবিতে কত খরচ হতে পারে, তার হিসাব ঠিক করে ফেলা উচিত, নচেৎ পরে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। ছবির খরচ নির্ভর করে অভিজ্ঞ প্রডাকসন ম্যানেজারের উপর। কারণ তাঁর হাত দিয়েই ছবির যাবতীয় খরচ করা হয়। প্রডাকসন্ ম্যানেজারের যেমন অভিজ্ঞতা থাকারও প্রয়োজন, তেমনি বিশ্বাসীও হতে হবে। কথায় বিশ্বাস করে অনেকে ব্যবসায় নামেন কিন্তু টাকার স্বচ্ছলতা না থাকলে ছবি আরম্ভ করে কিছুদিন স্যুটিং হবার পর অনেকে মনে করেন, এর পর ছবির বাকীটুকু ব্যয়ভার পরিবেশক বহন করবেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে আশা দুরাশায় পরিণত হ'তে দেখা যায়। এই সুযোগে পরিবেশকরা দেখেন যে, প্রযোজকের গলায় যখন কাঁটা বিঁধেছে তখন আর যাবে কোথায়? তখন তারা এমন Terms দেন যা প্রযোজককে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়। কারণ, এখানে ত এমন কোন Association নেই যাঁদের মধ্যস্থতায় Terms ঠিক হবে? সেরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়মও নেই। যদিও আমাদের বাংলাদেশে Bengal Motion Picture Association নামে একটি Association আছে, তবুও এঁরা এখনও Between Producers & Distributors Terms ঠিক করে দেবার দায়িত্ব নেন না। বাংলার চিত্র ব্যবসাকেবাঁচাতে হলে অবিলম্বে এরূপ সমিতির অগ্রণী হয়ে আইনতঃ Terms ঠিক করেদেবার দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত।

সুন্দর ছবি করতে হ'লে ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষের সাহায্যেরও প্রয়োজন হয়। সংগে সংগে অন্যান্য দায়িত্ব সম্পন্ন বিভাগ গুলিরও পরিপূর্ণ সহযোগিতাও সহানুভূতির দরকার। অধিকাংশ প্রযোজকদের নিজেদের ষ্টুডিও নেই। এঁদের ভাড়া করা ষ্টুডিওতে কাজ করতে হয়। ফলে খরচও হয় অথচ মনোমত কাজ পাওয়া যায় না। বছর দেড়েক পূর্বে দৈনিক ভাড়া বাবদ কেহ কেহ আটশত টাকা থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত হারে ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষকে দিতে বাধ্য হয়েছেন, আজকাল ৫।৬ শত দৈনিক হারে ভাড়া পাওয়া যায়। তাছাড়া ষ্টুডিওতে যতটুকু সহযোগিতা পাওয়া উচিত, তাও পান না। এই সহযোগিতা ও সহানুভূতির জন্য আলাদা সেলামী বরাদ্দ করতে হয় নচেৎ কেহ সহযোগিতা করেন না। এ ছাড়া অনেক আবদারও সহ্য করতে হয়। কোন কারণে যদি প্রযোজকেরা স্যুটিং করতে না পারেন, তাহলেও ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষ ভাড়া কিছুতেই ছাড়েন না। যদি স্যুটিং করতে করতে নির্ধারিত সময়ের একটু বেশী হয়ে যায় তো অমনি তাদের মিটার বেড়ে যায়। আর ষ্টুডিও কর্তৃপক্ষের জন্য যদি প্রযোজককে কোন ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তার আর কোন বিহিত হয় না। এই প্রসংগে শিল্পীদের অসহযোগিতার প্রশ্নও তোলা দরকার—এবং তাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলাও প্রয়োজন।—শিল্পীরা অনেক সময় ভুলে যান যে, তাঁরা শিল্পী, শিল্পের পূজারী। তাঁদের পান থেকে চুণ খস্‌লেই অমনি তাঁদের মান অভিমানের পালা শুরু হয়ে যায় এবং সুযোগ পেয়ে প্রযোজকদের বেগ দিতেও কসুর করেন না। শিল্পের দোহাই ছেড়ে দিলেও তাঁদের জানা উচিত যে, তাঁরা পেশাদার—তাঁরা দয়া করতে আসেন না—এবং পরিশ্রমের পরিবর্তে টাকা নিয়ে যান। এই চিত্র জগতে খুব অল্প সংখ্যক শিল্পীই আছেন, যাদের আচার ব্যবহারে সত্যিকারের শিল্পমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিচালক মহাশয়ের প্রত্যেক বিভাগের সহিত পরামর্শ করে কাজ করা উচিত। তবেই তিনি সহানুভূতি ও সহযোগিতার দাবী করতে পারেন এবং প্রত্যেকের কাজে স্বাধীনতা দেওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদনার উপর ছবির ভাল মন্দ অনেকটা নির্ভর করে।
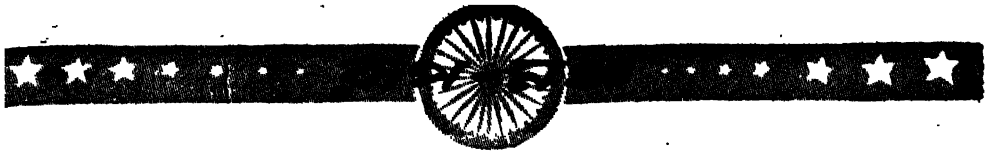
এঁ কাজে ক্রটী থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

ছবির মান নির্ভর করে ভাল গল্প—চরিত্র নির্বাচন—ফটোগ্রাফী—শব্দগ্রহণ—সংগীত পরিচালনা সেটের কারু-কার্য ও ক্রটীহীন সম্পাদনা এবং পরিচালকের পরিচালনার বৈশিষ্ট্য আর সংগীত পরিচালকের সুরের মায়াজালের উপর। গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশের উপরই উপরোক্ত উৎকর্ষ আশা করা যায়। এই নির্বাচনের উপরই প্রযোজক কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন এবং এতেই প্রযোজকের রুচি ও ছবির ভবিষ্যৎ জানা যায়। এই নির্বাচনের উপর যখন ছবির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে, তখন অভিজ্ঞতা না থাকলে এ নির্বাচন সম্ভবপর হয় না।

এই শিল্পটীকে বাঁচাতে হলে পরিবেশকদেরও দায়িত্ব কম নয়। ছবির আর্থিক দিক পরিবেশকদের exploitation এর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ক্রটী পূর্ণ পরিবেশনা হলে ছবির আর্থিক দিক থেকে প্রযোজককে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

দর্শকসাধারণের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ, তাঁরা হলেন চিত্র প্রদর্শক এই সব চিত্রগৃহের মালিকদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। বাংলা ছবির এই দুর্দিন ভেবেও চিত্র-গৃহের মালিকেরা বাংলা ছবির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও হিন্দি ছবি আমদানী করেন এবং তাঁরা একটুকুও ভেবে দেখেন না যে, হিন্দি ছবির তুলনায় বাংলা ছবির গণ্ডী সীমাবদ্ধ এবং এই বাংলা ছবি এই সব চিত্রগৃহের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে। এখন থেকে তাঁরা যদি সজাগ না হন, তবে বাংলা চিত্র ব্যবসায়ের দিন যে ঘনিয়ে আসবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। বাংলা ছবিকে বাঁচাতে হলে হিন্দি ছবি দেখান বন্ধ করতে হবে।

একাধিক চিত্রগৃহে হিন্দি ছবি একাদিক্রমে সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রদর্শিত হচ্ছে। এ সব হিন্দি ছবি বন্ধ করে যে সব বাংলা ছবি মুক্তির অভাবে বাক্স বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেই সব ছবিকে মুক্তি দিতে হবে। যদি চিত্রগৃহের মালিকরা হিন্দি ছবি দেখান বন্ধ না করেন, তবে দর্শক-সাধারণের এই চিত্রশিল্পটীকে বাঁচানোর জন্ত বাংলাদেশে প্রদর্শিত হিন্দি ছবি বর্জন করা উচিত।
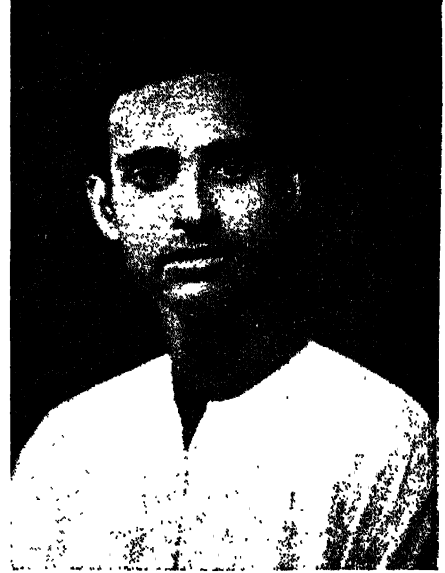
নৃত্যশিল্পী নরনারায়ণ

বর্তমান সংখ্যার অন্যত্র নৃত্য-শিল্প সম্পর্কিত এঁর একটী রচনা প্রকাশিত হ'য়েছে। নরনারায়ণ নিজে একজন যশস্বী নৃত্যশিল্পী।—এঁর পরিচালনাধীনে কলকাতায় একটী স্থায়ী নৃত্য-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী নৃত্য-শিল্পে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হ'য়েছে।

পূর্বে বাংলাদেশ বলতে যা ছিল, এখন পূর্ব পাকি-স্থান হওয়ায় পশ্চিম বাংলার সীমা খুবই ছোট হয়ে গেছে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাতে সিনেমা গৃহের সংখ্যা প্রায় মোট ৩২৫—যার মধ্যে এক কলিকাতার সংখ্যাই হচ্ছে ৬২। পূর্ববঙ্গে চিত্রগৃহের সংখ্যা ১১৭ এবং পশ্চিম বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলে ১৪৬। তা ছাড়া পূর্ব বাংলায় নব প্রবর্তিত নির্ধারিত শুল্ক দিয়ে ছবি পাঠাতে হয়। শুধু তাই নয়—হিন্দি ও ইংরেজী ছবি মিলিয়ে বছরে যে কয়েক কোটি টাকা বাইরে চলে যাচ্ছে, অথচ তার কোন অংশই ফিরিয়ে আনার উপায় নেই, তা' যতটা সম্ভব কিছুটা রোধ করা
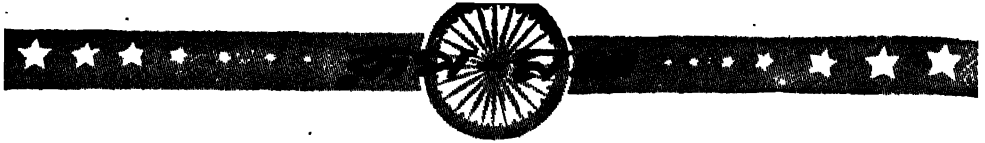
যায় যদি বাংলাদেশের তৈরী ছবি দেশের প্রত্যেক চিত্রগৃহে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়।

চিত্রগৃহের মালিকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছবির আয়ের অর্ধেক নিয়ে নেন। কিন্তু যিনি এই ছবিটীর পেছনে একটা বছর (তার কমই হোক আর বেশীই হোক) সমস্ত শক্তি, সাধনা, অধ্যবসায় ও অর্থ নিয়োগ করেন, তিনি কি পান? যদি দর্শকসাধারণ তাঁর ছবি গ্রহণ করেন, তবে তাঁর নিয়োজিত মূলধন ফিরে পান কিন্তু এমন অনেক সময় দেখা যায়, ছবি ভাল হলেও দর্শকসাধারণের মনে স্থান পায় না। তখন পরিবেশক ও চিত্রগৃহের মালিকদের দৌলতে এক রকম রিক্ত হস্তে ফিরে আস্তে হয়। আসলে যাঁরা এই ছবির মালিক, তাঁদের সহিত চিত্রগৃহের মালিকদের সম অংশ হওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ, যাঁরা বৃক্ষ রোপণ করলেন, তাঁরা তার ফল পেলেন না অথচ চিত্রগৃহের মালিকেরাই ফল ভোগ করতে লাগলেন। বাংলা চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অবিলম্বে এর একটা প্রতিকার হওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া অনেক সময় প্রযোজককে ছবি প্রদর্শনের জন্য চিত্রগৃহের মালিকদিগকে Holdover এর পরিবর্তে Houseprotection বাবদ মোটা টাকা দিতে হয়। এই protection এর জন্য ছবির চাহিদা থাকা সত্বেও প্রযোজক ছবি তুলে নিতে বাধ্য হন। অপর পক্ষে ছবির সংখ্যা বৃদ্ধির হেতু এখন ছবির মুক্তি দেবার জন্য প্রদর্শকদের দরজায় ধন্না দিয়ে মাত্র কয়েকটী সপ্তাহের জন্য ছবির মুক্তির ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়।

ছবির আর্থিক দিক থেকে প্রচারের দায়িত্বও কম নয়। যত ভাল প্রচার হবে ছবির চাহিদা ততো বেশী বাড়ে। ভাল প্রচারের গুণে অনেক বাজে ছবিও উৎরিয়ে যায়। প্রযোজকেরা সচরাচর প্রচারের দিকে মোটেই নজর দেন না। তার কারণ দু'টী। প্রথমটী প্রযোজকেরা মনে করেন যে, ছবি যদি ভাল হয় তো প্রচারের প্রয়োজন কি? অনর্থক বাজে খরচ বাড়িয়ে লাভ কি? কিন্তু প্রচার যদি না হয় তো কি দিয়ে দর্শকদের আকৃষ্ট করবেন? দ্বিতীয় হলো—ছবির যখন প্রচারের সময় উপস্থিত হলো, তখন অর্থের অভাব পরিলক্ষিত হলো। ছবির পরিবেশকেরাও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রচারের দিকে নজর দেন না এবং তাঁদের নিজেদের স্বার্থের জন্য যতটুকু প্রচারের প্রয়োজন, ততোটুকু করে প্রযোজকদের ঘাড়ে খরচটা চাপিয়ে দিতে কসুর করেন না। এই সব কারণে ছবির আকর্ষণ শক্তিও বেশী হয় না।

এসব সত্বেও ছবিখানি যদি দর্শক সাধারণের মনে স্থান পায়, তবে অনেক সময় নিরপেক্ষ সমালোচনার অভাবে এবং দুষ্ট ব্যক্তিদের চক্রান্তে ছবিখানির ভাগ্যে সমূহ বিপদ দেখা দেয়। দর্শকসাধারণ ছবির ভালমন্দ বিচার না করে এই শ্রেণীর সমালোচনার ওপর নির্ভর করেন। যখন তাঁরা ছবি দেখতে যান, তখন আর তাঁদের ছবি দেখে বিচার করার মত ক্ষমতা থাকে না। অনেক নিম্ন শ্রেণীর ছবিও বিজ্ঞাপনের গুণে সমালোচকদের প্রশংসায় উতরে যায়। অতএব ছবির বিচারের ভার দর্শকদেরই নেওয়া উচিত। কারণ, এই বাংলাদেশে নিরপেক্ষ সমালোচকদেরই অভাব।

সর্বশেষে চলচ্চিত্র শিল্পের অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন। চলচ্চিত্র শিল্পের এই প্রয়োজনীয় জিনিষটী হচ্ছে Raw Films। পূর্বে Agfa এবং Kodak এই দুই জাতীয় Film দিয়ে ছবি তোলা হতো এবং দুই এর মধ্যে Agfa ফিল্মই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই Agfa Filmটী Germanyতে তৈয়ারী হতো। কিন্তু যুদ্ধের দরুণ Agfa ফিল্ম না আসায় Kodakই একচেটে ব্যবসা আরম্ভ করে দেয় এবং এর দরুণ Kodak Film এর চাহিদাও যায় বেড়ে। কিন্তু Kodak আজ পর্যন্ত সে চাহিদা মেটাতেও পারে নাই। এক্ষেত্রে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতার প্রয়োজন। তাঁদের শুধু Censor কড়াকড়ি করার দিকে মন দিলে চলবে না। তাঁদের সর্বপ্রকারে শিল্পের উন্নতির জন্য সুবিধা অসুবিধার দিকে নজর দিতে হবে।

তারাসুন্দরী

শ্রীকালিদাস দাশ (রূপদক্ষ)

'রূপ-মঞ্চ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বন্ধু কালীশবাবু স্বর্গীয়া খ্যাতনামা অভিনেত্রী তারাসুন্দরীর সম্বন্ধে দু'এক কথা লিখে জানাতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কিন্তু তারাসুন্দরীর মত মহতী চরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমার এই ক্ষুদ্র লেখনী সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ছে। তবে চেষ্টা করে যদি দু'চার কথা প্রকাশ পায়—আমার লেখনী ও নিজেকে ধন্য বলে মনে করবে।

সেও আজ বহুকালের কথা। আমাদের অনেকেই হয়ত জন্মাননি, যেদিন ৬।৭ বছরের এই শিশু তারাসুন্দরী ছোট্ট এক বালকের ভূমিকায় নাট্যজগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ষ্টার থিয়েটারে। তাঁর এই ছেলেবেলার অভিনয় নাট্যামোদীদের প্রাণে কতটা দোলা দিয়েছিল বলতে পারি না, বা তিনি যে ভবিষ্যতে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদেরই একজন হ'তে পারেন—এ কথা অনুমান করার শক্তি তাঁদের ছিল কিনা জানিনা—শুধু জানি, এ প্রতিভা জন্মগত ছিল।

আমি বলছি ১৯২৫'২৬ এর কথা। তারাসুন্দরী তখন তাঁর নাট্যজীবনের বার্ধক্যে এসে পৌঁচেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ হতে অভিনয় সুরু করে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি তাঁর অপরূপ নটনিপুণতা, সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বর ও নির্দোষ উচ্চারণ ভংগী দিয়ে বহু দর্শককেই বিমুগ্ধ করে গিয়েছেন। চন্দ্রশেখরের 'শৈবলিনী', বলিদানের 'সরস্বতী', বেঙ্গল থিয়েটারের 'রিজিয়া'—এসব ভূমিকায় তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে শুনেছি যে, সে অভিনয় ছিল প্রাণবন্ত ও উচ্চাংগিক। নটসূর্য শিশির ভাদুড়ীর সম্প্রদায়ে "নাট্যমন্দির" (বর্তমান শ্রীরঙ্গম) ও তৎপরে ষ্টার থিয়েটারে বিভিন্ন ছোট ছোট ভূমিকায় আমি তখন অভিনয় করি। আমরা 'কিন্নরী', 'উর্ব্বশী' অভিনয় করেছি। কিন্তু তারাসুন্দরীর 'কিন্নরী'র মকরী 'উর্বশী'র বসন্তকে দেখতে গিয়ে অনেক নতুন টেকনিকের সন্ধান পেয়েছি। ১৯২৬ সালে 'মিত্র থিয়েটারে' তাঁর সংগে আমি প্রথম সংস্পর্শে আসি। তৎকালীন আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'দুর্গেশনন্দিনী'র এক সৈনিকের ভূমিকায় অভিনয় করার সময় তারাসুন্দরীর 'আয়েষা'র চরিত্রাভিনয় আমাকে বিচলিত করে তুলেছিল। শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়েছিল। তারাসুন্দরীর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার প্রবৃত্তি যেন আমার প্রবল হয়ে উঠেছিল। তারাসুন্দরী হয়ত তা লক্ষ্য করে থাকবেন। যদিও জনাব সোরাবর্দি সাহেবের ১৬ই আগষ্টএর কলঙ্কময় ইতিহাসকে ছাপিয়ে যায়নি, তবুও আমি যে রাত্রির কথা বলতে যাচ্ছি, সে রাত্রে কলকাতার বুকে হিন্দুমুসলমানের সামান্য সংঘর্ষ হয়। এই রাত্রেই বরোদাবাবুর 'শ্রীদুর্গা' প্রথম অভিনীত হয় আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে। একদিন 'শ্রীদুর্গা'র শেষ দৃশ্যে শ্রীদুর্গার ভূমিকায় তারাসুন্দরী যখন মহিষাসুর-এর ভূমিকায় নির্মলেন্দু লাহিড়ীকে বধ করবার জন্য উদ্যত হয়ে বলছেন, "মাতা আমি তোর, কিন্তু মাতা আমি সবার"—শ্রীদুর্গার তখন উভয় পার্শ্বে পনেরো ষোল জন দেবতা ঘিরে ছিলেন। এই দেবতাদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আমরা তখন সমবেত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ করব। এই সময় নির্মলবাবু শ্রীদুর্গার দিকে মুখকরে দর্শকবৃন্দকে পিছন করে ছিলেন। স্তোত্র পাঠ শেষ হ'লেই সে রাত্রির অভিনয় সমাপ্ত হ'বে। স্তোত্র পাঠ সুরু হ'ল। দেখা গেল ১৫।১৬ জন দেবতার মধ্যে একমাত্র আমারই স্তোত্র মুখস্থ ভাল মত হ'য়েছে। স্তোত্র পাঠ যখন হচ্ছিল, নির্মলবাবু তখন গোঁফ খুলতে সুরু করেছেন। শ্রীদুর্গা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে দেখে নিলেন। ড্রপ পড়ল। আমরা সব নিজ নিজ পোষাক পরিচ্ছদ খুলবার জন্য বেদী হ'তে নামতে যাচ্ছি—তারাসুন্দরী চীৎকার ক'রে বললেন, "দাঁড়ান সব।" আমরাও এ্যাটেন্সন্। এখানেই বলে রাখি যে, যদিও তারাসুন্দরী কাগজে কলমে ডিরেক্টার ছিলেন না, তবুও তাঁর সহযোগিতা ছিল সবচেয়ে বেশী। তারাসুন্দরীকে যেন আমরা একটু ভয় করেই চলতাম। কোন ত্রুটি হ'লে তাঁর কাছে ক্ষমা ছিলনা। 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই
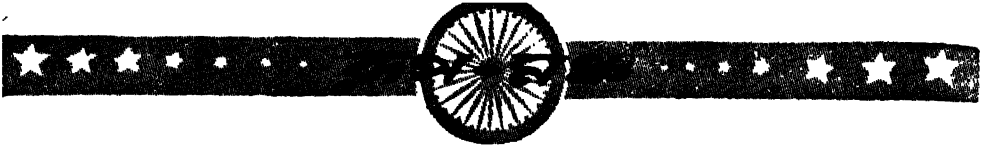
সন্ধ্যা হয়।' নির্মলবাবুকে উদ্দেশ্য ক'রে তারাসুন্দরী বললেন, "নির্মলবাবু! আপনিও যে আজ ছেলেমানুষ দেখছি! অভিনয়ের মাঝে আর বিশেষ করে মহিষাসুর বধের মত একটা গাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ আবহাওয়ায় আমি যখন সেই ভাবধারায় অভিনয় করছি তখন আপনার ঐ ধরণের ছেলেমি না করলেই চলত!" নির্মলবাবুর কোন কিছু বলার সাহস হ'ল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা তো ইতিমধ্যে কাঠ হ'য়ে গিয়েছি। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অনেক দ্রুত হয়ে গিয়েছে! এইবার বুঝি আমাদের পালা!" প্রথমে তিনি আমাকে স্তোত্রটি মুখস্থ বলতে বললেন। ভয়ে ভয়ে বললাম। ভাবলাম বুঝি বা বলবেন—'জিব পরিষ্কার ক'রে এস।' কারণ কথায় জড়তা আসলে তিনি একথা প্রায়ই বলতেন। "আজ কদিন ধরে শ্রীদুর্গা হচ্ছে তা স্তোত্রটি সব দেবতাদের মুখস্ত হ'ল না! 'বাবারা ফাঁকি দিয়ে জগতে বড় হওয়া যায় না।"—একথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমরাও পরস্পর মুখ চেয়ে পোষাক ছেড়ে সে রাত্রের মত নিষ্কৃতি পেলাম।

আর একদিনের ঘটনা—'খাসদখল'এ 'মাইতি'র ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনয় করার কথা—হাজার হাজার বিজ্ঞাপন বিলি করা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সে রাত্রে এক বিপদ ঘটল। ধীরেন দা'র গলা গেল ভেঙে, তার উপর রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হবার সময় তিনি যে টাকার থলেটি সংগে নিয়ে আসছিলেন, সেটা ট্যাক্সিতে ফেলে আসেন। ধীরেনদা'র অভিনয় করা সে রাত্রে সম্ভব হ'ল না। ধীরেনদা আমাকেই বললেন, "কালি—তোমাকেই মাইতি সাজতে হচ্ছে।" আমি স্তম্ভিত হ'লে তিনি বললেন, "আর কোন উপায়ই নেই।" "কিন্তু আমি যে বইখানা একবারও পড়িনি।" আমাদের দাদু শ্রীযুক্ত অমৃতলাল আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় কি—নেবে যা।" প্রম্পটার মনিমোহন দা'ও একই কথা বললেন। ভয়ই বা কিসের? তারাসুন্দরীর! কিন্তু আজ তো আমার কোন দোষ নেই। মাইতির ভূমিকায় প্রথমেই একটি গান তারপর তারাসুন্দরীর প্রবেশ। মঞ্চে প্রবেশ করার পূর্বে আমি তারাসুন্দরীর কাছে দেখা করতে গেলাম। তারাসুন্দরী স্নেহ ভরে আশীর্বাদ করে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, অভিনেতার ভয় থাকা উচিত নয়। রিহারস্যাল তো শুনেছ প্রম্পটার-এর দিকে একটু কান খাড়া করে ভাবে অভিনয় করে যেও। আটকে গেলে রিপিট কোরোনা—অংগভংগি করে চালিয়ে নিও। তবেই তো তোমার বাহাদুরী।" প্রম্পটার যখন গান করতে নির্দেশ দিলেন তখন আমি নির্বাকে কতকগুলি অংগভংগি দেখাতে সুরু করলাম। কিন্তু তারাসুন্দরী ভাবতেও পারেননি যে, তিনি যা শেখালেন তার পরীক্ষা এত সহজেই দিতে পারবো। মনে নাই—কী কথা বলে তিনি ষ্টেজে নামলেন তবে তাঁর অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও অপূর্ব অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে দর্শকদের এই মস্ত বড় ত্রুটিও বুঝতে দিলেন না। সে রাত্রে অভিনয় শেষ হলে তারাসুন্দরী রসরাজ ও মেজকর্তা জ্ঞানবাবুর কাছে আমার প্রশংসা সুরু করলে আমি বাধা দিয়ে বললাম, আর ঠাট্টা করবেন না। পরে বলে ফেললাম "আপনার শিষ্য হ'তে পারবো কিনা তারই পরীক্ষা করছিলাম। "সকলেই তো হেসে উঠলেন। ধীরেন দা পকেট হতে কী বার করে আমার পকেটে পুরে দিলেন। বুঝলাম পুরস্কার মিলল।

আর একদিনের কথা আমি না বলে থাকতে পারব না। যেদিন আমি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলাম যে, তারাসুন্দরী শুধু অভিনেত্রীই নন, তিনি একজন চিন্তাশীল ও বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা যিনি ভালর মর্যাদা দিতে কখনই পশ্চাৎপদ হন না। সেদিন মনমোহন বোর্ডে 'সংসার'-এ 'ঝামাঝি'র ভূমিকায় তারাসুন্দরী অভিনয় করবেন। আর ঝামাঝি প্রভুপত্নীকে চা-বাগানের কুলির কাছে বিক্রী করে যে টাকা আনবেন—সেই টাকা আমাকে চুরাচুরী করতে হ'বে। সেদিন আমি এক ঠোঁটকাটার মেকআপ নিয়ে মঞ্চে গেলাম। তারাসুন্দরী যখন ষ্টেজে অভিনয় করছেন, আমার তখন প্রবেশ। আমার অদ্ভুত মেক-আপ-এ তাঁর খুবই হাসি পেয়েছিল। সেটা আমি বেশ বুঝতে পারলেও দর্শকসমাজের ঠাওর করা দুরূহ ছিল। দৃশ্য শেষে তিনি আর থাকতে পারলেন না। একেবারে হেসে গলে গেলেন। এত হাসতে তাঁকে কোনদিনই দেখিনি। এতদিন ভাবতাম
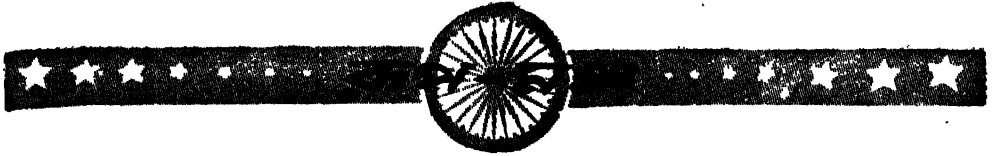
তিনি বুঝি আমোদপ্রিয় নন। যাক্ সে ভ্রান্ত ধারণা আমার দূর হ'ল। দৃশ্য শেষে তিনি আমাকে মেজকর্তা (জ্ঞানবাবুর) ঘরে ধরে নিয়ে গিয়ে আমার রূপসজ্জা দেখিয়ে দিলেন। জ্ঞানবাবু প্রথমটা ব্যাপারখানা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপারখানা কী?" জ্ঞান বাবুর ভাবখানা দেখে মনে হ'ল, এ ধরণের মেকআপ নেওয়া আমার অন্যায়ই হয়েছে। এদিকে অন্য আর্টিষ্টদেরও ফিসফাস বলতে শুনেছি,—"সবতে নূতন ধরণের মেকআপ করা কালি'র একটা বায়না"। দেখলাম, তারাসুন্দরী গোপনে জ্ঞানবাবুর কানে কানে কী সব বলে গম্ভীরভাবে আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে চলে গেলেন। মেজকর্তা একটু মুচকি হেসে বললেন, "আমার সংগে দেখা করে যেও।" 'হেসে একেবারে গলে যাওয়া'—কানে কানে ফিসফাস আবার পরক্ষণের 'তীক্ষ্ণদৃষ্টি'-- মাথাটা যেন গোলমাল হয়ে গেল। একবার মনে হ'ল তারাসুন্দরীর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই—কিন্তু সে আশা নাই দেখে জ্ঞানবাবুর সংগেই দেখা করলাম। তিনি আমার হাতে দশটা টাকা দিয়ে বললেন—"এ তোমার পুরস্কার। আর বর্ত্তমান মাস থেকেই তোমার দশটাকা বেতন বৃদ্ধি।" ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কিন্তু পরে আর সংশয় থাকল না। মনে মনে তারাসুন্দরীকেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম। কারণ এসব তাঁর প্রচেষ্টাতেই সফল হয়েছিল।

রঙ্গমঞ্চের সম্রাজ্ঞী তারাসুন্দরী বিখ্যাত নাট্যকার গিরিশ ঘোষের অধীনে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন এবং বৃদ্ধা বয়সে শ্রদ্ধেয় অভিনেতা অপরেশ মুখার্জী ও শিশির ভাদুড়ীর সহিত অভিনয় করে যান। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গালয় থেকে শেষ বিদায় নিয়ে তারাসুন্দরী ভুবনেশ্বরে তাঁর অবশিষ্ট জীবন এক দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেব সেবায় অতিবাহিত করেন।

চলচ্চিত্রে ম্যাডানের 'সরলা'র শ্যামা; 'শান্তি কি শান্তি'র পার্ব্বতী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়ার সবাক 'সাবিত্রী'তে শৈব্যার ভূমিকায় ইনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। মৃত্যুকালীন এঁর বয়স ছিল ৬৬ বৎসর।

আজকের দিনে জনসাধারণ নাট্য জগতে তারাসুন্দরীকে আর দেখতে পাবেন না। তাঁদের শুধু আমাদের কথার উপর বিশ্বাস রেখেই বলতে হবে—"তারাসুন্দরীর মত অভিনেত্রী আজও জন্মগ্রহণ করেন নাই।" তারাসুন্দরীর সন্তান শ্রীযুক্ত মাণিক বড়াল বর্ত্তমানে 'সূর্য্য ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউসন'-এর সংগে জড়িত আছেন।

তারাসুন্দরীর প্রিয়তমা শিষ্যা কৃষ্ণভামিনী তাঁকে অনেকটা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু ভগবান বিরূপ, তাই অতি অল্প বয়সেই কৃষ্ণভামিনী দেহত্যাগ করেন।

স্বর্গত অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী জ্ঞাপন করে আমরা তাঁদের আশীর্বাদ ভিক্ষা করব।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের রহস্যচিত্র

'কালোছায়া'

ভূমিকায় :

শিপ্রা দেবী, শিশির মিত্র
ধীরাজ ভট্টাঃ, গুরুদাস বন্দ্যোঃ
নবদ্বীপ হালদার, শ্যাম লাহা
হরিদাস চট্টোঃ, নৃপেন্দ্র মিত্র
প্রভৃতি

রচনা ও পরিচালনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র

বাজী রেখে বন্ধুদের দেখাবার মত ছবি হল 'কালোছায়া' অথচ যাতে বাজী হারবার ভয় নেই। আপনার বন্ধু যত বুদ্ধিমান ধুরন্ধর হোন 'কালোছায়া' চিত্রের কাহিনীর পরিণতি কল্পনা করা তাঁর স্বপ্নেরও অতীত। অতীতে এ রকম ছবি বাংলাদেশে তোলা হয়নি, ভারতবর্ষেও নয়। একমাত্র বিদেশে তোলা রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা চিত্রের মধ্যেই 'কালোছায়া'র কাহিনীর তুলনা চলতে পারে।

সম্পাদকের দপ্তর

[পূজা ও ঈদের সমারোহ কেটে যাবার পর পাঠক-পাঠিকাদের সংগে আবার মিলিত হচ্ছি বর্তমান বিভাগে। একটি মাস কেবল এই বিভাগটি বন্ধ ছিল—প্রতি বছরই থাকে। এই একটি মাসের ব্যবধানে সম্পাদকের দপ্তরে যে পরিমাণ চিঠি এসে জমেছে, তার সংখ্যা একদিকে যেমনি আমায় চিন্তিত করে তুলেছে—অপরদিকে তেমনি বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছে। চিন্তিত হ'য়েছি এইজন্য যে, এতগুলি চিঠির জবাব কতদিনে দিতে পারবো! বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়েছি এই বিভাগটির প্রতি জনপ্রিয়তায়। রূপ-মঞ্চের প্রতি বাঙালী পাঠক-সমাজের আন্তরিক সহযোগিতায়! তাঁরা নিছক কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নানান প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করেননি—বেশীর ভাগ পাঠক পাঠিকাদের চিঠির ভিতর দেখতে পেয়েছি রূপ-মঞ্চকে আরো নিখুঁত ক'রে তুলবার জন্য নানান পরিকল্পনার আভাষ। রূপ মঞ্চ কর্মীরা যেমনি নিষ্ঠা ও পরিশ্রম দিয়ে রূপ-মঞ্চের রূপ বিন্যাসে তৎপর হ'য়ে ওঠেন পাঠক সাধারণের চিন্তা ও পরিকল্পনায় তার চেয়ে কিছুমাত্র কম আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয়নি। তাই রূপ-মঞ্চের পাঠক-সাধারণকে আজ শুধু বলতে ইচ্ছে করে, 'তোমরা আমাদের প্রণাম নাও। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও অজ্ঞানতার মাঝে তোমরা এমনিভাবে চিরদিন আমাদের সামনে আলোক-বর্তিকা তুলে ধরো—রূপ-মঞ্চকে চির প্রজ্জল রেখে অবিশ্বাসী, নিন্দুক ও পরশ্রীকাতরদের চোখ আমরা ঝলসে দিতে পারবো।'

বিজয়া ও ঈদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার সংগে সংগে শারদীয়া-সংখ্যাকে অভিনন্দিত করে অসংখ্য পত্র এসেছে ভারত ও পাকিস্থানের বিভিন্ন স্থান থেকে। এসেছে ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল, ইংল্যাণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে। পরম শ্রদ্ধার সংগেই সকলের অভিনন্দন আমরা গ্রহণ করেছি। স্থানীয় শিল্পী, প্রযোজক ও বিশেষজ্ঞগণ ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করেছেন। রূপ-মঞ্চ তাঁদের কঠোর সমালোচনায় সচেতন করে তোলে—নির্মম আঘাত দিয়েও কম বেদনা দেয় না—আবার তাঁদের হ'য়ে অপরের আঘাত বুক পেতে নিতে রূপ-মঞ্চই সকলের পুরোভাগে যেয়ে দাঁড়ায়। রূপ-মঞ্চকে তাই তাঁরা জানেন তাঁদেরই মরমী বন্ধুরূপে—জনসাধারণ ও তাঁদের মাঝে মিলন-সেতুরূপে। রূপ-মঞ্চের কৃতকার্যতার মূলে এঁদের অবদানকেও কখনও অবহেলা করবার নয়। দুর্গাপূজা এবং ঈদ এই সামাজিক অনুষ্ঠানেও রূপ-মঞ্চ পাঠক সাধারণের মত রূপ-মঞ্চ এবং তাঁর কর্মীদের প্রতি এঁদের যে আন্তরিকতার পরিচয় পেয়েছি, তাকে ভুলবো কেমন করে! সহর এবং মফঃস্বল থেকে রূপ-মঞ্চ পাঠকসাধারণ ঈদ ও বিজয়ার সম্ভাষণের সংগে সংগে নিজ নিজ প্রথা অনুযায়ী রূপ-মঞ্চ কর্মীদের জন্য নানান মিষ্টি দ্রব্যাদি ও যৌতুক পাঠিয়েছিলেন। কেউ পাঠিয়েছিলেন কাপড়, কেউ গেঞ্জী, কেউ প্রসাধন সামগ্রী, কেউ লজেন্স, কেউ বিস্কুট, কেউ কলম এমনিভাবে উপহার দিয়ে আমাদের আন্তরিকতাসূত্রে বন্ধন করেছেন। প্রতিটি জিনিষ রূপ-মঞ্চ কর্মী ও কার্যালয়ে উপস্থিত বিভিন্ন বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হ'য়েছে। এই প্রসংগে কয়েকজন প্রেরকের নামোল্লেখ কচ্ছি। প্রখ্যাত চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা ছবি বিশ্বাস প্রযোজিত 'সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিঃ'-এর পক্ষ থেকে অচিন্ত্যকুমার, বিভা ফিল্‌ম্‌ প্রডাক্‌সনের স্বত্বাধিকারী বলাই পাচাল, প্রখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা কমল মিত্র, জীবেন বসু, জনপ্রিয় অভিনেত্রী রেণুকা দেবী, উদীয়মান অভিনেতা দেবীপ্রসাদ চৌধুরী ও সুজিত চক্রবর্তী, লীলাময়ী পিকচার্সের দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী, কল্পচিত্র মন্দিরের ভূতনাথ বিশ্বাস, পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অভিনেত্রী মীরা মিশ্র, লীলা দাশগুপ্তা, শেফালী সেনগুপ্তা, ইলা চক্রবর্তী, প্রতিভা বিশ্বাস, ইন্দুপ্রভা দেবী, আনীস খাতুন, মহম্মদ রফিক, গায়ত্রী দত্ত, কমলা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্‌, বসু বিশ্বাস এ্যাণ্ড কোং, রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী, ওয়াছেল মোল্লা এ্যাণ্ড সন্স, কোণার্ক কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিস্‌ লিঃ, মীরা

কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিস্ লিঃ, লিলি বিস্কুট কোং লিঃ, ধর টিন ফ্যাক্টরী প্রভৃতি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নাম এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। শারদীয়া সংখ্যার জন্য জনসাধারণ কতখানি উন্মুখ হ'য়ে ছিলেন তাঁর প্রমাণ আমরা ছাড়া আরো অনেকেই পেয়েছেন—যাঁরা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমীর অন্ততঃ যে-কোন একদিন রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে পদার্পণ করেছেন। দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে ভিড় ঠেলেই তাঁদের আসতে হ'য়েছে। সপ্তমীর দিন বিকেলের দিকে শারদীয়া রূপ-মঞ্চ আংশিকভাবে সহরে আত্মপ্রকাশ করে। একাদশী-দ্বাদশীতে স্থানীয় বিক্রেতাদের সম্পূর্ণ চাহিদা মিটিয়ে দিতে আমরা সক্ষম হই। মফঃস্বল গ্রাহক এবং বিক্রেতাদের নবমীর দিন থেকে কাগজ সরবরাহ করতে থাকি। প্রায় এক সপ্তাহ লেগে যায় তাঁদের চাহিদা মেটাতে। এ বিষয়ে ডাক ও রেল বিভাগের কর্মীরা আমাদের সংগে যে সহযোগিতা করেছেন, সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এই প্রসংগে শ্যামবাজার পোষ্ট অফিসের বন্ধুবর অমল হালদার ও অন্যান্য বন্ধুবর্গ এবং হাটখোলা পোষ্ট অফিসের কর্মী বন্ধুদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। শারদীয়া সংখ্যা মফঃস্বলে প্রেরণের জন্য প্রায় তিন হাজার টাকার ডাক টিকেট আমাদের খরিদ করতে হয়। ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝতে পারবেন, এত টাকা মূল্যের ডাকটিকিট সংগ্রহে কতখানি অসুবিধা। কিন্তু উপরোক্ত পোষ্ট-অফিসদ্বয়ের বন্ধুদের জন্য আমাদের সে অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। সকলের এতখানি সহযোগিতা পেয়েও কেন রূপ মঞ্চ পূজার পূর্বে প্রকাশিত হতে পারলো না, তার কৈফিয়ৎ পাঠকসাধারণ তলপ করতে পারেন। বর্তমান বছরে পূর্বে থেকে যে নিয়ম-শৃঙ্খলার সংগে আমরা শারদীয়া সংখ্যার কাজে হস্তক্ষেপ করেছিলাম—তাতে পূজার বহু পূর্বেই উক্ত সংখ্যাকে পাঠক সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারতাম; কিন্তু কেন তা পারিনি—তা বলছি। কাগজের মূল অংশের মুদ্রণ কার্য বহু পূর্বেই শেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু ছবির জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়। যে পরিমাণ বৈদেশিক আর্ট পেপার ছবির প্রয়োজনে আমাদের লেগেছে, তা সংগ্রহ করতে বিলম্ব হবার দরুনই সমস্ত পরিকল্পনা ওলোট পালট হ'য়ে যায়। বর্তমান বছরে যে অসুবিধার ভিতর পড়েছিলাম—আগামী বছরে তা শুধরে নেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাঠক সাধারণের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তবু কাগজ প্রকাশিত হবার সংগে সংগে যাতে স্থানীয় এবং মফঃস্বলের পাঠক সাধারণ সংগ্রহ করতে পারেন, সেজন্য বিন্দুমাত্রও গাফিলতির আমরা পরিচয় দেইনি। পূজোর ছুটি উপভোগ করবার সৌভাগ্য রূপ-মঞ্চ কর্মীদের কারোর ভাগ্যেই ঘটে ওঠেনি। আমাদের প্রচার বিভাগ, সরবরাহ বিভাগ, সম্পাদকীয় বিভাগ—কোন বিভাগের কোন কর্মীই একটি দিনের জন্যও কাজে অনুপস্থিত ছিলেন না। এমন কী প্যাকিং-এর জন্য যে সব ছোট ছোট ছেলেরা আছে—তাদের পূজার দিনগুলিও কেটেছে কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়ে। কাজের গতিবৃদ্ধির জন্য আমিও কর্মাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডলকে নিয়ে এদের সংগে প্যাকিং-এর কাজে লেগে যাই।

রূপ-মঞ্চের পাঠকসাধারণ শুনে খুশী হবেন, কাজের চাপ একটু হাল্কা হ'লে এদের সকলকে নিয়ে আমি এবং কার্যাধ্যক্ষ পূজোর সওদা করতে যখন বেরোলাম, তখন পূজোর হৈ-চৈ একদম থেমে গেলেও, প্রতিজনের হাতে নতুন কাপড় ও জামা কিনে দিলে তাদের মুখে যে হাসি ফুটে উঠলো—কোনদিন তা ভুলবো না। সহরের বিক্রয়-কেন্দ্রে মোট বয়ে বয়ে যারা শারদীয়া রূপ-মঞ্চ পৌঁছে দিয়েছে—শিয়ালদহ ও হাওড়াতে যাদের তত্ত্বাবধানে রূপ-মঞ্চ বেয়ে রেলে চেপেছে—যারা প্যাকিং করেছে—এদের প্রত্যেককেই পারিশ্রমিক ও মাহিয়ানা বাদে নতুন কাপড় জামা কিনে দেওয়া হয়। তাছাড়া অন্যান্য বছরের মত রূপ-মঞ্চের প্রতিজন কর্মী এবৎসরও এক মাসের করে পূজা ও ঈদের বোনাস পেয়েছেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক সাধারণ রূপ-মঞ্চের পরিচালনার সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছেন বলেই, এতগুলি কথা বললাম। উন্নাসিকের দল যদি নিজেদের স্বভাববশতঃ ব্যঙ্গোক্তি করেন, তাতে বিন্দুমাত্রও আমাদের আপসোস্ নেই। এবার আসুন আপনাদের চিঠিপত্রের জবাব দি।]
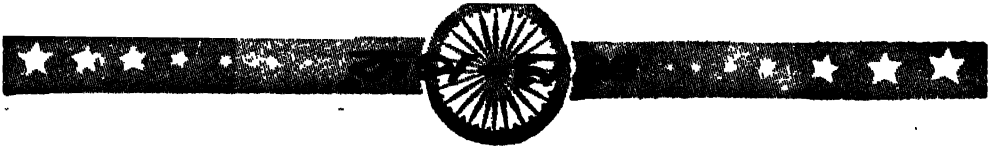
ডাঃ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (রোথসে প্লেস, এডিনবার্গ)

প্রথম পত্র : আসবার দিন হাওড়া ষ্টেশনে আপনাকে আশা করেছিলাম। উচ্চশিক্ষার্থে আমার এখানে আসবার মূলে আপনার উৎসাহ এবং প্রেরণা কোনদিন ভুলবো না। হয়ত কর্মব্যস্ততার জন্য আসতে পারেন নি। তবু আসবার পূর্বে আপনার সংগে যে দেখা করে আসতে পেরেছিলাম, এইটুকুই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি গত ৫।১০।৪৮ তারিখে এখানে পৌঁছেছি। আজ আমাদের দেশে শারদীয়াপূজার নবমী। কাল বিজয়া দশমীর উৎসব সুরু হবে। আমরা এখানে তার কোন আভাষই পাচ্ছি না। চার পাঁচ দিন পর আজকে সূর্যের মুখ দেখলাম। সমস্ত দিন কেবল বৃষ্টি, কুয়াসা আর শীত। এডিনবরাকে স্কটল্যাণ্ডের দার্জিলিং বলা যেতে পারে। এত শীত যে, দিনরাত ঘরের মধ্যে আগুন জ্বেলে রাখতে হচ্ছে। এডিনবরাতে কেবল ছাত্র ছাড়া আর কোন ভারতীয় নেই। যে সমস্ত বাড়ীতে আমরা থাকি, সেখানে 'Break-fast' ও 'Dinner' দেয়। দুপুর বেলা 'Lunch' খেতে হয় বাইরে। একজন ভারতীয় এদেশে এসেছিল অনেকদিন আগে, হয়ত বা পড়াশুনা করতে। তিনি একটা 'flat' ভাড়া নিয়ে 'Indian Association' করেছেন। সেখানে আমরা দুপুরে সবাই যাই Lunch খেতে। পরটা, মাংস, ডাল ও তরকারী পাওয়া যায়। দু'একদিন ভাত বা পানতুয়া পাওয়া যায়। খরচ আজকাল ভয়ানক বেশী। শুধু থাওয়া-থাকা ট্রাম-বাস ইত্যাদিতে প্রায় ২৫ পাউণ্ড পড়ছে। তাছাড়া tuition fee আছে। আমি যে বাড়ীতে থাকি খাওয়া ভালই দেয়। তবে যেদিন Cold-Beef দেয়, সেদিনই আর খাওয়া হয় না। এবার কলকাতায় কেমন পূজা হ'লো? বাগবাজারের প্রদর্শনী হ'য়েছিল কী? শারদীয়া রূপ-মঞ্চের জন্য পথ চেয়ে বসে আছি। তাড়াতাড়ি বিমান-ডাকে পাঠিয়ে দেবেন। দেশের খবর অনেক দিন পাই না। এ দেশে কোন কিছু হ'লে আমাদের দেশের কাগজে Head-line-এ ছাপায়। কিন্তু আমাদের দেশের কোন খবরই এদেশের কাগজে ছাপায় না। এমন কী London Times বা Daily Herald-ও নয়। দেশের খবর পাবার জন্য আমরা উদগ্রীব হ'য়ে থাকি। একখানা (one copy) Weekly Statesman আসে এডিনবার্গে। কাজেই তা পড়বার ভাগ্য কারোরই হয় না। এবার পূজায় কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন কি? রূপ-মঞ্চের কথা আর একবার মনে করিয়ে দিয়ে বিদায় নিচ্ছি।

'যে নদী মরু পথে' চিত্রে ফণী রায়

দ্বিতীয় পত্র :
ইতিপূর্বে আপনাকে এক পত্র দিয়েছি, আশা করি পেয়ে থাকবেন। আমার বিজয়ার অভিনন্দনের সংগে আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন—শারদীয়া রূপ-মঞ্চের জন্য। গতকাল বিমান ডাকে কাগজখানা হাতে এসেছে। রবাহুতের মত প্রথম থেকে তার শেষ পর্যন্ত গিলেছি। শুধু আমিই নই আমার সংগে সংগে আরও কয়েকটী ভারতীয় ছাত্রও। কাগজখানা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আর একবার দেখবার অবকাশ এখনও পাইনি—এখন হাতে হাতে ঘুরছে। যেটুকু দেখেছি, তাতেই প্রশংসা না করে পারবো না। প্রথমেই যে অভিনব সূচী সন্নিবেশ করেছেন সাংবাদিকতার ইতিহাসে রূপ-মঞ্চই এর মৌলিকত্ব ও অভিনবত্ব দাবী করতে পারবে। প্রতিটি রচনা—সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত।
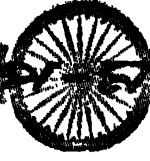
ছবির পাতায় আমাদের পরিচিত শিল্পীদের দেখে যেন চোখ জুড়িয়ে গেল।

●● আপনার পর পর দু'খানা চিঠিই যথা সময়ে পেয়েছিলাম। ব্যক্তিগতভাবেও উত্তর লিখে দিয়েছি—ব্যক্তিগতভাবে যেগুলি জানতে চেয়েছেন তাতেই লিখেছি। বি, বি, সির কমল বসুকেও চিঠি লিখে দিয়েছি—আপনি রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে তাঁর সংগে যোগাযোগ স্থাপনে চেষ্টা করবেন। প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও ষ্টেশনে যেয়ে বিদায় অভিনন্দন জানাতে পারিনি—সেজন্য ক্ষমা করবেন। আশা করি যে কাজের জন্য আপনি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে সুদূর এডিনবার্গে শিক্ষা লাভ করতে গেছেন—তাতে কৃতকার্যতা লাভ করে মঙ্গলমত দেশে ফিরে আসুন। দীর্ঘদিন পরাধীন থেকে আমরা স্বাস্থ্য হারিয়েছি—সম্পদ হারিয়েছি। আপনারা স্বাধীনদেশের নবীন সূর্য—দেশ দেশান্তর থেকে জ্ঞানের ভাণ্ডার লুটে পুটে নিয়ে আসুন—দেশবাসীর জন্য। আপনাদের কৃতকার্যতায় আমাদের বুক দশ হাত উঁচু হয়ে উঠুক।

ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিংহল, ইংল্যাণ্ড ও মার্কিণ দেশেও রূপ-মঞ্চের গ্রাহক রয়েছেন। এঁদের বেশীর ভাগই উচ্চশিক্ষার্থে গিয়েছেন। অবশ্য মালয়, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা ওখানকার স্থায়ী বাসীন্দা। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সেলস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন লিঃ প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসে
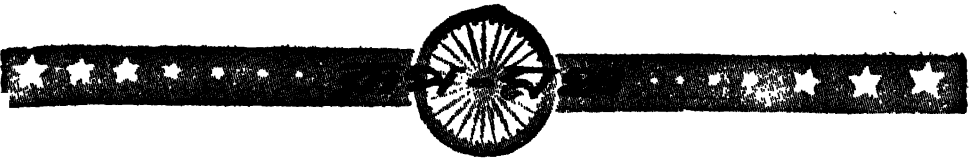
১০ খানা করে রূপ-মঞ্চ নিয়ে থাকেন। বিদেশস্থিত সমস্ত গ্রাহক ও এজেন্ট-দের কাগজ এবার বিমানযোগে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল। এজন্য ঝুঁকি অবশ্য আমাদের খানিকটা বেশী নিতে হ'য়েছিল, তবু আপনারা যে সময় মত কাগজ পেয়েছেন, এজন্য খুশী হ'য়েছি। বিদেশে শারদীয়া রূপ-মঞ্চ আপনাদের আনন্দ দিতে পেরেছে—এও আমাদের কম তৃপ্তির কথা নয়! বাগবাজারের প্রদর্শনী যথারীতি অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। পূজা কী ভাবে কেটেছে এই বিভাগের প্রারম্ভেই জানতে পারবেন।

বিভূতি নন্দন সরকার
(সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ)

আপনাদের পূজা-সংখ্যা রূপ-মঞ্চ এপিঠ ওপিঠ করে দেখলাম, দেখে কোনরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে পারলুম না। বড়ই দুঃখিত যে, প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা উলটাইয়া দেখিলাম শ্রীমতী রেণুকা রায়ের যে ছবিটি দিয়াছেন, তাহা মনে হয় ফুটপাতে চারি আনা করিয়া বিক্রয় হয়।...আপনাদের রুচি কেমন জানিনা। আমার মতে সব থেকে এই বৎসরের শারদীয়া রূপ-মঞ্চ সব চেয়ে বাজে হইয়াছে। যে অনুপাতে প্রশংসা পত্র বাহির করিয়াছিলেন যে, যে-কোন শারদীয়া সংখ্যার সংগে যাচাই করে নিতে পারেন। সে অনুপাতে মোটেই ভাল হয় নাই। একরকম ছেলে ভুলানো হইয়াছে। আড়াই টাকা মূল্যও অত্যাধিক। পত্রের উত্তর দিবেন। অনেক কথা বল্লাম বলে মনে কিছু করিবেন না।
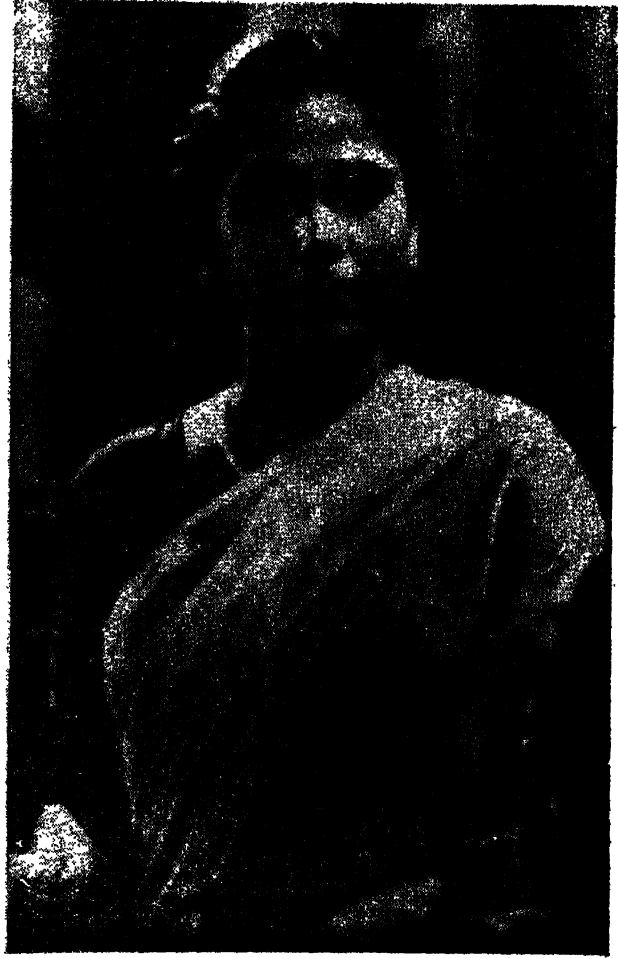
অভিনেতা বেচু সিংহ প্রযোজিত পরিচালিত 'বীরেশ লাহিড়ী' চিত্রে বঙ্কনা।

●● আপনার অভিযোগ পত্র প্রকাশ করে যতখানি স্থান অপব্যয় করলাম, তার জন্য রূপ-মঞ্চের অন্যান্য পাঠক সাধারণের কাছে যে আমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে, তা জানি। কারণ ইতিপূর্বেও এই ধরণের বালসুলভ অভিযোগের স্থান করে দিয়ে তাঁদের কাছে আমি তিরস্কৃত হ'য়েছি। তিরস্কার করবার অধিকার তাঁদের আছে। তবু আপনার পত্র-প্রকাশ করলাম এবং উত্তর দিচ্ছি এই মনে করে যে—
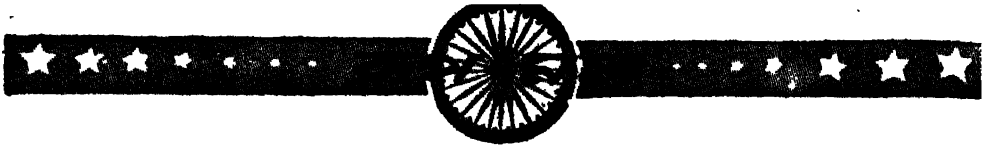
শারদীয়া সংখ্যার মানের বিরুদ্ধে এই একটা মাত্রই অভি-যোগ পত্র আমি পেয়েছি পাঠক সাধারণের তরফ থেকে। অন্য যেসব অভিযোগ এসেছে তা কাগজের মানের বিরুদ্ধে নয়—এসেছে বিলম্বে প্রকাশিত হবার বিরুদ্ধে। রেণুকা রায়ের ছবিটি বোর্ণ এ্যাণ্ড শেফার্ড গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের দিয়ে শ্রীমতী রেনুকার ১৮ খানা ছবি তোলানো হয় এবং সেগুলির ভিতর থেকে নির্বাচকমণ্ডলী এই ছবি খানাকেই রঙিন পাতায় দিতে বলেন। নির্বাচক-মণ্ডলী প্রত্যেকেই শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁদের রুচিকে আপনি ফুট পাতের ধুলোতে মিশিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে। রূপ-মঞ্চ সে অধিকার থেকে আপনাকে বঞ্চিত করেনি—বরং আপনার 'ব্যক্তিকে'ও প্রকট করে তুলেছে। এর চেয়ে আপনার সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারি না। অন্যান্য শারদীয়া সংখ্যার সংগে যাঁচাই করে রূপ-মঞ্চকে কিনতে বলা হয়েছিল—এবং যাতে পাঠকসাধারণ কয়েক মিনিটের মধ্যে ষ্টলে দাঁড়িয়ে এই যাঁচাই করতে পারেন—সেই জন্যই সূচীকে অভিনবভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছিল। রূপ-মঞ্চকে যাঁচাই করবার এত সুযোগ পেয়েও, আপনি রূপ-মঞ্চ কিনে ঠকলেন কেন? তারপর রূপ-মঞ্চত আত্মপ্রকাশ করেছে অন্যান্য অনেক কাগজের পর—সেক্ষেত্রে তুলনা করবারও সুযোগ পেয়েছিলেন। তাহ'লে নিজের বিচারশক্তির অক্ষমতার জন্যই কী রূপ-মঞ্চ কিনে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হ'লো না? দাম সম্পর্কে যে কথা তুলেছেন—যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁরা প্রত্যেকেই শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে এই প্রশ্নই বার বার আমাদের করেছেন—এই দাম রেখে এই খরচা পুষিয়ে যাবে কী আপনাদের?

রূপ-মঞ্চের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করবার অধিকার আপনাদের আছে— সে ত্রুটি বিচ্যুতি সব সময়ই সংশোধনের জন্য আমরা সচেষ্ট থাকি। কিন্তু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করতে যেয়ে এমন কিছু বলবেন না—যাতে আপনার বিচারশক্তি ও বুদ্ধির স্থিরতার প্রতি অন্যের সন্দেহ জাগতে পারে। আপনি বা আপনার মত যদি আরো কেউ থাকেন, তাঁদের সনির্বন্ধ অনুরোধ—রূপ-মঞ্চ ভাল না লাগলে যেন তাঁরা তা না কেনেন। প্রতি সংখ্যায় মূল্য প্রকাশ করা হ'য়ে থাকে। মূল্যের বিনিময়ে পণ্যকে যদি নিকৃষ্ট মনে হয়—কেন অযথা ক্রয় করে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন!

এ, কে চট্টোপাধ্যায় (চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা)
সরল সরকার (শোভাবাজার, কলিকাতা)

●● আপনারা উভয়েই ছুটির দিন বাদ দিয়ে ১০-১১ টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে পারেন। আপনাদের প্রয়োজন বাহ্যতঃ ভিন্ন হ'লেও, মূলতঃ এক। তাই একই সংগে উত্তর দিলাম সাক্ষাৎমত আলোচনা করা যাবে।

অনিল কুমার মজুমদার (মহেশ বারিক লেন, কলি) হিন্দি ও বাংলা ছবির বিজ্ঞাপনগুলি সহরের প্রাচীর থেকে সুরু করে 'সর্বত্র বিজ্ঞাপন মারিবেন না'র অমর্যদা করে রাইটার্স বিল্ডিংসেও দেখা দিয়ে হাওড়া ষ্টেশন পর্যন্ত ধাবিত হয়। ইংরেজী ছবির বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট জায়গা ভিন্ন দেখা যায় না, কিন্তু কলিকাতা সহরে ইংরেজী ছবি বাংলা ও হিন্দি ছবির তুলনায় নেহাৎ কম দেখানো হয় না। ছবি যখন একটি শিল্পকলা—তখন ছবির বিজ্ঞাপন দেবার পদ্ধতিও রুচিসম্মত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাংলা ও হিন্দি ছবির বিজ্ঞাপনদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

●● আপনার অভিযোগ আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করে চিত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রচার সচিবদের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি। আশা করি এ বিষয়ে তাঁরা তাঁদের অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট কর্মীদের উপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে দেবেন।

শ্রী বিশ্বনাথ দাস (মালদহ)

●● আপনি যদি কার্যোপলক্ষে কলকাতায় আসেন দেখা করবেন—যাতে স্যুটিং দেখবার সুযোগ পান, চেষ্টা করবো।
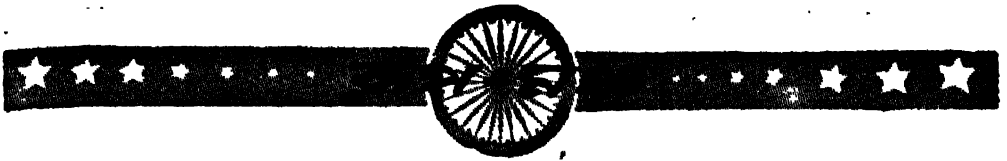
অভিনয়ের সুযোগ করে দেবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। নিজের প্রতিভা থাকলে সুযোগ আপনা থেকেই ধরা দেবে।

কৃষ্ণকাকলী দেব (লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

অঞ্জনগড়ের নায়ক রাজা গাঙ্গুলীর জীবনী ও পর্দার বাইরে একটি ছবি দেখতে ইচ্ছুক।

●● আপনার অনুরোধ রক্ষায় সচেষ্ট থাকবো।

সন্ধ্যা দাস ও সুধীর দাস (গোয়াবাগান লেন, কলিঃ)

সুনীল ঘোষ কি ইলা ঘোষের ভাই ?

●● গায়ক সুনীল ঘোষ গায়িকা ইলা ঘোষের ভাই। তবে শ্রীমতী ইলা বর্তমানে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হ'য়ে ইলা মিত্র হ'য়েছেন।

সুশীল রঞ্জন দাস (হালিসহর, ২৪পরগণা)

পথের দাবীর হিন্দি চিত্রটি কী কোন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করিয়াছে ?

●● বম্বেতে সম্প্রতি 'সব্যসাচী' মুক্তিলাভ করেছে বলে সংবাদ পেলাম।

ছবি চৌধুরী ও রেণু দাস (রামমোহন সাহা লেন, কলিকাতা)।

অলকনন্দা ও ভুলি নাই চিত্রের প্রদীপকুমার কী একই ব্যক্তি ! যদি তাই হয়, তবে একজন বসু ও আর একজন বটব্যাল কেন ?

●● হ্যাঁ, একই ব্যক্তি। প্রদীপকুমারের বংশগত উপাধি বটব্যালই। এঁর আর এক ভাই শিশির বটব্যালকে রামের সুমতি চিত্রে আপনারা দেখেছেন। প্রদীপকুমারকে দেবী চৌধুরাণী ও আগামী বহু চিত্রেই দেখতে পাবেন।

শ্রীশীলাব্রত বড়ুয়া (কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট, কলিঃ)।

(১) রঞ্জিৎ রায় কী চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন? (২) শ্রীমতী নীলা দাশগুপ্তার পরবর্তী চিত্রের নাম কী? (৩) শুনেছি প্রমথেশ বড়ুয়া সুইজারল্যাণ্ড গিয়েছেন—তিনি কবে ফিরবেন জানাবেন।

●● (১) না। শ্রীযুক্ত রায় বর্তমানে তিলোত্তমার সংগীত পরিচালনায় ব্যস্ত আছেন (২) বর্তমানে এখন নাম জানতে
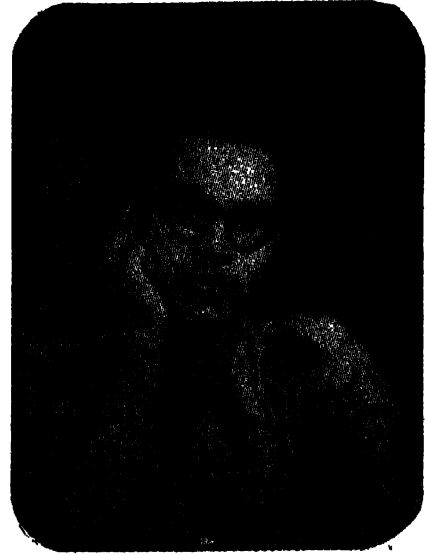
ফণীভূষণ চৌধুরী—এঁর উৎসাহ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা নানাদিক দিয়ে সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীকে সাহায্য করেছে।

পারিনি। তবে পরিচালক সুশীল মজুমদার ও দেবনারায়ণ গুপ্তের পরিচালনায় দু'খানি চিত্রে তাঁকে দেখা যাবে বলে গুজব শুনছি। (৩) শ্রীযুক্ত বড়ুয়া অক্টোবরের শেষে দেশে ফিরেছেন এবং আরো একটি সংবাদ, ভ্যানগার্ড প্রডাকসনের হ'য়ে নাকি তিনি একখানি চিত্র পরিচালনা করবেন।

কাশীনাথ পালিত (নৈহাটি, ২৪ পরগণা)।

গায়ক ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও জগন্ময় মিত্রের মধ্যে কার গলা মিষ্টি এবং কাকে আপনার ভাল লাগে ?

●● এঁদের দুজনের গলাই মিষ্টি। তবে ধনঞ্জয়ের গলা বেশী দরাজ বলে মনে হয়। দু'জনকেই সমান ভাল লাগতো। কিন্তু সম্প্রতি জগন্ময় বাবু যেন একটু ঝিমিয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়। দুজনের নির্দিষ্ট রেকর্ড প্রতিষ্ঠান গুলি এবার শারদীয়ায় দু'জনের যে রেকর্ড প্রকাশ করেছেন, জগন্ময় বাবু গীত রেকর্ডটি ধৈর্য ধরে শুনেও অনুমোদন
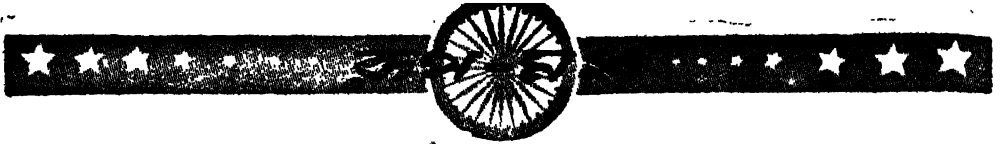
করতে পারলাম না! এ বিষয়ে গানের কথা ও বিষয়-বস্তুকেও দায়ী করবো। আশা করি জগন্ময় বাবু এবিষয়ে একটু অবহিত হ'য়ে উঠবেন। কারণ, আমি নিজেও তাঁর একজন গুণগ্রাহী।

প্রবোধকুমার বাগচী (জামসেদপুর)।

ভুলি নাই চিত্রে অনুপমার ভূমিকায় কি নিবেদিতা দাস অভিনয় করেছেন? মহানন্দ ও রাতুর ভূমিকায় কে কে অভিনয় করেছেন?

●● হ্যাঁ, অনুপমার ভূমিকায় নিবেদিতা দাসকে দেখতে পেয়েছেন। মহানন্দ ও রাতুর ভূমিকায় যথাক্রমে অভিনয় করেছেন—বিকাশ রায় ও সুদীপ্তা রায়।

কমলা ঘোষ (বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা)।

●● আপনি যাঁর ঠিকানা চেয়েছেন—প্রয়োজন না জানালে তাঁর ঠিকানা দেওয়া অসম্ভব। উক্ত শিল্পীই এই অভিমত জানিয়েছেন।

ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (আন্দুল মৌরী, হাওড়া)।

●● মাস্টার শম্ভুকে ভবিষ্যতে রূপ-মঞ্চের পাতায় দেখতে পাবেন।

সাতকড়ি লাহা ও কৃষ্ণচন্দ্র লাহা (মেদিনীপুর)।

প্রতিবাদ চিত্রেব নায়ক রঞ্জনের ভূমিকায় যাকে দেখতে পেয়েছি তিনি কি ছবি বিশ্বাসের ভাই?

●● না। তাঁকে ইতিপূর্বে প্রতিমা চিত্রে দেখতে পেয়েছেন। আগামী বহু চিত্রেও দেখতে পাবেন। তাঁর নাম পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়।

দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (হাওড়া)।

'কালোঘোড়া' চিত্রটি দেখিয়া একটুকুও সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না।

●● বর্তমান সংখ্যায় 'কালোঘোড়া'র সমালোচনা প্রকাশ করা হ'লো। আশা করি আপনার মতের মিল পাবেন এতে।

সুলতানা বেগম (গ্রাহক নং ১৩২৩)।

●● অশোককুমারের জীবনী ভবিষ্যতে জানাবার ইচ্ছা আছে।

বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত (রাধানাথ মল্লিক লেন, কলি)

দীপক মুখোপাধ্যায়কে আগামী কোন কোন চিত্রে দেখিতে পাইব?

●● দাসীপুত্র, ওরেযাত্রী, পদ্মা প্রমত্তা নদী ও আরো কয়েকখানি চিত্রে।

শ্রীমান নিতাই পদ (স্কট লেন, কলিকাতা)

(১) কানন দেবীর ষ্টুডিও কোথায় অবস্থিত? নিজের ষ্টুডিও থাকতে তাঁর প্রথম ছবি কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে তোলা হচ্ছে কেন? (২) সম্পাদকের দপ্তরে রূপ-মঞ্চের পাঠকদের প্রশ্নের ধারা অনুসরণে তাঁদের মন বিশ্লেষণ করে রূপ-মঞ্চে মনস্তাত্বিক সমালোচনা স্থান পাবে কিনা?

●● (১) কানন দেবীর নিজস্ব জায়গায় ষ্টুডিও নির্মিত হ'লেও, মূলতঃ ঐ জায়গার মালিকানা ছাড়া—ষ্টুডিওর সংগে কানন দেবীর আর কোন সম্পর্ক নেই। প্রখ্যাত শব্দযন্ত্রী শ্রীযুক্ত বাণী দত্তের প্রচেষ্টাতেই এই ষ্টুডিওটি গড়ে উঠেছে। এর নাম হ'লো ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিও—চণ্ডী ঘোষ রোড, টালীগঞ্জে অবস্থিত। (২) রূপ-মঞ্চে মনস্তত্বমূলক কোন সমালোচনা প্রকাশ করবার পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করিনি—তবে বহু বিকৃত মস্তিষ্ক পত্রপ্রেরকদের নিয়ে গবেষণার জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তাদের প্রেরিত পত্রগুলি "ওয়েষ্ট পেপার বক্স"এ এতদিন স্থান পেত। সম্প্রতি এগুলি পৃথক একটা ফাইলে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কারণ, এদের সংখ্যা যেন দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সুচিকিৎসার প্রয়োজন। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক—এদের নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলে অন্ততঃ রাঁচীর অনুমতি পত্র সহজেই পাবো, আশা করি।

শ্রীমতী বেলা দত্ত (নীলমনি মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

●● শ্রীমতী অলকাদেবী সম্পর্কে কিছু দিন পূর্বে এক পত্রে আপনি কতগুলি অভিযোগ এনে ছিলেন। আপনার অভিযোগগুলি সত্য কিনা জানিনা। তবে আরো কতগুলি অভিযোগ এসেছে তার বিরুদ্ধে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে। আমি তার সত্যতা সম্পর্কে অন্ততঃ কিছুটা প্রমাণ পেয়েছি।
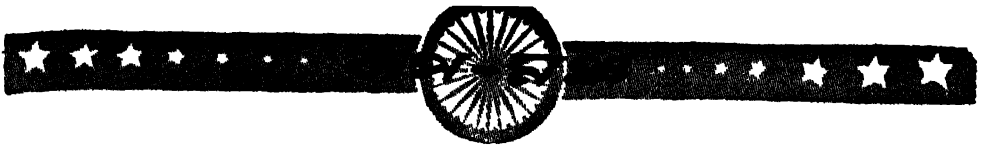
যদিও শিল্পীদের ব্যক্তিগত জীবন আমাদের আলোচনার বাইরে—তবু সত্যকে তাঁরা কেন মেনে নিতে পারেন না - একথা ভেবে সত্যই দুঃখ হয়। এ উদারতাটুকু তাঁদের থাকা উচিত। রূপ-মঞ্চ যেখানে বাইরের যে কোন আঘাত থেকে শিল্প ও শিল্পীদের রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, সেক্ষেত্রে রূপ-মঞ্চকেও ভাওতা দিয়ে যদি এঁরা নিজেদের সত্যকার পরিচয় গোপন করেন, তাকে ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কী বলবো! ভবিষ্যতে এ বিষয়ে যথাসম্ভব সতর্ক থাকবো।

অনিল কুমার ঘোষ (হেয়ার ষ্ট্রিট, কলিকাতা)
কিছুদিন পূর্বে গৌতম গুপ্ত নামে জনৈক প্রিয়দর্শন যুবকের ছবি রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি নাকি কোন চিত্রে আত্মপ্রকাশও করেছিলেন, ছবিটির নাম ও ভূমিকা দয়া করে জানাবেন কী?

●● শ্রীগৌতম গুপ্ত 'বিচারক'-এ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রূপ-মঞ্চ থেকেই তাঁকে দেওয়া হ'য়েছিল। ভূমিকাটির কথা স্মরণ নেই।

শ্রীঅশোক কুমার দত্ত (আগরতলা, ত্রিপুরা স্টেট)
(১) মলিনা দেবীর জীবনী জানিতে ইচ্ছা করি। (২) অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী অভিনয় করবার সময় যেমন তাড়াতাড়ি কথা বলেন, সেরূপ অন্য সময়েও কি তিনি এতো তাড়াতাড়ি কথা বলেন?

●● (১) মলিনা দেবীর জীবনী ইতিপূর্বে প্রকাশিত হ'য়েছে। (২) ব্যক্তিগত জীবনে শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কথা বলার চেয়ে কারোর কথা শুনতেই তিনি ভালবাসেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর গাম্ভীর্যে আপনারা না হেসে পারবেন না। কথা যখন বলেন—এমন ভাবেই বলেন—যেন বলতে বেশী ইচ্ছা নেই অথচ না বললেও চলছেনা অর্থাৎ ফোরণ কাটেন। অবশ্য তাতে তাঁর কৌতুক-প্রবণ মনের ভাব স্বচ্ছ ভাবেই ফুটে ওঠে।

সুধীরচন্দ্র দাস (শশীভূষণ দে ষ্ট্রীট, কলিঃ)
শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যালকে আমরা আর কোন চিত্রে দেখতে পাবো?

●● প্রখ্যাত চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা ছবি বিশ্বাস প্রযোজিত ও পরিচালিত সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলী লিঃ-এর 'যার যেথা ঘর' চিত্রে দেখতে পাবেন।

মিনতি, শিখা ও বরুণ সেন (বালী, হুগলী)
মঞ্চ সম্রাজ্ঞী সরযূবালাকে চিত্র জগতে দেখা যাইতেছে না কেন?

●● শ্রীমতী সরযূবালা বিধায়ক ভট্টাচার্য পরিচালিত 'কৃষ্ণা কাবেরী' চিত্রের অভিনয় শেষ করে বর্তমানে সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর 'যার যেথা ঘর' ও ভারতী চিত্রপীঠ প্রযোজিত দেবনারায়ণ গুপ্ত পরিচালিত 'দাসীপুত্র' চিত্রে অভিনয় করছেন।

তাপস সেন (কাথোনী টি এষ্টেট, আসাম)
●● রাই ডিসেম্বরের পূর্বেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে—তখন আবার পড়বার সুযোগ পাবেন।

রমা দেবী (কালী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা)
(১) সুপ্রভা সরকারের ঠিকানা কী?
(২) সুমিত্রা দেবীর জীবনী কবে প্রকাশিত হবে।

●● (১) আমাদের জানা নেই। কলিকাতা বেতার কেন্দ্র অথবা ভ্যানগার্ড প্রডাকসন, ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও, টালিগঞ্জ এই ঠিকানায় রূপ-মঞ্চের কথা উল্লেখ করে অভিনেতা শ্যামলাহার কাছে পত্র দিতে পারেন। (২) জীবনী প্রকাশে সুমিত্রা দেবীর আপত্তি থাকার দরুনই তাঁর জীবনী আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারবো না। তাঁকে এবিষয়ে পত্র লেখা হ'লে—এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

অবনী ভূষণ নাথ (মোক্ষদা ভবন, খুলনা)
রাঙ্গামাটিতে সত্য চৌধুরী কী নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন?

●● তাইত শুনেছি।

মীরা বসু (আমবাগান রোড, জামসেদপুর)
●● আপনার প্রশ্নপত্র খুঁজে পাচ্ছিনা বলে বার বার চিঠি লেখা সত্ত্বেও সেগুলির উত্তর দিতে পারি নি। আশা করি আবার প্রশ্ন করে পাঠাবেন।
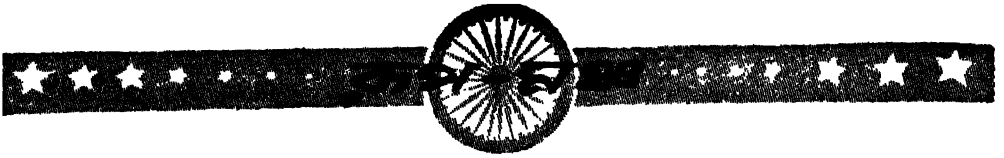
উমা, মীনা ও বীণা চন্দ্র (শিবঠাকুর লেন, হাওড়া)

(১) ছবি বিশ্বাসের জীবনী যে সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল উক্ত সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারিনি। যদি দিতে পারেনত উপকৃত হবো। (২) রাই পুস্তকাকারে বাহির হবে কী? (৩) উদয়ের পথে খ্যাতা বিনতা রায়ের পরবর্তী চিত্র কী?

●● (১) উক্ত সংখ্যা অর্থাৎ শারদীয়া ১৩৫৭, আমাদের কার্যালয় থেকে পাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। (২) রাইকে পুস্তকাকারে শীঘ্রই আপনাদের কাছে তুলে ধরা হবে। পূজার পর থেকেই তার মুদ্রণ কার্য সুরু হ'য়েছে। (৩) দিনের পর দিন।

কুমারী মৃদুলা চট্টোপাধ্যায় (বড় বাজার, বর্ধমান)

●● যে শিল্পী সম্পর্কিত যে বিষয়গুলি আপনি জানতে চাইছেন—বর্তমানে জানানো সম্ভব নয়।

গোরাচাঁদ দে (রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা)

আচ্ছা 'সাধারণ মেয়ে' চিত্রে দীপ্তি রায় নিজেই কী গান গেয়েছেন?

●● না। সুপ্রভা সরকার গেয়েছেন।

কমলা বোস (বি, এন, আর)

রূপ-মঞ্চের যে খাম আপনারা ব্যবহার করেন, তাতে সামনের দিকটা ইংরেজী ও পেছন দিকটা শুধু বাংলায় রূপ-মঞ্চ কথাটি লেখা থাকে। আমার মতে লিখতেই যদি হয়, তবে ইংরেজীতেই সবটা লেখেন না কেন? আর রূপ-মঞ্চের তৃতীয় প্রচ্ছদপটে ইংরেজীতে লেখা printed and published by......সম্পর্কেও আমার আপত্তি আছে। রূপ-মঞ্চ মারফৎ এর উত্তর পেলে বুঝবো নিজের দুর্বলতাকে মেনে নেবার সাহস তার আছে।

●● আপনার চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই। রূপ-মঞ্চের খামটিও যখন আপনি দেখেছেন, তখন বুঝতে পাচ্ছি, আপনি হয়ত গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্তা—ঠিকানা না থাকলে উত্তর দেবার নিয়ম নেই। তবু দিচ্ছি এই জন্য যে, আপনি রূপ-মঞ্চের নিজের দুর্বলতাকে স্বীকার করে নেবার উদারতার প্রশ্ন তুলেছেন। তবে কথা কী জানেন—রূপ-মঞ্চকে যদি যাঁচাই করতে চাইলেন, তবে এমন ছোটখাট ব্যাপার তুললেন কেন? যখন তুলেছেন, তখন উত্তর দিচ্ছি। এবং দিচ্ছি এই জন্য যে, নইলে আপনার মনে রূপ-মঞ্চ সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা থেকে যাবে। প্রথম কথা হ'লো, ইংরেজী ছাড়া এখন পর্যন্ত ভারতে সর্বজনবোদ্ধ অন্য কোন ভারতীয় ভাষা কার্যকরী ক্ষেত্রে দেখা দেয়নি। বাংলার বাইরেও বহু স্থানে রূপ-মঞ্চ গ্রাহক রয়েছেন, তাঁদের কাছে যখন চিঠি পত্র লেখা হয়—এমন অবস্থা হ'লো, সে চিঠিগুলি কোন কারণে মালিককে না পেয়ে ফিরে এলো। তখন ভারতের বাইরে ডাক বিভাগের অবাঙ্গালী কর্মীদের পক্ষে আমাদের কাছে উক্ত চিঠি ফেরৎ পাঠাতে খুবই বেগ পেতে হবে—ফেরৎ এলেও অনেকদিন বাদে আসবে। এই জন্য রূপ-মঞ্চের মোড়ক—খাম—সব কিছুই ইংরেজীতে মুদ্রণ করা হয়। খামের পেছনে যে বাংলা শব্দটী সন্নিবেশ করা হ'য়েছে, তা 'ক্রেষ্ট'-এরই সামিল। আর ওটা থাকলেই বা ক্ষতি কী! তৃতীয় ও চতুর্থ প্রচ্ছদপটে ঠিক ঐ একই কারণে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা হয়।

গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোঃ ক্যালটেক্স ক্লাবের সিরাজদ্দৌলা নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

অঞ্জনগড়

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার নিউথিয়েটার্সের নতুন ছবি অঞ্জনগড় একযোগে চিত্রা, রূপালী, ছায়া ও প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন উদয়ের পথে খ্যাত পরিচালক বিমল রায়। অঞ্জনগড় চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ—তাঁরই সর্বজন প্রশংসিত 'ফসিল' বড গল্পটিকে কেন্দ্র করে। কাহিনীকার নির্বাচনের জন্য প্রথম বারের মত এবারও শ্রীযুক্ত রায়কে প্রথমেই অভিনন্দন জানিয়ে নেবো। শ্রীযুক্ত রায়ের প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগীর পরিচয় শুধু তাঁর পরিচালনার মাঝেই ফুটে ওঠেনি—তাঁর পরিচালিত চিত্রের কাহিনী এবং কাহিনীকার নির্বাচনের ভিতরও কিছুটা ফুটে উঠেছে বৈকী! প্রথম পরিচালনার সুযোগ পেয়ে তিনি এমন একজন সাহিত্যিকের কাহিনীই নির্বাচন করলেন—চিত্রজগতে যাঁকে প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার গৌরব থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা চলে না। বর্তমান চিত্র কাহিনীকার শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষকে চিত্র জগতে পরিচয় করিয়ে দেবার গৌরবও আমরা তাঁকে দেবো। শ্রীযুক্ত ঘোষ বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রের একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক—অথচ তাঁকেও চিত্র জগতে প্রবেশ করাবার উমেদারী নিয়ে আমরা প্রত্যাখ্যাত হ'য়েছি। চিত্র জগতের রুদ্ধদ্বার একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিকের জন্যও উন্মুক্ত করে দিতে পারিনি। এবং নিউ থিয়েটার্সের নামও এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে। একথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না যে, নিউ থিয়েটার্সের স্থায়ী কোঠারী ভেংগে কোন নতুনই সহজে প্রবেশ করতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে নিউ থিয়েটার্সকে বাঙ্গালী চিত্রপ্রিয় জনসাধারণ যে শ্রদ্ধা করে এসেছেন—তার পূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হ'তো। শ্রীযুক্ত রায় নিউ থিয়েটার্সের কোঠারী ভেংগে দু'জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিককে পথ করে দিয়েছেন—এজন্য তাঁকে নিশ্চয়ই প্রশংসাবাদ দেবো। অবশ্য প্রশংসাবাদ থেকে নিউ থিয়েটার্সকেও বাদ দেবো না। আশা করি উপযুক্ত নতুনকে নিউ থিয়েটার্স ভবিষ্যতে এমনি সাদর আহ্বান জানিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করবেন।

'ফসিল'-এ প্রজা আন্দোলনের যে আভাষ ছিল, চিত্রকাহিনীতে তা মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের প্রাক্তন প্রভু মহামহিমান্বিত বৃটিশ রাজ এদেশের বুকে কায়েমী হ'য়ে বসবাস করবার উদ্দেশ্যে প্রথম আগমনের পর থেকেই "Divide and rule" নীতি প্রয়োগ করতে সুরু করেন। তাঁরা শুধু ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের বুক চিরেই রক্ত শোষণ করেন নি—সমগ্র দেশের বুকেই ছোরা চালিয়ে তাকে খণ্ড বিখণ্ড করে তুলেছিলেন, যার পরিণতি বর্তমান ভারত বিভাগে রূপ লাভ করেছে। যখন তারা বুঝলেন কিছুতেই এদেশে কায়েমী হ'য়ে থাকতে পারবেন না—তখন শেষ চাল চেলেছিলেন—রাজস্থান—হিন্দুস্থান— শিখস্থান—পাকিস্থান এমনি কতস্থানের রূপ দিয়ে দেশের আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জীব করে দিতে। কংগ্রেসের চোখে সে চাল অতি সহজেই ধরা পড়েছিল। তাই পূর্বে থেকে সচেতন হবার দরুণ অন্ততঃ আংশিক ভাবে কংগ্রেস যে জয়ী হ'য়েছে, একথা অস্বীকার করবো কী করে? বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস একদিন সংগ্রামের যে বীজ ছড়িয়ে রেখেছিল—তার সংগে সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে গেল চক্রান্তকারীদের সমস্ত চক্রান্ত। বর্তমান চিত্রকাহিনী দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের সার্থকতা নিয়েই গড়ে উঠেছে—'ফসিল'-এ দুলাল মহাতোর রক্তে যে বীজ অংকুরিত হ'য়ে উঠবার আভাষ পেয়েছিলাম—চিত্র কাহিনীতে ডাঃ গাঙ্গুলীর সৃষ্টি করে শ্রীযুক্ত ঘোষ তাকে সুপরিকল্পিত ভাবে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসার আদর্শে মূর্ত করে তুলেছেন। আর তাকে সার্থকতায় জয় মণ্ডিত করে তুলেছেন জনগণের আত্মার প্রতীক ডাঃ গাঙ্গুলীর আত্মবলিদানের ভিতর দিয়ে। প্রাক্তন প্রভুরা দেশীয় রাজ্য তথা সেখান-

সুকুমার মুখোপাধ্যায় পরিচালিত, চাঁদ মোহন চক্রবর্তী রচিত সিনে প্রডিউসার্সের 'মায়ের ডাক' চিত্রে শ্রীমতী অনুভা গুপ্ত

ছিলাম—সে সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে কোন সার্থক চিত্র গড়ে না উঠলেও, একাধিক চিত্র গড়ে উঠতে আমরা দেখেছি। কিন্তু প্রজা আন্দোলনের কথা নিয়ে কোন চিত্রই বাংলায় ইতিপূর্বে গড়ে ওঠেনি। সেদিক থেকেও অঞ্জন গড়ের বিষয়-বস্তুকে অভিনন্দন জানাবো। অঞ্জনগড়ের নায়কের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রায় একজন নতুন অভিনেতার সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন—এজন্য তিনি আমাদের ধন্য-বাদের যোগ্য! কিন্তু পরম বেদনার সংগেই আজ সেই নবী-নের কথা আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে। কারণ, এই তাঁর প্রথম এবং শেষ চিত্র। তাঁর চেহারা, কণ্ঠস্বর— বাচনভংগী এবং অভিনয় প্রতিভার যে সম্ভাবনা প্রথম অভিনীত চিত্রের মাঝেই আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে, তা বিকশিত হবার সুযোগ পেল না। তাঁর শোচনীয় মৃত্যু চিত্রজগতের একজন উদীয়মান নায়কের সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মহা ক্ষতিসাধন করে গেল।

কার জনসাধারণকে ভারতের সমগ্র আত্মা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে যে অপপ্রচেষ্টা করেছিলেন—দেশীয় রাজ্যের জন-গণের কঠোর সংগ্রামেই তা ব্যর্থ হ'য়েছে। ইংরেজের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমরা যে সংগ্রাম করে

আমরা গভীর বেদনার সংগে তাঁর কথা স্মরণ করে সমগ্র চিত্রামোদীদের পক্ষ থেকে স্বর্গত শিল্পীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবে-দন করে তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা কচ্ছি। আশা করি রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকারা অঞ্জনগড়ের সমালোচনা পড়বার সময়
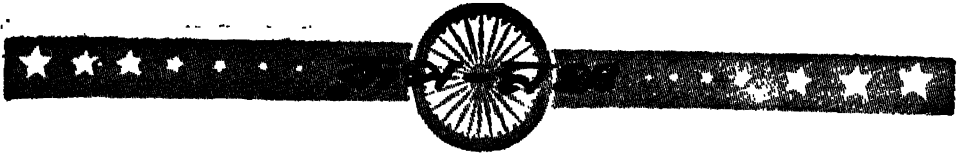
এই পর্যন্ত এসে দু'মিনিট মৌন থেকে স্বর্গত শিল্পীকে স্মরণ করবেন।

স্বর্গতঃ রাজা গাঙ্গুলীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দু'মিনিট মৌনতা অবলম্বন করুন।

একদিকে বাংলার ছবির অবনতি যেমনি দর্শক মনকে নিরাশ করে তুলেছে, অপরদিকে অঞ্জনগড় চিত্রখানি যে এই হতাশার মাঝেও তাঁদের অন্তরে আশার আলোকপাত করবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। অঞ্জনগড়ের দৃশ্যসজ্জা, অভিনয়—পরিচালনা —পটভূমিকা—চিত্রগ্রহণ—শব্দগ্রহণ ও সংগীত পরিচালনাকে প্রথমে আমরা সমগ্রভাবে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর যা ত্রুটি চোখে পড়ছে তার উল্লেখ কচ্ছি। সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে নিরপেক্ষ অভিমত ব্যক্ত করতে হ'লে, প্রথমেই প্রশংসা করতে হয় অঞ্জনগড়ের বিরাট ও নিখুঁত পটভূমিকাকে। যে পরিবেশের মাঝে চরিত্রগুলি ঘুরপাক খায়, সে পরিবেশের দুর্বলতা প্রায় প্রত্যেক বাংলা ছবিতেই দর্শকদের পীড়া দেয়। অথচ এই পরিবেশ যদি নিখুঁত ও চরিত্র সম্মত না হয়—তবে চরিত্রও যেমন দাঁড়াতে পারে না—কাহিনীর গতিও তেমনি পদে পদে বাধা পায়। অঞ্জনগড় তার ব্যতিক্রম রূপেই দেখা দিয়েছে। এজন্য পরিচালকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনাকে তারিফ না করে পারবো না। তবে কথা হচ্ছে, এত সুযোগ পেয়েও অঞ্জনগড় পূর্ণাংগ সার্থকতা লাভ করতে পারেনি—তার কাহিনীর সুসংবদ্ধ গাঁথুনী ও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের অভাবে। এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী কাহিনীকার—না চিত্র পরিচালক? নুনের অভাবে যেমন খাদ্য দ্রব্য সুপরিপক্ক হ'লেও বে-আস্বাদ মনে হয়—অঞ্জনগড় চিত্র সম্পর্কে কোন কথা বলতে গেলে ঠিক এই কথাটাই ব'লতে হয়। সাধারণভাবে অঞ্জনগড়কে আমরা প্রশংসা জানিয়েছি, এবার তার দুর্বলতা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। মিঃ মুখার্জির চরিত্র নিয়ন্ত্রণকে প্রশংসা করতে পারবো না। প্যালেসের ভিতর তাঁর যে রূপ ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে—প্যালেসের বাইরে তাঁর অন্য রূপ দেখে প্রথম থেকেই দর্শকদের মনে জাগে যে, এলোকটি অতি সহজেই ভেংগে পড়বে। ডাঃ গাঙ্গুলীর

কীর্তি পিকচার্সের 'কামনা' চিত্রে শ্রীমতী ছবি রায়
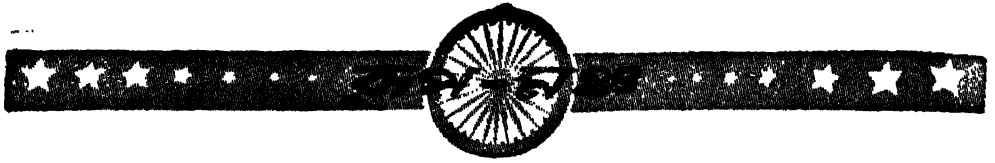
কন্যার চরিত্রটি সম্পর্কেও আমাদের বলবার আছে। মিঃ মুখার্জিকে অঞ্জনগড়ের প্রাচীন গড় ও শিবমন্দির দেখাতে যেয়ে—হর পার্বতীর মূর্তি দেখে ওভাবে মিষ্টার মুখার্জির বুকের সংগে মিশে যাওয়া অন্ততঃ তার মত মেয়ের শোভা পায় নি। এ ইংগিতটা বিমল রায়ের মত সংযমী পরিচালকের কাছ থেকে আশা করিনি। দুলালের মেয়ের চরিত্রটি অনাবশ্যক সৃষ্টি করা হ'য়েছে। মাইনিং সিণ্ডিকেটের ক্লাবের দৃশ্যের পরিবেশকে সমর্থন করতে পারবো না। অযথা কয়েক ফিট ফিল্ম নষ্ট হ'য়েছে—ওর চেয়ে কয়লার খনি ধ্বসে পরার দৃশ্য আরো ব্যাপক ভাবে ফুটিয়ে তোলাই উচিত ছিল। মিস পলির চরিত্রটি বাস্তব দৃষ্টিভংগী-প্রসূত নয় এবং বিদেশ প্রত্যাগতা কোন মেয়ে ওভাবে বাইজীর মত নেচে নেচে গান করে না—তার আচরণ যতই সমাজবিরোধী হউক না কেন। প্রজা মঙ্গল সমিতির কার্যকলাপ আরো ব্যাপক ভাবে ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল—তাদের 'সংগ্রাম'—আদৌ সংগ্রামের রূপ নেয় নি। গান্ধীজি প্রবর্তিত অহিংসা নীতির প্রচার করতে যেয়ে তার সার্থকতা এতখানিই ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে যে, গান্ধীজি নিজেও জীবিত থাকা কালে তাঁর মতবাদের এতখানি সার্থকতা দেখে যেতে পারেননি। ভারতের স্বাধীনতালাভকে যাঁরা বলবেন, নিছক অহিংস উপায়ে এসেছে—তাদের মিথ্যাবাদী ও ধাপ্পাবাজ ছাড়া আর কিছুই বলবো না। গান্ধীজি অনুসৃত অহিংসানীতি অনুসরণ করে চলবার মত মনের সবলতা ভারতের প্রধান মন্ত্রীরও আছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। অথচ অঞ্জনগড় রাজ্যের প্রজা মঙ্গল সমিতির আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস ভাবেই জয় মণ্ডিত হ'য়ে উঠলো। এতে যদি বলি, কাহিনীকার বা চিত্রপরিচালকের কোন সংগ্রাম সম্পর্কেই বাস্তব কোন অভিজ্ঞতা নেই, তাহলে ভুল বলা হবে না। আর একটা মারাত্মক ভুল হচ্ছে—(এবং এই ভুলটি কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়—) ঘটনাটি কোন সময়ের, তা কোন স্থানেই স্পষ্ট করে চিত্রে বলা হয় নি।

চিত্রের সংলাপ সম্পর্কে অনেকে অভিযোগ করেছেন—কিন্তু আমরা সে অভিযোগ আনবো না। বরং সংলাপ চরিত্রগুলিকে অনুসরণ করেই সংযোজিত হ'য়েছে। অভিনয়ে প্রথমেই দুলাল মাহাতোর ভূমিকায় কালী সরকারের প্রশংসা করবো। মিঃ মুখার্জির ভূমিকায় ৺রাজা গাঙ্গুলীর কথা ইতিপূর্বে'ই উল্লেখ করেছি। ডাঃ গাঙ্গুলীর কন্যার ভূমিকায় সুনন্দা দেবীর সংযত ও দীপ্ত অভিনয়—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বৃদ্ধ অমাত্য—বীরেশ্বর সেনের রাজা - প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত, জীবেন বসু, তুলসী চক্র, ভানু বন্দো ও কল্যাণ কুমারকেও নিন্দা করবো না। সুদাস বাবাজীর কণ্ঠে হেমন্তর গলা না দেওয়াই উচিত ছিল। তাতে চরিত্রের গাম্ভীর্য নষ্ট হ'য়েছে। এই সব দুর্বলতা থাকা সত্বেও অঞ্জনগড়কে বাংলা চিত্রামোদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে আমরা অনুরোধ জানাবো—যাতে নিউ থিয়েটার্স ভবিষ্যতে আরো উন্নত ধরণের চিত্র নির্মাণ করতে পারেন। —শ্রীপার্থিব

কালোঘোড়া

ফিল্ম্ সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডের প্রথম বাংলা ছবি "কালোঘোড়া"—মুক্তিলাভ করেছিল পূর্ণ শ্রী প্রমুখ সহরের একাধিক চিত্রগৃহে। প্রযোজক: কে, সি, গুহ। পরিচালক: জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর-সংযোজক: দক্ষিণা-মোহন ঠাকুর। বিভিন্ন ভূমিকায়: দীপ্তি রায়, চিত্রা দেবী, প্রভা, অহীন্দ্র চৌধুরী, বিপিন মুখোপাধ্যায়, নির্মল রুদ্র, আশু বসু প্রভৃতি।

"কালোঘোড়া"র পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলার চলচ্চিত্র-পরিচালক গোষ্ঠীর প্রবীণতম ব্যক্তি। এপর্যন্ত তিনি যত বাংলা ছবি পরিচালনা করবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তা আর কারোর পক্ষে সম্ভব হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করা যেতে পারে। অথচ সব চাইতে দুঃখের ও আশ্চর্যের বিষয় হলো, সত্যিকারের সার্থক আধুনিক একটি ছবির নির্দেশকরূপে তাঁর সাক্ষাৎ আমরা আজো পাবার অপেক্ষা রাখি। বহুদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে যিনি নিজেকে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিযুক্ত করে রেখেছেন, এটা তাঁর পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়। তবু সেই অগৌরবের গ্লানি নিয়েও জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আজো বাংলা ছবি পরিচালনা করছেন এবং বোধ
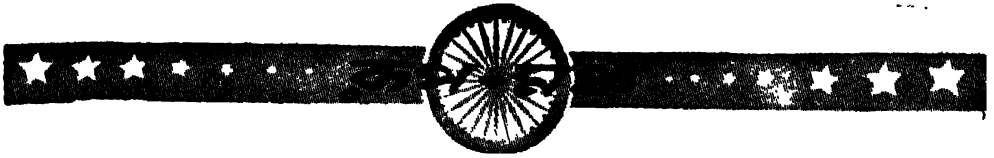
হয় আরো করবেন-ও। জ্যোতিষ বাবুর কথা আমি যখুনি ভাবি, তখুনি আমার মানস-নেত্রে ভেসে ওঠে সরকারি অথবা সওদাগরি অফিসের সেই সংখ্যাহীন নিয়মতান্ত্রিক কেরাণীকুলের কথা—যাঁরা কিনা কোনও রকমে দশটা-পাঁচটা অফিস ক'রে ট্রামে-বাসে বাদুড়-ঝোলা হ'য়ে বাড়ী ফিরে যেতে পারলেই নিজেদের ধন্য ও চিরকৃতার্থ মনে করেন—যাঁদের একঘেয়ে রুটিন্ মাফিক্ কাজের মাঝে নেই কোনো উৎসাহ-উদ্দীপনা, নেই কোনো বৈচিত্র্য অথবা প্রাণস্পর্শিতার সন্ধান—সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ, সংক্ষিপ্ত পৃথিবীর ভেতরেই যাঁদের একাগ্র আনাগোনা। জ্যোতিষ বাবু ছবির পর ছবি পরিচালনা করে চলেছেন, কিন্তু কই আজ পর্যন্ত সমসাময়িক একটি ছবিতেও তো তাঁকে দেখলাম না সাফল্যের সাথে বলিষ্ঠ কোনো পরিকল্পনা—সুস্থ এবং সুচারু কোনো শিল্পবোধ অথবা অভিনব কোনো বিষয়বস্তুর সামান্যতম পথ-নির্দেশ করতে! ছবির রাজ্যে তাঁর প্রধান কাজ—এই কোনরকমে দশটা-পাঁচটার office-duty করা। আশ্চর্য! নিজের যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতার কিছুমাত্র পরিচয় দিতেও যেন তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। অফিসের চাকুরি—চল্‌ছে কোনো মতে, চলুক......অবসর গ্রহণেরও তো আর বিশেষ দেরী নেই......পরিচালনা-কার্যে জ্যোতিষ বাবুর এই পরিচয়ই যেন সত্যিকারের পরিচয়। তবু তাঁকে দিয়ে ছবি করানো হচ্ছে এবং মনে হয় করানো হবে-ও। পোড়া কপাল যদি এই বাংলাদেশের না হয় তো হবে কার?

"কালোঘোড়া"র কাহিনী রচনা করেছেন সুপরিচিত গল্প-লেখক সরোজকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়। ছবিতে "কালোঘোড়া"র যে আখ্যানভাগের সাথে আমরা পরিচিত হ'য়েছি তাতে এইটুকুই বলা চলে যে, "কালোঘোড়া" একটি ছোট গল্প হিসেবেই সরোজ বাবুর হাতে সার্থক হতে পারতো। যে পটভূমিকার ওপর "কালোঘোড়া" রচিত তা সত্যিই অভিনব এবং সে জন্ম সরোজ বাবু প্রশংসার দাবী করতে পারেন। কিন্তু ভালো ছোট গল্প "কালোঘোড়া"কে ভালো বড় ছবি (বড় ছবি বলতে আমি বলছি, ১১।১২,০০০ ফুটের একটি ছবি) "কালোঘোড়া"তে পরিণত করবার চেষ্টার আবশ্যকীয় যে মালমসলা ও উপাদান, তাদের একান্ত অভাব দেখা গেছে আলোচ্য জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "কালোঘোড়া" ছবিতে। এজন্য সর্বাংশে দায়ী জ্যোতিষ বাবু এবং তাঁর অক্ষম চিত্রনাট্য ও অচল প্রয়োগ কলা-কৌশল। ঘটনা ও টেকনিকের ভেতর দিয়ে কিভাবে একটি গল্পকে ছবির মাধ্যমে চরম পরিণতি দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে যদি জ্যোতিষ বাবু ওয়াকিফহাল থাকতেন, তবে "কালোঘোড়া" ভাল ছবিই হতো। কেননা "কালোঘোড়া"র কাহিনীতে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। কিন্তু জ্যোতিষ বাবুর "কালোঘোড়া" দর্শকমনকে দিয়েছে শুধু হতাশ, ক্লান্তি ও বিরক্তি।

"কালোঘোড়া" ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন বিপিন মুখোপাধ্যায়। ছবির মধ্যে এই একটি চরিত্র যা কিনা সত্যিই অভিনব। যদি দক্ষতার সাথে এই চরিত্রটি বিপিন বাবু যথাযথ রূপায়িত করতে পারতেন তবে তাঁর নাম প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের তালিকাভুক্ত হতো অক্লেশেই। কিন্তু তা হয়নি। স্থানবিশেষে তাঁর অভিনয় মোটেই চরিত্রানুগ নয়। যে সব জায়গায় তাঁর চরিত্রের রূপানুযায়ী যে অভিব্যক্তি প্রকাশের প্রয়োজন ছিল, তাঁর অভিনয়ে মূর্ত হোয়ে উঠেছে ঠিক তার বিপরীত দিকগুলি। অভিনেতা হিসেবে বিপিন বাবুর ক্ষমতা যে খুবই সীমাবদ্ধ সে বিষয়ে অবহিত হওয়া গেল "কালোঘোড়া" দেখে। তবু এই অসাফল্যের দায়িত্ব একা বিপিনবাবুর নয়। জ্যোতিষ বাবুও বহুলাংশে দায়ী এর জন্য—কেননা, তিনিই ছবির নির্দেশক। ছবির চরিত্রানুযায়ী শিল্পীকে কিভাবে গঠিত করতে হয় সে শিক্ষা জ্যোতিষ বাবুর একেবারেই নেই। এ প্রসংগে উল্লেখ করছি অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত "সংগ্রাম" ও "পূর্বরাগ" ছবি দুটির কথা। এ ছবি দুটিতে বিপিন বাবুর সাবলীল অভিনয় প্রশংসার যোগ্য হয়েছিল। নায়িকার ভূমিকায় দীপ্তি রায়ের সম্পর্কেও ঠিক একই কথা বলা চলে। নরেশ মিত্র পরিচালিত "স্বয়ংসিদ্ধা"র দীপ্তি রায় যে এত নিম্নশ্রেণীর অভিনয় করতে পারেন, তা "কালোঘোড়া" দেখবার আগে কল্পনাও করিনি। "স্বয়ংসিদ্ধা"য় আত্মপ্রকাশ করে যে দীপ্তি রায় রাতারাতি ছবির
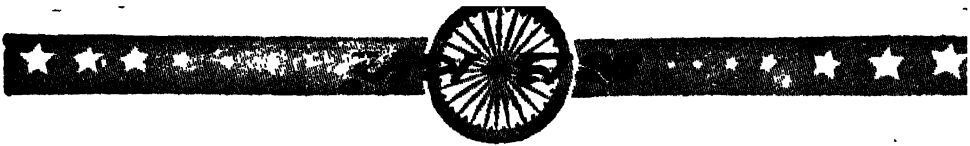
রাজ্য জয় করে ফেলেছিলেন, তাঁর এই অবনতি কেন? ধীর পদক্ষেপে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি কি নিষ্প্রভ হতে চললো? ক্ষয়িষ্ণু জমিদারের ভূমিকায় অহীন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় মন্দ লাগেনি, তবে অপর একটি প্রধান নারী-চরিত্রে চিত্রা দেবী সম্পূর্ণ অচল। উল্লেখ করবার মত আর কোনো চরিত্র অথবা অভিনয়ের সাক্ষাৎ পাইনি "কালোঘোড়া" ছবিতে।

"কালোঘোড়া"র সংগীত পরিচালনা করেছেন দক্ষিণা মোহন ঠাকুর। আবহ-সংগীতে দক্ষিণা বাবুর তবু কিছুটা সৃষ্টি আছে কিন্তু কণ্ঠ-সংগীতের সুর-সংযোজনায় তাঁর কৃতিত্বের কোনো পরিচয়ই পেলাম না "কালঘোড়া"তে। দু'একটা গানের সুরে, তাঁর পরিচালিত পুরানো ছবির গানের সুরের স্পষ্ট ছাপ অনুভব করলাম। এটা আশার কথা নয়। "কালোঘোড়া"র চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণ ও শব্দ-নিয়ন্ত্রণ মোটামুটি রকমের।

পরিশেষে জ্যোতিষবাবুকে একটি কথা নিবেদন ক'রেই এই আলোচনার শেষ করবো। এতদিনের পরেও যখন তিনি বাংলা ছবিকে যুগোপযোগী সত্যিকারের কিছু দিতে সক্ষম হলেন না তখন তিনি এ'কে নিষ্কৃতি দিন—এতে তাঁর নিজেরই উপকার হবে এবং বাংলা ছবিরও কল্যাণ হবে। ছবির রাজ্যের "কালোঘোড়া" হ'য়ে তিনি আর কতদিন অবস্থান করবেন? —ভুলু গুপ্ত।

তরুণের স্বপ্ন

"তরুণের স্বপ্ন" মুক্তিলাভ করবার বহু আগে থেকে কোলকাতা সহর ও তার আশেপাশের দশ বারো মাইল জায়গা জুড়ে পোষ্টার, হোর্ডিং, হ্যাণ্ডবিল ও সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপনীর যে ঢেউ প্রত্যক্ষ করা গেছে তা সত্যিই অভূতপূর্ব। তখন থেকেই আশা-নিরাশার সংশয়ে দোদুল্যমান মন শুধু দিন গুনছিল—কবে স্বপ্ন, হ্যাঁ এই 'তরুণের স্বপ্ন' বাস্তব হ'য়ে উঠবে? অবশেষে সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠছে এবং তাও বেশ পুরোপুরি মাত্রায়।

"তরুণের স্বপ্ন"-এর নির্মাতাদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি জনৈক অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে এই ভদ্রলোকের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা কি এবং কতদূর তা' আমাদের জানা নেই। লক্ষ্য করা গেল ইনিই একাধারে ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্যকার, গীত রচয়িতা ও পরিচালক। বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই ইনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। এক কথায় এঁকে সর্বেসর্বা বলাও চলে। ভালো—খুবই ভালো কথা। তবু একাধিক গুণের আধার যে জন, তাঁকে কি দেবী কলালক্ষ্মী হঠাৎ হজম করতে পারবেন? এমন 'সৌভাগ্য কি দেবীর হ'বে? ইদানীং বছর কয়েক দেবীর আবার বদ হজম সুরু হয়েছে কিনা—তাই বলছি।

"তরুণের স্বপ্ন" দেখতে দেখতে ক্রোধে, ঘৃণায় ও বিস্ময়ে বারেবারে মনে হচ্ছিল—এই আমাদের দেশের তরুণ আর এই কিনা তা'র স্বপ্ন! সে বিনিয়ে বিনিয়ে ন্যাকা ন্যাকা কণ্ঠস্বরে প্রেমের সস্তা বুলি আওড়ায়, আবার মাঝে মাঝে বড় বড় কথা কপচাতেও ছাড়ে না। তা'র চলনে-বাচনে, ভাবে-ভংগিতে, কথায় ও কাজে ভুলেও কি একবার মনে হয়—এই সেই তরুণ যা'র স্বপ্ন কিনা তার সারা দেশকে কেন্দ্রীভূত ক'রে? সারাটা ছবির প্রথমার্ধে বলানো হয়েছে তা'কে মানুষ হ'তে হ'বে—সত্যিকারের মানুষ হ'য়ে তাকে দেশের দুস্থ ও দরিদ্র জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু দেখলাম, নির্জন উপবনে প্যানপ্যানে প্রেমাভিসার সমাপ্ত ক'রে পরীক্ষার পর পরীক্ষায় first-second হ'য়ে সে অবশেষে বিলেত থেকে বড় ডাক্তারী ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরে এল। (আমাদের বাংলা ছবিতে পরীক্ষায় first-second হওয়া এবং বিলেত থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসা প্রভৃতি ব্যাপারগুলো কিন্তু মিনিট সেকেণ্ডের ঘটনা। দু-একটা telegram আর একটা জাহাজ দেখালেই ল্যাঠা চুকে গেল। এগুলো এত সোজা যে 'ছেলের হাতের মোয়া' বল্লেও চলে)। এখানে এসে তরুণ ডাক্তার (যার একমাত্র স্বপ্ন মানুষ হওয়া) দামী দামী স্যুট পরে গরম গরম বক্তৃতা দিল—সমস্ত দেশে: মহকুমায় মহকুমায়—গ্রামে গ্রামে—এমন কী থানায় থানায় পর্যন্ত তাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে দরিদ্র আর্তের সেবায় যারা কিনা শুধু চিকিৎসার অভাবে তিলে তিলে মৃত্যুকে
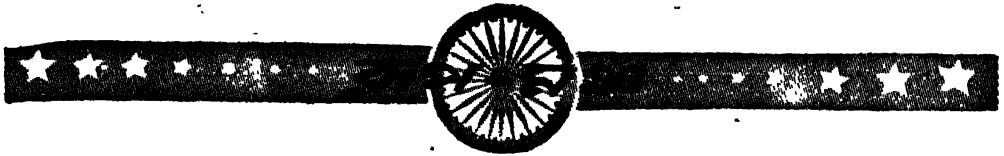
বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। আমাদের বাংলা ছবির—বিশেষ করে অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়ের মত কাহিনীকারের চিন্তাশক্তিপ্রসূত তরুণের স্বপ্নদর্শনের দৌড় আর কতটুকুই বা হবে? আসলে তাই দেখলাম—দরিদ্র গৃহস্থ সন্তান, মানুষ হবার স্বপ্নে বিভোর, তরুণ ডাক্তারের প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মিত হলো। হাল-ফ্যাসানের আধুনিক রুচি অনুযায়ী সাজসজ্জা, কৌচ সোফা কিছুরই অভাব নেই সে বাড়ীতে। "মানুষ" হলো আমাদের তরুণ। বিলেতী ডিগ্রী, ধনসম্পদ, অর্থ আর প্রাচুর্য সব কিছুরই মালিক যখন সে, তখন সে তো মানুষই হয়েছে! "মানুষ" ছাড়া আর কি বলবো তা'কে! অখিলেশ বাবুর definition অনুযায়ী সে তো সত্যিকারের "মানুষ"ই হয়েছে! কোথায় গেল সেই দুঃস্থ, দরিদ্র, অজ্ঞ জন-সাধারণ? কোথায় গেল তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থার গরম গরম বুলি? তরুণ ডাক্তার—"মানুষ" ডাক্তার হাসপাতালে দু'একটা injection ক'রে আর ল্যাবরেটরীতে কিছু test-tube নাড়াচাড়া করে ছুটলো তা'র পূর্বতন প্রণয়িনীর স্বামীর চিকিৎসা করতে। এই তো আমরা দেখলাম—এই-তো আমাদের দেখান হলো। কিন্তু যেতে তার দেরী হয়ে গেছে। যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ভদ্রলোকটির প্রাণবায়ু তরুণ ডাক্তারের পৌঁছুবার আগেই বহির্গত হয়ে গিয়েছে। তাই ডাক্তার তা'র সেই শৈশবের খেলার সাথী পূর্বতন ঈপ্সিতা ও তা'র শিশুপুত্রটিকে নিয়ে এল নিজের বাড়ীতে। সে এখন তার বোন। কিন্তু লোকে শুনবে কেন? তাই তারা কুৎসা গাইতে লাগলো। বোনটি অনন্যোপায় হ'য়ে শিশুপুত্রটিকে রেখে তরুণ ডাক্তারের আশ্রয় ছেড়ে চলে গেল নিরুদ্দেশের পথে। তরুণ ডাক্তার তার নিজের stamp অনুযায়ী শিশুপুত্রটিকে "মানুষ" ক'রে তুললো—কারণ বোনের কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল যে, তা'কে সে "মানুষ" তুলবেই। আর একটি বিলেতী ডিগ্রীওলা "মানুষ" ...রের সৃষ্টি হলো এবং একদিন তার জন্মোৎসবে তা'র ...ও ফিরে এল। সবার মিলন হ'লো এবং আসল তরুণ ...ক্তার (যিনি এখন বৃদ্ধ) আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলেন ...র স্বপ্ন সার্থক হয়েছে বলে।

আশ্চর্য! ছবির নামকরণ করা হয়েছে "তরুণের স্বপ্ন"—বিলেতী ডিগ্রী, বিরাট অট্টালিকা, প্রচুর ধনসম্পদ ও ব্যক্তিগত বাজে ব্যাপার এই যদি আমাদের দেশের তরুণের স্বপ্ন হিসেবে ধরে নিতে হয়, তবে বুঝে নিতে হবে দেশের সামনে ঘোর দুর্দিন। অখিলেশ বাবু যদি ছবির নামকরণ করতেন 'অরুণের স্বপ্ন' তবে আমাদের আপত্তি করবার খুব কম কারণই থাকতো। কেননা সে ক্ষেত্রে আমরা বুঝতাম জনৈক তরুণের (অর্থাৎ অরুণ চক্রবর্তীর) ব্যক্তিগত জীবনাদর্শই তিনি প্রতিফলিত ক'রে তুলতে চেয়েছেন তাঁর ছবিতে। কিন্তু তা' না ক'রে ব্যক্তিগত একজনের নিছক স্বপ্নবিলাসকে তিনি দেশের সমস্ত 'তরুণের স্বপ্ন' হিসেবে চালাতে চেয়েছেন। একে বুজরুকি, ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কি বলবো? ব্যক্তিগত একজনের স্বপ্নাদর্শকেও দেশের সমস্তজনের স্বপ্ন হিসেবে গ্রহণ করা যায় যদি তা কিনা সম্ভাবনাপূর্ণ, সার্থক জীবন-যাত্রার পথনির্দেশ করে। দেশ-গৌরব নেতাজী সুভাষচন্দ্রের "তরুণের স্বপ্ন" তাই সমস্ত তরুণেরই স্বপ্ন। অখিলেশবাবু তাঁর ছবির নামকরণ "তরুণের স্বপ্ন" ক'রে যে অন্যায় ও গর্হিত আচরণ করেছেন, তা'তে তাঁর লজ্জিত হওয়া উচিত। ছবির কাহিনী ও নামকরণ ছাড়া অখিলেশবাবু পরিচালনার দিক থেকেও কোন মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারেননি।

"তরুণের স্বপ্ন"-এর অভিনয়াংশে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় প্রধান পুরুষ ভূমিকায় পাহাড়ী ঘটকের কথা। নায়কের ভূমিকাতে অবতীর্ণ হবার মত যোগ্যতা তাঁর নেই। আরো বেশ কিছুদিন শিক্ষানবিশী ক'রে অভিনয় সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু জ্ঞান আহরণ ক'রে তিনি এদিকে আসুন, তাঁকে শুধু এই কথাই আমি বলবো।

নায়িকা চরিত্রে রেণুকা রায়ের অভিনয়ও প্রশংসা যোগ্য নয়। Lahiri's Select Poems পাঠরতা অবস্থায় রেণুকা রায়কে একবার কল্পনা করে দেখুন তো! ন্যাকা ন্যাকা কণ্ঠস্বরে তিনি নিজেকে এখানে ঢেকে রাখতে চাইলেও নেহাৎ বেমানান তিনি এ অবস্থায়। তবু বিবাহিতা অবস্থায় তাঁর কিছুটা শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া গেছে—পুনরায় বৃদ্ধাবস্থায় তাঁর চরিত্রচিত্রণ দর্শকমনকে তৃপ্তি দিতে
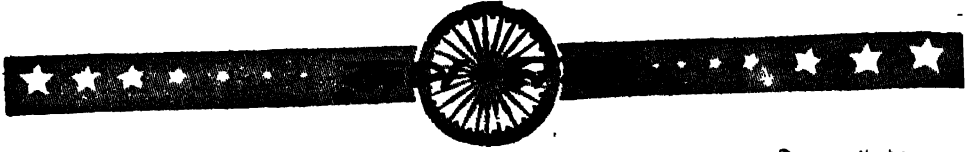
সক্ষম হয়নি। দরিদ্র গৃহস্থ রূপে সন্তোষ সিংহ চরিত্রানুগ অভিনয় করেছেন—ধীরাজ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে আমরা আরো আশা করেছিলাম। শঙ্করের ভূমিকায় নবাগত অভিনেতাটি যদিও মাঝে মাঝে থিয়েটার করেছেন, তবু ভালো পরিচালকের হাতে পড়লে ইনি সু অভিনয় করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। একটি ছোট ভূমিকায় সমর রায় অচল। রাজার ভূমিকায় নবাগত অভিনেতাটি মন্দ নয়। অপর একটি ভূমিকায় ফণী রায় যথাযথ।

সঙ্গীত পরিচালনায় কালীপদ সেনের কোনো বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় নি। যে ধারাতে বাংলা ছবির সংগীত এখন নির্দেশিত হচ্ছে কালীপদবাবু সে ধারাকেই অনুসরণ করেছেন।

চিত্রগ্রহণে সুহৃদ ঘোষ তাঁর সুনাম অনুযায়ী কাজ করেছেন। শব্দ-গ্রহণও মন্দ নয়।

—ভুলু গুপ্ত

(সমালোচনার শেষাংশ ৭৩ পৃষ্ঠার পর থেকে দেখুন)

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ

প্রখ্যাত মঞ্চ ও চিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস প্রযোজিত সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর প্রথম বাংলা ছবি 'যার যেথা ঘর' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সমাজ দরদী কাহিনীকার শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য রচিত একটী সম্পূর্ণ নতুন ধরণের কাহিনীকে ভিত্তি করে 'যার যেথা ঘর' চিত্র রূপায়িত হ'য়ে উঠছে। চিত্রখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস। 'প্রতিকার' চিত্রের পর বহুদিন বাদে চিত্রামোদীরা শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে পরিচালক রূপে দেখতে পাবেন। পূজাবকাশের পর শ্রীযুক্ত বিশ্বাস একাদিক্রমে কাজ করে 'যার যেথা ঘর'কে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'যার যেথা ঘর'-এর দৃশ্যপটে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছিল—শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের আর এক রূপে তাঁরা মুগ্ধ না হ'য়ে পারেন নি। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের বিশেষ আমন্ত্রণে 'যার যেথা ঘরে'র দৃশ্যপটে একদিন উপস্থিত থাকবার সুযোগ আমরাও পেয়েছিলাম।

ওদিন যে চরিত্রগুলি শিল্পীদের অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলার কথা ছিল—সেগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের। এই বিশ্লেষণের সময় প্রতিটি চরিত্র উপস্থিত সুধীজনের সামনে যেন স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠছিল। কয়েকবার রিহার্সেল হ'য়ে যাবার পর পরিচালক বিশ্বাস যখন হাঁক দিলেন: Ready. Silent Every body' তখন সমস্ত দৃশ্যপটটি যেন মুহূর্তে নিশ্চুপ হ'য়ে রইল। নির্জন পুরীর নিস্তব্ধতায় উপস্থিতদের শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহও স্পষ্ট হ'য়ে কানে বাজতে লাগলো। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস একবার তাকিয়ে নিলেন সবদিক। হ্যাঁ সব ঠিক আছে। চিত্রশিল্পী নিমাই ঘোষ সহকারী পরিবৃত হয়ে তৈরী হ'য়ে আছেন তাঁর ছায়াধর যন্ত্রটী নিয়ে। শব্দযন্ত্রী গৌর দাস সাংকেতিক ধ্বনি মারফৎ জানিয়ে দিলেন—তিনিও প্রস্তুত। উপরের দিকে মুখ তুলে একবার তাকিয়ে নিলেন পরিচালক বিশ্বাস। বৈদ্যুতিক আলোক শিল্পী—সবাই প্রস্তুত হ'য়ে রয়েছেন। বজ্রনির্ঘোষে তাঁর কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'লো: Taking।" নিঃশব্দে সমস্ত কর্মী ও বিশেষজ্ঞরা কাজ করে যেতে লাগলেন: বিরাট দৃশ্যপটটিতে শুধু শোনা যেতে লাগলো: শিল্পীদের সংলাপ। এক একটী দৃশ্য গ্রহণ শেষ হবার সংগে সংগে —O. K. বলে তিনি অনুমোদন করে নিচ্ছেন—কয়েক মিনিটের ব্যবধানে আবার নতুন দৃশ্য গ্রহণে তৈরী হচ্ছেন। এমনি ভাবে পর পর কয়েকদিন চিত্র গ্রহণের কাজ চলেছে বারোটা থেকে—বিকেল ৬টা অবধি। তারপর 'প্যাকআপ' করে দিয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বসেছেন সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীর ষ্টুডিওস্থিত অফিস কক্ষে। সেখানে হাসি ও কৌতুকে সহকর্মীদের নিয়ে মেতে উঠেছেন। তখন তাঁর আর একরূপে মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি। তাঁর ভিতর পরিচালকের গাম্ভীর্য ছিল না—ছিল না একজন খ্যাতিমান অভিনেতার বিন্দুমাত্র স্বাতন্ত্রবোধ। তিনি প্রতিজন কর্মীর সংগে বন্ধুরূপেই নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। কখন চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরীকে ডেকে বলছেন: রাজেন ভাই,—সম্পাদনার দিক থেকে তোমায় ত কোন বেগ পেতে হবে না।" রাজেন বাবু হেসে উত্তর দিলেন—কী যে বলেন—আপনি কী এতই আনাড়ি।" রাজেন বাবুকে বাধা দিয়ে ছবি বাবু মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন: না-না। তোমরা হচ্ছো বিশেষজ্ঞ—বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে আমার যখনই কোন ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়বে—দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ভুল মানুষ মাত্রেরই হওয়া স্বাভাবিক। আর আমি এমন কোন দিগগজ নই।" শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের এমনি অকপট স্বীকারোক্তি ও নিরভিমানের পরিচয় উপস্থিত সকলেরই অন্তর স্পর্শ করলো। এমনি ভাবে প্রতিজন সহকর্মীর সূক্ষ্ম দৃষ্টির ভিতর দিয়ে 'যার যেথা ঘর' গড়ে উঠছে। কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য—কর্মাধ্যক্ষ অচিন্ত্যকুমার, অন্যতম সহকারী তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রভৃতি আরো অনেকেই শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে নানাভাবে সহযোগিতা কচ্ছেন। কর্মাধ্যক্ষ অচিন্ত্যকুমার হঠাৎ খুব ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন---কাকে কোথায় কী ভাবে
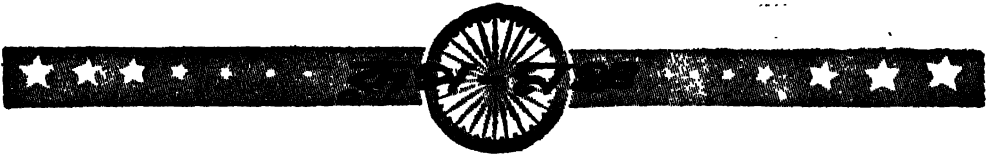
পৌঁছে দিতে হবে, ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে নির্দেশ দিয়ে উপস্থিত অতিথিদের জলযোগের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। আমরা ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন অনেকেই। মফঃস্বল থেকে 'রূপ-মঞ্চে'র কয়েকজন পাঠকও এসেছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের চিত্রগ্রহণ দেখবার জন্য। প্রত্যেকেই নমস্কার জানিয়ে খুশী মনে বিদায় নিলেন। 'যার যেথা ঘর'-এর সংগীত পরিচালনা করছেন প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। আর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন মীরা সরকার, সরযূবালা, রেণুকা রায়, কুমারী কেতকী, পাহাড়ী সান্যাল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, সন্তোষ সিংহ, শ্যামলাহা, মণি শ্রীমাণি, তারাপদ হালদার, সমর মিত্র, অচিন্ত্যকুমার ও ছবি বিশ্বাস।

কল্প চিত্র মন্দির

ভূতনাথ বিশ্বাস প্রযোজিত কল্পচিত্র মন্দির-এর প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন 'ওরে যাত্রী' স্থানীয় কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তির দিন গুনছে। শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য রচিত কাহিনীর অভিনবত্বে—জনপ্রিয় সুরকার কালীপদ সেনের সুরের মায়াজালে—কৃতি চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরীর পরিচালন নৈপুণ্যে নতুন ও পুরোন শিল্পীদের অভিনয় মাধুর্যে 'ওরে যাত্রী' দর্শক সমাজের অন্তর জয় করবার দাবী নিয়েই দেখা দেবে বলে প্রকাশ। 'ওরে যাত্রী'র বিভিন্ন চরিত্রকে রূপায়িত করে তুলেছেন দীপক মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, প্রভা, রেণুকা রায়, নমিতা, ধীরেন গাঙ্গুলী, প্রীতিধারা, জ্যোতি, উত্তম, হরিদাস, সত্য, লক্ষ্মী, সুশান্ত, কল্যাণী, অমল এবং কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে। দীপক মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অনুভার অভিনয়ে বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে প্রকাশ। 'ওরে যাত্রী'র চিত্র গ্রহণে উদীয়মান চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্তের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যাবে।
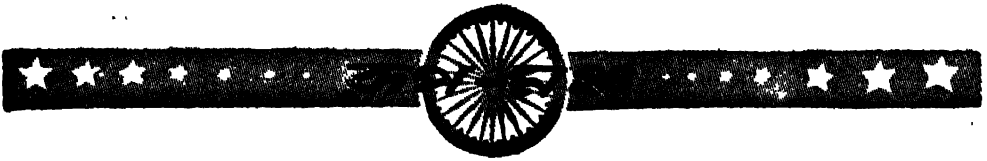
কীর্তি পিকচার্স

রাজীবের সংসারে সবই ছিল, ছিলনা কেবল শান্তি। ভাগ্যের পরিহাসে উৎপলা আজও বন্ধ্যা। উৎপলাকে কেন্দ্র করে তাই তার সংসারে একটা দারুণ অশান্তির পরিবেশ ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে ওঠে। উৎপলার তিনটি ননদ—রমা, রেবা ও রেখা, একমাত্র রেখাই এ বাড়ীতে তার বৌদিদিকে সবচেয়ে ভালবাসে। আর দুই ননদ এবং শাশুড়ী উৎপলার ছেলে না হওয়াতে তার প্রতি শুধু বিরূপ নন, অত্যন্ত অপ্রসন্ন। কিন্তু স্বামী রাজীব সব সময় পারিবারিক অশান্তির বাইরে থাকে এবং স্ত্রীর বন্ধাত্বের জন্য সে উৎপলার প্রতি আদৌ বিরূপ নয়—এইটুকুই উৎপলার সান্ত্বনা। পারিবারিক চক্রান্তে মেজ মেয়ে রেবার এক ভাসুরঝির হয় আবির্ভাব এ বাড়ীতে। নাম তার ইলা। মায়ের ইচ্ছা ইলার সংগে রাজীবের ফের বিয়ে দেন। যন্ত্রচালিতার মত ইলা চেষ্টা করে রাজীব ও উৎপলার মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করে, রাজীবকে জয় করতে। উৎপলার একনিষ্ঠ প্রেমের কাছে শেষ পর্যন্ত ইলাকে হার মানতে হয়, কিন্তু তার আগেই উৎপলা দূরে সরে যায় তার স্বামীর কাছ থেকে। তার সমস্ত বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় হাহাকার করে ওঠে একটি মাত্র সন্তানের জন্য। শেষ পর্যন্ত সন্তানহীনা নারীর কোলে সন্তান এলো এবং সেই সংগে স্বামীর সংসারে সগৌরবে উৎপলা ফিরে আসে। কাহিনীর শেষ কিন্তু এখানেই নয়। এরপরেও নিষ্ঠুর নিয়তির নির্মম বিধানে উৎপলার জীবনের যে পরিণতি দাঁড়ালো—মাতৃ-হৃদয়ের বেদনার সেইখানেই পরিপূর্ণ বিকাশ। কাহিনীকার 'কামনা' চিত্রে বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ের বেদনার যে রূপ দিয়েছেন, পরিচালক নবেন্দুসুন্দর তাকেই চিত্রে রূপায়িত করেছেন পরমাশ্চর্য নাটকীয়তা ও পরিবেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। নায়ক নায়িকার চরিত্রে দেখা যাবে উত্তম চটোপাধ্যায় ও ছবি রায় (এন,টি) কে। অন্যান্য চরিত্র রূপায়ণে আছেন জহর গাঙ্গুলী, ফণী রায়, তুলসী চক্রবর্তী, প্রীতি মজুমদার, রাজলক্ষ্মী (বড়), উমা গোয়েঙ্কা, আশু বসু প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন দ্বিজেন চৌধুরী। চার খানার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুখানা বিখ্যাত গান এই চিত্রের অন্যতম আকর্ষণ।

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওর নিজস্ব প্রযোজনায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সন্দীপন পাঠশালা'র চিত্র গ্রহণের কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হ'য়ে গেছে। সন্দীপন পাঠশালা পরিচালনা করেছেন উদীয়মান পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের অমর সৃষ্টি সীতারাম পণ্ডিতের চরিত্রকে রূপদান করেছেন সাধন সরকার। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন মীরা সরকার, সুপ্রভা দেবী, অমিতা বসু, প্রদীপ বটব্যাল, সিধু গাঙ্গুলী, কুমার মিত্র, মণি শ্রীমানী, জীবন মুখুজ্জে, শান্তা, বিশ্বনাথ চৌধুরী ও আরো অনেকে। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

গৌরী মুভীটোন লিঃ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীপ্রমথ নাথ বিশীর পৌরহিত্যে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের] 'যুগলাঙ্গুরীয়'র শুভ মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন সুধীর চন্দ্র চক্রবর্তী ও অশ্বিনী কুমার জ্যোতি। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অধ্যাপক ভোলা নাথ ঘোষ। সংগীত পরিচালনা করবেন প্রফুল্ল রায়।

আজাদ চিত্রপট লিঃ

এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন পূর্বাশা (আলোছায়ার পরিবর্তিত নাম) গড়ে উঠবে নিতাই ভট্টাচার্যের একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্রখানির পরিচালনা ও চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কৃতি চিত্রশিল্পী সুরেশ দাস।

রূপকলা নিকেতন

গত ১৫ই আগষ্ট থেকে এঁদের প্রথম চিত্র 'বাপু নে কহা থা'র চিত্র গ্রহণের কাজ কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুরু হ'য়েছে। চিত্রখানির তত্ত্বাবধান করছেন শ্রীনন্দলাল জালান। বাপুনে কহা থা'র কাহিনী রচনা করেছেন কে, কে, বর্মা। তাঁরই পরিচালনায় চিত্রখানি গৃহীত হবে। অভিনয়াংশে দেখা যাবে পাহাড়ী সান্যাল, পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা মিশ্র, প্রীতিধারা, শুক্তিধারা প্রভৃতিকে।

চিত্রমায়া লিঃ

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক
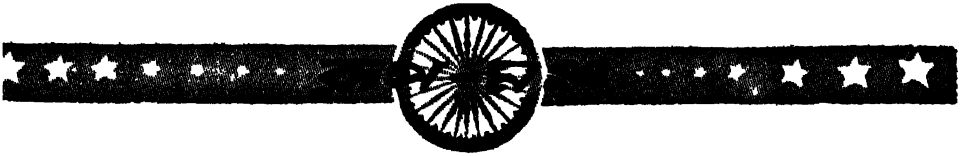
জীবনের অপরূপ সৃষ্টি 'কবি' বাণী চিত্রে নতুন রূপ নিয়ে শীঘ্রই দেখা যাবে। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রয়োগশিল্পী দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় এই নৃত্য-গীত মুখর চিত্র কাব্যটি আগামী বড়দিনের আনন্দোৎসব সার্থক করে তুলতে সমাপ্তির পথে এগিয়ে আসছে। বাণী চিত্রের উপযোগী চিত্র-নাট্য গঠনে প্রয়োগশিল্পী দেবকী বাবু গ্রন্থকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করায় রূপান্তর কার্য অতি নিপুণভাবে সম্পাদিত হ'য়েছে। বাড়তি সংলাপ এবং গান গুলিও তারাশঙ্করবাবু রচনা করে দিয়েছেন। অখ্যাত ও অস্পৃশ্য গ্রাম্য কবিয়ালের বিস্ময়কর জীবনে যে দুটি নারীর অবির্ভাব ঘটেছিল,ঘটনার পর ঘটনা প্রবাহে তাদেরই কথা ও কাহিনী, মিলন ও বিরহের লীলা ও মাধুর্যে আলো ও ছায়ায় অপরূপ হয়ে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে এই নাট্য-কাব্যে। এদের আশে পাশে আর যে একটী পুরুষের সন্ধান আমরা পাই, সে কবিয়ালের বন্ধু। পয়েন্টস ম্যান রাজন। এছাড়া বহু টাইপ চরিত্রের সমাবেশে কাহিনীটি সরস হ'য়ে উঠেছে। রবীন মজুমদারের কবিয়াল, অনুভা গুপ্তের ঠাকুরঝি, নীলিমা দাসের 'বসন' এবং নীতিশ মুখুজ্জের রাজন এই বাণী চিত্রের প্রধানতম আকর্ষণ। কবি ডি, ল্যুকস ফিল্ম ডিষ্ট্রী-বিউটর্সের পরিবেশনায় কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রগৃহে মুক্তির দিন গুনছে।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স

অগ্নি বিধ্বস্ত কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে নানা বাধাবিপত্তি সত্বেও 'অগ্রদূত' পরিচালকমণ্ডলীর ঐকান্তিকতায় 'সমাপিকা'র চিত্রগ্রহণ যথারীতি অগ্রসর হচ্ছে। আশা করা যায় এই মাসের শেষ ভাগে 'সমাপিকা'র কাজ সম্পূর্ণ হবে। অধুনা বাংলা কথা চিত্রে ক্রুর ও কুটিল চরিত্রের রূপদানে কমল মিত্র খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বলিষ্ঠ অবয়ব ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর তাঁর অভিনীত চরিত্রকে সহজেই ব্যক্তিত্বময় ও রহস্যজনক করে তোলে। বৃদ্ধের ভূমিকায় বিপিন গুপ্তের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর, দীর্ঘ চেহারা এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অভিনয়ধারা তাঁর এই ধরণের চরিত্রাভি-নয়কে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সমাপিকা চিত্রকাহিনী রচয়িতা নিতাই ভট্টাচার্য এই কাহিনীর মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের যে প্রচুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত দেখা যাবে। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সুনন্দা দেবী, রেণুকা রায়, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় জহর গাঙ্গুলী, পূর্ণেন্দু, শ্যাম লাহা, কালী সরকার প্রভৃতি আরো অনেককেই। সংগীত পরিচালনা করছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীমতী পিকচার্স

শ্রীমতী কানন দেবীর প্রযোজনায় শ্রীমতী পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন 'অনন্যা' প্রায় সমাপ্তির পথে। অনন্যা পরিচালনা করছেন সব্যসাচী। সংগীত পরিচালনা করছেন উমাপতি শীল। আর বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন কানন দেবী, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, অনুভা গুপ্ত, রেবা, বিমান, পূর্ণেন্দু, হরিধন, ভূজঙ্গ প্রভৃতি আরো অনেকে। কৃতি চিত্রশিল্পী অজয় কর চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে আছেন। একটী ছবির কাজ সুরু করার মধ্যে যে অদুর-দর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় শ্রীমতী কানন দেবী সে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নন তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত শুক্রবার ১২ই কার্তিক (২৯শে অক্টোবর)।

ওদিন কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে বেলা আড়াইটায় দেবকী কুমার বসু, নীরেন লাহিড়ী, অমর মল্লিক, সুকুমার দাশগুপ্ত, রাইচাঁদ বড়াল, সুধীরেন্দ্র সান্যাল, চিত্ত বসু, সুধীর দাস, প্রকাশচন্দ্র নান, সুনন্দা দেবী, ভারতী দেবী, অনুভা গুপ্ত, মলয়া সরকার নরেশ মিত্র, বিমল রায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, গৌর দাস, জে, ডি, ইরাণী, যতীন দত্ত, বিভূতি লাহা এবং বিশিষ্ট সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে 'সব্যসাচী'র পরিচালনা-ধীনে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনী 'চন্দ্রনাথ' এর শুভ মহরৎ সম্পন্ন হয়েছে। চন্দ্রনাথ চিত্রের নায়িকা চরিত্রে শ্রীমতী কানন দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন

বলাই পাচাল প্রযোজিত এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র 'সাক্ষী গোপাল' গৌর সী ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। চিত্রের সুর-সংযোজনা করছেন বলাই চট্টোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন নিরঞ্জন আদক। অমর মান্না (এ্যাঃ) প্রধান কর্মসচিব
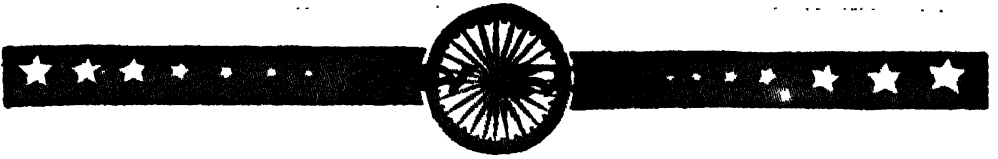
রূপে দেখাশুনা করছেন। কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করছেন গৌর সী। বিভিন্ন চরিত্র চিত্রণে দেখা যাবে মনোরঞ্জন ভটাচার্য, সুপ্রভা, স্বর্ণা, অপর্ণা, তুলসী চক্র, কল্পনা, হাসি, দুলাল দত্ত, অনুপকুমার, হারাধন, প্রভৃতিকে।

বিভা চিত্রণ

ইউনিভারসাল ফিল্ম করপোরেশনের তত্ত্বাবধানে বিভা চিত্রণের প্রথম চিত্র 'রাজমোহনের বৌ' ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অবলম্বনে গড়ে উঠছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন হিরন্ময় সেন। সংগীত পরিচালনা করছেন দেবেশ বাগচী এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন জ্যোৎস্না গুপ্ত, রেবা, ঝরণা, গৌরী দেবী, দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দীপালী, ভোলা, অনিল, আদিত্য, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি।

হীরেন বসু প্রডাকসন

হীরেন বসু পরিচালিত ও প্রযোজিত নৃত্য-গীত সমন্বিত হিন্দি কথা চিত্র 'বনজারে' মুক্তির দিন গুনছে। চিত্র খানির সংগীত পরিচালনা করেছেন অনুপম ঘটক। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন: দেবী দীপাঞ্জন, বনশ্রী, মালবিকা, প্রমোদচন্দ্র, জীবনলাল প্রভৃতি। বাসন্তীকা ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিমিটেড বনজারের পরিবেশনাস্বত্ব লাভ করেছেন।

যুগান্তর চিত্রপট লিমিটেড

গত ১৬ই আশ্বিন, বিকেল ৪ ঘটিকায় রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'অভিযান'-এর মহরৎ উৎসব ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ওদিন শ্রীমতী স্বাগতা দেবী ও কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে কয়েকটি স্থির চিত্র গ্রহণ করা হয়। পরে চিত্র জগতের বর্তমান সমস্যা নিয়ে শ্রীযুক্ত নরেন চক্রবর্তী (প্রাক্তন এম, এল, এ), নাট্যকার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ও সভাপতি বক্তৃতা করেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষথেকে পরিচালক বিমল সান্যাল ও উপস্থিত আরো অনেকেই বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। সমাগত অথিতিদের জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। উপস্থিতদের ভিতর নরেন চক্রবর্তী, দেবনারায়ণ গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ, বাণী দত্ত, অজিত সেন, প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়, বেনু মিত্র, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অভিযানের কাহিনী রচনা করেছেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করবেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেন স্বাগতা দেবী, কালী বন্দ্যোঃ, দেবীপ্রসাদ, জীবন বসু, নরনারায়ণ, দেবব্রত, সুমিত্রা, রুবি, গোরা, প্রভৃতি।

ন্যাশানেল স্ক্রীন করপোরেশন লিঃ

খ্যাতনামা পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে কয়েকজন সুপরিচিত ব্যবসায়ীকে নিয়ে সম্প্রতি এই যৌথ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। চিত্র পরিচালনা, পরিবেশনা,—ষ্টুডিও নির্মাণ প্রভৃতি পরিকল্পনাও এঁদের রয়েছে। ইতিমধ্যেই এঁদের প্রথম চিত্র 'সতী সীমন্তিনী'র চিত্র গ্রহণের কাজ গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ন্যাশানেল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে সুরু হ'য়েছে। চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন শক্তিপদ রাজগুরু এবং সংগীত পরিচালনা করছেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

মণিপুর ন্যাশানাল আর্ট পিকচার্স লিঃ

মণিপুর মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সমন্বিত এদের প্রথম বাণীচিত্রের নামকরণ হ'য়েছে শ্রীশ্রীগোবিন্দজী। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন মাণিক চক্রবর্তী। বিভূতি গাঙ্গুলী ও বসন্ত রায়ের তত্ত্বাবধানে এবং বৈদ্যনাথ দত্তের ব্যবস্থাপনায় এদের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে বলে প্রকাশ।

সুধা প্রডাকসন

সংগীত শিল্পী জহর মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত সুধা প্রডকসনের 'প্রতিরোধ' চিত্রের কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন সাংবাদিক চিত্র পরিচালক খগেন রায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন জহর মুখোপাধ্যায়। সম্পাদনা, শব্দগ্রহণ ও আলোক চিত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে রবীন দাস, বাণী দত্ত ও নিমাই ঘোষ। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়নে আছেন অহীন্দ্র, চৌধুরী, ইন্দু মুখো,, কমল মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য,কৃষ্ণধন, জীবেন বসু, তুলসী, হরিধন, মীরা সরকার, রেণুকা রায়,

আরতি দাস, রেবা দেবী, তারা ভাদুড়ী, উমা, অলকা ও আরো অনেকে।

ছায়াবাণী লিঃ

এঁদের পরিবেশনায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' কে, কে, প্রডাকসনের প্রযোজনায় গৃহীত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল জ্যোতির্ময় মৈত্র ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর। খ্যাতনামা সাহিত্যিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাসকে কেন্দ্র করেই বর্তমান চিত্র গড়ে উঠেছে। এর বিভিন্নাংশে অংশ গ্রহণ করেছেন নীলিমা দাস, অমিতা বসু, কালী বন্দ্যো, গোপাল মুখো ও আরো অনেকে।

লোকবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠান

শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায় পরিচালিত লোকবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম চিত্র নিবেদন 'দিনের পর দিন' এর চিত্র গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হ'য়ে এসেছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। 'দিনের পর দিন'-এর কাহিনীও তিনিই রচনা করেছেন। শ্রীযুক্ত রায়ের ইতিপূর্বে যে দুটী কাহিনী চিত্ররূপায়িত হয়ে উঠতে আমরা দেখেছি—গতানুগতিক চিত্র কাহিনীর ধারা থেকে সেদুটী পৃথক দাবী নিয়েই দেখা দিয়েছিল। শ্রীযুক্ত রায়ের কাহিনীর ভিতর একদিকে যেমনি সমাজ সমস্যার ইংগিত দেখতে পেয়েছি—তেমনি পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর সমাজদরদী মনের। 'দিনের পর দিন'এর কাহিনী আরো বলিষ্ঠ ইংগীত নিয়েই দেখা দেবে বলে প্রকাশ। এর বিভিন্নাংশে দেখতে পাওয়া যাবে বিনতা রায়, বিকাশ রায়, নিবেদিতা দাস, সাধনা চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, গৌতম মুখো, জ্যোতি সেন, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। চিত্রখানির সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

রমা আর্ট প্রডিউসার

স্বরাজ বসু প্রযোজিত 'সংসার' চিত্রখানিও সমাপ্তির পথে। 'সংসার' পরিচালনা করেছেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুর সংযোজনা করেছেন সুবল দাশগুপ্ত। ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়। চরিত্র চিত্রণে দেখা যাবে রবীন মজুমদার (ইতিপুর্বে ভুলবশতঃ প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করা হয়েছিল), সন্ধ্যারাণী, শান্তিগুপ্ত, রেবা বসু, জয়নারায়ণ, রবি রায়, চিত্রা, বন্দনা, বেচু সিংহ, প্রভা, ইন্দু প্রভৃতি।

শ্রীবাণী পিকচার্স লিঃ

চিত্রভারতীর প্রযোজনায় শ্রীবাণী পিকচার্সের প্রথম চিত্র 'যে নদী মরুপথে' মুক্তির দিন গুনছে বলে সংবাদ পেলাম। চিত্রের কাহিনী ও সংলাপ রচনা করছেন অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী। পরিচালনা করছেন অখিলেশ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন পবিত্র দাশগুপ্ত এবং ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছেন কৃষ্ণ মোহন ভট্টাচার্য ও ডাঃ হীরেন মৌলিক। যে নদী মরু পথের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, রবি রায়, ফণী রায়, সুশীল রায়, পাহাড়ী ঘটক, আশু বসু, বেচু সিংহ, শিবকালী, তারাপদ ভট্টা, প্রবোধ চক্র, সীতা দেবী, রেণুকা রায়, পুর্ণিমা, বন্দনা, উষা, ঝরণা ও আরো অনেকে।

রাঙ্গারাখী পিকচার্স

অভিনেতা বেচু সিংহ পরিচালিত এঁদের 'বীরেশ লাহিড়ী'র চিত্র গ্রহণের কাজ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বীরেশ লাহিড়ীর সংগীত পরিচালনা করছেন সত্যদেব ঘোষ। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন স্মৃতিরেখা বিশ্বাস, বন্দনা, শান্তি গুপ্ত, তারা ভাদুড়ী, বেচু সিংহ, দেবকুমার, মণি মজুমদার, (এ্যাঃ) দেবীপ্রসাদ, মাষ্টার সুকু ও আরো অনেকে।

শ্রীশঙ্কর কথাচিত্র

এদের বাংলা চিত্র 'কৃষ্ণা কাবেরী' বেঙ্গল ন্যাশানাল ষ্টুডিওতে সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন স্বনামধন্য নাট্যকার-পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্য। কাহিনীর কাঠামো দুটী নারী চরিত্রকে আশ্রয় করে গঠিত হয়েছে এবং এতে বৈচিত্র্যের সন্ধান এত প্রচুর যে, তা দর্শক মনে অতি সহজেই রেখাপাত করবে বলে প্রকাশ। সর্বোপরি সংলাপের মধুর বন্ধন ছবিখানিকে আরো মাধুর্যময় করে তুলবে বলে বিশ্বাস। প্রধানাংশে দেখা যাবে সরযূবালা, মীরা সরকার, কমল মিত্র ও বিপিন মুখোপাধ্যায়কে। ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করেছেন সত্য রায় এবং তত্ত্বাবধানের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে আছেন রঞ্জিৎ মিত্র।
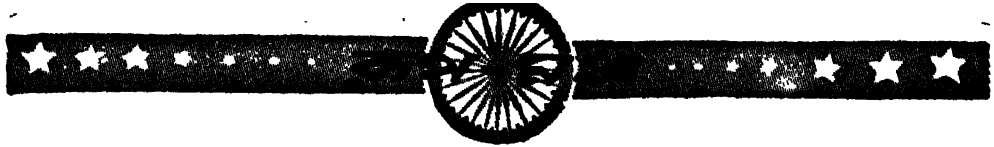
ইণ্ডিয়া ন্যাশানাল টকিজ লিঃ

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের অনুরাধার শুভ মহরৎ রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। শ্রীযুক্ত জহর গঙ্গোপাধ্যায় একটী বিশিষ্ট চরিত্রকে রূপায়িত করে তুলবেন। সংগীতাংশের ভার নিয়েছেন প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী কমল দাশগুপ্ত। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন খ্যাতনামা গীতিকার ও পরিচালক প্রণব রায়। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সোম প্রস্তুতির সর্ব বিষয়ে লক্ষ্য রাখবেন।

ভারতী চিত্রপীঠ

শ্রীযুক্ত সত্যাংশুকিরণ দালালের প্রযোজনায় ভারতী চিত্র-পীঠের প্রথম বাংলা চিত্র 'দাসীপুত্র' ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। দাসীপুত্রের কাহিনী রচনা করেছেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। তাঁরই পরিচালনায় 'দাসীপুত্র' চিত্র রূপায়িত হয়ে উঠছে। বর্তমানে শ্রীযুক্ত গুপ্ত একটি জটিল দৃশ্য নিয়ে ব্যস্ত আছেন। এই দৃশ্যে আছেন সরযূবালা, দীপক ও প্রীতিধারা। অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, শ্যামলাহা, নবদ্বীপ, আশু বসু, সেফালিকা, মণিকা, রাণীবালা, দেবীপ্রসাদ, লীলাবতী, মণিশ্রীমাণি, মাষ্টার সুকু প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিভূতি দত্ত। কলকাতার কয়েকটি চিত্রগৃহে 'দাসীপুত্র' মুক্তির দিন গুণছে।

বোসার্ট প্রডাকসন

শ্রীযুক্ত সুখেন্দু বসু প্রযোজিত বোসার্ট প্রডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র গড়ে উঠবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে। 'রাধারাণীর' চিত্রনাট্য রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সজনী কান্ত দাসকে। চিত্রখানি পরিচালনা করবেন কৃতি চিত্রশিল্পী সুধীশ ঘটক। চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব তিনিই নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘটকের পূর্ণাংগ চিত্র পরিচালনা যাত্রাপথে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। কারণ, এই সুযোগ তাঁর ইতিপূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। রাধারাণীর শব্দগ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীযুক্ত বাণী দত্ত। ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে চিত্রখানি শীঘ্রই সুরু হবে।

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'কে কেন্দ্র করে এঁদের প্রথম চিত্র 'দেবী চৌধুরাণী'র চিত্র গ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। 'দেবীচৌধুরাণী'কে নিয়ে পরিবেশকদের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব জেগে উঠেছে বলে প্রকাশ। কয়েকটী প্রথম শ্রেণীর পরিবেশক প্রতিষ্ঠান দেবীচৌধুরাণীকে তাঁদের পরিবেশন তালিকাভুক্ত করবার জন্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছেন। চিত্রখানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন না বলে আমাদের জানিয়েছেন। দেবী চৌধুরাণী পরিচালনা করছেন শ্রীযুক্ত সতীশ দাশগুপ্ত। প্রকাশ দেবীচৌধুরাণীর কয়েকটি বিশেষ দৃশ্য চিত্র জগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও প্রবীণ চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের তত্ত্বাবধানে গৃহীত হ'য়েছে। চিত্রখানির সুর সংযোজনা করেছেন জনপ্রিয় সুরকার কালীপদ সেন। উদীয়মান চিত্রশিল্পী শৈলেন বসু চিত্র গ্রহণে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে। প্রবীণ শব্দ যন্ত্রী গৌর দাস শব্দানুলেখনে নিজের সুনামকে কখনও ব্যাহত হ'তে দিচ্ছেন না। অভিনয়াংশে চিত্র ও নাট্যজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ছবি বিশ্বাস—উদীয়মান তরুণ প্রিয়দর্শন শিল্পী প্রদীপ বটব্যাল—চরিত্রাভিনেতা ফণী রায় ও উৎপল সেন—পৌরুষ দীপ্ত নীতীশ মুখোপাধ্যায়—কৌতুকাভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায় এবং নারী চরিত্রে সুমিত্রা, সুদীপ্তা, স্বাগতা, রেবা, নিভাননী, মনোরমা, উমা প্রভৃতি আরো অনেককে দেখা যাবে।

দেবীস্থান

গত ২২শে সেপ্টেম্বর, দেবীস্থান মন্দির ও তৎসহ মহিলা স্বাবলম্বন শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য সাম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জ্যোতিষ সম্রাট পণ্ডিত রমেশ চন্দ্র ভটাচার্য। দেশের দুস্থা মেয়েরা বিভিন্ন কার্যকরী শিল্প শিক্ষা করে যাতে স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠতে পারে—এতদুদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হ'য়েছে। দেবীস্থানের সম্পাদিকা কুমারী স্নেহলতা চক্রবর্তীর অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের জন্য কলিকাতার উপকণ্ঠে জমি সংগৃহীত হ'য়েছে। আমরা উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ কচ্ছি।

আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ)

আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের (প্রাক্তন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ) নাম সর্বজন বিদিত। জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কলেজ ও হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে দীর্ঘদিন ধরে দেশবাসীর সেবা করে আসছে। এর বহু কৃতি ছাত্র চিকিৎসা জগতে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়ে দেশ বাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। এই বেসরকারী হাসপাতাল ও কলেজটিকে বৃটিশ রাজের আমল থেকেই নানান আর্থিক কৃচ্ছতার ভিতর দিয়ে চলে আসতে হ'য়েছে। বহু পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ আর্থিক কৃচ্ছতার জন্য তাকে রূপ দিতে পারেন নি। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। পরাধীনতার সময় যে প্রতিষ্ঠান সমভাবে দেশবাসীর সংগে লড়াই করে এসেছে—আজ তাকে সর্বোতভাবে সাহায্য করাই কী দেশবাসীর কর্তব্য নয়? বৃটিশ আমলে যেসব পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি—স্বাধীনতা লাভ করবার পর সেগুলিকে কার্যকরী করে তুলবার জন্য পশ্চিম বাংলার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়কে চেয়ারম্যান করে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করা হ'য়েছে। জাতীয় সরকারের সাহায্য পেলেও আরো প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হাসপাতাল ও কলেজের বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য। আশা করি সহৃদয় দেশবাসী দেশের মহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে উক্ত হাসপাতালে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থানুযায়ী অর্থ-সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন না। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে আমরা বাংলার চিত্র ও নাট্যের শিল্পী, বিশেষজ্ঞ, কর্মী ও ব্যবসায়ীদের নাম ও ঠিকানা সহ তালিকা
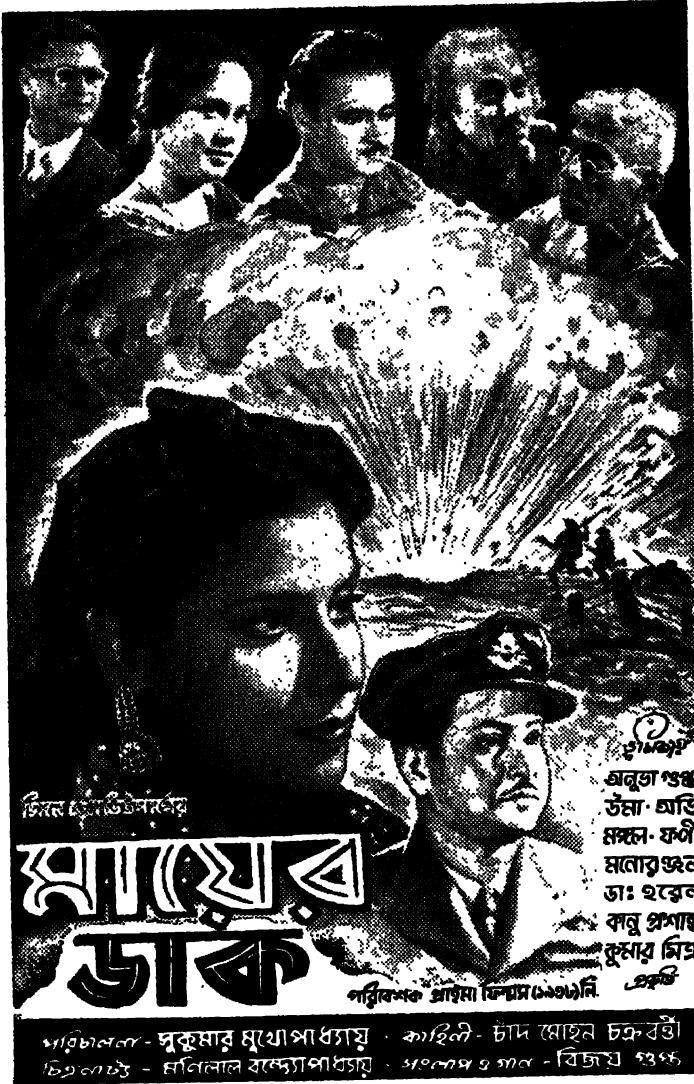
শুভারম্ভ

শুক্রবার

১২ই

নবেম্বর

রূ প বা ণী

ই ন্দি রা

আলোছায়া

(বে লে ঘা টা)

নেত্র সিনেমা

(দ ম দ ম)

সুরশিল্পী : সত্যদেব চৌধুরী

বিগত মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লিখিত এক অপূর্ব্ব কাহিনী।

আই, সি, এস, পরীক্ষার্থী অজিত যোগ দিল যুদ্ধে।

কাপুরুষ বাঙালীর কলঙ্ক ঘোচাতে

গিয়ে, সে প্রাণ হারালো।
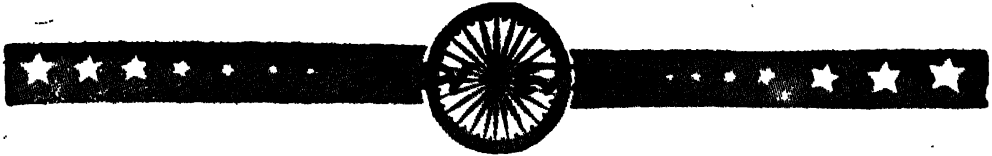
পাঠিয়েছি। কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে এবিষয়ে পৃথক ভাবে আবেদন করবার পূর্বে স্বতপ্রণোদিত হ'য়ে আমরা উক্ত হাসপাতালে সাহায্য প্রেরণার্থে চিত্র ও নাট্যজগতের শিল্পী, কর্মী ও ব্যবসায়ীদের অনুরোধ কচ্ছি। এবিষয়ে রূপ-মঞ্চের পাঠকসাধারণ আশা করি অবহিত হ'য়ে উঠবেন। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা: মেজর এস, সি, দত্ত, আই, এম, এস, (অবসর প্রাপ্ত) কে, আই, ই, বি, এসসি, এম, বি, অবৈতনিক যুগ্ম সম্পাদক, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কমিটি আর, জি, কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ১, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা।

দি ক্যালটেক্স ক্লাব

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে ক্যালটেক্স ক্লাবের সভ্যবৃন্দের উদ্যোগে শচীন সেনগুপ্ত রচিত সিরাজদ্দৌলা নাটকাভিনয় অভিনীত হয়। নাটকটী পরিচালনা করেন এন, কে, দস্তিদার। নামভূমিকায় ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেজর ওয়াটস এর ভূমিকায় ই, এব, ডাউনিং যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। অন্যান্য ভূমিকায় রথীন রায়, এস, এন, ঘোষ, ললিত সান্যাল, হীরেন সেন, ডি, আর দত্ত, সুব্রত রায়, তারক দত্ত, পি, কে, ঘোষ, পি, দত্ত, সুধাংশু সেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না মিত্র, আশা বসু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মস্কোয় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর

মস্কো ৪ঠা নভেম্বর: প্রখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী অমলা দেবীকে অদ্য এখানে সম্বর্ধিত করা হয়। এতদুপলক্ষ্যে তাঁর নৃত্যচিত্র 'কল্পনা' প্রদর্শিত হয়। সোভিয়েট সংস্কৃতি পরিষদ এই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন। শ্রীমতী অমলা দেবী ভারতে রুশ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "এখানে আসবার পর জানতে পেরেছি যে, এখানেও আমাদের দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিশেষ চর্চা হয়েছে এবং হচ্ছে। আমরা আশা করি এই দুই দেশের মধ্যে ভাব ও চিন্তাধারার আদান প্রদান বৃদ্ধি পাবে।" বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও পরিচালকগণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। —রয়টার।

ওয়াশিংটনে রুক্মিনী দেবীর নৃত্য প্রদর্শন

ওয়াশিংটন, ৩রা নভেম্বর। গত শনিবার ৩০শে অক্টোবর সন্ধ্যায় বিখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রুক্মীণী দেবী ওয়াশিংটনে ক্ল্যাসিকেল ভারতীয় নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু গণ্য-মান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত স্যার বেনেগল রমা রাও এবং লেডী রমা রাও অন্যতম। রুক্মিণী দেবী এখানে দক্ষিণ ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্যের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে পরিচিতা। এর পূর্বেও নিউইয়র্কে তিনি নৃত্যকলা প্রদর্শন করেছেন।

পরলোকে প্রবীণ অভিনেতা ভূজঙ্গ রায়

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীভূজঙ্গ রায় যিনি বঙ্গের চিত্রজগতে কামতাপ্রসাদ নামে খ্যাত—গত ৩০শে অক্টোবর চন্দননগর গোদলপাড়া গঙ্গাতীরস্থ বাসাবাটিতে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ভ্রাতা ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গিছেন। কৌতুকাভিনেতা শ্রীফণী রায় তাঁর মধ্যম ভ্রাতা। গোদলপাড়ার সহৃদয় যুবকগণ শবানুগমনে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। স্বর্গতঃ রায় সাগর মুভিটোন এবং শ্রীমতী সাধনা দেবীর (নৃত্যশিল্পী) সম্প্রদায়ে বহুদিন জড়িত ছিলেন। আমরা মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনা কচ্ছি।

পরলোকে শ্রীমান সরলকুমার রায় (কালো)

কলকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ ও প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী শ্রীযুক্ত অনাথ রায় মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সরল কুমার রায় (কালো) গত ১৩ই অক্টোবর, রাত্র ১২টার সময় শ্রীযুক্ত রায়ের নদীয়া জেলাস্থিত নিজ বাসভবনে মাত্র এক দিনের জ্বর ভোগের পর পরলোকগমন করেছে। মৃত্যুকালে কালোর বয়স মাত্র ১১ বৎসর হয়েছিল। শ্রীমান কালো যেমনি মেধাবী, তেমনি খেলাধুলায়, সংগীত ও চিত্রাংকনে
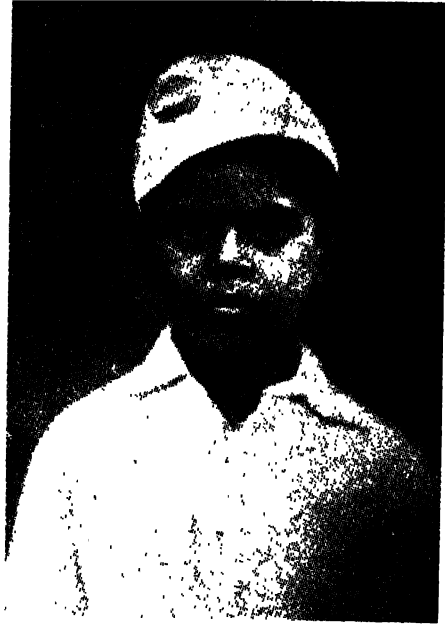
স্বর্গতঃ শ্রীমান কালো

এই বালক বয়সেই যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিল। প্রতি পরীক্ষায় সে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতো। ফুটবল, ক্রীকেট প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় একাধিকবার সে পুরস্কার লাভ করেছে। গত স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে শ্রীমান তার অংকিত এক খানি ছবি উপহার দেয় এবং পণ্ডিতজী তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩৭ সালের ১৩ই অক্টোবর রাত্রি ১২টায় কলকাতায় তার জন্ম হয়। ভারত বিশ্রুত স্বর্গীয় কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন মহাশয় শ্রীমানের মাতামহ ছিলেন। পিতা শ্রীযুক্ত রায় একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক ও প্রবীণ কংগ্রেসকর্মী—নেতাজী সুভাচন্দ্র এবং তাঁর অগ্রজ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংগে দীর্ঘদিন কাজ করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছে—তাছাড়া ভারতের রাষ্ট্রপাল শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারীর তিনি অন্যতম গৃহচিকিৎসক। তাই তাঁর বাড়ীতে বহু গণ্যমান্যপদস্থ ব্যক্তি ও দেশনেতারা প্রায়ই আসেন। শ্রীমান কালো এঁদের সকলেরই অন্তর জয় করেছিল। শ্রীমানের মৃত্যুতে শ্রীযুক্ত রায়কে সমবেদনা জানিয়ে যাঁরা পত্র লিখেছেন, তাঁদের ভিতর ভারতের রাষ্ট্র-পাল রাজাগোপালাচারিয়া, ডিরেক্টর জেনারেল সিভিল এভিয়েশন, স্যার এন. সি. ঘোষ, শিল্প ও সরবরাহ সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্যার উষানাথ সেন, বিচারপতি চারুচন্দ্র বিশ্বাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত রায় রূপ-মঞ্চের একজন শুভানুধ্যায়ী—আমাদের কার্যালয়ে শ্রীমান কালোকে প্রতিমাসে রূপ-মঞ্চ নিতে পাঠাতেন। আর এই সূত্রে শ্রীমান রূপ-মঞ্চের কর্মীদেরও খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাবা না পাঠালেও সে নিজে এসে বহুবার খোঁজ করে যেতো রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হ'য়েছে কিনা। এবং সেই পিতার সংগে যেয়ে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপাল বাংলার প্রাক্তন প্রদেশপাল রাজাজীকে কয়েক খণ্ড রূপ-মঞ্চ উপহার দিয়ে আসে। আমরা শ্রীমানের আত্মার মঙ্গল কামনা করে শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।
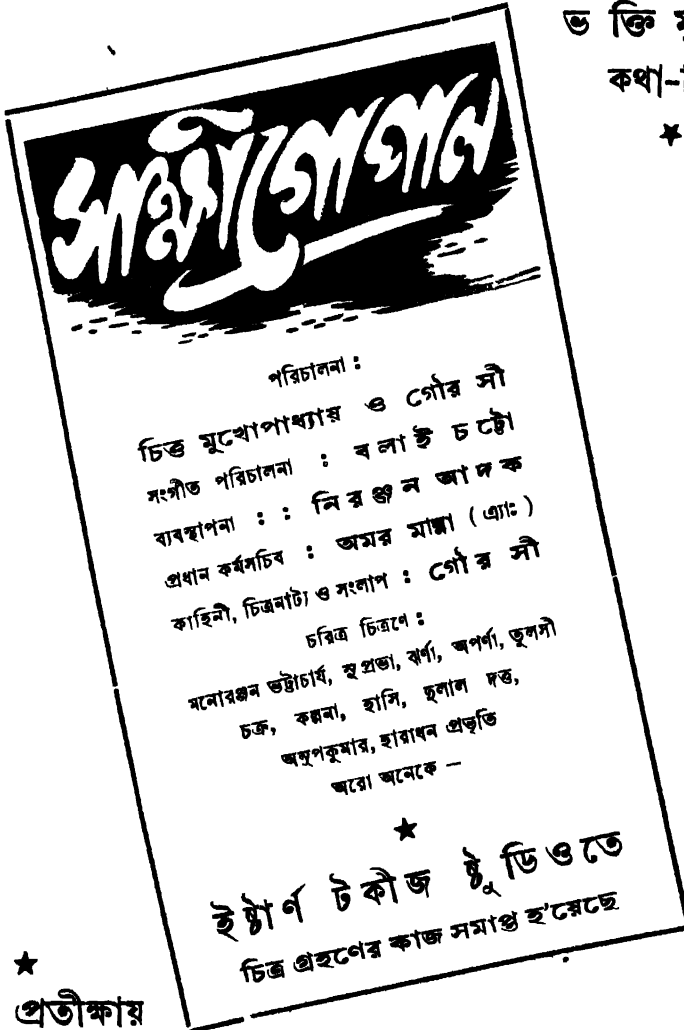
চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণিত সাক্ষীগোপালের অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য

নিয়ে বলাই পাচাল প্রযোজিত

বিভা ফিল্ম প্রডাকসনের প্রথম চিত্র নিবেদন !

ভক্তিমূলক

কথা-চিত্র

★

★

মুক্তির প্রতীক্ষায়
থাকুন !

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন :: দক্ষিণ ব্যাঁটরা হাওড়া

সমালোচনা — [৫৮ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নন্দরাণীর সংসার

স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর কাহিনী বলে প্রচারিত 'নন্দরাণীর সংসার'-এর চিত্ররূপ একযোগে সহর ও মফঃস্বলের কয়েকটি চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছে। বর্তমানে চিত্রখানি উত্তর কলিকাতার শ্রী প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হ'চ্ছে। চিত্রখানি পশুপতি কুণ্ডুর পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় গৃহীত হ'য়েছে। চিত্রনাট্য-রচনা ও প্রযোজনা করেছেন সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার। সুর সংযোজনা, গীতরচনা, ও নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন যথাক্রমে গোপেন মল্লিক, কবি শৈলেন রায় ও প্রহ্লাদ দাস। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, বিমান, মিহির, হরিধন, আদিত্য, সন্তোষ, মণি, রাণীবালা, শান্তিগুপ্ত, বনানী, গীতশ্রী, বীণা, গীতা, যমুনা প্রভৃতি।

কোন নাটক হয়ত একদিন নাট্যামোদীদের অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল—কোন উপন্যাস হয়ত বাঙ্গালী পাঠক সমাজের অন্তর জয় করে আছে—কোন রচয়িতা তাঁদের অন্তরে আজো সুপ্রতিষ্ঠিত—এঁদের রচনার জনপ্রিয়তা এবং ব্যক্তিগত ভাবে এঁদের সুনামের সুযোগ নিয়ে চিত্রজগতে যে অনাচার সুরু হয়েছে তা যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে—বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এই অনাচার সম্পর্কে প্রতিবাদ জানাতে কোন সময়ই পিছু হটেন নি। তবু এই অনাচার বন্ধ হচ্ছে না। অথচ এই অনাচারকে অবিলম্বে বন্ধ করতে না পারলে—বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিত্রজগতের ধুরন্ধরদের স্বেচ্ছাচারিতার কবলে যে শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করবে—আশা করি সে কথা চিন্তা করে প্রতিজন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালী, পত্র-পত্রিকাগুলির সংগে সুর মিলিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করবেন না। বাঙ্গালী দর্শকসাধারণ আজ আর মূক নন—তাঁদের চিন্তা ও বিচারশক্তি এবং মার্জিত রুচি দিন দিন যে বিকাশ লাভ করছে, ঘনিষ্ঠ ভাবে যাঁরা এঁদের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁরাই তা মেনে নেবেন। আমরা পূর্বেও বলেছি—বর্তমানেও পুনরুক্তি কচ্ছি, যদি প্রতিষ্ঠাবান কোন সাহিত্যিকের কোন কাহিনীকে চিত্ররূপায়িত করে তুলতে হয়—তার মর্যাদা পুরোপুরি রক্ষা করতে হবে—বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে উক্ত সাহিত্যিক যদি ইতি পূর্বেই গতায়ু হ'য়ে থাকেন। চিত্ররূপের সুবিধার জন্য যদি কোন সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন হয়, তবে কাহিনীর মূল বক্তব্যকে অটুট রেখেই তা করতে হবে। কোন জীবিত লেখকের কাহিনীর চিত্ররূপের সময় কর্তৃপক্ষ উক্ত সাহিত্যিকের সহযোগিতায়ই কিছুটা বেশী স্বাধীনতা পেতে পারেন। তবে কথা হচ্ছে, সব ক্ষেত্রেই কোন কাহিনী নির্বাচন করবার পূর্বে কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভাবে বিচার করে দেখা উচিত—সত্যিই উক্ত কাহিনীর চিত্ররূপের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা এবং থাকলে তার মূল বক্তব্যকে অব্যাহত রেখে কতটুকু বা পরিবর্তন করা যেতে পারে? ঝুকের মাথায় অপরের মুখে শুনে নির্বাচন-পর্ব শেষ করা মোটেই উচিত নয়। সব কাহিনীর ভিতরই যে চিত্ররূপের সমান সম্ভাবনা থাকে না, এ কথাটা যেমনি সত্য, আবার মূল বক্তব্যকে ব্যাহত না করে চিত্ররূপের প্রয়োজনানুরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সুচতুর চিত্রনাট্যকারের পক্ষে সম্ভব। দুঃখের বিষয়, এই 'সম্ভব' কথাটি আমাদের চিত্রজগতের তথাকথিত সবজান্তা সর্বদক্ষ চিত্রনাট্যকারদের কাছে আর সম্ভব বলে দেখা দেয় না। তাঁরা নিজেদের খুশী মত কাহিনীকে রূপায়িত করে থাকেন। এর প্রমাণ পূর্বেও যেমন একাধিক বার দর্শকসাধারণ পেয়েছেন—বর্তমানেও তার অভাব হবে না। আলোচ্য চিত্র 'নন্দরাণীর সংসার' সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য এবং এর চিত্রনাট্যকার এবিষয়ে এতখানিই অগ্রসর হয়েছেন যে, একমাত্র মূল নাটকের চরিত্রগুলির নাম ছাড়া আর কিছুই তিনি অব্যাহত রাখেন নি। আশ্চর্য হ'য়ে যাই এই ভেবে যে, এঁদের কী আত্মসম্মান বলেও কোন কিছু নেই! কোন স্পর্ধা ও দম্ভে নিজেদের চিত্রনাট্যকার বলে এঁরা জাহির করেন! এই জাহির করবার ভিতর কোন গৌরব নেই—আছে মূর্খতা ও নির্লজ্জতা। এঁরা নিজেরা তা উপলব্ধি করতে
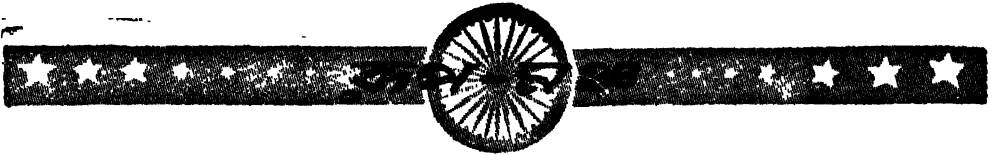
না পারলেও, বাঙ্গালী দর্শক সমাজ—ব্যঙ্গের হাসি হেসেই মন্তব্য করে থাকেন : ওরা আর কী করবে! ওদের করবার আছে কী—ক্ষমতাই বা কতটুকু! কিন্তু ব্যঙ্গের হাসি হেসেই বাঙ্গালী দর্শক সমাজকে আজ মূক থাকলে চলবে না—। তাঁদের সক্রীয় হয়ে উঠতে হবে। এরূপ কোন কাহিনীর চিত্ররূপের সংবাদ ঘোষিত হবার সংগে সংগেই স্থানীয় 'পাঠাগার' অথবা অন্য কোন উপায়ে উক্ত মূল কাহিনীটি সংগ্রহ করে তাঁদের পড়ে নিতে হবে। চিত্র মুক্তির পর বন্ধু বান্ধব—পাড়া প্রতিবেশী অথবা পরিজনের মাত্র একজন দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তি তা দেখে আসবেন—এবং তিনি যদি মনে করেন, চিত্ররূপে মূল কাহিনী বিকৃত হয় নি, তখনই অপরদের অনুমোদন করবেন। আর যদি বিকৃত হ'য়ে থাকে, তখন উক্ত চিত্ররূপ দর্শন থেকে পরিচিত সকলকে বিরত করবেন এবং পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদ জানাবেন। রূপ-মঞ্চ পত্রিকা থেকে এবিষয়ে একটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা হ'য়েছে। রূপ-মঞ্চের অন্যান্য পরিকল্পনার মাঝে একটি চলচ্চিত্র ও নাট্যমঞ্চ পাঠাগারের পরিকল্পনা প্রথম থেকেই গ্রহণ করা হয়। এই পাঠাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেশ বিদেশের চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তকাদি সংগ্রহ করা—দেশীয় চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কিত তথ্য ও প্রতিকৃতি সংগ্রহ করা—যাতে অদূর ভবিষ্যতে চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ-সেবীরা এনিয়ে গবেষণা করতে পারেন এবং উৎসাহী সাংবাদিক, শিল্পী, বিশেষজ্ঞ ও জনসাধারণ চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কিত পুস্তকাদি পড়বার সুযোগ পান। প্রতিবৎসর রূপ-মঞ্চের আর্থিক যা আয় হয়, তা থেকেই এই পাঠাগারকে আংশিক ভাবে কার্যকরী করে তোলা হয়েছে এবং হ'চ্ছে। যখনই উক্ত পাঠাগারটি পূর্ণাংগ রূপ পাবে, তখন এবিষয়ে রূপ-মঞ্চ মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে তার পূর্বে,মধ্যবর্তী সময়ের জন্য—অতীত ও বর্তমানের সাহিত্যিকদের যে সব কাহিনী চিত্র রূপায়িত হ'য়ে উঠছে—সেই মূল কাহিনী ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা পড়বার সুযোগ পান না—তাঁদের সেই সুযোগ দানের ব্যবস্থা আমরা করেছি। বর্তমানে রূপ-মঞ্চের পাঠাগারে এরূপ পুস্তকাদি পড়বার সুযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দেওয়া হবে। ৭৪।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে, সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা অবধি তাঁরা পাঠাগারের কক্ষে বসে এরূপ যে কোন উপন্যাস বা কাহিনী পড়ে যেতে পারেন। অবশ্য, নিজেদের পরিচিত কোন পাঠাগার থেকে যাঁরা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন, আমাদের পাঠাগারে আসা তাঁদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

এবার আমাদের মূল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক। 'নন্দরাণীর সংসার' নাটকটি যাঁদের কাছে আছে বা যাঁরা উক্ত নাট্যরূপ দেখেছিলেন অথবা উক্ত নাটক পড়বার সুযোগ পেয়েছেন—বর্তমান চিত্ররূপের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ তাঁরাত স্বীকার করবেনই। যাঁরা উপরোক্ত কোন সুযোগই পাননি—তাঁদের অনুরোধ করবো উক্ত নাটকখানি কিনে পড়তে। কারণ, তাহলে একদিকে যেমনি সত্যকে তাঁরা যাচাই করতে পারবেন, অপরদিকে পরোক্ষ ভাবে স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকারের পরিবারকে সাহায্য করাও হ'বে।

উক্ত নাটকের 'নিবেদন' প্রসংগে নাট্যকার যে কথা বলেছেন, তাতেই নাটকের মূল বক্তব্য ব্যক্ত হ'য়েছে। দর্শকসাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরা এখানে তা থেকে কতকাংশ আহৃত কচ্ছি : "নন্দরাণীর সংসার আমার পাঁচ বৎসর আগেকার রচনা। তখনো আমি উপন্যাসের নাট্যরূপ দিই নাই। বর্ত্তমান যুগে দেশের কল্যাণকামী বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক পল্লীতে ফিরিয়া গিয়া সেখানে তাঁহাদের কর্ম্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছা করেন। নাটকের নায়ক মহিমারঞ্জন সেই রকম এক
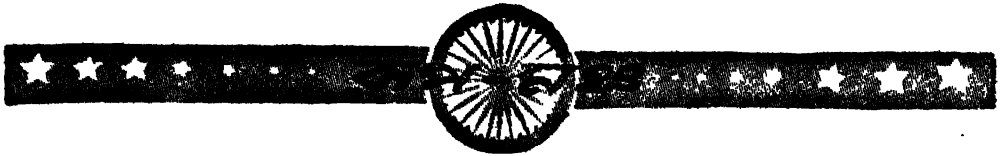
শিক্ষিত কর্ম্মী। যৌবনে—যখন জীবনে তাঁহাকে কোন্ পথে চলিতে হইবে, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই—সেই সময়ে, এক উচ্চশিক্ষিতা বালবিধবাকে ভালবাসিয়া সমাজের চক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেন। চিরদিন সেই স্রোতে চলিবার সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি তাঁহার ছিল না। কিছুদিন পরে, প্রধানতঃ পল্লীসেবার উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তাঁহার জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন—এবং পাশ্চাত্য গ্রাম ও জীবনের অনুকরণে নিজের ব্যবসায় এবং সঙ্গে সঙ্গে পল্লীগঠন করিয়া কিছু কৃতকার্য্য হন। 'নন্দরাণী' এই মহিমারঞ্জন স্ত্রী। স্বামী, পাশ্চাত্যশিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ—স্ত্রী, খাঁটি বৈষ্ণবের মেয়ে। স্বামী জীবনে পুরুষকার ছাড়া আর কিছু মানেন না—স্ত্রী জানেন দেবসেবার চেয়ে বড় কাজ সংসারে নাই। স্বামী-স্ত্রীর যথার্থ মিলন হয় না। স্ত্রীর সহযোগের অভাবে মহিমারঞ্জনের কোন সৃষ্টিই সার্থক হইয়া উঠে না। প্রাচীনকে সমর্থন এবং বর্ত্তমান ও আধুনিককে গালাগালি দেওয়া নাটকের উদ্দেশ্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে অনেক সদগুণ আছে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মহত্ব আছে। তবু, জানিনা কাহার দোষে ঘরের বাইরে কোথাও আজ বাঙ্গালীর সুখ নাই, আনন্দ নাই! প্রবীণে নবীনে যোগ নাই, প্রৌঢ়ের সঙ্গে তরুণের মিল নাই, বুদ্ধিমানের কাজ নাই, স্বামী স্ত্রীর মর্ম্মকথা বুঝিতে পারেন না, স্ত্রীও স্বামীর বৃহৎ অনুষ্ঠানে সহায় হন না,—ভাল করিতে গেলে মন্দ হয়। শিক্ষিত সহৃদয় যুবক মনে করেন, আঘাত দিয়া এই জাতিকে বাঁচাইব। কাছে গিয়া দেখেন, যাহাকে আঘাত দিবেন সে মুমূর্ষু! তাহার প্রাণশক্তি বুঝি নিঃশেষ হইয়াছে। আমি যখন সেখানে গিয়াছি, বাঙলা দেশের সর্ব্বত্র এই নিষ্ঠুর চিত্র আমার চোখে পড়িয়াছে। বর্ত্তমান নাটকে এই চিত্রের রস রূপ ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ইহার প্রতিকারের উপায় বলি নাই। উপায় আমার জানা নাই।"......। বস্তুতঃ এরই ভিতর সমগ্র নাটকটির মূল বক্তব্য ফুটে উঠেছে। 'নন্দরাণীর সংসার' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ৫ই ভাদ্র, শুক্রবার ১৩৪৩ সালে রঙমহল নাট্য মঞ্চে। ঐ একই বৎসরে নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

নাটকের প্রধান পুরুষ চরিত্র মহিমারঞ্জনকে কেন্দ্র করেই মূল সমস্যাগুলি ফুটে উঠেছে—। নাটকের মহিমারঞ্জন নির্দোষ চরিত্র নয়। মহিমারঞ্জন এবং সৌদামিনী বাল্যে পরস্পরকে ভালবেসেছিল এবং বালবিধবা সৌদামিনীকে বিবাহ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই মহিমারঞ্জন তাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাকে আর বিয়ে করতে পারেনি। জীবনের এই ভুলকে নাটকের মহিমারঞ্জন অস্বীকার করেনি কোন দিন—বরং তার প্রায়শ্চিত্তই করতে চেয়েছিল। সৌদামিনীও নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজের মন থেকে সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে নিয়েছিল। পরেশ চৌধুরীর সংগে মহিমারঞ্জনের বিরোধ মূলতঃ সৌদামিনীকেই কেন্দ্র করে। অথচ মহিমারঞ্জনের এই অপরাধকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। তাহলে সৌদামিনীর নিজের ইচ্ছায় গৃহত্যাগের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? জ্যোৎস্না ও পূর্ণিমা মহিমারঞ্জনের এই দুই কন্যার চরিত্রের ভিতর দিয়ে দুইটি বিভিন্নমুখীন বৈশিষ্ট্য মূল নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—আলোচ্য চিত্রে তাকেও অস্বীকার করা হ'য়েছে সম্পূর্ণ ভাবে। কলকাতা থেকে আগত মতিলাল ও জ্যোৎস্নার স্বামী বিকাশ—এ দু'টি চরিত্রও মূল নাটকে মূল বক্তব্যের প্রয়োজনে যে ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—চিত্ররূপের সংগে তার আদৌ মিল নেই। চিত্রে মহিমারঞ্জনকে এক নিখুঁত চরিত্র রূপে আঁকা হ'য়েছে। তার ব্যবসায়িক দৃষ্টি-ভংগীকেও ছোট করা হয় নি—সাময়িক

বিপর্যয়ের হুমকী দেখানো হয়েছে মাত্র এবং সে বিপর্যয়কে কাটিয়ে তোলা হ'য়েছে যাদুকরের যাদুমন্ত্রের মত। মূল নাটক ছিল বিয়োগান্ত—চিত্ররূপ হ'য়েছে মিলনান্ত। মোটকথা একমাত্র নামগুলি ছাড়া চিত্ররূপে আর কিছুই মূল নাটকের রক্ষিত হয় নি। চিত্রনাট্যকার শ্রীসুরেন্দ্র রঞ্জন সরকারকে এই অপরাধের জন্য দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চাইতে বলাও, আমাদের মূর্খতা। অপরাধ তাঁর সীমাহীন এবং অমার্জনীয়। চিত্রে পরেশ চৌধুরী, মহিমারঞ্জন ও জ্যোৎস্নার স্বামী বিকাশের চরিত্রে যথাক্রমে অভিনয় করছেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী—নটদক্ষ ছবি বিশ্বাস—ও নটকুশলী জহর গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা তিন জনেই চিত্র ও নাট্য জগতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী এবং স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকারের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা থাকাই সমীচীন। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে তার প্রমাণ পেলাম কোথায়? তাঁরা কি নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করবার পূর্বে মূল নাটকখানা একবার পড়েও দেখেননি? যদি দেখতেন, এই অনাচারকে তাঁরা বাধা দিতেন, দেওয়া উচিত ছিল। অন্ততঃ তাঁরা পারেন, দু'একটা চুক্তির জন্য তাঁরা নিশ্চয় লালায়িত নন এবং অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিলেও তাঁদের যে চুক্তির অভাব হবে না—এ বিশ্বাস তাঁদের যেমন আছে—আমাদেরও আছে। তবু কেন তাঁরা এ বিষয়ে অবহিত হয়ে ওঠেন না! এই কি তাঁদের শিল্প-প্রীতি! না অর্থ গৃধ্নুতার জলন্ত নিদর্শন! শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্গতঃ চৌধুরীকে গুরু বলেও স্বীকার করে থাকেন এবং তাঁর বর্তমান অভিনয়-পদ্ধতির জনপ্রিয়তার জন্য মাত্র ঐ একজনের কাছেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে নিজের উদারতার পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন না—অথচ তাঁর গুরুকে—বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় স্বর্গতঃ এক নট ও নাট্যকারের সৃষ্টিকে এমনি ভাবে তাঁদেরই জ্ঞাতসারে অন্যায় ভাবে জবাই করা হ'লো—তাঁরা প্রতিবাদ করলেন না। এতে তাঁদের আন্তরিকতায় সন্দেহ জাগাটা অস্বাভাবিক নয়।

অভিনয়ে ছবি বিশ্বাসকেই সর্বপ্রথম অভিনন্দন জানাব—তারপর উল্লেখ করবো অহীন্দ্র চৌধুরীর কথা। অবশ্য একথা বলতেই হবে, জহর গাঙ্গুলীর সরস অভিনয়ই বর্তমান চিত্ররূপকে সবচেয়ে বেশী রক্ষা করেছে। তবু শ্যালীকা পরিবৃত বিকাশকে নিয়ে গৃহীত দৃশ্যগুলি আরো সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত ছিল। মতিলালের ভূমিকায় বিমান এবং জ্যোৎস্নার ভূমিকায় বনানী—এঁদের ওপর খুবই অবিচার করা হ'য়েছে, পূর্ণিমার ভূমিকায় শ্রীমতী ছন্দা, সন্ধ্যারাণীকে অনুকরণ করতে যেয়ে কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন। সস্তা অভিনয়ের দিকে যদি ঝোঁকটা বেশী না যায়, শ্রীমতী ছন্দার ভবিষ্যত আশাপ্রদ বলেই আমাদের মনে হয়। রাণীবালার নন্দরাণী ও শান্তিগুপ্ত'র সৌদামিনী ভাল। গীতশ্রীও নিরাশ করেনি। হরিধন, আদিত্য ও মণি দাশগুপ্তের নামও উল্লেখযোগ্য। ছন্দার নাচখানি সুপরিকল্পিত। অবশ্য এই নৃত্যটির কোনই প্রয়োজন ছিল না। কাহিনীর পরিসমাপ্তি এর পূর্বেই টানা উচিত ছিল। সংগীত প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণ ও চিত্রগ্রহণ প্রশংসনীয় নয়। —শ্রীপার্থিব

অনির্বাণ

অসংলগ্ন, অবাস্তব ও অসাড় আংগিকের ওপর রচিত যে কাহিনী—কাহিনীর আখ্যানভাগকে যত শক্তিশালী শিল্পী গোষ্ঠী দিয়েই চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা হোক না কেন, তা যে আজকের দিনে কোনক্রমেই দর্শক মনকে স্পর্শ করতে পারে না, সে বিষয়ে আর একবার ভালো ভাবে অবহিত হওয়া গেল এম, পি, প্রডাকসনের আধুনিকতম বাংলা ছবি "অনির্বাণ" দেখতে গিয়ে। "অনির্বাণ" পরিচালনা করেছেন নিউ থিয়েটার্স-খ্যাত সৌমেন মুখোপাধ্যায়। এঁর কাহিনী রচনা করেছেন জনৈক অপ্রকাশ মিত্র। সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায় এবং বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন কানন দেবী, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, ছায়া দেবী, নরেশ মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র দে, রবি রায়, প্রভা, তুলসী চক্রবর্তী, আশু বোস এবং খ্যাত অখ্যাত আরো অনেকে।

দৈন্য আজ বাংলা ছবিকে যে ভাবে দুর্দিনের দুঃখভারাক্রান্ত পথে নিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে আমাদের প্রযোজক, পরিচালক ও কাহিনীকারবর্গ যদি কিছুমাত্র ওয়াকিফহাল থাকতেন, তবে আমার মনে হয়, 'অনির্বাণ'-এর মত কাহিনী আজকের দিনে কিছুতেই চিত্রায়িত হতে পারতো না। আমি
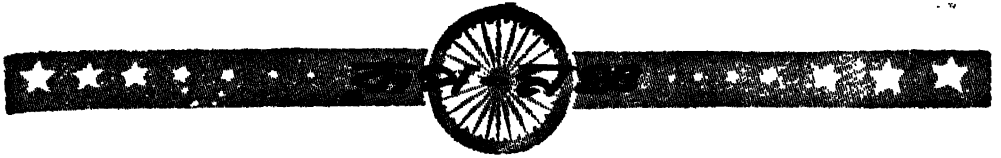
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি এই দেখে যে, এম. পি, প্রডাকসনের মত খ্যাতনামা চিত্র প্রতিষ্ঠানও তাঁদের ছবির জন্য নির্বাচন করেছেন কিনা "অনির্বাণ"-এর মত অচল ও অসম্ভব গল্পকে। অথচ বাংলা দেশ, সত্যকারের ভালো গল্পের দেশ। এ দেশের গল্প-সাহিত্য বিশ্বের সুধীজনের দরবারে সুস্বীকৃত—ভালো লেখকের ভালো রচনার অভাব ভারতের আর যে কোনও স্থানে থাকুক না কেন, অন্ততঃ বাংলা দেশে নেই—তা বাংলার ও বাঙ্গালীর অতি বড় শত্রুও অক্লেশে, দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেবে। তবু এদেশের ছবির ক্ষেত্রে যখন কাহিনী নির্বাচনের জন্য কর্ণধারেরা একত্রিত হন, তখন তাঁদের অশেষ ও অভাবনীয় মস্তিষ্ক সঞ্চালনের পর গৃহীত হয় কিনা অপ্রকাশ মিত্র রচিত "অনির্বাণ"- এর মত গল্প। বাস্তবিক সমসাময়িক যে কোন বাংলা ছবি দেখতে গেলেই প্রথমেই দর্শক মনকে আহত করে তাঁর কাহিনীর নিদারুণ দীনতা। অথচ কাহিনীই ছবির প্রাণ। তবু আমাদের ছবির যাঁরা কর্তাস্থানীয় লোক, তাঁরা অবহেলা করে আসছেন ছবির প্রাণস্বরূপ এই কাহিনী। তাঁদের অহেতুক এবং অযৌক্তিক অবহেলার জন্যই বাংলা ছবি ধীরে ধীরে অধঃপতনের শেষ সীমানার দিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলা ছবির এই যুগ সন্ধিক্ষণে বাংলার চিত্রপ্রতিষ্ঠানসমূহের দৃষ্টি এদিকে অচিরে নিক্ষিপ্ত হোক্! অন্যথায় বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন। যা হোক্—এখন আলোচ্য অনির্বাণে আসা যাক্। অপ্রকাশ বাবু ভেবে ছিলেন যে, ছবির কাহিনী ঘটনা বহুল হওয়া চাই। তা' যে চাই, সেটা আমরাও মানি।

কিন্তু ঘটনা বাহুল্যের কোন অর্থই হয় না—যদি না সেই ঘটনাগুলির মধ্যে একটা বাঁধুনি থাকে এবং একটি পরিষ্কার সামঞ্জস্যবোধ সেই ঘটনাগুলিকে পরস্পর গ্রথিত করে। কিন্তু "অনির্বাণ"-এর ঘটনাগুলি শুধু ঘটনা—কাহিনীর সাথে তাদের যোগাযোগে কোনো সামঞ্জস্য—কোনো নিবিড়তা নেই। তাই সেই ঘটনাগুলির ওপর ভিত্তি ক'রে যে "অনির্বাণ" প্রস্তুত হয়েছে, তা দর্শকমনে এতটুকু রেখাপাত করতে সক্ষম হয় নি। খাপছাড়া, এলোমেলো একটির পর একটি ঘটনা "অনির্বাণ"কে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে মাত্র। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমি ছবিতে আই-এন-এ episode এর উল্লেখ করবো। এমন উদ্ভট ও অবাস্তব পরিবেশের মধ্য দিয়ে "অনির্বাণ"-এর নায়িকা ও একটি প্রধান পুরুষ-চরিত্রকে সুদূর বর্মা প্রাংগনে নিয়ে যাওয়া হলো এবং সেখান থেকে তাঁদের পুনরায় ভারতবর্ষে I-N-A messenger হিসাবে পাঠানো হলো—যা কল্পনা করেও স্থির মস্তিষ্ক-সম্পন্ন একজন লেখকের পক্ষে দস্তুরমত অসম্ভব হওয়া উচিৎ ছিল—কিন্তু তাই হয়েছে। আমি শুধু একটি ব্যাপারের উল্লেখ করলাম মাত্র—এ ধরণের বহু অসংলগ্নতা "অনির্বাণ" ছবিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে আগাগোড়া।

"অনির্বাণ" পরিচালনা করেছেন সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার্সের বাইরে বোধ করি এই তাঁর প্রথম ছবি। সৌম্যেন বাবুর শিক্ষা, দীক্ষা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি, তাতে তাঁর কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই আশা করি এবং ইতিপূর্বে তাঁর দুএকটি ছবি, বিশেষ করে "প্রিয় বান্ধবী" আমাদের খুব খুশী করেছিল। কিন্তু দুঃখিত ও হতাশ হয়েছি তাঁর "অনির্বাণ" দেখে। অবিশ্যি এ জন্য যে কাহিনী-ই বহুলাংশে দায়ী, সে কথার আর পুনরুক্তি করতে চাই না। তবু সৌম্যেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়—তিনি "অনির্বাণ"-এর মত কাহিনী নির্বাচন করলেন কোন ভরসায় এবং কি ভাবে? যে সুযোগ সুবিধা এবং যে শিল্পী সমাবেশ তিনি পেয়েছিলেন এম-পি- প্রডাকসনের কাছ থেকে, তাকে তিনি এতটুকু কাজে লাগাতে পারলেন না—এইখানেই সৌম্যেন বাবুর চরম ব্যর্থতা। "অনির্বাণ"-এ তাঁকে প্রশংসা করবার মত আমি কিছুই খুঁজে পাই নি—আশা করি ভবিষ্যতে তিনি তাঁর কাহিনী নির্বাচনে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন। চরিত্রোপযোগী শিল্পী নির্বাচনে তাঁদের বয়সের কথাটাও একবার মনে রাখা উচিত।

অভিনয়াংশে যে শিল্পীবৃন্দ "অনির্বাণ"কে চিত্রায়িত করতে সাহায্য করেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই খ্যাতনামা। বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী দর্শক সমাজে তাঁরা চির পরিচিত। নতুন করে পরিচয় দেবার মত এঁদের আর কিছুই নেই। এঁদের
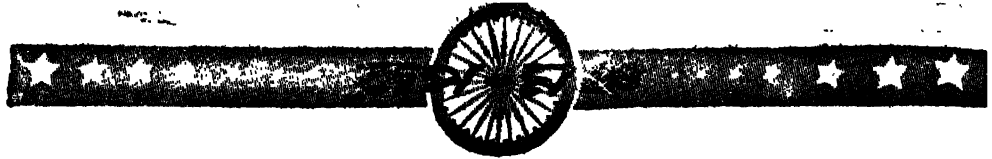
মধ্যে আলোচ্য ছবিতে আমার ভালো লেগেছে ছায়া দেবীর অভিনয়। মাঝে মাঝে দুএকটি দৃশ্য ছাড়া, তাঁর ভূমিকাটি সত্যই সুসমৃদ্ধ। তা ছাড়া চরিত্রানুগত যথাযথ অভিনয় করেছেন নরেশ মিত্র ও ছবি বিশ্বাস। কানন দেবীকে যে ভূমিকা দেওয়া হ'য়েছে, সেই চরিত্রে দেখাবার মত কিছু নেই। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলুম না, এ ধরণের একটি চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য কানন দেবীকে মনোনীত করা হলো কেন? যে কোনও সাধারণ একটি শিল্পী অক্লেশে এই চরিত্রটির রূপ দিতে পারতেন। তবে কানন দেবীর নাম Box office কে যে বেশ কিছুটা সাহায্য করেছে, তা'র উল্লেখ আশা করি না করলেও চলে। তবে প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী যাঁরা, তাঁদের ক্ষমতার অপচয় দেখতে সত্যিই দুঃখ হয়। কানন দেবীর মত শিল্পীর পক্ষে এ ধরণের ভূমিকা রূপায়িত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাই, আমার মতে যুক্তিযুক্ত। কেননা, একদিক থেকে তিনি লাভবান হলেও, অন্যদিকেও তাঁর যে ক্ষতি হচ্ছে, তা কি একেবারে অস্বীকার করবার মত? একটি প্রধান পুরুষ-চরিত্রে জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় অসহ্য। জহর বাবুকে অনুরোধ করছি, তাঁর অভিনয় ধারার আমূল পরিবর্তন করতে। এ ছাড়া প্রভা ও তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় করেছেন।

"অনির্বাণ"-এর সংগীত নির্দেশক রবীন চট্টোপাধ্যায়। সংগীতাংশে কানন দেবীর কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত দুটি মোটামোটি ভাল লেগেছে। গান দু'খানি ইতিপূর্বেই বহুলভাবে প্রচারিত। এ ছাড়া রবীন বাবুর সুরসংযোজিত কানন দেবীর কণ্ঠে Story-songটি বেশ লাগলো। কৃষ্ণচন্দ্র দে'র গানটি ভালো লাগে নি। "অনির্বাণ"-এর চিত্রগ্রহণ ও শব্দনিয়ন্ত্রণ সাধারণ শ্রেণীর—বিশেষ ভাবে উল্লেখ করবার মত কিছু নেই এ দুটি কাজে। এম, পি, প্রডাকসন, সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়, কানন, ছবি, নরেশ, ছায়া, জহর, কৃষ্ণচন্দ্র, প্রভৃতির একত্র সমাবেশে আমরা "অনির্বাণ" অপেক্ষা আরো অনেক ভালো ছবি আশা করে, ব্যর্থকাম হয়েছি। —তুলুগুপ্ত

নারীর রূপ

ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড পিকচার্স লিমিটেডের চিত্রার্ঘ্য, এস, এল, কারনানীর প্রযোজনায় সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায় গৃহীত। এর কাহিনীকার মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুরকার সুবল দাশগুপ্ত। অভিনয়াংশে আছেন রমলা, রবীন মজুমদার, রেণুকা রায়, জহর গাঙ্গুলী, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ, উৎপল সেন, বাণীব্রত, শিশির বটব্যাল, ম্যালকম, রেবা, সুদীপ্তা, অমিতা এবং আরো অনেকে। সংলাপ রচনা করেছেন মণীন্দ্র রায়, সুখময় ভট্টাচার্য।

চলচ্চিত্র জগতে মাঝে মাঝে দু'একখানা চিত্র আমাদের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করে—আমরা ভাবি, বাংলার চিত্র শিল্প অগ্রগতির দিকে এগিয়ে চলেছে—"ভুলিনাই", "অঞ্জনগড়" শৈল্পিক ঐশ্বর্য দিয়ে আমাদের চোখের সামনে উন্নততর ভবিষ্যতেরই ইংগিত দিয়েছে। তাই আশামুগ্ধ আমরা নূতন ছবির দিকে এই ইংগিতের উজ্জলতর সুস্পষ্ট রূপই আশা করি। কিন্তু এই পথে যে পর্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি আজও প্রচুর পরিমাণে এসে পড়তে পারে, তার অনেক গুলির মাঝে একটি হলো এই "নারীররূপ"। আজকের দিনেও যে এই রকম উদ্ভট ও অদ্ভুত ছবি পরিচালকের হাতে গড়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ এই চিত্রখানি। পরিচালক ছবির ভিতর দিয়ে দর্শক সাধারণকে কি পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন, তা বুঝতে পারলাম না। গল্পে, পরিচালনায়, চরিত্র চিত্রণে কোথাও একটু বলিষ্ঠ মনের বা অভিজ্ঞতার ছাপ পাওয়া যায় না। মনে হয় যেন ছোট ছোট ছেলেরা সং সেজে কয়েক ঘণ্টার জন্য ভেল্কিবাজী দেখাচ্ছে। 'স্বয়ংসিদ্ধার' কাহিনীকার উঁচুদরের সাহিত্যিক বলে স্বীকার না করলেও 'স্বয়ং সিদ্ধা'তে যে বিষয় বস্তুর অবতারণা করেছিলেন, তার ছিঁটে ফোটাও যদি 'নারীররূপে' থাকতো, তাহলেও হয়তো গল্পটিকে প্রশংসা করতে পারতাম। গল্পে না আছে কোন বাঁধুনি, না আছে কোন স্বাভাবিকতা। গল্পের কেন্দ্রীয় প্রাণধর্ম বা কাহিনীর উদ্দেশ্য কি—তা আমাদের চোখে পড়লো না। প্রিন্স নন্দলাল একজন অফুরন্ত টাকার মালিক এবং নিজের খেয়াল খুশী নিয়েই মেতে থাকে, সবচেয়ে বড় খেয়াল হলো তা
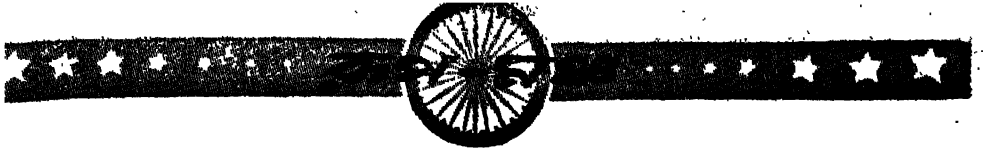
নারীদের রূপকে বেঁধে রাখা, কিন্তু তাতে তার মনে নেই লালসা বা কামনার বাষ্প। জীবনের অভিজ্ঞতা হলো, টাকা দিয়ে লক্ষ রূপসীর মেলা বসান যায়, কিন্তু প্রাণের খোঁজ পাওয়া যায় না। নন্দলালের এই অভিমত দামী সন্দেহ নেই, কিন্তু এইরূপ কোন চরিত্র বাস্তবে নেই। চরিত্র বিশ্লেষণে কাহিনাকার, পরিচালক প্রভৃতির অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে। পরিচালকের আরো অন্ততঃ দশ বৎসর চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থী হওয়ার প্রয়োজন। বড় বড় কয়েকটি সংলাপ জুড়ে দিলেই চরিত্রের রূপ ফুটে ওঠে না—চরিত্রের মাঝে চাই গাম্ভীর্য পূর্ণ দৃঢ়তা, একটা অনমনীয়তার ভাব, ভাস্কর্যোচিত কাঠিন্য চাই চরিত্রে—সর্বোপরি চাই বাস্তবতা। আমাদের পরিচিত পরিবেশে কি প্রিন্স নন্দলালের মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে? যে জহুরীর দোকানে পঁচিশ হাজারে একটি মালা কিনে সেই দোকানের মেয়ে কর্মচারীকে উপহার দেয় কিংবা নিজের সেক্রেটারী এবং তার বিবাহিতা অথচ পরিত্যাক্তা পত্নী—সেই মেয়ে কর্মচারাকে একটি বাড়ী, একটি গাড়ী ও লাখখানেক ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স মুখের কথায় দিয়ে দেয়, এমন লোক কি আমাদের সাধারণের কাছে পরিচিত? গল্প কি শুধু উদ্ভট কল্পনা-প্রসূত হবে? গল্প বাস্তব চরিত্রের ছায়ামাত্র না হলেও, তাতে বাস্তবতার প্রভাব থাকবে সবচেয়ে বেশী এবং এটা সর্বজনগ্রাহ্য মত। কিন্তু "নারীর রূপে"র দুর্বল গল্পাংশে বাস্তবতার স্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে যাওয়ার হাস্যকর প্রয়াস দেখা যায়। শিক্ষিতা এবং আদর্শবাদী সুন্দরী আশাও দর্শকমনে দাগ কাটতে পারে না অথচ চরিত্রটির মধ্যে সম্ভাবনা ছিল—অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রীর পরিণতি হাস্যকর। এরকম আদর্শবাদী মেয়ে পরে সব ভুলে গিয়ে প্রিন্সের সংগে প্রেমের তথাকথিত খেলা এবং বিবাহে তার পরিণতি—চরিত্রটির সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করেছে। প্রিন্সের পরোপকারীতা কিংবা মাধুর্যে আশা তাকে শ্রদ্ধা জানাতে পারতো কিন্তু এই শ্রদ্ধা কি বিবাহ বন্ধন ছাড়া অসম্ভব? দুজনে পরিচিত হলেই আসবে প্রেম এবং পরিশেষে বিবাহ দিতেই হবে—এই বাধা গৎ যেন পরিচালকদের অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে। প্রিন্স নন্দলাল এবং আশার ভূমিকায় যথাক্রমে রবীন মজুমদার এবং রেণুকা রায় আমাদের হতাশ করেছেন। মূল চরিত্র দু'টী এরজন্য বহুলাংশে দায়ী হলেও, অভিনয়ে কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লো না। ছবিখানির একমাত্র আকর্ষণ এবং শ্রেষ্ঠ চরিত্র চিত্রণ ও অভিনয় রমলার ভূমিকাটি। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেরী রূপে হাস্যে, লাস্যে রমলা যেমনি আনন্দ দিয়েছেন, তেমনি শেষের দিকে তার চরিত্রের পরিবর্তিত অংশেও সুঅভিনয় করেছেন। "মেরী" চরিত্রটিও সুন্দর। মডেল রূপে প্রিন্সের সাথে পরিচিত হয়ে সে প্রিন্সকে ভালবাসলো, অর্থসর্বস্ব স্বামীর সাহচর্য না পেয়ে তার মন প্রিন্সকেই চাইল, কিন্তু প্রিন্সের প্রত্যাখ্যান ও উপদেশে স্বামীকে নিয়ে নূতন ভাবে জীবন যাপন করতে গিয়েও রিক্ত গৃহ ছাড়া তার অদৃষ্টে কিছু রইল না। স্বামীর আত্মহত্যাকে যারা প্রিন্সের ষড়যন্ত্রের ফল বলে প্রিন্সকে অভিযুক্ত করতে চেষ্টা করলো, তাদের হাত থেকে প্রিন্সকে বাচানোই হলো মেরীর প্রধান কর্তব্য। এ শুধু কর্তব্য নয়—এ তার ভালবাসার যাঁচাই। প্রিন্সকে রক্ষা করে তাকে আশার হাতে তুলে দিয়ে সে ত্যাগের দ্বারা নিজে মহীয়সী হয়ে উঠলো। এই একটি চরিত্র দর্শকমনে রেখাপাত করবে আশা করি। রমলার বাচন-ভংগী, রূপসজ্জা ও অভিনয় সত্যই সুন্দর হয়েছে। এ ছাড়া বাণীব্রতের অলোকও মন্দ নয়। পুলিশ কমিশনার রূপে শিশির বটব্যাল ভালই। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে সন্তোষ সিংহ, জহর গাঙ্গুলী, চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। যেখানে মূলেই গলদ, সেখানে অভিনয় আর কতখানি সাফল্য পেতে পারে?

ছবিটির সংগীত আমাদের আনন্দ দিয়েছে। গানগুলির সুর ও স্বর আনন্দদায়ক। পরিচালনা বা ফটোগ্রাফীতে কোন বৈশিষ্ট তো নেইই, পরিচালনা যদি সাধারণ শ্রেণীরও বলতে পারতাম, তা হলেও একটু সান্ত্বনা ছিল। পরিচালনার দায়িত্ব কোন দিক দিয়েই সার্থক হয় নি—কোন ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ পরিচালকের পরিচয় দেখা যায় না। পরিচালক সতীশ দাশগুপ্ত চিত্রজগতে নবীন নন, পরিচালনায় সুযোগ পেয়ে তাঁর এমন অসদ্ব্যবহার তাঁর পক্ষে উচিত হয় নি। দর্শক সমাজ পুতুল নাচের যুগে আজ আর নেই—তাঁদের দৃষ্টি এবং রুচি অনেক পরিবর্তিত হয়েছে—এ খবর

চিত্র নির্মাতা-গোষ্ঠী রাখেন, কিন্তু তবু তাঁদের সামনে এরূপ আজগুবি ছবি পরিবেশনে নিবৃত্ত হতে পারেন না কেন? সংলাপ দিয়ে আসল গলদ ঢাকা যায় না,বরঞ্চ আরো সুস্পষ্ট হয় এটুকু মনে রাখা কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। সংলাপ উচ্চস্তরের তো হয়ই নি, নেহাৎ মামুলী ধরণের বড় বড় বুলি মাঝে মাঝে দিয়ে দর্শকদের ধাপ্পা দেওয়ার ও হাততালি কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। কথায় কথায় "মহাত্মাজী বলেন" আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আওড়ালেই সংলাপ হয় না এবং দুজনের আলাপের মধ্যে কবির ভাষায় বক্তব্য বলার ইচ্ছা হাসির উদ্রেক করে।

পরিশেষে, বহু বিজ্ঞাপিত "নারীর রূপে" নারীর কোন্ রূপটিকে বিশেষ ভাবে পরিচালক ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তা জিজ্ঞাসা করি। আশা চরিত্রটিকেই বোধ হয় তাঁরা আদর্শ করে তুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু এইখানেই সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা তাঁদের। এই চরিত্রটি আদর্শ হিসাবে ধরা হলে নারীর রূপ অনেকাংশে খর্ব হয়ে যাবে—নারীর আদর্শ আশা হতে পারে না। আশাকে দিয়ে অনেক কিছু করানোর ইচ্ছা হয়তো পরিচালকের ছিল, তাই তাকে একাধারে শিক্ষিতা, আদর্শবাদী এবং নানা বড় বড় কল্পনায় গড়ে তুলেছেন কিন্তু তার কোন্‌টি চিত্রে ফুটে উঠেছে? আশা নারীত্বের কোন্ দিকটা ফুটিয়ে তুলেছে? পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার খেই হারিয়ে গিয়ে কোন রকমে সব জোড়া লাগিয়েছেন এবং তারই ফলে আশার চরিত্রের কোনদিক আদর্শরূপে রূপ পায়নি,এর চেয়ে মেরীর ভিতর দিয়ে নারীর ত্যাগের দিকটা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অথচ সমস্ত চিত্রটীতে আশাকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, মেরীকে ততটা নয়—কিন্তু মেরীই উজ্জলতর।

চিত্র নির্মাতাদের কাছেও আমাদের এই নিবেদন যে,তাঁরা যেন এরকম চিত্র নির্মাণে আর দৃষ্টি না দেন। তাঁদের প্রয়াস যেখানে এরকম ব্যর্থতাই শুধু আনে, সেখানে তাঁদের হস্তক্ষেপ না করাটাই শিল্পজগতের পক্ষে মঙ্গলজনক। যেখানে আজ চিত্রের আরো উন্নতির প্রয়োজন এবং চারিদিকে সকলের এই উন্নতিই আজ কাম্য—সেখানে এরূপ চিত্র দ্বারা শিল্প জগতকে অবনতির অন্ধকারে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা অলজ্জ্য এবং অমার্জনীয় অপরাধ। দর্শক সমাজের পক্ষ হতে জোর গলায় এর প্রতিবাদ উঠেছে, কিন্তু তাতেও নির্মাতাদের অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণের মধ্য দিয়ে অন্তরে পৌঁছায় নি। তাই চাই আরো সঙ্ঘবদ্ধ মিলিত প্রতিবাদ, যাতে এরা চিত্রজগতের সর্বনাশ ডেকে না আনতে পারেন। কারোর উপকার না করতে পারলেও অপকার করা যে উচিত নয়—এটা এদের বুঝিয়ে দিতে হবে। —মণিদীপা

(খুচরো খবরের শেষাংশ)

বাঁকা লেখা—

শ্রীসুধীর দাস প্রযোজিত ছবিখানি অচিরেই মুক্তিলাভ করবে বলে প্রকাশ।

এক নারীর জীবনে প্রণয়ের ভ্রষ্টলগ্নের মর্মস্পর্শী ইতিহাস মণি বর্মণ রচিত এই কাহিনী। যাদের প্রতি প্রতিশ্রুত কর্তব্য, অতৃপ্ত মাতৃহৃদয়ের বুভুক্ষা ও বঞ্চিত যৌবনের অবরুদ্ধ প্রণয়াবেগ—এই বিচিত্র ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষুব্ধ নারী-চরিত্রটিকে রূপ দিয়েছেন কানন দেবী।

ছবিখানির অপর আকর্ষণ হচ্ছে—জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, বিপিন গুপ্ত, সুপ্রভা, সুহাসিনী, প্রভৃতির সমাবেশে বলিষ্ঠ ভূমিকালিপি।

পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু এবং সুর দিয়েছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিমল ঘোষের কর্মাদক্ষতায় রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত হয়েছে। পরিবেশন কচ্ছেন—ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স।

বিদুষী ভার্যা—

নরেশ মিত্র, পরিচালিত এম, পি, প্রডাকসনের আগামী চিত্র। স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের সংগে বিদুষী বধূ বাংলার সংসারে যে বিচিত্র সমস্যার সৃষ্টি করেছে—উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বহুপঠিত উপন্যাস অবলম্বনে রচিত ছবিখানি তারই সর্বোচ্চ রূপায়ণ। নায়িকার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করবেন শিক্ষিতা তরুণী শ্রীমতী মলয়া সরকার। নরেশ বাবুর শিক্ষাগুণে ইনিও 'স্বয়ং সিদ্ধা'র দীপ্তি রায়ের মতো প্রথমাবির্ভাবেই দর্শকহৃদয় জয় করতে পারবেন বলে আমরা আশা করি। পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছেন।

বিমল ঘোষের কর্মাধ্যক্ষতায় 'বিদুষী ভার্যা' কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ছবিখানির সুর দিচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়।

গত শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীমতী রেণুকা রায়ের রঙীন ছবিটি রূপ-মঞ্চের পাঠক-সাধারণের একাংশকে খুশী করতে পারেনি বলে কেবল মাত্র রূপ-মঞ্চের পাঠক-সাধারণের জন্য শ্রীমতী রেণুকার বিশেষ ভংগীমার নতুন একটী ছবি প্রকাশ করা হলো। রূপমঞ্চ: পৌষ-মাঘী সংখ্যা, ১৩৫৫

বসুমিত্র প্রযোজিত প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ও পরিচালিত "কালোছায়া" চিত্রে : ধীরাজ, সিপ্রা, গুরুদাস ও শিশির।

অষ্টম বর্ষ
অষ্টম সংখ্যা

রূপ-মঞ্চ

অগ্রহায়ণ পৌষ
১৩৫৫

আমাদের আজকের কথা

আমাদের আজকের কথা লিখতে বসে সম্পাদকীয় দপ্তরে লিখিত কয়েকজন পাঠকের কয়েকখানা পত্রের ওপর দৃষ্টি পড়লো। তাঁদের প্রত্যেকেরই পত্রগুলির বক্তব্য প্রায় একই। তাঁরা বাংলার নাট্যমঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের বর্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করে হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। তাই আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন: এই যে এত লিখছেন, তবু সুফল ফলছে কোথায়? প্রশ্নটা শুধু আমাকেই নয়—বাংলার প্রতিজন নাট্য ও চলচ্চিত্র সাংবাদিককেই ভাবিয়ে তুলবে। ভাবিয়ে তুলবে বাংলার নাট্য ও চিত্রজগতের যে কোন চিন্তাশীল দর্শক বা ব্যক্তিকেই। তাই ভাবছি—কী লিখবো—লিখে লাভই বা হবে কী! এতদিনত অনেক লিখলাম—তবুত কোন সুফল ফলতে দেখলাম না। বরং যাঁদের নিয়ে লিখেছি—যাঁদের জন্য লিখেছি—তাঁদের অভিশাপই কুড়িয়ে পেতে হ'য়েছে। তবে! তবে আর লিখে লাভ কী? তবে আর নাই বা লিখলাম! কিন্তু এই 'তবে'—ত সত্য নাও হ'তে পারে—কিছুটা সুফল হয়ত ফলেছে—না ফললেও ভবিষ্যতে ফলতে পারে। সেই কথা মনে করেই আবার লিখতে বসেছি। কলকাতার সাড়ে চারটি মঞ্চগৃহ (শ্রীরঙ্গম, স্টার, রঙমহল মিনার্ভা ও কালিকার অর্ধাংশ) চিরাচরিত খাতেই বয়ে চলেছে। বাইরে থেকে এগুলির কোন জৌলুষই চোখে পড়ে না—ভিতরে উঁকি-ঝুঁকি মারলে আরও চিন্তিত হ'য়ে উঠতে হয় এগুলির শিল্পবনিয়াদ আর আর্থিক বনিয়াদের সবকটি খুঁটিই নড়নড়ে অবস্থায় দেখে। পাদপ্রদীপের আলোকমালা যেন ঠিক নিকটিক করে জ্বলছে—যে কোন দমকা হাওয়ায় নিভে যেতে পারে। চিত্রজগতের অবস্থা আরও শোচনীয়। প্রযোগশালার পর প্রয়োগশালা নির্মিত হ'চ্ছে—একটার পর একটা প্রেক্ষাগৃহ রোশনাই জ্বেলে উঠছে—পাল্লা দিয়ে যেন ছবির সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলেছে। চিত্র-জগতের তৎপরতার কথা অস্বীকার করবো না ঠিকই। কারণ, তাহলেত সত্যের অপলাপ করা হবে। আর এই তৎপরতার জাজ্বল্যমান নিদর্শনত রয়েছে প্রেক্ষাগৃহগুলির দেওয়াল গাত্রের দ্রুত পট পরিবর্তনের মাঝে। এক—দুই—তিন বলারও সবুর সইল না—কত আশা নিয়ে এলো—মনে ছিল আশা, 'জল্‌দি চলো' হাঁকের সংগে সংগে পট পরিবর্তিত হ'তে লাগলো—স্যার শঙ্করনাথ এলেন তার অতীতের আভিজাত্য নিয়ে—'সাহারা'র মাঝে উমা এলেন তাঁর স্বর্গীয় প্রেম নিয়ে (উমার প্রেম)—'প্রিয়তমা'—শৈলজা-নন্দের 'ঘুমিয়ে আছে গ্রাম'-এ এসে চিত্রজগতকেও ঘুম পাড়িয়ে গেল। দুঃসাহসী 'কালোঘোড়া' ছুটে এলো 'অনির্বাণ' শিখা জ্বালাতে। এমনিভাবে এলো বংবেরং—জয়যাত্রা—তরুণের স্বপ্ন—ধাত্রী দেবতা—বাঁকালেখা মায়ের ডাক। নারীর রূপ—নন্দরাণীর সংসার—পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে গেল। আবার সম্প্রতি এসে হাজির হ'লো শ্যামলের স্বপ্ন। স্বপ্ন অলীক হ'লেও সুস্বপ্ন হ'লে তার আমেজ ক্ষণিকের জন্য মন ভরিয়ে তোলে—কিন্তু চিত্রজগতের তরুণের স্বপ্ন—শ্যামলের স্বপ্নর মধ্যে সে আমেজটুকু কোথায়? বরং দুঃস্বপ্নের

মত এরা যে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে—তার হাত থেকে মোটেই রেহাই পাচ্ছিনা। অথচ আমাদের রেহাই পেতেই হবে। এরা শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাদেরই পকেট মারছে না—সমগ্রভাবে চিত্রজগতের পকেটও ফাঁক করে দিচ্ছে। তার প্রমাণ—শিল্পী ও কর্মীরা ঠিকমত পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না—পত্রপত্রিকাগুলি বিজ্ঞাপন ছেপে টাকা আদায় করতে অসমর্থ হচ্ছেন—দশদিন ঘুরিয়ে দয়াপরবশতঃ যদি একখানা চেক দিচ্ছেন—ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সটান ফেরত দিয়ে দিচ্ছেন। (অবশ্য ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিয়েই বলা হচ্ছে এবং ব্যক্তিগতভাবেও কাউকে ইংগিত করা হচ্ছে না)। উচ্চপদস্থ কর্মচারী বা ধনী পিতা,—শ্বশুর বা ভাইকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে মাঝে মাঝে উলটে চমকীও দেখানো হচ্ছে—কিন্তু এই চমকীকেও আর কেউ ভয় করছে না। কারণ, দেশটা যে স্বাধীন হ'য়েছে। গেঞ্জিওয়ালা-লোহাওয়ালা প্রভৃতি কালোবাজারের দৌলতে যে পকেটকে ফাঁপিয়ে নিয়েছিলেন—তাও চিচিং-ফাঁক হ'তে বসেছে। আমাদের অর্থাৎ দর্শকদের ট্যাঁকেও টান যে না পড়েছে তা নয়—কিন্তু রাশনের দাম—দুধওয়ালা—কয়লাওয়ালার টাকা দিয়ে যা বেঁচেছে—বড় জোর নয় সেই টাকাটাই গচ্চা গেছে—তাতে এমন কোন আপসোস নেই। বরং দুঃস্বপ্ন আমাদের চেয়ে যারা এই দুঃস্বপ্নের জাল বুনছেন—তাদেরই জড়িয়ে নেবার কথা বেশী, তাঁদেরইত মনে চেপে বসবার কথা। কিন্তু তা কা এখনও বসে নি! অন্ততঃ প্রেক্ষাগৃহের দেওয়ালগুলির দ্রুত পট পরিবর্তন দেখে তাইত মনে হয়। তাই এখনও বলি—সাবধান!

১৯৪৮ সাল বিদায় নিল। শ্যামলের স্বপ্নের মত এমনি দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়েই! তবু আমরা ভেঙ্গে পড়িনি। দু' একটা সুখ স্বপ্ন যে না দেখেছি তা নয়—তারই আমেজে মনটাকে কোন রকমে চাঙড়া দিয়ে রাখতে পেরেছি। তাই কৃতজ্ঞতায় অভিনন্দন জানিয়েছি 'ভুলি নাই'কে—অতীতের স্মৃতি বিজড়িত হাসি-কান্নার কথা নতুন করে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে বলে—অভিনন্দন জানিয়েছি 'অঞ্জনগড়'কে—তারও বক্তব্য এমনি কোন প্রয়োজনীয় কথা শুনতে পেয়েছি বলে। অভিনন্দন জানাই বসুমিত্র প্রযোজিত সাহিত্যিক-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কালোছায়া'কে। বাংলার রহস্য চিত্রের ইতিহাসে নতুন পথ দেখাতে পেরেছে বলেই শুধু নয়—বাঙ্গালী কিশোর-কিশোরীদের কাছেও আন্তরিক আবেদন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে। অভিনন্দন জানাই অগ্রদূত পরিচালিত 'সমাপিকা'কে—নতুন কোন আবেদন না থাকলেও, বছরের শেষ দিনটিতে সুখ-স্বপ্নের মত আমাদের তৃপ্তি দিতে পেরেছে বলে।

১৯৪৮-এর দুর্যোগ ভরা দিন রাত্রিগুলি ডিঙ্গিয়ে আসতে যারা বিদ্যুৎশিখার মত ক্ষণিকের আলোতেও আমাদের মনকে আলোকিত করে তুলতে পেরেছেন—সমগ্রভাবে তাঁদের আর একবার স্মরণ করবার পূর্বে প্রতিবাদ জানিয়ে যেতে চাই, বাংলা ও বাঙ্গালার গৌরব মনে প্রাণে পূর্ণমাত্রায় যিনি বাঙ্গালী—বাংলার সেই বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকারের কাছে—'চিত্রা'র মত বাঙ্গালীর প্রিয় প্রেক্ষাগৃহে 'খিড়কী'র মত অশ্লীল—সস্তা ও জঘন্য হিন্দি চিত্র প্রদর্শনের অনুমতি দিয়ে সমস্ত বাঙ্গালী দর্শক সমাজের আত্ম-সম্মানে তিনি আঘাত দিয়েছেন বলে। —শ্রী...

'রাই' চিত্রে অভিনয়েচ্ছুক—যাঁদের সংগে সাক্ষাৎ করা হ'য়েছে—ব্যক্তিগতভাবে পত্র মারফৎই নির্বাচন-বিষয়ে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ৩১শে জানুয়ারীর ভিতর যাঁরা কোন পত্র পাবেন না, তাঁরা নির্বাচিতের দলে পড়েন নি বলেই মনে করবেন। অবশ্য এই নির্বাচন 'রাই' চিত্রের জন্য করা হয় নি। 'রাই'র চিত্র গ্রহণের বিলম্ব হচ্ছে বলেই আমি অন্যত্র এঁদের সুযোগ দানের ব্যবস্থা কচ্ছি। মফঃস্বলের অভিনয়েচ্ছুকদের এই জন্যই আমি সাক্ষাৎ গ্রহণ করিনি। কারণ অর্থ-খরচ করে অনিশ্চিত ঝুঁকি গ্রহণে কখনই আমি তাঁদের পরামর্শ দিতে পারি না।

বিনীত—কালীশ মুখোপাধ্যায়
রূপ-মঞ্চ সম্পাদক

প্রথিতযশা প্রয়োগশিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়া সকাশে শ্রীপার্থিব

★ ● ★

বিদেশ ভ্রমণের পর রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধির সংগে সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকার

২১শে নভেম্বর। বন্ধুবর অমল দত্ত এসে ঘুম ভাঙালেন। অনিচ্ছা সত্বেও বিছানার মায়া কাটিয়ে উঠতে হ'লো। বিছানার চাদরটা গায়ে জড়িয়ে তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে তাকে বল্লাম: তুমি যে যমদূতের মত কাটায় কাটায় এসে হাজির!" পাশের কেদারায় বন্ধুবর বসেছিলেন। উত্তর করলেন: বাঃ, ছ'টায় তোমার এখানে আসবার কথা ছিল। বরং আমারই কয়েক মিনিট দেরী হ'য়ে গেছে।"

যে কোন কাজে অমলের নিষ্ঠা অপরিসীম। মজলিসিতে নিজেকে যতই হালকা করে দিক – কাজের সময় ও কোন ওজর আপত্তি শুনতে রাজী নয়। অমল তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গতঃ অজয় ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। একদিন সেই মহাপ্রাণটিকে কেন্দ্র করে আমরা কয়েকজন শিক্ষিত উৎসাহী যুবক চিত্র ও নাট্য-জগতের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নানা পরিকল্পনা নিয়ে উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছিলাম।

নিজের সম্পর্কে নিজে বলতে যেয়ে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া শ্রীপার্থিবকে বলেন: আমি অতীত, বর্তমানের মধ্য দিয়ে আশাদীপ্ত ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে আছি।" লণ্ডনেও অনুরূপ অনুরুদ্ধ হ'য়ে তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন: I am a past, looking through present for a future."

চিত্রজগতের অংগনতল আমাদের দীপ্ত পদক্ষেপকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে গ্রহণ করেছিল। স্বর্গতঃ ভট্টাচার্যের অকাল মৃত্যু শুধু আমাদেরই পাঁজর ভেংগে দিয়ে যায়নি—চিত্রজগত সম্পর্কিত আমাদের বহু পরিকল্পনাকেই টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে। স্বর্গতঃ ভট্টাচার্যকে নিয়ে অতীতের হাস্য-মুখরিত দিনগুলির কথা আজও ভুলতে পারিনি—সেই পরিবেশ একদিন আরো যাঁদের উপস্থিতিতে ঝলমলিয়ে উঠতো, আজ তাঁদের দেখেও অনুভূতির নাড়াটা টনটনিয়ে ওঠে। অমল এঁদের থেকে পৃথক নয়। অমলের উপস্থিতি তাই বহুদিনের স্মৃতিবিজড়িত এক অধ্যায়ের মাঝে আমাকে নিয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে অতীতের সেই দিনগুলির কথাই ভাবছিলাম। অমল এক ঝাকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: কী থ-মেরে রইলে যে! ওঠ!" —'হ্যা' উঠি বলে আমি উঠেই পড়লাম। দৈনিক কাগজটা অমলের সামনে এগিয়ে দিয়ে

বল্লাম: তুমি ততক্ষণ এটা দেখ, আমি এলাম বলে।"

আধঘণ্টার ভিতরই হাতমুখ ধুয়ে আমি তৈরী হ'য়ে এলাম। একটা ট্যাক্সী ডাকিয়ে অমলকে বল্লাম: চলো, চায়ের পর্ব ত মণিদীপার বাড়ীতেই হবে।"

মণিদীপারও আমাদের সংগে যাবার কথা। কারণ, এক ঢিলে দু'পাখী মারবার ব্যবস্থা সম্পাদক করে রেখেছিলেন। মণিদীপার বাড়ীতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হাজির হলাম। বসতে বসতে চা ও আনুসংগিক এলো। সকালের পকেট খরচটা বেঁচে গেল মনে করে মনটা খুশীতেই ভরে উঠলো। আমরা ট্যাক্সীতে যেয়ে বসবার কিছুক্ষণের ভিতরই মণিদীপা তৈরী হ'য়ে এলেন। তাঁর দু'বছরের শিশুকন্যাটি—'মা যাই যাই" বলে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালো। আটটা তখনও বাজেনি। উত্তর কলকাতা থেকে দক্ষিণাভিমুখে আমাদের ট্যাক্সীটা ছুটে চললো। ট্যাক্সীর ভিতর আমরা আমাদের কর্মসূচী নিয়ে একটু আলোচনায় মেতে গেলাম।

অমলের নির্দেশে মুরেল ষ্ট্রীটের ১২।সি সংখ্যা চিহ্নিত বাড়ীটার কাছে এসে আমাদের ট্যাক্সীটা দাঁড়িয়ে পড়লো। অমলকে অনুসরণ করে সদর দরজা দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম। প্রশস্ত প্রাংগনের এক ধার দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। বাড়ীটাকে দূর থেকে একটা বাংলোর মত দেখাচ্ছিল। তার নিচেকার বারান্দায় বেশ যেন একটা মজলিস জমে উঠেছে বলেই মনে হ'লো। ছোটখাটো একটি মানুষ আরাম কেদারার সংগে মিশে রয়েছেন—আর তাঁকে ঘিরেই যে তাঁর গুণগ্রাহীর দল নানান আলোচনায় মত্ত হ'য়ে উঠেছেন, একথাও আমাদের মনে হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কাছা-কাছি যেতে তখনও কয়েক পা বাকী—ঐ ছোটখাটো মানুষটি এগিয়ে এসে সহাস্যে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। পরণে ছিল তাঁর খাকি ফুল প্যান্ট—গায়ে সাধারণ সিটের সার্ট—তার সবকয়টি বোতামও লাগানো ছিলনা—হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। পোষাক পরিচ্ছদে যেমনি আগোছাল ভাব, তেমনি এলোমেলো ছাপ তাঁর সর্ব দেহে। মাথার চুলগুলি থেকে দেহের প্রতিটি বহিরাংগের ওপর দেহধারীর অবজ্ঞার ভাব অতি সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু এই সবকিছুকে ছাপিয়ে মানুষটির স্বাতন্ত্র যে কোন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনা। তাঁর প্রতিভার দীপ্তির কাছে অতি সহজেই মাথা শ্রদ্ধাবনত হ'য়ে পড়বে। তাঁর ব্যক্তিত্ব তাঁর সর্বাংগ উপচে পড়ে। ছোটখাটো মানুষটি হ'লে কী হয়—তাঁর ভাংগা ভাংগা কথা বলার ভংগীমা—মুচকী মুচকী হাসি—নিরাড়ম্বর সাজ পোষাক সবকিছুর ভিতরই মানুষটির অসাধারণত্ব যেন প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরা তাঁর মুখোমুখী দাঁড়ালাম। মুখোমুখী দাঁড়ালাম ভারতের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন প্রয়োগশিল্পী শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার। তিনি স্বাগতঃ সম্ভাষণে আমাদের গ্রহণ করলেন।

বন্ধুবর অমল দত্ত বড়ুয়ার সংগে মণিদীপার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকাতেই শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বাধা দিয়ে বল্লেন: ওকে আর পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। রূপ মঞ্চের প্রথম যুগেই ওর সফরে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল।" বহুদিনের কথা কিন্তু বড়ুয়া আজও তাকে ভুলতে পারেননি—এতে বড়ুয়ার চরিত্রের আর একটা দিক আমার কাছে প্রকটিত হ'য়ে উঠলো। মজলিস স্থানে এসে আমরা উপস্থিত হলাম। সেখানকার প্রতিটি আসন প্রতিজনেরই দখলিভুক্ত ছিল। আমরা যেতে প্রত্যেকেই যাঁর যাঁর আসন আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন সকলের চেয়ে বেশী। তাঁর নিজের কেদারাটা মণিদীপার দিকে এগিয়ে —তাড়াতাড়ি ভিতর থেকে নিজেই দু'তিনটি আসন নিয়ে এলেন। আসন আনবার মত অন্য লোক একটু দূরে উপস্থিত থাকলেও—তাঁদের ডাকাডাকি করে সময় নষ্ট না করে—বড়ুয়া নিজেই আসন আনতে ছুটে গেলেন। এতে আমরা বিব্রত হ'য়ে পড়লেও, বড়ুয়া একে নিজের কর্তব্য বলেই মনে করেছিলেন। অনেকের চোখে সামান্য হ'লেও, এই ঘটনাটি আমার কাছে বড়ুয়ার সৌজন্যবোধ, নিরভিমান ও আন্তরিকতার এক মহৎ নিদর্শন রূপে মনের মাঝে এঁকে থাকবে। আমরা প্রত্যেকে আসন গ্রহণ করবার পর বড়ুয়া আসন গ্রহণ করলেন।
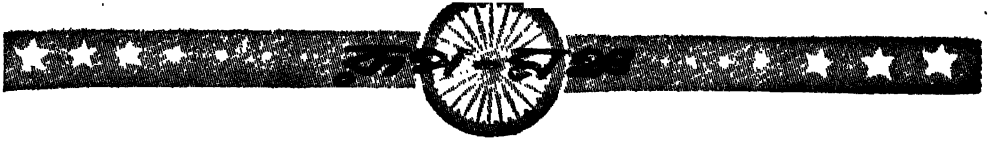
প্রথমেই আমি বড়ুয়ার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নিলাম। যদিও তাঁকে দেখে বেশ প্রফুল্ল এবং সতেজই মনে হচ্ছিল, তবু তাঁর নিজের মুখ থেকে তাঁর শারীরিক সুস্থতার সংবাদ না জানা অবধি নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছিলাম না। কারণ, তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্থানীয় চিকিৎসকেরা যে মন্তব্য করেছিলেন—তাতে তাঁর গুণগ্রাহীদের পক্ষে উদ্‌বেগে যথেষ্ট কারণ ছিল এবং ঐ মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই মনতঃ শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এবার বিদেশ যাত্রা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া উত্তর দিলেন: "ভালই আছি। ভয়ের কোন কারণ নেই।" একটু থেমে মুচকী হেসে আবার বল্লেন: "ভয়ের কারণ ছিলও না।" তারপর আনুপূর্বিক যখন তাঁর চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা ব্যক্ত করলেন—আমরা তা শুনে শুধু তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্তই হলাম না—বেশ কৌতুকও উপভোগ করলাম।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। ১০ই অক্টোবর, ১৯০৩ খৃঃ-এ তাঁর জন্ম হয়। সুস্থ দেহ ও সতেজ মন নিয়ে তিনি বাংলা চিত্র জগতের আশাদীপ্ত ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে আছেন। শ্রীপার্থিবের সংগে আলোচনা প্রসংগে তিনি যেসব পরিকল্পনার কথা বলেছেন—আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি। স্বদেশ প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল রূপ-মঞ্চের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার এই চিত্রখানি গ্রহণ করেছেন।

রূপ-মঞ্চের কয়েককটি সংখ্যা শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে উপহার দেবার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম—সেগুলি তাঁর হাতে দিতেই তিনি আগ্রহের সংগে গ্রহণ করে বল্লেন: "বেশ কিছুদিন যোগাযোগ রাখতে পারিনি রূপ-মঞ্চের সংগে—এগুলি দিয়ে একটু ঝালিয়ে নিতে পারবো!" আমি বল্লাম: "আজ আপনাকে একটু জ্বালাতন করতে এসেছি। ঘণ্টা দুই আপনাকে চাই। আর মণিদীপার হেপাজাতে যমুনা দেবীকেও থাকতে হবে কিছুক্ষণ।" শ্রীযুক্ত বড়ুয়া উত্তর দিলেন: "দু'ঘণ্টা কেন? আপনি যদি বিরক্তবোধ না করেন, যতক্ষণ খুশী খুশীমনেই আপনার কাছে বন্দী থাকবো!" বলেই বড়ুয়া দাঁড়িয়ে পড়লেন: "মাপ করবেন, কয়েক মিনিট সময় নিচ্ছি। যমুনা দেবীর খোঁজটা নিয়ে আসি।" কয়েক মিনিটের মধ্যেই তিনি ভিতর থেকে ঘুরে এসে বল্লেন: "যমুনা দেবী ঘর-কন্নায় ব্যস্ত আছেন। এক্ষুনি আসছেন।" আমরা এলোমেলো ভাবে কিছুক্ষণ নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতেই যমুনা দেবী এসে হাজির হলেন। তিনি যে ঘর-কন্নায়ই ব্যস্ত ছিলেন, তাঁর পোষাক পরিচ্ছদই তা সাক্ষ্য দিচ্ছিল। পরিচয় পর্ব শেষ হ'লে মণিদীপাকে লক্ষ্য করে তিনি বল্লেন: "আপনি দয়া করে ভিতরে আসুন। ওদের কচকচানির মাঝে বেশীক্ষণ থাকতে পারবেন না। আমরা বরং নিরিবিলিতে যেয়ে বসি।" আমরাও দ্বিধাহীন চিত্তে যমুনা দেবীর প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। কারণ, ওদের উপস্থিতির জন্য মাঝে মাঝে হয়ত আমাদের বাক-স্পৃহার রাস টেনে ধরতে হ'তো। যমুনা দেবীকে অনুসরণ করে মণিদীপা ভিতরে যেয়ে বসলেন। আমি আমার নামচার খাতাটি খুলে তৈরী হ'য়ে
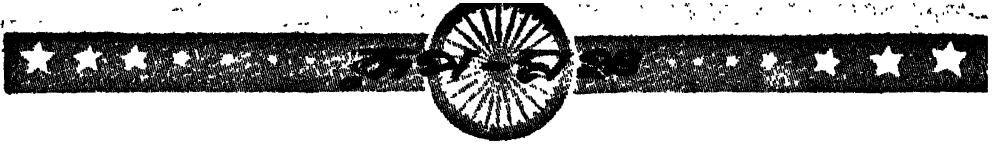
নিলাম। বন্ধুবর অমলকে বল্লাম আমার পাশ ঘেঁসে বসতে।

১৯৪৮। এপ্রিলের শেষাশেষি হবে। কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে পরীক্ষা করে টি, বি,-র পূর্বাভাস বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সুচিকিৎসার জন্য অনতিবিলম্বে তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার পরামর্শ দেন। এই সংবাদ অল্প সময়ের মধ্যেই চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। শুধু বড়ুয়ার আত্মীয়-স্বজনেরই নয়—চিত্র জগতের সকলের মনে এক গভীর ছায়াপাত করে। বড়ুয়ার বাড়ীতে শংকিত মন নিয়ে লোকজনের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। সকলের মনেই একই জিজ্ঞাস্য—কথাটা তা'লে কী সত্যি? কেমন আছেন আমাদের সাহেব?" বাড়ীর টেলিফোনটি অনবরত বাজতে থাকে: হ্যালো! পি. কে, ৬৭৭৮ বড়ুয়া সাহেব কেমন আছেন—সুইজারল্যাণ্ডে কবে যাচ্ছেন?" সকলের মনে একই শংকা—মুখে একই কথা।

১৫ই মে, ১৯৪৮। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া লণ্ডন যাত্রা করলেন। সংবাদপত্র মারফৎ বড়ুয়ার বিদেশ যাত্রা ও অসুখের সংবাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে বাংলার চিত্রপ্রিয় জনসাধারণ তথা বড়ুয়ার গুণগ্রাহীদের মাঝে অদ্ভুত আলোড়ন দেখা দেয়—তার পরিচয় যাঁরা পেয়েছেন, চিত্রপ্রিয় জনসাধারণের অন্তরে বড়ুয়া যে আসনে অধিষ্ঠিত আছেন, কেবলমাত্র তাঁরাই তাঁর মর্যাদাকে পরিমাপ করতে পারবেন। অন্যান্য পত্র পত্রিকার কথা বলতে পারি না। রূপ-মঞ্চ পত্রিকার চিঠি-পত্র বিভাগে বাংলা ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠি পত্র আসতে লাগলো—প্রত্যেকের চিঠিতেই বড়ুয়ার অসুস্থতার জন্য উদ্বেগ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল—প্রত্যেকের শংকিত মন অধৈর্য হ'য়ে জানতে চেয়েছে—বড়ুয়া কেমন আছেন—কবে ফিরবেন! বড়ুয়া আরোগ্য লাভ করেছেন কিনা। ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকে এসে বড়ুয়ার স্বাস্থ্যসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেতে থাকেন। বড়ুয়ার জন্য তাঁদের আন্তরিক প্রার্থনা ব্যক্ত হতে লাগলো: আমাদের বড়ুয়া আবার সুস্থ হয়ে ফিরে আসুন আমাদের মাঝে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তিনি ফিরে আসবেন। তাঁর বিদেশ যাত্রা সফল হউক।'

এবারটি ছিল বড়ুয়ার সপ্তম বার বিদেশ যাত্রা। তাঁর এবারকার যাত্রা যে অন্যান্যবারের চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সেকথা বলাই বাহুল্য: বড়ুয়ার আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও অগণিত গুণগ্রাহীদের মনে যে শংকা—যে উদ্বেগ জেগে উঠেছিল বড়ুয়ার নিজের মনেও তার কম ছিল না। শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা লাভের জন্যই তিনি ইতিপূর্বে বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর সন্ধানী মন ওদেশের শিল্পজগত খুঁজে বেড়িয়েছে নানান সম্পদ আহরণে—তাঁর সৃজনী প্রতিভাকে করেছে রসসমৃদ্ধ। কিন্তু, এবারের মনের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। আশংকা এবং ভিতির কালো ছায়া সেখানে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। লণ্ডন সহরে পদার্পণ করেই কয়েক জন বিশেষজ্ঞদের দ্বারা নিজেকে পরীক্ষা করালেন। তাঁদেরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। তাঁরা দৃঢ়তার সংগেই বল্লেন: আপনার দেশের চিকিৎসকগণ অযথা আপনাকে এতটা আতংকের মাঝে ফেলেছেন। টাকা পয়সা খরচ করে যখন এতদূর এসেছেন, মনের আনন্দে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়ে যান।"

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ারও বিস্ময়ের অবধি থাকে না: বলে কী এঁরা? চিকিৎসকেরা বড়ুয়ার মনোভাব বুঝতে পারেন। তাঁরা উত্তর দেন: হ্যাঁ—যা বলছি—সত্যই বলছি। টি, বি-টি-বি আপনার হয়নি। সুইজারল্যাণ্ডেও যাবার প্রয়োজন নাই। তবে যখন এতটা পথ এসেছেন—একবার ঘুরে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে যান।" বড়ুয়ার মন অনেকটা হালকা। তবু তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গেলেন—সেখানকার চিকিৎসকেরা লণ্ডনের চিকিৎসকদের থেকে ভিন্ন মত দিতে পারলেন না। যাক! এবার বড়ুয়া সত্যি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ক্যাবল পাঠানো হ'লো আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের কাছে। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। বড়ুয়ার গুণগ্রাহীদের মন থেকেও একটা দুশ্চিন্তার বোঝা নেমে গেল।

বড়ুয়ার বিলেত যাত্রার কথা এখানকার মত লণ্ডনের ভারতীয়দের মাঝেও প্রচারিত হয়ে পড়েছিল। তাঁরাও বড়ুয়ার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সমানভাবেই উৎকণ্ঠিত হ'য়ে নিজে-

ছিলেন—তাঁদের দুশ্চিন্তারও অবসান হ'লো। কিন্তু তাঁরা বড়ুয়ার সংগে সাক্ষাৎ করবার জন্য ব্যাগ্র হ'য়ে উঠলেন। এই ব্যাগ্রতা শুধু তাঁদের মাঝেই সীমাবদ্ধ রইলো না—উচ্চ পদস্থ কর্মচারী—ছাত্র ও শিক্ষাবিদ, রাজনীতিজ্ঞ ও বৃটিশ চলচ্চিত্রশিল্পের বিশেষজ্ঞগণও আগ্রহ প্রকাশ করলেন নানান ভাবে। লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন—এঁদের সকলের আগ্রহকে উপলব্ধি করতে পারেন। এঁদের সকলের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য, তাছাড়া সরকারী ভাবে শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে অভ্যর্থনা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সম্মানে এক বিরাট সভার আয়োজন করলেন। সভায় আমন্ত্রিত হ'লেন ওদেশের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞগণ—চিত্র ও নাট্যামোদী এবং সংগীত প্রিয় জনসাধারণ। আমন্ত্রিত হ'লেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও ছাত্র সম্প্রদায়। ইণ্ডিয়া হাউসটি মাননীয় অতিথিদের উপস্থিতিতে এক অভিনব রূপ লাভ করল। এই পরিবেশের মাঝে শ্রীযুক্ত ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন ইণ্ডিয়া হাউসে এমন একজন ভারতীয়কে সুধীবৃন্দের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে উপস্থিত হ'লেন—যাঁর প্রতিভা শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নয়—সে প্রতিভার সংস্পর্শে এসে ওদেশেরও অনেকে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি। তাই আজ তাঁকে দেখবার জন্য ওদেশের সুধীবৃন্দের সমাগমেও যে ইণ্ডিয়া হাউসটি অভিনব রূপলাভ করবে, তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে! শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মেনন বড়ুয়াকে সংগে নিয়ে সকলের সামনে উপস্থিত হতেই মুহুর্মুহু করতালি ধ্বনিতে ইণ্ডিয়া হাউসটি মুখরিত হয়ে উঠলো। এই মুখরতার মাঝে শ্রীযুক্ত মেননকে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়েই থাকতে হয়। তারপর সুধীসমাজকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন: আজ আপনাদের সামনে এমন একজনকে উপস্থিত করেছি, যাঁর মাঝে আমাদের কৃষ্টি ও সভ্যতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় শিল্পকলা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি আজ আপনাদের কিছু বলবেন—তাঁর এই বলাতে ভারতীয় চিন্তাধারাই যে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে, একথা আমি দৃঢ়তার সংগে বলতে পারি। মুহুর্মুহু করতালির মধ্য দিয়ে শ্রীযুক্ত মেনন তাঁর ভাষণ শেষ করেন—শ্রীযুক্ত বড়ুয়া জোর-করে এগিয়ে আসেন। শ্রীযুক্ত মেনন এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ভারতীয় কৃষ্টি ও কলার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তিনি বলতে সুরু করেন। তাঁর বলবার ভংগীমা, বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাবধারা সকলের মন ভরিয়ে তোলে। ওদেশের বহু সংবাদপত্রে বড়ুয়ার বক্তৃতাংশ বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়। বম্বের 'টাইমস'ও ফলাও করে তা মুদ্রণ করে।

ইণ্ডিয়া হাউস ব্যতীত আরও বহু স্থানে শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে বক্তৃতা দিতে হয়। সবক্ষেত্রেই তিনি ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতাকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ভারতীয়দের পক্ষ থেকে প্রতীচ্যের যা কিছু ভাল, তা গ্রহণ করবার আন্তরিকতা যেমনি তাঁর বক্তব্যে ফুটে উঠেছে—তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করবার জন্য প্রতীচ্যের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় সর্বত্রই একথা জোর দিয়ে বলেছেন: এমনি আদান প্রদানের মাঝে উভয়েরই মঙ্গল নিহিত রয়েছে। যে বিরাট ভৌগোলিক সীমারেখা পরস্পরের মাঝে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে—একমাত্র এমনি আদান প্রদানের দ্বারাই তাকে মুছে ফেলতে পারা যাবে।"

ইণ্ডিয়া হাউসের অভ্যর্থনা সভায় বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের যেসব বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন, তার ভিতর বৃটিশ চলচ্চিত্রশিল্পের আর্থার মার্শাল, জেমস রজার্স ও সুপ্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক কেবলকান্তির (Cavalkanti) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কেবলকান্তির সংগে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার প্রথম পরিচয়েই হৃদ্যতা জমে উঠে। মিঃ আর্থার র‍্যাঙ্ক বড়ুয়ার সংগে অল্পক্ষণ আলাপ করেই তাঁর প্রতিভার আভাস পেয়ে মুগ্ধ না হ'য়ে পারেন না। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিজস্ব কতকগুলি পরিকল্পনা ছিল - আর্থার র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেশন সেগুলি শুনে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন—। কারণ, ওগুলির সংগে তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনারও যে হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে! কেবলমাত্র ইংলণ্ডে সে পরিকল্পনাকে রূপায়িত করে তাঁরা ক্ষান্ত হতে চাননি। সমগ্র বিশ্বের চলচ্চিত্র জগত যাতে সে পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে, সে জন্যও সচেষ্ট ছিলেন। বিশেষ
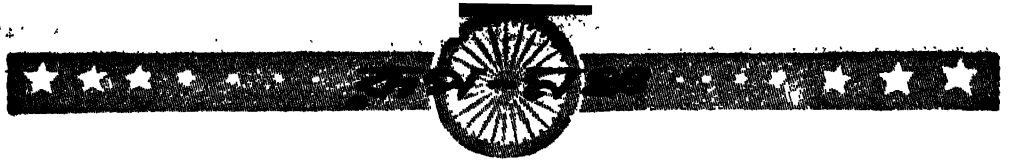
লণ্ডনে ইণ্ডিয়া হাউসে অলিম্পিয়া হকি টিমের অভ্যর্থনা সভায় শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ও যমুনা দেবীকে দেখা যাচ্ছে।

করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহ রয়েছে প্রচুর। তাঁরা নিজের দেশে ১৬ মিলিমিটারের শিক্ষা-মূলক চিত্র প্রচলনের এক পরিকল্পনা সম্প্রতি গ্রহণ করে-ছেন—তাঁদের ইচ্ছা ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতেও এর প্রচলন যাতে হয়। বড়ুয়ার কাছে নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। শুধু ব্যক্ত করেই নয়, বড়ুয়াকে অনুরোধ করে তাঁরা বল্লেন: ভারতবর্ষে এই কঠিন দায়িত্ব আমরা আপনার সহ-যোগিতাতেই কার্যকরী করে তুলতে চাই। এই শিক্ষামূলক চিত্রগুলি গড়ে উঠবে—ভূগোল—বিজ্ঞান—কলা—ইতিহাস—প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক মারফৎ ছাত্রেরা যে শিক্ষালাভ করে—তার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই ষোলমিলিমিটারের চিত্রগুলি। আর্থার র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেশনের পরিকল্পনাকে ভারতবর্ষে মূর্ত করে তুলতে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া কয়েকটী সর্তাধীনে স্বীকৃত হন। (১) এজন্য ভারতবর্ষেই পৃথক একটি যৌথ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। (২) এই প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৫১ ভাগ থাকবে ভারতীয় মূলধন। বাকী ৪৯ ভাগ অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেসন অথবা অন্য যে কোন বৈদে-শিকের থাকতে পারে। (৩) উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রযোজনায় ভারতবর্ষে যেসব চিত্র নির্মিত হ'বে ইংলণ্ডেও তা প্রদর্শনের সুব্যবস্থা করতে হ'বে। (৪) ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি নামে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত ভি, কে, মেনন-এর সহযোগিতায় লণ্ডনে যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠছে, তাকে স্বীকার করে নিতে হবে।

বস্তুতঃ র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেশন বড়ুয়ার প্রত্যেকটি সর্তই স্বীকার করে নিলেন। এখন এই ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটির উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। এবং এই আলোচনা করতে হ'লে একটু পেছন থেকেই আমাদের সুরু করতে হ'বে। দেশীয় চিত্রের অবনতির মূলে যে বিষয়গুলি বড়ুয়ার কাছে সবচেয়ে পীড়াদায়ক বলে মনে হয়, তা
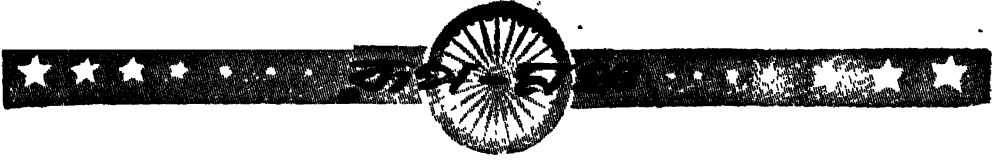
হচ্ছে চিত্র জগতে অযোগ্যদের আধিপত্য। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এই শিল্পটির সংগে দীর্ঘদিন জড়িত থেকে তার উন্নতির পরিপন্থি বলে যে বিষয়গুলিকে অনুধাবন করেছেন, চিত্রজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুপযুক্তের আস্ফালন তার ভিতর সবচেয়ে প্রধান। প্রযোজনা ও পরিচালনা থেকে সুরু করে যন্ত্র বিভাগেও এদের সংখ্যা গিজ গিজ কচ্ছে। এই অনুপযুক্তদের দ্বারা কোন সুন্দরের সৃষ্টি হতে পাবে না। অথচ দোষ সম্পূর্ণ তাঁদেরও নয়। তাঁরা কোন বিষয়েই উপযুক্ত শিক্ষালাভের কোন সুযোগ পান নি। দেশীয় চিত্র শিল্পের যদি সত্যিকার উন্নতি করতে হয়—তবে এর শিল্পজ্ঞগণকে উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ করে দিতে হবে। এবং যতদিন এই দেশেই উপযুক্ত কোন শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে (উপযুক্ত লোক প্রচুর পরিমাণে শিক্ষিত না হওয়া অবধি একপ কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারাও কোন উপকাব হবে না) ততদিন এদেশের ভবিষ্যৎ চলচ্চিত্র শিল্পজ্ঞগণ যাতে বিদেশ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে এদেশে আসতে পারেন—সেজন্য লণ্ডনে একটা যোগাযোগরক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বহুদিন শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার ছিল। ভারত আজ স্বাধীন হয়েছে। ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং এই সব পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন আগ্রহশীল যুবকদেব বিদেশ থেকে শিক্ষা পাবার সুযোগ সুবিধার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি দিচ্ছেন। চলচ্চিত্র শিল্পের সম্ভাবনাকে ভারত সরকার কিছুতেই অস্বীকার করতে পাবেন না। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এই উপযুক্ত সময়ে মনে করে লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত ভি, কে, কৃষ্ণ মেননের কাছে তাঁর ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটির পরিকল্পনা পেশ করলেন। (১) ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বাংগীন উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। এরই সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে ভারতেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সময়মত গড়ে তুলতে হবে। (২) লণ্ডনস্থ সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য হবে, যে সব শিক্ষার্থী চলচ্চিত্রের বিভিন্ন

লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রীযুক্ত ভি, কে, কৃষ্ণ মেননের উদ্যোগে ইণ্ডিয়া হাউসে বড়ুয়ার অভ্যর্থনা সভায় সকলের মাঝে বড়ুয়া, যমুনা দেবী ও কৃষ্ণ মেননকে দেখা যাচ্ছে।
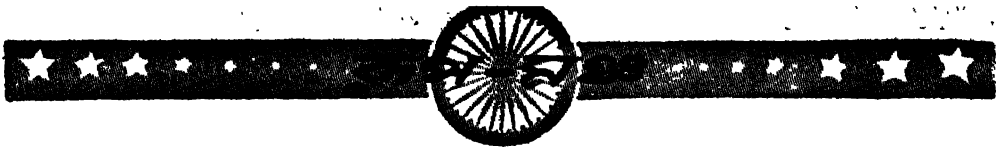
বিভাগে উপযুক্ত শিক্ষালাভের জন্য লণ্ডন যাবেন—তাঁদের উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, সে বিষয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করা। অনেক সময় ওদেশের ষ্টুডিওমালিকদের অনুদারতার জন্য ষ্টুডিওর সংগে সংশ্লিষ্ট থেকে এঁরা কার্যকরী শিক্ষালাভের সুযোগ পান না—ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি এই সব অসুবিধাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। (৩) তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতে মেধাবী ও অগ্রশীল ভারতীয় ছাত্রদের বৃত্তি দিয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠান করবে। (৪) ভারতীয় চিত্র যাতে লণ্ডনের বাজারে প্রদর্শিত হ'তে পারে—অর্থাৎ বিলেতি ছবি ভারতীয় বাজারে প্রদর্শিত হ'য়ে যেমনি অর্থোপার্জন করে, ভারতীয় চিত্রও যাতে লণ্ডনের বাজারে অনুরূপ অর্থোপার্জন করতে পারে, সে পরিকল্পনাও এই প্রতিষ্ঠানের থাকবে। (৫) এই প্রতিষ্ঠানের আর একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হবে—ভারতের মূল বক্তব্যকে চলচ্চিত্র মারফৎ ওদেশে প্রচার করা। অনুরূপ ভাবে ওদেশের বক্তব্যকে চিত্র মারফৎ ভারতে প্রচার করার দায়িত্বও ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি গ্রহণ করবে। (৬) তাছাড়া যখনই ভারতীয় শিল্প জগতের কোন লোক ওদেশে যাবেন—ওদেশের শিল্প জগতের সংগে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠানের থাকবে। আবার ওদেশ থেকে যখন কোন বিশেষজ্ঞ এদেশে আসবেন—এদেশে এসে তিনি যাতে চিত্রজগতের সংস্পর্শে আসতে পারেন এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে এসে তিনি যাতে কোন অসুবিধায় না পড়েন, সেদিকেও ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি দৃষ্টি রাখবেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার মত এই ফিল্ম সোসাইটির প্রয়োজনীয়তা শ্রীযুক্ত ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন অতি সহজেই হৃদয়ংগম করতে পারেন। তিনি শুধু মৌখিক অনুমোদন দ্বারাই ক্ষান্ত হন না—একে কার্যকরী করে তুলতে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করতেও আগ্রহ জানান।—তিনি কিছুদিনের জন্য যখন একবার ভারতে আসেন এ নিয়ে রাজকুমারী অমৃত কাউর, শ্রীযুক্ত বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত প্রভৃতির সংগে এ নিয়ে আলোচনা করেন এবং এঁরা সবাই আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীযুক্ত মেনন এবং বড়ুয়ার উদ্যোগে ইতিমধ্যেই সাময়িক ভাবে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটিকে পরিচালনা করবার জন্য একটা ট্রাস্টি-বোর্ড গড়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত ভি, কে, কৃষ্ণ মেনন উদ্যোক্তা এবং প্রমথেশ বড়ুয়া সংগঠক ও আহ্বায়ক নির্বাচিত হ'য়েছেন। তাছাড়া এই বোর্ডের সভ্যদের ভিতর আছেন মিঃ শেটিয়া, মিঃ রামচাঁদ, ডাঃ ভাণ্ডারী, ডাঃ পি, এন, বসু, ডাঃ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকেই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্ভবতঃ এই ট্রাস্টি-বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে থাকবেন।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার লণ্ডন-যাত্রা নানাদিক দিয়েই সার্থক মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। তাই, যে চিকিৎসক তাঁকে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন—বলতে গেলে তিনিই আমাদের ধন্যবাদের যোগ্য। কারণ, প্রথমতঃ স্বাস্থ্য সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া নিশ্চিত হতে পেরেছেন। তাই, বর্তমানে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি চিত্র পরিচালনায় মনোনিবেশ করতে পারবেন। তাঁর সৃজনী-প্রতিভা বাংলা চিত্র জগতকে বর্তমান অধোগতির হাত থেকে অন্ততঃ আংশিকভাবে রক্ষা করতে পারবে বলেই আশা রাখি। পরবর্তী সার্থকতার কথা বলতে গেলে—ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও আর্থার র‍্যাঙ্ক অরগানাইজেশনের সংগে তাঁর যোগাযোগ এবং ভারত সরকারের সহযোগিতায় শিক্ষামূলক চিত্র-নির্মাণের পরিকল্পনার কথাই উল্লেখ করতে হয়। ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি এবং আর্থার র‍্যাঙ্ক ও ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় অর্থ বিনিয়োগে শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা যদি কার্যকরী রূপ নেয়—ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রভূত উন্নতিই তাদ্বারা সাধিত হবে। তাই বলছিলাম, বড়ুয়ার লণ্ডন যাত্রা নানাদিক দিয়েই সার্থক হয়েছে।

পরিকল্পিত শিক্ষামূলক চিত্রগুলিকে প্রধানতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—(১) প্রাইমারী অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষামূলক চিত্র—(২) হায়ার অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষমূলক চিত্র। প্রথমোক্ত চিত্রগুলি নির্মিত হবে অল্প শিক্ষিত দর্শক বা ছাত্রদের কথা চিন্তা করে—দ্বিতীয় শ্রেণীর।

লণ্ডনে অনেকের মাঝে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ও যমুনা দেবী :: চিত্র গ্রহণ ডি নিলু

উদীয়মান অভিনেতা শিশির মিত্র বিভিন্ন চিত্রের রূপসজ্জায়

চিত্রগুলি মূলত নির্মিত হ'বে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়বস্তুগুলিকে কেন্দ্র করে। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার বর্তমান কর্মপদ্ধতির কথা জানতে যেয়ে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম সোসাইটি ও শিক্ষামূলক চিত্রের আলোচনায় বহু সময় আমাদের কেটে যায়। সে আলোচনার সবকিছু এখানে সন্নিবেশ করা সম্ভব নয়। অনেক কিছুই ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখলাম; এবং এগুলি কার্যকরী হয়ে উঠলে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া পুনরায় এনিয়ে আমার সংগে আলোচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন—।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ইতিপূর্বে অর্থাৎ যুদ্ধের পূর্বেও বহুবার বিলেত গিয়েছেন। তাই প্রাকযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের তুলনামূলক বিচার করা তাঁর পক্ষে খুবই সহজ হবে মনে করে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম: প্রাকযুদ্ধকালীন বৃটিশ চলচ্চিত্র থেকে যুদ্ধোত্তর বৃটিশ চলচ্চিত্রের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?"

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া উত্তর দিলেন: যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি। যুদ্ধপূর্ব বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প মার্কিণ চিত্রকে অনুসরণ করে চলতো। অথচ মার্কিণ ছাঁচে চিত্র নির্মাণ করতে যেয়ে কোন সময়ই কৃতকার্য হতে পারেনি; তাই মার্কিণ চিত্রের সংগে কোন সময়েই প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারেনি। বরং একুল-ওকুল দুকুলই হারিয়েছে। কোটা পদ্ধতি প্রভৃতি নানা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেও নিজেদের বাজারে মার্কিণ চিত্রের কাছে বার বার হার মানতে হয়েছে। বর্তমান যুদ্ধের সুরু থেকেই বৃটিশ শিল্পপতিদের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন হতে থাকে। মার্কিণ চিত্রের প্রভাব থেকে মুক্ত হ'য়ে তাঁরা নিজস্ব এক ধারা আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠেন। এবং এতে কৃতকার্যতাও লাভ করেন। এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের মূলে স্বনামধন্য বৃটিশ চলচ্চিত্র-প্রযোজক স্যার আর্থার র‍্যাঙ্কের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। সমগ্র বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশনের কর্তৃত্বাধীনে। এঁদেরই প্রচেষ্টায় ও অক্লান্ত নিষ্ঠায় বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প মার্কিণ প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজস্ব পথ খুঁজে পেয়েছে। যুদ্ধের প্রারম্ভে বৃটিশ চলচ্চিত্র জগতে যে নতুন ধারার আভাষ পাওয়া গিয়েছিল, যুদ্ধোত্তর সময়ে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজস্ব আবিষ্কৃত ধারায় বৃটিশ চলচ্চিত্র জগত যে ভাবে নিজেকে গড়ে তুলছে, তার বিরাট সম্ভাবনার কাছে—মার্কিণ চিত্র ভবিষ্যতে মোটেই এঁটে উঠতে পারবে না। মার্কিণী চিত্রের সস্তা আবেদন থেকে এই ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সস্তা আবেদনকে অগ্রাহ্য করে বর্তমান বৃটিশ চিত্র অতল সলিল সমাধির নীচে যে ধ্যান গম্ভীর শিল্প প্রতিমা রয়েছেন, সেই ধ্যানগম্ভীর রূপকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত।"

যুদ্ধোত্তর বৃটিশ চিত্র এবং মার্কিণ চিত্রের তুলনামূলক বিচার করতে যেয়ে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন: দেহের স্থূলতা এবং মনের সূক্ষ্মতার যে প্রভেদ, মার্কিণ এবং বৃটিশ চিত্রের বর্তমান ধারাকেও এমনি ভাবে তুলনা করা যেতে পারে।" বৃটিশ চলচ্চিত্র জগতে র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশনের প্রাধান্যের কারণ জিজ্ঞাসা করতে যেয়ে শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে আমি জিজ্ঞাসা করি: র‍্যাঙ্কের এই প্রাধান্য বিস্তারে তাঁদের আর্থিক সংগতিই সাহায্য করেছে, না অন্য কোন কারণ আছে?" শ্রীযুক্ত বড়ুয়া তার উত্তরে বলেন: আর্থিক সংগতি যে কোন শিল্প ও ব্যবসায়কে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই একমাত্র কথা নয়। র‍্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে তাঁদের তীব্র জাতীয়তাবোধ। শুধু ব্যক্তিগত জাতীয়তাবোধই নয়, সমগ্র বৃটিশ জনসমাজের জাতীয়তাবোধকে তাঁরা চলচ্চিত্র শিল্পের ভিতর দিয়ে রূপায়িত করে তুলেছেন—national spirit.—জাতীয় সত্তা বলতে আমরা যা বুঝি—তাকেই তাঁরা রূপ দিয়েছেন এবং তাঁদের কৃতকার্যতার মূলে এই 'natianal spirit'ই সবচেয়ে বড় কথা।"

ইংলণ্ডের চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করা হয়েছে কিনা একথা জিজ্ঞাসা করলে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন: জাতীয়করণ অর্থে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ জাতীয় সরকারের পরিচালনাধীন—সে অর্থে বৃটিশ চিত্রশিল্পকে জাতীয়করণ করা হয় নি। তবে র‍্যাঙ্ক অর্গানাইজেশন অথবা অন্যান্য শিল্পপতিদের পরিচালনাধীন থাকা সত্বেও বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প জাতীয় স্বার্থকে কোন দিনই ক্ষুন্ন করেনি—বরং জাতীয় স্বার্থের প্রতিই তাঁদের সর্বাগ্রে লক্ষ্য রয়েছে।" বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের সংগে বৃটিশ জনসাধারণের সম্পর্ক কতখানি—সেকথা বলতে

যেয়ে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন : বৃটিশ জনসাধারণ আজ দেশবিদেশের নতুন নতুন চিন্তাধারার সংগে পরিচিত হ'তে চান। বিশেষ করে ভারত সম্পর্কে তাঁদের রয়েছে অসীম আগ্রহ। বৃটিশ চলচ্চিত্রশিল্পও তাঁদের এই আগ্রহের প্রতি সর্বদাই দৃষ্টি রেখে চলেছে—দেশ বিদেশের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় বৃটিশ চলচ্চিত্র জগত তার জনসাধারণের সামনে তুলে ধরছে।"

আমাদের এখানকার মত কাঁচা ফিল্মের জন্য বৃটিশ চিত্র জগতকে অসুবিধা ভোগ করতে হয় কিনা তার উত্তরে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন : কাঁচা ফিল্মের অভাব আমাদের মতই ওদের রয়েছে। এজন্য ওদের অনেকটা মার্কিণ দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।"

ওখানকার বহু ষ্টুডিও শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এবার প্রদর্শন করে এসেছেন। এগুলির ভিতর ডেনহাম, পাইনউড, মারটনপার্ক, গম বিটিশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ওদেশীয় যে সব পরিচালকের সংগে বড়ুয়ার সাক্ষাৎ হয়েছে, তার ভিতর কেবলকান্তির নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য এবং শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার মতে কেবলকান্তিই বর্তমানে ওদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক। বৃটিশ ষ্টুডিওগুলির কথাপ্রসংগে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন : প্রত্যেক ষ্টুডিওতেই Workers' union রয়েছে। এই ইউনিয়ন-এর বিনা পরামর্শে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে কোন কর্মীকে দিয়েই কোন কাজ করানো যাবে না। এবং একজন কর্মীর মতের মূল্যও যথেষ্ট। অতিরিক্ত সময় করাতে চাইলে অতিরিক্ত মজুরী ত' দিতেই হবে, তবু কাজ করা না-করার জন্য কর্তৃপক্ষকে তাদেরই মর্জির কাছে ওপর নির্ভর করতে হবে। এতে অনেক সময় সামান্য কাজেও খুবই অসুবিধা ভোগ করতে হয়। কারণ, সামান্য একটু কাজ করলেই হয়ত একটি বড় দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ শেষ হ'য়ে যায়। সেক্ষেত্রে একজন কর্মীও যদি বেঁকে বসেন, তা আর শেষ করবার উপায় নেই। পরিচালক হয়ত ইউনিয়নের কাছ থেকে অনুমতি আনলেন কিন্তু কোন কর্মী কাজ করবেন না ব'লে যদি বেঁকে বসেন—তখন কাজ বন্ধই রাখতে হবে।"

বড়ুয়ার মতে শিল্পজগতে যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের প্রত্যেককেই শিল্পানুরাগী হ'তে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে শিল্পের স্বার্থই তাঁদের দেখতে হবে সর্বাগ্রে। ব্রিটেনে ভারতীয় চিত্রের ব্যবসায় দিকের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, একথা জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। ভারতীয় চিত্রের প্রতি ওদেশের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। আমিত' আমার ওদেশীয় কয়েকজন বন্ধুর আগ্রহে আমার 'মুক্তি' ও 'জবাব' ওদেশে প্রদর্শন করতে চেয়েছিলাম। অবশ্য, নানান অসুবিধার জন্য শেষ পর্যন্ত আর সে ব্যবস্থা করতে পারিনি।"

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া প্রায় ছয় মাস লণ্ডনে ছিলেন। এই সময়ে ওদেশের বহু চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞগণের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন—ওদেশীয় এবং ভারতীয় চিত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁদের সংগে নানান আলোচনা হয়েছে তাঁর। তাঁদের সহজ সৌজন্য-বোধ ও আগ্রহে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া যেমনি মুগ্ধ না হ'য়ে পারেন নি—তেমনি বড়ুয়ার শিল্পপ্রীতি ও প্রতিভার কথাও তাঁদের কাছে অপরিচিত রয়নি। বৃটিশ চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 'দি ব্রিটিশ কিনামেটোগ্রাফ সোসাইটি' (The British Kinemetograph Society) শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে তাঁদের সমিতির সভ্য করে নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়াই হ'লেন এই প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম ভারতীয় এবং অ-ইউরোপীয় সভ্য।

লণ্ডনে থাকাকালীন শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এবং যমুনা দেবী দু'দু'বার বি, বি, সি কর্তৃক আমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁদের বাংলা বিভাগে 'বিচিত্রা'য় ভাষণ দেন। রূপ-মঞ্চের পাঠক সাধারণের অনেকেই সে বক্তৃতা শুনে থাকবেন। তাছাড়া একটা অনুষ্ঠানে তিনি নিজে 'জনগণমন অধিনায়ক' সংগীতটি গান এবং 'সারে যাহাসে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা' সংগীতটি পরিচালনা করেন। বড়ুয়ার উদ্যোগে লণ্ডনের কিংসওয়ে হলে ভারতীয় নৃত্যের এক অনুষ্ঠান—ওদেশীয় নৃত্যামোদীদের খুবই মুগ্ধ করে। এই অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছিলেন সতীশ ভাটনগর এবং ব্যবস্থাপনার ভার ছিল সেনট্রাল ইণ্ডিয়ান কমিটি অফ দি ইণ্ডিয়ান লীগ-এর ওপর। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এই নৃত্যানুষ্ঠানের মূল সূত্রধার ছিলেন।

তিনি প্রতিটি নৃত্যের ব্যঞ্জনা ও অন্তর্নিহিত ভাবধারা দর্শকদের সুবিধার জন্য ইংরেজীতে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। এই বিষয়ে ভারি একটা মজার ব্যাপার হ'য়েছিল- প্রাচীর পত্রে বড়ুয়ার কার্টুন এঁকে কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতীয় নৃত্য-বিশারদ বলে প্রচার করেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া যখন সেই প্রাচীরপত্রের একখানি নমুনা আমাদের দেখালেন, উপস্থিত সকলেই তা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কৌতুক উপভোগ করলাম। কবিগুরুর বর্ষামঙ্গল— নৃত্য-নাট্যের অভিনয়ও বড়ুয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এবং ওদেশীয় জনসাধারণের কাছে তা খুবই প্রশংসা পায়।

২৯শে অক্টোবর, শ্রীযুক্ত বড়ুয়া স্বদেশে ফিরে আসেন— তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহীরা তাঁকে আবার বহুদিন বাদে সুস্থ ও সবল অবস্থায় নিজেদের মাঝে ফিরে পেয়ে যে যথেষ্ট আনন্দিত হ'য়ে ওঠেন, সেকথা বলাই বাহুল্য। বড়ুয়ার প্রত্যাগমনের সংবাদ প্রচারিত হবার সংগে সংগে চিত্রজগতের কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের ভিতরও খুবই উৎফুল্লের ভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবে এসে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সংগে দেখা করে যান। রূপ-মঞ্চ পত্রিকা থেকে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া সংগে সংগেই আমন্ত্রণ জানান।

বর্তমানে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার নিজস্ব কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: যে চিত্রগুলি অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিলাম, যদি কর্তৃপক্ষ রাজী থাকেনত সেগুলি শেষ করতে চেষ্টা করবো। এস, এস, প্রডাকসন নামে একটা নতুন প্রতিষ্ঠানের সংগে অবশ্য একখানি ছবি তুলবার কথা হচ্ছে।

তবে তার পূর্বে শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণ সম্পর্কে পণ্ডিতজীর সংগে আমার দেখা করবার প্রয়োজন আছে। তাঁর আহ্বানের অপেক্ষা কচ্ছি।"

এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কিছু মনে করবেন না, আপনার নিজের সম্পর্কে নিজের অভিমত জানতে চাই।"

শ্রীযুক্ত বড়ুয়া কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন: ওদেশের অনেক সাংবাদিকও একথা আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁদের যা বলেছি—আপনাকেও তাই বলতে হয়: I am a past, looking through present, for a future,"

বর্তমান বাংলা চিত্রজগতের নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির কারণ এবং এর হাত থেকে উদ্ধারের উপায় সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বলেন: কিছুদিন অবশ্য আমি এখানকার পরিস্থিতির সংগে যোগাযোগ রাখতে পারিনি, তবু এর পূর্বে যতখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এসেও বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীদের কাছ থেকে যতটা জানতে পাচ্ছি, তাতে মনে হয়, বাংলা চিত্রজগতের প্রতিটি বিভাগে অযোগ্যদের আনাগোনা যতদিন না বন্ধ হয়, এর কোন উন্নতির আশা নেই।" শ্রীযুক্ত বড়ুয়া গভীর বেদনার সংগেই এই কথাগুলি বলেন।

মণিদীপা ও যমুনা দেবী তাঁদের কাজ সেরে আমাদের মাঝে এসে বসেছিলেন। আমাদের সর্বজনপ্রিয় পাহাড়ী সান্যালও এসে হাজির হলেন। বড়ুয়ার গৃহে তিনি তাঁর সাংগপাংগদের নিয়ে 'পনটুন' খেলার বেশ এক আস্তানা তৈরী করে নিয়েছেন। পরিচালক বন্ধু মণি ঘোষও এসে হাজির হ'লেন— হাজির হ'লেন চিত্রজগতের আরো অনেকেই। এঁরাও মাঝে মাঝে আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। ৬'টার অনেক বেশীই হ'য়ে গিয়েছিল। চা ও আনুসংগিকের আগমনে আমিও একটু উন্মনা হ'য়ে উঠেছিলাম। তাই আলোচনার পরিসমাপ্তি টেনে খোস গল্পে মেতে গেলাম। পাহাড়ী তাঁর নিজের হাতে তোলা কতগুলি ছবি তুলে ধরলেন আমাদের সামনে। তার মধ্যে বড়ুয়ার একখানিও ছিল। আমি তাড়াতাড়ি লুফে নিলাম সেখানা। লণ্ডনে গৃহীত শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ও যমুনা দেবীর কোন ফটো আছে কিনা এবং থাকলে রূপ-মঞ্চ পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবার জন্য শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে অনুরোধ করতেই তিনি উঠে গিয়ে সমস্ত ফটোগুলিই নিয়ে এলেন। আমি সেগুলি থেকে বেছে বেছে কয়েকখানা নিয়ে নিলাম। তারপর শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ও যমুনা দেবীকে তাঁদের আতিথেয়তা এবং রূপ-মঞ্চের প্রতি আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

—শ্রীপার্থিব

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার ছায়া-সংগিনী প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী যমুনা দেবীর সংগে মণিদীপার সাক্ষাৎকার

শেষ নভেম্বর সকাল বেলা। অনিচ্ছুক দেহ ও মনটাকে শীতের মাঝে জোর করে বিছানা থেকে তুললাম—বারবার মনে পড়ছিল সেদিনকার পরিক্রমার নির্দেশের কথা, সম্পাদক মশাইর জোর হুকুম ছিল, সম্প্রতি বিদেশ-প্রত্যাগতা যমুনা দেবীর সাথে আমাকে দেখা করে উৎসুক পাঠকদের খানিকটা খোরাক দিতে হবে—শ্রীপার্থিব যাবেন প্রমথেশ বড়ুয়া সকাশে, সেই সংগে যেতে হবে আমাকেও। অতএব শীতের সকালেও আরাম বা আয়াস পছন্দ করলে আর চলবে না। হাত মুখ ধুয়ে যাত্রার সব প্রস্তুত করে অপেক্ষা করছি শ্রীপার্থিবের জন্য। কথা ছিল শ্রীপার্থিব এবং তাঁর বন্ধু শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সহকারী শ্রীযুক্ত অমল দত্ত আমার এখানে যাত্রাপথের মাঝখানে একটু বিরাম নেবেন। চা'পানের পর আমিও তাঁদের সংগ নেব। একটু বাদেই মোটর গাড়ীর আওয়াজে বুঝলাম, শ্রীপার্থিবের উপস্থিতি—জানালা দিয়ে দেখলাম অনুমান মিথ্যে নয়। শ্রীপার্থিব তাঁর বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দিলেন—এই যে ইনিই আমাদের পরম বন্ধু অমল দত্ত, ৺অজয়দার সহকারী ছিলেন, বর্তমানে শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সহকারী এবং আপাততঃ আমাদের পথ-নির্দেশক রূপে এসেছেন শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার তরফ থেকে।" নমস্কারান্তে আসন নিয়ে বসা গেল। তারপর চা'য়ের পর্ব সেরে নিতে হ'ল একটু তাড়াতাড়ি। কারণ, ঘড়িতে সময় তাগিদ দিচ্ছে—আটটার মধ্যে ওখানে পৌঁছুতেই হবে।

যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছলাম। শ্রীযুক্ত দত্ত আমাদের নিয়ে চল্লেন—গেটের ভিতরে ঢুকেই বড় একটা বাগান, তারই পাশের রাস্তা ধরে অগ্রসর হয়েই দেখি বারান্দায় ছোট্ট একটা টেবিল ঘিরে ছোটখাট একটি জনতা। তারই মাঝে দেখা গেল আরাম কেদারায় চিরপরিচিত শ্রীযুক্ত বড়ুয়াকে। আমরা বারান্দার কাছে যেতেই সকলে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। বড়ুয়া তাঁর আসনটী আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আরো আসন আনতে ছুটলেন। তারপর চললো আলাপ পরিচয়ের পালা। পরিচয় শেষে শ্রীপার্থিব তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে দেখলাম সচেতন হয়ে উঠেছেন—তাঁর খাতাপত্র বের করে প্রস্তুত হয়ে নিলেন। যমুনা দেবীর কাছে আমার আগমনের কথা বলতে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন—খানিকবাদে যমুনা দেবী আসরে এসে উপস্থিত হলেন। প্রাত্যহিক এই আসরটিকে যথাসময়ে সব কিছু জোগানোর ভার তাঁরই উপরে। তাছাড়া নিজস্ব গৃহস্থালী নিয়েও তিনি মেতে থাকেন—থাকতে ভালও বাসেন। রান্নাঘর থেকে তিনি ছুটে এসেছেন—পরিচয় হওয়ার পর আমি বললাম: আপনার রান্নাঘর থেকে অন্ততঃ একটা ঘণ্টার জন্য ছুটী নিতে হবে—এই সময়টুকু আমি চাই।" তিনি হেসে বললেন: "বেশত! তবে একটু বসুন, ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়ে আসি।" এদিকে শ্রীপার্থিব মিঃ বড়ুয়ার সংগে সাধারণ বিষয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছেন—অচেনা লোকের সংগেও চমৎকার গল্প জমাতে এঁর জুড়ি নেই—এখানে বড়ুয়া তো তাঁর পূর্বপরিচিত, আমি শ্রোতার দলেই রইলাম।

যমুনা দেবী আবার দেখা দিয়েই বললেন: আমরা অন্য ঘরে বসব—তা নাহ'লে এঁদের আলোচনার কবলে পড়ে টিকতে পারবো না—." যমুনা দেবীকে অনুসরণ করে আমি ভিতরে যেয়ে বসলাম। আমার খাতাটি খুলে তাঁর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলতে প্রথমেই অনুরোধ জানালাম।

যমুনা দেবী তিনবার মিঃ বড়ুয়ার সংগে ওদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন। প্রথমবার যান ১৯৩৮ সনে। তখন তিনি ওদেশীয় প্রায় সব নামকরা জায়গাতেই গিয়েছেন এবং লণ্ডনের সমস্ত
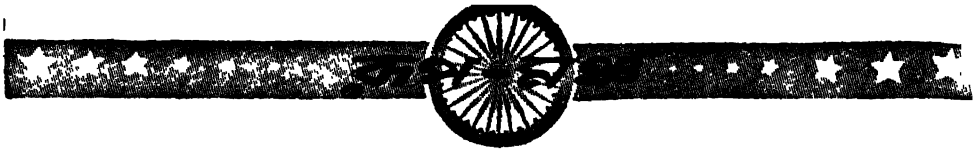
স্টুডিওগুলিই ঘুরে দেখেছেন। গত বছরও একবার লণ্ডনে গিয়েছিলেন—যতবারই যান, প্রধান স্টুডিওগুলিতে ঘুরে ওদেশের অভিনেতা অভিনেত্রী এবং সিনেমা শিল্প সম্বন্ধে জানবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। এই বছর মে মাসে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া এখানকার ডাক্তারদের পরামর্শে আবার যখন লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেন, তার কয়েক মাস পরে জুলাই মাসে যমুনা দেবী একাই লণ্ডন যাত্রা করেন।

শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার জন্য ইণ্ডিয়া হাউসে যে সম্বর্ধনা সভা আহৃত হয়, বলা বাহুল্য, যমুনা দেবীও সেই সম্মানের অংশ নেন। এ ছাড়া ওখানকার নানা উৎসবে তিনি শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সংগে উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডনে বি, বি, সি থেকে তিনি এবং বড়ুয়া ওদেশের সিনেমা সম্বন্ধে বেতার বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

ওখানকার অভিনেত্রীদের প্রসংগে তিনি বলেন: ওদের সবচেয়ে বড় কথা হলো, ওদের স্বাস্থ্য চর্চা। প্রতিজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অত্যন্ত যত্ন নেন। কাজেই আমাদের মত অল্পতেই তাঁদের অবসর নিতে হয় না। স্বাস্থ্য সিনেমা জগতের শিল্পীদের অপরিহার্য গুণের মধ্যে একটী। অভিনেত্রী হিসাবে যোগ দেওয়ার সময় যে form fill-up করতে হয়, তার মধ্যে শিল্পীর দেহের উচ্চতা, ওজন প্রভৃতির একটী নির্দিষ্ট মাপ আছে—সেই অনুযায়ী মাপ না হলে কাউকে অভিনেতৃ করে নেওয়া হয় না। এজন্য সকলকেই নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়।

তারপর ওদের অভিনয় সম্পর্কে স্কুল আছে, সেখানে অভিনয় সম্বন্ধে শিক্ষা গ্রহণ করে তারপর অভিনয় ক্ষেত্রে নতুনেরা প্রবেশ করতে পারেন। আমাদের দেশে এই দু'টীরই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। কোন ছবি তোলার আগে, কাহিনী পড়ে যার যার ভূমিকা বুঝিয়ে নানাভাবে আলোচনা করা হয় এবং মহড়া দিয়ে অভিনয় সম্বন্ধে তাঁদের পারদর্শিতা দেখে যদি মনে হয়, অভিনয়ে কোন গলদ নেই, তবেই ছবি তোলা হবে। ভূমিকা নির্বাচনের সময়ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয়-দক্ষতা অনুসারে ভূমিকা দেওয়া হয়। যেমন একটী অভিনেত্রীর চেহারা এবং হাবভাব যদি গ্রাম্য মেয়ের মত হয়, তাহলে তাঁকেই গ্রাম্য মেয়ের ভূমিকাটি দেওয়া হবে। যে চঞ্চল তাঁকে সেই অনুসারে ভূমিকা দেওয়া হয়। আবার যাঁর মধ্যে তেজ, গাম্ভীর্য প্রভৃতি দেখা যায়, তাঁকে তেমনি উদ্দীপ্ত ভূমিকাতে নামানো হয়। এরই ফলে ওদেশীয় ছবিতে কাউকে কোন ভূমিকা বেমানান হয়না। আর আমাদের মত একই শিল্পীকে কোনটাতে নায়িকা, অন্যটাতে মা কিংবা মেয়ে রূপে দেখতে পাওয়া যায় না। ছবিখানি সর্বাংগ সুন্দর করে তুলতে যা কিছুর প্রয়োজন, সে সবদিকে পরিচালকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে। আর একটী প্রধান বৈশিষ্ট্য ওদের লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে প্রতিটী শিল্পী এবং ছবির কর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতা। সব শিল্পীই মনপ্রাণ দিয়ে নিজেদের কর্তব্য করেন এবং ছবির অন্যান্য দিকেও তাঁদের লক্ষ্য থাকে। সকলের সংগে অকপট সহযোগিতায় তাঁরা ছবিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। প্রত্যেক কর্মী পরিচালকের নির্দেশ মত কাজ করে যাচ্ছেন, এতটুকু ত্রুটী নেই। অর্থই তাঁদের কাছে বড় নয়। তাঁরা শুধু জানেন, কি করে ছবিটাকে সুন্দর করে তুলতে হবে এবং তাঁরা পরিচালককে ও অন্য দশজনকে কি করে সাহায্য করবেন।

শিল্পীদের রূপসজ্জাও নিখুঁত না হলে চলে না। রূপসজ্জাকারের দায়িত্ব তাই অনেক। ওখানে অভিনেত্রীদের জন্য মেয়ে রূপসজ্জাকর থাকে। সাধারণতঃ তিনভাবে রূপসজ্জা করা হয়। কোন ছবি তোলার আগে তিনটি মেয়েকে তিন রংয়ে রূপসজ্জা করে ক্যামেরা এবং আলোর মাঝে পরীক্ষা করা হয়। তাঁদের ছবি তুলে পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনটী ক্যামেরার চোখে ভাল লেগেছে—তারপর সেই রং দিয়ে রূপসজ্জা করা হয়।"

যমুনা দেবী বলেন: এভাবে দেখা যায়, ওদের প্রত্যেকটী কাজেই কি অপূর্ব নিষ্ঠা—ছবি তাড়াতাড়ি শেষ করাই তাঁদের লক্ষ্য নয়। সংযম দিয়ে, নিষ্ঠা দিয়ে সর্বাংগ সুন্দর করে তুলতেই তাঁরা আন্তরিক ভাবে চান।"

আমাদের দেশের কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন—"এসব আমাদের দেশে হওয়া যে অসম্ভব তা নয়,

কিন্তু কে প্রথম এই পথে অগ্রসর হবেন? ছবি তুলে টাকার অঙ্ক বাড়ানো ছাড়া এঁদের আর বিশেষ কোন লক্ষ্য আছে বলে মনে হয় না। ওদেশীয় চিত্র নির্মাতারা টাকার অঙ্ককে বাদ দেন না ঠিকই, কিন্তু তাঁরা এটাও ভাবেন, দেশকে তাঁরা কিছু দিতে পেরেছেন কিনা। কিংবা সিনেমা জগতের উত্তরোত্তর উন্নতির পথে এতটুকু সাহায্য তাঁরা করতে পেরেছেন কিনা। তাই তাঁদের এত দরদ, এত নিষ্ঠা একটী ছবি নির্মাণে!"

লণ্ডনে থাকাকালীন শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার উদ্যোগে ভারতীয় নৃত্যকলা ও সংগীতের পাঁচটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর প্রতিটি অনুষ্ঠান ওদেশীয়দের কাছে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। এবারকার বিদেশ ভ্রমণে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কী মনে হ'য়েছে—একথা যমুনা দেবীকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার এই ভারতীয় নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠানগুলিই আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হ'য়েছে। কেন, তার একটু আভাস আপনাকে দিতে চেষ্টা করবো। ইতিপূর্বে যে কয়েকবার আমি বিদেশে গিয়েছি এবং ওদেশীয় শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছি ভারতীয় শিল্পীদের সম্পর্কে তাঁদের খানিকটা অবজ্ঞার ভাব আমাকে যথেষ্ট পীড়া দিয়েছে। দু'একজন মুষ্টিমেয় শিল্পীদের নৈপুণ্য ছাড়া সমগ্রভাবে ভারতীয় শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যকে তাঁরা যেন স্বীকার করতে চাননি! কিন্তু শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার এবারকার অনুষ্ঠানগুলি তাঁদের সেই ভুল ভাঙ্গাতে অনেকাংশে সমর্থ হ'য়েছে। প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁদের যে আগ্রহের পরিচয় পেয়েছি এবং যে প্রশংসাবাণী শুনেছি—তা থেকেই আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত ভাবেও অনেকের স্বীকারোক্তি শুনেছি। অনেকেই আমায় বলেছেন: না, আপনাদের ভারতীয় শিল্পীদের নৈপুণ্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে ভুল ধারণা আমাদের ছিল—এবার অনেকাংশে তা দূর হ'য়েছে।' আমি সহাস্যে তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিয়েছি: ভারত সম্পর্কে ভালভাবে কিছু না জেনেই এমনি ভাবে তার প্রতি আপনারা প্রতিক্ষেত্রে অবিচার করে থাকেন।" তাঁরা তা অস্বীকার করতে পারেন নি। যেসব শিল্পীরা এই অনুষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তাঁরা পেশাদারী নন—ভালভাবে তৈরী হ'য়ে নেবার সময়ও তাঁরা পাননি—তবু সত্যি, তাঁরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—তা খুবই প্রশংসার যোগ্য! তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া বা নিজেদের সম্মানই বজায় রাখেন নি—সমগ্রভাবে ভারতেরই মুখোজ্জ্বল করেছেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়া গ্রীষ্মের সময় আবার লণ্ডন যাবেন বলে স্থির করেছেন—তখন কবিগুরুর 'ডাকঘর' ও 'বাল্মিকী প্রতিভা' ওদেশে মঞ্চস্থ করবেন বলে মনে করছেন।" শ্রীযুক্তা যমুনা দেবী কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেন: আর একটী বিষয় আমি লক্ষ্য করেছি—ভারতীয় কাহিনীর প্রতি ওদের অদম্য আগ্রহ। এই আগ্রহ সম্পর্কে শ্রীযুক্ত বড়ুয়া অবশ্য বলেন: মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনীর প্রতিই ওদের ঝোঁকটা বেশী—এবং ভারতীয় কাহিনীতে মনস্তত্ত্বের দিকটা খুবই বেশী। তাই ভারতীয় কাহিনীর প্রতি ওরা দিন দিন বেশী আকৃষ্ট হচ্ছে।" আমাদের আলোচনার মাঝে—যমুনা দেবীর কাছে গৃহস্থালীর প্রশ্ন নিয়ে কয়েকটী মুখ উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেল। তিনি দু'একবার উঠে গিয়ে কি সব বুঝিয়ে দিয়ে এলেন—বুঝলাম আমাদের বাঙালী গৃহিনীর স্পর্শ তাঁকেও বাদ দেয়নি—বাইরে যে যাই হোন না—সংসার আর গৃহস্থালী ছাড়া বাঙালী মেয়েরা থাকতে পারেন না—এখানেই যেন তাঁদের মানায় সবচেয়ে বেশী।

এর মাঝে আমিও স্থির করলাম আর বেশীক্ষণ ওকে আটকে রাখব না—ওখানকার সম্বন্ধে আর দুটী কথা জিজ্ঞাসা করেই ছুটী নেব। লণ্ডনের অন্যান্য উৎসবে যেখানে তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেকথার উত্তরে তিনি বলেন—"উৎসবের প্রধান উপলক্ষ যিনি, সেই বড়ুয়ার মুখ থেকে সব শুনলে আপনার আরো ভাল লাগবে। কাজেই এই ভারটা আমি আর নিলাম না।" আমিও হেসে উঠে বললাম—বেশ, তাহলে আপনি লণ্ডনের যুদ্ধ পূর্বেকার এবং যুদ্ধের পরের অবস্থার প্রভাব সিনেমা জগতের উপর কতখানি কাজ করছে, সে সম্বন্ধে একটু বলুন, তাহলেই আমার শেষ হবে। যমুনা দেবী

বল্‌লেন—"দেখুন, ষ্টুডিও সম্পর্কে আমার চেয়ে মিঃ বড়ুয়ার অভিজ্ঞতার মূল্যই অনেক বেশী, আমি দেখেছি সাধারণ চোখ দিয়ে এবং শিল্পীর মন নিয়ে কিন্তু তিনি এর সবদিকগুলোই ভালভাবে জানেন এবং লক্ষ্যও করেন, কাজেই এই দুরূহ প্রশ্ন চলুন তাঁকেই করবেন। তাছাড়া যুদ্ধোত্তরকালের কতকগুলি পরিকল্পনা নিয়ে মিঃ বড়ুয়া ও ওখানকার সর্বপ্রধান প্রযোজক আর্থার র‍্যাঙ্ক অর্গাইজেসনের সংগে অনেক আলাপ আলোচনা হয়ে গিয়েছে, ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকেও এতে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'য়েছে বলে শুনেছি।"

যমুনা দেবীর সংগে বাইরের বারান্দায় এলাম। আমাদের নির্দিষ্ট আসনে বসে কান পাতলাম ওদের আলোচনায়। শ্রীপাণিবকে দেখলাম অতি মনোযোগের সংগে কি যেন লিখছেন আর বড়ুয়া ওদের সম্বন্ধেই বলে যাচ্ছেন। খানিক শুনেই বুঝতে পারলাম, আমারই প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে। আমিও ওদিকে মন দিতেই যমুনা দেবী বল্‌লেন: এবার আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর শুনুন, আমি যাই ওদিকে।" আমি ঘাড় নেড়েই সম্মতি জানালাম। তারপর আমি অন্যান্য শ্রোতাদের মত নীরবে শুনেই চললাম। অদ্ভুত দরদ এই মানুষটির সিনেমা

জগতের প্রতি। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ওখানে গিয়েও তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। ওখানকার ভারতীয় হাই কমিশনারের কাছেও তিনি তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেছেন। পণ্ডিত নেহেরুকে তিনি তাঁর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। প্রত্যেক ষ্টুডিওতে ঘুরে ঘুরে তিনি তাঁদের উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও এবং তাঁদের কাজকর্ম লক্ষ্য করেছেন। আমাদের দেশেও সেই ধারা প্রবর্তনের সুযোগের অপেক্ষা করছেন শ্রীযুক্ত বড়ুয়া।

যমুনা দেবী একবার চা নিয়ে এলেন। সবাইর চা খাওয়া হলে—আবার আলোচনা আরম্ভ হলো। বারান্দা ভরতি লোক মন্ত্রমুগ্ধের মত বসেছিলেন—একটি একটি করে লোক, সংখ্যা বাড়তে লাগলো। সর্বশেষে উপস্থিত হলেন সর্বজন-প্রিয় পাহাড়ী সান্যাল। বুঝলাম এই আসরটি রোজই এমনি জমকালো হয়ে উঠে।

প্রায় ঘণ্টা দুইয়ের ওপর আমরা ওখানে ছিলাম। তারপর আবার স্ব স্ব গৃহাভিমুখে রওনা দি'। পথে শ্রীপার্থিবকে আমার প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে যমুনা দেবীর মন্তব্যের কথা বললাম—শ্রীপার্থিবও যমুনা দেবীর কথাই অনুমোদন করলেন—"যথাযোগ্য স্থান থেকে যথোপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করাই কর্তব্য।" আমি বললাম—"কিন্তু এই জ্ঞান কি আবার আমাকে বিতরণ করতে হবে নাকি।" শ্রীপার্থিব বল্লেন —"আপনি অতটা কষ্ট নাই বা করলেন, আশা করি আমার আলোচনার ভিতর দিয়েই আমাদের পাঠকরা কিছুটা জানতে পারবেন।" আমি বললাম—"তথাস্তু, অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু একটি বিষয় আমাদের পাঠক পাঠিকারা আপনার আলোচনা থেকে তাঁদের কৌতূহলকে দমন করতে পারবেন না। সে বিষয়ে আমি আপনাকে টেক্কা দিয়েছি।" শ্রীপার্থিব গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন: কী রকম?" আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম: শ্রীযুক্ত বড়ুয়া ও যমুনা দেবীর ব্যক্তিগত সম্পর্কিত বিষয়টি।" শ্রীপার্থিবত চটে লাল! অগ্নিশর্মা হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন: এসব ব্যক্তিগত প্রশ্ন আপনি তুলেছিলেন কেন? আপনাদের মেয়েদের ঐত স্বভাব—সামান্য কৌতূহলকে দমন করতে পারেন না।' আমিও শ্রীপার্থিবকে প্রতি আক্রমণের সুরে বল্লাম: আপনিই বা সবটা না শুনে এত চটছেন কেন!" শ্রীপার্থিব একটু ঠাণ্ডা হ'য়েছেন বুঝে আমি বল্লাম: আমি যমুনা দেবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—লণ্ডনে আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ছিলেন কিনা! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুচকী হেসে তিনি উত্তর দিলেন: ব্যক্তিগত সম্বন্ধ সম্পর্কে বলবার কিছুই নেই—কারণ, ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দেই আমরা পরস্পরে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হই। তবে এবিষয়ে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল: শ্রীযুক্ত বড়ুয়া যখন আমাকে যমুনা দেবী বলে কয়েকজনের সংগে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন—তখন ওরা বড়ুয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যখন বিয়ে করেছেন, তখন মিসেস বড়ুয়া না বলে যমুনা দেবী বলে পরিচয় দিচ্ছেন কেন? তার উত্তরে বড়ুয়া হেসে জবাব দেন: আমাদের দেশে মিসেস হ'লে এক সময় শিল্পীদের কদর কমে আসতো। বিশেষ করে নায়িকার ভূমিকায় সুযোগ পেতে কষ্ট হ'তো। বর্তমানে অবশ্য সে ভয়টা নেই। আর যমুনারও সে ফাঁড়া কেটে গিয়েছে। তবু অভ্যাসটা যায় নি।" তাঁরা এ নিয়ে খুব কৌতুক উপভোগ করেছিলেন বড়ুয়ার সরল স্বীকারোক্তিতে।" শ্রীপার্থিব দেখলাম তবু ঠাণ্ডা হ'তে পাবেন নি। আমি আবার তাঁকে বাধা দিয়ে বল্লাম: আগেই ব্যস্ত হবেন না। আসবার সময় দেখলেন না বড়ুয়াকে ডেকে আমি চুপি চুপি কথা বলছিলাম?" শ্রীপার্থিব মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বল্লেন: হ্যাঁ, তা দেখেছিলাম বটে!"

আমি বল্লাম: এই বিষয়টিকে প্রকাশ করতে পারবো কিনা—বড়ুয়াকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এবং তিনিও খানিকটা হেসে প্রকাশ করবার অনুমতি দিয়েছেন।" শ্রীপার্থিব এবার দেখলাম সত্যিই ঠাণ্ডা হ'য়েছেন!—মণিদীপা

উদীয়মান অভিনেতা শিশির মিত্র

★

দেখতে শুনতেই হোমরা-চোমরা—কথাবার্তাও ভারিক্কী-চালের। তাই বয়সের কথা শুনলে আমার মত আপনারাও বিস্মিত না হয়ে পারবেন না। কায়াকে আপনারা না দেখে থাকতে পারেন কিন্তু ছায়াকে অনেকেই দেখেছেন। একাধিকবার রূপালী পর্দার সামনা-সামনি তাঁর সংগে আপনাদের দেখা হ'য়েছে। লোকটি আপনাদের অপরিচিত নয়। আমি বলছি উদীয়মান অভিনেতা শিশির মিত্রের কথা। সোমবার, ২০শে অক্টোবর, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শিশির মিত্রের জন্ম হয় তাঁর মাতুলালয়ে, ১৬, হেমচন্দ্র ষ্ট্রীট, খিদিরপুরে। শিশির মিত্র বর্তমানে মাত্র পঁচিশ বৎসরের যুবক—কিন্তু তাঁকে দেখে সত্যিই কি তাই মনে হয়?

শিশিরদের পৈতৃক বাড়ী ২২৩, বালীঘাট ষ্ট্রীটে অবস্থিত। তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসক। পিতা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রও একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। শিশিরকেও ভর্তি করা হ'য়েছিল মেডিক্যাল কলেজে—পৈতৃক ধারাটা বজায় রাখতে। কিন্তু শিশিরের টেপাটেপি-কাটাকাটি ভালো লাগলো না। বছর দুই ডাক্তারী পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকা নিয়ে ঘাটাঘাটি করলো—অভিভাবকদের পীড়াপীড়িতে—তারপর যখন তাঁরাও বুঝলেন, ওসব ওর ধাতে সইবে না—তখন তাঁদেরও আর কিছু বলবার রইলো না। পিতামাতার ছয়টি সন্তানের ভিতর শিশির চতুর্থ। চারজন ভাইদের ভিতর শিশির তৃতীয়। তবু পরিবারে তাঁর আদর যেন সব চেয়ে বেশী। বিশেষ করে তাঁর বড়দিদি শ্রীযুক্তা অলিভা দত্ত শিশির-গত প্রাণ। অন্যান্য ভাইদের বঞ্চিত করে শিশিরের বড়দিদি তাঁর সবটুকু স্নেহই যেন এই অবাধ্য ভাইটিকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনে সব চেয়ে বড় আঘাতই শিশির পেল—তাঁর এই বড়দিদির কাছ থেকেই। যে আঘাতের বেদনা আজও শিশির ভুলতে পারে নি।

শিশিরদের পরিবারটি কলকাতার এক প্রাচীন বনিয়াদী বংশ। রক্ষণশীলতার পাকাপোক্ত প্রাচীরে তার চতুর্দিক ঘেরা। সেখানে নতুন কোন আলো প্রবেশের উপায় নেই। পূর্বপুরুষেরা যা ভেবে এসেছেন—যা করে এসেছেন—পরবর্তী দল তাকেই অনুসরণ করে চলেছেন। বিন্দুমাত্র ব্যাতিক্রম পরিবারের নিয়মকানুনে হবার যো নেই। ভবিষ্যৎ আগন্তুকদেরও তাই বিনা প্রতিবাদে মেনে চলতে হবে। প্রতিবাদের সুর যদি কারো কণ্ঠে বেজে ওঠে—তাকে স্তব্ধ করবার ক্ষমতাও পরিবারের আছে। সেখানে কোন স্নেহ সেই—নেই মায়া-মমতা—নির্মম রক্ষণশীল বিচারকের বিধান নিঃশব্দে মেনে চলতে হবে। এই মেনে চলায় যদি কারোর অক্ষমতা প্রকাশ পায়—পরিবারের যত স্নেহের পাত্রই সে হউক না কেন—চিরদিনের জন্য পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হবে—পরিবারের রুদ্ধ কপাট কোন দিনই তার সামনে উন্মুক্ত হবে না।

অভিনেতা জীবনকে গ্রহণ করে শিশিরকেও পরিবারের এই চিরন্তনী বিধান মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় রইলো না। যে জীবনের হাতছানী তাঁকে পাগল করে তুলেছে—তাকে অবহেলা করে কোন বিধানকেই শিশির মেনে নিতে পারে না—সে বিধান যত নির্মমই হউক না কেন? যে নতুন আলোক শিখা তাঁর অন্তরকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে—তাঁর দ্যুতি সম্মুখের দিগন্ত বিস্তারীত অন্ধকার দূর করে নিশ্চয়ই পথ করে দেবে। পরিবারের অন্যায় রক্ষণশীলতার কছে শিশির পরাজয় স্বীকার করলো না। বরং দীপ্ত প্রতিবাদ জানিয়ে পরিবারের সকল বন্ধন ছিন্ন করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করলো না। শিশিরের মনটা কেবলমাত্র টনটনিয়ে উঠেছিল তাঁর বড়দির জন্য। বড়দিও কী তাঁকে সমর্থন করবেন না!

বড়দির বিয়ে হয়েছে কলকাতারই আর একটি রক্ষণশীল বনিয়াদী পরিবারে। তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত উদয় চাঁদ দত্ত হাটখোলা অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ দত্ত পরিবারের বংশধর। পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল এই দু'য়ের সংমিশ্রণে বড়দি আরো রক্ষণশীলা হ'য়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তবু শিশিরের বিশ্বাস ছিল—তার বড়দি তার দিক থেকে কোন মতেই মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারবেন না। যিনি ওকে

কোলে-পিঠে করে লালন-পালন করেছেন—অন্তরের অফুরন্ত স্নেহ সিঞ্চনে আবাল্য যৌবন যে শিশিরকে বড়দি বড় করে তুলেছেন—তার নতুন জীবন তাঁরই আশীর্বাদেইত দীপ্ত হ'য়ে উঠবে! তিনিইত তার কপোলে চন্দন রেখা এঁকে দেবেন। কিন্তু তা তিনি দিলেন না—যাবার সময় শিশিরের প্রণামও তিনি গ্রহণ করলেন না। সকলের অভিশাপ মাথায় করে—সকলের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে শিশির অভিনেতা-জীবন গ্রহণ করলো। এখন কথা হচ্ছে, আবাল্য এই রক্ষণশীল পরিবারে প্রতিপালিত হ'য়ে বাইরের হাতছানিতে শিশিরের মন কী করে সাড়া দিল! একথার উত্তর দিতে হলে মহাজন ভাষায় বলতে হয়: আমার বাহির কপাট বন্ধ হ'য়েছে ভিতর দুয়ার খোলা।" রক্ষণশীলেরা নতুন আলোর পথ রুদ্ধ করার জন্য যতবড় প্রাচীরই গাঁথুন না কেন—মানুষের মনটিকে কোন সময়েই তাঁরা বেঁধে রাখতে পারেন না। শিশিরের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

শিশিরদের পরিবারটি কিরূপ রক্ষণশীল ছিল, দু' একটী উদাহরণেই তা বুঝতে পারা যাবে। শিশিরের বাল্যশিক্ষা সুরু হয় ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউসনে। বিদ্যালয়ের সমবয়সী বন্ধু বান্ধবরা প্রায়ই ছবি ও নাট্যাভিনয় দেখতে যায়। শিশিরেরও ইচ্ছা হ'লো। কিন্তু সংগে সংগেই সে ইচ্ছাকে প্রশমিত করে রাখতে হয়। বাড়ীতে বল্লেত অনুমতি পাওয়া যাবে না। না বলেই বা কী করে পারা যায়! অত কড়াকড়ি নিয়ম কানুনের ভিতর ফাঁকি দেবারত কোন উপায় নেই। কিন্তু ইচ্ছাটাও দিন দিন যেন প্রবল হচ্ছে। সমবয়সী ছেলেরা সিনেমার কতই না গল্প গুজব করে আর শিশির তাদের সাথে কথায় মোটেই এঁটে উঠতে পারে না। এখন অবধিও সে একটি সিনেমাও দেখতে পারে নি। এ লজ্জার বোঝা সে কেমন করে বইবে!

একদিন মনে মনে সে আর তার ছোটভাই এক মতলব আঁটলো। অন্যান্য দিনের মত যেমনি ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে তাদের স্কুলে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে, শিশির গম্ভীর ভাবে ড্রাইভারকে বল্ল: আজ আমাদের খেলা আছে—তোমাকে আর নিতে আসতে হবে না।"

তখন আলেয়া প্রেক্ষাগৃহে চলছিল 'দক্ষযজ্ঞ'। শিশির ভাইকে সংগে নিয়ে স্কুল থেকে সটান সেখানে যেয়ে হাজির হলো। টিকিট কেটে যখন প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দার সামনে যেয়ে বসলো—সে কী উত্তেজনা ও শিহরণ! বাড়ীর কথা একদম ভুলেই গেল শিশির। ছবি দেখা শেষে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে যখন বেরিয়ে এলো—বাড়ীর কথায় বাড়ী-মুখো আর পা চলতে চায় না। বাড়ীতে শিশিরের কাকীমা শিশিরদের প্রতি একটু সদয়া ছিলেন। তাঁর কথা মনে হ'তে মনে একটু ভরসা হ'লো। চোরের মত পা টিপে টিপে দু'জনে যখন বাড়ী ফিরলো—রাত তখন অনেক। বিছানায় যেয়ে ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। কিছুক্ষণ বাদে শিশিরের মা এসে দু'জনকেই ঘাড় ধরে তুলে বাড়ীর বার করে দিলেন। তারপর অনেক রাত্রে সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হ'য়ে যাবার পর শিশিরের কাকীমা ওদের ডেকে নিয়ে আসেন। অবশ্য পরের দিন এ নিয়ে কারোর কাছে আর গালমন্দ শুনতে হয় নি।

বাইরের আবহাওয়ায় বাড়ীর ছেলেমেয়েরা বিগড়ে যাবে—বাড়ীর অভিভাবকস্থানীয়দের এধারণা যেমনি বদ্ধমূল হ'য়ে গিয়েছিল—তেমনি বাড়ীতেই বিভিন্ন আমোদ প্রমোদ ও খেলা-ধূলার ব্যবস্থা করে ছেলেমেদের মনকে ঘরমুখী করে তুলবার প্রতি দৃষ্টিও তাঁদের কম ছিল না। পরিবারের ছেলে মেয়েরা মিলে বাড়ীতেই আবৃত্তি, সংগীত ও নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করতো—বড়রাও তাতে উৎসাহ দিতেন। খেলাধূলারও ব্যবস্থা ছিল। শিশির সব বিষয়েই সকলের চেয়ে বেশী দক্ষতার পরিচয় দিত। পারিবারিক অনুষ্ঠান থেকেই বলতে গেলে শিশিরের মনে অভিনয়-স্পৃহা অংকুরিত হ'য়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী জীবনে অভিনয় জগতের প্রতি আকৃষ্ট হবার মূলেও রয়েছে এই পারিবারিক অনুষ্ঠানগুলি।

ভবানীপুর মিত্র ইন্সটিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে শিশির উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আশুতোষ কলেজে ভরতি হয়। বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ গণ্ডি থেকে কলেজে এসে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তাঁর বন্ধুর দল গেল বেড়ে—খেলাধূলা—অভিনয়ানুষ্ঠান—সাহিত্যানুশীলন

ও ছাত্রান্দোলনে তার উৎসাহ ও উদ্দীপনা বিভিন্ন পথ খুঁজে পেল। বয়সের সংগে সংগে ক্লাব প্রভৃতির সংগেও তাঁর সংযোগ স্থাপিত হতে লাগলো। এবং এদের উদ্যোগে যখনই কোন অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়—অভিনয়ে শিশিরের বৈশিষ্ট্য সকলের চোখেই ধরা পড়ে। অভিনয়ে নিজের ঝোঁক এবং দক্ষতার পরিচয় দিলেও, অভিনয়কে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করবার ইচ্ছা কোন দিনই শিশিরের ছিল না।

কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে পরিজনের ইচ্ছায় শিশির ডাক্তারী পড়বার জন্য মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হ'লো। ছ'বৎসর শেষ করবার পর সে বেশ বুঝতে পারলো—ডাক্তারী করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হবে না। অবশেষে পড়াশুনায় ইস্তাফা দিয়ে ব্যবসায়ের দিকে দৃষ্টি দিল। নানান ব্যবসা করলো। কোনটাতেই মন বসতে চায় না। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে সতীকান্ত গুহ নামে এক বন্ধুর পরামর্শে শিশির তাঁর আবাল্য বন্ধু সাহিত্যিক গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর সহযোগিতায় 'পূর্ব-পরিষদ' নামে একটী সংস্কৃতি পরিষদ গঠন করে। খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী কেলুনায়ার প্রভৃতিকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে কয়েকটী নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে খুবই আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। 'পূর্বপরিষদের' কর্মতৎপরতা বন্ধ করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর রইলো না।

বাংলা সাহিত্যজগতের অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সংগে শিশিরের খুবই

হৃদ্যতা ছিল। শিশির প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে জ্যেষ্ঠের আসনেই তাঁকে বসিয়ে এসেছে। শ্রীযুক্ত মিত্র শিশিরের অভিনয় ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে অভিনয় জগতে যোগদান করতে বলেন। শিশির বন্ধু বান্ধবদের পরামর্শে শ্রীযুক্ত মিত্রের উপদেশ মাথা পেতে নেয়। প্রেমেন্দ্র বাবু শিশিরকে তাঁর 'নতুন খবর' চিত্রে গ্রহণ করেন। পেশাদার অভিনেতা হিসাবে শিশির এই প্রথম চুক্তিবদ্ধ হ'লো। এই চুক্তির কথা শিশিরের পরিজনের কানে যেতেও দেরী হ'লো না। আশংকা অবশ্য শিশিরের ছিল—তবু মনে করেছিল, তাঁদের যুক্তিতর্ক দিয়ে শিশির বোঝাতে পারবে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, পরিবারের রক্ষণশীলতার কাছে শিশিরের কোন যুক্তিতর্কই কার্যকরী হ'লো না। অগত্যা পরিবারের সংগে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে শিশিরকে বেরিয়ে পড়তে হয়। ধনীর ছেলে কোন ঝড়-ঝাপটের সম্মুখীনও হয়নি ইতিপূর্বে—আদর্শের জন্য বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু এখন দাঁড়াবে কোথায়? রাজধানীর বিরাট বিরাট হর্ম্যমালার মাঝে কোথাও ত নিজের স্থান খুঁজে পায় না। অভিনয় জগতেও সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি—ব্যক্তিগত আর্থিক সংগতিও ত তার খুবই শোচনীয়। প্রথমটায় শিশির বেশ বিচলিত হ'য়ে পড়লো। তার এই শোচনীয়তা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে উদ্ধার করতে সর্বপ্রথম ছুটে এলো তার আবাল্য অকৃত্রিম বন্ধু গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু। শিশিরকে হাত ধরে টেনে গৌরাঙ্গবাবু তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে তাঁর মায়ের কাছে হাজির করে বল্লেন: মা, তোমার আর একটী ছেলে।" গৌরাঙ্গবাবুর মা শিশিরকে পরম আদরের সংগে গ্রহণ করলেন। মায়ের স্নেহ দিয়ে শিশিরের মনের সমস্ত বেদনা ভুলিয়ে দিতে চাইলেন। শিশির পরম নির্ভরতায় তাঁর স্নেহের মাঝে নিজেকে সপে দিল। মাঝে মাঝে শিশিরের মনটা শুধু কেঁদে উঠতো একজনের জন্যই—তিনি আর কেউ নন, শিশিরের স্নেহশীলা বড়দি। একা একা যখনই থাকতো, শিশির মনে মনে জিজ্ঞাসা করতো: বড়দি, বড়দিও আমাকে ভুল বুঝলেন! তাঁর আশীর্বাদ যে আমাকে পেতেই হবে!"

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপদেশেই শিশির কালিকা নাট্য-মঞ্চের সংগে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে যায়। এজন্য কালিকা নাট্য-মঞ্চের কর্ণধার শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী মহাশয়ের কাছে সত্যই সে কৃতজ্ঞ। প্রায় এক বৎসর কালিকার সংগে জড়িত থাকে। কালিকায় খেলাঘর, ২৬শে জানুয়ারী, স্বাধীনতার স্বপ্ন, মীরকাশেম, চন্দ্রশেখর, যশোরেশ্বরী প্রভৃতি নাটকে কৃতিত্বের সংগে শিশির অভিনয় করে। কালিকা নাট্য-মঞ্চে যোগদান করবার তিনচার দিন পর প্রখ্যাতা অভিনেত্রী মলিনা দেবী একদিন শিশিরকে ডাকলেন। তখনও মলিনা দেবীর সংগে শিশিরের ততটা হৃদ্যতা জমে ওঠেনি—তাই তাঁর কাছ থেকে ডাক আসাতে প্রথমটায় শিশির একটু বিস্মিতই হ'য়েছিল। শিশির মলিনা দেবীর সংগে দেখা করতেই তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন: আপনি ছবিতে অভিনয় করবেন কী?" শিশির সংকুচিত ভাবে উত্তর দেয়: করবো না আর কেন?—ইতিমধ্যেই ত প্রেমেনদার নতুন খবর-এ চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছি।"

মলিনা দেবী বলেন: আমি 'ঘরোয়া' ছবির কথা বলছি। আপনি রাজী হনত নায়কের ভূমিকায় সুযোগ পেতে পারেন। আমারই বিপরীত ভূমিকাভিনয় করতে হবে।" শিশির সোৎসাহে উত্তর দেয়: রাজী আর থাকবো না কেন? তবে সাহস হয় না—অতবড় ভূমিকাভিনয় করতে পারবো কী?" মলিনা দেবী উৎসাহ দিয়ে বলেন: সে আমি বুঝবোখন।"

বলতে গেলে মলিনা দেবীর আগ্রহেই শিশির 'ঘরোয়া' চিত্রে নায়কের ভূমিকায় নির্বাচিত হয়। মলিনা দেবীর প্রতি শিশির শুধু এইজন্যই কৃতজ্ঞ নয়—তাঁর অভিনয় প্রতিভা এবং অভিনয়ের বাইরের রূপটির কাছেও শিশির শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারে না। 'ঘরোয়া' চিত্রটি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীযুক্ত মণি ঘোষ। ঘরোয়ার অন্যতম প্রযোজক শ্রীযুক্ত অমর দত্তের সহজ সরল ব্যবহারেরও শিশির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে। 'ঘরোয়া' চিত্রেই শিশির চিত্রামোদীদের অন্তর জয় করতে সমর্থ হয়। এর পর 'মনে ছিল আশা' এবং 'পথের দাবী'র হিন্দি চিত্ররূপ 'সব্যসাচী'তে শিশির কৃষ্ণআয়ার-এর ভূমিকাভিনয় করে। বাংলার বাইরে একাধিক স্থানে সব্যসাচী মুক্তিলাভ করেছে। বম্বের ব্লিৎস পত্রিকাটি
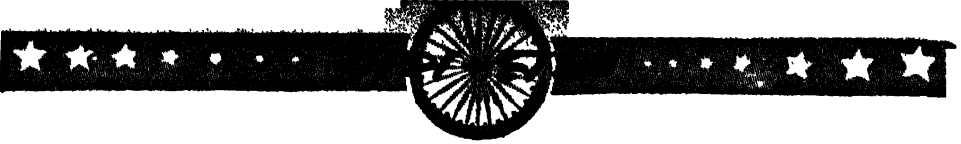
সব্যসাচীর সমালোচনা করতে যেয়ে নাম ভূমিকায় কমল মিত্র, ভারতীর ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী এবং শিশিরের কৃষ্ণআয়ার-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

এর পর শিশিরকে আমরা দেখতে পাই 'কালোছায়া' চিত্রে। 'কালোছায়া চিত্রে শিশিরের সংগে আমাদের শুধু অভিনেতা রূপেই পরিচয় হয় না—কলোছায়া চিত্রে প্রযোজক রূপেও শিশির দর্শক সাধারণকে অভিবাদন জানায়।

১৯৪২-৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শিশির কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে রীতিমত অংশ গ্রহণ করতো—কিছুদিন পূর্বেও বেতার শ্রোতারা বেতার মারফৎ শিশিরের অভিনয় শুনতে পেয়েছেন।

ঘরোয়ার অভিনয় শেষ করে শিশির তার বন্ধু গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুর সহযোগিতায় এবং শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর যুগ্ম সম্পাদনায় 'পাহাড়া' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করে। কয়েকটী সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েই পাহাড়া সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

ঘরোয়া মুক্তিলাভ করবার পর শিশিরের পিতা ও বাড়ীর অন্যান্যেরা চিত্রখানি দেখে আসেন। অবশ্য শিশির সম্পর্কে তাঁরা গোপনে গোপনে খুবই খোঁজ খবর রাখতেন। অভিনয় জগতে প্রবেশ করলেই যে ছেলে বা মেয়ে গোল্লায় যায় না—শিশিরকে দিয়েই তাঁরা এই অভিজ্ঞতা লাভ করলেন তখন শিশিরের পিতা নিজের ভুল বুঝতে পেরে শিশিরকে ডাকিয়ে বল্লেন: যদি অভিনয় জগতেই থাকতে চাও, তবে শুধু অভিনয় করে কী হবে! দেখবার মত একখানা বাংলা ছবিও চোখে পড়ে না। বিশেষ করে পরিবারের সকলকে নিয়ে কোন ছবি দেখতে পারি কৈ?—এতদিনত চিত্র জগতে বিচরণ করলে—যদি কিছু আঁচ করতে পেরে থাকত চিত্র
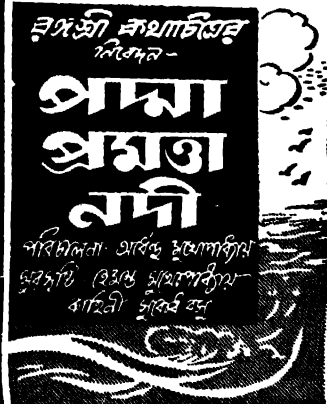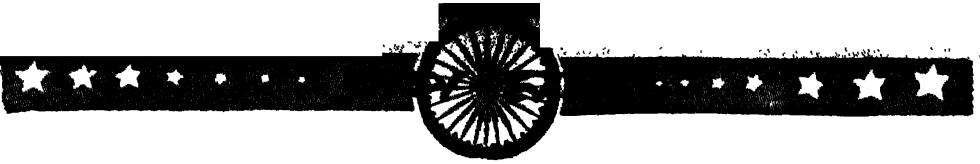
নির্মাণে লেগে যাও।"

শিশির অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয়: সেত বুঝলাম। ব্যবসাটাও যে নেহাৎ কম লাভের তা নয়—কিন্তু টাকা—টাকা কোথায় পাবো।"

শিশিরের বাবা উত্তর দেন: আর জ্যেঠামি করতে হবে না। ধীর মস্তিষ্কে কাজ সুরু করে দাও—টাকা যা লাগে আমি আছি।" শিশির নিজের অতীতের ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা চেয়ে তাঁর পিতার পদধূলি গ্রহণ করে। পিতা পরম স্নেহে পুত্রকে বুকে টেনে নেন। শিশিরের আজ সবচেয়ে আনন্দ, সে তার পরিজনবর্গকে জয় করতে পেরেছে বলে। মনের বিপুল আনন্দে শিশির তার বড়দির কাছে ছুটে যায় পদধূলি নিতে—শিশিরের সমস্ত উৎসাহ নিমেশে নিভে যায়। না—তাঁর বড়দি আজও তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি। আজও তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে শিশিরকে বুকে টেনে নিতে পারলেন না। শিশিরই বা হার মানবে কেন! সেত কোন অন্যায় করেনি! স্নেহের কাছে কিছুতেই সে হার মানবে না। বাবা ও অন্যান্য পরিজনদের অন্তর যেমনি ভাবে শিশির জয় করছে—তাঁর দিদির অন্তরও তেমনি ভাবে সে একদিন জয় করবে।

পিতার আশীর্বাদ লাভ করে শিশির তার অকৃত্রিম বন্ধু গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসুকে নিয়ে বসুমিত্র নাম দিয়ে একটী প্রযোজক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললো। বসুমিত্রের প্রথম চিত্র কালোছায়া গড়ে উঠলো শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটী রহস্যমূলক কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্রখানি প্রেমেন্দ্র বাবুই পরিচালনা করেছেন। 'কালোছায়া' ইতিমধ্যেই সহরের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করে দর্শকদের অন্তর জয় করেছে। শিশিরের পিতা পরিবারের অন্যান্যদের নিয়ে কালোছায়া দেখে এসে অভিমত ব্যক্ত করেছেন: না, সকলকে নিয়ে দেখবার মত ছবিই তোমরা তৈরী করেছো।"

শুধু কালোছায়া নয়—সম্পূর্ণ শিশুদের উপযোগী পূর্ণাংগ চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনাও শিশিরদের রয়েছে।

অভিনেতা-জীবনের সংগে সংগে প্রযোজকরূপে জনসাধারণের আশীর্বাদ ও সহানুভূতিলাভের জন্য শিশির আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাছাড়া চিত্রপরিচালক রূপে চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানাবার ইচ্ছাও তার মনে মনে রয়েছে। অভিনেতারূপে চিত্রজগতে যোগদান করে শিশির কোন অসুবিধার মধ্যে পড়েছে কিনা সেকথা জিজ্ঞাসা করলে বলে: সকলের স্নেহ ও সহযোগিতায় আমি ধন্য হ'য়েছি। তবে অনেককেই নাকি নানান অসুবিধায় পড়তে হয় এবং তার বড় প্রমাণ আমার অন্যতম অকৃত্রিম বন্ধু গুরুদাস। তার অপরাধ, সে স্বয়ংসিদ্ধা চিত্রে আশাতীত নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পেরেছিল। তাই অনেকের ধারণা, ওরূপ কোন ভূমিকা ব্যাতীত সে বুঝি কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারবে না। অথচ গুরুদাসের নৈপুণ্য ও অনুশীলন ক্ষমতা যে যথেষ্ট রয়েছে, একথা আমি বাজী রেখে বলতে পারি।"

বাংলা চিত্রজগতের পরিচালকদের ভিতর নীতিন বসু ও দেবকী বসু শিশিরের প্রিয়। কমল দাশগুপ্তের সুর তার ভাল লাগে। শিশির সময় পেলেই বাংলা ছবি ও নাটক দেখে। এবিষয়ে তাঁর কোন বাদ বিচার নেই। অভিনেতা অভিনেত্রীদের ভিতর শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র ও মলিনা দেবীর শিশির ভুয়সী প্রশংসা করে।

মোটর চালানো শিশিরের সবচেয়ে বড় নেশা—তাছাড়া সময় পেলে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে খোস-গল্পে যেতে যেতেও তাঁর ভাল লাগে। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়েও সে খুব উদার। যা পায়—তাই খায়। বিশেষ কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রতি তাঁর বিশেষ কোন আকর্ষণ নেই। সর্বপ্রকার 'আউট-ডোর' খেলায় শিশির অভ্যস্ত—কোন 'ইনডোর-খেলাই সে জানেনা—এমন কী তাসও নয়।

এখন অবধিও শিশির অবিবাহিত। রীতিমত ব্যায়াম করে। সামান্য কয়েক মিনিট আলাপ-আলোচনাতেই যে কোন লোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হ'য়ে পারবেন না। ধনীর সন্তান হ'য়েও সে নিরভিমান। সহজ ও সরল তাঁর বেশভূষা। আলোচনা প্রসংগে যতক্ষণ তাঁকে আমরা আমাদের মাঝে পেয়েছিলাম—তাঁর আন্তরিকতায় মুগ্ধ না হ'য়ে পারিনি।

—শ্রীপার্থিব

দেবী চৌধুরাণীর কয়েকটি দৃশ্যে

—উপরে—

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠান প্রযোজিত দেবী চৌধুরাণীর কয়েকটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস, সুমিত্রা নীতীশ প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে

—নীচে—

বিমল রায় পরিচালিত নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর 'মন্ত্রমুগ্ধ' চিত্রে মীরা সরকার ও সুনীল দাশগুপ্ত।

—উপরে—

প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক দেবকী কুমার বসু প্রযোজিত চিত্রমায়ার মুক্তি প্রতীক্ষিত 'কবি' চিত্রে ঠাকুরঝি চরিত্রে শ্রীমতী অনুভা গুপ্ত।

জনপ্রিয় উপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনবদ্য সৃষ্টি 'কবি'-কে কেন্দ্র করেই উক্ত 'কবি' চিত্র গড়ে উঠেছে।

—নীচে—

হিন্দি চন্দ্রলেখা চিত্রের একটী নৃত্য-দৃশ্য।

পৌষালী—৫৫
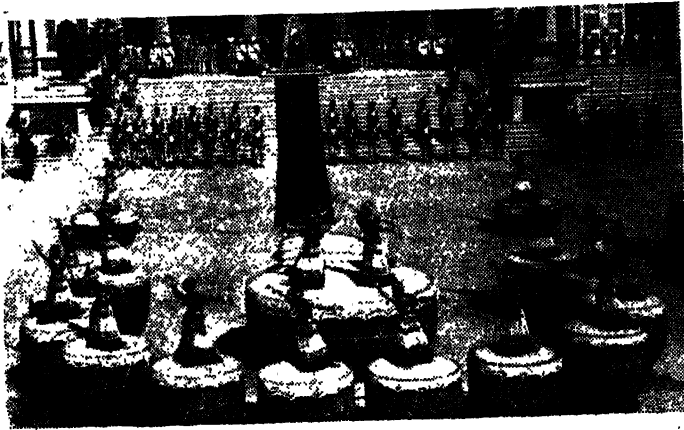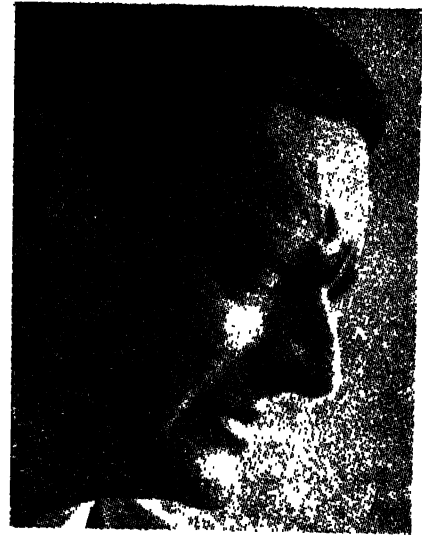
—উপরে—

বা দিকে : বাংলা চিত্র জগতের সর্বজন প্রিয় প্রবীণ ও মরমী পরিচালক প্রফুল্ল রায়। দেবী-চৌধুরাণীর জাঁকজমকপূর্ণ, জনতাবহুল ও বহির্দৃশ্যাবলী এঁরই নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছে। ডান দিকে : বৈদেশিক কবি ইলিয়ট। সম্প্রতি তাঁর কবি-প্রতিভার জন্য 'নোবেল প্রাইজ'-এ ভূষিত হ'য়েছেন।

—নীচে—

তারাশঙ্কর রচিত দেবকী বসু পরিচালিত ও প্রযোজিত চিত্রমায়ার কবি চিত্রে কবিয়াল ও ঠাকুরঝি রূপে রবীন মজুমদার ও অনুভা গুপ্ত।

—উপরে—

বনফুল রচিত নিউ থিয়েটার্সে'র 'মন্ত্রমুগ্ধ' চিত্রে রেবা বসু। বর্তমান দৃশ্যটিতেই সমস্ত চিত্র-কাহিনী কেন্দ্রীভূত বলা চলে। অরোরা ফিল্ম করপোরেশনের পরিবেশনায় চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে।

—নীচে—

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সুরশিল্পী ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুকৃতি সেন। 'অভ্যুদয়'-র পর যাঁর 'গান্ধীজি' আমাদের খুশী করেছে।

(উপন্যাস)

দুই

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

ঘুম এবারেও সহজে আসতে চাইলো না। এক অস্থির চঞ্চলতায় আমি অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। বিগত দিনের কত কথাইনা এলোমেলো ভাবে আমার মনের মাঝে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো। আবাল্য যৌবনের স্মৃতি-বিজড়িত দিনগুলির কথা একটার পর একটা পাশাপাশি ঠেলা ঠেলি করে আমার স্মৃতির পটে স্বচ্ছ হয়ে ভেসে উঠতে লাগলো। না, কাউকেই আমি ভুলিনি—ভুলতে পারিনি। ওঁদের ভোলা যায়ও না। যতুকাকা,—দাগাদা,—নোয়াদা—রমেশ দত্ত—দীনেশ দা'—গণেশ বসু—কার্তিক দা'—কামিনী দত্ত,—মৌলভী সাহেব,—পাগলা উপেন দা'—লালবিহারী মাষ্টার—কানা কেশবমামা—এঁদের ভিড় ঠেলে ঘোষেদের বাড়ীর পিসীমা খলখলিয়ে ওঠেন—মুচকী হেসে সলজ্জ চাহনীতে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে মল্লিক বাড়ীর হেলেন—পুরু চশমা নাকে চড়াতে চড়াতে পোষ্টমাষ্টার বিধুবাবু ডাকঘরের দরজা খোলেন—উত্তর-পাড়ার অবিনাশ মজুমদার—কোকাই দত্ত—গদাই দেওয়ানজীর সাথে ললিত শীল এসেও ভিড় করে। ভিড় করে গাঁয়ের পিওন পদ্মলোচন—আমার বাল্যের সহপাঠী আযনদ্দিন মৈইনা—সুকুর—মহসীন—আশু—গনা, প্রমথ আরো কতজন। দত্তপাড়ার পুকুরপাড়—গাঁয়ের হরির-হাট—আমাদের কর্মপ্রচেষ্টার কেন্দ্রস্থল হবিখোলা—খেলার মাঠ—খালের ধার—এগুলি শুধু ভিড় করেই দাঁড়ায় না—আমায় ডাকতে থাকে। শাখা প্রশাখা দিয়ে কতই না আকুলি বিকুলি জানায় আমাদের পুকুরপাড়ের ঝাকড়া বকুল গাছটা! টালির ঘরের পেছনের কৃষ্ণচূড়ার গাছটা পাতা-গুলি নেড়ে শব্দ করে ওঠে—পূবের ঘরের পেছনকার জামগাছটা টীনের চালের উপর আছাড় খেয়ে ব্যাকুলতা জানায়। পুকুর পাড়—বিলের ঘাট—ওরা সবাই এক সংগে সুরমিলিয়ে ডাকাডাকি সুরু করে দিয়েছে। আমার বাল্য ও কৈশোরের প্রতিটি দিন কেটেছে ওদের মাঝে—বিরহ-বধূর ব্যাকুলতা নিয়ে ওরা আমায় ডাকাকাকি সুরু করেছে। ওরা আমায় পাগলা করে তুলেছে—আমাকে আর ঘরে থাকতে দেবে না। আমি যাবো—এক্ষুনি ছুটে যাবো ওদের কাছে। ঘর কোন দিন আমায় ধরে রাখতে পারেনি—আজো পারবে না।

লেপটা ফেলে দিলাম গা থেকে। মশারীর বাইরে এসে খাটে পা ঝুলিয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। প্রবল উত্তেজনা-বশতঃ বসে থাকতেও পারলাম না। সমস্ত শিরা উপ-শিরাগুলিও যেন ওদের ডাকে সাড়া দিয়ে উঠেছে। উত্তেজনায় অন্ধকার ঘরের মেঝেতে দ্রুত পায়চারী করতে লাগলাম। অন্ধকার ঘরের বদ্ধ হাওয়া গুমোট পাকিয়ে আমার শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করলো। ঠাণ্ডা লাগবে বলে শিয়রের জানালাটাও বড়দি বন্ধ করে দিয়ে গেছেন। খানিকটা হাসি পেল আমার। বড়দির এ অভ্যাসটা বহু-দিনের। এজন্য দাদাও তাঁকে বহুবার বকেছেন—

: তোমার একী 'পুতু পুতু' স্বভাব বড়দি! জানালাকপাট-গুলি খুলে রাখ! ঘরে আলো বাতাস খেলতে দাও!"

বড়দির এই 'পুতু পুতু' স্বভাব আজও বদলায়নি, তাই হাসি পেল। জানালাটা খুলে দিলাম। বাধামুক্ত কুয়াসা-সিক্ত চাঁদের আলো আবার এসে পড়লো খানিকটা। সেই সংগে সংগে বাতাসও খেলে যেতে লাগলো। চাঁদের আলোয় দেখতে পেলাম, বড়দি যাবার পর দরজাটা বন্ধ
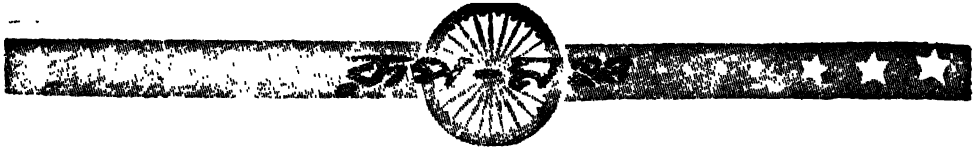
করা হয় নি। দরজার অর্গলটা এঁটে দিয়ে আমি জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার বাধাহীন দৃষ্টি অদূরে কুয়াসার রহস্যে আবৃত ধূসর প্রান্তরের মাঝে যেয়ে যেন আর পথ খুঁজে পেল না। ওর গাম্ভীর্যের পানে তাকিয়ে থেকে আমি আমার চিন্তার খেই হারিয়ে ফেললাম। মনটা উঠলো থমথমিয়ে। সমস্ত উত্তেজনা যেন নিমিশে প্রশমিত হ'য়ে গেল। আমি মশারীর ভিতর যেয়ে শুয়ে পড়লাম। লেপটাকে পায়ের কাছে ঠেলে দিয়ে পায়ের কাছ থেকে পাতলা কাঁথাটা টেনে গায়ে দিলাম। মশারীর ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝির ঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লেগে এক অপূর্ব স্নিগ্ধতায় আমায় রোমাঞ্চিত করে তুললো। সুষুপ্তি চুপি চুপি কখন এসে আমার চোখে তার নীলাঞ্জন মাখিয়ে গেল, আমি বলতে পারবো না।

শুধু এইটুকু বলতে পারি, সে নীলাঞ্জনের মোহমায়ায় আমি আমার বাল্যের দিনগুলি যেন আংশিকভাবে ফিরে পেলাম। ফিরে পেলাম সেই পরিবেশ—যে পরিবেশের মাঝে আমার মা সেই পুরোণ খাটে—সেই জীর্ণ বিছানায় আমাকে আর জয়ন্তকে নিয়ে শুয়ে থাকতেন।

আমি 'মা-মামণি' বলে দু'তিনবার মাকে আদর করলাম। মা নিজের হাতে তৈরী বড় কাঁথাটা আমার গায়ে দিয়ে কপোলে চুমো খেয়ে নিলেন। তাঁর গণ্ডদেশ বেয়ে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো আমার কপোলে! আমি বিচলিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম: মা, মা-মণি, তুমি কাঁদছো কেন!"

মা চোখ পুছে নিয়ে আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্লেন: তুই তার কী বুঝবি! তুই সকলের এত আদরের আর তোর জন্মদিনে তোর গায়ে একখণ্ড নতুন কাপড়ও আমি দিতে পারলুম না। একী আমার কম দুঃখরে!" দু'হাত দিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে সান্ত্বনার স্বরে আমি উত্তর দিলাম: কেন, মা-মণি! আমার জন্মদিনের জন্য তুমি কেমন সুন্দর কাঁথা তৈরী করে দিয়েছো! বড় হ'য়েও প্রতি বছর জন্মদিনে এই কাঁথাই আমি গায়ে দেবো। তখন কেমন মানিয়ে যাবে!" আমি চুপ করলাম। মাও আর কোন কথা বল্লেন না। মনে হ'লো, তিনি কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছেন। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো মায়ের ডাকে: পার্থ, পার্থ, ওঠ বেলা হ'য়েছে।"

*   *   *

আমি হচকিয়ে উঠে পড়লাম। উঠে পড়লাম চিরপরিচিত এক কণ্ঠস্বর শুনে। সে কণ্ঠস্বর চির বঞ্চিতা মহিমময়ী এক মায়ের। তিনি শুধু আমারই মা নন—সমগ্র দেশের মাতৃসত্তাকে আমি যাঁর ভিতর মূর্ত হয়ে উঠতে দেখেছি। একটু পূর্বেই তিনি আমার পার্শ্বে শুয়েছিলেন। একটু পূর্বেই তিনি আমায় ডাক দিয়ে গেলেন—সে ডাকে আমার সবদেহে এক অপূর্ব ঝংকার খেলে গেল। সে কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেছে, তা জানি। এই জানা-কে পরম সত্য বলে জানলেও, ক্ষণিকের স্বপ্নমায়ায় আমার কাছে তা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হ'তে লাগলো।

কিন্তু সত্য চিরদিনই সত্য। নির্মম বাস্তবের সংগে আঘাত খেয়ে ক্ষণিকের স্বপ্ন মায়া মুহূর্তে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। সারারাত জানালাটা খোলা ছিল। শেষ রাতের হাওয়ায় শীতের পরশটা হয়ত একটু বেশীই ছিল-- সমস্ত দেহ দিয়েই তা অনুভব করলাম। পায়ের কাছ থেকে লেপটাকে টেনে এনে কাঁথাটার ওপর চাপিয়ে দিলাম। রাত্রের বিদায়কালীন ম্লান অন্ধকারে কাঁথাটার রূপ দেখে চমকে উঠলাম। আঁতুড় ঘর থেকে বেরিয়েই মা নাকি আমার জন্য এই কাঁথাটা সেলাই করতে সুরু করে দেন। এটিকে শেষ করতে পুরো একটি বছর তাঁর লেগে যায়। সূঁচের সূক্ষ্ম বাঁধনে জঙ্গলের কত জীব-জন্তুকেই না মা কাঁথাটায় ধরে রেখেছেন!

মায়ের নয়টি সন্তানের ভিতর আমি অষ্টমগর্ভজাত। আমার পূর্বে তিনটি সন্তান শিশুকালেই মারা যায়। তাই জন্মসম্ভাবনার প্রথম থেকেই নানান তুক-তাক করা হয়েছিল আমার কল্যাণে। শুধু মা বা ঠাকুরমার কাছেই নয়, সমগ্র পরিবারের সকলের কাছেই আমার বিশেষ আদর ছিল। শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের মত আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিলেন, বিভিন্ন নামে আমায় ভূষিত করলেন। তাঁদের এতখানি স্নেহের পাত্রকে একই নামে ডাকতে তারা রাজী নন! অষ্টম গর্ভজাত বলে ঠাকুমা রাখলেন পার্থসারথী। ফাল্গুন মাসে জন্মেছি বলে দাদা রাখলেন ফাল্গুনী। এই দুটো নামই কায়েমী হ'য়ে জড়িয়ে রইলো। অন্যগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

প্রতি বছর আমার জন্মদিনে মা এই কাঁথাটা নামিয়ে আমার গায়ে দিয়ে দিতেন। আমি আজকের মত বড় হ'য়ে উঠবো, আমার জন্মের প্রথম দিন থেকেই মা তা কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এতদিন কাঁথাটার কথা মনেও হল না। বাইরের মহান ডাক যাদের ঘর ছাড়িয়ে নিয়ে যায় —ঘরের এমনি কত প্রিয় বস্তুই না তাদের মন থেকে মুছে যায়। বাইরের কাজ শেষে আবার ওরাই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে তোলে। ঘর আর বাইরের এই অচ্ছেদ্য সম্পর্ক কোনদিন আমি অস্বীকার করতে পারবো না। ঘরকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি তার সবটুকুই। তার ন্যায়-অন্যায়, হাসি-কান্না ও সুখ-দুঃখকে সমান ভাবেই। তাই ঘর কোন দিন আমার পথের সামনে প্রতিবন্ধক হ'য়ে দাঁড়ায়নি—মহত্তর কাজের প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়ে ঘর আমায় বাইরের মাঝে ঠেলে দিয়েছে। ক্লান্তি ও অবসাদে যখনই ভেংগে পড়েছি, ছুটে এসেছি ঘরের কাছে—নতুন উদ্দীপনা—নতুন কর্মশক্তি নিয়ে আবার বাইরের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। হয়ত এমনি কোন প্রয়োজনেই বহুদিন বাদে এবার ঘরে ফিরেছি। প্রয়োজন মিটে গেলে আবার চলে যেতে হবে। আসবার সময়ও যেমন দিনক্ষণ বিচার করে আসিনি—যাবার সময়ও তা করবো না। কাঁথাটার কথা যেমনি আমারও মনে ছিল না—তেমনি বড়দিরও না থাকবারই কথা। সম্পূর্ণ অভাবিত ভাবেই আমার জন্মদিনে কাঁথাটি অতীতের স্মৃতির এক পাতা তুলে ধরলো। আমার জীবনের সংগে ওর এক নিবিড় যোগ খুঁজে পেলাম। ওর সূক্ষ্ম কাজ-গুলি জীবন-শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় নিয়েই শুধু ফুটে উঠলো না—মনে হলো, কণ্টকিত পথে চলতে মায়ের আশীর্বাদী অমোঘ এক বর্ম রূপে। আমি কাঁথাটাকে খুব নিবিড় ভাবে জড়িয়ে নিলাম গায়ের সংগে। মা যদি আজ বেঁচে থাকতেন আর এত বড় হ'যে তাঁরই তৈরী কাঁথা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকতেন দেখতেন—তাঁর বঞ্চিত জীবনে ক্ষণিকের জন্যও যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত, সেকথা কল্পনা করেও আমার মনটা পরম খুশীতে ভরে উঠলো। কিন্তু তা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। এমন কী শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার পূর্বেও তাঁর সংগে আমার দেখা হয় নি। অথচ মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে একমাত্র আমারই কথা ছিল: না, ওরা আর আমায় তাকে দেখে যেতে দিলে না! ওদের নিজে-দেরও কী মা নেই!"

মরণোন্মুখ মায়ের এই অন্তরবেদনা শুধু দাদা বা দিদিদেরই বিচলিত করে তোলেনি—পাড়াপ্রতিবেশী আরো যাঁরা মায়ের পার্শ্বে ছিলেন, তাঁদের অন্তরও স্পর্শ করেছিল। এমনি কত মায়ের দীর্ঘশ্বাস—কত জায়ার চোখের জল—কত বোনের অন্তরবেদনা যে ওদের জন্য পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল, ওরা না জানলেও, আমরা তা জানি।
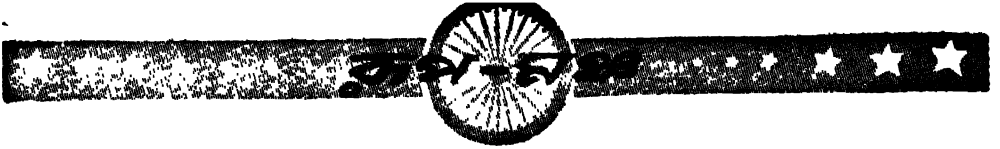
সত্যি, ওদের জন্যই মৃত্যুর পূর্বে মায়ের সংগে আমার শেষ দেখাটাও হয় নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেশ কিছুটা ঘনিয়ে উঠেছে। দেশের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে দেশবরেণ্য নেতাদের ওরা বন্দীশালায় নিয়ে আটকে রাখলো। ওরা সাত সমুদ্দ তের নদী ডিংগিয়ে একদিন এসেছিল এদেশের কৃপাপ্রার্থী হয়ে। ভাগ্যের এমনি পরিহাস—ওরাই একদিন হ'য়ে উঠলো ভারত-ভাগ্য-বিধাতা! প্রথম আগমনের দিনে ওরা আমাদের পদলেহন করে নিজেদের ধন্য মনে করেছিল—আর একদিন ওদেরই কড়া-চামড়ার বুটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠলো আমাদেরই সর্বাংগ। এদেশেরই নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে—এদেশের বুকে ওদের তৈরী গারদখানাগুলি ভরিয়ে তুললো এদেশেরই ছেলেমেয়েদের দিয়ে—যাঁদের চোখে ওদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবার স্বপ্ন—অতীতের ভুল সংশোধন করবার জন্য আত্মবলিদানের দৃঢ়তা নিয়ে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছে! এমনি স্বপ্ন চোখ ফুটবার সংগে সংগে আমারও চোখে ভর করেছিল—এমনি জীবন-পণ করে আমিও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। শত সহস্র মুক্তি সেনানীর মত আমারও দীপ্ত পদক্ষেপে ওদের বন্দীশালা কম্পিত হ'য়ে উঠেছিল।

ওদের শোষণ এবং শাসন দুইই বীভৎস রূপ নিতে লাগলো। ওরা যত অত্যাচার চালায় —আমাদের শক্তি তত বৃদ্ধি পায়। ওরা একজনকে গুলি করে, আমরা দশজনে বুক পেতে দেই। ওরা পাঁচজনকে ধরে নিয়ে যায় - আমরা পাঁচশত জন এগিয়ে যাই। ওরা হাঁপিয়ে ওঠে। এদেশের কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। স্বামী-স্ত্রীর ফিস-ফিসানীও বিরাট ষড়যন্ত্রের রূপ নিয়ে ওদের চোখে ভেসে ওঠে। ওদের শক্ত বুটের আঘাতে স্ত্রী ছিটকে

হুমড়ী খেয়ে পড়ে যায়—স্বামীর দেহ তীব্র কষাঘাতে রক্তাক্ত হ'য়ে ওঠে। কাউকে বিশ্বাস নেই! সব—সব, এদেশের সবাই বিশ্বাসঘাতক—সবাই বেইমান! ওরা নিজেদের ওপরও অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।—হাঃ—হাঃ—হাঃ—বিকট অট্টহাসি করে উঠি আমরা। এইত চেয়েছিলাম! সুনিশ্চিত জয়ের ইংগিত আমাদের মন ভরিয়ে তোলে।

শাসকের অত্যাচারে নগরে নগরে—পল্লীতে পল্লীতে হাহাকার উঠলো। বুভুক্ষিত নরনারীর গগনভেদী আর্তনাদ, —অন্নহীন বস্ত্রহীন নরনারীর নগ্ন ও ক্লিষ্ট মিছিল সহর ও পল্লীর পথে আর নতুন নয়। ওরা দেখে আর মুচকী মুচকী হাসে। কেমন জব্দ! আর চাইবে স্বাধীনতা! কিন্তু ওরা বুঝলো না—এই ভয়াবহতা ওদেরই ধ্বংসের ইংগিত দিয়ে গেল। ওরা সান্ত্বনা পায়—বিশ্বাসঘাতক বেইমানের দলকে না খেতে দিয়ে সায়েস্তা করতে পেরেছে বলে—শত সহস্র নারীর সতীত্ব ওদের লালসাগ্রস্ত সৈনিকদলের কামনার বহ্নিতে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পেরেছে বলে। অসহায় দ্রৌপদীর আর্তনাদ আজ শুধু একজন পার্থসারথীকেই বিচলিত করে তুললো না—একজন গাণ্ডীবীর ধনুকই হুংকার দিয়ে উঠলো না—শত শত গাণ্ডীবীর শত শত গাণ্ডীব জ্যানির্ঘোষ করে উঠলো। শত শত জন শত শত পার্থকে সারথ্য করতে ছুটে এলেন!

সমস্ত দেশের আত্মা প্রতিহিংসার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে আজ। হৃদয় নিয়ে আর ওদের ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। একটা হৃদপিণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে ওদের শত শত হৃদপিণ্ড উপড়ে ফেলে দিয়ে। ধ্বংস করো—বিপ্লবের অগ্নিশিখায় জ্বালিয়ে দাও ওদের শাসনশক্তির মূল উৎসগুলি!

বিয়াল্লিশের গণ-বিপ্লব প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত চতুর্দিক থেকে ওদের পুড়িয়ে মারতে উদ্যত হ'লো—তার রুদ্র রোষে ওদের থানা পুড়ে গেল - বিচারালয় অধিকৃত হ'লো - ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি ধূলিসাৎ হলো—লুণ্ঠিত হ'লো অস্ত্রাগার—আর কম্পিত হ'য়ে উঠলো বন্দীশালা মুক্তি সেনানীর পদভরে। এবারও আমার পদধ্বনি ওদের সংগে সুর না মিলিয়ে পারেনি।
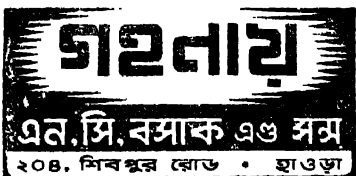
কলকাতাতেই আমি গ্রেপ্তার হই। প্রথম আমায় আটকে রাখলো প্রেসিডেন্সী জেলে। এখানে ইতিপূর্বে আরো আসতে হ'য়েছে। কিছুদিন বাদে নিয়ে গেল হিজলীতে—বদলী করলো মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে। একস্থানে দীর্ঘদিন আটকে রেখে ওরা নিশ্চিন্ত নয়। কী জানি, যদি এখানেও কোন কিছু বাধিয়ে বসি। আবার ঘুরিয়ে আনলো প্রেসিডেন্সীতে। ওদের মর্জি বোঝা দায়! কিছুদিন আত্মীয় স্বজনের কাছে পত্রাদিও লিখতে দেয়নি—আমার সম্পর্কেও তাঁদের কোন কিছু জানতে দেয়নি। আমার সংগে বারবার সাক্ষাতের আবেদন জানিয়েও দাদা সফলকাম হ'তে পারেন নি। প্রেসিডেন্সীতে এসে যতুকাকাকে পেলাম। আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি পত্র লেখা এবং দেখা সাক্ষাতের কড়াকড়িও একটু শিথিল হ'য়েছে দেখলাম। তাছাড়া আমরাও ওদের সেন্সারের কড়া দৃষ্টি এড়িয়ে নিজেদের উদ্ভাবিত উপায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আনাতে লাগলুম। এমনি এক সরবরাহ কেন্দ্রের মুসাবিদিতে যতুকাকার বাড়ী থেকে চিঠি এলো: অর্জুনের মা শীঘ্রই হয়ত বৃন্দাবন যাবেন। ভগবান ভগবান বলেই তাঁর সারা জীবনটা গেল—এ জীবনে ভগবানের সংগে দেখা হ'লো না এই তাঁর আক্ষেপ!" একদিন সুযোগমত চিঠিটি আমায় দেখিয়ে যতুকাকা বল্লেন: তোর মায়ের খুব অসুখ। এই চিঠি পড়েই বুঝতে পারবি: তোকে দেখতে চান। দাদা চেষ্টা করছে নিশ্চয়ই। আর সরকার থেকে অনুমতিও দিতে পারে। তোকে প্রেসিডেন্সীতে ফিরিয়ে আনার এও একটা কারণ হয়ত!"

মায়ের অসুখ সংক্রান্ত কোন সংবাদই আমাকে জানানো হয় নি বরং চিঠি পত্র যা এসেছে, তাতে তাঁর সুস্থতার সংবাদই পেয়েছি। মেদিনীপুর থাকতে একবার এক চিঠিতে সর্দি-কাশীর সংবাদ ছিল—তাতে চিন্তিত হবার কোন কারণই ছিল না। যতুকাকার কাছে প্রেরিত পত্রটি থেকেই মায়ের অসুস্থতার কথা জানতে পারলাম এবং মায়ের জীবন যে সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছে, সেবিষয়েও কোন সন্দেহ রইলো না। চিঠিটির মূল অর্থ যে ভাবে আমরা গ্রহণ করেছিলাম: অর্জুনের (ফাল্গুনীর) অর্থাৎ আমার মা বৃন্দাবন যাবেন অর্থাৎ মৃত্যুমুখ যাত্রী—ভগবান ভগবান বলে অর্থাৎ (পার্থ সারথী, পার্থ সারথী) আমার কথা বলে বলে তাঁর সারা জীবনটা গেল। এ জীবনে ভগবানের সংগে অর্থাৎ আমার সংগে আর তাঁর দেখা হ'লো না—এই তাঁর আক্ষেপ অর্থাৎ দাদা চেষ্টা করে কোন অনুমতি পাননি, তাই মা নিরাশ হ'য়ে পড়েছেন।

মায়ের অসুখ সম্পর্কিত পত্রটি থেকে প্রাপ্ত সংবাদ সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হ'লো যখন ত'চার দিনের ভিতরই মায়ের অসুখের খবর সরকারী ভাবে আমাকে জানানো হলো। আরো ত'চার দিন বাদে আমাকে জানানো হলো—মায়ের অসুখের কথা চিন্তা করে—মায়ের ইচ্ছানুযায়ী সরকার নজরবন্দী অবস্থায় তাঁর সংগে দেখা করবার জন্য আমায় অনুমতি দিয়েছেন। উপসংহারে, সরকার হৃদয়হীন নন বলে সরকারের সহৃদয়তার গুণগান করা হয়েছে। সরকারের এই অনুগ্রহ-বার্তা মা তখনও জীবিত আছেন কিনা, সে বিষয়ে আমার মনে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি করলো। সরকারী নীতি সম্পর্কে বিশেষ ভুক্তভোগী ছিলাম বলেই আমার মনে এ-সংশয় জেগেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমাকে আমার জেলা সহর ফরিদপুরে পাঠানো হ'লো। সেখান থেকে একজন দায়িত্বসম্পন্ন পুলিশ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন পুলিশ পাহাড়ায় আমাকে স্বগ্রামে পাঠাবার ব্যবস্থা হ'লো। আমার মনের অস্থিরতা সরকারী ব্যবস্থার কাছে বার বার আঘাত খেতে লাগলো।

মা কয়েক মাস যাবতই ভুগছিলেন। আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহ এবং মন দুইই ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠেছিল। জরাক্রান্ত হ'য়ে তাঁকে শয্যা গ্রহণ করতে হয়। ধীরে ধীরে নানান উপসর্গ এসে দেখা দেয়। দাদা এবং জয়ন্ত দুজনই তখন কলকাতায়। বহুদিন থেকেই দাদা কলকাতাতে পেট্রোল এবং মটর গাড়ী সংক্রান্ত ব্যবসা করেন। তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করে—জয়ন্তর শিক্ষা সমাপ্ত হবার সংগে সংগে নিজের ব্যবসায়ের একটি দায়িত্বপূর্ণ বিভাগের ভার দিয়ে জয়ন্তকে দাদা কাজে বহাল করেন। মায়ের অসুখ সংবাদ শুনে দাদা গ্রামে

আসেন। চিকিৎসকদের সংগে পরামর্শ করে মাকে কলকাতাতেই নিয়ে যেতে অভিপ্রায় জানান। মা শুনে অবাক হ'য়ে বলেন: পাগল হয়েছিস! এতদিন এই ভিটেয় কাটিয়ে শেষ জীবনে বে-জায়গায় যেয়ে মরবো?"

দাদা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চাইলেন। মা জিদ ধরে উত্তর দেন: ন'বছর বয়সে শশুর ঠাকুর আমায় এই বাড়ীতে আনেন। তোরা এক এক করে সবাই জন্মেছিস এই বাড়ীতে। আমার হাতেই এই ভিটের দায়িত্ব দিয়ে শাশুড়ী নিশ্চিন্তে মরতে পেরেছেন। এ ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারবো না।" এর ওপর কিছু বলা বৃথা মনে করে দাদা চুপ করে থাকেন—মাকে একটু সুস্থ করে কলকাতায় ফিরে আসেন। এমনি ভাবে পালাক্রমে তিনি ও জয়ন্ত মাকে দেখে যেতে থাকেন। মায়ের অসুখ যখন খুবই বৃদ্ধি পায়, দুজনকেই বাড়ীতে এসে থাকতে হয়।

রোগবৃদ্ধির সংগে সংগে আমাকে দেখবার জন্য মায়ের অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইতিপূর্বেও কয়েক দিনের জন্য মাকে দেখে যাবার জন্য আমাকে ছেড়ে দিতে দাদা সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন—কিন্তু তার কোন উত্তরই পাননি। এবারও বাড়ীতে এসে সিভিলসার্জনকে দিয়ে মাকে দেখিয়ে তাঁর অনুমোদন সহ আবার আবেদন করলেন। মাসখানেকের মত কেটে যায় তদ্বির ও আনু-সাংগিক ব্যাপারে। তারপর এবিষয়ে দাদাকে যখন জানানো হ'লো, মায়ের তখন অন্তিম মুহূর্ত।

যে ডাক্তার মাকে দেখছিলেন, তিনি দাদাকে ডেকে জবাবই দিয়ে বলেন: বাঁচবার কোন আশাই নেই—তবু যে ক'দিন

থাকেন এই যথেষ্ট।" জেলা সহরের বড় ডাক্তারও ভিন্ন মত দিতে পারেন না। দাদাও যে মায়ের অবস্থা না বুঝতে পারেন, তা নয়। তবু! তবু যে কথা—তাকে কোন বিজ্ঞান—কোন যুক্তিতর্ক কোন দিন অস্বীকার করতে পারেনি, পারবেও না।

দাদা মায়ের শিয়রে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলাতে থাকেন। মা চমকে উঠে বিকারের ঘোরেই জিজ্ঞাসা করেন: কে, পার্থ? পার্থ এলি!"

দাদা মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে অপরাধীর মত উত্তর দেন: না মা, আমি সব্য! পার্থ এখনও আসেনি। তুমি নিশ্চিন্ত হও—সে এসে পড়লো বলে!"

মা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে উত্তর দেন: আর এসেছে! ওরা তাকে আসতে দেবে না। না দিক! ও আমার মত শত শত মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে জেলে গেছে—সেইতো আমার পরম সান্ত্বনা! আমি ওকে—ওদের সবাইকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি—ওরা জয়যুক্ত হবে। আর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছি তাদের—যারা ওকে, ওদের সবাইকে আটকে রেখেছে। মায়ের অন্তর বেদনা যারা বুঝলো না।"

দাদা - জয়ন্ত -- বড়দি— মেজদি – ছোড়দি— বাড়ীর ও পাড়ার আরো যাঁরা মায়ের শয্যা-পার্শ্বে ছিলেন—মা তাঁদের সবাইকে নাম ধরে ডেকে ডেকে আশীর্বাদ করে গেলেন। দীপশিখা নিবাপিত হবার পূর্বে তার দ্যুতিতে অন্ধকারের বুককে ঝলসে দেবার মত মা সকলের সংগে কথা বলে নিলেন। কথা-শেষে এক অপূর্ব জ্যোতিতে তাঁর রোগ-ক্লিষ্ট মুখের পাণ্ডুরতা অন্তর্হিত হলো। ধীরে ধীরে এমনি ভাবে তিনি চোখ বুজলেন—যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন; ঘুম —সত্যি ঘুম। এ ঘুম থেকে কেউ আর তাঁকে জাগাতে পারবে না। কারোর হাকা-হাকি আর তাঁর কানে যেয়ে পৌছবে না—।

দিদিরা চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। জয়ন্ত—আধুনিক আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত জয়ন্ত—সত্যকে মেনে নেবার মত সবলতা যার মাঝে কোন দিন অভাব হয়নি—সেও বিচলিত না হ'য়ে পারলো না। শিশুর মত কেঁদে উঠলো দিদিদের সাথে। শিশু—হ্যাঁ, শিশু ছাড়া আজও ওকে আর কিছু

আমি ভাবতে পারি না। বয়সের সংগে সংগে ওর মন পাকা-পোক্ত হয়ে উঠেছে—শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাও কম লাভ করেনি। কিন্তু তবু ও আমাদের কাছে আজও শিশু। ও যে আমারই কোলে কোলে—পিঠে-পিঠে বড় হ'য়ে উঠেছে—সেকথা কেমন করে ভুলে যাবো! কোন দিন ভুলতে পারবো না। ওর পেট ভরবে না বলে নিজের মুখের গ্রাস ওর মুখে তুলে দিয়েছি—নিজে অভুক্ত থেকে ওকে ক্ষিদের জ্বালা টের পেতে দেইনি। ওর সমবয়সী ছেলেদের পরণে নতুন নতুন প্যাণ্ট দেখে ও যখন কিনে দেবার জন্য মায়ের কাছে বায়না ধরতো—আর মা নিজের অক্ষমতায় চোখের জলে কাপড় ভেজাতেন—আমি পুরোন কাপড়কে নীলে বা পলাশফুলের রং-এ ছুপিয়ে ওকে নিজের হাতে প্যাণ্ট তৈরী করে দিতাম। আমি হয়ত আমাদের পূবের ঘরের পেছনের জামগাছটার আগডালে উঠে টুবু টুবু পাকা জামের থলিটায় হাত দিয়েছি—কী সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে কাছারী বাড়ীর নেংরা আমগাছটার ডালে ডালে ঘুরে ঘুরে পাকা পাকা আমগুলি দিয়ে কোচর ভরতি কচ্ছি—আমার কানে হয়ত জয়ন্তর কান্না ভেসে এসেছে—সব ফেলে দিয়ে আমি বিদ্যুতবেগে ছুটে গেছি—কতবার যে গাছ থেকে ছিটকে পড়ে হাত পা ছড়ে গেছে, তার ইয়ত্তা নেই। ওকে কোলে নিয়ে আদর করে চুমোয় চুমোয় ওর ফোলা গাল দু'টো রাঙ্গিয়ে দিয়েছি—আর আশ্চর্য, সংগে সংগেই ওর কান্না যেত থেমে। মা-বাপের ও শেষ সন্তান—আমাদের সর্ব কনিষ্ঠ। সংসারের অভাব অনটনের মাঝেই ওর জন্ম। মরুভূমির দিগন্ত প্রসারিত হাহাকার নিয়ে ও জন্মগ্রহণ করে। মায়ের স্তন্যদুগ্ধও ও ওর প্রয়োজন মত পায় নি। দারিদ্রের ঝর মাথায় করে ওর জন্ম—দারিদ্রের সংগে লড়াই করে আমি আর মা ওকে বড় করে তুলেছি। ওর বাঁচবার কোন আশাই ছিল না—ও শুধু বেঁচে উঠেছে পুষ্টিলাভ করেছে—আমার ও মায়ের অন্তর নিঙরানো-নির্যাস পান করে। আজ সেই জয়ন্ত অসহায়ের মত কাঁদছে। আমি তখনও বাড়ীতে যেয়ে পৌছোইনি। নইলে, ওর কান্না দেখে আমিও কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। মৃত্যুর মত সত্যকে গ্রহণ করবার মত সবলতা আমার আছে—কিন্তু জয়ন্তের চোখের জলের কাছে আমি যে কত দুর্বল—তা আমি জানি! আমি ছাড়া আর একজনও জানতেন, কিন্তু তাঁর জানা-অজানা আজ যে ধরা ছোঁয়ার বাইরে!

দাদা নাকি নিশ্চল পাথরের মত হ'য়ে গেলেন। তাঁর চোখে এক ফোটা জলও ছিল না। মুখে ছিল না কথা। এক জায়গায় বসে আছেনত আছেনই। বরাবরই দাদা একটু রাশভারি গোছের। তারপর সংসারের বিরাট দায়িত্ব বয়ে বয়ে তাঁর স্বভাবটাও হ'য়ে উঠেছিল সমুদ্রের মত ধ্যানগম্ভীর। সহসা কোন ধাক্কাই তাঁকে বিচলিত করতে পারতো না। করলেও তার বহিঃপ্রকাশ ছিলনা। দাদার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আত্মীয়স্বজনের জানা থাকলেও, তাঁর তখনকার অবস্থা তাঁদের অনেককেই নাকি চিন্তিত করে তুলেছিল। একথা আমি ছোট ঠাকুরমার কাছ থেকেই পরে জানতে পারি।

মায়ের ইচ্ছানুযায়ী ঠাকুরমার চিতার পার্শ্বে আমাদের পুকুর-পাড়েই মায়ের চিতা সাজানো হয়। পুকুরপাড়ের পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ফাঁকা জায়গায় চিতার আগুন যখন বাতাসের সংগে পাল্লা দিয়ে শিখায়িত হয়ে ওঠে—সে প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখার পানে দাদার নিবদ্ধদৃষ্টি মাঝে মাঝে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তরের বুক বেয়ে প্রসারিত রাস্তাটির মাঝেই ঘুরে ফিরে বেরিয়েছে আমার সন্ধানে। কিন্তু কোন স্থানেই আমি তাঁর দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠিনি।

দাহ কার্য ও আনুষ্ঠানিক বিষয় সমাপনান্তে দাদা কম্বলের আসন বিছিয়ে বড় ঘরের মেঝেতে বসে রয়েছেন—তাঁকে ঘিরে রয়েছেন দিদিরা—জয়ন্ত—আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশী। চিতার আগুন বহু পূর্বেই নিভে গেছে। নিভে গেছে জয়ন্ত ও দিদিদের বাইরের উচ্ছ্বাস। দাবাগ্নীর বেশটুকু ধুক ধুক করে তখনও হয়ত জ্বলছে তাঁদের অন্তরে অন্তরে। তা কী সহজে নিভে যেতে পারে! আর দাদার মনের সংগে মন মেলালে তখন হয়ত জানতে পারা যেত—এক অস্পষ্ট পদধ্বনির জন্য প্রতীক্ষীয়মান একটি মনের সন্ধান!

কিন্তু আমার অবস্থা যে সম্পূর্ণ বিপরীত। পানাসহর থেকে

দীর্ঘপথ পুলিশ-বেষ্টিত অবস্থায় অক্লেশে অতিক্রম করে এসে পুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণের পাড় বেয়ে যখন উঠলাম—কোন এক অদৃশ্য হস্তের নিবিড় আকর্ষণে আমার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর অনুভব করতে লাগলাম—। সমস্ত দেহ অসার হয়ে আসতে লাগলো—মনে হ'লো, যে কোন মুহূর্তে পুকুরের পাড় বে'য়ে আমি গড়িয়ে পড়ে যাবো। গড়িয়ে অবশ্য পড়লাম না। টান আমাকে সামনে নিতেই হ'লো! কেন—যা তা ভাবছি! মা হয়ত আছেন, এখনও আছেন আমার অপেক্ষায়—! কিন্তু মন থেকে কোন সাড়া পেলাম না। পুকুরপাড় থেকে বাড়ী-টাকে রহস্যাবৃত এক নির্জনপুরী বলে মনে হতে লাগলো। মনে হ'তে লাগলো, শোক সমুদ্র মন্থন করে সে যেন আমারই জন্য অপেক্ষা কচ্ছে তার শোক-পাত্রটি তুলে ধরবার জন্য। বকুল গাছ পেরিয়ে বাইরের উঠোনে পা দিতেই বড় আমগাছটার সদ্য কর্তিত শাখার চিহ্ন দেখে শেষোক্ত ধারণাই আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়ে গেল।

আমার আগমনবার্তা ইতিমধ্যেই হয়ত পৌঁছে গিয়েছিল বাড়ীর ভিতর—তাই অনেককেই আসতে দেখলাম। তাঁদের প্রত্যেকের গতিই মন্থর—দৃষ্টি শোকাচ্ছন্ন। আমি কারোর দিকে চাইতেও পারলাম না। মণ্ডপ ঘরের কাছাকাছি যেতেই দাদাকে দেখতে পেলাম সকলের মাঝখান দিয়ে তিনি ছুটে আসছেন। ঝড়ের পূর্বাভাসের মত তাঁর অন্তরের শোকোচ্ছ্বাস যেন তাঁর সর্ব দেহ গ্রাস করেছে—। দাদা যেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পাচ্ছেন না! পারলেনও না—আমাকে বুকের মাঝে সাপটে নিয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। সমুদ্রের হৃদয়াবেগের মাঝে নদীর উচ্ছ্বাসের মত দাদার বুকের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে—আমি আমার অস্তিত্বকেও ভুলে গেলাম। নির্মম শাসক গোষ্ঠীর হৃদয়হীনতার পরিচয় বহন করে যে পাথরের মূর্তিগুলি আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল—তাদের চোখ দিয়েও টস টস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

একটু বিশ্রাম করে মায়ের সদ্য নির্বাপিত চিতায় যেয়ে আমি প্রণাম করে আসি।

* * * *

রাতের শেষ হ'য়ে এলেও—শেষ তখনও হয়নি। কুয়াসা-চ্ছন্ন অন্ধকারও কেটে যায়নি। পাখীর কলকাকলী তখনও ভোরের আগমন-বার্তা জানিয়ে দেয়নি। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। কাঁথাটাকে গায়ে জড়িয়ে পূবদিকের দরজাটা খুলে বেড়িয়ে পড়লাম। রাত্রি ও প্রভাতের উদ্বাহলগ্নের ঝির ঝিরে হাওয়া আমার গায়ে এসে লাগছে। মাথার বিচ্ছিন্ন চুলগুলিতেও আমি তার শীতল পরশ অনুভব কচ্ছি। খালি পায়ে পুকুরপাড়ের ঘাসে-ঢাকা অপরিচ্ছন্ন রাস্তা বেয়ে আমি মায়ের শ্মশান ভূমিতে এসে উপস্থিত হলাম। তালগাছটার গোড়া বেয়ে ওঠা ঝাকড়া কুলগাছটায় তখনও খানিকটা অন্ধকার আটকে ছিল—ঘাসে ঢাকা শ্মশানভূমির ওপর স্তিমিত আলো এসে পড়ে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আলো-ছায়ার এই নিস্তব্ধ খেলার মাঝে প্রকৃতির এক রহস্যময় রূপকে যেমনি আমি একান্তে অনুভব করলাম—তেমনি অনুভব করলাম, শ্মশান ভূমির রহস্যের মাঝে চির নিদ্রায় শায়িতা আমার মাকে। শ্মশান ভূমির বেদীমূলে নত জানু হ'য়ে আমার সমস্ত দেহ ও মন দিয়ে মায়ের অস্তিত্বকে অনুভব করতে যেয়ে আমিও শিশুর মত কেঁদে না উঠে পারলাম না। শ্মশানের বেদীকে উদ্দেশ্য করে আমার অজান্তে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হ'তে লাগলো: মা, মা-মণি, এই দেখ, আজও আমি আমার জন্মদিনে তোমারই তৈরী কাঁথাটা গায়ে দিয়েছি—তুমি দেখতে পাচ্ছত? বল! সাড়া দাও!! দাও, সাড়া!!!"

(ক্রমশঃ)

আধুনিক গানের কথা

ইলা মিত্র

নিজের প্রবহমান জীবনের ব্যথা বেদনা—বাসনা কামনার জটিল গ্রন্থিগুলিকে যখন উন্মোচন করে নিজেকে মুক্ত করে মেলে ধরি, তখন সমস্ত সুখ-দুঃখকে সুর দিয়ে অনির্বচনীয় করে তুলি—এই অনির্বচনীয়তাই সংগীত, এই সুরই প্রাণের সুর। এ প্রাণের সুরকে যেমনি বিশ্লেষণ করে বলা চলে না, তেমনি গানের ভাল লাগার কথা নিয়ে জোর করে কিছু বলা ও চলে না।

তবু গান সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলা যায় যে, সব মানুষের গানের একটা বিশেষ অনুভূতি আছে। যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের মর্ম ই যদি কোন শ্রোতা হৃদয়ংগম করতে পেরে সে গানকে নিজের সংগে মিলিয়ে নিজের করে শুনেন, তবে তার অবশ্যই মনে হবে, এ গান আমারই কথা। রবীন্দ্র সংগীতের বৈশিষ্ট্য—তাঁর গানের মধ্যে আমরা নিত্য দিনের মালিন্যকে পাই না—পাই অনিত্যের সন্ধান। পাই চির আকাঙ্খিত অনির্বচনীয়তার পূর্ণ উপলব্ধি। তাইত এই সংগীতের কাল নেই, যুগ নেই, মানুষের বিকশিত বুদ্ধি ও অনিয়ন্ত্রিত রুচির অনেক উর্ধ্বে কবিগুরুর সংগীত। বলা বাহুল্য, সকল সংগীতেই আমরা আশা করবো মানসিক পরিণতির—যে পরিণতি আমার সমস্ত সত্তার আকুলিত ক্রন্দন অথবা আনন্দাশ্রু। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, এই শব্দ বিন্যাস এই অনির্বচনীয়তার প্রতি যে আকর্ষণ গানের প্রাণ, একথা আজকের দিনে আধুনিক গান শুনে মনে করবার কিছু নেই। গানের কথা যে একটা প্রয়োজনীয় বস্তু একথা আমরা সবাই ভুলতে বসেছি। আধুনিক গানের কোন ইতিহাস নেই। কারণ, আজকের দিনে যেটা আধুনিক, কালকের দিনে সেটা অতীত। কোন মতেই তাকে আধুনিকের পর্যায়ে ফেলা যায় না অন্ততঃ আধুনিক কথাটার আভিধানিক অর্থ এই। কিন্তু গানের ইতিহাস আছে, তার উদ্দেশ্য আছে, আছে প্রয়োজনীয়তা গানের ইতিহাসের মর্মকথা এই যে, সংগীত চায় মানব জীবনের সত্যকে কল্পনাতীত সুন্দরকে, অনুভূতির প্রগাঢ়তাকে সুরে, ভাষায়, দরদে অন্তরিক করে তুলতে। যে চাঁদকে একাধিকবার দেখেছি, যে ফুলকে নিত্য দেখি—যে বিচ্ছেদ বেদনায়, মিলনের আন্তরিকতায় আমার প্রাত্যহিক জীবন সুসম্পূর্ণ, তাকে ছন্দে, সুরে ভাষায় প্রকাশ করে গান গাই। মাঝ নদীতে ঝড় উঠেছে—মাঝির কণ্ঠের অপূর্ব ভাটিয়ালীতে সেই কালো জলের—আঁধার আকাশের রূপকে দেখতে পাচ্ছি, আকুলিত শ্রীরাধার বিরহ সংগীত কীর্তনের সুরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে, নানাভাবে রচনার মাধুর্যে, সুরের অভিনবত্বে সংগীত হয়ে উঠে মর্মকথা। গানের ইতিহাসের এই উপাদান—গানের এই উদ্দেশ্য আর গায়কেরও সাধনা এই উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলা। এক্ষেত্রে আরো একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, সংসারে প্রয়োজনীয় গানের কি প্রয়োজন নেই! "প্রয়োজনীয় গান" কথাটার প্রকৃত অর্থ এই যে, আধুনিক গান হবে যুগধর্মী। যেহেতু গানটি আধুনিক, সেই হেতু তাকে যুগের ছাঁচে ফেলে রচনা করতে হবে। এইখানেই আমাদের আপত্তি। সাহিত্য যুগধর্মী হলে তাকে অনায়াসে বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু গানে যদি এই যুগধর্মের ছোঁয়াচ একেবারে জীবন্ত সমস্যা হ'য়ে রচিত হয়, তাহলে শ্রোতা হিসাবে আমি একেবারেই নারাজ এবং অনুমানে মনে হয়, সংগীত সমালোচক ছাড়া সংগীত রসিকটি ও বিব্রত হবেন। কিছুদিন আগে দুটি গান শুনেছিলাম।

'অঞ্জনগড়' চিত্রে শ্রীমতী অমিতা।

একটি বেতার মারফৎ আর একটী রেকর্ড মারফৎ। একটী গানের কথা "আমলকী বনে তুমি এসেছিলে" অপরটি "অন্ন চাই, বস্ত্র চাই"। প্রথমটি শুনে মনে হয়েছিল, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ফলে দেশে বোধ হয় কৃষির সুযোগ সুবিধার জন্যে সব ফুলের গাছ ছাঁটাই করে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযোগী এ হেন কষা ফলের গাছ লাগান হয়েছে আর প্রিয়া তাই এই গাছের তলায় প্রিয়র প্রতীক্ষায় রত। আরো মনে হল, আধুনিক গানে বোধহয় এবার থেকে কাজের কথা ভিন্ন অন্য কোন থাকবে না। বলা বাহুল্য, গায়িকার সুকণ্ঠের আবেদনের সংগে গানের কথার মিল না থাকায় আরো শ্রুতিকটু লাগছিল। পল্লী সংগীতের অতি সাধারণ ভাষায় বাউল গানের গ্রাম্য রচনায়ও এ বনের নাম শুনিনি. কুঞ্জবন, কদমতলা নেহাৎ শিবের গাজনে ভাটী ফুল কিংবা আকন্দের নাম শুনেছি। এবার দ্বিতীয় গানটীর কথা ক'টি শুনে স্বভাবতই মনে হয়েছিল, বাংলার পল্লী সেবা সমিতি অথবা মেদিনীপুর বন্যা বিধ্বস্ত অঞ্চলের চাঁদা চাওয়ার গান। কিন্তু ভুল

ভেংগে যাবে সুর আর বাদ্যযন্ত্রের বাহবা শুনে। তাদের সংগে থাকে একটা হারমোনিয়ম, করতাল, খোল আর একাধিক মোটা সরু প্রভৃতি কণ্ঠস্বরের মিশ্রণ। সুরটা মিনতি, আবেদন, করুণা-ভিক্ষা তদুপরি সমবেত মিছিলের দুর্দশা নিবেদন।

অন্ন চাই, বস্ত্র চাই এ দাবী আমাদের দশজনেরও, এ চাহিদা সর্বলোকের, সব যুগের আর এই চাহিদাকে যদি আধুনিক গানেই রূপ দিতে হয়, তাতেই বা আমাদের আপত্তি করলে যুক্তি কোথায়? তর্কের যুগে এ নিয়ে আমাদের তর্ক নয়, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব বিন্যাসে আর সুর সংযোজনার সামঞ্জস্য কোথায়? এই অসংগতি আর অসামঞ্জস্য শুনে হাসতে হয়, সুরকার আর রচয়িতা দুজনকেই দোষ দিতে হয়। আধুনিক গান গাইবার পক্ষে স্বাধীনতা থাকবে, art মাত্রেই এ স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া যায় কিন্তু এই অদ্ভুত স্বাধীনতা এই বৈষম্যকে কোন মতেই স্বীকার করে নিতে পারিনে। রচনায় চাঁদের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালালেও আমরা আপত্তি করব না কিন্তু গ্রহণ করব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। আধুনিক গানের শব্দবিন্যাস সম্বন্ধে আধুনিক রচয়িতাদের আর একটু বিচক্ষণ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়া দরকার একথা আমরা অতি সাধারণ লোক হয়েও ইদানীং উপলব্ধি করছি। আধুনিক গানের Standard নির্ণয় করলে আমরা দেখব, তার কোন Standard ই নেই। এদিকে বাংলার যে গান, যার মূর্চ্ছনা একদিন বাংলা দেশকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, সেই বাউল, পল্লী সংগীত, লোক সংগীত ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেই প্রাণবন্ত, সজীব, বলিষ্ঠতাময় আবেদন গায়কের কণ্ঠে যেমন নেই, তেমনি আজকের গান রচনায় সে বৈশিষ্ট্য নেই। এককথায় বলা চলে আধুনিক গানের এই সব ভুল ভ্রান্তি আমাদের সহ্যের অতীত। আধুনিক গানের কথা নিয়ে আমাদের একাধিকবার দোষারোপ করবার অধিকার আছে কিন্তু এই সব চোস্ত সুর সংযোজনার, এই খেয়াল খুশীর তাড়না থেকে আমরা মুক্তি পাব কিনা—পেলেও তা কতদিনে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সংগীতপিপাসু ও রসিকশ্রোতার কর্ণকুহরে 'আধুনিক' কথাটা এর পর থেকে আরো কি আশংকার সৃষ্টি করবে, জানিনা।

[রস-রচনা]

শ্রীসনৎ কুমার মৌলিক

নেমন্তন্ন! নেমন্তন্ন! নেমন্তন্ন!

প্রকাশ বটব্যালের ছেলের অন্নপ্রাশন—তাই নেমন্তন্ন। প্রকাশের বন্ধুদল খাইতে গিয়াছে। সকলেই মনোযোগ সহকারে খাইয়া যাইতেছিল, এমন সময় জ্ঞানেন এক হাঁড়ি রসগোল্লা শেষ করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল: "আরো দাও। আরো দাও!" পরিবেশক দ্বিতীয় হাঁড়ি হইতে জ্ঞানেনকে দেওয়া সুরু করিল। বন্ধুদের মধ্যে একজন বলিল: "আর দিওনা। ও আবার পেটরোগা।" একথা শুনিয়া জ্ঞানেন একেবারে রাগিয়া আগুন। প্রকাশ বলিল: "খেতে ওকে বাধা দিওনা।" বটব্যালের বাড়ীতে সাড়া পড়িয়া যায়। বাড়ীর মেয়েরা সবাই তাহার খাওয়া দেখিতে ছুটিয়া আসে। জ্ঞানেন একটার পর একটা রসগোল্লা গিলিতেছে আর বলিতেছে: "আরো দাও। আরো দাও!"

বিজয়ী বীরের মত পনেরো মিনিটের মধ্যে দুই হাঁড়ি রসগোল্লা সাবাড় করিয়া একটা বিকট ঢেকুর তুলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

বন্ধুদের মধ্যে যাহাকে কেহ কোনদিন মানুষ বলিয়া গণ্য করে নাই, বিউটি কম্পিটিশনে যে জিরো পাইবে, হেলথ একজামিনে যে ডিসকোয়ালিফাইড্ হইবে সেই জ্ঞানেন কিনা নেমন্তন্ন বাড়ীতে হিরো সাজিয়া বহু নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফেলিল! অন্য নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলিবার কিছুই ছিলনা কিন্তু কথা হইতেছে যে, সে মিস সুফলা বটব্যালেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে।

যাহার কৃপাদৃষ্টির জন্য প্রকাশের বন্ধুদের বড়ুয়া সার্ট, চুড়ীদার পাঞ্জাবী, জহর কোট, হারমোনিয়া গেল, আর সামান্য রসগোল্লা- পেটুক জ্ঞানেন অঘটন ঘটাইয়া ফেলিল। বন্ধুরা জ্ঞানেনের উপর ঈর্ষায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল।

পরের দিন বন্ধুরা জ্ঞানেনের মেসে যাইয়া উপস্থিত। জ্ঞানেন চিৎ হইয়া শুইয়া পেটের ওপর কোল বালিশ লইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছে:

"আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসিব
তুমি অবসর মত বাসিও।"

জ্ঞানেন গান গায়! পেটুকটা আবার গায়ক হইয়াছে নাকি! ইয়ার উইটনেস্!

অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। বন্ধুদের মধ্যে একজন বলিল: "মেসে এসে হোমিওপ্যাথি খেয়েছিলি তো?" জ্ঞানেন বলিল: "না—রে, আমার অবস্থা:

"খেয়ে চিৎ
শুয়ে কাৎ
উপুড় হোয়ে কাটাই রাত।"

বন্ধুদের মধ্যে আর একজন বলিল: "কালকে নেমন্তন্ন বাড়ীতে অত উৎসাহ কোত্থেকে হোল?" জ্ঞানেন বত্রিশ পাটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল: "এমনি তো ভাই, কেউ ফিরেও তাকায় না। তাই একবার চান্স পেয়ে পার্টস্ দেখিয়ে আকর্ষণ করলাম।" এইটুকু বলিয়া গলাটা ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল: "বিশ্বাস কর, সত্যি বলছি মিস সুফলা আমার দিকে তাকিয়েছিল।" জ্ঞানেন ঘাড়টা বাঁকাইয়া পুলকে একটা অদ্ভুত ভংগী করিল। তারপর সে বলিতে আরম্ভ করিল: "জানিস, এই বটব্যাল ফ্যামিলির মত প্রগ্রেসিভ ফ্যামিলি বাংলাদেশে একটাও নেই। আর প্রকাশ নিজে লাভ ম্যারেজ করেছে। বড়বোন লাভ ম্যারেজ করেছে। মেজবোনও লাভ ম্যারেজ করেছে। বাকি আছে ছোটজন আমাদের এই মিস সুফলা। দেখিস বলে রাখলাম, সেও লাভ ম্যারেজ করবে।"

মিস সুফলা যে লাভ ম্যারেজ করিবে সে বিষয়ে বন্ধুদের কাহারও কোন সন্দেহ নাই। এখন কোন ভাগ্যবান যে সেই বরমাল্য পাইবে, তাহাই ছিল তাহাদের চিন্তার বিষয়।

ছয়মাস পরের কথা। বিনামেঘে বজ্রাপাত। প্রকাশ এই-মাত্র সংবাদ দিয়া গেল যে, মফঃস্বলের একজন ছেলের সহিত তাহার ছোট বোন সুফলার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং এই বিবাহ বিনা প্রেমেই হইতেছে।

এই নিদারুণ দুঃসংবাদে প্রকাশের বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ অন্ধ হইয়া গেল, বোবা হইয়া গেল, বধির হইয়া গেল, অজ্ঞান হইয়া গেল। উন্মাদ হইয়া গেল। (সবাই অবশ্য পাঁচ মিনিটের জন্য)।

জ্ঞানেন চিরদিনের জন্য রসগোল্লা খাওয়া ত্যাগ করিল!

রাঙা জবা

[বড গল্প]

বিমলাশঙ্কর দাশ

কিঙ্কিণী নদীর সংকীর্ণ খাল। খালটা এখন দেখাইতেছে যেন, সবুজ একটি আঁকা-বাঁকা পথ। শীতের সুরুতেই খালের জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছিল। তেজেশ সেখানে লাগাইয়াছিল কলমী শাক। অতি সামান্য জিনিষ এক এক সময়ে অসামান্য সৌন্দর্য প্রকাশ করে। গ্রীষ্মের এই চাঁদনী রাতে সবুজ কলমী শাক ভরা খালটির উপর জ্যোৎস্নালোক এমন একটি অসামান্য রূপ গ্রহণ করিয়াছিল যে, মনে হইতেছিল যেন একটি আঁকা বাঁকা সবুজ পথ দুই পাশের সবুজ ঝোপগুলির মধ্য দিয়া অনন্তের পানে চলিয়া গিয়াছে।

খালের উঁচু বাঁধের উপর সাইকেলটা রাখিয়া তন্ময় হইয়া ইহাই দেখিতেছিল তেজেশ। রোজই এই সময়টা সে দেখে। অনেক পয়সা খরচ ও কঠিন পরিশ্রম করিয়া সে এই খালটাতে কলমী শাকের চাষ করিয়াছে। রাত্রে কোন দল-ছাড়া গৃহ-পালিত পশু যদি গৃহের পথ খুঁজিতে খুঁজিতে খালের খাদ্যে পেট ভরাইয়া ভোর পর্যন্ত কাটাইয়া দেয়,তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ কত হইবে ভাবিয়া তেজেশ আশংকিত হয়। তাই, সে রাত্রে দুই একবার পাহাড়া দিতে আসে। পিছনে হঠাৎ কে ডাকিল,—বাবু!"

: কি রে জবা যে? তুই, এখানে কি করছিস?"

তেজেশ ঘারটা ফিরাইয়া এই কথা কহিল। আসিয়াছিল সাঁওতালদের মেয়ে জবা। জবাকে এ সময়ে এখানে দেখিয়া খুব বিস্মিত হইল তেজেশ। সাঁওতালদের এই সুশ্রী মেয়েটিকে এ অঞ্চলের সকলেই চিনিত। সাঁওতালদের মেয়ে হইয়াও সে গৌরাঙ্গী। এই ব্যাতিক্রমের কারণ জানিতে হইলে তাহার জন্মের ইতিহাস জানিতে হয়। কিন্তু সে ইতিহাস সকলেই সহজ ভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন সকলেই শুধু জানে যে, সে মাণিক পাড়ায় যেখানে নূতন সরকারী আশ্রয় গৃহ নির্মাণ হইতেছিল, সেখানে এক মুসলমান ঠিকেদারের অধীনে এক রাজ-মিস্ত্রীর সংগে কামিনের কাজ করে। সারা দিন চূণ বালি-সুরকী মাখিয়া দিনান্তে যখন এই ধুলি-ধুসরিত তরুণীটি কণ্ট্রাক্টারের ট্রাকে চড়িয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে মহাতাবপুরের সাঁওতাল বস্তিতে আসিত, তখন কাহারও মনে হইত না যে, তাহারও বুকের মধ্যে দুঃখের মত একটা অনুভূতি আছে। তেজেশ প্রশ্ন করিল: কি রে! আজকাল কি তুই কণ্টাক্টারদের কাজ ছেড়ে দিয়েছিস।"

: হঁ্যা বাবু, উ কাজ আর করব নাই।"

তেজেশ জানিত যে, যাহারা জবার মত খাটিয়া খায় তাহারা এক জায়গায় কাজ ছাড়িয়া আর এক জায়গায় ধরে। তবুও জবার কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত হইল তেজেশ। কারণ, সে জানিত জবা শুধু খাটিয়া খাইবার জন্যই কাছাকাছি অন্য কোন রাজমিস্ত্রীর সহিত কাজে না লাগিয়া দূরে মাণিকপাড়াতে কেন খাটিতে যায়। তাই, তেজেশ জবাকে জিজ্ঞাসা করিল: কেন রে, কি হ'ল আবার? বেশত মজুরী পাচ্ছিলি ওখানে?"

: মিস্ত্রী আর কাজে লাগায় নি ত সেখানে আর যাব কেনে?"

: কেন, লাগায় নি কেন? কাজ ত এখনও শেষ হয় নি।"

তেজেশ এই কথা বলিয়া জবার আরও কাছে আসিল। তাহার পর জবা তাহার নিজের ভাষায় ভাঙা ভাঙা বাঙলাতে যাহা বলিয়া গেল, তাহার অর্থ খুব প্রাঞ্জল। কণ্ট্রাক্টারের হেড রাজমিস্ত্রী এখন আর তাহাকে সর্দারনী করিয়া রাখিতে চাহে না। সে মংলীকে সর্দারনী করিয়াছে। এখন তাহার সামনে সময়ে সময়ে জবাকে অপমান করে! জবা তাই চলিয়া আসিয়াছে। জবার কথা শুনিয়া তেজেশ বুঝিতে পারিল না ইহা সত্যই জবার মর্যাদাহানির ক্ষোভ না নারী-সুলভ অভিমান। কিন্তু মনস্তত্ত্বের সমস্ত সমস্যা দূর করিয়া জবা হঠাৎ বলিল: আমাকে একটা টাকা ধার দিবি বাবু, খেটে শোধ করে দোব। তেজেশ মনিব্যাগ বাহির করিয়া একটা টাকা দিয়া বলে: কাল মহাতাবপুরের ক্ষেতে আমার কাজে লাগিস্।"

টাকা লইয়া ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া যায় জবা। তাহার পিছনে মন্থর গতিতে মহাতাবপুরের দিকে চলে তেজেশ। জবার
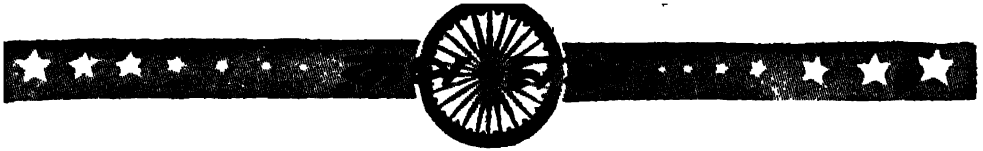
কথা ভাবিতে ভাবিতে একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে! জবা খুব বিশ্বাসী মেয়ে। সে আর যাহাই করুক, চুরি করে না। তেজেশেরও একজন বিশ্বাসী লোক দরকার। কলমী ক্ষেতে পাইকাররা শাক কিনিতে আসিয়া যখন শাক কাটিয়া আঁটি বাঁধে, তখন তাহারা খুব মোটা করিয়াই বাঁধে। তাহাতে তেজেশের খুব ক্ষতি হয়। জবার মত একজন বিশ্বাসী মেয়ে রাখিলে তাহার নজরে আঁটিগুলি সমান ভাবে বাঁধা হইত। কথাটা মনে পড়া মাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিল তেজেশ। সে তাড়াতাড়ি সাইকেল চড়িয়া পা' দুইটাকে ওঠা নামার কাজে লাগাইয়া দিল। তাহাকে এখনও তাহার আরও দুইটা বাগানে যাইতে হইবে। সহরের পাশে কৃষ্ণপুর আর শ্যামচাঁদপুরের এই দুইটা বাগানে যে সব্জী উৎপন্ন হয় তাহা খাইয়াই সহরের অর্ধেক লোক বাঁচিয়া আছে। আর তেজেশ তাহারই মুনাফা খাইয়া আনন্দে মনে মনে বলে,—'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী—তদর্ধং কৃষিকর্মণি।'

জবা তেজেশের ক্ষেতে কাজে লাগিয়া ক্রমশঃ মনিবের সুনজরে পড়িয়া গেল। মাথায় মাটির ঝুড়ি লইয়া প্রখর রৌদ্রে পরিশ্রম করিতে করিতে দুই একটা পরিহাসও শুনিতে পাইল। তাহার পর তাহার বসবাসের ও তেজেশের ক্ষেত পাহাড়া দিবার জন্য ক্ষেতেরই এক পাশে উঠিল পর্ণ কুটির। তেজেশই সব করিয়া দিল।

এই লইয়া সাঁওতাল পাড়ায় খুব সোর-গোল সুরু হইল। ঝুমরো সর্দারের ঘরে বসিল সাঁওতালদের বৈঠক! জবাকে তাহারা সেখানে ডাকিয়া পাঠাইল। জবা আসিল না। আসিল তেজেশ। সর্দারকে এক পাশে ডাকিয়া চুপি চুপি অনেক কথা কহিল। তারপর তাহার হাতে গুঁজিয়া দিল দুই খানি দশ টাকার নোট। সেদিন রাত্রে সর্দারের ঘরে শোনা গেল জংলী গানের সুরের সংগে মাদলের অবিশ্রান্ত আওয়াজ, মাতালের হাসি আর মোরগের আর্তনাদ। জবাও শেষ পর্যন্ত সেখানে আসিয়া জুটিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হইল যে, জবা যেমন তেজেশের ক্ষেত পাহাড়া দিবার জন্য তেজেশের পর্ণকুটিরে আছে দিনের বেলাটাও তেমনি ভাবেই থাকিবে। তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। কিন্তু, রাত্রে তাহাকে বস্তিতে আসিয়া থাকা চাই। সে সেখানে অন্য কাহারও ঘরে না থাকিতে চায় ত সর্দারের ঘরেই থাকিতে পারে। জবার ইহাতে রাজী হওয়া বা না হওয়ার কিছুই ছিল না। কারণ, তেজেশ তাহাকে অনেক আগেই এ সব পরামর্শ দিয়াছিল। তেজেশ লাঠি না ভাঙিয়া সাপ মারিতে জানে। তাহা না জানিলে এত বড় একটা ব্যবসা চালাইয়া ক্রমশ বড়লোক হইতে পারিত না।

যখন সে লেখা-পড়া ছাড়িয়া পৈতৃক বাগানটার সংস্কার করিবার কাজে এক মনে লাগিয়া গেল, তখন তাহার বন্ধু বনবিহারী মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র, তাহাকে ডাক্তারী পড়িতে বলিয়াছিল। তেজেশ তাহাতে কিছুতেই রাজী না হইয়া বলিয়াছিল, "দেশে আর একজন খুনী বাড়িয়ে লাভ কি?"

"মানে, কি বলতে চাও তুমি?"

"মানে, বলতে চাই যে, ডাক্তার হওয়া মানে খুন করার লাইসেন্স নেওয়া।" বনবিহারী তেজেশকে 'পাগল' বলিয়া গালি দিয়াছিল। সেই বনবিহারী একদিন ডাক্তারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিল। তখন যুদ্ধ কেবল সুরু হইয়াছে। ঔষধ দোকানগুলিতে ঔষধ পাইতে হইলে পাক্কা চোরা কারবারী হইতে হয়। বনবিহারী একটা যুদ্ধের চাকরী লইয়া ইরাণ বা ইরাকে চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু, তাহা না করিয়া সে দেশে ফিরিয়া আসিল ও সর্বপ্রথম তাহার বাল্যবন্ধু তেজেশের খোঁজ করিতে গেল।

তেজেশের দিনগুলি কাটিতে ছিল ভালই। ভোর ৫টায় সে বাহির হইয়া পড়ে মজুর ধরিতে। কৃষ্ণপুর ও শ্যামচাঁদপুরের সাঁওতাল বস্তিতে তখনও মজুরদের চোখে লাগিয়া থাকে তন্দ্রা—কাহারও কাহারও মুখে শালপাতার চোরট বা চুটা। তেজেশের সাইকেলের বেলটা সাঁওতালপাড়ার সামনে ক্রিং ক্রিং বাজিয়া উঠে। সাঁওতাল পল্লীতে সাড়া পড়িয়া যায়। মেয়ে ও পুরুষ দিনের কাজে লাগিবার জন্য ছুটিয়া আসে।

কেহ বা নিযুক্ত হয় কৃষ্ণপুরের বেগুন ক্ষেতে কোদাল পাড়িতে, কেহ বা শ্যামপুরের আখ-বাড়ীতে আর কেহ বা কিঙ্কিনী নদীর পাল-ভূমিতে যায় শশার ক্ষেতে জল ঢালিতে। ইহাদের এক একটা পাড়ায় এক একজন
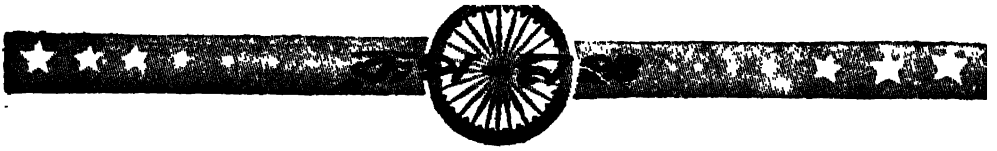
মোড়ল আছে। কৃষ্ণপুরের মোড়ল খুব বুড়া ও খুব রসিক। কিন্তু, তাহার রসিকতার পট ভূমিকায় ফুটিয়া উঠিত একটি করুণ চিত্র। কেন যে সে জবাকে কাছে রাখিতে চায় তাহার একটি করুণ ইতিহাস ছিল। বুড়ার একটি মাত্র মেয়ে ছাড়া আর কেহ নাই। সেও আবার সম্প্রতি পিতাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার পর বুড়ার মাথার চুল গুলা আরও সাদা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, সে রসিকতা ছাড়ে নাই। যখন সে নেশা করে, তখন তেজেশকেও তাহার ছড়া শুনিতে হয়। ঝুমরো মাথা দুলাইয়া বলে,—

কলিকালের বিধাতা কার্পণ্যের বশ:
কলা গাছে না দিয়া আউখে দিল রস।
—কুমড়াতে না দিয়া, দিল শরিষার ভিতর তেল,
(আর) কাপাশ বিচা ভরিয়া দিয়া নষ্ট কৈল বেল"॥

সব্জী ক্ষেতের মালিক তেজেশ ছড়া শুনিয়া ভাবে,—"তাইত, বিধাতা পুরুষ কলাগাছের মত নরম ও মোটা গাছে মিষ্টি রস না দিয়ে আখের মত সরু ও শক্ত গাছে তা দিলেন কেন?" কিন্তু তেজেশের বেশী ভাবিবার সময় নাই। তাহাকে সকাল বেলা এই মজুর নিযুক্ত করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আরও অনেক ব্যবস্থা করিতে হইবে। সে তাই বুড়ার ছড়া থামাইয়া বলে,—আচ্ছা বুড়ো, কথাটা তোমার মেনে নিলাম—কলিকালের বিধাতা খুব কৃপণ এখন, মাতি কোথায় কাজ করে বলত?" কন্যা মাতির নাম কানে যাওয়া মাত্রই পিতা বলিতে সুরু করে,—বিচার কর বাবু, উয়ার বিচার কর। উয়ার কথা আমি আর জানি নাই।"

মাতির প্রসংগ উঠিলে ঝুমরো এখন এই কথাই বলে। কথাটা শুনিয়া শুনিয়া তেজেশের সহ্য হইয়া গিয়াছে। পর পর দুইজন স্বামী পরিত্যাগ করিয়া মাতি এখন যাহার কাছে থাকিয়া আবার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছে, ঝুমরো সর্দার তাহাকে মোটেই পছন্দ করে না। এ সব ব্যাপারে বুড়া কিছু টাকা-পয়সার প্রত্যাশা করে। বুড়া বেশী খাটিতে পারে না বলিয়া বেশী পরমুখাপেক্ষী। কিন্তু মাতির এই হবু স্বামীটি বুড়াকে মোটেই আমল দেয় না। তাহারই বিচার। তেজেশ বলে, আচ্ছা, সে হবে খন।" ঝুমরো চলিয়া যায়, তেজেশও সাইকেলে চড়ে।

বনবিহারী তেজেশের বাড়ী গিয়া শুনিল যে, সে বাগানে আছে, ফিরিবে রাত্রি দশটায়। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। বনবিহারী তাহার মোটর বাইকটা মহাতাবপুরে তেজেশের বাগানের দিকে ছুটাইয়া দিল। বাগানে যখন পৌছিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। তেজেশের সব্জি ক্ষেতের মজুররা মজুরী লইয়া চলিয়া গিয়াছে। তেজেশ হিসাবের খাতা লিখিতেছিল। জবা উনোনে একটা হাড়িতে কি গরম করিতেছিল। বাগানের গেটের সম্মুখে মোটর বাইকের শব্দ-শুনিয়া তেজেশ ও জবা একটু সতর্ক হইল। বনবিহারী উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "ঘটোৎকচ"! বাল্যকাল হইতেই তেজেশ খুব হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ। শিশু অবস্থায় তাহার নাদুস্-নুদুস্ গোলগাল শরীরের উপর ছোট মাথাটি দেখিয়া তাহার দাদা মহাশয় নাম দিয়াছিলেন, —"ঘটি।" স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় সেই খবর পাইয়া নামের সহিত আরও অলঙ্কার দিয়া ডাকিতেন, —ঘটি! ঘটোৎকচ! তাহার পর হইতে বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে ঐ নামেই ডাকিত। এই অনার্য নামটা যখন তাহার রাখা হইয়াছিল তখন তেজেশ জানিত না যে, অনার্য লইয়াই তাহাকে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে হইবে আর এই অনার্যা জবাই হইবে তাহার জীবন-সংগিনী। কিন্তু, এতকাল পরে বাল্যবন্ধুর কণ্ঠে "ঘটোৎকচ"! ডাক শুনিয়া তেজেশ যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, জবা তেমনি বিব্রত হইল। সে তাড়াতাড়ি পিছনের দরজা দিয়া চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বনবিহারী শুধু তাহার সাড়ীর আচলটা দেখিতে পাইল। ঘরে ঢুকিয়া একটা দড়ির খাটের উপর বসিয়া বনবিহারী বলিল,—বাড়ীতে ঢুঁ মেরে দেখলাম নেই, সন্ধান নিয়ে জানলাম তুমি বাগানে আছ, ফিরবে রাত দশটায়। তাই, তোমার এই শান্তি-কুটির চড়াও করলাম। বিরক্ত করলাম না ত?" "না, না, কতকাল পরে এলে? বিরক্ত হ'ব কেন? এখন কি করছ তুমি?" "কিছু করিনি। আমাকে দিয়ে কেউ কিছু করিয়ে নিলে করতে পারি। ডাক্তারীটা পাশ করেছি। মনে করছি এখানেই একটা ডিস্পেন্সারি খুলব।"

"বেশ, বেশ। তারপর, আর সব খবর কি? বিয়ে করেছ?"

"না, করি নি। তবে, মা-বাবা দিয়েছেন। জান ত এদেশে কেউ বিয়ে করে না। একে আর একজনের বিয়ে দেয়।"

"ওই হ'ল। সব কথাতেই ভাবের অভাব আছে। বিয়ে করা ও বিয়ে দেওয়া এই দু'টোর কোন কথাটাই নর-নারীর আসল সম্পর্কটা প্রকাশ করে না।"

বনবিহারী হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—"সেটা আবার কি?"

তেজেশ তাহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল,—"সেটা কচু।"

বনবিহারী খুব খানিকটা হাসিয়া কহিল,—"ঠিক বলেছ। কিন্তু—। আচ্ছা ঐ উনোনে কার কি রান্না হচ্ছে বল ত?"

তেজেশ আড়চোখে একবার বনবিহারীকে দেখিয়া লইয়া কহিল,—"ও, কিছু না, গরুর জন্যে মহুল সেদ্ধ করা হচ্ছে।"

বনবিহারী অকারণে একটু মুচকি হাসিয়া উনানের একপাশে পড়িয়া থাকা মেয়েদের মাথা-বাধা কাঁটা ও একটা চিরুণী দেখাইয়া কহিল, "কিন্তু এগুলোও কি গরুর?"

তেজেশ তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহার পিঠে হাত চাপড়াইয়া কহিল-"হ্যা, বলতে পার। কারণ, এগুলো যার—সে একেবারে নিরীহ গো-বেচারী একটি সাঁওতাল মহিলা।"

"মহিলা? মেয়ে নয় তা হ'লে? মহিলারা ত নিরীহ হয় না। নিরীহ গোবেচারী যারা তারা মেয়ে, মহিলা নয়! ব্যক্তিটিকে দেখলে বলতে পারি মেয়ে না মহিলা।"

"ও, তুমি দেখতে চাও। এই। জবা! শুনে যা।"

কিন্তু, জবা আসিল না। সে তখন একটা ঝোপের আড়ালে নিজেকে গোপন করিয়াছে। তেজেশ বলিল,—"লজ্জা পাচ্ছে ভাই, আসবে না।"

বনবিহারী আর কথা খুঁজিয়া পাইল না। খাট হইতে উঠিয়া বলিল,—"আজ তাহ'লে আসি, ভাই! এখানে যখন আছি, তখন মধ্যে মধ্যে তোমার শান্তি ভংগ করব।"

"আচ্ছা, এসো। তোমাকে এই জায়গায় কি দিয়ে অভ্যর্থনা করব খুঁজে পাচ্ছি না।"

"কেন? ঐ যে সামনের বেড়াঘেরা জায়গাটাতে ফুটে আছে গোলাপ। ওরই একটা দিতে পার।"

"ও, তুমি ফুল নেবে? এ্যায়! চক্‌রা! একবার শুনে যা ত।"

চক্‌রা বুড়া মালি। কোন সুদূর অতীতে সে যে উড়িষ্যা হইতে এ দেশে আসিয়াছিল তাহা তাহার মনে পড়ে না। তখন সে বারো বছরের বালক মাত্র। আর, এখন তাহার বয়স প্রায় সোত্তর। বাগানেই সে থাকে। মাটির সংগে তাহার নিবিড় সম্পর্ক। তাহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কেহ আছে বা নাই তাহা কেহ জানে না। সবাই তাহাকে এখানে বরাবর এই বাগানের কুঁড়ে ঘরটিতে দেখিয়া আসিতেছে। তবে মধ্যে মধ্যে সে বছরে একবার বা দুইবার কটক যায়। সে তখন তাহার কুঁড়ে ঘরের দাওয়াতে বসিয়া দিগন্তে একখানা কৃষ্ণ মেঘ দেখিয়া কি যেন ভাবিতেছিল। তেজেশের ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে ছুটিয়া আসিয়া তেজেশের আদেশে বনবিহারীর জন্য লইয়া আসিল একজোড়া ফুটন্ত গোলাপ। তখন বাতাস জোরে বহিতে সুরু করিয়াছে।

ফুলের ঘ্রাণ লইতে লইতে বনবিহারী বলিল—"চল্লুম, ঝড় এলো বলে।"

"আচ্ছা, এসো। আমিও একটু বাদেই চলে যাব।"

তেজেশ এই কথা বলিয়া বনবিহারীকে বাগানের গেট পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া আসিল। কিন্তু, সে যে একটু বাদেই চলিয়া যাইবে বলিয়াছিল, তাহা আর হইয়া উঠিল না। আকাশের ঘন-ঘটায় আসিল আষাঢ়ের মেঘ। আশে-পাশের কুঁড়ে ঘরগুলি হইতে ভাসিয়া আসিল সাঁওতাল মেয়েদের গান। নব-বর্ষার জল ঝরিতেছে। তাহারই আবাহনী গান শুনা যাইতেছে অজানা ভাষায় মেঘ-বরণ মেয়েদের মধুর কণ্ঠে। বর্ষা নামিতে না নামিতেই ইহাদের কী হিল্লোল! ছল ছল বারিধারার মত চল-চঞ্চল যুবক-যুবতী ঘর ছাড়িয়া বাহিরে জলে ভিজিয়া পরম পরিতৃপ্তিতে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দেহগুলিকে ঠাণ্ডা করিয়া লইতেছে। ঝুমরার মেয়ে মাতি হঠাৎ বাগানে ঢুকিয়া পুকুরের সান-বাঁধান ঘাটে শুইয়া পড়িল। নেশা করিয়াছিল সে। জলে

ভিজিয়া তাহার যেন আশা মিটিতেছিল না। মসৃণ সিমেণ্ট বাধানো ঘাটে ঝম-ঝম করিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছিল। মাতি তাহারই উপর গড়াইয়া তাহার নিজের কালো পাথরের মত মসৃণ দেহটার জালা মিটাইতেছিল। ঝুমরো একটা বাঁশের ছাতা মাথায় দিয়া সেখানে আসিল। মাতিকে দেখিয়া একটা কথাও সে বলিল না। বাঁশের ছাতাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তেজেশের কাছে ছুটিয়া আসিল। জবাও সেখানে ছিল। ঝুমরোকে দেখিয়া জবা হাসিয়া ফেলিল। তেজেশ বলিল,—"আবার সুরু হ'বে বিচার করা।" জবা উনোনের ভিতর কাঠ ঠেলিতে ঠেলিতে বলে,—"আর বিচার করতে হ'বে নাই, মাতি ফিরে আইছে।" সংগে সংগে ঝুমরো ঘরে ঢুকিয়া সুরু করে,—"তু বাবু ইয়ার বিচার কর।" ঘরের বাঁশের কপাটটার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পুকুর ঘাটের দিকে তাকাইয়া তেজেশ চিৎকার করে,—এ্যা! মাতি! ঘরকে যা।" কথাটা শোনায় মেঘ-গর্জনের মত। মাতি উঠিয়া ছুটিয়া পালায়। সারা দিনের শ্রমের পর তেজেশের মেজাজটা এখন রুক্ষ হইয়া উঠিল। সে ঝুমরোকে বলিল—এখন যা এখান থেকে।" ঝুমরো তেজেশের চোখে বিরক্ত চাহনি দেখিয়া আর কোন দিকে না চাহিয়া বাঁশের ছাতাটা কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর রাত্রির অন্ধকারেরর সংগে সংগে আকাশ হইতে নামিল প্রবল বর্ষা। বাতাসে আসিল ঝঞ্ঝার নৃত্য। তেজেশ ডাকিল—জবা! পাওরা আন্।" জবা কুলঙ্গী হইতে একটা কালো বোতল লইয়া আসিল। রাঙা মেয়ের হাতে কালো বোতলটা তেজেশের চোখে দেখায় রাত্রির মত রহস্যময়। কি আছে উহার ভিতর? কালকুট নয়। মহুয়ার মদ। সাঁওতালী ভাষায় যাহার নাম পাওরা। জবাই সেটা নিজের হাতে তৈরী করিয়াছে। সরকারী বিধি-নিষেধ থাকা সত্বেও সাঁওতালরা এই অবৈধ কাজটা করিয়া থাকে। ধরাও পড়ে, দণ্ডিত ও হয়। কিন্তু, দণ্ড দিয়াইত মানুষের নেশা ছাড়ান যায় না। তেজেশও মানুষ! সেও এটা ধরিয়া জবার সহিত জীবনটাকে আরও সহজ করিয়া লইয়াছে। তাহার অবসরগুলি কাটিয়া যায় একটি মদির পরিবেশে। বহির্জগতের সংবাদ সে রাখে না। সে শুধু জানিয়া লয় তাহার সজী ক্ষেতে ক'টা মজুর কোন দিকে কাজ করিবে। তাই, সে মহুয়া-ভরা গ্লাসটা হাতে তুলিয়া জবাকে বলিল—"দু'টি ছোলা ভাজা আর কাঁচালংকা দে।" কথাটা বলিয়া সে ডান হাতটা পাতিয়া রাখে। জবা তাহার হাতে ভাজা-ছোলা ভরা বাটিটা তুলিয়া দিয়া একটা কাঁচালংকা মাটিতে ফেলিয়া দেয়। তেজেশ বলে,—দে, লংকাটা হাতে তুলে দে। জবা এবার রাগিয়া উঠে। বলে,—উ আমি পারব না।"

-তেজেশ বলে,—কেন রে?"

"রাগ কি কারো হাতে তুলে দিতে আছে গো? তা হ'লে যে রাগ হয়, ঝগড়া হয়। তুই কি আমার সংগে ঝগড়া করবি না কি?"

বলিতে বলিতে জবার চোখ দুইটা ছল্ ছল্ করিয়া উঠে। সাঁওতালরা লংকাকে 'রাগ' বলে। তেজেশ জবার সরলতায় মুগ্ধ হইয়া যায়। কাছে আসিয়া আদর করিয়া বলে,—অনুরাগ কাকে বলে, জানিস্ জবা?"

মানুষের জীবনযাত্রায় মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় সশস্ত্র সংগ্রাম—এই কথাটা হঠাৎ একদিন তেজেশ উপলব্ধি করিল। তাহার শান্তিপূর্ণ জীবনের মধ্যে জ্বলিল অশান্তির আগুন। তাহার জন্য তেজেশ ব্যক্তিগত ভাবে দায়ী ছিল না। দায়ী ছিল তৎকালীন সরকার। তখনও দেশে চলিতেছিল বিদেশীর রাজত্ব। তখন ৪২।৪৩ সাল হবে। তখনও আসে নাই ১৫ আগষ্ট। যুদ্ধের বীভৎসতায় সমস্ত দেশ আতংকিত। দেশের বিভিন্ন স্থানে গোরা সৈন্যেরা আস্তানা গেড়েছে। বনবিহারীর নূতন ডিস্‌পেন্সারীটার কিছু দূরেই পশ্চিম-বাংলায় তাহাদের জন্য খোলা হইয়াছিল এরূপ একটী শিবির। সেখানে আশেপাশের লোক আতংকিত হইয়া উঠিল। বনবিহারীর কাছে অভিযোগ আসিল যে, গ্রামের মেয়েরা গোরা শিবিরের পাশ দিয়া গেলে তারা ইংগিত করে। বনবিহারী চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছাত্র-জীবনে সে ছিল ভলেণ্টিয়ারের সর্দার। সে বাহুর মাংস পেশীটাকে টিপিয়া দেখিল যে, এখনও সেটা শক্ত আছে।
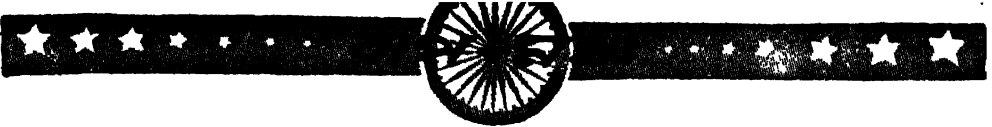
সে সেটাকে কাজে লাগাইবার জন্য বাল্যবন্ধু তেজেশের কাছে আবার একদিন উপস্থিত হইল। আসিয়াই সে তেজেশকে এক নূতন কথা শুনাইল। বলিল,—দেখ, এতকাল ত কাটিয়ে দিলে এই সাঁওতালদের মধ্যে, কিন্তু, এদের জন্য কি করেছ?"

"কেন? বেশ আছে ওরা?" অবহেলাভরে এই কথা বলিয়া তেজেশ মহুয়া-ভরা গ্লাসটা হাতে তুলিয়া লয়।

তেজেশের এই দুরবস্থা দেখিয়া বনবিহারী ঘুমন্তকে জাগাইবার চেষ্টা করে। বলে,- এখনও ঘুমোচ্ছ তুমি! জান, ঐ শক্তিমান সাঁওতালদের দল যদি আজ এই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিভীষিকার মধ্যে আমাদের পাশে দাঁড়ায় তাদের তীর, কাঁড় আর টাঙি নিয়ে—তা' হলে তোমরা হয়ত এখনও আরও কয়েকটা দিন টিকে থাকতে পারবে।"

বনবিহারীর কথায় তেজেশের আর একটা কথা মনে পড়িল। বলিল,—শুধু এই খবরটুকুই রেখেছ তুমি? আর একটা খবর শোন। শুধু গোরা সৈন্য নয়, পাদ্রীরা অনেক সাঁওতাল মেয়েকে চার্চে নিয়ে গিয়ে উদার খৃষ্টান ধর্মের সহায়তায় তা'দের স্ত্রীর সম্পূর্ণ মর্যাদা দিচ্ছে। পারবে তোমার সমাজ এটা করতে?". এতখানি কড়া কথা তেজেশের কাছে সে আশা করে নাই। ঠিক সেই সময় ঝুমরো সর্দার ঘরে ঢুকিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া মাটিতে উবু হইয়া বসিল। তেজেশ বলিল,—জান এর দীর্ঘ-নিশ্বাসের কারণ? সম্প্রতি ওর একমাত্র কন্যা গোরারা ধরে নিয়ে গেছে।"

ঝুমরো বলিল, অমন কথা বলবেন না বাবু, মেয়ে আমার মরেছে।" বলিতে বলিতে ঝুমরার চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—একবার সামনে পেতাম যদি সেই পোড়ারমুখীকে ত গলা টিপে মেরে ফেলতাম।"

তেজেশ আবার গেলাসটা তুলিয়া লইয়া কহিল—হ্যাঁ, মেয়েকে মেরে ফেলে বাপের মান বাড়াতে!"

বনবিহারী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তেজেশের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে তেজেশ কহিল,—এই বুড়োর মেয়ে মাতি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসেছে। মেয়েটি খুব স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু, মনের সুস্থতা হয়ত নেই। পর পর দু'বার বিয়ে করে স্বামী ছেড়ে বাপের কাছে ছিল। ও ফল বেচতে সৈন্যদের আস্তানায় যেত—সেখানে যেয়ে উপরি আয়ের পন্থা হ'য়েছে। এখন সে বেশ পসরা খুলে বসেছে। সে হ'য়েছে মতি-বিবি।"

কথাটা বলিয়া তেজেশ হোঃ হোঃ করিয়া হাসে। বনবিহারী প্রতিকারের পথ খুঁজিয়া পায় না। বলে, এসব কাজ করা আমার একার দ্বারা দুঃসাধ্য, যারা দেশের কাজ করছেন, তাঁরা এর প্রতিকার করুন না।"

তেজেশ বলে,—তাঁরা ত' জেলে আর যারা রয়েছে, তাদের কথা ছেড়ে দাও। তারাত বলে, এ যুদ্ধ তাদেরই যুদ্ধ। এদেরই মুক্তি যুদ্ধ। তোষণ-নীতি ও নিজেদের খ্যাতি নিয়ে এত ব্যস্ত যে, এ সব নোংরা কাজে হাত দিতে তাদের সময় নেই। এরা অস্বীকার করে সিপাহী বিদ্রোহের প্রয়াস, বোমা-পিস্তলের গুপ্ত ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি, আর ইংরেজের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগঠনের সাফল্য। তাই, এরা এ সব ছোট কাজে হাত দেবে না।"

তেজেশের কথাগুলা জড়াইয়া আসিতেছিল। বনবিহারী সব কথার মর্ম বুঝিতে পারিল না। ঠিক সেই সময় বাহিরে ছোট জানলাটার পাশে কে গুমরিয়া কাঁদিল। তেজেশ সে স্বর চিনিত। বলিল,—ঘরে আয় জবা! লজ্জা কি রে!" আজ আর জবা লজ্জা করিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটা জবার মত লাল হইয়া গিয়াছিল। সে তেজেশের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—তু ইহার বিচার কর।" ঝুমরো সর্দার, বনবিহারী ও তেজেশ নিজে খুব বিস্মিত হইল। কিসের বিচার চায় এই নারী? তারপর তাহারা জবার মুখে যাহা শুনিল, তাহা তাহাদের শিরায় শিরায় বহাইল উষ্ণ রক্তস্রোত। মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

জবা গিয়াছিল হাটে। সেখানে সৈন্যের দল তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সংবাদটা তেজেশকে পাগল করিয়া দিল। সে ঝুমরোর দিকে তাকাইতে সে আবার বলিল,—"তু ইহার বিচার কর বাবু!
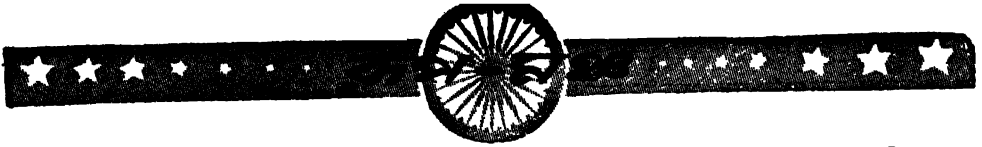
বাবু! উয়ারা কি মনে করেছে যে, আমরা মরা? তু হুকুম দে বাবু একবার দেখায়ে দি। উরা কি জানে নাই যে, নাড়াজোলের রাজা যইন হুকুম দিয়াছিল, তখন শুধু তীর কাঁড় ধরেই হাজার সাঁওতাল কাঁপাইয়া দিয়াছিল এই মেদিনী মাটি।"

তেজেশ বনবিহারীর হাত ধরিয়া বলে,—ঝুমরো! তাই করব এবার। আজ রাতেই সাঁওতালদের একজোট করে আক্রমণ করতে হবে ঐ গোরা-শিবির।"

ঝুমরো মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করিয়া লাফাইয়া উঠে। তাহার পর সে ছুটিয়া চলিয়া যায়। তারপর, রাত্রির অন্ধকার বাড়িবার সংগে সংগে চারিদিক হইতে বাজিতে থাকে দমাদম শব্দে মাদল। চারি পাশের সাঁওতালরা দলবদ্ধ হইয়া আগাইয়া আসে। তাহাদের কাহারও হাতে টাঙি, কাহারও হাতে বর্শা আর প্রত্যেকেরই পীঠে বাঁধা তীর-ধনুক। তাহারা তেজেশের কলমী-খালের বাঁধের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। নিবিড় অন্ধকারে খাল ও কলমী ক্ষেতে এক বিরাট কালোর একাকার হইয়া গিয়াছিল। বাঁধের উপর মানুষগুলিকে দেখাইতেছিল নৈশবিহারী শ্বাপদের মত। তেজেশ, বনবিহারী ও জবাও সেখানে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দেখাইতেছিল দণ্ডকারণ্যের রাম লক্ষ্মণ সীতার মত। তেজেশের হাতে তীর ধনুক, আর বনবিহারীর হাতে ছিল একটি দীর্ঘ বর্শা। একটা কেরোসিনের টিন মাথায় তুলিয়া জবা বলিল,—আমি যাই উয়াদের সংগে।"

তেজেশ বলিল,—মরতে এত সাধ কেন তোর?"

"মরব নাই গো, দেখিস্ তোরা। যে আমার ইজ্জতে হাত দিয়েছে, তার মুখটা পুড়াই দিব, মরব নাই।"

তেজেশ তাহার হাতে একটা মশাল দিয়া বলে,—ধর তবে এটা।"

বনবিহারী কিছু সামরিক কৌশল জানিত। সে এই বেসামরিক বাহিনীকে তিন দলে ভাগ করিল। স্থির হইল যে, একদল উত্তর দিক হইতে শত্রু-শিবির আক্রমণ করিতে যাইবে, আর এক দল পুবের জঙ্গলে পলাতক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিবে আর একদল পশ্চিম হইতে শত্রু শিবিরে আগুন ধরাইয়া দিবে। তেজেশ রহিল তীর ধনুক হাতে উত্তর বাহিনীতে জঙ্গলের আড়ালে, বনবিহারী রহিল পুবে, পশ্চিমের দলে কেরোসিনের টিন লইয়া রহিল জবা। তেজেশ ও বনবিহারী তাহাকে বারংবার বারণ করিয়াছিল। কিন্তু, সে ফিরিল না।

তখনও টিক্ টিকি পুলিশ ও ট্যাঙ্কের উপর নির্ভর করিয়া বৃটিশ-শাসন টিকিয়াছিল। আর সব দলেই ছিল ঘরের শত্রু বিভীষণ। সুতরাং গোরারা পূর্বাহ্ণেই খবরটা পাইয়াছিল! তেজেশের সাঁওতাল বাহিনী দেখিল যে, তাহাদের জন্য সম্মুখে সাক্ষাৎ যমের মত প্রতীক্ষা করিতেছে বৃটিশের বেতন-ভোগী সৈন্যরা। সাঁওতালদের উত্তর বাহিনী জঙ্গল ছাড়িয়া বাহিরে আসিবার সংগে সংগে সৈন্য-শিবির হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার শব্দে সাঁওতালরা চমকাইয়া উঠিল। তারপর,—তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিল একটা জীপ্ কার। তাহার চারি-পাশে দাঁড়াইয়াছিল সশস্ত্র সৈন্য, তাহাতে বসিয়াছিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহম্মদউল্লা ও জননেতা কিশোরী কর। তাঁহারা খবর পাইয়া হাঙ্গামা দমন করিতে আসিয়াছিলেন। সাঁওতাল বাহিনী কাছে আসিতেই কিশোরী বাবু গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা সুরু করিলেন,—ভাই সব! অকারণ রক্ত-ক্ষয় বাড়াই ও না। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ। এই সব তুচ্ছ কলহে সেই চরম মুহূর্তকে নষ্ট করো না। সাঁওতালরা! তোমরা চিরকাল এই সব দ্বন্দ্ব থেকে তফাতে আছ। তোমরা অন্য শ্রেণীর মানুষ। তোমরা সরল আদিম অধিবাসী। তোমরা ফিরে যাও। নইলে, মেসিনগানের গুলিতে প্রাণ হারাইবে!" বক্তৃতায় কেহ হাত-তালি দিল না। মোটর কারের হেড্ লাইটের উজ্জ্বল আলোকে ঝুমরোকে দেখা গেল। সে কিশোরী বাবুর কাছে আসিয়া বলিল,—কথাটা শুধাইয়া আসি বাবু! তারপর।"

তারপর ঝুমরো জঙ্গলের মধ্যে তেজেশের কাছে ফিরিয়া আসিল। সব শুনিয়া তেজেশের মনটা বিষাইয়া যায়। বলে,—আমাদের মধ্যে কে এমন দুষমন আছে যে খবর দিয়াছে ঐ শয়তানের দলকে?" ঝুমরোকে কাছে
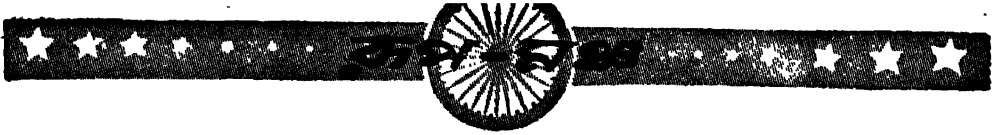
ডাকিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলে,—তা হলে এবার ফিরে চল সর্দার! দিন কয়েক পরে আবার দেখা যাবে।"

ঝুমরো তাহার মাথার ঝাঁকড়া চুল নাড়িয়া বলে,—না বাবু, তা হ'বে নাই। পাঁচ শ সাঁওতাল মোরা গুলি খাই মরব। বাকি সব দেখাই দিবে একবার! কেমন গো! পারবি ত সব ?"

সাঁওতালরা বলে,—তুই ঠিক বলেছিস্ গো, কেনে পারব নাই ?"

সুতরাং তেজেশের উপদেশটা নিষ্ফল হইয়া যায়। সাঁওতালদের দল হা-রা-র'-রা করিয়া আগাইয়া আসে। তারপর গোরা সৈন্যের বুলেট খাইয়া তাহারা মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

সাওতাল দলের সামনের লোক মরে ও পিছনের লোক আগাইয়া আসে। উত্তরে যখন এইভাবে চলিতেছিল মরণ-যজ্ঞ, তখন হঠাৎ দেখা যায় যে, পশ্চিম দিকে গোরা-সৈন্যের শিবিরে কে যেন আগুন লাগাইয়াছে। ঘরের পর ঘরে আগুন লাগাইয়া ছুটিতেছে তখন এক উন্মাদিনী নারী। হাতের জ্বলন্ত মশালে তাহার রাঙ্গা মুখটাও দেখাইতেছে যেন আগুনের মত। সৈন্যের দল তখন শিবির ছাড়িয়া পূবের জঙ্গলে ছুটিয়া আসিতেছিল। সেখানে অরণ্য হইতে উঠিতেছিল অস্ফুট আর্তনাদ। অন্ধকারের মধ্যে চলিতেছিল সাওতালদের চকচকে টাঙ্গি আর বন-বিহারীর বর্শা। উত্তর বাহিনীর আন্দাজ একশত সাঁওতাল যখন প্রাণ হারাইল, তখন তেজেশ সাঁওতালদের ফিরাইয়া আনিল। কিন্তু, তখনও বৃটিশ বুলেটের মুখে আত্মদান করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল শেষ বলি।

জবা আগুন লাগাইয়া বন্দুকের শব্দের দিকেই ছুটিয়া আসিতে-ছিল উন্মাদিনীর মত। হাতের মশালের আলোতে তাহার মুখটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। বন্দুকের তাগ্ করিতে সেইটাই ছিল সুবিধা। গোরা সৈন্যের অব্যর্থ বুলেট তাহার খুলিটাকে উড়াইয়া দিল। মশাল হাতে সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। দূর হইতে তাহা দেখিয়া তেজেশ শিহরিয়া উঠিল! তাহার পর সে একটি কথাও বলিল না। তখন রাত্রি শেষ হয় হয়। সাঁওতালরা চলিয়া যাইবার পর চলিতে লাগিল আগুন নিভাইবার আয়োজন। জল! জল! বলিয়া আর্তনাদ উঠিল।

গোরা সৈন্য নামিল কিঙ্কিণী নদীর জলে। নদীর জল তখন পোড়া খড়ের ছাইতে কালো হইয়া গিয়াছে। সেই অপর্যাপ্ত কর্দমাক্ত জল বালতী করিয়া বহিয়া আনা হইল। কিন্তু, তাহা শুধু লেলিহান অগ্নিশিখাকে উপহাস করিল। সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। পূর্বাকাশে তখন দেখা যাইতেছিল অরুণালোক। কিঙ্কিনী নদীর তীরে কশাড় বনের মধ্যে বসিয়া তেজেশ তাহা দেখিতেছিল। দূরের একটা বিরাট মেঘের পুঞ্জ অরুণ-আলোকে দেখাইতেছিল যেন, রাঙ্গা জবার তোড়ার মত। পাশে আসিয়া দাঁড়াইল বুড়া মালি চকরা। তাহার গলাটা তখন সর্দিতে ঘড ঘড করিতেছিল আহত সিংহের মত। সে হঠাৎ কাসিয়া ফেলিল। তেজেশ তাহার দিকে চাহিল। পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া কতগুলি টাকা তাহাকে দিয়া তেজেশ বলিল,—এই নে চক্‌রা! বাগানের কাজ এখন বন্ধ থাকবে, তুই এখন দেশে যা, পরে খবর দিলে আবার আসিস্।"

চক্‌রা এক হাতে নোট লইয়া আর এক হাতে গামছার খুঁট দিয়া চোখ দুইটাকে মুছিতে মুছিতে চলিয়া যায়। তেজেশ পূর্ব দিগন্তের রাঙ্গা মেঘটার দিকে আবার তাকাইয়া থাকে। অকস্মাৎ তাহার যেন মনে হয়, দূরে ঐ পূবে কোথাও কাহার কোঠা বাড়ীতে লাগিয়াছে আগুন—তাহারই ধোয়া ও শিখা উঠিতেছে ঐ উর্ধ-আকাশে। তেজেশ শিহরিয়া উঠে। তাহার মনে ভাসিয়া ওঠে অরুণ-রাঙ্গা একখানা মুখ—রাঙ্গা জবা। ঐ যেন রক্তে রাঙ্গা হইয়া লুটাইয়া পড়িল। তেজেশ আর দেখিতে পারে না। মুখটা নামাইয়া দুই হাটুর মধ্যে ঢুকাইয়া ফেলে। ধীরে ধীরে প্রভাত আলোক কিঙ্কিনী নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া উপহাস করিয়া বহিয়া যায়।

(শেষ)

নিউইয়র্কে বাংলা থিয়েটার

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

●

আমরা অর্থাৎ কলিকাতার শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী পরিচালিত "নাট্যমন্দির" লিমিটেড্ থিয়েটারের দলের এগারো জন অভিনেতা (শুধুই অভিনেতা, কোন অভিনেত্রী এদলে ছিলেন না) আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে অভিনয়ার্থ আমন্ত্রিত হইয়া, ১৩৩০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর, বুধবার কলিকাতা খিদিরপুর ডক হইতে রওনা হই।

জাহাজে করিয়া কলিকাতা হইতে নিউইয়র্ক যাওয়া সহজ কথা নয়। পঁয়তাল্লিশ দিন সময় লাগিয়াছিল। কি করিয়া সময় কাটানো যায়? তাই সেই সময় কিছুদিনের জন্য ডায়েরী লিখিয়াছিলাম। ডায়েরী লিখিবার অভ্যাস আমার পূর্বে ছিল না, এখনো নাই।

যাঁহারা লিখিতে জানেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া কবিতা লেখেন, হাজারিবাগ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিবার প্রলোভন দমন করিতে পারেন না। আমি পাঠকের জন্য নয়, শুধু সময় কাটাইবার জন্যই লিখিয়াছিলাম, তাই আজ পর্যন্ত প্রকাশ করিবার উৎসাহ হয় নাই। আমার ভ্রাতা পণ্ডিত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "শ্যামলী" পত্রিকার সম্পাদকমহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া লেখাটি দিতে বলেন। আমিও মনে করিলাম, আরো কিছুদিন লেখাটী ঘরে থাকিলে ইঁদুরে কাটিবে, "ন দেবায়, ন ধর্ম্মায় ন চ বিপ্রায়" —সেই কারণে এবং মাঝে প্রায় দশ বৎসর অতীত হওয়ায় "আমেরিকায় বাংলা থিয়েটার" বোধ করি ঐতিহাসিক মর্যাদা পাইবার যোগ্য হইয়াছে মনে করিয়া ছাপাইবার সম্মতি দিয়াছি।

১০ই সেপ্টেম্বর যখন, পাঠক নিশ্চয় বুঝিতেছেন, সেটী বাংলা ভাদ্র মাস। আমরা সাহেবী ভাবাপন্ন নই, বাংলা থিয়েটারওয়ালা! 'কু' বলুন, 'সু' বলুন বাঙালীর সব সংস্কারই আমাদের আছে। ভাদ্রমাসে, লোকে কথায় বলে কুকুর বিড়াল তাড়ায় না, এহেন ভাদ্রমাসে ঘর ছাড়িয়া সাত সমুদ্দুর পাড়ি দিলাম, মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিয়াছিল। ফলটা কি হইয়াছিল—"ফলেন পরিচীয়তে।" যে জাহাজে আমরা যাইতেছি, সেখানি American Pioneer Line এর জাহাজ, মাল ও যাত্রী দুইই লয়। জাহাজখানির নাম টাম্পা (Tampa)। মোটর শক্তিতে চলে। আমি এবং আমার সহযাত্রী সর্বসমেত এগারো জন। অন্য যাত্রী জাহাজে ছিল না, সুতরাং আমরাই সর্বেসর্বা। সর্বোতো-ভাবে সাহেবীয়ানার অনুকরণ করিতে হইবে না জানিয়া খুশী হইলাম। আমাদের নাম যথা—আমি শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী, শ্রীতারা কুমার ভাদুড়ী, শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়া কলেজের রসায়নের অধ্যাপক, শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় শিল্পাদর্শে (Indian Architect) গৃহনির্মাতা, শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী এবং Art Director—এঁর ডাক নাম "দেবু", শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্মলেন্দু লাহিড়ীর অগ্রজ কিছুদিন আগে মারা গিয়াছেন, শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী, শ্রীশীতল চন্দ্র পাল, শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়। পান্নাবাবু আমাদের দলের সর্দার,—ভাদুড়ী মহাশয় এই নাবালক কয়টীর ভার তাঁহার হাতেই দিয়াছেন। যথাসময়ে passport দেখান হইল, ডাক্তার আসিয়া আমাদের পরীক্ষা করিয়া গেলেন। আমরা পুরাপুরি জাহাজের লোক হইয়া গেলাম। কলিকাতা হইতে জলপথে বরাবর নিউইয়র্ক। জাহাজের লোকের ভিতর কেহ বলিল চল্লিশ দিন লাগিবে, কেহ বলিল পঁয়তাল্লিশ দিন। পূজা, আগমনী, বিজয়া, কালীপূজা সবই এবার জাহাজে—নিশ্চিন্ত। নির্দিষ্ট স্থান ঠিক করিলাম। মনোরঞ্জন বাবু আর আমি এক কেবিনে। যথাকালে পাঁচটার সময় (বৈকাল) আহারের ঘণ্টা বাজিল। আমাদের শুধু চা খাইবার নেশা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম নানাবিধ বিজাতীয় আহার্য। প্রথম দিন উৎসাহের সংগে আরম্ভ করিলাম। টেবিলে বসিয়াই শুনিলাম, এই রাতের খাওয়া,—রাত্তে আর কিছু দেওয়া হইবে না। ছুরি, কাঁটা, চামচের ব্যবহার প্রায় কাহারো জানা ছিল না, কিন্তু বাংলা থিয়েটারের জয়-জয়কার

আঠারো বৎসর পূর্বে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর অধিনায়কত্বে—শিশির-সম্প্রদায়ের যে অভিযাত্রীরা সুদূর নিউইয়র্কে বাংলা নাটকাভিনয়ের জন্য আমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়েছিলেন—বাংলা নাটকান্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনাকারীদের অনেকের মাঝে স্বর্গতঃ নট বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, স্বর্গতঃ নট শৈলেন চৌধুরী, স্বর্গতঃ নট ও নাটাকার যোগেশ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভাদুড়ী প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

—সংগে আর কেহ নাই। আমাদের আনাড়ি বলে কে? উহারই মধ্যে একটু সাহেবঘেঁসা ছিলেন বিশ্বনাথ, তারাকুমার ও শৈলেন্দ্র। তাঁহারা বহুবিধ উপায়ে আমাদের তালিম দিবার চেষ্টা করিলেন।

জাহাজ ছাড়িবার কথা ছিল ১২টার পরে। অনেক অপেক্ষার পর সত্যই ১২॥ টায় নঙ্গর উঠিল এবং ডক্ পার হইয়া জাহাজ গঙ্গায় পড়িল। আমিও কেবিনে গিয়া নিদ্রা গেলাম।

১১ই বৃহস্পতিবার—পরদিন সকালবেলা উঠিয়া দেখিলাম, (মনে ভাবিয়াছিলাম, প্রায় সমুদ্রের কাছে আসিয়াছি) জাহাজ নঙ্গর ফেলিয়া রহিয়াছে মেটিয়া বুরুজের ঘাটে। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, বেলা ১২টায় পুরা জোয়ার হইলে তবে জাহাজ ছাড়িবে। ৭॥টায় প্রাতরাশ, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া টেবিলে গিয়া বসিলাম। নানাবিধ খাদ্য—সেই সংগে একথালা ভাত। আমরা বাঙালী বলিয়া আমাদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা। সাহেব পরিবেশন করিতেছেন দেখিয়া অনেকে বিশেষ খুশী হইলেন। আমি একেবারে দস্তুর মত বাঙালী—আমার আপিসের সাহেবের সংগেও পরিচয় নাই। আমাদের তদ্বিরকারক (waiter) সাহেব-দুইটি বিশেষ ভদ্র। একজন German-American অপর লোকটি Irish-Australian. যিনি German-American তাঁহার চেহারাটা খানিকটা আমাদের ভারতের ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জনের মত। তাঁহার অসাক্ষাতে আমরা তাঁহাকে কার্জন বলিতাম। Irish-Australian লোকটির চেহারটা বেশ হাস্যোদ্দীপক। আমেরিকার film-এ হাস্যরসের অভিনয়ে এধরণের চেহারা মাঝে মাঝে দেখা যায়। গঙ্গায় পুরা জোয়ার হইলে আবার জাহাজ চলিল। গঙ্গার ভিতর পাইলট্ জাহাজের গতি-

বিধি পর্যবেক্ষণ করেন,—গঙ্গার রাস্তা বিদেশী কাপ্টেনদের অভ্যস্ত নয়। জাহাজ চলিল—আমরা ডেকে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দুই তীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। আমাদের দক্ষিণে ফুলেশ্বরের পাটকল ছাড়াইয়া বামে ফল্‌তা, বজবজ, ডায়মণ্ডহারবার রাখিয়া দামোদর রূপনারায়ণের মোহনা পার হইয়া চলিলাম। গঙ্গার দুই তীর ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ভাবিয়াছিলাম, সন্ধ্যার মধ্যে বোধ করি সমুদ্রে পড়িব। কিন্তু তাহা হইল না, সন্ধ্যা হইবার পূর্বেই ভাটা হইয়াছে বলিয়া আবার নঙ্গর পড়িল। রাত্রি ৮টার পর আবার জাহাজ চলিল। কোন কাজ না থাকায় সকাল সকাল শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরে উঠিয়া দেখি নদীর কূল নাই, জাহাজও ঢেউ কাটিয়া চলিতেছে,—ভাবিলাম সমুদ্রে পড়িয়াছি।
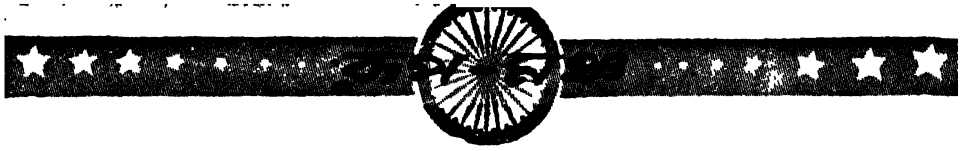
১২ই শুক্রবার—সকালে উঠিয়া দেখি,—জাহাজ নঙ্গর করা হইয়াছে—সামনে তীর। একখানি বাড়ী ও একটী light-house দেখা যাইতেছে। পান্নাবাবু বলিলেন…"এই সাগর দ্বীপ, বাড়ীখানি উত্তর পাড়ার রাজাদের"। পাইলটের সংগে একজন মুসলমান খালাসী ছিল। সে অভিজ্ঞের মত অনেক কথা বলিতেছিল। প্রথমেই তার মুখে শুনিলাম—জাহাজের কল বিগড়াইয়াছে সেইজন্য জাহাজ থামিয়াছে। হরিবোল হরি! যে জাহাজকে নিউইয়র্ক যাইতে হইবে, তাহার কল বিগড়াইল—সমুদ্রে পড়িবার পূর্বেই! পরে শুনিলাম—তাহা নহে, কল বিগড়ায় নাই, পূর্ব পূর্বারের মত এখনো জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছে। আশ্বস্ত হইলাম। যথারীতি প্রাতরাশ চলিল। প্রায় ১০টার সময় জোয়ার আসিলে জাহাজ ছাড়িল। সাগরদ্বীপের কাছেও জলের রং গঙ্গাজলের মতই ঘোলাটে ছিল। জাহাজ অগ্রসর হওয়ার সংগে সংগে জলের রং বদলাইতে লাগিল। ক্রমে ফ্যাকাশে সবুজাভ, নীলাভ—পরে গাঢ় নীল। সাগরদ্বীপ ছাড়াইয়া বয়া ছাড়াইয়া গভীর সমুদ্রে পড়িলাম। পাইলটের জাহাজ ও অন্য একখানি জাহাজ দেখা গেল। পাইলট নামিয়া গেলেন। আমরা অকূল সমুদ্রে পাড়ি দিলাম।

ভাদ্রের শেষ—বর্ষার শেষ, কয়দিন ধরিয়াই পূবে বাতাস জোর বহিতেছিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টি ও ছিল। সুতরাং সমুদ্রের মূর্তি একেবারেই শান্ত ছিল না। বেশ বড় বড় ঢেউ—জাহাজ দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমুদ্র-পীড়া (Sea-sickness) সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিলাম। অভিজ্ঞেরা পরমর্শ দিয়াছিলেন ঐ সময় কেবিনে না থাকিয়া ডেকে বেড়াইতে হইবে। আমরা সকলে তাহাই করিলাম। ২।৩ ঘণ্টা পরে জাহাজের দুই একজন কর্মচারী প্রশ্ন করিলেন, আমাদের কাহারও Sea-sckiness হইয়াছে কিনা। আমরা এক সংগেই উত্তর দিলাম "হয় নাই"। রাত্রিকালে বমি করিবার জন্য আলাদা একটি পাত্র প্রত্যেকের ঘরে রাখা হইল। জাহাজ খুবই দুলিতে লাগিল। 2nd Officerএর সংগে কথাবর্তায় বুঝা গেল—সমুদ্র বেশ দৃপ্ত। তিনি বলিলেন, দুই বৎসরের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের এরূপ মূর্তি তিনি দেখেন নাই। যাহা হউক ভয় নাই—জাহাজ ঠিক আছে। ভাবিলাম, ভরসাই বা কিসের। রবিন্‌সন্‌ ক্রুশোর গল্প মনে পড়িল। একবার ডেক বেড়াইয়া, দুর্গানাম স্মরণ করিয়া শুইয়া পড়িলাম।

১৩ই শনিবার—সকালে ঘুম ভাংগিতে একটু দেরী হইল। দেখি রৌদ্র উঠিয়াছে। সুন্দর প্রভাত। আকাশ পরিষ্কার। সমুদ্রের জল গাঢ় নীল। দিগন্তে সমুদ্র ও আকাশ একটী বৃত্তরেখায় মিশিয়া আছে—সেই বৃত্তের ঠিক কেন্দ্রটীতে আমাদের জাহাজ—কূলহারা সমুদ্রের মাঝখানে জাহাজের কেন্দ্রভ্রষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। মনে

হইল, সমুদ্রের উপর আকাশের ঘেরাটোপ দিয়া আমাদের জাহাজখানি ঢাকা। এই একই দৃশ্য কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে, যতক্ষণ কোন বন্দরে না পৌছিব—এমনই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়িল—

"মুক্তি যদি না থাকে মনে মনে
আকাশ সেও যে বাঁধে বন্ধনে—"

আকাশ কি করিয়া বাঁধিতে পারে পূর্বে বুঝি নাই!

বৈকালে একটা ঘণ্টা শুনিয়া সকলে ডেকে সমবেত হইলাম। জাহাজের মাঝিমাল্লা সবাই Life-belt পরিয়া উপস্থিত। সাংকেতিক চিহ্ন দেওয়ার সংগে সংগেই একখানি লাইফ-বোট খুলিয়া জলে ভাসাইবার উপক্রম হইল। ঝড় নাই, বাতাস নাই, রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে, জাহাজ পুরা দমে চলিতেছে, এমন সময় একি বিড়ম্বনা! শুনিলাম, এটা Disaster Rehearsal। ঈশ্বর না করুন, যদি কোন বিপদ ঘটে তখন কোন নৌকায় কাহাকে উঠিতে হইবে স্থির হইল। আমাদের ছয়জন ১নং বা ২নং নৌকায় উঠিবে এবং পাঁচজন—৩নং বা ৪নং নৌকায় উঠিবে। শুনিতেছি আগামী শনিবারে আমাদের Life belt পরিয়া ঐ অভ্যাস করিতে হইবে। ৫টায় আহারের পর ডেকে বসিয়া সূর্যাস্ত দেখিলাম। অস্তসাগরে সূর্যদেব ডুবিলেন। পান্নাবাবু ও মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, তাহারা তিমি মাছকে জল ছাড়িতে দেখিয়াছেন—আমি অবশ্য দেখি নাই, তবে উড়ন্ত মাছ দেখিয়াছি—তাহারা অল্প উড়িয়া আবার জলে ডুবে। সমুদ্র-পীড়া আমাদের কাহারো হয় নাই। মণিমোহন বাবু ও শৈলেনবাবু ২।৪ বার বমি করিয়াছিলেন। শীতলবাবু ও শ্রীশবাবুরও শরীর সামান্য একটু খারাপ হইয়াছে, কিন্তু দস্তুরমত Sea-sickness যাহাকে বলে—কাহারো হয় নাই।

১৪ই রবিবার—সকালে উঠিয়া ডেকে আসিলাম সূর্যোদয় দেখিবার জন্য, কিন্তু আকাশ মেঘে ঢাকা। একই সমুদ্র—একই আকাশ। আগামী কাল সকালে মাদ্রাজ পৌছিব শুনিতেছি—৪৫ দিনের আর ৪১ দিন আছে। ৪১ দিন এইভাবে কাটাইতে হইবে—চিন্তা করিতে ভয় হইতেছে; তবু দিন কাটিবে নিশ্চয়ই!

সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছে আহারের। জাহাজের কর্তৃপক্ষীয়েরা আমাদের আহারের অসুবিধার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিতেছেন। কিন্তু ওদের কোন খাদ্যই আমাদের পোড়ার মুখে যে রোচে না—তার উপায় কি?

বৈকালে আকাশ বড়ই পরিষ্কার। অনেক দিনের মেঘের খোলোস ছাড়িয়া আকাশের নীল আজ বাহির হইয়াছে। সমুদ্রের নীলের তুলনায় এ নীল অত্যন্ত ফিঁকে—।

রাত্রে কেবিনে মনোরঞ্জন বাবু গীতাপাঠ করিলেন—আমি অবহিতচিত্তে শুনিলাম—দ্বাদশ অধ্যায় ভক্তিযোগ শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। ৪৫ দিন জাহাজে বাস আর বাধ্যতামূলক (Compulsory) অখাদ্য ভক্ষণ যদি কাহারো অদৃষ্টে ঘটে, তিনিই এই আত্মসমর্পণের আবশ্যকতা হৃদয়ংগম করিবেন। আমরা সবই বোধকরি আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছি!

রাত্রে শুইতে যাইতেছি, এমন সময় পান্নাবাবু বলিলেন—জাহাজ! এ কয়দিন একখানিও জাহাজ দেখি নাই, নিশ্চয়ই বন্দর নিকটে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, দূরে দিগন্তের কোলে তিনটী আলো—আর কিছুই দেখা গেল না। রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আধতন্দ্রা আধনিদ্রার মধ্যে নঙ্গরের শব্দ শুনিলাম এবং সকলের কোলাহলে বুঝিলাম, মাদ্রাজ উপকূলে আসিয়াছি। প্রাচীনকালের মদ্রদেশকে অভিনন্দিত করিবার জন্য একবার ডেকে গেলাম—নজরে পড়িল একটি আলোক রেখা। মদ্রদেশের সেকালের অভিজ্ঞতা অশ্বপতি রাজার দেশ, আর একালের অভিজ্ঞতা মানচিত্রে।

১৫ই সোমবার—সকাল প্রায় ৮টার সময় বন্দর হইতে পথপ্রদর্শক (Pilot) আসিয়া জাহাজে উঠিলেন। তাঁহারই নির্দেশানুসারে জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিল। যথা সময়ে ক্যাপ্টেনের অনুমতি লইয়া আমরা সহর দেখিতে গেলাম।

মাদ্রাজ বন্দরটী চমৎকার—সমুদ্রের খানিকটা অংশ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া তরংগের গতি রোধ করা হইয়াছে। একটী প্রকাণ্ড গেট দিয়া বন্দরে প্রবেশ করিতে হয়, ভিতরটা একটা দীঘির মত। বন্দর ছাড়িয়া

বাহির হইলেই বড় রাস্তা, ট্রাম চলাচল করিতেছে। কলিকাতা হইতে তাড়াতাড়ি আসা—আমাদের সকলের সব জিনিষ কেনা হয় নাই,—কিছু বাজার করার আবশ্যকতা ছিল। সহযাত্রী শ্রীশবাবু বলিলেন, মাদ্রাজ তাঁহার বিশেষ পরিচিত—সমস্ত সহর তিনিই দেখাইবেন। ক্যাপ্টেনের কাছে বেলা পাঁচটা পর্যন্ত বাহিরে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছি। প্রথমেই অল্পদূর হাঁটিয়া General Post-Office এ গিয়া কলিকাতায়, বাড়ীতে এবং বন্ধু বান্ধবকে পত্রাদি দিলাম। তারপর সহর দেখা—শ্রীশবাবু বলিলেন, "মাভৈঃ, সব ঠিক করিতেছি"। Hindusthan Assurance কোম্পানীর মাদ্রাজে একটি বাড়ী তৈয়ারী হইতেছে। শ্রীশবাবু সেই বাড়ীর Designer। তিনি সেই কার্যে হিন্দুস্থানের আপিসে গেলেন। আমরা আশে পাশে বেড়াইতে লাগিলাম। দুটী ডাব ও একটী পান খাইয়া কলিকাতার বিস্মৃত জীবনধারা একটু স্মরণে আসিল। এগারো জন লোকের অন্ততঃপক্ষে তেত্রিশ রকমের কাজকর্ম সারিয়া বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় স্থির হইল, মাদ্রাজের একমাত্র দ্রষ্টব্য পদার্থ Aquarium দেখিতে হইবে। তিনখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া সেইদিকে রওনা হইলাম। Aquarium কলিকাতার Zoological Garden এর মত সামুদ্রিক জীবজন্তুর প্রদর্শনী। স্থানটি সহরের বাহিরে সমুদ্রকূলে। সেখানে দেখিলাম বিভিন্ন রকমের সামুদ্রিক মাছ ও সাপ। তিমি মাছ ছিল, কিছুদিন হইল মরিয়া গিয়াছে, যাঁহারা জীবতত্ত্ব আলোচনা করেন, তাঁহাদের কাছে ইহার প্রচুর মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের মত অবৈজ্ঞানিকদের কাছে উহা মাত্র দৃশ্য দেখা হিসাবে—ইহার বিশেষ মূল্য নাই। জীবজন্তুর সংগ্রহ খুবই কম।
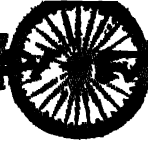
তবে Aquariumএ মাছের যে বর্ণবৈচিত্র দেখিয়াছি, তাহা যেমন নূতন—তেমনি নয়নাভিরাম। কতকগুলি পরীর মত নাচিতেছে, এরাই বোধ হয় সেকালের mar-maidগণের কন্যা-পুত্রবধূ হইবে।

Aquarium-এ যাইবার ও ফিরিবার পথে সমুদ্রের যে রূপ চোখে পড়িল তাহা অপূর্ব। কূলের সমুদ্র সবুজ, দূরে নীল—গাঢ় নীল নয়, আকাশের সংগে একেবারে একবর্ণ, মাঝে মাঝে সবুজ, মাঝে মাঝে ধূসর, স্থানে স্থানে আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য করিবার উপায় ছিল না।

এই সমস্ত বাজে কাজে এত সময় গেল যে, সহর দেখা আর হইল না—অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বেলা প্রায় ৩টার সময় জাহাজে ফিরিলাম।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি—বেলা পাঁচটার ঘণ্টার জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে অমল্যর একখানি পত্র পাইলাম। মনটা ব্যস্ত ছিল—একটু প্রফুল্ল হইল। আহারের পর ডেকে প্রায় রাত ৯টা পর্যন্ত বেড়াইলাম—সেই সময় জাহাজ ছাড়িল, বন্দর হইতে বাহির হইয়া বরাবর দক্ষিণমুখো। বহুদূর পর্যন্ত মাদ্রাজ উপকূলের আলোর রেখা দেখা গেল। তারপর কেবিনে গিয়া শুইলাম। পান্নাবাবু প্রভৃতি অনেক রাত অবধি গান করিয়াছিলেন। ঘুমের ঘোরে গানের সুর কানে আসিতে লাগিল—বেশ মধুর।

১৬ই মঙ্গলবার। সকালে অনেকক্ষণ ডেকে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আবার সেই অসীম আকাশের নীচে অনন্ত নীলাম্বু। মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গান গুঞ্জরিত হইতেছে—"অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে, আকাশ কাঁপে তারার আলোয় গানের সুরে—"। কেন যে এগানটী বিশেষ করিয়া মনে হইল জানিনা—সংগে সংগে একথাও মনে হইল, বাংলাদেশের অন্য সব কবি লোকালয়ের কবি, একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই মহাসমুদ্রের ছন্দের মিল!

"যাজে ব'লেই বাজাও তুমি সেই গরবে,
ওগো প্রভু, আমার প্রাণে সকলি সবে,
বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারে বারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা—
ব্যথায় ভ'রে॥"

কিছুদিন আগে কল্পনাও করি নাই, এই দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা আমার মত আনাড়ি পাড়াগেঁয়ের পক্ষে সম্ভব। কোথায় সুদূর নিউইয়র্কে কোন নূতন শাখা জ্বলিবে, কোন্ নটরাজের আরতি হইবে, তাহার ভার পড়িল যাদের উপর, অতিক্ষুদ্র পাশ্চাত্যসভ্যতা-ভীরু আমি তাঁদের একজন। ইহার আনন্দ আছে।

সকালে লঙ্কার উপকূলে পৌঁছিবার সম্ভাবনায় রাত্রে মেঘনাদবধকাব্য পাঠ করিলাম।

"একাকিনী শোকাকুলা আঁধার কুটীরে
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা নীরবে।"

১৭ই বুধবার। সকালে উঠিয়াই জাহাজের পশ্চিম দিকের সড়কে গিয়ে দাঁড়াইতেই "সুবর্ণদ্বীপমালিনী" লঙ্কার উপকূল দেখা গেল। জাহাজ হইতে কূল ৪।৫ মাইল হইবে। সাগর তীরে শুধু বনজঙ্গল আর পাহাড়। মাঝে মাঝে ধোঁয়া দেখা যাইতেছিল—মনে হইল হয়তো বা উহার মধ্যে লোকালয় প্রচ্ছন্ন আছে। এই লংকার সংগে আমাদের ভারতীয়গণের অনেক স্মৃতি জড়িত। আদিকবি বাল্মীকি, কৃত্তিবাস ও মাইকেল এই ক্ষুদ্রদ্বীপকে অমরত্বের জয়মাল্যে ভূষিত করিয়াছেন। আজ লঙ্কার রাবণও আমাদের আত্মীয়। মনে হয় বুঝি তিনি মরেন নাই, ঐ ধূম্রাকার পাহাড়ের মধ্যে আজও সর্বনরলোকচক্ষুর অন্তরালে—

"কনক আসনে বসি দশানন বলী
হেমকূট হৈমশিরে, শৃঙ্গবর যথা
তেজঃপুঞ্জ।"

যে সমুদ্র দিয়া আজ আমরা যাইতেছি এই সমুদ্রেই হয়তো একদিন রাবণ ও মেঘনাদ নৌকায় ও পুষ্পকে কত বিচরণ করিতেন। লংকার এই পূর্ব উপকূল একদিন ধনজনে সভ্যতায় হয়তো পরিপূর্ণ ছিল—তারপর কোথায় গেলেন সে রাবণ—সে দোর্দণ্ডপ্রতাপ দশগ্রীব।

তারপর আরো কত স্মৃতি—ধনপতি সওদাগর, শ্রীমন্ত সওদাগর, বাংলার চণ্ডীকাব্য—বাংলাদেশের সওদাগরেরা যখন দেশবিদেশ হইতে ধন আহরণ করিয়া বঙ্গমাতাকে
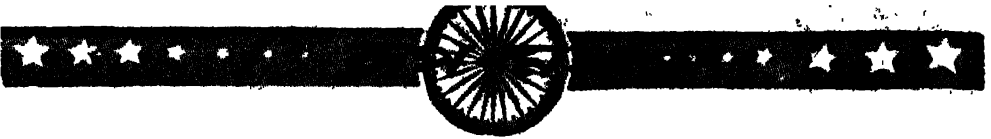
সমৃদ্ধ করিতেন। এই সমুদ্রেরই কোথাও শ্রীমন্ত "কমলে কামিনী" দেখিয়াছিলেন। আজ আর সে দিন নাই। বাংলার তরী নাই, বাণিজ্য নাই, সওদাগর নাই। পরের জাহাজে পরের দেশে যাইতেছি—"ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

তারপর ইতিহাসের সেই বিজয়সিংহ—সিংহবাহু রাজার

পুত্র—পিতাকর্তৃক ত্যক্ত হইয়া সাতশত সংগী লইয়া অর্ণবপোতে লংকাদ্বীপে আসেন।

বাংলার অর্ণবপোত শুধু দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীকবিকঙ্কণের কল্পনা নয়, সত্যই তার অস্তিত্ব ছিল।

বঙ্গসাগর বা কালাপানির জলের সংগে লংকার সম্মিলিত ভারত মহাসাগরের জলের বর্ণভেদ লক্ষ্য করিবার বিষয়। কালাপানি নাম হইতেই বঙ্গসাগরের জলের রঙ অনুমান করা যাইতে পারে। সে জলের রঙ একেবারে নীল—কৃষ্ণ বা কালির গায়ের রঙের মত, আর এখানকার জলে রং নবদুর্বাদলশ্যাম—শ্রীরামচন্দ্রের গায়ের রং।

গতকল্য হইতে সীতার ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছি, নিউইয়র্কে সীতা অভিনয় হইবে। আজ শেষ রাত্রেই জাহাজ কলম্বো পৌছিবে।

সকালবেলা বোধ হয় সহর দেখিতে যাইব। তার আগে কয়েকখানা চিঠি লেখা দরকার।

১৮ই বৃহস্পতিবার—রাত্রিশেষে সমুদ্র অতি উত্তাল হইয়া উঠিল, সংগে সংগে ভীষণ বৃষ্টি। কুহেলি-গুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া জাহাজ চলিতেছিল এবং মাঝে মাঝে বাঁশী বাজাইয়া আপনার অস্তিত্ব জানাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই নঙ্গর ফেলার শব্দ, তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। অনুমানে বুঝিলাম কলম্বো। বাহিরে আসিয়া দেখি অদূরে পোতাশ্রয়। আমরা সহর দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মাদ্রাজে জাহাজ একেবারে কিনারার গায়ে গিয়া লাগিয়াছিল। এখানকার ব্যবস্থা সেরূপ নহে, বন্দরের মাঝখানে জাহাজ হইতে সিঁড়ির সাহায্যে নামিয়া জলি বোটে করিয়া কিনারায় আসিতে হয়। আমাদের জাহাজের মাঝি মাল্লারা সবাই ভদ্রবেশ ধরিয়া ডাঙ্গায় নামিয়া গেল। কলম্বো বন্দর মাদ্রাজ বন্দরের চেয়েও সুন্দর। যাত্রীদের জেটী অতি সুন্দর—দোতলা কাঠের বাড়ী—টিন দিয়া ঢাকা চমৎকার! নৌকা করিয়া তীরে যাওয়া বড় ভাল লাগিল। বন্দরের দ্বার পার হইয়াই সহর। পূর্বদেশগামী সমস্ত জাহাজই প্রায় কলম্বোতে থামে। ইহারই কারণে স্থানটী অনেকটা পরিমাণে সর্বজনীন (cosmopolitan) সহরের ভাব ধারণ করিয়াছে। প্রথমে শুনিয়াছিলাম কলম্বোতে ২দিন জাহাজ থাকিবে, পরে

বুঝিলাম বেলা ৩টায় ছাড়িবে। পোষ্টাপিসে পত্রাদি রওনা করিয়া মনোরঞ্জন বাবু আর আমি সহর দেখিতে বাহির হইলাম ট্রামে—সহরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বড় বড় দোকান—একতলাটী সাধারণতঃ মাটির ভিতর। অধিকাংশ ব্যবসাদারই স্থানীয় অথচ দোকানগুলি আমাদের চৌরঙ্গীর দোকানের চেয়েও সুন্দর। অনেক জিনিষের দর ভারত বর্ষের চেয়েও বেশী। আমরা ট্রামে করিয়া সহরের শেষ প্রান্ত, বেলষ্টেশন সব ঘুরিয়া দেখিলাম। রাবণ রাজার আর কোন চিহ্নই লঙ্কায় নাই। বুদ্ধদেব তাঁর মহামন্ত্রে রাবণের রাবণত্ব একদিন যে একেবারে বিলোপ করিয়া ছিলেন তাহার অনেক নিদর্শন আছে। রাস্তায় প্রচুর বৌদ্ধভিক্ষু ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। রামানন্দ বাবুর রামায়ণের বিভীষণ ও চেড়ীদের চেহারার সংগে লক্ষ্য করিলাম। অনেকে মিউজিয়ম দেখিতে গিয়াছিলেন। আমাদের দেখা হয় নাই। রাজা অশোকের পুত্রকন্যা মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা এখানে প্রথম বৌদ্ধধর্মের অমৃতময়ী বাণী আনেন ইংরাজ অধীনে আসার পর পাশাপাশি খৃষ্টধর্মেরও বহুল প্রচার হইয়াছে। বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম এখানকার প্রধান ধর্ম। স্থানীয় সাধারণ লোক ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন। যে দুই চারিজনের সংগে আলাপ হইল, তাঁহারা দেখিলাম ভারতের অবস্থা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। কেল্লার পাশে সমুদ্র বেলা—সেখানে আমরা দু'জন অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম গান মনে পড়িল—"সাগরকূলে বসিয়া বিরলে গণিব লহরমালা"—নিছক কবিকল্পনা, লহরমালা গণা একেবারেই অসম্ভব। সিংহলের ডাব সম্বন্ধে ভাল ধারণা ছিল। ডাব কিনিয়া খাইলাম। জল যেমন শীতল, তেমনি মিষ্ট, জলের পরিমাণও সেই পরিমাণে বেশী। ১৫ সেন্ট অর্থাৎ ৵১০ পয়সা দাম নিল—জাহাজে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম কেহ কেহ ৴০ আনায় খরিদ করিয়াছেন। আমাদের সান্ত্বনা আমরা দর করি নাই, একদরে কিনিয়াছি। জাহাজে ফিরিয়া বাড়ী হইতে অমূল্য ও সুরেশের তার পাইলাম। বাড়ীর সংবাদ মোটামোটি বেশ ভাল। বেলা ৪৷০ টায় জাহাজ ছাড়িল। এবার বৃহৎ পাড়ি—ভারত মহাসাগরের পর আরব সাগর—তারপর এডেনের নিকট দিয়া লোহিত সাগরের ভিতর দিয়া সুয়েজখাল, সেইখানে জাহাজ থামিবে। কম করিয়া ১২ দিন লাগিবে। দুর্গাশ্রীহরি—দুর্গাশ্রীহরি—দুর্গাশ্রীহরি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে সূর্যাস্ত দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখি দিগন্তের কোলে একখানি পালের নৌকা সমুদ্রের তরঙ্গ ভেদ করিয়া সিংহলের দিকে যাইতেছে। বোধ হয় এডেন হইতে আসিতেছে চারিদিকের অতি-কায় যন্ত্র ও বিলাতী সভ্যতার প্রাচুর্যের মাঝখানে চরকার খদ্দরের প্রতিযোগিতার মত চারিদিকের বড় বড় ষ্টীম জাহাজ ও মোটর জাহাজের মধ্যে এই ক্ষুদ্র তরণীখানিকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। তরণী উত্তাল তরঙ্গকে ভয় করে নাই—চলিয়াছে এশুধু তার ক্ষণিকের জলখেলা নয়, সে লক্ষ্মীর বাহন একদিন চাদসদাগর, ধনপতি, শ্রীমন্ত, এইরকম বাহনেই দেশবিদেশ হইতে ধন বহন করিয়া ধনেশ্বরী বঙ্গ-মাতাকে সমৃদ্ধ করিতেন। আমরা পশ্চিমমুখেই চলিয়াছি, আমাদের সম্মুখে সূর্য অস্তসাগরে ডুবিবেন—বোধকরি বৃটিশ সোমালীল্যাণ্ডে। এবার আমাদের সম্মুখে আফ্রিকা, দক্ষিণে ভারত, পশ্চাতে স্বর্ণলঙ্কা। বলিতে ভুলিয়াছি, লঙ্কায় সোণা সস্তা হউক না হউক, মণিমুক্তার বড়ই প্রাচুর্ভাব। অনেক-বড় বড় দোকান আছে, মিউজিয়ম আছে।

রাতে আবার একবার মেঘনাদবধ পড়িলাম—"লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে"। রাত্রে তন্দ্রাঘোরে অনুভব করিলাম, জাহাজ বেশ দুলিতেছে, এ দোলা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে।

১৯শে শুক্রবার।—

পূর্ব দিক পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়াছি—বহুদিন এইভাবে চলিতে হইবে। তারপর এডেন, পরে লোহিত সাগর পার হইয়া সুয়েজ, সেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ থামিবে; তারপর থামিবে আফ্রিকার উপকূলে সৈয়দ বন্দরে। কাজ নাই, কর্ম নাই, শুধু দিনে তিনবার আহার, ডেকে কিছুক্ষণ বিচরণ আর রাত্রে নিদ্রা। গীতার ইংরাজী অনুবাদ করিতেছি আর ডায়েরি লিখিতেছি। সন্ধ্যার পর রবীন্দ্রনাথের জাহাজে লেখা 'ঝড় কবিতাটি

পড়িতেছিলাম। কেবিনে থাকা লক্ষ্য করিয়া কবিবর লিখিতেছেন—

"আঠারো দিন এমন ঘরে থাকতে কেবা পারে?" তবু তাঁর কবিপ্রতিভা তাঁহার সহযাত্রী ছিল। আমাদের থাকতে হবে ১৮×২=৩৬ দিন তো বটেই, হয়তো বা ৩৬+৯=৪৫ দিন! যখনই চিন্তা করি, তখনই দমিয়া যাই। যে আমেরিকাবাসী জার্মাণ আমাদের আহার্য্য পরিবেশন করিতেন, তিনি মাদ্রাজে নামিয়া গেছেন, সেখানকার হাঁসপাতালে চিকিৎসা করিবার জন্য—তাঁহার গলায় একরকম ঘা ছিল। তাঁহার পরিবর্তে মাদ্রাজ হইতে একজন মাদ্রাজী লওয়া হইয়াছে ঐসমস্ত কাজ করিবার জন্য। এই লোকটা আমাদের দেশীয়ভাবে খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। আজ বৈকালে চিংড়ীমাছের তরকারী আর ভাত দিয়াছিল সংগে রোহিত মৎস্যের ফ্রাই। ব্রাহ্মণভোজনের ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। ক্রমেই জাহাজের খাদ্যে অভ্যস্ত হইতেছি—জয় জগন্নাথ! পৃথিবীর সমস্ত জাতির সংগে আত্মীয়তা স্থাপিত হইতেছে।

২০শে—শনিবার, দেখিতে দেখিতে দশ দিন কাটিয়া গেল, আশা করা যায় বাকি দিন গুলিও কাটিবে। আকাশ চন্দ্রাতপের নীচে সমুদ্রের বৃহৎ খাঁচায় বন্দী। কাল রাত্রে একবার রুদ্রমূর্তিতে ঝড় দেখা দিয়াছিলেন—হঠাৎ শান্ত হইয়া শুধু বারি বর্ষণের দ্বারা আপনাকে রিক্ত করিলেন। সকালে তারাকুমার বাবু ও পান্না বাবু গাহিতেছিলেন। হঠাৎ কাহার তীব্র কণ্ঠ সমস্ত গান ছাড়াইয়া সুরের প্লাবনে সমস্ত জাহাজ খানিকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—অবহিত চিত্তে শুনিতে শুনিতে বুঝিলাম, আমাদের architect শ্রীশবাবু গান গাহিতেছেন —শ্রীশবাবু যে গান গাহেন পূর্বে জানা ছিল না। এতক্ষণে আমরা বোধ হয় ছেলে বেলাকার ভূগোল পড়া লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপের সন্নিহিত হইয়াছি!

২১শে রবিবার।

কাল শনিবার বৈকালে বেলা চারিটায় বিপদসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইল—আমরা পূর্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলাম এবং প্রস্তুত ছিলাম। সুতরাং Life-belt পরিয়া উপরের ডেকে উঠিলাম—গত শনিবারের মত এ দিনেও মাঝি মাল্লারা (crew) নৌকা নামাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। শুনিতে পাই অবশ্য নিজে ঠিক বোঝা যায় না—Life-belt পরিয়া আমাকে চমৎকার মানাইয়াছিল। একটা Life-belt চুরি করিয়া কলিকাতায় থিয়েটারে আনিবার লোভ হইয়াছিল—এরাস্ত খাঁ—বা নবীন তপস্বিনীর "জলচর" সাজিবার জন্য কাজে লাগিতে পারে।

রবিবার দিন প্রথমেই শুনিলাম, আর ৬ দিন পরে এডেনে পৌছিবে, তবুও সেখানে জাহাজ থামিবে না—তারপর সমস্ত লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল তারপর সুয়েজ। আমি সীতার ইংরাজী অনুবাদ চালাইতেছি, পরে মনোরঞ্জন বাবু প্রভৃতি Bernard Shaw প্রণীত "Intelligent Women's Guide to Socialism" পুস্তকখানি বিশেষ আলোচনা করিয়া পড়িতে ছিলাম। বড় উৎসাহে diary লিখিতে আরম্ভ করি, পূর্বে অভ্যাস ছিল না। এই আমেরিকা যাত্রা জীবনের খুব বড় ঘটনা মনে করিয়া কাজটা আরম্ভ করি। এখন মনে হয় মুস্কিলে পড়িয়াছি। জাহাজ একঘেঁয়ে চলিয়াছে আর আমরা এগারোটি প্রাণী জেলের কয়েদীর মত কোন মতে নির্দিষ্ট জীবন যাত্রা করিতেছি। জাহাজে একটী অপরিচিত যাত্রা ও নাই যাহার সহিত বা শত্রুতা করি। ইংরাজীতে কথা কওয়ার ফলে ইংরাজী অভ্যাস হবে মনে করিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি ইংরাজীতে কথা কওয়ার কোনই আবশ্যক নাই। চটিয়া গিয়া অমলেন্দু বাবু সঙ্কল্প করিয়াছেন, ইংরাজীতে কথা কহিবেনই। তারাকুমার বাবুর একটু জ্বর হইয়াছে—ম্যালেরিয়া।

মোঁপাসার গল্পের বই বিশ্ববাবু সংগে লইয়াছেন। কয়েকটী গল্প পড়িলাম। মোঁপাসা নূতন লেখক নহেন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি যথেষ্ট আছে। আমার মতামতে তাঁহার কিছুই আসে যায় না। দেশে থাকিতে অনেকবার শুনিয়াছি—"প্রভাত বাবু বাংলার মোঁপাসা—।" আমার মনে হয়, মোঁপাসা তাঁহারই দেশের বোকাশিয়োর মন্ত্র শিষ্য। মানুষের দুর্বলতা ও পাপ তাঁহার গল্পের বিষয় বস্তু। মৃদু হাস্য রসের দিক দিয়া প্রভাত বাবুর সহিত মোঁপাসার অল্প মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ ও
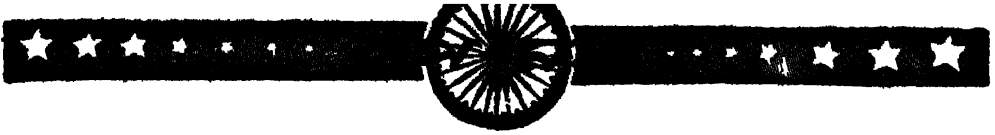
শরৎচন্দ্রের বিশুদ্ধ করুণ রস মোঁপাসার কোথায়ও নাই। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের লজ্জিত হইবার আদৌ আবশ্যক নাই। অবশ্য পৃথিবীর কোন সাহিত্যই পড়ি নাই, তবু যাহা নমুনা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে, তাহা হইতেই বোধ করি জোর করিয়া বলা যাইতে পারে কোন সাহিত্যের কাছেই বাংলাকে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে না।

২২শে সোমবার—আজ শ্রীশ্রীমহালয়া, কোথায় গঙ্গাস্নান করিয়া পিতৃপুরুষের তর্পন শ্রাদ্ধাদি করিব, তা নয় সকালে উঠিয়াই ম্লেচ্ছের হাতে আহার করিতে হইল—সুবিধার মধ্যে এই যে, ম্লেচ্ছকে আর ম্লেচ্ছ বলিয়া মনে হয় না এবং অভ্যাস গুণে অখাদ্যও সুখাদ্য হইয়া উঠিয়াছে। যদি কখনো হিন্দু রাজত্ব হয়, হিন্দু জাহাজ হয় দেশ বিদেশ যাইবার জন্য, তাহাতে বাথরুম থাকিবে না; জাহাজে যে সিঁড়ি আছে থাকিবে। উহারই সংগে একটা প্লাটফরম, সমুদ্রের জল পর্যন্ত পৌঁছিবে। যাত্রীরা সেইখানে সমুদ্রস্নান করিয়া অনায়াসেই তর্পনাদি করিতে পারিবেন। জাহাজের নিয়মানুবর্তী দেখিলে অনেক শিক্ষা হয়। মনে হয়, এই নিয়মের বন্ধনই মানুষকে মানুষ এবং জাতিকে জাতি করিয়া তুলে। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা সর্বপ্রথম শিখিলাম নিয়ম ভাঙিতে। হিন্দুর আচার ব্যবহার, জীবন ধারা, সন্ধ্যা তর্পন সমস্তই ভাঙিলাম। নিয়ম করিয়া কোন কাজ করা আজ প্রায় আমাদের সাধ্যাতীত হইয়াছে।

২৩শে মঙ্গলবার—

তারাকুমার বাবু বলিলেন কলম্বোতে একটি ইটালিয়ান হোটেল আছে—সেখানকার রান্নাও চমৎকার, দক্ষিণাও বেশ। আমি প্রশ্ন করিলাম, বাংলা রান্না জগতে চালান যায় কিনা? আমেরিকায় বা লণ্ডনে শুনিতেছি ভারতীয় হোটেল আছে—। বাংলা রান্নার বিশিষ্টতা লইয়া কোন কোন হোটেল আর কোথাও আছে কিনা। বাংলার ধর্ম বিদেশে পরিবেশন করিয়াছেন বিবেকানন্দ—জাতীয় সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ—নাট্যশিল্প পরিবেশনের ভার পড়িয়াছে শিশির ভাদুড়ীর উপর। ভাবিতেছি জাতীয় রান্না পরিবেশনের ভার কাহার উপর পড়িবে।

সুকতুনি, ঘণ্ট, ছেঁচকি, পায়স, পিঠা, সন্দেস, রসগোল্লা, লুচি—পৃথিবীর সর্বজাতিকে পরিতোষপূর্বক আহার করানো যাইতে পারে। গীতার ইংরাজী অনুবাদ কাল শেষ হইল শুধু গান কয়েকটি বাকি। এইবার "দিগ্বিজয়ী"র অনুবাদ আরম্ভ করিব। হাতে বিস্তর সময়। ভগিনী নিবেদিতার 'Foot falls of Indian history" পড়িতেছি। এই বিদেশিনী মহিলাটী হিন্দুর অন্তঃকরণ লইয়া হিন্দুস্থানের ইতিহাস বিচার করিয়াছেন। আমরা যাহা হারাইয়াছি—ইনি অতি সহজেই তাহা পাইয়াছেন।

বোধ করি এতদিনে সকোট্রা দ্বীপের সন্নিহিত হইয়াছি। আকাশ পরিষ্কার সমুদ্র সূর্যকরোজ্জ্বল—মাঝে দুই এক খণ্ড মেঘ আকাশে দেখা যায় এইমাত্র। বর্ষা শেষ হইয়াছে, শুভ্র শরৎ আজ আমাদের যাত্রা সহচর। বাংলার শরতের সংগে আকাশে বাতাসে আফ্রিকার উপকূলের শরতের কোন প্রভেদ নাই। তবে শরতের শেফালী আর বাংলার প্রাণ হইতে প্রবাহিত আগমনী গানের ঝংকার এ কূলহারা সমুদ্রের মধ্যে কোথায় পাইব। দেবীপক্ষ পড়িয়াছে। আমার অন্তরে ধ্বনিত হইতেছে ছেলেবেলাকার শোনা সুর, প্রতিবৎসর যাহা নূতন হইয়া আমার কানে ও প্রাণে মধু ঢালিয়াছে—

'গা তোল গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল মা তোর পাষাণী ঈষাণী—
লয়ে যুগল শিশু কোলে
মা কই, মা কই ব'লে
ডাকছে মা তোর শশধর বদনী॥"

শশধর বদনীর শশধর লাঞ্ছন মুখকমল এবার আর দেখা হইল না।

২৪শে বুধবার। কাল রাতে বেশ শীত পড়িয়াছিল। সকালবেলা বেশ শীত শীত। পান্নাবাবু, অমলবাবু, প্রভৃতি সকলে কার্যাভাবে দেবুর সহিত তর্ক আরম্ভ করিয়াছেন—দেবুর ও প্রতিজ্ঞা, কিছুতেই তকে হারিবে না—এরূপ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত যাহা হয়, দেবু কাঁদিয়া জিতিল। বাতাস প্রবল। একটু শীত পড়িয়াছে।
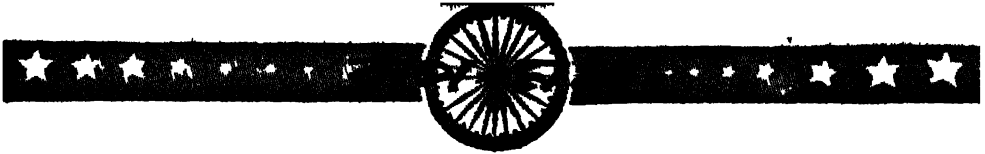
২৫শে বৃহস্পতিবার—

জাহাজের ডেকে দাঁড়াইয়া সমুদ্রের পানে চাহিলে আমাদেরই বিশ্বাস করা কঠিন হয়, আমরা আমেরিকা যাইতেছি। জাহাজে আমরাই যাত্রী, অন্য যাত্রী নাই। আর আমরা কয়জনই হাড়েমাসে এমনই বাঙ্গালী, বাংলার সুদুর পল্লী না খুঁজিলে আমাদের মত বাঙালী কলিকাতাতেও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। আমরা নিউইয়র্কে যাইতেছি ডাক্তারী পড়িতে নয়, কলকারখানায় কাজ শিখিতে নয়—ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা বাণিজ্য এসব শিখিতে নয়। বাংলা থিয়েটার করিতে।—বালেশ্বর, কটকে গিয়া বাংলা থিয়েটার করিলে দর্শক বুঝিতে পাবে না, আর আমরা নিউইর্কে গিয়া বিশুদ্ধ বাংলা অমৃতাক্ষর ছন্দে পৌরাণিক নাটক অভিনয় করিব। ভাল করিয়া চিন্তা করিতে গেলে ব্যাপারটা স্বপ্নের চেয়েও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। বাংলা কথা, বাংলা গান—বাঙালী নটনটীর অভিনয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবে আজও বাংলা থিয়েটার হয় নাই, প্যারী লণ্ডনে হয় নাই, হইতে চলিল নিউইয়র্কে। বিজ্ঞজন মাথা নাড়িয়া হয়তো বলিবেন—"ছেলেখেলা!" অথচ এই ছেলেখেলায় ইহার মধ্যে অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে।

কাল রাত থেকে বাতাস বেশ উতলা। শুনিয়াছিলাম আরব সাগর শান্ত, বঙ্গসাগরের তুলনায় কম মনে হইতেছে না। যেখানে পৌঁছিয়াছি এখান হইতে এডেন নাকি ৪০০ মাইল হইবে। করাচী হইতে "নিউ অর্লিন্স" জাহাজে শিশির বাবু, Ernic Elliot, অভিনেত্রীবৃন্দ পূর্বে মনে করিয়াছিলাম Wireless এ যাইতেছেন। খবর এই জাহাজে বসিয়াই পাওয়া যাইবে কিন্তু পাওয়া যায় নাই।

বেলা ১০টা ১১টার সময় বেবু উল্লসিত হইয়া বলিল Land, Land যে কলম্বসের মত সেও নূতন ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়াছে। আমাদের দক্ষিণে দূরে অর্ধচন্দ্র রেখার মত পাহাড় ঘেরা উপকূল দেখা যাইতেছে বটে। কেহ বলিলেন—আরব উপকূল—কেহ বলিলেন সকোট্রা পরে স্থির হইল সকোট্রার পাশে অনামা—ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহার প্রায় ঘণ্টা দুই পরে—আমাদের বামে আফ্রিকার উপকূলের পাহাড় দৃশ্যমান হইল। এই স্থানে আসিবার সংগে সংগেই সকালের সেই শীত শীত ভাবটা কাটিয়া গিয়া দেখিতে দেখিতে গরম পড়িয়া গেল। জাহাজ উপকূলের খুব নিকট দিয়া চলিতেছে। সমুদ্রের নীল নীর একেবারেই প্রশান্ত, ঝির-ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছিল। আফ্রিকার মরুমলয়। শান্তি জলের ভিতর দিয়া দলে দলে মাছ ও অন্যান্য জলচর খেলা করিতেছে দেখা গেল। সকাল থেকে শরীরটা বেশ ভাল ছিল না, স্নানটা বাদ দিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্নান করিতেই হইল।

সন্ধ্যার পূর্বে সকলে ডেকে সমবেত হইলাম। এটা প্রায় প্রাত্যহিক অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। আজকার সূর্যাস্ত যেমন সুন্দর তেমনি স্বচ্ছ, সমস্ত পশ্চিম আকাশটি রাঙায় রাঙা মনে হইতেছে, বুঝিবা সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার রাগ শক্তির জীবনধারার আভাস দিয়া আজিকার দিবাকর অস্ত গেল।

২৬শে শুক্রবার—

সমুদ্র তেমনই শান্ত কিন্তু কোনদিকে কোন উপকূলের চিহ্ন নাই যেন বৃহৎ সরোবরে। বোধকরি বাবেল মাণ্ডেব প্রণালীর মধ্য দিয়া চলিয়াছি। বড় মুস্কিলে পড়িয়াছি—কিন্তু উপায়ই বা কি?

সমুদ্র সম্বন্ধে কবিতা লেখেন নাই এমন বাঙালী কবি নাই বলিলেই হয়—আমার যাহা হউক লেখক বলিয়া সামান্য একটু খ্যাতি আছে—সমুদ্র সম্বন্ধে দুইচারি ছত্র ও পরারও যদি না লিখি মান থাকে। এই সমুদ্র কত অ কবিকে কবি করিয়াছে—আর আজ ১৭ দিন দিবারাত্রি সমুদ্রের বুকে থাকিয়াও যদি কিছু না লিখিতে পারি, নিজেরই কাছে লজ্জিত হইতে হয়। কত বঙ্গীয় কবি শুধু সমুদ্রের উপর
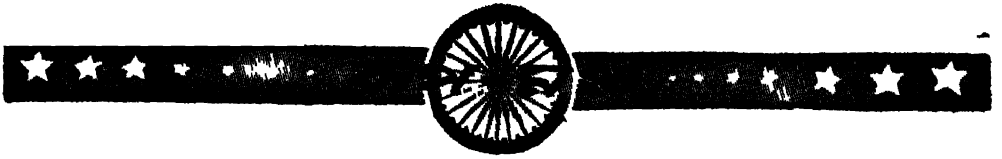
কবিতা লিখিবার জন্যই পুরী গিয়া থাকেন। কিন্তু যতবারই লিখিব মনে করি রবীন্দ্রনাথ কালিদাস ও Byron তিনে মিলিয়া আমার মস্তিষ্কে এমনই গণ্ডগোল বাধিয়া যায়—যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না—সমুদ্র সম্বন্ধে কোনো মৌলিক কবিতা রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব।

২৭শে শনিবার—

সকালে উঠিয়াই শুনিলাম, রাত্রে কখন অমর চন্দ্রাবস্থায় আমরা এডেন বন্দর ছাড়াইয়া আসিয়াছি— একটু বেলা হইলেই দুইদিকের উপকূলই দেখা যাইতে লাগিল—একদিকে আফ্রিকা—অন্যদিকে আরব—আমার কালকার অনুমান সত্য-নহে এখনই আমরা বাবেলমাণ্ডপ প্রণালীর ভিতর দিয়া যাইতেছি। আমাদের ডানদিকে ক্ষুদ্র একটি পস্তরময় দ্বীপের উপর ছোট একটি সহর। সহরের নাম পেরিম, পূর্বে ম্যাপে দেখা ছিল, এখন চর্মচক্ষে দেখিলাম। সুন্দর ছবিখানির মত—ঘর, বাড়ী, বন্দর, জাহাজ, অয়েল কোম্পানীর তৈলধারার সমস্তই আছে, নাই কেবল বৃক্ষ। স্থানটি মরু সহর, আচারে বুঝিতেছি। জাহাজে খুব গরম তিন দিন আগে বাক্স হইতে গরমের কাপড় বাহির করিয়াছি। আফ্রিকা হইতে পাখীর দল অনবরত আরব উপকূলে উড়িয়া আসিতেছে। সেইখানেই কি ছায়া ও নীর মিলিবে—?

বৈকালে সেই Boat drill—তখন আমরা লোহিত সাগরের ভিতর পড়িয়াছি। লোহিত সাগরে মাঝে মাঝে প্রস্তরময় দ্বীপ আছে, তাহারই একটির সন্নিহিত হইয়াছি। এমন সময় সাংকেতিক ঘণ্টা বাজিল—ইহাতে আর নূতনত্ব নাই। রাত্রে ভয়ানক গরম—অনেকেই ডেকে শুইলেন। আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত ডেকে বেড়াইয়া ১১টা আন্দাজ রাতে কেবিনে ঢুকিলাম। অর্ধ তন্দ্রা-জাগরণে রাত্রি প্রভাত হইল।

২৮শে রবিবার—

শ্রীশ্রীমহাষষ্ঠি। ভোর না হইতেই 'দুর্গা' নাম স্মরণ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। সুন্দর প্রভাত—লোহিত সাগর প্রায়ই প্রশান্ত থাকে—নদীর মত—প্রভাত বায়ু রাত্রির সমস্ত অবসাদ এক মুহূর্তেই হরণ করিয়া লইল—রবীন্দ্রনাথের গান মনে পড়িল—

"তোমার আশীর্বাদ হে প্রভু
তোমার আশীর্বাদ"

আজ শ্রীশ্রীমহাষষ্ঠি যখনই যেখানে থাকি না কেন বাঙালীর ছেলের পক্ষে আজ থেকে আরম্ভ করিয়া এই কয়টি দিন ভুলিয়া থাকিবার উপায় নাই। আজ ৪১ বৎসর ধরিয়া এই শারদোৎসব কোথায় কেমন কাটিয়াছে—তার কত বিচ্ছিন্ন চিত্র মনে পড়িতেছে। কত বৎসর থিয়েটার করিয়াছি। থিয়েটারের আগে প্রায় ১২ বৎসর পূর্বে প্রফুল্ল ও আমি বন্ধুবর নগেন্দ্রবাবুর দেশের বাড়ীতে ৺পূজায় নিমন্ত্রিত হই। তখন প্রফুল্ল করেন ওকালতি আর আমি মাষ্টারি আর আজ প্রফুল্ল জলে—আর আমি লোহিত সাগরের উপরে এক জাহাজের কেবিনে বসিয়া আমেরিকায় চলিয়াছি। সেদিনের পর জীবন আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। তখনো যৌবন, বয়স ২৯ বৎসর, অনেক কিছু আশা করিবার ছিল—। অনেক পুরাতন বন্ধুর কথা মনে পড়িতেছে—সংগে সংগে বাড়ীতে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ও আত্মীয় স্বজনের কথা ভাবিতেছি। লোহিত সাগরে পড়ার পর থেকে অনেক জাহাজের সংগে দেখা হইতেছে। কাল সর্বসমেত ৮।১০ খানা জাহাজ আমাদের জাহাজকে অতিক্রম করিয়াছে।

মনে পড়ে দুই বৎসর আগে শ্রীশ্রীমহাষ্টমীর দিন ১৩৩৫ সাল—সেদিন আগমনী আর রঘুবীর নাট্যমন্দিরে অভিনয়। দিগ্বিজয়ী নাটকের প্রথম streamer poster সেদিন ছাপাইয়া আসিয়াছে। সেইদিন এক স্কচ্ যুবক Statesman পত্রিকার একজন কর্মচারীর সহিত বাংলা থিয়েটার দেখিতে নাট্যমন্দিরে আসেন। শিশির বাবুর সংগে সাহেবের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল—আমাদের সংগে অল্পবিস্তর পরিচয় হইল মাত্র। ইঁহার নাম Eric Elliot, যুবক অভিনেতা—ভারতবর্ষ দেখিতে আসিয়াছেন। সেদিনকার সেই পরিচয়ের ফলেই আজ আমরা আমেরিকা যাইতেছি।

(ক্রমশঃ)

সশ্রদ্ধ ঘোষণা

আঠারো বৎসর পূর্বে সুদূর আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর কাছে—সেখানে বাংলা নাট্যাভিনয় করবার জন্য। জাতির মহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করে, নাট্যাচার্য নানান ঝুঁকি গ্রহণ করেও এই আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারেন নি। বাংলার নাট্যান্দোলনের ইতিহাসে নাট্যগুরুর এই অভিযান—চিরদিন স্মরণীয় হ'য়ে থাকবারই কথা। কিন্তু এই গৌরবদীপ্ত অভিযান সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিস্তারীত কিছুই জানি না। কেবল গল্পের মত আমাদের মনে রেখাপাত করে আছে—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য এর কতটুকুই বা রেখে যেতে পারবো! অথচ এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট কর্তব্য রয়েছে। বাংলার জনপ্রিয় নট ও নাট্যকার শিশির সম্প্রদায়ের অন্যতম স্তম্ভ স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ও এই অভিযানের একজন যাত্রী ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ এই কর্তব্যের কথা মনে করেই—আমাদের সামনে এই অভিযানকে পূর্ণাংগ ভাবে তুলে ধরবার জন্য তাঁর রোজ-নামচায় একে লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে প্রত্যাগমন করবার কিছুকাল পরে তাঁর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের অনুরোধে 'শ্যামলী' পত্রিকায় তা প্রকাশ করবার অনুমতি দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর, সম্ভবতঃ উক্ত পত্রিকা বন্ধ হ'য়ে যাওয়াতে এই রোজ-নামচার প্রকাশও বন্ধ হ'য়ে যায়। দীর্ঘদিন বাদে স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকারের ভ্রাতা আমাদের শ্রদ্ধেয় সুরেশদার সহযোগিতায় ও নাট্যকার পুত্র শ্রীমান অরুণ কুমার চৌধুরীর আগ্রহে উক্ত রোজ-নামচার খাতাটি আমরা হস্তগত করতে পেরেছি। পাঠক-সাধারণের সুবিধার জন্য 'শ্যামলী'তে রচনার যে অংশ অবধি প্রকাশিত হ'য়েছিল – বর্তমান সংখ্যায় তা পুনঃ প্রকাশ করা হ'লো। আগামী সংখ্যা থেকে রোজ-নামচার অপ্রকাশিত অংশই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হ'বে। স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকার বাংলা নাট্যান্দোলনের যে গৌরবদীপ্ত অভিযানের কথা তাঁর রোজ-নামচার পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখে ছিলেন—দীর্ঘদিন বাদে রূপ-মঞ্চ পত্রিকা তাকে নাট্যামোদী জনসাধারণের কাছে এবং ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের জন্য তার পাতায় পরিবেশন করবার গৌরব লাভ করে নিজেকে ধন্য বলেই মনে কচ্ছে। এই প্রসংগে শ্রদ্ধেয় সুরেশদা ও শ্রীমান অরুণ এবং স্বর্গত নট ও নাট্যকারের অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের রূপ-মঞ্চ তথা বাংলার নাট্যামোদী জন-সাধারণের পক্ষ থেকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কালীশ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক: রূপ-মঞ্চ

সম্পাদকের দপ্তর

সুনীল কুমার রায় (সিদ্ধেশ্বরী লেন, হাওড়া)
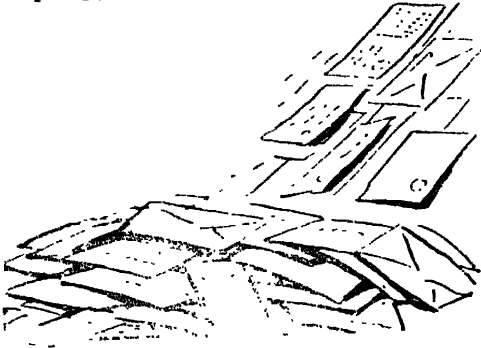
গত পূজা সংখ্যায় আপনার 'সোভিয়েট চলচ্চিত্র শিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধের উপসংহারে চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয়করণ করে জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের যে প্রস্তাব আপনি করেছেন, তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এতে আমাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছি। জাতীয়করণের প্রস্তাব আপনাদের কাছ থেকে আরো পূর্বেই আশা করেছিলাম। মঞ্চ ও চলচ্চিত্র বিষয়ক এই পত্রিকাটি বহুদিন হ'তেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আমরা আশা করি, রূপ মঞ্চ কখনই গতানুগতিক পত্রিকারূপে তার পথ বেছে নেবে না বরং প্রগতিশীল দৃষ্টিভংগী নিয়ে জনসাধারণের ইচ্ছাকে কার্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট হবে। শিক্ষাবিস্তারে চলচ্চিত্র যে অন্যতম স্থানলাভ করেছে একথা আজ সর্বত্রই স্বীকৃত হ'য়েছে। সুতরাং সেই শিল্প যদি শুধু মাত্র সস্তা আমোদ-প্রমোদ বিতরণ ও ধনলাভের মধ্যেই আজ নিবদ্ধ থাকে, তবে সে শিল্পের প্রয়োজন কতটুকু তা আজ ভাববার বিষয়। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ভাবে বহুল পরিমাণে তৃতীয় শ্রেণীর চিত্রের আবির্ভাব হচ্ছে, তাতে দর্শক সাধারণের রুচি শুধু যে বিক্ষুব্ধ হ'য়েছে, তা নয়। সমগ্রভাবে জাতীয় চিন্তাধারাকেও অপকর্ষের দিকেই নিয়ে যাবে একথা আজ স্বীকার না করে উপায় নেই। শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের লোভের শিখা যদি এইভাবে চলচ্চিত্র শিল্পকে পুড়িয়ে মারে, তার চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কিছু নেই। অথচ আজ শিক্ষা ও জাতিগঠনের প্রয়োজন কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! কিন্তু এনিয়ে আজ যা আন্দোলন দেখা যাচ্ছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অল্প। শুধুমাত্র কোন একটা বিশেষ চিত্রের সমালোচনা করে তাকে তৃতীয় শ্রেণীর চিত্র বলে অভিহিত করলেই চলবে না—সমগ্রভাবে বিষয়টিকে উত্থাপন করে প্রতিকারের দাবী জানাতে হবে। সেন্সার বোর্ডের নীতিজ্ঞান সম্পর্কে আপনাদের পত্রিকায় খুবই কড়া সমালোচনা দেখেছি কিন্তু সেখান থেকে যে কোন সুফল পাওয়া যাবে একরূপ মনে হয় না। সুতরাং এই অবস্থার প্রতিকার হ'তে পারে একমাত্র জাতীয়করণের পক্ষে। কিন্তু জাতীয়করণ করতে হবে বল্লেই জাতীয়করণ হবে না। তা নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে এবং এ বিষয়ে আপনাদেরই অগ্রণী হতে হবে। আপনাদের প্রস্তাবকে দীর্ঘস্থায়ী করে তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন আশা করি। এতে আপনারা ধন্যবাদার্হ হবেন।

●● প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি চলচ্চিত্রের প্রতি আপনার দরদী মনের পরিচয় পেয়ে। সত্যি, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দিন দিন যা অবনতি ঘটছে, তা যে কোন চিন্তাশীল ব্যক্তিকেই চিন্তিত করে তুলবে। চলচ্চিত্রকে জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তা আমরাও উপলব্ধি কচ্ছি—এবং এতে আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে জেনে খুবই খুশী হলাম। এবিষয়ে ইতিপূর্বেও রূপ-মঞ্চে সমালোচনা করা হ'য়েছে। তবু এই আন্দোলন যে ব্যাপক ভাবে হয়নি একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবো। তবে সে ব্যাপক আন্দোলন করবার সময় এখনও পেরিয়ে যায়নি বলেই আমার বিশ্বাস। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—নিশ্চয়ই জানেন: Strike the iron while it is hot." এক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। জাতীয় সরকার দেশের কার্যভার গ্রহণ করে নানান সমস্যার ভারে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন—সেগুলির দায়িত্ব সম্পাদন করে একটু ঝাড়া-কাটা দিয়ে উঠলেই, আমার মনে হয়, এনিয়ে ব্যাপক আন্দোলন করা

উচিত। নইলে বিভিন্ন সমস্যার মাঝে কোন আন্দোলন বা জনমতের চাপে যদি তাড়াহুড়ো করে তাঁদের কোন কিছু করতে হয়— তাতে বরং গলদ থেকে যাবারই সম্ভাবনা। তাই বর্তমানে আমার ব্যক্তিগত অভিমতে, চলচ্চিত্র শিল্পকে জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনবার জন্য আন্দোলন করার চেয়ে পরোক্ষ কর্তৃত্বের জন্য অনুরোধ করাই ভাল। এবং যে সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্ব জাতীয় সরকার গ্রহণ করলে ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের হাতে সাময়িকভাবে চলচ্চিত্র শিল্পের কর্তৃত্ব থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না—সেই সমস্যা সমাধানের জন্য জাতীয় সরকারের কাছে আমাদের সংঘবদ্ধ দাবী জানাতে হবে এবং এজন্য কার্যকরী আন্দোলনও করতে হবে। বাংলা ছবি কেন ভাল হচ্ছে না তার কারণ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে আমার চোখে, শুধু আমার চোখে কেন অনেকের চোখেই যে গলদগুলি ধরা পড়ছে তা হচ্ছেঃ (১) প্রযোজনা ক্ষেত্রে অল্পপুঁজিদের সংখ্যাধিক্য। গেঞ্জিওয়ালা—লোহাওয়ালা থেকে আরম্ভ করে আলুপটলের অশিক্ষিত ব্যবসায়ীরা অসৎ উপায়ে কালোবাজার থেকে কিছু টাকা কামিয়ে হঠাৎ প্রযোজক সেজে বসছেন। পেটে বোমা মারলেও 'ক' অক্ষর যাঁদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয় না—তাঁদের হাত দিয়ে যে ছবি নির্মিত হচ্ছে—তাতে তাদের তথাকথিত রুচি ও চিন্তাধারারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

কেবলমাত্র অর্থের জোরেই এরা প্রযোজক সেজে বসছেন। তা বসুন, আপাততঃ তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু সেই পুরো অর্থ টাও এদের নেশায় লাগা টাকে থেকে আসতে পাচ্ছেনা। বিশ পঁচিশ হাজার দিয়েই বাণী লাভ করতে চাইছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে ও পাচ্ছেনই না—মাঝের মধ্যে চিত্রজগতে এক অবিশ্বাসের বযাক্ত বাষ্প ছড়িয়ে বিদায় নিচ্ছেন। এদের অনেকে সম্মিলিতভাবে আবার শেয়ারের যুক্ত করেছেন অর্থাৎ যৌথ প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে—আগ্রহশীল নতুনদের সুযোগ দেবেন বলে—ওঁৎকিত প্রতিভাদের কিছু লোভের পরিচয়ে—অর্থ সংগ্রহ করে সটকান দিচ্ছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় আইন করে প্রাদেশিক সরকারকে এদের আনাগোনা বন্ধ করতে হবে। যাঁরা ছবি করতে আসবেন—একখানা ছবি করবার মত দেয় টাকা তাঁদের আছে কিনা, তার প্রমাণ দিতে হবে প্রাদেশিক সরকারকে। যৌথপ্রতিষ্ঠান মারফৎ চিত্র প্রযোজনা ক্ষেত্রে যারা অগ্রসর হবেন—উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবর্গরা যদি একখানা ছবি করবার মত অর্থ নিজেরাই ব্যয় করতে পারেন—তবেই তাঁদের যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার অনুমতি দেওয়া হবে। এবং অন্ততঃ একখানা ছবি মুক্তিলাভ করবার পরই তাঁরা জনসাধারণের কাছে প্রতিষ্ঠানের অংশ বিক্রী করতে পারবেন, তার পূর্বে নয়। (২) সেন্সার বোর্ডকে ঢেলে সাজাতে হবে। তাকে চিত্র প্রদর্শনের ছাড়পত্র প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানরূপে থাকলেই চলবে না—চিত্র শিল্পের সংস্কারকরূপে তাকে গড়ে তুলতে হবে। এ সম্পর্কে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হ'য়েছে। (৩) বর্তমানে যে বিষয়টি সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনতে হবে—তাহচ্ছে নাট্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। অবিলম্বে সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে এই নাট্য-বিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে। এতে শুধু অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরই যে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, তা নয়। চিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চলচ্চিত্র সাংবাদিক, সুরকার, রূপসজ্জাকর, দৃশ্যসজ্জাকর, বৈদ্যুতিক আলোকশিল্পী প্রভৃতি চিত্র ও নাট্য-জগতের সর্ববিধ কর্মীদের শিক্ষার ব্যবস্থাই করতে হবে। অধিকন্তু প্রযোজক, পরি

রাণাঘাট লিলিপুট সম্প্রদায়ের সভ্যাগণ।
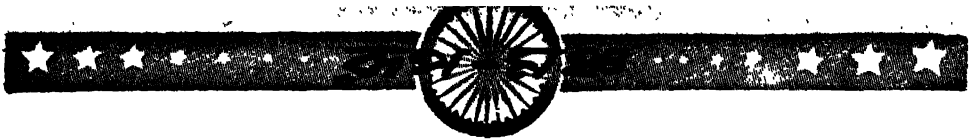
বেশক, প্রদর্শক প্রভৃতি ব্যবসায়ীদেরও চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কে সাধারণভাবে ওয়াকীফহাল করে তুলবার সুযোগ করে দিতে হবে। এবং নাট্য বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করবার পূর্বেই যে সব বিশেষজ্ঞ ও শিল্পজ্ঞগণ দীর্ঘদিন চিত্র ও নাট্যজগতের সেবা করে আমাদের খানিকটা শ্রদ্ধার্জনে সমর্থ হ'য়েছেন তাঁদের মধ্য থেকে কয়েক জনকে বিদেশ পাঠিয়ে বিদেশের চিত্র ও নাট্য-জগতের বিভিন্ন শিক্ষার ধারা সম্পর্কে খানিকটা প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করবার সুযোগ করে দিতে হবে। যাতে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি পরিকল্পিত নাট্য বিদ্যালয়ে যোগদান করে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। এবং সংগে সংগে মেধাবী ও আগ্রহশীল উচ্চশিক্ষিত ছেলে এবং মেয়েদের চিত্র ও নাট্য-জগতের বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে। বিদেশ থেকে উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে তাঁরা ভবিষ্যতে আবার নাট্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষক রূপেই যোগদান করবেন। এবং চিত্র ও নাট্যজগতের ভবিষ্যৎ শিল্পজ্ঞগণকে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলবেন। আমাদের বর্তমানের আন্দোলন পরিকল্পিত এই চিত্র ও নাট্য-বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই বর্তমানে ব্যাপকতা লাভ করুক। এবং যতক্ষণ না জাতীয় সরকার এবিষয়ে অবহিত হচ্ছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা রূপ-মঞ্চ মারফৎ এমনি আন্দোলন করে যাবো। আমাদের সমবেত কণ্ঠ—জাতীয় সরকারের এই আশু কর্তব্য সম্পর্কে যদি সরকারকে অবহিত করে তুলতে পারি—তাতে শুধু চিত্র ও নাট্যজগতের প্রতিই আমরা আমাদের কর্তব্যের পরিচয় দেবো না—সমগ্রভাবে জাতির এক বিরাট সমস্যা সমাধানে কিছুটা কাজে লাগতে পেরেছি বলে জাতিরও যেমনি ধন্যবাদার্হ হবো, তেমনি নিজেদেরও গৌরবান্বিত বলে মনে করবো। এবিষয়ে সমগ্র পাঠকসমাজের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি—যার যে পরিকল্পনা থাকে, যিনি যেভাবে এ নিয়ে চিন্তা করেছেন, রূপ-মঞ্চ মারফৎ তা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করুন।
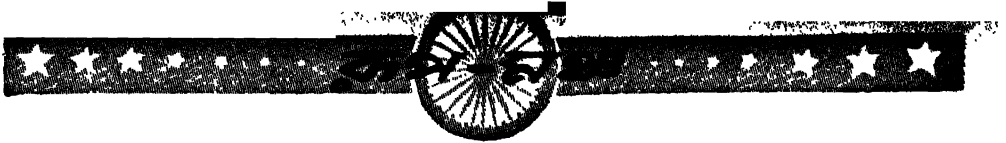
অমলকুমার ও রাণী (ডিব্রুগড়, আসাম)

বর্তমানে বাঙ্গালীদের অনেক হিতৈষী বন্ধু জুটেছে বলে মনে হয়। এই সব হিতৈষীরা বাঙ্গালীকে কাপুরুষ বলে মনে করেন এবং তাঁদের ধারণা বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কাজই হয় না—তাঁরা শুধু কাঁদতে জানে। আমাদের মাননীয় প্রধান উপমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলও সম্প্রতি এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই 'ভুলি নাই' ছবিটি হিন্দিতেও চিত্ররূপায়িত করে তুলতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সব ছবি দেখে সর্দার প্যাটেল ভবিষ্যতে সংযত হ'য়ে বাঙ্গালী সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করতে পারবেন।

●● আপনাদের চিঠির সবটা প্রকাশ না ক'রে মূল বক্তব্যটুকুই এখানে তুলে ধরলাম। বাঙ্গালী যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নির্যাতিত ও অবহেলিত হচ্ছে একথা ঠিক। এবং এর ইন্ধন যাঁরা যোগাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে আমাদের তথা-কথিত বিশ্বপ্রেমিক অথবা বিশাল ভারত-প্রেমিক বাঙ্গালী-রাও রয়েছেন। আমার এই উক্তিতে প্রাদেশিকতার কোন গন্ধ নেই। মানুষ নিজেকে দাঁড় না করিয়ে অপরের জন্য বুক পেতে দিতে পারে না। বাঙ্গালীকে আজ শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, শুধু তার নিজের প্রয়োজনেই নয়—অপরের প্রয়োজনেই। বাংলা বাঁচলে ভারত বাঁচবে। তাই প্রতি-জন বাঙ্গালীকে প্রতি ক্ষেত্রে সব সময় মনে রাখতে হবে, 'তিনি প্রথমে বাঙ্গালী- তারপর অন্য কিছু।' এতে কেউ যদি প্রাদেশিকতায় অন্ধ বলে দোষারোপ করেন—তা' হাসিমুখেই সহ্য করতে হবে। বাঙ্গালী কী—তা আর সবাই যেমন জানেন, সর্দার প্যাটেল তাঁদের চেয়ে বেশীই জানেন। কারণ, বাঙ্গালীকে গভীরভাবে জানবার সুযোগ তিনি যত-খানি পেয়েছেন, ততখানি অনেকেই পাননি। 'ভুলি নাই' ছবির হিন্দিরূপ মারফৎ বাঙ্গালীকে নতুন করে জানাবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, বাঙ্গালীর পরিচয় তার কর্মে, ত্যাগে ও নিষ্ঠায়। চিত্র-শিল্পের দায়িত্ব ও প্রয়োজনে যদি 'ভুলি নাই' হিন্দিরূপ গ্রহণ করে তাকে আপনাদের মত আমিও অভিনন্দন জানাবো। বাঙ্গালী কাঁদে বলে সর্দার প্যাটেলের উক্তিতে আপনারা ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন। কিন্তু এতে ক্ষুণ্ণ হবার কী আছে? সর্দার প্যাটেল ত' সত্য কথাই বলেছেন। বাঙ্গালী কাঁদে—কাঁদতে জানে, কারণ, তার অন্তর আছে। তবে এ কাঁদা তার নিজের জন্য নয়—অন্যের জন্য। 'পরের জন্য কাঁদতে জানা, তবেই কাঁদা বড় হয়'—এত বাঙ্গালী কবিই বাঙ্গালীকে শুনিয়েছেন। তবে সর্দার প্যাটেল-এর উক্তিকে আপনারা বিকৃতভাবেই গ্রহণ করেছেন—এ বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করেছেন।

অমল হালদার (এ) প্রিয়দর্শন, উচ্চশিক্ষিত। বাংলা চিত্রজগতের জন্য রূপ মঞ্চের আর একজন নতুন আবিষ্কার।

মাষ্টার ষ্টানলি (আতপুর, ২৪ পরগণা)

●● আপনার চিঠি পেলাম। আপনাদের চাহিদার কথা চিন্তা করেই গত শারদীয়া সংখ্যাতে বিভিন্ন শিল্পীদের ছবি প্রকাশ করা হয়েছিল। শুধু শারদীয়া সংখ্যাতেই নয়—প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই অভিনেতাদের চেয়ে অভি-

নেতাদের প্রতিকৃতি মুদ্রণের অনুরোধই আসে বেশী। তবু আমরা অভিনেতাদেরও প্রতিকৃতি প্রকাশ করে থাকি। উচিত মনে করেই এবং সাধারণতঃ নতুনদের কথাই এবিষয়ে সর্বপ্রথমে বিবেচনা করা হয়। তবে রূপ-মঞ্চের পাতায় যে সব ছবি দেখতে পান, তার নির্বাচনে সব সময় আমাদের হাত থাকে না। চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের প্রচারের সুবিধা মত নির্বাচন করে ব্লক নির্মাণ করে পাঠান। তবু আমরা তাঁদের সব সময়ই অনুরোধ করি কোন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রীর ছবি পাঠাতে। কারণ যাঁরা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের চেয়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁদের প্রচারের প্রয়োজনীয়তাই বেশী। 'রতন' ছবির করণ দেওয়ান আর জোয়ারভাটার প্রদীপ কুমার এক ব্যক্তি নন। 'সন্ধ্যাবাণী'কে চিঠি লেখা হয়েছে—উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। সম্মতি না পাওয়া অবধি, কবে তাকে রূপ-মঞ্চের পাতায় দেখতে পাবেন, সঠিক বলতে পারি না।

তিলোত্তমা
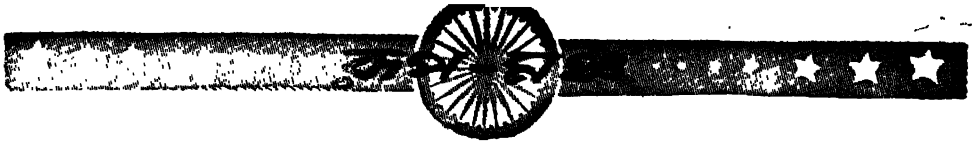
বীণাপাণী বসাক (লালচাঁদ মোকীমলেন, ঢাকা) ঃ আমাদের দেশের ছায়াচিত্র প্রতিষ্ঠান হ'তে আজ পর্যন্ত আশানুরূপ চিত্র পাই নি। এজন্য প্রায়ই দেখি, সংবাদ পত্রে এবং রূপ-মঞ্চে লেখালেখি হচ্ছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্যন্তও কর্তৃপক্ষের কোন সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। এর জন্য দায়ী কে? আমি বলবো, এর জন্য শিল্পীবৃন্দ ও শিল্পিগণকেই পুরোপুরি ভাবে দায়ী করা যদি ঠিক হবে না। এর জন্য দায়ী চিত্র প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারেরা। এতদিন বিদেশী শাসনের নাগপাশ আমাদের জাতীয় জীবনকে রুদ্ধ করে রেখেছিল সত্যি, কিন্তু তবু যতটুকু সুযোগ তাঁরা এরই মাঝে পেয়েছেন—তার বিন্দুমাত্রও মর্যাদার পরিচয় দিতে পারেন নি। একজন দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী নেতা যেমন ভাবে দেশের ও জনসাধারণের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গ করে থাকেন—ঠিক তেমনি মনোবৃত্তি কোন প্রযোজক বা পরিচালক বা চিত্র ও নাট্য জগতের কারোর মাঝে দেখতে পাই কী? কোন চিত্র পরিচালককেই গরীব দরদ ও দেশপ্রেম নিয়ে ছবি তুলতে দেখিনি। জনগণের মানসিক পরিস্থিতি, অন্তরের সুখ-দুঃখ, আশা আকাঙ্খা যদি কোন শিল্পীর মনে প্রতিফলিত না হয়, তবে তার সৃষ্টি কোন মতেই জনগণের কাছে আবেদনশীল হ'তে পারে না। এতদিন জনসাধারণও চলচ্চিত্রের প্রতি উদাসীন ছিলেন —কর্তৃপক্ষও তাঁদের খুশীমত ছবি নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এখন আর জনমত উদাসীন বা মূক নয়—তাই এবিষয়ে অবহিত হয়ে উঠতে বলি।

●● আপনার বলাতে আমাদেরও সমর্থন রয়েছে জানবেন।

কেশব বিশ্বাস (বসু বিশ্বাস এ্যাণ্ড কোং, গ্রে ষ্ট্রীট, কলকাতা)।

আমাদের এখানকার প্রথমশ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীদের বার্ষিক আনুমানিক আয় কিরূপ? হলিউডের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীদের আয়ের সংগে তাদের তুলনা করা চলে কি?

●● মোটেই নয়। বরং ওদের আয়ের তুলনায় এঁদের আয়ের পরিমাণ উল্লেখ করলে হাস্যাস্পদই হতে হয়। অথচ অভিনয় প্রতিভার বিচার করে দেখতে গেলে আমাদের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীরা হলিউডের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রীদের চেয়ে কিছুমাত্র ছোট নন, বলেই আমি মনে করি। কোন রকম শিক্ষার সুযোগ না পেয়ে জন্মগত প্রতিভা, অধ্যবসায় ও অনুশীলন ক্ষমতার গুণে এরা যতখানি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন - হলিউডের শিল্পীদের কাছে তা কোন মতেই ম্লান হবে না। এদের আনুমানিক বার্ষিক আয় জনপ্রতি বার্ষিক পচিশ হাজারও হবে কিনা সন্দেহ। তাওও মুষ্টিমেয়র। আর হলিউডের জনকয়েক শিল্পীর বার্ষিক আয় এখানে উল্লেখ করছি তাহলেই জানতে পারবেন দুয়ের তুলনা মোটেই চলে না।

(১) ক্লদেট কোলবার্ট—৪২৬,৯৪৪ ডলার। (২) বিংক্রসবী—৪১০,০০০। (৩) আইরীন ডান—৪০৫,২২২। (৪) চার্লস বয়র—৩৭৫,২৭৭। (৫) ওয়ালেস বেরী—৩৫৫,০০০। (৬) ক্যারী গ্রান্ট—৩১০,৬২৫। (৭) শার্লি টেম্পল—৩০৬,৮১৭। (৮) জন ক্রফোর্ড—৩০৫,৩৮৩। (৯) নর্মা শীয়ারার—৩০০,০০০। (১০) ওয়ারেণ ব্যাক্সটার—২৯৯,৮০৭। (১১) ক্লার্ক গ্যাবল—২৯২,০০০। (১২) গ্রেটা গার্বো—২৭০,০০০। (১৩) ফ্রেড এ্যাসটার—২৬৬,৮৩৭। (১৪) ভিক্টর ম্যাকলাগ্লেন—২৫৮,০৮২। (১৫) জেমস কেগনী—২৪৩,০০০। (১৬) স্পেনসার ট্রেসী—১২২,০০০। (১৭) রবার্ট মণ্টগোমেরী—২০৯,৭১০। (১৮) জিনজার রোজার্স—২০৯,৭৬৭। (১৯) ক্যাথারীণ হেপবার্ণ—১৯৫,১৬০। (২০) ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস (জুনিয়ার)—১৯৫,২৭০। (২১) জর্জ র‍্যাফ্ট—১৮৬,৯৭৪। (২২) রবার্ট টেইলর—১৮৪,৮৩৩। (২৩) এরল ফ্লিন—১৮১,৩৩৩। (২৪) লরেটা ইয়ং—১৭৫,৮৬০। (২৫) ডায়েনা ডারবিন—১৭৩,৯১৬। (২৬) রবার্ট ইয়ং—১৫৮,৯১৬। (২৭) নেলসন এডিডি—১৪৬,৪৬। (২৮) বেটি ডেভিস—১৭,৭৫৩। (২৯) ব্যাসিল র‍্যাথবোন—১৪০,৮৩৩। (৩০) মার্ণা লয়—১৭০,৬৬৭। (৩১) জীন অর্থার—১৩৬,৬৬৬। (৩২) ফ্রেড্রিক মার্চ—১৩৩,৩৩৩। (৩৩) মার্লিন ডিয়েট্রিচ—১৪০,০০। (৩৪) জেনেট ম্যাকডোনাল্ড—১২৫,০০০। (৩৫) ফ্রেডি বার-

থোলো মই— ১৮,২৬৬। (৩৬) টাইরণ পাওয়ার—১১৭,০৮১। (৩৭) অলিভার হার্ডি—১১৬,৮৫০। (৩৮) জন ব্যারীমূর—১০৫,৮৩৩। (৩৯) হেনরী ফনডা—১০৫,০০০। (৪০) রোনাল্ড কোলম্যান—১০২,০০৩। এই চল্লিশজন শিল্পীর বার্ষিক আয়ের কথা এখানে উল্লেখ করলাম। এঁরা ছাড়াও আরো অনেকেই রয়েছেন, যাঁদের বার্ষিক আয় একলক্ষ ডলারের ওপর। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ট্রেজারী ডিপার্টমেণ্ট এ্যাণ্ড দি সিকিউরিটিস্ এ্যাণ্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে প্রকাশিত বুলেটিন থেকেই এই তালিকা দেওয়া হ'লো।
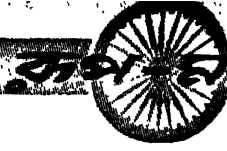
অসিতকুমার ও অমরকুমার ভট্টাচার্য
(শিবপুর রোড, হাওড়া)

(১) 'ধাত্রী দেবতা' বইটি দেখিলাম। যিনি পরিচালনা করিয়াছেন নিতান্ত ছেলেমানুষী করিয়া তারাশঙ্করবাবুর অমন সুন্দর উপন্যাসখানাকে একদম নষ্ট করিয়াছেন। ইহার কী কোন প্রতিকার নাই। (২) মহেন্দ্র গুপ্তের সহিত বিপিন গুপ্তের কোন পারিবারিক সম্বন্ধ আছে কি?

●● (১) আপনাদের অভিমত অস্বীকার করবার কারোরই উপায় নেই। প্রতিকার আপনাদেরই হাতে। এবং তার পরিচয় কর্তৃপক্ষ খুবই পেয়েছেন। যেজন্য তাড়াতাড়ি প্রেক্ষাগৃহ থেকে ছবি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হলেন। আশা করি 'ধাত্রী দেবতা'র কর্তৃপক্ষও যেমনি এ থেকে শিক্ষা পেলেন—অন্যান্য প্রযোজকেরাও লাভ করবেন। (২) না।

পুষ্পলেখা মিত্র (শান্তিনিকেতন, বীরভূম)

রূপ-মঞ্চ পত্রিকার দুইটি বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে একটিতে দেখেছিলাম 'বিদূষী ভার্য্যা' চিত্রগ্রহণে নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী পরাগ সরকার অভিনয় করবেন—অপরটিতে শ্রীমতী মলয়া সরকারের নাম দেখেছিলাম।

পরাগ এবং মলয়া কী একই অভিনেত্রীর নাম না পৃথক দু'জনের? (২) শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও শ্রীসত্য চৌধুরী এই দু'জন সংগীতজ্ঞের মধ্যে কার গলা শ্রুতিমধুর এবং কে বেশী জনপ্রিয়?

●● (১) পরাগ এবং মলয়া একই অভিনেত্রীর নাম। পরাগই পরে মলয়া হ'য়েছেন। আবার সম্প্রতি শুনছি তাঁর পদবী সরকার থেকে রায় হ'য়েছে! যাই হউক না কেন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যখনই এরা খোলস পালটান—হয় তাঁদের প্রচার বিভাগ থেকে আর না হয় ব্যক্তিগত ভাবে তাঁরা নিজেরা যদি আমাদের জানিয়ে দেন, তবে আর এমনি জবাবদিহির মাঝে পড়তে হয় না। শুধু আপনিই নন, আরো অনেকেই এই প্রশ্ন তুলেছেন—আর আপনাদের এতে বিন্দুমাত্র দোষও নেই। (২) দু'জনের ভিতর গৌরীকেদার ভট্টাচার্যের গলা আমার কাছে বেশী মিষ্টি লাগে। তবে জনপ্রিয়তা সম্ভবত শ্রীযুক্ত সত্য চৌধুরীই বেশী।

(সম্পাদকের দপ্তরের শেষাংশ ৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

প্রয়োগশালার পরিবেশে কয়েকঘণ্টা

বড় ক'রে দেখলে চলবে না। ... ঠেলে দিলে চলবে না। কাছে টেনে ... ভুলকে সংশোধন করে নি...

...প্রাণবন্ত ... বন্ধুবর আমন্ত্রণ এসেছে—তাঁদের দৃশ্যপটে উপস্থিত থাকবার জন্য। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের সে অনুরোধ রক্ষা করে উঠতে পারিনি নানান অসুবিধায়। ২২শে ডিসেম্বর, বুধবার সকালে প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অভিনেতা-পরিচালক শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসের কাছ থেকে তাঁর একান্ত অনুগত চর শ্রীমান অচিন্ত্যকুমার এসে বাড়ীতে হানা দিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের আমন্ত্রণ লিপির সঙ্গে রয়েছে 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদক এবং প্রচারবিদ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পালের অনুরোধ পত্র। তাঁরা লিখেছেন: অচিন্ত্য যাচ্ছে, ছবি বাবুর আমন্ত্রণ নিয়ে— আজ আর না গেলে চলবে না। আমরাও যাচ্ছি। আপনি প্রস্তুত হ'য়ে থাকবেন। কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় গাড়ী নিয়ে হাজির হবো।" আর সকলকে এড়ানো গেলেও শ্রীমান অচিন্ত্যকে এড়ানো যাবে না একটুকু বেশ উপলব্ধি করেছিলাম! ...নানান অসুবিধা থাকা সত্বেও মত না দিয়ে পারা গেল না। আমার কথা নিয়ে তবে অচিন্ত্য ছাড়লো। এই ...ভোলা কর্মি ছেলেটিকে সত্যি ভাল লাগে: ভাল লাগে আমরাই শুধু নয়—যারা ওর সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের সকলেরই। ওর মত কাজ পাগলা লোক খুব কমই দেখা যায়—কাজ পেলে ওর আর কোন কথা নেই। ঝড়ের বেগে ও ছুটে চলে—কাজ শেষ করে আবার গল্প-গুজবে মেতে যায়। বলতে গেলে ওরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতায় সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিঃ তাঁদের প্রথম চিত্র '... যেথা ঘর' নিয়ে আজ চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানাবার মর্যাদা লাভ করেছেন। সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর কর্ণধার রূপে শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওরই আন্তরিকতার জন্য। অবশ্য শ্রীযুক্ত বিশ্বাস আমাদের কাছে, বিশেষ করে সেখানে, যদি অচিন্ত্যকুমার উপস্থিত থাকেন—ওকে লক্ষ্য করে ওর সম্পর্কে বলতে যেয়ে বলেন: "এক নম্বরের খুনী। দেখছেন না, আমাকে কী ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে! ও না করতে পারে এমন কাজ নেই! আমি তাই ওর নামের পরিভাষা দেখেছি Unthinkable."

বস্তুতঃ অচিন্ত্যকুমারের প্রতি শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের গভীর স্নেহ এবং বিশ্বাসই যে এতে ধরা পড়ে, তা আমরাও যেমন বুঝি—অচিন্ত্যকুমারও তা বোঝে। ষ্টুডিও মহলে সবাই ওকে Unthinkable বলে ডাকে। অচিন্ত্যকুমার চলে গেলে আমি আমার সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি—যে কয়ঘণ্টা আমাকে অনুপস্থিত থাকতে হবে সংসারের পরিবেশ থেকে—সে সময়কার কাজগুলি পূর্বে থেকেই সেরে রাখি।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় চারটেয় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল ও রূপ-মঞ্চ সম্পাদক গাড়ী নিয়ে এসে হাজির হলেন—আমি প্রস্তুত হ'য়েই ছিলাম। গাড়ীতে যেয়ে উঠলাম।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে যখন আমাদের গাড়ী প্রবেশ করলো, তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে। গাড়ী থেকে আমরা নামতে না নামতেই অচিন্ত্যকুমার ছুটে এলেন: অন্ততঃ কমপক্ষে দশবার তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন—"এসেছেন আপনারা তা'হলে! যাক, কথা রেখেছেন।" ধীরে ধীরে ষ্টুডিওর বহু পরিচিত বন্ধুরাই এসে হাজির হলেন ... এঁরা আমাদের গ্রহণ করলেন। ... এঁদের সংগে এক নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। এঁরা বয়সের ভাগেই আমার চেয়ে বড়—কিন্তু এঁরা যে মর্যাদার আসনে আমায় বসিয়েছেন—যে আত্মীয়তায় এঁরা আমায় একাত্মীয় করে তুলেছেন—জীবনের পরম পাওয়া বলেই তাকে আমি সশ্রদ্ধভাবে গ্রহণ করেছি। অথচ এঁদের সংস্পর্শে আসবার পূর্বে কত অলীক ধারণাই না আমার মনে বদ্ধমূল হ'য়েছিল! আত্মীয়স্বজন কত ভবিষ্যৎ বাণীই না ক'রেছিলেন আমার সাংবাদিক জীবন গ্রহণ করবার পূর্বে! তাঁদের মতে বাঙলা দেশের মেয়ে ... সাংবাদিকতা এক বিরাট গর্হিত কাজ! কেবলমাত্র আত্ম-বিশ্বাস—আমার স্বামীর আগ্রহ এবং 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদক ও তার সহকর্মিদের সহযোগিতাকে সম্বল করেই সকলের বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে আমি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতাকে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করি। চিত্র জগতে প্রবেশ করে চিত্র-জগতের কর্মীদের সংস্পর্শে এসে সকল ভুল ধীরে ধীরে আমার কাছে

পন্যাসখানাকে একদম নষ্ট করিয়াছেন।
প্রতিকার নাই। (২) মহেন্দ্র গুপ্তের
বারিক সম্বন্ধ আছে কি

ফুল হ'য়ে ফুটে উঠলো। ভুল যে এঁদের না আছে তা নয়। ভুল মানুষ মাত্রেরই থাকা স্বাভাবিক। তাই বলে ভুলটাকেই বড় ক'রে দেখলে চলবে কেন? ভুল করে বলে ঘৃণাভরে দূরে ঠেলে দিলে চলবে না। কাছে টেনে নিয়ে দরদ দিয়ে সে ভুলকে সংশোধন করে নিতে হবে। চিত্র পরিচালক ও নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্তের সংগে দেখা হ'লো। তিনি নমস্কার করে এগিয়ে এলেন। আমরা প্রতি নমস্কার জানালাম। দু'চারটে কথা বলেই সম্পাদককে আড়ালে ডেকে নিয়ে কোন গুরুতর আলোচনায় তিনি মেতে গেলেন। আমি শ্রীযুক্ত পাল ও অচিন্ত্যকুমারকে অনুসরণ করে 'যার যেথা ঘর'-এর দৃশ্যপটে যেয়ে উপস্থিত হলাম। শ্রীযুক্ত পাল আমায় বসিয়ে রেখে ভ্যানগার্ডের ইউনিটের উদ্দেশ্যে গেলেন। 'যার যেথা ঘর'-এর দৃশ্য গ্রহণের কাজ তখনও চলছে। শ্রীমতী রেণুকা রায় অভিনয় শেষে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে বসেছিলেন। আমাকে দেখতে পেয়েই সম্বর্পণে এগিয়ে এলেন। আমি তাঁর পাশে যেয়ে বসলাম। ওদিনকার শেষ দৃশ্যটির চিত্রগ্রহণ চলছিল।

নির্বাক মুহূর্তের মধ্য দিয়ে চোখাচোখী হ'লো পরিচালক-অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের সংগে — দাচপল অসিতবরণ—চিত্র-সম্পাদক রাজেন চৌধুরী, কর্মাধ্যক্ষ তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় আরো অনেকের সংগে। সমস্ত দৃশ্যটি গম গম কচ্ছে। আইনজ্ঞের পোষাক পরিহিত সন্তোষ সিংহকে চিনতে পারলাম—সাহেবী পোষাক পরিহিত সমর মিত্রকেও চিনতে অসুবিধা হ'লো না। ইতিপূর্বে তাঁকে মিনার্ভা মঞ্চে কয়েকখানি নাটকে দেখেছি। কিন্তু এই দু'জন যে বৃদ্ধকে ঘিরে গম্ভীর আলোচনায় মত্ত হ'য়ে উঠেছিলেন—সেই বৃদ্ধকেই সঠিক চিনতে পারলুম না। মূল দৃশ্যপট থেকে আমরা একটু দূরেই ছিলাম—তাই কণ্ঠস্বর শুনেও চেনা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি। আমরা শেষ মুহূর্তে যেয়ে হাজির হ'য়েছি—পুরো দৃশ্যটার চিত্র গ্রহণও দেখতে পেলাম না। শেষের 'শট'টি কয়েক মিনিটেই পরিচালক বিশ্বাস নিয়ে

মায়াপুরী পিকচার্সের তিলোত্তমা চিত্রে শ্রীমতী তিলোত্তমা

সাতাশ বছর বয়সে এই প্রথম০০০০০০০০০
ভূমিকায় ঃ
শিপ্রা দেবী ঃ শিশির
মিত্র ঃ ধীরাজ ভট্টাচার্য
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নবদ্বীপ
শ্যামলাহা ঃ হরিদাস ঃ নৃপেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি

নিলেন। ওদিনকার মতো 'প্যাক-আপ' করার সংগে সংগে সংগেই সমস্ত দৃশ্যপটটী সকলের কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠলো। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কখন এসে হাজির হ'য়েছেন, আমি দেখতে পাইনি—তিনি সকলের সংগে আলাপ আলোচনায় মেতে পড়লেন। ঢাকা (পূর্ব পাকিস্থান) থেকে রূপ-মঞ্চের কয়েকজন পাঠক এদিন স্যুটিং দেখতে এসেছিলেন—তাঁদের কোন অসুবিধা হ'য়েছে কি না সে বিষয়ে সম্পাদককে খোঁজ খবর নিতে দেখলাম ওরই ভিতর। রেণুকা দেবী ও আমি গল্প গুজবে মেতে গেছি—হঠাৎ ডাকে চমকে উঠলাম: বৌদি নমস্কার!" তাকিয়ে দেখি, দাড়ির একটা ধার খুলে মচকী মুচকী হাসছেন আমাদের চিরদিনের সদাহাস্যময় পাহাড়ী। আমি প্রতি নমস্কার জানিয়ে বল্লাম: কী রূপ-সজ্জাই না নিয়েছেন। চিনতেই পারছিলুম না।" কিছুক্ষণ কথা বলবার পরে পাহাড়ী তাঁর আবর্জনাগুলি পরিষ্কার করবার জন্য বিদায় নিলেন। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস এগিয়ে এসে বল্লেন: তা আর একটু বাদে এলেই পারতেন।" আমিও সপ্রতিভ হ'য়ে উত্তর দিলাম: আমার দোষ কী—চারটেয় যে গাড়ী গেছে।" ছবিবাবু আর উত্তর খুঁজে পেলেন না। তাঁর স্বাভাবিক ভংগীমায়—"ও" বলে ঢোক গিলে বললেন: এসেছেনই যখন—দয়া করে আর একটু থেকে যেতে হবে। প্রজেকশনের ব্যবস্থা কচ্ছি দেখে যাবেন।" ইতিপূর্বে একরূপ প্রজেকশন আমি দেখিনি—তাই সুযোগটা ছাড়তে চাইলাম না। নেহাৎ যে অনুরোধেই থেকে যাচ্ছি একরূপ ভাব প্রকাশ করে ছবিবাবুকে বল্লাম: বলছেন যখন তখন দেখে যাবোই।" আমার কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ঝড়ের বেগে শ্রীমান অচিন্ত্যকুমার এসে হাজির হলেন। হন্তদন্ত হ'য়ে তিনি বল্লেন—"চলুন, চলুন—আমাদের অফিস-কক্ষে চলুন।" কী আর করা যায়, রেণুকা দেবীকে সংগে নিয়ে, ওঁদের অফিস-কক্ষে যেয়েই হাজির হলাম। ফণী বাবু, কালীশ বাবু, এঁরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়লেন, বলতে পারিনা। অফিস-কক্ষে বসে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করলাম; ওদিনকার চিত্রগ্রহণে যে যে পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র প্রভৃতি লেগেছে—কয়েকজন অল্পবয়স্ক কর্মী তা মিলিয়ে মিলিয়ে তুলে রাখছেন পরম নিষ্ঠার সংগে। পরম ধৈর্যের সংগেই তাঁদের একাজ করে যেতে দেখলাম। যদিও তাঁদের কাজে বিন্দুমাত্র খুঁত আমার চোখে পড়লো না—তবু আমার মনে হয়, একাজের জন্য যদি কর্তৃপক্ষ মেয়েদের নিয়োগ করেন—তাতে চিত্রশিল্পের আর একটা বিভাগে যেমনি মেয়েরা কাজ করবার সুযোগ পাবেন, তেমনি এই কাজের দায়িত্বও তাঁরা ছেলেদের চেয়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। কাজের দু'একটা নমুনা দিলেই আমার কথায় অনেকে সায় দেবেন ব'লেই বিশ্বাস করেই। যেমন মনে করুন—যে সব পোষাক-পরিচ্ছদ ও কাপড়-চোপড় পরে অভিনেতা অভিনেত্রীদের অভিনয় করতে হয়—সেগুলি মিলিয়ে ভাজ করে গুছিয়ে রাখা। ময়লা হ'লে চিত্রগ্রহণের পূর্বে ঠিকমত কাঁচিয়ে রাখা! তারপর ইউনিটের শিল্পী ও কর্মীদের জলখাবার, চা প্রভৃতি পরিবেশন করা। তাছাড়া সংগতি-লেখন—মেয়েদের রূপ সজ্জা প্রভৃতি ব্যাপারেও মেয়েদের নিয়োগ সম্পর্কে চিত্র-প্রযোজকদের কাছে এই প্রসংগে দাবীও জানিয়ে রাখতে চাই। বেশীক্ষণ এখানে বসে থাকতে হ'লো না—প্রজেকশনের জন্য ডাক পড়লো।

দোতলার এই অফিস-কক্ষটি থেকে নীচে নেমে এসে আবার প্রজেকশন রুমের দোতলায় উঠতে মাঝ পথে অস্পষ্ট আলোক দেখতে পেলাম পাহাড়ী, ছবি বিশ্বাস, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, রূপ মঞ্চ সম্পাদক, চিত্র-সম্পাদক রবীন দাস প্রভৃতি আরো অনেকে বেশ গুলজার পাকিয়ে নিয়েছেন। তাঁরাও চল্লেন আমাদের সাথে। স্টুডিওর এই প্রজেকশন রুমটি ছোট খাটো একটি প্রেক্ষাগৃহের মত। ছবির কাজ কিছুদূর অগ্রসর হ'লেই অথবা সমাপ্ত হবার পর শিল্পিগণ এই প্রজেকশন রুমে তা দেখে নিয়ে ছবিটা সম্পর্কে একটা আঁচ করতে পারেন। কোন খুঁত থাকলে তা যথাসম্ভব সংশোধন করে নিতে চেষ্টা করেন। অনেক সময় এক একটি দৃশ্য একাধিকবার গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে—এই একাধিকবার গৃহীত দৃশ্যগুলির কোন্‌টাকে শেষ পর্যন্ত রাখা হবে—দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে যেটিকে সবচেয়ে

ভাল বলে মনে হয়, সেটিকে রেখে বাকীগুলি চিত্র সম্পাদক বাতিল করে দেন। এই প্রজেকশনকে এক কথায় বলা যেতে পারে খণ্ড খণ্ড গৃহীত দৃশ্যাবলী সংযোজিত হবার প্রাথমিক পর্যায়। গৃহীত দৃশ্যাবলীর যে অবান্তর অংশগুলি চিত্র-সম্পাদক বাতিল করে দৃশ্যগুলিকে পর পর সাজিয়ে দিয়ে একটি পূর্ণাংগ সংগতিমূলক চিত্রে দাঁড় করান —এতে সেই অবান্তর অংশগুলি তখন অবধিও সম্পূর্ণ-ভাবে বাতিল করা হয় না। তাই প্রজেকশন দেখতে বেশ মজা লাগছিল। এই ছবিই অন্যরূপে দেখবো প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায়।

এক একটা রিল শেষ হচ্ছে আর আলো জলে উঠছে—আবার আর একটা চালু হ'তেই আলো নিভে যাচ্ছে। এই সময়টুকুর ভিতর প্রেক্ষাগৃহের মতই শিল্পী ও দর্শকেরা হাস্যরসে মেতে উঠছেন। একবার দর্শকদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—বিভিন্ন আসনে স্টুডিওর বিভিন্ন বিভাগের শিল্পীরা রয়েছেন। শব্দযন্ত্রী গৌর দাস, জে, ডি, ইরাণী, মান্না লাডিয়া, চিত্রশিল্পী নিমাই ঘোষ, রসায়নাগারিক ধীরেন দাশগুপ্ত, চিত্র সম্পাদক রাজেন চৌধুরী, রেণুকা রায় ত আমার পাশেই বসেছিলেন—পাহাড়ী বসেছিলেন সামনে। আর আমার পাশের আর এক সারিতে দেখতে পেলাম পরিচালক-অভিনেতা ছবি বিশ্বাসকে, সংগীত পরি-চালক মণ্টু মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক পাঁচু গোপাল মুখো-পাধ্যায়, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক, ফণীন্দ্র পাল, অচিন্ত্যকুমার আরো চেনা অচেনা অনেককেই দেখতে পেলাম। কিন্তু সবচেয়ে হাসি পেল শ্রীমান হুয়াকে দেখে—বেশ ভারি গম্ভীর চালে বসে আছে। হুয়া শুধু আমারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি, আর সকলেরও। ফণীবাবু হুয়াকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন: তুই যে যাত্রাদলের রাজার 'পোজ' নিয়ে বসে আছিস।" বেচারী আর যায় কোথায়! চারিদিক থেকে সপ্ত-রথীর মত সবাই ওকে ঘিরে ধরলেন। আলো জলার সংগে সংগে অচিন্ত্যকুমার ব্যস্ত হয়ে ওঠেন অতিথিদের পান, সিগারেট ও চা দিয়ে আপ্যায়িত করবার জন্য। সকলের সকল হাসি কৌতুক ছাপিয়ে তাঁর জুতোর খটাখট শব্দ দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'য়ে ওঠে। হঠাৎ ছবি বাবুর কণ্ঠ শোনা গেল, তিনি হাকলেন: অচিন্ত্যবাবু!" ঝড়ের বেগে খটাখট শব্দে অচিন্ত্য কুমার এসে সামনে দাঁড়ালেন তাঁর। ছবিবাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন: কাল একজোড়া রবারের জুতো কেনা চাই।"

"হো—হো"—করে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। প্রজেক-শন শেষ হ'লো। এরই মাঝে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস তাঁর বর্তমান ছবি 'যার যেথা ঘর' এর চৌদ্দ আনা কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। 'যার যেথা ঘর'—এ শ্রীযুক্ত বিশ্বাস চিত্র পরিচালকরূপেও দর্শকমনে বিশেষ স্থান করে নেবেন বলেই আমার দৃঢ় ধারণা। চিত্রের কতকগুলি দৃশ্য এমনি সুনিপুণভাবে গ্রহণ করা হ'য়েছে - যা শুধু আমারই কাছে প্রশংসামুখর হ'য়ে ওঠেনি, প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ দর্শকই শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা ক'রতে লাগলেন। এই প্রসংগে তিনটি দৃশ্যকে একই দৃশ্যে ফুটিয়ে তোলার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আরো কয়েকটী দৃশ্য এরূপ নৈপুণ্যের পরিচয় নিয়ে দর্শকদের চোখে ধরা দেবে। এজন্য রাজেন চৌধুরীও নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে সাহায্য করেছেন। শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য রচিত 'যার যেথা ঘরে'র কাহিনীটিও অভিনবত্বের দাবী নিয়েই ধরা দেবে বলে মনে হ'লো। সুধাকণ্ঠী সুপ্রভা সরকার গীত একখানি সংগীতই তখন অবধি গৃহীত হয়েছে, সে সংগীতটি শুনে উপস্থিত বিশেষজ্ঞ দর্শকেরা সবাই স্বীকার করলেন: না, মণ্টুবাবু নতুন কিছু দেবার চেষ্টা করেছেন।" চিত্র খানির সবচেয়ে যে বিষয়টি সবচেয়ে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেল—তা হচ্ছে এর অভিনয়াংশে যাঁদের সংগে আমরা পরিচিত হলাম তাঁরা সবাই আমাদের মুগ্ধ করেছেন। এর ভিতর প্রথমেই বলতে হয়—বৃদ্ধের ভূমিকায় অভিনব রূপ-সজ্জায় শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যালের কথা। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস — সরযূ দেবী, রেণুকা দেবী, মীরা সরকার, শ্যামলাহা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, শ্রীমতী কেতকী— এঁরা সবাই অভিনয়ে বেশ সমতা রক্ষা করেছেন। 'যার যেথা ঘর' এর শব্দ গ্রহণ ও চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে আছেন যথাক্রমে গৌর দাস ও নিমাই ঘোষ। আর এর দৃশ্য-রচনার নির্দেশ দিয়েছেন বিজয় বসু।
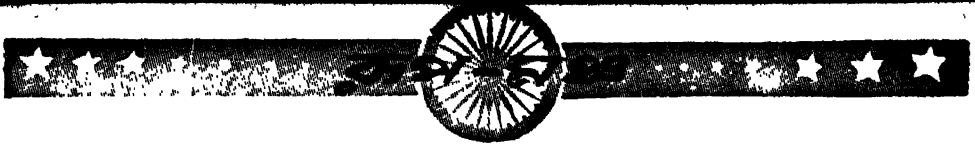
প্রজেকশন শেষে ঘরে ফিরবার জন্য আমরা উন্মুখ হ'য়ে উঠলাম। রাত ৯টা বেজে গেছে তখন। শ্রীমান হুয়া হলেন এবার আমাদের কাণ্ডারী। তাঁরই সদ্য কেনা গাড়ীতে—কালীশ বাবু, পাঁচু বাবু, মণ্টু বাবু, ফণী বাবু, ধীরেন বাবু প্রভৃতি আমরা ৬।৭ জন চেপে বসলাম। ছবি বাবু এসে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর গেট ছাড়িয়ে যেতেই ফণী বাবু রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন: জানেন কালীশ বাবু, হুয়া মাত্র ৬০০্ টাকায় এই গাড়ীখানা কিনেছে।" হুয়া প্রতিবাদ করে উঠলেন: না—না, ফণীদার কথা বিশ্বাস করবেন না?"

পাঁচুবাবু ফোঁড়ন কাটলেন: না—অযথা হুয়ার নামে দুর্নাম দিচ্ছেন কেন? গাড়ীখানাকে সারাতে যে ২৩ শত টাকা বেরিয়ে গেল—তা এলো কোত্থেকে।"

হুয়া গর্জে ওঠে। রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে বলতে শুনি—পাঁচু বাবু ও ফণী বাবুকে উদ্দেশ্য করে: আপনারা বলতে চাইছেন—এই সাত আট হাজার টাকার গাড়ীটা ও মাত্র ৭৮ শত টাকা দিয়ে কিনে বিরাট লাভ করেছে এইত! এত খুশীর বিষয়!" হুয়ার প্রতিবাদের কণ্ঠ—তখনও থামেনি: না—না—কালীশদা, ৭।৮ শত কেন আচ্ছা হিসাব করে বলছি—৬০০্ টাকা দিয়ে কিনেছি—আরো ৪৫ শত টাকা মেরামত খরচা হ'য়েছে।" এবার কিন্তু রূপ-মঞ্চ সম্পাদকও না হেসে পারলেন না। তিনি শুধু আস্তে আস্তে বললেন: কী বন্ধক ছিল নাকি?" গাড়ীর প্রতিজন যাত্রীই এবার অট্টহাসি করে উঠলেন—কারণ অভিনয়ের বাইরে হুয়ার এই গুপ্ত কারবার সম্পর্কে সকলেই একটু আধটু ওয়াকীফহাল আছেন।

হুয়া আর কিছু বলতে না পেরে শেষকালে ভমকী দেখালো: আমি কিন্তু গাড়ী বিগড়ে দেবো—শেষে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে।" তখন অবধি চৌরঙ্গীও আমরা ছাড়িয়ে আসিনি—শীতের রাত্রে যদি সত্যিই গাড়ী ঠেলতে হয়—কী অবস্থায় পড়তে হবে সে কথা চিন্তা করে হুয়াকে কপট অনুরোধের ভংগীতে আমি বল্লাম: না ভাই, শুন, ওদের কথায় কী কান দিতে আছে!"

হুয়া এবার বীরবিক্রমে বলে উঠলেন: আপনি ছিলেন তাই এঁরা রক্ষা পেয়ে গেল। নইলে মজাটা দেখাতাম এক-বার! আর এই জন্যই এঁদের সংগে আমার মোটেই থাকতে ইচ্ছা করে না—কেবল ক্ষেপিয়ে নেবে!" হুয়ার এই কথাগুলি যে সম্পূর্ণ মিথ্যা তা হুয়া নিজেও জানতেন। কারণ—হুয়া নিজেও এঁদের সংগ ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না। শিল্পের বাইরে শিল্পীদের ব্যক্তিগত এই কপট ঝগড়া ঝাটিও এক অভিনয়ের নামান্তর! অভিনয়ের বাইরের সময়টুকু এমনি ভাবে এঁরা কপট-অভিনয়ে মধুর করে তোলেন।

আমাকেই সব প্রথমে পৌঁছে দিয়ে—হুয়া যখন বিদায় নিলেন, রাত দশটা তখন বাজে। — মণিদীপা

নতুন বছরের নতুন সংবাদ ০ ০ ০ ০ ০ ০

কলকাতার রাস্তা - ইতস্তত: গাড়ীঘোড়া ও লোকজন যাতায়াত করছে।...... দামিনী তার শিশুপুত্র অজয়ের হাত ধরে আজই প্রথম পা বাড়িয়েছে পেটের জ্বালায়।......এখানকার সব কিছুই নতুন, সব কিছুই বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে দামিনী আর অজয়ের চোখে।......এই বিস্ময়ের মাঝেই তারা বিশ্বের বিচিত্র গতি লক্ষ্য করে। মা-পুত্রকে করে তোলেন মহীমময়! পুত্র মাকে করে তোলে মহীয়সী। রূপালী পর্দায় আপনাদের চোখেও এই বিস্ময় প্রতিভাত হ'য়ে উঠবার দিন গুনছে।

=রূপায়ণে=

অহীন্দ্র চৌধুরী, দীপক, সন্তোষ সিংহ, সরযূবালা, প্রীতিধারা, শ্যামলাহা, মলিকা, দেবীপ্রসাদ, রাণীবালা, নবদ্বীপ হালদার, শেফালিকা, বেণু মিত্র, আশু বসু, রাজলক্ষ্মী (ছোট), লীলাবতী, মণিশ্রীমানি, মণি মজুমদার (এঃ), সঙ্ঘ মিত্রা, মাষ্টার সুখেন, মাষ্টার বুড়ো, মানু, ছন্দা প্রভৃতি।

★

●সংগীত পরিচালনা : বিভূতি দত্ত (এঃ) :: ●চিত্র-শিল্পী : অনিল গুপ্ত

●শব্দ-যন্ত্রী : শিশির চট্টোপাধ্যায় :: ●ব্যবস্থাপক : গিলু চৌধুরী
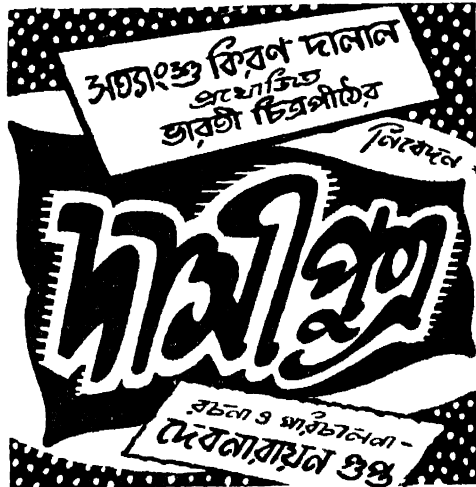
মুক্তি প্রতীক্ষায়

কালোছায়া (সমালোচনা)

গৌরাঙ্গ প্রসাদ বসুর প্রযোজনায় বসুমিত্রের প্রথম বাংলা ছবি। কাহিনী ও পরিচালনা—প্রেমেন্দ্র মিত্র। আলোক চিত্র—বিভূতি দাস। শব্দ-গ্রহণ-পরিতোষ বসু। সম্পাদনা -বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প নির্দেশনা— নির্মল মেহেরা। আবহ সংগীত—অমিয়কান্তি। অভিনযাংশে—ধীরাজ ভট্টাচার্য, শিশির মিত্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শিপ্রা দেবী,শ্যামলাহা, হরিদাস, নবদ্বীপ হালদার, বাণীবাবু প্রভৃতি। উপর্যোপরি কয়েকখানি ছবির ব্যর্থতা সত্বেও সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের নবতম চিত্রখানি আমরা যথেষ্ট আশা নিয়েই দেখতে গিয়েছিলাম। সাহিত্যিক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক তেমনি করেই দেখতে চেয়েছিলাম তঁকে। বিভিন্ন পরিচালকের হাতে তাঁর একাধিক কাহিনী চিত্ররূপায়িত হ'য়ে দর্শক সাধারণকে আনন্দ দিয়েছে। অথচ তাঁর নিজস্ব পরিচালনায় গৃহীত কাহিনী সেই তুলনায় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে না পারায় আমরা ব্যথা পেয়েছি—দুঃখিত হযেছি। কালোছায়া দেখে তাঁর সম্বন্ধে এই বেদনাবোধ অনেকখানি কমে গেছে। প্রেমেন বাবুর কাছ থেকে নতুন করে সত্যিকার শিল্প-সৃষ্টির আশা জাগছে মনে।

রহস্য চিত্রের নামে ইতিপূর্বে বাংলা ছবিতে একাধিক ছেলে-মানুষী রহস্য হ'য়ে গেছে। বড় বড় পোষ্টার আর বেনারে, নামকরা দৈনিক আর মাসিকের পাতায় পাতায় অজস্র বিজ্ঞাপনের যাদুকরী ভাষায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভের আগে পর্যন্ত ছবি সম্পর্কে নানা ধরণের রহস্যঘন কথা প্রচারিত হওয়ার পর দেখা গেছে, সে ছবির কোনখানে রহস্যের বিন্দু-মাত্র চিহ্নও কোথাও নেই—নিতান্ত ছকে ফেলা মামুলী একখানি বাংলা সনাতন প্রেমোপাখ্যান। বড়জোর সময়োপযোগী কিছু স্বদেশী উত্তেজনার ছোঁয়াচ পাওয়া গেছে তাতে মাঝে মাঝে। তাই আমাদের ধারণা ছিল, বাংলা রহস্য চিত্রের যা কিছু রহস্য বুঝি এইখানেই। কালোছায়ার বিজ্ঞপ্তিও ঠিক একই কারণেই ভীত করে তুলেছিল আমাদের। কিন্তু কালোছায়া এর প্রশংসনীয় ব্যতিক্রম। চেষ্টা করলে ভাল ডিটেক্টিভ ছবিও যে এদেশে করা যায়, আলোচ্য চিত্রখানি দেখে এ সন্দেহ অনেকেরই চওয়া স্বাভাবিক।

কাহিনীতে যতখানি প্লট পাকানো হয়েছে, তারও বেশী জটিলতার অবকাশ ছিল। কিন্তু প্রেমেন বাবু তা উপেক্ষা করে গেছেন। বড় ভাই পংগু পক্ষাঘাতগ্রস্ত দীননাথকে হত্যা করে ছোট ভাই রাজীবলোচন তার চেহারাগত অদ্ভুত সাদৃশ্যের সুযোগ নিয়ে নকল দীননাথ সেজে বাপের যা কিছু সম্পত্তি গ্রাস করবার মতলব করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা পীতাম্বর নিরুদ্দেশ। সুতরাং সেদিক থেকে কোন বাধার তিনি চিন্তা করলেন না। এদিকে পীতাম্বর মেজো ভাই ধূর্ত রাজীবলোচনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে তারই কাছে ডাক্তারের ছদ্মবেশে লুকিয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়—পীতাম্বরের একমাত্র কন্যা অণিমা যাকে পীতাম্বর অভাবের তাড়নায় একদিন অসহায়া মাতার বক্ষে শিশু অবস্থায় ফেলে কাপুরুষের মত পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে দূরে—সেও আজ বড় হয়ে ওই বাড়ীতেই নার্সের চাকরী নিয়ে আর নিজের পিতার দরুণ সম্পত্তির ন্যায় পাওনা কৌশলে উদ্ধার করবার মতলবে আত্মগোপন করে আছে। এমনি সময় রাজীবলোচনের তার পেয়ে কল-কাতা থেকে সখের গোয়েন্দা এলো সেই বাড়ীতে। সুরজিত পৌছুনর আগেই রাজীবলোচন খুন হলেন। রাজীব-লোচনের আহ্বানে তারই বাড়ীতে এসে গোয়েন্দা সুরজিত তাঁকেই নিহত অবস্থায় দেখে এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যা যা ঘটলো তাই হচ্ছে ছবির মূল গল্পাংশ।

গল্পের পরিধি রাজীবলোচনের ওই বাড়ীটুকুর মধ্যেই সীমা-বদ্ধ। তিন ভাই, অণিমা, গোয়েন্দা সুরজিত, সুরজিতের একজন গবেট সহকারী, একটি চীনে রাধুনী, একজন সরকার, এছাড়া বিশেষ কোন চরিত্রের বালাই নেই গল্পে। খুনী হিসাবে দুজন লোককে সন্দেহ করা যায় প্রধানতঃ। বড় ভাই দীননাথ এবং ছোট ভাই ডাক্তার বেশী পীতাম্বর। দীননাথ পংগু এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় সন্দেহ স্বভাবতঃই
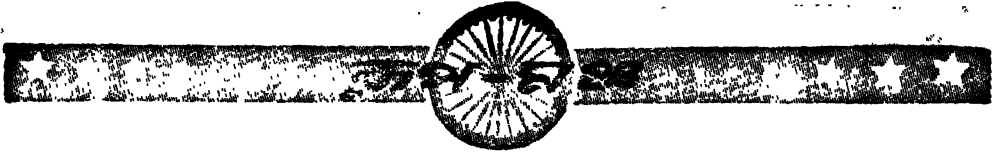
ডাক্তারের ওপর বেশী পড়ে। তাছাড়া ঘটনা পরম্পরায় তাঁর ওপরই সন্দেহ ফেলার চেষ্টা করা হ'য়েছে বিশেষ ক'রে। কিন্তু শুধু ডাক্তারকে সন্দেহ ভাজন না ক'রে আরো কয়েকটি চরিত্রকেও যদি এই সন্দেহের মধ্যে টেনে আনা যেতো, ত'াহলে রহস্যটা আরো গভীর হতো নিঃসন্দেহে। অণিমার আসল পরিচয়ও অতো তাড়াতাড়ি দর্শকদের না জানিয়ে ষড়যন্ত্রের মূলে সেও থাকতে পারে মনে করানো উচিৎ ছিল। চীনে রাঁধুনীটির প্রয়োজন বর্তমান গল্পে কিছুই নেই—কেবল খানিকটা হাল্কা হাস্যরস সৃষ্টি করা ছাড়া। গোয়েন্দার সহকারী একটু বেশী মাত্রায় ক্যাবলাকান্ত শ্রেণীর।
দীননাথ বেশী রাজীবলোচন ও ডাক্তার বেশী পীতাম্বর চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে অনেকখানি সার্থকতার দাবী ক'রতে পারে। গোয়েন্দা সুরজিতের চরিত্রে এমন কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নেই কোথাও, যা দর্শক মনকে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেলো এবং সুরজিত তার ভেতর দিয়ে খুব সাধারণ ভাবেই এই রহস্যের কিনারা ক'রে ফেললো। গোয়েন্দা চরিত্রের ওপর বোধ হয় একটু অবিচারই ক'রেছেন কাহিনীকার এই ব্যাপারে। সাধারণ মানুষের চিন্তাধারা আর একজন অভিজ্ঞ গোয়েন্দার চিন্তার মধ্যে অনেকখানি তফাৎ থাকে ব'লেই তাঁরা সম্মান এবং যশ অর্জন করেন। সুরজিতের মধ্যে সে রকম কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন আমরা পাইনি। অণিমাও অসম্পূর্ণ একটি চরিত্র। যার জন্যে খুব বেশী রেখাপাত সে ক'রতে পারে না দর্শক মনে। ছবির পূর্ণচ্ছেদ প্রেমেন বাবুর অদ্ভুত রসবোধের পরিচয় দেয়। যেখানে এসে তিনি ছবি শেষ ক'রেছেন, সেখানে আর কিছু বলার নেই—অথচ অনেক কিছুই যেন বলবার ছিল। দ্রষ্টার দল আরো একটু দেখবার আশা করেন—কিন্তু তার কোন প্রয়োজন থাকে না। এই পরিমাণ জ্ঞান সচরাচর পাওয়া যায় না পরিচালকদের মধ্যে। ছবির প্রথম
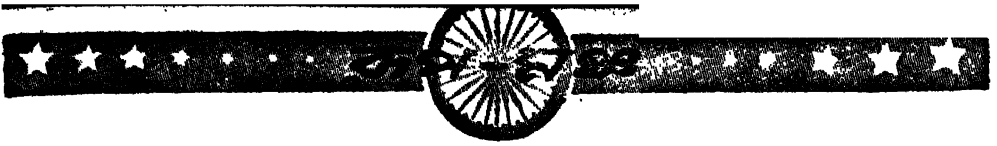
দিকে রাজীবলোচন ও দীননাথকে একটি দৃশ্যে কয়েকটি সটে এক সংগে দেখাবার জন্যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের নকল হিসাবে যাঁকে ব্যবহার করা হ'য়েছে তাঁকে স্পষ্ট বোঝা যায় অন্য ব্যক্তি ব'লে। সেদিক থেকে mixing-shot গুলি প্রশংসীয়।

অভিনয়ে সর্বপ্রথম নাম ক'রতে হয় রাজীবলোচন ও দীননাথের একই সংগে দু'টি ভূমিকায় ধীরাজ ভট্টাচার্যের। দু'টি বিভিন্ন কণ্ঠস্বর ও রূপসজ্জায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তারপর ডাক্তার বেণী পীতাম্বর চরিত্রে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর ধীর ও সংযত বাচন ভংগী, পরিমিত অংগ সঞ্চালন দর্শক মনে রেখাপাত করে। 'স্বয়ং সিদ্ধা'র কৃতকার্যতার পর যেসব প্রযোজক সিরিয়াস চরিত্রে গুরুদাস বাবুকে গ্রহণ করতে চান নি—আশা করি এবার তাঁদের সেই অদূরদর্শীতা দূরীভূত হবে। সুরজিতরূপে শিশির মিত্র সম্পর্কেও একথা বলা যায়। তাঁর প্রথম ছবি 'ঘরোয়া'র অভিনয় আর এই অভিনয়ে অনেক তফাৎ। তাঁর বচন ভংগী ও চলাফেরার অকুণ্ঠ প্রশংসা করবো। চরিত্রটিকে তিনি যথাযথ রূপ দিয়েছেন। শিপ্রা দেবীর অভিনয়ও প্রশংসনীয়। নবদ্বীপ হালদার আধিক্য দোষে দুষ্ট। শ্যাম লাহা খুবই জমিয়েছেন। রহস্য চিত্রের আলোকচিত্র গ্রহণ আরো ভাল হওয়া উচিৎ ছিল। বিভূতি দাস একজন কৃতি আলোক-চিত্রকর। তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো উন্নত ধরণের চিত্র গ্রহণ আশা ক'রেছিলাম। শব্দ-গ্রহণ সাধারণ শ্রেণীর। সম্পাদনা ছবির গতিকে কোনখানে ব্যাহত করেনি। ওতে দু'এক জায়গায় আরো একটু কাঁচি চালালে বোধহয় ভাল হ'তো। কয়েকটি মাত্র সেটে শিল্প-নির্দেশক তাঁর বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাবার অবকাশ পাননি। আবহ-সংগীত পরিচালনায় অমিয়কান্তি সম্পর্কেও সে কথা বলা যায়। সংগীত বিবর্জিত 'কালোছায়া' গোটা কয়েক সাস্পেন্স মিউজিকের উপর নির্ভর ক'রে, তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা শক্ত। পরিচালনায় প্রেমেনবাবু হৈ চৈ একটা কিছু না ক'রলেও মোটামুটি ভালই কাজ ক'রেছেন।

'কালোছায়া'র জনপ্রিয়তা রহস্য চিত্র নির্মাণের দিকে বাংলা ছবির প্রযোজকদের উদ্বুদ্ধ ক'রলেই আমরা খুশী হবো। এই ধরণের ছবির আরো একটা সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'চ্ছে, কিশোরপোযোগী চলচ্চিত্রের অভাব খানিকটা দূর ক'রতে পারবে। —দি, দে, চৌ।

গান্ধীজী:—গত ২রা অক্টোবর, শুভ গান্ধী জন্মতিথিতে তাঁরই স্মৃতি উদ্দেশ্যে কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের শ্রদ্ধার্ঘ নৃত্য-গীত সম্বলিত গীতি নাট্য "গান্ধীজী"। সাহিত্যিক প্রভাত বসু এর রচয়িতা: পরিচালক ও সুরস্রষ্টা—কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সংগীত পরিচালক সুকৃতি সেন। নৃত্য-পরিকল্পনা—প্রহ্লাদ দাস। রূপায়ণে কথক বা দ্রষ্টার রূপে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের নৃত্য ও সংগীত শিল্পিবৃন্দ।

এই গীতি-নাট্যের সমালোচনার প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় এর রচয়িতার কথা। গান্ধীজীর কর্মবহুল এবং সংগ্রামমুখর জীবনবেদকে কয়েক ঘণ্টার একটী গীতি-নাট্যে গ্রথিত করা দুরূহ প্রচেষ্টা। গান্ধীজী ও তাঁর কর্ম জীবনের সহচরদের নেপথ্যে রেখে তাঁদের জীবনের ঘটনাবলীকে সংগীত, নৃত্য, অভিনয়, আবৃত্তি ও রূপকের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা শক্তিমান নাট্যকারের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। তাঁর জীবন দর্শনকে কেন্দ্র করে সার্থক নাট্যরচনাও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এই ক্ষেত্রে "গান্ধীজীর" রচয়িতা যথেষ্ট সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর প্রাণের স্বতঃউৎসারিত শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছে! ভক্তির প্রাবল্যের অন্তরালে বক্তব্য চাপা পড়েনি—মহামানবের আদর্শ ও কর্মসাধনা দেবত্বে পর্যবসিত হয় নি রচয়িতার সংযত লেখনীর পরিচয়ে, তাই তিনি আমাদের আনন্দ দিতে সক্ষম হ'য়েছেন। এজন্য তিনি সত্যিই ধন্যবাদার্হ এবং প্রশংসাযোগ্য। তাঁর নাটক নাট্যবিচারের দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে কিনা, সেই তর্কের প্রশ্ন এখানে নিষ্প্রয়োজন।

কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ এই গীতি-নাট্যখানাকে মঞ্চস্থ করে তাঁরাও যথেষ্ট দেশ সেবার পরিচয় দিয়েছেন। গীতি-নাট্যের ভিতর দিয়ে ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস প্রচার জাতীয় জীবনকে গঠন করে তুলতে অনেকখানি সাহায্য
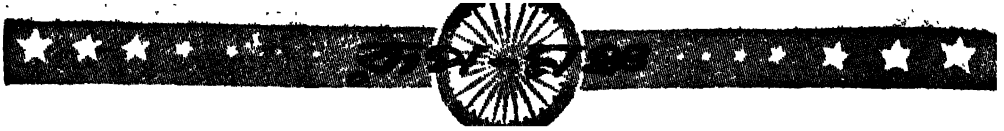
করবে। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘ এই বিষয়ে অগ্রণী হয়ে তাঁদের কর্মপন্থাকে আরও সুদূর প্রসারী করে তুলবেন এটুকু আশা করি। তাঁদের প্রযোজিত "অভ্যুদয়" জাতীয় সংগীত ও নৃত্য-নাট্যের ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা করেছে এবং তাঁদের দ্বিতীয় অবদান "গান্ধীজী"র পর তাঁর প্রেরণাও শ্রীযুক্ত প্রভাত বসু স্বীকার করেছেন। কিন্তু তবু এই নাট্যে যথাসম্ভব নতুন পরিবেশ ও আংগিক গ্রহণ করা হয়েছে। মহামানবের জীবন কথা, কর্মসাধনা ও ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস যথাযোগ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—চরিত্র-গুলিকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে তাঁদের জীবনের ঘটনাগুলিকে রূপায়িত করা হয়েছে অতি সুন্দর রূপে।

সংগীত এবং নৃত্য পরিচালক তাঁদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। যন্ত্র সংগীতের মূর্চ্ছনায়, নৃত্যের ভংগীতে সংগীতগুলি জীবন্ত হয়ে দর্শকদের সামনে ফুটে উঠেছে। নাটকের সুষ্ঠ রূপায়ণে এঁদের দায়িত্ব অনেক খানি এবং এই দায়িত্ব তাঁরাও আপ্রাণ পরিশ্রমে সফল করে তুলেছেন। সংগীত শিল্পীদের সকলেই প্রশংসা পেতে পারেন। নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে দু'একজন মহিলা শিল্পীর মধ্যে ভাব প্রকাশের অভাব আছে। হাতের মুদ্রায় বা ভংগীতে যতখানি প্রকাশ করা যায় বা দর্শকসাধারণ যতখানি বুঝতে পারেন, মুখের ভাবে তার চেয়ে বেশী বুঝা যায়। দর্শক সাধারণ সকলেই নৃত্য শাস্ত্রের অনুশীলন করেন না—এজন্যই এদিকে নৃত্য পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিশেষ করে শ্রীমতী স্নিগ্ধা রায় এবং মঞ্জুশ্রী দত্তের মধ্যে এই অভাব আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর শোকাচ্ছন্ন ভারতমাতার প্রতীক কালোবেশ পরা মেয়েটীর ভূমিকায় সবিতা চট্টোপাধ্যায় ভাবে, ভংগীতে, অপূর্ব ব্যঞ্জনায় দর্শকদের অভিভূত করেছেন--অন্যান্য প্রত্যেকটী নৃত্য প্রশংসাযোগ্য হলেও, এই নৃত্যটী পরিবেশের দিক দিয়ে এবং ভাবপ্রকাশের দিক দিয়ে অধিকতর প্রশংসা পাওয়ার দাবী রাখে। কথকরূপে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের উদাত্ত কণ্ঠস্বরের আবৃত্তিতে "গান্ধীজীর" ঘটনা-সংযোজনা এবং গান্ধীজীর কর্ম সাধনার সংগে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছে। এই ধরণের গীতি-নাট্যে কথক বা সূত্রধরের ভূমিকার একটি বিশেষ স্থান আছে —নির্দোষ উচ্চারণ, সতেজ বাচন-ভংগী ও আবৃত্তির উপযোগী জোরালো কণ্ঠস্বরের সাহায্যে এই ভূমিকাটীর রূপ দেওয়া সম্ভবপর। শ্রীযুক্ত ভদ্র এই ভূমিকাটির মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

পরিশেষে এইরূপ একখানি নাটকের প্রযোজনা করে সকলেই যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, সেজন্য সকল-কেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই প্রচেষ্টা আরও সুদূর প্রসারী হওয়া দরকার—এইখানেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হলো না। এই দেশের প্রতিটি প্রাণকেন্দ্রের প্রত্যেকটি প্রাণের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে আমাদের জাতীয় জীবনের পরিচালকদের কর্মবহুল জীবন কথাকে—প্রচার করতে হবে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের এই প্রচেষ্টা যেন আমাদের অনুরাগী করে তোলে এই দিকে, এই কামনা করি। তবেই তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। —মণিদীপা

নিউথিয়েটার্স লিঃ

খ্যাতনামা প্রবীণ সাহিত্যিক 'বনফুল' এর মন্ত্রমুগ্ধ নাটকের কাহিনীকে কেন্দ্র করে চিত্ররূপায়িত 'মন্ত্রমুগ্ধ' একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত বিমল রায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন মীরা সরকার, রেবা বসু, সুনীল দাশগুপ্ত, জীবেন বসু, কালী সরকার, শক্তিপদ ভাদুড়ী, ইন্দু মুখুজ্জে, রমা নেহেরু, মনোরমা (ছোট), ছবি রায় ও আরো অনেকে। মন্ত্রমুগ্ধের সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল এবং খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীশ ঘটক এই চিত্রে শ্রীযুক্ত বিমল রায়ের সহযোগী পরিচালকরূপে কাজ করেছেন। চিত্রখানি অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ এর পরিবেশনায় মুক্তিলাভ করবে।

পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি কাহিনী অবলম্বনে হিন্দি চিত্র 'ছোটভাই'র চিত্রগ্রহণের কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। স্নেহশীলা ভাবী এবং দুষ্টু রামের ভূমিকায় মলিনা দেবী ও মুকুর অভিনয় করছে। রামের বড় ভাইয়ের ভূমিকায় পদমহেন্দ্র এবং শ্রীমতী
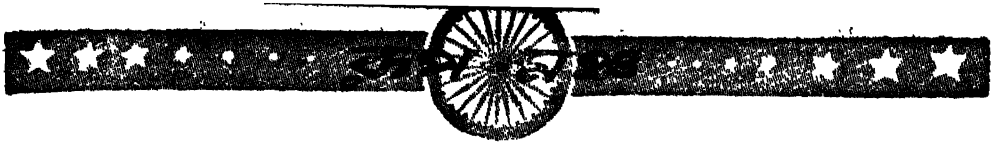
রাজলক্ষ্মী (বড়) রামের সুমতির বাংলা চিত্ররূপের তাঁর নিজস্ব ভূমিকাটাই ফুটিয়ে তুলছেন।

ওরিয়েন্টাল স্ক্রীন করপোরেশন লিঃ

এঁদের প্রথম চিত্র 'সতী সীমন্তিনী'র প্রাথমিক কাজ পরিচালক গুণময় বন্দোপাধ্যায় প্রায় শেষ করে এনেছেন। সতীসীমন্তিনীর কাহিনী রচনা করেছেন উদীয়মান সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু। চিত্রখানির সংগীত পরিচালনা করবেন সন্তোষ মুখোপাধ্যায়। গত সংখ্যায় প্রতিষ্ঠানের নাম ওরিয়েন্টাল স্থলে ভুলক্রমে ন্যাশানেল মুদ্রিত হয়েছিল বলে আমরা দুঃখিত।

কীর্তি পিকচার্স

জীবনের প্রতিটি ছন্দে প্রতিটি দ্বন্দ্বে প্রতিটি পদক্ষেপে কামনা মানব প্রকৃতির উচ্ছ্বাসময় দ্যোতনা। কামনার অংকে শিশু দোলা খায়—নারীর বুক ভরে উঠে স্নেহে—পুরুষ হয় ক্রুর, অন্ধ, সত্যভ্রষ্ট। নবেন্দু সুন্দরের পরিচালনায় ও শ্রীজগদীশপদ কীর্তির প্রযোজনায়—কামনা চিত্ররূপায়িত হয়ে মুক্তির দিন গুনছে। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন উত্তম, ছবি রায়, জহর, ফণী রায়, প্রভৃতি আরো অনেকে। সংগীত পরিচালনা করেছেন দ্বিজেন চৌধুরী।

ভারতী চিত্রপীঠ

নাট্যকার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর দাসীপুত্র চিত্রের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করে ফেলেছেন। 'দাসীপুত্র' পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের ক্রমোন্নতির সাক্ষ্যরূপেই আত্মপ্রকাশ করবে। অতীতের ভুলভ্রান্তিকে সংশোধন করে নেবার আন্তরিকতার পরিচয় বহন করেই দাসীপুত্র মুক্তির দিন গুনছে। দাসীমাতার ভূমিকায় মঞ্চসম্রাজ্ঞী সরযূবালার হৃদয়স্পর্শী অভিনয় যে কোন দর্শকের অন্তর স্পর্শ করবে। কোন একটি প্রাণস্পর্শী দৃশ্যে অভিনয় করতে যেয়ে শ্রীমতী সরযূ এতই নাকি অভিভূতা হ'য়ে পড়েছিলেন যে, অভিনয় শেষেও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে তাঁর বেশ সময় লেগেছিল। সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ার একটি দৃশ্যকে অনেকে ডামি বা অন্যভাবে গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন সরযূর দেহে আঘাত লাগবে বলে। কিন্তু উক্ত দৃশ্যকে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলবার জন্য পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্তের মনোভাব বুঝতে পেরে শ্রীমতী সরযূ নিজেই সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়েন। এতে তাঁর দেহের অনেক স্থানই ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় এবং কয়েক দিন তাঁকে শয্যাও নিতে হয়। দাসীপুত্রের অন্যান্যাংশে অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, শ্যামলাহা, দীপক, মণিশ্রীমানি, নবদ্বীপ, আশু বসু, দেবীপ্রসাদ, প্রীতিধারা, মণিকা ঘোষ, রাণীবালা, লীলাবতী, মাষ্টার স্বরূপ প্রভৃতি আরো অনেকে। দাসীপুত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন প্রবীণ সুরজ্ঞ শ্রীযুক্ত বিভূতি দত্ত। চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন শ্রীযুক্ত সুধাংশু কিরণ দালাল। চিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও শিশির চট্টোপাধ্যায়ের ওপর। দাসীপুত্রের ব্যবস্থাপনার ভার দেওয়া হ'য়েছিল শ্রীযুক্ত গিলু চৌধুরীকে।

ফার্স্ট ন্যাশনাল পিকচার্স লিঃ

গত ১১ই ডিসেম্বর, রাধাফিল্ম ষ্টুডিওতে এঁদের বাংলা ও হিন্দি চিত্র 'কর্মনিষ্ঠ মেয়ে' ও 'মজবুরীর' মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্র দু'খানি পরিচালনা করবেন যথাক্রমে শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ দালাল ও সৈয়দ কেওরভী। এবং যথাক্রমে এই চিত্র দু'খানিতে দেখা যাবে বিপিন মুখোপাধ্যায়, সুরুচি মিত্র এবং মুশারেফ ও শীলা মেহেরকে।

চিত্রমায়ার আগতপ্রায় নিবেদন 'কবি'

কালীঘাট—ফলতা লাইট রেলওয়ের অন্তর্গত একটি ষ্টেশনের নিকটবর্তী, রেল লাইনের উপর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামে কবি চিত্রের বহির্দৃশ্যগুলি তোলার কাজ শেষ করে, চিত্রমায়ার প্রযোজক ও পরিচালক দেবকী কুমার বসু মহাশয় সম্প্রতি সদলবলে সদরে ফিরে এসেছেন। শব্দযন্ত্রী নৃপেন পাল এবং দু'জন ক্যামেরাম্যান তাঁদের যন্ত্রপাতি সমেত প্রায় দু'হপ্তা ধরে বিভিন্ন লোকেশান-এ কাজ করেছেন। রেল লাইনের উপর প্লেব্যাক যন্ত্রের সংগে সমতালে অনেকগুলি গানের শট্ তোলা হয়েছে! এ ছাড়া ট্রেনের শট্গুলি নাটকীয় প্রয়োজন অনুযায়ী নানাভাবে এবং বিভিন্ন angle থেকে নেবার জন্য প্রায় ৫।৬ দিন ধরে স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। দেবকী বাবুর মুখে শোনা গেল, তাঁর যাবতীয় কর্মিগণের কঠোর পরিশ্রম
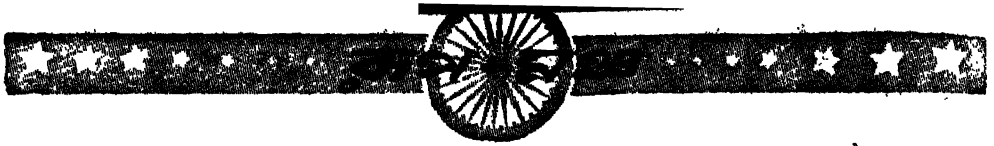
এবং প্রচুর অর্থব্যয় সফল হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে ছবির পর্দায় তার পরিচয় পাবেন।

গ্রন্থকারের সংগে দিনের পর দিন যে ভাবে নিকট সহযোগিতা রক্ষা করে, তাঁর চোখের সামনে বেশীর ভাগ দৃশ্য তোলা হয়েছে, এদেশের ছায়াচিত্রের ইতিহাসে তা অভাবনীয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারাশঙ্কর বাবু বলেন, তাঁর কর্মজীবনে এধরনের অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে ঘটে নি। গ্রন্থকারের যথাযোগ্য সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়ে, উভয়ের পূর্ণ সহযোগিতায় চিত্র গ্রহণের প্রচেষ্টা এই প্রথম।

প্রত্যেকেরই অভিনয় যে গ্রন্থকারকে খুশী করেছে এ কথাও আমরা শুনেছি। অনুভা, নীলিমা, রবীন, এবং নীতীশ - নাটকের চারিটি চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠায় দর্শকদের যে পুরো পুরি খুশী করতে পারবে, এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে তারাশঙ্করের 'কবি' মুক্তির শুভ দিনটির প্রতীক্ষা করছে। বাণী চিত্রের প্রয়োজনে সবগুলি গানই তারাশঙ্কর বাবু লিখে দিয়েছেন এবং তাতে সুর সংযোজনা করেছেন যশস্বী সুরকার অনিল বাগচী।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী

সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী হিসাবে অভিজাত-সমাজে সম্মানিত রবি প্রসাদ গুপ্ত মহাশয় এবং বিশিষ্ট ধনী ইন্দ্রজিত সিংহ মহাশয় উভয়ের প্রযোজনায় বহু অর্থব্যয়ে নির্মিত রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক নিবেদন 'দেবী চৌধুরাণী' শীঘ্রই রূপালী পর্দায় আত্মপ্রকাশ করবে। স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উপন্যাসের মাধুর্য অক্ষুন্ন রেখে তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে নিখুঁত ভাবে ছবির পর্দায় কাহিনীটি পরিবেশিত হয়—ছবির প্রযোজকগণ সে দিকে যে বিশেষ সচেতন, একথা আমাদের জানিয়েছেন।

প্রথমাংশের চিত্র গ্রহণ কার্যের দায়িত্ব ছিল সতীশ দাশগুপ্তের উপর। অপরাপর জাঁকজমক পূর্ণ এবং জনতাবহুল দৃশ্যাবলীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সেগুলির চিত্রগ্রহণের ভার অর্পণ করেন প্রবীণ ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত প্রয়োগশিল্পী প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের উপর। গত আগষ্ট মাস থেকে প্রফুল্ল বাবুর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে এগুলি অতি নিপুণ ভাবে গৃহীত হচ্ছে এবং আর এক পক্ষ কালের মধ্যে ছবির যাবতীয় কাজ শেষ হয়ে যাবে—এই প্রতিষ্ঠানের প্রচার সচিব একথা আমাদের জানিয়েছেন।

এই বিরাট বাণী-চিত্রের প্রযোজনার ক্ষেত্রে আর দু'টি বিশিষ্ট কর্মীর শিল্প নৈপুণ্য বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা যথাক্রমে আলোক-চিত্রশিল্পী শৈলেন বসু এবং শিল্প-নির্দেশক বটু সেন।

শৈলেন বাবু ইতিপূর্বে মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে সবত্র পরিচিত। দেবী চৌধুরাণীর ফটোগ্রাফীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড এদেশের চিত্র-বিজ্ঞানের ইতিহাসে নব অধ্যায় সূচনা করবে—এমন আশ্বাসও কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন।

এই বাণীচিত্রের নাম ভূমিকায় অবতীর্ণা বাঙলার চিত্র জগতের প্রিয়দর্শনা অভিনেত্রী সুমিত্রা দেবী। নায়কের ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন 'ভুলি নাই'-খ্যাত, প্রিয়দর্শন প্রদীপ বটব্যাল। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে দেখতে পাবেন যাঁদের, তাঁদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, উমা গোয়েঙ্কা, সুদীপ্তা দেবী ও উৎপল সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীতাংশের পরিচালনা করেছেন: কালীপদ সেন। দেবী চৌধুরাণীর প্রচার কার্য যশস্বী প্রচারবিদ শ্রীযুক্ত সুধীরেন্দ্র সান্যালের মত যোগ্যতম ব্যক্তির উপর অর্পিত হওয়ায় আমরা কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির তারিফ করি।

মহাভারতী লিমিটেড

নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে এই নবগঠিত যৌথ প্রতিষ্ঠানটির প্রথম বাংলা সমাজ চিত্রের শুভ মহরৎ উৎসব ইস্টার্ণ ফিল্ম ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। ছবির প্রয়োগ কর্তা ও পরিচালকরূপে স্বনামধন্য কথা-শিল্পী প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং তাঁর সহকর্মীদের পূর্ণ সাফল্য কামনা করি! প্রেমেন্দ্র বাবুর স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে এর চিত্র-নাট্য রচিত হয়েছে এবং ছবিখানির নামকরণ করা হয়েছে "কুয়াসা"। লব্ধ প্রতিষ্ঠ অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য এই ছবির একটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপদান করবেন। নায়িকা রূপে চিত্রাবতরণ করবেন একজন শিক্ষিতা ও নবাগতা।
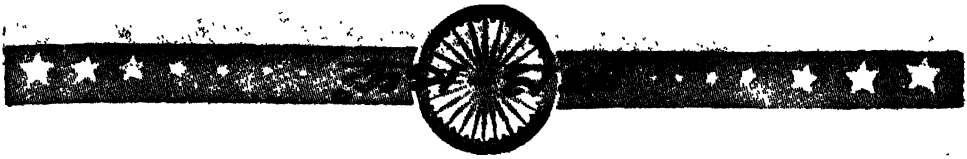
নীলদর্পণ

গত আঠারোই নভেম্বর ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরবর্তী চিত্র 'নীলদর্পণে'র মহরৎ উৎসব সম্পন্ন করেছেন। বিদেশী বেনিয়া নীলকরদের উৎপাতে বাংলার নিরীহ চাষীরা কী শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হ'য়েছিল—স্বর্গতঃ দীনবন্ধু মিত্র রচিত নীলদর্পণ শুধু নাটক হিসাবেই নয়—সে অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনায় ইতিহাসের মর্যাদা পেয়ে আসছে। এই নীলদর্পণকে কেন্দ্র করেই শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের বর্তমান চিত্র গড়ে উঠবে। মহরতের দিন শ্রীযুক্ত বিকাশ রায়কে নিয়ে চিত্র গ্রহণ করা হয়। নীলদর্পণের চিত্র গ্রহণ ও শব্দগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হ'য়েছে যথাক্রমে সুধীশ ঘটক ও বাণী দত্তকে। সংগীত পরিচালনা করবেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স' লিঃ

এদের অভিমান চিত্রের মহরৎ উৎসব শ্রীমতী সন্ধ্যারাণীকে নিয়ে ইতিমধ্যে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। অভিমান পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিভা ফিল্ম প্রডাকসন

বলাই পাচাল প্রযোজিত গৌর সী ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় গৃহীত এদের প্রথম ভক্তিমূলক চিত্র সাক্ষীগোপাল কলকাতার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির দিন গুনছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মুভিটোন লিঃ

শ্রীবিভূতিদাসের উদ্যোগে সম্প্রতি এই চিত্র প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। এদের প্রথম চিত্র 'প্রতীক্ষার' কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীআর্য কুমার মুখোপাধ্যায় এবং চিত্রখানি পরিচালনা করবেন 'পঞ্চমুখ'।

মুভীল্যাণ্ড

গত ১৪ই ডিসেম্বর ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এদের প্রথম চিত্র 'পরদেশী কোকিলার' মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন। 'পরদেশী কোকিলা' পরিচালনা করবেন নৃত্যবিদ ও পরিচালক সমর ঘোষ। এর বিভিন্নাংশে দেখা যাবে শ্যামলাহা, জীবেন বসু, ফণী রায়, নবদ্বীপ হালদার প্রভৃতি আরো অনেককে। সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন রবি রায় চৌধুরী। প্রকাশ বর্তমান চিত্রখানি পূর্ণাংগ কৌতুক চিত্র হবে।

মায়াপুরী পিকচার্স লিঃ

এদের বাংলা পৌরাণিক নৃত্য-গীত বহুল বাণীচিত্র তিলোত্তমার চিত্রগ্রহণ কার্য ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সমাপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। এর কাহিনী রচনা ও পরিচালনা করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সুর সংযোজনা ও নৃত্য পরিকল্পনা করেছেন রাইচাঁদ রায়। নৃত্য শিক্ষা দিয়েছেন পিটার গোমেশ। গীত রচনা করেছেন তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়। আলোক চিত্রগ্রহণ ও শব্দযোজনা করেছেন যথাক্রমে দশরথ বিশাল এবং জে ডি ইরাণী ও শিশির চট্টোপাধ্যায়। তিলোত্তমার বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন তিলোত্তমা, মনোরমা, উমা গোয়েঙ্কা, অঞ্জলি কর, নীতাশ, শৈলেন, সুজিত, রঞ্জিৎ, নবদ্বীপ, আশু, জীবন, জয়নারায়ণ, পঞ্চানন, রাধারমণ, মণি, পূর্ণ, কমল, প্রভাত দাস, প্রভাত বসু ও আরো বহু নতুন ও পুরাতন শিল্পীবৃন্দ। ১৯৪৯ এর প্রথমদিকে কলকাতার বিভিন্ন চিত্রগৃহে চিত্রখানি মুক্তিলাভ করবে।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল টকীজ লিঃ

গীতিকার পরিচালক প্রণব রায় রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে তাঁর 'অনুরাধা' চিত্রের কাজ দ্রুত সমাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। 'অনুরাধা' অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। অনুরাধার প্রধান নারী চরিত্রে অভিনয় করছেন কানন দেবী। এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল টকীজ লিঃ শ্রীমতী কাননের ওপরেও টেক্কা দিয়েছেন বলতে হবে। কারণ, শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে কানন দেবীর এই সর্বপ্রথম চিত্রাবতরণের কৃতিত্ব তাঁরাই লাভ করলেন। কানন দেবী মনে মনে ঠিক করে রেখে-ছিলেন—নিজস্ব প্রযোজনায়ই তিনি প্রথম শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে অভিনয় করবেন। প্রধান পুরুষ চরিত্রে দেখা যাবে সর্বজনপ্রিয় জহর গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি সম্পূর্ণ নতুন চরিত্রে। অনুরাধার সুর সংযোজনায় ভার গ্রহণ
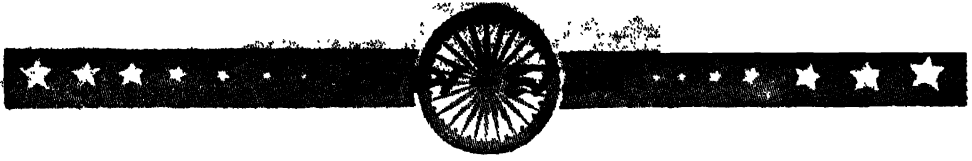
করেছেন প্রখ্যাত সুরকার কমল দাশগুপ্ত আর চিত্রগ্রহণ করছেন কৃতি চিত্রশিল্পী অজয় কর। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সোম প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অনুরাধার প্রযোজনা করছেন।

দেবকুমার কলামন্দির

শ্রীকুমার প্রযোজিত দেবকুমার কলামন্দিরের চিত্রগ্রহণ-কার্য শ্রীকুমারের অকস্মাৎ মাতৃবিয়োগের জন্য অগ্রসর হতে পাচ্ছে না। গত কার্তিক মাসে শ্রীকুমারের মাতা শ্রীযুক্তা ঈশানী দেবী সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেছেন। তাঁর মত ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা খুব কমই দেখা যায়। তিনি যেমনি বিদুষী, তেমনি দানশীলা ও ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় করেই শ্রীকুমার চিত্রজগতে পা বাড়িয়েছিলেন। মায়ের মৃত্যুতে শ্রীকুমার যে আঘাত পেয়েছেন, তার সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমাদের নেই। ভগবানের কাছে মৃতার আত্মার মঙ্গল কামনা করি এবং শ্রীকুমারও যাতে এই আঘাত সামলে নিতে পারেন, তার প্রার্থনা করি।

বঙ্গবাসী কলেজ প্রাক্তন-ছাত্রসংসদ

গত ১৫ই ডিসেম্বর, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন ছাত্র সংসদ কর্তৃক কবিগুরুর 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় সব দিক দিয়েই সর্বাংগ সুন্দর হ'য়েছিল।

ষ্টীল কণ্ট্রোল রিক্রিয়েশন ক্লাব

গত ১৯শে নভেম্বর, উক্ত ক্লাবের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক ষ্টার রংগমঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত টিপু সুলতান নাটকের অভিনয় হয়। অভিনয় সবদিক দিয়েই সার্থক হ'য়েছিল।

ডালমিয়া জৈন এয়ার ওয়েজ ড্রামাটিক সোসাইটি

গত ২২শে নভেম্বর, রঙমহল রংগমঞ্চে সোসাইটির সভ্যবৃন্দ কর্তৃক শচীন সেনগুপ্ত রচিত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক অভিনীত হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিজন সভ্যই অভিনয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দেন।

চৈতন্য লাইব্রেরী

গত ৪ঠা ডিসেম্বর, স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় পাঠাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভার অধিবেশনে 'আমাদের শিক্ষার ধারা' সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মিলন আসর

গত ১৩ই অগ্রহায়ণ, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় রংমহল রংগমঞ্চে মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'মহারাজা নন্দকুমার' নাটকটি সমিতির সভ্যবৃন্দ কর্তৃক অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর এস্. কে. গুপ্ত এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী। অভিনয়ে শিবু আঢ্য, অমল সেন, শিবনাথ রায়, অসিত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমস্ত বিষয়ে তত্ত্বাবধান করেন প্রফুল্ল রায় ও প্রবীর ঘোষ।

কোন্নগর সাটার ডে ক্লাব

গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই নভেম্বর ক্লাবের উদ্যোগে নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, তুষারকান্তি ঘোষ, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনাদি দস্তিদার, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উপস্থিতিতে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে গৌরমোহন পাইন

গত ২৭শে কার্তিক, শনিবার শ্রীযুক্ত গৌর মোহন পাইন তাঁর ৭৪, আমহার্ষ্টষ্ট্রীট স্থিত নিজ বসত বাটীতে ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। স্বর্গতঃ পাইন দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠাতা ও সহ-সভাপতি ছিলেন। ত্রিবেণীতে হোমিওপ্যাথ হাসপাতালটি তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে তাঁর যথেষ্ট দান ছিল। তাঁর সরল ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলেই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি আজীবন অকৃতদার ছিলেন। মৃত্যুকালে দুই ভাই ও বহু ভ্রাতুষ্পুত্র-পুত্রী ও পুত্রবধূ এবং বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। আমরা মৃতের আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

পরলোকে চিত্র পরিচালক অতুল দাশগুপ্ত

চিত্র পরিচালক অতুল দাশগুপ্ত গত ১০ই অগ্রহায়ণ কলেরায় আক্রান্ত হ'য়ে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করে-

ছেন। ১৯৩৫ খৃঃ স্বর্গতঃ দাশগুপ্ত তাঁর পিতৃব্য চিত্র পরিচালক সতীশ দাশগুপ্তের সহকারীরূপে চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। আদর্শ মহিলা, কর্ণার্জুন, সোনাপুর, জন্মে যাদের জীবন গড়া প্রভৃতি চিত্রে স্বনামের সংগে সহকারীরূপে কাজ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি 'বিস্মৃতি' নামক একটি চিত্রের পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধ পিতা মাতা, বিধবা স্ত্রী, এক ভ্রাতা ও দু'টি কন্যা রেখে যান। স্বর্গত দাশগুপ্ত অতি অমায়িক ও কর্মঠ ব্যক্তি ছিলেন। রূপ মঞ্চ কার্যালয়ে তিনি বহুবার এসেছেন এবং রূপ-মঞ্চে তাঁর রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করে শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

রাজশ্রী কথাচিত্র

এঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন নিশিরডাক গড়ে উঠেছে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটী কাহিনীকে কেন্দ্র করে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন অমিনা মিত্র। নিশির ডাক এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন প্রতি রেখা বিশ্বাস, তপতীরাণী মিত্র, বিমান, বিপিন, অপর্ণা, কণীরায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মাষ্টার শঙ্খ, বীরেন, বিজয়, প্রভৃতি। চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন অজিত মিত্র। শুনে খুশী হলাম, আমাদের সর্বজনপ্রিয় 'বড়দা' আনন্দবাজার পত্রিকার চল চ্চিত্র-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রুপেন্দুনারায়ণ ভৌমিক নিশির-ডাকের প্রযোজনার সংগে জড়িত রয়েছেন।

এসোসিয়েটেড পিকচার্স

অগ্রদূত পরিচালিত সমাপিকা, ৩১শে ডিসেম্বর কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করেছে। সংগ্রাম চিত্রকাহিনী রচয়িতা নিতাই ভট্টাচার্য রচিত এই এই কাহিনীটী মানব মনের গভীরতম অনুভূতিকে মর্মবিদ্ধ করে তুলেছে। জনপ্রিয় অভিনেতা অভয় গাঙ্গুলী আদর্শ-বাদী ডাক্তারের অভিনব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। তার বিপরীত নারী চরিত্রটিকে রূপায়িত করে তুলেছেন শ্রীমতী সুনন্দা। অপরাংশে আছেন শক্তিমান অভিনেতা কমল মিত্র, রেণুকা রায়, সুপ্রভা, মুখুজ্জে, পূর্ণেন্দু, শ্যামলাহা, কালী সরকার প্রভৃতি। সুর শিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় নেপথ্য সংগীতে ও সুর রচনায় ছবিখানির মাধুর্য বৃদ্ধির সহায়তা করেছেন।

ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ

'ভুলিনাই' চিত্রোপহার দিয়েই এঁরা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানটি বাংলা দর্শকসমাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ এর কর্তৃপক্ষ রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের সংগে আলাপ আলোচনা প্রসংগে প্রথম শিশুচিত্র নির্মাণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্ণধার সতীশ বাবু তার সহযোগিদের নিয়ে আমাদের কার্যালয়ে এসে জানিয়ে গেছেন যে, তাঁদের বর্তমান প্রচেষ্টা শিশু-চিত্রকে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়ে উঠবে। আমরা কর্তৃপক্ষকে এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এঁদের বর্তমান চিত্রে অভিনয় করবার জন্য আট বছর থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত প্রিয়দর্শন ছেলেমেয়ের দরকার। চিত্রখানি সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক হবে। তাই এবিষয়ে আগ্রহীদের অভি-ভাবকেরা রূপ-মঞ্চ সম্পাদক ৩০ গ্রে ষ্ট্রীট অথবা ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ ৬, হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে সরাসরি পত্রালাপ করিতে পারেন।

চিত্রাভিনেতার শুভ পরিণয়

উদীয়মান চিত্রাভিনেতা দীপক মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি কিছু দিন পূর্বে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। গত শারদীয়া সংখ্যা রূপ-মঞ্চে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের জীবনী প্রকাশিত হ'য়েছিল।

রূপ মঞ্চ পাঠক সাধারণ উক্ত জীবনীর অপূর্ণ অংশটি এবার পূর্ণ করে নিতে পারবেন আশা করি। রূপ-মঞ্চ ও তার পাঠক সমাজের পক্ষথেকে সস্ত্রীক দীপকবাবুর নতুন জীবনের উদ্দেশ্যে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জ্যোতিষ-সম্রাট কন্যার শুভ পরিণয়

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ, শনিবার নাগের বাগান নিবাসী ক্যাপ্টেন ধীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান প্রবোধ চন্দ্র চক্রবর্তীর সহিত জ্যোতিষ সম্রাট রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী উষারাণী দেবীর শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হ'য়েছে। বিবাহ বাসরে বহু গণ্যমান্য

ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমরা নবদম্পতীর দীর্ঘায়ু ও শুভ জীবন কামনা করি।

চিত্র ও নাট্যাভিনেতা ছবি বিশ্বাসের ভ্রাতৃবিয়োগ

প্রখ্যাত চিত্র ও নাট্যাভিনেতা ছবি বিশ্বাসের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রবি বিশ্বাস কিছুদিন পূর্বে তাঁর কার্যক্ষেত্র থেকে গৃহাভিমুখে যাবার সময় মটর দুর্ঘটনায় গুরুতর আঘাত পেয়ে আঘাত-স্থলেই মারা যান। স্বর্গতঃ বিশ্বাস নিজেও একজন অভিনেতা ছিলেন। কয়েক খানি চিত্রে তাঁর সংগে আমাদের সাক্ষাৎও হ'য়েছিল। আমরা তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করে শ্রীযুক্ত বিশ্বাস ও অন্যান্য শোক সন্তপ্ত পরিজনকে আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত সেনের পত্নী বিয়োগ

গত ২২শে নভেম্বর, সোমবার (৬ই অগ্রহায়ণ) ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর কার্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অজিত সেনের স্ত্রী শ্রীমতী জ্যোতিকণা সেন এ্যানিমিয়া রোগভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। গত ৮শে বৈশাখ, ১৩৫০ সালে শ্রীযুক্ত

সেনের সংগে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীমতী সেন সর্বপ্রকার কণ্ঠ ও যন্ত্র সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। বিবাহের পর থেকেই তিনি রূপ-মঞ্চ পত্রিকার গ্রাহিকা ছিলেন এবং হাসপাতালে রোগ শয্যায় শায়িতা থাকা সময়েও রূপ-মঞ্চের কয়েকখণ্ড পুরাতন সংখ্যা তাঁর শিয়রে ছিল। মৃত্যুকালে তিনি পাঁচবছরের পুত্র স্বপনকুমার, তিন বছরের শিশুকন্যা সুধা—স্বামী ও বহু আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন। আমরা মৃতার আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

পদ্মা প্রমত্তা নদী ঃ (সমালোচনা)—কয়েক মাস যাবৎ সিনেমা জগতে যে একঘেয়েমীর বাহুল্যে দর্শকমন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে—"পদ্মা প্রমত্তা নদী" তাদের মনে আবার নূতনত্বের আভাস দেবে। গতানুগতিক বৈচিত্রহীন গল্পের ভারে, ছবির মান-পর্যায়ের নিম্নাভিমুখী গতিকে আবার এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে মনে একটু আশাও জাগে। কীর্তিনাশা পদ্মার সর্বনাশা শক্তি একদিকে যেমন মানব এবং তার কীর্তিকে ধ্বংস করে তেমনি অপর দিকে তারই মাতৃবক্ষ নিঃসৃত স্নেহ যেন পলিমাটির স্তরে স্তরে বিকাশ হয়ে নব মানবের জন্ম দেয়, জাগিয়ে তোলে নূতনদেশ। পদ্মার এই বিচিত্র রূপের সংগে মানব জীবনের ভাংগা গড়, উত্থান পতনের যে সাদৃশ্য আছে - তাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শ্রীযুত সুবোধ বসুর এই উপন্যাস খানির চিত্ররূপ দিয়েছেন বঙ্গশ্রী কথাচিত্র। কাহিনীর অভিনবত্ব, চরিত্র সৃষ্টিতে দর্শকমন সত্যই একঘেয়েমীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে বাঁচবেন। এজন্য সর্বপ্রথমেই প্রশংসাযোগ্য এর প্রযোজক এবং পরিচালক। কাহিনীর নাট্যরূপ দানে ও পরিচালন ক্ষেত্রে শ্রীযুত অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন কিন্তু পদ্মার ভয়ংকরী রূপকে আরো সুস্পষ্ট করে দেখানো উচিত ছিল। পদ্মার যে দৃশ্য ছবিতে দেখানো হয়েছে—তার কৃত্রিমতা দর্শকদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। এখানে আরো সূক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টি রাখা অসম্ভব ছিল বলে মনে হয় না। চিত্রগ্রহণ আরো একটু বাস্তব হলে এই ত্রুটি হতো না—মডেল ও দৃশ্যপটকেই অবলম্বন করা ছাড়া কি আর কোন উপায় নেই? পদ্মার কাহিনীর রূপের চাইতে তার শান্ত স্বচ্ছ রূপই ছবিতে ফুটে উঠেছে

বেশী কিন্তু কাহিনীর প্রথম যবনিকা এই সর্বনাশা শক্তির প্রভাবেই। কাজেই পরিচালকের কাছ থেকে আরো সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগী ও বাস্তব-সৃষ্টিই বাঞ্ছনীয় ছিল। মূল কাহিনীর কোন পরিবর্তন না হলেও মনে হয় ছবি প্রথম দিকে মন্থর গতিতে চলেছে আর শেষ দিকে মাত্র দু'একটি দৃশ্যে তাড়াহুড়ো করে যেন শেষ দৃশ্যে সমাপ্তি টানা হয়েছে। রাজার ছোট বেলাকার জীবনের ঘটনাধিক্য এবং শেষ দিকে ঘটনার স্বল্পতা ছবির গতিসাম্য রক্ষা করতে পারে নি।

কাহিনীর অন্তর্গত চরিত্রগুলিও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এক একটী চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে। বিভিন্ন অভিনেতারা এই বিচিত্র চরিত্রগুলিকে আন্তরিকতায় সজীব করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। নায়িকা সুমিত্রা রূপে সিপ্রা দেবীর অভিনয় প্রথমেই চোখে পড়ে। সংলাপের বাহুল্য নেই তাতে—মাত্র কয়েকটি দৃশ্যেই চরিত্রটা বেশ ফুটে উঠেছে। দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত সুমিত্রা চরিত্র—শিপ্রা দেবী শান্ত সংযত অথচ সুদৃঢ় অভিনয়ে সার্থক সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন। কথাবার্তা অথবা চলাফেরার মাঝেও একটি সংযত ভাব পরিস্ফুট। সুমিত্রার একমাত্র অবলম্বন মা। নিজের উপার্জনই সম্বল, কিন্তু বাড়ীর আসবাবের ঐশ্বর্য কোন ধনী বাড়ীর কথা মনে করিয়ে দেয়। এই সম্পর্কে অনেক ছবিতে আমরা পরিচালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি কিন্তু তাঁরা কার্যক্ষেত্রে এদিকে কেউই দৃষ্টি দেন না। গরীবের বাড়ী কি সিনেমা সেটে তৈরী করা অসম্ভব? সুমিত্রার মার ছোট্ট ভূমিকায় সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় এক কথায় সম্পূর্ণ সার্থক। মাত্র দুটী দৃশ্যে আমরা তাঁর দেখা পাই, কিন্তু মনে দাগ কাটে সব চেয়ে বেশী। রাজার পিতার ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। মা-হারা একমাত্র পুত্র রাজার স্নেহশীল পিতা—তাঁর অভিনয়ে স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। ছোট রাজার ভূমিকায় দুটী ছেলে অভিনয় করেছে—দ্বিতীয়টির অভিনয় ভালই কিন্তু চেহারায় যেন চোয়াড়ে এবং ইচড়ে পাকা ভাবটাই বেশী। উপন্যাসের রাজা পদ্মার দুরন্ত ছেলে বটে। চেহারাও ছিল আকর্ষণীয়। এখানে তার চেহারাতে লালিত্যের বদলে রুক্ষতাই বেশী। রাজার পরিণত বয়সের রজতপ্রসন্ন দীপক মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ে যথাযথ ফুটে উঠেছে। মন্দাকিনীর ভূমিকায় প্রীতিধারার অভিনয় এবং চেহারা কোনটাই প্রশংসনীয় নয়। অন্যান্য ছোট ভূমিকায় পল্টু, শিশির বটব্যাল, নরেশ, রাধারাণী, অজিত চট্টো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। জীবেন বসুর চেহারা এখন আর কলেজের ছাত্ররূপে মানায় না। পূর্ণিনন্দের ভূমিকাভিনেতাও মন্দ অভিনয় করেন নি—তবে তাঁর কথার উচ্চারণে জড়তা ও অভিনয়ে আড়ষ্টতা আছে।

পদ্মার তীরবর্তী অধিবাসীদের কথা বার্তা প্রদেশীয় ভাষার মধ্যেই রাখাটা সংগত হয়েছে বলেই মনে হয়। তাদের কথাবার্তাও যথাযথই হয়েছে।

ছবিখানির সংগীত অংশ মধুকর। ভাটিয়ালী গান দুখানির রচনা, সুর এবং গায়কের কণ্ঠ সত্যই প্রশংসনীয়। রাধারাণীর কণ্ঠের কীর্তন তুচ্ছ খানাও সুশ্রাব্য। সংগীত পরিচালক রূপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর গানকরূপের সুনামের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। ছবিখানির চিত্র গ্রহণও প্রশংসনীয়, তবে পূর্বেই বলেছি, পদ্মার প্রকৃতরূপকে চিত্রে গ্রহণ করা উচিত—চিত্রগ্রহণ আরো বাস্তবধর্মী হওয়া উচিত ছিল। মাঝে মাঝে ত্রুটী থাকলেও—"পদ্মা প্রমত্তা নদী" উপভোগ্য চিত্ররূপে সমাদর পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। সব কিছু মিলিয়ে এই ছবিখানি আমার মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

—মণিদীপা

সুধীর বন্ধু প্রডাকসনস

সুধীর বন্ধু প্রডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'দখনে বাঘ' এর কাজ ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে শুরু হয়েছে। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী বিভূতি দাস 'দখনে বাঘ' চিত্রখানি পরিচালনা করছেন। পণ্ডিত কালীকিঙ্করের উপর সংগীত পরিচালনার ভার দেওয়া হ'য়েছে। 'দখনে বাঘে'র কাহিনী রচনা করেছেন নবীন সাহিত্যিক নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেখা-নাট্যে শহীদ ক্ষুদিরাম ও বিপ্লবী কানাইলাল

অধ্যাপক নরেশ চক্রবর্তী রচিত রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত বাংলার দুই বিপ্লবী বীরের জীবন কাহিনী রেখা নাট্যে রূপ দিয়ে মেগাফোন কোম্পানী আমাদের ধন্যবাদভাজন হ'য়েছেন। শহীদ ক্ষুদিরাম চারখানি রেকর্ডে (আট খণ্ডে) সম্পূর্ণ।
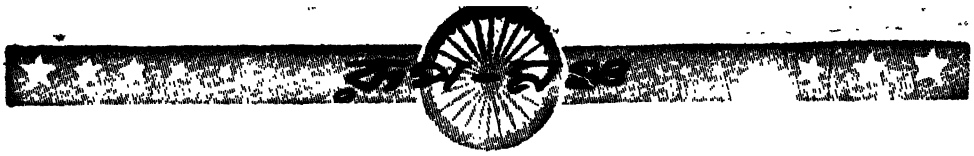
উক্ত নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন – ক্ষুদিরাম—প্রবোধ চক্রবর্তী, কথক—বিমল সেনগুপ্ত, অমৃত বাবু - ফণী রায়, অপরূপা—বন্দনা দাশগুপ্ত, কিশোরী—নীলিমা সান্যাল, সত্যেন বাবু অজিত বন্দ্যোঃ, নন্দলাল—সুশীল রায়, সতীশ বসু—নরেশ চক্রবর্তী, করণ ডক্—এ, ব্যানার্জি, গায়ক—৺ভবানী দাস, প্রফুল্ল—তারাপদ। বিপ্লবী কানাইলাল—চারখানি রেকর্ডে (চারখানি খণ্ডে) সমাপ্ত। বিপ্লবী কানাইলালের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন কানাইলাল—প্রবোধ চক্রবর্তী, সত্যেন—নরেশ চক্রবর্তী, কথক বিমল সেনগুপ্ত, মা, নীলিমা সান্যাল, রাধু—লাবণ্য পালিত, জজ—বিমল। এই দুইখানি রেখা নাট্যই আমাদের খুশী করেছে। জাতীয় সংগ্রামের শহীদদের জীবন-গাথা রেখা-নাট্যে রূপায়িত করে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার যে দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সম্পাদকের দপ্তর

(৭২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অলোক কুমার দাস (বাঁড়াডেঙ্গী, হাওড়া)

রবীন মজুমদার ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদের দু'জনের ভিতর কার অভিনয় আপনার ভাল লাগে ?

●● এঁরা দু'জনেই একই শ্রেণীর অভিনেতা। হালকা চরিত্রে মন্দ লাগে না। তবে এঁদের অভিনয়ে আমার মতে, কোন গভীরতার সন্ধান মেলে না। শুনছি দেবকী বাবুর 'কবি' চিত্রে রবীন বাবু খুব সুন্দর অভিনয় করছেন—কবি মুক্তিলাভ করলে তার সম্পর্কে বর্তমানের অভিমত পালটে নেবার আশা রাখি।

নিরঞ্জন ভদ্র (কোন্নগর)

পাপের পথে কথাচিত্র খ্যাত জীবন গাঙ্গুলী কি ছায়া জগত থেকে বিদায় নিয়েছেন ? যদি না দিয়ে থাকেন, তবে তাঁর পরবর্তী চিত্র কি ?

●● শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে কোন ছবিতে অভিনয় করছেন না। তিনি নিজে ইচ্ছা করে বিদায় নেন নি—বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন 'দশচক্রে ভগবান ভূত' বলে। কয়েক মাস পূর্বে তিনি রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে এসেছিলেন এবং আমাদের সংগে অনেকক্ষণ বসে নানান বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করে গেলেন। তখনই তিনি তাঁর এই দশচক্রে ভূত বনে যাবার কথা বলেন। শুনলে আমাদের মত আপনারাও ব্যথিত হ'য়ে উঠবেন। জীবন বাবু দীর্ঘ দিন রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন– আর্থিক এবং পারিবারিক বহু বিপর্যয়ই তাঁকে সহ্য করতে হয়। সুস্থ হ'য়ে যখন তিনি দু'এক স্থানে দেখা করতে যান—তাঁর দেহের সবলতা তখনও ফিরে পান নি তাই কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা মনে করলেন, নিশ্চয়ই তাঁর মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে এবং কয়েকজন দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন লোক তা চতুর্দিকে রটিয়ে বেড়াতে লাগলেন ফলে কোথাও তিনি কোন চুক্তি পেলেন না। আমার এবং তাঁর আরো দু'একজন শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর পরামর্শে দু'একটী নাট্য-মঞ্চেও দেখা করলেন—কিন্তু তারাও সুযোগ দিলেন না। শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে অভিনয় জগত থেকে বিদায় নিতে হ'য়েছে। গলদ আমাদের কতদূর পর্যন্ত শিকড় গেড়েছে চিন্তা করে দেখুন !

নূরজাহান বেগম (ইডেন গার্লস কলেজ, ঢাকা)

●● আগামী সংখ্যায় শ্রীমতী বনানীর লেখা দেখতে পাবেন এবং তার জীবনীও যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।

শাশ্বতী বটব্যাল (রসা রোড, কলিকাতা,)

(১) 'ভুলিনাই' চিত্রে 'আনন্দকিশোর কে ? (২) বিকাশ রায়কে কোন চিত্রে দেখতে পাবো ? (৩) প্রদীপকুমারের জাবনী দেখতে পাবো কি ?

●● (১) মাষ্টার মন্টু। (২) পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ চিত্রে দেখতে পাবেন। (৩) নিশ্চয়ই। তবে অপেক্ষা করতে হবে।

শঙ্কর প্রসাদ সেন (ঝাড়গ্রাম)

বসুমিত্র প্রডাকসনের কালোছায়া চিত্রে নৃপেন্দ্রগোপালের নাম দেখলাম তাঁর ঠিকানা কি ?

●● তিনি আপনাদের ঝাড়গ্রামেরই লোক। শুনি ওখানকার বেশ ধনাঢ্য ব্যক্তি। তাই আশা করি ওখানেই তাঁর খোঁজ পাবেন।

রানী চৌধুরী ও বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য (মুসলমান-পাড়া লেন, কলিকাতা)

●● পাহাড়ী সান্যাল ও প্রবোধ সান্যালের সংগে কোন পারিবারিক সম্বন্ধ নেই।

তমসা লাহিড়ী (জয়নারায়ণ বসু আনন্দ লেন, হাওড়া)

কানন দেবী প্রযোজিত 'চন্দ্রনাথ' চিত্রে কে কে অভিনয় করবেন ?

●● এখনও সে সম্পর্কে কোন খবর পাওয়া যায় নি। তাছাড়া 'চন্দ্রনাথ'-এর চিত্রস্বত্ব নিয়ে—কানন দেবী ও অন্য একটা প্রযোজকের মাঝে একটি আইনগত সমস্যা উঠেছে। সে সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কে চন্দ্রনাথ তুলবেন, তাও বলা সম্ভব নয়।

গোবিন্দ মিত্র (কাঁথি, মেদিনীপুর)

(১) চন্দ্রাবতী দেবী কি চিত্র জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন ? (২) নবদ্বীপ হালদার ও রণজিৎ রায়ের জীবনী প্রকাশ করবেন কী ?

●● (১) না। তাকে 'রাঙা মাটি' চিত্রে দেখতে পাবেন—তাছাড়া 'ফেরফের' বলে আর একটা চিত্রের অভিনয়ও তিনি সম্প্রতি শেষ করেছেন। (২) নিশ্চয়ই। আমাদের প্রত্যেক কৌতুকাভিনেতাকেই রূপ-মঞ্চের পাতায় দেখতে পাবেন। আগামী সংখ্যায় হরিধন মুখোপাধ্যায়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবো।

বীণাপাণী ঘোষ (জগদীশপুর)

অঞ্জনগড় চিত্রে রামধুন সংগীতটি কি সুনন্দা দেবী নিজে গেয়েছেন ?

●● না। শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদার গীত রামধুন সংগীতটি ওখানে সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং এবিষয়ে শ্রীমতী দস্তিদার আইনের সাহায্যও নিয়েছেন বলে শুনেছি।

বিমল মিত্র (মোহনবাগান লেন, কলিকাতা)

তপনকুমার ও ভোলানাথ মাসন্ন কী একই লোক ?

'দি উইকার সেকস' চিত্রে জন হপকীন্স ও ডেরেক বণ্ডকে দেখা যাচ্ছে।

●● হ্যাঁ।

কালিদাস মুখুজ্জে, রমেন ঘোষ, সন্তোষ গাঙ্গুলী (ইব্রাহিম বিল্ডিং, নজরবাগ লক্ষ্ণৌ)

(১) জনপ্রিয় অভিনেতা অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়ের আগামী চিত্র কী? (২) নিউথিয়েটাসের আগামী বাংলা ছবি কী?

●● (১) অসিতবরণ নিউথিয়েটার্সের বাইরে একখানা হিন্দি ছবিতে অভিনয় করবার জন্য সম্প্রতি একটি প্রতিষ্ঠানের সংগে চুক্তিবদ্ধ হ'য়েছেন বলে শুনেছি। (২) মন্ত্রমুগ্ধ। মুক্তির দিন গুনছে।

বিমলেন্দু শেখর দত্ত চৌধুরী (লাইম স্ট্রীট, বেলেঘাটা)

●● সিপ্রা দেবীর জীবনী ভবিষ্যতে প্রকাশ করা হবে। তাঁর ঠিকানা প্রকাশ করতে পারবো না বলে দুঃখিত। স্নমিত্রা দেবী সম্পর্কে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, তার উত্তর জেনেই বা আপনার লাভ কী? অন্য কোন পত্রিকায় তিনি জীবনী প্রকাশ করেছেন কিনা, তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাদের কাছে যখন এবিষয়ে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, তখন আমাদেরও কী আর অগ্রসর হওয়া উচিত? আশা করি রূপ-মঞ্চের মর্যাদার কথা রূপ-মঞ্চ পাঠক হিসাবে আপনি ভুলে যাবেন না।

রেখা গুপ্ত (শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

'গন উইথ দি উইণ্ড'ও 'ওয়াটারলু ব্রিজের' সুপ্রসিদ্ধা চিত্রতারকা ভিভিয়ান লাইর জন্মভূমি ভারতবর্ষ বলে শুনেছি। একথা কী সত্যি? ওদেশীয় চিত্র জগতে আর কোন অভিনেত্রী আছেন কী,যাদের ভারতবর্ষে জন্ম হয়েছে?

●● হ্যাঁ, ভিভিয়ান লাই ভারতবর্ষেই জন্মগ্রহণ করেন। এঁর আসল নাম হ'চ্ছে ভিভিয়ান মেরী হার্টলী—১৯১৩ খৃঃ, ২৩শে নভেম্বর ইনি দার্জিলিং-এ জন্মগ্রহণ করেন।

ভিভিয়ান লাই ছাড়া আরো অনেক অভিনেত্রী বিদেশীয় চিত্র জগতে রয়েছেন—যাঁদের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। এঁদের ভিতর আরমুলা জীনস, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, ৫ই মে, সিমলাতে জন্মগ্রহণ করেন। মার্গারেট লকউডের নামও আপনারা শুনে থাকবেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, ১৫ই সেপ্টেম্বর, করাচীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাছাড়া আরো অনেকেই থাকতে পারেন। তবে তাঁদের কথা আমাদের জানা নেই।

ধূর্জটী শরণ বকসী (পাটপুর, বাঁকুড়া)

(১) মীরা মিশ্র নৌকাডুবির পর আর কোনও বাংলা ছবিতে নামছেন কিনা? সব্যসাচীর পর তাঁর পরবর্তী হিন্দি বই কি? (২) সিনেমা গৃহের ভিতর বিড়ি সিগারেট খাওটা আইন করে বন্ধ করা যায় না?

●● (১) শ্রীমতী মিশ্র 'আবর্ত' বলে একখানি বাংলা চিত্রের অভিনয় শেষ করেছেন। চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে। বর্তমানে 'বাপনে কহাথা' বলে একখানি হিন্দি চিত্রে অভিনয় করছেন—সব্যসাচীর পর এই চিত্রখানির নাম করা যেতে পারে। তাছাড়া সম্প্রতি তিনি নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর সংগে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন বলেও শুনেছি এবং 'বিষ্ণু-প্রিয়া'য় সম্ভবতঃ নামভূমিকায় অভিনয় করবেন। (২) আইনের বন্ধন ছাড়া প্রেক্ষাগৃহে ধূমপান বন্ধ করা যাবেনা বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ নাগরিক জ্ঞান (Civic Senes) বলে আমাদের কিছুই নেই। আমরা নিজেদের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। অপরের কথা চিন্তা করতে নারাজ।

চিত্ত দাস (রাজপুতনা)

●● আপনার ইচ্ছামত ঠিকানা প্রকাশ করা হলো না। জগমোহন ও জগন্ময় মিত্র একই লোক। রবীন মজুমদারের জীবনী প্রকাশ করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

যশোদা নন্দন দত্ত (বারুইপুর, ২৪ পরগণা)

●● উদয়শঙ্কর বাঙ্গালী।

এ, জেড, খোন্দকার (সিটি কলেজ, বাণিজ্য বিভাগ)

'নন্দরাণীর সংসার' চিত্রের শ্রীমতী বনানী চৌধুরীর সংযত অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে। কিন্তু মনে হয়েছে তাঁকে চেপে দিয়ে ছন্দাকে সুযোগ দেবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

●● শ্রীমতী বনানীর প্রতি 'নন্দরাণীর সংসার' চিত্রে যে অবিচার করা হয়েছে—একথা আপনার মত আমিও স্বীকার

করবো। এই অবিচার ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ শ্রীমতী চন্দ্রাকে বেশী সুযোগ দেবার জন্যই করা হয়েছে কিনা—তা দর্শক হিসাবে আপনারাই বলতে পারেন। তবে অবিচার ইচ্ছাকৃতই হউক আর অনিচ্ছাকৃতই হোক সর্বক্ষেত্রেই খুবই অন্যায়। কারণ, এমনি অবিচারের নিষ্পেষণেই প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বহু শিল্পী বিকাশ লাভ করতে পারেন না।

কালীময় ভট্টাচার্য

(জামসেদপুর)

●● পীতাম্বর ভট্টাচার্যকে সম্প্রতি 'কালোছায়া' চিত্রে দেখতে পেয়েছেন। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরবর্তী চিত্রেও একটী বিশিষ্ট ভূমিকায় তাঁকে দেখতে পাবেন।

রমেন শীল (বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

রূপ-মঞ্চ-এ ত অনেক শিল্পীদের জীবনীই আমাদের জানবার সুযোগ করে দিয়েছেন আপনার জীবনী জানাবেন কবে?

●● রূপ-মঞ্চই আমার জীবনী। রূপ-মঞ্চের বাইরেও যদি আমার সম্পর্কে কিছু জানতে চান—আমার মৃত্যু পর্যন্ত আপনার কৌতূহলকে দমিয়ে রাখতে হবে। তাও নিশ্চয়তা দিতে পারি না। রূপ-মঞ্চের গুণগ্রাহীরা এবং কর্মীরা আমার মৃত্যুর পর যদি কোন স্মৃতি-সংখ্যা প্রকাশ করেন তাতেই বিস্তারীত জানতে পারবেন।

লক্ষ্মীনারায়ণ সেন ও ইন্দিরা সেন (নিম-গোস্বামী লেন, কলিকাতা)

●● আমার নতুন উপন্যাস আপনাদের খুশী করেছে জেনে খুশী হলাম। পদ্মা দেবী ও বিজয়া দাস সম্পর্কে বর্তমানে কোন খবর পাই নি—পেলেই জানাবো। তবে তাঁরা

অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত রূপশ্রী কথাচিত্রের 'পদ্মা প্রমত্তা' চিত্রে দীপক ও সিপ্রা দেবী।

কেউই চিত্রজগত হ'তে বিদায় নেন নি। 'ম্যাটিনী' শোটা দুপুরের প্রদর্শনীকেই বলা হ'য়ে থাকে। ৫।০র প্রদর্শনীকে Evening Show অথবা সান্ধ্য-প্রদর্শনী বলা হ'য়ে থাকে। আপনাদের সামর্থ অনুযায়ী যে অর্থই রূপ-মঞ্চ সাহায্য ভাণ্ডারে প্রেরণ করবেন, তাই খুশী মনে গ্রহণ করা হ'বে।

কানাই চট্টোপাধ্যায় (মসজিদ বাড়ী রোড, নৈহাটি)

বর্তমান অভিনেতাদের মধ্যে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় কি টাইপ চরিত্রে বাংলার মধ্যে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা নন? যোগাযোগ, অভিযোগ, রাত্রি, পূরবী, বিশবছর আগে ও সর্বহারাতে তাঁর অভিনয় কী অতুলনীয় নয়?

●● নিশ্চয়ই। শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় ক্ষমতাকে আমি অকুণ্ঠ চিত্তে সমর্থন করি।
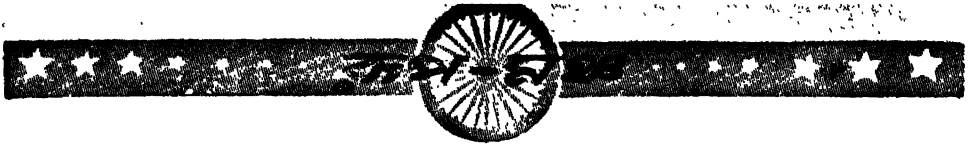
বীরেশ্বর দাশগুপ্ত (যাদবপুর কলেজ, ২৪ পরগণা)

●● অঞ্জনগড় চিত্রে পাকল কর নিজে গান নি—তাঁর কণ্ঠের গান গেয়েছেন শ্রীমতী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। যে কোন দিন ১১-১২ ভিতর আপনি আমার সংগে দেখা করতে পারেন।

লক্ষ্মণ রায় (বহরমপুর)

বিচারকের দেবীপ্রসাদ এবং রাজমোহনের বৌ চিত্রের দেবী প্রসাদ কী একই ব্যক্তি ?

●● না। দু'জনেরই ছবি শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। আশা করি তা থেকেও পার্থক্য বুঝতে পারবেন—প্রথম জন হলেন চৌধুরী পরবর্তী জন সম্ভবতঃ মুখোপাধ্যায়।

নমিতা মিত্র (সিটি কলেজ, কলা-বিভাগ)

চলচ্চিত্রের অবিষ্কারক ও তাঁদের জীবনী রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করবেন কী এবং এবিষয়ে কাঁদের নাম প্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে ?

●● নিশ্চয়ই। চলচ্চিত্রের আবিষ্কারের মূলে বহু মনীষীর নামই উল্লেখ করতে হয়। রূপ-মঞ্চের পরবর্তী কোন সংখ্যায় এঁদের সম্পর্কে সাধারণ ভাবে আপনাদের জানাতে চেষ্টা করবো। আগামী সংখ্যায় **জর্জ ইষ্টম্যান, টমাস এলভা এডিসন, ফ্রিজ গ্রীন, লুই লুমেরী, এডওয়ার্ড মেব্রীজ, রবার্ট পল, চার্লস পাথে** সম্পর্কে জানাবার ইচ্ছা রইল।

চিঠি-পত্রের 'জবাব' বর্তমান সংখ্যার মত শেষ করলাম 'রূপ-মঞ্চের জনৈকা পাঠিকা শ্রীমতী ইন্দিরা সেন প্রতিমা ও 'পূরবীর কাছে যে পত্র লিখেছেন তা উদ্ধৃত করে দিয়ে।

ভাই "প্রতিমা" ও "পূরবী"—

তোমাদের সংগে আমার 'পরিচয়' থাকলেও "অদৃষ্টে" আজ তোমাদের যার সংগে "নয়া সংসার" পাততে "পথ বেঁধেছে" তারি "অধিকার" নিয়ে তোমাদের আমি কিছু বলতে চাই। "হাল বাংলায়" আজ "রামরাজ্য"র স্থান নাই। "সমাজ" আজ শুধু "গরমিল" "সমাধান" করতে ব্যস্ত। তোমাদের "স্বামীর ঘর" এর কোন অভিজ্ঞতা নাই। তাই জাননা যে প্রত্যেক "পরিণীতা" "নারী"কেই "মাটীর ঘর" এর "বন্ধন" শক্ত রাখতে "কতদূর" ই না "এপার ওপার" ভাবতে হয়। "দুনিয়া"য় "হারজিত" আছেই, তাই ভেবে কখনও "পরাজয়" এর "প্রতিশোধ" নিতে চেষ্টা কোর না, কিম্বা "বিজয়িনী"র গর্বে "মাতোয়ারা" হয়ে সকল "দেনা পাওনা" "শোধবোধ" করতে চেয়ো না। "জীবন"টা তো আর "অভিনয় নয়"। এর জের "পরপারে" ও টানতে হয়। যে সব ধনীর "নন্দিতা"রা "সহধর্মিণীর" পুঁজি নষ্ট করে, "উদয়ের পথে"র নামে "পাপের পথে" নেমে আসে, তারা কখনও "বন্দিতা" হয় না। "সন্ধ্যা" যখন ঘনিয়ে আসে তারা তখন "দোটানায়" পড়ে "শেষরক্ষা" বা "প্রতিকার" করতে না পেরে "সন্ধির" প্রস্তাব করে। "কিসমৎ" মন্দ বলেই তারা "তানসেন" এর মত "শহর থেকে দূরে" চলে যেতে বাধ্য হন। নব "দম্পতি" অঙ্গুরটী বদল করেই "প্রতিশ্রুতি" নিয়ে "স্বামীস্ত্রী"র সকল সম্বন্ধ বজায় রাখে। আমার "শেষ উত্তর", আজ হতে তোমরা "সাত নম্বর বাড়ী" ও "নয় নম্বর বাড়ীতে" বিনা "অপরাধ" এ ও বিনা "বিচার"এ চির "বন্দী।" "মুক্তির" আশা খুব কম। সবই "পাষাণ দেবতার" "যোগাযোগ"! যার যা প্রাপ্য দিও ও "দাবী" নিও। "বিরিঞ্চি বাবার" মত অনেক "গোঁজামিল" দিলুম কিছু মনে ক'র না ভাই। তোমরা 'বাংলার মেয়ে' স্বাধীনতা পেয়েছ শুনে "বড়দিদি"কে "নতুন খবর" পাঠিয়েছি :

আমার ভাই "চন্দ্রশেখর" এর সহিত "শান্তি"র বিবাহ ঠিক হয়েছে, ইতিমধ্যে নাকি তাদের "মাবাপ" "আশীর্বাদ" করেছে। গত সপ্তাহে "মানময়ী গার্লস স্কুলে" "রামের সুমতি" অভিনয় হবে। আমার কল্পা "শ্রীমতী" "কল্পনা" বৌদির ভূমিকা নিয়েছে। আর কি লিখব "রাত্রি" দশটা বাজে। তোমরা আমার "ভালবাসা" নিও। এই "শেষ পত্র" কাল "অঞ্জনগড়" যাচ্ছি "রায় চৌধুরীদের" বাড়ীতে "জামাই ষষ্ঠী"র নিমন্ত্রণ আছে। "চিঠির" "জবাব" দিও। তোমাদের "ইন্দিরা"।

শ্রীসুনন্দা দেবী প্রযোজিত এস. বি, প্রডাকসনের সিংহদ্বার চিত্রে সুনন্দা দেবী।
সিংহদ্বার মুক্তি প্রতীক্ষায়। রূপ-মঞ্চ : মাঘ-সংখ্যা : ১৩৫৫

রূপ-মঞ্চের পাঠকপাঠিকাদের জন্য

রূপ-সজ্জার বাইরে কৌতুকাভিনেতা

শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়

অষ্টম-বর্ষ
নবম-সংখ্যা
★

রূপ-মঞ্চ

— মাঘ —
১৩৫৫
★

আমাদের আজকের কথা

জাতীয়করণ—(১)

জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে শিল্প কলা ও ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 'জাতীয়করণ' কথাটির প্রয়োগ স্বভাবতঃই যেন বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘদিন বৈদেশিক সরকারের শাসনাধীনে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজসত্তাই শুধু নিষ্পেষিত হয়নি—শিল্পকলা প্রভৃতির অগ্রগতিও যেমনি রুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল—তেমনি অনেক কিছুর অস্তিত্বও লোপ পেতে বসেছিল। সব কিছুর ক্ষতি স্বীকার করেও আমরা একটী শুভদিনের সুখ-স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। সে স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে পারলে, আমাদের সকল ক্ষতি যে একদিন পূর্ণতা নিয়ে দেখা দেবে—এ বিশ্বাস আমাদের মধ্যে কোনদিনই শিথিল হ'য়ে যায়নি। তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে বৈদেশিক সরকারের শাসন-মূলে আঘাত হানবার সংগ্রামেই আমরা লিপ্ত ছিলাম। আমাদের সে সংগ্রাম আজ জয়মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে। দেশের শাসন-পরিচালনার ধ্বজা স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিকেরাই ধরে রয়েছেন। ভগীরথের পুণ্যতোয়া সলিলধারায় শাপদগ্ধ সাগরকুলের মত সঞ্জীবীত হ'য়ে উঠবার আগ্রহ নিয়েই দেশীয় শিল্প-কলার শুষ্ক আর্তকণ্ঠ জাতীয় সরকারের পানেই চেয়ে আছে। তাই, জাতীয়করণ কথাটি বেশী মাত্রায় শুনতে পাওয়াই স্বাভাবিক। 'জাতীয়করণ' কথাটি আমরা প্রয়োগ করে থাকি ইংরেজী 'ন্যাশনালাই-জেশন' (Nationalisation) কথাটির প্রতিশব্দরূপে—রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন অর্থে। কিন্তু আমাদের এই প্রয়োগে যে ভ্রান্তি রয়েছে—বর্তমানে তা সংশোধন করে নেওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করি। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এই প্রয়োজন যেন বেশী অনুভব কচ্ছি। কারণ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনেও এবিষয়ে যে যথেষ্ট ভ্রান্তি রয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে একাধিক বার তার প্রমাণ আমি পেয়েছি এবং এজন্য যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হ'য়েছে। গত পৌষালী-সংখ্যা রূপ-মঞ্চ-এ চলচ্চিত্রশিল্পকে জাতীয়করণ করা সম্পর্কে কোন আন্দোলন করা বর্তমানে উচিত হবে কিনা, সে প্রসংগে বলতে গিয়ে লিখেছিলাম : জাতীয় সরকার দেশের কার্যভার গ্রহণ করে নানান সমস্যার ভারে বিব্রত হ'য়ে পড়েছেন—সেগুলির দায়িত্ব সম্পাদন করে একটু ঝাড়া-কাটা দিয়ে উঠলেই আমার মনে হয় এনিয়ে ব্যাপক আন্দোলন করা উচিত। নইলে বিভিন্ন সমস্যার মাঝে কোন আন্দোলন বা জনমতের চাপে যদি তাড়াহুড়ো করে তাঁদের কোন কিছু করতে হয়—তাতে যথেষ্ট গলদ থেকে যাবারই সম্ভাবনা। তাই বর্তমানে আমার ব্যক্তিগত অভিমতে চলচ্চিত্রশিল্পকে জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনবার জন্য আন্দোলন করার চেয়ে, পরোক্ষ কর্তৃত্বের জন্য অনুরোধ করাই ভাল।" বস্তুতঃ আমার এই অভিমত অনেক পাঠককে খুশী করতে পারেনি। ইতিপূর্বে একাধিকবার জাতীয়করণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বর্তমানে তাকে এড়িয়ে যেতে চাইছি মনে করে—তাঁরা যেমনি বিস্ময় প্রকাশ করে পত্র দিয়েছেন—তেমনি আমার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রতিও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

পত্র প্রেরকদের আন্তরিকতায় যেমন বিন্দুমাত্র আমার সন্দেহ নেই, তেমনি ( ) জাতীয়করণ, ( ) প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন ও পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীন শব্দগুলির দায়িত্বকর প্রয়োগ-পদ্ধতির জন্য যে আমাকে ভুল বুঝেছেন—তাও বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাই চিত্র ও নাট্য-শিল্প জাতীয় সরকারের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনেই পরিচালিত হবে কি না—তা নিয়ে আলোচনা করবার পূর্বে উক্ত শব্দগুলি নিয়ে আমাদের মনে যে ভ্রান্তি রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করে দূর করতে চাই। প্রথম কথা, নাট্য ও চিত্রশিল্প সম্পর্কে জাতীয় সরকার পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ যে কোন নীতিই গ্রহণ করুন না কেন, তার সংগে জাতীয়করণের বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হ'লেই যে চিত্র ও নাট্য শিল্পকে জাতীয়করণ করা হ'য়েছে বলে আমরা মেনে নিতে পারবো, তারও যেমন কোন নিশ্চয়তা নেই—আবার পরোক্ষ কর্তৃত্বাধীন থেকেও যে জাতীয়করণ করা যেতে পারবে না, এরও তেমনি কোন বাধা নেই। তবে সর্বক্ষেত্রেই জাতীয়করণ করতে হ'লে বিশেষ চিন্তা ভাবনা ও সর্বজনগ্রাহ্য পরিকল্পনানুযায়ীই করতে হবে। এখানেই পাঠক সমাজের মনে 'জাতীয়করণ' কথাটির অর্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব ওঠা স্বাভাবিক। জাতীয়করণ অর্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন বলবো না—যে শিল্প ও কলাকে জাতীয় সম্পদ—চিন্তা ও ভাবধারার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই গড়ে তোলা ও বিকাশ পাবার সুযোগ করে দেওয়া যাবে সেই শিল্প-কলাকেই জাতীয়করণ করা হ'য়েছে বলে আমরা মেনে নিতে পারবো—জাতীয়করণ কথাটির মূল অর্থের কথা চিন্তা করে 'জাতীয়করণ' শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ যে ভাবে আমি করতে চাইছি আমার সে বক্তব্যকে আরো পরিষ্কার করতে যেয়ে উদাহরণ স্বরূপ বৈদেশিক সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতি ও সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তদানীন্তন বেসরকারী ও বর্তমান বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কথা উল্লেখ করতে চাই।

বৈদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিকে তখন যেমনি আমরা জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নিতে পারিনি—তেমনি জাতীয় সরকারের [illegible] চালনাধীন বলে বর্তমানের সরকারী শিক্ষা প্রতি[illegible] গুলিকেও জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান দিতে পা[illegible] না বা শিক্ষাপদ্ধতিকে জাতীয়করণ করা হ'য়েছে বলে [illegible] নিতে পারবো না। (অবশ্য শিক্ষা পদ্ধতিকে জাতীয়[illegible] করবার নীতি ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন এবং আংশি[illegible] ভাবে তা কার্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট আছেন।)

কিন্তু এখনও আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে এমন অনেক কিছু[illegible] আছে, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। বিদেশী সরকারে[illegible] অনুসৃত নীতিই আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। এদেশী[illegible] ঐতিহাসিক চরিত্রের ওপর তারা যে কলংক আরো[illegible] করেছিলেন - যতক্ষণ না তার বিপক্ষে ঐতিহাসিক কো[illegible] প্রমাণ কিছু আমরা আবিষ্কার করতে পারবো—অর্থ[illegible] প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করতে পাচ্ছি, ততদিন পূর্বো[illegible] পন্থাকেই আমাদের অনুসরণ করে চলতে হচ্ছে—অবশ্য ইতি[illegible] মধ্যেই এসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা শুরু হ'য়েছে। সেই গবেষকগণ প্রকৃত সত্যকে যখন আবিষ্কার করতে পারবে[illegible] —তখনই শিক্ষা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে জাতীয়করণ ক[illegible] সম্ভব হবে। তার পূর্বে আংশিক কৃতকার্যতা লাভ ক[illegible] যেতে পারে। যেমন ইতিমধ্যেই মাতৃভাষাকে শিক্ষা[illegible] মাধ্যম বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'য়েছে। অথচ বৈদেশি[illegible] আমলেও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠান বলে আমরা মেনে নিতে দ্বিধা করিনি। কারণ, কো[illegible] স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত না হ'লে[illegible] সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা পদ্ধতি জাতীয় স্বার্থ [illegible] ভাবধারার আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র, আমাদের নেতা[illegible] এরূপ অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূলে ছিলেন—যেগু[illegible] কথা সুধীসমাজের অবিদিত নেই। সেগুলি[illegible] জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে আমরা তখন মেনে নিয়েছি[illegible] এইজন্য যে, জাতীয় স্বার্থ ও ভাবধারার বাহক রূপেই সে[illegible] গড়ে উঠেছিল। এমনিভাবে কবিগুরু প্রতিষ্ঠিত শা[illegible] নিকেতনকে আমরা জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলেও মেনে [illegible] দ্বিধা বোধ করবো না - কারণ, জাতীয় স্বার্থ এবং ভাব[illegible]

শ্রীমতী শান্তি গুপ্ত

দেবশ্রী চিত্রপীঠের সদ্য মুক্তি-প্রাপ্ত 'সতেরো বছর পরে' চিত্রে একটী বিশিষ্ট চরিত্রের রূপসজ্জায়
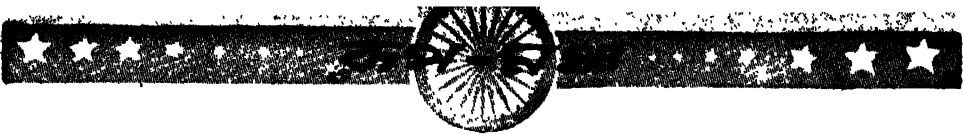
তার ভিতর মূর্ত হ'য়ে উঠেছে এবং সেখানে শিক্ষা পদ্ধতিকে যে প্রথম থেকেই জাতীয়করণ করা হ'য়েছে—একথাও আশা ক'রে কেউ অস্বীকার করবেন না। জাতীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনের বাইরে রেখেও চলচ্চিত্র ও নাট্য শিল্পকে জাতীয়করণ করা যেতে পারে। তবে জাতীয়করণ করার সেই মূল নীতিটি অর্থাৎ চলচ্চিত্র ও নাট্য-শিল্প সম্পূর্ণ জাতীয় স্বার্থ ও ভাবধারার উপরে যে নীতিকে অনুসরণ করে প্রতিষ্ঠিত হবে—সেই নীতিকে সর্বজন গ্রাহ্য করে তুলবার ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রের হাতেই আছে। সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন—তা পরোক্ষও হ'তে পারে আবার প্রত্যক্ষও হ'তে পারে।

জাতীয়করণ কথাটি আমরা যে ভুল অর্থে প্রয়োগ করে থাকি—আশা করি আমার উপরোক্ত আলোচনা থেকে পাঠক সাধারণ তা অস্বীকার করতে পারবেন না। এবং যাঁদের মনে এসম্পর্কে কোন ভুল ছিল বা আছে, তাঁরা তা সংশোধন করে নিতে পারবেন। জাতীয়করণ শব্দটি প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার অভিমত যে নিতান্ত ব্যক্তিগত বা ভ্রান্তিমূলক নয়—তার প্রমাণ পেলাম অগ্রহায়ণ-সংখ্যা শনিবারের চিঠির সংবাদ-সাহিত্য বিভাগে। সংস্কৃত অভিধানে যার অর্থ অন্য, ব্যাকরণ মতে যার ব্যবহার শুদ্ধ নয়, এরূপ কতকগুলি শব্দের আলোচনা অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ইতিপূর্বেও শনিবারের চিঠি পত্রিকায় করেছেন। উক্ত সংখ্যায় অন্যান্য শব্দের ভিতর 'জাতীয়করণ' কথাটিরও উল্লেখ দেখলাম। এবিষয়ে উক্ত পত্রিকা থেকে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের অভিমত আমরা উদ্ধৃত করলাম অধ্যাপক ভট্টাচার্য বলেছেন, "জাতীয়করণ শব্দটি Nationalisation এর অনুবাদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন শিল্প-ব্যবসায় বা সম্পত্তি যখন ব্যক্তি বা সংঘ বিশেষের হাত হইতে রাষ্ট্রের অধিকারে আসে, তখন তাহার Nationalisation হইল মনে করা হয়। এই অর্থে 'জাতীয়করণ' অপেক্ষা রাষ্ট্রসাৎ-করণ ভাল কথা। অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অনায়াসে এইরূপ বলিতে পারি—"ভারত সরকার কয়লা ও লৌহ শিল্পকে রাষ্ট্রসাৎ করার কথা ভাবিতেছেন।" "ভারতের শ্রেষ্ঠ 'অধিকোষ' Reserve Bank 'সংবিধান সভার' বিধানে রাষ্ট্রসাৎ হইয়া গেল।" রাষ্ট্রসাৎ শব্দের অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ত। পাণিনির সূত্র অনুসারে 'তদধীন' অর্থে সাতি প্রত্যয় হয়—যেমন "রাজসাৎ দেশঃ", "স্ত্রী সাৎ যুবা"। Nationalisation অর্থে রাষ্ট্রস্বীকরণও চলিতে পারে। রাষ্ট্রস্বীকরণ শব্দের অর্থ যাহা পূর্বে রাষ্ট্রের স্ব (=সম্পত্তি) ছিল না; তাহাকে রাষ্ট্রের স্ব করা। প্রচলিত জাতীয়করণ অপেক্ষা প্রস্তাবিত শব্দ দুইটির অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশে সামর্থ অধিক।" অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মতে প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন বলতে জাতীয়করণ প্রয়োগ না করে রাষ্ট্রসাৎ বা রাষ্ট্রস্বীকরণ ব্যবহার করা উচিত। তাই আশা করি, সুধীসমাজ জাতীয়করণ এবং রাষ্ট্রসাৎ বা রাষ্ট্রস্বীকরণ আলোচিত পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহার করবেন এবং আমরাও সেই পন্থা অনুসরণ করে চলবো।

বর্তমান সংখ্যার আলোচনা জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রস্বীকরণ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব—তারই মীমাংসায় সীমাবদ্ধ রইল। আগামী সংখ্যাতে চিত্র ও নাট্য শিল্পকে জাতীয়করণ না রাষ্ট্রস্বীকরণ বা অন্য কোন করণের প্রয়োজন—সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। —শ্রীকাঃ

পর্দার অন্তরালে

'পর্দার অন্তরালে' ও 'সাগর পারের খবরাখবর' বর্তমান সংখ্যা থেকে এই বিভাগ দু'টির পবর্তন করা হ'লো। 'সাগর পারের খবরাখবর' বিভাগে বৈদেশিক চিত্র ও নাট্য-মঞ্চ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্যাদি—শিল্পীদের সম্পর্কিত খুঁটিনাটি বিষয় প্রভৃতি স্থান পাবে। আর 'পর্দার অন্তরালে' বিভাগটিতে স্থান পাবে—পর্দার অন্তরালে যেগুলি ঘটে—যা দর্শকসাধারণ জানতে পারেন না, অথচ তাঁদের জানা উচিত, সেই বিষয়গুলি। তবু বোধ হয় এই বিভাগটি সম্পর্কে পরিষ্কার করে কিছু বলা হ'লো না। নাটক বা চিত্রের দোষত্রুটি দর্শকসাধারণ নিজেরাই ধরতে পারেন—তবু সমালোচকদের প্রখর দৃষ্টিতে সেগুলিকে বড় করে তোলবার প্রয়োজন রয়েছে—যা শুধু দর্শক সাধারণের পক্ষেই নয়, যাঁরা এর নির্মাণ মূলে রয়েছেন তাঁদের পক্ষেও। কিন্তু অনেক সময় আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে এমন অনেক কিছুই ঘটতে দেখি—যা চিত্র ও নাট্য শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশকেই শুধু ব্যাহত করে না—সে অন্যায় ও দুর্নীতির চক্রজালে শিল্পের সংগে জড়িত বহুজনকেই আত্মাহুতি দিতে হয়—শিল্পক্ষেত্রে প্রবেশেচ্ছুকদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে, সে অন্যায়ের আঘাত হানবার কথাও একাধিকবার আমরা শুনতে পাচ্ছি—সে অন্যায়ের কাহিনী সকলের পক্ষে জানবার কথাও নয়। অন্যায় যাঁরা করেন, তাঁদের সে নীচতার কথা কারো কানে পৌঁছবে না মনে করেই, তাঁরা পর পর একাধিক অন্যায় করে চলেন। এই অন্যায়ের মুখোস খুলে দেবার জন্যই আমরা বর্তমান বিভাগটির প্রবর্তন করলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান-মূলক পন্থা হ'লেও, এই বিভাগটি হবে সংশোধনমূলক। অর্থাৎ অন্যায়কারীরা যদি অনুতপ্ত হ'য়ে আত্মসংশোধনে সচেতন হ'য়ে ওঠেন—আমাদের সহানুভূতি লাভে কেও তাঁরা যে বঞ্চিত হবেন না, এ প্রতিশ্রুতি তাঁদের আমরা দিতে পারি। আর অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত উভয়েই নিজ নিজ বক্তব্য বর্তমান বিভাগে প্রকাশ করবার সুযোগ পাবেন। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ প্রকাশিত হবে, সে সম্পর্কে আমরা কোন দায়িত্ব গ্রহণ করবো না। তবে কোন সংখ্যায় কারোর বিরুদ্ধে যদি কোন অভিযোগ প্রকাশিত হয়—পনেরো দিনের মধ্যে যদি অভিযুক্তের কাছ থেকে কোন উত্তর না আসে—সে অভিযোগকে সত্য বলেই ধরে নেওয়া হবে এবং অভিযুক্ত তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করবার আর কোন সুযোগ পাবেন না। আশা করি, যাঁরা যখনই কোন অন্যায়ের চক্রজালে জড়িয়ে পড়বেন—তাঁরা এ বিষয়ে উপযুক্ত প্রমাণ ও নিজেদের নাম-ঠিকানা সহ সেই অন্যায় ও অন্যায়কারীদের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তুলবেন। এই বিভাগটির ভার দেওয়া হ'লো **শ্রীদীপঙ্করের** ওপরে। ন্যায়ের আলোক শিখায় যিনি সকলের মনের অন্ধকার দূর ক'রে শিল্প জগতকে সমস্ত গ্লানি থেকে মুক্ত করতে সব সময় সচেষ্ট থাকবেন। -- সম্পাদক : রূপ মঞ্চ।

●● বর্তমান সংখ্যার উদ্বোধন করা হচ্ছে **শ্রীশৈলেশ দে** (২১বি, ফার্ণ রোড, বালীগঞ্জ) নামক একজন সংগীত শিল্পীর অভিযোগ পত্র প্রকাশ ক'রে। তাঁর অভিযোগ শ্রীবীরেশ্বর বসু, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, অঞ্জলি স্মৃতি টকীজ লিঃ (৯৪বি, নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন)-এর বিরুদ্ধে। শৈলেশ বাবুর অভিযোগের উত্তরে যদি বীরেশ্বর বাবুর কোন বক্তব্য থাকে—বর্তমান সংখ্যা প্রকাশিত হবার দু'সপ্তাহের ভিতর তিনি যদি তা আমাদের কাছে পেশ না করেন—তবে আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে মন্তব্য করা হবে। শৈলেশ বাবু রূপ-মঞ্চ সম্পাদককে লিখেছেন :—

"ছায়াচিত্র রসিকদের কাছে আজ রূপ-মঞ্চ অপরিহার্য। যে ভাবে আজ আপনি চিত্রপ্রিয় রসিকদের মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছেন, এজন্য আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সিনেমাজগতে কোনরূপ দুর্নীতি দেখলে সর্বাগ্রে আপনার কথা মনে পড়ে—কারণ, মধু বিতরণ করেই আপনার দায়িত্ব আপনি শেষ করেননি—প্রয়োজন মত হুল ফুটাতে

দ্বিধাবোধঃ করেননা— এজন্যই আজ 'রূপ-মঞ্চ' সবার প্রিয়। রূপ-মঞ্চ আজ জনমতেরই প্রকাশ। আজ আমি আপনাকে একটি ঘটনা জানাচ্ছি। সিনেমা জগতের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে এরূপ অন্যায় আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে কিনা জানিনা।

১৯৪৭ সনের প্রথম দিকে আমি ৫৩বি, জাষ্টিস চন্দ্রমাধব ষ্ট্রীট, ভবানীপুরে অবস্থিত অঞ্জলি স্মৃতি টকীজে নির্দ্ধারিত বেতনে সহকারী সংগীত পরিচালক নিযুক্ত হই। ৮৭বি, নেপাল ভট্টাচার্য ফার্ষ্ট লেন, কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। শ্রীযুক্ত অতুল দাশগুপ্তের পরিচালনায় ছবির মহরৎ অনুষ্ঠান হয়। কিছুদিন পরে তিনি বিতাড়িত হন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন গাঙ্গুলী ঐ পদে নির্বাচিত হন। কয়েকদিন স্যুটিং হবার পরে তাঁকেও বিদায় দিয়ে এবার বীরেশ্বর বাবু নিজেই একাধারে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ছবির পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা হয়ে বসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, বীরেশ্বর বাবুর পিতা শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বসু উক্ত ছবির কাহিনী রচয়িতা এবং কাকা শ্রীযুক্ত অমল্য বসু হন কোম্পানীর সেক্রেটারী। আরো উল্লেখযোগ্য যে, ইহা একটি লিমিটেড কোম্পানী।

যাই হোক, উক্ত কাজে যোগ দেবার ১০।১২ দিন পর আমি আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি—কারণ, তখন আমি ঢাকা হ'তে এখানে নবাগত। আমার সঞ্চিত যাবতীয় অর্থ তখন ঢাকাতে এক ব্যাংক-এ গচ্ছিত ছিল। ঠিক সে সময়ে বীরেশ্বর বাবু অফিসের কোন কাজে ঢাকা যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি পাব বলে আমি তাঁকে আমার সঞ্চিত বেশীর ভাগ অর্থের একখানি চেক দিই। কথা হয়, তিনি এক সপ্তাহের মধ্যেই ঢাকা হ'তে ফিরে আসবেন। আসার সময়ে ব্যাঙ্ক হ'তে আমার এই টাকা তুলে নিয়ে এসে আমাকে দেবেন। শুনে অবাক হবেন যে, উক্ত ম্যানেজিং ডাইরেক্টার, ছবির পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর বসু ব্যাঙ্ক হ'তে সে টাকা তুলে নিয়ে নিজেই হজম করে ফেললেন! আপনি বলুন তো—একটি দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত থেকে যিনি জনসাধারণের হাজার হাজার টাকা নাড়াচাড়া করছেন তাঁকে বিশ্বাস করে কি আমি ভুল করেছিলাম?

যাহা হোক, তারপর রোজ দুবেলা তাঁর বাসা ও অফিসে তাগাদা দিতে লাগলাম—কিছুতেই কিছু হোল না। শেষে অফিসের কয়েকজন ভদ্রলোক চাপ দেবার ফলে অতি সামান্য কিছু টাকা আমাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হন। কথা হয় যে, ২।১ মাসের মধ্যেই তিনি সব টাকা দিয়ে দেবেন। বলা বাহুল্য যে, তিনি তা দেননি। তা হ'লে আজ আর এ চিঠি লিখার দরকার হো'ত না। শেষে পথে ঘাটে চাপ দেবার ফলে এক হ্যাণ্ডনোট লিখে দেন। কথা হয় যে, মাসে ৫০৲ টাকা করে সব টাকা শোধ করবেন। কিন্তু কাযত তা হয় নাই।

এখানেই শেষ নয়। আপনি শুনে হয়তো স্তম্ভিত হবেন যে, উক্ত ভদ্রলোক (?) কয়েক মাস আগে আমাকে টাকা পরিশোধ করবার ছলে কিছু টাকার একটি চেক দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক হ'তে সেটি ফেরৎ আসে—ভূয়া ব'লে! এ ছাড়া দীর্ঘদিন কাজ করলেও যে মাহিনা বাবদ কিছু পাইনি, একথা বলাই বাহুল্য। এবং কেউ পেয়েছে বলেও শুনিনি।

অথচ আশ্চর্য এই যে, আজও এই শ্রেণীর ভদ্রলোকেরা (?) নির্বিবাদে সমাজে বিচরণ করছেন। অঞ্জলি স্মৃতি টকিজ আজ আছে কিনা জানিনা—থাকলেও সাধারণ চোখে তা দেখতে পাচ্ছি না অথচ দেখছি যে আবার নূতন নামে এক কোম্পানী গড়ার আয়োজন চলছে।

বলুন তো এখন আমি কি করবো? একজন গায়কের আর্থিক মলধন কতটুকুই বা! এ সামান্য মূলধনকে ঘিরেই বাস্তব জগতে আমার যা কিছু আশা ও আনন্দ গড়ে উঠেছিল—তিল তিল করে সঞ্চয় করে যা করেছিলাম, তা কি এ ভাবেই যাবে?

আমাদের দুর্ভাগ্যকে নিয়ে যে ভদ্রশ্রেণীর (?) সিনেমা কোম্পানীর মালিকেরা ছিনিমিনি খেলছে, আপনার হুল কি তাদের দংশন করবে না? এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের কাছে আমার মত যাতে কেউ প্রতারিত না হন, সে উদ্দেশ্যে রূপ মঞ্চের পাঠকপাঠিকাদের অবগতির জন্ম এ চিঠি লিখছি! আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কার গ্রহণ করুন।

— - — উপরে — —

কল্পচিত্র মন্দিরের পরে যাত্রা চিত্রে দীপক মুখোপাধ্যায়। সম্প্রতি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। — — - -

— — — নীচে - — -

ভরত নাট্যম এর প্রখ্যাত-নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী বালা সরস্বতী। — --- - -
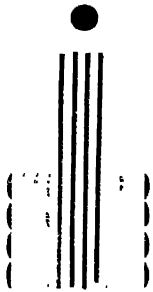
নিউইয়র্কে বাংলা থিয়েটার

স্বর্গতঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

(দুই)

৩রা অক্টোবর, শুক্রবার, ১৬ই আশ্বিন।

বিজয়া দশমীর জের—সকাল হতেই, গান বাজনা আনন্দ ইত্যাদি। তারপর দিবা নিদ্রা। একজন stewart ভদ্রলোক আমাদের পরিবেশন প্রভৃতি করিয়া থাকে, জাহাজের অন্যান্য কাজ করিয়া থাকে—লোকটির সহিত পূর্বে হইতেই আলাপ পরিচয় হইয়াছে—নাম Hearts. অষ্ট্রেলিয়াবাসী। ন্মস্থান মেলবোর্ণ। নিষিদ্ধ পানীয়ের একটি তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। যেমন খুশী, তেমনি কৃতজ্ঞ হইয়া ন্ধ্যার পর সে আমাদের ঘরে আসিয়া পান করিতেছিল। াকটি বড় ভাল এবং অদৃষ্টবাদী। বেশ ভাল লেখাপড়া ানে। তাহার জীবনের ইতিহাস বলিল। তাহার পিতা ্লেন ভারতবর্ষের ইঞ্জিনিয়ার, বাল্যকাল তাহার ভারতেই াটিয়াছিল—জলন্ধর ও সিমলায়। হার্টস বলিল, "I love ndia—Mother India, not India of the British rown, but a free India, having a equal status with every other country of the world. (আমি ারতবর্ষকে ভালবাসি—জননী ভারতবর্ষ, বৃটিশ মুকুটের া ভারতবর্ষ নহে : স্বাধীন ভারত—জগতের বিভিন্ন দেশের ানে পদমর্যাদা সম্পন্ন ভারতবর্ষ।)

ুব সময় সে মেসোপোটেমিয়াতে ইংরাজের অধীনে ারতীয় মহারাষ্ট্র সেনাদলের সেনানায়ক ছিল। অশ্বারোহনে া ছবি দেখিলাম—তখন সে যুবক—আজ প্রৌঢ়। সে ল, "The war killed my two brothers, my ...her and sister,"

...সা করিলাম—মা ও বোন যুদ্ধে মারা গেলেন কেমন ...? সে বলিল—তারা যখন আফ্রিকায় ছিলেন, ...garian Govt শত্রুপক্ষ বলিয়া তাহাদিগকে অস্বাস্থ্য... ানে অন্তরীণ করিয়াছিল। সেখানে জ্বরে ভুগিয়া ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া তাঁহারা মারা যান। মা, ভগিনী ও ভাইদের মৃত্যুর পর Hearts ৮০০০০ পাউণ্ড—অর্থাৎ ১২ লক্ষ টাকার মালিক হইয়াছিল—সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি - মায়ের অর্থ—ভগিনীর অর্থ তাহার হইল।

Hearts বলিল—"Then I begun to love my friend old jonnie waker."

তারপর সে যাহা বলিল, তাহার অর্থে নূতনত্ব নাই। দ্রাক্ষা-সুন্দরীর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সংগে সংগে আনুসংগিক সকলেই আসিয়া দেখা দিল। তাহার পরিণাম ফলে সে একজন জাহাজের ষ্টুয়ার্ট। হার্টস তারপর ভারতবর্ষ এবং বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিল। তিলক মহারাজের কথা বলিল। বোমা সম্বন্ধে সে তীব্র প্রতিবাদ করিল। মহারাষ্ট্র যুবকদের উপর তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ।

তারপর সাহিত্যের কথা উঠিল। সে বলিল, "I first finished one Indian history Ramayan. King Ram is a very brave hero, his wife Sita was stolen by Ravana, a cruel king of the forest. A very great bird-king came to rescue but was killed by Ravana."

মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, আমরা আমেরিকায় যে থিয়েটার করিব—তাহার নাটক এই রামসীতার কাহিনী লইয়া এবং ইনিই নাট্যকার।"

আমি নাট্যকার শুনিয়া তাহার শ্রদ্ধা বাড়িয়া গেল। সে বলিল, "কাল সকালে বইখানা তোমাকে দিব—একজন জার্মানের লেখা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "সাহেব তুমি বিবাহ করিয়াছ ?" উত্তর করিল, "না, তবে পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বজাতির মধ্যে আমার প্রণয়িনী আছে। বন্ধু,আমি জীবনকে উপভোগ করেছি,কষ্টও পেয়েছি। জীবনে শুধু ব্যর্থতাই আছে।" অবশেষে সে যাহা বলিল ইংরাজীতে লিখিলাম : "I live, still going on strong, like my old friend General Jonnie Waker."

৪ঠা অক্টোবর, শনিবার-- ১৭ই আশ্বিন।

সকালবেলা প্রাতরাশের সময় হার্টস আমাকে বাঁধির কাছে পুস্তকখানি দিল। এখানি স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্তের "রামায়ণ এবং মহাভারতের "ইংরেজী অনুবাদ।

Maxmullerকে পুস্তকখানি উৎসর্গ করা হইয়াছে বলিয়া হার্টস মনে করিয়াছিল—অনুবাদক বুঝি জার্মাণ। তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, লেখক বাঙ্গালী এবং নব্য বাংলার যে কয়জন বাঙালীর নাম প্রাতঃস্মরণীয়, ইনি তাঁহাদেরই একজন। কাল রাতে খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সকালে আকাশে মেঘ নাই বটে, কিন্তু সমুদ্র তরঙ্গ প্রবল। অনেকদিন পরে আবার কাল রাত্রি হইতে আমরা বেশ দুলিতেছি। ৪টায় আবার সেই Boat-drill.

প্রবল বাতাস, প্রবল তরঙ্গ—খুব শীত। উপরের ডেকে বেশীক্ষণ বেড়ান গেল না। শরীরটা একটু খারাপ লাগিতেছে। সন্ধ্যার পর পান্নাবাবুর ঘরে আড্ডা চলিল।

৫ই অক্টোবর, রবিবার—১৮ই আশ্বিন।

শরীরটা খারাপ। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই--আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি হইতেছে। তবে তেমন তরঙ্গের জোর আর নাই। অনেকেরই শরীর খারাপ, তবে সমুদ্র পীড়া ঠিক নয়। 'দিগ্বিজয়ী" অনুবাদ এখনও অনেক বাকী—কাজ আরম্ভ করা যাউক—নতুবা শেষ হইবে না। বৈকালের দিকে বাতাস নরম হইয়াছে, সমুদ্র একেবারে শান্ত বলিলেই চলে। বৈকালে বেতার-সংবাদ পাওয়া গেল R 101 নামক একটি বিমানপোত (air-ship) বিলাতের Candington সহর হইতে গতকল্য শনিবার করাচীর দিকে রওনা হইয়াছে। বিলাতের ইসমালিয়া সহরে থামিবে।

আমরা বলা কহা করিতেছি, ঐ উড়োজাহাজ আমরা দেখিতে পাইব কিনা। জাহাজের chief officerকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, দেখা যাইবে না।

৬ই অক্টোবর, সোমবার—১৯শে আশ্বিন—

শরীরটা খারাপ বলিয়া সকলের আগেই কাল রাত্রি ৯টার মধ্যে শুইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বিশুবাবু খবর দিলেন, chief officer এর কাছে Radio officer আসিয়া খবর দিয়াছেন—R 101 air-ship ফরাসী উপকূলে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সর্ব শুদ্ধ ৫২ জন লোক উহাতে ছিল, ৪৬ জন মারা পড়িয়াছে। মৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ইংলণ্ডের বিমান সচিব অন্যতম। ঘুমের ঘোরে সব কথা বুঝিলাম না। সকালে উঠিয়া শুনি ঘটনা সত্য। নির্দয় প্রকৃতি। কোথায় কাহার সামান্য একটি ত্রুটিতে [illegible] গুলি জীবন নষ্ট হইল। সকলে অনুমান করিতেছে গ্যাস জ্বলিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। সকল খবর এখনো পাওয়া যায় নাই।

আমাদের ডানদিকে সকালে একটা দ্বীপের মত দেখা যাইতেছিল। শুনিলাম উহা মালটা দ্বীপ। বেলা ১২টার পর বামদিকে আবার আফ্রিকার পার্বত্য উপকূল—কেহ কেহ বলিতেছেন টিউনিস।

শরীরটা আজও খারাপ—ঠাণ্ডা লাগিয়াছে।

৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—২০শে আশ্বিন--কোজাগরী পূর্ণিমা

শ্রীশ্রীকোজাগরী লক্ষ্মীপূজা। আজকার দিনটা আমার [illegible] স্মরণীয় দিন। বাল্যকাল হইতে এই পূজা বিশেষ করিয়া আমাদের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছি। [illegible] দিনের অনেক কথা মনে পড়ে,—সব চেয়ে বেশী মনে পড়ে মাকে। সুশৃঙ্খলে পূজা সম্পন্ন করাইবার জন্য তাঁহার [illegible] আগ্রহ—কত পরিশ্রম! দিদির শ্বশুরবাড়ী [illegible] বাপের বাড়ীতে তাঁহার আসা প্রায়ই ঘটিয়া উঠিত না, কেবল এই পূজা উপলক্ষ্য করিয়া আমরা [illegible] আনিতাম। এই সময়টা পুরা দিন বাকি তিনি আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন। এগারো বৎসর আগে এই [illegible] পূজার সময় বাড়ীর সমস্ত পুত্রকন্যা সমবেত হইয়াছি[illegible] তারপর বোধ করি একমাসের মধ্যেই বিদায় বাঁশী [illegible] কে কোথায় চলিয়া গেল। আমার গৃহহারা প্রবাসী আজ তাহাদের কথাই ভাবিতেছি। নয়নে অশ্রু জমিয়া উঠিতেছে।

বেলা বোধকরি ৫টা। ঘুম হইতে উঠিয়াছি হইল যেন, জাহাজ চলিতে চলিতে হঠাৎ থামি[illegible] সন্ধান লইয়া দেখিলাম তাই বটে। ব্যাপার কি? আমাদের মাদ্রাজী পরিবেশক যোসেফ বলিল—"[illegible] ভাঙ্গিয়া ইঞ্জিন অচল হইয়াছে"—সংগে সংগে ইহার

করিতে ২।৪টী ডিগবাজী খাইলাম-একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা বটে, জাহাজের প্রধান কর্মচারী বলিলেন, এ বিশেষ কিছু নয়। সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি এই ভাবেই চলিল। এ অবস্থায় লেখা পড়া করা একরকম অসম্ভব বলিলেই চলে। পান্না বাবু পায়ে একটা চোট খাইয়াছেন। আমার ডানহাতের কড়ে আঙ্গুলটা জখম হইয়াছে। দুপুর বেলা কিছুক্ষণের জন্য আকাশ একটু পরিস্কার দেখা গিয়াছিল—রাত্রি পূর্ববৎ।

১৪ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—২৭শে আশ্বিন সকালটা অনেক ভাল।

বাতাসের জোর ও গর্জন কমিয়াছে বটে, তরঙ্গ এখনও যথেষ্ট প্রবল—প্রচণ্ড শীত। বঙ্কিমবাবুর 'দেবী চৌধুরাণী' ব্রজেশ্বর ও হরবল্লভকে লইয়া ত্রিস্রোতা নদীর ভিতর দিয়া বজরা ছাড়িবার কালে সেই প্রবল ঝড়ের মধ্যে বজরার যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন—আজ তিনদিন সমানে সেই অবস্থার মধ্যে দিয়া কালযাপন করিতেছি। নিউইয়র্কে যাত্রা আমাদের কাছে এখন প্রায় "দিল্লীর লাড্ডুর" অবস্থা হইয়াছে। অর্থাৎ খাইয়া পস্তাইয়াছি।

১৫ই অক্টোবর, বুধবার—২৮শে আশ্বিন—

আকাশে মেঘ আছে—সূর্যও উঠিয়াছে, কিন্তু তরঙ্গ ও জাহাজের দোলানি পূর্ববৎ। মনে হইতেছে আটলান্টিকের স্বাভাবিক অবস্থাই এই। এই কারণেই বোধকরি সেকালের পাশ্চাত্য নাবিকরা প্রাচীন পৃথিবীর সর্বত্র পরিভ্রমণ শেষ করিয়া আটলান্টিক পাড়ি দিয়াছিলেন।

১৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার- ২৯শে আশ্বিন—

জাহাজের দোলনি অতিরিক্ত বাড়িয়াছে। আমাদের একেবারেই অস্থির করিয়া তুলিল। লেখা তো অসম্ভব। এক জায়গায় বসা দাঁড়ানো সম্ভব হইতেছে না। অথচ আকাশ পরিস্কার বলিলেই হয়। ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের গর্জনের মত বায়ুর গর্জন—সেই সংগে তরংগের আক্ষেপ। উপর ডেক পর্যন্ত জলের ছাট পর্যন্ত আসিতেছে। সকালের খাবার সাধারণ ভোজনাগারে না দিয়া ঘরে হাতে হাতে দিয়া গেল। দুপুরবেলা মনে বড় অবসাদ আসিল। একবার ভাবিলাম উপর ডেকে খোলা হাওয়ায় একবার বেড়াইয়া আসি—অবসাদ কাটিবে। শ্রীহরি—সেখানে গিয়া দে[illegible] ক্ষুদ্র মণির সমুদ্র আমি, আমাকে কেন্দ্র করিয়া সমুদ্র [illegible] নাগর দোলায় পাক খাইতেছে। সে যেন অর্জুনের বি[illegible] রূপ দর্শন। মনে মনে প্রার্থনা করিলাম, হে জগন্নিব[illegible] তুমি প্রসন্ন হইয়া এই রূপ সম্বরণ কর, তোমার এ বি[illegible] রূপের আমি সম্পূর্ণ অনধিকারী।

১৭ই অক্টোবর, শুক্রবার ৩০শে আশ্বিন।

"দুর্গা শ্রীহরি" স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম—তখনও সেই দোলা তবে সমুদ্র একটু যেন শান্ত [illegible] হইল। প্রতিদিন যাইতেছে—দিনটিকে পরিপূর্ণ[illegible] উপলব্ধি করিয়া ৬০ সেকেণ্ডে মিনিট, ৬০ মিনিটে [illegible] ২৪ ঘণ্টায় দিন হইতেছে। দিন যাইতেছে বটে, [illegible] জানান দিয়া।

আমাদের chief-officer লোকটি বড় ভাল। শী[illegible] বাবুর চুল দেখিয়া কি জানি কেন ভদ্রলোক বিশে[illegible] আকৃষ্ট হইয়াছেন। শীতলবাবুকে Bill বলিয়া ডাকে[illegible] এবং তাহার লম্বা চুল লইয়া যখন তখন রহস্য কর[illegible] থাকেন। পোর্ট সৈয়দে সকলেই বাড়ীর চিঠিপত্র পাইয়াছে[illegible] কেবল শীতলবাবু পান নাই। সেই জন্য তিনি [illegible] চিন্তাযুক্ত হইয়াছেন। একে এই দীর্ঘদিন ধরিয়া ম[illegible] সমুদ্রের ভিতর দিয়া একরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রা, তা[illegible] স্নেহাস্পদগণের কোন কুশল সংবাদ না পাওয়ায় শীতল[illegible] একরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। chief offcer তাঁহা[illegible] সান্ত্বনা দিবার জন্য সন্ধ্যার পর আমাদের সংগে এক পর[illegible] করিলেন। Radio offcerও তাঁহার মতলব রাখিলে[illegible] তারপর শীতল বাবুকে বলিলেন,তোমার কলিকাতার [illegible] দাও আমরা wirelessএ তোমার বাড়ীর খবর আ[illegible] দিতেছি। শীতলবাবুকে সংগে লইয়া Radio offce[illegible] কাছে বেতার পাঠাইবার অভিনয় করিয়া আসিলেন। [illegible] সন্ধ্যা নাগাদ সে তারের উত্তর আসিবে—এক[illegible] আছে। অবশ্য উত্তরে সুসংবাদই আসিবে [illegible] ব্যাপারটা একটা প্রতারণা মাত্র, তবু এই ভীম তরঙ্গ [illegible] শীতলবাবুকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য এই প্রতারণার [illegible] প্রয়োজন। ইহার মধ্যে যে মহান মানবতা প্রচ্ছন্ন [illegible]

তাহাই আমার মনকে উৎফুল্ল করিল। chief-officer শেষ পর্যন্ত এই বলিয়া উৎসাহিত করিলেন, "You are doing for Bengali food and always moping. You get everything in New York, Indian restaurents, rice curry, mustard oil and what not. But the thing you must lack, is not Bengali food or your own way of life, but courage.

১৮ই অক্টোবর, শনিবার, ১লা কার্তিক।

আশ্বিন মাস চলিয়া গেল। কলম্বো হইতে একমাস আসিলাম—এখনও নিউইয়র্কের দেখা নাই। কলিকাতা হইতে সমুদ্রে একমাস শেষ করিয়া আমরা আটলান্টিক মহাসাগরে পড়িয়াছি। প্রথম সমুদ্র যাত্রীদের পক্ষে এত দীর্ঘ পথ যাত্রা একরূপ দুঃসাহস বলিলেই হয়। আজ মনে পড়ে কলম্বসের সহযাত্রীগণের কথা। কলম্বস না হয় নিজের মনের বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন—তিনি প্রচণ্ডকে বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহারা তাঁহার সংগে ছিল তাহাদের যাত্রা যথাযথই নিরুদ্দেশ। কাল রাত্রি পুনরায় রবীন্দ্রনাথের ঝড় কবিতাটি পড়িলাম। সমুদ্রে পড়িবার উপযুক্ত বটে, সমুদ্র যাত্রীর পাথেয় পাইলাম—

"কার্পণ্যের বদ্ধ দ্বারে
সংগ্রহের অন্ধকারে
যে আত্ম-সঙ্কোচ নিত্য গুপ্ত হয়ে রয়,
হানো তারে হে নিঃশঙ্ক
ঘোষুক তোমার শঙ্খ
জয়, জয়, জয়।"

১৯শে অক্টোবর, রবিবার, ২রা কার্তিক।

প্রসন্ন প্রভাত, সুন্দর সূর্যোদয়। ঝড় ঝঞ্ঝা বাতাস কিছুই নাই। আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত হইয়াছেন। অনেকেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ২।৩ দিন হইল মনোরঞ্জন বাবু পেটের একটা colic বেদনায় কষ্ট পাইতেছেন। তিনি অবসাদগ্রস্ত হইয়াছেন। পান্নাবাবু, যাঁহার সর্বপ্রকার খাদ্যে সমান আস্থা দেখিয়া আসিতেছি, ২।৩ দিন হইল আহার প্রায় ছাড়িয়াই দিয়াছেন বলিলেই হয়। কাবাবু ভাবে এবং খাদ্যকে অধিকতর রুচিকর করিবার নিমিত্ত তারাকুমার বাবু কিছু কিছু তরকারী বাঙালী মতে রন্ধন করিয়াছেন। সকলেই মনে করিতেছেন, আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের পূর্বে শিশির বাবুর সংগে যে মেয়েরা গিয়াছে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল।

২০শে অক্টোবর, সোমবার, ৩রা কার্তিক।

আজ আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—তবে তরঙ্গ তেমন প্রবল নয়। দোলানি একেবারেই নাই। কালও ছিল না। নিউইয়র্কের নিকটবর্তী হইতেছি—আর বোধহয় ৮০০ মাইল বাকি। আগামী বৃহস্পতিবারের ভিতরেই পৌঁছিতে পারিব। দেখা যাক। "সর্বং আত্মবশং সুখং সর্বং পরবশং দুঃখং।" তাহাদের দুঃখ, বিদেশের দুঃখ সমস্ত দুঃখের মধ্যেই এই পরবশ ভাব। নচেৎ আহার নিদ্রা ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব তো কিছু নাই—তবু কাহারও দেহে মনে শান্তি ও স্বস্তি নাই কেন। সকালবেলা একটা তর্ক উঠিয়াছিল—"জাতি হিসাবে আমাদের ভারতীয়দের কোন পথ অবলম্বনীয়?" আমরা বিশ্বের সমস্ত মানুষের সংগে মিলিত হইব, না, সকলের সহিত অসহযোগ প্রাণপণে আমাদের প্রাচ্য আদর্শটিকে রক্ষা করিয়া চলিব? পৃথিবীর সর্বজাতির সহিত মিশিয়া চলিতে হইলে, ভারতবাসীকে খুব বড় হইতে হইবে কিন্তু মনের সে শক্তি হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া পাওয়া যায়। অসহযোগ সেই শক্তিলাভের জন্য নিকৃষ্ট উপাদান। ইংরাজেরা বা অন্য জাতীয়েরা পূর্ব দেশে আসে নিজেদের জাতীয়তা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—আমরাই বা কেন খিদিরপুরের ডক হইতে বিদেশী খাবার খাইতে আরম্ভ করি?

২১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার, ৪ঠা কার্তিক।

আজ শ্রীশ্রী শ্যামা পূজা। এখন প্রায় সকাল ৮-৩০ কলিকাতায় বোধহয় সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাদের কালীপূজার সন্ধ্যা সেখানে কত আলো—কত আনন্দ। নূতন করিয়া বাংলা দেশের প্রাণের মাঝে অনুভব করিতেছি। সমস্ত দেহ ও মন বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। জয় কালী! যে কার্যে চলিয়াছি তাহাতে যেন সিদ্ধিলাভ করি। "দেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।" হে মা আনন্দময়ী মনে আনন্দ

দাও। সমস্ত ব্যথা বেদনার মধ্যে তোমার মঙ্গল হস্ত আমাদিগকে রক্ষা করুক—যাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মুখের হাসি—মুখের জ্যোতি তোমার করুণায় অম্লান ও অক্ষুণ্ণ থাকুক—জয় মা, জয় মা, জয় মা!

কয়দিন ধরিয়া মনোরঞ্জন বাবুর Colic pain (বেদনা) বড়ই বাড়িয়া উঠিয়াছে। তাহার যন্ত্রণা আমার স্বাভাবিক অবসাদগ্রস্ত মনকে আরও অবসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। হে সর্বমঙ্গলময়ী, জননী আমাদের সকলের মঙ্গল কর।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে॥"

আগামী পরশু বৃহস্পতিবার জাহাজ নিউইয়র্কে পৌঁছিবে আশা করা যাইতেছে।

২২শে অক্টোবর, বুধবার, ৫ই কার্তিক

আটলান্টিক আর সে আটলান্টিক নাই। আজ এক দিন হইল মহাসাগরের মূর্তি একেবারেই শান্ত, স্থির, মনোরম—যেমন সুয়েজ উপসাগর—নিস্তরঙ্গ। জাহাজ একেবারেই স্থির। একটু আন্দোলনও অনুভব করিতেছিনা। সুন্দর সুপ্রভাত। কাল খুব শীত পড়িয়াছিল। আজ শীত অনেক কম। মনোরঞ্জন বাবুর বেদনা কাল সকালের পর আর হয় নাই—বেশ ভালই আছেন। সমুদ্রপীড়ায় অবসাদগ্রস্ত সকলেই প্রফুল্ল হইয়াছেন। নূতন পৃথিবী নিকটবর্তী কিন্তু তাহাকে বরণ করিয়া লইবার মত মনের তরুণত্ব কই? মন ফিরিয়া ফিরিয়া সেই বহুদূরগত বঙ্গভূমির এক কোণে যাইয়া চলিতেছে। গচ্ছতি পুরঃ শরীর ধাবতি পশ্চাৎ অসংস্থিতং চেতঃ।" আজ প্রতিপদ। কাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আমাদের বাড়ীতে প্রতিপদে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইফোঁটা লওয়ার প্রথা ছিল এবং এখনও আছে। মনে পড়ে প্রতি বৎসর যতদিন দিদি বাঁচিয়া ছিলেন—এই দিন আমাদের তিনি নিমন্ত্রণ করিতেন। তার পরদিন কিংবা তৎপর দিবস পূজার ছুটির শেষে বিদেশে রওনা হইতাম। সে একদিন গিয়াছে:

২৩শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ৬ই কার্তিক।

আজ ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া ৺পিতৃদেবের মৃত্যুতিথি। এই কারণেই দিনটি আমার নিকট সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। কাল আমরা জাহাজে আমাদিগের এ যাত্রার সর্বশেষ রাত্রি গিয়াছে। শুনিতেছি আজ বেলা ৩টার মধ্যেই পৌঁছিব। সকল ঘরেই গোছ গাছের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। আমরা যেন ৺পূজার ছুটী শেষ করিয়া বাড়ী হইতে রওনা হইব।

(ক্রমশঃ)

'রবীন্দ্রনাথের রক্ত করবী'

বনানী চৌধুরী

★

রবীন্দ্রনাথের বিরাট সাহিত্য সমুদ্রের মধ্যে "রক্ত করবীর" স্থান একটি বুদ্বুদের মত নহে।—ইহার স্থান একটি বেগবতী স্রোতস্বিনীর মত—যাহার লীলায়িত, নৃত্যপরায়ণ শান্ত ধারা সাহিত্য সমুদ্রকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যদি "অনেক খুঁজে পেতে এক জায়গায় জঞ্জালের পেছনে এই একটি মাত্র রক্ত করবীর গাছ" না পাইতেন—তাহা হইলে আমরা নন্দিনীকে পাইতাম না—তাহার বক্ষের ইতিহাস শুনিতাম না। রঞ্জনের জন্য নন্দিনীর অন্তরের আকুল শিহরণও অনুভব করিতাম না। আকাশে মেঘের ফাঁকে যখন চাঁদ উঁকি মারিয়া আলো আঁধারের স্বপ্ন সৃষ্টি করিত—তখন বুঝিতাম না যে ইহা নন্দিনীর প্রেম-চঞ্চল স্বপ্ন কাহিনী। আর দক্ষিণা বাতাস যখন সুদূর দেশের স্নিগ্ধ সুবাস বহন করিয়া আনিত—তখন বুঝিতাম না যে, ইহা বিশ্বের চির যৌবন মণ্ডিত রঞ্জনের গায়ের সুবাস। তখন এই না লেখা "রক্ত করবীর" জন্য আমাদের দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিত—ভাবিতাম ফুল দিয়া ঠাসাঠাসি করিয়া গাঁথা একটি দীর্ঘ মালার মধ্যে যেন একটি সুদৃশ্য ফুলের স্থান শূন্য রহিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ "রক্ত করবী" লিখিয়াছিলেন ১৩৩০ সালের গ্রীষ্মকালে, শিলংয়ের এক শৈলাবাসে। ইহার কয়েক বছর আগে কবি ইউরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-পরবর্তী ইউরোপের মর্মন্তুদ বিধ্বস্ত রূপ তাঁর চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছিল পাশ্চাত্য বস্তুবাদী সভ্যতার ভয়াবহ রূপ। তিনি দেখিয়াছিলেন সেই যান্ত্রিক সভ্যতার চাকায় বাঁধা রক্ত মাংসের মানুষ কী ভাবে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হইয়া যাইতেছে—কি ভাবে তাহার ব্যথা—আনন্দ—প্রেম—বিরহ-গাথা সজীব, স্পন্দনশীল অন্তর লোহার সভ্যতার চাপে লোহায় পরিণত হইয়া যাইতেছে। তাহার কাছে পাখীর গানের কোন দাম নাই—নরনারীর প্রেমের কোন প্রয়োজন নাই। সে কেবল জানে কাজ—বস্তু সংগ্রহের কাজ, শক্তি সংগ্রহের কাজ।

প্রাণ এবং প্রেম বর্জিত এই যন্ত্র-সভ্যতার পরিণামকে উপলক্ষ্য করিয়াই কবি 'রক্ত করবী' কাহিনীকে রূপায়িত করিয়াছেন। এ কাহিনীতে যে, রাজ্যের কথা বলা হইয়াছে তাহার নাম যক্ষপুরী। এ রাজ্য মাটির তলায় অবস্থিত—বাইরের আলো-বাতাস এখানে প্রবেশ করে না। এখানকার রাজা এক জালের আড়ালে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করে। রাজার কোন সংগী নাই। প্রেম, প্রীতি দয়া, মায়া-মমতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি রাজার কাছে মিথ্যা। তাহার কাছে একমাত্র সত্য—তাহা প্রেম নহে প্রীতি নহে—তাহা শক্তি, শক্তিমত্তার গর্ব। এই প্রতাপ দ্বারা রাজা তাহার রাজ্য শাসন করে। অর্থের লোভ রাজার দুর্দম। অন্ধকার খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া স্তূপাকার করাই রাজার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এ রাজ্যের যাহারা প্রজা—তাহারা সকলেই রাজার স্বর্ণ সংগ্রহের শ্রমিক। রাজার চোখে ইহারা মানুষ নহে—ইহারা স্বর্ণলাভের যন্ত্রমাত্র। ইহাদের নাম রাম বা রহিম নহে—ইহাদের নাম ৬৯ক, ৭১ঙ। রাজা এমন কঠিন নিয়মে ইহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা নিজেদের প্রাণশক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞান। প্রেম, ভালবাসা, তাহাদের মন হইতে শুকাইয়া গিয়াছে। তাহারা জানে তাহাদের একমাত্র কর্তব্য "পৃথিবীর বুক চিরিয়া সোনার বোঝা মাথায় কীটের মত সুড়ঙ্গের ভিতর হইতে উপরে উঠিয়া আসা।" ইহা ছাড়া আর কিছু কর্তব্য নাই।

যক্ষপুরীর অবস্থা যখন এমনি জড়, প্রাণহীন, গুমোট অন্ধকারে ভরা—যখন রাজা নিঠুর সংগ্রহের লুব্ধ তাড়নায় প্রাণের মাধুর্যকে জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে বসিয়াছে—এমন সময়ে আসিল নন্দিনী। সে আসিল আলোর দেশ হইতে, প্রাণের দেশ হইতে—চোখে তাহার রঞ্জনের প্রেমের নীল কাজল পরিয়া। তাহার রঞ্জনের ভালোবাসা তাহার অন্তরকে রূপে, রসে, আনন্দে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছে। সে প্রতি মানুষকে ভালবাসে, প্রতি মানুষকে আনন্দ দান করে। তাহার প্রাণময় অন্তরের ছোঁয়াচে প্রতি মানুষের মনে শিহরণ জাগায়। যক্ষপুরীর জালের বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রেম ও প্রাণশক্তির প্রতীক

নন্দিনী হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিল। এই মুক্ত প্রাণের আহ্বানে যক্ষপুরীর কারাগারের মধ্যে সকলে এক মুহূর্তে চঞ্চল হইয়া উঠিল। বালক শ্রমিক কিশোরের কচি হৃদয় টলমল করিয়া উঠিল—নন্দিনীকে সে ফুল যোগাইতে চাহে—রক্ত করবীর ফুল। অনেক খুঁজিয়া সে একটি মাত্র রক্ত করবীর গাছ পাইয়াছে—ইহার ফুল নন্দিনীর জন্যই সে আনিয়া দিবে। ইহার জন্য সে শাস্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে—মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য বলিয়া মনে করে।

নন্দিনীর প্রাণের ছোঁয়াচে বিশুপাগল সংগীত মুখর হইয়া উঠিয়াছে—সে যখন তখন নন্দিনীকে গান শোনায়। যক্ষপুরীতে ঢুকা অবধি এতকাল তাহার মনে হইত, জীবন হইতে তাহার আকাশখানা বুঝি হারাইয়া গিয়াছে। এখানকার টুকরো মানুষদের সংগে তাহাকেও এক ঢেঁকিতে কুটিয়া পিণ্ড পাকাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু নন্দিনী আসার সংগে সংগে তাহার মনে হইল, না, তাহার আলো একেবারে হারায় নাই। সে খুশী হইয়া নন্দিনীকে বলে—"তুমি আমার সমুদ্রের অগমপারের দূতী—যেদিন এলে আমার হৃদয়ে লোনা জলের হাওয়ায় এসে ধাক্কা দিলে।"

যক্ষপুরীর অধ্যাপক—যাঁর মধ্যে মানুষটুকু মরিয়া গিয়া কেবল পণ্ডিতটুকু জাগিয়াছিল - তিনিও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতরের মানুষটুকু আবার মাথা খাড়া করিয়া উঠিতেছে যেন। নন্দিনীর হাতের রক্তকরবী অধ্যাপকের কাছে বিস্ময়ের মত ঠেকে তিনি ভয় আনন্দ মেশানো অপূর্ব অনুভূতির শিহরণ পান। একটা ভাংগনের সুর, একটা বিদ্রোহের সুর তাঁহার সারা মন জুড়িয়া বাজিতে থাকে। তিনি বলিতে থাকেন—"সুন্দরের হাতে রক্তের তুলি দিয়াছেন বিধাতা- জানি না রাঙা রঙে তুমি কি লিখন লিখতে এসেছো।"

যক্ষপুরীর স্বয়ং রাজার বুকেও নন্দিনীর আগমনী গান ধ্বনিত হইয়াছে। রাজা চির জীবন কেবল সোনার তাল সংগ্রহ করিয়াছে। এই বিরাট সোনার তালের নীচে তাহার কোমল হৃদয়টি কবে যে সমাধিস্থ হইয়াছিল—তাহা রাজা নিজেই জানিতে পারে নাই। দিনে দিনে রাজা নিজেকে স্বার্থের পায়ে, লোভের পায়ে, এমন ভাবে আহুতি দিয়াছে যে, সে সমগ্র বিশ্বের প্রাণশক্তি হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সে ভুলিয়া গিয়াছে সোনা অপেক্ষা আনন্দের দাম বেশী—ভুলিয়াছে প্রতাপের মধ্যে পূর্ণতা নাই—প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা। রাজা আজ এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে, যেখানে সে নিজেকেই নিজে আর সহ্য করিতে পারে না। প্রতাপ তাহাকে অন্ধ করিয়াছে, লোভ তাহাকে দুর্দম করিয়াছে, সোনা এবং শক্তির গর্ব তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে এবং সেই সংগে তাহার অন্তর মরুভূমির মত শুষ্ক হইয়া খাঁ খাঁ করিতেছে। প্রেম শূন্য ক্ষুধিত অন্তর গুমরিয়া গুমরিয়া মরিতেছে। ঠিক এমন দিনে নন্দিনী আসিল—জানালার বাহির হইতে রাজাকে ডাকিল। মুহূর্তে কী যেন হইয়া গেল—বহুদিনের পাথর চাপা মৃতপ্রায় অন্তরে আজ খুশীর আমেজ লাগিল যেন—নন্দিনীর প্রাণের রুনুঝুনু নুপুর ধ্বনি রাজা ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে লাগিল। তারপর তাহার মনে হইল—নন্দিনীকে তাহার চাই। শক্তি দিয়া, প্রতাপ দিয়া, সে নন্দিনীকে লাভ করিবে। নন্দিনীকে পাওয়ার নেশায় সে মাতিয়া উঠে—কিন্তু পায় না। কেন না জোরের মধ্যে তাহাকে পাওয়া যায় না—প্রেমের মধ্যেই তাহাকে লাভ করিতে হয়। কিন্তু রাজা প্রেম ভুলিয়া গিয়াছে। নন্দিনীকে না পাওয়ার ব্যথা তাঁহার অন্তরকে মথিত করিয়া তুলে। সে বুঝিতে পারে প্রতাপের পথ বাছিয়া লইয়া এবং প্রেমের পথ ত্যাগ করিয়া সে কী ভুল করিয়াছে। সে মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছে তাঁহার বিরাট শক্তি সত্ত্বেও সে এক দুর্বল নারীকে আপনার করিতে পারে না।

নিজের এই অক্ষমতার জ্বালায় রাজা জ্বলিয়া মরিতেছিল। এমনি সময়ে আসিল—যৌবনের প্রতীক রঞ্জন—নন্দিনীর প্রেমে রাঙা রঞ্জন।

সে রাজার সম্মুখীন হইয়া তাহার জাল ভেদ করিতে চাহে—রাজাকে আহ্বান জানায় বাহিরে আসিয়া এই সুন্দর পৃথিবীর আলো বাতাসে নিজেকে ডুবাইয়া দিতে—প্রেমের এবং প্রাণের ঢেউয়ে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে। কিন্তু রাজা তাহার নিজের যৌবনকে মারিয়াছে—আজ যৌবন-ক[illegible]

[শেষাংশ ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শ্রীপার্থিবের সংগে সাক্ষাৎপ্রসংগে কৌতুকাভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়ের কৌতুকাভিনয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ !

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৪৮। সকাল সাতটায় এসে কাজে বসেছি। লোকজন তখনও আর কেউ এসে পৌঁছোননি। পৌঁছোবার কথাও নয়। কাজের চাপ একটু বেশী থাকলে এই সময়টায় আমি, কার্যাধ্যক্ষ অথবা সম্পাদক নিরালায় বসে সেগুলি সেরে রাখি। কারণ, দশটা বাজতে না বাজতেই লোকজনের ভিড় এতই বাড়তে থাকে যে, হাতের কাজ নিয়ে তখন হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়। একদিকে দাদাভাইর কাছে পূর্বদিনের কাজের খতিয়ান পেশ—অন্য দিকে কম্পোজিং বিভাগ থেকে গোবিন্দ বাবু, সুনীল, নন্দমহারাজ, ধীরেনঠাকুর, দুলাল মহান্তপ, [illegible]জগোপাল প্রভৃতির ফার্স্ট প্রুফ, সেকেণ্ড, মেক-আপ-প্রুফ—কে কোনটা সংশোধন করবে অথবা কে কোন নতুন লেখাটা কম্পোজ করবে তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ। অপরদিকে মেসিন [illegible] থেকে আলীজান জমাদার আর যোগীন মহাবাজের তাগিদে পাগলা হয়ে উঠতে হয়—কোন ফরমা আটতে হবে—কোন মেসিনে কোনটা চড়বে—মেসিন-প্রুফটা তাড়াতাড়ি দেখে দিন—এমনি তাঁদের তাড়ার নমুনা। তাদের বাতক [illegible]মান পরিমল তাঁদের ওপরেও এক কাঠি যায়। আর সর্বোপরি সবচেয়ে আমাদের সকলেরই প্রাণ অতিষ্ঠ করে [illegible] সরফরাজসিং অনিল ভাদুড়ীর হাকডাক। তাই [illegible] ৭টা থেকে ১০টা অবধি নিরিবিলি আমরা কয়েকটি [illegible] কাজ করে যেতে পারি। নির্মল, ধ্রুব, জগদীশ [illegible] জয়রাম ওদের দু'একজনকে থাকতে হয় ঘন ঘন চা সিগারেট, আর পান যোগাবার জন্য। ওদিন আমি আর [illegible] ছাড়া আর কারোর আসবার প্রয়োজন ছিল না—, নিমলও তখন আসেনি। কনকনে ঠাণ্ডা শীত পড়েছে—দোতলার ঘরটা খুলে দরজা ভেজিয়ে আমি চুপি চুপি কাজ করে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ বাদে 'ঠুক ঠুক' করে দরজায় দু' তিনটে টোকা মাবার শব্দ হ'লো। লেখা বন্ধ করে আমি কান খাড়া করে রইলাম। আবার শব্দ। 'কে-কে'—বলে, বসে থেকেই হাঁক দিলুম।

সকণ্ঠলায় উত্তর এলো : দয়া করে দরজাটা খুলবেন কী ?"

বাঃ! এ যে মহিলা-কণ্ঠ! এত সকালে আবার কে এলেন ? মহিলারা যে রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে না আসেন, তা নয়—কিন্তু সেত দশটার পর থেকেই পুরুষদের মতই তাঁদের আনাগোনা শুরু হ'তে থাকে। একটু বিরত বোধই করলাম। উঠে যেয়ে দরজা ফাঁক করে দেখলাম : একজন বর্ষীয়সী মহিলাই হবেন—ঘোমটার ওপর চাদর চড়িয়েছেন—দরজার দিকে পেছন দিয়ে জড়সড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মুখ নিচু করে জিজ্ঞাসা করলাম : কাকে চান ?"

উত্তর এলো : শ্রীপার্থিবকে। ভিতরে আসতে পারিকি ?"

কৌতূহল বেড়ে গেল! আজত কোন মহিলার আসবার কথা ছিল না! এসেই যখন পড়েছেন, তখন আর কী করি—স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বল্লুম : আসুন, আমিই শ্রীপার্থিব, ভিতরে এসে বসুন।" দরজাটা ভাল করে খুলতে খুলতে আগন্তুক মোড় ঘুরতেই আমি প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে নিলাম। মাথাটা যেন গুলিয়ে গেল—চোখে দেখতে পাচ্ছি ত! ভাল করে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম। সলজ্জ ভাবে ঘাড় নিচু করে বিনয় নম্রভাবে আগন্তুক বল্লেন : আমি কী দেরী করে ফেলেছি ?"

"থামুন মশায়—থামুন—আগে একটু হেসেনি" বলে এতই হাসতে লাগলাম যে, পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড় ।—

"চলুন চলুন, ভিতরে বসে হাসবেন'খন—বাইরে যা ঠাণ্ডা !" আগন্তুক নির্বিকার ভাবে বলে যেতে লাগলেন। আমি ভিতরে যেতে যেতে বল্লাম: যা অভিনয় দেখালেন—তাতে ঠাণ্ডা অনেকক্ষণ পালিয়েছে।" আমার সংগে সংগে হরিধন বাবু চেয়ারে বসতে বসতে বল্লেন: তবুত আপনার মন পাই না—যাক,—এবারত স্বীকার করছেন—অভিনয় সত্যিই আমি জানি কি না—"
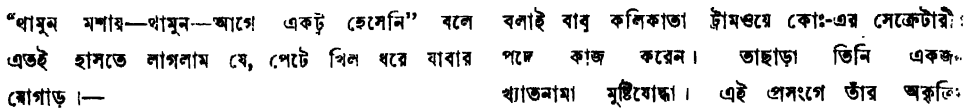
আমি উত্তর দিলাম: তাত কোনদিন অস্বীকার করি নি—তবে মাঝে মাঝে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন—যেমন আজকে করলেন। যেভাবে চাঁদর মাথায় দিয়ে মিহি কণ্ঠে কথা বলছিলেন 'আমিত—' "মহিলা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি।" হরিধন বাবু আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্লেন: আর পারারও ত কথা নয়—এক সময় স্ত্রী ভূমিকায় বহু অভিনয় করতে হ'য়েছে—কোন বিষয়ে কতটা দক্ষতা আছে,আপনার কাছে একটা পরীক্ষা দিয়ে রাখলাম, লিখবার সুবিধা হবে বলে।"

"পরীক্ষায় যে আপনি উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাও আমি বলছি—অর্থাৎ সব বিষয়েই আপনি ওস্তাদ।"

আপনারা এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পাচ্ছেন, কার ডাকে আমায় বিভ্রান্ত হ'তে হ'য়েছিল। তাঁকে আপনারা দেখেছেন—একাধিক ছবিতে তাঁর গদগদ ভাব আপনাদের না হাসিয়ে ছাড়েনি—বহুদিন বাদে প্রথম প্রকাশেই হরিধন মুখোপাধ্যায় আপনাদের হাসিয়ে বাজী মাৎ করেছিলেন 'সন্ধি' চিত্রে। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করলে আমার মত আপনারাও বলতে বাধ্য হবেন: না ওস্তাদই বটে!"

২৪ পরগণা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা-মাতা দু'জনেই পরলোক গমন করেছেন। হরিধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বলাই মুখোপাধ্যায়ের সংগেই হরিধন একসংগে বসবাস করছে এবং আজীবন জ্যেষ্ঠের সংগে একত্রে বাস করবে এই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা।

বলাই বাবু কলিকাতা ট্রামওয়ে কোং-এর সেক্রেটারী পদে কাজ করেন। তাছাড়া তিনি একজন খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা। এই প্রসংগে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু ও আত্মীয় খ্যাতনামা মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুক্ত বলাই চট্টোপাধ্যায়ের নামও করা যেতে পারে।

হরিধনের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও মুষ্টিযুদ্ধে ইতিমধ্যেই সুনাম অর্জন করেছে। শ্রীমান বর্তমানে যাদবপুর টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র এবং কলেজের মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় বর্তমান বছরে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

হরিধনের বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় শ্যামবাজারের এ, ভি, ইন্সটিটিউসনে। তখন এই স্কুলটির সম্পাদক ছিলেন স্বর্গত: অভিনেতা ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু—তিনি রসরাজ অমৃতলাল নামেই সর্বজনবিদিত। তিনি হরিধনকে খুব স্নেহ করতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যখনই কোন আবৃত্তি অথবা কোন আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করতো, রসরাজ নিজে তাঁদের শিক্ষার ভার নিতেন। কিন্তু হরিধনের উপর তাঁর পক্ষপাতিত্ব কারোরই দৃষ্টি এড়াতো না। অন্য সকলের চেয়ে হরিধনকেই যেন তিনি বেশী আগ্রহ করে শেখাতেন। স্বর্গতঃ গিরিশচন্দ্রের 'সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ' কবিতাটি তিনি যে যত্ন সহকারে হরিধনকে শিখিয়েছিলেন - সেকথা হরিধন আজও ভুলে যেতে পারেনি—কোনদিন পারবেও না। তাঁর অভিনেতা জীবনের কৃতকার্যতার মূলে রসরাজের আশীর্বাদের কথা না উল্লেখ করে পারা যায় না।

বালক-বয়স থেকেই আবৃত্তি ও অভিনয়ে হরিধনের অ... ও পারদর্শিতা আত্মীয়স্বজন, শিক্ষক ও বন্ধু বান্ধবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু সকলকে চমৎকৃত করে ... সংগীত-প্রতিভা। অতটুকু বালক—যেমনি তাঁর ... গলা—তেমনি তাল-জ্ঞান। পরবর্তীকালে সংগীতে ... যে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী অনেকেই তখন করেছিলেন। কৌতুকাভিনেতা রূপে সকলের ... পরিচিতি লাভ করলেও—তখনকার অনেকে ...সই
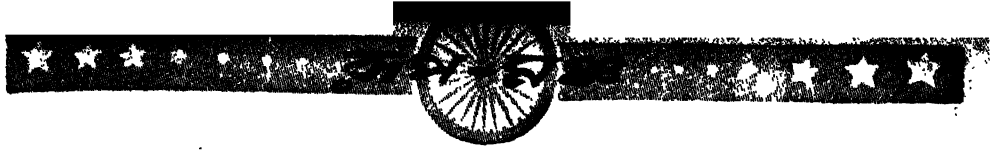
ভবিষ্যদ্বাণী যে মিথ্যা হয়নি, একথা যাঁরাই তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছেন--তাঁরাই স্বীকার করবেন।

উচ্চ শিক্ষালাভ করবার সৌভাগ্য হরিধনের হয়নি—কারণ, অতি অল্প বয়সেই তাঁকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয় অর্থোপার্জনের জন্য। সতেরো আঠারো বছর বয়স হ'তে না হ'তেই সে কিলবার্ণ কোম্পানীতে একটি চাকুরী গ্রহণ করে। কর্মজীবনের তাগিদে শিক্ষা জীবনকে পরিত্যাগ করতে হ'লেও, হরিধনের মন থেকে অভিনয়-স্পৃহা কোন দিন মুছে যায় নি। এবিষয়ে তাঁর আবাল্য বন্ধু শ্রীযুক্ত অসিত-কুমার ঘোষালের সাহচর্য সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। শ্রীযুক্ত ঘোষাল কলিকাতার এক বনিয়াদী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঠাকুর পরিবারের সংগেও এঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। বর্তমানে তিনি সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের অন্যতম পরিচালক। তাঁরই সহযোগিতায় তাঁর মাতামহ স্বর্গতঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ৩।২ এ, নলিনী সরকার ষ্ট্রীটস্থিত বাড়ীতে 'দীনবন্ধু সম্মিলনী' নামে একটি ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বর্গীয় নারায়ণ চন্দ্র দে, শঙ্কর মিত্র, সুধীর মিত্র, রূপশ্রী লিঃ-এর কেশব দত্ত এঁরাও এর উদ্যোগ মূলে ছিলেন। বিভিন্নমুখীন সমাজ-সেবার আদর্শে 'দীনবন্ধু সম্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা হয়। তাছাড়া অভিনয় বিভাগ, সংগীত বিভাগ প্রভৃতি বিভাগে কৃষ্টিমূলক চর্চার ব্যবস্থাও ছিল। ১৯২৫।২৬ খৃঃ হবে—দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে দীনবন্ধু সম্মিলনীর উদ্যোগে ইউনিভার-সিটি ইন্সটিটিউটে 'জনা' নাটক অভিনীত হয়। হরিধন নামভূমিকায় অভিনয় করে। শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চন্দ্র এই স্মৃতি-ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। এই অভিনয় প্রসংগে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—অভিনয়ের পূর্বে ইউরোপীয় মুষ্টিযোদ্ধা ও ভারতীয় মুষ্টিযোদ্ধাদের সর্ব-প্রথম প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার উদ্যোগমূলে ছিলেন খ্যাতনামা বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধাদ্বয় শ্রীযুক্ত বলাই মুখো-পাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু সম্মিলনী থেকে মেদিনীপুর সাহায্য ভাণ্ডারের জন্যও এক অভিনয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবং এই উপলক্ষে 'মহারাষ্ট্র' নাটক অভিনীত হয়। হরিধন সদা-শিবরাও এর ভূমিকাভিনয় করে।

এই সময় 'দীনবন্ধু সম্মিলনী' থেকে একটি কীর্তন বিভাগ খোলা হয়। কেবলমাত্র ভদ্র পরিবারের আট নয় বৎসরের মেয়েদের নিয়ে এই কীর্তন দলটি গড়ে তোলা হয় এবং এঁদের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে সত্তর রজনীর ওপর পালা কীর্তন অভিনীত হয়। এই কীর্তনাভিনয় নানান দিক দিয়েই তখন সকলের প্রশংসা লাভ করতে সমর্থ হয়। মেয়ে-কীর্তন দল প্রতিষ্ঠায় হরিধন সর্বপ্রথম পথ প্রদর্শক। প্রথমেই বলা হ'য়েছে, বিভিন্ন সমাজ সেবার আদর্শ নিয়েই দীনবন্ধু সম্মিলনী গড়ে উঠেছিল এবং যেমনি এই প্রতি-ষ্ঠানের অন্যতম বিভাগে সংগীত এবং অভিনয়াদির আয়োজন করা হ'তো, শরীর গঠনেও দীনবন্ধু সম্মিলনীর কম প্রচেষ্টা নিহিত ছিল না। এই ব্যায়াম চর্চা বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হ'তো শ্রীযুক্ত বলাই চট্টোপাধ্যায় ও মুখো-পাধ্যায়ের দ্বারা। প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে পাড়ায় পাড়ায় মুষ্টিভিক্ষা সংগৃহীত হ'তো। মুষ্টিভিক্ষা—চাঁদা এবং অন্যান্য উপায়ে প্রতিষ্ঠানের যে অর্থাগম হ'তো—তা সম্পূর্ণরূপে ব্যয়িত হ'তো দুস্থ ও আর্তের সেবায়। বহু ভদ্রপরিবারকে প্রতিষ্ঠান থেকে গোপনে অর্থ সাহায্য করা হ'তো। বহুজনকে কাপড়-জামা কিনে দেওয়া হ'তো। অর্থাভাবে যেসব পিতামাতা শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারতেন না, দীনবন্ধু সম্মিলনী থেকে তাদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা হ'তো। স্বর্গতঃ পণ্ডিত অশোক নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই দীনবন্ধু সম্মিলনীর একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন।

দীনবন্ধু সম্মিলনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অক্লান্ত কর্মী শ্রীযুক্ত অসিত ঘোষাল মহাশয়ের বিবাহ উপলক্ষে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সম্মিলনীর সভ্যরা 'আলমগীর' নাটকাভিনয় করেন। হরিধন নাম ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। 'আলমগীর'-এর চরিত্রোপযোগী তাঁর রূপ-সজ্জার ভার গ্রহণ করেছিলেন—স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক,

অভিনেতা ও রূপকার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ডি, জি নামে যিনি চিত্রজগতে সর্বজন পরিচিত। এই অভিনয় উপলক্ষে যেসব সুধীজন উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক দেবকীকুমার বসু, প্রথিতযশা প্রয়োগশিল্পী কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া, স্বর্গতঃ পরিচালক দীনেশ দাস এবং সর্বোপরি নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা শুধু শ্রোতা বা নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবেই উপস্থিত ছিলেন না—অভিনয়কে নানাদিক দিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছিলেন। অভিনয়ে খুশী হ'য়ে শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম-এর পক্ষ থেকে হরিধনকে একটী স্বর্ণ পদক উপহার দেন।

সৌখীন অভিনেতা হিসাবে হরিধন পথের শেষে নাটকে সুখদা, বিবাহ বিভ্রাট—ঝি, খাসদখল—নিতাই, জোরবরাৎ ঘটকী এবং বাঙ্গালী নাটকেও একটী প্রধান ভূমিকায় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে।

শিল্পাচার্য ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জামাতা স্বর্গতঃ নির্মল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মিলনী ক্লাবের উদ্যোগে কবিগুরুর প্রায়শ্চিত্ত ও বৈকুণ্ঠের খাতা নাটকাভিনয়ে হরিধন যথাক্রমে ধনঞ্জয় বৈরাগী ও বৈকুণ্ঠের ভূমিকাভিনয় করে। মিলনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত স্বর্গতঃ কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিবাহ ও সাজাহান নাটকে কর্তা ও ঔরংজেবের চরিত্রাভিনয়েও নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। সাজাহান নাটকাভিনয়ে বর্তমান চিত্র ও নাট্যজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস দারার ভূমিকাভিনয় করেছিলেন। রঘুবীর নাটকে হরিধনের সখার পার্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সরোজনলিনী স্মৃতি বার্ষিকী উপলক্ষেও একবার বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। স্বর্গতঃ গুরুসদয় দত্ত মহাশয় এবং স্বর্গতঃ লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীল সিংহ (তখন লর্ড হননি) হরিধনকে অভিনয়ে খুশী হ'য়ে দু'খানি স্বর্ণপদক উপহার দেন। স্বর্গতঃ পশুপতি বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থিত বাড়ীতে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের অভিনয়েও হরিধন একখানি স্বর্ণপদক লাভ করে।

'দীনবন্ধু সম্মিলনী'র অভিনয় তৎপরতা বন্ধ হ'য়ে যাবার মূলে বেশ একটী মজার ব্যাপার আছে। এরা একবার স্টার রঙ্গমঞ্চে পতিব্রতা নাটক অভিনয় করেন। হরিধন কালীনাথ-এর ভূমিকাভিনয় এতই সুন্দর হয়েছিল যে, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র ভদ্র ও স্বর্গতঃ অশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তদানীন্তন 'খেয়ালী' পত্রিকায় পতিব্রতার সমালোচনা প্রসংগে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন। অসিতবাবুর পিতা এই প্রশংসায় ভয়ানক রেগে যান। কারণ, তাঁর ভয় ছিল, হয়ত এরা শেষকালে পেশাদারী হ'য়ে উঠবে। তাই দীনবন্ধু সম্মিলনী বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেন। সৌখীন নাট্যাভিনয়ে আরো কতগুলি নাটকে হরিধন যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। তার ভিতর কেদার রায়—শ্রীমন্ত, বিল্বমঙ্গল—ভিক্ষুক, আলিবাবা—মর্জিনা, মানময়ী গার্লস্ স্কুল—রাজেন বাড়ুই ও নীহারিকা পোষ্যপুত্র—শ্যামাকান্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে হরিধন স্বর্গতঃ নির্মল মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় মোহনবাগান লেনে একটী যাত্রা-সম্প্রদায় গড়ে তোলে এবং এদের প্রথম অবদান 'ভক্ত হরিদাস' সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। হরিধনের ভক্ত হরিদাসের অভিনয় প্রত্যেককেই মুগ্ধ করে। যাদবপুর যক্ষা হাসপাতালের সাহায্যার্থে সেণ্টাল ক্যালকাটা ব্যাঙ্ক লিঃ-এর কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ও উদ্যোগে রঙমহল রঙ্গমঞ্চে 'বাংলার মেয়ে' নাটকাভিনয়ে হরিধনের ভবানীর স্বামীর ভূমিকাভিনয়ও কম প্রশংসার্জন করে না। 'অল ইণ্ডিয়া সাপ্লাই এজেন্সী' নামে হরিধন নিজে একটী নাটকও লিখেছিল এবং সে নাটকটিও সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়। কিলবার্ণ কোম্পানীতে প্রবেশ করা ব্যতীত হরিধনের কর্মজীবন সম্পর্কে এপর্যন্ত বিশেষ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৩২ খৃঃ-এ হরিধন উক্ত কাজে ইস্তাফা দিয়ে নিজস্ব ঝুঁকিতে বিভিন্ন ব্যবসায় লিপ্ত হ'য়ে পড়ে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা করপোরেশনে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে যোগদান করে—১৯৪০ খৃষ্টাব্দে স্থায়ী পদ লাভ করে। বর্তমানে সে কলিকাতা কর্পোরেশনে কাজ করছে।

হরিধনকে আমরা দেখেছি—সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ে—যাত্রা ও কীর্তন আসরে। এবার তাঁর জীবনের যে দিকটার

উল্লেখ করবো, বাঙ্গালী চিত্র ও নাট্যামোদীরা হরিধনের জীবনের সে দিকটার সংগে আশা করি বিশেষভাবেই পরিচিত আছেন। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার 'মায়া' নাটকের প্রযোজনায় তখন ব্যস্ত। তাঁর অন্যতম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ঋষি ভাদুড়ী মহাশয় ও বর্তমান কালিকা নাট্য মঞ্চের কর্ণধার শ্রীযুক্ত রামচৌধুরী মহাশয় একদিন হরিধনের বাড়ীতে যেয়ে হাজির হলেন। শ্রীযুক্ত রাম চৌধুরী মহাশয় হরিধনের দাদার একজন বন্ধু। তিনি হরিধনকে শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে যোগদান করবার জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু হরিধন পরম বেদনার সংগেই তাঁর সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, জ্যেষ্ঠের অনুমতি পাওয়া যাবে না বলে। পরে দাদার অনুমতি পেয়ে হরিধন অবশ্য সম্মতি দেয় এবং ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে শ্রীরঙ্গমে যোগদান করে 'মায়া' নাটকে সর্বপ্রথম পেশাদার নাট্য-মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করে প্রবীণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়ের আগ্রহে এবং সহযোগিতায় নাট্য-ভারতী রঙ্গমঞ্চে যোগদান করে। নাট্য-ভারতীতে দেবদাস, পথের সাথী, কর্ণার্জুন প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সাফল্যের সংগে অভিনয় করে। রঙমহলে যোগদান করে এবং সেই তিমিরে, রামের সুমতি প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে। এরপর হরিধনকে আমরা দেখতে পাই কালিকা নাট্য-মঞ্চে। কালিকা-নাট্যমঞ্চে হরিধন অতঃপর রামপ্রসাদ, বৈকুণ্ঠের উইল, জয়দেব, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে বর্তমানে যুগদেবতায় অভিনয় করছে। বর্তমানে কালিকা নাট্য মঞ্চের সংগেই হরিধন জড়িত।

...র্দায় হরিধনের প্রথম আত্মপ্রকাশ খাসদখল ...ত্রে—এই চিত্রে বাংলা চিত্রজগতের অন্যতমা ...ভিনেত্রী শ্রীমতী রেণুকা রায়ের সংগেও আমাদের প্রথম ...চয় হয়। গ্রে ষ্ট্রীটস্থিত বর্তমানে মতিমহল প্রেক্ষাগৃহটি ...ন 'মায়াপুরী' নামে পরিচিত ছিল। অবশ্য তখন এটী ...ক্ষাগার ছিল না—স্বর্গতঃ চানীদত্ত মহাশয় এবং সিণ্ডো... ...ন কোম্পানীর শ্রীযুক্ত বামন দাস চট্টোপাধ্যায় এটিকে ...টী ছোট চিত্র-নির্মাণাগারে পরিণত করেছিলেন বলা ...। 'খাস দখল'-এর নির্মাণ মূলে এঁরাই রয়েছেন। ...দিন বাদে বর্তমান রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওর অন্যতম পরিচালক শ্রীযুক্ত মাধব ঘোষালের চেষ্টায় ও আগ্রহে হরিধন সন্ধি চিত্রে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং দর্শক সাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হয়। এরপর হরিধন কৃতিত্বের সংগে অভিনয় করে—সহর থেকে দূরে, ভাবীকাল, এইতো জীবন, সাত নম্বর বাড়ী, শান্তি, প্রতিমা, রায়চৌধুরী, উমার প্রেম, মনে ছিল আশা, বন্দিতা, মাটি ও মানুষ, স্বার শঙ্কর নাথ, নন্দরাণীর সংসার, শাঁখা সিঁদুর, কবি প্রভৃতি চিত্রে। বর্তমানে হরিধন অনন্যা, হেরফের, প্রভৃতি চিত্রের অভিনয় শেষ করে—কুহকিনী, পরশ পাথর, সুপার প্রেম দখনে বাদ, প্রতিবোধ প্রভৃতি চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। এপর্যন্ত যতগুলি চিত্রে হরিধন অভিনয় করেছে, ভাবীকাল, সন্ধি, শান্তি, শাঁখাসিঁদুর, মাটি ও মানুষ প্রভৃতি চিত্রে তাঁর নিজের অভিনয় ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে খুশী করেছে। মাটি ও মানুষ চিত্রে হরিধন তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে সর্বপ্রথম একটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভূমিকায় অভিনয় করে। এজন্য পরিচালক সুধীরবন্ধুকে সে অজস্র ধন্যবাদ জানায়। কারণ, তিনিই প্রথম হরিধনকে একটী 'সিরিয়াস' চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেন। এই প্রসংগে হরিধন আমাকে বলে: দ্যাখো ভাই শ্রীপার্থিব, সত্যকথা বলতে কী, কৌতুকাভিনয়ে আমি অন্তর থেকে মোটেই কোন সাড়া পাই না"। হরিধনের মত একজন কৌতুকাভিনেতার কাছ থেকে একথা শুনে আমার বিস্মিত হওয়ায় আপনারা আশা করি কোন অন্যায় মনে করবেন না। কিন্তু এর পেছনে যে ইতিহাসটুকু আছে—তা শুনলে আপনারা আরো বিস্মিত হবেন। এবং আমাদের চিত্রজগত যে কতখানি অনুদার, তারও প্রমাণ পাওয়া যাবে। শ্রীযুক্ত মাধব ঘোষাল হরিধনের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। আধুনিককালে চিত্র জগতে যে সব বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাধববাবু এবং তাঁর ভাইয়েদের স্থান নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য নয়। চিত্রজগত সম্পর্কে মাধববাবু যতখানি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন—তা থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এখানকার প্রবেশ পথ সকলের পক্ষে সুগম নয়। 'সিরিয়াস' চরিত্রাভিনেতারূপে হরিধন যদি প্রবেশ করতে চায়, তাহলে তাঁকে খুবই বেগ পেতে হবে। তাই কৌতুকা-

ভিনেতা রূপে তাঁকে আত্মপ্রকাশ করবার পরামর্শ দেন। শ্রীযুক্ত ঘোষালের পরামর্শে হরিধন চিত্রজগতে খুব সহজেই স্থান করে নিতে পেরেছে। তাই তাঁর কৌতুকাভিনেতার জীবনের জন্য ঐ একটী লোকের কাছে হরিধন খুবই কৃতজ্ঞ। মঞ্চজীবনের জন্য হরিধন কৃতজ্ঞতা জানায় নাট্যাচার্য শিশির কুমারের কাছে। 'মাখা' নাটকে সুযোগ দিয়ে এবং তাঁকে চরিত্রোপযোগী গড়ে তুলে—তাঁর অভিনেতা জীবনকেও অনেকখানি গৌরবময় করে তুলেছেন। ১৯৩৬।৩৭ খৃষ্টাব্দে নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মিলনী অনুষ্ঠিত সংগীত প্রতিযোগিতায় হরিধন কীর্তনে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করে সম্মিলনীর কাছ থেকে পদক লাভ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগতভাবে হরিধনের কীর্তন প্রতিভায় সন্তুষ্ট হ'য়ে দেশবন্ধু-কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীও হরিধনকে একটী পদক উপহার দেন।

উদীয়মান পরিচালকদের যাঁদের কাছ থেকে হরিধন আন্তরিক সহযোগিতা পেয়েছে, তাঁদের ভিতর সুধীরবন্ধু, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ ও খগেন রায়ের নাম উল্লেখ করে। প্রবীণ পরিচালকদের ভিতর শ্রীযুক্ত দেবকী বসুরও হরিধন অজস্র প্রশংসা করে। শ্রীমতী মলিনা, চন্দ্রাবতী, কানন দেবী, কমল মিত্র, অসিতবরণ, বিপিন গুপ্ত, গুরুদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, বিমান বন্দ্যো, এঁদের অভিনয় ধারা ও ব্যক্তিগত ব্যবহারও হরিধনকে মুগ্ধ করে। প্রয়োগশালার বর্তমান নোংরা পরিস্থিতির আমূল সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা হরিধন খুবই অনুভব করে এবং সর্বোপরি শিল্পীদের শিক্ষার জন্য রূপ-মঞ্চ পরিকল্পিত নাট্য-বিদ্যালয়ের প্রয়োজ-নীয়তাকেও আন্তরিক ভাবে সমর্থন করে। চিত্র পরিচালনা করবার ইচ্ছা হরিধনের আছে কিনা সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে বলে: তা কী আর নেই—তবে সুযোগ পেলে হয়। চিত্র পরিচালনা থেকেও নাট্য পরিচালনা করবার ইচ্ছা আমার বেশী।" প্রতিটি বাংলা ছবি হরিধনের দেখা চাই। বিশেষ করে নিজের অভিনীত চিত্রগুলি। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও হরিধনের যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে। নিরপেক্ষ সমালোচনাকে সব সময়েই হরিধন তারিফ করে এবং শিল্প ও শিল্পীর জীবনে পত্র পত্রিকার দান মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। বাংলার স্বর্গতঃ জনপ্রিয় অভিনেতা দুর্গাদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় শুধু তাঁর অভিনয় নৈপুণ্য ও প্রিয়দর্শন চেহারার জন্যই নয়—তাঁর শিল্প মনটির জন্য আজও হরিধনের কাছে আদর্শ হ'য়ে আছেন।

চিত্র পরিচালকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রসংগে হরিধন বলে, "চিত্রাভিনয়ে আমরা চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অনেক সময় ব্যর্থ হ'লে দর্শকসাধারণ সবটুকু দোষ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে থাকেন, কোন চরিত্রকে সুষ্ঠুভাবে প্রকটিত করে তুলতে ব্যর্থ হই বলে। তাঁদের অবশ্য এতে কোন অন্যায় নেই। কিন্তু তাঁরা যদি ভিতরের খবর জানতে পারেন, তবে সব সময় আমাদেরই দোষ দেবেন না। যে যে চরিত্রে আমাদের অভিনয় করতে হয়—সে চরিত্রগুলি সম্পর্কে প্রথমে আমাদের কিছুই জানতে দেওয়া হয় না। চিত্র-গ্রহণের সময় টুকরো টুকরো যে সংলাপ চিত্র পরিচালকেরা দেন, তাই দু'তিন বার আওড়িয়ে বলে যেতে হয়। চরিত্রগুলির সম্পূর্ণভাবে সংগতি রেখে কী করে অভিনয়ে চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে? আশা করি চিত্র পরিচালকগণ এদিকে দৃষ্টি দেবেন। তাঁরা যদি সম্পূর্ণ চরিত্রটি পূর্বে থেকে আমাদের জানিয়ে দেন, তাহ'লে তার সর্বাংগীন রূপারোপে আমরা অনেকখানি সফল হবো।"

১৯৩৯ খৃঃ-এ হরিধন বিবাহ করে। বর্তমানে সে একটি পুত্র ও দু'টী কন্যার পিতা। অবসর সময় পারিবারিক পরিবেশের মাঝেই কাটিয়ে দিতে হরিধন ভালবাসে। —শ্রীপার্থিব

আমার ব্যাকুলতার কাছে মা বুঝি সাড়া না দিয়ে পারলেন না। এক অপূর্ব পুলকে আমার দেহ ও মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। শ্মশানভূমির ধ্যানগম্ভীর হিমশীতল মাটির স্পর্শে আমার অন্তরের সমস্ত জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই ধ্যানগম্ভীর রূপকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। আমার কপোলের উচ্চভাগে প্রভাত সূর্যের ঈষদুষ্ণরশ্মির স্পর্শ অনুভব করতেই শস্য সমৃদ্ধ মাঠের পূর্ব প্রান্তে পুব-পাড়ার সমাদ্দার বাড়ীর মাথার ওপর রক্তগোলাকার সূর্যদেব আমার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হ'য়ে উঠলেন। কতদিন এই পুকুরপাড়ে ওই আলোক-দেবতার সংগে যে মুখোমুখী হ'য়েছি তার ইয়ত্তা নেই। রাতের অন্ধকার বিদায় নিলেও, চোখের পাতা থেকে ঘুমের রেশ যখন বিদায় নিতে চাইতো না—বেড়ার ফাঁক দিয়ে সূর্যদেব তাঁর কিরণজাল পাঠিয়ে কতই না ডাকাডাকি সুরু করতেন! সে-ডাক শুনে আর আমি বিছানায় থাকতে পারতাম না। ছুটে আসতাম পুকুরপাড়ে। তার দুষ্টুমি হাসি তখন পুকুর-পাড় ছাড়িয়ে সারা বাড়ীটাতেই ছড়িয়ে পড়তো। মনটা একদম ভেংগে যেত। একদিনের বিরহও যেন সইতো না। অথচ জীবনের কতদিনইত কেটে গেল ওই প্রভাত সূর্যের মুখ না দেখতে পেয়ে। এই বিচ্ছেদ বিরহের-বেদনায় এর পূর্বে একদিনও মূর্ত হ'য়ে উঠবার অবকাশ পায়নি। আজ মিলন-মুহূর্তেই যেন তা মনটাকে পেয়ে বসলো। মনে হ'লো, যেন যুগ যুগান্তর ধরে সূর্যোদয়ের এই নয়ন ভুলানো রূপ-মাধুর্য থেকে বঞ্চিত ছিলাম। দীর্ঘদিনের পর আজকের সূর্যোদয় তাই এক অভিনব সৌন্দর্যমণ্ডিত হ'য়েই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ঠাকুমা—বড়কাকা ও বাড়ীর আর সকলের মুখে শুনতে শুনতে একদিন যে সূর্য বন্দনা আমার মুখস্ত হ'য়ে গিয়েছিল – সেই বন্দনাই আজ আমার মুখে উচ্চারিত হ'তে লাগলো—

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

আমি যুক্ত করে মহাদ্যুতিময় আলোক দেবতাকে প্রণাম জানালুম। সমাদ্দার বাড়ীর ঝাকড়া ঝাকড়া গাছগুলির ফাঁকা দিয়ে তাঁর রশ্মিগুলি সারা মাঠের হলুদ সরষে ক্ষেতের উপর প্রতিফলিত হ'য়ে যেন সোনায় সোনা ঢেলে দিয়েছে। ওই সোনালী শষ্যার দিকে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল! মাথার অবিন্যাস্ত চুলগুলি হাতদিয়ে বুলিয়ে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। প্রাবৃটে দিগন্ত প্রসারিত পদ্মার সমাহিত উদার বক্ষ ভেদ করে নিরুদ্বেগে জলপোত অগ্রসর হ'তে হ'তে অতর্কিত ব্যাত্যা-বিক্ষুব্ধে যেমনি ধাক্কা খেয়ে বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে—আমিও তেমনি ধাক্কা খেয়ে বিমূঢ় হ'য়ে গেলাম বকুলতলার কাছাকাছি এসে।

"কোথায় গেছিলি?"

পুকুর ঘাট থেকে বড়দি বাসন মেজে সবেমাত্র বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছেন—সামনে পড়ে যাওয়াতে একটা কিছু

জিজ্ঞাসা করা দরকার মনে করেই হয়ত প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু আমি কোন উত্তরই খুঁজে পেলাম না। প্রশ্নের সংগে মুখ তুলে শুধু স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বড়দির দিকে। বড়দিও চাইলেন আমার দিকে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তাঁর চোখের পাতা কাঁপতে কাঁপতে জলে ছল ছল হ'য়ে উঠলো। প্রশ্ন করে আমাকেও যেমনি অপ্রস্তুতের মাঝে ফেলেছেন, তিনিও তেমনি কম অপ্রস্তুত হননি—তিনি হয়ত পূর্বে থেকেই আমাকে লক্ষ্য করেছিলেন। তাই উত্তরের অপেক্ষায় না দাঁড়িয়ে থেকে—মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলেন। তাঁর গতিপথের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। বড়দি আমার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলে—বকুলতলার বেঞ্চটার ওপর বসতে যেয়ে নিজের কাছে নিজেই যেন আর একটা ধাক্কা খেয়ে নিলাম : ছিঃ ছিঃ, বড়দির কাছে ধরা পড়ে গেলাম! মুখের ভাষায় কোন উত্তর আমি দেইনি সত্য—কিন্তু আমার চোখের ভাষাতেই যে প্রকৃত সত্য বড়দির কাছে প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে! তাই এই লজ্জা কিছুক্ষণের জন্য আমায় আচ্ছন্ন করে ফেললো।

আত্মীয়স্বজন সকলের কাছেই আমি নির্মম হৃদয়হীন বলে পরিচিত ছিলাম। বিশেষ করে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়বার পর থেকে। কারার পাষাণ প্রাচীরে দীর্ঘদিন কাটিয়ে তাঁদের বিচারে আমার মনটাও নাকি পাষাণে পরিণত হ'য়েছিল। তাঁদের শোক-দুঃখের কোন আবেদনই নাকি সেখানে পৌঁছতো না। নইলে পরিবারের নানান বিপর্যয়ের কথাও কী আমায় বিচলিত করে তুলতো না? আমি যদি দাদার পার্শ্বে যেয়ে দাঁড়াতাম, পরিবারের আর্থিক সংগতি পাকা বনিয়াদের ওপর গড়ে তুলতে পারতাম। কিন্তু তা আমি দাঁড়াইনি। শুধু আমি কেন—আমার মত এমনি আরো অনেকেই দাঁড়াতে পারেনি। আমাদের এই ছোটগ্রামের আরো অনেকেই তাঁদের দাদা বা আর কারোর পার্শ্বে না দাঁড়িয়ে, আমারই মত যতু কাকার পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার মত তাঁরাও তাঁদের আত্মীয়স্বজনের কাছে নির্মম হৃদয়হীন বলেই পরিচিত ছিল। যতু কাকাকে গায়ের সকলে ডাকতো 'স্বদেশী-পাষণ্ড' বলে। আর ডাকবেই বা না কেন? আমরা সবকজনই ছিলাম গায়ের সেরা সের ছেলে। সব ক'জনের পরিবারের কত আশা-আকাঙ্খাই না আমাদের সবক'জনকে ঘিরে লতায়িত হ'য়ে উঠেছিল। সকলের সকল আশা নির্মূল করে যতুকাকা আমাদের দলে টেনে নিলেন। এতে তাঁকে পাষণ্ড বলবে নাত—কী বলবে?

কিন্তু হৃদয় আছে বলেই যে আমরা যতুকাকার ডাকে সাড়া দিতে পেরেছিলাম—একথা যতুকাকার চেয়ে খুব কম জনেই ভাল করে জানতেন। শুধু জানতেন আমার মায়ের মত আরো দু'একজনের মা। যাঁদের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেশের মাতৃসত্তাকে আমরা অনুভব করতে পেরেছিলাম। ব্যক্তিগত সুখ-ঐশ্বর্যকে সমষ্টির স্বার্থে জলাঞ্জলি দেবার মহা-মন্ত্রে যতুকাকাও এমনি কোন মায়ের কাছ থেকে দীক্ষিত হ'য়েছিলেন কিনা, বলতে পারি না! পুরাণ বা ইতিহাসের পাতায় যে বীরাঙ্গনা মাতৃচরিত্র পড়তে পড়তে একদিন অভিভূত হ'য়ে পড়তাম—তাঁরাই যেন রূপ পরিগ্রহণ করে আমার ও এমনি আরো অনেকের মায়ের মাঝে ধরা দিয়েছিলেন। আমাদের হৃদয়ের সত্যকার সন্ধান এঁরাও জানতেন। এঁরা জানতেন, আমার বড়দির মত শত শত বড়দির বঞ্চিত জীবনের হাহাকার—জয়ন্তর মত শত শত ভাইয়ের ক্ষুধার জালা আকণ্ঠ পান করে—তাঁদের সামনে অমৃতের ভাণ্ডটি তুলে ধরবার মহা-সাধনায় আমরা মগ্ন ছিলাম। ব্যক্তিগত কারোর শোক দুঃখ আমাদের অন্তর স্পর্শ করতে পারতো না। তাই, আমাদের হৃদয়ের সন্ধান আত্মীয়স্বজন কোনদিনই পাননি। পাষাণ প্রাচীরের মাঝে যে নরম মনটি ননীর মত ভেসে বেড়াতো—পাষাণ কেন সকলের পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব ছিল না।

বড়দি হয়ত আবার ঘাটে আসবেন। এর মাঝে মনের সব লজ্জা ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম। দাঁত মেজে নে মনে করে বেঞ্চটার উপর দাঁড়িয়ে দাঁতনের উপযোগী ব গাছের একটা সরু ডাল খুঁজতে লাগলাম। দাঁতনের জন্য ও ডাল ভাঙতে একটা মরা ডালের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে

শুধু ঐ একটা ডালকে ঘিরেই নয়—বকুল গাছটার যেখানে যত মরা-ডাল রয়েছে, সবগুলিকে ঘিরেই আমার দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে ফিরতে লাগলো। কত ডালই না গাছটায় শুকিয়ে রয়েছে! লোলুপ শিকারীর মত চোখ দু'টো আমার জ্বলে উঠলো। হাত দু'টো নিসপিস করে উঠলো। ইচ্ছা হ'লো, গাছে উঠে সমস্ত ডালগুলিকে ভেংগে নীচে জড়ো করি। নীচের দিকে তাকাতেই ভারি হাসি পেল, ইচ্ছা হ'লো প্রাণ খুলে একবার হেসেনি। কিন্তু হাসির গতি ঠোঁটের কোণেই চেপে রাখতে হ'লো। বেঞ্চটার উপর বসে পড়লাম। বকুলতলা—আমতলা জামতল—যেখানে দৃষ্টি গেল, সব ক'টি গাছের তলায় শুকনো পাতা স্তূপাকৃত হ'য়ে আছে—ওদের কত যে ভুগতে সমাধিস্থ হয়েছে তাই বা কে জানে। অথচ একসময় গাছের নীচেকার ত দূরের কথা, গাছের উপরেও একটা শুকনো পাতা—কী মরা ডাল- ঝরে পড়বার অপেক্ষায় থাকতে পারতো না। বাড়ীর পাঁচ সড়িকের কতজনের সন্ধানী দৃষ্টিই না ওদের জন্য ওত পেতে থাকতো। সেদিনকার কথাই মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল একটী ঘটনার কথা—যা আজও আমি ভুলতে পারিনি।

সেও এই শীতের সময়ই হবে। আমার বয়স তখন আট কী নয় বছর। স্কুলে তখনও ভরতি হ'তে পারিনি তবে স্কুলে যাতায়াত করি। স্কুলে যাবার সময় হ'য়েছে। ক্ষিধেও লেগেছে খুব।

কৈ খেতে দাও" বলে রান্নাঘরে মায়ের কাছে যেয়ে হাজির হলাম। রান্না তখনও হয় নি। মা সবেমাত্র ভাতের হাড়ি উনোনে চড়িয়ে সিক্ত জ্বালানীগুলিতে আগুন লাগিয়েছেন। আগুন জ্বলছে না। শুধু ধূয়োর কুণ্ডলী সারা ঘর ধূয়োময় করে তুলেছে। আমি বিকট চিৎকার করে হাত-পা আছড়াতে আছড়াতে বলে উঠলাম: কী কচ্ছিলে এতক্ষণ—পেট যে ক্ষিধেয় পুড়ে যাচ্ছে! বেলা হ'য়ে গেছে। স্কুলে যেতে হবে না বুঝি!"

মা আমার দিক চেয়ে বলে উঠলেন:— দেখছিস নে উনোন ধরছে না! ভিজে কাঠ!"

বাঁশের চোঙ দিয়ে ফুঁ দিতে দিতে মায়ের চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠেছে।

আমি বল্লাম: হু, তা আমি কী করবো?"

মা উত্তর দিলেন: না, তোরা কে কী করবি? তোদের সংসারে এসে মাঠে মাঠে কাঠ কুড়োনোই আমার বাকী আছে!"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা বল্লেন: য-ত লক্ষী বাবা আমার, কাছারী বাড়ী থেকে দু'টো শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে আয়। উনোনটা ধরলেই ভাতটা চটকরে নামিয়ে নিয়ে তোকে খেতে দেবো।"

উনোন না জ্বললেও আমি দ্বিগুণ জ্বলে উঠে উত্তর দিলাম: পারবো না—পারবো না—কিছুতেই পারবো না। ক্ষিধেয় পেটের নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে। সেই কখন দু'টো মুড়ি খেয়েছি।—হু।" বলে কান্নায় আমি ভেংগে পড়লাম। নিতান্ত অবুঝের মত কান্না আমায় চেপে বসেনি। মা কী আর তা না বুঝতে পারেন। মায়ের মত ক্ষিধে সহ্য করবার ক্ষমতা যে আমার তখনও হয় নি। মা তাড়াতাড়ি তাঁর পাশ থেকে একটা বাটি এগিয়ে দিয়ে বল্লেন: নে, এই মুড়ি ক'টা খেয়ে পাতা কুড়িয়ে নিয়ে আয়।" পরম আগ্রহে মুড়ির বাটিটা টেনে নিয়ে রবাহুতের মত মুড়িগুলি শেষ করে আমি ছুট দিলাম। মায়ের মুখের গ্রাস আমি কেড়ে খেলাম, সেকথা বিন্দুমাত্রও আমার মনে জাগলো না। দু'এক গাল মুড়ি চিবিয়েই মাকে যে ওদিন কাটিয়ে দিতে হয়েছিল, তা যদি তখন জানতাম!

কাছারী বাড়ীতে এসে কোন গাছের তলাতেই একটা শুকনো পাতাও দেখতে পেলাম না। আমি লাফিয়ে বকুল গাছটায় উঠলাম। তার একটা ডাল ধরে তিন চারটে ঝাকুনী দিলাম। দু'তিনটের বেশী শুকনো পাতা নীচে পড়লো না। গাছটার উপর বড্ড রাগ হ'লো। এ-ডাল সে-ডাল ধরে জোরে—আরো জোরে ঝাঁকি দিতে লাগলাম। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে গাছের ঐ একটা একটা ডালই একটু একটু করে দোল খেয়ে উঠলো। ব্যর্থতায় আমি মরিয়া হ'য়ে উঠছি তখন। জ্বালানী আমাকে যোগাড়
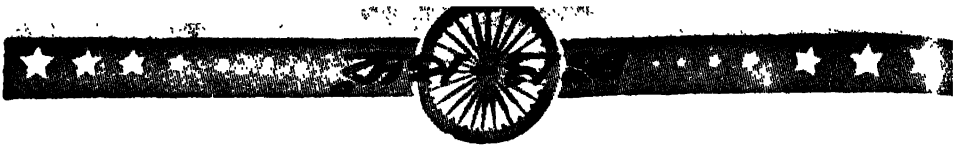
করতেই হবে। হাতের কাছে একটা কাকের বাসা দেখতে পেলাম। ছোট ছোট ডাল আর খড়কুটো দিয়ে কেমন নীড় রচনা করেছে। আমার শিকারী মনে একটুও সহানুভূতি জাগলো না। এক টানে বাসাটা ভেংগে মাটিতে ফেলে দিলাম—। ডিমগুলি মাটিতে পড়ে সংগে সংগে ভেংগে গেল। মনে তবু দোলা লাগলো না। কিন্তু কাক-গুলি কোথা থেকে যে খবর পেল! ঝাঁকে ঝাঁকে গাঁয়ের কাকগুলি এসে কা-কা শব্দে হাহাকার করতে লাগলো। বকুল গাছটাকে ঘিরে নির্মম শিকারীকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো—। ঝাকড়া বকুল গাছটার পাতা আর শাখার মাঝে আমি আত্মগোপন করেছিলাম—নইলে ওদের তীক্ষ্ণ চঞ্চু-দংশনে আমাকে সহজেই ঘায়েল করে তুলতো। ওদের সংখ্যাধিক্যে আমিও শংকিত হ'য়ে উঠলাম। এবার লাফিয়ে পড়ে ছুট দেবো। কিন্তু একটু দূরেই বড় এক-খানা মরা ডাল দেখতে পেলাম। বড—বেশ বড়। ওটাকে যদি ভাঙতে পারি—ঐ একখানা ডালেই মায়ের আজকের রান্না হ'য়ে যাবে। কিন্তু ডালখানাকে ঠিক জুৎ-সই মত ধরতে পাচ্ছি না। বা হাত দিয়ে গাছটাকে ধরে একটু ঝুঁকে পড়ে ডান হাতটাকে বাড়িয়ে দিলাম মরা ডালটাকে ধরতে। যে ডালের উপর পা রেখেছিলাম—ওটাকে আশ্রয় করে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে একটু উঁচু হ'য়ে নিলাম। হ্যাঁ—এবার আর ডাল না ভেংগে যায় কোথায়! বদ্ধ-মুষ্টিতে টান মারবার সংগে সংগে ডালটা মর মর করে ভেংগে পড়লো—আমি আর টাল সামলাতে পারলাম না। ডালের সংগে সংগে ডালে ডালে আঘাত খেতে খেতে নীচে পড়ে গেলাম।

তারপর অনেকক্ষণ অবধি কিছু জানতে পারি নি। যখন জ্ঞান হ'লো, তখন দেখলাম, সারা দেহ আমার ক্ষতবিক্ষত—সে ক্ষতস্থানে মা-ই হয়ত হলুদ-চুনের প্রলেপ মাখিয়ে রেখেছেন। আর আমার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তাঁর অন্তরের আশীর্বাদ অশ্রুধারায় ঝড়ে পড়ছে। আমি পিট পিট করে মায়ের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বল্লাম: মা, মাণি গো,তুমি কেঁদো না—আমার একটুকুও লাগেনি—দেখবে আমি কালই সেরে উঠবো।"

সেরে উঠতে আমার পাঁচ ছয় দিন লেগে গেল।

* * * *

দাঁতমাজাটাও ইতিমধ্যে সেরে নিয়েছি। কাঁথাটাকে বেঞ্চে ওপর রেখে মুখটা ধুতে যাবো—ইতিমধ্যে পিন্টু ছুটতে ছুটতে এসে বল্ল: দাদামণি,—তুমি এখনও মুখ ধোও নাই—ওপাড়া যাবা কখন?"

পিন্টুকে নিয়ে আজ পাড়া বেড়াতে যাবো বলে রেখে-ছিলাম। আমরাই গরজে। দীর্ঘদিন বাদে আমাকে অপরিচিতের মত গাঁয়ে ঢুকতে হ'য়েছে—নতুন করে পরিচিত হবার জন্য পিন্টুকেই সাথী ঠিক করে রেখে-ছিলাম। পুকুর ঘাটে নামতে নামতে ওকে বল্লাম: তুমি তৈরী হ'য়ে নাওগে, আমি মুখ ধুয়ে এলাম বলে। আর আর পাড়ায় যাবো না—চল, স্কুল বাড়ীটা হ'য়ে আসি।"

পিন্টু অবাক হ'য়ে বল্ল: স্কুল ত ছুটি।"

আমি বল্লাম: তাতে কী?"

পিন্টু কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

* * * *

পিন্টুকে নিয়ে আমি মাঠের রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। পিন্টু কলই-সিমের গাছ থেকে কচি কচি সিম তুলে আমায় বেছে বেছে দিতে লাগলো—এক সময় এই সিমের ক্ষেতকে কেন্দ্র করে আমরা কম হৈ-হুল্লোড় করি নি; কিন্তু আজ আর সিমের ক্ষেত ততটা আমায় আকর্ষণ করতে পারলো না। স্কুল বাড়ীকে কেন্দ্র করে নানান কথায় মন আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছিল।

* * * *

বকুল গাছ থেকে পড়ে যাবার সাত আট দিন বাদে স্কুলে গেছি। পৈতৃক আমলের একখানা ছেঁড়া ওয়ার্ডবুক, উপরের ক্লাসের একটী ছাত্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাদববাবুর পাটিগণিত—এ, টি মুখার্জির ভূগোলের বই—ভাংগা ত্রিকোণাকার একখানা শ্লেট—সাত আটদিন বাদে স্কুলে যাচ্ছি—কত উৎসাহ! স্কুল—
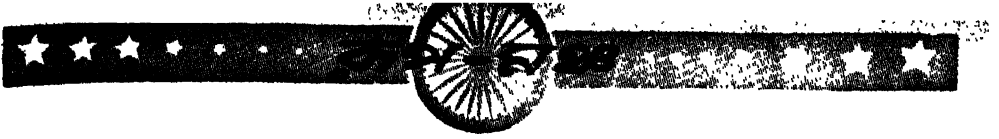
লবন—মইন্যা—নিত্যেন—আশু, এদের সংগে এত দিন দেখা না হওয়াতে পেটের ভিতর কত কথাই না জমে গেছে ! এতদিনে ডংকুর গাছটায় ডংকুর গুলি হয়ত পেকে উঠেছে। সমাদ্দার বাড়ীর কুল গাছটার কুলগুলি ফুরিয়েই গেল নাকি ! তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাটা ধরলুম। কিন্তু স্কুল বাড়ীটার কাছে এসে পা যেন আর চলতে চাইলো না। প্রথম পিরিয়াডেই এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড-মাষ্টার ইংরেজী পড়াবেন। এই মাস্টারটির ভয়ে আমরা সবাই জড় সড় থাকতাম। কিম্ভূত আকারের বিরাট তাঁর চেহারা। যেমনি মোটা—তেমনি বেটে। চুল পেকেছে—দাঁত পড়েছে—ভুরি নেমেছে—টাক পড়েছে। রংও তাঁর আবলুসের মত কালো। নাম কামিনী দত্ত। কিন্তু সে নামে আমাদের কারোর কাছেই তিনি পরিচিত নন। কেউ ডাকে ভুইটামহেশ্বর—কেউ কালাপাহাড—কেউ যমরাজ কেউ বা ডাকে কুম্ভকর্ণ বলে। নাকের উপর চশমা চড়িয়ে—হাতে পাকা একজোড়া বেত নিয়ে তিনি ক্লাসে ঢোকেন—বেতের ঘা দিতে দিতে পড়াতে সুরু করেন—আর বিদায় নেন নাক ডাকতে ডাকতে। নাক ডাকার কী বিকট আওয়াজ—বেতের আঘাতেরই বা কী জ্বালা ! সুকুমার দত্ত—আমরা ডাকতাম ওকে কুমীরা বলে। কুমীরা ছিল আমাদের ক্লাসের সবচেয়ে গ্যাট্টা-গোট্টা ছেলে। সেই কুমীরাও কামিনী দত্তের বেতের ঘায়ে একদিন অজ্ঞান হ'য়ে গিয়েছিল। আমাকে অবশ্য কোন দিন তাঁর বেতের ঘা খেতে হয়নি—কিন্তু তাঁর দেহের ঘা আর সকলের মত আমাকেও পাগলা করে তুলতো। পড়া করে এলে বেতের ঘা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। কিন্তু তাঁর দেহের ঘা' থেকে কারোরই রেহাই ছিল না। ক্লাসে ঢুকে চেয়ারে বসেই টেবিলে পা তুলে দিতেন। প্রথমেই ডাক পড়তো একজনের। তাঁর পেছনে যেয়ে খোস-পাঁচড়ার [illegible]টি খুটে খুটে তুলবার জন্য। কোন কোন সময় আবার আস্ত ধান দিয়ে মাথার পাকাচুল তুলবার হুকুম হ'তো। যেদিন তাঁর ক্লাস থাকতো—দু'একখানা বই নিতে ভুল হ'লেও, পকেটে করে দু'চারটে ধান নিতে ভুল হতো না।

গায়ে অত ঘা ছিল বলেই হয়ত কামিনী দত্ত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঘা দিয়ে দিয়ে কথা বলতেন, যা আমাদের বালক-মনকেও বিদ্রোহী করে তুলতো। কিন্তু বিদ্রোহ ঘোষণা করবার শক্তি কারোর ছিল না। আমার মনটা মাঝে মাঝে হুংকার দিয়ে উঠলেও সে হুংকারকে প্রশমিত করে রাখতে হ'তো। কারণ তখনও আমি স্কুলে ভরতি হতে পারিনি। স্কুলের আমি আইনসম্মত ছাত্র নই। তাই কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবার কোন অধিকারই আমার ছিল না। ভয়ে ভয়ে স্কুলে ঢুকলাম। ঘরে ঢুকতেই ঘণ্টা পড়ে গেল। কামিনী মাষ্টারকে লাইব্রেরী ঘরে ঢুকতে দেখলাম। সময় মত ঘণ্টা বাজলেও ঘণ্টামত ক্লাস বসে না। একমাত্র যোগেশ পণ্ডিত আর মৌলভী সাহেব ব্যতীত আর সব মাষ্টারমশায়রাই কয়েকমিনিট ফাও নিয়ে থাকেন। মুলি-বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে কামিনী মাষ্টারকে আসতে দেখা গেল। কুমীরা 'কালাপাহাড়' বলে ওয়ার্নিং দেবার সংগে সংগে আমরা সকলেই যার যার আসনে দিব্বি ভালছেলেটির মত স্থির হ'য়ে বসলাম। ভুইট্যা-মাষ্টার চেয়ারে বসলেন—পুরোণ চেয়ারটা মচমচিয়ে উঠলো। আর সংগে সংগে তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা দিতে লাগলো।

জলদ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি হাঁক দিলেন : পাতরা ! পাতরা।"

পাতরা আমার নাম নয়, তবে পাথের অপভ্রংশ কামিনী মাষ্টার 'পাতরাই' করে নিয়েছিলেন। তাঁকেও যেমনি আমরা আসল নামে ডাকতাম না—তিনিও আমাদের কারোর নামের অপভ্রংশ না করে নিয়ে ডাকতেন না।

আমি খুট খুট করে নিতান্ত অসহায়ের মত তাঁর টেবিলের সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম।

"বই কোথায়—শ্লেট ?"

এ প্রশ্ন কামিনী মাষ্টারের আজ নতুন নয়। বহুদিন আমায় জিজ্ঞাসা করেছেন। আর আমি ত্রিকোণাকার শ্লেটখানি সহ বইগুলি তাঁর সামনে তুলে ধরেছি। তিনি বাজারের ত্রিকোণাকার একধরণের বিস্কুটের সংগে আমার শ্লেটের তুলনা করে পরম কৌতুক উপভোগ কর-তেন। আজও বলে উঠলেন : এই বিস্কুট এহাবারে না

ভাঙলে অবে না। নেদাপড়া কী ফাঁকী বাজী দিয়া অয়রে ?"
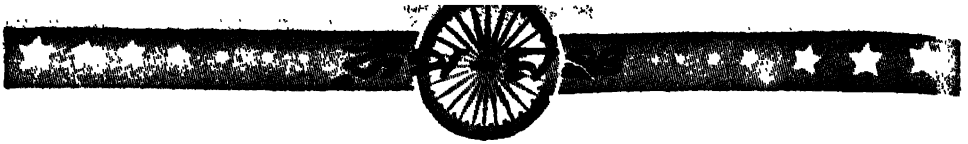
শ্লেটখানা আমার হাত থেকে টেনে নিয়ে কামিনী মাষ্টার মেঝেতে এক আছাড় দিলেন—ভাঙ্গা শ্লেটখানা আঘাত খেয়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল। আমি ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলাম। বহুদিন ব্যাবহার করতে করতে শ্লেটখানার ওপর আমার একটা অপরিসীম মমত্ব জেগে উঠেছিল—তাছাড়া নতুন একখানা শ্লেট কিনবার সংগতিহীনতার কথাও না-জানা ছিল, এমন নয়। কামিনীমাষ্টার যে শ্লেটখানা আজকে ভেংগেই ফেলবেন, একথা আমার মত ক্লাসের আর কেউই ধারণা করতে পারেনি। তাদের বেশীরভাগের সংগতির সংগে আমার মিল ছিল বলে, আমার মত তারাও ব্যথিত না হ'য়ে পারেনি—। কিন্তু ঐ নিষ্করুণ কামিনী মাষ্টারের তা বুঝবার ক্ষমতা ছিল না!

স্বাভাবিক কণ্ঠেই তাঁর আদেশ হ'লো: যা, 'গুলারে ফেইল্যা দিয়া আয়।"

আমি চোখ মুছতে মুছতে শ্লেটের টুকরোগুলোকে অতি যত্নের সংগে কুড়িয়ে নিয়ে বাইরে বেত ঝাড়ের মাঝে ফেলে দিয়ে এলাম।

ঘরে ঢুকতেই তাঁর প্রশ্ন এলো: এ্যাদ্দিন আসিস নাই ক্যান ?"

এতদিন কেন আসিনি—তার সত্যিকার কারণ কামিনী দত্তকে বলতে আমার আত্মাভিমানে বাধ ছিল। আমি চুপ করে রইলাম। আমাদের পাড়ার একটী ছেলে জবাব দিল: ও গাছ থ্যা পইর‍্যা গেছিল স্যার ?"

কামিনী মাষ্টার তাঁর দিকে তাকিয়ে বল্লেন: তোরে সরদারী করতে কইছে কেডা ?" ছেলেটি ধমক খেয়ে বসে পড়লো।

কামিনী মাষ্টার আমাকে গর্জন করে বলে উঠলেন: বেটা মাইন্যা দিয়া পড়বি গ্যা, আবার গাছ বাইতে যাও ? যা হাফ-নিল ডাউন অইয়া থাক।"

এই অন্যায় অনুশাসন বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে বেঞ্চের পর যেয়ে আমি হাফ-নিলডাউন হ'য়ে দাঁড়ালাম। তবু গাছ থেকে পড়ে যাবার অন্তরালে যে মর্মান্তিক কাহিনী জড়িয়ে ছিল, আমার পরিবারের আত্মমর্যাদার কথা চিন্তা ক—কামিনী মাষ্টারের কাছে সে কথা ব্যক্ত করলাম না। আমার পরিবারের দারিদ্রের কথা নিয়ে কামিনী মাষ্টারকে উপহাস করবার সুযোগ দেইনি—একথা চিন্তা করেও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলাম। কিন্তু আমার চোখের পাতা দিয়ে টস টস করে বেঞ্চের ওপর যে কয়েক ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো—তাকে কোনমতেই রোধ করতে পারলাম না।

* * * *

হঠাৎ চোখে যেন একটা পোকা ঢুকে গেল বলে মনে হলো। আমি দাঁড়িয়ে পড়ে চোখটা ডলে নিলাম। পিণ্টু চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: চোহে বুঝি কিছু গ্যাছে। ডইলো না। কাপড়ের খোট দিয়া ভাপ দাও।"

পিণ্টুর উপদেশ মেনে নিলাম। কাপড়ের খুঁট দিয়ে ভাপ দিয়ে নিতে নিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই স্কুলবাড়ীর কাছে এসে পৌছে গেলাম। (ক্রমশ:)

গ্রীয়ার গারসন (Greer Garson)

ম্যাডাম কুরী, র‍্যানডম হারভেষ্ট, গুডবাই মিঃ চিপস, মিসেস মিনিভার প্রভৃতি চিত্রের প্রখ্যাতা অভিনেত্রী গ্রীয়ার গারসনের নাম আমাদের কাছেও অবিদিত নেই। সাগরপারের কথা ছেড়েই দিলাম—আমাদের দেশের শিক্ষিত ও রুচিবান দর্শকদের মাঝেও গারসন অভিনীত কোন ছবি এলে কম চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী গ্রীয়ার গারসন উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে কাউন্টি-ডাউনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বর্তমান দৈহিক উচ্চতা ৫ ফিট ৬ ইঞ্চি এবং ওজন ১১২ পাউণ্ড। মাথার রক্তাভ চুল, সবুজ আভাযুক্ত নীল চোখ—দোহারা গড়ন—সর্বোপরি ব্যক্তিত্ব শ্রীমতী গারসনকে তাঁর অভিনেত্রী জীবনে সাহায্য করেছে অনেকখানি। গ্রীয়ার গারসন লণ্ডন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিনোবল (Greenoble) একজন গ্রাজুয়েট এবং শিক্ষয়িত্রীর জীবন গ্রহণ করবেন বলে প্রথম থেকেই তাঁর অভিলাষ ছিল—কিন্তু কার্যতঃ লণ্ডনের একটি প্রচার প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্ম জীবন সুরু হয়। এতে প্রথমটায় মিস গারসন খুবই ভেংগে পড়েছিলেন—কিন্তু তাঁর অভিনেত্রী জীবন সে বেদনা ভুলিয়ে দিয়েছে, কারণ ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষয়িত্রী জীবনে মিস গারসন যতটুকু শিক্ষার আলোক বিকিরণ করতে পারতেন—অভিনেত্রী জীবনে চলচ্চিত্র মারফৎ তার ব্যাপকতা অনেক বেশী। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে বার্মিংহাম রিপার্টরী থিয়েটারে অভিনিত 'স্ট্রীট-সিন' নাটকে শ্রীমতী গারসন অভিনেত্রীরূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৩৪-৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীমতী গারসন লণ্ডনের নাট্যশালার সংগে জড়িত থেকে গোল্ডেন এ্যারো, এ্যাকসেণ্ট অন্ ইয়থ, ওল্ড মিউজিক প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। মেট্রো গোল্ডুইনমেয়ার খ্যাত প্রযোজক মিঃ লুই, বি, মেয়ার শ্রীমতী গারসনের 'ওল্ড মিউজিক' নাটকের অভিনয় দেখে খুবই প্রীত হন এবং ব্যক্তিগতভাবে গারসনের সংগে দেখা করে চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য অনুরোধ করেন। শুধু তাই নয়—শ্রীমতী গারসন স্বীকৃতা হ'লে তাঁর প্রতিষ্ঠানে তক্ষুনি তাঁকে চুক্তিবদ্ধা করে নেবেন বলে অভিলাষ ব্যক্ত করেন। বস্তুতঃ মিস গারসন মিঃ মেয়ারের এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দেন। এর পর হলিউডে যেয়ে একবছর মিস গারসনকে থাকতে হয়। এই এক বছর চলচ্চিত্রের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে গারসনকে অনেক কিছু শিখে নিতে হয়। তারপর চলে আসেন বৃটেনে। মিস গারসনের সর্বপ্রথম চিত্র 'গুডবাই মিঃ চিপস' এম-জি-এম (বৃটিশ)-এর প্রযোজনায় ব্রিটেনেই নির্মিত হয়। তারপর হলিউডে আসেন এবং এম, জি, এম, এরই চিত্রে পর পর অভিনয় করে যাচ্ছেন। গারসন অভিনীত পরবর্তী চিত্রগুলির ভিতর রিমেম্বার—১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে, প্রাইড এ্যাণ্ড প্রেজুডিস—১৯৪০ খৃঃ-এ, 'ব্লসমস্ ইনদি ডাষ্ট'—'হোয়েন লেডিজ মিট', 'মিসেস মিনিভার', 'র‍্যানডম হারভেষ্ট'—১৯৪২ খৃঃ-এ, দি ইয়ংগেষ্ট প্রফেসন', ম্যাডাম কুরি—১৯৪৩ খৃঃ-এ, মিসেস
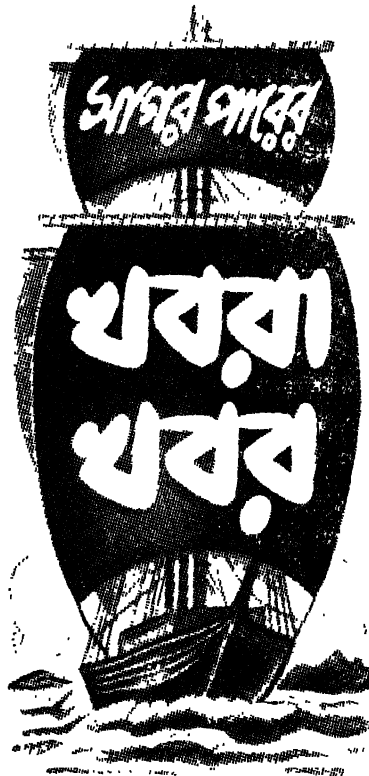
পারকিংটন, ১৯৪৪ খৃঃ-এ, দি ভ্যালি অফ ডিসিশন, এ্যাড ভেনচার—১৯৪৫-খৃঃ এ, ডিজায়ার মি—১৯৪৭ খৃঃ-এ, জুলিয়া মিসবিহেভ—১৯৪৮ খৃঃ-এ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রথম প্রকাশের দিন থেকেই শ্রীমতী গারসন দেশ বিদেশের অসংখ্য গুণগ্রাহীদের কাছ থেকে যে অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে আসছেন—তা যে কোন শিল্পীর পক্ষে ঈর্ষার বস্তু। ১৯৪১-৪২ খৃঃ-এ দি এ্যাকাডেমী অফ মোশন পিকচার আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সেস কর্তৃক 'মিসেস মিনিভার' চিত্রে অপূর্ব অভিনয়ের জন্য গারসন এ্যাকাডেমী পুরস্কারে ভূষিতা হন এবং বৃটেনের বার্ণসটেইন কোয়েচানার (Bernstein questionnare) কর্তৃক পরিচালিত প্রতিযোগিতায় ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে জনপ্রিয়তার প্রথম স্থান অধিকার করেন। এত খ্যাতি এবং অর্থোপার্জন করেও শ্রীমতী গারসনের ব্যক্তিগত জীবনে বার বার অশান্তির কালোছায়া রেখাপাত করেছে। অভিনেত্রী জীবনে প্রচুর অর্থোপার্জন করলেও গারসনের বাল্য ও কৈশোর তাঁর মা মিসেস নিনা গারসনের সংগে খুব আর্থিক কৃচ্ছ্রতার মধ্য দিয়েই কাটে। এবং সে জন্য অল্প বয়সেই লণ্ডনের এক বিচারপতির সংগে গারসনকে বিয়ে বসতে হয়—যিনি বয়সে গারসন থেকে অনেক বড় ছিলেন। কিন্তু মা ও নিজের আর্থিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই গারসন এমনি আত্মবলিদানে অগ্রসর হন। গারসনের এই পরিণয় সম্পর্কে হলিউডের তাঁর এক সাংবাদিক বান্ধবী 'ফটোপ্লে' পত্রিকার মহিলা প্রতিনিধি লুইলা ও পারসন (Louella O. Parsons) বলেন: It had worked out badly because she was not in love with him. She had married for security for her mother and herself and she was more a daughter than a wife to the older man."

রিচার্ড নেইর (Richard Ney) সংগে গারসনের দ্বিতীয় বিবাহও সুখের হয়নি। গারসনের প্রথম স্বামী যেমন বয়স্ক ছিলেন, দ্বিতীয় স্বামী নেই হলেন ঠিক তার বিপরীত অর্থাৎ বয়সে গারসন থেকে অনেক ছোট তাই এই বিবাহও অশান্তিময় হয়েই উঠলো। এই অশান্তি গারসনের অভিনেত্রী জীবনকেও গ্রাস করতে উদ্যত হয়। তখন গারসন 'ডিজায়ার মি' চিত্রে অভিনয় করছিলেন এই চিত্রখানি অন্য কারণে ব্যর্থ হ'লেও গারসন নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেন। কারণ, ব্যক্তিগত নানা চিন্তা ও অশান্তির ভারে তিনি এতই ভেংগে পড়েছিলেন যে সে ভাংগা মন নিয়ে আশানুরূপ অভিনয় করতে পারেন নি ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বর মাসে রিচার্ড নেইর সংগে গারসনের বিবাহ বিচ্ছেদ পাকাপাকি হ'য়ে যাওয়াতে মিস গারসনের মন থেকে বড় একটা অশান্তির বোঝা নেমে যায়। কিন্তু এই বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বেই বুড্ডি ফোগেলসন (Boddy Fogelson) বলে এক ভদ্রলোককে শ্রীমতী গারসন বিয়ে করছেন বলে হলিউডের চলচ্চিত্র সংবাদিকেরা বেতার ও পত্রপত্রিকা মারফৎ প্রচার কার্য সুরু করতে থাকেন গারসনকে ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে এনিয়ে নানান প্রশ্ন করলে, তিনি তাঁর উত্তর দিতে অস্বীকার করেন এবং সেপ্টেম্বর মাস অবধি তাঁদের কৌতূহলকে দমিয়ে রাখতে অনুরোধ জানান। বুড্ডি ও গারসনকে নিয়ে তাঁদের কৌতূহল জাগবার কারণও ছিল। বুড্ডি ইতিপূর্বে কোনদিন গারসনকে সামনা সামনি দেখেনও নি—প্রচারপত্রে শুধু নাম দেখেছেন। তাহলেও গারসনের প্রতি তাঁর সেরূপ কোন আকর্ষণ ছিল না। আর তিনি চলচ্চিত্র জগতেরও কেউ নন। গারসন যখন 'জুলিয়া মিসবিহেভ' চিত্রে অভিনয় করেন, তখন এই চিত্রের অন্যতম অভিনেতা বুড্ডির পরিচিত বন্ধু পিটার লফোর্ডের অনুরোধে বুড্ডি একদিন 'জুলিয়া মিসবিহেভ' এর দৃশ্যপটে আসেন। এবং পিটার তাঁদের বর্তমান চিত্রের নায়িকার সংগে বুড্ডিকে আলাপ করতে বলেন—কারণ, বুড্ডি কোন প্রযোজক প্রতিষ্ঠানে অর্থ নিয়োগ করবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। দৃশ্যপটে এখানে ওখানে ঘুরে চিত্রগ্রহণের খুঁটি নাটি বিষয়গুলি যখন বুড্ডি আগ্রহের সংগে লক্ষ্য করছিলেন, তখন একেকে কয়েকজন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও কর্মীদের নিয়ে ঠাট্টা তামাসায় একজন মহিলাকে মসগুল হ'য়ে উঠতে দেখেন এবং উক্ত মহিলা বুড্ডির মনে বেশ এক বৈশিষ্ট্যের ছাপ নিয়ে ধরা দেন। পিটার যখন গারসনের সংগে আলাপ করিয়ে দিতে বুড্ডিকে নিয়ে যাবেন—বুড্ডি তাঁকে বাধা দিয়ে
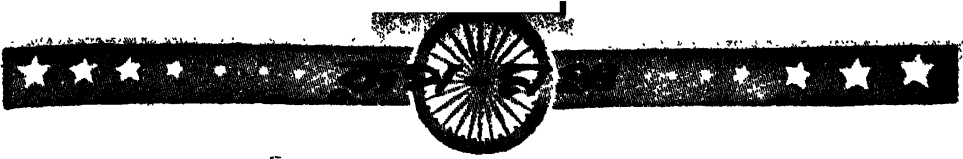
বললেন : তোমার নায়িকার সংগে আলাপ নাইবা করলাম! ওর চেয়ে চলো, ঐযে গল্পগুজবে যে মেয়েটি মেতে রয়েছেন, ওর সংগে আলাপ করে আসি ”
পিটার কোন কথা না বলে মুচকী হেসে—বুড্ডিকে নিয়ে রূপ-সজ্জা ঘরে হাজির হলেন। বুড্ডি মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। তবু যখন পিটার নিয়েই এসেছেন, তখন নায়িকার সংগে আলাপ করেই যাওয়া উচিত মনে করে নায়িকার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ বাদে নায়িকা এসে যখন হাজির হলেন, বুড্ডির আশ্চর্যের অবধি রইল না। এই বক্রাভ কেশ বিশিষ্টা অদ্ভুত আকর্ষণশক্তি সমন্বিতা মেয়েটীত ইতিপূর্বে প্রথম দর্শনেই তার মন জয় করেছে! বুড্ডি অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। পিটার আবার মুচকী হেসে পরিচয় করিয়ে দেন : শ্রীমতী গীয়ার গারসন—আমাদের বর্তমান চিত্রের নায়িকা।” এবার আর বুড্ডির মনে ক্ষোভ থাকে না। বস্তুত এই ঘটনা থেকেই বুড্ডি ও গারসনকে নিয়ে নানান গুজব রটতে থাকে। তারপর বুড্ডির সংগে শ্রীমতী গারসনকে নৈশভ্রমণেও অনেকে দেখতে পান। এবং বুড্ডি একাধিকবার গারসনের 'পিবল বীচের' বাড়ীতে অতিথি রূপে আমন্ত্রিত হন। রিচার্ড নেইর সংগে গারসনের বিবাহ বিচ্ছেদ পাকাপাকি হ'য়ে যাবার পর লুইল্যাপারসন 'ফটোপ্লে'র প্রতিনিধি হিসাবে গারসনের সংগে আবার দেখা করেন এবং ফগেলসনকে সত্যিই তিনি বিয়ে করছেন কিনা সেবিষয়ে জানতে চান। কিন্তু এবারও গারসন সঠিক কোন উত্তর দেন না। তিনি বলেন : বিচার্ডকে নিয়ে যে দুর্ভাবনায় আমি পড়েছিলাম—তার হাত থেকে আমি রেহাই পেয়েছি—বর্তমানে আমি আমার মনের অনেকটা শান্তি ফিরে পেয়েছি এবং ফোগেলসনকে আমার ভালই লাগে। তিনি যদিও সুন্দর পুরুষ নন—তবু তাঁর মনের বলিষ্ঠতা—ব্যক্তিত্ব ও সর্বোপরি ভদ্রোচিত ব্যবহারে আমি মুগ্ধ না হ'য়ে পারি নি। তবু তাকেই আমি বিয়ে করবো কিনা, এখনও তা বলতে পারি না। কারণ, আমি চাই

'দি গুইনিয়া পিগ' চিত্রে সেইলা সিম ও রবার্ট ফ্লেমিং।

শান্তি। দু' দুবার এই বিয়েই আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করেছে।—তার যাতে আর পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য আমি সতর্ক এবং এবার যাকে বিয়ে করবো, তাকে নিয়েই আমি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে চাই। তাই আমার এবারের নির্বাচনে ভুল থাকলে চলবে না। বেশ কিছুদিন সময় নিয়েই আমি মনস্থির করবো"—এ সম্পর্কে শ্রীমতী গারসনের নিজের ভাষায়ই তাঁর অভিমত উদ্ধৃত কচ্ছি: If I marry again it must be for ever Do you know I am the only one in my family ever to be divorced? I could never go through again what I went through that awful day when I was kept at the court house for hours, being photographed and interviewed···I want happiness. It's lonely not having the companianship of a man, but when I do marry, it's to be right! That is why I am taking my time to reach a decision."

বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে শ্রীমতী গারসনের এই উক্তি তাঁর অভিনেত্রী জীবনের মতই কী তাঁর প্রতি আমা- শ্রদ্ধা জাগায় না? শ্রীমতী গারসনের ব্যক্তিগত জীবনও চিরস্থায়ী শান্তি ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠুক—সুদূর সাগর পার থেকেও আমরা তাই কামনা কচ্ছি।

রীতা হেওয়ার্থ (Rita Hayworth)

সাগরপারের লাস্যময়ী রীতা হেওয়ার্থের নামও আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। ধনকুবের আগা খাঁর পুত্র আলি খাঁর সংগে রীতা হেওয়ার্থের সম্প্রতি পরিণয় সূত্রের কথা ওদেশীয়দের মত ভারতেও তাঁকে নিয়ে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। রীতা হেওয়ার্থের আসল নাম মার্গারেট কারমেন কনসিনো (Margurerite Carmen Consino)। ১৯১৮ খৃঃ-এ ১৭ই অক্টোবর, ম্যানহাটনে তাঁর জন্ম হয়। রীতার দৈহিক উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি, ওজন ১১৮ পাউণ্ড। রীতার মাথার চুলগুলি রক্তাভ বাদামী রং-এর—চোখ দু'টী তাঁর লাল। রীতা নিউইয়র্কে শিক্ষা লাভ করে। রীতার পিতা স্পেনদেশীয় এবং মাতা একজন আইরীশ মহিলা মাত্র ছয় বৎসর বয়সে পিতার সংগে প্রথম নৃত্য-নাট্যে আত্ম-প্রকাশ করে। চৌদ্দ বৎসর বয়সেই অভিনয়কে জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করে। ১৯৩৫খৃঃ-এ প্রথম চিত্রাবতরণ করে টুয়েনটিয়েথ সেনচুরী ফক্সের 'দান্তেস ইনফারনো (Dante s Inferno) চিত্রে একটী নর্তকীর ভূমিকায়। তারপর তাঁকে দেখা যায় 'আণ্ডার দি পমপাস', 'চার্লিচ্যান ইন ইজিপ্ট' প্রভৃতি চিত্রে। বলতে গেলে ১৯৩৯ খৃঃ-এ কলম্বিয়ার 'ওনলি এ্যাঞ্জেল হ্যাভ উইংস' চিত্রেই রীতা চিত্রা- মোদীদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর প্রতিটি চিত্রেই কৃতিত্বের সংগে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। স্ট্রবেরী ব্লণ্ডী (ওযার্ণার)—ব্লাড এ্যাণ্ড স্যাণ্ড (টুয়েনটিয়েথ); ইউ উইল নেভার রীচ মি (কলম্বিয়া) ১৯৪১ খৃঃ-এ, মাইগলসল (টুয়েনটিয়েথ), টেলস অফ ম্যানহাটন (টুয়েনটিয়েথ), ইউ ওয়ার নেভার লাভলিয়ার (কলম্বিয়া, ১৯৪২ খৃঃ এ, কভার গার্ল (কলম্বিয়া) ১৯৪৪ খৃঃ এ. টুনাইট এ্যাণ্ড এভরি নাইট (কলম্বিয়া), গিলডা (কলম্বিয়া) ১৯৪৫ খৃঃ-এ ডাউন টু আর্থ (কলম্বিয়া), লেডী ফ্রম সাংহাই (কলম্বিয়া) ১৯৪৭ খৃঃ এ এবং ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে কলম্বিয়ার বর্ণ ইয়েসটারডে চিত্রে। 'বার্ণসটেইন কোয়েসনার' জন- প্রিয়তার প্রতিযোগিতায় রীতা অভিনেত্রীদের ভিতর অষ্টাদশ স্থান অধিকার করে। রীতা বৈদেশিক চিত্রজগতে —বিদ্যুৎ শিখার মত চাঞ্চল্যময়ী। তার প্রণয়-প্রার্থীদের অভাব নেই। বিশেষ করে রীতাকে ঘিরে ধনকুবেরদের মাঝে যে গুঞ্জন ধ্বনিত হ'য়ে উঠে—তা আর কোন অভি- নেত্রীর সময়ই দেখা যায় না। তাঁর মাদকতাময় চোখের দৃষ্টিতে এমনি আকর্ষণ রয়েছে যে, অতি সহজেই এরা আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েন। অথচ এহেন রীতা যখন জয়মাল্য দিল ওরসন ওয়েলস্-এর গলায়—সেদিনও হলিউডে কম বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় নি। ওরসন ওয়েলস-এর প্রতিভার কাছে রীতা নিজেকে সপে না দিয়ে পারেনি—এতে তাঁর জয়পরাজয় দুইই রয়েছে। ওরসনের মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিকে লাভ করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়! ওরসন একাধারে পরিচালক, প্রযোজক, লেখক ও অভিনেতা। কোনটাতেই

সে কারোর চেয়ে কম নয়। দু'বছর বয়স থেকেই নাকি ওরসন বিশুদ্ধ ইংরাজিতে কথা বলতে শেখে। বাইশ বছর বয়সে আমেরিকার বেতার জগত মারফৎ ওরসনের প্রতিভা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইচ জি ওয়েল্‌স-এর কাহিনী অবলম্বনে ওরসন প্রযোজিত 'ওয়ার অফ্ দি ওয়ার্লডস' বেতারাভিনয়ের কথা এখনও আমেরিকাবাসী ভুলতে পারে নি। পঁচিশ বৎসর বয়সের সময় বিশ্ববিখ্যাত 'সিটিজেন কেন'-এর মত চিত্রের রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনা করে বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। 'সিটিজেন কেন'-এ অভিনেতা রূপেও তাঁর সংগে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। 'লেডীফ্রম সাংহাই' চিত্রে রীতার বিপরীত ভূমিকায় অরসন অভিনয় করেন। বর্তমানে তাঁর বয়স বত্রিশ বৎসর।

ওয়ান্স আপন এ ড্রিম চিত্রে গুগী উইদার্স (Googie Withers)।

অরসন ওয়েলস-এর সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধা হ'য়ে রীতা হেওয়ার্থ বৈদেশিক চিত্রজগতে যে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল—গত বছরেও শেষের দিকে ওরসনের সংগে তাঁর বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ধনকুবের আগা খাঁর পুত্র আলিখাঁর সংগে তাঁর সম্প্রতি বিবাহের গুঞ্জনও তেমনি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। আলিখাঁর বয়স বর্তমানে ৩৮ বৎসর। অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করে। দেখতেও সুন্দর, খেলাধুলায়ও তেমনি পারদর্শী। ইতিপূর্বে একজন ইংরাজ মহিলার সংগে তাঁর বিবাহ হ'য়েছিল।

রীতার সংগে বিবাহ বিচ্ছেদ হবার পর—ওরসন ওয়েলসও সম্প্রতি লীয়া প্যাডোভানা (Lea Padovana) নাম্নী একজন ইতালীয় অভিনেত্রীর সংগে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছেন এবং ইতালীয় স্ত্রীর সংস্পর্শে এসে ওরসন ইতিমধ্যেই ইতালীয় ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে নিয়েছেন। আলিখাঁর সংগে বিবাহের কথা পাকাপাকি হয়ে গেলেও হলিউডে এখনও জল্পনা-কল্পনা চলেছে রীতা ও ওরসনকে নিয়ে—রীতা কী ওরসনকে সত্য সত্যই ভুলে যেতে পারবে? এ প্রশ্ন
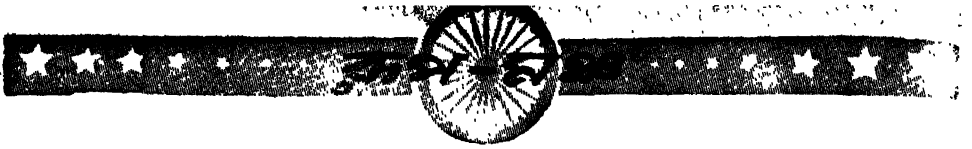
নেহাৎ অবান্তর নয়। কারণ, ওরসনের মত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে যে বা যাঁরা এসেছেন, কেউ তাঁকে কোন দিন ভুলতে পারেন নি। রীতাও যে পারবে না—তাও সম্প্রতি এলসা ম্যাক্সওয়েল ফটোপ্লে পত্রিকার অন্যতমা মহিলা প্রতিনিধি রীতার কাছ থেকেই আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এলসা ম্যাক্সওয়েল সোজাসুজি রীতাকে জিজ্ঞাসা করে: রীতা, তুমি কী ওরসনকে ভুলতে পারবে?" রীতা এলসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জবাব দেয়: ওর মত মানুষকে কী এত সহজে ভোলা যায়—তবে আমি খুশী যে ও ওর জীবনে রেবেকাকে পেয়েছে!"

১৯৪৮-খৃষ্টাব্দে একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত বৈদেশিক শিল্পী

সম্প্রতি ডেইলী মেল পরিচালিত 'একাডেমী এ্যাওয়ার্ড'-এর ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। **অভিনেতা**: (১) জেমস ম্যাসন। (২) মাইকেল উয়াল্ডিং। (৩) স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার। (৪) রেকস হ্যারিসন। (৫) মাইকেল রেডগ্রেভ। (৬) এরিক পোর্টম্যান। **অভিনেত্রী**: (১) মার্গারেট লকউড। (২) এ্যানা নিগল। (৩) এ্যান টড্। (৪) ফিলিস কলভার্ট। (৫) সেলিয়া জনসন। (৬) প্যাট্রিসিয়া রোক। - নিতাই সেন।

বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রমোন্নতি

এইচ এইচ উলেনবার্গ

> নূতন ফিল্ম আইন প্রচলিত হওয়ার ফলে বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্প সুদৃঢ় আর্থিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আইনের সাহায্যে এবং মূলধনের অভাব দূরীকরণের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার ফলে বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্প অতি দ্রুত প্রভূত উন্নতি লাভ করবে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৯৪৮ সালের ১লা অক্টোবর তারিখটি বৃটেনের চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ওই তারিখ থেকে বৃটেনের সমস্ত ছবিঘরে প্রদর্শিত বড় কাহিনী প্রধান চিত্র-গুলির মধ্যে শতকরা ৪৫টি বৃটেনে প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই ব্যবস্থা বৃটেনের তথা সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পে মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। বৃটেনের চলচ্চিত্র উৎপাদ- ক্রমোবৃদ্ধির পথে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান পরিবেশকদের হাতে ১৯৪টি কাহিনীপ্রধান চিত্র আছে ছোট কাহিনীমূলক চিত্রগুলি এই সংখ্যার মধ্যে ধরা হয়নি। এ ছাড়া পূর্ব পূর্ব বৎসরে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত এরূপ ৬২ খানি চিত্র আগামী এক বৎসরের মধ্যে পুনরায় প্রদর্শনের জন্য বোর্ড অব ট্রেডের ফিল্ম পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৃটেনের ছবিঘরগুলি বর্তমানে মোট ২৫৬টি চিত্র প্রদর্শনের জন্য পেতে পারে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, বিদেশী ছবি আমদানী হ্রাস করার ফলে বৃটেনের চিত্রগৃহগুলিতে ফিল্মের অভাব দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা নেই। বৃটেনের নির্মিত চিত্রগুলি পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশেও বিশেষ সমাদৃত হয়েছে এবং বৃটেনে চিত্র উৎপাদনের হার সেই সমস্ত দেশে সরবরাহ করবার পক্ষেও অসন্তোষজনক নয়।

উপরোক্ত সংখ্যার মধ্যে ৪২টি ছবির প্রদর্শন এখনও সুরু হয়নি বা সবেমাত্র সুরু হয়েছে।

বর্তমানে বৃটেনের ষ্টুডিও গুলিতে প্রতিমাসে পাঁচখানি করে নূতন ছবি নির্মিত হচ্ছে এবং আগামী জুন মাস থেকে প্রতি মাসে ছ'খানি করে নূতন ছবি নির্মিত হবে বলে আশা করা যায়।

বৃটিশ ফিল্মের অনুরাগী দর্শকদের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য বলা যেতে পারে যে, বৃটেনের ষ্টুডিওগুলিতে, ১৯৪৮ সালে, ৮৩টি কাহিনী প্রধান চিত্র (তন্মধ্যে একটি অষ্ট্রেলিয়ান) এবং ১২টি ছোট কাহিনীমূলক চিত্র নির্মিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে নির্মিত বড় কাহিনী প্রধান ছবির সংখ্যা ছিল ৫৮। ১৯৪৮ সালের নির্মিত ছবিগুলির মধ্যে ছ'টি রঙীন।

প্রশ্ন হলো এই যে,বৃটেনের ষ্টুডিওগুলি আরও অধিক সংখ্যক চিত্র নির্মাণ করার সামর্থ আছে কিনা। বর্তমানে বৃটেনে ২৫টি ষ্টুডিও ও ৭২টি 'সাউণ্ড ষ্টেজ' আছে। যে যে ষ্টুডিওতে কাহিনী প্রধান চিত্র নির্মাণের সুবিধা আছে কেবলমাত্র সেগুলিকেই হিসাবের মধ্যে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া ছোট ছোট ষ্টুডিও আরও অনেকগুলি আছে, যেখানে
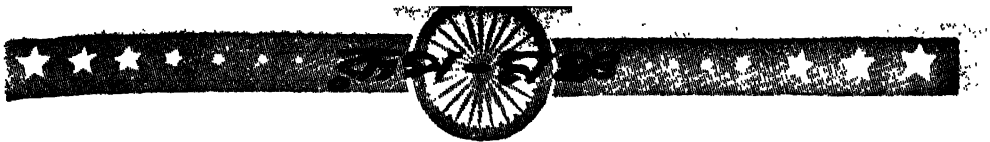
গত কয়েক মাসের মধ্যে বহু সংখ্যক ছোট কাহিনীমূলক ছবি প্রস্তুত হয়েছে। বর্তমানে বৃটেনের ষ্টুডিওগুলিতে বৎসরে অন্ততঃ ১২০টি বড় কাহিনী প্রধান চিত্র প্রস্তুত হতে পারে।

১৯৪৮ সালে নূতন ফিল্ম আইন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা এবং মূলধনের অভাবের জন্য স্বতন্ত্র প্রযোজকরা যথেষ্ট সংখ্যক ছবি প্রস্তুত করতে পারেন নি।

সরকারী সাহায্য

কিন্তু তা সত্বেও ষ্টুডিওর কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান। গত বৎসর মার্চ মাসে বৃটেনের ষ্টুডিওগুলিতে ৭৬১৮ জন লোক কাজ করত; ডিসেম্বর মাসের হিসাব থেকে দেখা যায় যে, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮৬১তে দাঁড়িয়েছে। বৃটেনের ফিল্ম চিত্র যে দিন দিন উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নূতন ফিল্ম আইন চালু হওয়ার ফলে বৃটেনের ফিল্ম শিল্প সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হবে। এ ছাড়া বোর্ড অব ট্রেড একটি ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনে গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে মূলধনের জন্য ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৬৬২৫০০০০ টাকা ঋণ প্রার্থনা করা হবে।

ইতিমধ্যে ফিল্ম ফাইনান্স কোম্পানী নামক প্রতিষ্ঠান অন্তর্বর্তীকালের জন্য কাজ সুরু করে দিয়েছে।

বোর্ড অব ট্রেড কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ সমিতি রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণাধীন ফিল্ম ষ্টুডিও স্থাপনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানাদির কাজ শেষ করে বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি মিঃ হ্যারল্ড উইলসনের কাছে একটা বিবরণী দাখিল করেছেন। বিবরণীটি শীঘ্রই হোয়াইট পেপার রূপে প্রকাশিত হবে।

১৯৪৮ সালে জে, আর্থার র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ষ্টুডিওগুলিতে ১৭টি বড় কাহিনী প্রধান চিত্র এবং ৫টি ছোট কাহিনী-মূলক চিত্র প্রস্তুত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে এই প্রতিষ্ঠান ৩টি চিত্র নির্মাণ করেছিল। ১৯৪৮ সালে প্রস্তুত ছবিগুলির মধ্যে 'হ্যামলেট' 'অলিভার টুইষ্ট' 'দি রেড সুজ' প্রভৃতি কয়েকটা ছবি আন্তর্জাতিক সুখ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। 'ক্রিষ্টোফার কলম্বাস, স্কট অব অ্যান্টার্কটিক' প্রভৃতি ছবিও বিশেষ সমাদর লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

আলেকজাণ্ডার কর্ডার তত্ত্বাবধানে লণ্ডন ফিল্ম ষ্টুডিওতে গত বৎসরে ৮ খানি ছবি নির্মিত হয়েছে; তন্মধ্যে 'দি ফলন আইডল', ও 'দি উইনস্লো বয়' নামক দুটী ছবি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কর্ডা প্রতিষ্ঠানে এ বৎসর আরও অধিক সংখ্যক ছবি প্রস্তুত হবে।

এ ছাড়া 'কনসোলেশন ফিল্ম' 'হারবার্ট উইলকক্স প্রডাকসনস্' 'পিলগ্রিম পিকচাস,' 'জন ষ্টাফোর্ড প্রোডাকসনস্' প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিও গত বৎসরের অনেকগুলি ছবি প্রস্তুত করেছেন এবং সকলেই চিত্র নির্মাণের হার এ বৎসরে অনেক বাড়াতে পারবেন বলে আশা করেন।

উপরোক্ত তথ্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৃটেনে বিদেশী চিত্রের অবাধ আমদানী বন্ধ করার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার ফলে বৃটিশ ফিল্ম শিল্পের প্রভূত উন্নতি হবে। স্বদেশে এবং বিদেশে বৃটিশ ছবির অনুরাগী দর্শকরা এতে বিশেষ আনন্দ অনুভব করবেন। প্রথম শ্রেণীর চিত্র উৎপাদন বৃদ্ধির পথে এখন কোন বাধাই নেই, গভর্ণমেন্ট অর্থ ও আইনগত সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন, ষ্টুডিওতেও স্থানাভাব নেই এবং প্রতিভাবান ও কুশলী প্রযোজক ও পরিচালক ও শিল্পীও যথেষ্ট সংখ্যক আছেন।

১৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রঞ্জনকে সহ্য করিতে পারিল না। রঞ্জনকে-ও সে মারিল। নন্দিনী খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল—রঞ্জনের মৃত দেহের উপর ঝাপাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল—"জাগো রঞ্জন, আমি এসেছি, তোমার সাথী।" রাজাকে অনুনয় করিতে লাগিল, "রাজা, রঞ্জনকে জাগিয়ে দাও।" তারপর মৃত রঞ্জনের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল—"বীর আমার, নীলকণ্ঠ পাখীর পালক এই পরিয়ে দিলুম তোমার চূড়ায়। তোমার জয়যাত্রা আজ হ'তে সুরু হ'ল—সে যাত্রার বাহন হবো আমি।" রাজাকে নন্দিনী বলিল—"রাজা আজ থেকে তোমার সাথে আমার লড়াই।"

রঞ্জনের প্রতি নন্দিনীর প্রেমের এই অপূর্ব অভিব্যক্তিতে রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেল—সে ভাবিতে লাগিল, বিরাট শক্তি দিয়া যে নন্দিনীকে সে পায় নাই—কী দিয়া এই রঞ্জন এমন করিয়া তাহাকে জয় করিয়াছে।

রাজা মুহূর্তে নন্দিনীর হাত ধরিয়া বলিল—"চল আমার সংগে—আজ আমাকে তোমার সাথী করো নন্দিনী।" নন্দিনী বুঝিতে পারে না—শুধায়—"কোথায় যাবো?" রাজা উত্তর দেয়—"আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে—কিন্তু আমার হাতে হাত রেখে। এই আমার ধ্বজা; আমি ভেংগে ফেলি এর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেল ওর কেতন। আমারই হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, সম্পূর্ণ মারুক—তাতেই আমার মুক্তি"

এমনি করিয়া প্রতাপের প্রতীক রাজা প্রেমের কাছে ধরা দিল—প্রেমের কাছে প্রতাপ পরাজয় স্বীকার করিল।

এবিশ্বে পুরুষ শক্তি যদি প্রেমের স্পর্শে ধন্য না হয়—তবে সে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইতে বাধ্য। পুরুষ শক্তির উপাসক। তাহার এই শক্তির গর্ব, এই শক্তির অভিমান তাহাকে নিষ্ঠুর হৃদয়হীন করিয়া তোলে। আকাঙ্খিত বস্তু সংগ্রহের তীব্র নেশায় সে এমন মত্ত হইয়া যায় যে, সে তাহার আত্মার ক্রন্দন শুনিতে পায় না—দিনের পর দিন বিফল বিলাপ করিয়া আত্মা যায় শুকাইয়া—যৌবন যায় মরিয়া। ইহারই প্রতিক্রিয়ায় পুরুষ ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে এবং নিজের উপরই অত্যাচার করিতে থাকে।

নারী প্রেমের প্রতীক। তাহার প্রেমের স্পর্শে পুরুষ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে—মহীয়ান হইয়া উঠে। প্রেমের স্পর্শেই পুরুষের হৃদয় বিশ্বের হৃদয়ের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করে—বিশ্বের অন্তরের ব্যথা-আনন্দে শিহরণ অনুভব করে।

'রক্ত করবী'র আলেখ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, যে সভ্যতা বড় হইতে চাহে, তাহাকে প্রাণের স্পর্শে, প্রেমের স্পর্শে ধন্য হইতে হইবে—হৃদয়হীন সভ্যতা ধ্বংসের পথে লইয়া চলে—জীবনের পথে নহে।

সম্পাদকের দপ্তর
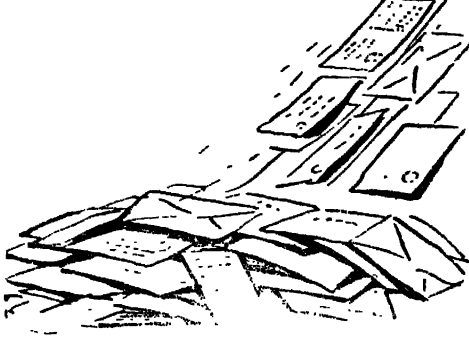
বাংলা চিত্রজগতের অন্যতমা বিদুষী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী বনানী চৌধুরীর জীবনী প্রকাশের জন্য তাঁর অসংখ্য গুণগ্রাহী তথা রূপ-মঞ্চ পাঠক পাঠিকাদের বারবার নানান অনুরোধ আসে। এবিষয়ে শ্রীপার্থিবের দপ্তর ও সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে তাঁকে পত্র লিখে—তাঁর সম্মতি জানতে চাওয়া হ'য়েছিল। শ্রীমতী বনানী তাঁর উত্তরে আমার কাছে যে পত্র লিখেছেন, সম্পাদকীয় দপ্তরে সেই পত্রখানি রূপ-মঞ্চের পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত শ্রীমতী বনানীর বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষা ও রুচির সংগে রূপ-মঞ্চের পাঠকসাধারণ পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন—শ্রীমতী বনানীর বর্তমান চিঠিখানি তাঁর প্রতি আমার মত পাঠক সাধারণের মনেও যে আরো উচ্চ ধারণা রেখাপাত করবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। শ্রীমতী বনানী জীবনী প্রকাশে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করে যে কারণের কথা উল্লেখ করেছেন—তার প্রতিই বিশেষ ভাবে পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অথচ ইতিপূর্বে বাংলা চিত্র-জগতের জনৈকা অভিনেত্রী অনিচ্ছা জ্ঞাপন করতে যেয়ে লিখেছিলেন: আমাদের প্রচারের জন্য রয়েছে সিনেমা প্রতিষ্ঠান আর বিজ্ঞাপন লুব্ধ পত্র-পত্রিকাগুলি—" তাঁর অনিচ্ছার কথাই আমাদের কাছে শুধু প্রকাশ করেন নি—তাঁর আত্মম্ভরিতার সীমাহীন আস্ফালনের কথা প্রকাশ করে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর স্বরূপটুকুও তুলে ধরেছে। কোন শিল্পীকে ছোট করবার হীন মনোবৃত্তি রূপ-মঞ্চের নেই বলেই উক্ত শিল্পীর পত্র রূপ মঞ্চে প্রকাশ করিনি এবং করবোও না। শ্রীমতী বনানীর পত্রখানি তাঁকে বড় করে তুলবে বলেই প্রকাশ করলাম। শ্রীমতী বনানী লিখেছেন:

"আপনি যে রূপ-মঞ্চে আমার জীবনী প্রকাশের ইচ্ছা করেছেন, সেজন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কিন্তু বর্তমানে কোন পত্রিকায় আমার জীবনী প্রকাশ হওয়া সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে। আমার ধারণা, কোন মানুষের জীবনী প্রকাশের সত্যিকারের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয়, যখন সে তার আদর্শকে তার জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে এবং যখন অন্য বহু মানুষের মনে সে স্থায়ী ভাবে নিজের স্থান করে নিতে পারে। আমার জীবনী প্রকাশের প্রয়োজন শিল্পী হিসাবে—সাংসারিক মানুষ হিসাবে নয়। সুতরাং শিল্পী হিসাবে সার্থকতা মণ্ডিত হওয়ার পরে আমার জীবনীর কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। সাংসারিক জীবনে আমি হয়ত নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করি এবং ব্যক্তিগত ভাবে অর্থাৎ স্ত্রী হিসাবে, মা হিসাবে, এমন কি মানুষ হিসাবেও হয়ত নিজেকে গৌরবান্বিত বলে মনে করতে পারি;—কিন্তু শিল্পী হিসাবে আমি নিজেকে সেভাবে তো প্রকাশ করতে এখনও পারিনি। যতদিন না আমি নিজেই আমার শিল্প-মনের বহিঃপ্রকাশের রূপে গৌরব বোধ করবো, ততদিন আমার জীবনী প্রকাশ করা নিরর্থক হবে। অবশ্য একথা আমি অনুভব করি যে, আমার চিন্তাধারার সংগে বাইরের জগতের চিন্তাধারার বিনিময় প্রয়োজন এবং সেই জন্যই আমি
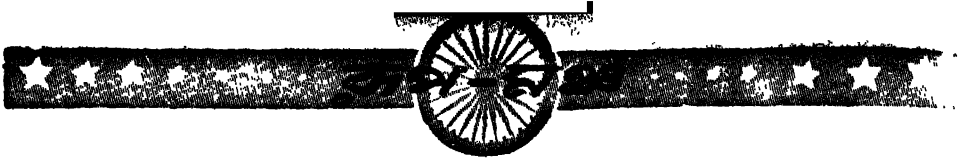
মাঝে মাঝে দু'একটি কৃষ্টিগত প্রবন্ধ রচনা করে থাকি—যার মধ্যে আমার মনের রূপ কথঞ্চিত ধরা পরে। আমার নিজের expectation-এর তুলনায় সে এখনও পর্যন্ত এতই অকিঞ্চিৎকর যে, এখনই জীবনী প্রকাশের তাগিদ আমি নিজে অনুভব করিনি। আমার কথাগুলি আপনাকে যে কষ্ট করবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে। তবুও অনুরোধ, আমাকে যেন ভুল বুঝবেন না। আমার জীবনে এমন কোন সুপ্রভাত যদি আসে, যেদিন দেখবো আমার স্বপ্ন সত্যিই সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলেছে—যেদিন আমার শিল্পজীবন জনসাধারণের আশীর্বাদে ধন্য হবে—সেদিন আমি নিজেই চিঠি লিখে দিন ঠিক করে 'রূপ-মঞ্চ' কার্যালয়ে হানা দেবো। জীবনী প্রকাশ সম্পর্কে আমার সংগে আপনি একমত কিনা সুবিধামত লিখে জানালে খুশী হ'বো। আপনি যদি সত্যই মনে করেন, আমার জীবনী প্রকাশে আমার নিজের বা চিত্রশিল্পের বা শ্রদ্ধেয় দর্শক সাধারণের এতটুকু উপকারের সমম্ভাবনা আছে—তা হলে আমি না করবো না। কেন না, আমি আপনাকে আমার পরম শুভানুধ্যায়ী বলে মনে করি।"

●● উক্ত পত্রের উত্তরে ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং রূপ-মঞ্চ পত্রিকার পক্ষ থেকে জীবনী প্রকাশ সম্পর্কে শ্রীমতী বনানীর অভিমতকে অভিনন্দিত করা হয়েছে এবং তাঁর পত্রখানি রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করা হ'চ্ছে একথাও যেমনি জানিয়েছি, তেমনি লিখেছি, রূপ-মঞ্চের পাঠকসাধারণ এবং আপনার গুণগ্রাহীরা যদি আপনার বর্তমান শিল্পজীবন সম্পর্কে জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন—আপনার কাছে অকিঞ্চিৎ-ক'লেও—সে জীবনী প্রকাশ করবার জন্য আবার অনুমতি চেয়ে পত্র দেবো। আশাকরি, রূপ-মঞ্চ পাঠক সাধারণ এবিষয়ে তাঁদের মতামত যত শীঘ্র সম্ভব সম্পাদকীয় দপ্তরে জানিয়ে দেবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র কুমার মণ্ডল ও বাসন্তীময়ী মণ্ডল (চুঁচুঁড়া)

(২) সমাপিকা দেখলাম। বইটা যে সেই চিরাচরিত একঘেয়েমি থেকে মুক্ত এটা দেখে খুশী হলাম। গানগুলি বেশ ভালই লাগলো। শ্রীপার্থিবে ভাষাতেই বলি, চিত্রজগতের লুকানো বুলবুল সুপ্রভা সরকারে গলা যেন শুনতে পেলাম। আপনি কী বলেন? (৩) আপনার "আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি" পড়ছি। খুব ভাল লাগছে। আবার এক এক সময়ে আপনার ওপর রাগও হচ্ছে। তার কারণ, সবটা এক সংগে পড়তে না পারার জন্য। একটু পড়ে আবার এক মাস বসে থাকতে হ'চ্ছে। 'আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি'র জন্য আমাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

●● (১) আপনাদের প্রথম প্রশ্নটি জগমোহন ও জগন্নাথ মিত্রকে নিয়ে। দিল্লীর শোভনা ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য অনেক দিন পূর্বে আমি লিখেছিলাম, এঁরা একই ব্যক্তি কিনা বলতে পারি না। তখন মাত্র অভিনেতা জগমোহনকেই আমি জানতাম। কিন্তু পরে শ্রীযুক্ত জগন্নাথ মিত্রই ব্যক্তিগত ভাবে আমার এ ভুল সংশোধন করে দেন এবং রূপ-মঞ্চের পরবর্তী সংখ্যায় তা উল্লেখ করা হয়। আপনারা হয়ত তা লক্ষ্য করেন নি। (২) সমাপিকা
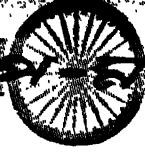
আপনাদের ভাল লেগেছে শুনে খুশী হলাম। আমার মনে হয়, ইংরাজী ১৯৪৯ সাল থেকে আমরা এই ধরণের ছবিই বেশী পাব। সমাপিকার গান শ্রীপার্থিবের বুলবুল গান নি—গেয়েছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। (৩) 'আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি' আপনাদের ভাল লেগেছে জেনে খুশী হলাম। আপনারা আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আমার বর্তমান উপন্যাসটিকে পুস্তকাকারে হয়ত প্রকাশ করতে পারতাম, কিন্তু আমার ইচ্ছা, আমার যা কিছু সৃষ্টি, তার সংগে রূপ-মঞ্চের পাঠকসাধারণেরই প্রথম পরিচয় হউক। আপনাদের আমি চিনি, জানি—আপনাদের সকলের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমার সাহিত্য জীবনের সমস্ত ভুল সংশোধিত হ'য়ে উঠুক! আশা করি, এজন্য আমার ওপর রাগ হ'লেও, ধৈর্য ধরে থাকবেন।

রেবতী বসু (লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজ, কলিকাতা)

আমি রূপ-মঞ্চ পাঠকগোষ্ঠীরই একজন। রীতিমত রূপ-মঞ্চ পড়ে এইটুকু জ্ঞান হ'য়েছে যে, পক্ষপাতিত্ব শূন্য সমালোচনা প্রকাশ করে রূপ মঞ্চ শুধু আমাদেরই উপকার করে না—প্রযোজক, পরিচালক প্রভৃতিদেরও ভুল সংশোধনে সাহায্য করে। কিন্তু পৌষালী সংখ্যা পড়ে মনে হয়, আমার এই অনুমান সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের অবদান গান্ধীজি আমি দেখেছি। এটিকে নৃত্য-নাট্য বললে ভুল বলা হয়। অবশ্য প্রচার করা হ'য়েছিল নৃত্য-নাট্য বলে কিন্তু দেখলাম, এতে নৃত্যের চেয়ে অভিনয়ের অংশই বেশী। মণিদীপা গান্ধীজির সমালোচনা করতে গিয়ে এর ভিতরের নৃত্য এবং আংশিক কতগুলির আলোচনা করেছেন। অভিনয়াংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে গেছেন। আপনি গান্ধীজির অভিনয় দেখেছেন কিনা জানিনা—যদি দেখে থাকেন,তাহ'লে আমার মতের সংগে আপনিও নিশ্চয়ই বলবেন যে, এটা একাবারে বটতলার যাত্রা হ'য়েছে। তবে হাঁ, মণিদীপাকে সমর্থন করে আমিও বলছি, নৃত্যগুলি খুবই সুন্দর হ'য়েছে। একটী পুরুষ শিল্পীর নৃত্য আমাদের খুব ভাল করেছে। মণিদীপাকে ধন্যবাদ যে, তিনি বুঝেছেন কোন নাচটা সবচেয়ে ভাল হ'য়েছে এবং 'গান্ধীজি'কে সুন্দর করে তুলেছে। জালিওয়ানাবাগের দৃশ্যে সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের নৃত্য সত্যই আকর্ষণীয়। শুধু এটাই নয়। করুণরসে পরিপূর্ণ এই নৃত্যটির পর সবিতা দেবী এবং আর দু'জন ছেলে যারা "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" নৃত্যটি নেচেছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। একটী পুরুষ শিল্পী এবং সবিতা দেবী যদি না থাকতেন, তাহ'লে পরিচালক সুকৃতি সেন এবং প্রযোজক সরাবী মিত্র ব্যর্থ হ'তেন। আচ্ছা গান্ধীজির আলোচনা পূর্ণভাবে করা হয়নি কেন? আর শ্রীপার্থিবকে কেন সমালোচনা করতে দেননি? এরূপর সমালোচনার দায়িত্ব শ্রীপার্থিবের হাতেই ছেড়ে দেবেন আশা করি। (২) এবার রেণুকা রায়ের ছবিটা ভারী সুন্দর হ'য়েছে। সত্যকথা বলতে কী, পৌষালী-সংখ্যা হ'য়েছে অপূর্ব। মাঝে মাঝে আপনাদের ওপর রাগ হ'লেও, এই সব কারণে শেষ পর্যন্ত রাগ আর থাকে না।

●● (১) গান্ধীজি সম্পর্কে আপনার অভিমত প্রকাশ করলাম। রূপ-মঞ্চের সমালোচনায় যদি বিন্দুমাত্র ত্রুটি থাকে, তা সংশোধন করবার জন্য রয়েছেন আপনারা—রূপ-মঞ্চের পাঠকসমাজ। রূপ মঞ্চের সমালোচনা বিভাগে একাধিকজন রয়েছেন। সকলের দৃষ্টিভংগী এক নয়—তবে তাঁদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ জাগবার কোন কারণ নেই। ভুল যদি হয়, তা' তাঁদের দৃষ্টিভংগীর। তবে সমালোচনা সম্পর্কে রূপ-মঞ্চের যে বিশেষ নীতি আছে, তা প্রত্যেককেই মেনে নিতে হয়। যেমন মনে করুন: (১) কোন পরিচালক এমন কোন নতুন অথবা প্রয়োজনীয় বিষয় তাঁর চিত্রে অবতারণা করেছেন যা, ইতিপূর্বে অন্য কোন পরিচালক করেননি উক্ত পরিচালক যদি ব্যর্থও হন—তবু তাঁর প্রচেষ্টাকে রূপ-মঞ্চ অভিনন্দন জানাবে। তিনি যদি কৃতকার্যতা অর্জন করেন, তাহ'লে রূপ-মঞ্চ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে অন্যান্যদের ওরূপ ধরণের চিত্র
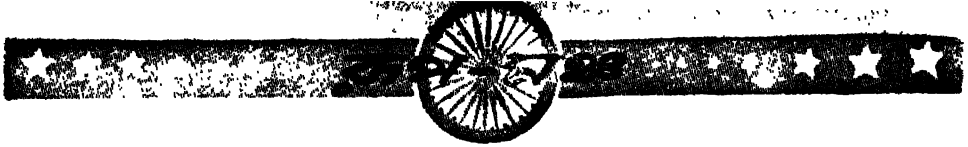
নির্মাণে উৎসাহ দিতে। যখন ওরূপ আদর্শ নিয়ে একাধিক চিত্র দেখা যাবে, তখন উচ্ছ্বাস থাকবে না—থাকবে সত্যকার সমালোচনা। (২) কোন নতুন অভিনেতা বা অভিনেত্রী প্রথম প্রকাশে যদি ব্যর্থও হন—তাঁর ব্যর্থতাকে নির্মমভাবে আঘাত দেওয়া হবে না। বরং শুধরে নেবার পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করে তোলা হবে। (৩) ঠিক এমনি ভাবে প্রতিষ্ঠিত পরিচালক—কাহিনীকার—সংগীতজ্ঞ-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সমালোচনা যতখানি নির্মমভাবে করা হয়—যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি—অথচ সম্ভাবনা রয়েছে, তাঁদের সমালোচনা খুব নরম সুরে করা হয়। (-) আবার যখন দেখা যায়, শুধু অর্থ ও ক্ষমতা বলে কেউ কাহিনীকার পরিচালক বা ঐ ধরণের কিছু সেজে বসেছেন, অথচ তাং ভিতর প্রতিভার লেশ মাত্র নেই—তিনি যতক্ষণ না বিদায় নেবেন, ততক্ষণ অবধি তার বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা করে যাওয়া হবে। চিত্র ও নাটকের সমালোচনায় যতখানি নির্মম হওয়া উচিত, অভ্যুদয়—গান্ধীজি, ডিসকভারী অফ ইণ্ডিয়া—নবান্ন বা এই ধরণের উদ্দেশ্যমূলক অনুষ্ঠানগুলি ততটা নির্মমভাবে সমালোচিত হওয়া উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। কারণ, এই ধরণের অনুষ্ঠানের মূলে উদ্যোক্তাদের যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার রয়েছে—
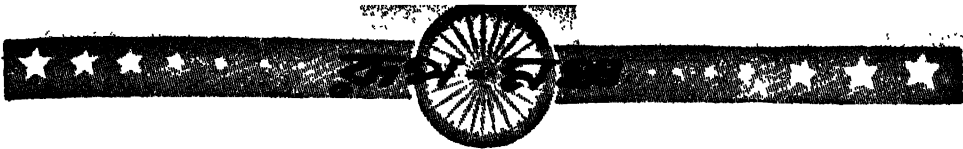
ব্যক্তিগতভাবে যাঁরাই এঁদের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরাই তা স্বীকার করবেন। যতক্ষণ না এঁরা সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে নিখুঁত অনুষ্ঠান উপহার দেবার সুযোগ পাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁদের উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলবার জন্য আপনাদের ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। গান্ধীজির সমালোচনাও এই দৃষ্টিভংগী থেকে বিচার করেই মণিদীপাকে করতে বলা হ'য়েছিল। আমি যদিও গান্ধীজি দেখিনি—তবু রূপ-মঞ্চের অন্যান্য কর্মী যাঁরা গান্ধীজি দেখেছেন, তাঁরা মণিদীপা থেকে ভিন্ন মত ব্যক্ত করেননি। আমি মূল নাটকটি পড়েছি—নাটকটিও আমায় অখুশী করেনি। মণিদীপাকে আপনার চিঠিটি দেখানো হ'য়েছিল—তিনি বল্লেন, নৃত্যনাট্যের তুলনায় গান্ধীজিতে নৃত্যের পরিমাণ কমই। কিন্তু বর্তমান নাটকটিতে এছাড়া উপায় ছিল না; কারণ, গান্ধীজি বা অনুরূপ কোন চরিত্রের বিকাশ নৃত্যের ভিতর দিয়ে যদি দেখানো হ'তো—তাহ'লে আরো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবারই সম্ভাবনা ছিল এবং তাতে চরিত্রের মর্যাদাহানি ঘটতো। (২) রেণুকা রায়ের ছবি এবং সমগ্রভাবে পৌষালী সংখ্যা আপনাদের খুশী করতে পেরেছে জেনে খুশী হলাম। রূপ-মঞ্চকে নিয়মাধীনে আনতে পাচ্ছি না—আমাদের অক্ষমতার জন্য আপনাদের অসন্তুষ্টি—রূপ-মঞ্চের নিজস্ব ছাপাখানা না হওয়া অবধি দূর করতে পারবো না।

শ্রীরাধারমণ দত্ত (নিউ দিল্লী, রেশনিং অফিস)

●● পড়া শুনা শেষ করবার পূর্বে অভিনয়-জগতে প্রবেশ করবার চিন্তা আপনার না করাই ভাল।

সৈয়দ মাকদুম হায়দার (মীর্জাবাজার, মেদিনীপুর)

(১) শ্রীমতী চন্দ্রা ভাল অভিনয় করেন, না শ্রীমতী দীপ্তি রায় ? (২) শ্যামলাহার আর একটী নাম কী হয় ?

●● (১) শ্রীমতী দীপ্তির অভিনয় ক্ষমতা শ্রীমতী চন্দ্রার চেয়ে অনেক বেশী। (২) হ্যাঁ।

অনাথ নাথ দে (ভৈরব প্রেস, বাঁকুড়া)

●● শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া চিত্রজগত থেকে বিদায় নিয়েছেন কী না গত পৌষালী সংখ্যায়ই তাঁর উত্তর পেয়েছেন।

দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (রায়গঞ্জ, দিনাজপুর)

●● (১) সন্তোষ সেনগুপ্ত আর জগন্ময় মিত্রের ভিতর—প্রথমোক্তজনই আমার প্রিয় সংগীতশিল্পী—যদিও বন্ধুত্ব শেষোক্তজনের সংগে। (২) প্রেমেন্দ্র মিত্র পরিচালিত কুয়াসা চিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেখতে পাবেন।

প্রণতি নাহা (আর্য পল্লী, গৌহাটি, আসাম)

আজকাল চিত্র এবং নাট্যজগতে মহিলাদের মধ্যে কে কে ভাল গান করেন ?

●● চিত্রজগতে সুপ্রভা সরকার ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় বর্তমানে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্র সংগীতে সুচিত্রা মিত্র সকলের ওপর টেক্কা দিচ্ছেন। নাট্য-জগতে মিনার্ভা মঞ্চে সীতা দেবী—আধুনিককালে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছেন।

মাধুরী, উমা, মীণা ও বীণা চন্দ্র (শিবঠাকুর লেন, কলিকাতা)

●● কার্তিক সংখ্যা রূপ-মঞ্চে প্রকাশিত সুনন্দা দেবীর চিত্রখানি 'অঞ্জনগড়ের'ই। এবিষয়ে কোন ভুল হয়নি। শ্রীমতী সুনন্দা টোঙ্গায় চড়ে রাজপ্রাসাদে যখন গিয়েছিলেন, উক্ত ছবিটি তখনকার দৃশ্য থেকে গৃহীত। তবে ঐ অংশটুকু ছবিতে নেই। কারণ ওটি স্থির-চিত্র। এই চিত্রগুলি প্রচারের জন্য পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয়।

দীপ্তি চট্টোপাধ্যায় (হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ)

শ্রীমতী দীপ্তি রায়কে আগামী কোন চিত্রে দেখা যাবে ?

●● নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত 'নিরুদ্দেশ' চিত্রে। 'নিরুদ্দেশ'-এর চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সুরু হ'য়েছে। এই চিত্রে অসিতবরণ, রবীন মজুমদার ও সন্ধ্যারাণীকেও দেখতে পাবেন।

জগদীশ মোদক (কাঁচরাপাড়া)

●● যাঁদের ঠিকানা চেয়েছেন, দিতে পারলুম না বলে দুঃখিত।

বিনয় মুখোপাধ্যায় (নিত্যধন মুখুজ্জে রোড, হাওড়া)

বাঁকা লেখার অনুপকুমার কী মঞ্চাভিনেতা ও গায়ক ধীরেন দাসের পুত্র ?

●● হ্যাঁ।

অমল মোদক (পঞ্চাননতলা, নৈহাটী)

●● উত্তর দেবার মত প্রশ্ন করেন না বলেই উত্তর দেওয়া হয়না। আপনি যে ধরণের প্রশ্ন করেন, সেগুলির উত্তর দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

অপূর্ব চক্রবর্তী (কাইজার ষ্ট্রিট, ই, আই, আর কলোনী)

●● যে কোন দিন (ছুটির দিন বাদে) ১০-১১ টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে পারেন।

মহাদেব প্রসাদ পাল (বেহালা, প্রাক্তন ছাত্র আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ)

সম্প্রতি অগ্রদূত পরিচালিত 'সমাপিকা' চিত্রটি দেখিয়াছি। সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করিলে চিত্রটির বহু দোষ ত্রুটির সন্ধান মিলিবে। এইরূপ সমালোচনা হইতে বিরত থাকিয়া আমি কেবল মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। চিত্রের নায়ক একজন ডাক্তার—যিনি Master in Surgery ডিগ্রীর অধিকারী এবং এই বিশেষ চরিত্রটিতে যিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমাদের টালীগঞ্জের সিরিও কমিক চরিত্রাভিনেতা রূপে সুপরিচিত। অবশ্য ইহাতেও আমার আপত্তি ছিলনা, যদি তিনি serious type এর অভিনয়েও সমান নৈপুণ্য দেখাইতে পারিতেন। M. S. ডিগ্রীধারী ডাক্তারের প্রশ্ন না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। কোন বিবেকশক্তিসম্পন্ন ডাক্তারই গুরুতর অস্ত্রোপচারের সময় নার্সের সংগে রসালাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য চিত্রে দেখানো হইয়াছে, একজন M. S. ডাক্তার Delivery Case এর Operation-এর সময় চিত্রের নায়িকার সংগে হাস্যোদ্দীপক অবাস্তব আলোচনা লইয়া emergency operation এ অনর্থক বিলম্ব ঘটাইয়াছেন। পরিচালক মহাশয় যদি কষ্ট করিয়া একটীবার কোন হাস

পাতালের operation-room এর নিয়মানুবর্তীতা লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার কৃতকর্মের জন্য নিশ্চয়ই লজ্জিত হইবেন। অন্ততঃ হওয়া উচিত। তারপর আরও দৃশ্যকটু মনে হইল যখন, এই আদর্শবান ডাক্তার গুরুতর রূপে মস্তিষ্কে আঘাতপ্রাপ্ত রোগীকে সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া নির্বিকারভাবে নায়িকাকে প্রশ্ন করিল, তুমি ইহাকে ভাল বাস? অস্ত্রোপচারের কয়েক সেকেণ্ড বিলম্বে যে রোগীর রক্তপাত হেতু মৃত্যু হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহাকে লইয়া একজন আদর্শবান ডাক্তারের ইহা কোন স্তরের পরিহাস? ইহাতে হয়ত Dramatic climax সাধিত হইয়াছে কিন্তু পরিচালকের জানা উচিত যে, অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকেরা কখনও ভাবপ্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হইতে পারেন না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ইনজেকসনের সূঁচ ফোটানোর সময়ে 'উঃ' শব্দেই ডাক্তার সমবেদনায় সূঁচ বাহির করিয়া লইতেন। পরিশেষে পরিচালক মহাশয়কেও একটু অনুরোধ করি, তিনি একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন কি যে, কয়জন মহাপুরুষের ভাগ্যে আজ পর্যন্ত এই দুর্লভ M. S. ডিগ্রীলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে সংবাদও তিনি রাখেন না। রাখিলে অন্ততঃ তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তিনি এই বিশেষ চরিত্রটির রূপদানে সচেতন হইতেন।

●● আপনার অভিযোগের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং এবিষয়ে 'সমাপিকা'র সমালোচনায় রূপ-মঞ্চের অভিমত জানতে পারবেন।

দিলীপ দাস (বেনিয়া পুকুর রোড, ইটালী)

ইদানীং দেখা যায়, শহরের যে কোন প্রেক্ষাগৃহে যে কোন চিত্র মুক্তি লাভ করুক না কেন, ভিড় নেহাৎ কম হয় না। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রেক্ষাগৃহে দেখা যায়, চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীতে দর্শকদের স্থানে এমন কতকগুলি জীব বসিয়া আছে, যাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহারা প্রেক্ষাগৃহের বাহিরে ও ভিতরে হট্টগোল, অশ্লীল গল্প ও নানা-প্রকার উক্তি করিয়া থাকে, শিক্ষনীয় কিছুই গ্রহণ করে না। বরঞ্চ অশিক্ষনীয় কিছু থাকিলে তাহাই আগে গ্রহণ করিয়া থাকে এবং প্রেক্ষাগৃহের ভিতরে ছবি দেখান সুরু হইলে নিজেদের মধ্যে এরূপ গল্প করিতে থাকে যে, পার্শ্ববর্তী লোকেদের রসগ্রহণে খুবই অসুবিধা হইয়া পড়ে। এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সেন্সারবোর্ড ও সরকার চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি এতই উদাসীন যে, ইহার উন্নতির দিকেও তাহাদের লক্ষ্য নাই। নানান অশ্লীল চিত্র প্রদর্শিত হইয়া সমাজের বিশেষ করিয়া শিশুদের যে কী ক্ষতি করিতেছে—সে বিষয়েও কোন প্রকার চেতনা নাই। নইলে নারীর রূপ (বাংলা), জুগনু (হিন্দি), খিড়কী (হিন্দি) প্রভৃতি অশ্লীল চিত্রগুলি প্রদর্শনের অনুমতি দেন? কলেজ জীবনের পটভূমিকায় জুগনু চিত্রখানি নির্মিত বলিয়া প্রচারিত, কিন্তু ইহাতে গণিকাবৃত্তির রূপটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বোম্বাই সরকার চিত্রখানির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন অথচ আমাদের বাংলা সরকারকে কলা দেখাইয়া চিত্রখানি সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রদর্শিত হইল। আশা করি বাংলা সরকার এবিষয়ে অবহিত হইবেন এবং এরূপ চিত্রের প্রদর্শন ভবিষ্যতে নিষিদ্ধ করিবেনই। অধিকন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নির্মিত চিত্রগুলি আইনের দ্বারা শিশুদেরও জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দেবেন।

●● প্রেক্ষাগৃহে যে সব দর্শক এমনি গর্হিত আচরণের পরিচয় দিয়ে থাকেন—তা সমগ্রভাবে আমাদের দর্শক সমাজেরই লজ্জার কথা। আশা করি প্রতিজন রুচিবান দর্শক এবিষয়ে অবহিত হ'য়ে উঠবেন। আমি বিশেষ করে ছাত্র-দর্শকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি—যাঁরা যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকলের আগে সাড়া দিয়ে ওঠেন। তাঁরা আটজন-দশজন করে একত্রে তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর টিকেট কেটে ছবি দেখতে যাবেন এবং যখনই কোন দর্শক এরূপ কোন গর্হিত ও রুচিবিগর্হিত আচরণ করবেন, তখনই দৃঢ় প্রতিবাদ জানাবেন। যদি তাতেও উক্ত দর্শকের চেতনা না হয়, তবে সরাসরি তাকে প্রেক্ষাগৃহের বাইরে বের করে দেবেন। এবং এবিষয়ে প্রেক্ষাগৃহের
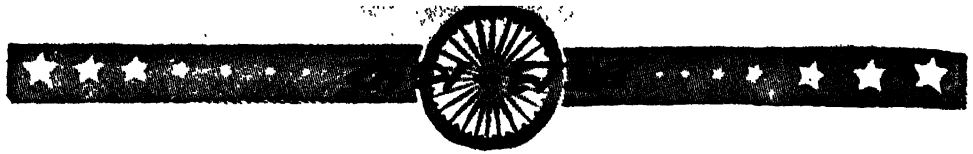
মালিক ও প্রয়োজন বোধে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতাও কামনা কচ্ছি। প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহে যেসব দর্শক এরূপ গর্হিত আচরণ করেন—তারা যে বিশেষ এক শ্রেণীর জীব—অর্থাৎ ভদ্রনামের অযোগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবু বলবো, তারা মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টিমেয়কে সংশোধন করতে যদি সংখ্যাধীকা সমর্থ না হন, তবে সংখ্যাধীক্যের লজ্জিত হওয়া উচিত। আশা করি প্রতিজন দর্শক এ বিষয়ে যত্নপর হ'য়ে উঠবেন। সরকারের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কেও আপনি যে অভিযোগ এনেছেন—তাও আমি অস্বীকার করবো না। স্বাধীন হ'লেও বৃটিশ আমলের মতই বর্তমান সেন্সার বোর্ড অযোগ্যদের নিয়ে গঠিত—চিত্রশিল্প সংক্রান্ত কোন বিষয়েই যাঁদের কোন অভিজ্ঞতা—শিক্ষা ও চিন্তা নেই। এবিষয়ে কিছুদিন পূর্বেও যেমনি কঠোর সমালোচনায় বাংলা সরকারকে অবহিত হ'য়ে উঠতে আমরা চেষ্টা করেছি—ভবিষ্যতেও তার ত্রুটি হবে না।

সুরূপা চন্দ্র (গোযাবাগান লেন, কলিকাতা)

●● আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর গত পৌষালী সংখ্যায় পুষ্পলেখা মিত্রের প্রশ্নোত্তরেই পেয়েছেন আশা করি। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে, সংসার চিত্রে নায়কের ভূমিকায় প্রমোদ গঙ্গোপাধ্যায়ই অভিনয় করেছেন। ভুলক্রমে ইতিপূর্বে রবীন মজুমদারের নামোল্লেখ করা হ'য়েছিল—ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন।

অনিতা সরকার (মীরবাজার, মেদিনীপুর)

●● আপনারা 'রুদ্রবীণা' নামে একটী হাতে লেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের করছেন জেনে খুব খুশী হলাম। সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুদ্রদেবতার নির্মম অভিযানের আদর্শেই আপনাদের রুদ্রবীণার সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠুক। শুধু আমার ব্যক্তিগতই নয়—রূপ-মঞ্চের সমস্ত পাঠক সমাজের শুভেচ্ছাও রইল আপনাদের উদ্দেশ্যে।

সরোজ কুমার রায় (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

কিছুদিন পূর্বে কোনও একজন অভিনেত্রীর লেখায় দেখেছিলাম তিনি : "কিছুদিন আগেও একমাত্র চিত্র সম্বন্ধীয় পত্রিকার" নিরপেক্ষ সমালোচনায় সন্দিহান। হয়ত তিনি সমালোচনায় দুঃখ পেয়েছেন। তাই আজকালকার নতুন সহযোগিদের কাছে নিজের দুঃখ বর্ণনা করেছেন। তাঁকে এবং অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের অন্য পত্রিকার সহিত রূপ-মঞ্চকে যাঁচাই করে নিতে অনুরোধ কচ্ছি।

●● আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। নিরপেক্ষ সমালোচনা করতে যেয়ে রূপ-মঞ্চকে অনেক সময়ই অনেকের বিরাগভাজন হ'তে হয়। এতে আমরা বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নই। কারণ, এঁরা ছাড়া অনেকেই আছেন—যাঁরা রূপ মঞ্চের পাতায় নানানভাবে সমালোচিত হ'য়েও রূপ-মঞ্চকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা করেন। যাঁরা করেন না—যতদিন না তাঁদের ভুল ভাঙ্গাতে পারবো, ততদিন অবধি অনুরূপ উক্তি তাঁরা করবেনই। সত্যই যদি রূপ-মঞ্চ তার ধর্ম রক্ষা করে চলে—তবে এঁদেরও একদিন জয় করতে পারবো। কিন্তু দুঃখ হয় তখনই, যখন কোন সহযোগী রূপ-মঞ্চের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। রূপ-মঞ্চের নানান দুর্বলতা আছে জানি—কিন্তু বাংলা থেকে প্রকাশিত মঞ্চ ও পর্দা সংক্রান্ত যে কোন পত্র পত্রিকার তুলনায় রূপ-মঞ্চের দুর্বলতা যে অনুল্লেখযোগ্য, যে কোন নিরপেক্ষ বিচারকই তা স্বীকার করবেন। তবু তাঁরা সুযোগ পেলেই টিপ্পনি কাটেন—এতে তাঁদের ঈর্ষা ও নীচতারই পরিচয় ফুটে ওঠে। রূপ-মঞ্চের সমালোচনা না করে নিজেদের সুষ্ঠু রূপারোপে যদি তাঁরা যত্ন নেন—তাহ'লে জনসাধারণইত তাঁদের গলায় জয়মাল্য দেবেন। যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে মঞ্চ ও পর্দা সংক্রান্ত পত্রপত্রিকাগুলিকে চলতে হয়, সে পরিবেশের উন্নতির ওপরই পত্রপত্রিকার উন্নতি নির্ভর করে। বৈদেশিক পত্রিকা অথবা বম্বে থেকে প্রকাশিত 'ফিল্ম ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সংগে বাংলাদেশের পত্রপত্রিকার যাঁরা তুলনা করতে যেয়ে নাসিকা কুঞ্চন করেন, এদেশীয় চিত্রজগতের পরিবেশ সম্পর্কে তাঁদের আগে ওয়াকিফহাল হওয়া উচিত। তবু রূপ-মঞ্চ তার কর্মী সংঘের অপরিসীম নিষ্ঠায়—পাঠকবর্গের ঘনিষ্ঠ-সহযোগিতায় যে 'মান' অধিকার করতে পেরেছে, তা নিতান্ত অগৌরবের নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন যে কোন সাংবাদিক ও সুধী ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন।
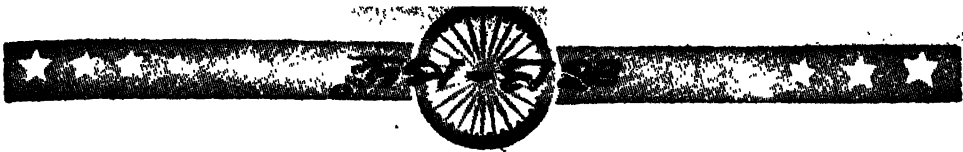
নমিতা মিত্র (সিটি কলেজ, কলা বিভাগ)

●● গত সংখ্যার স্বীকৃতি অনুযায়ী চলচ্চিত্রের কয়েকজন আবিষ্কারকের পরিচিতি দেওয়া হ'লো।

১। জর্জ ইষ্টম্যান (George Eastman)

১২ই জুলাই, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের ওয়াটার ভাইলে জন্মগ্রহণ করেন। রোল-ফিল্ম-এর আবিষ্কার করে তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের প্রভূত উপকার করেছেন। ১৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করে—ইষ্টম্যান একটী ইনসিওরেন্স প্রতিষ্ঠানে কেরাণীর কাজ গ্রহণ করেন। ২৪ বৎসর বয়সের সময় একবার ছুটি উপভোগ করতে বেড়াতে বেরিয়ে তিনি একটী ক্যামেরা ক্রয় করেন। একজন চিত্রশিল্পীর অনুসন্ধান করে—কী ভাবে ছবি তুলতে হয় এবং ক্যামেরার যান্ত্রিক বিষয় সম্পর্কে খুঁটি-নাটি জেনে নেন। তারপর ছুটির ভ্রমণ বাতিল করে দিলেন। এমনকী কাজটিও ছেড়ে দিলেন। বাড়ীতে বসে চিত্রগ্রহণ থেকে চলচ্চিত্রের গবেষণায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে লাগলেন। এমনি করে পুরো নয়টি বছর কেটে গেল। গভীর সাধনা ও অনুশীলন ক্ষমতার বলে ৯ বছর পর তিনি 'রোল-ফিল্ম' আবিষ্কার করলেন। এই আবিষ্কার থেকে তিনি প্রভূত যশ ও সম্পদের অধিকারী হন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ৭৮ বৎসর বয়সে ইষ্টম্যান পরলোক গমন করেন। কিন্তু বিশ্বের দরবারে আজও তিনি অমর হ'য়ে আছেন।

টমাস এলভা এডিসন (Thomas Alva Edison)

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইউ, এস, এর মালান (ওহিও)-য় জন্মগ্রহণ করেন। ফনোগ্রাফ-যন্ত্র Phonograph) এবং শ্বেতশিখা-বিচ্ছুরিত আলোক যন্ত্র (Incandesecnt lamp) তিনি আবিষ্কার করেন। এগুলি ছাড়া তিনি প্রায় ১৫০০ পেটেন্ট রেজিষ্ট্রি করেন। চলচ্চিত্রের আবিষ্কারক বলে অবশ্য অনেকে এডিসনকে মনে করেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি চলচ্চিত্রের আবিষ্কারক নন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এডিসন কাইনেটোসকোপ (Kinetoscope) নামক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে চলমান চিত্রগ্রহণ এবং প্রদর্শন দুইই সম্ভব হ'তো। কাইনেটোসকোপ যন্ত্র আবিষ্কার করবার বহু পূর্বে এডিসন চলমান-চিত্রগ্রাহী যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবনা স্বত্ব নিয়ে উইলিয়াম ফ্রিজগ্রীণ নামক এক ইংরেজ ভদ্রলোকের সংগে নমুনা-যুদ্ধে (Patent war) লিপ্ত হন এবং তাতে হেরে যান। এডিসন আবিষ্কৃত মূল 'কাইনেটোসকোপ' যন্ত্রটি বর্তমানে লণ্ডনের 'সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে (South Kensington Museum) রক্ষিত আছে। ১৯৩১ খৃঃ-এ এডিসন পরলোক গমন করেন।

উইলিয়াম ফ্রিজ গ্রীণ (William Friese Greene)

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিষ্টলে জন্মগ্রহণ করেন। কার্যকরী চলমান চিত্রগ্রাহী যন্ত্রের আবিষ্কারকের কৃতিত্ব সর্বপ্রথম ফ্রিজগ্রীণেরই প্রাপ্য। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর নমুনা যন্ত্রটী রেজিষ্ট্রী করেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৬শে জুন তারিখে চেষ্টারে বৃটিশ ফটোগ্রাফিক কনভেনশন-এর কাছে সর্বপ্রথম সর্বসাধারণ সমক্ষে ফ্রিজগ্রীণ তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটির পরীক্ষা দেন। এরপর এডিসনের সংগে নমুনা নিয়ে তাঁর এক বিরোধ হয়। সে বিরোধে ইউনাইটেড ষ্টেটস সার্কিট কোর্ট ফ্রিজগ্রীণের পক্ষেই রায় দেন। কারণ, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এডিসন তাঁর কাইনেটোসকোপ যন্ত্রের নমুনা দাখিল করতে পারেন নি। ১৯২১ খৃঃ ফ্রিজগ্রীণের মৃত্যু হয়।

লুই লুমেরী (Louis Lumiere)

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্যারীসে জন্মগ্রহণ করেন। লুই লুমেরীকে চলচ্চিত্র জগতের সর্বপ্রথম পেশাদার প্রদর্শক বলা যেতে পারে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে, ২রা ফেব্রুয়ারী বোলেভার্ড ডি ক্যাপুসাইনস (Boulevard Des Capucines)-এ সর্বপ্রথম তাঁর নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করে অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণের কাছে চলমান-চিত্র প্রদর্শন করেন। লুমেরী এবং তাঁর অন্যতম ভ্রাতা আগাষ্ট (Auguste) এডিসনের কাইনেটোসকোপ যন্ত্রের উদ্ভাবনে উৎসাহিত হ'য়ে—নিজেরাই এক ধরণের চিত্রগ্রাহী ও চিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র তৈরী করেন এবং তা দিয়ে বেশ ব্যবসা সুরু করে দেন। লুই লুমেরীর প্রথম দিককার চিত্রগুলির ভিতর নাম করা

যেতে পারে (১) দি এরাইভ্যাল অফ এ ট্রেন এ্যাট এ কার্নাটি স্টেশন ; (২) ক্যাভালরী হরসেস্ লেড টু বি ওয়াটারড্ ; (৩) ব্রেকফাষ্ট অন দি লন ; (৭) বেদিং ইন দি মেডিটারেনিয়ান ; (৫) দি ফল অফ এ ওয়াল প্রভৃতির।

এডওয়ার্ড মুইব্রীজ (Edward Muybridge)

এঁর আসল নাম হচ্ছে এডওয়ার্ড জেমস্ মুগাবীজ। তারপর এড্‌ইয়ার্ড (Edweard) নামে পরিচিত হন— শেষে এডওয়ার্ড মুইব্রীজই কায়েমী হ'য়ে থেকে যায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে টেমস নদীর তীরবর্তী কিংসটনে জন্মগ্রহণ করেন। চলমান চিত্রের অংকুর প্রথম মুইব্রীজের ভিতরই পরিলক্ষিত হয়, যখন তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়াতে বিভিন্ন ভৌগলিক পরিমাপ-গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। ভৌগলিক বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণামূলক অভিজ্ঞতা থেকে চলমান চিত্রের সম্ভাবনা মুই ব্রীজের চোখে ধরা পড়ে। ষ্টানফোর্ডের গভর্ণর এবং তাঁর অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সহযোগিতায় এবিষয়ে তিনি খানিকটা অগ্রসরও হ'য়েছিলেন। প্রথম তিনি ধাবমান অশ্বের পায়ের গতি চিত্ররূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। এই পরীক্ষার জন্য ষ্টানফোর্ডের গভর্ণর মুইব্রীজকে তাঁর কতকগুলি অশ্ব ও আস্তাবল ছেড়ে দেন। চব্বিশটি ক্যামেরা পর পর সাজিয়ে অশ্বের বিভিন্ন চলমান গতির বিভিন্ন চিত্রগ্রহণ করে তাকে গতিশীল চিত্রে রূপান্তরীত করবার চেষ্টা করা হয়। বস্তুতঃ এই প্রচেষ্টা থেকে পরবর্তী দল চলমানচিত্র গ্রহণের প্রেরণা লাভ করে কৃতকার্যতা অর্জন করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মুইব্রীজ পরলোকগমন করেন।

রবার্ট ডবলিউ পল (Robert W. Paul.)

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। রবার্ট পলকে চলচ্চিত্রগ্রাহী যন্ত্র ও প্রদর্শক যন্ত্রের অগ্রবর্তী-উদ্ভাবকদের অন্যতম বলা যেতে পারে। ১৮৯৫ খৃঃ তিনি চলমান-চিত্র নিয়ে প্রথম গবেষণা করতে শুরু করেন এবং একটী চলমান চিত্রগ্রাহী যন্ত্র আবিষ্কারে সমর্থ হন। পরবর্তী বৎসরে তিনি এক প্রদর্শক যন্ত্র উদ্ভাবন করতে সমর্থ হন। পল তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রটীর নাম রেখেছিলেন "থিওটোগ্রাফ" (Theotograph), লণ্ডনের আলহামব্রা থিয়েটারে প্রায় দুই বৎসর ধরে তিনি কতগুলি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট পল মারা যান।

চার্লস পাথে (Charles Pathe)

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীসে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিখ্যাত 'পাথে ফ্রেরীজ (Pathe Freres) এর প্রতিষ্ঠাতা। দেশীয় মেলা এবং এরূপ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁর ফনোগ্রাফ যন্ত্র নিয়ে মাথা পিছু এক ফ্রাঙ্ক মূল্যের বিনিময়ে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করতেন। এথেকে কিছু অর্থসংগ্রহ করে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত কতগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করেন; ধীরগতি সমন্বিত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাছাড়া সর্বপ্রথম দীর্ঘ চিত্র নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁরই প্রাপ্য। এই চিত্রটির নাম লা' মিজারেবল (Les Miserables)। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'পাথেগেজেট' নির্মাণ করে সর্বপ্রথম সংবাদ চিত্র নির্মাণের গৌরব অর্জন করেন। এই চিত্রটি দৈর্ঘ্যে ৪০০ ফিট ছিল। অবশ্য বর্তমানে একখানি সংবাদ চিত্রের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ১০০০ থেকে ১৫০০ ফিটের মধ্যে থাকে।

ভারতীয় নৃত্য-কলা

নৃত্য-শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস (পরিচালক নৃত্য-ভারতী)

"আঙ্গিকং ভুবনং যস্য বাচিকং সর্ব্ববাঙ্ময়ম্।
আহার্য্যং চন্দ্রতারাদি তং নুমঃ সাত্ত্বিকং শিবম্॥"

"সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁর আংগিক অভিনয়ের প্রতীক, চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্রমণ্ডলী যাঁর অংগের ভূষণ এবং শব্দ মাত্রই যাঁর বাচিক অভিনয়—সেই দেবাদি দেব মহাদেবকে আমরা নমস্কার করি।" (অভিনয় দর্পণ)।

যখন সৃষ্টি হয়নি ভাষার—তখন মানুষ ব্যক্ত করতো মনের ভাব—অংগ ভংগী সহকারে। তখনকার আদিম অধিবাসীরা শিক্ষিত ছিল না—বনে, জংগলে, পাহাড়, পর্বতের গুহায় ছিল তাঁদের বাস। কাঁচা অথবা অর্ধ দগ্ধ মাছ মাংস এবং বনের ফল—ঝরণার জলই ছিল তাঁদের জীবনধারণের উপযোগী খাদ্য। তাঁরা আনন্দে নৃত্য করত—নদী তরংগের উড্ডীয়মান পাখীর পক্ষ সঞ্চালন এবং বন্য জীব-জন্তুর গতি ভংগীর অনুকরণ করে। আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সেই সব নৃত্য-ভংগীর কিছু না কিছু ভাব-ভংগী দেখতে পাওয়া যায় পাহাড়ী অথবা নীচু জাতি—জংলীদের আনন্দ উৎসবে। আবার শাস্ত্রের দিক দেখলে দেখা যায়—অতীত যুগে পিতামহ ব্রহ্মা—শত পুত্রসহ ভরত মুনিকে নাট্য বেদ শিক্ষা দেন এবং তাঁরা গন্ধর্ব, কিন্নর এবং অপ্সরিগণসহ অভিনয় করেন নটরাজের সম্মুখে। নটরাজ শিব তাঁদের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে প্রিয় শিষ্য তণ্ডুকে (নন্দীকেশ্বরের এক নাম তণ্ডু) আদেশ করেন—ভরত মুনিসহ শত পুত্রকে "তাণ্ডব" শিক্ষা দিতে এবং পার্বতীকে লাস্যের শিক্ষা দিতে অনুরোধ করেন। এইভাবে নৃত্য-কলার প্রচার হয় স্বর্গে ও মর্ত্যে। নৃত্য দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য। তাল-লয় যোগে উদ্ধত করণ ও অংগহার সহকারে যে নৃত্য, তাকেই বলে তাণ্ডব নৃত্য। আর লীলায়িত অংগভংগী সহকারে যে নৃত্য—তাকেই বলে লাস্য। কোন কোন গ্রন্থকর্তা নৃত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন—গীত হতে বাদ্যের উৎপত্তি এবং বাদ্য হতে নৃত্যের উৎপত্তি। আবার কেউ কেউ বলেন—তাণ্ডবের "তা" এবং লাস্যের "লা" মিলে হয়েছে "তাল"। যেমন—তকারে শংকর প্রোক্ত, লকারে পার্বতী স্মৃতা। 'শিব শক্তি সমাযোগাত্তাল ইত্য ভিধীয়তে।' এক একজন শাস্ত্রকারের এক এক রকম মত, সুতরাং এর মীমাংসা করা খুবই কঠিন।

নাচ শিখবার আগে জানতে হবে নিজের শরীরকে। শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যাক—উর্ধ্ব, মধ্য ও নিম্ন। কণ্ঠ হতে শির পর্যন্ত উর্ধ্ব, কটি হতে কণ্ঠের নিম্ন পর্যন্ত মধ্য এবং কটি হতে পদ পর্যন্ত নিম্ন। শরীরের এই তিন ভাগকে পৃথকভাবে সঞ্চালন করা, অভ্যাস করতে হবে।

কিন্তু নাট্যশাস্ত্র মতে শরীর চর্চা—"শিরকর্ম" ১৩ প্রকার। যথা—আকম্পিত, কম্পিত, পরিবাহিত, উদ্বাহিত, অধোগত, লোলিত, অবনত, অঞ্চিত, পরাবৃত, উৎক্ষিপ্ত, ধুত, বিধুত, নিহঞ্চিত।

গ্রীবাভেদ ৯ প্রকার। যথা—সমা, নতা, উন্নতা, ত্র্যস্রা, বলিতা, নিবৃত্তা, অঞ্চিতা, কুঞ্চিতা, রেচিতা।

বক্ষভেদ ৫ প্রকার—সম, প্রকম্পিত, উদ্বাহিত, অভুগ্ন, নির্ভুগ্ন।

কটিভংগি ৫ প্রকার—কম্পিত, উদ্বাহিত, রেচিত, ছিন্ন, নিবৃত্ত।

দৃষ্টিভেদ ৩৬ প্রকার। তন্মধ্যে, ৮ প্রকার স্থায়ী দৃষ্টি, ৮ প্রকার রস দৃষ্টি, ও ২০ প্রকার সঞ্চারি দৃষ্টি।

৮ প্রকার স্থায়ী দৃষ্টি। যথা—হৃষ্টা (হাসি), স্নিগ্ধা (শান্ত), দীনা, ক্রুদ্ধা, দৃপ্তা, ভয়ান্বিতা, জুগুপ্সিতা, বিস্মিতা।

৮ প্রকার রসদৃষ্টি যথা—শৃংগার, ভয়ানক, হাস্য, করুণা, অদ্ভুত, রৌদ্র, বীর, বীভৎস।

২০ প্রকার সঞ্চার দৃষ্টি—স্নিগ্ধা, ললিতা, বিতর্কিত, শূন্যা, মলিনা, শ্রান্তা, লজ্জান্বিতা, গ্লানা, শংকিতা, বিষণ্ণা, মুকুলা, কুঞ্চিতা, অভিতপ্তা, অর্ধ মুকুলা, বিভ্রান্তা বিপ্লুতা, আকেকরা, বিকোশা, মদিরা, ত্রস্তা। এছাড়াও ৮ প্রকার দর্শন আছে যথা—সম, সাচী, অনুবৃত্ত, আলোকিত, প্রলোকিত, উল্লোকিত, অবলোকিত।

এছাড়া পাদভেদ, স্থানকভেদ, চারী, ভ্রূ, ইত্যাদির নানা রকম ভেদ আছে। কিন্তু করণ ও অংগহার সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। ১০৮ করণ ও ৩২ অংগহার। হস্ত, পাদ, জংঘা, উরু ও কটীতটের সমানভাবে চালনার নাম চারী। আর পাদদ্বয় নিষ্পাদিত চারীর নাম "করণ"। এ ছাড়া "কর করণ" আবার পৃথক। কর করণ চার প্রকার—আবেষ্টিত, উদ্বেষ্টিত, ব্যবর্তিত, পরিবর্তিত। আবার হস্ত ভেদ অর্থাৎ যাকে বলে মুদ্রা প্রকরণ—অসংযুক্ত হস্ত ২৪ প্রকার এবং সংযুক্ত হস্ত ১৩ প্রকার। অসংযুক্ত হস্ত—পতাকা, ত্রিপতাকা, অর্ধচন্দ্র, অরাল, শুকতুণ্ড, মুষ্টি, শিখর, কপিথ, কটকামুখ সূচী, পদ্মকোশ, মৃগশীর্ষ, সর্পশীর্ষ, কাংগুল, চতুর, অলপদ্ম, ভ্রমর, হংসাস্য, হংসপক্ষ, সন্দংশ, মুকুল, উর্ণনাভ, তাম্রচূড়।

১৩ প্রকার সংযুক্ত হস্ত - অঞ্জলী, কপোত কর্কট, স্বাস্তিক, কটক বর্ধমান, উৎসংগ, দোল, নিষেধ, পুষ্পপুট, মকর, গজদন্ত, অবহিত্থ, বর্ধমান—এই সকল মুদ্রার অভিনয় দর্পণের সংগে কিছু মিল আছে কিন্তু কথাকলির মুদ্রা অনেক তফাৎ। নৃত্য শিক্ষার আগে যে শরীর চর্চা অর্থাৎ ব্যায়ামের দরকার—তা এই সকল অংগভেদ হতে কিছু বেছে নিয়ে অভ্যাস করলেই শরীর নিজের আয়ত্বে আসে। যেমন গ্রীবা ভেদ হতে প্রথম ডাইনে বায়ে, দ্বিতীয় সামনে পেছনে কপোতের মত- তৃতীয়—ঘুরান।

স্কন্ধ—দুই স্কন্ধ এক সংগে ঘোরা, পরে এক এক করে, এবং সামনে পেছনে।

বক্ষ—দুই পার্শ্বে। কটি—দুই দিকে ঘোরান ইত্যাদি। উদয়শংকর সংস্কৃতি সদনে এই ব্যায়ামকে বেশ ধারাবাহিক ভাবে নাম দিয়েছেন। যেমন হাতের—

এ, বি, সি, ১, ২, ৩, সোলডার ১, ২, ৩, চেষ্ট, হিপ্‌স, নেক ১, ২, ৩। দশ রকম হাতের সার্কেলিং পজিসন, বডি রাউণ্ড, সাধারণ হাটার নানা রকম ধরণ ইত্যাদি এই সকল নিয়ম—অনুসরণ করলে শরীর খুবই তৈরী হয়—তারপর নাচের টেকনিক শেখায় কোনই কষ্ট হয় না। এই সকল ব্যায়াম শিক্ষার সংগে সংগে সেখান হয়—কি করে একত্রিভূত করতে হয়। তিন চার বা ততোধিক সঞ্চালন। যেমন পায়ে একের ঠোকা রেখে কোমর দোলান—সংগে গলা, সংগে দুই দিকে চোখ এবং ভ্রূ-ভংগী, হাতে কোন না কোন মুভমেণ্ট ইত্যাদি। এই হলো শরীর চর্চার কথা। আগামীতে নাচের টেকনিক সম্বন্ধে বলবো। (ক্রমশঃ)

বাসর প্রদীপ

(গল্প)

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

সহরতলীর প্রান্তে নেমে এসেছে রাত্রির তরল অন্ধকার, দূরে বড় রাস্তায় তখনও রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে সহরগামী বাস গুলো, নমিতা ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দূরের পানে। পেছনের আলোকোজ্জল বিয়ে বাড়ীর সমারোহ তখনও মন থেকে মুছে যায়নি! সে যেন হাঁফিয়ে উঠেছে! হাঁফিয়ে উঠেছে সারাদিনের কর্মক্লান্তিতে, হাঁফিয়ে উঠেছে তার জীবন যাত্রায়—হাঁফিয়ে উঠেছে তার পরিবেশের একঘেয়েমিতে! সারা মন প্রাণ দিয়ে মুক্তি চায় আজ সে এ বন্ধন হতে! সকাল হতেই সংসারের ঝামেলা—বড় বোনের ছেলেপিলের ক্যাঁচক্যাঁচানি···কলরব

তারপরই নাকে মুখে গুঁজে ইস্কুলে গিয়ে মেয়েদের নিরেট মাথায় ইংরাজী আর অঙ্ক কষাণে ···

"...নমি—এত দেরী হল তোর?"

দিদির কথায় কেমন যেন চমকে ওঠে নমিতা,...রাত হয়েছে একটু ··তবে এমন একটা সন্দেহের সুরে কথা বলাটা দিদির সেই আবাল্যেরই বদভ্যাস। কোন উত্তর না দিয়েই ঘরে ঢোকে নমিতা!

···চিঠিখানায় হাতের লেখা দেখেই একটু চমকে ওঠে নমিতা!···একি!···বিশ্বাসই করতে পারে না! তবু হাতে তুলে নেয়! সেন্সার করা হয়েছে ··সরকারী ভাবে তাবপর পৌঁচেছে তার কাছে!

···চোখের সামনে হতে মুছে যায় বিয়ে বাড়ীর সমারোহ,··ওরই ছাত্রী অশোকার বিয়ে, তাকে যেতেই হবে··· কথা দিয়েছে!···

··দুটো যেন খাটের সংগে এঁটে গেছে। চিঠিখানা খুলে পড়তে থাকে ব্যগ্রভাবে!

··তমাসু,

··ও সম্বোধনটা শুনে চমকে যেও না!···ওই নামেই ডাকব এই আশা ছিল সারা জীবন ধরে, কিন্তু হয়ত তা আর সফল হবে না, তাই তোমাকে দূর হতেই ওই নামে ডাকলাম, সাড়া দিও!

··জীবনের আশা আলো আজ আমার চোখের আঁধারে মিশিয়ে আসছে! সমস্ত উৎসাহ-শক্তি দিয়ে যুদ্ধই করে এসেছি মানুষের পাশব প্রবৃত্তির কাছে, সাম্রাজ্যবাদী বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে, আজ আমি ক্লান্ত মুমূর্ষু! পরাজিত —? না পরাজিত আমি নই—জয় পরাজয় এখনও নির্দ্ধারিত হয়নি,···যুদ্ধ করছে আমারই মত শত সহস্র সৈনিক, বাংলা —সারা ভারতের পথে প্রান্তরে আমাদেরই ঘরে ঘরে, তারাই আনবে জয়লক্ষ্মীকে ছিনিয়ে, আমি হয়ত সেদিন থাকব না! তবু · স্বপ্ন দেখছি আজ হতেই সে নোতুন দিনের!

দুরারোগ্য ক্ষয়রোগের দুর্বার আক্রমণ আজ হাড় পাঁজরা শিথিল করে দিয়েছে!···মনের কোণে যে দুর্বল মানুষটা ছিল, সে যেন দুনিয়ায় আপনজনকে খুঁজতে বসে আজ.— তোমাকে তাই আগে মনে পড়ল!!

প্রীতি জানিয়ে গেলাম।···আর চিঠি পাবে কি না জানি না - হয়ত ক্ষমতা থাকবে না তখন লিখবার, নয়ত এ পৃথিবী হতেই চলে যাব কোন নূতন জগতের সন্ধানে!"

সন্তুদার চিঠি, বিপ্লবী সত্যেনদা!!...

নমিতার হাত দুটো কাঁপতে থাকে দাঁড়াবার · ক্ষমতা সে যেন হারিয়ে ফেলেছে, কোন রকমে সামনের বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে!! মাথাটা যেন ঘুরছে!! ·· চোখের সামনে হতে সব যেন মুছে যায় নমিতার। ঘরটা, ওপাশের ছোট্ট শেলফ ভরা বইগুলো, টেবিলের উপর গাদা করা পরীক্ষার খাতাগুলো— অশোকার বিয়েতে দেবার জন্য আনা নোতুন বইখানাও!

···দশ বৎসর আগেকার কথা!

সহরের অস্তিত্বও নাই, এঁদো পচা পুকুর, তেঁতুল গাছের সমারোহ ছোট লাল সুরকি ঢালা রাস্তাটা একেবেঁকে চলে গেছে ওপাশের বাঁহাতে ··কোন এক জমিদারের বাগান-বাড়ীর পাঁচিলটা শেওলা জমে কাল হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে পুরোণো দু'একটা বাড়ী, ..
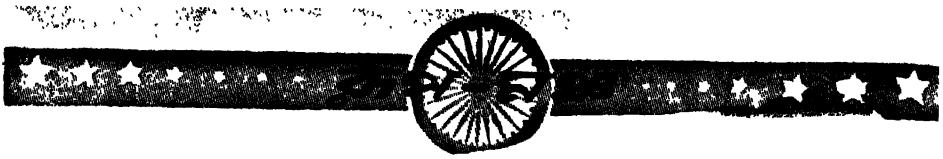
মাঠের মধ্যে এখানে ওখানে শুরু হয়েছে দু'একখানা নোতুন বাসিন্দাদের বাড়ী,...দেশ হতে আসছে দু'চারজন নোতুন বাড়ীতে বাস করবার বাসনা নিয়ে।

...চোখে তার দূর খুলনার কোন পল্লীর শুভ্র নীলায়তন লাগান!...মনে তার আঠারোবাকির কীর্তনখোলার ঘাটের তাল-খেজুরের মাথা নাড়া হাওয়ার চাঞ্চল্য...দেহে শীতের কুসুমিত নদীর দেওয়ারে মৌরী ফুলের সজীবতা...সহরের রূপ তাকে ছোঁয়া দিয়ে গড়ে তুলতে পারে নি!

...একপাল হাঁস একপা তুলে সকালের রোদ পিঠ করে ধ্যান করছিল! তাদের কলরবে সচেতন হয়ে ওঠে! দূর হতে মা চীৎকার করেন—'নমি' এ্যাই নমি, কার হাঁস তাড়া করছিস?'

নমির মায়ের চীৎকারে কান দেবার সময় নাই! ছোট বোনকে কোল হতে নামিয়ে দিয়ে হাঁসের পিছু পিছু ছুটে বেড়ায়—হাঁস তাকে ধরতেই হবে! সারা মাঠময় হাঁস-গুলোও গলা উঁচু করে ছোটাছুটি করে!

...সাইকেলখানা সহসাই থেমে গেল! নমিতাও চোখ তুলেই দেখে সামনে একটি ছেলে, সাইকেল হতে নেমে সেও একটা হাঁসকে ধরে ফেলেছে।

..."কি করবে হাঁস নিয়ে? এই নাও..."

...হাঁসটা ছেলেটি নমিতার হাতে তুলে দিতে যায়! নমিতা বলে ওঠে..."আপনার ধরা হাঁস নোব কেন?"

..."বেশ, তবে ধরে নাও!"

"দরকার নাই আমার হাঁসের! চল রে!"

ছোট বোনকে সংগে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায় নমিতা!

ছেলেটি চেয়ে থাকে তাদের গতিপথের দিকে। গাছ কোমর করা মেয়েটি বিনা সংকোচেই এগিয়ে চলেছে। সেও সাইকেলে উঠে পড়ে।

* * * * *

...আশেপাশের বস্তিগুলোর কলরব একদিন মাত্রা ছাড়িয়ে ওঠে! সামনের রাস্তাটায় জমে যায় মেয়ে ছেলের ভিড়! ...ছোট একটা ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে খেলা করছিল। ওই কুলি কামিনাদেরই হবে, একখানা মটর ধাক্কা দিয়ে তা[illegible] ফেলে দিয়েছে!

এবাড়ী সেবাড়ীতে কলরব পৌছাতেই অনেকেই বার হ[illegible] আসে! দুপুর বেলা পুরুষের চেয়ে নারীর ভিড়ই বে[illegible] বাবুটিও ছেলেটিকে ধাক্কা দিয়ে চারিদিকে লোক জম[illegible] দেখে—কোন রকমে বার হয়ে যাবার চেষ্টা করেন!

হঠাৎ কয়েকজন ছেলে বোধ হয় দলবেঁধে কলেজ হতে ফিরছিল বইপত্তর নিয়ে—তাদের মধ্যে একজন গি[illegible] ভদ্রলোককে গাড়ী হতে সটান টেনে নামিয়ে ফেলল!

..."চাপা দিয়ে পালাচ্ছেন যে বড়?"

..."রাস্তায় ওরকম ভাবে খেলা করলে চাপাত পড়বেই!"

ছেলেটি চটে ওঠে, "চাপাত পড়বেই!"

"মারবেন নাকি?"—আমতা আমতা করতে থাকে ভদ্রলোক!

সমবেত ছেলের দল বলে ওঠে ..."দোব নাকি সতুদা?"

...ছেলেটার মাথায় চোট লেগেছে, গা হাত পাও ছ[illegible] গেছে। পাশের বাড়ীর কারা বার হয়ে এসেছে!...কো[illegible] রকমে তার চোখে মুখে জল দিয়ে...বাতাস করতে থাকে ভদ্রলোকও শেষ পর্যন্ত ছেলেটির মাকে কিছু টাকাক[illegible] চিকিৎসার জন্য দিয়ে তাকে সংগে করে হাসপাতালে নি[illegible] যেতে রাজী হন!

...ভিড় পাতলা হয়ে আসে! কুমি মেয়েটা ছেলেটাক[illegible] কোলে নিয়ে আর একজনের সংগেই হাসপাতালে গে[illegible] ভদ্রলোকের গাড়ীতে উঠে!

এতক্ষণ দেখতে পায়নি সত্যেন, ছেলেটির রক্ত তারও হা[illegible] জামায় লেগেছে!—"একটু জল দেবেন!"

ছুটে গিয়ে পাশের মেয়েটি একঘটি জল আর সাবান নি[illegible] আসে!... একটু বিস্মিতই হয়ে যায় সত্যেন! সেই সকা[illegible] হাঁস ধরা মেয়েটিই! নিঃসংকোচে জল ঢালতে থাকে।

..."ওকি ভাল করে সাবান নেন! আপনি কোন ক[illegible] পড়েন?"

"...ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে!"

"এই পাড়াতেই থাকেন? কোন বাড়ী? উই বড়[illegible]!"
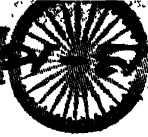
লাকটাকে কিন্তু গাড়ী থেকে ওরকম করে টেনে নামান অন্যায় হয়েছিল, হাজার হোক ভদ্রলোক · !"

ভদ্রলোক ! কই জল ঢালুন !"

হাতটা ধুয়ে নীরবে বইগুলো তুলে নিয়ে পা বাড়ালো সত্যেন গাড়ীর দিকে !

··বড়দির কথায় নমিতা মুখ তুলে চাইল !

তোর ধিঙীপনা এখনও গেল না নমি ? যার তার সংগে"

—"কথা কইতেও পাব না ? বেশ করব আমি !·· উনি ঞ্জিনিয়ার শুনেছ মা, গুণ্ডা নন, রীতিমত লেখাপড়া জানা— ওই বাড়ীটাতে থাকেন !"

দদি ভেংচি কাটে—"তবে আর কি, ভালই হল তোমার !"

··"দেখবি দিদি"—ঘটির বাকী জলটুকু বড়দির গায়ে-মাথায় ঢেলে দিয়েই বাড়ী ঢুকে পড়ে !

াড়ীর সকলের ভালবাসা-স্নেহ কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সত্যেনের উপরই ! আশেপাশের পাড়ার ছেলেদের মধ্যে কৃতিত্ব ছল তারই ! বাড়ীর বিশাল চত্বরে তাদেরই গড়া সমিতির জমন্যাসিয়াম—লাইব্রেরী, সাংস্কৃতিক বৈঠকের সমারোহ, ছলেদের আবদার অত্যাচারে বাড়ীর সকলেই অতিষ্ঠ -খরজে সহ্য করে যায় সকলেই। প্রতিবাদ করবার সাহস নই একজনের ভয়ে—তিনিই এ বাড়ীর কর্ত্রী। সত্যেন জানে সব সব কিছু একজন সামলাবেনই—তিনি তার মা-ই !

ছলেদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁর অংশ গ্রহণ করা চাই ! দের খাওয়ান দাওয়ান সব বিষয়েই মা কোন দিকে ত্রুটি তে দেন না !

বড়বৌদি, চা চাই কাপ পনের !"

বৌদি একটু বিরক্তই হন সত্যেনের কথায়।

পাড়ায় ছেলেরা মিলে রেডক্রশের সাহায্য সমিতির কি কেটা বৈঠক বসিয়েছে, বার বার তাগাদা দিয়েও বাড়ী থেকে চা আসে না দেখে নিজেই বাড়ীতে যায়—"ভদ্রলোকরা এলে কি বাড়ীতে এক কাপ চাও পাবে না ?"

"কি হয়েছে রে সতু !"

মায়ের আগমনে ব্যাপারটা সব পরিষ্কার হয়ে যায়,···

সকালের ব্যাপারটা চুকেই গিয়েছিল, হঠাৎ মায়ের মুখে শুনে বলে সত্যেন—"কোথা শুনলে তুমি ?"

"ও বাড়ীর নোতুন গিন্নী এসেছিলেন কি না বেড়াতে—তোর খুব সুখ্যাতি করে গেলেন,···"

লজ্জিত হয়ে ওঠে সতু, "অকারণেই সুখ্যাতি করতেই শোনো মা, কুখ্যাতি কি তোমার কানে পৌছায় না ?"

ছেলের মাথায় হাত বোলাতে থাকেন মা,—"কুখ্যাতির কাজ তুই করবি না বাবা, তাকি জানি না ?"

...এমনি মায়ের ভালবাসায় গড়া সত্যেন···কোথা থেকে যে এমনি করে তীব্র কোন গরলের সন্ধান পাবে জানত না। এতদিন পৃথিবীকে সে দেখে এসেছিল শান্ত কমনীয় শ্যামলরূপে, বৃহত্তর জগতে বৃহত্তর পরিবেশে এসে অনেক দেখল, অনেক শিখল। দেখল মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার, শিথিল মানুষকে সচেতন করবার মহত্তর শিক্ষা !

···বিশাল ফ্যাক্টরীর ব্লাষ্ট ফার্ণেশে গলিত লৌহ প্রবাহে কোন অদম্য শক্তির উৎসাহ,—মাথার উপরে ইলেকট্রিক ক্রেনগুলো অবলীলাক্রমে তরল গলিত লৌহধারাকে বয়ে বয়ে নিয়ে চলেছে ! মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে মানুষের বাঁচবার সাধনা—রোজকার রুটি সংগ্রহের জন্য তীব্র লড়াই ! এই কষ্টোপার্জিত মুখের গ্রাসও ছিনিয়ে নিতে চায় কোন লোভী মানুষ সম্প্রদায় ! ছিটকে লৌহপিণ্ডের ঝলকানিকে শাসিয়ে চলে শ্রমিকের হাতুড়ী, শতধাবিদীর্ণ রি রোলিং সিটের বিক্ষিপ্ত টুকরাগুলো মানুষের জয়বার্তারই ঘোষণা—সে লৌহ দানবের বিজেতা মানুষ সামান্য মানুষের কাছেও হাত পাতে দিনকার মজুরীর সামান্যতম অংশ তার ফিরে পেতে !

·· সারা অঙ্গে এদের কর্মব্যবস্থায় জ্বলে ওঠে সত্যেনের, তাকে রাখা হয়েছে এই মানুষদিকে চালাবার জন্যে ! রয়লারের প্রচণ্ড শক্তিকে যারা কাঁটার মাপে বেঁধে, রেখেছে···দুর্দান্তঘূর্ণায়মান টারবাইনের আকাশচুম্বী ক্ষমতাকে ভোল্টোমিটারের সূক্ষ্ম 'কায়েমে' আটকে রেখেছে, তাদিকে চালাবার জন্য সত্যেনের প্রয়োজন !

কিন্তু তাদিকে পেটভরে খেতে দেবার প্রতিশ্রুতি যেন দিতে পারে না, মেসিনম্যানের তৈলকালি মাখা ছিন্ন ওভার-কোট পরা মূর্তি তার সামনে এসে সেলাম করে দাঁড়ায় !

লৌহদানবের সংগে এরাও এই কারাগারে বন্দী। সত্যেনের সংগেও কোন প্রভেদ নাই এদের, সেও ত বন্দী !!

সারাটা মন ভরে ওঠে কোন অজানা হাহাকারে। প্রাণ নেই, আছে উন্মাদনা! অন্তর নেই—আছে শুধু পাশব প্রবৃত্তির দর্প। এর মাঝে কি রক্তমাংসে গড়া মানুষ বাঁচতে পারে। তাই প্রয়োজন তার কোন এক ভালবাসার ঠাঁই, যাকে দিয়ে তার অন্তরের শূন্যতাকে সে পূর্ণ করবে।

সন্ধ্যার পরই জমে আড্ডাটা!

নমিতা সারাদিনের পর চেয়ে থেকে সামনের পথটার দিকে। সাইকেলখানা বাড়ীর সামনের গেট পার করে ঠেলতে ঠেলতে আসে সত্যেন!

: দেরী হয়ে গেছে আজ? কই পড়তে বসনি তুমি?"

: বারে—এইত বসেছি: কিন্তু আজ আর পড়ায় মন বসছে না!·· গল্প করব কেমন?"

: এইজন্য আমাকে আসতে বলা রোজ রোজ? আমার মাষ্টারীতে যদি ফেল কর, বদনাম রটবে যে আমারই?"

: তা রটুক, মাষ্টারী করে ত খেতে হয় না আপনাকে!"

···রোজকার সন্ধ্যার এই সময়টুকুর জন্য দুজনেই সারাটাদিন কাটায়!

রাত্রি ঘনিয়ে আসে,·· ঘনিয়ে আসে দূর ঝিলের মাথার তালীবনশীর্ষে তারার ম্লান রোশনী,—পথে আসাযাওয়া কমে যায় লোকের,—ঝিল্লীমুখর সহরতলীর নির্জন বনপথে কাদের হালকা পদধ্বনি রাতের আধারে গুমরে মরে! গুমরে মরে কার অন্তরের না বলা বাণী, অনুভব করে নমিতা·· সত্যেনের মন যেন লোহার আগুনে পুড়ে ঝামা হয়ে গেছে! ··

হাতের পরশ, নরম তন্ত্রীগুলো সচেতন হয়ে ওঠে, জীবকোষের স্নায়ুতন্ত্রীগুলো ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, রাত্রির তমিস্রা ভেদকরে কার চোখের না বলা বাণী আজ সত্যেনের অন্তর স্পর্শ করে:

: নমি,"

হাতের নরম চাপ অনুভব করে সত্যেন, চোখের ডাগর তারায় তারায় যৌবনের উচ্ছল আবেগ:

রাত্রি ঘনিয়ে আসে, সত্যেনের ঘুম আসেনা: সারা শরীরে আজ তার আনন্দের ছোঁয়া, জীবনের অনেক কিছু সম্পদ আজ তার পৃথিবীকে ফাঁকি দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে সে—তার স্মৃতির মণি কোঠায়। তেঁতুলগাছের মাথায় জমাট ঘন অন্ধকার,···পুঞ্জীভূত তমসার কোলে তারকার জ্যোতির মতই মনের গগনে কার চোখের চাহনি সমস্ত না পাওয়ার বেদনা দূর করে দিয়েছে! সামনে তার পথ · সে দুস্তর পথের পাথেয়ের সন্ধান দিয়েছে নমিতাই!

···কারখানার চারিদিকে কর্মচঞ্চলতার মধ্যেও সত্যেন কেমন যেন অসহায় বোধ করে। যুদ্ধের করালছায়া এগিয়ে আসছে, · এগিয়ে আসছে ভারতের ভাগ্যাকাশে। সিঙ্গাপুর—মালয়—বার্মার সেগুন বনসমাকীর্ণ বন্ধুর পার্বত্যভূমি পার হয়ে আরাকানের বর্ত্মপথে পলাতকদের পিছু পিছু ধাওয়া করে আসছে যুদ্ধের করালভীতি· চিমনীগুলোর কালো ধোয়ায় আকাশকোল ঢেকে গেছে! ইলেকট্রিক ফার্ণেসের লালাভ গলিত লৌহপিণ্ড ছিটিয়ে পড়ছে সহস্র ধারে! হাইড্রোলিক প্রেসের কঠিন চাপে সিট মেটাল গুলো দীর্ঘ, দীর্ঘতর হতে থাকে! 'টার্ণিং লেদের' ঘর্ষণে পিতলের চকচকে শেলগুলো... ভরাট হয়ে ওঠে ··বিস্ফোরকের ভারে! গ্রাম—নগর—জনপদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, হায় ভেংগে যাবে কত সংসার। কত মানুষের অন্তর—কত প্রেম-প্রীতির বন্ধন শতধা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে! ওয়েলডিং রডের মুখে—লাখো লাখো যুঁই ফুলের সমারোহে...কত রক্তস্নাত বন-ভূমির ভবিষ্যৎ ইতিহাস রচনা হবে ওর জন্মে।

···ঘড়িটা এগিয়ে চলে,—কারখানার সমস্ত সিটিগুলো বাজতে থাকে। আকাশের রোদ তখনও ম্লান হলদে হয়ে গেছে,···ধূসর গোধূলীর ছায়া নেমেছে মাটির বুকে।

গৃহকোণে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যাদীপ, সন্ধ্যাশঙ্খের মঙ্গল তান ডেকে আনে পথহারা গৃহলক্ষ্মীকে। আকাশের অরুণিমা রূপায়িত হয়ে ওঠে সিন্দুর কঙ্কণের ঝঙ্কারসুরে! কর্মচঞ্চল—ভীত যুদ্ধছায়াময় নগরীর অন্তপ্রত্যন্তে আজ···মিলোয় নীড়ের সংকেত। হংসমিথুন আজও সন্ধ্যায় তারাদীপ্ত রাত্রির আগমনে কাশবন ছায়ায় ঘাড়ে ঘাড় রেখে চোখ বোজে!

সত্যেন এগিয়ে আসে বাড়ীর দিকে! বৌদি··· খাবারের ডিসটা এনে টেবিলে নামিয়ে দেন, পিছনে কাকে দেখেই বিস্মিত হয়ে ওঠে সত্যেন।

"তুমি?"

হাসে বৌদি—"কেন ওর কি আসতে নেই? রোজ সন্ধ্যায় তুমিই যাও ওদের বাড়ী, আজ না হয় ওই এসেছে! কি রে নমিতা!"

কথা বলেনা নমিতা, সত্যেনের চোখে রাজ্যের বিস্ময়! ভাল করে চারিদিক চাইতেই অনুভব করে তার ঘরের সাজসজ্জা বদলেছে, টেবিলখানা গুছোন, মায় পেনে কালি পোরা অবধি রয়েছে। বই খাতা সব পরিষ্কার করে গুছোন, ছবিগুলোয় ধুলোও নেই।

"সুখবর দিতে এলাম সতুদা,—টেষ্টে First হয়েছি আমি!"

..."তাই নাকি?"

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে নমিতা!—আঁচলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে,"—একটা মাস একটু দেখিয়ে দেবেন কিন্তু, নাহ'লে Final-এ কি হবে বলা যায় না!"

চলে গেল নমিতা,··· বৌদি হাসেন মুখ টিপে।

—"মাষ্টারী করছ কতদিন হতে ঠাকুরপো,. কই আমরাত কিছুই জানিনা!"

"জানবার মত এমন কিছু একটা নয়!"

মা কোন কথাই বলেন না!

নিজেকে হারিয়ে ফেলে সত্যেন: ফ্যাক্টরীর কর্মব্যস্ততা, লৌহদানবের রুদ্ধ আক্রোশের গর্জন ছাপিয়ে কানে আসে তার মন্বন্তরের হাজারো বুভুক্ষু নরনারীর আর্তনাদ!··· মহানগরীর পথে ঘাটে—শীর্ণ চলিষ্ণু নরকংকালের শোভাযাত্রা—মৃত্যু পথযাত্রীদের শেষ আর্তনাদ—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী রক্তের উন্মাদনাময় রুম্বার নাচের হল্লা... কোণঠেসা···টমির কুশ্রী রসিকতা মুমূর্ষু জাতির অন্তিম সময়ের শান্তিও হরণ করেছে।

···বিস্তীর্ণ প্রান্তরটায় বিদেশী সরকারের রাষ্ট্রনীতির নিষ্ঠুর পরিহাসই চলেছে—নোওরখানা রিলিফ ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে। তাবুর নীচে খড়ের চাটাই পেতে শেষদিন গুণছে বাংলার শত সহস্র হতভাগা নরনারী। জমি-জায়গা, ঘর বাড়ী—বাংলার শ্যামল গ্রামচ্ছায়া হারিয়ে আজ উদার আকাশে কপিশপিঙ্গল চাহনি মেলে শেষ আশ্রয় খোঁজে কোন অজানাদেশে।

.. সত্যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে ওদেরই মধ্যে! গামবুট পরে বর্ষাতি চাপিয়ে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়ায়। চটচটে কাদা খড়ের সংগে তালপাকিয়ে রচনা করেছে শত শত গৃহহারার শেষ শয়ন!

রাত্রি হয়ে গেছে। বাড়ী ফিরতেই দেখে ডাক্তার বাবু বার হচ্ছেন বাড়ী হতে। বাবা—দাদা—সকলেই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে!···সত্যেন সেই পোষাকেই তাড়াতাড়ি করে এগিয়ে যায়, বাড়ীর মধ্যে। বৌদির চোখে জল!

"মা"—সত্যেনের ডাকে মা চোখ খুলে চান: কদিন হতেই মায়ের অসুখ বাড়াবাড়ি—'কোথা গিইছিলি? ক্যাম্পে?'

" —হ্যাঁ মা,···কেমন আছ?"

—"ভালই আছি আমি! এত খাটিস না বাবা, চাকরী—তারপর দিনরাত রিলিফ ক্যাম্প। শরীরের দিকে নজর দে—কি হয়ে গেছিস দেখ দিকি!"

হাসে সত্যেন: মায়ের কাছে আজও সেই এতটুকু খোকাই সে! এরবেশী পরিচয় কিছুই নাই, বাইরে সে যাই হোক না কেন?

শীতের শেষে···পিটুলী গাছের পত্রহীন ডালে কি যেন হিজিবিজি সংকেত। কাঞ্চনের গাছটা হতে বাতাসের বেগে ঝরে পড়ে ঝরাপাতার দল—কোন শূন্যে মিলিয়ে যাবার সংকেত নিয়ে এল রিক্ত শূন্য ধরিত্রীর বুক হতে। সত্যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে! পৃথিবীর ভালবাসা—স্নেহ—মমতা সব হতে আজ সে নির্বাসিত। একজন কেউও রইল না—যার বুকে মাথা রেখে সে নিজেকে ভুলবে, ভুলবে তার সব অশান্তি, তার সমস্ত বিক্ষোভ। আজ সে একা—মায়ের চলে যাবার সংগে সংগেই পৃথিবী তার কাছে বর্ণহীন! সকালের অরুণিমা—তেঁতুল বটগাছের মাথায় প্রভাতের সোনার আলোতালীবন সমাকীর্ণ ঝিলের বুকে সাপলার হাতছানি—সোঁদাল গাছের ঝাকড়া ফুলভার সব বর্ণ গন্ধহীন হয়ে ম্লান হয়ে গেল।

—মা নেই। মাকে হারাতে একদিন হতই, কিন্তু তার সংগে সংগে অন্তরের এই নিঃস্বতা আসবে এটা সে কল্পনা করেনি···মা যে তার সারা মন জুড়ে ছিল—ছিল তার অনুভূতিতে—ছিল তার আনন্দের সুরে সুরে—ছিল তার কিশোর মনের সাথীরূপে! সবশেষ হয়ে গেল।

—"চল—ওরা যে এগিয়ে গেলেন।"

নমিতার কথায় চমকভাংগে সত্যেনের। চিতার আগুন নিভে গেছে, গঙ্গার স্তব্ধ উদার বক্ষে—শেষ দিনের বিদায় আভা! শেষবারের মত মাকে প্রণাম জানিয়ে গেল সত্যেন, রেখে গেল তার অন্তরের প্রণতি, নীরবে গোপনে সঞ্চিত দুফোটা অশ্রুধার।

পৃথিবী বদলে আসছে! বদলে আসছে তার প্রকৃতি। বদলাচ্ছে তার মানুষ—তার রীতি নীতি। যে বিরোধ একদিন আসবে তাই এল!...

সারা দিন কঠিন পরিশ্রমের পর আবার নাইট সিফ্‌ট! চাহিদা বেড়েছে মারণাস্ত্রের, রাজ্যরক্ষা, নীতিরক্ষা, কর্তৃত্ব-রক্ষার জন্য চাই অস্ত্র। যোগাবে অর্থশালীর দল, পরিশ্রম করবে অর্থহীনের দল!

—কারখানায় ধূমায়িত বারুদের মতই শ্রমিকের রুদ্ধ আক্রোশ গুমরে ওঠে—আজ তাই প্রকাশ পেয়েছে। Blast furnace এর গলিত লাইমষ্টোন—আইরণ ওরস—হার্ডকোক্ সব জমে ঝামা হয়ে যাবে, তরল লালাভ গতি আর 'উলফ্রামের' ঝাপটা খেয়ে গর্জন করে উঠবে না, 'লেড'-র বোলিং মিলস—'বড় বড় হাইড্রোলিক প্রেসের আর্তনাদ থেমে যাবে। সব ছাপিয়ে শোনা যাবে বুভুক্ষ জনদেবতার আর্তনাদ, তাদের পেটপুরে খাবার চাই'...

মালিকদের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠেছে। বিশাল গেটগুলো বন্ধ, লাখো লাখো টাকার অর্ডার বন্ধ হয়ে যাবে? যুদ্ধ সীমান্তে কাদের কামান—রাইফেলের আওয়াজ নীরব হয়ে আসবে।

দেশদ্রোহীতার ষড়যন্ত্র! শ্রমিকরা দাবী জানায় দেশদ্রোহী কারা বিচার করুক দেশবাসীরাই। লাভের মোটা অঙ্ক যারা আত্মসাৎ করে চলেছে হাজারো শ্রমিকের নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে—তারাই দেশের শত্রু। হাজার শ্রমিকের ন্যায় বুদ্ধির চেয়ে কি একজন মালিকের দেশপ্রেম বেশী?

এ প্রশ্নের জবাব কোনদিনই মেলেনি। আজও তাই মিলল না।

—কারখানার সামনে শান্তিপূর্ণ শ্রমিকদের উপর চলল তাদেরই তৈরী করা গুলি,—সবুজ ঘাসের চাবড়া—যুদ্ধ সীমান্তের মতই রক্তস্নাত হয়ে উঠল: অসহায় জনতার আর্তনাদে ভরে গেল আকাশকোল। কাদের কোলাহলে কারাপ্রাচীরের অন্তরাল সজীব হয়ে উঠল। পেটভরে খেতে চাওয়ার অপরাধে দেশদ্রোহীর দল—ঠাঁই পেল লৌহ কপাটের অন্তরালে। যারা মাথা নীচু করে পড়ে রইল—তারাই জ্বালাল আবার ফার্ণেসের আগুন—আবার সজীব হয়ে উঠল কারখানার লৌহদানব। ধোঁয়ায় চিমনীর মুখ হতে আকাশ অবধি বয়ে গেল কলংকের কালোদাগ! দুদিন কাগজের শিরোভাগে উঠল দেশদ্রোহী নেতাদের নাম—সত্যেন তাঁদের একজন।

নমিতার চোখের সামনে পৃথিবীর আজ একটা অধ্যায় সারা হল। স্বপ্ন দেখে সে সত্যেদার দৃপ্ত চাহনি ব্যর্থ হবার নয়। ওদের কারাগারের অন্তরালে সে জ্যোতি নিভে যাবে না।

পাতা ঝরে—আবার মেহগিনী, বট, তেঁতুল গাছে আসে নতুন পাতার সমারোহ। ঝিলের ধারে তালগাছগুলো স্বপ্ন দেখে···আকাবাঁকা ছায়াপথে,···নির্জন প্রান্তর সজীব হয়ে ওঠে নব অতিথির কোলাহল!! ঝিলের বিস্তার বাড়তে থাকে। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের দয়ায়, আশে পাশে গড়ে ওঠে··· ছোট বড় বাড়ীর নিশানা। বৃদ্ধ তেঁতুল বটগাছের মধ্যে নিশীথ রাত্রে আলোচনা চলে···বাতাসের কানাকানিতে কার বয়স হল কত? ওর গুঁড়িতে কবে টিয়াপাখী ছানা পেড়েছিল, ওর ডালে কবে কাঠবিড়ালীর হল প্রথম মধুরাত্রি উদ্‌যাপন!

একটা বছর কেটে গেল। সত্যেনের কথা ভুলতে পারে না নমিতা। যে কোন পুরুষই আসে তার সংস্পর্শে, তাকেই সে যাচাই করতে যায়, সত্যেনের কষ্টিপাথরে। মনের কোনে

কোথায় যেন তার হাহাকার। দিন গোনে কবে আবার তার সেই হারান দিনের পাখী ফিরে আসবে।

কলেজের বান্ধবীদের মাঝে আলোচনা হয়...রেবা বলে ওঠে —সন্ন্যাসীর জন্মে ভাবিস না নমি, তুই ও আবার সন্ন্যেসিনী হয়ে যাবি!"

হাসে নমিতা মলিন ভাবে। সত্যেনকে দেখলে এদের ধারণা বদলে যাবে।

আলিপুর পুলটা অনেকবার পার হয়েছে নমিতা। সেই কাদাগোলা জলধারার দুদিকে নগরীর জীর্ণ পরিক্রমা? কালীঘাটের নোংরা বস্তি, আজ কত আশা-ভরসা নিয়ে যাচ্ছে সে। লাল ইটের প্রাচীর ঘেরা বিশাল সীমানা দেওয়া আকাশচুম্বী কোন বন্দীশালার অন্তরালে জাগে কার তীর্থযাত্রী আত্মা, কাদের বক্ষরক্তে এই কারাপ্রাচীরের রং হল রক্তবর্ণ।

জমাট সিমেন্টের চৌকো ইট বাঁধান চত্বরে নালপরা বুটের শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি তোলে,—এগিয়ে আসে শব্দটা গেটের দিকে।

চেনা যায়না সত্যেনকে, চোখে মুখে শীর্ণ একটা ম্লান জ্যোতি। নমিতাকে দেখেই একটু যেন চমকে ওঠে, "তুমি?"

এগিয়ে যায় নমিতা—"কেন, আসতে নেই নাকি? যাক চিনতে পেরেছেন—? আজকাল বড় নেতা হয়েছেন, চিনতে পারেন আমাদিগকে যথেষ্ট সৌভাগ্যের কথা?"

...হাসে সত্যেন, জবাব দেয় না! আরও অনেকেই—অনেক সহকর্মী এসেছিল। তাদের সংগে আলাপ সেরেই... এগিয়ে যায়।

বৃথাই বাঁধতে চেয়েছিল নমিতা কোন ঘর ছাড়া যাযাবরকে। ওদের পথের নিশানা নাই, ওদের পথে নাই বিশ্রামের ছায়াতল। নীলবনে কোন হংস বলাকার নীড় বাঁধবার সংকেত ওদের নাই।...ওদের পথের ধারে যেদিন হাসনুহানা সৌরভ ছড়াত, সেদিন পথিক ভ্রমরের সাক্ষী হতে কেউ আসেনি।

...এমনি করে যেদিন ঝড় ঘনিয়ে এল...কোন পথিকই টের পায়নি,...মহানগরীর চেতন পর্যায় হবে সুরু, সহর-তলীর এঁদো পঁচা সমস্ত জঞ্জালই দূর করে দিয়ে ধ্বংস-স্তূপের তলে নূতন নগরের পত্তন। বস্তির খোলার চালের ঘন সবুজ চালকুমড়ার লতার বন্ধন শ্লথ হয়ে এল, গুঁড়িয়ে গেল অতীতের সমস্ত সৃষ্টির প্রয়াস। কাদের ভালবাসার মধুনীড় এক নিমেষে কাদের বিলাস-ব্যসনের ইন্ধন হয়ে গেল। নূতন নগরীর হল ভিত্তি স্থাপন শতশত গৃহহারা হতভাগ্যের...শেষ প্রস্তর স্তূপ।

...সত্যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, হারিয়ে ফেলে আবার সহরের কর্ম ব্যস্ততায়, চারিপাশে শোনে তার আহ্বান, এগিয়ে যাবার।...থামবার সংকেত নাই। নাই তার জীবনে কোন মধুরাতির ইসারা। তার মনোবনে কোন সাথীহারা হংসবলাকার ক্লান্ত পাখার বিধুনন সংকেত আনেনি।

"এত কি ভাবছ?...নমিতার ডাকে চমকে ওঠে সত্যেন! ...এতক্ষণ কি যেন আকাশ পাতাল সে ভাবছিল। এ জগতের সে যেন বহুদূরের কোন স্বতন্ত্র জগতের বাসিন্দা। নমিতার নরম উষ্ণ হাতের স্পর্শ যেন তাকে মাটির পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনে। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস...তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নমিতার নীরব রাত্রির মদির স্পর্শ। আজ যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে নমিতা।...কোন দুর্বার নারীত্বের আত্মপ্রকাশ কি তার জীবনে আজ প্রথম?

চারিদিক নীরব নিথর। আকাশের ম্লান তারার জ্যোতি ওঠে শিউরে! নেবুতলার উজ্জ্বল 'ছায়াপথে' কার ক্লান্ত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আনাগোনা।

সত্যেনের মনে কোন ছায়াপাত নাই।...প্রত্যাখ্যানের তীব্র অপমানে গর্জন করে ওঠে নারীত্ব, পুরুষের এ অপমান নারীর কোন দুর্বলতম স্থানে ঘা দেয়, যা কোন পুরুষই কল্পনা করতে পারে না।

স্তব্ধ হয়ে যায় নমিতা। তার কাকলি-মুখর সজীবতা—এক মুহূর্তে মিলিয়ে যায় অপমানের গাম্ভীর্যে। সত্যেনের সে চোখ নাই।

...উঠে পড়ে সে, নির্জন পথটা ধরে নীরবে দুজনে বাড়ীর দিকে চলতে থাকে।

বৃদ্ধ বট তেঁতুলের ঘন আলিংগনবদ্ধ অন্ধকার প্রাংগণে কতকগুলো গৃহহারা লোক জড়াজড়ি করে পড়ে আছে, ছেঁড়া তালাই কাঁথার উপর। আশে পাশে ভাংগা বস্তী
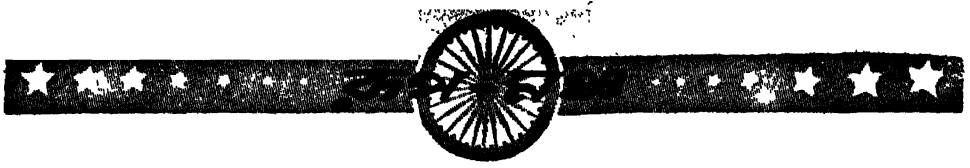
টিনের চালা, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের স্তব্ধ কর্মপরিক্রমা। এক বাচ্চা ছেলে ঠাণ্ডার চোটেই বোধ হয় ট্যাঁ ট্যাঁ করে চেঁচাচ্ছে—মায়ের খেয়াল নাই, দিব্যি অসাড়ে ঘুমিয়ে চলেছে।

ক্ষিপ্র পায়গুণ্ডা এদের সুপ্ত অসহায় মূর্তির দিকে চাইলেই সারা জীবনে একটা বিদ্রোহের সাড়া অনুভব করে সত্যেন। নমিতার স্নো-সেণ্ট এর সুবাস মাখা সাজ—তার কালো চোখের আগুনা মায়া তার চেয়ে তীব্রতর কোন উন্মাদনা জাগায়—এরা এই হতভাগা সর্বহারার দল। ভুলিয়ে দেয় তার নিজের কামনা—চাওয়া পাওয়ার সমস্ত কথা,... তাকে ছাপিয়ে নূতন কোন বলিষ্ঠ ঋজু সত্যেন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে—যে সমাজ সংসার সব কিছুরই মায়া কাটাতে পারে না।

...বৌদির কথায় চমকে ওঠে সত্যেন, বই হতে মুখ তুলে চায়। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বৌদি বলে চলে, "...তোমার দাদারাও বলছিলেন, বিয়ের ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলতেই, শ্যামবাজারেই ঠিক করেছেন ওঁরা—"

: কিন্তু"

: সত্যেনকে বলতে অবসর না দিয়েই বলে ওঠে বৌদি,

"...নমিতারা কায়স্থ,—বাবার অসবর্ণ বিয়েতে মত নাই, জানইত তাঁর কথা। নমিতার মাও বলেছিলেন...কিন্তু"

বিস্মিত হয়ে যায় সত্যেন। তার অসাহায্যে এই সব চক্রান্ত চলেছে যা স্বপ্নেও সে কল্পনা করেনি।

নীরবে শুনে যায় সত্যেন কথাগুলো।. পাড়ার লোকের মুখে শুনে তার নামে নমিতাকে জড়িয়ে যে কাল্পনিক কাহিনীগুলো প্রচারিত হয়েছিল, বাবাও তাহলে বিশ্বাস করেছেন।

নমিতা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে সত্যেনের বাবার সামনে, আঁচলটা আঙ্গুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। বলে চলেছেন বৃদ্ধ

"...ওর মা বেঁচে থাকতে তুমি আসতে ওর সংগে মিশতে হৈ চৈ করতে—কিছুতেই কিছু এসে যেত না, কিন্তু এখন বয়স হয়েছে তোমাদের দুজনেরই, যাতে আর কেউ কোন কথা বলবার সুযোগ পায় তা হবে কেন? তুমি বাড়ীতে আসবে বৌমারা রয়েছেন...ছোট বোন রয়েছে, তাদের সংগে নিশ্চয়ই মেলামেশা করবে, কিন্তু সংগে"

.."আমি মেশবার চেষ্টাও করব না, আপনি নিশ্চিন্ত হন'!'

উঠে আসে বৃদ্ধ। নমিতার মাথায় হাত বোলাতে থাকে,... "মনে কিছু করোনা মা, পাঁচজনে কথা বলে, কানে আসে তাই সাবধানই হতে বলছি। তোমাদের দুজনের মঙ্গলেরই জন্য।"

..."বেশ, কথা দিচ্ছি আমি ওর সংগে কোন সম্পর্ক আমি রাখব না,"—

বার হয়ে এল নমিতা।...

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। বট তেঁতুলের কোলে কোলে তারার লুকোচুরি। লকলকে কচু গাছের বনে হলদে কচু ফুলের তীব্র সুবাস। কচুরিপানার সবুজ বুকে বেগুনি রং এর ফুলদলে চুমু একে যায়।

অঝোরে ঝরে আজ অশ্রু। নারীত্বের ব্যর্থতার অপমানের জ্বালায় আজ ভেংগে পড়ে নমিতা। নিজেই নিজের সমস্ত দাবী আজ ত্যাগ করে এসেছে। তবে আজ এ অশ্রু কেন?

কেন জানে না। যা একমুহূর্তের মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে আসতে গিইছিল তা যে মনের সবচেয়ে বড় সম্পদ বুঝতে পারেনি। কেউ জানবে না তার এ ত্যাগের ইতিহাস—কেউ শুনবে না তার এ আত্মহত্যার কাহিনী, সত্যেনও না।

—কয়েকদিন সারা বাড়ীটা থমথমে। যেন কোন এক ঝড়ের পূর্বাভাষ। নমিতা রোজই আসত, তার ঘরে পা দিযে টেবিলটার দিকে চাইলেই বুঝতে পারত সত্যেন, কার বিগত পদধ্বনির স্তব্ধ শব্দ। সব যেন চিরতরে নীরব হয়ে গেছে।

ভুলে যায় নিজেকে। কয়েকদিন অত্যন্ত ঘোরাঘুরির পর একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার এগোতে হবে। চোখের সামনে ভাসে সেই দূর জনমানবহীন কাকদ্বীপ—জেওখালি বনরাশি, সুন্দরি গরাণ গাছের সীমা দেওয়া খালের বুক চিরে নৌকা চলেছে, দুপাশে বাঁধের ওদিকে—নরম ভিজে মাটির বুকে—সোনাধানের আস্তারণ,—দূরে নীলা বনরাজি

কোলে মিলিয়ে গেছে। আবার বনসীমা, মাঝে মাঝে মসৃণ খালের বুকে আড়াআড়ি দাগ কেটে চলে যায় উদয়নাগ হলদে বোয়ার দল। কার ত্রস্ত চকিত পাদবিক্ষেপে বনতল শিউরে ওঠে। মাঝি নাম নেয় সাঁইবাবা দক্ষিণা-রায়ের।

তার মাঝেও মানুষ, নিতান্ত ভাগ্য বিতাড়িত মানুষ সারাবছরের কষ্টোপার্জিত অন্ন জমিদারের নক্ষে তুলে দিয়ে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে রামরহিমের দোহাই পাড়ে। আইন নাই—মনুষ্যত্ব নাই—বনের রাজত্বে মানুষ রাজাও পশুরাজ বনে গেছে। আইন হয়েছে অন্ধকার বনের সান্নিধ্যে কালাকানুনের স্বরূপ।

চারিদিকে খালের পরিক্রমা দিয়ে জমিদারীর নিশানা! বুড়ীর চোখের - জল বাধা মানেনা—ছেলে, সোমত্ত জোয়ান ছেলে বাবর জমিদারী ছেড়ে চলে যাবে—চলে যাবে সহরে। কুলিগিরী করে, না হয় অন্য কোন আবাদে···দিনমজুরী খেটে রুজি কামাবে, খাল পার হতে দেবে না ডিঙ্গিতে, সাঁতরে পার হয়ে পালা-বার শেষ চেষ্টাই করেছিল···কিন্তু পারে নি! কুমীরের শক্ত কামড়ে আর্তনাদ করে তলিয়ে গেল অতলে কোন দুর্বার শক্তির আক্রমণে!

"মা হয়ে দেখনু বাবু, জান দিতে নারনু!" সত্যেনের সারা মন বিষিয়ে ওঠে।

এতবড় বিশ্বে তার কি মাথা নীচু করে সমস্ত বিধান, অত্যাচার মেনে নিয়েই থাকতে হবে!

বনের সুপ্ত মানবাত্মা আজ জেগে উঠেছে! তার ঠাঁই ও স্থির হয়েছে ওই জনগণের মধ্যে!··মহাযাত্রার হয়েছে সুরু!

···চমকে ওঠে সে! অনুভবই করতে পারেনি, সুন্দরবন হতে ফিরে এসেছে কলকাতার সহরতলীতে! তেঁতুল বটের ঘন ছায়ায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল এতক্ষণ! কোন স্বপ্নাবিষ্টের মতই এগিয়ে চলে !!

কখন যে বাড়ীখানার সামনে এসে পড়েছিল জানে না! ঘরের মধ্যে হতে গানের সুর ভেসে আসছে! থমকে দাঁড়ায়। নমিতার গলাই।

ঘরে প্রবেশ করেই বিস্মিত হয়ে যায়। একটি অপরিচিত ভদ্রলোক স্যুট পড়ে বসে,···গান চলেছে!···তাকে দেখে একটু মুখ তুলে চায় মাত্র নমিতা নেহাৎ অপরিচিতের মত!···গান শেষ হতেই ধীরে ধীরে উঠে ভিতরে চলে গেল সে!

কথাগুলো যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনে চলেছে সত্যেন! ভদ্র লোক এইবার ফাইনাল এম বি, দেবেন! খুব ভাল Brilliant ছেলে!

"তুমিত আর আসই না বাবা!" নমিতার মায়ের কথায় মুখ তুলে চাইল মাত্র সত্যেন!

: এমনি, নানা কাজের ভিড়!"

নমিতা বার হয়ে এল না! সারা মনে যেন কোনখানে তার অভিমানের ছায়া! যে পথ ছেড়ে একবার এসেছে, সে পথে পা বাড়াবে না সে—অতীতের সব পরিচয় মুছে দিতে চায় সে!

ধীরে ধীরে বার হয়ে এল সত্যেন! নমিতার এই ব্যবহারে একটু বিস্মিত করেছিল তাকে! নমিতা কি তবু কোন দাবী তার উপরেও রাখেনি—তবে কেন এই অভিমান!

অন্তরের অন্তরে কোন স্বার্থপর মানুষ হাহাকার করে উঠেছিল! সত্যই কাকে যেন হারিয়েছে সে! সাগ্রহে যে এসেছিল—সে তাকে প্রত্যাখানই করেছে! আজ তার উপর অভিমান করার কোন দাবীইত নাই!

পৃথিবীর আঁধার যেন ঘনতর হয়ে আসে!···সারা বিশ্বে সে একা, মা নাই—নমিতা নাই, পৃথিবীর কোন আকর্ষণই তার নাই! দুহাত দিয়ে সকলে তাকে ঠেলে দিয়েছে সামনের দিকে—মহত্তর সাধনার পথে।

আকাশের নিষ্প্রভ তারায় মায়ের চোখের আভা,—স্নেহময়ী কোন জননীর শান্ত কোমল পরশ!···সর্বাংগে সেই জ্যোতি-কণার আনাগোনা! গৃহাংগনে ছোট্ট স্বপ্ননীড়ের কল্পনা তার আজ নাই, বৃহত্তর বিশ্ব আজ ডাক দিয়েছে তাকে! সার্থক হোক তার সাধনা!

কার ঘর ভেংগে গেল! ধূলিসাৎ হয়ে গেল ইমারতের ইষ্টক। প্রাচীর প্রাংগনে মুকুলিত হল আশার তরু কুঞ্জ!

নমিতার দিনগুলো কেটে যায়, সহরের বৈচিত্র্যতার মধ্যে।

কলেজ হতে বার হয়েই ওদের হোষ্টেলে কেটে যায়!··· গঙ্গার বুকে ধাবমান ষ্টিমারের আশে পাশে ছিটকোন জল কণার বুকে কোন দূর সাগরের স্বপ্ন-জাল বোনে নমিতা। নিবারণ চেয়ে থাকে সামনের দিকে! দূরে রাজগঞ্জের আকাশকোলে বিলীয়মান মাস্তুলের আগায় সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকারের আনাগোণা!···বোটানিক্সের নির্জনতম গাম-গ্রোভের মধ্যে কোন ব্যাত্যান্দোলিত হাউয়াই হনলুলু সাগরতীরে বালুবেলার স্বপ্নমায়া!···

···দিন কেটে যায় হালকা পদধ্বনিতে! মহাকালের বুকে ছায়া পড়ে না।···

সুন্দর বনের গভীরতম প্রদেশে···কোন পথহারা হরিণ শাবকের হালকা পায়ের ছুটোছুটি বন্ধ হয়ে যায়, বনটিয়ার গান থেমে গেল!···দূর আকাশে আকাশে কাদের জয়ধ্বনি সোনা ফসলের স্তূপে চারিদিকে সমবেত চাষীদের স্ত্রী পুত্র নিয়ে আনন্দ-উল্লাস। নিস্তব্ধ বনের দিগন্ত সীমায় সাপলা কাটির খালের নিস্তরংগ জলের বুকে জাগে আলোড়ন! মশালের লালাভায় আকাশকোল রাংগা হয়ে ওঠে!

··এদের মাঝে সত্তোন মিলিয়ে আছে! মিলিয়ে আছে তার সমস্ত সত্ব—অনুপরমাণু তার দৃঢ়তর। মনের জয় যাত্রার নিশানা ওদের সম্মিলিত কণ্ঠের আনন্দধ্বনিতে!

ওদের যাত্রা সার্থক হোক।

···নমিতা ভুলে গেছে সব। সব ভুলতে চেয়েছিল সব তার অতীতকে, সত্তোনকে! কিন্তু পারেনি! নিবারণকে কাছে পেয়ে যেদিন আসল পরিচয় জানল তার, সভ্যতার মুখোসের অন্তরালে যে আদিম পশু মানবকে ভাল-বেসেছিল—তারই অনুশোচনায় সারা মন হাহাকার করে ওঠে।

···প্রতিবাদ জানাতে ভাষা নাই, আঘাত সে নীরবেই হজম করে ফিরে এল। তার সেদিন চরম পরাজয়। রূপের মোহতেই নিবারণ এগিয়ে এসেছিল। কোন দায়িত্ব স্বীকার করার সৎসাহস তার ছিল না। যেদিন বুঝতে পারল কথাটা নমিতা—সেদিন তার নারীত্বের দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে···মায়ের কথায় মুখ তুলে চাইল

"নিবারণ আসবে—বেড়াতে যাবি না?"

"সে আর আসবে না মা,

"আসবে না—?"

: না, আমি তাকে নিষেধ করে দিয়েছি।"

: কেন?

: সে কথা আর শুনতে চেয় না।"

মা অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন মেয়ের দিকে।···

আজ কোথায় সত্তোন জানেনা নমিতা। সে থাকলে হয়ত সান্ত্বনা পেত। এ অপমানের কথা একমাত্র বলতে পারে তাঁকেই। কিন্তু তাঁকেই ত সে দরজা হতে অপমান করে বিদায় করেছে। ক্ষমা চাইবে—তারও উপায় নেই।

···সংবাদপত্রের শীর্ষদেশে আজ সংবাদ পৌচেছে দূর সুন্দরবনের সীমা পার হয়ে কোন বন্দী মানবাত্মার আর্ত-নাদ!···প্রজাবিপ্লবের অন্যতম নেতার কারাবরণের কাহিনী! সোদরী গরাণ গাছের প্রহরীঘেরা বনভূমি হতে মানুষ বন্দী করে আনল মানুষকে। স্তব্ধ হয়ে গেল বনভূমির নব জাগৃতি, দিগন্ত কোলে সোনার ধানের আস্তরন—ওদের চোখের সামনে লক্ষ বোঝাই হয়ে হয়ে পাড়ি জমাল সহরের দিকে সাধুখাঁ বাহাদুরের গুদামে, মাল গুজারী নৌকার বালাম পালের রংগীন নিশান বাঁকের মুখে মিলিয়ে গেল। হরিণ শিশুর ডাগর চোখে বনভূমির বন্দনা—বনটিয়ার মনোবীণায় কলকাকলির সুর-রেশ! বাঁকের মুখে খালের বুকে হংসমিথুনের মধুমেলা কাদের বন্দুকের শব্দে ছিন্ন ভিন্ন হলনা!

···আবার সেই কারাপ্রাচীর। বহুদিনের পরিত্যক্ত সেলটা আবার মুখর হয়ে উঠল, বন্দীদের কলরবে।···নমিতা স্তব্ধ হয়ে যায়—সংবাদপত্রের স্তম্ভে সত্তোনের সংবাদ! সে আজ রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে বন্দী।·· কেন জানেনা···নমিতার চোখের কোণে আজ জলধারা! সেই তাঁকে এ পথে ঠেলে দিয়েছে। সেই এগিয়ে দিয়েছে কারাগারের অন্তরালে।

আজও চোখ অশ্রু সজল হয়ে ওঠে। সামলাতে পারেনা নিজেকে। নিজের এই দুর্বলতা কেন জানেনা বার বার মধুময় কল্পনার জোয়ার আনে মনে।

(শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়)

সমালোচনা ও নানা সংবাদ

চন্দ্রলেখা

প্রযোজক ও পরিচালক—এস্, এস্ ভাসন। আলোক চিত্রশিল্পী—কমল ঘোষ, নাম ভূমিকায়—রাজকুমারী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন—এস্, কে রাধা, রঞ্জন, যশোধরা কাট্টজু, সুন্দরী এবং জেমিনীর বালকবালিকাবৃন্দ। মাদ্রাজের জেমিনি ষ্টুডিওতে গৃহীত ও প্রযোজিত "চন্দ্রলেখা" স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত হয়ে সম্প্রতি বীণা, বসুশ্রী ও ওরিয়েণ্টে প্রদর্শিত হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের কলা-কৌশলের সাহায্যে একটি সাধারণ পর্যায়ের ছবি যে অভূত-পূর্ব আলোড়ন ও অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করতে পারে, তার নিদর্শন এই "চন্দ্রলেখা"। ছবিখানির প্রচার-সচিবের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়!

চন্দ্রলেখার সমালোচনার প্রথমেই মনে আসে কাহিনীর কথা। কাহিনী অনাবশ্যক দীর্ঘ ও দুর্বল—মাঝে মাঝে নানা অবান্তর দৃশ্য টেনে আনা হয়েছে একমাত্র নানান ধরণের নৃত্য সৃষ্টির জন্য। নৃত্য পরিকল্পনা প্রশংসাযোগ্য হলেও সংখ্যাধিক্য হেতু তার রস-গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। কাহিনীর সংগেও যেন নৃত্যগুলি খাপ খায়নি—মাঝে মাঝে এনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কাহিনীর সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে, যেদেশীয় রাজ্যে বিজলী বাতি জ্বলে—সার্কাস পার্টি আসে, সেখানে বড় ভাইকে লুকিয়ে রেখে, জীবিত পিতাকে বন্দী করে রেখে ছোট ছেলের সিংহাসন অধিকার করা অবাস্তবতায় পূর্ণ ও অনৈতিহাসিক। কাহিনীটি কোন্ দেশ কিংবা কোন্ সময়ের তা সম্পূর্ণ গোপন রাখা হয়েছে।

ছবিখানির একমাত্র ও প্রধান আকর্ষণ এর চিত্রগ্রহণ ও দৃশ্যসজ্জা। প্রশংসনীয় আলোক চিত্র গ্রহণের জন্য শ্রীযুত কমল ঘোষ প্রশংসাযোগ্য। নানা জাকজমকপূর্ণ ও বৃহৎ দৃশ্যগুলিকে তিনি অদ্ভুতভাবে চিত্রে গ্রহণ করেছেন। দৃশ্যপট পরিকল্পনা ও বিরাট দৃশ্যসজ্জা প্রশংসনীয় ও কৃতিত্বপূর্ণ। পরিচালকের প্রশংসা করতে পারতাম, যদি তিনি সস্তা ও অবাস্তব কাহিনী নির্বাচন না করতেন। কাহিনীর দোষ-ত্রুটিকে নানা চটকদারী উপাদানে ঢেকে তিনি দর্শক মনকে অভিভূত করতে চেয়েছেন, কিন্তু এতে একমাত্র আর্থিক লাভ হলেও, চিত্র শিল্প জগতের কোন উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্থ আদায়ের অনেক কলাকৌশলই আমরা দেখেছি, কিন্তু মন পরিতৃপ্ত করবার মত কিছুই নেই। অভিনয়াংশে উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই। চন্দ্রলেখা রূপে রাজকুমারী নৃত্য ও সংগীতে দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছেন। মাঝে মাঝে বিশেষ করে ছোট রাজকুমারের ভূমিকায় রঞ্জনের মধ্যে অতি নাটকীয় ভাব মনকে পীড়া দেয়। দুই রাজকুমারের অসি-যুদ্ধ প্রশংসনীয় কিন্তু আধিক্য দোষে দুষ্ট। পরিচালক যেন কোন কিছুই অল্প সময়ে শেষ করতে নারাজ।

ছবিতে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অবাস্তবতা দোষ থাকলেও পরিচালকের অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে নানা চাতুর্যপূর্ণ অথচ সস্তা উপাদানে "চন্দ্রলেখা" ভরপুর। এজন্য কর্তৃপক্ষের তহবিল দিনের পর দিন বৃদ্ধি হবার পক্ষে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করছে না। কিন্তু আজকের দিনের প্রযোজকদেরও কি এইটাই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকবে?

—মণিদীপা

মন্ত্রমুগ্ধ

যে সব চিত্র প্রতিষ্ঠান রুচি সম্পন্ন বাংলা বই তুলে দর্শকদের রুচিকে উন্নত করার প্রয়াস পেয়েছেন, নিউ থিয়েটার্স লিঃ তাঁদের অগ্রগণ্য। শুধু সেজন্য দর্শক সাধারণ নিউ থিয়েটার্সের ছবিকে শ্রদ্ধার সংগে গ্রহণ করেন। তিন বছর ধরে বহু অর্থ ব্যয় করে যখন 'অঞ্জনগড়' আত্মপ্রকাশ করলো, তখন নিউ থিয়েটার্স কর্তৃপক্ষ বুঝলেন যে, 'অঞ্জনগড়' সম্বন্ধে দর্শক সাধারণ যত প্রশংসাই করুক না কেন, তাতে টাকা আসবে না। তাই কি ছ'মাসের মধ্যে একখানি অতি সস্তা ধরণের বই তুলে কম খরচে 'মন্ত্রমুগ্ধ' দ্বারা বাজার মাৎ করার ভার পড়েছিলো পরিচালক শ্রীবিমল রায়ের উপর? বাংলার সিনেমা ক্ষেত্রে রুচি ও টাকা অনেকের মতে একসংগে পাওয়ার সময় এখনও আসেনি। তাই প্রথমটার ওপরই জোর দেওয়াতেই নিউ থিয়েটার্স

আমাদের কাছে এত প্রশংসনীয় ছিল! কিন্তু তার এই শোচনীয় পরিণাম দেখে রুচিসম্পন্ন দর্শক সমাজ আজ বিস্মিত হয়েছেন। 'উদয়ের পথে' এবং 'মন্ত্রমুগ্ধ' এই দুই ছবির পরিচালক যে এক ব্যক্তি তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে। বনফুল বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর কাহিনীকে চিত্র রূপায়িত করবার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু তাই বলে বর্তমান কাহিনীটার নির্বাচন কৌতুক চিত্রের খাতিরেও সমর্থন করতে পারবো না। আজকালকার যুগে কোনো মেয়েই 'সে গাঁয়েরই হোক বা শহরের মেয়ে' নিজের চোখের সামনে কোন মানুষকে পশু করে দেওয়া দেখলেও বিশ্বাস করবে না। অঘটন ঘটনার মধ্যে বাহাদুরী আছে সত্য, কিন্তু তাতে 'আলাদীনের প্রদীপের' সাহায্য নিলে হাস্যকরই হয় না, রুচিবিগর্হিতও হয়। কাহিনীর উদ্দেশ্য যদি দর্শকের হাসির খোরাক যোগাড় করা, তবে তা কিছু পরিমাণে সার্থক হয়েছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ লোকের কীর্তি-কাহিনীতে আমরা হাসি। এবং মন্ত্রমুগ্ধও হাসিয়েছে নেহাৎ কাতুকুতু দিয়ে।

পরিচালক শ্রীবিমল রায়ের যথেষ্ট নাম আছে। কিন্তু সুনাম থাকলেই যে তাঁর অপব্যবহার করতে হবে তার কোনো কারণ নেই। বৈকাল বেলায় জনমানবশূন্য লেকের কথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। রক্তাক্ত কান নিয়ে হোষ্টেলের জবাবদিহির ভয় যাকে অভিভূত করতে পারে; বেশী রাত করে ফিরতে তো তিনি কোনও কুণ্ঠা বোধ করেননি! তারপর একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করা দরকার। মাঝ রাতে গুণ্ডা, চোর, প্রভৃতি সম্বলিত কোন সংবাদ কোন মেয়ে হোষ্টেলের সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছ থেকে পুলিসের কাছে যখন গেল, তার তদারক করতে পুলিস এলো তার পরদিন দুপুর ১২।১টার সময়। পুলিসের সম্বন্ধে আমাদের যত খারাপ ধারণাই থাক না কেন, মেয়ে হোষ্টেল ও গুণ্ডা সম্বন্ধে এতটা গাফিলতি সাধারণতঃ পুলিসেরা করে না বলেই মনে হয়। ফটোগ্রাফী ভালই হয়েছে, শব্দগ্রহণ খারাপ হয়নি। তালা খোলা ও বন্ধ করার শব্দগ্রহণ করা উচিত ছিল। পদক্ষেপের শব্দগ্রহণ না করায় কিছু শ্রুতিকটু হয়েছে।

মোহনলাল ও চুমকির ভূমিকায় শ্রীসুনীল দাশগুপ্ত ও শ্রীমতী মীরা সরকারের মনোনয়ন দৃষ্টিকটু হয়েছে। অভিনয়ের দিক দিয়ে নবাগত শ্রীসুনীল দাশগুপ্তকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমবারে জড়তা হীনতার পরিচয় দিয়েছেন দেখে সত্যিই আনন্দিত। তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা আশা রাখি। তবে দু'এক জায়গায় তাঁর অতি-অভিনয় হয়েছে। শ্রীজীবেন বসু চরিত্রানুযায়ী ভাল অভিনয়ই করেছেন। শুভংকরীর ভূমিকায় শ্রীমতী রেবা বসুর অভিনয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ঝানু মল্লিকের ভূমিকাভিনেতা নবাগত হলেও অভিনয় ভালই করেছেন। 'মীরা সরকারের অভিনয় চলন সই। তুলসীবাবু নিজের পূর্ব মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছেন।

শেষ কথা, মন্ত্রমুগ্ধ কে হয়েছিল বলা শক্ত। চুমকি না মোহনলাল, শুভঙ্করী না হারাধন? "নিউ থিয়েটার্স কর্তৃ-না পরিচালক শ্রীবিমল রায়?"

—শ্রীবিনোদ ঘোষাল

সমাপিকা

সমাপিকার সমস্ত কাহিনীটি দুটি প্রধান চরিত্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এই দুটীর মধ্যে প্রথম শিবু ডাক্তার অর্থাৎ ডাক্তার শিবব্রত রায়ের। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে কাহিনীকার শিবু ডাক্তারকে একটী গোটা মানুষ করে তুলেছেন—কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। অপর চরিত্রটি হ'ল অজিতার। প্রথমটা অজিতাকে মনে হয় অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মানসকন্যাদের হারানো একজন। তার চরিত্রের দৃঢ়তা শেষ দৃশ্য পর্যন্ত বিশেষভাবেই অক্ষ: ছিল। সে সত্যের সেবায় নিজের কুমারী জীবনে কলং পর্যন্ত মাখতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু সেই সত্যান্বেষী মে-

যখন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে শিবব্রতের সামনেই সুশোভনকে বল্ল: "হ্যাঁ আমি তোমায় ভালবাসি" তখন সে আমাদের কাছে ছোট হয়ে গেল না। মিথ্যা বলিয়ে কাহিনীকার অজিতাকে আমাদের কাছে আরও মহত করে দিলেন। মহেশ ডাক্তারের চরিত্রের সুরু থাকলেও শেষ নেই। সে যে কেন একদিন অজিতাকে মোটর গাড়ীতে লিফ্ট দিতে চেয়েছিল, তার ইংগিত সারা কাহিনীর ভেতর কোথাও পাওয়া যায় না। শিবু ডাক্তারের চরিত্রের একটী কনট্রাষ্ট ব্যাকগ্রাউণ্ড আঁকবার জন্যেই যেন মহেশের চরিত্র সৃষ্টি। তবে কাহিনীটি খুব সুন্দর এবং ঘটনাবহুল।
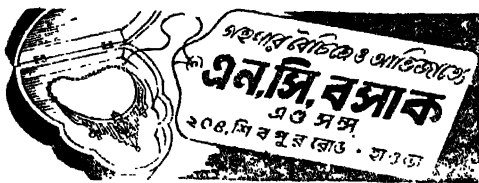
চিত্রনাট্যের বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে, সংলাপের আধিক্যে চরিত্র সৃষ্টি বহু জায়গাতেই বাধা পেয়েছে। পাকা সার্জ্জন শিবব্রত রায়ের পক্ষে মুমূর্ষ রোগীর অপারেশন ফেলে নার্সিং সম্বন্ধে লেকচার দেওয়া সাধারণ দর্শকের চোখে লাগে। এবিষয়ে সম্পাদকের দপ্তরে প্রকাশিত জনৈক পত্রপ্রেরকের অভিমতকে আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন কচ্ছি। মৃত্যুর সময় শিবু ডাক্তারকে দিয়ে অতগুলো কথা বলানো চিত্র নাট্যকারের পক্ষে উচিত হয়নি। "সুজিতা! আমার অসমাপ্ত কাজ........." বলে শিবু ডাক্তারের মৃত্যু হলেই যথেষ্ট হোত। কারণ, শিবু ডাক্তারের চরম পরিচয় আগেই আমরা পেয়েছি। চিকিৎসা শাস্ত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে ভুল ত্রুটী আছে। একটার উদাহরণ দিই। বলা হয়েছে, মায়ের পেট কেটে জুলিয়াস সিজারকে ভূমিষ্ট করানো হয়েছিল বলে ঐ ধরণের অপারেশনকে Caesarean section বলা হয়। কিন্তু ধাত্রীবিদ্যার এক নম্বর বই Queen's Charlotte's লিখছে—"Julius Ceasar was not born by this method." (vide Queen Charlotte's Text Book of Obstetries. Chapter XXX. Page 459, 1st Para). এই সমস্ত টেকনিক্যাল ব্যাপারের মধ্যে পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার একজন সুদক্ষ চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেই পারতেন। ...র একটি মস্তবড় ত্রুটী চোখে লাগে,—সেটি হচ্ছে পরুষ ...ী নিয়ে শিবু ডাক্তারের চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে যাওয়া (কারণ ঐ সময়েই শিবুর সংগে সুজিতার নার্সিং শেখার সময় দেখা হয় এবং প্রথম দেখান হয় যে সুজিতা চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে নার্সিং শিখছে)।

চিত্রগ্রহণ খুবই সুন্দর। ডলি শট্ এবং প্যানিংগুলি সত্যিই ভাল হয়েছে। কোথাও এতটুকু জার্ক নেই। ফোটগ্রাফীর টোন সর্বত্র সমান। ক্রটীর ভেতর—সুনন্দা দেবীর লো এংগেল থেকে নেওয়া শটগুলি দৃষ্টিকটু হয়েছে। হাসপাতালের বারান্দায় যে দৃশ্যে তিনি জহরবাবুর সংগে কথা কইছিলেন, সেই দৃশ্যে একটি ক্লোজ আপে ডিফিউসনের অল্পতার জন্যে সুনন্দা দেবীর মুখের লোমকূপ পর্যন্ত বিশ্রী ভাবে দেখা গেছে। ঐ দৃশ্যেই একটি শটে পূর্ণেন্দু বাবুর জামার ওপর মাইক্রোফোনের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। ঝড়ের দৃশ্যে যেখানে সুনন্দা দেবী গান করেন, সেখানে সার্সির ওপর বৃষ্টি পড়লেও একবারও বিদ্যুৎ চমকায় নি অথচ তার আগে এবং পরে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকানো দেখানো হয়েছে। সুশোভনের মাথা অপারেশনের দৃশ্যটির সময় রাত্রি—কিন্তু প্রচুর আলোক সম্পাতের জন্যে রাত্রি বলে বোঝাই যায় না। এ দৃশ্যে moody light করলে suspence আরও বেড়ে যেত বলে মনে হয়।

শব্দগ্রহণ প্রথম পর্যায়ের। একই লোকের কথার ওপর শট্ চেঞ্জ করা সত্বেও কণ্ঠস্বরের সমতা (level) ঠিক রাখার মত অত্যন্ত কঠিন কাজে শব্দযন্ত্রী তাঁর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। ইলেকশন ক্যাম্পেনের বক্তৃতায় কমল বাবুর কণ্ঠস্বর লাউড স্পীকার মারফৎ শোনান হয়েছে; এবং শব্দ গ্রহণেও লাউড স্পীকারের মেটালিক সাউণ্ড এফেক্ট দিয়ে শব্দযন্ত্রী যতীন বাবু সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। তবে ঝড়ের দৃশ্যের talkie portion-এ ঝড়ের ভেতর এক ফোঁটা হাওয়া নেই কেন? যতীন বাবুর চেষ্টা করা উচিত ছিল সত্যিকারের হাওয়া শুদ্ধ talkie shot নেওয়া। (যদিও হাওয়ার শব্দ re record করা হ'য়েছে)।

সম্পাদনার কাজও খুব সুন্দর। শট্ চেঞ্জে কোন জার্ক নেই। শেষ দৃশ্যের মোটর দুর্ঘটনার পর ছোট ছেলেটির কান্নার insert-টুকু অত্যন্ত ভাল লেগেছে। শিবব্রতর কাছে অজিতার ইলেকশনে সম্মতি পাওয়ার suggestion ইলেকশন postor-এ mix করে সম্পাদক মশাই অত্যন্ত
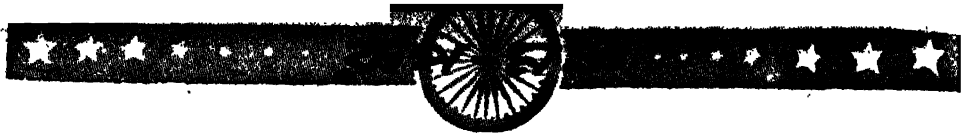
সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। তবে ছবির tempo fluctuate করেছে। প্রথমে মন্থর, মাঝে একবার বেড়েই আবার মন্থর এবং শেষে অত্যন্ত বেড়ে গিয়ে শেষ দৃশ্যে অত্যধিক সংলাপ থাকার দরুণ একেবারে ঝুলে গেছে। ইলেকশন ক্যাম্পেনে মহেশ ডাক্তার এবং সুজিতার বক্তৃতার location যে আলাদা, তা প্রথমটা wipe করে establish করা উচিত ছিল। তারপর intercut করে tempo তোলা যেতে পারতো ঐ খাদের দুর্ঘটনার দৃশ্যের climax এ দর্শকদের নিয়ে যাবার জন্যে। ছবির দু'একটি দৃশ্য, যেমন শ্যাম লাহার উপন্যাসের ফরমুলা: কমল মিত্র, বেণী খুড়ো এবং অজিতার কথোপকথন; সুশোভনের বান্ধবীর উষ্মা—স্রেফ ছেঁটে দিলে ছবিটা আরও ঝরঝরে হ'ত। ডাক্তার বাবুর মোটর চাপার সংবাদে সুজিতা হতবাক হয়ে গেল,—বেশ লাগল; এবং তখনকার নির্বাক ছবি খুবই suspense সৃষ্টি করেছিল কিন্তু তক্ষুনি করুণ back ground music সুরু হ'য়ে দৃশ্যের গুরুত্ব কমিয়ে দেয়—ওখানে বোধ হয় silence-ই music এর কাজ করত। হাসপাতালে শিবু ডাক্তার যে পথ দিয়ে আসেন (ক্যামেরাকে সামনে রেখে) যাবার সময় তাঁর (camera-.ক charge করে) সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে যাওয়া ভুল geography;—অন্য একটা passing shot যোগ করলে ভাল হ'ত। গান-গুলির চিত্রগ্রহণ সুন্দর হ'লেও অল্প out synchronised; —তবে মনে হয় সুনন্দা দেবী কাজের ঝামেলায় গান শিখতে ফাঁকি দিয়েছেন।

ছবির গান আর আবহ সংগীত শুনলাম। সংগীত পরি-চালক রবীন বাবুর সুর সৃষ্টি শুধু বাংলা কেন—ভারতের দরবারের জ.:মালা আনতে পারে। অভিনয়ের জন্যে প্রথম নম্বরের অভিনন্দন জানাই জহর গাঙ্গুলীকে। তিনি সত্যি-কারের বড় অভিনেতা। শিবু ডাক্তারের প্রাণের প্রতিটি স্পন্দন তিনি প্রত্যেকটি দর্শককে অনুভব করিয়েছেন। দ্বিতীয় অভিনন্দন হ'ল সুনন্দা দেবীকে,—সংযত এবং সুষ্ঠু অভিনয় করা তিনি জানেন। অন্যের সংলাপ overlap করান close upগুলি stand করায় সুনন্দা দেবী এত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন যে, মনেই হয় না তিনি অভিনয় করছেন। অজিতার মত কঠিন এবং জটিল চরিত্রটী ওঁ: অভিনয় গুণেই রূপ পেয়েছে। কমল মিত্রের অভিনয়ে: স্থান চিত্র নাট্যকার কোথাও দেন নি। বিপিন গুপ্ত এব পূর্ণেন্দু মুখুজ্জে ভাল অভিনয়ই করেছেন। টাইপ চরিত্রে: রূপ দিয়ে তুলসী চক্রবর্তী আবার আমাদের আনন্দ দিলেন দৃশ্যসজ্জা মনোরম। এন্, টির বাইরেও যে ভাল দৃশ্যসজ্জ: হ'তে পারে, তার পরিচয় সত্যেন রায়চৌধুরী তাঁর দৃশ্যপট নির্মাণের ভেতর দিয়ে দিয়েছেন।

এক কথায় সমাপিকা যে কোন দর্শককে আনন্দ দেবে।

—চোখ এবং কান

এস, বি, প্রডাকসন

শ্রীমতী সুনন্দা দেবী প্রযোজিত এস,বি, প্রডাকসনের দ্বিতীয় বাংলা চিত্র নিবেদন 'সিংহদ্বার'এর চিত্র গ্রহণের কাজ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সমাপ্ত হ'য়েছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন যশস্বী পরিচালক নীরেন লাহিড়ী। কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান চিত্রে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী অসীমকুমার নামে এক প্রিয়দর্শন তরুণ নায়কের সংগে বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন। সিংহদ্বারের অভিনয়াংশে আছেন সুনন্দা দেবী, অলকা, নমিতা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ফণী বিদ্যাবিনোদ, পাপা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা প্রভৃতি আরো অনেকে। সিংহদ্বারের দৃশ্য রচনার ভার ছিল উদীয়মান শিল্পী বিজয় বসুর ওপর। নবীন কৃতি চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্তের চিত্রগ্রহণে যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস। সিংহদ্বারের শব্দগ্রহণ ও সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ছিল যথাক্রমে গৌর দাস ও রবীন চট্টোপাধ্যায়ের ওপর।

বসুমিত্র

গত ২৭শে জানুয়ারী ক্যাসানোভায় বসুমিত্রের তৃতীয় অব দান 'সাংহাই'র মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। সাংহাই পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত অমল বসু। ইনি ইতিপূর্বে সহকারী পরিচালক রূপে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কাল ছায়া চিত্রেও প্রেমেন্দ্র বাবুর প্রধান সহকারী ছিলেন সাংহাই-এর আখ্যান বস্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেকার

...ংহাইয়ের পটভূমিকায় একটি জটিল রোমাঞ্চকর প্রায় সত্য ...প্চর কাহিনী এবং সচরাচর বাংলা ও ভারতীয় ছবি থেকে ...ম্পূর্ণ পৃথক বলেই প্রযোজক অভিনেতা শিশির মিত্র ...নিয়েছেন। সাংহাইয়ের প্রধান কয়েকটি চরিত্রে থাকবেন ...রাজ ভট্টাচার্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, ...শিশির মিত্র প্রভৃতি। স্থানীয় ষ্টুডিওর কাজ শেষ করে ...াকেশনের জন্য এপ্রিলের গোড়ার দিকে পরিচালক ...দবল নিয়ে সাংহাই যাবার আশা পোষণ করেন।

...ায়াপুরী পিকচার্স লিঃ

...বাণের অমর কাহিনী অবলম্বনে মায়াপুরী পিকচার্সের ...ংলা বাণীচিত্র 'তিলোত্তমা' সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের পরি-...লনায় গ্রথিত হ'য়েছে। কৌতুকাভিনেতা রণজিৎ রায় ...লোত্তমার সংগীত পরিচালনা, নৃত্য পরিকল্পনা এবং একটা ...শিষ্ট চরিত্রকে রূপায়িত করে তুলেছেন। নৃত্য-শিক্ষা ...য়েছেন পিটার গোমেশ। আমরা শুনে খুশী হলাম যে, ...-মঞ্চের অন্যতমা শুভানুধ্যায়ী ও পাঠক-গোষ্ঠীর সভ্যা ...মারী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়-এর সব ক'খানি গীত ...না করেছেন। নাম ভূমিকায় কর্তৃপক্ষ নবাগতা ...লোত্তমাকে সুযোগ দিয়ে আমাদের ধন্যবাদভাজন ...য়েছেন। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত হরি ...ং মহাশয় ছবিটির সর্বপ্রকার প্রস্তুতিতে দৃষ্টি রেখেছেন।

...চার-সচিবের কৃতিত্ব

...ধন্য প্রচারবিদ্ সুধীরেন্দ্র সান্যাল, সদ্যমুক্ত চিত্র-মায়ার ...বি-চিত্রের প্রচার পরিচালনায় যে শিল্পরুচি, কলাজ্ঞান ও ...ৌন্দর্যবোধের পরিচিয় দিয়েছেন, তা সত্যই প্রশংসনীয়। ...বর্ণ এবং দ্বিবর্ণে ছাপা কবির পরিচয় পুস্তিকাটির পরিকল্পনা ...িনবত্ব ও মুদ্রণ-পারিপাট্যে অতুলনীয়, এ ছাড়া আমরা ...বির একখানি অভিনব ডেস্ক-ক্যালেণ্ডার পেয়েছি।

তারাশঙ্কর ও দেবকীকুমার

সাহিত্য ও চিত্র-জগতের দু'জন প্রবীণ ও প্রতিভাবান শিল্পীর সম্মিলিত প্রতিভায় সমুজ্জ্বল, চিত্র-মায়ার প্রথম বাঙলা ছবি "কবি" চিত্ররসিক এবং সমালোচকদের আশাতীত আনন্দ দানে সমর্থ হয়েছে।

দেবকীকুমারের শিক্ষাধীনে প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রবীন মজুমদার, অনুভা গুপ্ত, নীতীশ মুখোপাধ্যায় এবং নীলিমা দাস বিস্ময়কর নটনিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থকার তারাশঙ্কর রচিত অধিকাংশ গানগুলিই মধুর সুর-সংযোজনার গুণে অতি শ্রুতিমধুর হয়েছে।

মুক্তি প্রতীক্ষায় "দেবী চৌধুরাণী"

রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের "দেবী চৌধুরাণী", এখনও তার শুভ-উদ্বোধনের পরম লগ্নটির প্রতীক্ষায় আছে। প্রকাশ যে, বাণী-চিত্রাকারে বঙ্কিমের মূল কাহিনীটিকে নিখুঁতভাবে রূপায়ণে, স্বনামধন্য আলোক-চিত্রকর শৈলেন বসু অসাধারণ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। প্রফুল্ল রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধান ও নির্দেশে ছবিখানির গঠনকার্য অতি যত্নের সংগে সুসম্পন্ন হয়েছে।

রাজশ্রী কথাচিত্র

এঁদের প্রথম সামাজ সমস্যা মূলক কথাচিত্র নিশির ডাক শীঘ্রই শ্রী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন অজিত মিত্র। কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চটোপাধ্যায়। নিশির ডাক পরিচালনা করেছেন অশ্বিনী মিত্র এবং সংগীত পরিচালনা করেছেন চিত্ত রায়।

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও

উদীয়মান পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের সন্দীপন পাঠশালার চিত্রগ্রহণ কার্য সমাপ্ত হ'য়ে মুক্তির দিন গুণছে। এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সাধন সরকার, মীরা সরকার, প্রদীপ কুমার, সুপ্রভা মুখুজ্যে, অমিতা বসু, কুমার মিত্র, সিধু গাঙ্গুলী, জীবন মুখুজ্যে, শান্তা; সত্যব্রত এবং মাষ্টার নিরঞ্জন প্রভৃতি। আমরা শুনে খুসী হলাম আমাদের সাংবাদিক বন্ধু, দীপালী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় 'সন্দীপন পাঠশালা'তেও শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহকারী পরিচালক রূপে কাজ করেছেন।
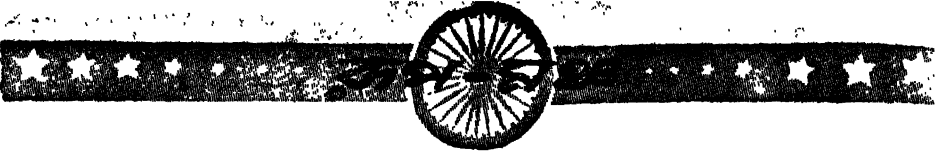
দেবীস্থান—কুমারী স্নেহলতা চক্রবর্তী দেবীস্থান নাম দিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তুলবার জন্য যে প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন—তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির কথা শুনে আমরা খুবই খুশী হলাম। সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এই প্রতিষ্ঠানটির সভানেত্রী। এই মহতী কাজের আমরা সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি এবং জনসাধারণকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী কর্তৃপক্ষকে আর্থিক সাহায্যে উৎসাহীত করতে অনুরোধ করি। সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা, কুমারী স্নেহলতা চক্রবর্তী, সম্পাদিকা—দেবীস্থান, ৩এ, নন্দরাম সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫।

মডার্ণ প্লেয়ার্স এসোসিয়েশন (বৌবাজার)। আমরা শুনে খুশী হলাম, মডার্ণ প্লেয়ার্স এসোসিয়েসন "কাবেরীর মৃত্যু" নামে একটি নাটক আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী রঙমহল রংগমঞ্চে ডাঃ আর, বি, পাল, ডিরেক্টার 'অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অফ হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেল্‌থ-এর সভাপতিত্বে মঞ্চস্থ করছেন। এই অভিনয়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থ অল ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অফ হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেল্‌থ-এর প্লেগ রিসার্চ স্কীম এর সাহায্যার্থে ব্যয়িত হবে

(৬৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

অন্ধকার নেমে গেছে। আবার যেন এ জগতে ফিরে আ... নমিতা, নিমন্ত্রণে যাবার সময় হয়ে গেছে।...তাড়াতাড়ি উঠে বসে। কারাপ্রাচীরের অন্তরাল হতে...লিখে... সত্যেন ..চিঠিখানা অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।...

...কয়েকটা বৎসরই কেটে গেছে। সত্যেনদের বাড়ী কোন চিহ্নই নাই, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের দৌলতে আ... চুরমার হয়ে গেছে তাদের বাড়ীটা। জেগে উঠেছে সেখানে কোন প্রাসাদোপম অট্টালিকা।...

আজ কোনখানেই তাদের কোন পরিচয়ই নাই। ত... সত্যেনের ছোঁয়া মন হতে মুছে যায় নি। নমিতার নিঃসং... জীবনে সেই আজ একমাত্র সংগী, একমাত্র বন্ধু। (শেষ)

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রূপ-মঞ্চ কার্যালয় ও এম, আই, প্রেস, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫, হ'তে সম্পাদিত ও মুদ্রিত এবং ৭৪।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ'তে প্রকাশিত।

-- শ্রীযুক্ত রাধামোহন ভট্টাচার্য --

রূপমঞ্চ : শ্রাবণ ’১৩৫৪

নবাগতা মলয়া সরকার ও পরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
নরেশ মিত্র পরিচালিত 'বিদুষী ভার্যা' চিত্রের বিশিষ্ট ভূমিকায়।
———— চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে! ————

অষ্টম-বর্ষ
দশম-সংখ্যা

রূপ-মঞ্চ

— ফাল্গুন —
১৩৫৫

পশ্চিমবঙ্গ আমোদকর সংশোধনী বিল

৫ই মার্চ, পশ্চিমবঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সিনেমা টিকেটগুলির ওপর আমোদকরের বর্তমান হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা সমন্বিত পশ্চিমবঙ্গ আমোদকর সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। অর্থসচিব মাননীয় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পরিষদে এই বিলটি উত্থাপন করেন। বিলে সিনেমা টিকেটগুলির করের হার বৃদ্ধি ছাড়া সিনেমাগুলিতে করমুক্ত কমপ্লিমেণ্টারী টিকেট বা পাশের ওপরও একই হারে আমোদকর ধার্য করার প্রস্তাব হ'য়েছে। বর্তমানে সিনেমা টিকেটগুলির ওপর মূল্যানুযায়ী শতকরা কিঞ্চিন্‌ন্যূন ২০ ভাগ হ'তে সর্বোচ্চ ৩৩১/২ ভাগ কর ধার্য আছে। প্রস্তাবিত আইনে এই করের হার সর্বনিম্ন শতকরা ২৫ ভাগ ও সর্বোচ্চ ৭৫ ভাগ করবার ব্যবস্থা হ'য়েছে। তিন আনা পর্যন্ত মূল্যের টিকেটগুলির ওপর পূর্বের ন্যায় কোন কর ধার্য করা হবে না। প্রস্তাবিত কর ধার্যের ফলে গভর্ণমেণ্টের প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আয় হবে বলে আশা করা যায়। বিলের উদ্দেশ্যপ্রকরণে বলা হ'য়েছে যে, সরকারী আয় বৃদ্ধির স্বার্থেই সিনেমা টিকেটগুলির ওপর বর্তমান করের হার বৃদ্ধি করা এবং কমপ্লিমেণ্টারী টিকেটগুলির ওপর কর ধার্য করা প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালের পশ্চিমবঙ্গ অর্থ সংশোধনী আইনের বিধান অনুসারে সিনেমা টিকেটগুলির ওপর আমোদকরের বর্তমান হার আগামী ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চালু থাকবে এবং এই বিল ঐ তারিখের পূর্বে গৃহীত না হ'লে, উক্ত করের হার মূল আমোদকরের হারগুলিতে ফিরে যাবে।

প্রস্তাবিত আমোদকর সংশোধনী বিলের হার

(১) তিন আনার অধিক হ'তে একটাকা মূল্যের টিকেটগুলির ওপর মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ কর ধার্য হবে।
(২) একটাকার অধিক হ'তে তিন টাকা মূল্যের টিকেটগুলির ওপর শতকরা ৫০ ভাগ কর ধার্য করা হবে।
(৩) তিন টাকার অধিক মূল্যের টিকিটগুলির ওপরে শতকরা ৭৫ ভাগ কর ধার্য করা হবে। এতদ্ব্যতীত সিনেমা গৃহগুলিতে পাশ বা কমপ্লিমেণ্টারী টিকিট যে কোন নামেই ফ্রি পাশ দেওয়া হউক না কেন, সে সমস্ত ফ্রি পাশের ওপরেও যে বিশেষ সিটের জন্য পাশ দেওয়া হ'য়েছে, সেই সিটের টিকটের মূল্যানুযায়ী উপরোক্ত হারে কর ধার্য হবে। মূল বিলে প্রথম দু'টী ক্ষেত্রে এরূপ বিধান ছিল যে, তিন আনার অধিক হ'তে আট আনা পর্যন্ত টিকেটগুলির ওপর ২৫ ভাগ এবং আট আনার অধিক হ'তে ৩৲ টাকা পর্যন্ত টিকেটগুলির ওপর ৫০ ভাগ কর ধার্য করা হবে। কিন্তু পরিষদে বিলের দফাওয়ারী আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ঘোষ এরূপ এক সংশোধন প্রস্তাব করেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই 'আট আনা' কথাটি তুলে দিয়ে 'এক টাকা' করা হউক। সরকার শ্রীযুক্ত ঘোষের সংশোধন প্রস্তাব স্বীকার করে নেন এবং পরিষদে উহা গৃহীত হয়।

সরকার দলের চীফ হুইপ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের এক সংশোধন প্রস্তাবক্রমে এরূপ বিধান করা হয় যে, ধার্য করের শতকরা হার কষতে গিয়ে ফলে এক আনার কোন অংশ হ'লে পুরাপুরি এক আনাই কর গ্রহণ করা হবে। ইতিপূর্বে এই বিলের বিস্তারীত বিবরণ বাংলা সরকারের গেজেটে প্রকাশ করা হ'য়েছিল। গেজেটে আমোদকর বৃদ্ধির কথা আমাদের মত বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের যেকোন শুভানুধ্যায়ীকেই যে বিচলিত করে তুলেছিল, এরূপ

প্রযোজনায়

শ্রীরবিপ্রসাদ গুপ্ত

ও

শ্রীইন্দ্রজিৎ সিং

সহযোগিতায় ও চিত্র-নাট্য-রচনায়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বসু মল্লিক

এম-এ-বি-এল্

সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্রের

মানসকন্যা…

ভবানী পাঠকের নিষ্কাম ধর্ম-সাধনায় উত্তীর্ণা—প্রফুল্ল-দেবীরাণীর সমন্বয়ে যে ভোগ-বিমুক্তা, যোগময়ী মাতৃ-মূর্তির স্মৃতি, লোক চিত্তে অবিস্মরণীয় মাধুর্যে অক্ষয় হইয়া আছে—

বাণী-মুখর ছবির পর্দায়

তাহারই রূপারোপপ্রাণ-ধর্মে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

চিত্ররূপ ও নির্দেশ:

প্রফুল্ল রায়

চলচ্চিত্রায়ণে:

শৈলেন বসু

পরিচালনায়:

সতীশ দাশগুপ্ত

সুর-সৃষ্টিতে: কালীপদ সেন

শিল্প-নির্দেশে: বটু সেন

●

বিশিষ্ট চরিত্রে:

ছবি বিশ্বাস, নীতীশ, প্রদীপ কুমার, উমা গোয়েঙ্কা, সুদীপ্তা, রেবা বসু, উৎপল সেন, উপেন চট্টোপাধ্যায়, প্রভা, ফণী রায় প্রভৃতি।

মুক্তি আসন্ন প্রায়!
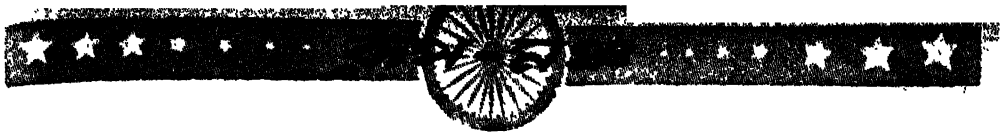
[বি]শ্বাস আমাদের আছে। তাই গত অধিবেশনে বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হবার পূর্বেই সরকারের কাছে নানান মহল থেকে প্রতিবাদ জানানো হ'য়েছে। আমরা শুনে খুশী হলাম, বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতিও এবিষয়ে যথাসময়ে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা বোধ করেন নি। বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প নানান বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে আজ যতটুকু মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পেরেছে—তা ব্যক্তিগত ভাবে বহুজনের প্রচেষ্টা এবং বাঙ্গালী চিত্রামোদী জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই। বৈদেশিক শাসন আমলেও যেমনি চিত্রজগতের ওপর সরকারী শোষণ ব্যতীত অন্য কোন নেক নজর পড়েনি—স্বদেশী আমলেও তার কোন ব্যতিক্রম আজ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। সরকারের শোষণ আর সমাজের তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়ে যে শিল্পকে হামাগুড়ী দিয়ে চলতে হ'য়েছে—আজও সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলো না বলে, সমাজ ধুরন্ধরেরা ও আমাদের স্বদেশী সরকারী কর্তারাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী নাক সিটকে ওঠেন। কিন্তু তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন সম্পর্কে যদি জনসাধারণ জবাবদিহি করেন—কী তাঁদের উত্তর দেবার থাকবে? কিছুই না! এতদিন বৈদেশিক সরকারের দোহাই দিয়ে সমস্ত কর্তব্যের বোঝা থেকে রেহাই পেয়েছি। স্বদেশী পাণ্ডারাও আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন: সবুর কর—দেশটাকে আগে স্বাধীন হ'তে দাও—আমাদের গদিতে বসতে দাও—সব হবে। আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিয়োজিত হ'য়েছে তাই দেশ স্বাধীন করবার সংগ্রামে। সংগ্রামে আমরা 'জয়ী' হ'য়েছি—সত্য, কিন্তু আমাদের দুঃখ দুর্দশার অবসান হ'য়েছে কী কিছু? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে চলছে—তার সংগে কঠোর পরিশ্রম করেও আয়ের সমতা রক্ষা করতে পাচ্ছি না। শুধু লাভ হ'য়েছে আমাদের নেতাদের সরকারী গদিতে বসাতে পেরেছি। ব্যক্তিগত লাভালাভ থেকে চলচ্চিত্র শিল্পও দেশ স্বাধীন হবার পর, একটুকুও নিজেকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করতে পারেনি। অথচ জুলুম যেন তার ওপর বেড়েই গেছে। কিছুদিন পূর্বে 'সেন্সারসিপ' নিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের মস্তিষ্কের উর্বরতার পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। বর্তমানে প্রস্তাবিত আমোদকর বৃদ্ধির পরিকল্পনাকেও অনুরূপ উর্বরতার পরিচায়ক ব্যতীত অন্যভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু এবার আমরা সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যান্বিত হ'য়ে উঠেছি এই জন্য যে, মাননীয় অর্থ সচিব একজন বাস্তববাদী বলেই আমাদের কাছে পরিচিত। অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাঁর বিজ্ঞতা সর্বজন স্বীকৃত। দেশীয় শিল্পের প্রতি তাঁর শুধু অনুরাগের পরিচয়ই আমরা পাইনি—তাঁর কর্মতৎপরতার সাফল্যও তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে—কিন্তু সামান্য দশ লক্ষ টাকার ঘাটতি পূরণের জন্য আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাবে তাঁর অদূরদর্শীতার কথাই আমাদের কাছে প্রমাণিত হ'য়েছে। সরকারের আয় এবং ব্যয় দুইই দেশ এবং দেশবাসীকে কেন্দ্র করে। সময়ের বিভিন্নতায় বিভিন্নখাতের আয় বৃদ্ধি ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়—নতুন নতুন সমস্যার জন্য ব্যয়ের পরিমাণও অনুরূপ দেখা দেয়। তাই নতুন করে কর ধার্যের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করবো না—তবে তা যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু যে শিল্প এখনও স্বাবলম্বী হ'য়ে উঠতে পারে নি—সরকারী কৃপাদৃষ্টি লাভের আশায় আজও যে চাতকের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে—তাকে সাহায্য না করে যদি উলটে এমনিভাবে করের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়-তাতে সে শিল্প আরো কী পঙ্গু হ'য়ে পড়বে না? বঙ্গবিভাগের জন্য বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পকে খুবই ঘা খেতে হ'য়েছে—বাঙ্গালীর আত্মঘাতী উদারতার জন্য বাংলার বাজার থেকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ছবিগুলি হাজারে হাজারে টাকা লুটে পুটে নিয়ে যাচ্ছে—অথচ বাংলা ছবির সে সৌভাগ্যত দূরের কথা—বাংলার বাইরে বাঙ্গালীদের মুখদর্শন করবার সুযোগও সব সময় মেলে না। পশ্চিমবঙ্গে যে মুষ্টিমেয় দর্শকসমাজ রয়েছেন—তাঁদেরই সংগে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের ভাগ্য জড়িত। তাঁদের আর্থিক অবস্থা এমন কিছু আহামরি নয়—একথা নতুন করে মাননীয় অর্থ সচিবকে বোধ হয় বোঝাতে হবে না। অথচ এই বর্ধিত হারে আমোদকরের বোঝা তাঁদেরই বইতে হবে। কারণ, পরোক্ষ করনীতির (indirect taxation) মজাই এই। দেখতে মনে হয়, এই আমোদকরের বোঝা প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরাই বয়ে

বেড়াচ্ছেন। মূলতঃ কিন্তু যাচ্ছে চিত্রামোদী জনসাধারণের পকেট থেকে। বিভিন্ন আর্থিক সমস্যায় যাঁদের জীবন কণ্টকিত—অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির অভাব কুলিয়ে ওঠাও সকলের পক্ষে সম্ভব নয়—তবু এরই ভিতর সপ্তাহে, মাসে বা বৎসরে কিছু সঞ্চয় করে তাঁরা দু'একবার ছবি দেখে থাকেন—ক্ষণিকের আনন্দ পাবার জন্য। (ক্ষণিকের আনন্দই বলবো—কারণ, এখনও চলচ্চিত্র তার অন্তর মাধুর্য নিয়ে আমাদের দেশে পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি—।) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য দিন দিন যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে—আমোদ প্রমোদ বা অন্যান্য খাতে ব্যয় করবার ক্ষমতাও সেই হারে হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে। কর বৃদ্ধি না করবার পূর্বেই এজন্য আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের আর্থিক বনিয়াদ বেশ কিছুটা আঘাত পেয়েছে। বর্তমানে যদি বর্ধিত হারে কর চাপানো হয়—তাহলে মরার ওপর খাড়ার ঘা দেওয়া ছাড়া আর কী বলবো? এবং বর্ধিত হারে কর চাপালে—উচ্চ শ্রেণীর আসনগুলির বিক্রয় সম্ভাবনা অনেকটা অনিশ্চিত হবার আশংকায়, প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা নিম্ন শ্রেণীর আসনগুলির মূল্যও যে বৃদ্ধি করবেন—সে আশংকাও আমাদের মনে জাগবার যথেষ্ট কারণ আছে।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে বাস্তব দৃষ্টিভংগী দিয়ে বিষয়টিকে আমরা বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। ফ্রি পাশের ওপরও কর ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে—এতে দুর্নীতিই বৃদ্ধি পাবে। এবং এই দুর্নীতির আশ্রয় করে শুধু ফ্রি পাশের করের বোঝা থেকেই প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা রেহাই পাবেন না—তাঁরা যদি সত্যই দুর্নীতির সাহায্য গ্রহণ করেন, টিকিটের ওপর ধার্য করের বোঝা থেকেও রেহাই পেতে পারবেন। মাননীয় অর্থসচিব একজন বাস্তববাদী হ'য়েও যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন? তাহ'লে বলবো, সরকারী কর্মচারীদেরই এ কথা জিজ্ঞাসা করুন। তাঁরা যদি এজন্য পরিদর্শকও নিয়োগ করেন—সরকারের করের ঘরে শূন্য বসিয়ে পরিদর্শকদের পকেটে কিছু পুরে দিয়ে—প্রেক্ষাগৃহের মালিকেরা বেশ একটা উপরি কামিয়ে নিতে পারবেন।

সবচেয়ে আশ্চর্য হ'য়ে যাচ্ছি আমাদের রথী-মহারথী এম, এল এ মহাশয়দের কাণ্ডকারখানা দেখে! বিলটি গৃহীত হবার সময় তাঁরা মুখে কাপড় গুজে ছিলেন কিনা বলতে পারি না। জনসাধারণ ও দেশীয় একটী নতুন শিল্পের স্বার্থ যার সংগে জড়িত, সে বিষয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র কর্তব্যের পরিচয় কেউ দেননি। অথচ জনসাধারণের অনুকম্পার ছাপ নিয়েই তাঁরা ব্যাবস্থা পরিষদকক্ষে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন এবং এখনও সেখানকার শোভা বর্ধন কচ্ছেন। কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, একথা নিজেদের স্বার্থেই তাঁদের মনে রাখা উচিত। জনসাধারণ নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠ করেছেন—দেশের শাসন পরিচালনার পুরোভাগে কংগ্রেসের আদর্শ সামনে রেখে যাঁরা অধিষ্ঠিত হয়েছেন—আশা করি তার অমর্যাদা তাঁরা কখনই করবেন না। —শ্রীকাঃ

আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাবে মাননীয় অর্থ-সচিবের নিকট বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির স্মারক লিপি—

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরও বর্ধিতহারে যে আমোদকর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছেন, তার প্রতিবাদে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির পক্ষ হতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসচিব শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকারের নিকট নিম্নলিখিত মর্মে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

এই প্রদেশে আরও আমোদকর বৃদ্ধি কল্পে যে বিল উত্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে এই সমিতি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে: বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্বমূলক এই প্রতিষ্ঠান কতক গুলি প্রাসংগিক তথ্য ও প্রস্তাব বিবেচনার্থ উপাপন করিতেছে :—

(১) গত যুদ্ধাবসানের পর হইতে সিনেমার দর্শকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে; কলিকাতার কলেক্টরের কাগজ পত্রেই ইহার প্রমাণ মিলিবে। (২) এই সময়ে চিত্র নির্মাণ, পরিবেশন ও প্রদর্শনের ব্যয় যুদ্ধপূর্বকাল অপেক্ষা যথাক্রমে শতকরা ১০০৲ ৭৫ ও ৭৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। (৩) এই সময়ে প্রদেশ বিভাগের ফলে বাংলা চিত্র প্রদর্শনের বিক্রয়ও সংকুচিত হইয়াছে। (৪) জনসাধারণের ব্যয় ক্ষমতাও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে, ফলে চিত্রসমূহের পুনঃ

প্রদর্শনে সন্তোষজনক অর্থোপার্জন হয় না। (৫) উপরোক্ত কারণে বাংলার বহু চিত্র নির্মাতা আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। (৬) এই শিল্প দেশের অত্যধিক করভার প্রপীড়িত শিল্পগুলির অন্যতম। (৭) আরও করবৃদ্ধি করা হইলে আয় আরও কমিয়া যাইবে এবং উহার ফলে বাংলা ছবির ধ্বংস সাধিত হইবে। বাংলা ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র অতি ক্ষুদ্র। (৮) বাংলায় আর চিত্র নির্মাণ সম্ভব হইবে না। ফলে হাজার হাজার লোক বেকার হইবে এবং এমন অনেকে দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়া পড়িবে যাহারা ষ্টুডিওর পিছনে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করিয়াছে। (৯) বিহারে আমোদকর বৃদ্ধির ফলে সরকার এবং ব্যবসায়ীদের আয় বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। (১০) পূর্ব পাকিস্থানের কর্তৃপক্ষও আমোদকর বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের আবেদন বিবেচনা করিয়া ঐ সংকল্প ত্যাগ করা সংগত মনে করেন। তাঁহাদের যুক্তিও ছিল আমাদেরই অনুরূপ। (১১) ইংলণ্ডেও এখানকার মত অবস্থা হওয়ায় বিলাতের গবর্ণমেণ্ট চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদিগকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

উপরোক্ত তথ্য পেশের পরেও সরকার যদি আমোদকর বৃদ্ধির ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সমিতি ছয় মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে নিম্নরূপ হারে কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছে। ॥০ আনা ও ১৷৷০ টাকা পর্যন্ত ২৫%, ১৷৷০ টাকার উর্ধ্বে এবং ৩৲ টাকা পর্যন্ত—৩৩⅓%, ৩৲ উর্ধ্বে—৫০% ট্যাক্স।

আসন সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ—১৷৷০ হইতে ৩৲ টাকা মূল্যের আসন—বিনা করে স্বত্বাধিকারীর পরিবারস্থ লোকজনের এবং চিত্র ব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহার করিতে দেওয়া হউক।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির পক্ষ হতে উক্ত স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছেন বি, এন, সরকার (সভাপতি), এম, ডি, চ্যাটার্জি (সহ-সভাপতি) এম ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ), এন, সি ঘোষ (প্রডিউসার্স সেকসনের চেয়ারম্যান), সি বি দেশাই (ডিষ্ট্রিবিউটর্স সেকসনের চেয়ারম্যান), এইচ পাল (একজিবিটর্স সেকসনের চেয়ারম্যান), এস এন ঘোষ, এ বসু, এস মল্লিক, বাবুভাই কে কাপাডিয়া, রতিলাল শেঠ, ডি এ পি আয়ার, কে, এন, চ্যাটার্জি, এইচ চন্দ্র, এইচ ব্যানার্জি, এন এ প্যাটেল। আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তাবিত কর বৃদ্ধির বিপক্ষে অভিমত পোষণ করি। তবু, আপাততঃ বঙ্গীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির পরিকল্পনায় সমর্থন করছি।

'উদয়ের পথে' ও 'ভুলি নাই'-খ্যাত রাধামোহন ভট্টাচার্যের সংগে শ্রীপার্থিবের সাক্ষাৎকার

উদয়ের পথে ও ভুলি নাই চিত্রের রাধামোহন ভট্টাচার্য আজ আর বাঙ্গালী চিত্রামোদীদের কাছে অপরিচিত নন। তাঁর অভিনয় দক্ষতা আজ সর্বজন প্রশংসায় ধন্য হ'য়ে উঠেছে। অথচ প্রথম যেদিন তিনি চিত্র জগতে প্রবেশ করেন—শিক্ষা, আভিজাত্য ও অভিনয়-দক্ষতা থাকা সত্বেও, বাংলা চিত্র জগত থেকে তাঁকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা নিয়েই ফিরে যেতে হ'য়েছিল। এই প্রত্যাখ্যান রাহুগ্রাসের মত শুধু তাঁর বিকাশকেই রুদ্ধ করেনি, রূপ-মঞ্চের পাতায় যে সব শিল্পী-দের সংগে ইতিপূর্বে আমি পাঠকসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি—তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই এমনি প্রত্যাখ্যানের বেদনা নিয়ে অপেক্ষা করতে হ'য়েছিল। তবু তাঁরা ভেংগে পড়েননি—আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠা নিয়ে পথ খুঁজে নেবার অপেক্ষায় দিন কাটিয়েছেন। সত্যকার প্রতিভার পথ কোন সময়েই কোন বাধায় চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হ'য়ে যায়নি—পূর্ণ বিকাশের মহিমা নিয়ে বরং বাংলার চিত্র ও নাট্য-জগতকে বিস্মিত করে তুলেছে। রাধামোহন সম্পর্কে কিছু বলবার পূর্বে—সেই প্রতিভার উদ্দেশ্যেই আমি দু'চারটি কথা বলে নিতে চাই—যে প্রতিভা—আজও বিকাশের কোন সুযোগ পায়নি—যে প্রতিভা—ব্যর্থতার আঘাতে নিজের মাঝেই গুমরে গুমরে কেঁদে বেড়ায়, একদিন তাঁদের মুখে হাসি ফুটে উঠবে—তাঁরাও বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতের রুদ্ধ দুয়ার ভেংগে পথ করে নিতে পারবেন—সেদিন তাঁদের প্রতিভার আলোকে বাংলার চিত্র ও নাট্যজগত সত্যই উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে। অন্ধকারের বুকে যাঁরা আজ ম্লান মুখ লুকিয়ে আছেন—শ্রীপার্থিব তাঁদের কথাও এমনি ভাবে একদিন সকলের কাছে বুক ফুলিয়ে বলবার সুযোগ পাবে—সে বিশ্বাস আছে বলেইত আজ তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে যাই।

১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯শে ভাদ্র), বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর-এ শ্রীরাধামোহন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার এগারোটি সন্তানের মধ্যে রাধামোহন নবম এবং ভাইদের ভিতর তৃতীয়। রাধামোহনদের পরিবারটি শিক্ষা, আভিজাত্য এবং ঐশ্বর্যের দিক থেকে খুবই খ্যাতিসম্পন্ন। তার পিতামহ স্বর্গত শিবদাস ভট্টাচার্যকে আজও বিষ্ণুপুরে অনেকেই ভুলে যেতে পারেন নি। সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে তাঁর দান ছিল অনেকখানি। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টা ও আন্তরিকতায় বিষ্ণুপুরে তখন দু'টী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তার মধ্যে একটী হচ্ছে বিষ্ণুপুর হাই স্কুল আর একটি হচ্ছে শিবদাস বালিকা বিদ্যালয়। তিনি এই দু'টী বিদ্যালয়েরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ পুরুষ ছিলেন—সংগঠন ক্ষমতাও তাঁর ছিল অদ্ভুত। সংগীত শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও যেমন ছিল—আগ্রহও তেমন কম ছিল না। তাছাড়া গবেষণামূলক বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল পত্র সংগ্রহে তাঁর সাধনা ছিল অপরিসীম। বিষ্ণুপুর শুধু আজ বাংলার ইতিহাসেই নয়—ভারতের ইতিহাসেও এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। বিষ্ণুপুরের মাঠ - ঘাট—বনানী—ভূগর্ভমুখী প্রাচীন সৌধমালার ভগ্নাবশেষ আজও বাংলার এক গৌরবময় অধ্যায়কে বুকে করে আছে। তার প্রতিটি ভগ্ন ইঁট—বাংলার ঐতিহ্য ও কৃষ্টি আজও মুছে যেতে দেয়নি। অথচ বৈদেশিক শাসকের আমলে বাংলার গৌরবমণি বিষ্ণুপুরের কত গৌরব কাহিনীই না লুপ্ত হ'তে বসেছিল! স্বর্গতঃ শিবদাস ভট্টাচার্য বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীকে যেমনি বিষ্ণুপুরের প্রতি তাঁদের কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে তুললেন—তেমনি বিষ্ণুপুরের প্রতি বাংলার সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণেরও কম চেষ্টা করলেন না। ১৯১৭ খৃঃ-এ ৭২ বৎসর বয়সে রাধামোহনের পিতামহ স্বর্গারোহণ করেন—তখন রাধামোহনের বয়স মাত্র আট-

বৎসর। পিতামহের স্নেহের মধ্য দিয়েই রাধামোহনের শৈশবের আটটি বৎসর অতিক্রান্ত হয়।

রাধামোহনের পিতা স্বর্গতঃ ভোলানাথ ভট্টাচার্যও তাঁর পিতার বহু সদগুণ লাভ করে ধন্য হ'য়েছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন—প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে রাধামোহনের পিতা শিক্ষক ও ছাত্রমহলে খুব মেধাবী ছাত্র বলেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন এবং প্রতিটি পরীক্ষায় তাঁর সে খ্যাতি কোন সময়েই ম্লান হ'তে দেননি। ভোলানাথ বাবু ইচ্ছা করলে তখন যে কোন সরকারী উচ্চ পদে আসীন হ'তে পারতেন—কিন্তু তিনি তা করেননি। তাঁর নিজেরও সরকারী চাকরীর প্রতি কোন মোহ ছিল না—তাঁর পিতাও তাঁকে এবিষয়ে প্রশ্রয় দেননি। তিনি পড়াশুনা শেষ করে বিষ্ণুপুরেই স্বাধীনভাবে ওকালতি ব্যবসা সুরু করে দিলেন। পিতার মতই ভোলানাথবাবু তাঁর কর্মদক্ষতা ও আন্তরিকতায় বিষ্ণুপুরের জনসাধারণের অন্তরে নিজের স্থান করে নিলেন। একাধিক্রমে পঁচিশ বছর তিনি বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেছিলেন—তাছাড়া দীর্ঘদিন বার এসোসিয়েশনের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন। তাঁর সমকক্ষ বিষ্ণুপুরে তখন আর কোন আইনজীবি ছিলেন না—এদিক থেকেও তিনি যথেষ্ট পসার করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিতাবস্থায় যে দু'টী কর্মনিদর্শনের জন্য বিষ্ণুপুর বাসীদের কাছে আজও তিনি স্মরণীয় হ'য়ে আছেন—তা হচ্ছেঃ (১) বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজ বংশের তদানীন্তন একমাত্র শেষ বংশধরকে খুবই আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে হয়। এমনকী দৈনন্দিন সাংসারিক ব্যয়ভারও কুলিয়ে ওঠা তাঁদেব পক্ষে সম্ভব ছিল না। ভোলানাথ বাবু এ বিষয়ে সরকারকে রাজ পরিবারের জন্য কোন মাসোহারা ব্যবস্থা করবার জন্য লেখালেখি আরম্ভ করেন—তাঁরই উদ্যোগ ও পরিশ্রমের ফলে রাজ পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য সরকার থেকে মাসিক বৃত্তি বরাদ্দ করা হয়। (২) ভোলানাথ বাবুর দ্বিতীয় স্মরণীয় কর্ম সাফল্য হ'লো, বিষ্ণুপুর সংগীত বিদ্যালয়। বর্তমানে যা বিষ্ণুপুর মিউজিক কলেজ নামে খ্যাত—তাঁর তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুর যেমনি বাংলার প্রাচীন কীর্তিকলাপ বক্ষে ধারণ করে আছে—তেমনি বাংলার সংগীত সম্পদকে নিজের কঠোর সাধনায় আজও লুপ্ত হয়ে যেতে দেয়নি—বরং সংগীতের প্রতিটি রাগ রাগিনীকে ঘরে ঘরে অমর করে রেখেছে। সুবিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষ্ণুপুরেরই অধিবাসী। ভোলানাথবাবু নিজে সংগীত শিল্পী ছিলেন না—কিন্তু তিনি ছিলেন সংগীতের একজন পরম রসিক শ্রোতা ও বোদ্ধা। তাই সংগীত সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুরে একটী সংগীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং তাকে বাস্তব রূপ দিতে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করেননি। বহুদিন তিনি এই সংগীত বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে তিনি যখন পরলোক গমন করেন, রাধামোহনের তখন এম, এ, পরীক্ষা দেবার কথা।

রাধামোহনের ওপর তাঁর পিতার কতখানি প্রভাব রয়েছে, সে কথা জিজ্ঞাসা করলে রাধামোহন বলেনঃ আমার বাবা আজও আমার জীবনে আদর্শ হ'য়ে আছেন। নিজের বাবা বলেই নয়, যাঁরা তাঁকে জানতেন—যাঁরা তাঁর নিকটসংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁরাই বলতে পারবেন—আমার বাবা কতখানি চারিত্রিক মাধুর্যে সম্পদশালী ছিলেন। আমিত তাঁর কণামাত্রও পাইনি। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্ম দক্ষতা আমি খুব কম লোকের মধ্যেই দেখতে পেয়েছি। একটী দিনের ঘটনা আমার আজো মনে আছে। ১৯২৬ অথবা ২৭ খৃষ্টাব্দ হবে—হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তখন একবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে উঠেছিল। বিষ্ণুপুরের এক মসজিদের পাশ দিয়ে বাদ্য-ভাণ্ড সহ হিন্দুদের এক বিরাট শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল। তখন বি, কে, গুহ নামে এক ভদ্রলোক বিষ্ণুপুরের এস, ডি, ও ছিলেন। তিনি কোন মতেই শোভাযাত্রীদের ফেরাতে পারলেন না। অথচ ঐ মসজিদের পাশ দিয়ে যদি তাঁরা অগ্রসর হতেন, নিশ্চয়ই একটা দাঙ্গা বেধে উঠতো। শোভাযাত্রীদের নানান অনুনয় বিনয় করেও তিনি তাঁদের আয়ত্তে আনতে পাচ্ছিলেন না। অবস্থা ক্রমে ক্রমে এতই শোচনীয়

হয়ে উঠেছিল যে, একমাত্র গুলি ছোড়া ছাড়া তিনি অন্য কোন পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তখন হঠাৎ তাঁর মনে হলো বাবার কথা। রাত দশটা হবে। তিনি খবর পাঠালেন আমাদের বাড়ীতে। বাবা তখন খেতে বসেছেন। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে খাওয়া শেষ না করেই মুখ ধুয়ে বাবা হাংগামার জায়গায় যেয়ে উপস্থিত হ'লেন। তাঁর উপস্থিতির সংগে সংগে সমস্ত আবহাওয়া পালটে গেল। শোভাযাত্রীদের তিনি উদ্দেশ্য করে বলতেই—নিঃশব্দে তাঁরা ফিরে গেলেন। বাবাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে এস, ডি, ও, হালকা মনে তাঁর কোয়াটারে ফিরে যান। এই ঘটনার পর থেকে তিনি এরূপ কোন জটিল সমস্যা দেখলেই, বাবার পরামর্শ নিতে আসতেন এবং আমাদের পরিবারেরও এই থেকে তিনি একজন পরম বন্ধু হয়ে ওঠেন।"

রাধামোহনের মাতুল পরিবারটিও নানাদিক দিয়ে খ্যাতি সম্পন্ন। পিতৃকুলের মতই তাঁর মাতৃকুল একটী সংস্কৃতি সম্পন্ন অভিজাত পরিবার। কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ বাগচী পরিবারই রাধামোহনের মাতুলালয়। তাঁর মাতামহ স্বর্গতঃ কালীদাস বাগচী কুচবিহার রাজ্যে এক দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তাঁর কার্যকালে কুচবিহার রাজ্যের বহু উন্নতি সাধিত হ'য়েছিল। জন্মস্থানে ফিরে এসে তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাধামোহনের মাতামহ-পরিবারে সংগীত চর্চা এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। স্বর্গত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন এঁদের নিকট প্রতিবেশী। পরিবারে তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। রেকর্ডের প্রথম যুগে স্বর্গতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্যোগ এবং উৎসাহেই রাধামোহনের দু'জন মাসীমার সংগীত রেকর্ডে রূপায়িত হয়। রাধামোহনের মায়েরও সংগীতে এক সময় যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তিনি অবশ্য বর্তমানে জীবিতাই আছেন। তবে বৃদ্ধাবয়সে আর সংগীত চর্চায় মনোনিবেশ করতে পারেন না। পরিবারের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় রাধামোহন তাঁর মাকে বরাবরই সর্বময়ী কর্ত্রী রূপে দেখে আসছেন। এবং এ বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র দুর্বলতা কোন সময়েই রাধামোহনের চোখে ধরা পড়েনি। রাধামোহনের বাল্য শিক্ষা বিষ্ণুপুরেই আরম্ভ হয়। উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজ, ওয়েসলিয়ান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাটনা ল' কলেজে। রাধামোহনের ছাত্র জীবন নানা দিক দিয়ে গৌরবময়। বিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁর অসাধারণ মেধার পরিচয় ফুটে ওঠে। প্রবেশিকা পরীক্ষাতে সমস্ত বর্ধমান বিভাগের মধ্যে রাধামোহন প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ছ'টি বিষয়ে ছ'টি 'লেটার' লাভ করেন। আই, এ, পরীক্ষাতে রাধামোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে উত্তীর্ণ সমস্ত ছেলেদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি, এ পরীক্ষায় নানা কারণে রাধামোহন আশানুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না—তবু দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে উপাধি লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই শেষ উপাধি লাভের জন্য রাধামোহন এম, এ-তে ভর্তি হন। অধ্যয়নের দু'বৎসর শেষ হবার পর, শেষ পরীক্ষার জন্য রাধামোহন প্রস্তুত হচ্ছেন—বি, এ. পরীক্ষার অগৌরবকে তিনি এবার শুধরে নেবেন—রাধামোহনের নিজের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব কতজনেরই না কত আশা—কিন্তু সমস্ত আশাই নিমেষে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল—নিদারুণ অভিশাপের মত পিতার মৃত্যু সমস্ত পরিবারে এক করাল ছায়াপাত করলো—রাধমোহনের আর এম, এ পরীক্ষাটা দেওয়া হ'লো না। এরপর রাধামোহন আত্মীয়স্বজনের অনেকের ইচ্ছায় পাটনা কলেজে ওকালতী পড়তে যান। এবং ওকালতী পরীক্ষায়ও প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। রাধামোহনের পরিবার বর্গ—বন্ধু বান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন সকলেরই ইচ্ছা ছিল—রাধামোহন আই, সি, এস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে। শিক্ষক এবং পরিচিত অধ্যাপকেরা—বরাবরই রাধামোহনের ওপর সেই আশাই করে আসছিলেন, কিন্তু রাধামোহনের মন কোনদিনই এতে সায় দেয়নি। রাজনীতি নিয়ে কোনদিনই মাথা না ঘামালেও, বৈদেশিক শাসকগোষ্ঠীর ক্রীড়নক হ'য়ে—তাদের অন্যায় শাসনের জোয়াল কাঁধে বইবার হীন মনোবৃত্তি কোন সময়েই রাধামোহনের মনে উঁকি মারেনি। ওকালতী পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হবার পর রাধামোহন মেদিনীপুর আদালতে যোগদান করেন। এক বৎসর শিক্ষানবীশ থাকবার পর মাত্র চল্লিশ দিন রাধামোহন উকালতী ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। এও যেন তাঁর ভাল লাগলনা। যদিও এই চল্লিশ দিনেই রাধামোহনের কৃতিত্ব অন্যান্য আইনজ্ঞদের চোখে ফুটে উঠেছিল এবং তাঁর পসার যে দিন দিন বৃদ্ধি পাবে, তার নিশ্চয়তার ইংগিত পেয়েও রাধামোহন ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ওকালতী ব্যবসায় ইস্তাফা দিয়ে এলেন।

ওকালতী ব্যবসা পরিত্যাগ করবার সংগে সংগে রাধামোহনের ভ্রাম্যমানের জীবন সুরু হয়। উদ্দেশ্যহীনভাবে রাধামোহন ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে। পাঞ্জাব—বম্বে—দিল্লী—কত স্থানের কত সহরে সহরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও যেয়ে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করে আবার আস্তানা গুটিয়ে অন্য জায়গার উদ্দেশ্যে ছুটে চলেন। বিভিন্ন মানুষের সংগে তাঁর পরিচয় হ'লো, আয়ত্ব করলেন তাদের ভাষা—অনেক কিছুই জানলেন তাঁদের জীবন যাত্রা সম্পর্কে। কখনও কখনও পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে কিছু উপার্জন করছেন—কখনও কখনও কোন স্থানে বেশীদিনের জন্য থেকে কোন ধনী পরিবারের গৃহ-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে কিছু আয় করে নিচ্ছেন—কখনও কখনও অভিনয় ও নানান হৈ চৈর ভিতর দিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

অভিনয় দক্ষতা রাধামোহনের মাঝে শৈশবাবস্থাতেই পরিদৃষ্ট হয়। পারিবারিক আবহাওয়া এবিষয়ে ছিল অনেকটা অনুকূলে। বাড়ীতেই মঞ্চ বেধে অভিনয় অনুষ্ঠিত হতো—মাত্র ছয় বৎসর বয়সে নিজেদের গৃহ-প্রাংগনে 'সরলা' নাটকের অভিনয়ে সর্বপ্রথম রাধামোহন আত্মপ্রকাশ করেন গোপালের ভূমিকায়। এর পর পারিবারিক ও বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে রাধামোহন অংশ গ্রহণ করতে থাকেন এবং স্থানীয় অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকেও কোন সময় বাদ যান না। সংগীতে ছোট বেলাতেই রাধামোহনের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাই এই সব অনুষ্ঠানে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাঁকে সংগীত প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করতে হ'তো। শুনলে অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হ'য়ে যাবেন—এই সময়
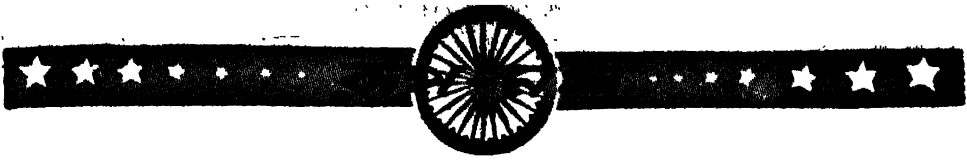
কৌতুক ও 'সিরিও-কমিক' চরিত্রে রাধামোহনের কৃতিত্ব ফুটে ওঠে সবচেয়ে বেশী। রমা—গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরপারে—কালীচরণ, নরনারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণ, বিজয়া—নরেন, রঘুবীর—অনন্ত রাও, চিকিৎসা সংকট—নিধু, বিসর্জন—জয়সিংহ—রাধামোহন অভিনীত বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলির কথা বিষ্ণুপুরের আজও অনেকেই ভুলতে পারেন নি। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে প্রতিটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করলেও—অভিনয়ে বড় একটা রাধামোহনকে দেখা যায়নি। কারণ, কলেজের অনুষ্ঠানে সব সময়ই তাঁকে হারমোনিয়াম বাদকের গুরু দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হ'য়েছে। অবশ্য কলেজের অনুষ্ঠান ছাড়া তখন কলকাতার বিভিন্ন ক্লাবের সংগে রাধামোহনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—এবং সেগুলির উদ্যোগে ইউনিভারসিটি ইন্‌সটিটিউট অথবা অন্যত্র যখনই যে অনুষ্ঠান হ'তো—তাতে রাধামোহনকে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে হ'তো। রাধামোহনের সংগীত প্রতিভা বাংলার বাইরেও প্রকাশ পায়। তিনি যখন পাটনা ল' কলেজের ছাত্র- সেখানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনে তাঁকে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। বলাই বাহুল্য, এই দায়িত্ব পালনে রাধামোহন সংগীতে নিজের যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমনের সময় রাধামোহন দিল্লীতে কিছুকালের জন্য অবস্থান করেন। এই সময় দিল্লীর সর্বজন পরিচিত বেঙ্গলী ক্লাবের সংগে রাধামোহন যথেষ্ট পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। ১৯৩৮-১৯৪১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে বেঙ্গলী ক্লাবের উদ্যোগে অভিনীত বিজয়া, পুনর্মূষিক, চিরকুমার সভা, পথ বেঁধে দিল, মন্ত্রমুগ্ধ প্রভৃতি নাটকের অভিনয় এবং পরিচালনায় রাধামোহন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করবার পর রাধামোহন লক্ষ্মৌর সংগীত বিদ্যালয়ে উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষার সংকল্প করেন। কিন্তু পরিবার থেকে বাধা আসবার জন্য তাঁকে সে সংকল্প পরিত্যাগ করতে হয়। এরপর সাংবাদিকতা শিক্ষার অভিপ্রায় নিয়ে কিছুদিন বম্বে অবস্থান করেন এবং আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করবার পর অভিনেতারূপে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করবার কথা তাঁর মনে জাগে। অবশ্য তখন অবধিও রাধামোহন এবিষয়ে ততটা আগ্রহশীল হ'য়ে ওঠেননি।

রাধামোহন যখন বম্বেতে—তখন দালদা বনস্পতির প্রচারমূলক চিত্রে লুচি খাওয়ার দৃশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সাত টাকা পারিশ্রমিক পান। চলচ্চিত্রে প্রবেশলাভের কথা মনে হ'তেই নিউ থিয়েটার্স লিঃ-এর কথা স্বভাবতঃই রাধামোহনের মনে জাগে এবং রাধামোহন একদিন নিউ থিয়েটার্সের স্টুডিওতে যেয়ে হাজির হন। তখন প্রবীণ চিত্র পরিচালক প্রফুল্ল রায় 'অভিজ্ঞান' এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তিনি রাধামোহনকে অতি যত্নের সংগে চিত্রগ্রহণের বিভিন্ন জটিল সমস্যাগুলি আলোচনা করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। নীতীন বসু, হেমচন্দ্র প্রভৃতি প্রখ্যাত পরিচালকরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের কাছেও যে রাধামোহন প্রার্থী হ'য়ে না দাঁড়িয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু কেউই কোন আশার আলোকে তাঁর ভবিষ্যৎকে আলোকিত করে তুলতে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। প্রফুল্ল রায়ও অবশ্য তাঁকে কোন সুযোগের সন্ধান দিতে পারেন নি—কিন্তু তবু সম্পূর্ণ অপরিচিত একটী যুবকের সংগে তিনি যে ভদ্র ব্যবহার করেছিলেন, রাধামোহন তা কোনদিনই ভুলবেন না। নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে আর একজন পরিচালক—যাঁর ব্যবহার রাধামোহনকে মুগ্ধ করেছিল এবং যিনি সর্বপ্রথম রাধামোহনকে সুযোগ দেন, তিনি হচ্ছেন চিত্র পরিচালক ফণী মজুমদার। তাঁর কাছে রাধামোহন চির কৃতজ্ঞ। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে, বলতে গেলে রাধামোহন এই প্রথম চিত্রাবতরণ করলেন ফণী মজুমদার পরিচালিত মুভি টেকনিকের 'অপরাধ' চিত্রে। শংকর ভট্টাচার্য নাম নিয়ে তখন রাধামোহন চিত্রামোদীদের অভিবাদন জানান। একটী 'ভিলেইন' চরিত্রে রাধামোহনকে অভিনয় করতে হয় এবং তাঁর মাসিক পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় ১৫০৲ টাকা করে। এরপর রাধামোহন বম্বেতে ফণীমজুমদার পরিচালিত হিন্দি চিত্র 'তমন্না'তেও একটি 'ভিলেইন' চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন এবং এই সময়ে তাঁর পারিশ্রমিক মাসিক ৪০০৲ টাকা করে নির্ধারিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহুদিন পরিভ্রমন করবার জন্য হিন্দি
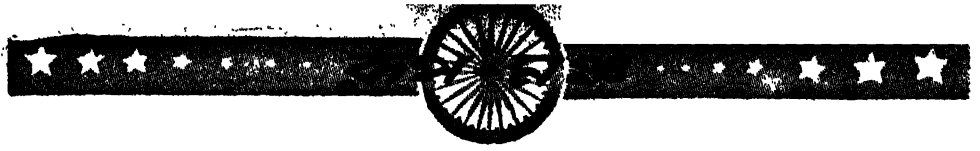
ভাষাটা রাধামোহন খুব ভাল ভাবেই আয়ত্তে এনেছিলেন। এই চিত্রের নায়ক নায়িকা ছিলেন যথাক্রমে জয়রাজ ও লীলাদেশাই। রাধামোহনের বিশুদ্ধ হিন্দি বলবার ক্ষমতা দেখে জয়রাজ খুবই বিস্মিত হ'য়ে যান এবং প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে, রাধামোহন এই প্রথম হিন্দি চিত্রে অভিনয় কচ্ছেন।

এরপর প্রায় এক বৎসর চিত্র জগত থেকে রাধামোহনকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয় এবং বেকার জীবন সুরু হয়। তদানীন্তন সরকারের জনসংভরণ বিভাগে ৮০৲ টাকা মাইনের একটী চাকরীর জন্য প্রার্থী হ'য়েও রাধামোহন উক্ত পদলাভে সমর্থ হন না। তারপর শ্যামবাজার অঞ্চলে শ্রীযুক্ত বি, এন, গুহর কাঠগোলায় ১২৫৲ টাকা মাইনেতে এক চাকরী গ্রহণ করেন। এখানে থাকার সময়ে শ্রীযুক্ত বিমল রায়ের সংগে রাধামোহন পরিচিত হ'য়ে ওঠেন। তখন বিমল রায়ের উদয়ের পথে চিত্রখানি পরিচালনা করবার কথা চলছে। বিমল বাবু তাঁর চিত্রে রাধামোহনকে গ্রহণ করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন এবং তাঁর পরিচালনার কথা যখন পাকাপাকি হ'য়ে গেল—বিমলবাবু সময়মত রাধা-মোহনকে ডাকিয়ে উদয়ের পথে চিত্রে তাঁকে গ্রহণ করা স্থির হ'য়েছে বলে জানিয়ে দিলেন। রাধামোহন কাঠগোলার চাকরীতে ইস্তাফা দিলেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে অক্টোবর মাস অবধি কাঠগোলায় কাজ করেন। কাঠগোলার কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে রাধামোহনের মনে আজও মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাধামোহন নিউথিয়েটার্সে যোগদান করেন। প্রথমে সবাই তাঁকে স্বর্গতঃ দেবী মুখোপাধ্যায় অভিনীত চরিত্রটিতে নির্বাচন করেন। কিন্তু রাধা-মোহন এতে ঘোর আপত্তি তোলেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, অনুপের চরিত্রটি পেলে তিনি আশানুরূপ অভিনয় করতে পারবেন। এমন কী অনুপের চরিত্রটি পেলে তিনি যে আর্থিক চাহিদার পরিমাণও কমিয়ে নেবেন, একথাও জানালেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনুপের চরিত্রেই তিনি নির্বাচিত হ'লেন। ১৯৪৩ খৃঃ-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট অবধি রাধামোহন উদয়ের পথে চিত্রে অভিনয় করবার জন্য নিউ থিয়েটার্সের সংগে চুক্তিবদ্ধ হ'য়ে যান। মাসিক তিনশত টাকা করে তাঁর পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়।

বাংলার শিল্পজগতের দুর্ভাগ্য—উদয়ের পথে খ্যাত নায়ককে দশমাস পরে আবার সম্পূর্ণ বেকার হ'য়ে পড়তে হয়। এই দশমাস পরে আর্থিক কৃচ্ছতা রাধামোহনকে এতই পেয়ে বসে যে—একটা সিগারেট খেতে হ'লে, তাঁকে কয়েক মাইল হেটে কোন বন্ধু-বান্ধবের কাছে ছুটতে হ'তো। এরপর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সরকার এবং শ্রীযুক্ত বিমল রায়ের আগ্রহে রাধামোহন উদয়ের পথের হিন্দিরূপ 'হামরাহী' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য ৫০০৲ শত টাকা মাহিনায় পুনরায় এক বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হ'লেন। হামরাহীর কাজ শেষ করে রাধামোহন দিল্লী এবং পাঞ্জাব ভ্রমনে বেরোন। যেখানেই গেছেন, সব স্থানেই জনসাধারণের কাছ থেকে আশাতীত অভিনন্দন লাভ করে ধন্য হ'য়েছেন: কিন্তু সংগে সংগে আর্থিক কৃচ্ছতা আবার তাঁকে ঘিরে বসে; এমন কী কলকাতায় ফিরে আসবার মত পাথেয় সংগ্রহেও তাঁকে খুবই বেগ পেতে হ'য়েছিল। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে কল-কাতায় ফিরে এসে ফেব্রুয়ারী মাসে 'অভিযাত্রী' চিত্রে অভিনয় করবার জন্য রাধামোহন চুক্তি বদ্ধ হন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সি, আই, ডি, চিত্রে অভিনয় করবার জন্যও রাধা-মোহন চুক্তি বদ্ধ হ'য়ে পড়েন। এই সময়টা আর্থিক দিক থেকে রাধামোহনকে ততটা চিন্তিত হ'তে হয়নি। কারণ, এরপর ১৯৪৭ এর আগষ্ট মাসে 'ভুলিনাই' এবং 'ভুলিনাই'র চিত্রগ্রহণ কার্য শুরু হ'তে হ'তে 'স্বর্ণসীতা' চিত্রেও অভিনয় করবার জন্য রাধামোহন চুক্তিপত্রে সই করেন। ভুলি-নাই এবং স্বর্ণসীতার পর আবার বেকার জীবন সুরু হয়। এই বেকার জীবন এবং আর্থিক অনিশ্চয়তা রাধামোহনকে যেন পেয়ে বসেছে।

চিত্র জগতে প্রবেশ করে রাধামোহনকে—এমন কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি—যাতে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার উপক্রম হ'য়েছে। এবিষয়ে রাধামোহন বলেন: পরিবেশ বা পরিস্থিতি যার কথাই বলুন না কেন—তার ওপর নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব অনেকখানি রয়েছে—এবং যে কোন পরিস্থিতি বা পরিবেশের মান অনেকটা 'ব্যক্তি'র
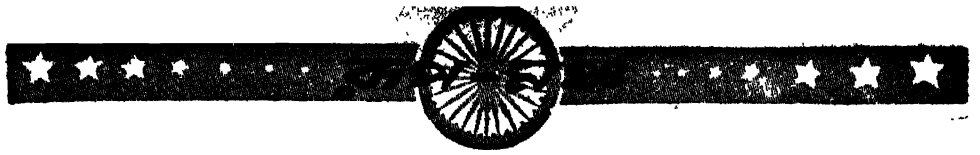
নিজের ওপর নির্ভর করে।" পারিবারিক কোন বাধাও রাধামোহনের শিল্প জীবনের পথকে রুদ্ধ করতে উদ্যত হয়নি। রাধামোহনের মা পুত্রের অভিনীত চিত্রগুলি খুব আগ্রহের সংগেই দেখে থাকেন। এবং বিশেষ করে 'উদয়ের পথে' ও 'ভুলি নাই' চিত্র দেখে তিনি এতই মুগ্ধ হ'য়েছিলেন যে, পুত্রকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আশীর্বাদ না করে পারেননি। বর্তমানে রাধামোহন তাঁর মা এবং ছোট ভাইয়ের সংগে ৮।৫এ, রসা রোডে বসবাস কচ্ছেন। অন্যান্য ভাইয়েরা অবশ্য যাঁর যাঁর কর্মস্থলে থাকেন। সকলেই একই পরিবার ভুক্ত।

যতগুলি চিত্রে রাধামোহন এপর্যন্ত অভিনয় করেছেন, তার ভিতর 'উদয়ের পথে'র অনুপের চরিত্রটিই তাঁকে সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে। এই চরিত্রটির নিখুঁত রূপদানে তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতেন এবং পরিচালককে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না। পরম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের সংগেই রাধামোহন বলেন: আমার সে পরামর্শ বিমলবাবু প্রত্যাখ্যান করেননি।' ভুলিনাই চিত্রের প্রসংগেও একথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নানা ভাষা রাধামোহনের জানা থাকায় এই চরিত্রটি রূপায়নেও পরিচালককে নানান ভাবে রাধামোহন সাহায্য করতে পেরেছিলেন। চিত্র জগতের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রাধামোহনের কোন অভিযোগ নেই সত্য, কিন্তু তিনি প্রত্যেককেই নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে উঠবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। যে সব মহিলা শিল্পীদের সংগে রাধামোহনের অভিনয় করবার সুযোগ হ'য়েছে, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্তা বিনতা রায়কেই বেশী প্রতিভাসম্পন্না বলে তিনি মনে করেন। ছোট বড় যে সব শিল্পীদের সংগে রাধামোহন অভিনয় করেছেন—তাঁদের প্রত্যেকেরই মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ না হ'য়ে পারেননি। চলচ্চিত্রে যোগদান করবার পূর্বে এবং এখনও যে দু'জন শিল্পীর অভিনয় রাধামোহনকে মুগ্ধ করে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীযুক্তা সুপ্রভা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ফণী রায়।

সেতার, গীটার, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতি প্রায় সবরকম বাদ্য-যন্ত্রেই রাধামোহনের দক্ষতা রয়েছে। স্বর্গতঃ রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রাধামোহনের সংগীত শিক্ষা সুরু হয়। স্বাধীনভাবে চিত্র পরিচালনা করবার ইচ্ছা রাধামোহনের আছে—অন্ততঃ এবিষয়ে সত্যই তাঁর কোন যোগ্যতা আছে কিনা তা একবার তিনি যাঁচাই করে দেখবেনই। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের হ'য়ে বহুবার নাট্য-পরিচালনা ও প্রযোজনা করবার সুযোগ রাধামোহন পেয়েছেন এবং তাতে তাঁর কম কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যার্থে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কবিগুরুর 'চির কুমার সভা'র প্রযোজনা, পরিচালনা ও রাধামোহনের অক্ষয়ের ভূমিকাভিনয় সুধীজনের প্রশংসায় ধন্য হ'য়ে ওঠে। রাধামোহন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির একজন সভ্য এবং বিশ্বভারতীর আজীবন সভ্য। চিত্রজগতের বাইরে তাঁর যে জীবন, তা খুবই গৌরবময় এবং চিত্রজগতের ছোঁয়াচে কোন সময়ই সে জীবনের কোন মর্যাদা হানি হয় নি। তাঁর বন্ধুবান্ধব বেশীরভাগই চিত্রজগতের বাইরের লোক—চিত্র জগতে প্রবেশ করেও সে বন্ধুত্বে কোন সময়ই কোন ভাটা পড়েনি। বর্তমানে রাধামোহন ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা শিখতে শুরু করেছেন। খেলাধূলায়ও কোন বিষয়ের চেয়ে রাধামোহনের কম আগ্রহ নেই। বিশেষ করে টেনীস, ক্রীকেট, ব্যাডমিণ্টন খেলতে রাধামোহন খুবই ভাল বাসেন। খাওয়া দাওয়াতেও রাধামোহনের কোন বাদ বিচার নেই। অভিনয়, খেলাধূলা প্রভৃতি সব কিছুর বাইরে পড়াশুনায় মেতে থাকতেই রাধামোহন সবচেয়ে ভালবাসেন। সমস্ত হৈ-চৈ থেকে নিরালায় পড়াশুনায় গভীর মনোনিবেশে কাটিয়ে দিতে তাঁর যতখানি ভাল লাগে, আর কিছুতেই ততখানি মন ভরে না। বেতারেও একাধিকবার রাধামোহন অংশ গ্রহণ করেছেন। তার ভিতর গুরু—পঙ্কক, রাজা ও রাণী—বিক্রমজিৎ এবং গত রবীন্দ্র জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে বেতার অনুষ্ঠানে তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পে বিভূতি মুখোপাধ্যায় ও বনফুল, কবিতায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র ও অজিত দত্ত, প্রবন্ধে—জ্যোতির্ময় রায়, উপন্যাসে—তারাশংকর, সতীনাথ ভাদুড়ী ও অমলা দেবীর রচনাই রাধামোহনকে মুগ্ধ করে। বৈদেশিক সাহিত্যে সমর-সেট মম ও প্রিসলী, নরম্যান কলিনন্স-এর রচনার রাধামোহন ভক্ত।

বাংলা চিত্রের ব্যর্থতার জন্য অযোগ্য লোকেদের আধিপত্যকেই রাধামোহন একমাত্র কারণ বলে মনে করেন। বাংগালী দর্শকসাধারণের প্রতি রাধামোহনের রয়েছে অপরিসীম শ্রদ্ধা।

রাধামোহন এখনও বিয়ে করেননি। এ বিষয়ে তাঁর নির্দিষ্ট কোন মতামত নেই।

প্রথম দর্শনেই রাধামোহনের স্বাতন্ত্র যেমনি যে কোন লোকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে, তেমনি বাইরে থেকে লোকটিকে খুব গম্ভীর প্রকৃতির বলেও অনেকের পক্ষে ভুল করা অস্বাভাবিক হবে না। একথা ঠিকই, কোন বাজে আলোচনায় কোন সময়ই তাঁর কোন প্রকার উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যাবে না। পরচর্চা বা পর নিন্দা এরূপ কোন আলোচনা থেকে রাধামোহন সব সময়ই নিজেকে দূরে রাখতে ভালবাসেন। কিন্তু যেই কোন সমস্যার কথা উঠলো—সাহিত্য, বিজ্ঞান বা অনুরূপ কোন প্রয়োজনীয় ও কৃষ্টিমূলক কোন আলোচনা উঠলে—রাধামোহনের গাম্ভীর্য মুহূর্তে অন্তর্হিত হ'য়ে যায়। আলোচনায় যোগদানকারী যে কোন লোকের থেকে তিনি অতি সহজেই মুখরা হ'য়ে ওঠেন—এই মুখরতার মাঝে তাঁর পাণ্ডিত্য যে কোন সন্ধানী লোকের দৃষ্টিতে স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে উঠবে।

সাজপোষাকের কোন বালাইই নেই রাধামোহনের। মোটা খদ্দরের ধুতি—পাঞ্জাবী অথবা পায়জামা—পাঞ্জাবী, বড়জোর মাঝে মাঝে একটা জ্যাকেট চড়ে তার ওপর। আমাদের শিল্পীদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে যাঁদের কল্পনাবিলাসী মন নানান জাল বোনে—রাধামোহনকে দেখে তাঁরা খুবই হতাশ হবেন সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইরের চাকচিক্য দিয়ে নিজের দেহকে ঢেকে রাখেননি বলেই হয়ত তাঁর শিল্পমনের ছাপ দেহের সর্বাংগে স্বচ্ছ হ'য়ে ফুটে ওঠে।

রাধামোহনের সহজ সরল ব্যবহার যেমনি মধুর, তেমনি মধুর তাঁর হাসিটি। নিজের মর্যাদা সম্পর্কে রাধামোহন যেমনি সচেতন, তেমনি সচেতন অন্যের মর্যাদা সম্পর্কেও। প্রায় দু'তিন ঘণ্টা তাঁর সংগে নানান আলোচনায় কাটিয়ে দিলাম। আপনাদের কাছে যতটুকু পৌছে দিচ্ছি, তার বাইরেও বহু আলোচনাই আমাদের হ'য়েছিল—সেগুলি এ প্রসংগে অবান্তর বলে, প্রকাশ করলাম না। এই সময়ের মধ্যে—রাধামোহনের মনের যতটুকু আমি সন্ধান পেয়েছি—তার সবটুকুই মনে করে রাখবার মত। আমাদের আলোচনার সময় শিল্পী কমল চট্টোপাধ্যায়, প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক, কার্যাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডল ও স্নেহেন্দ্র গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক রাধামোহন বাবুর কতগুলি ছবি নিলেন। এখানে তাঁর একখানাই আপনাদের জন্য প্রকাশ করা হ'লো। বাকীগুলো রেখে দেওয়া হ'য়েছে রূপ-মঞ্চের পাঠাগারের জন্য। —শ্রীপার্থিব

সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে কাঁচা ফিল্ম নিয়ে যে দুর্নীতি চলছে—সে সম্পর্কে বহু প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ আসছে--ইতিপূর্বেও এবিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হুসিয়ার করে দিয়েছি—কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। তবু আর একবার তাদের হুসিয়ার করে দিয়ে বলছি—যদি এ বিষয়ে তারা সতর্ক না হ'য়ে ওঠেন—তাদের নাম প্রকাশ করে মুখোস খুলে দিতে যেমনি আমরা বাধ্য হবো—তেমনি প্রাদেশিক সরকারের মারফৎ উপযুক্ত শাস্তি বিধানের ক্ষমতা ও যে আমাদের আছে, তাও মৃদু ভাবে বলে দিতে চাই। কোন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের জনৈক বাঙ্গালী কর্মচারীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী অভিযোগ আসছে। নিজের এক ভাইকে শিখণ্ডী রূপে দাঁড় করিয়ে প্রযোজকদের কাছে উচ্চহারে স্থিরচিত্র গ্রহণের ব্যবসা নাকি তিনি একচেটিয়া করে নিয়েছেন। যারাই উক্ত স্থির চিত্র গ্রহণে—উক্ত প্রতিষ্ঠানকে চুক্তি দিচ্ছেন না, তাঁরাই কাঁচা ফিল্ম সংগ্রহে ব্যর্থ হচ্ছেন।

—উপরে—

রূপ সজ্জার বাইরে বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অভিনব নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও নানান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তাঁকে চিত্র জগতে প্রবেশ করতে হয়েছে—।

—চিত্রগ্রহণ—
কালীশ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক : রূপ-মঞ্চ

—নীচে—

ডান দিকে :—কথক নৃত্যের অন্যতম স্রষ্টা কালকা বৃন্দাদীন। — —

বা দিকে :—হিন্দি চিত্রজগতের জনপ্রিয়া অভিনেত্রী নুরজাহান। — —

★

রূপ-মঞ্চ
ফাল্গুন—৫৫

ইনগ্রিড্ (Ingrid Bergman)

রহস্যময়ী গ্রিটা গার্বোর পরিণত সে সুইডেন মার্কিণ-চলচ্চিত্র জগতকে যে অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রীকে উপহার দিয়ে আবার কৃতজ্ঞতা ভাজন হ'য়ে র'ল তাঁর নাম ইনগ্রিড্ বার্জম্যান। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র জগতে বার্জম্যান যেমনি গার্বোর মতই খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থা হ'য়েছে, মার্কিণবাসীদের কাছেও তেমনি গার্বোর মতই রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। গ্যাসলাইট চিত্রের নায়িকা বার্জম্যানকে এদেশীয় চিত্রামোদীদের কাছেও কম মোহময়ী বলে মনে হয়নি। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ইনগ্রিড বার্জম্যান সুইডেনের স্টকহলম সহরে জন্মগ্রহণ করে। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ৫ ফিট, ৭½ ইঞ্চি। ওজন ১২৭ পাউণ্ড ধূসর আভাযুক্ত মস্তকের কেশরাশি তন্দ্রাজড়িত উজ্জ্বল চোখ দুটী স্বভাবতই যেন বার্জম্যানকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। পাঠ্যাবস্থায় বার্জম্যান বিদ্যালয়ের বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে এ সময় নাট্য রচনা, প্রযোজনা, পরিচালনা ও অভিনয়ে তার যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন শ্রীমতী বার্জম্যান মাত্র পঞ্চদশ বর্ষীয়া কিশোরী। তারপর শিক্ষা জীবন সুরু হয় স্টকহলম এর রয়াল ড্রামেটিক থিয়েটার স্কুলে। এখানে প্রাথমিক পাঠ্য বিষয় শেষ করবার সংগে সংগে ইসভেনস্ক ফিল্ম ইনডাস্ট্রির (Svenks Film Industry) 'মুনকব্রোগীভেন' চিত্রের একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পায়। এর পরবর্তী চার বৎসরে বার্জম্যান প্রায় এগারো খানি চিত্রে অভিনয় করে—তার ভেতর নয়খানা চিত্রেই প্রধানা চরিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ পায়। মাত্র সপ্তদশ বৎসর বয়সের সময় বার্জম্যান তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য সুইডেনের সুধীবৃন্দের স্বীকৃতি লাভে সমর্থা হয়। রয়াল ড্রামেটিক থিয়েটার স্কুলের শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হ'য়ে বার্জম্যান বৃত্তিলাভ করে। বার্জম্যানের বাল্য বয়স খুবই দুঃখ কষ্টের ভিতর দিয়ে কাটে। মাত্র তিন বৎসর বয়সের সময় বার্জম্যান তাঁর মাকে হারায় আর দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় বার্জম্যানের পিতৃবিয়োগ ঘটে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বার্জম্যান হলিউডে আসে ইনটারমেজ্জো (Intermezzo) চিত্রের অভিনয়ই তার জীবনে এই সুযোগ এনে দেয়। কারণ সেলজনিক ইউ এর প্রযোজনায় উক্ত চিত্রখানির মার্কিণ রূপ দেওয়া হয় এবং সেজন্য বার্জম্যানের ডাক পড়ে। হলিউডে বার্জম্যান অভিনীত চিত্রগুলির ভিতর নাম করবার মত হ'চ্ছে আদম হ্যাড ফোর সন্স (কলম্বিয়া), রেজ ইন হেভেন (এম জি এম) ডাঃ জেকীল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড (এম জি এম) ক্যাসাব্লাঙ্কা (ওয়ার্ণার), সারাটোগা ট্রাঙ্ক (ওয়ার্ণার) ফর হুম দি বেল টোলস, (প্যারামাউণ্ট), দি মার্ডার ইন থর্নটন স্কোয়ার (এম জি এম—পূর্বে গ্যাসলাইট নাম ছিল) স্পেলবাউণ্ড (ইউনাইটেড আর্টিষ্ট), দি বেলস অফ সেণ্ট মেরীস' (আর কে ও) নটোরিয়াস (আর, কে ও), আর্চ অব ট্রায়াম্ফ (এম, জি, এম এণ্টারপ্রাইজ) জন অফ আর্ক (ওয়াগনার) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে ব্রডওয়ে মঞ্চে অভিনীত লিলিওম, হলিউড ও অন্যান্য স্থানে অভিনীত এ্যানাক্রাইষ্ট, নিউ ইয়র্কের এলভিন থিয়েটারে অভিনীত জন লরেইন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
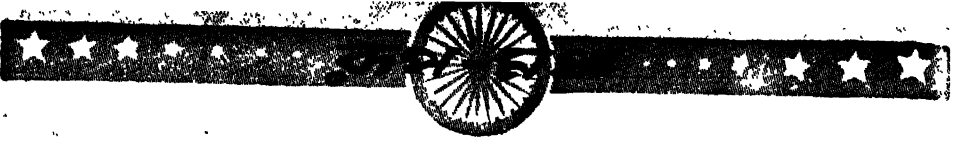
ইনগ্রিড্ বার্জম্যান ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে গ্যাসলাইট চিত্রের অভিনয় নৈপুণ্যে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করে 'এ্যাকাডেমী এ্যাওয়ার্ডে' ভূষিতা হয়। ১৯৪৬-৪৭ খৃষ্টাব্দে বার্স্টেইন কোয়েচনার প্রতিযোগিতায় বার্জম্যান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

বার্জম্যানের স্বামী ডাঃ পিটার লিণ্ডষ্ট্রোম লস এ্যাঞ্জেলস জেনারেল হসপিটাল-এর একজন খ্যাতি সম্পন্ন রেসিডেন্ট-সার্জন। স্বামী সম্পর্কে বার্জম্যান সব সময়েই গর্বিতা। পরস্পরের কর্মজীবন সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু পরস্পরের মাঝে এপর্যন্ত কোন দিনই বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়নি। স্বামী আর দশ এগারো বছরের মেয়ে পিয়াকে নিয়ে ইনগ্রিড্ বার্জম্যানের ছোট্ট সংসারটিতে কোনদিনই বিষাদের ছায়া রেখাপাত করতে পারে না। তবে পিয়ার ভবিষ্যৎ নিয়ে ইনগ্রিড্ এখন থেকেই চিন্তিতা। পিয়া বর্তমানে বেভারলী হিলস পাবলিক স্কুলের চতুর্থ মানের ছাত্রী! পিয়াকে ছাড়া বার্জম্যান কোন সময়ই একা থাকতে পারে না। হলিউডে তাঁর প্রথম চিত্র ইন্টারমেজ্জোর সময় পিয়া বার্জম্যানের কাছে ছিল না। তখন বার্জম্যানকে খুবই ম্রিয়মান বলে মনে হতো। রূপ-সজ্জার টেবিলে মেয়ের ফটো রেখে অভিনয়ে যাবার সময় বার বার মেয়েকে চুম্বন করে যেতো। নিজের থাকবার ঘরেও পিয়ার একখানা ছবি থাকতো। বাড়ী ফিরে মেয়ের ফটোখানাকে বুকে নিয়ে বার্জম্যানকে অনেকেই কাঁদতে দেখেছেন। অথচ মেয়ে যখন কাছে এলো—দৃশ্য গ্রহণে[র] সময় কোন দিনই তাকে বার্জম্যান সংগে নিত না[।] এবিষয়ে বার্জম্যান ঘোর বিরোধী ছিল। অবশ্য প[রে] নিজের অভিনীত চিত্রের দৃশ্যপটে মেয়েকে সংগে নি[তে] আর অমত করেনি। 'দি বেলস অফ সেন্ট মেরী[স]' চিত্রের দৃশ্যপটে সর্বপ্রথম বার্জম্যান মেয়েকে সংগে নি[য়ে] যায়। চিত্রগ্রহণ শেষ হ'য়ে যাবার পর বার্জম্যান মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে : কেমন লাগল তোমার পিয়া?" পিয়া গম্ভীর ভাবে মায়ের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিল : এ আ[র] এমন কী কাজ? আমিও করতে পারি!" পিয়াকে অভিনেত্রী করে তুলবার কোন আগ্রহই বার্জম্যানের নেই। তবে পরিণত বয়সে সে নিজে যদি অভিনেত্রী জীবনকেই বরণ করে নেয়, তাতে বার্জম্যান বাধা দেবে না। বরং নিজের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা দিয়ে মেয়ে[র] অভিনেত্রী জীবনকে সুদৃঢ় ভাবে গড়ে তুলতে সাহায্যই করবে। মেয়েকে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠবার সুযোগ বার্জম্যান দিতে চায়।

বাইরে থেকে বার্জম্যানকে যতই গম্ভীর প্রকৃতির ও স্বল্পভাষী বলে মনে হউক না কেন—যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছেন—তাঁরাই স্বীকার করবেন মানুষ হিসাবেও ইনগ্রিড্ কতখানি মাধুর্যময়ী। তাঁর বাড়ীটি সব সময়ই বন্ধু বান্ধবদের কোলাহলে মুখরিত থাকে। এঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে—[এ]ং রবার্টস—স্টকহলম-এর রয়াল ড্রামেটিক থিয়েটারের প্রতিভা-ময়ী অভিনেত্রী সিগ্নী হাস্ সো,—যাঁর প্রতি বার্জম্যানের রয়েছে অসীম শ্রদ্ধা এবং যাঁকে বার্জম্যান নিজের অভিনেত্রী জীবনে আদর্শ রূপে গ্রহণ করেছে। সঙ্গীত আলফ্রেড হিচকক, লুই মাইলস্টোন, চার্লস বয়ার, গ্যারী কুপার প্রভৃতি আরো অনেকের নামই এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

বার্জম্যান অদ্ভুত ধরণের কৌতুকপ্রিয়। বইয়ের দিকেও ঝোক তাঁর অসম্ভব। ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্তই থাকুক আর নাই থাকুক, সপ্তাহে অন্ততঃ চার পাঁচ খানি বই বার্জ-ম্যানের পড়া চাই। ছবি দেখা বার্জম্যানের দারুণ নেশা।
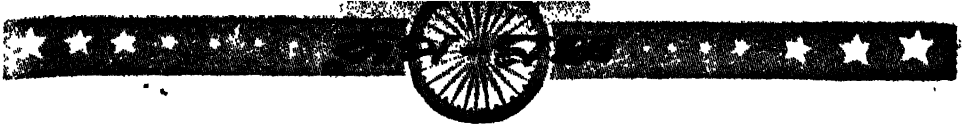
এবিষয়ে তাঁর কোন বাদ বিচার নেই। একবার মাত্র বার্গম্যান নিউ ইয়র্কে গিয়েছিল—এই এগারো দিনে সে চোদ্দখানি ছবি দেখে। প্রতিদিন একখানা করে, তাছাড়া তিনদিন রাত্রির প্রদর্শনী ছাড়াও ম্যাটিনীতে তিন খানা ছবি দেখে। হলিউডে ফারমারস মার্কেটে বার্গম্যান বাজার করতে ভালবাসে। খেতেও বার্গম্যান বেশ পটিয়সী, তবে রান্না করতে তাঁর ভাল লাগে। রান্নার কথা মনে হলেই গায়ে জ্বর আসে।

রূপ চর্চার প্রতি বার্গম্যানের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য নেই। এমন কী অভিনয়েও অত্যধিক রূপ-সজ্জা তাঁর ভাল লাগে না। চরিত্রের প্রয়োজনে যতটুকু আবশ্যক, বার্গম্যান কেবল মাত্র ততটুকু রূপ-সজ্জারই পক্ষপাতী। বার্গম্যান দাম্ভিক—দিন দিন গার্বোর মতই রহস্যময়ী হ'য়ে উঠছে—ইনগ্রিড্ বার্গম্যানের বিরুদ্ধে এমনি কতকগুলি মন্তব্য হলিউডের কতকগুলি পত্র-পত্রিকার পাতায় প্রায়ই দেখা যায়। এতে বার্গম্যান মডার্ণ স্ক্রীণ পত্রিকার অন্যতমা মহিলা প্রতিনিধি হেড্ডা হোপারের কাছে খুবই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। ডিসেম্বর সংখ্যার মডার্ণ স্ক্রীন পত্রিকায় ইনগ্রিড্ বার্গম্যানের সংগে হেড্ডা হোপারের সংগে যে সাক্ষাৎকার-প্রসংগ প্রকাশিত হ'য়েছে—তাতে হেড্ডা হোপারও বার্গম্যানের বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগগুলি অলীক ব'লেই দৃঢ়তার সংগে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বার্গম্যানের সংগে হেড্ডা হোপার দু'ঘণ্টারও বেশী বিভিন্ন আলোচনায় কাটিয়ে দেয়—এই দু'ঘণ্টাতে সবচেয়ে যে বিষয়টি হেড্ডাকে আকৃষ্ট করেছে—তা হ'চ্ছে বার্গম্যানের অন্তর মাধুর্য। অভিনয়ের মতই তাঁর মধুর ব্যবহার যে কোন লোকের অন্তর স্পর্শ করবে। বার্গম্যান সত্যিই গার্বোর মত রহস্যময়ী হ'য়ে উঠছে কিনা, কৌতুক করে হেড্ডা একথা জিজ্ঞাসা করলে বার্গম্যান হাসতে হাসতে বলে: আমি ত' আমার কোন পরিবর্তনই দেখছি না হেড্ডা! গার্বো আর আমি একই দেশের অধিবাসী—দু'জনেই শিল্পী—তাই পরস্পরের মাঝে কতকগুলি বিষয়ে মিল থাকা অস্বাভাবিক নয়। তাই বলে ...রা হ'য়ে উঠছি, একথার মূলে কোন সত্য থাকতে ...রে না। তোমাদের সাংবাদিকদের ঘন ঘন সাক্ষাৎকার, গুণগ্রাহী ও জনসাধারণের ঔৎসুক্য সত্যি আমার ভাল লাগে না। এঁরা যদি পরিমিতভাবে চলেন—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু এঁরা এতই মাত্রা ছাড়িয়ে যান যে, এত হৈ-চৈ মোটেই আমার ভাল লাগে না। প্রথম কথা, আমার কাজের জন্য আমাকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়—তার চেয়ে আমার আর কিছু বড় নয়। এর ভিতর অনবরত লোকজনের সাক্ষাৎকার—হৈ-চৈ আমায় পাগলা করে তোলে। তাছাড়া নিজেকে সকলের কাছে এতটা প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি না। আমার মানসিক পরিবর্তন হ'য়েছে বলে যাঁরা মনে করেন—তাঁরাও ভুল করে থাকেন। প্রথম যখন আমি হলিউডে আসি, আমি এখানকার ভাষা বুঝতাম না—এরা কোন অর্থে কী কৌতুক প্রয়োগ করতেন, না বুঝেই বোকার মত হাসতাম। ইংরেজীতে শুদ্ধ করে কথা বলতে পারতাম না। কোন কথা যে অর্থ মনে করে বলতাম—তা অন্য অর্থ নিয়ে প্রকাশ পেত। তাই মুখ বন্ধ করে রাখাই আত্মরক্ষার উপায় বলে মনে করলাম। তাছাড়া এদের প্রশ্নের ধরণও অন্যরকম। আমি তখন হলিউড ছাড়া কোথাও যাইনি—আমাকে প্রশ্ন করা হ'লো—নিউইয়র্ক তোমার কী রকম লাগে? এতে আমি কী উত্তর দিতে পারি?" কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বার্গম্যান বলে: তুমি বিশ্বাস করো হেড্ডা, আমি সত্যি খুব মিশুকে। আরো বিপদ, যখন আমি কাজের ফাঁকে গল্প গুজবে মেতে উঠি—তাকে এরা আমার অভিনয়ের নামান্তর বলেই মনে করে। এঁদের মন জয় করবো আমি কী করে? তারপর এঁদের ঔৎসুক্য এতটাই উগ্র যে, অনেক সময়ই তা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। আমি হয়ত আমার স্বামী পিটারকে নিয়ে কোন হোটেলে খেতে বসেছি—পাশের টেবিল থেকে একজন উঠে এসে বললেন: আমার নাচের সংগীরূপে তোমায় পেতে পারি কী?' রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, পেছন থেকে একজন ডেকে বসলেন। ফিরে তাকিয়ে যেই জিজ্ঞাসা করলাম: 'ডাকলে কেন?' কোন উত্তর দিতে পারলেন না। আলভীন থিয়েটারে আলভীন গ্যাং নামে আমার এক গুণগ্রাহীর দল আছে জানো, আমি যখন জন অফ
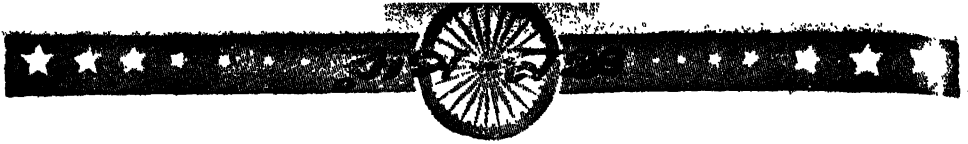
লরেইন-এর অভিনয়ের জন্য সেখানে যাই—অটোগ্রাফের জন্য তাঁরা যে কীভাবে আমাকে পাগলা করে তুলেছিলেন—তাঁদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য, অভিনয় শেষে সকলের খাতায় সই করতে লাগলাম। সই করতে করতে যখন কাঁধ ব্যথা হয়ে উঠলো, তখনই সই করা থেকে ক্ষান্ত দিলাম। অবশ্য আলভিন গ্যাংএ—সত্যই একদল আমার গুণগ্রাহী আছেন—যাঁরা এরপর থেকে নানান ভাবে ভিড়ের হাত থেকে আমায় রক্ষা করে আসছেন। কোন শিল্পী সম্পর্কে তাঁর গুণগ্রাহীদের আগ্রহ থাকাতে আমি নিন্দা করি না—তবে সে আগ্রহের অভিব্যক্তি রুচিসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বার্জম্যান হাসতে হাসতে বলে: 'ভাখো হেড্ডা, এ বিষয়ে আমারও কম কৌতূহল নেই। রাস্তায় যদি পরিচিত কোন লোকজন বা শিল্পী দেখি, আমিও পিটারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রায়ই বলি: 'ঐ দেখ-ঐ যে বেটি ডেভিস্ যাচ্ছে—আরে দেখেছো, গাড়ীতে গারসন চলে গেল।' পিটার আবার আমায় ঠাট্টা করে বলে—তোমার দিকে কেউ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকালে রেগে যাও—তা তুমি আবার অন্যের দিকে তাকাও কেন?' আমি তার উত্তরে বলি: 'আমি নিজেও একজন অপরাধী, স্বীকার করছি। কিন্তু আমার দিকে বেশীক্ষণ কেউ তাকিয়ে থাকলে সহ্য করতে পারি না।' হেড্ডাও বার্জম্যানের এই স্বীকারোক্তিতে না হেসে থাকতে পারে না। বার্জম্যানের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় হেড্ডা এই উক্তি করে আসে: 'দু'ঘণ্টা তোমার সাথে কী ভাবে যে কেটে গেল! তবু লোকে বলবে তুমি কারোর সংগে প্রাণ খুলে মিশতে জানো না—যারা বলে, তারা সত্যের অপলাপই করে।' ইনগ্রিড্ বার্জম্যান বর্তমানে ইংল্যা[illegible] 'আণ্ডার কপরিক্যান' চিত্রের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

ডেইলী মেল পরিচালিত ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড-এর ফলাফল

গত সংখ্যার রূপ-মঞ্চে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড (বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্প)-এর ফলাফল প্রকাশ করা হ'য়েছে। মুদ্রণ-বিভ্রাটে ১৯৪৭ এর স্থলে ১৯৪৮ খৃঃ মুদ্রিত হ'য়েছে। আশা করি পাঠকসাধারণ উক্ত ভুল সংশোধন করে নেবেন। বৃটিশ চলচ্চিত্রের সর্বাংগীন উন্নতির আদর্শ ও বৃটিশ চিত্রের অনুরাগী দর্শকদের বৃটিশ চিত্র সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করবার সুযোগ দানের এবং শিল্পী ও বিশেষজ্ঞগণকে উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে বৃটেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'ডেইলী মেইল' 'ন্যাশনাল ফিল্ম্ এ্যাওয়ার্ডে'র প্রবর্তন করেছেন মাত্র কয়েক বৎসর হোল। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড বৃটেনে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং ক্রমে ক্রমে এই জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। শুধু বৃটিশ চলচ্চিত্রের অনুরাগী দর্শকেরাই আকৃষ্ট হ'য়ে যে একে শক্তিশালী করে তুলেছেন তা নয়, বৃটিশ চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী, শিল্পী ও বিশেষজ্ঞগণও বৃটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ডকে শক্তিশালী করে তুলতে নানান ভাবে সহযোগিতা করছেন। ঠিক এমনি আদর্শে, বলতে গেলে বৃটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড প্রবর্তিত হওয়ার বহু পূর্বে, রূপ-মঞ্চ পত্রিকার উদ্যোগে বাংলা চিত্রের সর্বাংগীন উন্নতির উদ্দেশ্য নিয়ে 'বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির' পরিচালনায় প্রতি বৎসর যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'য়ে আসছে, রূপ মঞ্চ পাঠকসমাজ সে বিষয়ে যথেষ্টই ওয়াকিফহাল আছেন। উক্ত প্রতিযোগিতাও দিন দিন ক্রমবর্ধমান দর্শকদের সহযোগিতায় জনপ্রিয় হ'য়ে উঠছে। কিন্তু পরম দুঃখের সংগেই আমাদের বলতে হচ্ছে যে, [illegible] চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের যতখানি সহযোগিতা পেলে [illegible] চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির প্রতিযোগিতাকে আমরা শক্তিশালী করে তুলতে পারতাম—ততখানি সহযোগিতা আজও [illegible]
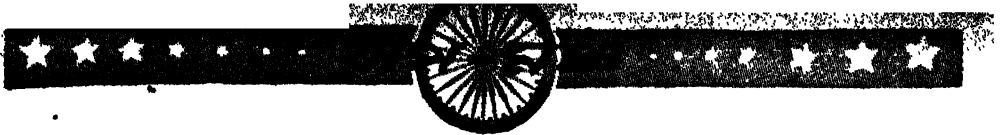
লাভ করতে পারিনি। অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের সহযোগিতা লাভের আশা পোষণ করেই আমরা এবিষয়ে বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি। ১৯৪৮ সালে বৃটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের যেসব শিল্পীরা ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড-এ সম্মানিত হয়েছেন, তাঁরা হচ্ছেন :—

অভিনেতা : (১) জন মাইলস, (২) মাইকেল উইলডিং, (৩) জেম্‌স্ ম্যাসন, (৪) ডেনীস্ প্রাইস, (৫) স্টুয়ার্ট গ্রাঞ্জার, (৬) ডেভিড নিভেন, (৭) ট্রেভর হাওয়ার্ড, (৮) জ্যাক ওয়ার্ণার, (৯) জন ম্যাককল্লাম, (১০) ডেভিড ফারার।

অভিনেত্রী : (১) মার্গারেট লকউড, (২) এ্যানা নিগল, (৩) প্যাট্রিসিয়া রোক, (৪) জিন সাইমনস, (৫) গুগী হুইদার্স, (৬) জন গ্রীণউড, (৭) শ্যালী গ্রে, (৮) মাই জেটারলিং, (৯) ভ্যালেরাই হবসন, (১০) ফিলিস কলভার্ট।

১৯৪৮ সালের নির্বাচকদের সংখ্যা ছিল : ২,৭৮১,৭৫০ জন। ১৯৪৬ থেকে ৪৮ পর্যন্ত পর পর তিন বৎসর মার্গারেট লকউড শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান পেয়ে আসছেন। মার্গারেট লকউডের জন্মস্থান ভারতবর্ষ। আগামী কোন সংখ্যায় তাঁর বিষয়ে খুঁটিনাটি জানাবার ইচ্ছা রইল। —শ্রীমন্ত

বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনী
১৯৪৯
সঙ্গীতরসিক ও নাট্যামোদীদের জ্ঞাতার্থে

ইংলণ্ডের অমর নাট্যকার সেক্‌সপীয়রের জন্মস্থান ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অব এ্যাভনে প্রতিবৎসর এক নাটকোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উপলক্ষে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের সুবিখ্যাত মেমোরিয়াল থিয়েটারে সেক্‌সপীয়রের অনেকগুলি নাটক অভিনীত হয়। বৃটেন ভ্রমণকারীরা যদি ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের সুন্দর ছবির মত পথ গুলিতে ভ্রমণ না করেন এবং ওখানকার থিয়েটারে সেক্‌সপীয়রের নাটকাভিনয় না দেখেন, তাহলে তাঁদের ভ্রমণ সার্থক হয়না।

এই বৎসরের উৎসব অনুষ্ঠিত হবে আগামী মে মাসে; ঠিক যে সময়ে লণ্ডন ও বার্কিংহামে বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হবে (২রা মে থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত)। বৈদেশিক দর্শকদের সাহায্য করবার জন্য বৃটেনে একটি সমিতি আছে। সমিতির নাম 'থিয়েটার হলিডে প্ল্যান;' ঠিকানা ৭৭, ডীন ষ্ট্রীট, লণ্ডন; ডবলিউ, আই, ইংল্যাণ্ড। বিদেশাগত নাট্যামোদী ও সংগীতরসিক ব্যক্তিরা যাতে বৃটেনের শ্রেষ্ঠ সংগীতানুষ্ঠান ও নাটকাভিনয়গুলি দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হন, সেজন্য এই সমিতি তাঁদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করে দেবার ভার গ্রহণ করেন।

বৃটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর বৈদেশিক দর্শকদের মধ্যে যাঁরা সেকসপীয়র স্মরণোৎসবে যোগদান করতে ইচ্ছুক, তাঁরা যতশীঘ্র সম্ভব 'থিয়েটারে হলিডে প্ল্যানের' কাছে সে কথা জানাবেন। আগামী ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গ্লাসগোতে স্কটিশ শ্রমশিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হবে এবং ঠিক এই সময়ে (২১শে আগষ্ট থেকে

১১ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরায় তৃতীয় আন্তর্জাতিক সংগীত ও নাটকোৎসব অনুষ্ঠিত হবে। গ্লাসগো প্রদর্শনীর বৈদেশিক দর্শকদের মধ্যে যাঁরা এডিনবরার উৎসবে যোগদান করতে ইচ্ছুক, তাঁরাও 'প্ল্যানের' কাছে সর্বপ্রকার সাহায্য পাবেন।

দর্শকরা সমিতির কাছ থেকে উৎসব সম্পর্কীয় সমস্ত খোঁজখবর পাবেন। উৎসব স্থানে বাস সংগ্রহ করা, আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানগুলির জন্য টিকিট সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজ সমিতির দ্বারাই সম্পন্ন হবে।

বিমানযোগে রেডিও সেট সরবরাহ

লণ্ডনের কোন এক ফার্মের রপ্তানি বিভাগের ম্যানেজার মিঃ হ্যারল্ড ফার্মে তৈরী রেডিও সেট এবং ইলেক্‌ট্রোনিক যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের জন্য গত তিন বছরে বি ও এ সি বিমানে ১,৫০,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি এইভাবে লক্ষ লক্ষ টাকার রেডিও সেট, ভাল্‌ব্‌ এবং অন্যান্য উপকরণাদি ইজিপ্ট, পাকিস্তান, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, সিংহল এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বিক্রয় করতে পেরেছেন। সবশুদ্ধ তিনি বিমানযোগে ২৮টি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মিঃ ফীল্ড মনে করেন যে, বিমানের সাহায্য না নিলে বৃটেনের রপ্তানি প্রচেষ্টায় এইভাবে সাহায্য করা তাঁর কার্যের পক্ষে সম্ভব হত না। এই প্রসংগে তিনি কি করে ব্রহ্মদেশের চাহিদা মেটাতে পেরেছিলেন, তার বর্ণনা করেন।

তিনি যখন এই সম্পর্কে লণ্ডন থেকে 'তার' পেলেন, তখন তিনি কলকাতায় ছিলেন। তাঁকে অবিলম্বে রেঙ্গুন যেতে আদেশ করা হয়। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তিনি রেঙ্গুনে পৌঁছে, কি ধরণের রেডিও সেটের প্রয়োজন হবে তার খোঁজ খবর নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং সেখান থেকে তিনি রেডিও টেলিফোনের সাহায্যে লণ্ডনে সমস্ত বিবরণ জানান। তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজন মত রেডিও সেটের নমুনা তৈরী করে বি ও এ সি বিমানযোগে তা রেঙ্গুণে প্রেরণ করা সম্ভব হয়।

টেলিভিশন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার

১৯৪৮ সালে বৃটেনে ব্যবহৃত 'টেলিভিশন রিসিভিং সেটের' সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২,৮০০, তুলনায় ১৯৪৭ সালে ছিল মাত্র ৩১,০০০। গত ডিসেম্বরে এক মাসের মধ্যেই প্রায় ১০,০০০ 'সেটে'র জন্য লাইসেন্‌স্‌ দেওয়া হয়।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টেলিভিশন সেটের ব্যবহার যখন নিষিদ্ধ হয়, তখন বৃটেনে ব্যবহৃত 'সেটের' সংখ্যা ছিল ১৮,০০০। পরে ১৯৪৬ সালে টেলিভিশন ব্যবহার পুনঃপ্রচলন হলে ছ মাস বাদে 'সেটের' সংখ্যা হয় মাত্র ৭,৫০০।

বৃটিশ টেলিভিশন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ নর্মান কলিন্‌স্‌ সম্প্রতি মন্তব্য করেন যে, বৃটেনের টেলিভিশন যন্ত্রগুলি যে কেবল আমেরিকার তুলনায় উন্নত তা নয়, সুলভ ও। তিনি আশা করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনের প্রতিগৃহে একদিন টেলিভিশন ব্যবহার দেখা দেবে।

কিশোর মনের ওপর চলচ্চিত্রের প্রভাব

চলচ্চিত্র বয়স্ক ব্যক্তিদের মনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে, সে সম্বন্ধে পূর্বে কিছু কিছু অনুসন্ধানাদি হয়েছে বটে কিন্তু কিশোর কিশোরীদের মনোজগতে চলচ্চিত্র কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং সমাজের ওপর তার কি ফল হয়, সে সম্পর্কে বৃটিশ সমাজতত্ত্ববিদ মিঃ ডব্লিউ, এ, সাইমন ই সর্বপ্রথম বিশদ গবেষণা করেন।

সম্প্রতি এই বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা প্রসংগে মিঃ সাইমন ১২টি ফিল্মের উল্লেখ করেন। এই ফিল্মগুলি
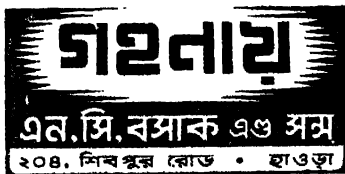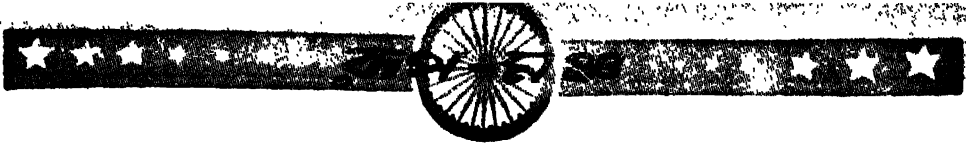
১৩ থেকে ১৭ বৎসর বয়স্ক কিশোর কিশোরীদের মনের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে তা তিনি ভালভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। কমপক্ষে ৩৬টি ছেলেমেয়ে সমস্ত ছবিগুলি দেখেছিল এবং ছবি দেখার ফলে ছবির বিষয়বস্তু এবং কোন বিশেষ ছবির দ্বারা তারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিল মিঃ সাইমন তা খুব ভালভাবে অনুসন্ধান করে দেখেন।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ওপরই ছবির প্রভাব বেশী। ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্যও আছে। বিয়োগান্ত চিত্রগুলি মেয়েদের মনকেই বেশী নাড়া দেয় এবং মেয়েদের মনের ওপর সেগুলির প্রভাবও অধিকক্ষণ থাকে। ছবির করুণ দৃশ্যগুলি মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। ছবির বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা খুঁটিনাটি বিষয়গুলি ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই বেশীদিন মনে করে রাখতে পারে।

চরিত্রের ওপর প্রভাব

চলচ্চিত্র কিশোর কিশোরীদের চরিত্রের ওপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে? ছবি দেখে কিশোর কিশোরীরা প্রেম নিবেদনের কতটা অনুপ্রেরণা লাভ করে? এই ব্যাপারে মেয়েদের চেয়ে ছেলেরাই সহজে প্রভাবিত হয়। মিঃ সাইমন যতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করেন, তার মধ্যে শতকরা ৩১টি ছেলে ছবি দেখার পর মেয়েদের প্রতি অধিকতর প্রেমের আকর্ষণ অনুভব করে এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২০ জন মাত্র এরূপ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়।

এরূপও দেখা গেছে যে, ছবি দেখার ফলে মেয়েদের মধ্যে পিতামাতার প্রতি ভালবাসা ও অপরকে সাহায্য করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছবির পর্দায় কোন বিশেষ ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করার ইচ্ছা, চিত্র তারকা হবার আকাঙ্ক্ষা ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যেই প্রবল হয়ে ওঠে। শতকরা মাত্র ৭টি ছেলেমেয়ে বলে যে, প্রচুর অর্থোপার্জন করার জন্যই তাদের এই আকাঙ্ক্ষা।

চলচ্চিত্রের প্রভাবে ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে অনেকের মনে অতৃপ্তি ও অসন্তোষের ভাব দেখা দেয়। শতকরা ৩৬টি ছেলে এবং ২২টি মেয়ে নিজেদের জীবন নীরস ও বৈচিত্র্যহীন বলে মনে করে। এ্যাডভেঞ্চার মূলক ছবি ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বেশী প্রভাবিত করে—এটা অবশ্য খুবই বিস্ময়ের কথা। গৃহত্যাগ করে দেশবিদেশে ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যেই বেশী পরিমাণে দেখা যায়। মেয়েরা ছবির পর্দায় খুব নাচ গলা জামা পরা অভিনেত্রী, জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুরতা বা স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কঠোর ঔদাসীন্যের ভাব দেখতে মোটেই পছন্দ করে না।

তারকাদের অনুকরণ

মিঃ সাইমন ১২৩১ জন ছেলে এবং ৮৯৯ জন মেয়ের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তারা সেগুলির খোলাখুলি জবাব দেয়। সমান সংখ্যক ছেলে ও মেয়েরা বলে যে, তারা নৃত্য ও প্রেম ছাড়া পর্দায় যা দেখে তারই অনুকরণ
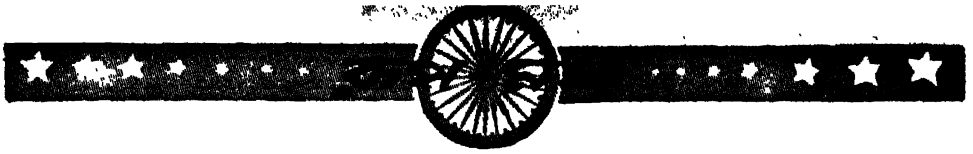
করতে চায়। অনেক মেয়ে স্বীকার করেছে যে, তারা চিত্রাভিনেত্রীদের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে বটে কিন্তু ছেলেদের তা বুঝতে দিতে চায়না। ছেলে ও মেয়ে উভয়েই চিত্র তারকাদের চুল ও পোষাকের অনুকরণ করতে চেষ্টা করে এবং মেয়েরা প্রসাধনরীতি সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষা লাভ করে।

শতকরা প্রায় ৫০ জন কিশোর কিশোরী তারকাদের চলন বলনের ভংগী ও খেয়াল খুসীর অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। মিঃ সাইমনের এই অনুসন্ধান কার্যের ফলে কতকগুলি বিশেষ মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। চিত্রনির্মাতাদের যেগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, দস্যুতস্করদের খুব সাহসী ও পরোপকারী রূপে চিত্রিত করলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিশোর কিশোরীরা জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। চিত্র নির্মাতাদের সব সময় একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ছবির মধ্যে এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা তাদের মনে কোন সমাজবিরোধী ভাবের উদ্রেক করে বা তাদের চরিত্রের ওপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। —জোসেফ কালমার

বৃটেনে নাট্য শিল্পের আদর

বৃটেনের জনসাধারণের মধ্যে কন্‌সার্ট, অপেরা, নৃত্যগীত এবং থিয়েটারের কদর আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। নাট্য শিল্পে জনসাধারণের আগ্রহ কি পরিমাণে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে 'আর্ট কাউন্সিলের' সাম্প্রতিক বিবরণী থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রকাশ, কাউন্সিল পরিচালিত নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলিই বৃটেনে সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। তাদের কারখানার শ্রমিকদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত কন্‌সার্টের চাহিদা অত্যন্ত বেশী তা ছাড়া বিভিন্ন স্থানে ক্লাব গঠন করে সংগীত এবং অনুরূপ শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও তারা করেছে।

গত ১২ মাসের মধ্যে 'আর্ট কাউন্সিলের' আনুকুল্যে ৪৫ টি নাটুকে দল সাধারণ্যে নৃত্য-গীত সম্বলিত নানা ধরণের ৬০০ নাটক পরিবেশন করেছে। নাটকগুলি কেবল বড় বড় সহরেই দেখানো হয় নি। গ্রামেও দেখানো হয়েছে, যাতে সর্বশ্রেণীর লোকে আধুনিক অভিনয়-কৌশল এবং উন্নত ধরণের নাচের পরিচয় পায়।

'আর্ট কাউন্সিল'ই এই নাটুকে দলগুলির বাইরে অভিনয় করার সমস্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। এরা গতবার ১১২টি ছোট ছোট সহরে এবং গ্রামে যে আটটি নাটক মঞ্চস্থ করে তা দেখতে প্রায় ৯৫,০০০ লোক এসেছে। খনি এলাকাতেও তারা কয়েকবার তাদের অভিনয় দেখিয়েছে। সেখানেও শ্রমিকদের মনে অচিন্ত্যনীয় আগ্রহ দেখা গিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটরের পদে অভিনেতা

আটচল্লিশ বছর বয়স্ক স্কটিশ অভিনেতা এ্যালিষ্টের সিম্ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লর্ড রেক্টর (অধ্যক্ষ) পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ৮০০ ভোটের তুলনায় তিনি পেয়েছিলেন ২০০০ ভোট।
ইংলণ্ডে তিনি ফিল্ম এবং মঞ্চ অভিনেতা হিসাবে সুপরিচিত হলেও সিম্ এক সময় এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

তিনি যখন জেম্‌স ব্রিডি'র "দি এ্যানাটমিষ্ট" নাটকে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, সেই সময় তাঁর এই নির্বাচন ফলাফল প্রকাশিত হয়। এই নাটকটিতে তিনি এডিনবরা বিশ্ব বিদ্যালয়ের জনৈক এ্যানাটমির অধ্যাপক হিসাবে অবতীর্ণ হন।

নিউইয়র্কে বাংলা থিয়েটার

(তিন)

স্বর্গত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

২৪শে হইতে ২৬শে অক্টোবর, ৭ই হইতে ৯ই কার্তিক, শুক্র, শনি, রবি এই তিনদিন ডায়েরি লিখি নাই। লিখিবার সময় এবং বিষয় বস্তুর স্থিরতা ছিল না, সহরটি ভাল করিয়া দেখিয়া তবে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা লিখিব মনে করিয়াই পূর্বে লিখি নাই, এখন লিখিতেছি। বৃহস্পতিবার আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্য হইতে জাহাজ আমেরিকার জলে আসিয়াছে। দূরে দূরে বয়া দেখা যাইতেছে। ক্রমে আমরা সাজগোজ করিয়া জাহাজের ডেকে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখন হড্‌সন উপসাগরের মধ্যে পড়িয়াছি। ক্রমে উপসাগর ছাড়াইয়া নদীর মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করিল। আমাদের বামদিকে নিউজর্সি এবং ডানদিকে নিউইয়র্ক, এই স্থানে আমাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য জাহাজ থামিল, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষ হইলে আসিলেন Custom Officer. তাঁহার কার্য শেষ হইলে আসিলেন Immigration Officer. ক্রমান্বয়ে তিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দাড়াইতেই শিশিরবাবুর তার পাওয়া গেল। পাগড়ী চাপকান্ পরিয়া বা ধুতি চাদর পরিয়া নাবিবার পরামর্শ দিয়াছেন। অথচ দেশে থাকিতে যাবতীয় বিলাত বা আমেরিকা ফেরতের নিকট শুনিয়া আসিতেছিলাম, খাঁটি সাহেবিয়ানার কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি চলিবে না।

আসল কথা মনের বল, তাহা থাকিলে দুনিয়ার অনেক স্থানে অনেক কিছুই করা চলিতে পারে। যাহা হউক, আমাদের জাহাজ বেলা প্রায় ৩টায় ডকে ভিড়িল। ডকে ঢুকিবার পূর্বেই Trans Atlantic Serviceএর একখানি অতি বৃহৎ এবং বিখ্যাত "ইউরোপ" নামক জাহাজ দেখিলাম। স তো জাহাজ নহে, কলিকাতার একটা ব্যারাক। অতি বৃহৎ ব্যাপার। জাহাজখানি German Companyর। ইহারা ৫।৬ দিনে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়।

২৫শে অক্টোবর।

প্রাতঃভ্রমণ করিবার জন্য সকালে রাস্তায় বাহির হইলাম। একবার একা, আবার ফিরিয়া আসিয়া অমলবাবুর সহিত। আমাদের বাসার নিকট Broadway—কলিকাতার Harrison Road. উহা পার হইয়া হড্‌সন গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গেলাম। অতিরিক্ত ঠাণ্ডাবাতাস, মাথার টুপি উড়াইয়া লইতে চাহে। সমস্ত দিন বাসায় থাকিয়া সন্ধ্যার পর Mansfield Theatreএ অভিনয় দেখিতে গেলাম। শিশিরবাবু পাশ পাইয়াছিলেন।

আমাদের দলে ছিলেন, শিশিরবাবু, বিশুবাবু, তারুবাবু, মনোরঞ্জনবাবু, শ্রীমতী কঙ্কাবতী ও আমি। নট নটীরা নিগ্রো। পুস্তকের নাম "Green Pastures"। বইখানি ৯ মাস ধরিয়া খুব জোরে চলিতেছে, নাটকখানি পৌরাণিক। আমাদের দেশের যাত্রার মত। Bibleএর স্তোত্রগুলি মাঝে মাঝে গীত হয়। আমার এবং আমাদের সকলেরই খুব ভাল লাগিল। প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী একেবারে নিখুঁত অভিনয় করিল। অভিনয়ের অপেক্ষা বেশী তারিফ করিতে হয় দর্শকদের। বড় ভাল। বড় ভদ্র, একটু হৈ চৈ হাসি ঠাট্টা সমালোচনা কিছুই নাই। ইহারা আনন্দ করিতে যায় এবং আনন্দ করিতে জানে।

২৬শে অক্টোবর—রবিবার।

সকালে বাহির হই নাই। বাসাতেই অনেকে আসিতেছেন। শনিবার দুপুর বেলা এখানকার আমাদের Publicity Officer Mr. Bomberged না কি ঐরূপ একটি Bombshell গোছের নাম, তাঁহার সহিত আলাপ হইল। বিশেষ ভদ্রলোক। আমার কথা কিছু লিখিয়া লইলেন। আমার দ্বিতীয় দলের বিজ্ঞাপন বিশেষ কিছুই হয় নাই। শনিবার, রবিবার কয়েকখানি কাগজে শিশিরবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবন ইতিহাস বাহির হইয়াছে। রাত্রে রিহার্সালের জন্য Biltmore Theatre-এ গেলাম।

২৭শে অক্টোবর সোমবার, ১০ই কার্তিক।

Biltmore হইতে ফিরিয়া বাকি রাত্রিটা শিশিরবাবু, সত্য সেন, নির্মল দাস, ইহাদের সংগে সীতার প্রযোজনা সম্বন্ধে

আলাপ আলোচনা হইল। সামান্য সময়ের জন্য সামান্যই নিদ্রা হইয়াছে। রাত্রে dress, sceno, setting, light adjustment প্রভৃতির rehearshal দিতে গিয়া দেখা গেল, সমস্ত মিল করিয়া আগামী কাল অভিনয় হওয়া অসম্ভব। অথচ বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গিয়াছে, বিশেষ চিন্তার কথা, দেখা যাক ভগবান কি করেন?

২৮শে অক্টোবর, মঙ্গলবার ১১ই কার্তিক।

স্থির হইল, অভিনয় কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখিতে হইবে। এখানকার সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীই আমাদের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের সকলের সাহায্যে শীঘ্রই প্রস্তুত হইতে পারিব আশা করা যায়। আমার বিশ্বাস, ৩টা রিহার্সালে সমস্ত ত্রুটি সারা যাইতে পারে।

২৯শে অক্টোবর, বুধবার, ১২ই কার্তিক।

মন বড় দমিয়া গেল। অভিনয়টা নির্দিষ্ট দিনে হইয়া উঠিল না। কাল সমস্ত রাত্রি শিশিরবাবু, পান্নাবাবু, শৈলেনবাবু ও আমি জাগিয়াছি, কাজে নয়, গল্প-গুজবে।

সন্ধ্যায় একজন প্রবাসী বাঙ্গালী ও তাঁহার বিদেশিনী স্ত্রীর সংগে পরিচয় হইল, ইঁহারা শ্রীযুক্ত লাহিড়ী ও শ্রীযুক্তা লাহিড়ী, লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ী শ্রীরামপুর, ১০ বৎসর এখানে আছেন। ইঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে সেতার ও এসরাজ বাজাইয়া জীবিকা অর্জন করিতেছেন, মহিলাটি ২।৩ খানি বাংলা গান গাহিলেন: যথা—"দিয়োনা—দিয়োনা—দিয়োনা ব্যথা"—

৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার, ১৩ই কার্তিক।

Miss Merbury শিশিরবাবুকে চিঠি লিখিয়াছেন, অভিনয় ভাল, কিন্তু Scenery এবং Costumes আরও নয়নাভিরাম হওয়া আবশ্যক, সুতরাং দৃশ্যপটগুলি, যাহা জাহাজের খোলে দেড়মাস বন্ধ থাকিয়া এবং ওঠানামার গণ্ডগোলে প্রায় চূর্ণ হইয়াছে, নূতন করিয়া রংগীন করিতে হইবে। প্রায় ২ সপ্তাহ সময় লাগিবে। সোমেশবাবু আসিয়াছিলেন—গণিতে ইঁহার অতি অসাধারণ শক্তি, স্মৃতি শক্তিও তেমনিই অপূর্ব। তাঁহাকে সংগে লইয়া মনোরঞ্জন বাবু ও আমি নদীর ধারে গিয়া উত্তর দিকে বেড়াইতে ছিলাম। International House-এ গেলাম। মনোরঞ্জনবাবুর বন্ধু শ্রীযুক্ত রক্ষিত সেখানে কাজ করেন। এখানে জগতের সর্বজাতির সম্মেলন, ভারতেরও সামান্য একটু আসন সেথায় আছে, রবীন্দ্রনাথ এখন নিউইয়র্কে আছেন। তাঁহার সেক্রেটারীর সংগে আলাপ হইল, রাত্রে আহারান্তে শয়ন করিতে যাইতেছি, সতু সেন আসিলেন: সমস্ত রাত্রি তিনি তাঁহার আমেরিকা অভিজ্ঞতা বলিতে লাগিলেন।

১২ই নবেম্বর, বুধবার, ২৬শে কার্তিক।

কাল সন্ধ্যায় বেড়াইতে বাহির হইয়া থিয়েটার দেখিতে গেলাম। 'দি নিউ আমষ্টার্ডম' থিয়েটার-এ অভিনয়ের সুখ্যাতি আগেই শুনিয়াছিলাম! 'আর্‌ল্‌ক্যারল্‌ ভ্যারাইটিজ'। 'আ্যারল্‌ ক্যারল' প্রযোজকের নাম, পালার নাম ভ্যারাইটিজ অর্থাৎ এই প্রযোজনা তাঁহার গর্বের বস্তু। ইহা নাটক নহে, ভ্যারাইটি শো, নাচ, গান, ছোট ছোট ব্যঙ্গ অভিনয়, যাদুবিদ্যা ইত্যাদি। ৬০।৭০ জন সুন্দরী মেয়ে বাহির হইয়াছিল। তাহাদিগের অংগসৌষ্ঠব, নৃত্যভংগী অপূর্ব দৃশ্যপট, সাজসরঞ্জাম এবং সর্বোপরি আলোর খেলা অতি সুন্দর। আমরা বাংলাদেশে যে ওরূপ পারি না তাহা নহে, আমাদের অর্থাভাব। আমাদের প্রযোজনাকে আমাদের জীবনের সংগে পারিপার্শ্বিকের সংগে মিলাইয়া সুন্দর করিতে হইবে। আজ পর্যন্ত যত লোক বিদেশে আসিয়াছেন এবং তারপর দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কেহই আসল তুলনামূলক সমালোচনা করেন নাই। তাঁহারা শুধু বিদেশের সমস্ত জিনিষেরই প্রশংসা করিয়াছেন, দেশীয় যাহা কিছু সমস্ত বিষয়েরই নিন্দা করিয়াছেন। আমাদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু গুণও প্রচুর আছে। 'র-মেটিরিয়্যাল' এর অভাব নাই, ভাল ইন্‌জিনিয়রের দরকার।

দেশে থাকিতে শুনিয়াছি, আমার নাটক বিশেষ কিছু নহে—জমিয়াছে শুধু প্রযোজনার (প্রডাকৃশন্‌) জোরে। এখানে আসিয়া মনে হইতেছে, প্রযোজনা ঠিক হয় নাই। যাহা কিছু জমিয়াছিল, ভাষা ও সুরের জোরে। এইখানে প্রডাকৃশন্‌ কথাটার অর্থ ভাল করে বুঝা দরকার। গানে যেমন রাগ-রাগিনী—নাটকেরও তেমনি 'প্রডাকৃশ-

হিন্দি গানের ভাষা আমি বুঝিনা, কিন্তু যেখানে গানের কথা ছাড়াইয়া রাগরাগিনীর আলাপ হয়, সেখানে কাহারও বুঝিতে কষ্ট হয় না। অভিনয়েও নাটকের মধ্যে যেটুকু জাতীয় (ন্যাশন্যাল), সেটুকু তাহার নিজস্ব ভাব ও ভাষা—যেখানে সর্বজাতীয় (ইনটারন্যাশন্যাল্) সেখানে সে ভাষার বন্ধন অতিক্রম করিয়া অনির্বচনীয় হয়। আমাদের অভিনয় সর্বত্র অনির্বচনীয় নহে।

১৩ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার, ২৭শে কার্তিক।

কাল সকালে বিলাতে 'গোল টেবল' বৈঠকের প্রথম অধিবেশন। সম্রাট ও প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য (রেডিওতে) আমাদের অনেকেই ভোর বেলায় উঠিয়াছিলেন। আমি উঠিতে পারি নাই।

সন্ধ্যায় 'ইভিনিং পোষ্ট' কাগজে তাহার বিবরণ পড়িলাম। কাগজের বিশেষ সংবাদদাতা বিলাতে ছিলেন। সেখান হইতে তারে তাঁহার প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন।

১৪ই নভেম্বর, শুক্রবার, ২৮শে কার্তিক।

খবর পাওয়া গেল, অধ্যাপক রমন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন, ভারতের পক্ষে পরম গৌরবের কথা। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন একজন আমেরিকাবাসী। তিনি এখন জার্মানীতে বাস করিতেছেন। জাহাজের মত এখানেও জীবন ক্রমে অতিষ্ঠ হইতেছে। কাহারও কিছুই ভাল লাগে না। যন্ত্রপাতি পোষাকপত্র সমস্তই বিলট্মোর থিয়েটারে আটক রাখিয়াছে। একটু গান বাজনা করিবারও উপায় নাই, লেখাপড়ায়ও মন দেওয়া অসম্ভব। শুধু শুধু রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইবার মত বয়স আর নাই। তাহার উপর আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতেছে।

১৫ই নভেম্বর শনিবার, ২৯শে কার্তিক।

আজ আবার একটা পাকা কথাবার্তার দিন, আমরা যে কোথায় দাঁড়াইয়া আছি, ঠিক বুঝিতেছিনা। আমাদের সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া কেন বা আনিল, আর কেনইবা এইভাবে বসাইয়া রাখিয়াছে? যদি বলিত "না তোমাদের দ্বারা হইবে না" তাহা হইলেও বাঁচিতাম। পঁচিশ জনে মিলিয়া চেঁচাইয়া লোকদের বলিতাম, "এই লোকগুলা আমাদের আশা ভরসা দিয়া এখানে আনিয়া এইভাবে বিপদে ফেলিয়াছে। আমরা কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছি না। এখানে অর্থ ও যশঃ উপার্জনের এত পথ খোলা আছে যে, ভাদুড়ী মহাশয়কে সম্মুখে রাখিয়া আমরা অনেক কিছুই করিতে পারি। ভীত হইবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এই চুপ করিয়া বসিয়া থাকা বড় অসহ্য।

১৬ই নভেম্বর রবিবার, ৩০শে কার্তিক।

কাল রাত্রিকালে বাসায় খুব "গ্যালা নাইট" গিয়াছে, সন্ধ্যার নীচে রান্নাঘরে বসিয়া চা পান করিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের কয়লাওয়ালা একটি বোতল টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "প্রেজেণ্ট" ঘরের তৈরী জিনিষ 'ফ্রক গ্রেপ্স'। রাধাচরণ বাবু উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন "উই ডোন্ট্ ড্রিঙ্ক"। আমি বলিলাম, উপহার কখনও ফিরাইয়া দেওয়া উচিৎ হয় না। শিশিরবাবুর কাছে পাঠানো হইল। তারপর আনন্দ অভিযান আরম্ভ হইল। শিশিরবাবু তাঁহার প্রসন্ন মানসিক অবস্থায়, শ্রীশবাবুকে বক্তৃতার দ্বারা আক্কেল দিবার চেষ্টা করিলেন। শ্রীশবাবুকে দেখিয়া মনে হইল না, তাহার আক্কেল হইয়াছে।

সকালে শৈলেনবাবুর বাড়ীতে ভাদুড়ী মহাশয় শ্রীমতী কঙ্কা প্রমুখ আমাদের আট দশজনের নিমন্ত্রণ, ভাদুড়ী ও কঙ্কা যাইতে পারিলেন না। পান্নাবাবু, অমলবাবু ও আমি যাইতেছি।

শৈলেন ঘোষের বাসা 'ব্রুকলিন্' সহরের উত্তর পূর্ব প্রান্তে 'সিপ্সে হেড বে' নামক স্থানে। ১৮।২০ বৎসর আগে স্থানটি সমুদ্র গর্ভে ছিল। সুন্দর সহরতলী গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের বালীগঞ্জ, টালীগঞ্জ, ঢাকুরিয়ার মত। সুড়ঙ্গ রেলপথে নদী পার হইয়া যাইতে হয়। সমস্ত দিন বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটিল, শৈলেনবাবু তাহার স্ত্রী, ২টি ছোট মেয়ে, তাহাদের সংগে আর একটি বেকার পরিবার থাকেন। কর্তার নাম গান্ধী (ইনি পাঞ্জাবী) তাঁহার স্ত্রী ও দুটী মেয়ে।
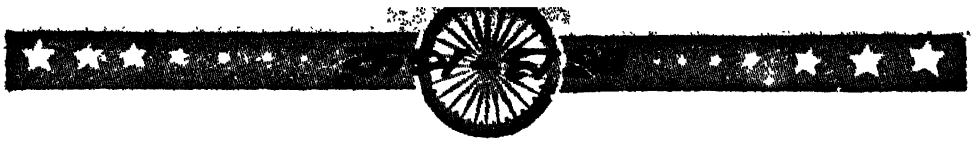
আরও দুইটি ভদ্রলোক পরে আসিয়াছিলেন। একজন মিঃ বাজপেয়ী; ইনি কেমিষ্ট। ইহার একটু ইতিহাস আছে পরে লিখিব। আর একজন মাদ্রাজী। শৈলেনবাবু তাঁহাকে 'জোয়ি' বলিয়া ডাকেন। বৈকালের দিকে একটু গান ও আবৃত্তি হইল।

শ্রীমতী ঘোষের নাম শ্রীমতী রেবেকা ঘোষ। ইহার পিতা সাইবেরীয় ইহুদী, মাতা আমেরিকান। গোড়ায় ইনি শৈলেনবাবুর ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জন কার্যে সহকর্মিণী ছিলেন। তারপর দুইজনে প্রেম হয়। আজ ৭ বৎসর ইহারা বিবাহিত। সুখে দুঃখে ইঁহাদের মিলিত জীবনধারা একরূপ চলিয়াছে। কথাবার্তায় মনে হইল একটি বড় আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই মহিলা জীবন যাপন করিতেছেন। মেয়ে দুইজনের একজনের নাম মরিয়ম আর একজনের নাম লীলা। শ্রীমতী ঘোষ ভারতীয় জীবন লইয়া একখানি নাটক লিখিতেছেন। আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। আমি সাধ্যমত সাহায্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।

১৭ই নভেম্বর—সোমবার, ১লা অগ্রহায়ণ।

সুপ্রভাত। কার্তিক মাস শেষ হইল। আজ অগ্রহায়ণের প্রথম দিন। কাল সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। মাঝে একবার বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিলাম। আজও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অল্প বৃষ্টি হইতেছে। এখানকার লোকের কুসংস্কার, শুক্রবার বৃষ্টি আরম্ভ হইলে এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলে।

১৮ই নভেম্বর, মঙ্গলবার, ২রা অগ্রহায়ণ।

বাড়ীর চিঠি কাল পাইয়াছি, উত্তর লিখিলাম। কাল বৃষ্টি থামিয়া একটু রৌদ্র উঠিয়াছিল। এখন আকাশ আবার মেঘাচ্ছন্ন। তবে বৃষ্টি পড়ে নাই। এই অনিশ্চয় নিরুদ্দেশ প্রবাস আমাদের সকলকেই বিশেষ পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। গতকাল ও আজ পাকা কথার দিন ছিল। এখনও কোন পাকা কথা হয় নাই। কাহারও হাতে টাকাকড়ি কিছুই নাই। মনের অবস্থা এমনই যে, কিছুই ভাল লাগে না। পড়াশুনা, গল্পগুজব, বেড়ানো, সহর দেখা— কিছুতেই মন লাগে না। আমাদের বর্তমান অবস্থায় আমাদিগকে মন্ত্রণা দিতে পারে, এমন মাথাওয়ালা মানুষ আশে পাশে কোথাও দেখিতেছি না।

১৯শে নভেম্বর বুধবার, ৩রা অগ্রহায়ণ।

ভরসার মধ্যে এই যে, কাল সন্ধ্যায় World কাগজে আমাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছে। সহরে গুজব রটিয়াছিল, আমরা অভিনয় না করিয়াই কলিকাতায় ফিরিব। মিস মারবারি এবং ক্যারল রীড প্রতিবাদ করিয়াছেন, গুজব সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা ডিসেম্বর মাসে ব্রডওয়েতে অভিনয় করিব—কাগজে ঠাট্টা করিয়া লিখিয়াছিল, "অনেকে আশংকা করিতেছেন, হিন্দু থিয়েটারের নাচের মেয়েরা কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বে আপেল বিক্রয় করিতে বাহির হইবেন, তবে সে আশংকার কারণ নাই।" কাগজে ছাপার অক্ষরে লেখা পড়িয়া মনটা অনেকটা আশ্বস্ত হইল।

২০শে নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা অগ্রহায়ণ।

কিন্তু কৈ মিস মারবারি ও মিঃ রীড শুধু কাগজেই প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমাদের সংগে আজও কোন পাকা কথা হইল না, যে আমেরিকায় প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান, সেখানে আসিয়া আমরা একটি মাস (এবং শিশির বাবুরা দেড় মাস) চুপ করিয়া বসিয়া আছি। 'আশার বিরুদ্ধে আশা' করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। দেশের কাগজ পত্রে আমাদের এই নীরবতা সম্বন্ধে কি লিখিতেছে কেই বা তা জানে। কয়েকদিন হইতে পান, ফৌজদারি, বালাখানার তামাক খাইতে ইচ্ছা হইতেছে। চারিজন মেয়েকে সংগে লইয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু ও আমি মিউজিয়ম দেখিতে গিয়াছিলাম। কি দেখিলাম তাহা বলা যায় না। Biology, Geology, Zoology, Geography, Botany, Anthropology, প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে বিদ্যার্থীর এই মিউজিয়মটি দেখা দরকার। মিউজিয়মের নাম "American Museum of natural history'। অন্য অনেক দ্রষ্টব্যের মধ্যে একটি প্রস্তরীভূত নরমূর্তি দেখিলাম। ইহার ইতিহাস—লোকটি বহুকাল পূর্বে তামার খনিতে কাজ করিবার সময় বোধকরি চাপা পড়িয়া মারা যায়। Copper Sulphateএ তাঁহার দেহ রক্ষিত হইয়াছিল—কালে সে দেহের কিয়ৎ অংশ প্রস্তরে পরিণত হইয়াছে। যেখানে ... পাওয়া যায়, তাহার পাশে যে অস্ত্র শস্ত্র ছিল তাহা ... মনে হয় ঘটনাটি ঘটিয়াছিল—কলম্বসের আগমনের পূর্বে

২১শে নভেম্বর, শুক্রবার, ৫ই অগ্রহায়ণ।

এখানকার ভারতীয়ের মধ্যে এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাঁদের আগ্রহ এবং কৌতূহল আছে এমন আমেরিকানদের মধ্যে "গোল টেবিল বৈঠকের" খুবই আলোচনা চলিতেছে। কোন কাজ হউক বা না হউক—ভারতীয় ডেলিগেটগণের কথায় সবাই মুগ্ধ হইয়াছেন। পণ্ডিত জাতির সর্দার আহম্মদ করের এবং মুসলমান নারী সমাজ হইতে শ্রীমতী সাহনওয়াজের বক্তৃতা সকলকার মর্ম স্পর্শ করিয়াছে। ইঁহাদের উত্তরে শ্রীযুক্ত মাক্‌ডোনাল্ড মহাশয় কি বলিবেন তাহা সকলে আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ভারতের রাজা, প্রজা, ধনী, নির্ধন, হিন্দু, মুসলমান, আবাল বৃদ্ধ বণিতা আজ যে একবাক্যে স্বরাজ চাহিয়াছেন, ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল "স্বরাজ" তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাত্মা গান্ধী জেলের ভিতর হইতে তাঁর ত্যাগের মহামন্ত্র প্রভাবে এই পরিবর্তন ঘটাইয়াছেন। এই সময় আমাদের অভিনয়টী আরম্ভ হইলে বড় ভাল হইত। কিন্তু আজও কিছুই স্থির হইল না। বুঝিতে পারিতেছিনা আমাদের শুধু শুধু (অভিনয় না করিয়াই) ফিরিতে হইবে কিনা! কার দোষ দিব? ৮ই ডিসেম্বরের মধ্যে ৪ খানা জাহাজ কলিকাতায় যাইবে—আমাদের জাহাজ ছাড়িবে—৩০শে নভেম্বর।

২২শে নভেম্বর, শনিবার, ৬ই অগ্রহায়ণ।

প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেব বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁর বক্তৃতার সার মর্ম "একটা কিছু করিতে হইবে"। সেটী যে কি তাহার কোন আভাষ নাই। "গোল টেবিল বৈঠকে"র কাজ প্রায় শেষ হইল। ডেলিগেটগণ আমাদের পরে জাহাজে উঠিয়াছিলেন। আমাদের আজও আরম্ভই হইল না। মনে বড়ই অশান্তি। কোন কাজ করা একেবারেই অসম্ভব। ভগবান রক্ষা না করিলে এ অবস্থায় মান সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে না। আজ তিন সপ্তাহ Reed আজ নয় কাল, কাল নয় শনিবার, শনিবার নয় সোমবার—এই ভাবে শিশির বাবুর কাছে সময় লইতেছে। শিশিরবাবুর হাতে বা কারো হাতে একটী পয়সা নাই। নালিশ মোকদ্দমা করা এই বিদেশে যে কতদূর অসম্ভব, তাহা কেবল এই অবস্থায় পড়িলেই বুঝা যায়। ভরসার মধ্যে আমরা ২৫ জন এক সংগে আছি। হে ভগবান রক্ষা কর, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

২৩শে নভেম্বর, রবিবার, ৭ই অগ্রহায়ণ।

কাল দেশের পত্র পাইয়াছি। সুরেশ, স্ত্রী, নগেনবাবু, দাদা এবং হ'লর পত্র দিয়াছেন। সবাই আশা করিতেছেন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন—আমরা সিদ্ধি লাভ করিব। সকলের মিলিত প্রার্থনার ফলে যদি আমাদের এ যাত্রায় শুভ এবং শ্রেয় লাভ হয়। ইহা শুধু সম্ভব হইতেছে, আমরা ভারতবর্ষীয় বলিয়া। আমাদের হইয়া লড়িবার কেহই নাই। চীন অভিনেতা Melangfang যখন New-york এ আসিয়াছিলেন, শুনিতে পাই সমগ্র চীন সাম্রাজ্য তাঁহাকে অর্থ ও উপহার দিয়া এখানে পাঠাইয়াছিলেন—এবং এখানকার চীন রাষ্ট্রদূত সর্বপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অজ্ঞাত কুলশীল এক ইংরাজ নন্দনের কথায় বিশ্বাস করিয়া এত দূর দেশে এরূপ অপ্রস্তুত হইয়া আশা শিশিরবাবুর পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

কিন্তু দেশে থাকিতে একথা কেহই "বলি বলি করিয়াও বলিতে পারি নাই।"

২৪শে নভেম্বর, সোমবার, ৮ই অগ্রহায়ণ।

আজ সোমবার। আজ, কাল, পরশু এই তিন দিনের মধ্যে যদি কিছু হয় তো হইল—যদি না হয় তাহা হইলে Tampa জাহাজে ফিরিবার চেষ্টা বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। কিন্তু বুদ্ধিমানের মত বুদ্ধি মাথায় আছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শিশিরবাবু একেবারেই কিং কর্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িতেছেন। কারল রীড ছাড়া আর একজন ভদ্রলোক আমাদের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ সেন ওরফে সাটু সেন।

২৫শে নভেম্বর মঙ্গলবার, ৯ই অগ্রহায়ণ।

আজকার দিনও গেল। কাল সতু সেন বলিয়াছিলেন, "You will know everything by sixteen hours" সে ১৬ ঘণ্টা গত হইয়াছে, নূতন জ্ঞান লাভ কিছুই হয় নাই।
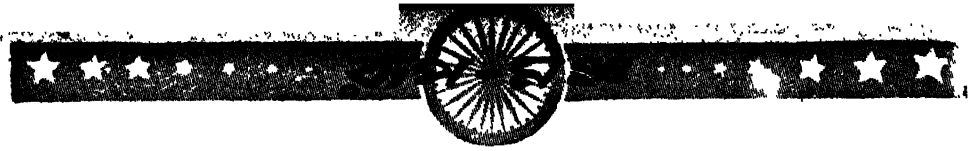
বেলা ১২টায় ভাদুড়ী মহাশয় বলিয়াছিলেন—"Good news" কিন্তু সেটি যে কি তাহা বুঝি নাই। অনেকদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি "Good news"। বাড়ীতে চিঠি লেখা গেল। স্ত্রী বরাবরই চিন্তিত। এতখানি দীর্ঘ বিরহ অভ্যাস নাই। আজ খুব শীত পড়িয়াছে, বোধ হয় শীঘ্রই তুষারপাত হইবে। বরাত ফিরিবে এই আশায় সেদিন লটারির টিকিট কিনিয়াছি, কিন্তু তবু ভাঙা বরাত ফিরিল না। বাড়ীতে কিছু টাকা পাঠাইতে না পারিলে মন শান্ত হইতেছে না। ২৮শে অভিনয় আরম্ভ হইলে এতদিনে কনট্রাক্ট অনুসারে ৪ সপ্তাহ শেষ হইত।

২৬শে নভেম্বর ১০ই বুধবার।

কাল সন্ধ্যায় "India Society of America"র উদ্যোগে "বিলটমোর হল"এ কবি রবীন্দ্রনাথের সম্মানে ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

এ ভোজ আমাদের ভারতীয় ভোজ নহে। এখানে "খাওয়ান দাওয়ান যেমন—তেমন বাজনা শুনো গিয়ে" বাজনার পরিবর্তে বক্তৃতা, তাহারও মূল্য ২৫শ ডলার। সুতরাং আমরা কেউই যাইতে পারি নাই। সকালে কাগজে দেখিলাম, রবীন্দ্রনাথ আমেরিকায় আসিয়া এই এই প্রথম মুখ খুলিলেন। প্রায় ১ মাস ২০ দিনের পর। তাঁহার শরীর রুগ্ন, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ একখানি ইজিচেয়ারে বসিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতার সারমর্ম, রবীন্দ্রনাথের সেই পুরাতন কথা "পশ্চিম তাহার এত ঐশ্বর্যের মধ্যে সুখ পায় নাই, প্রাচ্য তাহার দারিদ্র্য সত্ত্বেও অন্তরের আধ্যাত্মিক সম্পদে ধনী। সময় আসিয়াছে যখন পূর্ব ও পশ্চিম মিলিবে।" কবি সেই মিলনের দূত। কিন্তু পশ্চিম যে আদৌ মিলনের জন্য ব্যস্ত নহে, তাহার কি? রবীন্দ্রনাথ হইতে আমি পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ বাঙ্গলা দেশে সত্বর ফিরিয়া যাওয়া এবং যাহার যেমন সাধ্য দেশের কাজ করা। এভাবে ভিক্ষা করিতে আসিয়া সত্যই ভারতীয় 'আর্ট' প্রচার করা যায় না। এদেশে এবার বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রবল। আমরা ভারতীয়রা সকলেই সমস্যাটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিতেছি।

২৭শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার, ১১ই অগ্রহায়ণ—

আজ এখানে এক উৎসবের দিন, স্কুল-কলেজ আদালত ছুটি। শীতকালের উৎসব, আমাদের নবান্নের মত! উৎসবের নাম "Thanks giving day" কবে এ জাতি কোন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া কিংবা কোন নূতন সম্পদের অধিকারী হইয়া, যুক্ত করে ভগবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল, সে কথা অনেকেরই আজ মনে নাই। কিন্তু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে জাতির জীবনে। (ক্রমশঃ)

পূব-পাড়ার দক্ষিণ-পূর্ব সীমানার শেষ প্রান্তে আমাদের বিদ্যালয় গৃহটী অবস্থিত। পূব ও দক্ষিণে শস্য শ্যামল মাঠ—তার গা বেয়ে ছোট্ট খালটী এঁকে বেঁকে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত। বছরের বেশীর ভাগ সময়ই খালের জল শুকিয়ে যায়। বর্ষার কয়েক মাসের জন্যই খালের বুক জলে থৈ থৈ করে ওঠে। স্কুলের নিজস্ব কয়েক বিঘা চাষের জমি রয়েছে। এই জমি থেকে স্কুলের যা আয় হয়, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের সাহায্যের পরিমাণ থেকে তা নেহাৎ কম নয়। প্রথম যাঁদের প্রচেষ্টা ও অর্থে স্কুলটি স্থাপিত হয়, এই কয়েক বিঘা জমি তাঁদেরই একজন স্কুলকে দান করে যান। স্কুলবাড়ীর পশ্চিম দিকে সমাদ্দার বাড়ী। মাঝখানে ছোট্ট পালান। উত্তর দিকেও এমনি একটা পতিত জমি গ্রামের বসতি থেকে স্কুলবাড়ীটাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। উত্তর ভিতকে সম্পূর্ণ অধিকার করে স্কুল গৃহটী গড়ে উঠেছে—পশ্চিম আর পূর্ব দিকে তার দু'টী বাহু যেন কিছুটা দূর প্রসারিত হ'য়ে আছে। ইংরেজী 'ই' অক্ষরটির মাঝের দাগটা মুছে ফেললে যে আকার নেয়, আমাদের স্কুলগৃহটীর অবয়ব ঠিক সেই রকম দেখতে। মাথার ওপর টিনের চাল—চারিদিকে মুলি বাঁশের বেড়া। হোগলার সিলিং আর 'পারটিশন'।

মেঠো জমি থেকে স্কুল বাড়ীর ভিত অনেকটা উঁচু। বর্ষায় যখন চারিদিক জলে ভেসে যায়, স্কুল বাড়ীটি ছোট্ট একটী দ্বীপের মত ভাসতে থাকে। আমার আজো মনে আছে, বড়কাকা অর্থাৎ আমাদের স্কুলের যোগেশ পণ্ডিত—ভূগোলে বর্ণিত দ্বীপের বিশ্লেষণের সময় বর্ষাকালে জলে ভাসমান আমাদের স্কুল বাড়ীটিকে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করেছিলেন।

১৯২৪-৩১ খৃষ্টাব্দ হবে, আমরা স্কুলের ছাত্র ছিলাম। এই ক'বছরের গোড়ার দিকে স্কুলের আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয় হ'য়ে উঠেছিল। শিশুশ্রেণী নিয়ে স্কুলের সাতটী শ্রেণীতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ ষাট জন। শিক্ষক ছিলেন পাঁচজন। হেড মাষ্টার কামিনী দত্ত—এফ এ, ফেল। সেকেণ্ড মাষ্টার কেশব সরকার—ম্যাট্রিক ফেল। থার্ড মাষ্টার নেপাল দত্ত-- ম্যাটিক-এ ডিস্এলাউড হয়েছিলেন। হেড পণ্ডিত যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—নর্মাল। সেকেণ্ড পণ্ডিত খগেশ বন্দোপাধ্যায় —গুরু ট্রেইনিং। বেশীর ভাগ শিক্ষকদের বাড়ী আমাদের গাঁয়েই। কেবল নেপাল দত্তের বাড়ী ছিল ইন্দ্রপুর থেকে তিন চার মাইল দূরে। তিনি নীচের শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াতেন। আমাদের গাঁয়েই এক আত্মীয়ের বাড়ীতে নেপাল দত্ত থাকতেন। শনিবার বাড়ী যেতেন আবার সোমবার এসে ক্লাস নিতেন। সেকেণ্ড মাষ্টার কেশব সরকারের বাড়ী ঠিক আমাদের গ্রামে না হ'লেও, ছোট বয়স থেকে তিনি আমাদের গাঁয়ে তাঁর দিদির বাড়ীতেই প্রতিপালিত। তিনি রাত্রে চোখে কম দেখতেন। আমরা তাঁকে ডাকতাম কানা-কেশব মামা বলে। তিনি নীচের ক্লাসে ইংরেজী পড়াতেন আর উপরের ক্লাসে পড়াতেন

জ্যামিতি আর গ্রামার। তাঁর পড়াবার রীতি আমাদের ভাল লাগত। হেডমাষ্টার কামিনী দত্ত—গাঁয়ের অন্যতম তালুকদার। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী অবধি ইংরেজী পড়াতেন। ইংরেজী পড়াবার মূল দায়িত্ব তাঁর ওপর থাকবার জন্যই কিনা জানিনা—ইন্দ্রপুর মাইনর ইংরেজী স্কুল থেকে পাশ করে যারা অন্যত্র হাই স্কুলে ভরতি হ'তো, ইংরেজীতে অন্যান্য ছেলেদের সংগে তাদের এঁটে উঠতে খুবই বেগ পেতে হ'তো। হেড পণ্ডিত যোগেশ বাড়ুজ্জে, তিনি আমার বড়কাকা। বাবার খুড়তাত ভাই। তিনি কেবল ইংরেজী বাদে অংক, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস—প্রায় সব বিষয়ই পড়াতেন। তবে অংক আর বাংলা পড়ানোতেই যেন তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেত সব চেয়ে বেশী। ইন্দ্রপুর মাইনর স্কুল থেকে উত্তীর্ণ একটু সাধারণ মেধার ছাত্রেরাও হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যে কোন ছাত্রদের সংগে অংক এবং বাংলায় টেক্কা দিতে পারতো। এ বিষয়ে বড়কাকার সুনাম শুধু আমাদের গাঁয়েই নয়—সমস্ত জেলাতেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি শুধু স্কুলের হেডপণ্ডিতই ছিলেন না—তিনি ছিলেন স্কুলের প্রাণকেন্দ্র। নানান আর্থিক বিপর্যয়ের মাঝেও স্কুলটি যে টিকেছিল, শুধু তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার গুণে। তিনি প্রয়োজন বোধে স্কুলের ঘণ্টা বাজাতেন—আমাদের নিয়ে জীর্ণ বেড়াগুলির সংস্কার সাধন করতেন—বাইশ মাইল মেঠো রাস্তা পায়ে হেটে জেলা সহর থেকে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যের বকেয়া টাকা আদায় করে নিয়ে আসতেন। মাসের পর মাস মাষ্টারদের মাইনে বাকী পড়ে যেত—বড় কাকা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা তুলে মাষ্টারদের বকেয়া মাইনে পরিশোধ করতে কতই না চেষ্টা করতেন!

আবার বর্ষশেষে ছেলেদের দ্বারা অভিনয় অনুষ্ঠান আয়োজনে তাঁর কতই না আগ্রহ ছিল! সরস্বতী পূজার চাঁদা সংগ্রহ থেকে বাজার করা—পুজো করা—স্কুল গৃহ সাজানো সবই তিনি রাত জেগে জেগে আমাদের নিয়ে করতেন। মাষ্টারদের ভিতর সাথী রূপে পেতেন, কেবলমাত্র খগেশ পণ্ডিতকে—কামিনী দত্ত তাঁকে ডাকতেন গরুড় মহারাজ বলে। তিনি আমাদের খগুকাকা—বাবার আর এক খুড়তাত ভাই।

মাষ্টারদের মাইনের হার ছিল: হেড মাষ্টার লিখতেন পঁয়ত্রিশ টাকা—পেতেন বাইশ টাকা। সেকেণ্ড মাষ্টা[র] পেতেন আঠারো টাকা, লিখতেন--পঁচিশ টাকা। থা[র্ড] মাষ্টার লিখতেন বিশ, পেতেন পনেরো। হেড পণ্ডিত লিখতেন তিরিশ, পেতেন উনিশ। সেকেণ্ড পণ্ডিত পেতে[ন] তেরো, লিখতেন কুড়ি। দপ্তরী ও কেরাণীর খাতে বরাদ্দ ছিল সাত টাকা। এর তিনটাকা নিতেন কামিনী দত্ত, বাকী চার টাকা সমান সমান ভাগাভাগি করে নিতেন হেড পণ্ডিত আর সেকেণ্ড পণ্ডিত। কেরাণী ও দপ্তরীর কাজ অবশ্য এঁদেরই করতে হ'তো। ছাত্রদের বেশীর ভাগই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বামুন কায়েতের ঘরের। তাদের আর্থিক সংগতি খুবই শোচনীয় ছিল। নমঃশূদ্র ও মুসলমান চাষ[ী] পরিবারের যে সব ছেলেরা স্কুলে পড়তো—তাদের সংগতি তবু কথঞ্চিৎ সচ্ছল বলা যেত। বেশীরভাগ ছাত্রেরাই মাসে মাসে স্কুলের মাইনে পরিশোধ করতে পারতো না। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে পাট উঠলেই চাষী পরিবারের ছেলের[া] স্কুলের মাইনে পরিশোধ করতো। চাকরে পরিবারের মুষ্টিমেয় যারা ছিল, তারাই শুধু মাসে মাসে মাইনে জুগিয়ে যেত। বাকী প্রত্যেকেরই মাইনে আদায় করা হ'তো বর্ষশেষে—পরীক্ষা দেবার অনুমতি নামঞ্জুর করবার ভান করে অথবা পরীক্ষা দেবার অনুমতি দিলেও—প্রমোশন বন্ধ রাখবার ভয় দেখিয়ে। কিন্তু তাতেও সব ওয়াশীল করা যেত না। পরবর্তী বছরে জের টেনে যাওয়া হ'তো। শিক্ষকদের মাইনেও বাকী পড়ে যেত—তাঁরা অনেক সময় একটু সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে তাঁদের মাইনে বরাদ্দ করে নিতেন।

আমি যখন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি—স্কুলের আর্থি[ক] অবস্থা এমনি সংকটাপন্ন হ'য়ে উঠেছিল যে, স্কুল উঠে যাবারই উপক্রম হ'য়েছিল। গাঁয়ে যাঁরা পাষণ্ড অখ্যাতি অর্জন করেছিলেন—সেই যতুকাকার দলের জন্য বলতে গেলে স্কুলটি রক্ষা পেয়ে যায়। বয়সে যতুকা[কা] বড়কাকার চেয়ে অনেক ছোট ছিলেন—যতুকাকাও ব[...]

কাকার কাছে পড়েছেন। কিন্তু যতুকাকা এবং তাঁর দলের ওপর বড়কাকার অসীম শ্রদ্ধা এবং স্নেহ দুইই ছিল। খগুকাকার সংগে দলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি বয়সে অবশ্য যতুকাকার ছোটই ছিলেন। যতুকাকা বা তাঁর দলের মার্কা মারা কাউকে স্কুলকমিটির মধ্যে আনবার ইচ্ছা না থাকলেও, এঁদের প্রতি বিশ্বাসী আরো অনেককে স্কুল কমিটিতে আনবার জন্য বহুবারই বড়কাকা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কামিনী মাষ্টারের চক্রান্তে তাঁর সমস্ত চেষ্টাই বার বার ব্যর্থ হ'য়েছে।

কামিনী মাষ্টারের ভগ্নীপতি গদাই মল্লিক ছিলেন স্কুল কমিটির সেক্রেটারী। কামিনী মাষ্টার ছিলেন অন্যতম সভ্য। কামিনী মাষ্টারের সহযোগিতায় গদাই মল্লিক স্কুল ফণ্ডের তহবিল তছরূপের অপরাধে ইন্‌সপেকটারের কাছে অভিযুক্ত হলেন। ইনসপেকটর সাহেব সংগে সংগে কামিনী মাষ্টারকে বরখাস্ত করে স্কুল কমিটি ভেংগে দিয়ে—নতুন নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে যান। আমরা তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। সাধারণত বর্ষার সময় ইন্‌স্‌পেক্টর সাহেব আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে আসতেন। ইন্‌স্‌পেক্টর চলে যাবার কয়েকদিনের মধ্যেই নতুন নির্বাচনের তোড়জোড় সুরু হ'লো।

এবার আর কামিনী মাষ্টারের কোন বাঁধাই ফলবতী হ'লো না। নৌকো বেয়ে আমরা বাড়ী বাড়ী ভোট সংগ্রহে যেতে গেলাম। এই সময়ই যতুকাকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার আমি সুযোগ পাই। নির্বাচনে আমাদের মনোনীত সভ্যদের জয় হ'লে--যতুকাকা তাঁদের বাড়ীতে সকলের সামনে আমায় পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন: খুব খেটেছিস! এইত চাই!" আর কোন কথা তিনি বলেন নি। বলবার দরকারও হয়নি। কিন্তু গর্বে আমার বুকখানা দশহাত ফুলে উঠেছিল। তাঁর ক্ষণিকের স্পর্শে এক অভূতপূর্ব আনন্দে আমার সর্বদেহ রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছিল। সেই থেকেই যেন এক নিবিড় আকর্ষণে যতুকাকা আমায় কাছে টানতে লাগলেন!

কেশবমামা অস্থায়ীভাবে হেডমাষ্টারের পদে বহাল হ'লেন। বর্ষশেষে গ্রাজুয়েট হেডমাষ্টার আনবার জন্য ইন্‌সপেকটর সাহেব হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন। নতুন কমিটি তাকে কার্যকরী করে তুলবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সংবাদটা ছাত্রমহলে ও গায়ে সকলের মাঝে খুব তাড়াতাড়িই ছড়িয়ে পড়লো। সকলের মনই খুশীর আমেজে ভরে উঠলো। নতুন কমিটির নির্বাচন বা গ্রাজুয়েট হেডমাষ্টার আসবার কথায় আমরা ততটা খুশী হ'তে পারিনি—যতটা আমাদের খুশী করেছিল, কামিনী মাষ্টারের বরখাস্তের সংবাদ। তাঁর ঘা দিয়ে কথা বলা—অথবা গায়ের ঘা থেকে আমরা রেহাই পেয়ে গেলাম—শুধু এই জন্যই নয়, কিছুদিন পূর্বেও কামিনী মাস্টার স্কুলগৃহটিকে ঘিরে আমাদের আশা-আকাঙ্খার মূলে যে ঘা দিয়েছিলেন—তার জ্বালা কিছুতেই আমাদের মন থেকে মুছে যেতে পারেনি। এবার কামিনীমাষ্টার যে ঘা খেলেন, তা থেকেই আমাদের মনটা ঝরঝরে হ'য়ে উঠলো।

বহুদিন পূর্বে আমাদের স্কুলে মজিদ মিঞা নামে এক মৌলভী সাহেব ছিলেন। ভিন্ন গায়ে বাড়ী হ'লেও—বড় কাকার মতই স্কুলের প্রতি তাঁর টান ছিল অপরিসীম। তিনি বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস, ড্রিল, ড্রইং প্রভৃতির ক্লাস নিতেন। আর মুসলমান ছাত্রদের শেখাতেন আরবী। আমরা যখন স্কুলে কেবল যাতায়াত সুরু করেছি—তার পূর্বেই কামিনী মাষ্টারের চক্রান্তে তিনি স্কুল ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর গল্প শুনতাম সকলের মুখে মুখে। একসময় মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা হ্রাস পাবার জন্য আর্থিক অনাটনের অজুহাতে স্কুল কমিটির সাহায্যে কামিনীমাষ্টার তাঁকে বরখাস্ত করেন। আমরা তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র অর্থাৎ কামিনী মাষ্টার বরখাস্ত হবার ঠিক একটা বছর পূর্বে, ইন্‌সপেকটর সাহেবকে ধরে বড় কাকা আবার মৌলভী সাহেবকে স্কুলে আনান। এই সময় স্কুলে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই, কামিনী মাষ্টার বিরোধিতা করেও কোন সুবিধা করে উঠতে পারলেন না।

মৌলভী সাহেবকে এই প্রথম আমরা চাক্ষুষ দেখলাম। পরণে ধুতি—গায়ে ছিটের লম্বা সার্ট আর মাথায় লাল ফেজ টুপি। উঁচু লম্বা দোহারা চেহারা। সামান্য দাড়ি গোঁফ। বছর পয়ত্রিশ বয়স হবে। আমার আজও মনে
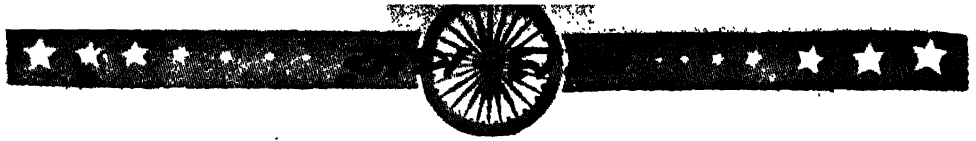
আছে. প্রথম যেদিন তিনি মুচকী মুচকী হাসতে হাসতে আমাদের ক্লাসে ঢোকেন—তাঁর ঘরে ঢুকবার ভংগী—চেয়ারে বসবার কায়দা—সবই আমি আগ্রহের সংগে লক্ষ্য কচ্ছিলাম। এক অপূর্ব আনন্দ মিশ্রিত উৎসুক মন নিয়ে শুধু আমিই নই,আমাদের ক্লাসের সব ছেলেরাই তাঁর কথা শুনবার জন্য উদগ্রীব হ'য়ে উঠেছিল। নাম ডেকে খাতাটা পাশে সরিয়ে রেখে আমাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বল্লেন : আইজ আর তোমাগো পড়াবো না। তোমাগো সাথে আগে পরিচিত হইয়্যা নি।" তাঁর ঝক ঝকে সাদা দাঁতগুলি যেন মুক্তোর মত দেখাচ্ছিল—কথাগুলিই বা কী মিষ্টি! প্রথম বেঞ্চে আমি, শুকুর, নিত্যেন আরো দু'তিনটে ছেলে বসেছিলাম। শুকুর মুসলমান। পরীক্ষায় ওর আর আমার ভিতরই লাগতো প্রতিযোগিতা—দু'তিন নম্বরের জন্য হয় আমি ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ড—নয় ও ফার্ষ্ট আমি সেকেণ্ড হতাম। কিন্তু পরস্পরের ভিতর ভাব ছিল গলার মালার মত। মৌলভী সাহেব শুকুরদের বাড়ীতেই তাঁর থাকা স্থির করেছেন। শুকুরের কাছ থেকে এ সংবাদ পূর্বেই আমরা জেনেছিলাম। শুকুরকে বাদ দিয়ে প্রথম আমাকেই মৌলভী সাহেব নানান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। নিজের নাম,বাবার নাম—কোন বাড়ী—গত পরীক্ষায় কোন বিষয়ে কত পেয়েছি না পেয়েছি ইত্যাদি। তারপর নিত্যেনকে প্রশ্ন করার পূর্বে আমায় আবার জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি সব্যর ভাই না?" আমি দাঁড়িয়ে মাথা নীচু করে উত্তর দিলাম : হ্যাঁ!" মৌলভী সাহেব একটু থামলেন। আমি তাঁর দিকে একবার মুখ তুলে তাকিয়ে নিলাম। তাঁর মুখখানা যেন হঠাৎ উজ্জলতর হ'য়ে উঠলো। তিনি বল্লেন : সব্যের মত ছেলে আমার জীবনে আমি দেখি নাই।" সত্যি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন দাদা। দাদা কোথায় পড়ছেন না পড়ছেন, কবে বাড়ী এসেছিলেন—খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করে মৌলভী সাহেব বল্লেন : তুমিত চিঠি ল্যাখ?" আমি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। মৌলভী সাহেব বল্লেন : আমি আবার স্কুলে ফিরা আইছি—তারে লিখা দিও।" আমি এবারও মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। তিনি 'বইসো' বললেই বসে পড়লাম। তারপর এমনিভাবে প্রত্যেকটি ছেলেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকী সময়টুকু তিনি নানান গল্পে কাটিয়ে দিলেন। কোনদিক দিয়ে যে ঘণ্টাটা চলে গেল, আমরা টেরই পেলাম না। প্রথম দিনেই সম্পূর্ণভাবে তিনি যেন আমাদের মন জয় করে নিলেন।

সে বছর খুব বর্ষা নেমেছিল। সমস্ত গ্রামই জলে তলিয়ে গিয়েছিল—এক একজনের বসতবাড়ী জলের ওপর যেন ছোট ছোট দ্বীপের মত ভেসে বেড়াতো। আমাদের স্কুলগৃহের ভিত্তিটা ছাড়া প্রায় সবটাই জলে ডুবে গিয়েছিল। স্কুল ছুটির পর লাইব্রেরী ঘরে একদিন আমাদের সকলকে ডাকিয়ে মৌলভী সাহেব বল্লেন : দ্যাখছোত, পানিতে সব জায়গা ডুইব্যা গেছে। পানি টাইন্যা গেলে এবার তোমরা নিজেরা মাটি কাইট্যা স্কুলবাড়ীরে উচ্যা কইর‍্যা তোলবা। স্কুলের এ্যামন টাকা নাই যে, কুলি দিয়া মাটি কাটানো যাবে। তোমাগো স্কুল—তোমরা না দেখলে কারা দ্যাখবে।" কিছুক্ষণ থেমে মৌলভী সাহেব আবার বলতে সুরু করেন : মাটি কাটা অইলে তোমাদের জন্য গার্ডেনীং-এর ক্লাস খোলা অবে। নতুন মাটিতে শাক-সব্জী-ফল-ফলারী ফুলগাছ সব কিছুই ভাল হবে। আর এসব থিকা স্কুলের আয়ের উপায় হবে। তোমরা যদি পরিশ্রম কইর‍্যা টিনের চাল বদলাইয়া দালান দিয়া যাইতে পারো—সবাই তোমাদের নাম করবে। তোমরা রাজী থাকোত বলো, আমি সরকারকে সাহায্যের জন্য লিখাদি!" আমরা সবাই একবাক্যে সম্মতি জানালুম। এর পর থেকেই স্কুলে—বাড়ীতে—খেলার মাঠে—নিজেদের মাঝে—মৌলভী সাহেবের সাথে—অবসর সময়ে সেকী আমাদের জল্পনা—কল্পনা সুরু হ'লো! বাড়ীতে পত্রিকার পাতা উলটিয়ে শাকসব্জীর বিজ্ঞাপন নিয়ে কত সময়ই না আমাদের কাটতে লাগলো! সময় পেলেই ছুটে যাই—মদনমিঞা কী মধু সেখের কাছে কোন সময়ে কোন ফসলটা ভাল হয়—তা জেনে আসতে।

মৌলভী সাহেবও বাংলা সরকারের কৃষি-দপ্তরে লেখালেখি করে প্রাথমিক কাজ আরম্ভ করবার মত কিছু টাকা আদায় করে ফেললেন।

শীতের আমেজ পড়বার সংগে সংগে জমি শুকিয়ে উঠলে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে আমাদের কোদালীর
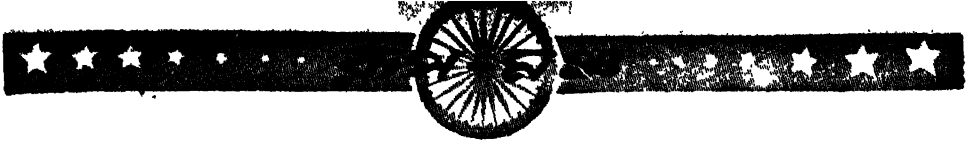
ঠুন-ঠান ঠনা-ঠন শব্দ প্রতি সকাল বিকেল স্কুল বাড়ীর নির্জনতা ভংগ করে তার ভিত্তিকে অনেকটা উঁচু করে তুললো। কোদালীর শব্দ থামলো—কিন্তু থামলো না আমাদের কর্মতৎপরতা। গাঁয়ের এ বাড়ী সে-বাড়ী থেকে ভাল ভাল কলা গাছের চারা বয়ে বয়ে এনে স্কুল বাড়ীতে লাগাতে লাগলাম। কুমুইর্যাদের ফুলের বাগান থেকে আনলাম—যুঁই—শিউলী—হাসনাহেনা—আরো কত ফুলের চারা। গাঁদা ফুল সার ববাদ্দে লাগিয়ে দিলাম কয়েকটা যায়গায়। বাঙ্গী ও শশার চারা লাগালাম। অনেকটা যায়গা নিয়ে করলাম বেগুনের চাষ। তাছাড়া যে যা পাড়লো—এখানে সেখানে একটু খালি জায়গা পেয়েই, তা পুঁতে দিল। ক্লাস বসবার পূর্বে টিফিনের সময় ঘুরে ঘুরে দল বেঁধে আমরা গাছগুলি দেখে যাই। কোনটা কতটা বেড়ে উঠলো—নিজেরা দেখি আর বড়কাকা—খগুকাকা—মৌলভী সাহেব সকলকে ডেকে দেখাই। কামিনী মাষ্টারের বিদ্রুপবাণ মাঝে মাঝে আমাদের কানে আসে: মৌলভী ছেলেগুলার মাথা খাইল। পড়াশুনা আর কেউ করবেনা—বাগান নিয়াই মাইত্যা থাকবে। বুড়াকালে মৌলভীর ভীমরথী অইছে।" লাইব্রেরী ঘরে মাঝে মাঝে মৌলভী সাহেবকে আক্রমণ করেও কামিনী মাষ্টারকে এসব কথা বলতে শুনতাম। মৌলভী সাহেব শুধু হেসে উড়িয়ে দিতেন। আমাদের ভারী রাগ হ'তো! কেন? কেন, কামিনী মাষ্টার অযথা মৌলভী সাহেবকে কথা শোনাবেন! মৌলভী সাহেব কী কামিনী মাষ্টারকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে পারেন না! তিনিত আর বড়কাকা কী খগুকাকার মত চাকরীর কেয়ার করেন না! আর পড়াশুনায়ও বিন্দুমাত্র আমরা ফাঁকি দিতাম না। বরং পরীক্ষার ফল খারাপ হ'লে বাগান নিয়ে আমরা মেতে থাকি এই অপবাদ কেউ দিতে পারে বলেইত পড়াশুনায়ও যেন আমাদের নিষ্ঠা আরো বেড়ে গিয়েছিল। স্কুল ছুটির পর বই খাতাপত্র একজায়গা জড়ো করে আমরা বাগানে জল সিঞ্চনে মেতে যেতাম।

জল সিঞ্চনের সময় চারাগুলি সম্পর্কে কত শংকাই না আমাদের মনে জাগতো! কোনটা একটু নেতিয়ে পড়লে খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়তাম। কতটা বাঁচবে···কতটা মরবে এমনি সন্দেহ দোলায় দোল খেতে খেতে আমাদের সময় কাটতে লাগলো। বেশ কতদিন কেটে গেল।

স্কুল-বাড়ীর উত্তর দিকে এক পাশে চুপি চুপি আমি আর শুকুর একটা রাজগন্ধার গাছ লাগিয়ে রেখেছিলাম কলাবাগানের আড়ালে। রোজ চুপি চুপি দু'জনে সকলের অলক্ষ্যে দেখে আসতাম সে গাছটাকে। একদিন দেখলাম—গাছটা ভেংগে কলি বেরিয়েছে। পরের দিন দেখলাম—কয়েকটা কলির মুখ বেশ হলুদ হ'য়ে উঠেছে—। পরের দিন আমাদের আনন্দের অবধি রইল না—দেখলাম—বেশ বড় দু'টো রাজগন্ধা ফুটে রয়েছে। শুকুর আর আমি দু'জনে মিলে পরামর্শ করলাম—আজ সকলে যখন চলে যাবে, মৌলভী সাহেবকে আমরা দু'জনে ফুল দু'টী উপহার দেবো। শুকুর মৌলভী সাহেবের সংগেই বাড়ী যেত। বাগানে জল দেবার কাজ হ'য়ে গেল—বড়কাকা লাইব্রেরী ঘর বন্ধ করে সবে মাত্র রাস্তায় নেমেছেন। আমি কলাবাগানের মাঝে পালিয়েছিলাম, পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী শুকুর মৌলভী সাহেবকে নিয়ে যেই স্কুলবাড়ীর উত্তর সীমানার কাছে পৌঁছেছে—আমি সামনে যেয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখেই মৌলভী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: এখনও বাড়ী যাও নাই পার্থ? বাড়ীতে যে চিন্তা করবেন—কিছু বলবা নাকি?"

শুকুর আর আমাতে একটু চোখোচুখি হ'য়ে গেল: আমি বল্লাম: স্যার একটু এদিকে আসুন!" বলেই আমি কলা বাগানের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগলাম। শুকুর মৌলভী সাহেবের পাশ কাটিয়ে আমার সংগে সংগে এগোতে লাগলো। আমাদের উদ্দেশ্য করে মৌলভী সাহেব বলে উঠলেন: 'একটা কিছু মতলব আগেই বুঝি ফাঁইদ্যা রাখছিলা?" আমরা কোন উত্তর না দিয়ে কলাগাছটার কাছে এসে দাঁড়ালাম। মৌলভীসাহেব ততক্ষণ এসে গেছেন। ফুলদু'টির দিকে চেয়ে একবার মৌলভী সাহেবের দিকে তাকালাম—অপূর্ব আনন্দে তাঁর চোখমুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—ফুল দু'টী তখনও গাছের শোভা বর্ধন করে ফুটে ছিল—তার সুষমার চেয়ে মৌলভী সাহেবের মুখখানাকে আমাদের কম সুষমামণ্ডিত বলে মনে হ'লো না!

হাতের বই খাতা মাটিতে রেখে হাটু গেড়ে আমি ও শুকুর গাছটার দু'পাশে বসে—আস্তে আস্তে পরম যত্নের সংগে ফুল দু'টী তুলে নিয়ে মৌলভী সাহেবকে উপহার দিতে গেলাম : মুখে আমাদের কোন ভাষা ফুটে বেরোল না—কিন্তু আমাদের অন্তরে অন্তরে গুঞ্জরিয়ে ফিরছিল : ওগো দেবতা, তুমি আমাদের অর্ঘ্য গ্রহণ করো। ফুল দু'টী এগিয়ে ধরতেই মৌলভীসাহেব দু'হাত দিয়ে জাপটে আমাদের কোলে টেনে নিলেন—তখনকার আনন্দের সংগে তুলনা করে পৃথিবীর কোন ঐশ্বর্যকেই কোনদিন বড করে মনে করতে পারিনি। কিছুক্ষণ কিভাবে যে আমাদের কাটলো, তা বলতে পারবো না। চির আনন্দময় বলে স্বর্গের যে রূপ আমাদের কল্পনায় ছিল—স্কুল বাড়ীর সেই নির্জন স্থানে আমাদের মাথার ওপর বোধ হয় সেদিন প্রথম স্বর্গ নেমে এসেছিল! মৌলভী সাহেবের মুখের দিকে মুখ তুলে তখন আর চাইতে পারিনি—তিনিই প্রথম কথা বল্লেন : দ্যাখোত, পণ্ডিতমশায় কতদূর গ্যালেন? আমি ফুল দুইট্যা ধইর‍্যা রাখি—তোমরা ডাইক্যা নিয়া আসো। তিনি হয়ত বেশীদূর যান নাই।" বলার সংগে সংগেই আমিও শুকুর বড়কাকার উদ্দেশ্যে এক ছুট দিলাম। তিনি তখন সবেমাত্র সমাদ্দার বাড়ী ডিংগিয়ে মাঠে নেমেছেন। আমাদের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন। শুকুর বল্ল : তাড়াতাড়ি একটু আসেন স্যার, মৌলভী সাব আপনারে এ্যাকটু ডাকতেছেন।" বড় কাকা পা চালিয়েই আমাদের পিছু পিছু আবার স্কুল বাড়ীতে ফিরে এলেন। মৌলভী সাহেব ফুল গাছটার কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন—আর ফুল দু'টীর ওপর বারবার চোখ বোলাচ্ছিলেন। আমরা যেতেই বড়কাকাকে বল্লেন : আসেন পণ্ডিতমশায়! দ্যাখেন, ওদের গাছে কতবড় ফুল অইছিল, আমাকে আর আপনাকে দেখার জন্যি তুইল্যা রাখছে।" বড়কাকাও আগ্রহ ভরে ফুল গাছটার দিকে তাকালেন। মৌলভী সাহেব বড় কাকাকে বল্লেন : আপনি আমারও গুরু—ওদেরও গুরু—ওদের হইয়া আমিই আপনারে এটা উপহার দিলাম—আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।" তারপর আমায় ইংগিত করতেই আমি বড়কাকার পদধূলি নিলাম। মৌলভী সাহেব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন—বড়কাকার মত তাঁরও পদধূলি নিতে ইচ্ছে হ'লো—সংস্কারবর্জিত আমার বালক-মন—বারবার সায় দিলেও—মৌলভীসাহেবের নিজের আপত্তির কথা মনে করেই, তাঁকে শুধু নমস্কারই জানালুম। শুকুর দু'জনকেই আদাপ করলো।

দেখতে দেখতে বাগানের সমস্ত গ্যাঁন্ধা গাছগুলি ফুলে সুশোভিত হ'য়ে উঠলো। স্কুল বাড়ীর সৌন্দর্য যেন শতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কলাগাছ গুলির নতুন পাতা বেরিয়েছে—শশা গাছ, বাঙ্গী গাছ কেমন লতিয়ে উঠেছে—বেগুনের চারাগুলিও বেশ ঝাকড়া হ'য়ে উঠেছে। বাঙ্গীর গাছগুলির নিচে খড়কুটো বিছিয়ে দিতে তার ছোট ছোট হলুদ ফুলগুলি দেখে কী আনন্দেই না নেচে উঠেছিলাম! একটা গাছে বেশ কয়েকটা কুঁড়ি বেরিয়েছে—কুমীরাই প্রথম দেখেছিল, আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও যখন বলে ওঠে : এ্যাই পার্থ, শুকুর, মইজ্যা, দেইখ্যা যা কেমন বাঙ্গী ধরছে—" আমরাত সেখানে হুড়মুড় করে ছুটলাম।

কুমীর‍্যা আঙ্গুল দিয়ে বাঙ্গীর কুঁড়িগুলি দেখাচ্ছিল, আমার দৃষ্টিতে তা এড়িয়ে যায়নি। আমি ছুটে গিয়ে ওর হাতে এক ঘা মেরে বল্লাম : এই, আঙুল দিয়ে দেখাসনে--নষ্ট হ'য়ে যাবে!" কুমীরা অপ্রস্তুত হ'য়ে আঙ্গুল গুটিয়ে বাঙ্গীর কুঁড়িগুলি দেখাতে লাগলো। সত্যি, গাছটায় অজস্র কুঁড়ি বেরিয়েছে। মৌলভীসাহেব—বড়কাকা সবাই এলেন' "এদিন কামিনীমাষ্টারও এলেন! কচি বাঙ্গীর কথা শুনে হয়ত তাঁর জিব লকলকিয়ে উঠেছিল!

সেদিন বাড়ীতে এসে আর বইয়ের পাতায় মন বসলো না। ক্ষিধে নেই বলে দু'টো মুড়ি খেয়েই শুয়ে পড়লাম। ঘুম এলো না—চোখ বুজে কেবল বাগানের চিন্তায় বিভোর হ'য়ে রইলাম। এক একটা বাঙ্গী চার পয়সা থেকে দু' আনা, তিন আনা করেও বিক্রী হ'তো। একটা গাছে যা কুঁড়ি নেমেছে—সমস্ত গাছগুলিতে না জানি কত বাঙ্গীই ফলবে! ওগুলি বড় হ'য়ে উঠলে—একটু হলুদ রং নিলেই আমরা ঝাকা ঝাকা ভরতি করে নিয়ে হরির হাটে বেচে আসবো। থলি ভরতি করে টাকা নিয়ে এসে বড়কাকা আর মৌলভী সাহেবকে দেবো। সেই টাকা দিয়ে তাঁরা

ইঁট কাটাবেন—কড়ি-বরগা আনাবেন—স্কুলবাড়ীর জং ধরা টিনের ঘর আর তখন থাকবে না। কেমন সুন্দর দালান গড়ে উঠবে! এমনি চিন্তা করতে করতে সুখ স্বপ্নের ভিতর দিয়ে রাত কেটে গেল। আমরা পঞ্চম শ্রেণীতে উঠেছি। সব বিষয়েই এবার দায়িত্ব আমাদেরই বেশী। সরস্বতী পূজার ভারও আমাদের ওপরই ছিল। যে কোন ব্যাপারে স্কুল সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ বা কোন কাজের জন্য আমাদেরই ডাক পড়ে। শুকুর বয়সে আমার একটু বড়ই ছিল। তাছাড়া ম্যানেজমেণ্ট-এ ওর ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। ওকেই আমরা ক্লাসের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করেছি। বাগানের কাজে এখন আর আমাদের বেশী পরিশ্রম করতে হয় না—চাড়াগুলি এবার বেশীর ভাগই ঝারাকাটা দিয়ে উঠেছে। এবার ফল ধরতে সুরু করবে। তবু আমরা একবার তদারক করে আসি। এখন আমাদের কাজ শুধু স্কুল বাড়ীটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। ছুটির পর হয়ত লাইব্রেরী ঘরটা ঝাট দিতে কেউ লেগে গেলাম। চতুর্থ শ্রেণীর হোগলার সিলিংটা ভেংগে পড়েছে—বড কাকা কয়েকজনকে নিয়ে বসে গেলেন সেটাকে সংস্কার করতে।

শশা গাছে শশা ফলতে সুরু করেছে। মৌলভী সাহেব আর বড়কাকা একদিন কচি কচি শশা তুলে আমাদের সকলের হাতে তুলে দিলেন। আমরা এত কষ্ট করেছি—তাই প্রথম ফল নাকি আমাদেরই খেতে হবে। বড়কাকা আর মৌলভীসাহেব ব্যথা পাবেন বলেই তাঁদের কথায় আমরা রাজী হলাম—নইলে শশাগুলি খেয়ে অনেকগুলি পয়সা নষ্ট করে ফেললাম—এজন্য মনে মনে কম আপসোস হয়নি!

বাঙ্গীগুলিকে যখন একটু রং নিতে দেখলাম—আমরাই একদিন মৌলভী সাহেবকে বলেছিমাম যে, ভাল দেখে ছয়টা বাঙ্গী প্রথম ছ'জন শিক্ষকদেরই উপহার দেবো। মৌলভী সাহেব খুব খুশী হ'য়েছিলেন তাতে। কোন মাষ্টারকে কোন বাঙ্গীটা দেবো গাছে থাকতেই আমরা তা ঠিক করে রেখেছিলাম। বাঙ্গীগুলো কাটতে যাবো—হঠাৎ দেখি সব চেয়ে বড় বাঙ্গীটাই যেন কে চুরি করে নিয়ে গেছে! কুমীর‍্যা চীৎকার করে বলে উঠলো: যে ব্যাটা আমাগো বাঙ্গী চুরি কইর‍্যা খাইছে—তিনরাত্তির মধ্যে কলেরা অইয়া মরবে।"

আমি মৌলভীসাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকাতেই—তিনি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন। তাঁর এই তাকানো নিতান্ত অর্থহীন বলে আমার কাছে মনে হ'লোনা। এবং এর সংগে সামঞ্জস্য খুঁজে পেলাম কিছুদিন পরে, যখন লাইব্রেরী ঘরে শিক্ষকদের পরস্পরের তামাসা কৌতুক থেকে জানতে পারলাম, বাঙ্গীটি কামিনীমাষ্টারই আত্মসাৎ করেছিলেন। বাঙ্গী বা শশার গাছ থেকে আর্থিক লাভালাভ আমরা কিছুই করতে পারলাম না। কারণ, এগুলি যেমন প্রচুর ফলেও নি—তেমনি যা ফলেছিল, তার কতক গেল আমাদের ও অন্যান্য ছাত্রদের পেটে—কতক গেল মাষ্টারমশায় স্কুলের সেক্রেটারী ও অন্যান্য কমিটি মেম্বারদের বাড়ীতে - কতক আমাদের অসাক্ষাতে আত্মসাৎ করলো আশে পাশে বাড়ীর লোকেরা—। এই ক্ষতির ব্যথা আমরা শুধু ভুলতে পেরেছিলাম, বেগুন ক্ষেতের কথা চিন্তা করে। অনেকটা জায়গা নিয়েও যেমনি বেগুনের চাষ করেছিলাম, বেগুনও ধরতে আরম্ভ করলো প্রচুর পরিমাণে। তবে বেগুনের চাষটা আমরা একটু দেরীতে করেছিলাম—তাই সেবার যখন বর্ষা একটু আগেই নামা ধরলো, আমরা খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। কিন্তু জলের গতিও যেমনি কিছুটা রুদ্ধ হ'য়ে গেল—নতুন মাটি কাটার দরুণ স্কুলবাড়ীর ভিত্তিটাও ছিল উচু। তাছাড়া ঠিক একই সময়ে সমস্ত গাছগুলি ভেংগে যেন বেগুন ফলতে সুরু করলো।

শনি মঙ্গলবার আমাদের গাঁয়ে হাট বসতো। শনিবারটাকেই আমরা প্রশস্ত বলে স্থির করলাম। রবিবার বন্ধ থাকার জন্য সোমবারে পাড়ার বিশেষ ক্ষতি হবে না। মৌলভীসাহেবকে আগে থেকে বলে রাখলাম। বেগুনের দরটা দু'তিন হাট থেকে জেনে এলাম। ইউনুস বলে আমাদের পাশের গাঁয়ের একটী লোক হাটে আলু-বেগুন বিক্রী করতো। সে ঠাকুরমাকে ধারে তরিতরকারী দিয়ে যেত। তার সাথে আমার খুব ভাব ছিল। ইউনুসকে আগে থেকে বলে এলাম—তার দোকানের পাশেই আমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে রাখতে। আমাদের পাড়ার মধুসেখের তেল নুনের দোকান ছিল। স্কুলে যাবার সময় তার কাছ থেকে
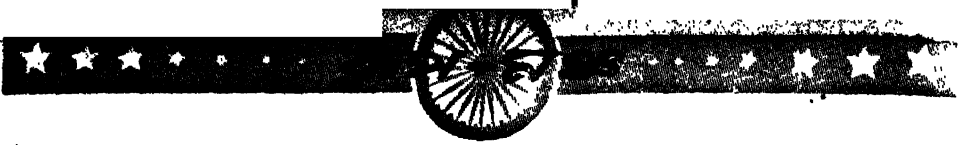
একটা বাড়তি পালা ও কয়েকটা ওজন করবার পাথর নিলাম। শুকুর—মইন্যা—কুমীরা—নিত্যেন—এরা কেউ যোগাড় করে আনলো ঝাকা, বস্তা কেউ আরো পালা ও পাথর। লাইব্রেরী ঘরে স্কুল আরম্ভ হবার পূর্বে সেগুলি আমরা মৌলভী সাহেবের হেপাজতে রেখে এলাম।

একটায় আমাদের স্কুল ছুটি হ'লো—বিভিন্ন ক্লাস থেকে বেছে বেছে কয়েকজনকে নিয়ে আমরা ডাগর ডাগর বেগুন গুলি তুলে বাগানের একপাশে স্তূপীকৃত করলাম। তার পর সেগুলি ঝাকায় ভরে ধুয়ে নিয়ে মেপে মেপে বস্তায় ভরলাম। মোট তেত্রিশ সের বেগুন হ'লো।

দূরের খাল বেয়ে হাটের নৌকো যেতে সুরু করেছে– স্কুল বাড়ীর পাশের জলে ডোবা রাস্তা দিয়েও—কাপড় বাচিয়ে অনেক হাটুরে ঘপাঘপ শব্দ করতে করতে হাটে চলেছে—আমাদের যে পাঁচ-ছ'জনের পূর্বে থেকেই হাটে যাবার কথা ছিল—তারা বাদে আর সব ছাত্রেরাই বাড়ী চলে গেছে। লাইব্রেরী ঘরে মাষ্টার মশায়রা শুধু রয়েছেন। আমরা মনে কচ্ছি—তাঁদের কে কে আমাদের সংগে হাটে যাবেন, সেই পরামর্শই বুঝি আটছেন! আমাদের মনের অস্থিরতা ক্রমে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অস্থির চাঞ্চল্যে স্কুলগৃহের সম্মুখ-প্রাংগনে আমাদের ড্রিল করবার খোলা জায়গাটায় পায়চারী কচ্ছি। এক একবার স্কুল গৃহটার পানে তাকিয়ে থেমে পড়ছি—এই জংধরা টিনের চাল আর থাকবে না--থাকবে না আর ঐ মুলি বাঁশের খসে পড়া বেড়া গুলি---হোগলার সিলিংও বছর বছর আমাদের আর মেরামত করতে হবে না। এগুলিকে সরিয়ে দিয়ে কেমন পাকাপোক্ত বিরাট অট্টালিকা গড়ে উঠবে।—অনেকগুলি ক্লাস বসতে পারবে তার ভিতর—ধীরে ধীরে আমাদের মাইনর স্কুলটি হাই স্কুলে পরিণত হবে—আরো কত মাষ্টার আসবে---এ গাঁ সে-গাঁ থেকে ছাত্রেরা আসবে পড়তে—মাইনর পাশ করে গাঁ ছেড়ে আর আমাদের কোথাও যেতে হবে না। বা—কী—মজা! আনন্দে মনটা নেচে উঠলো—। সব—সব—বেগুন বিক্রী করে, টাকা—আনা—পয়সার হিসাবটি অবধি মিলিয়ে মৌলভী সাহেবের কাছে জমা দেবো। এমনি জমা হ'তে হ'তে স্কুলের ফণ্ড বেড়ে যাবে—তখন আর আমরা কাউকে কেয়ার করবো না—কাউকে না! জেলাবোর্ডের সামান্য সাহায্যেরও আমরা তোয়াক্কা রাখবো না—না—না!

"না—না—না" লাইব্রেরী ঘর থেকে মৌলভী সাহেবের গলার মতই যেন আমার কানে ভেসে এলো। আমি কানখাড়া করে রইলাম। হাঁ, মৌলভী সাহেবের গলাই বটে! কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলছেন: ওদের এ্যাত উৎসাহ আমি নষ্ট করতে পারবো না। আমি ডাইক্যা দিতেছি—যা করবার আপনিই করেন।"—বলতে বলতে'ই মৌলভী সাহেব বেরিয়ে এলেন। অস্বাভাবিক উত্তেজনা তাঁর চোখমুখে—আমাকে সামনে দেখেই যেন একটা ধাক্কা খেয়ে নিলেন। একা হ'লো মৌলভী সাহেবের! আমার মুখের দিক চেয়ে যেন কথা বলতে পারছেন না! শুকুর কুমীরা, মৈইনা—সবাই একে একে এসে মৌলভী সাহেবকে ঘিরে দাঁড়ালো। তিনি কতকটা সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: বাগুনগুলা মাপছো!"—কুমীরা উত্তর দিল: হাঁ স্যার!" মৌলভী সাহেব জানতে চাইলেন: কত স্যার অইছে—"

কুমীরা আবার বল্ল: তেত্রিশ স্যার—তয় আমরাত মাপছি স্যার, বেশীও অইতে পারে।" মৌলভী সাহেবের মুখে এবার ক্ষণিকের জন্য খুশীর হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বল্লেন: বাঃ—বাঃ, অনেকগুলি অইছে তো! আচ্ছা তোমরা এগুলা লাইব্রেরী ঘরে নিয়া আসো—দ্যাখো হেডমাষ্টার মশায় কী বলেন।" মৌলভী সাহেব আর দাঁড়ালেন না—। আমরা বেগুনের বস্তা ধরাধরি করে লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে হাজির করলাম।

বড়কাকা বল্লেন: খোলত বস্তার মুখটা!" কুমীরা বস্তার মুখটা খুলতেই বড়কাকা কয়েকটা বেগুন হাতে নিয়ে দেখতে লাগলেন, একমাত্র কামিনী মাষ্টার ছাড়া আর সব শিক্ষকদেরই হাতে হাতে বেগুনগুলি ঘুরতে লাগলো। তাঁরা সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন: খাসা বেগুন অইছে।" শুধু কামিনী মাষ্টারের লোলুপ দৃষ্টি বস্তার মুখে নিবদ্ধ হ'য়ে রইল!

বানরের পিঠে ভাগের মত—প্রায় বেশীর ভাগ অংশই

বস্তার ভিতর রয়ে গেল—কামিনী মাষ্টার আর তাঁর ভগ্নীপতি স্কুল-সেক্রেটারীর বাড়ী যাবার অপেক্ষায়। কামিনী মাষ্টারের নির্দেশেই—কুমীরা মেঝেতে বড়কাকা - কেশবমামা—খগুকাকা—থার্ড মাষ্টার আর মৌলভী সাহেবের জন্য কয়েকটা ভাগ করে রাখলো। বেগুনগুলির পরিণতি সম্পর্কে আমাদের মনে কোন সন্দেহই রইল না। আমরা পরস্পরে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে নিলাম। বড়কাকা—মৌলভী সাহেব বা আর কোন মাষ্টারের মুখে কোন কথা নেই। কামিনী মাষ্টারই আজকের আসরের সর্বপ্রধান ও একমাত্র অভিনেতা! কুমীরা নিঃশব্দে হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। আমরা রাগে ও দুঃখে ভিতরে ভিতরে কেবল ফুলছি—কোন প্রকার বহিঃপ্রকাশ তখন অবধিও রূপ নেয় নি। আমাদের পরস্পরের মনে যে একই ঝড় বইছিল—তা আমরাও যেমন বুঝেছিলাম—তেমনি বুঝেছিলেন মৌলভী সাহেব আর বড়কাকা। কোনদিকেই আমরা মুখ তুলে তাকাতে পাচ্ছিলাম না। বেগুনের বস্তাকে কেন্দ্র করে আমাদের দৃষ্টি স্থির হ'য়ে ছিল। আর কোন কাজ নেই মনে করে, কুমীরা উঠে দাঁড়ালো—আমাদের চোখে চোখে ইংগিত খেলে যাবার সংগে সংগেই সবাই লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। কামিনী মাষ্টার হাক দিলেন: পাত্তরা, শুইন্যা য্যা—" আমরা ফিরে দাঁড়ালাম। মাষ্টার মশায়দের উদ্দেশ্য করে কামিনী মাষ্টার বল্লেন: নাও, দণ্ডটা আমিই দিতাছি!" তারপর কাপড়ের ছোট মুখবন্ধ খুঁতি থেকে একটা সিকি বের করে আমার হাতে দিতে যেয়ে বল্লেন: এ্যাদ্দিন তোরা এ্যাত কষ্ট করলি—এই দিয়া বিস্কুট কিনা খাবি।"

আমি এবার আর কথা না বলে পারলাম না। কামিনী মাষ্টারের হাত থেকে সিকিটা নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লাম:—দরকার নেই আমাদের বিস্কুট খাবার!" ঝড়ের বেগে লাইব্রেরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। মৌলভী সাহেব দু'তিনবার 'পার্থ—পার্থ' বলে ডাকতে ডাকতে বারান্দা অবধি বেরিয়ে এলেন। মৌলভী সাহেবের একটা ডাকে সাড়া দেবার জন্য আমাদের সকলের সবগুলি হৃদয়-তন্ত্রী এক সংগে বেজে উঠবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকতো—আজ সেই মৌলভী সাহেবের সমস্ত ডাকাডাকি উপেক্ষা করে আমরা হনহনিয়ে ভ্রুক্ষেপবিহীনভাবে বেগুনক্ষেতে এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাথায় আমাদের ভূত চেপেছে তখন—সমস্ত বেগুনগাছগুলিই আজ উপড়ে ফেলে দেবো! কলাগাছে ঠ্যাস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা কিছু করবার মতলব আটছি আমরা। মৌলভী সাহেব ছুটে এলেন সেখানে। তিনি বল্লেন: শেষে তোরা আমাকেও অপমান করলি! হেডমাষ্টার, শত্ত হ'লেও গুরুজন—তাঁর সামানা ঐভাবে ছুইড়্যা দিয়া আইলি! কাজটা ভাল করো নাই তোমরা। চলো—সিকিটা নিয়া আসো।—" মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম: তারপর শুকুরকে আমি হুকুম করলাম: যা, তুই নিয়া আয়—" মৌলভী সাহেব হেসে বল্লেন: একদম পাগলা কোথাকার! বেশ তাই হবে। তবে তোরা বাগানে থাকিস। সকলে চইল্যা গেলে আমার কথা শুনা যাবি।" শুকুর লাইব্রেরী ঘর থেকে সিকিটা নিয়ে এলো।

লাইব্রেরী ঘরে তালা পড়লো। অন্যান্য মাষ্টাররা কাপড়ের খুঁটে করে বেগুনগুলি নিয়ে নৌকোয় যেয়ে উঠলেন। কামিনী মাষ্টারের চাকরটা বস্তাটা মাথায় করে—কামিনী মাষ্টারের আগে আগে নৌকোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে চললো। গ্রীষ্মের ছুটির পরের সময়কারই কথা। বর্ষার জল এসে গেছে—উঁচু রাস্তা বা ভিটেগুলি তখনও জলে তলিয়ে যায়নি। বর্ষার জলে পাটগাছগুলি বেশ শক্ত ভাবে দাঁড়িয়ে উঠেছে—কোন কোন জমির আউস ধানগুলির মাথা বেশ মোটা হ'য়ে আগামী ফসলের ইংগিত দিচ্ছে—অন্যান্য ক্ষেতের ধানগাছগুলিও বর্ষার জলে বেরে বেরে চলেছে। স্কুলে তখন আমরা নৌকো বা তালের ডোঙ্গাতেই যাতায়াত করি। কামিনী মাষ্টার নৌকোয় যেয়ে উঠলেন—আমরা পূল বাড়ীতে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছি—কয়েকখানা ধানের জমির আলবেয়ে তার নৌকোটা পাটের জমির আড়ালে পড়লো। নৌকোর বাহক আর তার লগিটাকে তখনও দেখা যাচ্ছে। পেছন থেকে কার স্নেহ হস্তের আকর্ষণে—নিজেকে আমি ধরা না দিয়ে পারলাম না। মৌলভী সাহেবের বুকের মাঝে আমি
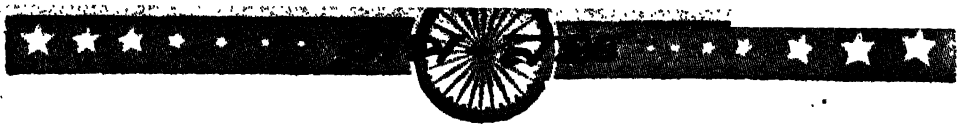
মিশে গেলাম। তিনি আমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগলেন। তাঁর স্নেহ করস্পর্শে আমার দু'চোখ বেয়ে বিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কাপড়ের খুঁট দিয়ে যতই আমি সে অশ্রুর পথ রোধ করতে চাইলাম, ততই যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বেশী কেঁদে উঠতে লাগলাম। মৌলভী সাহেবও কম বিচলিত হ'য়ে উঠলেন না। সিক্ত কণ্ঠে আস্তে আস্তে তিনি বলতে লাগলেন: তোরা মনে করছিস—তোদের লগ্যা আমার কম কষ্ট অইছে! এই স্কুলের জন্য এ্যাত করতে চাই, তবু কিছু কইর‍্যা উঠতে পারি না। দেখিসনা—আর একটা মানুষ, ঐ যে, আমাগো যোগেশ পণ্ডিত মশায়—সারা জীবনটা দিলেন স্কুলের জন্যি—তবু কী করতে পারলেন? না—না—কিছু হবার উপায় নাই—কিছু না—" মৌলভী সাহেবের কণ্ঠ রোধ হ'য়ে এলো। এবার আর নিজেকে সামলে নিতে আমার বেশী বেগ পেতে হ'লো না। মৌলভী সাহেবের চোখে জল! তা কী আমি সহ্য করতে পারি! তাঁর সিক্তকণ্ঠই আমায় নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নেবার ক্ষমতা যোগান। আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতস্থ তখন। মুখে কিছু না বলতে পারলেও, আমার মনে হ'তে লাগলো—আমি যেন খুব বড় একজন যোদ্ধা হ'য়ে গেছি! আমি যেন মৌলভী সাহেবকে সান্ত্বনা দিচ্ছি: ছিঃ, কাঁদতে নেই! এখন না হয়—নাইবা হ'লো স্কুলের কোন উন্নতি—আমি শুকুর—নিত্যেন—এরা যখন বড় হবো—অনেক টাকা রোজগার করবো—আমাদের স্কুলটিকেও তখন বড় করে তুলবো—খুব বড়! এই জংগ ধরা টিনের চাল আর তখন থাকবে না—থাকবে না স্কুলে তখন কামিনী মাষ্টারের মত কোন ভুইট্যা মহেশ্বর! শুকুর কাছেই দাঁড়িয়েছিল—তার হাতে তখনও কামিনী মাষ্টারের দেওয়া সিকিটা। শুকুর ওটাকে পকেটে রাখতেও পারেনি—ফেলে দিতেও পারেনি। আমি ওর হাত থেকে সিকিটা নিয়ে যে রাস্তা বেয়ে কামিনী মাষ্টারের নৌকোটা এঁকে বেঁকে গেছে, সেই রাস্তার উদ্দেশ্যে ছুড়ে মারলাম। 'ভুইট্যা মহেশ্বরের ভুরি একদিন ফাটাইয়া দেবো'—কামিনী মাষ্টারের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে তা বলতে লাগলাম। মৌলভী সাহেব এবার আর আমাদের কোন বাধা দিতে পারলেন না। শুধু আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

কামিনী মাষ্টার বেগুন খেয়ে যাতে কলেরায় মরে যায়, সেজন্য শুকুরদের গাঁয়ের পীরের দরগায় সিন্নি দিতে বললাম। আর আমি কালই এজন্য পাগলা উপেনদাকে দিয়ে তাঁর সিন্দুক-দেবতাকে ১০৮টা নিখুঁত তুলসী পাতা দিয়ে পুজো দেবার ব্যবস্থা করবো, তাও সকলকে জানিয়ে দিলাম। কিন্তু কিছুতেই আমরা বেগুনগুলির বেদনা আর ভুলে যেতে পারিনি। কামিনী মাষ্টারের বরখাস্তের সংবাদেই আমাদের মন ঝরঝরে হ'য়ে উঠেছিল। তাই প্রথম যেদিন সংবাদটি আমাদের কানে এলো, সেদিন একসংগে শুকুরদের গাঁয়ের পীর—আর উপেনদার সিন্দুক-দেবতাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম—তাছাড়া যীশু থেকে আরম্ভ করে সকল ধর্মের সকল মহাপুরুষ ও দেবতার উদ্দেশ্যে কতভাবেই না আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নিলাম!

বলতে গেলে স্কুলের কোন উন্নতিই আমরা করতে পারিনি। যেটুকু উন্নতি হয়েছিল, তা নতুন স্কুল কমিটির একনিষ্ঠা ও যতুকাকাদের দলের পরোক্ষ সাহায্যের জন্যই। ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠে আমরা গ্রাজুয়েট হেড মাষ্টারের কাছেই পড়বার সুযোগ পেলাম। স্কুলের জং ধরা পুরোণ টিনগুলি সরিয়ে নতুন টিন রোদের আভায় বেশ ঝক ঝক করে উঠলো। পুরোণ গুলি দিয়ে বেড়া দেওয়া হ'ল। আমরা চলে যাবার পর সপ্তম শ্রেণীটাও খোলা হ'য়েছিল। কয়েকবছর স্কুলের সংগে আমাদেরও যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তারপর কে কোথায় ছিটকে পড়লাম! শুকুর ম্যাট্রিক পাশ করে দারোগা হ'য়েছিল, সে সংবাদও পেয়েছিলাম। পড়াশুনা শেষ করে আমার ত বেশীদিনই কাটলো জেলে জেলে। বড়কাকা কয়েক বছর পূর্বে মারা গেছেন। মৌলভী সাহেবের কোন খোঁজ খবরই পাইনি। কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাংগায় ভারতের নগ্ন ফকির মহামানব মহাত্মা গান্ধী যখন শান্তির জন্য জীবন পণ করলেন, নিরালায় বসে আমাদের নীচতার কথা ভাবতে ভাবতে তখন কেবল বড়কাকা আর মৌলভী সাহেবের কথাই মনে ভেসে উঠেছে। গান্ধীজীর পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে যখন তাঁদের
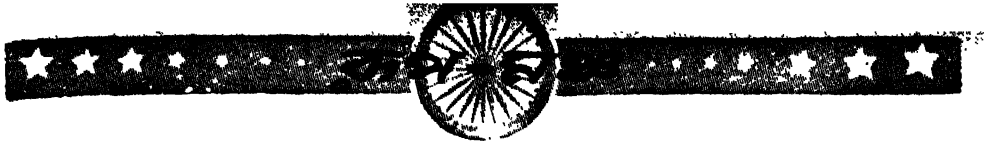
কথা চিন্তা করেছি—সেই দুই গ্রাম্যশিক্ষককে গান্ধীজির চেয়ে একটুকুও ছোট বলে মনে করতে পারিনি। একা গান্ধীজির মৃত্যু সমস্ত পৃথিবীতে শোকের করাল ছায়াপাত করেছিল—বাংলার অন্ধকার পল্লীর বুকে সকলের অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতে মৌলভী সাহেব ও বড়কাকার মত কত গান্ধীজি যে তিলে তিলে তাঁদের আদর্শের জন্য প্রাণ দিচ্ছেন—তাঁদের সে আত্ম-বলিদানের কথা যদি বিশ্বের দরবারে পৌঁছতো—বিশ্বের বুক থেকে কোনদিনই বোধ হয় শোকের করাল ছায়া মুছে যেত না! তাই বুঝি এঁরা আত্মগোপন করেই আত্মবলিদান করে যান!

যেখানে দাঁড়িয়ে কামিনী মাষ্টারের উদ্দেশ্যে তার প্রদত্ত সিকিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম—যেখানে দাঁড়িয়ে মৌলভী সাহেবের কোলের মাঝে নিজেকে আমি মিলিয়ে দিয়েছিলাম—যেখানে দাঁড়িয়ে আমি ও শুকুর বড়কাকা ও মৌলভী সাহেবকে অর্ঘ্য দিতে আমাদের অন্তর নির্যাসে সামান্য রাজগন্ধাকে অসামান্য করে তুলেছিলাম—আমাদের স্কুলবাড়ীর নির্জন কলাবাগানে ক্ষণিকের জন্য যেখানে স্বর্গ নেমে এসেছিল—দাদুকে সংগে নিয়ে একে একে স্কুলবাড়ীর সমস্ত স্থানই আমি ঘুরে বেড়ালাম। স্কুলবাড়ীর প্রতিটি ধূলিকণায় যেন আমার মৌলভী সাহেব আর আমার বড়কাকার স্মৃতি জড়ানো রয়েছে। টিনের ছেঁদা দিয়ে লাইব্রেরী ঘরটায় উঁকি মেরে দেখলাম। প্রথম যে ঘরে মৌলভী সাহেবের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছিল—সে ঘরটাও দেখে নিলাম। হ্যাঁ—ঐত' ঠিক অমনি জায়গায় তিনি চেয়ারে বসেছিলেন—তাঁর সে মিষ্টি হাসি আজও যেন ঘরটায় খেলে যাচ্ছে—আর আমি, শুকুর, মৈইন্যা, নিতোন, কুমীরা উন্মুখ হ'য়ে চেয়ে আছি তাঁর দিকে। স্কুল বাড়ীটা ছেড়ে যেন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। আমার বড়কাকা—আমার মৌলভী সাহেব—আমার বাল্যের সহপাঠিদের স্মৃতি বিজড়িত স্কুল বাড়ীটাও আমায় যেন আজ বিদায় দিতে চাইছে না—কিন্তু দাদুর বারবার তাগিদ: দাদামণি, চলো—বেলা অইচে।"

হাত ঘড়ির দিকে আমিও তাকিয়ে দেখলাম—বেলা সত্যিই অনেক হয়েছে। এবার যেতেই হবে।

যাবার সময় প্রণাম জানালাম মৌলভী সাহেব আর বড়কাকার উদ্দেশ্যে। প্রণাম জানালাম—তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত আমার পুণ্যভূমি স্কুল বাড়ীটার উদ্দেশ্যে—আমার কাছে আজ সে শুধু বাল্যের স্কুল গৃহই নয়—মৌলভী সাহেব ও বড়কাকার পুণ্য স্মৃতিবহন করে সে আরো মহীয়সী হ'য়ে উঠেছে স্মৃতিসৌধের তুলনায় তাজমহল বা গান্ধীঘাটের চেয়েও সে আমার কাছে মূল্যবান ও পুণ্যতর। —(ক্রমশঃ)

ভারতীয় নৃত্য-কলা

(দুই)

নৃত্য-শিক্ষক প্রহ্লাদ দাস (পরিচালক নৃত্য-ভারতী)

ভারতীয় ক্লাসিকেল নাচ বলতে—তাঞ্জোরের ভরত নাট্যম, মালাবারের—কথাকলি, লক্ষ্ণৌর—কথক এবং আসামের মণিপুরের—মণিপুরী এই চার প্রকার টেকনিককেই বোঝায়। এ ছাড়াও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের পল্লী নৃত্য আছে। যেমন গুজরাটের গরবা, রাজপুতনার ভীল, বিহারের সাঁওতাল নীলগিরির—সাভারস্, রোহিলখণ্ডের, খোন্দ এবং নাম্বোডিস্—আসামের নাগা ইত্যাদি। ভারতীয় ক্লাসিকেল নাচ শিখতে হলে যে দেশের যে নাচ সেই দেশের উপযুক্ত গুরুর কাছে বেশ ধৈর্য সহকারে ২।৩ বছর ধরে এক একটী টেকনিক অভ্যাস করলে তবে কিছুটা শেখা যায়। ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে—তাঞ্জোরের ভরতনাট্যমই আদি এবং নাট্য শাস্ত্রোক্ত—নাট্য শাস্ত্রে যে সব "করণ অংগ হারের" উল্লেখ আছে—তার বেশীর ভাগই ভরত নাট্যমে পাওয়া যায়। ভরত নাট্যম বা দাসী আট্যম—নাচের উৎপত্তি দেবতার মন্দির হতে। পূর্বকালে—বংশে সুন্দরী মেয়ে জন্মালে—তাকে দান করত দেবতার উদ্দেশ্যে—বাল্যকাল হতে তারা থাকত দেবতার মন্দিরে—কাজ তাদের ফুল তোলা—মালা গাঁথা এবং পূজার যোগাড় করা। আরতির সময়—নৃত্য করা এবং গান করা—নাচ ও গানের ভিতর দিয়ে বিলিয়ে দেওয়া আপনাকে দেবতার পায়ে। কবি গান রচনা করতেন—গায়ক—সুর সংযোজনা করতেন এবং নৃত্যগুরু সেখাতেন নাচ। এই সকল মেয়েরা থাকত চির কুমারী। তারা—দেবতাকে জানত স্বামী বলে। দেবতার দাসী—সেইজন্য তাদের বলা হতো দেব-দাসী। ধীরে ধীরে এদের মধ্যে এলো ব্যাভিচার—মন্দিরের পরিবর্তে নাচতে আরম্ভ করল তারা রাজামহারাজাদের বিলাস কক্ষে—দেবতার পরিবর্তে মানবের মনস্তুষ্টির জন্যে—ক্রমে ক্রমে নেমে এলো এরা অধঃপতনের নিম্নস্তরে—সমাজ তখন দিল তাদের—দূরে ঠেলে এই ভাবে চলার পর কিছুদিন—হঠাৎ আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও উদয়শঙ্করের যত্ন চেষ্টায়, নৃত্যকলার হ'তে লাগল উন্নতি। ধীরে ধীরে মৃতপ্রায় নৃত্যকলার ফিরে আসতে লাগল প্রাণ—বালা সরস্বতী, রুক্মিনী দেবীর নাচ বহু মিউজিক কনফারেন্সে এবং ভাল ভাল প্রদর্শনীতে দেখে লোকের ধারণা কতকটা বদলে গেল সেই পতিত সম্প্রদায়ের ওপর হ'তে। তাই আজ যে কয়জন ভরত নাট্যমের গুরু আছেন—তাঁদের আদর এত বেড়ে গেছে যে, সাধারণ লোক কি গরীব কেউ তাঁদের কাছে নাচ শিখতে পারে না। এইবার দেখা যাক ভরতনাট্যম নাচের বিশেষত্ব কী?

ভরত নাট্যম নাচ শুধু মেয়েদেরই জন্য। এই নাচে—নাট্য শাস্ত্রোক্ত "করণ, অংগহারের ব্যবহার বেশী দেখা যায়। এই নাচ এত কষ্টসাধ্য যে, নূতন লোকের পক্ষে—চার পাঁচ বৎসর নিয়মিত অভ্যাস করলে তবে ভাল ভাবে শেখা যায়। এই নাচ আরম্ভ করবার আগে ভূমি দেবীকে প্রণাম (আবার কেউ কেউ বলেন গুরুবন্দনা) করে, তার পর শিল্পী প্রথমে চোখ, তার পর ভ্রূ পরে গ্রীবা, স্কন্ধ—ইত্যাদি এবং সব শেষে পায়ের কাজ—এই ভাবে দেহের অংগ প্রত্যংগ দিয়ে প্রণতি জানায় দেবতার উদ্দেশ্যে। এই নাচের নাম আলারিপ্পু বা বন্দনা আলারিপ্পু তিন মাত্রা অথবা ৭ মাত্রায়ও হতে পারে। দ্বিতীয়—জ্যোতি স্বরম অর্থাৎ স্বরগ্রামের সংগে নাচ, তৃতীয় শব্দম, কিছু কথা এবং স্বরগ্রাম দুইয়ের মিশ্রণ, ৪র্থ বর্ণম্—স্বরগ্রাম, কথা, এবং বোল এই তিনের মিশ্রণ—এই নাচ খুবই বড় হয়, "পদম্" শুধু কথা তার পায়ের কাজ থাকবে। "তিলানা"—এই নাচে পায়ের কাজ খুবই বেশী—কথা স্বরগ্রাম এবং বোল—যেমন আমাদের দেশে তাড়ানা গান হয়। সবশেষে "অভিনয়" অর্থাৎ গানের কথার অভিব্যক্তি, পায়ের কাজ খুবই কম। এই নাচের পোষাকের বেশী আড়ম্বর নেই—কাপড় যেমন মাদ্রাজি মেয়েরা পরে এবং কিছু গয়না। আনুসংগিক বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে—মাদলম্ এবং নাগসরম্ ও মন্দিরা।
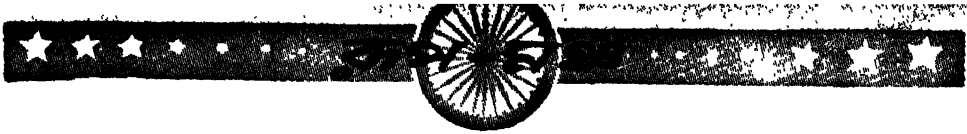
গুরু—মুখে গান করেন এবং হাতে মন্দিরা বাজান। এই নাচ গুরুর সাহায্য ব্যতীত করবার উপায় নেই। গুরু ছাড়া ঐ গান এবং বোল অন্য কেউ জানে না। একটী পদম্‌এর দুই এক লাইন নিম্নে দেওয়া হলো—

"বেলা বারে উন্মাইতেরী অরুমাডান্‌ দেহি
বিড়িউ মোড়ুহুম্‌ ক্যাত্তিরুক্কিরা বাগাই এন্না বেলা বারে…"
"হে শুভ্রমুখা! তুমি আসবে বলে সারারাত এবং প্রভাত পর্যন্ত অপেক্ষা করছি তুমি এলে না, ইত্যাদি।"

এই নাচে অনেক রকম তাল ব্যবহার করা হয়। তিস্র, চতুস্র, মিশ্র এবং খণ্ডম্‌ এই সব তালই বেশী ব্যবহৃত করা হয়। সংকীর্ণ তাল খুবই কম ব্যবহার। ত্রিপুটা, আদি রূপক, ঝম্প—এই সব তাল আমাদের দেশের যথাক্রমে তেওরা, ত্রিতাল, রূপক এবং ঝাঁপতালের সংগে মিলে যায়। তবে এই তালের যদি জাতি পরিবর্তন হয় যেমন ত্রিপুটার লক্ষণ একতাল একখালি একতাল একখালি। চতুস্র—

জাতি ত্রিপুটা—অর্থাৎ ১ — — — |×|×
তিস্র জাতি ত্রিপুটা— ১ — — |×|×
মিশ্র " " ১ — — — — — — — |×|×
খণ্ডম " " ১ — — — — |×|×
সংকীর্ণ — ১ — — — — — — — — — — — |×|×

এই ভাবে প্রত্যেক তালে এই রকম পরিবর্তন আছে। কোন্‌ তালের কি লক্ষণ তাই আগে জান্‌তে হবে। এসব এত উচু ধরণের এবং এত কঠিন অংক শাস্ত্র যে বেশ খানিকটা হিসাব করে কাজ করতে হয়। গুরুর সাহায্য ব্যতীত এসব জিনিষ দেখে—বা বই পড়ে শেখা যায় না। আজকাল—অনেক শোতে ভরত নাট্যম নাচ দেখা যায়—কিন্তু দুঃখের বিষয়—তার কোন ষ্টাইল নাই। এর ওর কাছ হতে দেখে তুলে নেওয়া ষ্টেপ—তার না হয় পজিসন, না হয়—মুভমেণ্ট। এই ভাবে নৃত্য কলাকে বিকৃত করে পাবলিক কে ধাপ্পা দিলে স্বাধীন ভারতের নিজস্ব শিল্পকলার অবনতিরই সম্ভাবনা। (ক্রমশঃ)
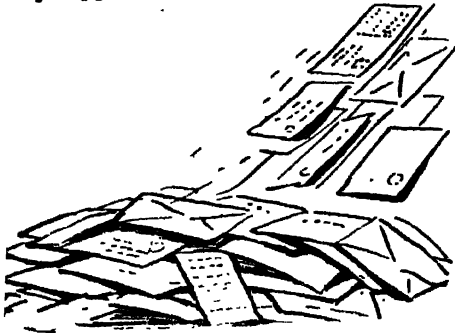
সম্পাদকের দপ্তর

রূপ-মঞ্চের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সংগে সংগে 'সম্পাদকের দপ্তর' বিভাগটির জনপ্রিয়তাও দিন দিন আশাতীত ভাবে বেড়ে চলেছে। 'সম্পাদকের দপ্তর' নাম থাকলেও মূলতঃ এই বিভাগটি রূপ-মঞ্চ পাঠকসাধারণেরই। এই বিভাগটিতে যেমনি তাঁরা চিত্র, নাট্য-মঞ্চ ও আনুসংগিক বিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন—তেমনি এবিষয়ে তাঁদের বিভিন্ন মতামত—পরিকল্পনা ও চিন্তাধারা বিকাশের সুযোগও পেয়ে থাকেন। আমি যখন এই বিভাগে লিখিত আমার শ্রদ্ধেয় পাঠকসমাজের চিঠিগুলি নিয়ে উত্তর দিতে বসি—চিঠিগুলি শুধু ভাষা মুখর হ'য়েই আমার কাছে ধরা দেয় না—যাঁরা চিঠি লেখেন, তাঁরাও আমার কল্পনার সামনে ভেসে ওঠেন। রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে বসে যেমন আমি আগন্তুকদের সংগে কথা বলি - তাঁরা আমার টেবিলের সামনে বসে থাকেন—ঠিক তেমনি 'সম্পাদকের দপ্তরে' আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক সাধারণের চিঠি পত্রের উত্তর লিখবার সময়, তাঁদের উপস্থিতিও অনুভব করি। সম্পাদকের ভারিক্কী আসন থেকে আমি নেমে আসি—মানুষের সহজ পর্যায়ে—আমার নিজের মানুষ-সত্তাকে নতুন করে অতি সহজ ভাবে যেন অনুভব করি। চিঠি পত্রের উত্তর লিখবার সময় আমার মনে হয়, তারা আমার সামনে বসে নানান প্রশ্ন করছেন—নানান পরিকল্পনার কথা তুলে ধরছেন—আমি পরম বন্ধুর মত হাসি-তামাসায় আলাপ-আলোচনায় উচ্ছসিত হ'য়ে তাঁদের সংগে কথা বলছি—আমার নিজের দুর্বলতা তাঁদের আলাপ আলোচনা থেকে শুধরে নিচ্ছি—রূপ-মঞ্চের রূপ পরিকল্পনায় তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ কচ্ছি—বাংলার অনাদৃত চিত্র ও নাট্য মঞ্চের উন্নতির জন্য একাত্ম হ'য়ে—উপায় উদ্ভাবনে মেতে উঠছি। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে—রূপ-মঞ্চের পাতা উল্টে পাঠকসমাজ যখন এই বিভাগটি খুলে বসেন—তাঁদের অক্ষম সম্পাদকের অনেক কিছুই দুর্বলতার কথা হয়ত ধরা পড়ে—কিন্তু তাঁর আন্তরিকতা সম্পর্কে কারোরই কোন সন্দেহ জাগে না। তাইত, তাঁদের এত আপনার করে ভাবতে পারি!

কিন্তু এই ভাবা শুধুত রূপ-মঞ্চ বা তার সম্পাদককে ঘিরে থাকলেই চলবে না—রূপ-মঞ্চ এবং স-কর্মী তার সম্পাদক চিত্র ও নাট্য-জগতের সর্বপ্রকার উন্নতির আদর্শ নিয়ে আত্মনিয়োগ করেছে—পাঠক সাধারণকেও আজ সেদিকে আত্ম-সচেতন হ'য়ে উঠতে হবে।

রূপ-মঞ্চের পাঠক সমাজের ভিতর—অধ্যাপক—অধ্যাপিকা—শিক্ষিত—ধনী—জমিদার—ব্যবসায়ী—সাহিত্যিক—শিল্পী বিশেষজ্ঞ—ছাত্র-ছাত্রী, রাজনীতিজ্ঞ—কেরাণী—বেকার—সবাই রয়েছেন। সকলের শিক্ষা ও রুচি এক নয়। এই বিভাগের মধ্য দিয়েই তার পরিচয় আমি যেমন পাই—আমার পাঠকসমাজকেও মাঝে মাঝে তেমনি জানাতে চেষ্টা করি। যাঁদের রুচি ও শিক্ষা সম্পর্কে কারোর কোন অভিযোগ নেই—তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। যাঁদের সম্পর্কে আছে—তাঁদের কোণঠাসা করে রাখলে আমাদের চলবে না। তাঁদের উন্নত পর্যায়ে টেনে তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে—রূপ-মঞ্চ এবং তার শিক্ষিত ও রুচীবান পাঠক-সমাজকে। শুধু রূপ-মঞ্চের পাঠক গোষ্ঠীতেই যে এঁরা রয়েছেন তা নয়—বাংলার চিত্র ও নাট্য-শিল্পকে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতায় যাঁরা আজো বাঁচিয়ে রেখেছেন—তাঁদের বেশীর ভাগ দর্শকই এই শ্রেণীর। মনীষী বার্ণার্ড শ'-এর একটী কথা আছে, তার ভাবার্থ হচ্ছে: সংখ্যাধিক্য সব সময় ভুল করে, কিন্তু সংখ্যালঘুই ঠিক।' আমাদের ভিতর সংখ্যাধিক্যই যদি রুচিহীন ও অশিক্ষিত হন, তাঁদের কাছ থেকে সং[illegible]
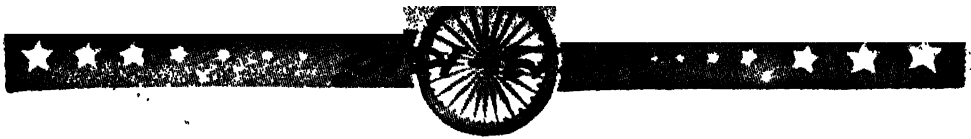
লঘুদের নাক সিঁটকে দূরে সরে থাকার ভিতর কোন গৌরব নেই। সংখ্যাধিক্যের মান উন্নিত করে সংখ্যালঘুকে সংখ্যাধিক্যে পরিণত করার মধ্যেই রয়েছে সংখ্যালঘুদের কৃতিত্ব। এই কৃতিত্ব অর্জনে আশা করি রূপ-মঞ্চের সংখ্যালঘু শিক্ষিত ও রুচিবান পাঠক-সমাজ নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন।

চিঠি পত্রের উত্তর দেবার পূর্বে আজকের মত এই আমার শেষ কথা নয়। আমরা আমাদের এই বিভাগটিকে চিত্র ও নাট্য-মঞ্চের উন্নতির জন্য যাতে কার্যকরী করে তুলতে পারি—সেজন্য প্রতি মাসে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে প্রথমেই আমি আলোচনা করবো। আলোচনা করবো, শুধু পাঠক সমাজকে নিছক অবহিত করে তুলবার জন্য নয়—সে সমস্যা সমাধানে তাঁদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্য। বর্তমান সংখ্যায় দু'টী সমস্যার অবতারণা করবো। প্রথমটি সম্পূর্ণ চিত্র জগত সম্পর্কিত। জনসাধারণের চাহিদা ও রুচির প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্মাতারা যাতে চিত্র নির্মাণে তৎপর হ'য়ে ওঠেন—এও যেমন এক কথা—তেমনি এরূপ চিত্র নির্মাণে জনসাধারণ কী ভাবে কার্যকরী সাহায্য করতে পাবেন - সেও আর এক কথা। দ্বিতীয় সমস্যাটি, চিত্র ও নাট্য-জগত সম্পর্কিত হ'লেও—দর্শক বা শ্রোতা হিসাবে—জনসাধারণের কর্তব্য সম্পর্কিতই। প্রথমটির কথাই আগে বলি—এটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

●● বর্তমান বাংলা ছবির বিরুদ্ধে বাঙ্গালী দর্শকদের অভিযোগের অন্ত নেই। পরিচালনা, কাহিনী, সংগীত পোষাক-পরিচ্ছদ, রূপ-সজ্জা, দৃশ্যপট—যান্ত্রিক কলাকুশল, কাহিনী—প্রায় সব বিষয়েই আমাদের অভিযোগ রয়েছে প্রচুর। একমাত্র অভিনয় সম্পর্কেই উপরোক্তগুলির তুলনায় আমাদের অভিযোগ কম। বিশেষ কোন চিত্রে—বিশেষ বিশেষ কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীর অভিনয় যে পীড়াদায়ক হ'য়ে না ওঠে, তা নয়—কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করে দেখতে গেলে, অভিনয়ের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ অনেক কম এবং বাংলা চিত্রজগতের যদি কোন উন্নতির কথা বলতে হয়—তাহ'লে এই অভিনয়ের কথাই নিঃসন্দেহে আমরা উল্লেখ করতে পারি। কোন রকম শিক্ষার সুযোগ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও, অভিনয়ে আমরা যতখানি উন্নতি লাভ করেছি—তা কম বড় কৃতিত্বের কথা নয়!

দর্শক হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগই থাক না কেন—একটা বিষয় আমাদের চিত্রজগতের কর্তৃপক্ষরা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আমরা অর্থাৎ বাঙ্গালী দর্শকেরা অল্পেতেই খুশী। কোন ছবিটায় ক্যামেরার কাজে খুঁত থেকে গেলো—কোন সংগীতটা মনে দোলা দিতে পারলো না—চিত্রসম্পাদক কোথায় মারাত্মক ভুল করে রেখেছেন—শব্দ গ্রহণটা আশানুরূপ কানে বাজলো না—জমিদার বাড়ীটা তার নায়েবের বাড়ীর উপযোগীও হ'লো কী না—লনচ্যানীর পাশে অহীন্দ্র চৌধুরী—লরেন্স অলিভারের পাশে ছবি বিশ্বাস—পলি মুনির কাছে পাহাড়ী সান্যালের রূপসজ্জা মেনে নিতে একটুকু আমরা কুণ্ঠা বোধ করি না। সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও চিত্রখানি সমগ্র ভাবে যদি আমাদের মনে একটুও দোলা দিতে পারে—তাতেই আমাদের মন ভরে ওঠে। এই ভরে ওঠার ভিতর অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যার দাবী আমাদের নেই—সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও যদি আমরা না পাই—তাহ'লে কুরুক্ষেত্র বাধালে আমাদের অপরাধটা কোনখানে?

বাংলা চিত্রজগতের কাহিনীকার, পরিচালক—প্রযোজক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষদের সংগে যখনই সাক্ষাৎ হয়—বাংলা চিত্রের বিরুদ্ধে বাঙ্গালী দর্শক সমাজের অভিযোগ ও দাবীর কথা বলতে যেয়ে আমি শুধু এইটুকুই বলি। আমার এই বলা আশা করি পাঠক সাধারণও সমর্থন করবেন। যন্ত্র-বিদদের বাহাদুরী কা খেইল—সুরশিল্পীর সুরের কসরৎ—বিরাট বিরাট চোখ ধাঁধান দৃশ্যপট আর ভৌতিক রূপ-সজ্জা—কিছুতেই কী আমাদের মন ভরছে না ভরবে যদি সমগ্রভাবে চিত্রকাহিনীটী আমাদের মনে কোন দোলা না দেয়? একটি সুন্দর কাহিনী যদি কেউ পর্দার বুকে সাবলীলভাবে বলে যেতে পারেন—বর্তমানে তাতেই আমরা খুশী থাকবো। এই সাবলীলভাবে বলে যাবার জন্য যন্ত্রবিদ, শিল্পগোষ্ঠী এবং অন্যান্যদের কমপক্ষে যতটুকু
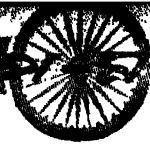
কর্মদক্ষতার প্রয়োজন—ততটুকুরই যদি তাঁরা পরিচয় দিতে পারেন, তাহলেই আমরা সন্তুষ্ট।

এই কাহিনীর ব্যর্থতাই আজ বাংলা ছবির সবচেয়ে বড় সমস্যা। ভাল কাহিনী যদি হয়—অভিনয়ে শিল্পীবৃন্দ যদি সুষ্ঠুভাবে চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তুলতে পারেন, যন্ত্রবিদদের শুধু চিত্ররূপের জন্য যতটুকু ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন—তা থাকে এবং সূক্ষ্ম রস-দৃষ্টি দিয়ে সব কিছুর সামঞ্জস্য রক্ষা করে যদি পরিচালক চিত্রটী আমাদের কাছে তুলে ধরতে পারেন—তাহলে সে চিত্র কেন আমাদের মনে ধরবে না? এর উত্তরে কর্তৃপক্ষস্থানীয়রা বলেন, আর কোন কিছু নিয়ে আমাদের ততটা সমস্যা নয়—যতটা সমস্যা কাহিনী নির্বাচন নিয়ে। আমরা ঠিক ধরতে পাচ্ছি না, দর্শকেরা কোন ধরণের কাহিনী পছন্দ করেন? সেটা যদি জানতে পারতাম, তাহলে মনে ধরবার মত ছবি নিশ্চয়ই তৈরী করতে পারতাম।' এ বিষয়ে কৃতি চিত্রশিল্পী ও উদীয়মান পরিচালক এবং অগ্রদূতগোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিভূতি লাহা আমার কাছে এক পরিকল্পনা পেশ করেছেন। সমগ্রভাবে সে পরিকল্পনাটিকে তুলে ধরবার পূর্বে রূপ-মঞ্চের প্রতিজন চিন্তাশীল, রুচিবান পাঠককে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি—কোন ধরণের চিত্রকাহিনী তাঁরা পছন্দ করেন এবং কেন করেন, সে বিষয়ে বিশদভাবে লিখে যতশীঘ্র সম্ভব যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেন। লেখা সম্পর্কে তাঁদের কয়েকটা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখতে অনুরোধ করি। প্রতিটি লেখা ফুলসক্যাপ কাগজের পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী হবে না। আর এক পৃষ্ঠা করে লিখতে হবে। শেষ পৃষ্ঠায় নাম, ঠিকানা, শিক্ষা, পেশা, বয়স ইত্যাদি বিশদ ভাবে লিখে দিতে হবে। মেয়ে-পুরুষ সবারই এ বিষয়ে তাঁদের অভিমত জানাবার অধিকার রয়েছে। সংখ্যাধিক্যের পর্যায়ভুক্ত হ'য়ে যে রচনাটি রচনার দিক থেকে বিচারকমণ্ডলীর বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে—সেই রচনাকারীকে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতি থেকে 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি-পদক' উপহার দেওয়া হবে। ৩০শে চৈত্র, ১৩৫৫-র ভিতর এই রচনা পাঠাতে হবে।

●● দ্বিতীয় সমস্যাটি হচ্ছে প্রেক্ষা ও নাট্যগৃহে ধূমপান নিয়ে। এবিষয়েও পৃথকভাবে পাঠকসাধারণের মতামত আহ্বান করা যাচ্ছে—আগামী ৩০শে চৈত্রের ভিতর—প্রেক্ষা ও নাট্য-গৃহে ধূমপান উচিত, কী উচিত নয়—এ বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে ফুলসক্যাপ কাগজের দু' পৃষ্ঠার ভিতর লিখে নাম ঠিকানাসহ আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ কচ্ছি।

মালা দেবী (কলিকাতা)

●● আপনি রবিবার বাদ দিয়ে পূর্বে থেকে দিন ঠিক করে বেলা ১২টা থেকে ১টার মধ্যে আমার সংগে দেখা করতে পারেন। অন্যথায় বেলা ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে যে কোন দিন এলেই দেখা হবে।

শ্রীউৎপল রায় (টবিন রোড, বরাহনগর)

বহুদিন পরে বিশেষ কারণে—চিঠি লিখতে বাধ্য হলাম। পৌষালী সংখ্যায় ডিব্রুগড়, আসাম হ'তে শ্রীঅমলকুমার ও রাণীর চিঠির উত্তরে যা লিখেছেন, তার শেষাংশের জন্য প্রতিবাদ জানাচ্ছি—এইজন্য যে, সর্দার প্যাটেল যা বলেছেন, বাঙ্গালীদের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ বলেননি, ব্যঙ্গ করেই বলেছেন। আপনি যে কথা বলেছেন, সে কথা ঠিক, কিন্তু প্যাটেল কি সত্যসত্যই ওই কথা ভেবে বলেছিলেন? তাঁর প্রতিবাদ পড়েছি, তাতেও তাঁর দোষস্খালন হয় না—বলে মনে করা যেতে পারে। দ্রৌপদীর প্রযোজক পরিচালক ও 'ফিল্ম ইণ্ডিয়া' কাগজের সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেল প্রায়ই বাঙ্গালীদের নামে যা ইচ্ছে তাই লেখেন। জানুয়ারী ১৯৪৯ সংখ্যায় যা লিখেছেন, তার একাংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি! "The Bengalees are a race of lazy and unenterprising thinkers. They eat too much, sleep too long, talk too much and work too little." রূপ-মঞ্চের কাছ থেকে এর যথাযোগ্য প্রতিকার ও প্রতিবাদ আশা করি। হিন্দি ছবি বাঙ্গালীরা ভিড় করে দেখেন ও গদ গদ চিত্তে প্রশংসা করেন। বাঙ্গালী মালিক তাঁদের চিত্রগৃহে বাংলা ছবি ফেলে হিন্দি ছবি দেখাচ্ছেন—বাঙ্গালী সব দিক দিয়ে পাকে পড়েছে বলে ব্যাঙের অন্যায় লাথিও কি সহ্য করতে হবে? হিন্দি ছবির বিরুদ্ধে সম্মিলিত 'ফ্রণ্ট' তৈরী করলে বাংলা ছবির বিশেষ ক্ষতি হবে না। কারণ, বাংলা দেশের চিত্রশিল্পকে বাঁচাতে গেলে এধরণের কোন

কিছু না করলে উপায় নেই। বাংগালী কবে আত্মসচেতন হ'যে উঠবে? এখনও কি সময় হয়নি? নইলে চিত্রায় 'খিড়কী' দেখানো চলতো না।

●● সর্দার প্যাটেল যখন প্রতিবাদ করেছিলেন--তখন তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কোন অভিযোগ অন্ততঃ প্রকাশ্যে থাকা উচিত নয়। বাইরে থেকে আমরা অনেকে সর্দার প্যাটেলকে যতটা বাঙ্গালী বিদ্বেষী বলে অথবা প্রাদেশিকতায় অন্ধ বলে মনে করি—আমার মতে মূলে তিনি ততটা নন। নিজের প্রদেশের প্রতি অত্যধিক টান থাকাই মানে প্রাদেশিকতায় অন্ধ নয়। সর্দার প্যাটেল যার সম্পর্কে বা বিরুদ্ধে যা বলেন বা করেন—তার ভিতর কোন জটিলতা নেই। তাঁকে চেনা যায়, তিনি বর্ণচোরা নন। কিন্তু অন্যান্য অবাঙ্গালী নেতা অনেকেই আছেন—বাংলায় এসে বাঙ্গালীদের কথা বলতে যেয়ে যাঁরা গদ গদ হ'য়ে ওঠেন—আর বাঙ্গালীরাও অনুরূপ ভাবে তাঁদের গলায় মালা পরিয়ে কৃতার্থ বনে যান---তাঁদের বেশীর ভাগই বর্ণচোরার দলের। সর্দার প্যাটেল আর 'ফিল্ম ইণ্ডিয়া' কাগজের সম্পাদক বাবুরাও প্যাটেলএর মাঝে আকাশ পাতাল ব্যাবধান। শেষোক্তজনের উক্তিকে 'পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায়' বলে উড়িয়ে দেওয়াই ভাল। কারণ, বাঙ্গালী কি জাতের তা তাঁর নতুন করে বলবার কোন প্রয়োজন ছিল না—আর সে বলবার ভিতর যদি বিন্দুমাত্র সত্য থাকতো—তাহ'লেও নয় কথা ছিল। তাই তার উক্তিকে পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারিনি। দেশবন্ধু— রবীন্দ্রনাথ— সুভাষচন্দ্র— আচায প্রফুল্লচন্দ্র—জগদীশ বসু প্রায় একই যুগে এরকম ক'টি মহাপুরুষ ভারতের কেন—পৃথিবীর কোন দেশের কোন প্রদেশে দেখা গেছে—তার সন্ধান নিয়েই বাঙ্গালী সম্পর্কে প্যাটেল সাহেবের ঐ উক্তি করা সমীচীন ছিল। আসল কথা তা নয়—। তিনি তাঁর দ্রৌপদীর মুক্তির জন্য যখন কলকাতায় আসেন—মনে করেছিলেন: তাকে অভ্যর্থনা করবার জন্ত হাওড়া ষ্টেশন থেকে প্যারাডাইস সিনেমা অবধি কাতারে কাতারে লোক ভিড় করে দাঁড়াবে—আর তিনি তাদের 'ঘাড়ে চড়ে চড়ে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু 'কাকস্য পরিবেদনা!'—হাওড়া ষ্টেশনেত কেউ যায়ইনি—অধিকন্তু ঘটা করে তার সম্মানার্থে তার চবেবা যে ভোজ সভার আয়োজন করেছিলেন—তাতেও সত্যিকারের কোন বাঙ্গালী চলচ্চিত্র সাংবাদিক উপস্থিত হননি। অথচ এ লোকটি এমনই বেহায়া যে, ঘটা করে তার কাগজে ভুয়ো অভ্যর্থনার কথা প্রকাশ করতে সাংবাদিকের স্বাভাবিক রুচিতেও তার বাধেনি।

তবু তার উক্তিকে উড়িয়ে দিতে পারিনা এই মনে করে—বাঙ্গালীর সত্যিই আজ বড় দুর্দিন! বাংলাদেশের আজ যাঁরা কর্ণধার—তাঁরা প্রাদেশিকতার উর্দ্ধে থাকার ভান করে নিজেদের স্বার্থ আগলে আছেন। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্ত তাঁর নাটকের সিরাজদ্দৌলার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন: ওঠ মা ওঠ—জাগো—শোনাও তোমার অভয় মন্ত্র।" সে মন্ত্র দেশবন্ধুর পর একমাত্র দেশগৌরবেরই মুখেই শুনতে পেয়েছি। বাংগালীর বিরুদ্ধে তখন কেউ কোন কথা বলতে সাহস করেনি। 'সে রামও নেই—সে অযোধ্যাও নেই।' কে শোনাবে আজ বাঙ্গালীকে সেই অভয়মন্ত্র? কে জাগাবে বাংগালীকে তার মোহ নিদ্রা হ'তে?

শুধু বাবুরাও প্যাটেল কেন—আরো কত প্যাটেলইত কত কথাই না বলছে! আর বলবেই বা না কেন? প্যাটেল মহারাজ বম্বের চিত্র জগতে বিরাজ করেন—বাংলার চিত্র-জগত মোহাচ্ছন্ন বলেইত তারা বাংলার বুক শুষে টাকা লুটে পুটে নিয়ে যাচ্ছেন। আর তার পথ প্রসস্ত করে দিচ্ছে—বাংলার মীরজাফর জগৎ শেঠ প্রভৃতি শ্রেণীর চিত্র-বেণিয়ার দল - তাঁদের প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি ছবির মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়ে। শচীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে সিরাজের মুখ দিয়ে আর এক জায়গায় দুঃখ করে বলেছিলেন: মীর-জাফর, জগৎ শেঠ, উমিচাঁদের দল আর কী জন্মগ্রহণ করবে না গোলাম হোসেন।" দুরদর্শী নাট্যকারের এই আশংকা যে অমূলক নয়, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার প্রমাণ পাচ্ছি। আমাদের চিত্র জগতের কথাত আপনারা না জানেন এমন নয়! বীণা, বসুশ্রী—সহরে নবনির্মিত প্রেক্ষা-গৃহের ভিতর এরাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। তাঁর স্বত্তাধিকারীদের পুরো মাত্রায় বাঙ্গালী
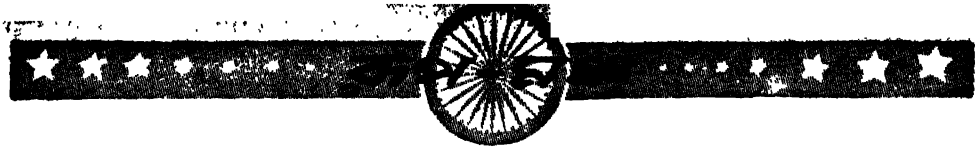
বলেই জানি—এবং সম্ভবতঃ পূর্ব'বঙ্গে কোথাও তাঁদের মূল বাড়ী—যে পূর্ব'বঙ্গ বিচ্ছিন্ন হ'লেও—স্বাধীনতা সংগ্রামে আজও সমগ্র ভারতের নমস্য হ'য়ে আছে। কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে তাঁদের জগৎ শেঠীয় বেণিয়'-মনোবৃত্তি দিন দিনই যেন বীভৎস রূপ নিচ্ছে। হিন্দি ছবি একটার পর একটা তাঁদের গৃহে মুক্তিলাভ করছে—অথচ বহু বাংলা ছবি নির্মিত হ'য়েও প্রেক্ষাগৃহের অভাবে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাঁরা তাঁদের অবাঙ্গালী পরিবেশকদের খুশী করবার জন্য নিজেদের প্রেক্ষাগৃহের মুখপত্র হিসাবে সম্প্রতি একটী পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেছেন—লজ্জার বিষয়, এই পত্রিকা বাংলায় প্রকাশিত হচ্ছে না—হচ্ছে ইংরেজীতে। দোষ এঁদের দেব না—বর্ত'মান বাংলা সরকারকেও দিতে চাইনা—কারণ, তাঁরাও চেয়ে আছেন কেন্দ্রের দিকে। কোন কথা বলতে গেলে প্রাদেশিকতায় অন্ধ বলে আমাদের গলা বন্ধ করে দিতেও তাঁরা হয়ত দ্বিধা করবেন না। দোষ দেবো আমরা তাঁদের—যদি কিছু বলতে হয় তাঁদেরই বলবো, যাঁদের ওপর আমাদের অধিকার আছে—। তাঁরা হচ্ছেন—আপনারা,—বাংলার চিত্র ও নাট্যামোদী জনসাধারণ। হিন্দি চিত্রজগত যদি বাংলা ছবি প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা না করে—আপনারা কী হিন্দি ছবির দর্শন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে পারবেন না? বাঙ্গালীদের যে সব প্রেক্ষাগৃহে হিন্দি ছবি মুক্তিলাভ করবে—বাঙ্গালী দর্শক সমাজ কী এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারেন না যে, সে প্রেক্ষাগৃহের প্রবেশপত্র সংগ্রহ থেকে বিরত থাকবেন! যেদিন দেখবো, 'বেহায়া'র মত বাঙ্গালী দর্শক সমাজ হিন্দি ছবি দর্শনের জন্য কোন প্রেক্ষাগৃহে সার বরাদ্দে আর দাঁড়িয়ে থাকছেন না—সেদিন চাপে পড়েই অন্তত: এদের টনক নড়বে। এবং প্যাটেল প্রমুখদের প্রলাপ উক্তির সত্যকার জবাব সেদিনই আমরা দিতে পারবো—তার পূর্বে নয়।

অশোক কুমার দত্ত (আগরতলা, ত্রিপুরারাজ্য)

বর্ত'মানে বাঙ্গালী অভিনেতাদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কে?

●● প্রদীপ বটব্যালকেই বলা যেতে পারে। তবে তাঁর মস্তকটি দেহের গঠন অনুযায়ী একটু ছোট।

এম, ডি, আলাউদ্দিন (ফরিদপুর, সদর)

●● পূজার পরের সংখ্যায় অন্যের মারফৎ আপনার প্রশ্নের জবাব পেয়েছেন আশা করি।

অমিয় কুমার পাল (রাণাঘাট)

●● 'দাসীপুত্র' মুক্তির দিন গুনছে। তারিখ সঠিক জানতে পারেনি।

নির্ম'লেন্দুশেখর চক্রবর্তী (আশুতোষ মুখার্জি রোড)

●● রাধামোহন ভট্টাচার্যের জীবনী বর্ত'মান সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে—তাঁর বিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য এথেকেই জানতে পারবেন।

দেবেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (বেনিয়াপুকুর রোড, কলিঃ)

(১) এ, এল প্রডাকসনের প্রথম চিত্র কী? (২) গায়ক ভবানী দাস কী মারা গেছেন?

●● (১) ঘরোয়া। (২) হাঁ। রূপ-মঞ্চে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করা হ'য়েছিল। আপনি কি তা দেখেন নি?

লক্ষ্মণ রায় (বহরমপুর)

সিনেমায় নামিলেই চরিত্র খারাপ হ'য়ে যায়, এই ধারণা আমাদের দেশের লোকের মনে কেন আছে? ইহা দূর করিবার কী কোন উপায় নেই?

●● যাদের চরিত্রের ঠিক নেই—আমাদের সিনেমা জগতকে তারাই এই অপবাদ দিয়ে থাকেন। চরিত্র এমন ঠুনকো জিনিষ নয় যে, মেয়ে-পুরুষের সংস্পর্শেই তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। এবিষয়ে বলতে গেলে বিস্তারীত ভাবে বলতে হয়—আগামী কোন সংখ্যায় এ নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। সিনেমার ঘাড়ে চরিত্রহীনতার দোষ যারা চাপিয়ে থাকেন—তাদের চরিত্র সংশোধিত হ'লেই—সিনেমার বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ দূর হবে।

মুকুন্দ (কলিকাতা)

●● আপনি যে কোন দিন ১০—১১টার ভিতর আমার সংগে দেখা করতে পারেন—তবে কোন আশ্বাস দিতে পারি না।

ননীগোপাল ঘটক (বেলিয়াজোড়, বাঁকুড়া)
কাননদেবীর প্রযোজনায় শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ কী প্রস্তুতির পথে ?

●● না। 'চন্দ্রনাথ'-এর স্বত্ব নিয়ে আইনগত প্রশ্ন উঠেছে বলেই সম্ভবতঃ কাননদেবী আর অগ্রসর হ'তে পারেন নি।

এল, সি, ডাট (শরৎ বাড়ুজ্জে রোড, ঢাকুরিয়া)
শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে 'রূপ-মঞ্চে'র শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে কী ?

●● না। শিল্পী হিসাবেই যতটুকু সম্পর্ক।

জনৈকা পাঠিকা (আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা)

●● যে অভিনেত্রী সম্পর্কে আপনি যা জানতে চেয়েছেন—কেবল মাত্র তাঁর অনুমতি নিয়েই জানানো সম্ভব।

পূর্ণিমা মাঝি (আন্দুল মৌরী, হাওড়া)

●● রূপ-মঞ্চে কবিতা প্রকাশ করা হয় না। আপনি অন্য কোন রচনা পাঠাতে পারেন—উপযুক্ত হ'লে নিশ্চয়ই স্থান করে দেবো।

মীরা সেন (শিলচর, কাছাড়)
শ্রীমতী রাণীবালার জীবনী রূপ-মঞ্চে প্রকাশ করবেন কী ? তাঁর অভিনয় আপনার কেমন লাগে ?

●● নিশ্চয়ই। মঞ্চে খুবই ভাল লাগে। চিত্রেও মন্দ লাগে না।

শ্রীলেখা রায় (কলিকাতা)
শুনলাম সুগায়িকা অসিতা বসু নিউ থিয়েটার্সে কিছুদিনের জন্য যোগদান করেছেন-এ গুজব কী সত্য।

●● কুমারী অসিতা বসু সুগায়িকা কিনা আমি ঠিক বলতে পারবো না। তাঁকে আমি নৃত্যশিল্পী বলেই জানি। সম্ভবতঃ তিনিই নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেছেন—একথা সত্য।

সেখ এইচ, আমেদ (মেহের লস্কর লেন, কলিকাতা)
অভিনেত্রী বনানী চৌধুরীর পূর্ব নাম কি ? এবং পিত্রালয় কোথায় ?

●● লিলি। যশোহরে।

গীতা, সুনীতা, অমিতা মজুমদার (নন্দরাম সেন ষ্ট্রিট, কলিকাতা)

●● শ্রীমতী ছন্দা চন্দ্রাবতীর মেয়ে নন। শ্রীমতী চন্দ্রাবতীর মেয়েরা কোন মিশনারী বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা করতো, তা বহুদিন পূর্বে জানতাম। তারা কেউ সিনেমায় নামেনি বলেই বর্তমানে জানি। উৎপলা সেন আর সুপ্রীতি ঘোষ দু'জনের মধ্যে শেষোক্ত জনের গানই আমার ভাল লাগে।

পান্নালাল নন্দী (জি, টি রোড, হাওড়া)
শ্রীমতী রেণুকা রায়ের সংগে রূপ-মঞ্চের সম্পর্ক কি ? আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে, শ্রীমতীর বহু বিশেষ বিশেষ ভংগীমার তোলা ছবি রূপ মঞ্চের পাতায় স্থান পায়। এর কারণ কী ?

●● রূপ-মঞ্চ শিল্প সংক্রান্ত পত্রিকা। শ্রীমতী রেণুকা রায় একজন শিল্পী। শিল্পী হিসাবে অন্যান্যদের সংগে রূপ-মঞ্চের যা সম্পর্ক রয়েছে—শ্রীমতী রেণুকার সংগেও সেই সম্পর্ক। তিনি রূপ মঞ্চের আজীবন সভ্যা— অবশ্য শিল্পীদের ভিতর আরো অনেকেই রয়েছেন রূপ-মঞ্চের আজীবন সভ্য বা সভ্যা। একাধিক ছবি প্রকাশিত হ'লেই যে রূপ-মঞ্চের সংগে কারোর কোন সম্পর্ক থাকবে এর কোন যুক্তি নেই। ইতিপূর্বেও বহুবার বহু শিল্পীর একাধিক ছবি পর পর এবং এমন কী একই সংখ্যায় প্রকাশিত হ'য়েছে। রূপ-মঞ্চের পুরোণ সংখ্যাগুলি উলটে গেলেই তা দেখতে পাবেন। কোন শিল্পী হয়ত এক সংগে তিন চারখানা ছবিতে অভিনয় করেছেন—উক্ত চিত্রের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তাঁদের চিত্রের প্রচারের জন্য হয়ত উক্ত বিশেষ শিল্পীর প্রতিকৃতিই পাঠালেন—যা তাঁদের চিত্রের প্রচার-স্বার্থে আমাদের প্রকাশ করতে হয়।

সমালোচনা ও নানা সংবাদ

কবি—

সুপরিচিত লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "কবি" উপন্যাসখানি সর্বজন পঠিত এবং প্রশংসিত সৃষ্টি। চিত্র মায়ার পক্ষ থেকে দেবকী কুমার বসু এই উপন্যাসখানিকে চিত্রে রূপায়িত করেছেন। প্রযোজনা, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার ভার তিনিই নিয়েছিলেন। সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সুর সংযোজনা করেছেন অনিল বাগচী, শিল্প নির্দেশক ছিলেন শুভ মুখোপাধ্যায় এবং নৃত্য পরিচালনা করেছেন প্রহ্লাদ দাস। ভূমিকায় আছেন রবীন মজুমদার, অনুভা গুপ্ত, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, নিভাননী, রেবা দেবী, রাজলক্ষ্মী তুলসী চক্রবর্তী, আশু বসু, নৃপতি চট্টো, হরিধন মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায় ও আরো অনেকে।

"কবি"র কাহিনী এক গ্রাম্য কবিয়াল নিতাইকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সে ষ্টেশনে কুলীগিরি করে কিন্তু প্রাণে তার কবিত্বের মৃদু গুঞ্জন—তার কবিত্ব শুধু গান লেখাতেই নয়, সে মনে প্রাণে কবি হতে চায়। ডোমের ছেলে একদিন কবির বিজয় মাল্য লাভ করে। তার জীবনে আসে দুটী নারী-স্নিগ্ধ প্রেমের পরিপূর্ণতা নিয়ে আসে ঠাকুরঝি—আসে দেহবিলাসিনী বসন। কিন্তু কবিয়াল কাউকে আপন বলে ধরে রাখতে পারল না। কবির জীবনে এলো সব হারাণোর যবনিকা। চিত্রের উপসংহার ব্যথা-বিধুর হলেও প্রাণে একটা মধুর সুরের মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তোলে।

কবির সমালোচনায় প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, এই উপন্যাসখানির চিত্ররূপ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। উপন্যাসখানিতে সিনেমার উপাদান থাকলেও, তা নভেলি ছাঁচে ঢালা নয়—কবিকে বলা যেতে পারে একখানি বিরহ কাব্য। উপন্যাসের সব কিছু ছাপিয়ে কবিয়ালের বিরহী প্রাণের ব্যাকুলতা আমাদের মনকে নাড়া দেয়। গ্রাম্য পরিবেশ—নায়কও একজন গ্রাম্য নীচজাতি ডোম। আমাদের চিত্র জগতের কেতাদুরস্ত হাল্ ফ্যাশানের নায়ক নয় সে, তার জীবন, কর্মসাধনা তার প্রেরণার উৎস, দীঘল কালো মেয়েটী ঠাকুরঝি, সবই আমাদের গ্রামের নিরালা কোনে আমরা দেখতে পাই। কাজেই এই ধরণের একখানি কাব্যোপন্যাস আমাদের চিত্র-দর্শকরা গ্রহণ করতে পারবেন কিনা কিংবা যাঁরা উপন্যাসকে প্রাণদান করবেন, তাঁরাও চরিত্রগুলিকে যথাযথ রূপ দিতে পারবেন কিনা, এটা সত্যিই একটা বড় প্রশ্ন ছিল আমাদের মনে। "কবি" দেখে সে প্রশ্নের সমাধান পেয়ে সত্যিই খুশী ও আশান্বিত হ'য়ে উঠেছি। সহরের যান্ত্রিক আবহাওয়ায় মন আমাদের এমনি যন্ত্রমুখী হয়ে উঠেছে যে, গ্রামের একটুখানি পরশ পেলেও যেন আমরা নূতন করে নিজেকে জানতে পারি,—আমরা যে যন্ত্র নই—আমাদের মাঝেও যে একটা মন আছে তার সত্যিকারের খোরাক পাই গ্রামের মাঝে। "কবি" আমাদের সেই পাওয়ার আনন্দই দিয়েছে। পরিচালক দেবকীকুমার বসু অত্যন্ত সংযত ও সুষ্ঠুভাবে এই দুঃসাহসিক কাজে সাফল্য এনেছেন। কবির চিত্ররূপ অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলা হয়েছে। এই কাহিনীর ছোটখাট ঘটনাগুলি ও চরিত্রগুলি তিলে তিলে যেন নিতাই চরণকেই গড়ে তুলেছে—কোন নাটকীয় কাহিনী সৃষ্টি করেনি, এই ছোটখাট ঘটনা ও চরিত্রগুলি পরিচালকের নৈপুণ্যে নিখুঁত রূপ পেয়েছে! ছবির শেষে প্রত্যেকটী দৃশ্য স্বকীয় ঔজ্জ্বল্যে দর্শক মনে ছাপ রেখে যায়। মেলার দৃশ্য, ষ্টেশনের চায়ের ষ্টল, চায়ের দোকানের খুড়োমশাই, পাঁপরওয়ালার পাঁপর বিক্রী করা, রেল লাইনের পাশে গ্রামের আলো আঁধারি পরিবেশ, ঠাকুরঝির দুধের কলসি, কৃষ্ণচূড়ার নির্জনতলা, নিতাই এর দিকে পিছন ফিরে আঁচলের আড়াল দিয়ে ঠাকুরঝির চা খাওয়া, ভূতের ওঝার ভূত ছাড়ানো, ঝুমুর দলের মাসী, নারান—রেলওয়ে ইনসপেকটারের ট্রলি করে কাজে আসা, প্রভৃতি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৃশ্য ও চরিত্রগুলি আমাদের মন থেকে অস্পষ্ট হয়ে যায় না, পরিচালকের সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রতিটী খুঁটিনাটী জিনিষ এত পরিষ্কার হয়ে ফুটে ওঠেছে—যা আমরা কোন ছবিতে সাধারণতঃ পাইনা।
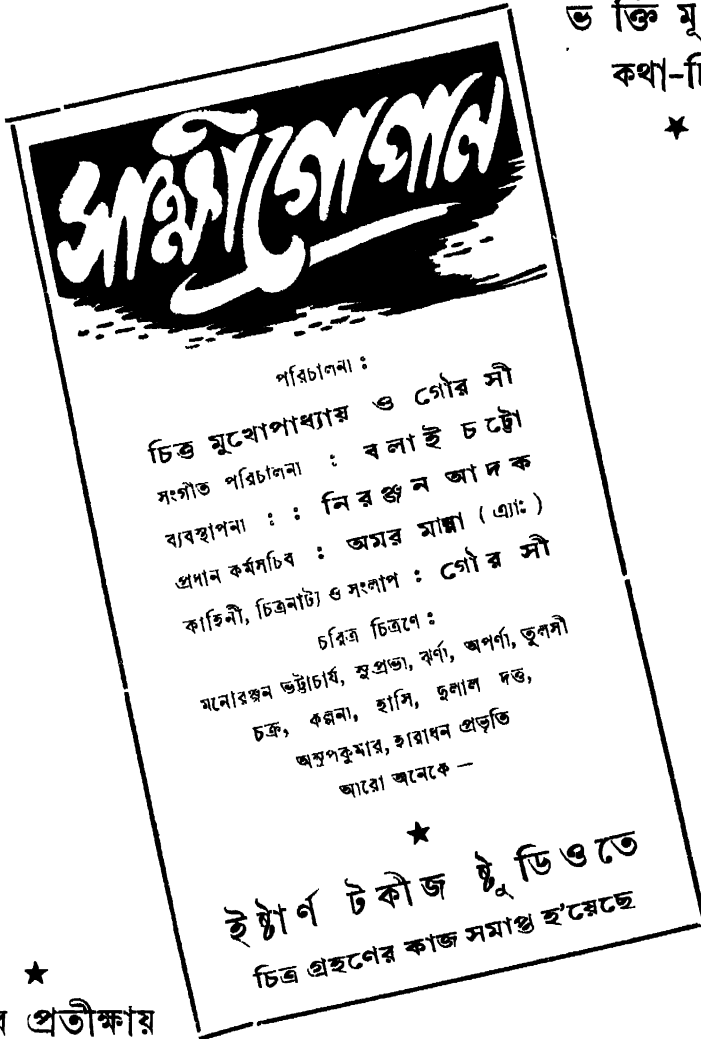
পরিচালক দেবকী কুমার বসুর পরিচালক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁর জীবনে গৌরবময় নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে এই চিত্রখানি। তাঁর অন্য কোন ছবিতে এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি, শিল্পবোধ ও সংযত পরিচালনার পরিচয় আমরা পাইনি। "কবি" শ্রীযুক্ত দেবকীকুমার বসুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

"কবি"র সবচেয়ে বড় ত্রুটী হল তাঁর সংলাপ, বীরভূম অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষা ও কলিকাতা অঞ্চলের ভাষাকে একত্র মেশানোতে বড়ই শ্রুতিকটু হয়েছে। পরিচালকের উচিত ছিল পাত্রপাত্রীদের সব সময় একই ভাষায় কথা বলানো—সেটা বীরভূম অঞ্চলের ভাষা হলে চিত্রখানির পরিবেশের সংগে সম্পূর্ণ সংগত হতো। দুই ভাষার একত্র সমন্বয় মাঝে মাঝে হাস্যকর হয়ে উঠেছে।

ছবিখানির প্রথম দিক অর্থাৎ বসন-এর সংগে নিতাইচরণের পরিচয়ের পূর্ব পর্যন্ত খুবই ভাল লাগে। ছবির গতি ও বেশ সুন্দর কিন্তু তারপরই যেন ছবির গতি মন্থর অথচ ঘটনা সমাবেশ অত্যন্ত অল্প। অবশেষে বসনের মৃত্যুর পর নিতাইয়ের ঠাকুরঝির কথা মনে পড়া ও চলে আসা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। এর মাঝে আরো কিছুটা সময় দেওয়া উচিত ছিল। এতে নিতাইর চরিত্রও অনেকটা খর্ব হয়ে গেছে। মনে হয় নিতাই যখন যাকে পেয়েছে, তাকে নিয়েই মগ্ন রয়েছে। যেই বসন চলে গেল, তখনই তাকেও মন থেকে মুছে ফেলে ঠাকুরঝির কাছে চলে এলো—এখানে চিত্রনাট্যের জন্য নিতাই চরিত্র অনেকে ঠিক বুঝতে পারবেন না।

অভিনয়াংশে সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে ঠাকুরঝির ভূমিকায় অনুভা গুপ্তকে। এর আগে যে কখানি ছবিতে তাঁকে আমরা দেখেছি, তাতে তাঁর প্রতিভার বিশেষ কিছু নিদর্শন আমরা পাইনি। কিন্তু ঠাকুরঝি অনুভা গুপ্তের আন্তরিকতায় অপূর্ব রূপ পেয়েছে। মনে হয় তিনি সবখানি দরদ ঢেলে দিয়ে ঠাকুরঝিকে প্রাণবন্ত করে তুলতে প্রয়াস পেয়েছেন। চরিত্রটীকে মাধুর্যে ভরে তুলতে তাঁর সমগ্র শিল্পপ্রাণ যেন জেগে উঠেছে। অভিনয়ে, ভাবপ্রকাশে কোনদিকেই তাঁর অণুমাত্র অবহেলার দেখা যায় নি। ঠাকুরঝি তার মাঝে যেন প্রাণ পেয়েছে—প্রত্যেকটী দৃশ্যে তাঁর অভিনয় মনে দাগ কেটে যায়, দর্শকমনের মাল্যচন্দনে অনুভা গুপ্তের ঠাকুরঝি অভিষিক্ত হয়ে উঠবার সবখানি যোগ্যতা রাখে। নীলিমা দাসের বসনও অভিনয়ে চমৎকার। কিন্তু এই চরিত্রটীকে মনে হয় সাধারণ দর্শকরা ঠিক ধরতে পারেন নি—ঠাকুরঝির ভূমিকা থেকে এই ভূমিকাটা কঠিন। এই ধরণের দেহ বিলাসিনীদের জীবন যাত্রা—তাদের কথাবার্তার সহিত আমরা অনেকেই অভ্যস্ত নই, তাই বসন্ হয়তো দর্শক-মনের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু নীলিমা দাস এই ভূমিকাটীতে প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। নীতীশ মুখোপাধ্যায়ের রাজন এক কথায় সুন্দর। কবির বন্ধুত্বে গর্বিত রাজন্ কথাবার্তায়, ব্যবহারে কবির পরম শুভানুধ্যায়ী, আবার ঠাকুরঝির প্রতি তার স্নেহের পরিচয় বেশ স্বাভাবিকভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন মজুমদারের কবিয়াল নিতাই তাঁর শিল্পজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপায়ন—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। রবীন বাবুকে এই প্রথম আমরা উচ্ছসিত অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পেলাম। ছোটখাট ভূমিকাগুলির প্রত্যেকটী ত্রুটীহীন, তবু এর মাঝে বিশেষ করে মহাদেব কবিয়ালরূপে তুলসী চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য। ছোট টাইপ চরিত্রে তাঁর দক্ষতার প্রমাণ এই চিত্রেও তিনি আবার দেখিয়েছেন। রেবা দেবী, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, কুমার মিত্র প্রভৃতির প্রত্যেকটী ছোট চরিত্রই মনে রাখবার মত।

"কবি" চিত্রের গানগুলি দু'একটী ছাড়া আর সব কবিয়ালের, রবীন মজুমদারের কণ্ঠে গানগুলি শ্রুতিমধুর হ'য়েছে—গানের সুর সংযোজনা আরো একটু গ্রাম্য-প্রভাবান্বিত হওয়া উচিত ছিল। কবিদলের লড়াইয়ের গানগুলি ছাড়া অন্যগুলিতে মাঝে মাঝে আধুনিক গানের রেশ এসে পড়েছে। তবু সুর-শিল্পী অনিল বাগচী উল্লেখ-যোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

দৃশ্যসজ্জা, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি এবং প্রয়োগ কৌশল প্রশংসনীয়, এদিকে পরিচালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি চিত্রে বাস্তবতা এনে দিয়েছে।

"কবি" চিত্রে একটী বিরহমধুর সুর অনুরঞ্জিত হ'য়ে
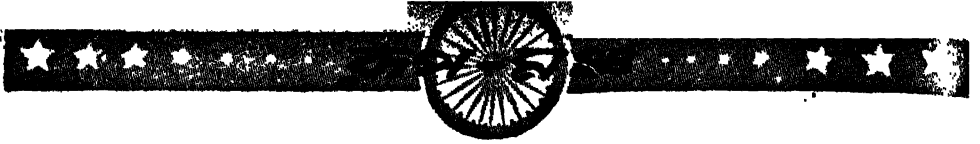
আছে--বিরহ কাব্যের যা সবচেয়ে বড় কথা, সেই অশ্রু সজল অথচ মধুর পরিবেশ কোথাও ব্যাহত হয়নি। তাই তার বিয়োগান্ত অশ্রুসজল পরিণতি দর্শক মন বেদনার সাথে সাথে মাধুর্যেও ভরিয়ে তোলে। "কবি" দর্শক মনের অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য, ক্ষুদ্র ত্রুটী আছে—কিন্তু তাকে ছাপিয়ে রেখেছে সকলের অভিনয় আর অপূর্ব প্রয়োগ কৌশলে পরিবেশ সৃষ্টি করা—যা দর্শকমনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকতে পারে। —মণিদীপা।

"নিশির ডাক" ও "সতেরো বছর পরে"

সমসাময়িক কোনও নতুন চিত্র প্রতিষ্ঠানের নতুন পরিচালকের নির্দেশনায় গৃহীত বাংলা ছবি দেখতে যাওয়া এবং দেখে এসে সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা যে কি সমস্যার ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা এক ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ অনুমান করতে পারবেন না। বাস্তবিক এর চাইতে তথাকথিত কম্যুনিষ্ট আখ্যায় জেলে যাওয়া সোজা এবং সে ক্ষেত্রে অভিশাপের বোঝাটাও কম। এ ধরণের বাংলা ছবি দেখতে যাবার আগেই মনে মনে একটা ধারণা এসে বাসা বাঁধে যে, আমাকে দেখতে হবে এমন একটা বিষয়বস্তু যার খাপছাড়া, এলোমেলো, অর্থহীন, অবাস্তব, গতানুগতিক অযোগ্যতা—ব্যর্থতা ও অসংলগ্নতার কোনও সীমা পরিসীমা নেই। বাংলা ছবির সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ প্রদর্শনী ক্ষেত্রে "নিশির ডাক" "সতেরো বছর পরে" প্রমুখ গণ্ডায় গণ্ডায় ছবি, বাংলা ছবির যে সর্বনাশ ডেকে আনছে, সে বিষয়ে আমরা যদি এখনও ওয়াকিফহাল না হই এবং আইনের সাহায্যে যদি না এ ধরণের ছবি তোলা বন্ধ করে দেই, তবে আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে বাংলা ছবি দেখতে যাবার জন্য প্রস্তুত বাঙ্গালী দর্শকও খুব বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার দুঃখ হয় এই ভেবে যে, বাংলা ছবির হ'লো কি? সুদক্ষ কাহিনীকারের ভালো রচনার অভাব বাংলাদেশে কোনোদিনই ছিল না এবং এখনো নেই। বাংলা দেশের অসংখ্য পত্র-পত্রিকার পাতা উল্টোলে, প্রখ্যাত অথবা অখ্যাত লেখকের ছবি তোলার উপযোগী কাহিনীর অভাব মোটেই অনুভূত হয় না—তবু আসল ক্ষেত্রে তাঁদের সাক্ষাৎ না পেয়ে দেখতে পাই চিত্রায়িত হ'য়েছে "নিশির ডাক", "সতেরো বছর প[রে]" প্রভৃতি শ্রেণীর নিকৃষ্ট কাহিনী। সামান্য কারণে স্বা[মী] স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি—ফলে বিচ্ছেদ এবং পরিশে[ষে] অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে গাঁজাখুরি মিলন—অথবা খাঁচা[র] বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে শেষকালে পথে পথে অনু[তপ্ত] হৃদয়ে ঘুরে বেড়ানো এবং অবশেষে হাটুতে মাথা রে[খে] মরে যাওয়া কিংবা বেঁচে থাকা—এইসব ব্যাপার [যদি] আমাদের পয়সা খরচা ক'রে এখনো দেখতে যেতে হয়, তবে বলুন তার চাইতে অধিক দুর্ভাগ্যের আর কি আছে কি? দশ-পনেরো বছর আগেই এ-ধরণের ক[ত] কারখানা ছবির মাধ্যমে দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি—আজো যদি সেই একই বিষয়বস্তুর পরিবেশন করা হয় এবং সে জন্য যদি কেউ বাংলা ছবি দেখতে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তবে দোষটা কি দর্শক সম্প্রদায়ের? যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে দর্শকমনের গ্রহণ করবা[র] ক্ষমতার ও যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই সহজ সত্যটা ভুলে গেলে চলবে কেন? অথচ চি[ত্র]নির্মাতারা যে এই সত্য উপলব্ধি করতে পারছেন, সে র[কম] কোনও প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে না। নইলে অগুনতি এই শ্রেণীর ছবির জায়গায় আমরা খুব অল্প সংখ্যক ভা[লো] ছবির সাক্ষাৎ পেতাম বলেই মনে হয়। আমি ভেবে উঠতেই পারি না যে, অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সর্বনা[শা] ব্যর্থতা ও ক্ষতির বহর দেখেও কি ক'রে নতুন কর্ণধারেরা এই ধরণের ছবি তুলতে নতুন উৎসাহে মেতে ওঠেন কোনোক্রমে একটা ছবি তোলার অজুহাতে, যারা কিছুদিন ছবির রাজ্যে আসেন, শুধুমাত্র আনুসংগিক ব্যাপারসমূহে মত্ত থাকতে, তাদের সাবধান বাণী শুনিয়ে দেবার দিন আজ সমাগত। বাংলা ছবির কল্যাণ ও মঙ্গলের [জন্য]
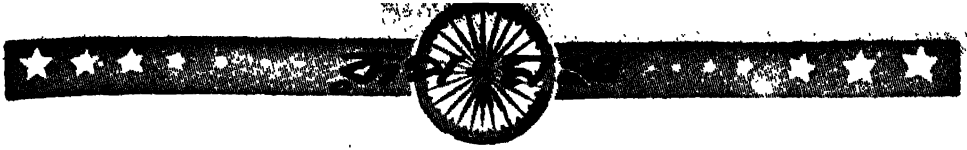
তারা এর সংস্পর্শ ত্যাগ করুন -- অন্যথায় বিশাল জনমতের তুমুল আন্দোলনে তাদের গতিবিধি নির্দিষ্ট হ'বে ছবির রাজ্যের সীমানার বাইরে।

"নিশির ডাক"—রাজশ্রী কথাচিত্রের অজিত মিত্র প্রযোজিত, অশ্বিনী মিত্র পরিচালিত ছবি। এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য যিনি রচনা করেছেন, তিনি স্বনামধন্য নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর রচনার সাথে যতটুকু আমরা পরিচিত, তাতে আর একবার প্রমাণিত হলো যে, চিত্রনাট্য রচনার কিছু ক্ষমতার পরিচয় দিলেও মৌলিক চিত্র কাহিনী সৃষ্টিতে তাঁর অক্ষমতাটাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। "নিশির ডাক"-এর মত কাহিনী রচনার চাইতে এ সব ব্যাপারে তাঁর হাত না দেওয়াই উচিৎ যদি কিনা তিনি তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে অক্ষুণ রাখতে চান। পরিচালনা ক্ষেত্রে অশ্বিনী বাবুকে সাদর সম্ভাষণ জানাবার কোনো কিছু খুঁজে পেলাম না। ছবি তোলার আগে, কি ছবি আজকের মানুষ চায় সেটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা যে পরিচালকের নেই আমার মতে, তাঁর এ পদ থেকে সরে দাঁড়ানোই ভাল।

"সতেরো বছর পরে"—দেবশ্রী চিত্রপীঠের ছবি। পরিচালনা করেছেন যুগ্মভাবে গিরীন চৌধুরী ও বীরেন দাশ। কাহিনী লিখেছেন জনৈকা মণিকা দে, বি, এ। জানিনা দেবশ্রী চিত্রপীঠের সাথে এই ভদ্র মহিলার কি যোগাযোগ? তার নিজের অথবা তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনের কোনও সম্পর্ক যদি এই চিত্র প্রতিষ্ঠানের সাথে না থাকে, তবে একজন সমালোচক হিসেবে আমি নিরুপায়। যে কাহিনীর নমুনা "সতেরো বছর পরে" ছবিতে পাওয়া গেছে, তাতে অবাক বিস্ময়ে শুধু এই কথাই মনে হয়েছে, আমরা কি এখনও সেই বটতলার যুগে বাস করছি না কি? হায় ভগবান! এই ছবি তুলতে আবার যুগ্ম পরিচালকেরও প্রয়োজন হয়? জানিনা, এর পেছনেও কোনও কারণ আছে কি না? গিরীনবাবু ও বীরেনবাবু দুজনকেই এ সব ব্যাপারে মাথা না ঘামাতে বলি। কি প্রয়োজন, লাভ আর বাংলা ছবির পরিচালক হয়ে? অন্যপথ কি খোলা নেই? অভিনয়াংশে উল্লেখ করার মত দু ছবিতে বিশেষ কিছু পাই নি। তার মধ্যে --"সতেরো বছর পরে" —এতে সন্তোষ সিংহের সংযত অভিনয় ভালো লাগলো। "নিশির ডাক"-এ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাঝে মাঝে ভালো লেগেছে। এই ছবিতে সাবিত্রীর ভূমিকায় যে শিল্পীটি অবতীর্ণা হয়েছেন (বিশ্বাস, স্মৃতিরেখা) তার অভিনয় যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্রানুগ হয়নি, তবু মনে হয়, ভালো পরিচালকের হাতে তিনি সাফল্যের পথ খুঁজে পেতে পারেন। চোখ-মুখের flirting ভাব-ভংগি যদি তিনি সংযত করতে পারতেন, তবে ঐ ছবিই হয়তো তাঁর প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে সহায়ক হ'তে পারতো। দু'ছবির সংগীত-পরিচালক হিসেবে, বহুদিনের অভিজ্ঞ চিত্ত রায় ও বিনয় গোস্বামী কিন্তু মোটেই আশা অথবা ভরসার পরিচয় দিতে পারেন নি। সেই একই ধরণের, পুরোণো সুরের অক্ষম পুনরাবৃত্তিই যদি সংগীত পরিচালনা নামে অভিহিত হয়, তবে রামা শ্যামা সবাই সংগীত পরিচালক। প্রমাণিত হলো—বিনয়বাবু এবং চিত্তবাবু এই দলের। দৃশ্যসজ্জার দিক থেকে, দু' ছবিই ব্যয়-সংকোচের যে নমুনা দেখিয়েছে। তাতে ব্যর্থতাকেই বাড়িয়ে তোলা হ'য়েছে।

"নিশির ডাক-"এ, একটা ঘরের পেছনের অবারিত মাঠের দৃশ্য কুশ্রীভাবে চোখে প্রতিভাত হ'য়েছে। স্পষ্ট বোঝা গেছে পেছনে একটি "scene" জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং "scene" টি এতই পুরোণো ও ক্ষতবিক্ষত যে, বুঝতেই পারলাম না কি ক'রে সেটা পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের দৃষ্টি অতিক্রম করতে সমর্থ হলো? ক্যামেরার কাজ দু' ছবিতেই অতি সাধারণ শ্রেণীর। তুলনায় "সতেরো বছর পরে" নিকৃষ্টতর। শব্দযন্ত্রীর কাজেও প্রশংসা করার মত কিছু নেই -কোনোরকমে চালিয়ে নিয়ে গেছেন বলা চলে। "সতেরো বছর পরে" —তে এক সুখ্যাতা গায়িকার কণ্ঠ দু জায়গায় দুটি বিভিন্ন চরিত্রের মুখে খুবই অশোভন-ভাবে শোনা গেছে। এটা ভাল কথা নয়।

বাংলা ছবির আজকের এই সংকটতম মুহূর্তে "নিশির ডাক", "সতেরো বছর পরে" প্রমুখ ছবি তাকে আরো দুর্যোগ ও অধঃপতনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাত্র—এমন কোনো পথ কি খুঁজে বার করা সম্ভব নয়, যাতে কিনা এ ধরণের ছবির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেতে পারে?

—ভুলু গুপ্ত

বিশেষ যত্নের সহিত—

ইন্দ্রপুরীর মত বিরাট ষ্টুডিওতে এই চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছে।

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়নি বটে—কিন্তু লক্ষ লক্ষ

লোককে আনন্দ দেবার মত ক্ষমতা রাখে—

★

আলোক চিত্রে:

অনিল গুপ্ত

শব্দযন্ত্রে:

শিশির চট্টোপাধ্যায়

শীঘ্রই আপনার প্রিয়

চিত্রগৃহে আসিতেছে!

রাঙ্গামাটী—

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ প্রযোজিত 'রাঙ্গামাটী' চিত্রখানি রচনা ও পরিচালনা করেছেন গীতিকার পরিচালক প্রণব রায়। সংগীত পরিচালনা করেছেন কমল দাশগুপ্ত এবং বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন জহর গাঙ্গুলী, চন্দ্রাবতী, সিপ্রাদেবী, সুপ্রভা মুখুজ্জে, অপর্ণা দেবী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, সত্য চৌধুরী, রবি রায় প্রভৃতি আরো অনেকে। 'রাঙ্গামাটী' চিত্রে শ্রীযুক্ত প্রণব রায় যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন—সেজন্য প্রথমেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে নেবো। শিল্পীর কাছে তার শিল্প বড়, না দেশ বড়—এবং দেশের প্রয়োজনের সময় তাঁর কর্তব্য কী—জয়ন্তী ও মাষ্টার মশায় এই দুইটী চরিত্রের ভিতর দিয়ে তা ফুটিয়ে তুলে সমাধান করতে চেয়েছেন। দেশের প্রয়োজনের সময় কোন শিল্পীই দূরে সরে থাকতে পারেন নি! যখনই দেশের সামনে মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে—শিল্পীর ধ্যান ভেংগেছে সকলের আগে। দেশের বিপদে যেমনি শিল্পী তাঁর শিল্প সাধনা নিয়ে মুক্তির জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন—তেমনি দেশবাসীর অন্যায় যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, শিল্পীই সর্বপ্রথমে দেশবাসীকে সে অন্যায় সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। দেশের প্রয়োজনে শিল্পীই সর্বপ্রথমে সর্বকালে ও সর্বদেশে সাড়া দিয়ে এসেছেন—এই মহা সত্যকেই শ্রীযুক্ত প্রণব রায় তাঁর রাঙ্গামাটী চিত্রে আমাদের বলতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই মহা সত্যকে চিত্র মারফৎ আমাদের কাছে বলতে যেয়ে তিনি যদি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন, তাহ'লে বাংলা চিত্রজগতে রাঙ্গামাটী যেমনি একখানি স্মরণীয় চিত্র হ'য়ে থাকতো—তেমনি প্রণব বাবুকেও অকুণ্ঠ প্রশংসায় চিত্রামোদীরা অভিষিক্ত করে তুলতেন। কিন্তু তিনি তা পারেন নি। পারেন নি বলেই ব্যর্থতার আঘাত তাঁকে সহ্য করতেই হবে। এই না পারার কারণ খুঁজতে যেয়ে তাঁকেই দায়ী করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। কারণ, প্রযোজনার দিক থেকে কোন কার্পণ্যই আমাদের চোখে পড়েনি। বিরাট বিরাট দৃশ্যপট—নামকরা অভিনেতৃ সমাবেশ—জনপ্রিয় সুর-শিল্পী—কৃতি চিত্রশিল্পী—সবকিছুর যোগাযোগ থাকা সত্বেও প্রণববাবু সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। নিজের রচিত কাহিনী ও বিষয়বস্তুর মর্যাদা তাঁর নিজের হাতেই রক্ষিত হয়নি। দোষ তাঁর একারই। তাঁর এই দুর্বলতার কারণ অনুসন্ধান করতে যেয়ে প্রথমেই নজরে পড়ে নায়কের ভূমিকায় সংগীত শিল্পী সত্য চৌধুরীর নির্বাচন। এতদিন চিত্রজগতের সংগে জড়িত থেকেও সত্য চৌধুরীর ভিতর এমন কোন্ প্রতিভা শ্রীযুক্ত রায়কে আকৃষ্ট করলো - যেজন্য তাঁকে নায়কের ভূমিকায় নির্বাচন করলেন—প্রথমেই একথা ভেবে অবাক হ'য়ে যাই। কোঠরগত চোখ, প্রশস্ত চোয়াল—এর কোনটাই শিল্পীর অনুকূলে নয়—তারপর বাচনভংগী ও চলার গতিতেই শ্রীযুক্ত চৌধুরীর জড়তা পরিলক্ষিত হয়নি—তাঁর কণ্ঠস্বরও অভিনেতার উপযোগী নয়। তিনি যখন কথা বলেছেন, মনে হ'য়েছে মুখে যেন 'মার্বেল' জাতীয় কিছু পুরে রেখেছেন। সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত চৌধুরীর সংগীতে যে খ্যাতি রয়েছে—সেই খ্যাতির মোহই শ্রীযুক্ত রায়কে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু একমাত্র জাতীয় সংগীত অথবা বীরত্ব ব্যাঞ্জক সংগীত ছাড়া শ্রীযুক্ত চৌধুরীর খ্যাতি যে আর কিছুতেই ফুটে ওঠেনি, একথা প্রণব বাবুর মনে রাখা উচিত ছিল। আলোচ্য চিত্রেও এর নিদর্শন মিলবে—গানের সব ক'খানি সুর ভাল হ'লেও, সত্যবাবুর কণ্ঠে যে ক'খানি শুনতে পেয়েছি, তার মধ্যে কেবলমাত্র শেষের গানখানারই প্রশংসা করা চলে এবং এইখানি সত্যই খুব সুন্দর গেয়েছেন সত্যবাবু। আবার তেমনি শুধু রবীন্দ্র সংগীত খানিরই তিনি মর্যাদাহানি করেন নি - ঐ গানখানিকে কেন্দ্র করে পরিচালক রায় যে অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হ'য়েছেন, সে পরিবেশও নষ্ট হ'য়েছে সত্য চৌধুরীর গানের জন্য। দ্বিতীয় ব্যর্থতার জন্য আমাদের মনে হয় দায়ী চন্দ্রাবতী অভিনীত জয়ন্তী চরিত্রটি। এই চরিত্রটি সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং বিদেশী গন্ধে ভরপুর। একস্থানে লেখিকা বলে পরিচয় দিলেও জয়ন্তী চরিত্রটি হ'য়েছে বারবণিতারই নামান্তর। সোমেশ্বরের চরিত্রটিরও কোন প্রয়োজন ছিল না। জয়ন্তীকে যদি সোমেশ্বরের ভগ্নী বা অনুরূপ কোন মর্যাদার আসনে বসানো হ'তো—তাহ'লেও জয়ন্তী অন-

সাধারণের সমর্থন পেত, 'রাঙ্গামাটী'ও ব্যর্থ হতো না। অবশ্য জয়ন্তীরূপে চন্দ্রাবতী অভিনয়ে তাঁর সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছেন—সোমেশ্বর চরিত্রে নীতীশও ব্যর্থ হননি। নায়কের চরিত্রটি রাঙ্গামাটীর লোকেদের মুখ দিয়ে যেন এক 'ডেমিগডের' মত আঁকা হয়েছে, অথচ তার কর্মপ্রচেষ্টা বাস্তবে বিন্দুমাত্র রূপ নেয় নি। অনেক অবাস্তব দৃশ্য ও চরিত্র ঢুকিয়ে চিত্রখানিকে একদিকে যেমনি বড় করা হ'য়েছে—তেমনি বিরাট বিরাট দৃশ্যপট রচনা করে প্রযোজককে অযথা আর্থিক ঝুঁকির ভিতর টানা হ'য়েছে। বাংলা চিত্রের দুর্দিনের সময় চিত্র পরিচালকেরা যদি এসব কথা মনে না রাখেন, তাহ'লে এর দুর্দিন আরো ঘনিয়ে আসবে। মাষ্টার মশায়ের চরিত্রে জহর গাঙ্গুলী অপূর্ব অভিনয় করেছেন। বহুদিন জহর বাবুর এত সুন্দর অভিনয় দেখিনি। এই চরিত্রটির জন্যও প্রণববাবুকে ধন্যবাদ দেবো। অন্যান্য চরিত্রে সুপ্রভা, সন্তোষ সিংহ, সিপ্রা দেবী, শ্যামলাহা, নৃপতি, রবি রায়, অপর্ণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
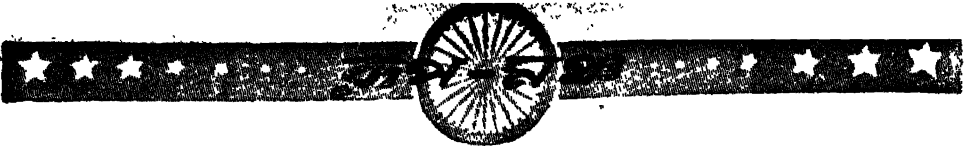
চিত্রগ্রহণে অজয় কর যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—শব্দগ্রহণও প্রশংসনীয়। শিল্প নির্দেশনারও তারিফ করবো। অন্যান্য বিষয়ে এত প্রশংসা করলেও রাঙ্গামাটী যেমনি আমাদের মনে ধরেনি তেমনি দর্শকসাধারণেরও ধরবে না—একথা নিশ্চিত। তবু সমালোচনা শেষে বাঙ্গালী দর্শক সাধারণকে 'রাঙ্গামাটী চিত্রখানির পৃষ্ঠপোষকতা করতে অনুরোধ জানাবো—কারণ এর প্রযোজনা মূলে রয়েছেন একজন বাঙ্গালী চিত্র ব্যবসায়ী—শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ।

এসোসিয়েটেড ডিসট্রিবিউটর্স লিঃ-এর তরফ থেকে তিনিই চিত্রখানির প্রযোজনা করেছেন। এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটর্স লিঃ এবং শ্রীযুক্ত ঘোষের নাম বাঙ্গালী চিত্রব্যবসায়ী ও চিত্রামোদীদের কাছে নতুন নয়। ইতিপূর্বে একাধিক বাংলা চিত্র উপহার দিয়ে এঁরা আমাদের শ্রদ্ধার্জন করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরপর নানান বিপর্যয়ে এঁরা সাময়িক ভাবে বিপর্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন—সেই কথা চিন্তা করেই—বাঙ্গালী চিত্র প্রদর্শক ও চিত্রামোদীদের কাছে 'রাঙ্গামাটী'কে পৃষ্ঠপোষকতা করতে আবেদন কচ্ছি। —শীলভদ্র

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

খ্যাতনামা কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য রচিত অরোরা ফিল্ম করপোরেশন প্রযোজিত "বন্ধুর পথ" চিত্রখানি বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার সংগে সংগেই সম্ভবতঃ সহরের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে। চিত্রখানির কাহিনীর জটিলতার সংগে চিত্র নির্মাতারাও যেন খানিকটা জড়িয়ে পড়েছিলেন। বন্ধুর পথের চিত্রে দর্শকেরা দেখতে পাবেন যে, জনৈক ব্যারিষ্টার তার কনিষ্ঠা কন্যার সংগে যখন স্থানীয় কোন উদীয়মান এ্যাডভোকেটের বিয়ের

বাসার্ট প্রডাকসন্সের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন 'রাধারাণী'র মহরৎ উপলক্ষে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তির সামনে সমবেত সুধীবৃন্দের মধ্যে বা দিক থেকে উপবিষ্ট: পরিচালক বিমল রায়, পরিচালক প্রফুল্ল রায়, জলু বড়াল, অনিল বাগচী, প্রযোজক সুখেন্দু বসু (৫ম), পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক দেবকী বসু, 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক সজনী কান্ত দাস, 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাতা অভিনেত্রী [illegible]মা দেবী, 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদকের পেছনে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী, দেবকী বসুর পিছনে পরিচালক ও [illegible]শিল্পী সুধীশ ঘটক, গনেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপদ ভৌমিক ও প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিদের দেখা যাচ্ছে।

প্রস্তাব করেছেন, তখন কন্যাটি তার একজন বন্ধুর সংগে বিলেত পালিয়ে যায় এবং ঐ বন্ধুকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে। অবশ্য নানান বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়ে মেয়েটীর জীবন শেষ পর্যন্ত বিপদমুক্ত হ'য়ে ওঠে এবং এক মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়েই চিত্রের পরিসমাপ্তি টানা হয়। উক্ত মেয়েটি' ভূমিকায় প্রথমে কতৃপক্ষ জনৈকা শিক্ষিতা তরুণীকে নির্বাচিত করেছিলেন। উক্ত তরুণী তাঁর চরিত্রের প্রায় অর্ধাংশের অভিনয় যখন শেষ করে আনলেন, তখন এক ইংরেজ আই, সি, এস-এর সংগে বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হ'য়ে পড়েন এবং বাকী অংশটুকু শেষ করতে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। কর্তৃপক্ষের তখন উক্ত অংশটুকু বাদ দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। এবং উক্ত ভূমিকায় শ্রীমতী রেণুকা রায়কে নির্বাচিত করে কর্তৃপক্ষ আবার প্রথম থেকে চিত্রের কাজ সুরু করেন। এজন্য তাঁদের যে কতখানি আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণ করতে হ'য়েছে—যে কোন ভুক্তভুগী মাত্রই বুঝতে পারেন। তাছাড়া কলকাতায় যখন শোচনীয় সাম্প্রদায়িক হাংগামা বেধে ওঠে, অরোরার নিজস্ব ষ্টুডিওতে তখন বন্ধুর পথের চিত্রগ্রহণ কার্য চলছিল এবং কিছুদিনের জন্য ষ্টুডিওর কাজ সম্পূর্ণ অচল অবস্থায়ই ছিল। প্রায় তিনটি বৎসর পর বন্ধুর পথ অতিক্রম করে 'বন্ধুর পথ' দর্শকসাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেল। দর্শকসাধারণের অভিনন্দনে তার এই আত্মপ্রকাশ ধন্য হ'য়ে উঠুক, তাই আমরা কামনা করি। বন্ধুর পথের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন শ্রীমতী রেণুকা রায়, সুহাসিনী, রমা, উষাতারা, বন্দনা, রাজলক্ষ্মী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ধীরাজ, মিহির, ইন্দু, জীবেন প্রভৃতি আরো অনেকে—: চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন চিত্ত বসু।

চিত্র প্রতিষ্ঠান লিঃ

যে নারী বুকভরা ভালবাসার আশায় ঘরের বাঁধন ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছিল, সেই একদিন সন্তানের শুভ কামনায় নিজের পরিচয়কে করেছিল গোপন। কিন্তু নিয়তির এমনি পরিহাস যে, সেই সন্তান একদিন তাঁকে উপেক্ষা করে গেল। চিত্র প্রতিষ্ঠান লিঃ-এর প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন 'হেরফের' এমনি মর্মস্পর্শী কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। শ্রীমতী চন্দ্রাবতী, দীপ্তি রায়, সমর রায়, অবনী, স্বাগতা দেবী প্রভৃতি আরো অনেকের প্রাণবন্ত অভিনয়ে হের ফের-এর প্রতিটি চরিত্র কতখানি যথার্থ রূপ পেয়েছে—দর্শকসাধারণ অতি সহজেই তা বিচার করতে পারবেন হের ফের যখন চিত্রা—প্রাচী ও সহরের অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দায় প্রতিভাত হ'য়ে উঠবে।

'কবি'র রজত জয়ন্তী

আগামী ১৮ই মার্চ দেবকী বসু পরিচালিত চিত্রমায়ার কবি সহরের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে একযোগে প্রদর্শিত হয়ে রজত জয়ন্তী উৎসব উদযাপন করবার সুযোগ পাবে। প্রযোজক-পরিচালক দেবকীকুমার বসু তারাশংকরের অমর উপন্যাস 'কবি'র চিত্ররূপায়ণে যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন—তা বাঙ্গালী দর্শকসমাজ অনেকদিন মনে করে রাখবেন। ইতিপূর্বে তারাশংকরের কোন উপন্যাসেরই রূপালী পর্দায় পূর্ণ মর্যাদা রক্ষিত হয় নি—কবি সেদিক থেকেও কৃতিত্বের দাবী করতে পারে। কবির কৃতকার্যতার মূলে পরিচালক ও অভিনেতৃবৃন্দ ছাড়া চিত্র সম্পাদক রবীন দাস ও শিল্প-নির্দেশকের নাম আমরা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই।

ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ

'ভুলি নাই' চিত্রের নির্মাতা ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স লিঃ গত ১১ই মার্চ ক্যালকাটা মুভিটোনে তাঁদের দ্বিতীয় চিত্র 'পরিবর্তন' এর মহরৎ সুসম্পন্ন করেছেন। 'পরিবর্তন' পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সত্যেন বসু। চিত্রগ্রহণ, শব্দগ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনার ভার নিয়েছেন যথাক্রমে অজয় কর, বাণী দত্ত ও বীরেন নাগ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেট্রোপলিটান ইন্সটিটিউসনের প্রধান শিক্ষক শ্রীধরণীধর মুখোপাধ্যায়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পিকচার্স চিত্রজগতে আত্মনিয়োগ করবার সময় উদ্দেশ্যমূলক চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা সামনে রেখেছিলেন। 'ভুলি নাই' কৃতকার্যতার পর সত্যেন বাবু প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাংলার চিত্রামোদী শিশুদর্শকদের স্বার্থের কথা মনে
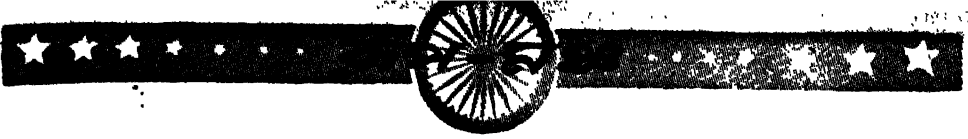
রেখে তাঁদের দ্বিতীয় চিত্র গড়ে উঠবে। পরিবর্তন সেই প্রতিশ্রুতি পালনের সাক্ষ্য রূপে দেখা দিয়েছে। তাই কর্তৃপক্ষকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদই শুধু জানাচ্ছি না—কিশোর কিশোরীদের উপযোগী শিক্ষামূলক চিত্র নির্মাণে তাঁদের প্রচেষ্টাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সাফল্যও কামনা কচ্ছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী

দেবী চৌধুরাণী নানা কারণে সাহিত্য সম্রাটের এক অনন্য-সাধারণ রচনা। অনন্যসাধারণ এই কারণে যে, আমাদের অন্তঃপুরের নারীকে যদি যথার্থ শিক্ষা এবং সুযোগ দেওয়া হয়, তাহ'লে এই নারীই কত অসহায়ের ভরসা হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন। বঙ্কিমের আলোচ্য উপন্যাসের এ হ'লো একটী মাত্র দিক। যখন ঘটনা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে দেবীর জীবনে অকল্পনীয় বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চলেছেন, ঠিক তখনই বঙ্কিমের আর এক চোখ উদ্‌ঘাটন করেছে নারীর হৃদয় রহস্যকে। স্বামীর প্রেমের জন্য ব্যাকুল একটী হৃদয় বেদনা বিধুর করেছে সমস্ত পরিবেশটি। ছায়া চিত্রে দেবী চৌধুরাণী রূপায়িত করতে গিয়ে এই পরিবেশ সৃষ্টির দিকেই সবচেয়ে সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছেন প্রফুল্ল রায়—যাঁর ওপর ভার পড়েছে এই ছবির নির্দেশনার। ছবির জাকজমকপূর্ণ দৃশ্যগুলির জন্যেও তিনিই দায়ী। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, প্রদীপ বটব্যাল, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা, সুদীপ্তা, প্রভৃতি আরো অনেকে। কলিকাতার পরিবেশন স্বত্ব শ্রীরবি প্রসাদ গুপ্ত কর্তৃক সংরক্ষিত। মফঃস্বল এবং বাহিরের স্বত্বের ভার পেয়েছেন মুভিস্থান লিঃ।

সন্দীপন পাঠশালা

আগামী ১৮ই মার্চ ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিও প্রযোজিত তারাশংকরের সন্দীপন পাঠশালা মিনার, ছবিঘর, বিজলী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তিলাভ করবে। উদীয়মান চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সন্দীপন পাঠশালা পর্দায় রূপলাভ করেছে। ছোটজাত চাষা—কৈবর্তের ছেলে সীতারাম—সে চায় তারই মত যারা সমাজের নিম্নস্তরে থেকে পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়, তাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে জ্ঞানের আলো প্রজ্বলিত করতে। আসে সহস্র বাধা—সমাজপতিরা ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন—ভাবেন তাদের সম্মান এবার গেল। পিতার অভিমান—স্ত্রীর গঞ্জনা—সমাজের অনুশাসন সব কিছুকে উপেক্ষা করে সীতারাম তার আদর্শে থাকে অবিচলিত। কণ্টকাকীর্ণ পথে চলতে সে পায় মাতৃস্নেহের শান্ত স্পর্শ—অন্তরঙ্গ বন্ধুর গাঢ় আলিঙ্গন এবং ক্ষণ-বসন্তের মৃদু দোলা। সন্দীপন পাঠশালার বিভিন্ন চরিত্র রূপায়নে আছেন সাধন সরকার, মীরা সরকার, প্রদীপকুমার, অমিতা, সুপভা, সিধু, শান্তা, জীবন, সুনীল দাশগুপ্ত, মণি শ্রীমানি প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। গত সংখ্যায় দীপালী সম্পাদক বন্ধুবর বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় সন্দীপন পাঠশালায় অর্ধেন্দুবাবুর সহকারী ছিলেন বলে ভুলবশতঃ আমরা উল্লেখ করেছিলাম। বঙ্কিমবাবু এই চিত্রে প্রচার দায়িত্ব নিয়ে আছেন।

পূর্ণিমা পিকচার্স লিঃ

কলিকাতার বুকে উপরোক্ত নামে একটী চিত্র প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে মাথা তুলছে। লব্ধ প্রতিষ্ঠ নাট্যকার ও চিত্র পরিচালক বিধায়ক ভট্টাচার্য, নিখিলেশ রায়, পুরুষোত্তম বিশ্বাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী গঠিত। এঁদের আগামী চিত্র 'কৃষ্ণা তিথির চাঁদ'-এর চিত্রগ্রহণ কার্য এপ্রিলের প্রথম দিক থেকে সুরু হবে।

বিদুষী ভার্যা

এম, পি, প্রডাকসনের প্রযোজনায় ও নরেশ মিত্রের পরিচালনায় উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু পঠিত উপন্যাসের চিত্র রূপ আগতপ্রায়। এই ছবিতে পরিচালক মলয়া ও কবিতা সরকার নামে দু'জন নবাগতার সংগে দর্শকসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। শিক্ষার দৈন্যে কুণ্ঠিত ও বিমুখ স্বামী আর প্রগতিবিরোধী গ্রাম্য সমাজ এক বিদুষী ভার্যার জীবনে এই বিচিত্র সমস্যাকে কেন্দ্র করে মনোরম কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। প্রধান চরিত্রগুলিকে রূপ দিয়েছেন নরেশ মিত্র, পরেশ বন্দ্যোঃ, শিবশংকর, রবি রায় শ্রীমতী প্রভা। সুকবি শৈলেন রায়ের গীতরচনা ও রবীন চট্টোপাধ্যায়ের

সুর সংযোজনা চিত্রখানিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে।

যার যেথা ঘর ও সিংহদ্বার

সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলা লিঃ-এর 'যার যেথা ঘর' অভিনেতা পরিচালক ছবি বিশ্বাসের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে ইতিমধ্যেই শেষ হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে। যার যেথা ঘরের বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন ছবি বিশ্বাস, মীরা সরকার, সরযূবালা, রেণুকা রায়, কুমারী কেতকী, সংঘমিত্রা, শেফালী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, শ্যাম লাহা প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানির সুর-সংযোজনা করেছেন প্রতাপ মুখোপাধ্যায়। কাহিনী রচনা করেছেন নিতাই ভট্টাচার্য। প্রখ্যাতা অভিনেত্রী সুনন্দা দেবী প্রযোজিত নীরেন লাহিড়ী পরিচালিত এস, বি, প্রডাকসনের সিংহদ্বার চিত্রখানিও সমাপ্ত হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে। সিংহদ্বারের সংগীত পরিচালনা করেছেন সুর-শিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায়। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সুনন্দা দেবী, রবীন মজুমদার, নবাগত অসীমকুমার, অলকা দেবী, শ্যাম লাহা প্রভৃতি আরো অনেকে। কিছুদিন পূর্বে যার যেথা ঘর ও সিংহদ্বার ছবি দু'খানির শেষ দৃশ্যের কাজ শেষ করবার সময় আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে যথাক্রমে আমন্ত্রণ এলো শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস, নীরেন লাহিড়ী ও প্রযোজক-অভিনেত্রী সুনন্দা দেবীর কাছ থেকে। তাঁদের আন্তরিকতায় আমরা সাড়া না দিয়ে পারিনি। রূপ-মঞ্চের স্থির চিত্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুক্ত শীতল ভট্টাচার্যের অধিনায়কত্বে চারটি ক্যামেরা সহ রূপ-মঞ্চ সম্পাদক, জিতেন পাল, স্নেহেন্দ্র গুপ্ত ও বীরেন দত্তকে পাঠানো হয়। নতুন ভাবে ষ্টুডিও সংবাদ পরিবেশন করবার উদ্দেশ্য নিয়েই ওদিন রূপ-মঞ্চের প্রতিনিধি দল ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে হাজির হ'য়েছিলেন। দৃশ্যপটে শিল্পীদের অভিনয়কালীন চিত্রগ্রহণ ছাড়া ছবি বিশ্বাস, নীরেন লাহিড়ী, নিতাই ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল রায়, জহর গাঙ্গুলী, সুনন্দা দেবী, মীরা মিশ্র, নবাগত অসীম কুমার, অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, শ্যাম লাহা, শিশির মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়, গৌর দাস, ফণীন্দ্র পাল প্রভৃতি আরো অনেকের বিভিন্ন ভংগীমায় তাঁদের জানতে না দিয়ে প্রায় একশত খানি ছবি তোলা হ'য়েছে। আগামী সংখ্যায় সিংহদ্বার ও যার যেথা ঘর-এর বিশেষ ধরণের সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে ওর কতকগুলিকে সন্নিবেশ করা হবে। দু'খানি চিত্রেরই শিল্পনির্দেশ দিয়েছেন বিজয় বসু।

ভারতী চিত্রপীঠ

সত্যাংশু কিরণ দালাল প্রযোজিত এঁদের প্রথম বাংলা চিত্র নিবেদন দাসীপুত্র সহরের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তির দিন গুনছে। দাসীপুত্র পরিচালনা করেছেন নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সরযূ, দীপক, অহীন্দ্র, প্রীতিধারা, সন্তোষ সিংহ, রাণীবালা, মণিকা, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ, আশু বোস, সংঘমিত্রা মণিশ্রীমানি প্রভৃতি আরো অনেকে। চিত্রখানির পরিবেশন স্বত্ব লাভ করেছেন বম্বে পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটর্স লিঃ।

বিভা ফিল্ম

এঁদের প্রথম ধর্মমূলক চিত্র সাক্ষীগোপাল সমাপ্ত হ'য়ে মুক্তির দিন গুনছে। চিত্রখানি গৌর সী ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় গৃহীত হ'য়েছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন বিপিন, মনোরঞ্জন, তুলসী, সুপ্রভা, স্মৃতি, ঝরণা, অপর্ণা ও আরো অনেকে। সিনেমা সারকিট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড সাক্ষীগোপালের পরিবেশন স্বত্ব লাভ করেছেন জেনে আমরা খুশী হলাম।

বোসার্ট প্রডাকসন

সুখেন্দু বসু প্রযোজিত বোসার্ট প্রডাকসনের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন গড়ে উঠবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী' কে কেন্দ্র করে। রাধারাণী পরিচালনা করবেন কৃতি চিত্রশিল্পী সুধীশ ঘটক। পরিচালক নির্বাচনে বোসার্ট প্রডাকসন যে একজন উপযুক্ত লোককে সুযোগ দিয়েছেন, এজন্য প্রযোজক সুখেন্দু বসুকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীযুক্ত ঘটকের পরিচালক জীবনের শুভ কামনা কচ্ছি। চিত্র নাট্য রচনার ভার দেওয়া হ'য়েছে শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে। ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে ইতিমধ্যেই 'রাধারাণী'র মহরৎ উৎসব সুসম্পন্ন হ'য়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ চিত্র পরিচালক দেবকী কুমার বসু এবং সজনীকান্ত দাস যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথি
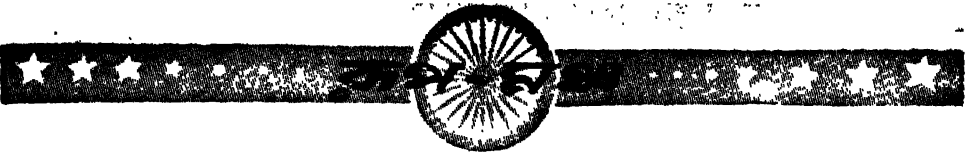
আসন গ্রহণ করেন। বঙ্কিমের আবক্ষ মূর্তির চিত্রগ্রহণের পর উপস্থিত সুধীবৃন্দের চিত্রগ্রহণ করা হয়। পরিশেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। প্রযোজক সুখেন্দু বসু, কর্মাধ্যক্ষ গণেশ বন্দ্যোঃ, ব্যবস্থাপক প্রভাত বন্দ্যোঃ ও দ্বিজেন ব্রহ্মচারী অতিথিদের প্রতি সব সময়ই যত্নবান ছিলেন।

চিত্রশ্রী লিঃ

এদের প্রথম চিত্র ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় রচিত চিতা-বহ্নিমান এর মহরৎ উৎসব রূপশ্রী লিঃ-এর নবনির্মিত ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিতাবহ্নিমানের চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত মনুজেন্দ্র ভঞ্জ (চন্দ্রশেখর) এবং চিত্রখানি পরিচালনা ও প্রযোজনা করছেন ধীরেন শীল।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল টকীজ লিঃ

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সোম প্রযোজিত এঁদের প্রথম চিত্র নিবেদন শরৎচন্দ্রের 'অনুরাধার' চিত্র গ্রহণ রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করেছেন প্রণব রায়। সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন কমল দাশগুপ্ত। অভিনয়াংশে আছেন কানন দেবী, জহর গাঙ্গুলী, কানু বন্দ্যো, তুলসী চক্র, মোহন ঘোষাল, নিভাননী, শুক্তিধারা, উমা গোয়েঙ্কা, মাষ্টার মুকু, বাবলু ও আরো অনেকে। অনুরাধার প্রচার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিসিটি লিমিটেড।

সুধীরবন্ধু প্রডাকসন

সাহিত্যিক পরিচালক সুধীরবন্ধু প্রযোজিত এদের 'দখনে বাঘ' চিত্রের কাজ ইতিমধ্যেই প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। চিত্রখানি পরিচালনা করছেন কৃতি চিত্র শিল্পী বিভূতি দাস, কাহিনী রচনা করেছেন মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহ্বান

গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী উত্তর কলকাতায় আহ্বান সমিতির প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' এবং সুশীল চট্টোপাধ্যায় রচিত 'ঝড়' নাটিকার অভিনয় হয়। কেবল মেয়েরাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কুমারী দীপ্তি চট্টোপাধ্যায়, স্বাতী চট্টোপাধ্যায়, যূথিকা, ইভা ও নভা বন্দ্যোপাধ্যায় অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কুমারী তৃপ্তি চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ সংগীতও হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সংগীত পরিচালনা করেছিলেন গৌর ঘোষ।

রঙ্গশ্রী

কোলকাতার অন্যতম বিশিষ্ট অবৈতনিক অভিনয় সংঘ "রঙ্গশ্রী"র সভ্যগণ গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রঙমহল রঙ্গমঞ্চে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "পি-ডবলিউ-ডি"র অভিনয় করেন। নাট্য পরিচালনায় ও মিঃ সেনের ভূমিকায় সংঘের বিশিষ্ট সভ্য. উদীয়মান তরুণ মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা সাধন সরকার বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন। তাঁর অভিনয় সমস্ত দর্শককে অভিভূত ক'রে রাখে। শ্যামলীর ভূমিকায় বিশিষ্টা অভিনেত্রী বন্দনা দেবী সু-অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় সুনীত হালদার, পরেশ দাস, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা নাগ, মহাদেব প্রামাণিক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু দে প্রশংসনীয় অভিনয় করেন। বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আমরা রঙ্গশ্রীর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন কর্মীসংঘ

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন কর্মীসংঘের উদ্যোগে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী ষ্টার রঙ্গ মঞ্চে তারাশংকর বিরচিত "দুই পুরুষ" অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীশ মুখোপাধ্যায়, ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ বি, দত্ত প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অভিনয়াংশে বিমলার ভূমিকায় মণি ভট্টাচার্য, গোপীনাথের ভূমিকায় প্রাণকুমার দত্ত, মহাভারতের ভূমিকায় অজয় বসু সু-অভিনয় করেন। সুশোভনের ভূমিকায় হরষিত গুপ্তের মৌলিক অভিনয় ক্ষমতা সবাইকে আনন্দ দেয়। তিনি যদি "মেক আপে"এর প্রতি একটু দৃষ্টি দিতেন তবে তাঁর অভিনয় সার্থকতম হয়ে উঠতো। কর্মী সংঘের সত্যেন দত্ত, ক্ষিতীন দত্ত রায় ও রক্ষিত বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুষ্ঠানটি সর্বাংগ সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

নৃত্য সংঘ

গত ২৯শে জানুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতার ছাত্রছাত্রীবৃন্দের
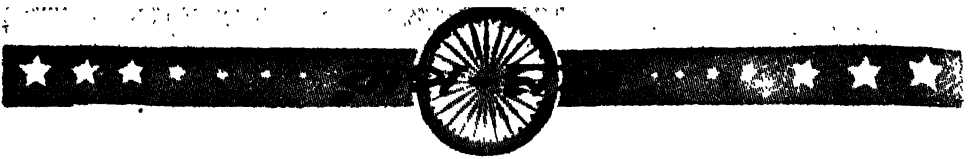
উদ্যোগে সংঘের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও লেঃ হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। উপস্থিত সুধীবৃন্দের মধ্যে চিত্রসম্পাদক ও পরিচালক সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ দত্ত, মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আশুতোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউ নাট্য-সম্প্রদায়

গত ৭ই ফাল্গুন শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মল্লিক মহাশয়ের ভবনে সম্প্রদায়ের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক নটগুরু গিরিশ চন্দ্রের বিল্বমঙ্গল নাটকের সসজ্জ মহলা হয়।

এম, পি, প্রডাকসন

ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় এদের আর একখানি বাংলা চিত্রের কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। এই চিত্রখানির সাময়িকভাবে নাম রাখা হয়েছে আভিজাত্য। আভিজাত্যের কাহিনী রচনা করেছেন কবি শৈলেন রায়। সংগীত পরিচালনা কচ্ছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণ ও চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব নিয়ে আছেন যথাক্রমে অগ্রদূত গোষ্ঠীর যতীন দত্ত ও বিভূতি লাহা অগ্রদূত গোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য সর্বজন প্রিয় বিমল ঘোষ চিত্রখানির প্রস্তুতির সর্বদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। অভিনয়ে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা যাবে ছায়া দেবী, অনুভা গুপ্ত, অলকা, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, হরিধন, কানু বন্দ্যোঃ, বিকাশ রায়, মাষ্টার শম্ভু, নমিতা ও আরো অনেককে।
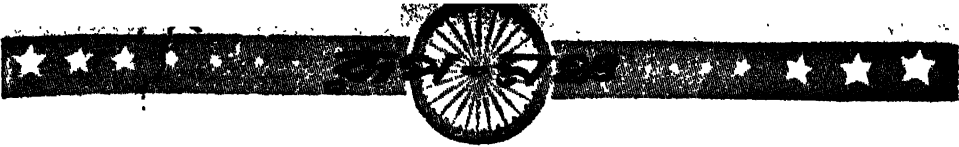
শ্রীমতী পিকচার্সের অনন্যা

সারা ভারতের চিত্তহারিণী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী কানন দেবীর নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠান শ্রীমতী পিকচার্সের প্রথম চিত্র নিবেদন 'অনন্যা' শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

'অনন্যা' একান্তভাবে নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও বিচিত্র অনুভূতির আবেগশিহরিত কাহিনী। প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি মেয়ের মনে স্বামী, সংসার এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন-বিভোর যে কল্পনা থাকে—অধিকাংশ জীবনেই তা সার্থক ও সুন্দর হয়ে ওঠে না। কিন্তু আঘাত ও বেদনা, ব্যর্থতা, লজ্জা ও অপমান মনে করে রাখবার মত মেয়ে সংসারে বেশী মেলে না। সাধারণ জীবনযাত্রার দৈন্য ও গতানুগতিক পরিবেশের মাঝখানে তাদের মনের ঐশ্বর্য চাপা পড়ে যায়—একদা স্বপ্নাতুরা আদর্শমনা জীবনতৃষ্ণায় ছন্দময়ী নারীমনকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না—দেখতে পাওয়া যায় একটি সামান্যা বধূ, একটি অতিপরিচিত ক্লান্ত জননীকে। মাঝে মাঝে অত্যন্ত সংগোপনে ব্যর্থ অতৃপ্ত অন্তরের ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস হয়তো একবিন্দু অশ্রুজল দেখা দিয়ে চকিতে মিলিয়ে যায়, কে তার সন্ধান রাখে।

এঁদের মধ্যে হয়তো সীতার মনের শক্তি ছিল বেশী, সংসারের নীচতা স্বার্থ ও দৈন্যের আবর্তের মাঝখানে পড়ে তার নারীহৃদয়ের সুন্দরতম স্বপ্নটিকে সে হারায়নি। নিজের জীবনে সেই সুন্দরের সাক্ষাৎ হয়তো মিললনা কিন্তু তারই মেয়ের জীবনে সে নিজের ব্যর্থ স্বপ্নকে সঞ্জীবিত করে তুলবে। সামান্যা মেয়ের কাজ এ নয়—বহু দীর্ঘদিনের অপেক্ষা, কত অপমান, লাঞ্ছনা ও আঘাত তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারল না—তবু ভুললনা তার স্বপ্নসুন্দর জীবন তৃষ্ণা। যে বয়সে সে সংসারের বধূ হয়ে এসেছিল, আজ তার মেয়ে উমা সেই বয়সে এসে পৌছেচে—আজ তার নিজের চোখে উঠেছে চশমা, চুল গেছে সাদা হয়ে কিন্তু তার মেয়ের মধ্যে আজও তার মনের স্বপ্নতুরা আদর্শমনা, শিল্পমনা নারী মনটি বেঁচে আছে।

শ্রীমতী কানন দেবী নারী মনের এই রহস্যমধুর ও অনুভূতি-ব্যাকুল রূপটিকে কুমারী হ'তে বধূ, বধূ হ'তে জননী এবং জননী হ'তে প্রৌঢ়া নারীর বিভিন্ন রূপান্তরের রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তাঁর অভিনয়-কুশলতায়।

"অনন্যা" চিত্রে কমল মিত্র একটি কুটিল চরিত্রের রূপ দিয়েছেন। পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় মেরুদণ্ডহীন কুটিল দাদার একান্ত অনুগত নির্বোধ ভাইয়ের চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করবেন। শ্রীমতী রেবা কুটিল ডাক্তার রাঘব ঘোষালের কুটিলা ও মুখরা স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা দেবেন। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় সীতার (কানন দেবী) ভাইয়ের একটি মধুর চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কানন দেবী, কমল মিত্র, পূর্ণেন্দু, রেবা, বিপিন গুপ্ত ও বিমান বন্দ্যোকে "অনন্যা" চিত্রে কম বয়স ও বেশী বয়সের বিভিন্ন রূপসজ্জায় দেখা যাবে। এঁরা ব্যতীত বিকাশ রায়, হরিধন ও সন্তোষ দাসকে তিনটি বিশিষ্ট পুরুষ চরিত্রে দেখা যাবে। রুণু ও বিজলী দু'টী ছোট মেয়ের চরিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছে। আলোকচিত্রশিল্পী অজয় করের নাম আজকের সকল ছায়াচিত্র রসিকের নিকটেই পরিচিত। কিন্তু "অনন্যা" চিত্রে অজয়বাবুর চিত্র গ্রহণের কুশলতা দেখে অতি সাধারণ দর্শকও স্বীকার করবেন, ভাল ছবি তৈরী করতে হ'লে ভাল গল্প, চমৎকার অভিনয়, সুন্দর পরিচালনা সত্ত্বেও নাটকীয় গতিবেগ ও mood নির্ভর করে ভাল চিত্রশিল্পীর নিপুণতার ওপর। অজয় কর এই চিত্রে বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। আলোক-চিত্রশিল্পীর কৃতিত্বের সংগে আর একজনের নামও জড়িয়ে থাকে। শিল্পনির্দেশক সুচারুভাবে ও রুচিসংগত সেট নির্মাণ না করলে আলোক চিত্র শিল্পী ভাল ছবি তুলতে পারেন না। বারেন নাগ এবিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। শব্দগ্রহণে সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কৃতিত্বও কম নয়। কানন দেবীর কণ্ঠে বিশ্বকবির গানের সকল মর্মময় মাধুর্য ও উন্মাদনা তিনি শব্দগ্রহণে নিখুঁতভাবে ধরেছেন। উমাপতি শীল সুরসংযোজনা করেছেন।

কিন্নরীর আসল সুরের অঙ্গহানির অভিযোগ

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মিনার্ভা থিয়েটারে বর্তমানে যে কিন্নরী নাটিকা অভিনীত হোচ্ছে, তাতে মিনার্ভার বর্তমান কর্তৃপক্ষগণ কিন্নরীর

বর্তমান সুরশিল্পী হিসাবে অন্ধগায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের নাম বেশ একটু ফলাও করে প্রচার করছেন। কিন্তু আমি আপনাকে ও বর্তমান দর্শকবৃন্দকে এই কথাই জানান মনে করি যে, এই কিন্নরীর আসল সুর স্রষ্টা হোলেন স্বর্গতঃ সংগীত সম্রাট দেবকণ্ঠ বাগচী (সরস্বতী) মহাশয় এবং তাঁরা সেই দেবকণ্ঠ বাবুর দেওয়া কিন্নরীর সুরের কাঠামো নিয়ে তারই অংগরাগ কোরে তাকে নাকি আরও ভাল করেছেন এবং সে সুরও নাকি বর্তমান দর্শকবৃন্দ প্রাণ ভরে নিয়েছেন—এ কথা ৬ই ফেব্রুয়ারী কোন এক বিশিষ্ট সংবাদপত্রেই জানা গেছে।

যাই হোক, তাঁরা বহুদিন বাদে কোলকাতার লোভনীয় জন সংখ্যার লোভ সামলাতে না পেরে বেশ ভেবে চিন্তে যে কিন্নরী নাটিকা মঞ্চস্থ করেছেন, এতে তাঁদের ব্যবসাবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আরও পাওয়া যেত, যদি তাঁরা আরও কিছুদিন আগে একে মঞ্চস্থ করতেন যখন অনেকের হাতে কালোবাজারের অনেক অপয়া টাকা ছিল। তারপর তাঁরা ব্যবসা বুদ্ধি নিয়ে শিল্পের দিক থেকেও প্রাচীন কিন্নরীকেও নাকি আধুনিক রূপে সাজাবার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের ভাষায় তাঁরা নাকি কৃতকার্যও হয়েছেন।

এখন প্রশ্ন জাগে, আধুনিক রূপের স্বরূপ কি? আধুনিক রূপ আর কিছুই নয়, একটা হোলো সেই প্রাচীন রূপ সৃষ্টির পুনরাবর্তন আর একটা হোলো নামগোত্রহীন রূপের সাড়ে বত্রিশ ভাজা আর সব শেষ হোলো প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নাতিশীতোষ্ণ জগাখিচুড়ী। সুতরাং তাঁরা যদি শেষোক্ত আধুনিক রূপে কিন্নরীকে রূপদান করে থাকেন, তা হোলে বাঙ্গালী পরিচালিত "মিনার্ভা থিয়েটারে" কিন্নরীর নামকরণ কিন্নরী না হোয়ে "ভেনাস অব মিনার্ভা থিয়েটার" হোলে ভালই হোতো, তখন আর স্কুলের ছেলেরা "লিজেণ্ডস অব গ্রীস এণ্ড রোম" এত কষ্ট কোরে পড়তো না, আর বাঙ্গালী "ইয়োর্স মোষ্ট অবিডিয়েণ্ট সার্ভেন্টরা" চোখে দেখতেন সরষে ফুলের পরিবর্তে কণ্টোলের কাঁকরমণিকে সোজা সীতেশাল। আর বৃদ্ধ চিরকুমারদেরও মনে পড়তো ডাক্তার ফ্রয়েডের অমূল্য মতবাদ।

তারপর ব্যবসায়ীর মধ্যে বড় একটা শিল্পমনের সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে মিনার্ভার বর্তমান পরিচালকগণ যদি সত্যকার শিল্পের বড়াই করেন, তা হোলে আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে, তাঁরা কেন স্বর্গত দেবকণ্ঠ বাগচীর দেওয়া কিন্নরী নাটিকার চির নূতন সুরের বেত্রাঘাত করার অধিকার কৃষ্ণবাবুকে দেন? আর আমি একথাও চিন্তা করতে পারি না যে, কৃষ্ণবাবুর মত বাংলার সুগায়ক কোন অধিকারে সে কালের বাংলা রঙ্গমঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ সুর স্রষ্টা দেবকণ্ঠ বাবুর সুরের উপর ওস্তাদি ফলিয়ে তাঁর মৌলিক সুরের অংগহানি করেন? তিনি কি জানেন না যে, সাগর পারের রঙ্গমঞ্চে আজও সেক্সপিয়রের প্রাচীন নাটক গুলি অভিনীত হোলেও সেদেশের লোকেরা সেক্সপিয়রের সেই হুবহু ভাষা ও ভাবধারা এবং তৎকালীন সাজ সজ্জা ও পরিবেশ সব কিছুই বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কেন? দর্শকদের কি রুচিবোধ পালটায় নি? না এমন মনীষী নেই যে সেক্সপিয়রের নাটকগুলির আমূল পরিবর্তন কোরে এমন কী সুরকেও বর্তমান সময়োপযোগী কোরে তোলেন? হ্যামলেট চিত্রখানি দেখলেই আমাদের বোঝা উচিত যে, তাঁরা প্রাচীনকে অনভিজ্ঞতা বশতঃ একটা নূতন রূপ দিয়ে তার আভিজাত্য নষ্ট করেন না, এইটাই তাঁদের বিশেষত্ব। আর আমরা ভুলে যাই, যা পুরাতন, যা আমাদের সম্পদ তাকে সর্বাংগীন ভাবে গ্রহণ কোরে তাকে নাট্যে ও চিত্রে হুবহু ফুটিয়ে তোলাইতো আমাদের নিপুণতা ও চরম সার্থকতা।

তারপর এই কিন্নরী সৃষ্টির পিছনে স্বর্গীয় ক্ষিরোদপ্রসাদের পরই স্বর্গীয় দেবকণ্ঠ বাগচী মহাশয়ের দানও নেহাৎ কম নেই। মিনার্ভার বর্তমান সম্প্রদায় হয়তো জানেন না যে, কিন্নরী এমনই একখানি গীতি নাটিকা যার নাটকীয় ভাবধারাকে "সর্বাংগ" ও গানকে "প্রাণ" হিসাবে গ্রহণ করলে বোধ হয় ভুল হবে না। কারণ, গীতিনাট্যই হোলো ইংরাজীতে "অপেরা"; যেমন আলিবাবা, এডিকেটারের হুপী, ষ্ট্রাইক মি পিঙ্ক, আই নিউ দি সুসী ও এম, জি, এম এর থাউজেণ্ডস্ চিয়ার্স ও ইয়ালাণ্ডা এণ্ড দি থিপস্ ইত্যাদি এদের সংগীতই যেমন প্রাণ ঠিক কিন্নরীর ক্ষেত্রেও যদি
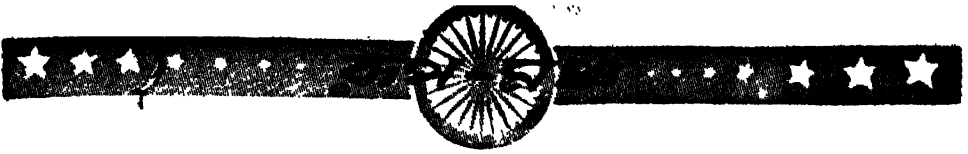
সংগীত বাদ দেওয়া যায় তা হোলে সে আর কিন্নরী থাকবে না তখন সৃষ্টিও হবে মলিন। তাই অপেরা নাটকীয় সুর স্রষ্টাকেও দ্বিতীয় স্রষ্টা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এদিক দিয়াও কি বর্তমানে কিন্নরীর সংগে তাঁর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকতে পারে না।

আরও লিখি যে, বহু বৎসর ধরে দেবকণ্ঠ বাবুর দেওয়া কিন্নরীর সুর অপ্রতিহত অবস্থায় চলে আসার পর হঠাৎ তাঁদের এখনই বা কেন সে সুরের উপর তাঁদের এমন কটাক্ষপাত ঘটলো। তাঁরা কি জানেন না যে, দেবকণ্ঠবাবুর সুর চির নূতন, সে কুমারটুলীর মাটির ঠাকুর নয় যে, পুরাতন হোলেই তার অংগরাগ কোরতে হবে। সুতরাং সে সুরের অংগরাগ কোরে তাকে আরও সুন্দর করার চেষ্টাকে আমি বলবো তাদের এ অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়: তাঁরা কি জানেন না যে স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথের "রবীন্দ্র সংগীত" বা বাংলার সম্পদ, যার উপর কোন ওস্তাদি যেমন চলে না, ঠিক তেমনই স্বর্গীয় দেবকণ্ঠের "দেবকণ্ঠ সংগীতেরও" কোন-রূপ পরিবর্তন, পরিবর্জন বা পরিবর্ধন কোরে তার মৌলিকত্ব নষ্ট করার কোন অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু অনেকের মধ্যে পরিবর্তন করার এমনই জঘন্য উন্মাদনা জাগে যে, তখন তাঁরা স্বার্থের খাতিরে নিজেদের বিচার বুদ্ধিটুকুও হারিয়ে ফেলেন। রবীন্দ্রনাথ তাই একদিন অতি দুঃখে কোন এক উদীয়মান গায়ককে বোলেছিলেন যে, আমার সুরের উপর কোনরূপ ষ্টীম রোলার চালিও না। আজ যদি দেবকণ্ঠ বাবু বেঁচে থাকতেন, তা হোলে কৃষ্ণবাবু কি সাহস কোরতেন তাঁর সুরের উপর এমন ওস্তাদি ফলাতে?

সুতরাং তাঁর চির নূতন সর্বজনপ্রিয় সুরের মন্দ বিচার বা অংগহানি করার যোগ্যতা বা অধিকার মিনার্ভার বর্তমান সম্প্রদায়ের কাহারও আছে কি না আমার জানা নেই। তবে বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন যে দেশে যদি আর একজন বিবেকানন্দ কখনও জন্মায় সেই বুঝবে বিবেকানন্দ কি কোরে গেছে। ঠিক তেমনই দেশে যদি আর একটি দেবকণ্ঠ জন্মান, তা হোলে তিনিই বুঝবেন দেবকণ্ঠবাবু কি সুর দিয়ে গেছেন এবং তিনিই হবেন দেবকণ্ঠবাবুর সুরের অংগহানি করার একমাত্র যোগ্য পাত্র। আর যদি আর একটি দেবকণ্ঠের আবির্ভাব না হয়, তবে স্বর্গীয় এচ, জি, ওয়েলস সাহেবের মতে ভবিষ্যত এমন দিন আসবে, যেদিন দুর্দান্ত বিজ্ঞানবলে ধরার মানুষ—গুলো রকেট ছেড়ে স্বর্গ মর্ত্য তোলপাড় কোরেও শান্তি পাবে না। সেদিনকার ডারউইন ও লেমার্কের চোখেও বর্তমানের এই রূপটীও দেখা দিবে এক আদিম রূপে। সেই চরম দিনের পরম বিস্ময়কর বিজ্ঞান যদি আমার মতে সুরেও এমন ভেল্কি লাগায় যে, তখন গায়কের কণ্ঠ থেকে সাধারণ সা, রে, গা, মা সুরের পরিবর্তে যদি বেরিয়ে আসে গাধার সাথে সুরের গাধা। মায়ের সাথে ম্যাও কোরে ছলো বেড়াল. আর 'পা'য়ের সাথে পাদুকার পরিবর্তে উড়ে আসে ঝাকে ঝাকে কোকিল "অডিটোরিয়ামে" কিংবা "রে" সুর গাইবার আগেই "সুরের ষাঁড়" এসে যদি সিং দিয়ে গুতোয় দর্শকদের তখনই সম্ভব হবে দেবকণ্ঠ বাবুর সুরের অংগরাগ করা। তার আগে নয়। যাই হোক ব্যবসাবুদ্ধি, স্বার্থপরতা ও পরশ্রীকাতরতা আমাদের মনকে এমনই প্রবলভাবে বিষিয়ে তুলেছে যে, আমরা আমাদের নিজস্ব দোষগুলি স্বীকার করার সৎ সাহস টুকুও হারিয়েছি। অতএব আমি উপসংহারে লিখি যে, তাঁরা যখন দেবকণ্ঠ বাবুকে কিন্নরীর আদি সুর স্রষ্টা হিসাবে অন্ততঃ একদিনের জন্যেও গ্রহণ করে তাঁর মূল্যবান সুরের কাঠামো নিয়েছেন তখন অন্যান্য দশক ঘুমিয়ে থাকলেও আমি এই দাবী করছি যে, তাঁরা যেন অনতিবিলম্বে দেবকণ্ঠ বাবুর দেওয়া কিন্নরীর আসল সুরগুলি হুবহু বজায় রেখে তাঁর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। বিনীত—শ্রীতারকনাথ বাগচী ১০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। (আগামী সংখ্যায় মন্তব্য দ্রষ্টব্য)।

মৃদঙ্গ-মধুকর: লেখক—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দে (সুবোধবাবু) মৃদঙ্গ-বারিধি, মৃদঙ্গ ভারতী। প্রকাশক কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শাস্ত্রী, কাব্য ব্যাকরণ, সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ, ভিষক শিরোমণি, ২০১ এ, গিরিশ পার্ক নর্থ, কলিকাতা। মূল্য: চার টাকা। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দে একজন প্রখ্যাত মৃদঙ্গ-শিল্পী। দীর্ঘদিন কঠোর সাধনায় ও অনুশীলনে তিনি মৃদঙ্গ বাদন সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা
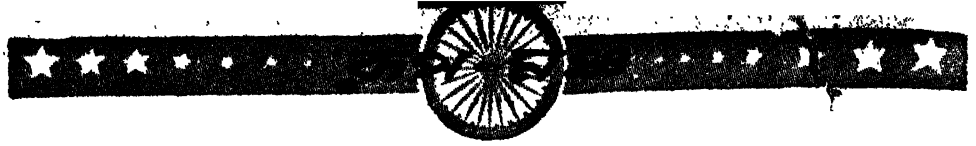
অর্জন করেছেন, মৃদঙ্গ বাদনে উৎসাহী শিক্ষার্থীদের জন্য আলোচ্য গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করে শুধু তাদেরই মহা উপকার করেননি—সমগ্রভাবে সংগীত জগতেরও মহা উপকার করেছেন। মৃদঙ্গের বিভিন্ন প্রাচীন ও মূল তাল তিনি দক্ষতার সংগে আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবেশ করেছেন। খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ ওঙ্কার নাথ ঠাকুর, পণ্ডিত কে, সি, ঠাকুর, মহম্মদ দবীর খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী সংগীতশাস্ত্রের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ আলোচ্য গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আমরাও তাঁদের সংগে সুর মিলিয়ে আগ্রহশীলদের কাছে পুস্তকখানি অনুমোদন কচ্ছি।

ভ্রম সংশোধন

গত ও পূর্ববর্তী সংখ্যা রূপ-মঞ্চে শিল্প ভারতীর পরিবর্তে 'গান্ধীজি' গীতিনাট্যকে ভ্রম বশতঃ কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের অবদান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি পাঠক-সাধারণ সেজন্য ক্ষমা করবেন।

রূপ-মঞ্চের আগামী সংখ্যা

আগামী সংখ্যা রূপ-মঞ্চ স্বর্গতঃ নট ও নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র দর্শক সমিতির ১৩৫৪ সালের জনপ্রিয়তা প্রতিযোগিতার ফলও উক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার মূল্য হবে এক টাকা। গ্রাহকদের অতিরিক্ত কোন মূল্য দিতে হ'বে না।

শ্যামলাল প্রডাকসন

এদের প্রথম কথাচিত্র "চাঁদ চরকার হাট" এর মহরৎ উৎসব ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হ'য়েছে। চিত্রখানির কাহিনী রচনা করেছেন ইন্দুমাধব ভট্টাচার্য এবং পরিচালনা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিমল মুখোপাধ্যায়।

রূপ-মঞ্চের চিত্র বিভাগ

'রূপ-মঞ্চে'র পাঠক সাধারণকে পরম আনন্দের সংগে জানাচ্ছি যে, 'রূপ-মঞ্চে'র চিত্র বিভাগের জন্য আধুনিক সাজসরঞ্জামসহ কয়েকটি উন্নত ধরণের জার্মাণ ক্যামেরা কেনা হ'য়েছে। ইতিপূর্বে আমাদের রুচি ও প্রয়োজন মত কোন ছবি তুলতে অন্যান্য চিত্রশিল্পী বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য গ্রহণ করতে হ'তো। এতে আর্থিক ঝুক্কিও যেমনি বেশী গ্রহণ করতে হ'তো—নানান অসুবিধাও তেমনি দেখা দিত। শীতল ষ্টুডিওর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত শীতল ভট্টাচার্য 'রূপ-মঞ্চে'র প্রতিজন কর্মীকে স্থিরচিত্র গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষা দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আগামী সংখ্যা থেকে 'রূপ-মঞ্চ' সম্পাদক ও চিত্রবিভাগের অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত জিতেন পাল গৃহীত বহু ছবি 'রূপ-মঞ্চে' প্রকাশ করা হবে। ইতিপূর্বে 'রূপ-মঞ্চে'র পাঠকসমাজের যাঁরা শিল্পীদের ছবির জন্য আমাদের লিখতেন—তাঁদের সে অনুরোধ আমরা রক্ষা করতে পারিনি। এখন থেকে 'রূপ-মঞ্চে' প্রকাশিত যে ছবির নিচে চিত্রগ্রহণ 'রূপ-মঞ্চ' বলে উল্লেখ থাকবে—সে সব ছবি পাঠক-সাধারণকে আমরা সরবরাহ করতে পারবো। এ বিষয়ে চিত্রবিভাগ, রূপ-মঞ্চ : দোতালা : ৩০, গ্রে ষ্টিট : এই ঠিকানায় পত্র লিখে অথবা সাক্ষাৎ করে আগ্রহশীলদের বিস্তারীত বিবরণ জেনে নিতে হবে।

[ভারপ্রাপ্ত সদস্য : রূপ-মঞ্চ—চিত্র বিভাগ]

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রূপ-মঞ্চ কার্যালয় ও এম, আই, প্রেস, ৩০, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৫, হ'তে সম্পাদিত ও মুদ্রিত এবং ৭৪।১, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, হ'তে প্রকাশিত।

অষ্টম-বর্ষ
১১-১২শ সংখ্যা

—চৈত্র-বৈশাখ—
১৩৫৫ ৫৬

নট ও নাট্যকার স্বর্গত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

বাংলার প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার স্বর্গতঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—আর বছর সাতেক হ'লো তিনি পরলোক গমন করেছেন। বাঙ্গালী জনসাধারণের কাছে যোগেশচন্দ্রের নট ও নাট্যকার প্রতিভা নিয়ে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ সর্বজনের স্বীকৃতিতে সে প্রতিভা ধন্য হ'য়ে উঠেছিল—সে প্রতিভার রেশ আজও বাঙ্গালী জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায়। তাঁর নাটক শুধু মহানগরীর বক্ষেই রাতের পর রাত অভিনীত হ'য়ে প্রশংসা অর্জন করেনি—তাঁর নাটকের আবেদন সুদূর গ্রামাঞ্চলের পল্লীবাসীর অন্তরও মথিত করে তুলেছিল এবং এখনও তুলছে। তাই যে প্রতিভার দ্যুতি এতখানি ব্যাপ্ত—তার সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলবার প্রয়োজনই নেই। বর্তমান প্রসংগে যে কথা আমি বলতে চাই, তা হ'চ্ছে—অনেকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, সাত বছর পূর্বে যিনি পরলোক গমন করেছেন—সাত বছর পরে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের কী অর্থ থাকতে পারে? এরই উত্তর দিতে যেয়ে বলতে চাই, যোগেশচন্দ্র যখন মারা যান—তখন রূপ-মঞ্চের কোন সংখ্যাকে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করবার সুযোগ আমরা পাইনি। সেই সুযোগ আমরা প্রথম পেলাম সাত বছর পরে এবং তাঁকে গ্রহণ করতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিনি: তাই আমরা বাংলার চিত্র ও নাট্যপ্রিয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে বর্তমান সংখ্যাটিকে সেই স্বর্গতঃ শিল্পীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করলাম। স্বর্গতঃ শিল্পীর উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের এই দীন আয়োজনেও নাট্যাচার্য শিশির কুমারের রচনার অভাবে হয়ত বিশেষ ত্রুটি রয়ে গেল। কারণ, এই দুই প্রতিভাকে আমাদের মত অনেকেই বিচ্ছিন্ন ভাবে কল্পনা করতে পারেন না—। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নাট্যগুরুর রচনার জন্য অপেক্ষা করে, আমরা তা সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। এবং বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হতেও যথেষ্ট বিলম্ব হ'য়ে গেল সেই কারণে। তবে আশার কথা এই, যোগেশচন্দ্র সম্পর্কে রূপ-মঞ্চের পাতায় শিশির কুমার ভবিষ্যতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন বলে অভিলাষ জ্ঞাপন করেছেন—আজকের অংগহানি সেদিন পূর্ণ করে নেবার আশায়, আমাদের আয়োজনের চেয়ে আন্তরিকতাকেই বড় করে দেখবার জন্য রূপ-মঞ্চ পাঠকসাধারণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তাঁদের—যাঁরা আমাদের এই দীন আয়োজনে সাড়া না দিয়ে পারেন নি।

—শ্রীকাঃ

প্রযোজনা • সত্যাংশুকিরণ দালাল

সুরসৃষ্টি • বিভূতি দত্ত (এ্যাঃ)

ভারতী চিত্রপীঠের নিবেদন!

দাসীপুত্র

রূপায়ণে • সরযূ • অহীন্দ্র • দীপক • মণিকা • শ্যাম লাহা • রাণীবালা • নবদ্বীপ • প্রভৃতি •

গীতিধারা • ...বোস ও সন্তোষ সিংহ

কাহিনী ও পরিচালনা • দেবনারায়ণ গুপ্ত

একমাত্র পরিবেশক • বম্বে পিকচার্স ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ

কর্ম্মের দ্বারায় যে
বড় হইল শিক্ষায়
যে হইল
সম্মানীয়—

কুষ্টির কোষ্ঠি
পাথরে যাচাই
করিয়া যাহাকে
সর্ব্বগুণসম্পন্ন
ব্যক্তি বলা যায়—

জীবনের ঘাত-
প্রতিঘাতে তারই
কাছে একদিন
প্রকট হইয়া উঠিল
মায়ের কলঙ্ক !!!

সে কলঙ্ক আরোপিত করিল কে? প্রিয়া না উপেক্ষিতা

উপেক্ষিতা বলে : মানুষই জাতের সৃষ্টি করেছে !

প্রিয়া বলে : কর্ণও সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কিন্তু কুন্তির কলঙ্ক আজও যায়নি।

উপেক্ষিতা বলে : কর্ম্মেও মানুষ বড় হয় শেষ পর্য্যন্ত—

"দাসীপুত্র" কি বড় হইল ?

এবং অন্যান্য চিত্র গৃহে মুক্তি আসন্ন !

বিভিন্ন চিত্রের-রূপসজ্জায় চরিত্রাভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

নট-নাট্যকার যোগেশচন্দ্র

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

●

যোগেশচন্দ্র ছিলেন আমার চেয়ে বয়সে বড়, ডাকতাম 'যোগেশ দা' ব'লে। নিতান্ত অন্তরংগ সমবয়সী বন্ধুর সংগে বন্ধু যেমন করে কথা বলে, ঠিক তেমনি করে তিনি কথা বলতেন আমার সংগে। আমিও বলতাম। যোগেশদা ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অগ্রজ, হিতৈষী বন্ধু এবং অন্তরংগ আত্মীয়। আর আমি ছিলাম তাঁর অনুরক্ত ভক্ত।

একদিন কথায় কথায় তাঁকে বলে ফেলেছিলাম এই কথাটা। আমার মাতৃসমা পরমা শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর এবং অন্তরংগ সুহৃদ রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণের উপন্যাসগুলি যখন তিনি নাটকাকারে রূপান্তরিত করছিলেন, তখন একদিন বলেছিলাম : পায়ে হাত দিতে দেবেন না জানি, তবু আপনাকে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে। উপন্যাসের মধ্যে কথাশিল্পী রচিত যে বিচিত্র জগৎ ছিল পাঠক-পাঠিকার মনোরাজ্যে, রূপে-রসে সমুজ্জ্বল করে' তাকেই আপনি তুলে ধরলেন আপনার সাধারণের চোখের সামনে। অনন্য-সাধারণ প্রতিভা না থাকলে একাজ সহজে হবার নয়। নাট্যশিল্পী যোগেশচন্দ্রকে কেমন করে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবো, বুঝতে পারছি না।

আজও আমার মনে আছে, গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে যোগেশদা খুব ধীরে-ধীরে তামাক খাচ্ছিলেন। আমার কথা শেষ হ'তেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। জিজ্ঞাসা করলেন : আপনার ভাল লেগেছে ?

বললাম : খুব।

কিন্তু তাঁর চোখের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম, চোখ দু'টি জলে ভরা ; গলার আওয়াজ কাঁপছে। বললেন : আমার পুরস্কার আমি পেয়ে গেলাম।

বললাম : আমি আপনার ভক্ত হয়ে পড়েছি।

তিনি বললেন : আমি কিন্তু আপনার ভক্ত অনেকদিন থেকে। 'নারীমেধে'র গল্পগুলি আমার সব চেয়ে ভাল লাগে। 'তেনানী তিগুনী'র কথা কত লোককে যে বলেছি, তার ঠিক নেই।

নিজের প্রশংসা সেদিন কি ব'লে চাপা দিয়েছিলাম মনে নেই।

প্রতিদিন সকালে তাঁর বাইরের ঘরে আড্ডা বসতো। যখন যেখানে যে বাড়ীতে উঠে গেছেন সেইখানেই। বহু লোকের আমদানী হ'তো। ঘন ঘন চা আসতো, দোকান থেকে আসতো গরম জিলিপি আর বিড়ি, সিগারেট তামাক তো ছিলই। আমি সে আড্ডায় বড় একটা যেতাম না।

তিনি এক একদিন আসতেন আমার বাড়ীতে। কেমন যেন একটা অদৃশ্য আকর্ষণ ছিল আমাদের মধ্যে। এক দিনের একটি অদ্ভুত ঘটনা—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হ'লেও —আমার চিরদিন মনে থাকবে! তখনও আমি সিনেমায় আসিনি। গল্প-উপন্যাস লিখেই দিন চলে। শ্যামপুকুরের একটা ভাড়া বাড়ীতে থাকি। হঠাৎ একদিন আমার মনে হ'লো—থিয়েটারের নাটক নিজেত লিখতে পারলাম না, লিখবার চেষ্টাও কোনোদিন করলাম না ; যোগেশদা যদি আমার একটা উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন তো, মন্দ হয় না। ভাবলাম একদিন তাঁকে বলবো। কিন্তু বলি কেমন করে ? লজ্জা করে যে!

এই চিন্তার সূত্র ধরে' মনে-মনে নিজেই ভাবতে লাগলাম —উপন্যাস তো অনেক লিখেছি, কিন্তু ঠিক নাটকের উপযোগী কোন্‌টি হ'তে পারে ? মনে মনে এক একটি বই ধরেছি আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি—নাঃ কোনোটিই পছন্দ হচ্ছে না। অন্যমনস্কের মত জামাটা গায়ে দিয়ে জুতো পরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি, গলিরাস্তার বাঁকের মাথায় যোগেশদা। আমারই বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছেন। দু'জনেরই মুখে হাসি! তিনিই প্রথমে কথা বললেন : চলুন আপনার 'রায়চৌধুরী' বইখানা দিন। দেখি একবার চেষ্টা করে নাটক হয় কি-না!

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। মানুষের মন নিয়ে যিনি এই খেলা খেলেন, সেই অদৃশ্য অন্তর্যামীর পায়ে
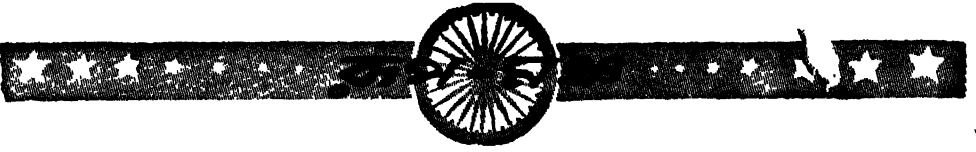
প্রণাম জানালাম। আমার সর্বাংগ তখন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেছে।

দু' পেয়ালা চা তৈরি করতে বলে'—তাঁর হাতে রায়চৌধুরী বইখানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম : হঠাৎ আপনার এ-কথা মনে হ'লো কেন ?

তিনি বললেন : যাচ্ছিলুম থিয়েটারের দিকে। হঠাৎ আপনার 'রায়চৌধুরী'র কথা মনে হ'তেই নেমে পড়লুম ট্রাম থেকে। বইটা যখন 'সাধনা'য় বেরুতো, তখন পড়েছিলুম খানিকটা, সবটা পড়িনি।'

দু'জনে ঠিক একই সময়ে একই কথা ভেবেছি। কথাটা বললাম তাঁকে।

শুনলেন। কিন্তু মন্তব্য কিছুই করলেন না। হাত দু'টি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে বললেন শুধু : জয় রাম।

'রায়-চৌধুরী' নাটক তিনি লিখে যেতে পারেন নি। কেমন করে আরম্ভ করবেন, ঘটনাগুলো কেমন করে সাজাবেন, কোন্ কোন্ জায়গা বদল করবেন—মুখে মুখে তার কাঠামোটা আমাকে একবার শুনিয়েছিলেন মাত্র।

সিনেমা ছবি পরিচালকের কাজ যখন আমি প্রথম পাই, কিছুতেই ঠিক করতে পারি না—কোন্ গল্পের চিত্রনাট্য লিখবো। গেলাম যোগেশদার কাছে। সিনেমা সম্বন্ধে কতদিন কত আলোচনা করেছি তাঁর সংগে। কত দুঃখ প্রকাশ করেছি এই ব'লে যে, সিনেমার ছবি আজকাল কথা বলছে—তবু সেখানে কথা-শিল্পীদের কেউ ডাকে না। ভাল ছবির জন্য চিত্র-শিল্পীর প্রয়োজন হয়, ভাল আওয়াজের জন্য প্রয়োজন হয় শব্দযন্ত্রীর, অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন হয় ভাল অভিনেতা অভিনেত্রীর। ভাল কথার জন্য প্রয়োজন হয় না শুধু কথা-শিল্পীর !

যত নগণ্যই হোক্, আজ তবু একজন কথাশিল্পীর ডাক্ এসেছে সিনেমার জগৎ থেকে ! আনন্দ যেন যোগেশদারই বেশী। কেমন করে একাজ পেলুম, কত টাকা দেবে, কোন চুক্তিতে কাজ করতে হবে—এই রকম সব কত প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ! অগ্রজ যেমন করে' তাঁর স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করে।

বললাম : ভয়ে আমার বুক দুর্ দুর্ করছে যোগেশদা। কাগজে কাগজে সিনেমাছবির কত সমালোচনা করেছি, কত কটুবাক্য বলেছি। আজ না হয় সিনেমার সিংহদ্বার পার হবার ছাড়পত্র পেলাম, কিন্তু রাজ দরবারে গিয়ে নিজের যোগ্যতা যদি প্রমাণ করতে না পারি ? যদি অপমানিত হয়ে মাথা হেঁট করে' ফিরে' আসতে হয় ? নিজের সর্বনাশ তো হবেই, আমার পরবর্তী কালের কোনও সাহিত্যিকের আর সেখানে স্থান হবে না। কথা-শিল্পীদের মুখের ওপর সিনেমার সিংহদ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

যোগেশদাই আমাকে তখন সাহস দিয়েছিলেন। তিনিই বেছে দিলেন আমার 'নন্দিনী' গল্পটি।

তৎক্ষণাৎ ভূমিকা নির্বাচন হয়ে গেল—তাঁরই বাইরের ঘরে বসে। ঠাকুর্দার ভূমিকা তাঁকেই দিলাম, আর তাঁর বেহালা বাজানো নাতির ভূমিকা দেওয়া হ'লো তাঁরই প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান জহরকে। পশুপতি আমাদের নিত্য সহচর, যোগেশদার পরম স্নেহভাজন। তাঁকে দেওয়া হ'লো নন্দ মোক্তারের পুত্র গোবিন্দের ভূমিকা। প্রভা হ'লো নন্দ মোক্তারের গিন্নি—গোবিন্দ ওরফে গবার মাতা-ঠাকুরাণী। এ-সবই যোগেশদার নির্বাচন।

নন্দিনী ছবি হ'লো। ছবি করবার সময় যেখানে সন্দেহ হয়েছে, যেখানে আটকে গেছি, সেইখানেই পরামর্শ করেছি তাঁর সংগে।

আমার প্রথম ছবি, জনসাধারণ যখন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন, অগ্নিপরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হ'লাম, সেদিনও দেখেছিলাম, যোগেশদা তাঁর হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে বলেছিলেন : জয় রাম !

তার পরেই 'বন্দী'। যোগেশদাকে 'বন্দী'র গল্পটা শোনালাম। বললেন : চমৎকার গল্প। আমাকে ওই ভীতু জমিদারের পাটটি দিন।

তাই দেওয়া হ'লো। যোগেশদা বললেন : আপনি আমার ভয় ভাঙ্গিয়ে দিয়েছেন শৈলজাবাবু। ছবিতে আগে আমাকে কেউ ডাকতো না, এখন ডাকছে।

কিন্তু কে কার ভয় ভাঙ্গিয়েছিল ভগবান জানেন। জহর, মলিনা, প্রভা, ইন্দু মুখুজ্জে, ৺ যোগেশচন্দ্র, পশুপতি কুণ্ডু
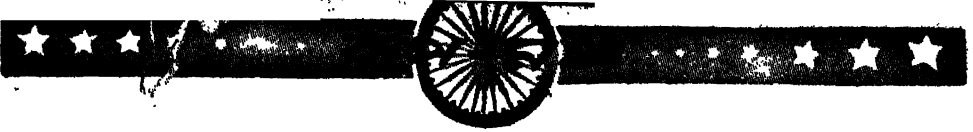
সন্ধ্যারাণী, ফণী রায়, কানু বন্দ্যোঃ, বিপিন গুপ্ত—সিনেমা-রাজ্যে আজ যাঁদের অভিনয় প্রতিভা সর্বাবাদীসম্মত, সেদিন তাঁদের মূল্য এক কানাকড়িও নেই ব'লে সকলে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিল। তাঁদেরই নিয়ে আমার প্রথম ছবি করবার সাহস আমি পেয়েছিলাম যোগেশচন্দ্রের কাছ থেকেই।

যোগেশচন্দ্র মাত্র পাঁচটি দিন অভিনয় করেছিলেন আমার 'বন্দী' ছবিতে। তার পরেই যেদিন তাঁর অভিনয় করবার কথা, তার আগের দিন তাঁরই বাড়ীর 'সেটে' কাজ করছি ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিয়োতে, অকস্মাৎ নিদারুণ দুঃসংবাদ আমাদের কানে গিয়ে পৌঁছোলো—যোগেশচন্দ্র চলে গেছেন! বেনুবাবু (নীরেন লাহিড়ী) উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে এসে আমাকে এই সংবাদটি দিয়েছিলেন আমার মনে আছে। যোগেশদারই লেখা 'সহধর্মিনী' নাটকের ছবি তখন তিনি পরিচালনা করছিলেন। বেনুবাবু তখন শোকে মূহ্যমান, তাঁর দু' চোখ দিয়ে দর দর করে জল গড়াচ্ছে, মুখে কথা বলতে পারছেন না! পরম আত্মীয় বিয়োগের দুঃসহ বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা সকলেই এলাম তাঁর বাগবাজারের বাড়ীতে। দেখি, জহর তাঁর মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদছে। স্ত্রী-পুত্র কন্যা শোকে মূহ্যমান। ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছেন যোগেশচন্দ্র, মনে হয় যেন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাভিভূত, মুখে চোখে সারা দেহে কোথাও এতটুকু বিকৃতির চিহ্ন নাই। তাঁর সেই নির্বিকার নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহের দিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলুম না। যে পায়ে একদিন তিনি আমাকে হাত দিতে দেননি, সেদিন তাঁর সেই পদস্পর্শ করে আমার শেষ প্রণতি জানালাম। দুর্ভাগা এই বাংলাদেশের ততোধিক দুর্ভাগা এক নট-নাট্যকার চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন আমাদের কাছ থেকে। কি যে আমরা হারালাম, সেকথা চিরদিনের জন্য লেখা রইলো আমাদের হৃদয়ে। দেশ যে কি হারালো তার হিসাব লেখা হবে—বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস যদি কোনোদিন লেখা হয় তো সেই ইতিহাসের পাতায়!

যোগেশচন্দ্র

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এক দুর্যোগের রাতে যোগেশচন্দ্র নিঃশব্দে, ভীরু-পদক্ষেপে এবং বৃহৎ ব্যক্তিত্বের ছায়ায় যখন প্রথম প্রবেশ করেন, তখন যে ছায়ার আড়ালে তিনি প্রবেশ করলেন, তার দিকেই সকলের দৃষ্টি, সুতরাং তাঁর আগমন ঠিক আবির্ভাব হ'য়ে ওঠে নি। তাতে সবচেয়ে খুশী হয়েছিলেন, যোগেশচন্দ্র নিজে। নিজেকে হেড-লাইন করে বাইরের লোকের সামনে কি করে জাহির করতে হয়, আজকালকার অনেকের মত এই যুগ-কৌশল যোগেশচন্দ্র জানতেন না। এই ব্যাপারটার মধ্যে যে কুৎসিৎ অভব্যতা এবং সংস্কারহীন স্বল্পতা আছে, তা স্বভাবতই তিনি জানতেন এবং নোংরা জিনিষের মতন তাকে তিনি এড়িয়েই চলতেন। তাই তাঁর আসা বা চলে যাওয়ার মধ্যে বিশেষ কোন হৈ-চৈ হয় নি। নিজে না পিটলেও, অপরকে দিয়ে পেটাবার যে একটা ব্যবস্থা করবেন, সে রকম একটা ঢাকও তিনি জোগাড় করতে পারেন নি। গুটীকতক পার্শ্বচারী বান্ধবের মনে শুধু এই বিরল-বাক নিঃশব্দচারী লোকটীর অসাধারণত্ব এবং মাধুর্য নিহিত রয়ে গিয়েছে।

যে মাধুরী ছিল তাঁর চরিত্রে, যে ভব্যতা ছিল তাঁর ব্যবহারে, যে রুচি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে, তাই অবিকল প্রতিফলিত হয় তাঁর রচিত সাহিত্যে। তাই যোগেশচন্দ্রের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে, সেই সময়ের বাইরের আমদানী কোন জিনিসের কোন প্রভাব নেই···বাইরের প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে, তিনি তাঁর নিজের ভেতর থেকে এক অপরূপ মধুর সাহিত্য সৃজন করে চলেছিলেন এবং যেদিন সেই সাহিত্য একটা স্পষ্ট রূপ নিয়ে ফুটে উঠছিল, যেদিন তিনি তাঁর মধ্যে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন, সেইদিনই হঠাৎ তাঁকে চলে যেতে হলো। তাই যোগেশচন্দ্রের নাট্য-সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটা অপরূপ সৃজনের আত্মবিকাশধারাকে সম্পূর্ণতার লগ্নে মৃত্যু-দণ্ডিত দেখতে পাই। জগতের সাহিত্যে অনুরূপ ট্র্যাজেডী মাঝে মাঝে ঘটে।

নাট্যসাহিত্যের একান্ত দৈন্যের মুখে যোগেশচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন। একান্ত সংশয়ের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ থেকে সব চেয়ে দূরতম মেরু-কেন্দ্রে তাঁর যৌবনমন ঘুরে বেড়াচ্ছিল— স্কুল ঘরের নাটকীয়হীনতার মধ্যে। অন্তরের সহজাত নাট্য-প্রীতির বাইরে, স্কুলঘরের বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যেই তাঁর যৌবনের অধিকাংশ দিন অতিবাহিত হয়। নাট্যকার হিসাবে তিনি সহসা নিজের মধ্যে থেকে নিজেকে আবিষ্কার করেন এবং এই কাজে তাঁকে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেন বা উৎসাহ দেন, শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের বৈদ্যুতিক প্রতিভার উষ্ণ স্পর্শে তাঁর ভেতরকার সংশয়ের হিম রাত্রির অবসান ঘটে।

সেই সময় সহসা, বহুদিনের আবদ্ধতাকে দূর করে, বাংলার রঙ্গমঞ্চে একটা নতুন গতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। পুরাতন বিমলিন দৃশ্যপট আর জনান্তিকের নীরব চীৎকারের গতানুগতিকতার মধ্যে সহসা শিশিরকুমারের আবির্ভাব। পথ নেই অথচ এসে গেল ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগের বৈদ্যুতিক যান। পুরাতন রঙ্গমঞ্চ আর পুরাতন নাটকের মধ্যে শিশিরকুমারের দুরন্ত প্রতিভা নিজের নিষ্ক্রমণ পথের ব্যর্থ অন্বেষণে নিজের মধ্যেই আবর্ত-সংকুল হয়ে ওঠে। এই সময়ে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে যোগেশচন্দ্রের সংগে তাঁর সাক্ষাৎ। তাঁর নতুন অভিনয়-রীতির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগের জন্যে নতুন নাট্যকারের সন্ধান তিনি করছিলেন; যে নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা মৃত মানবদের মনকে আবার নতুন সঞ্জীবনী রসে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে পারবে, যার মধ্যে দিয়ে যুগের অন্তরকে তিনি কণ্ঠস্বরের নব ব্যাখ্যায় চিরন্তনকালের সংগে সংযুক্ত করতে পারবেন। সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদে যোগেশ-চন্দ্র "সীতা" রচনা করলেন। "সত্যে"র মধ্য দিয়ে এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় অভিনেতা তাঁর প্রতিভার নিষ্ক্রমণ পথের সন্ধান পেলেন। বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটা নতুন যুগের পত্তন হলো। যদিও তার পৌরাণিক কলেবর বদলালো না, কিন্তু সেই পুরাতন কলেবরের মধ্যে স্বতন্ত্র এক নতুন মন জেগে উঠলো।

শিশিরকুমারের প্রেরণায় এবং নিজের অন্তরের সুপ্ত নাট্য-প্রীতি জাগ্রত হওয়ায় যোগেশচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে রঙ্গমঞ্চকে গ্রহণ করলেন। একদিকে তাঁর নিজের একটা আদর্শবাদ, অন্যদিকে শিশির প্রতিভাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেওয়া, এই দুটো প্রয়োজনের তাগিদে যোগেশচন্দ্র তাঁর নাটকের বিষয় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এবং তার ফলেই দিগ্বিজয়ী, রাবণ প্রভৃতি নাটকের সৃষ্টি।' সেইজন্যে যোগেশচন্দ্রের নাট্য-সৃষ্টির কাজে দু'টো বিভিন্ন যুগ দেখা যায়। প্রথম যুগ হলো, শিশিরকুমারের প্রেরণার যুগ। এই যুগে তাঁর নাট্যবস্তু এবং নাট্যরীতি ইতিহাস এবং পুরাণকে জড়িয়েই ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা নতুন ব্যাখ্যার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। কিন্তু শিশিরকুমারের সংগে রঙ্গমঞ্চ সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার ফলে, যোগেশচন্দ্রের প্রতিভা সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে দাঁড়ালো। সেই হলো তাঁর দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত। এবং এই যুগের বিশেষ দান হলো, তাঁর সামাজিক নাটক-গুলি। ইতিহাস এবং পুরাণের দূরত্ব থেকে তাঁর মন প্রতিদিনের জীবনের অতি নিকট কেন্দ্রে নেমে এলো। ইতি-মধ্যে অভিনেতা রূপে তিনি নিজের একটা স্বতন্ত্র রূপেরও সন্ধান পেয়ে গিয়েছেন। তাঁর প্রথম যুগের নাট্যসৃষ্টিতে যেমন শিশিরকুমারের প্রভাব লক্ষিত হয়, তেমনি তাঁর দ্বিতীয় যুগের নাট্যসৃষ্টিতে অভিনেতা রূপে তাঁর নিজের সত্তাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। সেইজন্যে এই যুগের নাটকগুলিতে তিনি অপূর্ব সুন্দর কতকগুলি জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। এই চরিত্রগুলি তাঁর স্বকীয় জীবন-দর্শন ভংগীতে এক অপূর্ব মধুর মূর্তি গ্রহণ করেছে। এবং অনুসন্ধান করলে তাদের মধ্যেই আসল যোগেশচন্দ্রকে খুঁজে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশকে, বাংলার সমাজকে, বাংলার কৃষ্টিকে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। বাংলার সামাজিক এবং আত্মিক জীবনে পূর্ব ও পশ্চিমের, নতুন এবং পুরাতনের যে সংঘর্ষ এসে পড়েছিল, যোগেশচন্দ্র জানতেন সেই সংঘর্ষে মধ্যেই আছে বাংলার আধুনিক নাট্য-সাহিত্যের খোরাক।

তিনি এই বিপুল সংঘর্ষে আধুনিকদের পাশে এসে দাঁড়াননি, দাঁড়াতে তাঁর মন যায় নি, কিন্তু পুরাতনদের ও নায়ক হতে চান নি, যদি ও সে সুযোগ তাঁর ছিল···এই দু'দলের মাঝখানে থেকে, দু'পক্ষেরই বেদনা তিনি অনুভব করে গিয়েছেন · দুপক্ষকেই তাঁর উদার সহানুভূতি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন···যেখানে প্রতিবাদ করবার প্রয়োজন হয়েছে, প্রতিবাদ করেছেন কিন্তু সে প্রতিবাদের পেছনে কোন উগ্র অভিশাপ বা তিক্ততা ছিল না, ছিল একটা মধুর হাসি। ব্যঙ্গ, ভর্ৎসনা, প্রীতি আর বেদনার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব হাসি।

যোগেশচন্দ্রের নাট্য সাহিত্য তাঁর সেই নতুন দৃষ্টি ভংগীরই বাণীরূপ। বাংলার আত্মিক সংঘর্ষের ইতিহাসের একটা সন্ধিযুগ।

নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত

যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে দু'চার কথা লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। তাঁর সংগে আমার আলাপ খুব অল্পদিন হয়েছিল। স্বর্গতঃ শিল্পী রমেন চট্টোপাধ্যায় (দেবুদা) আমাকে একদিন যোগেশ-চন্দ্রের বাগবাজারের বাড়ীতে নিয়ে যান। দোতালার ঘরে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে, চারিদিকে এলোমেলো স্তূপাকার বই ছড়িয়ে তার মাঝখানে বসেছিলেন যোগেশচন্দ্র। দেবুদার কাছে আমার পরিচয় পেয়েই অত্যন্ত স্নেহশীল আত্মীয়ের মত আমায় হাত ধরে পাশে বসিয়ে নিলেন। যোগেশচন্দ্র তখন নাট্যজগতে খ্যাতির উচ্চশিখরে, আর আমি সবে মাত্র একজন নবাগত। সেই প্রথম পরিচয়ের দিনেই বুঝতে পারলুম—এই আত্মভোলা শিল্পী অন্য সবার চেয়ে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। প্রতিভাবান পুরুষের সংস্পর্শে এলেই মানুষের মনে একটা বিস্ময় বোধ জাগে; প্রতিভার দীপ্তি অনেক সময় চোখ ঝলসে দেয় হীরকের দ্যুতির মত। প্রতিভাবানকে বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে অনেক সময় খানিকটা দাম্ভিক বলে অনেকে ভুল করেন। তার কারণ, তাঁর আচার ব্যবহার কথাবার্তা সব কিছুর ভেতরই তাঁর প্রতিভার দীপ্তি ঝলমল করে ওঠে. তাঁকে আর সকলের চেয়ে উঁচুতে তুলে ধরে। কিন্তু যোগেশচন্দ্রের ভিতর আমি এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখেছি। তার ভিতর উগ্রতা ছিলনা, ঝলমলানি ছিলনা। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল বাংলাদেশের মাটির মহাদেব—শান্ত সমাহিত ধ্যানমূর্তি স্মরণ করে মাথা আপনা হতে নুয়ে পড়ে পায়ের তলায়।

যোগেশচন্দ্র একান্তভাবে বাঙ্গালী ছিলেন; তাই তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে বাংলার পল্লীজীবনের যে নিখুঁত, স্বাভাবিক চিত্র ফুটে উঠেছে বাংলার অন্য কোনো নাট্যকারের রচনায় তা একান্ত দুর্লভ। উপন্যাস ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র, বিশেষ করে পল্লীজীবনের চিত্র অংকনে যেমন অপরাজেয়, আমাদের সমসাময়িক নাট্য সাহিত্যেও, আমার ব্যক্তিগত বিচারে যোগেশচন্দ্রের স্থানও অনেকটা সেই পর্যায়ে।

নট যোগেশচন্দ্রকে "সীতা"য় বশিষ্ঠ, "দিগ্বিজয়ী"তে আলি আকবর, "অশোকে" আকাল, "মহাপ্রস্থানে" যুধিষ্ঠির, "রমায়" গোবিন্দ গাঙ্গুলী, "আলমগীরে" রামসিংহ, "মহানিশায়" রসিকাপ্রসন্ন প্রভৃতি যে সকল ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখেছি. তাতেও তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। তাঁর অভিনয় দেখতে এসে কোন এক মুহূর্তে মনে হয়নি যে, অভিনয় দেখছি। নাটকের জীবন্ত চরিত্রটী যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তার ভেতর কোন যায়গায় এতটুকু চমক লাগাবার প্রচেষ্টা নাই। শ্রেষ্ঠ নট হয়েও, আমার মনে হয়, দর্শকের করতালির অভ্যর্থনা সবার চেয়ে কম পেয়েছেন যোগেশচন্দ্র। তিনি কাউকে কোনোদিন বিস্মিত করেন নি; সবাইকে করেছেন মুগ্ধ। রঙ্গালয় এই মানুষটীকে হারিয়ে যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তা ভুলবার নয়। তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

যোগেশচন্দ্র স্মরণে—

প্রভাত সিংহ

বঙ্গরঙ্গজগতে যিনি শাশ্বত স্থান অধিকার করে জনগণের চিত্তে আপন প্রতিষ্ঠা করে রয়েছেন, তাঁর নাম নিয়ে কিছু বলার ভেতরে আর কিছু না থাক, তাঁর আচরণ ও
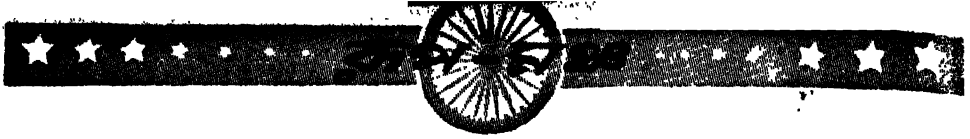
স্বভাবের আংশিক তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে বলেই অনেকে অনেক কিছু লিখবেন। আমি কিন্তু তা লিখবনা। আমি শুধু আমারই সংস্পর্শে আসা সেই 'দাদু' চারিত্রিক যোগেশচন্দ্রের কথা উল্লেখ করে যাব মাত্র।

১৯৩৫ সাল। রঙমহলে পরিচালকরূপে আমি যোগদান করেছি। নতুন নাটক,নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী এবং নতুন সমাজ সংস্কার বিষয়বস্তুর ধ্যান আমাকে যেন পেয়ে বসে ছিল। বর্তমানের মত বহু জনের বহু প্রচার গুরুগম্ভীর রক্ষে করে মঞ্চ চালনা করার তখন কোনই প্রয়োজনই ছিলনা। সেই স্বাবলম্বী স্বপ্রতিষ্ঠ যুগে আমার সংগে ৺যোগেশচন্দ্র প্রথম 'চরিত্রহীন' নিয়ে সখ্যভাবে আবদ্ধ হলেন। চরিত্র হীন' তখন চলছে অপ্রতিহত গতিতে। ৺যোগেশচন্দ্রের "শিবপ্রসাদ" সুধীজনকে শুধু বিমুগ্ধই নয়—বিস্মিতও করে তুলেছে। যেমন নাট্যকার, তেমনি নট ৺যোগেশচন্দ্রকে মনে মনে প্রণাম জানালেম। তারপর কালক্রমে তাঁর "মাকড়সার জাল", "নন্দরাণীর সংসার" প্রভৃতি আমি মঞ্চস্থ করেছি। জ্ঞানী ও গুণীজন এ-নাটকগুলিকে বহুদিন ধরে সহানুভূতি দেখিয়ে রঙমহলকে প্রকৃতই "অভিজাত অভিনয় আসর" বলার মতবাদ গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকার হিসেবে ৺যোগেশচন্দ্র ছিলেন নিছক বাংলাদেশের খাঁটি অনাড়ম্বরপ্রিয় নাট্যকার। তাঁর স্বভাবজাত কথা বার্তার মতনই তিনি মোলায়েম ও মিষ্টি ভাষার সমাজের বিভিন্নক্ষেত্রে আলোকরশ্মিপাত করেছেন।

এই আলোকপাতে অন্ধকারের অনেক মালিন্যই দূর হয়ে গিয়েছে। নট হিসেবে শুধু serio-comic অংশেই নয়, অত্যন্ত জটিল ও কঠিন অংশেও তিনি এমন কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন যা, একমাত্র তাঁরই দ্বারা সম্ভব অবিস্মরণীয় কীর্তিরূপে বিবেচিত হয়েছে। উত্তরকালেও তাঁর এ গৌরব রঙ্গমঞ্চের ঐতিহ্য বহন করবে বলেই আমি মনে করি। সমমান কেন্দ্রে সমতা রক্ষা করে নট ও নাট্যকার হওয়া গিরিশ পরবর্তী যুগে যে সম্ভাবনার ইংগিত বাংলাদেশ পেয়েছে, তা একমাত্র ৺যোগেশচন্দ্রেরই মধ্যে নিহিত ছিল। তিনি ছিলেন এজন্য এক হিসেবে স্রষ্টা। সৃজনশক্তির পরিচ্ছন্ন ও অনন্যসাধারণ গুণে তাই ৺যোগেশচন্দ্রের নাম চির স্মরণীয় আর যেহেতু তিনি ছিলেন স্বভাব-স্রষ্টা, তাই দুঃখবাদকে তিনি বহন করে গেছেন অমৃতলোকে। তাই কবিগুরু ভাষায় আজ শুধু এই বলেই শেষ করি, যে—

"... ....বিস্মৃতিসাগর নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।
তুমি বিশ্ব পানে চেয়ে মানিছ বিস্ময়,
বিশ্ব তোমা পানে চেয়ে কথা নাহি কয় :
দোঁহে মুখোমুখি। অপার রহস্য তীরে
চির পরিচয় মাঝে নব পরিচয়।"

যোগেশচন্দ্র

প্রফুল্ল নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সম্পাদক : কংগ্রেস কমিটি
২৪ পরগণা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান)

যোগেশচন্দ্র ছিলেন সরলতা ও প্রেমের আধার; তাঁহার বন্ধুপ্রীতি ছিল অসাধারণ। বাল্যকালে বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার ভালমানুষীর সুযোগ লইত এবং সময়ে সময়ে তাঁহার উপর অত্যাচারও করিত কিন্তু তাহাতে যোগেশচন্দ্রের ভালবাসার কিছুমাত্র অপ্রতুল হয় নাই তাঁহার এই ভালমানুষীর জন্যই তাঁহার ডাক নাম ছিল ভোঁদা। বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষ করে ১০।১১ বৎসর বয়সে যোগেশচন্দ্র টাকীর নিকটবর্তী বেল কাঁটী গ্রামে তাহার এক পিসিমাতার গৃহে অবস্থান করিয়া টাকী গভর্ণমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে এনট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে I. A. পড়েন। এই সময় হইতেই যোগেশচন্দ্র সাহিত্য চর্চায় মনোনিবেশ করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই তাঁহার প্রথম নাটক লিখিত হয়। আজীবন ভাবপ্রবণ যোগেশচন্দ্রের গ্রাম্যজীবন ও গ্রাম্য সরলতার উপর ছিল অগাধ প্রীতি। তাঁহার ভগ্নীপতি খুব আমোদ আহ্লাদ ভাল বাসিতেন এবং একটী সখের যাত্রার দল তৈয়ার করিয়া ছিলেন। যোগেশচন্দ্র ঐ দলে অনেকবার অভিনয় করিয়া ছিলেন। পরিণত বয়সে থিয়েটারে যোগদান করা হতে
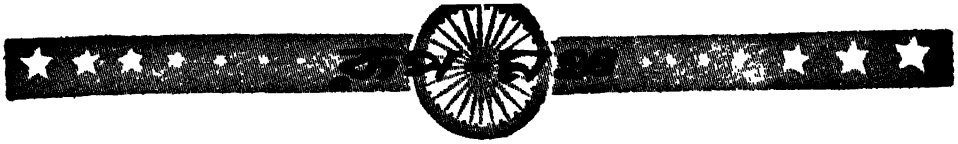
যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী, তরজা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক আসক্তি ছিল। যোগেশচন্দ্রের প্রথম নাটক। তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় লিখিত। ঐ কার্যে তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। দিদির প্রতি যোগেশচন্দ্রের যেমনি অসীম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, দিদিরও তেমনি যোগেশচন্দ্রের প্রতি ছিল অসীম স্নেহ। তাঁহার মনে ধারণা ছিল, কালে যোগেশচন্দ্র একজন নামজাদা সাহিত্যিক হইবেন এবং সেজন্য লেখাপড়ার ক্ষতি হইলেও সাহিত্য চর্চায় তিনি কখনও বাধা দেন নাই বরং বরাবরই উৎসাহ দিয়াছিলেন। I. A. পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার পর যোগেশচন্দ্র শিক্ষকতা করিতে যোগদান করেন। সংগে সংগে সাহিত্য চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই সময় তাঁহার লিখিত নাটক সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনীত করাইবার আগ্রহে তিনি দিনের পর দিন দানিবাবুর নিকট ও পরে ক্ষেত্রবাবুর নিকট যাতায়াত করেন। কতদিন স্কুলের কাজের ক্ষতি করিয়াও দানিবাবুর নিকট নাটক পাঠ করার কার্যে অতিবাহিত হইয়াছে। আহার নিদ্রা কোনও দিকে দৃষ্টিপাত ছিল না। কখনও বা হতাশায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছেন।—এই অবস্থায় যখন ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন যোগেশচন্দ্রের মনেও উহা গভীর রেখাপাত করে। তাঁহার জনৈক বন্ধু যখন ওকালতী ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কাযে আত্মনিয়োগ করেন, তখন যোগেশচন্দ্রও ভাবাবেগে শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের কাযে যোগদান করেন। কিছুদিন প্রচারকাযে এদিক ওদিক ঘুরিয়া পরিশেষে তিনি স্বীয় গ্রামকে নিজের কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেন ও সেখানে পল্লীবাসীর নিকট চরখার প্রচার ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান তাঁত ব্যবসায়ীগণের সহযোগে ঐ সুতার বস্ত্র প্রস্তুত করণ ও সহর হইতে দেশী কাপড়ের ও খদ্দরের জামা প্রভৃতি খরিদ করিয়া লইয়া গিয়া ও গ্রামাঞ্চলে বিক্রয় করা, ইহাই ছিল তাঁহার কাজ। বৎসরাধিক কাল এই কার্যে লিপ্ত থাকিয়া যখন দারিদ্রের কষাঘাত সহ্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিল, তখন আবার তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইল। উক্ত বন্ধুর মারফৎ কলিকাতা নাট্যজগতে সর্বত্র পরিচিত সুধাবাবুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উক্ত সুধাবাবুর মধ্যস্থতায় শ্রীযুত শিশিরবাবুর সহিতও যোগেশবাবুর পরিচয় হয়। যোগেশচন্দ্র তখন তাঁহার নাদীরশাহ নাটকখানি সাধারণ প্রেক্ষাগারে অভিনীত করাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর শিশিরবাবুকে উক্ত নাটকখানি পড়িয়া শুনান হয় এবং শিশিরবাবু নাটকখানি আদ্যোপান্ত শুনিয়া বিশেষ প্রীত হন ও উহা অভিনয় করাইবার প্রতিশ্রুতি দেন ও পরে উহা "দিগ্বিজয়ী" নামে অভিনীত হয়। তৎপূর্বেই শিশিরবাবু Exhibition এ থিয়েটার করিবার ভার লন ও স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "সীতা" নাটক লইয়া অবতীর্ণ হন। ঐ Exhibition অন্তে শিশিরবাবু Madan Co থিয়েটারে যোগ দেন ও উক্ত "সীতা" নাটক অভিনয় করিবার আয়োজন করেন। প্রাচীর পত্র দেওয়ার পর হঠাৎ কোন কারণে উক্ত পুস্তক অভিনয় করা বন্ধ হইয়া যায় এবং শিশিরবাবুর অনুরোধে মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে যোগেশচন্দ্র "সীতা" নাটকখানি প্রণয়ন করেন ও উক্ত নাটক শিশিরবাবু কর্তৃক অভিনীত হয়। যোগেশচন্দ্রও ঐ সংগে অভিনেতা হিসাবে যোগ দেন। এইখানেই যোগেশচন্দ্রের জীবনের পটপরিবর্তন। অতঃপর নট ও নাট্যকার হিসাবে যোগেশচন্দ্র সাধারণের নিকট পরিচিত হন।

কয়েকটি বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে একযোগে

মুক্তিলাভ করবে

—প্রতীক্ষায় থাকুন—

যোগী যোগেশচন্দ্র

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য

●

অনেকদিন আগের কথা। যোগেশচন্দ্র তখন থাকতেন বাগবাজার ষ্ট্রীটের এম-ডি-হ্যারিব নতুন ব্লক বাড়ীটাতে। শিশিরকুমার ইনষ্টিটুটে সদ্য ঢুকেছি—তাঁদের ইসুয়িং অফিসার হ'য়ে। সরস্বতী পূজো কিম্বা অন্য কী একটা ব্যাপারের চাঁদা চাইবার জন্য আমার উপর ভার পড়লো—যোগেশচন্দ্রের কাছে যাবার। শীতের সকাল। বাড়ীর বাইরের ঘরটাতে বালাপোষ গোছের একটা শীতবস্ত্র গায়ে দিয়ে তিনি বাইরের ঘরেই বসেছিলেন। সামনে গড়গড়া, মাঝে মধ্যে জল টেনে কল্কের আগুনকে উজ্জীবিত রাখছেন এবং যতদূর মনে পড়ে বোধহয় প্রুফ দেখছিলেন।

নমস্কার করে দাঁড়াতেই প্রতিনমস্কার ক'রে বললেন—বসুন! সসংকোচে আসন গ্রহণ করতেই একটু হেসে বললেন :—এই পাড়াতেই থাকেন-না!

—আজ্ঞে হাঁ—সসম্ভ্রমে উত্তর দিলাম।

—ও। মুখটা চেনা চেনা লাগছে। সামনের শিশিরকুমার লাইব্রেরীর বারান্দাতেই দেখেছি মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে হাঁ। সেখানেই দেখেছেন। কিন্তু—

—কিন্তু কী?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে বলেই ফেললাম—ডাইনে বাঁয়ে না চেয়েইতো আপনি পথ চলেন—দেখেছি। এর মধ্যে মুখ চিনে রাখাতো সহজ কথা নয়!

—নইলে কি আর নাট্যকার হওয়া যায়? চোখের পলকে তাঁকে মানুষ দেখে চরিত্র বুঝতে হবে, ঘটনার আরম্ভ শুনেই বুঝে নিতে হবে তার শেষ। কাগজের সংবাদদাতার সংগে নাট্যকারের তফাৎ তো থাকবেই!

—তা বটে। বললাম। তিনি আবার প্রুফ দেখায় মন দিলেন।

একটু পরে চাকর দু'কাপ চা দিয়ে গেল। তিনি এককাপ তাঁর নিজের কাছে টেনে নিয়ে পুনরায় প্রুফ দেখায় মন দিলেন।

চা খেতে খেতে চেয়ে দেখতে লাগলাম—সেই আশ্চর্য মানুষটিকে। শান্ত দর্শন সুশ্রী, মাথা নীচু ক'রে কাজ করছিলেন বলে কপালের একটি শিরা স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, এত কাছে থাকলেও মনে হয় যেন সুদূর-সুদুর্লভ তিনি। কাছে পাওয়াটাই যেন কাছে পাওয়া নয়। যে আঙুল দিয়ে তিনি কলম ধরে আছেন, তাই দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এত বিচিত্র নরনারী, কত আশ্চর্য নাটক।

—কী ব্যাপার বলুন তো? চোখ না তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন।

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে হকচকিয়ে গেলাম। যে সব কথা মনে মনে ভেঁজে এসেছিলাম, তার একটিও মনে পড়লো না। কিন্তু কিন্তু ক'রে বললাম—

—আজ্ঞে—কিছু চাঁদা—

—ইনষ্টিটুটের জন্যে? আমাকে শেষ করতে না দিয়ে তিনি বললেন—নিশ্চয় দেব। কিন্তু এক টাকা। না-না প্রতিবাদ করবেন না। টাকা দেখতে একটা হলেও আমার সদিচ্ছাটা একশো টাকার। শুধু সামর্থ্যের অভাবে দিতে পারছিনা। এই বলে একটুখানি চুপ করে প্রুফটার দিকে চাইলেন। তারপর মুখ তুলে আবার বললেন :—

—বাংলাদেশে নাট্যকার হ'য়ে জন্মানো আশীর্বাদ নয়—অভিশাপ। সেদিন একথা বিশ্বাস করিনি। আজ করি। বাইরে থেকে আমাদের যা দেখেন—আমরা তা নই। লোককে ভুল বোঝাবার জন্যে ওরা আমাদের পোষাক পরায়, মুখের উপর ফোকাস ফেলে, হাসতে বলে, প্রেম করতে বলে। রাতের অন্ধকারে থিয়েটার শেষে আমরা যখন বাড়ী ফিরে আসি, ভাগ্য ভাল যে তখন আমাদের কেউ দেখতে পায়না।......আবার একটু থেমে বললেন—ঠিক এই কারণেই বহু লোক মদ খায়।......কেউ ভেবেও দেখেনা যে ফাঁকা সুখ্যাতি আর শুকনো ফুলের মালায় সংসার খুশী হয়না।......শিফ্টাররা গালাগাল দিয়ে টাকা আদায় করতে পারে, হিরো-হিরোইনরা না এসে টাকা আদায় করতে পারে। পারেনা কেবল নাট্যকার। সে মুখচোরা, সে লাজুক, সে ভদ্রলোক, সে স্রষ্টা—এই তাঁর অপরাধ।......লক্ষ্য করলাম—উত্তেজনায় তাঁর কাণ দুটি
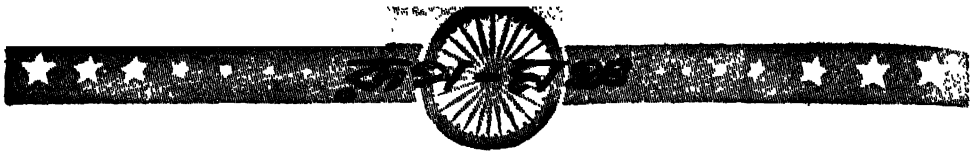
লাল হ'য়ে উঠেছে। আর বিরক্ত না ক'রে নমস্কার ক'রে উঠে পড়লাম।

আরো বেশ কিছুদিন পরে—

শিশির ইনষ্টিট্যুটে অনেক সাধ্য সাধনার পর নিজেরা নাটক লিখতে সুরু করেছি। স্বর্গীয় কবি অনিল ভট্টাচার্য ও আমার লেখা "পশ্চিমে হাওয়া" তখন অভিনীত হ'য়ে গেছে, পুনর্মূষিক ভব (সেই তিমির) সদা শেষ হ'য়েছে। কর্তৃপক্ষের যাঁরা ইন্সুরিং অফিসারের ঔদ্ধত্যে বিচলিত হ'য়েছিলেন,—তাঁরা শান্ত হ'য়েছেন।

'দেহ যমুনা' নামে আমার একখানি নাটক তখন বিহারস্থালে পড়েছে। যথাসময়ে নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'ল—রংমহল নাট্যমঞ্চে। কুখ্যাতির চাইতে সুখ্যাতিই হ'ল বেশী। যার ফলে দ্বিতীয়বার অভিনয় আয়োজন করতে হ'ল। এই দ্বিতীয়বার অভিনয়ের দ্বিতীয় অংকের শেষে যখন ড্রপ পড়লো,—তখন গ্রীনরুমে একজন এসে আমাকে বললেন- যোগেশবাবু তোমায় খুঁজছেন।

—কে যোগেশবাবু? বিরক্ত হ'য়ে প্রশ্ন করলাম। কেননা নিজে অভিনয় অংশ গ্রহণ করেছি, ফলে পরিশ্রমও হয়েছে খুব; কাজেই ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিটা বেশ বিরক্তিকরই লাগবার কথা।

—নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী! বন্ধু বললেন।

ধড়াস্ ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে। তিনি কি থিয়েটার দেখছেন নাকি?

—হ্যাঁ ষ্টেজ বক্সে ছিলেন।

ছি ছি ছি! কেমন একটা লজ্জা যেন এসে আমায় আচ্ছন্ন করলো। মনে হ'ল—নাট্যকার যোগেশচন্দ্রকে দেখাবার মতো এ নাটকতো হয়নি। এ যে ছেলে মানুষের কলম নিয়ে ছেলে মানুষী খেলা হ'য়েছে। কত ত্রুটি আজ এর মধ্যে। ঠিকমতো দৃশ্য সাজানো হয়নি, সংলাপে আছে কত ত্রুটি, অভিনয় হচ্ছে যাচ্ছেতাই। অবিশ্যি যা হচ্ছে—তাতে আমরা নিজেরা খুসী হ'তে পারি, কিন্তু সমস্ত বাংলা দেশের হৃদয় জয় ক'রেছেন যিনি, সেই প্রখ্যাত নাট্যকারকে কি দেখানো যায়—এই অকুশলী হাতের নাট্য রচনা?

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। কম্পিত বুকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি একটু হেসে বললেন,—আপনাকে যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আমি সেই চাঁদা চাইতে গিয়াছিলাম?

হুঁ। এই নাটকখানি কি আপনার লেখা?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—পাবলিক বোর্ডে এটি অভিনয় করতে দিতে কি আপত্তি আছে?

কী বলে এই লোকটা? আপত্তি! কত লোক পাণ্ডুলিপি বগলে ক'রে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বাইরে থেকে টিকিট কেটে যে রূপকথার রাজ্যের একটুমাত্র আভাস পেয়ে উতলা চিত্ত নিয়ে বাড়ী ফিরি, সেই রাজ্যে প্রবেশের এমন অযাচিত নিমন্ত্রণ? প্যালপিটেশন বেড়ে গেল কী বলবো ভেবে না পেয়ে ফস্ ক'রে বোকার মতো বলে ফেললাম:—

—ভাল লাগছে?

—হ্যাঁ, সেই জন্যেই বলছি। মনে হয় সামান্য একটু কাট ছাঁট ক'রে নিলেই জিনিষটি বেশ দাঁড়াবে। আপত্তি নেই তো?

—ন—না! গলাটা পরিষ্কার ক'রে জবাব দিলাম।

—তাহ'লে এর মধ্যে একদিন আমার সংগে দেখা করবেন, সকাল বেলায়, বাড়ীতে।

যাওয়া হয়নি; কারণ, তখন 'যুগান্তরে' চাকরী নিয়েছি দশটা ছটার গুঁতোয় 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ছি। এমন সময় একদিন আমাদের অফিসে রংমহলের বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কাজে এলেন বন্ধুবর বিদ্যাধর মল্লিক। তাঁর সংগে কথায় কথায় আধুনিক নাটক নিয়ে আলোচনা হ'ল। আমাকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন 'দেহযমুনা' শোনাবার জন্য তাঁর মনোনয়ন নিয়ে দোতলার অফিসে ঢুকে দেখলাম, যোগেশবাবু ও শ্রীযুক্ত গদাই মল্লিক বসে আছেন। আমাকে দেখেই যোগেশবাবু উচ্ছসিত কণ্ঠে বললেন—আসুন, আসুন, এই কিছুক্ষণ আগেই আপনার কথা হচ্ছিল। নাটকখানি এনেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।
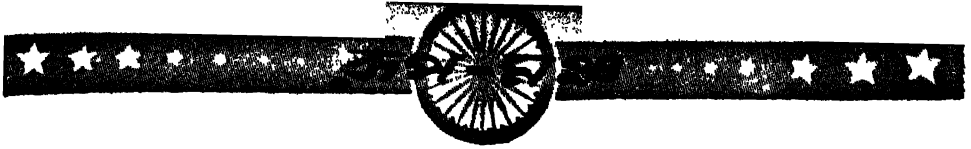
—তাহ'লে সময় নষ্ট না ক'রে আরম্ভ করুন। গদাইবাবু শুনুন, একটু Bold হ'লেও—ভারী সুন্দর, বিশেষ ক'রে ডায়ালগ তো বেশ ভাল। শোনা এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন সেইদিনই হয়ে গেল। গদাইবাবু একটু হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—মশাই, নাটকখানি তো মন্দ নয়, কিন্তু ওজন কতো?

—ওজন! সর্বনাশ, এমন জানলে কোন মুদীখানার দোকান থেকে খাতা খানাকে ওজন করিয়েই আনতাম।

—ওজন আর কত হবে? সংকুচিত গলায় উত্তর দিলাম —বড় জোর—আধ সের।

দু'জনেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। যোগেশবাবু বললেন— উনি আপনার পারিশ্রমিকের কথা বলছেন।

ও! লজ্জায় লাল হ'য়ে মাটির দিকে চেয়ে রইলাম। বলতে কি মনে মনে গদাইবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম। যেহেতু তিনি টাকার কথা বলেছেন।

সেই রাত্রে এক সংগে রিক্শা ক'রে বাড়ী ফিরলাম। সেদিনের কথাগুলি আমার সারা জীবনের পাথেয়, আমার নাট্য রচনার পথ প্রদর্শক হ'য়ে আছে। রঙমহল থেকে বেরিয়ে তিনি বললেন :—

—একটা ব্যাপারে আজ আপনাকে একটু তিরস্কার করবো।

—কেন?

—গদাইবাবুকে টাকার কথাটা বললেন না কেন? ভেবেছিলাম, আপনার রচনাভংগী যেমন নতুন, তেমনি মানুষ হিসেবেও বোধ করি আপনার মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাব। কিন্তু দেখ্‌লাম—না—তা নয়। আপনি শুধু যোগেশ চৌধুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন মাত্র। তার মানে—ঠক্‌বেন।

—কিন্তু আমিতো ঠিক টাকার জন্য—

—মিথ্যে কথা। টাকার জন্যেই বটে, কিন্তু নতুন লেখা ব'লে সাহস ক'রে চাইতে পারলেন না। কিন্তু আজকের এই চাইতে না পারাটা রেকর্ড হ'য়ে রইল। এরপরে কোনদিন চাইলে ওরা অবাক্ হবে। আর এই ক'রে ক'রেই আমরা আখের নষ্ট করেছি। একটু থেমে আবার বললেন—ওঁরা ভাবলেন—শিফ্‌টায় পরিশ্রম করছে—তাকে পয়সা দাও, অভিনেতা অভিনেত্রীরা পরিশ্রম করছেন, তাঁদের দাম দাও, কিন্তু নাট্যকারের আবার পরিশ্রম কী? ওতো স্রেফ কলমের খোঁচার বিলাস। তার আবার দাম কী? যা দু'চার পয়সা দেওয়া হয়—তাই খুব। তার ওপর রয়্যালটি বেসিস থাকলে আদায় করতে প্রাণান্ত।...অথচ নাট্যকারদের একটা ইউনিয়ন করবার জন্য কী চেষ্টাই না করেছি আমি। কেউ রাজী হয়না। যদি থিয়েটার অথরিটি চটে যায়। জঘন্য—জঘন্য—সমস্ত ব্যাপারটাই

অনেকক্ষণ নীরবে পথ চলেছি, একটু পরে নিজের মনেই তিনি বললেন বিধায়কবাবু, লেখা ছাড়বেন না। আপনার মধ্যে প্রমিস রয়েছে।

মনের মধ্যে নাট্যকারের কথাটাই দোলা খাচ্ছিল; তাই নিজের প্রশংসা শুনে চুপ ক'রে রইলাম। রিক্শাটা তখন চিত্রার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ যোগেশবাবু বললেন—তার চাইতে এসব করা অনেক ভাল।

—কী সব? বিনীত প্রশ্ন করলাম।

—এই সিনেমা টিনেমা। পয়সা পাওয়া যায়। আবার চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরে বললাম,—আচ্ছা, নাটক লেখার কি কোন ফরমুলা আছে?

—নাঃ! মানুষ দেখুন, কেবল মানুষ দেখুন। ট্রামে বাসে-পথে-ঘাটে, রাজদ্বারে—শ্মশানে—যেখানে যত মানুষ চলা ফেরা করছে, হাসছে,—কাঁদছে—গান গাইছে—সব্বাইকে দেখুন। মনে রাখবেন—পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে নাটক রয়েছে—শুধু আপনার দেখতে পাওয়া চাই। এখানে যা ঘটছে—সবই নাটকীয়। কোন কেরামতি না ক'রে সহজভাবে তাকে নাটকে ধরবার চেষ্টা করুন। দেখবেন ভাল নাটক হয়েছে।

এরপর বহুবার, বহু কারণে তাঁর সংগে দেখাশোনা হয়েছে প্রতি বারই কাছে ডেকে আদর করে অনেক উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু এত মেলামেশার পরও যে জিনিষটির সন্ধান তাঁর মধ্যে পাইনি, তা হ'চ্ছে চঞ্চলতা। তাঁর চলা-

উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার কয়েকটি অভিজাত প্রেক্ষাগৃহে একযোগে মুক্তি প্রতীক্ষায়—
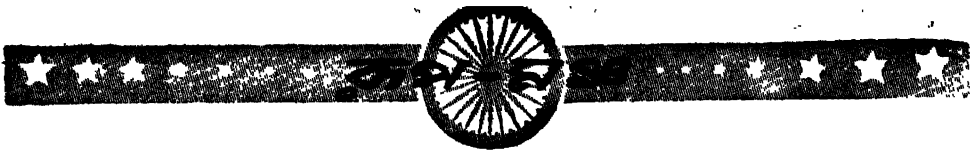
ছবি বিশ্বাস অভিনীত ও পরিচালিত

যার যেথা ঘর

চিত্রচক্র প্রযোজিত সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলী লিঃ-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য—

যার যেথা ঘর

রচনা : **নিতাই ভট্টাচার্য**

অভিনয়াংশে : **ছবি বিশ্বাস, মীরা সরকার পাহাড়ী সান্যাল, সরযূবালা, রেণুকা রায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সন্তোষ সিংহ, জীবেন বসু, কুমারী কেতকী, শ্যামলাহা, সমর মিত্র তারা হালদার, দেবী চক্রবর্তী, পান্না চক্রবর্তী কৃষ্ণকিশোর** প্রভৃতি আরো অনেকে।

সংগীত পরিচালনা—

প্রতাপ মুখোপাধ্যায় (মণ্টুবাবু)

গীতকার : **মোহিনী চৌধুরী**

শিল্প-নির্দেশনা : **বিজয় বসু**

শব্দ-যন্ত্রী : **গৌর দাস**

সম্পাদনা ও টেকনিক্যাল উপদেষ্টা

রাজেন চৌধুরী

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ—

অচিন্ত্য কুমার

ফেরা কথাবার্তা যেমন ছিল শান্ত, অন্তরের দিক থেকেও তিনি তেমনি সমাহিত ছিলেন।

তাঁর রচনা প্রসংগ আমি তুলবোনা। তা ভাল, কি মন্দ, নীরেশ কি সরেস—সে বিচার নাট্যরসিকের। আমি শুধু এই অপূর্ব মানুষটির কথা বলছি। কথা বলতেন তিনি ধীরে ধীরে, তার মধ্যে অন্যান্য অভিনেতার মতো এ্যাকটিং এর নাম গন্ধও ছিলনা। তাঁর ঘরোয়া কথা বলার মতই— ছিল তাঁর এ্যাকটিং। সহজ-সরল—স্বতঃস্ফূর্ত—চরিত্রের যাথার্থ্যে পরিপূর্ণ। যাঁরা মহানিশা দেখেছেন, যাঁরা সীতা, দিগ্বিজয়ী, বাঙলার মেয়ে দেখেছেন, তাঁরা আমার কথা বুঝতে পারবেন।

সংঘাতময় ছিল তাঁর জীবন। ভালয়-মন্দয়-ছলনায়—বিশ্বাসঘাতকতায়—তাঁকে বহুবার বহু ক্ষেত্রে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়েছে। কিন্তু তাতেও তিনি ভেঙে পড়েননি, ভগবানকে স্মরণ ক'রে আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন এ যেন ঝড়ের পাখী। কালবৈশাখীর খামখেয়ালীতে ভেঙে যাওয়া নীড়, আবার একটি একটি ক'রে কুটো সংগ্রহ ক'রে নতুন করে বাঁধবার উদ্যম। সেই হার না-মানার উদ্যম ছিল তাঁর সর্ব দেহে মনে।

আজ তিনি নেই। কিন্তু একদিন তিনি ছিলেন। সেই থাকার স্মৃতি জাতি কী ভাবে পালন করেছে? তাঁকে ভুলে গিয়ে। তাঁর অজস্র নাটকে পরিপ্লাবিত হ'য়ে আছে বাঙলার নাট্যশালা। সেই দানের মর্যাদা ষ্টেজ কী ভাবে পালন করছে? তাঁর সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না ক'রে। তিনি বেঁচে থাকতে যারা তাঁর কাছে উপকৃত হ'য়েছিল, যারা তাঁকে ঠকিয়েছিল, খোসামোদ করেছিল, প্রবঞ্চনা করেছিল, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ যারা তাঁর মস্তিষ্কের বিনিময়ে নিজের ব্যাংক-ব্যালান্স স্ফীত ক'রেছিল, সবাই আজ এক যোগে তাঁকে ভুলে বসে আছে। বিলেত হ'লে কী হতো সে কথা বলবো না, কিন্তু এদেশে হ'লে কী হয়—সেটা স্বচক্ষে দেখলাম। শ্রীভগবানের মুখ-নিঃসৃত গীতার মহৎ বাণী এদেশে সুস্পষ্টরূপ লাভ করেছে—'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' এ সোনার বাংলায় কাজ করলে ফুল পাওয়া যায়, কিন্তু ফল পাওয়া যায় না।

স্বর্গতঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যসাহিত্য পরস্পরের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তুলনা করা চলে যুক্তবেণী অর্থাৎ দুটি নদীর মিলিত ধারার সংগে। একটি ধারার প্রাণবন্যা এলে অপরটিতে তার বেগ সঞ্চারিত হয় স্বাভাবিকভাবে। রঙ্গমঞ্চে নতন প্রতিভার আবির্ভাব হলে, সে প্রতিভার স্পর্শ শুধু রঙ্গমঞ্চের কর্মীদেরই সঞ্জীবিত করে না। সে প্রতিভার স্পর্শে সুপ্ত নাট্যকার প্রতিভাও স্ফুরিত হয়। নূতন নাট্যকার আবির্ভূত হন। প্রতিভাশালী নাট্যকার যদি আগে আবির্ভূত হন, তবে তাঁর রচনাকে রূপ দেবার জন্যে অজ্ঞাত প্রতিভাশালী অভিনেতা অগ্রসর হয়ে আসেন।

বাংলাদেশের নাট্যশালা ও নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসও সেই ইতিহাস। মাইকেল-দীনবন্ধুর নাট্য প্রতিভার আবির্ভাবের ফলে বাংলায় রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি। (অবশ্য এর পশ্চাতে তৎকালীন গুণী বিদগ্ধ সমাজের একটি আন্দোলন ছিল; সে আন্দোলন নাট্যসাহিত্য রচনায় সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করেছিল এবং রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের ভূমিকা প্রস্তুত করেছিল এ কথা সত্য।) সেই রঙ্গমঞ্চে আমরা পেলাম গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফীর মত বিরাট অভিনয়-প্রতিভাকে। বাংলার রঙ্গমঞ্চে বিপুল বন্যা এল। তারই আবেগে গিরিশচন্দ্র অমৃতলালের মধ্যে নাট্যসাহিত্যের সুপ্ত প্রতিভা স্ফুরিত হ'ল; দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ আবির্ভূত হলেন।

বাংলার রঙ্গমঞ্চে আবার একটি নবযুগ এল নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আবির্ভাবের ফলে। নূতন প্রতিভা এল, নূতন নাটক চাই। নূতন গায়কের কণ্ঠে নূতন গান চাই। শিশিরকুমারের প্রতিভাকে পূর্ণ দীপ্তিতে জ্বলতে দেওয়ার জন্য ঘৃতপূর্ণ নূতন প্রদীপ চাই। এই আকর্ষণে গ্রাম্য স্কুলের একজন শিক্ষক এলেন অগ্রসর হয়ে। সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হল তাঁর মধ্যে। স্বর্গতঃ শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী শিক্ষকতা ছেড়ে হলেন নাট্যকার। শুধু নাট্যকার হয়েই তিনি নিরস্ত থাকলেন না, নটরূপে তিনি রঙ্গমঞ্চে যোগ দিয়ে স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র থেকে অপরেশচন্দ্র পর্য্যন্ত যে নট-নাট্যকারের ধারা—সেই ধারাকে অব্যাহত রাখলেন। এ দিক দিয়ে যোগেশচন্দ্রই সব শেষ ব্যক্তি। যোগেশচন্দ্রের নাট্য-প্রতিভা শিশিরকুমারের নটপ্রতিভার আশ্রয়, তাকে সূর্য্যা-লোকিত চন্দ্র দীপ্তির সংগে তুলনা করলে তাঁকে খর্ব করা হবে না। তাঁর নাটকগুলি চন্দ্ররশ্মির মতই স্নিগ্ধ ও মধুর। আর একটি বড় কথা—সেটি তাঁর নিজস্বতা। তিনি বাংলা দেশের মর্মকথা জানতেন, যেমন জানতেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র। পাশ্চাত্য প্রভাবে তাঁর রচনার রূপ ধার-করা চেহারা নিয়ে ঠোঁট ঠেকিয়ে কথা বলেনি—দেশী সাহেবের মত, বা জামা কাপড় পরা ইংরেজের মত। অথচ নূতন যুগের ভাবনা ও সমাজের উপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে অসচেতন ছিলেন না। এই কারণেই তাঁর নাটকের রূপ বাংলার স্বকীয় এবং যোগেশচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্য।

বাংলার সমাজকে গভীরভাবে তিনি জানতেন। তাঁর পরিচয় আমি পেয়েছিলাম তাঁর অভিনয়ের মধ্যে। আমার 'দুই পুরুষ' নাটকে বৃদ্ধ জমিদারের ভূমিকায় অভিনয়ে যে রূপ তিনি দিয়েছিলেন, সে রূপ দেওয়া সাক্ষাৎ গভীর পরিচয় ভিন্ন সম্ভবপর নয়। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে চরিত্রাংকনে এই গভীর পরিচয় পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে। সাহিত্যিক বিচারেও তাঁর নাটকগুলি সম্মান লাভ করেছে যথেষ্ট। 'রূপমঞ্চ' পত্রিকা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ কচ্ছেন এবং এই সংগে এই ক'টি কথা বলতে পেয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করছি।

শ্রদ্ধাঞ্জলী

অধ্যাপক অরুণ চন্দ্র সেন

যেদিন ৺যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়, সেদিন কেবলমাত্র তাঁহার সহকর্মীদিগের এই দারুণ বিনিপাতের জন্য শোক হয়—দেশের লোকের মধ্যে এই ক্ষতির জন্য কোনরূপ শোকের অভিব্যক্তি হয় নাই। অথচ তাঁহার রচিত নাটকের অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন বহু লক্ষ লোক; তাঁহার অসামান্য প্রতিভাকে বিশেষ কেহই স্বীকার করে নাই, কিংবা তাঁহার মৃত্যুতে যে বাংলার নাট্য-সাহিত্যের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও কেহই অনুভব করে নাই। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয় যে, এই ক্ষেত্রে অভিনেতা এবং প্রয়োগাচার্য তাঁহার প্রাপ্য সম্মান হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহাদের অপরাধ নহে; ইহার জন্য দায়ী আমাদের দেশের সাহিত্য সমালোচকগণ। যাঁহারা সাহিত্য সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটক সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত করেন না, যেহেতু তাঁহারা শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক। অথচ তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, অভিনীত নাটক সাহিত্যে একটি বিশেষ সম্মানিত স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং সম্ভবতঃ থাকিবে। যে নাটক রঙ্গমঞ্চে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর অভিনীত হইয়া বহু লক্ষ লোককে আনন্দ এবং শিক্ষা দান করিয়াছে, এইরূপ নাটক সম্বন্ধেও আমাদের সাহিত্য সমালোচকগণ উদাসীন। তাহার দোষগুণের বিচার হইয়া তাহার যথার্থ সাহিত্যিক মূল্য নিরূপিত হয় না। সাধারণ দর্শকের নিকট অভিনেতা এবং অভিনেত্রী বিপুল সম্বর্দনা লাভ করেন, নাট্যকার লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যান।

অথচ অভিনয় এমন একটি আর্ট নহে যাহা লেখ্য বস্তু হইতে সংগীতের মতন সম্বন্ধ মুক্ত। নাট্যকার তাঁহার ভাষা এবং কল্পিত পরিস্থিতির সাহায্যে তাঁহার নাটকীয় চরিত্রগুলিকে ফুটাইয়া তোলেন নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়া। অভিনেতা এবং অভিনেত্রী অভিনয়ের দ্বারা তাহার জাজ্জ্বল্য প্রভাব দর্শকের মনে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু যেখানে নাটকীয় পরিস্থিতিতে বিসদৃশ ঘটনার সমাবেশ থাকে এবং যেখানে নাটকীয় চরিত্রগুলি দুর্বল ভাষার দ্বারা অসংগত মনস্তত্ত্বের বিকাশ করে, সেখানে সু-অভিনয় কিংবা সুপ্রয়োজনা নাটকের বিসদৃশতা ফুটাইয়া তোলে। ভাষার দৈন্য উচ্চারিত বাচনের প্রচেষ্টাকে ধিক্কার করে। দেখা যায় এইরূপ নাটক দর্শকগণ গ্রহণ করে না। যে নাটক পঁচিশ বৎসরের উর্ধ্বকাল পর্যন্ত অভিনীত হইয়া আসিতেছে এবং প্রেক্ষাগৃহে দর্শকগণের ভিড় যাহার লোকপ্রিয়তার সাক্ষ্য দেয়, সেইরূপ নাটক সাহিত্যের দিক হইতে কখনও অবহেলার যোগ্য নয়। আমি জানি, কোন একজন খ্যাতনামা প্রয়োগাচার্য মনে করেন যে, অভিনয় এবং অভিনীত বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক আর্ট। তিনি বলেন যে, যে কোন নাটককে প্রযোজনা এবং অভিনয় এবং অভিনয়-কৌশলের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু এই মত যে ভ্রান্ত, তাহা বহুবার রঙ্গমঞ্চে প্রমাণিত হইয়াছে। যাঁহারা বাংলাদেশে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা এবং বিখ্যাত প্রয়োগাচার্য বলিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যে এইরূপ অভিজ্ঞতা বিরল নহে যে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এবং অভিনয়ের চরম কৌশল দেখাইয়া যে নাটক তাঁহারা অভিনয় করিলেন, বিজ্ঞাপনের বাহুল্য সত্ত্বেও তাহা কয়েক রাত্রির অভিনয়ের পর প্রেক্ষাগৃহের শূন্যতা তাঁহাদিগের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তাঁহাদিগের উৎসাহকে নির্বাপিত করিয়া দিয়াছে।

আমি এ কথা বলিতেছি না যে, একমাত্র প্রেক্ষাগৃহই নাটকের উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ বিচারের মানদণ্ড স্বরূপ গৃহীত হওয়া উচিত নহে। কিন্তু সমালোচক যদি নাট্য সাহিত্য বিচার করিতে গিয়া দর্শকদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার সমালোচনা উচ্চস্তরের হইলেও তাহা অবাস্তব বলিয়া বিবেচিত হইবে। কতকগুলি কারণে সাধারণ বাঙ্গালীর রুচি ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির রুচি অপেক্ষা বিভিন্ন। ভাবালুতা বাঙ্গালী চরিত্রের অস্থি মজ্জাগত। চীৎকার করিয়া 'মা' বলিয়া কাঁদিলে অধিকাংশ বাঙ্গালীর চক্ষু আর্দ্র হয়। স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে যদি তাঁহার বুকে পড়িয়া তাঁহার স্ত্রী "স্বামী" বলিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া ওঠে, তাহা হইলে সেই নাটকের সাতখুন মাপ। এই কথাগুলি

মনে করিয়া যদি যোগেশচন্দ্রের নাটকের সমালোচনা করি, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, তাঁহার তিনটি বিখ্যাত নাটক সম্পূর্ণভাবে ভাবের আতিশয্য হইতে মুক্ত। তাহা হইলে তাঁহার নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ কি?

আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে যোগেশচন্দ্রের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। আমি এইখানে ইহাই বলিতে চাহিতেছি যে, যোগেশচন্দ্রের নাটক সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে। আমি তাঁহার তিনটি নাটক যথা "সীতা", "দিগ্বিজয়ী" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়া" বাঙ্গলা সাহিত্যের তিনটি শ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া মনে করি। তাঁহার ভাষা ঐশ্বর্যমণ্ডিত—নাটকের পরিস্থিতিগুলি স্বাভাবিক অথচ চমকপ্রদ। চরিত্রগুলি মনস্তত্বের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। আমি বিবেচনা করি যে, যোগেশচন্দ্রের রচিত "দিগ্বিজয়ী" এবং "বিষ্ণুপ্রিয়া" সেক্সপীয়ার কিংবা শিলারের রচিত যে কোন ঐতিহাসিক নাটক অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। "দিগ্বিজয়ী"তে যে অতিমানবের চরিত্র প্রতিভাত হইয়াছে তাহা সর্বাংশে জুলিয়াস সীজারের চরিত্র অপেক্ষা সমধিক গৌরব সম্পন্ন। ব্রুটাস এবং সালেংবেগের চরিত্রের মধ্যে ভাবগত ঐক্য আছে, যদিও তাহা ফুটিয়াছে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন ভাবের ঘটনার পরিবেশের মধ্যে দিয়া।

"বিষ্ণুপ্রিয়ার" চৈতন্য ঐতিহাসিক চৈতন্য হইতে অভিনয়িক কারণে কিছু স্বতন্ত্র হইলেও, তাঁহার শ্রী এবং গৌরবের কোন লাঘব হয় নাই। ঐতিহাসিক চৈতন্যের মধ্যে যে ভাবের আতিশয্য এবং ঐকান্তিক ভগবদ্ প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়, তাহা রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা পরিস্ফুট করা অসম্ভব। যোগেশচন্দ্র সংযত হস্তে চৈতন্য চরিত্র অংকিত করিয়াছেন। ইহাতে নাটকের মর্যাদা সমধিক বাড়িয়াছে।

"সীতা"র ভূমণ্ডলে অতুলনীয় তুলিতে অংকিত হইয়াছে। অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া যুদ্ধের পর লবকে অযোধ্যায় আনয়ন করা নাটকীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ইহার জন্য যে বহুল পরিমাণে অভিনয়ের সাফল্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নাট্যকারই অভিনেতাকে এই সুযোগ দিয়াছেন, তাহা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

আজ ৭ বৎসর হইল যোগেশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে, কাহারও জানিবার প্রয়োজন হয়না যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের পক্ষ হইতে তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এ পর্যন্ত কি করা হইয়াছে। আমার এই মন্তব্য অবশ্য তাঁহার পূর্ববর্তীগণ সম্বন্ধেও করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী দর্শকদিগকে এই ঔদাসীন্যের জন্য যদি আমি অভিনন্দিত না করি, তাহা হইলে আশা করি কেহই আমার অপবাদ লইবেন না; বর্তমান যুগে প্রতিভার বিচার শুধু চক্ষুর দ্বারা হয়। মস্তিষ্কের দ্বারা হয় না।

স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্র

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

(লালগোলা রাজ)

সেদিন শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্রের ভ্রাতা) এসে যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে আমায় একটা লেখা দিতে বললেন। শুনে আমার দুঃখও হ'ল, লজ্জাও হ'ল। দুঃখের কারণ এই যে, স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্রের স্মৃতি রাখবার জন্য আমাদের তরফ থেকে সমবেত চেষ্টা এতদিন কিছুই করা হয়নি; আর লজ্জার কারণ এই যে, আমাদের নিজেদেরই যেটা করণীয় ছিল, সেটা তাঁকেই এসে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হ'য়েছে।

কিন্তু আমি ভাবছি কি লেখা দেব? আজকাল লেখার মারফৎ লোকের সম্মান দেখানো হয়। অন্তর জগত থেকে বাইরে এসে এই সব অনুষ্ঠান পালন করতে আমার যেন ঠিক ভাল লাগেনা; কারণ, অন্তরে যাঁকে ধরে রেখেছি, বাইরে হয়ত ঠিক তাঁকে প্রকাশ করতে পারব না।

অনেকেই তাঁর নাটকাবলী ও নটপ্রতিভার বিষয় আলোচনা করবেন—কিন্তু, আমার সংগে তাঁর ব্যক্তিগত যে টুকু সম্পর্ক গ'ড়ে উঠেছিল, সেই বিষয়েই দু' একটি কথা আমি এখানে বলব।

তাঁর সংগে আমার পরিচয় হ'য়েছিল, বহুদিন পূর্বে। আমি দুর্জয়লিংগের যাত্রী—লালগোলা থেকে কলকাতায় এসে তারপর দার্জিলিং যাব। এই ক'লকাতাতেই আমার জনৈক বন্ধুর সাথে তিনি এলেন আমার সংগে দেখা করতে। আমাদের মধ্যে অনেক নাট্যালোচনা হ'ল। কথায় কথায় আমার উপন্যাস "স্পর্শের প্রভাব" তাঁকে দিলাম—তিনি দিলেন তার নাট্যরূপ—"পতিব্রতা"। রঙমহল নাট্যমঞ্চে এই নাটকখানি বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছিল—এটা বোধ হয় সকলেই জানেন। আমি ছিলাম লালগোলায়—প্রায় দেড়মাস নাটকখানি অভিনীত হওয়ার পর যখন আমি কলকাতায় এলাম—চৌধুরী মশায়ের সংগে দেখা হ'তে তাঁকে আমি বললাম, "আপনার নাটকখানি খুব চলছে।" তিনি হেসে বল্লেন, "ছেলে আপনার, আমি পাউডার মাখিয়ে তাকে সাজিয়ে দিয়েছি মাত্র।"

আমাদের পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হোল। তাঁর একটা মজা ছিল—আলাপ আলোচনার মধ্যে, তিনি যখন হাস্য পরিহাসের কথা বলতেন, আমরা যতই হাসতাম, তিনি কিন্তু ততই গম্ভীর হ'তেন। অনেক দিনের পর দিন-রাতের পর রাত—তাঁর সংগে গল্পগুজব, হাস্য পরিহাস করেছি।

তিনি ছিলেন স্কুল মষ্টার, হ'লেন নট ও নাট্যকার। আশ্চর্য হবার কিছু নেই—সেক্‌স্‌পীয়রের দিকে তাকালেই তা বোঝা যায়। প্রতিভা কখন কার মারফৎ কি ভাবে এসে ধরা দেয়—তা ঠিক বোঝা যায় না। সেই জন্যই কবি বলেছেন—'ও যেন একটা আইডিয়া, বোঝা যায়, কিন্তু ধরা যায় না।

আরো কিছুদিন পরে তিনি এসে আমার 'অচল প্রেম' উপন্যাসখানি চেয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি এর নাট্যরূপ দিলেন, কিন্তু পরিমার্জনের পূর্বেই তাঁর কাছে পরপারের ডাক এসে গেল। হঠাৎ শুনলাম তিনি আর নেই—বর্তমান নাট্যজগতে সুদুর্লভ নাট্যকারের যুগে তাঁর তিরোধান যে বিপুল ক্ষতি ক'রেছে—তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের যোগেশচন্দ্র চিরহাস্যপুরে চ'লে গিয়েছেন। আমরা এখানে দীর্ঘশ্বাসের সেতু বন্ধ রচনা করেছি। আর বুকের মণিকোঠায় তাঁর জন্যে যে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বলছে, তারই প্রদীপ্ত প্রভায় উজ্জ্বল এই পুণ্য স্মৃতির অর্ঘ্য সেই সেতুবন্ধের উপর দিয়ে তাঁর উদ্দেশে পাঠিয়ে দিলাম।

যোগেশচন্দ্র

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থের সক্রিয় সহযোগিতায় সংগৃহীত।

২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত "চারঘাট" নামক একটি গণ্ড গ্রামে আজ হইতে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে যোগেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় বিরাজ মোহন চৌধুরী, মাতা স্বর্গীয়া বীরেশ্বরী দেবী। যোগেশচন্দ্র তাঁহার পিতার নিকট হইতেই সাহিত্য প্রতিভার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহাদের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে তাঁহার বিধবা মাতা এক কন্যা ও দুই পুত্র লইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ তাত স্বর্গীয় দৈবচরণ চৌধুরীর অভিভাবকত্বে কায়ক্লেশে তাহাদিগকে মানুষ করিতে থাকেন। যোগেশচন্দ্রের জেষ্ঠা ভগিনী স্বর্গীয়া কিরণশশী দেবী আবাল্য তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার উৎসাহদাত্রী ছিলেন। কৈশোরে তাঁহার উৎসাহ না পাইলে হয়ত যোগেশচন্দ্র ভবিষ্যত জীবনে নাট্যকার হইতে পারিতেন না। দরিদ্রের সংসারে সাহিত্য প্রতিভার কোন মর্যাদাই ছিল না। যোগেশচন্দ্রের মাতা গরীবের এই "ঘোড়া রোগ" মোটেই পছন্দ করিতেন না। ছেলে যাহাতে শীঘ্র কিছু লেখাপড়া শিখিয়া দুই পয়সা ঘরে আনিতে পারে, সেই দিকেই তাঁহার খরদৃষ্টি ছিল। যোগেশচন্দ্র যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁহার রচিত "সীতার বনবাস" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা তাঁহার জননী ক্রোধে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের ভগিনীপতির চেষ্টায় গ্রামে ইতর-ভদ্র মিলিয়া একটি যাত্রার দল গড়িয়া তুলিয়াছিল।

যোগেশচন্দ্র যখন প্রবেশিকার ছাত্র, তখন হইতেই তিনি ইহার প্রতি অনুরাগী হইয়াছিলেন। কয়েকবার এই দলে তিনি তাঁহার ভগিনীপতির আগ্রহে অতি প্রশংসিত ভাবে "জনার" চরিত্র অভিনয় করেন।

এই নাট্যাভিনয়ের পর তিনি নিজে এবং অপরে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার নাট্য প্রতিভার সহিত নট প্রতিভারও সহজাধিকার আছে। অবশ্য পূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি, এই উভয় প্রতিভাই তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার পিতা বিরাজমোহন চৌধুরী ছাত্র জীবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বাংলার তদানীন্তন খ্যাতনামা মনিষীগণের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াই তিনি "বঙ্গ বিধবা" নামক একখানি নাটিকা রচনা করিয়া বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া উহা বহরমপুরে অভিনয় করেন। বিদ্যাসাগরের নামে উৎসর্গীকৃত হইয়া এই নাটিকাখানি মুদ্রিতও হইয়াছিল। বাল্যকালে আমরা ইহার দুই চারিখানি ছিন্নপত্র বিরাজমোহনের গ্রন্থ সঞ্চয়ের মধ্যে পাইয়াছিলাম।

১৯০৮ সালে তিনি টাকী ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহা আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া অতি কষ্টে সম্ভবপর হইয়াছিল। এই মহানগরীতে আসিয়া কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত তাঁহাদের কোন আর্থিক সংগতি ছিল না। তথাপি যোগেশচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ শিক্ষানুরাগ ও অধ্যাবসায় দ্বারা নিজের চেষ্টায় কলিকাতায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া মেট্রোপলিটান কলেজে এফ, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

মহানগরীতে আসিয়া তাঁহার সেই সুপ্ত নাট্যপ্রীতি আরও জাগিয়া উঠে। তখন বাংলার রঙ্গমঞ্চ একদিকে গিরিশ-চন্দ্রের ও অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল এই দুই মহারথীর প্রতিভায় উদ্দীপিত। যোগেশচন্দ্রের নাট্যপ্রীতি তাঁহাকে ছাত্র জীবনে এই দুই মহারথীর সান্নিধ্যে আনয়ন করে। ইহাদের সহিত পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্য তিনি প্রতি রবিবারেই পড়াশুনার ক্ষতি করিয়াও তাঁহাদের সান্নিধ্যে কাটাইতেন। এজন্য গিরিশ পরিবারের সহিত তাঁহার পরবর্তী জীবনে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটে। গিরিশচন্দ্রের স্বনামধন্য পুত্র স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু) তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসরণে বাঙ্গালীর নব-জাগ্রত জাতীয়তাকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যোগেশচন্দ্র "রাজস্থান" হইতে গল্পাংশ সংগ্রহ করিয়া কয়েকখানি নাট্য
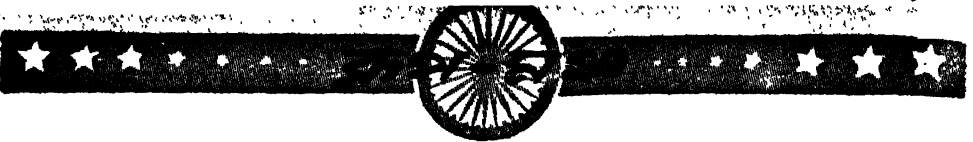
রচনা করেন। আশা ছিল তাঁহার এই রচনাগুলি দানিবাবুর প্রভাবেই বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু সে আশা তাঁহার সফল হয় নাই। এই সময় তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বর্গীয় হরিপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "দুর্গাবতী" নামক একখানি নাটক তদানীন্তন 'কোহিনূর' রঙ্গমঞ্চের কর্মাধ্যক্ষ তাঁহার মাতুলের প্রভাবেই এইখানেই উহা মঞ্চস্থ হয়; এবং অতীব প্রশংসার সহিত দীর্ঘকাল উহার অভিনয় চলে। এই সূত্রে এখনকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সহিত যোগেশচন্দ্রের বন্ধুত্ব ঘটে। পরবর্তী জীবনে আমৃত্যু এই বন্ধুত্ব অটুট ছিল। এজন্য শিশির প্রতিভার সান্নিধ্যে আসিবার পূর্বে ই ক্ষেত্রবাবুর প্রতিষ্ঠিত "Thespian Temple" থেস্‌পিয়ান টেম্পলে—তাঁহার একখানি জাতীয়তাভাবে উদ্দীপক নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তাবিত ও বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মতবিরোধের জন্য উহা অভিনীত হয় নাই।

এই সময় যোগেশচন্দ্র সাংসারিক অসচ্ছলতার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার শাখার শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। বিদ্যালয়ের বাহিরে তাহাকে গৃহশিক্ষকের কার্যও করিতে হইত. দারিদ্র্যের এই দারুণ আঘাতেও তাঁহার অসাধারণ নাট্যপ্রীতি বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই। তিনি একাদিক্রমে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাত্রি জাগিয়া নাট্য রচনা করিতেন। এই রাত্রি জাগরণের ফলে বহুদিন ধরিয়া তাঁহাকে অনিদ্রা ব্যাধিতে ভুগিতে হয়। ফলে তাঁহার সাময়িক মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়।

তখন গিরিশচন্দ্র পরলোকগত হইয়াছেন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" হইতে তাঁহার সামাজিক নাটকগুলির উপর সমালোচকমূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য স্বর্ণপদক পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।

যোগেশচন্দ্র একটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেন এবং ঐ স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ইহার পর "বসিরহাট সাহিত্য সম্মেলন" হইতে সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া যোগেশচন্দ্র পূর্ববৎ শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া একশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

এইরূপেই যোগেশচন্দ্র ছাত্র ও কর্মজীবনের স্বল্প অবকাশ কালেও নাট্য রচনা ছাড়াও সাহিত্যের নানা শাখায় নানা ফুল ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। তখনকার কোন সাময়িক পত্রিকায় হয়ত তাঁহার এই রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু যোগেশচন্দ্র কোনদিনই সঞ্চয়ী ছিলেন না বলিয়া তাঁহার টুকরা প্রবন্ধগুলি আজ আমাদের নিকট নামেমাত্র পর্যবসিত হইয়াছে।

সাহিত্য রচনার এই আকুল আগ্রহের ফলেই এই সময়ে ঠাকুর পরিবারের ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রভৃতির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। এই পরিচয় সূত্রে তাঁহাদের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বহুদিন ধরিয়া যোগেশচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই সময় যোগেশচন্দ্র তাঁহার পুরাতন কর্মক্ষেত্র "মেট্রোপলিটান স্কুল" পরিত্যাগ করিয়া কর্পোরেশন ষ্ট্রিটস্থিত—বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডে "ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমি"তে বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন।

তাঁহার অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উভয়ে দীর্ঘকাল এক কক্ষে একত্রে বাস করিয়াছিলেন। এ পর্যন্ত যদিও নাট্য জগত হইতে তিনি তাঁহার নাট্যপ্রীতির কোন অনুকূল সাড়া পান নাই, তথাপি তাঁহার নাট্য রচনার বিরাম ছিল না। এইখানে থাকিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক "নাদিরসাহ" রচনা করেন। ইহারই সূত্রে তাঁহার সহিত নটগুরু শিশিরকুমারের পরিচয় ঘটে, তাহা সবিস্তারে আমরা পরে উল্লেখ করিব। ইতিমধ্যে যোগেশচন্দ্র সন্তানের জনক হইয়াছেন। সংসারের বোঝা দিন দিন ভারি হইতেছে। একমাত্র স্কুলের শিক্ষকতায় সে বোঝা বহন করা দুঃসাধ্য ছিল। নাট্য রচনা যে তাঁহার পণ্ডশ্রম হইতেছে, সাংসারিক প্রয়োজনে যে ইহা কোন কাজেই আসিবেনা, এ ধারণা তাঁহার বদ্ধমূল হইতেছিল। এইজন্য মহানগরীর এই কায়ক্লেশের জীবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোন সুদূর পল্লীতে জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীর শান্তিময় জীবন খুঁজিতেছিলেন।
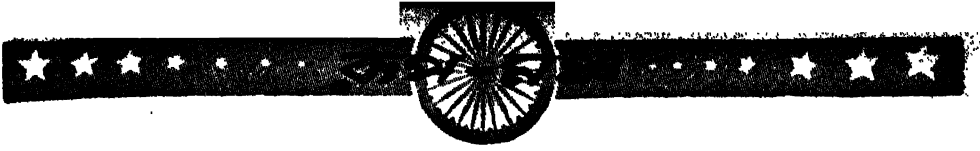
এমন সময় মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনের ভেরী বাজিয়া উঠিল। সংসারী যোগেশচন্দ্র অকস্মাৎ দুঃসাহসী বীরের মত চাকুরির পত্রচ্ছায়া পদদলিত করিয়া বৈচিত্র্যের আশায় অসহযোগী হইয়া সহর ছাড়িয়া তাঁহার জন্মভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি একদল মুসলমান কারিগরের সহায়তায় মোটা সুতার দেশী কাপড় তৈয়ারী করিতে মাতিয়া উঠিলেন।

সংসারে দারিদ্র্যের চাপ আরও গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল। বাংলা নাট্যাকাশের পূব সীমায় নটসূর্য শিশিরকুমার তখন আপনার অপূর্ব বিভায় জলস্থল আলোকিত করিয়া উদিত হইতেছেন।

ইহার পূর্ব পর্যন্ত বাংলার রঙ্গমঞ্চ সুরক্ষিত দুর্গের মত বাহিরের লোকের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য ছিল। ইহা যে কতবড় সত্য, তাহা যোগেশচন্দ্র মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গিরিশ হইতে আরম্ভ করিয়া অমৃতলাল, সুরেন্দ্রনাথ, ক্ষেত্রমোহন, চুণীলাল, নিখিলনাথ প্রভৃতির স্নেহভাজন হইলেও স্বরচিত নাটকের অভিনয় করাইতে পারেন নাই। শিশিরকুমার যখন কলেজের অধ্যাপক, তখন যোগেশচন্দ্র কোন দূর আত্মীয়ের গৃহে তাঁহার সহিত প্রথম পরিচিত হন। তাঁহাদের এই প্রথম পরিচয়ের উপর নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্বাদ অলক্ষ্যে বর্ষিত হইয়াছিল। কারণ, যোগেশচন্দ্র ও শিশিরকুমার উভয়েরই এই মিলন সার্থক ও সানন্দ হইয়াছিল। যোগেশচন্দ্র আমৃত্যু বন্ধুত্বের এই গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া গিয়াছেন। শিশিরকুমার তাঁহার মৃত্যুর পরও অদ্যাপি তাঁহার পরিবারের প্রতি সহায় হস্ত সদাই বিস্তৃত রাখিয়াছেন। শিশিরকুমার তখন ম্যাডান কোম্পানীর চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করিতে উদযুক্ত হইয়াছেন। তিনি এই সুযোগে খদ্দরের ব্যবসায়ে বিপন্ন যোগেশচন্দ্রকে তাঁহার পল্লীগৃহ হইতে আপনার পার্শ্বে আনয়ন করেন। শিশিরকুমার তখন নরেশচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র, মনোরঞ্জন প্রভৃতি তাঁহার আদিযুগের কয়েকটি বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবের সহযোগে তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর পত্তন করিয়াছেন। এখানে তিনি শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো'র নির্বাক চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। যোগেশচন্দ্রও ইহাতে দেওয়ানের ক্ষুদ্র একটি ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার নট জীবনে প্রথম পদক্ষেপ। শিশির প্রতিভার উষ্ণ স্পর্শে যোগেশচন্দ্রের সুপ্ত প্রতিভার ক্রমবিকাশ দেখাইবার স্থান এখানে নাই। তথাপি তাঁহার এই-নবজীবনের ঘটনা-পরম্পরার হিসাবে সংক্ষেপে যে টুকুই না বলিলে প্রত্যবায় ঘটিবে, এখানে কেবল সেইটুকুই উল্লেখ করিতেছি। শিশিরকুমার ইডেন গার্ডেন প্রদর্শনীতে যখন দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" লইয়া জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হন; যোগেশচন্দ্র তখন হইতে কোনো অংশ গ্রহণ না করিলেও শিশিরকুমারের সংগে সংগেই ছিলেন। ইহার পর শিশিরকুমার যখন স্থায়ীরূপে মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে সীতা বই অভিনয় করিতে মনস্থ করেন, তখন প্রতিপক্ষের বাধায় ইহা সম্ভবপর হয় না। এই সময় যোগেশচন্দ্র শিশিরকুমারের অনুরোধে মাত্র সাতদিনের মধ্যে সীতা নাটক নতুন করিয়া রচনা করেন। এই নাটকেই তিনি সর্বসাধারণের নিকট নাট্যকার রূপে পরিচিত হন। এই নাটকখানি যোগেশচন্দ্র ৫৫নং অপার চিৎপুর রোডে আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বিতল কক্ষে বসিয়া রচনা করেন। এখানে তিনি তাঁহার অনুজের সহিত একত্রে বাস করিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী হিসাবে ইতিমধ্যে তিনি ঠাকুর পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। ঠাকুর পরিবারের জামাতা সুসাহিত্যিক ৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় শিশির গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের আনুকূল্যে এই আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস হইতে যোগেশচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ওয়ার্ডস ওয়ার্থের বঙ্গানুবাদ নামক কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেদিন যোগেশচন্দ্রের এই সীতাকেই কেন্দ্র করিয়া শিশির প্রতিভার অপূর্ব দ্যুতি বাংলার দিকদিগন্তে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। যোগেশচন্দ্রের সীতাকে কেবল মাত্র শিশির প্রতিভার বিকাশস্থল বলিলে বোধ হয় সবটুকু বলা হয় না। বরং ইহা সে যুগের শিশির গোষ্ঠীর যৌথ প্রতিভার আশ্রয় স্থল হইয়াছিল বলিলে কিছু অত্যুক্তি হয় না। দ্বিজেন্দ্র প্রতিভার ভিত্তি ভূমিতে যোগেশচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ, হেমেন্দ্র কুমারের সংগীত, কৃষ্ণচন্দ্রের গান, ৺গুরু-

দাস চট্টোপাধ্যায়ের সুর—মণিলালের নৃত্য, শিশিরকুমারের অভিনয়—একই সংগে এই সীতায় যুগপৎ স্ফূর্ত হইয়া রঙ্গ ভারতীকে রূপে, রসে, ভাবে, ভংগীতে অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। এজন্য বাংলার সুদূর পল্লী হইতে দলে দলে অবিরাম দর্শক শ্রেণী 'সীতার' অভিনয়ে শিশির সম্প্রদায়ের অপূর্ব প্রতিভালীলা দর্শন করিবার জন্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়াও কলিকাতা মহানগরীতে আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরী পর্যন্ত ইহার স্নিগ্ধলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গভাষার তথা ভারতীয় অপর কোন নাটকে এমন "মণি-কাঞ্চন" সংযোগ ঘটে নাই। নাটকখানি আপনার অভাবনীয় চরিত্র গৌরবে যেমন জন সাধারণের অপূর্ব প্রীতি-স্থান হইয়াছিল, তেমনই একদল রক্ষণশীল পণ্ডিত সমাজের এমনই বিরাগভাজন হইয়াছিল যে, তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে রাজকীয় শাসন বিধি প্রবর্তনের প্রাণপণ প্রয়াস করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। নাটকখানি বহুজনের নিন্দা ও প্রশংসায় ভূষিত হইয়া এ পর্যন্ত বঙ্গ পল্লীতে দূর দূরান্তরে অগ্নি স্ফুলিংগের ন্যায় হাজারে হাজারে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অতঃপর শিশির-যোগেশ প্রতিভার দ্বিতীয় পর্যায় 'দিগ্বিজয়ী'—ইহা যোগেশচন্দ্রের পূর্বলিখিত নাদিরশাহের নবপর্যায়। এই নাটকখানি তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে একত্রে যখন ওরিয়েন্টাল ট্রেনিং একাডেমীর শিক্ষাভবনে বাস করিতেছিলেন, তখনই ইহা রচনা করিয়াছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বলেন, যোগেশচন্দ্র একদিনে এক একটি দৃশ্য রাত্রি জাগিয়া লিখিতেন। এবং তাঁহার শয্যাসংগী বন্ধুটিকে অকালে জগাইয়া না শুনাইলে তিনি খুসী হইতেন না। এইরূপে নাটকখানি সীতার বহু পূর্বেই যোগেশচন্দ্রের শিক্ষকতা জীবনে রচিত।

শিশিরকুমার যখন মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক, তখন উভয়ের কোন বন্ধুগৃহে যোগেশচন্দ্রের এই নাটকখানি, যোগেশচন্দ্রের নিজের মুখেই তিনি শুনিয়াছিলেন। ইহার ফলে শিশিরকুমারের গুণগ্রাহী শিল্পীহৃদয় নাটকখানির মধ্য-স্থলের যোগেশচন্দ্রকে নিজের মধ্যে তাঁহার নটজীবনের বন্ধু করিয়া লইয়াছিলেন।

১৯২৭ সালের বড় দিন। কংগ্রেসে তখন গান্ধী যুগ চলিতেছে। সেবার কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন। পার্ক সার্কাসের নবনির্বাচিত সুবিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডে তাহার সাড়ম্বর আয়োজন চলিতেছে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সেবার নির্বাচিত সভাপতি। আজিকার জগদ্বিখ্যাত নেতাজী তখন বাংলার সুভাষচন্দ্র—তাঁহার প্রতিভার আলো ক্রমশঃ দীপ্ত হইতে দীপ্ততর করিয়া ধীরে ধীরে জ্বলিতেছেন।

কংগ্রেসের অধীনে জাতীয় সৈন্যদল গড়িয়া তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর। কংগ্রেসের মহামান্য সভাপতিকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের দিগদিগন্ত হইতে এই মহানগরীর বক্ষে সেদিন দেশভক্ত মহামনীষীগণের দলে দলে মহা সমাবেশ। এমনই এক ভারতব্যাপী দেশভক্তির মাহেন্দ্রক্ষণে নাট্য-মন্দিরে মঞ্চ প্রদীপে মহানাটক দিগ্বিজয়ীর মহা আবির্ভাব। দিবসে পার্কসার্কাসের কংগ্রেস নগরীতে দেশপ্রীতির জীবন্ত প্রবাহ আর রাত্রিতে মঞ্চ প্রদীপে শিশির প্রতিভালোকে তাহারই রসমূর্তি নগরীরে যেন মুগ্ধ করিয়া তুলিল। বাংলার উন্মাদ মাতৃভক্তি সেদিন সুভাষচন্দ্রের ও শিশিরকুমারের মধ্য দিয়া ভারতের শ্রেষ্ঠ তৃপ্তির হেতু হইয়া উঠিয়াছিল। আজ মহারাষ্ট্রের—আজ গুজরাটের—আজ সমগ্র দেশের কংগ্রেস মহারথীগণ শিশিরকুমারের দিগ্বিজয়ীর দর্শন করিয়া বঙ্গ রংগমঞ্চের প্রেক্ষাগারকে ধন্য করিলেন—এরূপ সংবাদ তখনকার দৈনিক পত্রে দৃষ্টিগোচর হইত।

আগামী দুই বৎসর শিশির সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বৎসর। আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরী হইতে আহূত হইয়া সদলবলে শিশিরকুমার তথায় যাত্রা করেন। তিনি সর্বপ্রথম একাকী অভিনেত্রীদিগকে লইয়া বম্বে করাচী হইয়া জাহাজে ওঠেন। অবশিষ্ট অভিনেতারা খিদিরপুরের ডকেই জাহাজ ধরিয়া একেবারে সোজা আমেরিকা যাত্রা করেন। দ্বিতীয় দলের সহযাত্রী ছিলেন যোগেশচন্দ্র। বাংলা তথা ভারতের নাট্যশালার জীবনে এই

ঘটনাটি একান্তই অভূতপূর্ব। ইহার পূর্বে আর কখনও এদেশীয় অভিনেতৃগণের বিদেশে এরূপ অভিনয় চাতুর্য দেখাইবার সুযোগ ঘটে নাই। যোগেশচন্দ্র একাধারে নট-নাট্যকার বলিয়া উভয়তঃ গৌরবের অধিকারী হন। এইখানে বাংলা ভাষায় সীতা যে গৌরবের সহিত অভিনীত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। ইহার দুই বৎসর পরে আমেরিকা প্রত্যাগত শিশিরকুমারের নাট্য প্রতিভা যোগেশচন্দ্রের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় "বাঙালীর হিয়া অমিয় মাথিয়া" নিমায়ে "ধরিল কায়া"। প্রেম ভক্তিকে কেন্দ্র করিয়া চারিশত বৎসরের বাংলার যে অন্তর্গূঢ় অপূর্ব বেদনা তাহাই এই নাটকে, আধুনিকতার শিল্প সাহায্যে নবপ্রতিষ্ঠিত রঙ্‌মহল রংগমঞ্চে প্রথম অভিনীত হয়। এই নাটকেই প্রখ্যাতনামা সতু সেন তাঁহার আমেরিকা মঞ্চশিল্পের অপূর্ব অভিজ্ঞতা প্রথমে প্রয়োগ করেন। ইহার পর পূর্ণ পরিণতির আকর্ষণে যুক্তধারার মুক্তধারায় প্রবাহিত হওয়ার ন্যায় শিশির-যোগেশ নাট্যপ্রতিভাও দুই পৃথক ধারায় বইতে আরম্ভ করিল।

এবারে তাঁহার নাট্য রূপান্তরিত "মহানিশা", "পতিব্রতা", "বাংলার মেয়ে", "পথের সাথী", "চরিত্রহীন" প্রভৃতি অপূর্ব সামাজিক নাটকগুলি বর্তমান বাংলার মর্মস্থলকে উদ্ঘাটিত করিয়া একে একে ধারাবাহিক ভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া এক অপূর্ব রসের বন্যা বহাইয়াছিল। এইগুলিতে তাঁহার অভিনয় ধারাও স্বপ্রতিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র হইয়া এক অভিনব মূর্তি গ্রহণ করিল। এখানে প্রসংগতঃ যোগেশচন্দ্রের উপন্যাস হইতে নাট্য রূপান্তরিত সামাজিক নাটকগুলির গোড়ার কথা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চাই।

ইহা অবশ্য অকপটে স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইংরাজী সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে আসিয়া নবীন বঙ্গ সাহিত্যের যেমন সেই আদি যুগেই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমের হস্তে উপন্যাসের ক্ষেত্রে সোনা ফলিয়াছে—তেমন নাট্য-সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটে নাই। এজন্য নাট্যশালার হাতীর খোরাক জোগাইবার অপরিহার্য প্রয়োজনে সেই প্রাথমিক যুগের অমর দত্ত, অমৃতলাল প্রভৃতি একাজে দীর্ঘকাল ধরিয়া হাত পাকাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনঃ সংযোগের সহিত পরীক্ষা করিলেই সে যুগের নাট্যরূপের সহিত এ যুগের নাট্যরূপের বিশেষতঃ যোগেশচন্দ্রের নাট্যরূপের "আকাশ জমিন ফারাক" অতি সহজেই চোখে পড়িবে। যোগেশচন্দ্র যে কৌশলী যাদুকরের মত তাঁহার বনমানুষের হাড় ছোয়াইয়া এক মুঠা ধূলা সোনায় পরিণত করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক যেমন আপন পরীক্ষাগারে বসিয়া বহু কাঁচা মালকে স্বীয় গবেষণার আলোকে রূপে, রসে, গন্ধে, গৌরবে অভিনব করিয়া পৃথকভাবে সৃষ্টি করিয়া তুলেন, যোগেশচন্দ্রও সেইরূপ উপন্যাসের কয়েকটি গতানুগতিক চরিত্রকে আপন কবি মনের মণিকোঠায় অন্তরের জারক রসে জীর্ণ করিয়া অভিনব ভাব, ভাষা ও ভংগীতে আপন অতুলনীয় সংলাপ সংযোজনায় প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করিয়া আমাদের সম্মুখে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। অবশেষে তাঁহার এই নাট্য রূপদান সম্বন্ধে একটি বিশেষ ব্যাপার কথা না বলিয়া থামিতে পারিতেছি না। এগুলিতে যেমন তিনি যশলাভ পাইয়াছিলেন, দুঃখও তিনি কম পান নাই।

এ সম্বন্ধে শ্রীঅনুরূপা দেবীর পথের সাথীর নাট্যরূপের "নিবেদনে" যোগেশচন্দ্র যে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠকবর্গকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখানে উহারই অংশ বিশেষে যোগেশচন্দ্র যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা নিম্নে পাঠকসাধারণকে উপহার দিলাম। "যাঁর উপন্যাস তিনি মনে করেন, তাঁর প্রতি অবিচার হইল। যিনি নাটক রচনা করেন, তিনি ভাবেন আমি নূতন চরিত্র সৃষ্টি করিলাম তবে সামান্য গল্পাংশের জন্য উপন্যাস রচয়িতার দ্বারস্থ হই কেন। আমি যে সকল উপন্যাস হইতে নাট্যরচনা করিয়াছি, সেই উপন্যাস ও আমার নাটক যাহারা মিলাইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার মধ্যে কেহ কেহ উক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন। আমিও মাঝে মাঝে ভাবি, আমার এ বিড়ম্বনা কেন? "পর কৈনু আপন, আমি আপন কৈনু পর।" পূর্বে ছিলাম নাট্যকার, এখন নাট্যরূপ দাতা।

তাঁহাকে এ দুর্ভোগ আরও ভূগিতে হইয়াছিল। ইহার পর তাঁহাকে শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীনের" নাট্যরূপ দিতে হইয়া-

ছিল। কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ ভার অন্যের উপর দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের এই সংকল্প শরৎচন্দ্রের শ্রুতি-গোচর হইলে তিনি ইহাতে আপত্তি জানান। শরৎচন্দ্র বলেন, "যোগেশ যদি নাট্যরূপ দেয়, তবেই আমি বইখানি দিতে প্রস্তুত আছি।" যোগেশচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে অগ্রজের মত শ্রদ্ধা করিতেন। এজন্য তাঁহার এই ইচ্ছাকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর বঙ্কপ্রীতির অনুরোধে তাঁহাকে আরও দুইবার এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছিল। রাজা ধীরেন্দ্রনারায়ণের "অচল প্রেম" ও কালীপ্রসন্ন দাসের "ঘাত প্রতিঘাত" এই দুইটির নাট্যরূপও তাঁহাকে দিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রয়োগদোষে কালিকা রংগমঞ্চে 'অচল প্রেমের' জীবন্ত সমাধি রচিত হয়। ঘাত-প্রতিঘাতের নাট্যরূপ তাঁহার মৃত্যুর প্রায় একসপ্তাহ পূর্বে সমাপ্ত হয়। সমাপনান্তে পাণ্ডুলিপিখানি তিনি নাট্যভারতীর কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশিশিরকুমার মল্লিক মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি ইহা তাঁহারই নিকটে রহিয়া গিয়াছে।
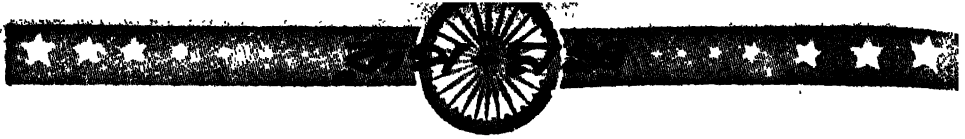
উপন্যাসের এই নাট্যরূপ ছাড়াও যোগেশচন্দ্রের "মাকড়সার জাল", "নন্দরাণীর সংসার", "মহামায়ার চর" "পরিণীতা" ইত্যাদি কয়েকখানি মৌলিক সামাজিক নাটকও রচিত ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রংগালয়ে প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। এবং মাকড়সার জাল ব্যতীত তিনি অপর-গুলিতে প্রায় বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া যোগেশ চন্দ্র "মীরাবাঈ", "নিমাই সন্ন্যাস", "প্রতাপাদিত্য", "তুলসী দাস", "ফুল্লরা", "কৃষ্ণ সুদামা", "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া", "বিরহ মিলন" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রামোফোনের নাটিকাও রচনা করিয়া গিয়াছেন। মীরাবাঈ ও নিমাই সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাঁহারা ভিতরের খবর রাখিতেন তাঁহাদের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মুখে আমরা শুনিয়াছি যে, পালাটি সর্বাংশে এমনই সুন্দর হইয়াছিল যে, কোম্পানী অল্প কয়েক বৎসরেই সারা বাংলায় লক্ষাধিক মত বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়াছিলেন। উপসংহারে যোগেশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটক "রাবণ" সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলার প্রয়োজন।

"মহানিশা" "পতিব্রতা" প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ সাফল্যের সহিত অভিনীত হওয়ার পর রঙ্গমহল রঙ্গমঞ্চে তাঁহার রাবণ অভিনীত হয়। কিন্তু নানা কারণে ইহার মঞ্চ প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। এ জন্য জনসাধারণের দরবারে ইহার যথার্থ গুণাগুণের পরীক্ষা বাধা পায়। নাটক প্রয়োগ বিজ্ঞান, অপর সাহিত্য কৃত্যের ন্যায় তাহা পাঠকের ব্যক্তিগত উপভোগের বিষয় নহে। উহার সাফল্য নাট্যকার, অভি-নেতা, অভিনেত্রী, মঞ্চ শিল্পী, নৃত্য শিল্পী, সুর শিল্পী, প্রভৃতির সমবায় কৃত্যের উপর নির্ভর করে। একটি মাত্র উপকরণের অপপ্রয়োগে যেমন কোন ব্যঞ্জনের সকল সুস্বাদ নষ্ট হইতে পারে, তদ্রূপ নাট্যকার হইতে সুরশিল্পী পর্যন্ত কোন শিল্পীর ব্যর্থতায় সমগ্র নাটকখানির প্রয়োগ ব্যর্থ হইতে পারে। যোগেশচন্দ্রের এই রাবণ নাটকখানির ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। এজন্য নাটকখানির অসাধারণ লিপিকৌশল ও চরিত্র গৌরব সত্ত্বেও উহা নষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, আমরা যোগেশচন্দ্রের মুখেই শুনিয়াছিলাম যে, সীতার রাম, দিগ্বীজয়ীর নাদিরসাহের ন্যায় রাবণের রাবণও তিনি শিশিরকুমারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন। এবং ইহা যখন তিনি শিশিরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তখনই রচিত হইয়াছিল। তাই এক শিশির কুমারের অভাবেই উদ্বোধন রজনী হইতেই নাটকখানির নাভিশ্বাস উঠিয়াছিল। আমাদের এখনও বিশ্বাস আছে যে, এখনও যদি ইহা শিশির প্রতিভায় উদ্দীপিত হয়, তবে "সীতা" ও "দিগ্বিজয়ীর" সাফল্যের অপরূপ সাফল্যে ইহা নিঃসংশয়ে সর্বজন পূজিত হইবে। পাঠকদিগের মধ্যে যদি কেহ ইহা একবার আদ্যোপান্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, তবে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবেন যে, মহাকবি মাইকেল যেমন মেঘনাদ বধ কাব্যে গতানুগতিক মেঘনাদকে একটি নতুন খাতে বহাইয়া মহিমময় করিয়া তুলিয়াছেন, যোগেশচন্দ্রও তেমনই গতানুগতিক উদ্ধত প্রকৃতির রাবণকে একজন যথার্থ ভক্ত ভাবুকে পরিণত করিয়াছেন।

এ পর্যন্ত যোগেশচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে তিনি কিরূপে সামান্য শিক্ষক হইতে একজন প্রতিষ্ঠ নাট্যকার হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার কতকটা
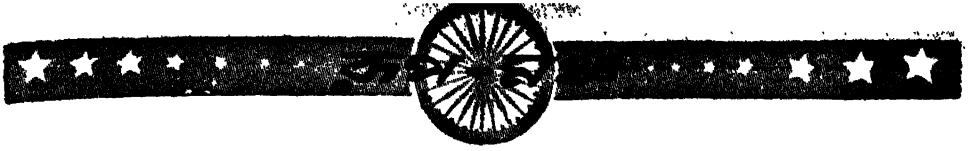
বাস্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তিনি তো কেবল নাট্যকার নহেন, নট বটেন। এ পর্যন্ত আমরা কোথাও তাঁহার নট জীবনের উল্লেখ করি নাই। আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা মত এ সম্বন্ধে অল্প দুই চারি কথা এখানে উল্লেখ না করিলে যোগেশচন্দ্রের এই ক্ষুদ্র জীবনীর কথাও অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অবশ্য তিনি যে কয়েকটি ছায়াচিত্রে অভিনয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও জনসাধারণের চোখের সামনে রহিয়াছে। তাহা হইতেই তাঁহার অভিনয়-রীতির কতকটা পরিচয় পাইতে পারেন। কিন্তু ইহাই সব নয়। ইহা ব্যতীত তিনি নিজের ও অপরের বহু বিখ্যাত নাটকে নানা ভূমিকায় বহুবার অবতীর্ণ হইয়া দর্শকসাধারণকে পরম তৃপ্তি দিয়া গিয়াছেন। যোগেশচন্দ্রের তিরোধান খুব অধিক দিন ঘটে নাই। এখনও রসিক সমাজে এমন লোক অনেকে আছেন, যাঁহারা যোগেশচন্দ্রের নাট্যরস স্বয়ং পান করিয়া তাঁহার সুখস্মৃতিকে এখনও ভোলেন নাই। মহানিশায়—রাধিকাপ্রসন্ন, পথের সাথীর—জমিদার বসন্ত সেন, বাংলার মেয়ের—উপেন্দ্রনাথ, পরিণীতার—শ্রীপতি, মহামায়ার চরের মৃত্যুঞ্জয় এ সকল চরিত্র এখনও জনসাধারণের হৃদয়ে জাগ্রত আছে। যোগেশচন্দ্র শৈশব হইতেই অভিনয় পাগল ছিলেন। অভিনয় দেখা ও অভিনয় করা দুইই সমান প্রিয় ছিল। শৈশবে যখন পল্লীঅঞ্চলে বাস করিতেন, তখন "মনসার ভাসানে" গ্রাম্য অভিনেতার অভিনয় দেখিতে তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। দূরে কোথাও যাত্রা হইতেছে সংবাদ পাইলে, তাঁহাকে গৃহে আটকাইয়া রাখা কঠিন হইত। আবার বড় হইয়া যখন কলিকাতায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিলেন, তখন রঙ্গালয়ের কোনো বিশেষ রজনী ফাঁক যাইত না। আজ বিশেষ নাটকে গিরিশচন্দ্র বা অমৃতলাল কোনো বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেছেন জানিতে পারিলে, তাহা দেখিবার জন্য অতীব ব্যগ্র হইতেন। এইরূপে অভিনয় দেখিতে যেমন ব্যগ্রতার পরিচয় পাই, সেইরূপ স্বয়ং অভিনয় করিতে কম ব্যগ্রতার পরিচয় দেন নাই। ঠিক এই কারণেই তিনি বালক হইয়াও তাঁহার ভগিনীপতির সখের যাত্রার দলে "জনা", "বিজয়া" প্রভৃতি স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার বাসগ্রামের চারিপাশে সাত আট মাইলের মধ্যে কোথাও সখের থিয়েটারের দল গড়িয়া উঠিলে সেখানে তাঁহার ডাক পড়িত। কলিকাতায় আসিয়াও এই স্বভাবের জন্য তাঁহাকে অনেক জায়গায় বেগার খাটিতে হইয়াছে।

এইরূপে আপনার অজ্ঞাতসারে গ্রাম্য অভিনেতা হইতে আরম্ভ করিয়া মহানগরীর অভিনেতা পর্যন্ত তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় প্রতিভার উপর আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।

ইহার পর বিধাতার অমোঘ বিধানে যখন শিশিরকুমারের সহিত তাঁহার আকস্মিক ভাবে যোগাযোগ ঘটিল, তখন ঐ সকলের উপর শিশিরকুমারের প্রভাবই অধিকতর বড় হইয়া দেখা দিল। কিন্তু প্রভাব প্রভাবই, তাহা ক্ষণিকের, উহা কোন মৌলিক পরিবর্তন আনিতে পারে না। যোগেশচন্দ্রের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। নিজের অথবা অন্যের সামাজিক নাটকগুলির ভূমিকাভিনয়কালে তিনি ধীরে ধীরে শিশির প্রভাব অতিক্রম পূর্বক আপন অন্তর্নিহিত এক বিশিষ্ট অভিনয় ভংগীর সন্ধান পাইলেন। এজন্য আমরা দেখিতে পাই সীতার শম্বুকের ও দিগ্বীজয়ীর আলি আকবরের তিনি যে অভিনয় ভংগীর আশ্রয় লইয়াছেন, শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অদ্বৈতাচার্যে তাহা ধীরে ধীরে বদলাইতে সুরু করিল। বিল্বমঙ্গলের সাধকে ও রমার গোবিন্দ গাঙ্গুলীতে তাহা আরও সুব্যক্ত হইয়া উঠিল। এবং শেষ পর্যন্ত মহানিশার রাধিকাপ্রসন্নে আসিয়া উহা বহুমুখী প্রোজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় আপনার চতুর্দিকে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব লাবণ্য মণ্ডিত শুভ্র ও শান্ত জ্যোতিপ্রবাহ বিকিরণ করিয়া আপনার বৈশিষ্ট্যে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অভিনব অভিনয় ভংগীর আবিষ্কার আমৃত্যু তিনি ইহাকে বন্ধুভাবে গাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এই জাতীয় অভিনয় ভংগীকে তিনি চরিত্রাভিনয় আখ্যা দিতেন। নদীর গতিপথের ন্যায় অভিনেয় নাটকের মধ্যে একটি একটি চরিত্র ঋজু কুটিল নানা ভংগীমায় এক মহাপরিণতির অভিমুখে অশ্রান্ত ধারায় বহিয়া যায়। ইহার মতি, গতি ও গৌরব একই ছন্দের মাপ কাটিতে বাঁধা। তাই সর্বত্র সেই সামঞ্জস্যের একই

সুর ধ্বনিত হইতে থাকে। যোগেশচন্দ্র স্থান ও কালভেদে যে সকল বিভিন্ন নাটকের বিশেষ বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহারই একটি তালিকা রচনা করিয়া দিলাম।

আলমগীর—রামসিংহ; তপতী—দেবদত্ত; সাজাহান—দিলদার, সুজা; বিল্বমঙ্গলে—সাধক; বমা—গোবিন্দ গাঙ্গুলী, বেণী; সধবার একাদশী—ঘটিরাম ডেপুটী। বলিদান—রূপচাঁদ, করুণাময়; প্রফুল্ল—যোগেশ, মদন ঘোষ; চন্দ্রগুপ্ত—কাত্যায়ন, বাচাল; ষোড়শী—এককড়ি, জনার্দন; মহামায়ার চর—মৃত্যুঞ্জয়; নন্দরাণীর সংসার—পরেশ চৌধুরী, মহিমারঞ্জন। প্রতাপাদিত্য—বিক্রমাদিত্য, বসন্ত রায়; মহানিশা—রাধিকাপ্রসন্ন; পরিণীতা—শ্রীপতি; মুক্তির উপায়—ফকিরচাঁদ; সীতা—শম্বুক, বাল্মীকি; চন্দ্রশেখর—চন্দ্রশেখর, শ্রীনাথ; দুই-পুরুষ—শিবনারায়ণ; বাংলার মেয়ে—উপেন্দ্রনাথ; পথের সাথী—বসন্ত সেন; মানময়ী গার্লস স্কুল—দামোদর; চরিত্রহীন—শিবপ্রসাদ; দিগ্বিজয়ী—আলি আকবর; পথের শেষে—দুর্গাশংকর, মেঘমুক্তি—প্রোঃ ঘোষ; মাটির ঘর—সত্যপ্রসন্ন।

এক সময়ে কিছু কালের জন্য বাংলার নাট্যশালার জীবনে গভীর অন্ধকার নামিয়া আসে। ইহা সম্ভবতঃ জনসাধারণের জীবনে প্রীতিরসে নিত্য বর্ধমান ছায়াচিত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় বঙ্গ রঙ্গালয়ের প্রথম পরাজয় কালিমা। স্বল্পমূল্যে ও স্বল্প সময়ে লোকে সিনেমা দেখিয়া যে আনন্দ পায়, রঙ্গালয়ে তাহা সম্ভব হয় না। এজন্য এ সময়ে যোগেশচন্দ্র তাহার পরিকল্পনায় রঙ্গালয়কে একটি নতুন ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে চাহিয়াছিলেন। সেদিন থিয়েটারের ব্যয় বাহুল্যই তাহার অকাল বার্ধক্যের অন্যতম হেতু হইয়াছিল বলিয়া, যোগেশচন্দ্র সমবায় পদ্ধতিতে থিয়েটারের আর্থিক জীবনের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মপদ্ধতির ছক আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের মনে পড়ে তখনকার দিনে অধিকাংশ রঙ্গালয়ই উচ্চহারে বাড়ী ভাড়া যোগাইতে লাল বাতি জ্বালিত। এজন্য বাড়ীওয়ালাদের এ অত্যাচার দূর করিতে যোগেশচন্দ্রের পরিকল্পনার কোন এক ধারায় নগরীর রাজপথের পার্শ্বের পতিত কোন ভূখণ্ডে করগেট টিন ও এসবেসটার প্রভৃতি তখনকার কালে স্বল্প মূল্যের উপকরণে অনাড়ম্বর শিল্প সৌন্দর্যে অলংকৃত নবতম রঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব ছিল। আমাদের দেশের সনাতন রক্ষণশীলতা যোগেশচন্দ্রের এই পথ নির্দেশ গ্রহণ করেন নাই। সোৎসাহী সরলচিত্ত যোগেশচন্দ্র অতশত না বুঝিয়া সকলকে এই যুগ আহ্বান জানাইয়া রঙ্গালয়ের এই মহানিশা অবসানে স্বয়ং সর্বাগ্রে অগ্রসর হইয়া পড়েন। ইহার ফলে গৃহধর্মী যোগেশচন্দ্রকে আর্থিক জীবনে অতি প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। এমনকি ইহার পরিণামে তাঁহার কিছুকালের জন্য মতিভ্রম পর্যন্ত হইয়াছিল।

এই সময় তাঁহার আর এক অভিন্ন হৃদয় বন্ধু রেখাশিল্পী যামিনী রায় তাঁহার নিত্য সংগী ছিলেন। এ সময় লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শৈলজানন্দ যোগেশচন্দ্রকে আহ্বান করিয়া তাঁহার নিজগৃহে ভূমিকা গ্রহণে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইহার পর আর্থিক জীবনের এই দারুণ বিপর্যয় কাটাইয়া যোগেশচন্দ্র আর একবার তাঁহার প্রাক্তভাব পূর্বরূপ ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন।

তাজমহল ফিল্ম কোম্পানীর আমলে শিশির সম্প্রদায় কোন অজ্ঞাত কারণে ছায়া শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়া "কায়া" শিল্পেরই একান্ত ভক্ত হইয়া উঠেন। বিদেশ হইতে নবাগত এই শিল্পকে তাঁহারা রঙ্গালয়ের কতকটা প্রতিপক্ষরূপে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উদাসীনভাবে উহাকে পাশ কাটাইয়া চলিতে চাহিলেন। ভাবিলেন, তাঁহাদের এই নীরব উপেক্ষায় উহা বুঝি দিনে দিনে শুকাইয়া ক্ষীণ হইয়া মরিয়া যাইবে, কিন্তু বাস্তবে ঘটিল অন্যরূপ—উহা নানাকারণে দিনে দিনে নাট্যশালার ক্ষীয়মান ধারার পাশে পাশে আপনার প্রাণবেগে নূতন পথ কাটিয়া বন্যাধারার মত ফুলিয়া ফাঁপিয়া প্রাণের আনন্দে দুইকূল মুখরিত করিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিল। ফলে নাট্যশালার নৈকট্যহীন একদল নূতন অভিযাত্রী এই আগন্তুক শিল্পের পতাকাবাহী বাহিনী হইয়া দেখা দিলেন। তখন তাঁহা-

মহলের পুরাতন দল হয়ত গোপনে বসিয়া মনে মনে ক্ষোভ করিতে ছিলেন যে—

:"বিদায় দিয়াছি বলে নয়ন জলে
এখন ফিরাব তারে কিসের ছলে"

ইহা অবশ্য খুবই সত্য যে, অতি অল্পকালের মধ্যেই এই আগন্তুক শিল্পের এরূপ দ্রুত প্রসার লাভ ঘটিয়াছে যে, আমাদের মতন সাধারণ লোকের ইহা কল্পনাতীত ছিল। শিশির সম্প্রদায়ের যদি ভবিষ্যৎ দৃষ্টি থাকিত, তবে যন্ত্রবাহন এই শিল্পদেবীর পূজার সবটুকু প্রসাদ, ইহার গৌরব ও বৈভব—তাঁহাদের ভাগ্যেই পড়িত। যাহা হউক, ঠেকিয়া শিখিয়া ইহারা পরে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন—"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যাজতিঃ পণ্ডিতঃ"। আজ ষ্টুডিও হইতে নাট্যশালা আর দূরবর্ত্তী নহে। একের সহিত অন্যের আর সেই খাদ্য খাদক সম্বন্ধ নাই। এখন উভয়ের মধ্যে প্রীতির সেতু রচিত হইয়াছে।

যোগেশচন্দ্র ও শিশির গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া উপরোক্ত দুর্ভোগ তাঁহাকেও ভুগিতে হইয়াছে। কেবল একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে এই যন্ত্র বাহন দেবীর পূজার পৌরিহিত্যে আড়ালে অন্তরালে তাঁহার ডাক পড়িত। এইরূপে কেবল অভিনেতা হিসাবে নহে—পরিচালকরূপেও তাঁহার আহ্বান ছিল। ছায়াশিল্পের সেই মান্ধাতার আমলে 'কাজল রেখা' নামক একখানি নির্বাক চিত্রে তিনি সব্যসাচীর ন্যায় কাহিনী, সংলাপ ও সম্পাদনার ভার লইয়াছিলেন। যাহা হউক জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে আসিয়া ইহার সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। এই শিল্পের একান্ত অনুরাগী একদল তরুণ ভক্ত কিরূপে যেন এই আত্মভোলা যোগেশচন্দ্রকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহারা স্বেচ্ছায় ইহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া এই নতুন পথে সোৎসাহে যাত্রা আরম্ভ করেন। যোগেশচন্দ্রের শিল্পমন এই মণিকাঞ্চন সংযোগে পরম আপ্যায়িত হইয়া উঠে। কিন্তু ইহা যেন দীপ নিভিবার আগে শেষ ঔজ্জ্বল্য। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অকালে হারাইয়া তাঁহার মর্ম্মস্থলে ঘুন ধরিয়াছিল। তাহার উপর অন্তিম আঘাত হানিল তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতার আকস্মিক প্রয়াণ। তিনি জীবনে বড় কম আঘাত পান নাই। পিতা, মাতা, ভগিনী, প্রথমা পত্নী প্রভৃতি অনেকেই তাঁহাকে অনেক আঘাত দিয়াছেন। সবই তিনি মুখ বুজিয়া নীরবে সহ্য করিয়াছেন। এ দু'টিকেও তেমনি মুখ বুজিয়া নীরবে সহ্য করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার মনে যাহা পারিল তাঁহার দেহ তাহা পারিল না। অন্তর্গূঢ় হৃদয় বেদনা তুষাগ্নির ন্যায় তাঁহার মর্ম্মস্থলকে নীরবে দগ্ধ করিতেছিল। তাই একদা তাঁহার জড়দেহ জীর্ণ গৃহের ন্যায় অকস্মাৎ ধ্বসিয়া পড়িল।

তখন ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে তাঁহার 'পরিণীতা' নাটকের চিত্র গ্রহণ চলিতেছে, অন্যদিকে রাত্রিতে নাট্যভারতীর 'দুই পুরুষের' অভিনয়ে প্রচুর জনসমাগম হইতেছে। কর্তৃপক্ষের অনুরোধে রাত্রি জাগিয়া "ঘাত প্রতিঘাতের" নাট্যরূপ রচনা চলিতেছে। কয়দিন হইল শরীরও ভাল যাইতেছে না—দেশের ম্যালেরিয়ার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে।

সেদিন সোমবার, অসুস্থ দেহে সারাদিন ষ্টুডিওতে কাটিয়াছে। অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া ক্লান্ত দেহ শয্যায় মেলিয়া দিলেন। সন্ধ্যার পর মেয়েদের অনুরোধে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে করিতে অকস্মাৎ ভিতর হইতে বমি ঠেলিয়া আসিল। সকলে আশংকা নেত্রে লক্ষ্য করিল যে, বমির সহিত প্রচুর পরিমাণে রক্ত বাহির হইয়াছে। তখনি তাঁহার সাহিত্যিক বন্ধু ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য মহাশয়কে সংবাদ দেওয়া হইল।

তিনি দেখিয়া যথারীতি ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করিয়া ভয় নাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সারারাত্রি অবিশ্রাম বাতাস করিলেও তিনি ঘুমাইতে পারিলেন না।

কিন্তু প্রভাত হইতেই পরম আরামে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলেন। পশুপতিবাবু দেখিতে আসিলে—তিনি নিদ্রা বিজড়িত চোখে তাঁহাকে জানাইলেন যে, অতি পরিশ্রমে তিনি বড়ই অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এইরূপ বিশ্রাম আরও দুই একদিন পাইলে বিনা ঔষধেই তিনি সুস্থ হইয়া উঠিবেন। সন্ধ্যায় তাঁহার অপর ডাক্তার বন্ধু সোমনাথ সাহা আসিলেন, বসিয়া বসিয়া বাতাবী লেবু খাইতে খাইতে তাঁহার সংগে অনেকক্ষণ ধরিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি এই পরিবারের বিশেষ হিতৈষী বন্ধু। বহু ঝড় ঝঞ্ঝায়
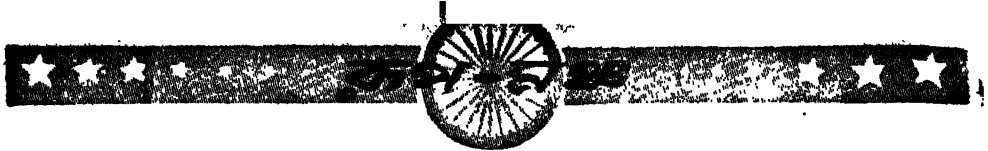
দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁর সাহায্যে এই পরিবার রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। সেই পরম বন্ধু সোমনাথ বাবুও আভাষে ইংগিতে কোন ভয়ের কারণ আছে বলিয়া জানাইলেন না। সকাল হইতে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত যোগেশচন্দ্রের দেহের তাপ স্বাভাবিক ছিল।

কাণ্ডারী—কবি
নরনারায়ণ—যুধিষ্টির।
রঘুবীর—সখারাম।
রাবন—ভগ্নদূত, বিভীষণ।
সর্ব্বহারা—শ্যামল।
কারাগার—বসুদেব।
গৈরিকপতাকা—রামদাস স্বামী।
কমলাকান্তে—কমলাকান্ত।
স্বামী-স্ত্রী—মিঃ দাস।
সরলা—গদাধর।
অশোক—উপগুপ্ত।
বিষ্ণুপ্রিয়া—অদ্বৈত আচার্য্য।
চিরকুমার সভা—রসিক।
শেষরক্ষা—নিবারণ।
কর্ণার্জ্জুন—ভীষ্ম।
গৃহলক্ষ্মী—উপেন্দ্র।
শান্তি কি শান্তি—প্রসন্ন কুমার।
পোষ্যপুত্র—রজনীনাথ।
মন্ত্রশক্তি—রমাবল্লভ।
সাবিত্রী—অশ্বপতি।
বিদ্রোহী বাঙ্গালী—চিন্তাহরি।
মেবারপতন সগর সিংহ।

ইহা ব্যতীত মুক্তার মুক্তি, হারানিধি, লাখ টাকা প্রভৃতি আরও বহু নাটকে প্রধান ও অপ্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন।

অকস্মাৎ রাত্রি নয় ঘটিকার পর অল্প শীত করিয়া একটু জর আসিল। নিজেই একখানি চাদর চাহিয়া লইয়া গায়ে দিলেন। তারপর তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রিতে তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখনও অল্প জর রহিয়াছে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় অনবরত কাতরাইতে লাগিলেন। প্রভাত হইতে বেলা যতই বাড়িতে লাগিল ব্যাধির যন্ত্রণাও তত বাড়িতে লাগিল। এই সময় যোগেশচন্দ্রের আর এক ডাক্তার বন্ধু শ্রীরামচন্দ্র অধিকারি মহাশয়ও দেখিয়া গেলেন। কিন্তু বিধাতা প্রতিকূল হইলে মানুষের কোন চেষ্টাই সফল হয় না। মহাকবি মাঘ তাঁহার অমর কাব্যে এই কথাই লিখিয়াছেন—

প্রতিকূল গম পগতে হি বিধৌ।
বিফলত্বমেতি বহু সাধনতা॥

ধীরে ধীরে যোগেশচন্দ্রের শেষ নিশ্বাস আসন্নতর হইয়া আসিতে লাগিল। কি যে ব্যাধি—কিসে যে তাহার প্রতিকার বাড়ীর লোকে কিছুই তাহা বুঝিল না। যোগেশচন্দ্রের এই চিকিৎসক বন্ধুমণ্ডলীর উপর তাঁহার পরিবার চিরদিনই একান্ত নির্ভরশীল। যোগেশচন্দ্র অচিরে সুস্থ করিয়া তোলার গুরু দায়িত্ব যেন একমাত্র তাঁহাদেরই। এজন্য তাঁহাদের নির্দেশ পালন ব্যতীত কিছু করিবার অধিকার যেন তাঁহাদের

নাই। এই একান্ত নিভরতার শিক্ষা তাহার পরিবার যোগেশ চন্দ্রের নিকট হইতেই শিখিয়াছিলেন। যোগেশচন্দ্রের জেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু দিনের কথা মনে পড়িতেছে। তখন বড়-দিনের আসর জমাইয়া রঙমহলে শরৎচন্দ্রের চরীত্রহীনের নাট্যরূপের অভিনয় চলিতেছে। যেদিন নিশীথ রাতে যোগেশচন্দ্রের পুত্র মাত্র দশ বার দিন ভুগিয়া পরলোকগত হয়, সেদিনও তিনি তাঁহার এই পুত্রকে ডাক্তার বন্ধুগণের হাতে নির্ভয়ে অর্পণ করিয়া চরিত্রহীনের শিবপ্রসাদের অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন।

যাহা হউক মাত্র অর্ধ দিবস শয্যাগত থাকিয়া তাঁহার অগণ্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের অগোচরে অকস্মাৎ অকালে তাঁহার কর্মমুখর জীবনের অবসান ঘনাইয়া আসিল। হৃদ-যন্ত্রের ক্রীয়া বন্ধ হইয়া তিনি পরলোকগত হইলেন। বিদ্যুতগতিতে এই দুঃসংবাদ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বন্যার ন্যায় জনস্রোত তাঁহাকে একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্য তিনতলা সিড়ি বহিয়া তাঁহার মৃত্যু কক্ষে উন্মাদের ন্যায় ঝাপাইয়া পড়িল। দীর্ঘ ছয় সাত ঘণ্টা ধরিয়া জনসাধারণের এই পূজা নীরবে চলিতে লাগিল।

তারপর সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত জহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজকীয় মর্যাদায় শ্মশান সজ্জা প্রস্তুত হইল। প্রকাণ্ড খাট আসিল। ফুল আসিল, ফুলে ফুলে শবদেহকে আচ্ছন্ন করিয়া যোগেশচন্দ্র তাঁহার ভক্তগণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া বাগবাজার হইতে হ্যারিসন রোডে নাট্যভারতী পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহ ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত নিশীত রাত্রে নিমতলা শ্মশানে আনিত হইলেন। তাঁহার পার্থিব দেহ শ্মশানের লেলিহান বহ্নি জ্বালায় অচিরে ভস্মে পরিণত হইল। এই রূপে যোগেশচন্দ্রের পার্থিব লীলার অবসান ঘটিল।

নিউইয়র্কে বাংলা থিয়েটার

(চার)

স্বর্গত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী

●

২৯শে নভেম্বর, শনিবার, ১৩ই অগ্রহায়ণ।

নূতন মহাজনের সংগে কথাবার্তা (negotiations) আরম্ভ হইয়াছে—। শ্রীযুক্ত সতু সেনকে কবে "স্বাক্ষর" হবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—"স্বাক্ষর" তো পূর্বেও হইয়াছিল। এখানে স্বাক্ষর করার বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হইতেছে না।

কাল একজন বাঙালী ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন—তাঁর নাম শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ বিশ্বাস—Boston এ থাকেন। ১৮ বৎসর বয়সে জাপান হইয়া এখানে এসেছেন—আজ তাঁর বয়স—২৭ বৎসর। Massuchusates Universityতে lecture দিয়া থাকেন। তার উপর textile expert. বৎসরে ৪০০০।৫০০০ ডলার উপার্জন করেন—স্বচ্ছল অবস্থা। এদেশী একটী মেয়েকে (Scotland England Family) বিবাহ করিয়াছেন। মেয়েটীর একটা সাড়ী পরাণো ছবি দেখাইলেন। ক্ষিতীশবাবু যদিও ছেলেবেলা হইতে বহুদিন বিদেশে আছেন এবং বিদেশিনী বিবাহ করিয়াছেন, তবু ইহার মনটী আজও খাঁটী বাঙালী আছে, বাংলা দেশে কোন কাপড়ের কলে ভাল কাজ পাইলে দেশে ফিরিতে ইচ্ছুক আছেন। তাঁর ছোট ভাইকে এখানে পড়াবার জন্য আমেরিকায় আনিলেন। সে Limfania জাহাজে বিলাত হইতে আজ আসিল। তার নাম শ্রীমান চারু বিশ্বাস—তাহার জন্য ভদ্রলোক বোষ্টন হইতে আসিয়াছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা Trans Atlantic Serviceএর বড় একখানা জাহাজে London গিয়া—সেখান হইতে Massels ট্রেণে গিয়া তারপর P. N. O. Boat এ Bombay হইয়া কলিকাতা যাই—তাহা কি হইবে—? না আবার Tampur মত ৪৪ দিন। কে জানে ভগবান অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন—আজ New Olears ছাড়িতেছে, Australia হইয়া Colombo যাইবে—আর আগামীকাল Tampu ছাড়িবে কলিকাতা যাইবার জন্য—।

৩০শে নভেম্বর রবিবার, ১৪ই অগ্রহায়ণ।

কাল সন্ধ্যার পর আমার ভূতপূর্ব ছাত্র শ্রীমান রণজিতের বাসায় অমলবাবু, মণিমোহনবাবু ও আমি গেলাম। রণজিৎ বাসায় ছিল না। তার স্ত্রী শ্রীমতী হেলেন রায় আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মেয়েটী বড় ভাল। ঠিক আমাদের দেশের গৃহস্থ ঘরের মেয়ের মত—১৮ হইতে ২০ বছরের ভিতর বয়স। তার বাপের বাড়ী Indiana. মা আছেন, বাপ নাই—ভাই বোনে তারা ১০টী ১২টী ছিল—২ জন মারা গেছে। বড় বোনের বয়স ৩৩, তার একটী ছেলে আছে। বোন, বোনপো, ভাই, মা—প্রভৃতির ফোটো দেখাইল। তারপর ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্বন্ধে কথা হইল।

মেয়েটী "Mother India" বইখানা পড়িয়াছে। তাহা হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। অবশ্য "Mother India" যে খাঁটী পুস্তক নয়—propaganda—তা সে জানে। লালা লাজপৎ রায়ের "Unhappy India" এবং শ্রীযুক্ত ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "A Son of Mother India Speaks" নামক পুস্তক দু'খানিও সে পড়িয়াছে। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আসিলেন শ্রীযুক্ত বসন্ত রায় এবং শ্রীযুক্ত নির্মল দাস। নির্মল দাসকে কেন তিনি আমাদের বাসায় আসেন না, জিজ্ঞাসা করায় দু'একটী অভিমানের কথা বলিলেন। আমাদের বর্তমান অবস্থার আলোচনা হইল। নির্মল দাস বলিলেন—"ভাদুড়ী মহাশয় যদি আমাদের কথা শুনিয়া চলিতেন, আজ আপনাদের এরূপ দুর্দশা হইত না।" Erric Elliotকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সেও ঐরূপ উত্তর দিবে নিশ্চয়ই, কেননা কলিকাতা হইতে সে বলিতেছে, "I must have some hands in the production, I know Broadway." এবং আমাদের দলের প্রত্যেকেরই ধারণা—'ভাদুড়ী মহাশয় যদি আমার কথা শুনিয়া কাজ করিতেন, তাঁর এদুর্দশা হইত না—' আজ আমি . . .
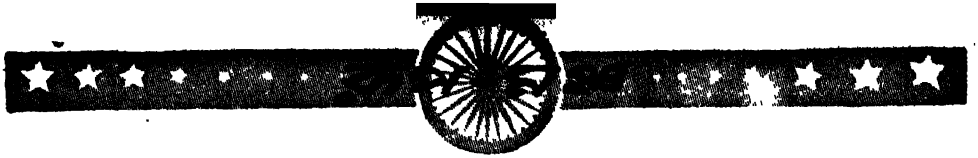
করি—ভাদুড়ী মহাশয় কারো কথা শুনেন নাই, খুবই ভাল কথা—কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, তিনি কিছুই করেন নাই। মাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া স্রোতে গা ভাসান দিয়াছেন। Erric যদি কলিকাতায় না যাইত—তাঁর আসা হইত না। পশ্চাৎ হইতে ধাক্কা দিবার শক্তি দরকার, তাঁর গতির জন্য এঞ্জিনের মত কোন সম্মুখের শক্তি তাঁর গতিকে পরিচালিত করিতে পারে না।

বাড়ীর চিঠি পাইলাম—সবাই ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছু টাকা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত কারো ভাবনা থামিবে না। হায়রে—"আমি যাব বঙ্গে তো কপাল যাবে সঙ্গে।" এত আশা করে নিউ ইয়র্কে এলাম। কিছু ফাঁকা টাকা ও যশ উপার্জন করিবার জন্য—এখানে আসিয়া এই বিভ্রাট। যেখানে ভয় ছিল, সেইখানেই ধরা পড়িয়াছি। গিরিক এবং ভাদুড়ীমহাশয় ঝগড়া করিয়া—প্রত্যেকে প্রত্যেকের দুর্বলতা প্রকাশ করিয়াছেন মোটের উপর সবজিনিষটা একেবারে ভাঙিয়া গেছে।

১লা ডিসেম্বর।

অকূল সমুদ্র। কোন দিকে কূল পাওয়া যায় না। আটলান্টিক পার হইতে ১২ দিন গিয়াছিল—এ সমুদ্র যে কত দিনে পার হইব—তাহাতো বুঝিতেছি না। লিখিবার কিছু নাই—ভাবিবার কিছু নাই—আমাদের চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের অবস্থা "গাছে তুলিয়া মই কাড়িয়া লইয়াছে"—। আমাদের প্রার্থনা শুধু এই—"ফল পাড়িতে চাহিনা"—গাছ হইতে নামিতে পারিলে বাঁচি। ভরসার মধ্যে বড় ভরসা ২৫ জন লোক এক সংগে আছি। শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগের বক্তৃতার জন্য ভোজের আয়োজন চলিতেছে। নিমন্ত্রিত হইয়াছি। ১ ডলার মূল্য। সে মূল্যও নাই যে, কুটুম্বিতা করিয়া আসি। আমাদের বর্তমান অবস্থার মত tragicomical situation কোন নাটকে পূর্বে দেখি নাই।

২রা ডিসেম্বর—১৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার—

গত রাত্রি এবং আজ সকালে বাড়ীতে এবং বেঁওকাটীতে হরিদাসীকে পত্র লিখিলাম। শিশিরবাবু শ্রীশবাবুকে 'বারাণসী' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রস্তুত করিবার সাহায্য করিতেছেন। এটী একটী দর্শনীয় বস্তু: শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু এই মাত্র ফিরিয়া আসিলেন—৩ দিন পরে। বলিলেন, "বোষ্টন" হইতে ফিরিলেন। কাল শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ আর একটী বক্তৃতা দিয়াছেন—। এটী খুব চমৎকার—। শ্রীশবাবু সে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে খুব প্রশংসা করিয়াছেন। এখানকার লোকেরা খুব উল্লসিত হইয়াছিল। আজ আমাদের সমস্ত ঠিকঠাক হইবার কথা। দেখা যাক কি হয়।

৩রা ডিসেম্বর ১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার।

কিছুই হয় নাই। শুধু শুনিলাম—"সংবাদ ভাল। everything is progressing wonderfully"। গত মার্চ মাস হইতে এই কথা শুনিয়া আসিতেছি। ১লা ডিসেম্বর তারিখে পুনরায় 'Natural History Museum' দেখিতে গিয়াছিলাম।" Red Indian Section দেখিলাম। Red Indian দের অনেক হাতের কারুকার্য সুন্দর। গৃহ নির্মাণ, নৌকা নির্মাণ কোন কাযেই তাহারা কোন প্রাচীন সভ্য জাতির চেয়ে হীন ছিল বলিয়া মনে হয় না। সেকালের ইউরোপীয়েরা (যারা প্রথম এদেশে এসেছিলেন) যদি এদের শত্রু মনে না করিতেন—বোধকরি এতদিনে ইহারা বড় হইত। কাল গিয়াছিলাম "Metropoliton Muscum of Art" দেখিতে। একতলাটা দেখিলাম—প্রাচীন মিশরের ধ্বংসাবশেষ—Pyramid গুলির model। প্রাচীন রাজাদের (অন্ততঃ খৃষ্ট জন্মের ২০০০ বৎসর আগেকার) কবর। প্রাচীনকালের রাজাদের এবং যোদ্ধৃগণের তৈলচিত্র—। সমস্ত ইউরোপীয়, পারস্য, ভারতীয় যোদ্ধাগণের তরবারি, চর্ম, বর্ম, অশ্ব, অশ্বসজ্জা, ভল্ল—। খৃষ্ট জন্মের ১০০০ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া—ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত স্ত্রীলোকের স্বর্ণালংকার, মণি, হার মুক্তা। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের পৌরাণিক ইতিবৃত্তের পাষাণ গাঁথা—খৃষ্টোৎসব—সাধুজনের মূর্তি—জীবন মৃত্যুর চিত্র—প্রভৃতি কত যে দেখিলাম—' সে যেন আর্টের অরণ্য। সেখানে প্রবেশ করিলে আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়।

মনের শক্তি লাভের জন্য মহাত্মা গান্ধীর জীবনী পড়িতেছি।

আমাদের এই দলের মধ্যে একজন লোক আছেন—যাঁকে পূর্বে ভাল চিনিতে পারি নাই—শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী। ভদ্রলোকের মনের শক্তি এবং ভগবানে বিশ্বাস অসাধারণ। আমরা সবাই উদ্বিগ্ন হইয়াছি। চঞ্চল হইয়াছি। মাঝে মাঝে নানারূপ সমালোচনাও করিতেছি—কিন্তু অমলবাবু, একেবারে ধীর স্থির শান্ত। তাঁর আহার, নিদ্রা, সংবাদপত্র-পাঠ বেশ নিয়মিত ভাবেই চলিতেছে।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—

কাল সব ঠিক হইবার কথা ছিল। সমস্ত দিন সতু সেন আসেন নাই। রাত্রি ১০টায় আসিবার কথা ছিল। সেই সময় ফোনে শিশির বাবুকে কথা বলিলেন। কি কথা হইল শিশির বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিলেন—"Things are progressing wounderfully" চাই কি এক সপ্তাহের মধ্যে টাকাকড়ি ও পয়সা পেতে পারি—তবে contract স্বাক্ষর হইতে অনেক বিলম্ব হইবে।" এ কথার যে কি অর্থ—তাতো বুঝিবার উপায় নাই।" এরূপ অটল রহস্যের সম্মুখে কখনো আত্মসমর্পণ করিতে হয় নাই। কাল ভারতবর্ষের "জাতিভেদ" সম্বন্ধে শিশিরবাবুর সংগে আলোচনা হইতেছিল। আমাদের ভারতীয় "জাতি-ভেদ" দুইভাগে বিভক্ত—"বর্ণভেদ"—ও "অস্পৃশ্যতা"। বিবাহে বর্ণভেদ মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক কুসংস্কার। মানুষ মহাত্মা না হইলে এ সংস্কারের হাত হইতে তাহার পরিত্রাণ নাই।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—।

শুনিলাম ১৫ই জানুয়ারীর পূর্বে থিয়েটার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। Bure Reed বলিয়াছেন আমি আর কিছু জানি না। আগামী মঙ্গলবারে আমাদের নূতন মহাজন B. M. Moss শেষ কথা বলিবেন। তাঁর "Broadway Theatre"এ সোমবার হইতে "New-Yorkers" নামক নূতন নাটক অভিনয় হইবে। শুনিলাম সেই নাটকখানির successএর উপর তিনি নির্ভর করি-তেছেন। ভগবানের কাছে এখন আমি আর কিছুই প্রার্থনা করিতেছি না। শুধু কোন উপায়ে আমাদের কলিকাতায় ফিরাইয়া লওয়া হউক। শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া যেন সবাইকে ভাল দেখি—মা রক্ষাকর—রক্ষাকর—রক্ষাকর।

"সর্ব্বমঙ্গল্যে মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্রম্বকে গৌরি, নারায়ণি—নমোঽস্তুতে॥"

৬ই ডিসেম্বর, ২০শে অগ্রহায়ণ শনিবার—

কাল শৈলেন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসেছিলেন। তাঁর সংগে আমাদের বর্তমান অবস্থার আলোচনা হইতেছিল। তিনি বলিলেন—"এ বৎসর এখানে অত্যন্ত দুর্বৎসর। Theatre season অর্ধেক কাটিয়া গেল। নূতন মহাজন এখন আসিবে এরূপ সম্ভাবনা নাই বলিলেই হয়। তবে যদি দেশ হইতে টাকা আনাইয়া নিজেরা থিয়েটার ভাড়া করিয়া থিয়েটার করেন—খুব ভাল হয়। Hindu Theatre দেখিবার জন্য Newyorkএর জনসাধারণ ব্যস্ত আছে। এর মধ্যে আর একখানি অদৃশ্য হস্তের সংস্পর্শ আছে বলিয়া মনে হয়।"

রাত্রে সতু সেন আসিলেন। তিনিই এখন আমাদের একমাত্র কর্ণধার। তাঁকে স্পষ্ট কথা জিজ্ঞাসা করা হইল—

"আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে—
হে সুন্দরি,
বল কোন পার, ভিড়িবে তোমার
সোনার তরী?"

স্পষ্ট বলুন—'আমরা এরূপভাবে আর কতদিন অপেক্ষা করিব।'

তিনি বলিলেন—"বড় জোর আর এক সপ্তাহ। ইহার মধ্যে নানা কারণে একটা হেস্ত নেস্ত হইবেই। আপনাদের দুর্ভাগ্য—২৮শে অক্টোবর যাহা হইয়াছে তার উপর বেশী আর কিছু হইতে পারে না। এখন আশা করা যায়, ভালই হইবে—। এক সপ্তাহের ভিতর যদি কিছু না হয়, আপনারা বাড়ীতে ফিরিবেন এবং বেশ ভালো ভাবেই ফিরিবেন—কোন ভয় নাই।

৭ই ডিসেম্বর—২১শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—

এই ডায়েরীর প্রথম দিকে জাহাজে বসবাস করিবার সময় একদিন লিখিয়াছিলাম—"নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সংগে

পরিচিত হইবার প্রবল বাসনা আমার আছে।" আমাদের প্রথম নাট্যাভিনয়ে তিনি উপস্থিত থাকিবেন, এ ব্যবস্থা পূর্বে ছিল। তারপর আমাদের দুর্ভাগ্য—তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইলেন। আমাদের অভিনয় হইল না। তারপর তিনি সুস্থ হইয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, লোকজনের সংগে দেখাও করিয়াছেন—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুই চারি কথাও বলিয়াছেন: কিন্তু এদেশে কোন সাড়া পড়ে নাই। আজ শিশির বাবুর এবং সেই সংগে আমার রবীন্দ্রনাথের নিকট যাইবার কথা আছে।

যাওয়া হইবে কিনা জানিনা। শুনিতেছি রবীন্দ্রনাথ ১৬ই ডিসেম্বর আমেরিকা হইতে রওনা হইবেন। "Variety Fair" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা রবীন্দ্রনাথ প্রমথ আমাদের ভারতবাসী সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছে—তাহাতে আমাদের কাহারো আমেরিকা হইতে কিছুই প্রত্যাশা করিবার নাই—। সকলেই বলিতেছেন—রবীন্দ্রনাথই তাহার জন্য দায়ী—। মাইকেল ইয়ুরোপে পদার্পণ করিয়াই যে কথা বুঝিয়াছিলেন—

"পর দেশে ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আচারি"

রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম প্রবাসী প্রতি ভারতবাসীর সে কথা বুঝা উচিত। ভারতীয় শিল্পকলা, ভারতীয় নাট্যকলা, কাব্যকলা, প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, ইতিহাস—ইউরোপ কি আমেরিকায় বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমরা নিজেরা অর্থ ব্যয় করিয়া যদি তাহা বুঝাইতে পারি তাহা হইলে ভাল, নতুবা—এ দেশের অর্থে ভারতীয় সভ্যতা প্রচার—এ দেশের ধনশালী লোকের চোখে যে কতদূর হীনতার কার্য—"Variety Fair"-এর লেখা তাহার প্রমাণ—

"Varity Fair" চারিজন বিখ্যাত লোকের ছবি দিয়া মোটা অক্ষরে লিখিয়াছেন—

We nominate for oblivion— যাঁদের ছবি আছে তাঁদের নাম (১) Bornelius Vanderbilt IR. (২) Sir Rabindra Nath Tagore (৩) Mathew Woll. (৪) William (Bin) Duffy, তিনজনের সংগে আমাদের সম্বন্ধ নাই—কিন্তু যাঁকে সমগ্র ভারতবর্ষ পূজা করে তাঁর সম্বন্ধে—"Vareity Fair" লিখিয়াছেন—

We nominate oblivion for Sir Rabindra Nath Tagore because his 'mystical' poetry has been acclaimed chiefly by the pseudocultured, because in all his potraits he takes care to look as much like a holyman and a saint as possible, because he is the chief of all the Mahatmas and Swamis who swarm over here to spread his information about India's and finally because he visits the United States every few years, collect a comfortable sum in lecture fees, and depart, giving out interviews in which he denounces "America for its materialism"

ইহার পরে যাঁরা আমেরিকায় বক্তৃতা দিতে আসেন—তাঁদের আসিবার কি অধিকার ও প্রয়োজন আছে?

এই কথা লইয়াই কাল বৈকালে শিশিরবাবু, সন্তু সেন ও মনোরঞ্জনবাবু ও আমাতে আলোচনা হইতেছিল। সন্তু সেন বলিলেন—তিনি একবার মহাত্মাজীকে আমেরিকায় আসিয়া বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়া পত্র লিখেন—তাহাতে উল্লেখ ছিল—"ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের" জন্য প্রচুর অর্থ এই উপায়ে আমেরিকা হইতে উপার্জন করা যাইতে পারে।

উত্তরে মহাত্মা যাহা লিখিয়াছিলেন, সন্তু তাহা আমাদিগকে শুনাইলেন—ভাষাটী হয়তো ঠিক হইবেনা। শুনা কথা। তবে ভাব এইরূপ—

My dear friend,

I am very thankfull to you for your proposal. But at present I can't leave India. India ought not take American money for her national movement and must raise her own money. I shall go to America, only when India is independent and speak of India and Indian culturre without taking money for my lectures.
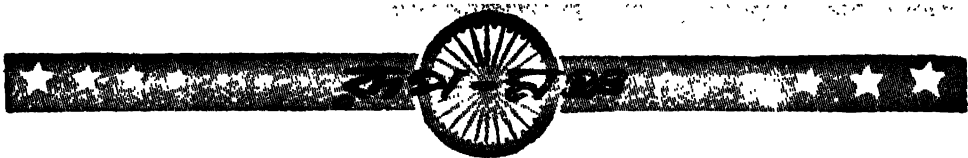
এখন দেখিতেছি সমুদ্রপারে শুধু চান হিসাবেই আর পর্যটক হিসাবে আসা চলে। ভারত সভ্যতা বিদেশে প্রচার করিতে হইলে—মহারাজ অশোকের মত রাজশক্তির আশ্রয় আবশ্যক।

৮ই ডিসেম্বর, ২১শে অগ্রহায়ণ সোমবার—

তিনমাস পূর্বে এই দিনে শিশিরবাবু আমেরিকা যাত্রার জন্য কলিকাতা ছাড়েন।

কাল "Newyork Evening Post" কাগজ হইতে জনৈক ভদ্রলোক এসেছিলেন আমাদের খবর নিতে। Burl Reed এর কাছে তিনি প্রথমে যান। Burl Reed আমাদের ঠিকানা তাঁকে দিয়াছেন। "ভারতবর্ষ" সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন—"Why dont you kick the British out of India?" আমরা মহাত্মা গান্ধীর "অহিংস অসহযোগ" সম্বন্ধে অনেক কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম—ভদ্রলোক ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তারপর থিয়েটার প্রসংগে আলোচনা হইলে—আমাদের সভ্যতার অবস্থা কি—জানিবার চেষ্টা করিলেন। আমরা বিশেষ খবাছোঁয়ার মধ্যে গেলাম না Dr. Mukherji নামক জনৈক আমেরিকা প্রবাসী বাঙ্গালী এখানে এসেছিলেন—তিনি বলিলেন—"আপনার কৌতূহল অত্যন্ত অনাবশ্যক। সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবেন—" ভদ্রলোক বলিলেন—

"Newyork are interested to know about the Hindu show. India is long way off. And you are pretty long here doing nothing. Newyork have a right to know if the Hindu artists are stranded. We want to know what short of contract you have and with whom."

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন আমরা বলিয়াছি—আগামী সপ্তাহে সঠিক খবর জানিবেন।

তিনি চলিয়া যাওয়ার পর Dr.Mukherji তাঁর মোটর গাড়ী করিয়া আমাদিগকে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনাইতে লইয়া গেলেন। Mukherjiর সংগে তাঁর স্ত্রী Mrs Mukherji এবং একটী ছোট মেয়ে (Miss Mukhrji). New Hindu Societyর উদ্যোগে পারস্য দেশীয় সুফি ভক্ত কবি—বাহাউল্লার কাব্য আলোচ্য বিষয় ছিল। আমাদের পূর্ব পরিচিত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় ছিলেন সভাপতি। একজন সিরিয়া দেশীয় মহিলা সংগীত করিলেন। Syed Hossain নামক ভারতীয় মুসলমান যুবক (এখানে লেখক বলিয়া তাঁর বেশ খ্যাতি হইয়াছে) তিনি বক্তৃতা দিলেন। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময় উত্তীর্ণ করিয়া সভায় উপস্থিত হইলেন। বিনা পয়সার সভা—লোকের অভাব ছিল না। প্রচুর মহিলা আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার পর "তোমার শঙ্খ ধূলার প'রে কেমন ক'রে সইব?" কবিতাটীর ইংরাজী এবং বাংলা আবৃত্তি করিলেন। Helen Keller নামক আমেরিকার অন্ধ, বধির ও মূক মহিলা লেখিকা রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিয়া একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন—তাঁর কথাগুলি আর একজন মহিলা ভাল করিয়া বলিয়া দিলেন। Helen Keller এর মননশক্তি অতি আশ্চর্য। ভগবান তাঁকে অন্ধ, বধির ও মূক করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। তিনি আপনার অতি অসাধারণ মননশক্তির প্রভাবে—লেখিকা হইয়াছেন। সভায় রবীন্দ্রনাথের বোলপুর স্কুলের জন্য অর্থ সাহায্য চাওয়া হয়। কিছু টাকা উঠিয়াছে—খুব বেশী নয়। সভা ভংগ হইলে Mukherjiর গাড়ীতে সমস্ত Central পার্ক প্রদক্ষীণ করিয়া প্রায় সাড়ে এগারোটা রাত্রিতে আমরা বাড়ী ফিরি। অমলেন্দুবাবু, মনোরঞ্জনবাবু এবং আমি ছিলাম।

বাসায় ফিরিয়া দেখি সতু সেন উপস্থিত। তাঁর সংগে অনেকক্ষণ আমাদের থিয়েটার যদি successful হয় তার profit কিরূপ তাহাই আলোচনা হইল। "যুক্ত সাম্রাজ্যের প্রত্যেক সহরে আপনারা অভিনয় করিবেন। নিউইয়র্কে প্রথম চারি সপ্তাহ—তারপর ২ সপ্তাহ—তারপর ভারতবর্ষে ফিরিবার পথে—লণ্ডন, প্যারী, বার্লিন—you must be used to American ways of life"

এখন শুনিতেছি ২৭শে ডিসেম্বর হইতে থিয়েটার হইতে পারে।

৯ই ডিসেম্বর, ২৩শে অগ্রহায়ণ; মঙ্গলবার—

B. M. Moss এর সংগে আজ একটা হেস্ত নেস্ত হইবে।

শিশিরবাবু দেড়টার সময় বাহির হইবেন। কাল শিশিরবাবু রবীন্দ্রনাথের সংগে দেখা করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে খবরের কাগজে খবর আসিয়াছে—তিনজন বাঙালী ইয়ুরোপীয় পোষাকে সজ্জিত হইয়া—Secretariat Buildingএ প্রবেশ করিয়া Inspector General Nelson সাহেবকে গুলি মারিয়া হত্যা করিয়াছে। তারপর একজন আত্মহত্যা করেন। কিছুদিন আগে একজন Mr. Mukherji, police Inspector চাঁদপুরে হত হইয়াছেন। দেশে এই রুদ্রলীলা চলিয়াছে—লোকে মারিতেছে মার খাইতেছে, মরিতেছে আর আমরা এই সুদূর হইতে শুধু কল্পনা কল্পনা করিয়াই দিন কাটাইতেছি। ভগবান কবে যে আবার দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, তাহা তিনিই জানেন।

১০ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, বুধবার—

এতদিন ধরিয়া শুধু হা হুতাশ করিতেছি কিন্তু আমাদের বর্তমান দুরবস্থার কারণ আলোচনা করি নাই। সেটা লিখিয়া রাখি—ভবিষ্যতে কাজে লাগিতে পারে—২৭শে অক্টোবর আমাদের dress rehearsel হয়—২৮শে play হইবার কথা। কলিকাতা হইতে আমাদের সংগে "Tampa" জাহাজে দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদ আসে। অনেক জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে আনা সম্ভবপর হয় নাই। সেগুলি এখানে প্রস্তুত করিয়া দিবার কথা। আমরা আমেরিকায় নামিয়াই শুনিলাম আগামী মঙ্গলবার অভিনয়। মাঝে চারিদিন তখন আছে। যদি আমাদের লোকজন সংগে থাকিত একদিনে ষ্টেজ সাজানো সম্ভব হইত। বিদেশী লোক—অনভ্যস্ত। পুরা একটা দুইটা দিন গেল customs এর নিকট হইতে জিনিষপত্র খালাস করিতে। Dress rehearsel দিতে গিয়া দেখি—scene গুলি সাজানো হইয়াছে—কিন্তু platform নাই সিঁড়ি নাই—back cloth নাই। এরিক বলিয়াছিলেন সেখানে সংগ্রহ করা হইবে। সংগ্রহ হয় নাই। তারপর rehearsel আরম্ভ হইল—'dress rehearsel which is good as play' ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল কিন্তু নাটক ও অভিনয়ের সংগে দৃশ্য অনুযায়ী আলো adjustment করিবার লোক নাই। Electrician-কে বুঝাইতে পারে এমন কেহ ছিল না। Indian orchestra যাহার একান্ত আবশ্যক ছিল—সেটা একেবারে নাই। এদেশে হারমোনিয়াম দেখিলে লোকে নাক সিটকায়। বাঁশী বাজাইবার লোক আমাদের ছিল না। এক বাঁয়াতবলা—তাও শীতলবাবু মেয়েদের পায়ের তাল দেখাইবার জন্য দুমদাম জোরে পিটিতেছিলেন।

যাহা হউক—অবস্থা হইল। শ্রীযুক্ত শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় দুর্মুখ—সে ভদ্রলোক জাহাজে পাট পর্যন্ত মুখস্থ করে নাই। প্রথম হইতেই তিনি "তো তো" আরম্ভ করিলেন—ভাদুড়ী মহাশয় মৃদু স্বরে—তাঁহাকে সাহায্য করিলেন—সাহায্যও auditorium হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। পরে শুনিলাম Burl Reed নাকি শ্রীশবাবু সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"My God the man does not know his role. And I hear the play has run three hundred nights."

প্রথম দৃশ্য অভিনয় হইয়া গেল—আর কোন গণ্ডগোল হয় নাই। গোলযোগ বাধিল দ্বিতীয় দৃশ্যে—সীতার original দ্বিতীয় অংক (শম্বুক বধ) সময় সংক্ষেপার্থ বাদ দেওয়া হইয়াছে—দ্বিতীয় অংক হইয়াছে বাল্মিকীর দৃশ্য। অথচ এই ১৮ বৎসর সময় যে চলিয়া গেল—তার কোন ইংগিত মধ্যে কোথাও দেওয়া হইল না। বরং দৃশ্যের প্রথমে নাচগানের জন্য "মঞ্জুল মঞ্জরী" গাওনা হইল। "সীতার বনবাসের" ঐ করুণ দৃশ্যের পর—শুধু অকারণ পুলকে নাচ-গান এবং সর্বশুদ্ধ ৭ জন নর্তকীর মধ্যে মাত্র ২ জন নাচ জানে—এবং সেই দুইজনই কালো এবং একজন মোটা, একজন রোগা। এইবার Miss Mercurry জ্বলিয়া উঠিলেন এবং এরিককে গালিবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। এরিক নিজের দোষ শিশিরবাবুর ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করিল। তারপর বাল্মীকি মহাশয় প্রবেশ করিলেন—পরে লব কুশ—; শুধু লোকই আসা যাওয়া করে। নাটক জমে না—। তারপর আসিলেন কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ শত্রুঘ্ন—শ্রীমান বেচা চন্দর—তাঁর আসিবার ও কথা কহিবার ভংগী দেখিয়াই Miss Murcurryর পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল—তিনি
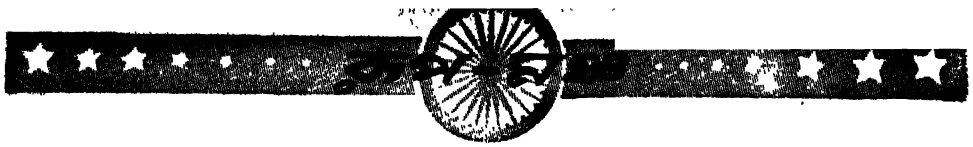
চীৎকার করিয়া বলিলেন—"Look at the man, has he even been on the stage?" ইহার পরেই তাঁরা চলিয়া যান—। বাকি দুই অংক অভিনয় হইল বটে—কিন্তু কোথাও জমিল না—শ্রীশবাবু আবার পাট ভুলিলেন। "ফিরাও বালকে" বলিতে আলো নিভিল না—শিশিরবাবুকে অত্যন্ত সজ্ঞানে মূর্চ্ছা যাইতে হইল—। কোন গতিকে কাল রিহার্সাল শেষ হইল।

পরে শুনিলাম আমাদের বিরুদ্ধে charge এবং S. K. Bhaduri ও Burl Reed এর বিরুদ্ধে charge—

(1) The play was not well arranged. Scenes omited instead of lives.

(2) Some actors uncertains.

(3) Mr. Chatterjee and Mr. Chandra didn't know their parts.

(4) Scenes old and wornout.

(5) Back cloth wanting and Hindu instrument nill.

(6) No furniture.

(7) Dancing girls ugly, their costumes and jewelery most unimpressive.

(8) Two girls couldn't dance at all.

(9) The principal dancer fat and comic.

Burl Reed এর বিরুদ্ধে অভিযোগ—

(1) No co-operation was Given to Mr. Bhaduri.

(2) Platforms were not ready.

(3) Light adjustment was bad.

(4) Too many critics invited before the thing was ready.

১১ই ডিসেম্বর, ২৫শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার—

যে B. M. Moss এর সংগে এতদিন ধরিয়া আমাদের কথাবার্তা হইয়া আসিতেছে—রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার থিয়েটারে রবিবার—কবিতা আবৃত্তি করিবেন এবং তাঁর সংগে—Ruth St. Dennis নামক এই দেশীয় জনৈকা নর্ত্তকী নৃত্য করিবেন। Moss-এর—"Broadway Theatre" প্রতি রবিবার অভিনয় করিবার প্রস্তাব ইতিপূর্বে আমাদেরই নিকট আসিয়াছিল। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আমাদের সংগে থিয়েটার করিতে বোধ হয় আপত্তি করিবেন না- (Public Theatre). সন্ধ্যায়—শ্রীমান রণজিৎ রায়ের বাসায় মনোরঞ্জন বাবু ও আমি যাই। রায় বাসায় ছিলেন না—তাঁর স্ত্রী সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন! আমরা দরজার সামনে দাঁড়াইয়া দুই কথা কহিয়াই চলিয়া আসিলাম।

Mrs. Roy বলিলেন—"We are too busy. The winter is coming and we must now do our best."

আমার সেই ঈশপের গল্প মনে পড়িল—এদেশে শীতকালের অর্থ আছে —তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়।

১২ই ডিসেম্বর, ২৬শে অগ্রহায়ণ, শুক্রবার—

কাল রাত্রে এক ভদ্রলোকের সংগে পথে দেখা। আমাদের অভিনয় কবে হইবে জিজ্ঞাসা করায়—আমরা অত্যন্ত অপ্রস্তুত এবং হতাশ ভাবে উত্তর দিলাম—"বড়দিনের সময়"। লোকটা আমাদের ভংগীমায় ভিতরের কথা ধরিয়া ফেলিল, বলিল—

This country is broke. You have very little hope of success even if you open your show. I am a musician, Had you in this country some ten eight and six yoar ago, you could have collected some money but now the country is broke." তারপর সে বলিল—Look here, you are bound to fail if you play a full show of your own. Instead of doing that, I suggest you rather to participate in a full brief show—some hindu music, some comic staff etc.

মনে ভাবিয়া দেখিলাম, এ উপায়ে ২।৪ জনের সুবিধা হইতে পারে বটে কিন্তু ২৫ জন নরনারী ইহাতে কি কাজ করিবে?

১৩ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ, শনিবার—

"সর্বং আত্মবশং সুখং সর্বং পরবশং দুঃখং"

আমেরিকা আসিবার জন্য যেদিন জাহাজে উঠি—সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমরা যে কি ভয়ংকর পরবশ হইয়া দিন কাটাইতেছি—তাহা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। আমরা পরাধীন জাতি—পরাধীন দেশে বাস করি—তবু এতটা পরবশ কখনো হইতে হয় নাই—আজ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন দেশে বাস করিয়া যেরূপ পরাধীনতা অনুভব করিতেছি। আজ রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা প্রবাসী ভারতবর্ষীয়গণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। এখনো আমাদের নিমন্ত্রণ পত্র আসে নাই। কেন, জানিনা।

শুনিতেছি একটু সুবিধা হইয়াছে—থিয়েটার – ছবি প্রভৃতির মূল কর্ণধার যাঁরা, এমন কয়েকজন মহাজন আমাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"We shall give you a chance to show yourself" তাঁরা একটী থিয়েটার আমাদের দিবেন—আমরা সেখানে অভিনয় করিব। বড় বড় producer সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। আমাদের অভিনয় দেখিয়া যদি তাঁরা বুঝেন—ইহাদের পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করিলে সুবিধা হইতে পারে—তখন হয়তো আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি।

১৪ই ডিসেম্বর, ২৮শে অগ্রহায়ণ, রবিবার—

কাল rehearsal হইল অনেকদিন পরে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। তিনি Newyork প্রবাসী সমস্ত হিন্দুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—শুধু আমাদের নিমন্ত্রণ করিতে ভুলিয়াছেন। ভাবে মনে হয় Newyork এ আমরা এক ঘরে হইলাম। আগে যাঁরা আসিতেন, তাঁরা কেউ আর আসেন না। সেদিন "Newyork Evening Post" এর তরফ হইতে যে ভদ্রলোক আমাদের সংগে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন—তাঁর নাম Mr. Copeland—গতকাল Evening Post এ তিনি আমাদের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—"Hindu actors still here, inactive but amiable. They have enough time to talk weather" আমাদের করুণ হাস্যরসাত্মক অবস্থাটীকে বেশ সরস করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "We thought Mr. Bhaduri with and his hindu actors must have vanished by some magic art of their own and carried Mr. Burl Reed away with them কিন্তু দেখা গেল সবাই নিউইয়র্ক সহরে আছেন—বার্ল রীডকে জিজ্ঞাসা করিলে—তিনি বলেন—আমি জানিনা—ভাদুড়ী জানেন। ভাদুড়ীর কাছে গেলে শোনা যায়—তাঁর বড় সর্দি, তিনি উঠিতে পারিতেছেন না। Merbury বলেন, আমি তো শুধু agent। Copelland লিখিয়াছেন—"আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—কে টাকা যোগাইতেছে" —উত্তরে Merbury বলিলেন—"বোধ হয় some men in the down town" আমার বিবেচনায়, এরূপ লেখা যত বাহির হয়, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। বিদ্রূপ করিয়া প্রশ্ন

করিয়া—এই রহস্য আবরণের মধ্য হইতে নিউইয়র্কবাসী আমাদের উদ্ধার করুন—ভগবানের কাছে ইহাই প্রার্থনা করি।

১০ই ডিসেম্বর, ২৯শে অগ্রহায়ণ, সোমবার—

কাল Brodway Theatreএ রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সংগে Ruth St Dennisএর ভারতীয় নৃত্য ছিল আমরা টিকিট পাইয়া দেখিতে যাই। আমরা ১২জন গিয়াছিলাম—Box এ বসিয়াছিলাম মনোরঞ্জনবাবু, শৈলেন্দ্রবাবু, শিশিরবাবু, কঙ্কাবতী, সত্য সেন ও আমি। ঠিক সময়ে আরম্ভ হয় নাই—দর্শকবৃন্দ অনেক হাততালি দেওয়ার পর কবি বক্সে আসিয়া বসেন—ঠিক আমাদেরই পাশে—দৃষ্টির দ্বারা আমাদের প্রণতি স্বীকার করিলেন। থিয়েটার বাড়ীর মালিক B. M. Moss কবিকে পরিচিত করাইবার ভার নিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁর ভাই B. T. Moss উক্ত কার্য করেন। Ruth St Dennis-এর সংগে এক থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের যে নামিতে স্বীকার পাওয়া একেবারেই উচিত হয় নাই, একথা কবি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই Stageর ভিতর না গিয়া Boxএ বসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আজ রাতে "Europea" জাহাজে রওনা হইবেন। আমেরিকাবাসীর পক্ষ হইতে Wil Durand নামক ভারত প্রেমিক লেখক—রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে আমেরিকাবাসীর পক্ষ হইতে একখানি "বিদায় অভিনন্দন" পাঠ করেন। লেখাটা বড় চমৎকার। তারপর রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন—তাতে তিনি বলেন—"I come here today in my true vocation as a philosopher, who talk wisdom of the east, as I have often been mistaken for." তারপর কয়েকটী কবিতা আবৃত্তি করেন—প্রথম ইংরাজীতে তারপর বাংলা—"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে; সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া, তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।" আবৃত্তি অতি মনোহর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তারপর Ruth St Dennis নাচিলেন।

(১) ধূপ ধুনা লইয়া নৃত্য; (২) সর্প নৃত্য; (৩) হিন্দুযোগী; (৪) রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতা—বীণাবাদিনী; (৫) মাড়োয়ারী নাচ—(৬) লাল ও কালো শাড়ী পরিয়া নাচ; Ruth St. Dennis খবর পাঠাইলেন—কবির আশীর্বাদ তিনি প্রার্থনা করেন; কবি stage এর ভিতর গেলেন—সেখানে একখানা আসনে তাঁকে বসাইয়া নর্তকীগণ তাঁকে নমস্কার করিলেন—পরে শেষ নাচটী হইল তারপর রবীন্দ্রনাথ—

"জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে—
জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।"

কবিতাটী আবৃত্তি করিলেন। ইহার পরেই যবনিকা পতন।

১৬ই ডিসেম্বর, ৩০শে অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার—

বাড়ীর পত্র পাইলাম এবং বাড়ীতে পত্র লিখিলাম। কাল রিহার্সাল হইয়াছে—আজও সকাল হইতে গানের রিহার্সাল হইতেছে। আমরা যে আলস্যের দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করিয়া কর্মস্রোতে ভাসিয়াছি, আপাততঃ ইহাই আমাদের পক্ষে মঙ্গলের লক্ষণ। কেন জানিনা তবু মনে হইতেছে—বর্তমান দুরবস্থার অন্ত হইতেছে আজ হইতে আমরা লাভের দিকে অগ্রসর হইব। হে ঈশ্বর, আমার এই কামনা সফল হউক।

গতরাত্রে রবীন্দ্রনাথ Trans Atlantic Serviceএর বড় জাহাজ "Europe"তে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হইলেন। সেখানে ২।৪ দিন থাকিয়া দেশে ফিরিবেন।

১৭ই ডিসেম্বর, ১লা পৌষ, বুধবার—

দুইদিন একটু উৎসাহ হইয়াছিল—আজ আবার অবসাদ। ভগবান, আর কত দিন? কবে এ সংসারের হাত হইতে মুক্তি পাইব! আমাদের প্রত্যেকের তৃষিত আকুল আঁখি

সপ্তসমুদ্রের পরপারে মাতৃভূমির দিকে চাহিয়া আছে হে ভারত জননী, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের লইয়া চল।

১৮ই ডিসেম্বর, ২রা পৌষ, বৃহস্পতিবার—

শুনিলাম, ২৯শে ডিসেম্বর আমাদের অভিনয় হইবে। শিশির বাবু বলিলেন শতকরা ৯৯ সম্ভাবনা। অবশ্য ইহার পূর্বে শতকরা ১০০ সম্ভাবনাও নষ্ট হইয়া গেছে। সুতরাং সত্য সত্য অভিনয় না হওয়া পর্যন্ত এখানে কিছুটা বিশ্বাস নাই। যারা ১১০০০ হাজার মাইল দূর হইতে থিয়েটারের দল আনাইয়া ২ মাস কাল শুধু বসাইয়া রাখে—তারা যে কি করিবে বা করিবে না, তাহা স্বয়ং ভগবানই জানেন।

১৯শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, ৩রা পৌষ—

মনের উপর এতদিন ধরিয়া যে অবসাদ পুঞ্জিভূত হইয়াছে তাহা কিছুতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছি না। কিছু অর্থ হাতে না আসা পর্যন্ত যথার্থ উৎসাহ আসিতেছে না। পূর্বে শুনিয়াছিলাম অভিনয়ের আগে নটনটীদের এক সপ্তাহের বেতন আগাম দিবে—এখন শুনিতেছি এক সপ্তাহ অভিনয়ের পর দিবে। এখানে আসিয়া আমরা এমনভাবে নিজেদের কৃতিত্ব হারাইয়া বসিয়া আছি যে, management এর পক্ষ হইতে যাহা বলিতেছে আমাদিগকে তাহাই করিতে হইতেছে—

"বনবাস, পরবাস, লুকায়িত ক্লীববেশে –
ভাবোন কি অধিক আর?"

*   *   *   *

ভগবানের কাছে শুধু প্রার্থনা

ধৈর্য দেহ শ্রীমধুসূদন—

এবারকার অভিনয়ে একটী নূতন "রামশ্লোক" সংযোজিত হইল। প্রাচীন পদ—মনোহর সুর—পূর্বে অপরেশ বাবুর "রামানুজে" গাওয়া হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ মঠ হইতে গানটি সংগৃহীত। রাধাচরণবাবু গাহিবেন—তাঁর জানা। এই স্তোত্রটি গাহিবার দিন হইতে ২৯শে অভিনয়ের প্রস্তাব হইয়াছে।

২০শে ডিসেম্বর শনিবার, ৪ঠা পৌষ—

বহুকাল পরে কাল দমকা খরচ করিয়াছি—সর্বশুদ্ধ ৫৫ সেণ্ট। কাগজ, কালি, নিব, Who is Who in film land. Newyork এ আসিয়া অবধি একসংগে এত খরচ আর করি নাই। কাল রাতে আলোচনা হইতেছিল—এখানে আমাদের অনেকগুলি নাটক অভিনয় করিতে হইবে—একখানি বই ক্রমান্বয়ে চলিবেনা। "সীতা", "দিগ্বিজয়ী", "সাজাহান" স্থির আছে। সামাজিক কি নাটক করা যাইতে পারে প্রশ্ন উঠিল। আধুনিক নাটক হইবে অথচ বাংলা সমাজের কোন কুৎসা তাহাতে নাই—এমন নাটক একখানিও পাওয়া গেল না। শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন—"দশ দিনের মধ্যে একখানা নাটক লিখিয়া দিতে পারিবেন—?"—আমি বলিলাম—"মনের এরূপ অবস্থায় সত্যকার ভাল জিনিষ লেখা অসম্ভব।" উত্তরে তিনি বলিলেন—"যদি সোমবার কিছু silver tonic দেওয়া যায়—?" আমি বলিলাম—"আশাকরা যায়—মনের temperature বাড়িবে—কিছু inspiration পাইতে পারি।"

Newyork এ আসিয়া প্রথমে একটি মাত্র ভাল অভিনয় দেখিয়াছি নিগ্রো থিয়েটারে—"Green Pasture" একথা পূর্বে লিখিয়াছি। ২৫শে অক্টোবর থিয়েটার দেখি। ঐ নাটকে Angel Gabriel-এর ভূমিকা যিনি অভিনয় করিতেন—কয়দিন হইল Taxi চাপা পড়িয়া ভদ্রলোক মারা গেছেন। মাত্র একদিন অভিনয় দেখা—তাতেই তাঁর সংগে যেন আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছিল—তাঁর সম্বন্ধে "Newyork American" কাগজে যাহা লিখিয়াছে, তাহা উদ্ধার করিলাম—ইহার মধ্য হইতে নিগ্রোজাতির বেদনা কিছু অনুভব করা যাইবে—লেখাটি প্রবন্ধ আকারে প্রকাশিত হইয়াছে "No color line in Heaven."

"There is a city, I want to go to, and its name is heaven." That is what Charles Wesley Hill (অভিনেতার নাম) used to sing in the Green Pastures, the play in which he acted the part of the Angel Gabriel.

He will sing the song for us no more, because last week he was killed by an automobile, and perhaps his wish has now been fulfilled.
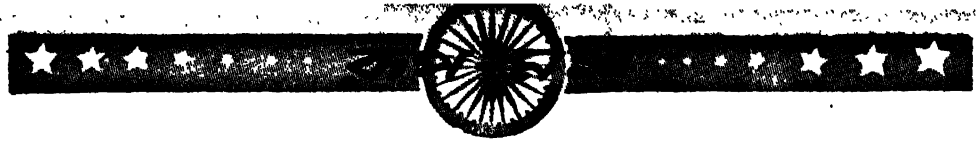
He was a colored man, a great actor and a fine human being. In that section of Newyork where most of the people of his race live, he was beloved because he played the part of Gabriel both on and off the stage. All of his race and white people too, are better for his having lived amongst us, because he has religion in him and he was sincere in his wish that after life he wanted to go to that city called Heaven.
He was colored man, but he was whiter than some of the people we know.
And those who believe in the hearafter should be proud if permitted to mingle with him in that City he used to sing about.
Editorial Appearing today in the Paul Block newspapers.

PAUL BLOCK
Publisher

২১শে ডিসেম্বর, রবিবার, ৫ই পৌষ—
আকাশে বাতাসে উৎসবের সাড়া পড়িয়াছে; রাস্তায়, খবরের কাগজে, লোকের মুখে Christmas এর কথা। অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক যুগের অন্তরে এখনো কোথায় এককণা আধ্যাত্ম জীবনের বীজ পড়িয়া আছে। বৎসর বৎসর তাহা অংকুরিত হয়—নব পল্লবে ভূষিত হয় আবার কোথা হইতে অবিশ্বাসের ভীষণ তুষারপাতে মৃত জড়বৎ হইয়া যায়—জাতীয় জীবনের বিপুল কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে তার অস্তিত্বের কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এমনই ভাবে আজ জগতের সর্বত্র মানব সমাজ—মানব সভ্যতা চলিয়াছে; প্রাচ্য জীবন ধারায় পশ্চিমের চেয়ে আধ্যাত্মিকতার স্থান বেশী, একথা আজ আর বলা যায় না। এবিষয়ে আমি মহাত্মা গান্ধীজির সংগে একমত—
"There is no such thing as Western or European Civilization ; but there is a modern form of Civilization which is purely material. The people of Europe, before they were touched with modern civilization, had much in common with the people of the East."

২২শে ডিসেম্বর, সোমবার, ৬ই পৌষ।
বিরেনবইয়ের ধাক্কাও বোধকরি ফস্কাইয়া গেল। ২৯শে অভিনয় কেমন করিয়া হইবে বুঝিতেছি না—আজও কিছুই ঠিক হয় নাই। আজ পাকা খবর পাওয়া যাবে—কাল লেখাপড়া—পরশু থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন এবং থিয়েটার বাড়ীতে রিহাসাল। "আজ কাল পরশু" বলিয়া কেমন কথার খেলাপ করিতে হয়—তাহা এই আমেরিকার থিয়েটার ম্যানেজারগণ যেমন জানে—এমন বোধ হয় পৃথিবীর আর কেহ নয়। আমাদের জোর করিয়া কোন কথা বলিবার উপায় নাই—আমরা—অত্যন্ত অসহায়। অসহায়ের উপর সুবিধা সবাই লইয়া থাকে আমাদের উপরও লইতেছে। অবশ্য আমাদেরও দোষ ত্রুটির অন্ত ছিলনা।

২৩শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার, ৭ই পৌষ।
Max Rhynehardt যখন এখানে এসেছিলেন তাঁর সংগে ছিলেন যাঁরা, তাঁরা সবাই Star Artist, তা সত্বেও তাঁদের থিয়েটার ৮ সপ্তাহের বেশী চলে নাই। German ভাষায় অভিনয় হইয়াছিল—এখানে শতকরা ২০ জন জর্মান ভাষা জানে এবং সেবার unemployment problem ছিলনা।

২৪শে ডিসেম্বর, বুধবার, ৮ই পৌষ।
আজ বড়দিনের অধিবাস। পরশু রাত থেকে বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সকালে উঠিয়া দেখি সমস্ত বাড়ী, ঘর, রাস্তা, মোটরগাড়ীর ছাদ সব সাদা হইয়া গেছে। ছেলেরা বরফের বল তৈয়ারী করিয়া খেলিতেছে। আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তাটি বেশ নির্জন—খুব অল্পলোকজন চলাচল করিতেছে—অনেকের মাথায় ছাতা—। পথিকের মধ্যে ১।১ জন পরস্পরের পায়ে বরফ ছুড়িয়া মারিতেছে। আমাদের এখানে মধুর "রামনাম" গান হইতেছে। আমার প্রবাসী অবসাদগ্রস্ত মনও অকারণ পুলকিত হইতেছে।

২৫শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ৯ই পৌষ।
আজ বড়দিন। সমস্ত দেশ আনন্দে মত্ত। ধনীরা সর্বত্র দরিদ্রগণকে দানদান করিতেছেন। আমাদের বর্তমান agent stockton পরিবারের সংগে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। সেখানে শিশিরবাবু ও শ্রীমতী কঙ্কা নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। শৈলেন্দ্র ঘোষ আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—কিন্তু আমাদের মনে সুখ নাই বলিয়া খাওয়ার উৎসাহ হয় নাই। বসন্ত বাবু আসিয়াছিলেন—একটীন সিগারেট উপহার দিয়াছেন। অত্যন্ত ধন্যবাদের সংগে গ্রহণ করিলাম—আগে দুইদিন দুইটিন উপহার দিয়াছিলেন। শুনিতেছি, আমাদের সমস্ত ঠিক হইয়া গেছে—৭ই জানুয়ারী হইতে অভিনয় আরম্ভ হইবে—দেখা যাউক কি হয়—। (ক্রমশঃ)

(রস-রচনা)

শ্রীসনৎ কুমার মৌলিক

সকাল বেলায় শীতল চক্রবর্তী চেঁচামেচি শুরু করেছে :—
ঘড়িটা কোথায় গেল? দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ঘুম থেকে উঠেই দেখি নেই। মাধুরী বলে :—তুমিই বা দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখ কেন? শীতল উষ্ণ হেসে বলে : দশ বচ্ছর হোল এখানে রাখছি, কিচ্ছু হোলনা আর আজ কিনা……। দশ বচ্ছরে কিছু হয়নি বলে যে আজ কিছু ঘটতে পারে না একথা তাকে বোঝায় কে? মাধুরী বলে : এ পাড়ায় যদু ঠাকুর্দা এত বছর পর্যন্ত বেঁচে কাল মারা গেলেন কেন? শীতল বলে :—তর্ক রাখো। বুঝতে পেরেছি ঘড়ি তুমিই লুকিয়ে রেখেছো। মাধুরী বিরক্তি প্রকাশ করে :—আঃ কি যে বলো! এখন কি আর সেই বয়স আছে যে, তুমি আমার ব্লাউজ লুকাবে আর আমি তোমার চশমা লুকাবো কিংবা ঘড়ি লুকাবো! শীতল চুপ করে বটে, কিন্তু মনটা চট্‌ফট্‌ করতে থাকে। ঘড়ি যাবে কোথায়? এর তো হাত-পা নেই যে হামাগুড়ি দেবে! বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েও নেই যে তারা নেবে। চাকরটাকে ডাকলে হয় না? সেই মুহূর্তে চাকরের ডাক পড়লো। লছমন্‌ কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির।

—আমার ঘড়িটা কোথায় গেল? তুই নিয়েছিস কিনা বল?

লছমন ভয়ে চোখ মিট্‌ মিট্‌ করে।

—তোকে থানায় পাঠাব। জলদি বল কোথায় রেখেছিস?

লছমন একটা ঢোক গিলে বলে :—সিরি সিরি গণেশ বাবাজী কা নাম লেকর কহে তুহু—হাম নেহি জানতা হেঁ আপ-কা ঘড়ি কাঁহা হ্যায়।

শীতল বলে : জানিস আমার বাবা দারোগা ছিলেন। চোর ধরা বেশী কঠিন নয়।

লছমন মনে মনে কিসের ভরসা পেয়ে ফস করে বলে বসে :—মেরা পিতাজী ভি পুলিশ মে কাম করতে থে। শীতল চটে যায় :—ব্যাটা তোর বাবা পুলিশ ছিল তা আমার কি? শীতলের রাগ দেখে মাধুরী ভয় পেয়ে যায়। কে জানে চাকরের গায়ে আবার হাত দিয়ে না বসেন। নতুন চাকর। যা দিনকাল পড়েছে। ও চলে গেলে আবার আর একটা পাওয়া তো মুস্কিলের কথা। মাধুরী বলে : যা লছমন, ঘড়িটা কোথায় গেল খুঁজে ছাখগে। লছমন ধীরে ধীরে চলে যায়। শীতল বলে : জানো মাধুরী ঘড়িটা ছিল বিয়ের। সেইজন্যেই বড় দুঃখ লাগছে। সবাই ঘড়ি খোঁজে। শীতল খোঁজে। লছমন খোঁজে। তবু ঘড়ি পাওয়া যায়না কেন?

অফিসে আসতে শীতলের আজ লেট হোল। বড় বাবু বল্লেন : কি শীতলবাবু, আপনার অফিস-লাইফে এই প্রথম লেট, কারণটা কি?

বাম হাতের কব্জির দিকে বার দুয়েক তাকিয়ে শীতল বল্ল : স্ত্রীর delivery হবে স্যার… তাই স্যার……এখনও কিছু হয়নি স্যার…।

ব্যাস্‌ আর বলতে হোলনা। না চাইতেই বড়বাবু তৎক্ষণাৎ তাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

বাড়ীতে এসে শীতল দেখে মাধুরী বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ নভেল পড়ছে। রাগে পিত্তি জ্বলে উঠলো। স্ত্রীর deliveryর ধোঁকা দিয়ে ছুটি পেয়ে গেল আর সেই স্ত্রী কি না…উঃ…

—বই না পড়ে ঘড়িটা খুঁজলেও তো পারতে?

মাধুরীর কানে কথাই গেলনা। তার চোখের সামনে তখন হত্যা, বিভীষিকা, লোমহর্ষ কাণ্ডকারখানা ঘটে যাচ্ছে। ঘরে আগুন লাগলে কিংবা চুলের মুঠি ধরে টানলেও মাধুরী টের পাবেনা। শীতল অনুমান করে—নিশ্চয়ই মাধুরী চুরি করেছে। শেষটায় নিজের স্ত্রীকে সন্দেহ করবে! আর ঘড়ি নিয়েই বা সে কি করবে! নাঃ, কিছুই বলা যায় না যা দিনকাল পড়েছে। আর স্ত্রীর আচরণও যখন রীতি-মতো সন্দেহজনক হোয়ে উঠেছে, তখন সন্দেহ না করে আর উপায় কি! এটাও লক্ষ্য করার মত, রাজ্যের এত বই থাকতে মাধুরীর বেছে বেছে ডিটেকটিভ কি এতই ভাল

লাগে ? দ্যাখোনাঃ এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে তবু মাধুরীর কোন হুঁসই নেই। জুতার মস্ মস্ শব্দ করতে করতে শীতল বাইরের ঘরে চলে যায়।

সাতসাতটি দিন মাধুরীর ওপর চোখ রাখল শীতল। মাধুরীর ওঠা-বসা-শোওয়া-খাওয়া তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করে। একদিন গোপনে সে মাধুরীর স্যুটকেশও search করে ফেলেছে। রহস্যের কোন কিনারা করতে পারছেনা। কি যে করা যায়। লছমনটাকে রোজই থানায় দেবার ভয় দেখান হচ্ছে। এত চেষ্টা করেও ঘড়ি পাওয়া যায়না কেন।

রাত্তের বেলা। কিসের একটা শব্দে শীতলের ঘুম ভেংগে গেল। মাধুরীকে বোবায় ধরল নাকি ?

কদ্দিন নিষেধ করেছে— চিৎ হোয়ে শুয়োনা—শুয়োনা। তবু কানে কথাই তোলেনা। ওই আবার একটা শব্দ হোল না ? নাঃ, এ শব্দতো বোবায় ধরার শব্দ নয়। তবে ? জোড়াসন হোয়ে সে বসল। হাঁ, এবার বুঝেছে শব্দটা ওপরের ceiling থেকে আসছে। চোর ? হায়রে। ঘড়ি নিয়ে চোরের সখ মেটেনি। নাঃ চোরই বা ceiling-এর ওপরে উঠতে যাবে কেন ? মাধুরীকে একটা ঠেলা দিয়ে ডাকল :—ওগো শুনছো ? ওগো… কার সাধ্যি তাকে জাগায় ! নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকে সে ! কি আশ্চর্য ! রাতের পর রাত parallel ভাবে দুজনে শুয়ে আসছে অথচ শীতল জানেনা যে মাধুরীর নাক ডাকে। মেয়েমানুষের নাক ডাকে ! বাঃ, ভারি কৌতুক বোধ হচ্ছে। ঘড়ির শোক না থাকলে ওর নাকের ফুটোতে নস্যির গুড়ো দিয়ে মজা করতো। ঘড়ির শোকে মনটাই ভেংগে গেছে। ঘড়ির চিন্তা করতে করতে সে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালবেলা। ঘুম ভাংগার সংগে সংগে ঘড়ির জন্য শীতলের মন খারাপ লাগে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই প্রথম নজরে পরলো অনেকদিনকার ceilingটা একেবারে মশারীর ওপর ভেংগে পড়েছে। টুকরো টুকরো কাপড়ে, টুকরো টুকরো কাগজে মশারীর ওপর এক বিরাট জঞ্জাল। মাধুরীও ঘুম থেকে উঠলো। আজ উঠতে তার দেরী হোয়ে গেছে। সেও এই জঞ্জাল দেখে বিস্মিত হোয়ে যায়। শীতল বলে : মাধুরী এ জঞ্জাল সাফ করার বন্দোবস্ত করো। এমন সময় ঝপাস করে বাক্স বিহীন ঘড়ি ceiling থেকে মশারীর ওপর পড়লো। বাক্সটা কি হোল, কোথায় গেল বোঝা গেল না বা তখনকার মত বুঝবার জন্য শীতল চেষ্টাও করল না।

শীতল তৎক্ষণাৎ ঘড়িটা তুলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো তারপর সে চীৎকার করে ওঠে :—আমি পেয়েছি। আমি পেয়েছি।

শীতল আনন্দে এত জোরে চীৎকার করে ওঠে যে লছমন পর্যন্ত দৌড়ে এসে ঘরে ঢোকে। শীতল ঘড়িটা একবার কানের কাছে নিচ্ছে, একবার বুকের কাছে নিচ্ছে, একবার চোখের সামনে ধরছে। ঘড়ি নিয়ে যে কি করবে সে তাই ঠিক করতে পারছে না।

মাধুরী বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকিয়ে বলে :—

আমার মনে একবার সন্দেহ হোয়েছিল যে, এ হয়তো গণেশবাহনের কীর্তি।

লছমন হাত নেড়ে বলে :—মাঈজী-বাহন-টাহন নেহি সমঝতে হেঁ। এহি হ্যায় সিরি সিরি গণেশ বাবাজীকা কিরপা।

এই বলে সে গণেশবাবাজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।
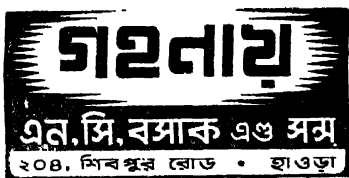
শ্রীপার্থিবের সংগে চরিত্রাভিনেতা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার

চরিত্রাভিনেতা হিসাবে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষতা আশা করি কোন বাঙ্গালা চিত্র ও নাট্যামোদীই অস্বীকার করতে পারবেন না। বিভিন্ন ধরণের চরিত্রে বিভিন্ন রূপসজ্জায় চিত্র ও নাট্যের মাধ্যমে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে আমাদের পরিচয় হ'য়েছে—কিন্তু আজ অবধি কোন চরিত্রেই তাঁকে ব্যর্থ হ'তে দেখিনি। বরং স্ফুটোম্মুখ ফুলের কুঁড়ির মত তাঁর অভিনয় ক্ষমতা দিন দিন বিকশিত হ'য়ে উঠছে। কৌতুকাভিনেতা রূপেও কানু বন্দ্যোঃ কর্ম দক্ষতার পরিচয় দেননি। বরং নিছক কৌতুকাভিনেতা রূপে যাঁরা আমাদের হাসিয়ে থাকেন, তাঁদের ভাড়ামী অনেক সময়ই অসহ্য হ'য়ে ওঠে। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভাড়ামীর অভিযোগ কোন সময়েই কাউকে আনতে দেখা যায়নি। খল ও কুটীল চরিত্রের অভিনয়ে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এতই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন যে, এরূপ কোন চরিত্রে তাঁকে দেখবার সংগে সংগেই দর্শকমন বিষিয়ে ওঠে। আবার দুঃখীর ইমানে জামালের ভূমিকায় তাঁর সকরুণ অভিনয় আমাদের অন্তর স্পর্শ না করে পারেনি।

২০শে জুন, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মানভূমের যোধপুরে মধ্যস্থিত পাঁচভদ্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। চিত্র ও নাট্যপ্রিয় জনসাধারণের কাছে কানু নামে পরিচিত হ'লেও, এঁর আসল নাম হচ্ছে কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কানু বন্দ্যোর পিতা উত্তর দক্ষিণ ভারতের রাজস্ব বিভাগে কাজ করতেন। মানভূমেই তাঁকে বসবাস করতে হয়। কিন্তু এঁদের পৈতৃক বাড়ী হচ্ছে বেহালায়। পিতামাতার পাঁচটি পুত্র ও চারিটি কন্যা সন্তানের মধ্যে কানু ষষ্ঠ এবং পুত্রদের মধ্যে তৃতীয়। কানুর যখন মাত্র দুই বৎসর বয়স, কানুর পিতা চাকরী জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য টালাতে এসে বসবাস করতে থাকেন। বর্তমানে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের অন্যান্যদের সংগে টালাস্থিত ১১।এ, বনমালী চাটুজ্জে ষ্ট্রীটেই বসবাস কচ্ছেন।

কানুর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় টালাস্থিত ধরণীধর পাঠশালাতে। তারপর ভারতী শিক্ষা মন্দিরে কিছুদিন পড়বার পর কাশীমবাজার পলিটেকনিক স্কুল থেকে কানু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'যে উচ্চ শিক্ষার জন্য সিটি কলেজে ভর্তি হয়। ভারতী শিক্ষা মন্দিরে কানু যখন চতুর্থ মানের ছাত্র, তখন তাঁর বয়স দশ-এগারো বৎসর হবে। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন মহাশয়ের আগ্রহ এবং উৎসাহে বাগবাজারস্থিত স্বর্গত নন্দলাল বসু মহাশয়ের বাড়ীতে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কানু অংশ গ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বর্গতঃ রসরাজ অমৃতলাল। কানু একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে। তাঁর আবৃত্তি সবজন প্রশংসায় ধন্য হ'য়ে ওঠে। বলতে গেলে এই থেকেই অভিনয়ের প্রতি কানুর ঝোঁক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। হরিপদবাবুর পুত্র স্বনাম ধন্য মঞ্চশিল্পী শ্রীযুক্ত কিরীট সেন কানুর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সহপাঠী। কানু যখন কাশীমবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র, তখন স্কুলের প্রত্যেকটি অভিনয়ানুষ্ঠানেই সংক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকে।

কানুর পিতা কোনদিনই পুত্রের নাট্য-প্রীতিতে বাধাও যেমনি দেন নি—উৎসাহিতও তেমনি করেননি। এই সময় কানু খুব ভাল গান গাইতে জানতো। প্রবেশিকা পরীক্ষা দেবার পর কানু সর্বপ্রথম সোখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে 'অহল্যার' ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। টালার সানডে ক্লাবের স্বর্গতঃ তুলসী
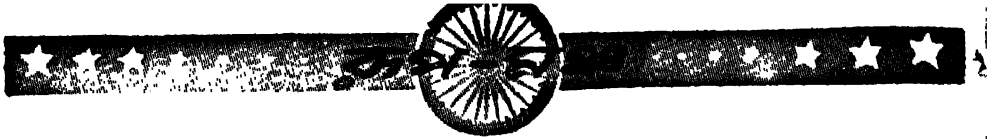
চরণ দাস মহাশয়ের কাছ থেকে কানু উক্ত ভূমিকায় অভিনয়োপযোগী শিক্ষালাভ করে। এর পর থেকেই বিভিন্ন সৌখীন নাট্য-সম্প্রদায়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নাটকাভিনয়ে কানু অংশ গ্রহণ করতে থাকে। তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্ত্রী ভূমিকায় কানুকে অভিনয় করতে হ'ত। এগুলির ভিতর প্রতাপাদিত্যে কাত্যায়নী, [illegible] যামিনী, লাখটাকায় [illegible] স্ত্রী, প্রফুল্লে—জগমণি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বপ্রথম পুরুষ ভূমিকায় অভিনয় করেন সান্ধ্য সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলমগীর নাটকের কামবক্সের ভূমিকায়। স্বর্গত রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় রাম ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। সানডে ক্লাব ও সান্ধ্য সমিতির উদ্যোগে অভিনীত আরও বিভিন্ন নাটকে কানুবাবু সাফল্যের সংগে অভিনয় করেন—তার ভিতর ক্ষত্রবীর—অর্জুন, পাণ্ডবগৌরব—শ্রীকৃষ্ণ, জনা—অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বসুদেব ও শিশুপাল, বিল্বমঙ্গল—সাধক, প্রতাপাদিত্য—রডা, বিক্রমাদিত্য, হরিশ্চন্দ্র, বামনক, [illegible]—মৃগাঙ্ক, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সান্ধ্য সমিতির তৎকালীন সভ্যদের ভিতর যারা পরবর্তী কালে সাধারণ অভিনয় ক্ষেত্রে যোগদান করেন, তাদের মধ্যে [illegible] কুমার, ভূমেন রায় ও স্বর্গত রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কানু বন্দ্যো: সর্বপ্রথমে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন ই, আই আর এ। এই সময়েই তিনি সান্ধ্যসমিতির সংস্পর্শে আসেন। ই, আই, আর-এ এক বৎসর কাজ করবার পর কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের ডাক বিভাগে যোগদান করেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ অবধি ডাক বিভাগে সসম্মানে কাজ করে জুন মাসে কানুবাবু অবসর গ্রহণ করেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় পোষ্টাল ক্লাবের উদ্যোগে বিজয়া এবং প্রফুল্ল নাটক মঞ্চস্থ হয়। কানুবাবু যথাক্রমে নরেন ও জগমণির ভূমিকাভিনয় করেন।

১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দ হবে, স্বর্গত নট ও নাট্যকার যোগেশ চৌধুরী মহাশয়ই সর্বপ্রথম নাট্যাচার্য শিশির কুমারের সংগে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিচয় করিয়ে দেন। তখন শিশির কুমার কর্ণওয়ালিস নাট্য-মঞ্চে ছিলেন। প্রথম একবার যখন কানুবাবু তার সংগে দেখা করতে যান, শিশিরকুমার নানাভাবে তাকে পেশাদার শিল্প জীবনের পথ থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দেন। দ্বিতীয়বার কানু যখন নাট্যাচার্যের সামনে এসে উপস্থিত হ'লেন, তার মনে শংকা ও ভয় [illegible] ছিল। কিন্তু সমস্ত কিছুকে দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি নাট্যাচার্যের কাছে উপস্থিত হলেন। বিচিত্রা ষ্টেজে আলমগীর এর মহলা নিয়ে তখন নাট্যাচার্য ব্যস্ত ছিলেন। কয়েকটী প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদের পর নাট্যাচার্য কানুবাবুকে আলমগীর নাটকে গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। কানুবাবু বিক্রমসোলাঙ্কীর ভূমিকায় নির্বাচিত হ'লেন। পেশাদার শিল্প গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে কানুবাবু সর্বপ্রথম আলমগীর নাটকেই আত্মপ্রকাশ করেন। পেশাদার সম্প্রদায়ে তার প্রথম রজনীর অভিনয় শ্রীরামপুর টকীজে অনুষ্ঠিত হয়। সেবারকার নবীনের প্রথম অভিনয় দূরদর্শী নাট্যাচার্যের দৃষ্টিতে আশার আলোক নিয়ে [illegible] উঠে। তিনি কানুর অভিনয়ে খুবই মুগ্ধ হন। শ্রীরামপুরের অভিনয়ের পর শিশির সম্প্রদায় পাটনা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণে বের হন। এবং আলমগীর, ষোড়শী, প্রফুল্ল, শেষরক্ষা, চন্দ্রগুপ্ত, রমা, সীতা প্রভৃতি নাটক অভিনয় করেন। কানুবাবু প্রতিটি নাটকেই অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় এক মাস ভারতের বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করবার পর নাট্যাচার্য তার দলবল নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ষ্টার রঙ্গমঞ্চের পরিচালনা ভার গ্রহণ করে নব নাট্য-মন্দির নাম দিয়ে নব দ্বারোদ্ঘাটন করেন। কলকাতা মহানগরীতে সর্বপ্রথম

কানুবাবু এবার নাট্যামোদীদের অভিবাদন জানালেন শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব রচিত 'ফুলের আয়না' নাটকে বণিকের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বিরাজ বৌ—নিতাই গাঙ্গুলী, সরমা—শারণ, শ্যামা—বজ্রসেন, প্রফুল্ল—ভজহরি, আলমগীর—কামবক্স, এরাদৎ খাঁ, সীতা—দুর্মুখ, অশ্বরক্ষক, রীতিমত নাটক—দীবেন্দু, প্রমোদ ডাক্তার, বিজয়া—রাসবিহারী, নরেন, যোগাযোগ—নবীনকৃষ্ণ প্রভৃতি নাটকের উল্লিখিত চরিত্রগুলি পরম নিষ্ঠার সংগে অভিনয় করেন। যোগাযোগে প্রথমে কানুবাবুর কোন নির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল না। অভিনয়ারম্ভের একদিন পূর্বে তাকে শেষ পর্যন্ত নবীন কৃষ্ণের ভূমিকাটি বণ্টন করা হয়। তিনি আপ্রাণ চেষ্টায় চরিত্রটিকে অভিনয়োপযোগী আয়ত্ত করে ফেলেন। তাঁর এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না। এমন কী কবিগুরুর আশীর্বাদেও তা ধন্য হ'য়ে ওঠে। যোগাযোগ ও রীতিমত নাটকের অভিনয় কবিগুরু দেখে খুব খুশী হ'য়েছিলেন এবং তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কানুবাবুকে ডাকিয়ে নিয়ে বলেছিলেন: তোমার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়েছিলাম—তোমার স্ত্রীর অভিনয়ও আমি উপভোগ করেছিলাম (স্ত্রী—মতির মা—রাণীবালা অভিনয় করেছিলেন)।

এর কিছুদিন পরে শিশিরকুমার স্টার বোর্ড পরিত্যাগ করেন এবং পুনরায় দলবল নিয়ে মফঃস্বল সফরে বেরিয়ে পড়েন। শিশির সম্প্রদায় এবার রংপুর, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন নাটক সাফল্যের সংগে অভিনয় করে

রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে রূপ-মঞ্চ কর্মী ও অন্যান্যদের সংগে আলোচনা রত কানু বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁদিক থেকে: মহেন্দ্র গুপ্ত, নির্মল ঘোষাল, কানু বন্দ্যো, ফণীন্দ্র পাল, পুষ্পকেতু মণ্ডল ও দেবু মুখো: চিত্রগ্রহণ: রূপ মঞ্চ

কলকাতায় ফিরে আসেন। কলকাতায় এসে শিশিরকুমার পুনরায় কর্ণওয়ালিস বোর্ড-এর কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করলেন এবং নরনারায়ণ ও অন্যান্য পুরোণ নাটকগুলি মঞ্চস্থ করতে থাকেন। নরনারায়ণ নাটকে কানুবাবু শকুনির ভূমিকাভিনয় করেন। এর পরই শিশিরকুমারকে আমরা দেখতে পাই শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে। কানু বন্দ্যো ছায়ার মত এখানেও তাঁর নাট্যগুরু—এযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভাকে অনুসরণ করে চলেন। নিতাই ভট্টাচার্য রচিত উড়ো চিঠি নাটক দিয়ে নাট্যাচার্য শ্রীরঙ্গমের দ্বারোদ্ঘাটন করেন—কানু হেমন্ত মাষ্টারের চরিত্রে অভিনয় করেন। শ্রীরঙ্গমে অভিনীত মায়া, দেশবন্ধু, মাইকেল, বিপ্রদাস প্রভৃতি নতুন নাটকগুলিতে কানুর অভিনয় প্রতিভা দিন দিন বিকাশ লাভ করে নাট্যামোদীদের প্রশংসার্জন করে। কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের মত শিশির সম্প্রদায়ের সংগে এই প্রথমবার তাঁর বিচ্ছেদ ঘটলো। কানু মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে যোগদান করলেন এবং রাষ্ট্র বিপ্লব, দেবদাস প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করবার পর পুনরায় শ্রীরঙ্গমে ফিরে আসেন এবং উল্কা ও দুঃখীর ইমান নাটকে অভিনয় করেন। দুঃখীর ইমান নাটকে কানুর জামালের ভূমিকাভিনয়—তাঁর অভিনেতা জীবনে আশাতীত গৌরব এনে দেয়। কানুর অপূর্ব নটদক্ষতায় দুঃখীর ইমানের জামাল এক অপরূপ রূপ নিয়ে সর্ব শ্রেণীর নাট্যামোদীদের প্রশংসায় ধন্য হ'য়ে ওঠে। দুঃখীর ইমানের পর শিশির সম্প্রদায়ের সংগে আবার কানু বাবুর বিচ্ছেদ ঘটে। এবার তিনি রঙমহল রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। রঙমহলে তখন মনোজবাবুর নতুন নাটক 'বিপর্যয়' অভিনীত হবার তোড়জোড় চলছে। কানু বিপর্যয়ে হরিহরের ভূমিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন এবং অন্যান্য পুরোণ নাটকেও অংশ গ্রহণ করেন। রংমহলের সংগেও কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচ্ছেদ ঘটে ও রঙমহল পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে তিনি এখন পর্যন্ত আর কোন রঙ্গালয়ে যোগদান করেন নি।

পেশাদার রংগমঞ্চের সংগে জড়িত কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চ জীবনের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে খানিকটা দেওয়া হ'লো। এবার তাঁর চিত্র জীবন নিয়ে কিছুটা বলবো।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দ হবে—বলতে গেলে তখনও নির্বাক চিত্রেরই যুগ। কানুবাবু ছায়া চিত্রে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেন দুর্গেশনন্দিনী চিত্রে একটী 'মুপার' চরিত্রে। সবাক চিত্রে তিনি সর্বপ্রথম অভিনয় করেন 'শুভ ব্রহস্পর্শ চিত্রে'। 'শুভ ব্রহস্পর্শ' পরিচালনা করেন খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অখিল নিয়োগী। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত দ্বিতীয় সবাক চিত্র হ'লো শশীনাথ। শশীনাথ স্বর্গত কর্মযোগী রায় ও শ্রীযুক্ত গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় গৃহীত হয়। এরপর কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দেখতে পাই রাজগী, সাথী, পরাজয়, ডাক্তার, মায়ের প্রাণ, শাপমুক্তি, রিক্তা, প্রতিশোধ, ভাটিনার বিচার, অভয়ের বিয়ে, পাষাণ-দেবতা, রাজ কুমারের নির্বাসন, এপার ওপার, অভিযোগ, নন্দিতা, নন্দিনী, সংসার থেকে দূরে, অভিনয় নয়, গরমিল, সহধর্মিনী, ভাবীকাল, দম্পতি, রাত্রি, সাধারণ মেয়ে, জয়যাত্রা, পথ বেঁধে দিল
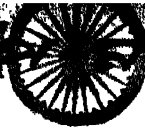
বিদেশিনী, পূরবী, নিবেদিতা, প্রিয়তমা, মায়ের ডাক, নতুন বৌ, বিশবছর আগে, মাতৃহারা, গৃহলক্ষ্মী, কতদূর, আকৃতি, মহাকবি কালিদাস, ছদ্মবেশী, মন্দির, দোটানা, স্বামীর ঘর, চোরাবালী, বিরিঞ্চি বাবা, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, মহাকাল, রায়চৌধুরী, মানে না মানা, সর্বহারা, রাঙামাটি প্রভৃতি চিত্রে। বর্তমানে কানুবাবু অনুরাধা, পরশপাথর, কুয়াসা, মহাসম্পদ এবং সুকুমার দাশগুপ্তের নতুন চিত্রে (সাময়িকভাবে 'আভিজাত্য' নাম রাখা হ'য়েছে) অভিনয় কচ্ছেন।

এপর্যন্ত যতগুলি নাটকে কানুবাবু অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে দুঃখীর ইমানের জামালের চেয়ে আর কোন চরিত্রই তাঁকে তত বেশী খুশী করতে পারেনি। এই চরিত্রটীকে নিজের অভিনয় প্রতিভায় যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে তিনি নিজেও কম পরিশ্রম করেননি। যতদিন উক্ত চরিত্রে তাঁকে অভিনয় করতে হ'য়েছে, ততদিন দিনের বেলা তিনি কিছু খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুভুক্ষুপীড়িতের আর্তির ও অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে এরূপ কৃচ্ছতা অবলম্বন ক'রে অভিনয় শেষেই তিনি কেবল অন্ন গ্রহণ করতেন। চিত্রাভিনয়ের ভিতর শাপমুক্তি, বিশবছর আগে ও সর্বহারার (দুঃখীর ইমানের চিত্ররূপ) অভিনয় ব্যক্তিগতভাবে কানুবাবুকে খুশী করে। যেসব পরিচালকদের সংস্পর্শে কানুবাবু এসেছেন—তাঁদের প্রতিভার বিশ্লেষণ করে কোন রায় দিতে কানুবাবু নারাজ, তবে যাঁদের ব্যক্তিগত ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করে, তাঁদের ভিতর নাম করতে হয় প্রেমেন্দ্র মিত্র, নীরেন লাহিড়ী, সুকুমার দাশগুপ্ত, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্ল রায়ের। শিশির যুগের মঞ্চশিল্পীদের ভিতর শিশিরকুমারকে বাদ দিয়ে স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরী, স্বর্গতঃ রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বর্গতঃ শৈলেন চৌধুরী কানুবাবুর বিচারে সবচেয়ে বেশী প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা ছিলেন। এঁদের বাইরেও বহু প্রতিভা সম্পন্ন শিল্পী রয়েছেন। কিন্তু কানু বন্দ্যো বলেন: এঁদের একজনে যদি কোন বিশেষ ধরণের চরিত্রে একবার দক্ষতার পরিচয় দিলেনত, আর রক্ষা নেই। অনুরূপ ধরণের ভূমিকা ছাড়া তিনি আর কোন ভূমিকাভিনয় করবার সুযোগ পাবেন না। এতে সত্যকার প্রতিভা কখনই বিকাশ লাভ করতে পারেনা। তারপর মঞ্চশিক্ষকেরা কোন অনুল্লেখযোগ্য ভূমিকায়ও অভিনেত্রীদের গড়ে তুলবার জন্য যতখানি পরিশ্রম করেন—অভিনেতাদের সময় তার অর্ধেক কষ্ট স্বীকার করেন কিনাও সন্দেহ। মঞ্চ কর্তৃপক্ষের এই অবহেলার জন্য—বহু প্রতিভাই সকলের অজ্ঞাতে ঝরে পড়ে। এই প্রসঙ্গে কানুবাবু কয়েকজন অভিনেতার নামোল্লেখ করেন—সুযোগের অভাবে যাঁরা ততটা খ্যাতি অর্জন করতে পারেন নি, যেমন, স্বর্গতঃ শীতল পাল, হীরালাল দত্ত, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ হালদার, জীবেন বসু, [illegible] মুখোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন গোসাঁই, [illegible] মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নিজের সম্পর্কে বলতে যেয়েও কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি নিজেও আমার কর্মানুযায়ী সুযোগ খুব কমই পেয়েছি। বর্তমান অভিনেতাদের [illegible] মিত্র ও [illegible] সিংহের [illegible] প্রশংসা করেন। মঞ্চাভিনেত্রীদের [illegible] ও রাণীবালা কানুর প্রিয়। মঞ্চ এবং চিত্রাভিনেত্রীদের ভিতর মলিনার অভিনয় দক্ষতার প্রতি কানুর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। স্বর্গতঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শচীন্দ্র সেনগুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী নাট্যকারদের মধ্যে কেবলমাত্র এঁদেরই সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য কানুবাবুর হ'য়েছে। এঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ না হ'য়ে পারেননি। বিশেষ করে প্রথমোক্ত দু'জনের কাছে তিনি [illegible] কৃতজ্ঞ। স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরীর সহযোগিতায়ই তিনি এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য-প্রতিভার শিষ্যত্ব লাভের সুযোগ পেয়ে ধন্য হ'য়ে উঠেছেন। দ্বিতীয় জনের কথা বলতে যেয়ে বলেন—এযুগের শক্তিমান বিপ্লবী নাট্যকার হিসাবে শচীনদা শুধু আমারই শ্রদ্ধার্জন করেন নি—নাট্যকার হিসাবে তিনি সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয়—তিনি আমাদের 'শচীনদা' এর চেয়ে আর বেশী কিছু বলা যায়ও না—প্রয়োজনও করেনা। চিত্র বা নাট্য প্রযোজনা বা পরিচালনা করবার ইচ্ছা আছে কিনা একথা কানুবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি সরাসরি উত্তর দেন: না ওসব

বাসনা আমার নেই : আমি অভিনেতা রূপেই জনসাধারণের আশীর্বাদ লাভ করতে চাই—আমি চাই নতুন নতুন এমন ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পেতে, যাতে অন্ততঃ নিজেকে একবার যাঁচাই করে দেখতে পারি, সত্যি আমার অভিনয় ক্ষমতা কতটুকু আছে না আছে?

মঞ্চ এবং প্রযোগশালার নানান দুর্নীতির মধ্যে কানুবাবু যেটির প্রতি বিশেষ জোর দেন, তা হচ্ছে নিম্নশ্রেণীর শিল্পীদের প্রতি কর্তৃপক্ষ স্থানীয়দের দুর্ব্যবহার। এঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানান।

নতুনদের জন্য অভিনয় শিক্ষার উপযোগী রূপ-মঞ্চ পরিকল্পিত নাট্য-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তাকে কানুবাবু আন্তরিক ভাবে সমর্থন করেন।

অভিনয়ের বাইরে বাগানের কাজ এবং পড়াশুনার ভিতর দিয়ে সময় কাটিয়ে দিতে কানুবাবু ভালবাসেন। রাজনীতির ছায়াও কানুবাবুকে ভীত করে তোলে। যেখানেই রাজনীতির কচকচানি—সেখান থেকে কানে আঙুল দিয়ে কানু বাবু গা ঢাকা দিয়ে থাকেন। এক সময় ফুটবল ও ব্যাডমিনটন খেলায় কানু বাবুর যথেষ্ট পারদর্শিতা ছিল। খাদ্যদ্রব্যের ভিতর কোন জিনিষটি কানুবাবুর সবচেয়ে বেশী প্রিয়, একথার উত্তর দিতে যেয়ে কানুবাবু যখন বলেন : বড় চিংড়ী মাছের মাথা ভাজার মত আর কিছুই নয়—তখন উক্ত সুস্বাদু খাদ্যবস্তুটির কথা মনে হতে কানু বাবুর জিবও এমনি লক লকিয়ে উঠেছিল যে, আমরা উপস্থিতদের ভিতর কেউই না হেসে থাকতে পারিনি। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে কানুবাবু বিবাহ করেন। বর্তমানে তিনি ছটি সন্তানের পিতা। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কানুবাবুর পিতৃ বিয়োগ ঘটে এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মাতৃ বিয়োগ হয়। কানুবাবুর অভিনীত নাটক এবং চিত্র তাঁর মা একাধিকবার দেখেছেন এবং পুত্রকে অকৃপণ আশীর্বাদে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতি কামনা করে গেছেন। কানুবাবু যখন ডাকবিভাগের কাজ করতেন—ডাক বিভাগের উচ্চ কর্মচারী থেকে সকলেই তাঁকে প্রীতির চোখে দেখতেন। কেবল মাত্র তাঁদেরই সহযোগিতায় অফিসের কাজ করে তাঁর পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব হ'য়েছে। এঁদের ভিতর ক্যাপ্টেন পি, সি বসু, (এ, পি, এম্ জি) ক্যাপ্টেন শ্রীশচন্দ্র বসু (প্রেসিডেন্সী পোষ্ট মাষ্টার), মণীগোপাল ঘোষ, জিতেন বন্দ্যোপাধ্যায়, তড়িৎ দাশ, রাজেন্দ্রলাল দে প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রূপ-মঞ্চ কার্য্যালয়ে আমাদের সংগে কানু বাবুর সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের উভয়ের বন্ধু সহকারী চিত্র পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবী মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ পরস্পরের সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হ'য়েছিল। আলোচনার সময় শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্র পাল, পুষ্পকেতু মণ্ডল, দেবু মুখোপাধ্যায়, স্নেহেন্দ্র গুপ্ত, রূপ-মঞ্চ সম্পাদক ও আমি উপস্থিত ছিলাম। আলোচনার সময় সম্পাদক কানু বাবু ও অন্যান্যদের কতগুলি চিত্রগ্রহণ করেন। এখানে কেবলমাত্র তার একখানাই দেওয়া হ'লো—বাকীগুলি রেখে দেওয়া হ'য়েছে রূপ-মঞ্চের পাঠাগারের সংগ্রাহক বিভাগে। প্রায় তিন ঘণ্টা কানু বাবু আমাদের মধ্যে ছিলেন। নানান খোসগল্পে অভিনয়ের মতই তিনি আমাদের মজিয়ে রেখে ছিলেন।

—শ্রীপার্থিব

'এ্যাকাডেমী এ্যাওয়াডস' বলতে এ্যাকাডেমী অব মোশন পিকচার্স আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সেস কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারকেই বলা হ'য়ে থাকে। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে, এ্যাকাডেমী অফ মোশন পিকচার্স আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর সভ্য সংখ্যা ছিল ২৪০ জন। বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১২,০০০ হাজারের ওপর দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সর্বদেশে এঁদের সভ্য রয়েছেন এবং তাঁরা চিত্রজগতের প্রযোজক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক, লেখক, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি শ্রেণীর। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পুরস্কার ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ থেকে অসকার্স (Oscars) নামে অভিহিত হ'য়ে আসছে। 'অসকার্স' নামের পেছনেও একটা কাহিনী জড়িয়ে আছে। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'ডেনজারাস' চিত্রে অপূর্ব অভিনয় করে বেটি ডেভিস সর্বপ্রথম যখন এ্যাকাডেমী এ্যাওয়ার্ডে ভূষিতা হ'লেন—তিনি তাঁর পুরস্কারের নিদর্শনটিকে আদর করে তাঁর তদানীন্তন স্বামী হারমন অসকার নেলসন-এর ডাক নাম ওসকার বলে অভিহিত করতেন। সেই থেকে এ্যাওয়ার্ডের নিদর্শনটি ওসকার নামে পরিচিত হ'য়ে আসছে। সমিতির সভ্যরাই প্রতি বছর চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিষয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করে এ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর নানান দেশে সভ্য থাকলেও, এ্যাকাডেমি অফ মোশন পিকচার্স আর্টস এ্যাণ্ড সায়েন্সেস-এর মূল কার্যালয় আমেরিকায় অবস্থিত। এবং পুরস্কার বিতরণী উৎসব হলিউডেই অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে। যখন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'তে পারেন না, তখন এ্যাকাডেমী থেকে কোন প্রতিনিধি মারফৎ তাঁর পুরস্কার পৌঁছে দেওয়া হ'য়ে থাকে। যেমন লরেন্স অলিভার 'হেনরী দি ফিফথ'-এর জন্য যখন এ্যাওয়ার্ড পেলেন, তিনি হলিউডে উপস্থিত থেকে ব্যক্তিগতভাবে সে এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ, হ্যামলেটের কাজ নিয়ে তিনি তখন ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৭-এর জুন মাসে ব্রিটেনের ডেনহাম ষ্টুডিওতে হলিউড থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হ'লো লরেন্স অলিভারের কাছে এ্যাওয়ার্ডটি পৌঁছে দিতে। 'রূপ মঞ্চের' পাঠক সাধারণের জ্ঞাতার্থে এ পর্যন্ত যে সব বৈদেশিক শিল্পী ও বিশেষজ্ঞরা এ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত হ'য়েছেন, বর্ষানুক্রমে তাঁদের নাম এখানে উল্লেখ কচ্ছি।

১৯২৭—১৯২৮ঃ অভিনেতা এমিল জেনীংস (ওয়ে অফ অল ফ্লেস এবং লাষ্ট কমাণ্ড চিত্রে)।

এ্যাকাডেমী এ্যাওয়াডস (Academy Awards)

গত দুই সংখ্যার রূপ-মঞ্চে ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ডের প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হওয়াতে বহু পাঠক-পাঠিকা এ্যাকাডেমী এ্যাওয়ার্ডের সংগে তাকে জড়িয়ে নিয়ে—নানান ভ্রান্তিকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। তাঁদের সেই শান্তি দূর করতে এ্যাকাডেমী এ্যাওয়ার্ডস সম্পর্কে একটু পরিষ্কার করে বলে নিতে চাই। ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ড কেবলমাত্র বৃটিশ চলচ্চিত্রের সর্বাংগীন উন্নতিকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে এবং এর পরিচালনার পুরোভাগে রয়েছেন "ডেইলী মেল" পত্রিকা। আর কেবলমাত্র বৃটিশ জনসাধারণই বৃটিশ চিত্রগুলি সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে বৃটেনে ব্রিটিশ ন্যাশনাল ফিল্ম এ্যাওয়ার্ডের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯২৯-৩০ : অভিনেতা : জর্জ আরলীস (ডিজরেলী চিত্রে)। অভিনেত্রী : নর্মা শীয়ারার (ডাইভোর্স চিত্রে)। পরিচালক : লুই মাইলসষ্টোন অল কোয়াইট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট)। শ্রেষ্ঠ চিত্র : অল কোয়াইট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট (ইউনিভারস্যাল)।

১৯৩০-৩১ : অভিনেতা : লাওনেল ব্যারীমুর (এ ফ্রি সোল চিত্রে)। অভিনেত্রী : মেরী ড্রেসলার '(মিন এ্যাণ্ড বিল' চিত্রে)। পরিচালক : নরম্যান তাউরোগ (স্কিপি চিত্রের জন্য। শ্রেষ্ঠ চিত্র : সিমারোন (রেডিও)।

১৯৩১-৩২ : অভিনেতা : ফ্রেড্রিক মার্চ (ডাঃ জেকিল এ্যাণ্ড মিঃ হাইড চিত্রে)। অভিনেত্রী : হেলেন হাইজ (দি সিন অফ মেডেলোন ক্লডেট চিত্রে)। পরিচালক : ফ্রাঙ্ক বোরজাগী ব্যাড গার্ল চিত্রের জন্য। শ্রেষ্ঠ চিত্র : গ্রাণ্ড হোটেল (মেট্রো গোল্ডউইন পিকচার্স)। বর্তমান সংখ্যায় এই পাঁচ বৎসরের ফলাফল প্রকাশ করা হ'লো। আগামী সংখ্যায় পরবর্তী বৎসর গুলির ফলাফল প্রকাশ করবার ইচ্ছা রইল।

'হ্যামলেট' ছবির একটি দৃশ্যে লরেন্স অলিভিয়ার ও জিন সিমন্স

অভিনেত্রী : জেনেট গেনর (সেভেন্থ হেভেন ও স্ট্রিট এ্যানজেল চিত্রে). পরিচালক : ফ্রাঙ্ক বোরজেগি ও লুই মাইলসটোন যথাক্রমে সেভেন্থ হেভেন ও টু এ্যারাবিয়ান নাইটস চিত্রে। শ্রেষ্ঠ চিত্র : উইংস (প্যারামাউন্ট), সানরাইজ (ফক্স)।

১৯২৮-২৯ : অভিনেতা : ওয়ার্ণার ব্যাকস্টার (ইন ওল্ড আরিজোনা চিত্রে)। অভিনেত্রী : মেরী পিকফোর্ড (ককেটি চিত্রে)। পরিচালক : ফ্রাঙ্ক লয়েড (উইয়ারী রিভার, ডিভাইন লেডী ও ড্রাগ চিত্রের জন্য। শ্রেষ্ঠ চিত্র : দি ব্রডওয়ে মেলডি (মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ার)।

★

ব্রিটেনের অন্যতমা প্রখ্যাতা মহিলা অভিনেত্রী ডেম সিবিল থর্ণডাইক

(Dame Sybill Thorndike)

★

ব্রিটেনের নাট্যজগতে ডেম সিবিল থর্ণ ডাইকের অপরিসীম প্রভাব আজ সর্বজন স্বীকৃত। নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রায় অর্ধ

শতাব্দী ধরে তিনি স্বীয় অভিনয় প্রতিভায় বৃটেনের নাট্য-জগতে যে সেবা করে আসছেন—তারই ফলে তাঁর এই প্রভাব। তিনশত বৎসর পূর্বে এলিজাবেথীয় যুগে ইংলণ্ডের নাট্যজগত খ্যাতির যে সৌধ শিখরে উঠেছিল, ডেম সিবিল থর্ণডাইক তাঁর আজীবন সাধনায় সেই অতীত গৌরবের সৌধ শিখরেই বৃটেনের বর্তমান নাট্যজগতকে উন্নিত করতে চেয়েছেন। থর্ণডাইক বৃটেনের প্রাচীন ও বিখ্যাত নাট্য-মঞ্চ ওল্ড ভিকেরই একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী—। ওল্ড ভিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে স্বীয় প্রতিভায় নাট্য জগতকে সমুজ্জ্বল রেখেছেন। নাট্যশিল্পে বৃটেনের চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যই থর্ণডাইক তাঁর অভিনয় ধারায় বজায় রেখে এসেছেন। মিসেস সিড্ডন্স (Mrs. Siddons) ও ডেম এলেন টেরী (Dame Ellen Tery) প্রভৃতি প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রীদের পাশাপাশিই থর্ণডাইকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

থর্ণডাইকের অভিনেত্রী জীবনে সাফল্যের গৌরব সহজ পথ বেয়ে আসেনি। তাঁর অভিনেত্রী জীবনের যাত্রারম্ভে যে বাধাবিপত্তি পথরোধ করে দাঁড়িয়ে ছিল—থর্ণডাইক অকুণ্ঠ চিত্তেই যে কোন প্রশ্নকারীর কাছে তা ব্যক্ত করেন। আজকের আলোকোজ্জল জীবনের মাঝে সেদিনকার আঁধারের বুক চিরে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, তা সহজভাবে ব্যক্ত করতে থর্ণডাইক একটুকুও দ্বিধা করেন না। কারণ, সে আঁধারের মাঝেও নিজে কোন সময় দিশেহারা হয়ে পড়েননি। আঁধারের বুক চিরে আলোর যে শিখা লুকিয়ে ছিল, তা কোন সময়ই থর্ণডাইকের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে অপসারিত হয়নি। মঞ্চজীবন যখন একবার তিনি গ্রহণ করেছেন—সে জীবন থেকে ব্যর্থতার আঘাত নিয়ে কোন সময়েই তিনি ফিরে যেতে চাননি।

অভিনয় শ্বাস প্রশ্বাসের মতই যেন সহজভাবে থর্ণডাইকের জীবনে ধরা দিয়েছে। থর্ণডাইকের পিতা ছিলেন কেন্টের ধর্মযাজক। বাল্যকালে ভ্রাতা রাসেল থর্ণডাইকের সংগে পিতার যাজকীয় বিদ্যালয়ে সিবিল অভিনয়ে অংশ গ্রহণ

'বণী প্রিন্স চার্লি' চিত্রের একটী দৃশ্যে ডেভিড নিভেন ও মার্গারেট লেটন।

করেন। বর্তমানে চার্চ এবং নাট্যমঞ্চের সংগে বৃটেনে যেমনি যোগাযোগ বিদ্যমান, মধ্যযুগেও তেমনি অলৌকিক নীতিবাচক অভিনয়ের দ্বারা জনসাধারণকে শিক্ষিত করবার প্রচলন খুবই বেশী ছিল। কিন্তু প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সমস্ত আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। ধর্মযাজকের কন্যার জীবনে সংগীত অপরিহার্য বলে অনুভূত হয়। তের বৎসর বয়সে সংগীত শিক্ষার জন্য তাই সিবিল থর্ণডাইককে লণ্ডনের গিল্ডিহল স্কুল অফ মিউজিক-এ ভর্তি হ'তে হয়। কিন্তু বাধ্য হ'য়ে থর্ণডাইককে সংগীত শিক্ষার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে হয়। কারণ, তাঁর হাতের কব্জি দিন দিন এমনি দুর্বল হ'য়ে পড়লো এবং এমন এক অসম্ভব বেদনা দেখা দিল, যে জন্য তাঁর পক্ষে পিয়ানো বাজানো অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। তখন তাঁর ভাইকে সংগে নিয়ে বেন গ্রীটের অধীনে মঞ্চাভিনয় শিখতে সুরু করে দিলেন। বেন গ্রীট সিবিল থর্ণডাইকের ভিতর এক অসামান্য প্রতিভার সন্ধান পেলেন। তিনি আমেরিকাগামী এক সেক্সপিরীয়ান নাট্যসম্প্রদায়ের সংগে থর্ণডাইককে নিতে চাইলেন। এই ভ্রমণ অনভিজ্ঞা এক শিক্ষার্থিনীর প্রতিভা বিকাশের পথ যেমনি উন্মুক্ত করে দিল, তেমনি নাট্যশিল্পের প্রতি তাঁর আগ্রহও বাড়িয়ে তুললো। এই ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ে থর্ণডাইক সেক্সপীয়ারের প্রায় পঁচিশখানি নাটকে অভিনয় করেন। এই ভ্রমণ যে কতখানি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল, তা থর্ণ ডাইকের উক্তি থেকেই বলছি: "আমরা অভিনব পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে আমেরিকার প্রাচীন ও মনোরম সহরে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলাম। উপকূল থেকে উপকূল—দেশ থেকে দেশান্তর—উত্তর থেকে দক্ষিণ—আমাদের অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'তে লাগলো। এই অভিনয় যেমনি উত্তেজনাপূর্ণ, তেমনি সুখের ছিল। শিক্ষার দিক থেকেও যেমনি কম অভিজ্ঞতা লাভ করিনি, তেমনি বন্ধু ভাবাপন্ন ইংরেজী ভাষাভাষী এক দেশের কাছেও আমাদের কম কৃতজ্ঞতা জানাবার নেই।" এই সম্প্রদায়ে অভিনয় করতে করতে থর্ণডাইকের গলা ভেংগে যায় এবং তাঁকে একমাত্র অভিনয়ের সময় ছাড়া সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি গলার উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং খাদ নামিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। ভ্রমণ শেষেও সম্প্রদায় পরিত্যাগ করতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গলা একদম বসে যাবার জন্য তাঁকে বাধ্য হ'য়েই নাট্যসম্প্রদায় থেকে বিদায় নিতে হয়। তিনি ইংলণ্ডে ফিরে এসে আরো হতাশ হ'য়ে পড়েন। কারণ, তাঁর গলার আর কোন উন্নতি হবে না বলে একজন গলা-বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রায় ছয় সপ্তাহের জন্য তাঁকে একটু কথা বলবারও অনুমতি দেওয়া হয়না। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে তাঁর গলার উন্নতি পরিলক্ষিত হ'তে লাগলো এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। সুস্থ হ'য়ে উঠবার পরই অভিনয়ের জন্য চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন।

মনীষী জর্জ বার্ণার্ড শ'কে ধন্যবাদ—তিনিই থর্ণডাইককে প্রথম সুযোগ দেন। কয়েকটি ছোটখাটো চরিত্রাভিনয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে থর্ণডাইক শ'-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এবং তিনি তাঁর ক্যানডিডা (Candida) নাটকের প্রধান ভূমিকায় থর্ণ ডাইককে পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এই থেকেই ম্যাঞ্চেষ্টারস্থিত মিস হার্ণিম্যানের বিখ্যাত নাট্য সম্প্রদায়ে থর্ণডাইক যোগদান করবার সুযোগ পান। এখানেই জন গলসওয়ার্দী এবং গিলবার্ট মুরে প্রভৃতির অধীনে থর্ণডাইকের কাজ করবার সৌভাগ্য ঘটে। গলসওয়ার্দী 'দি সিলভার বকস' নামক নাটক লিখে তখন প্রথম খ্যাতির গৌরবে বিকশিত—গিল্বার্ট মুরে কৃতিত্বের সংগে একখানি গ্রীস নাটকের অনুবাদ করে প্রশংসার্জন করেছেন। সৌভাগ্যের অদৃশ্য অঙ্গুলী নির্দেশে থর্ণডাইক ক্যাসন নামক একজন উদীয়মান নবীন অভিনেতার সংস্পর্শে আসেন। মিঃ ক্যাসনই পরবর্তী জীবনে স্যার লুই ক্যাসন নামে বৃটেনের একজন খ্যাতি সম্পন্ন প্রযোজক হ'য়ে ওঠেন। এঁরা পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং পরবর্তী কয়েক বছর প্রায় একই সংগে কাজ করেন। ল্যাংকাসায়ারের এক তুলাকেন্দ্রের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কিত শক্তিশালী নাটক 'হিণ্ডল ওয়েকস'-এ থর্ণডাইক প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। লণ্ডন নাট্য-মঞ্চে এই নাটকটি অভিনীত হয়। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে
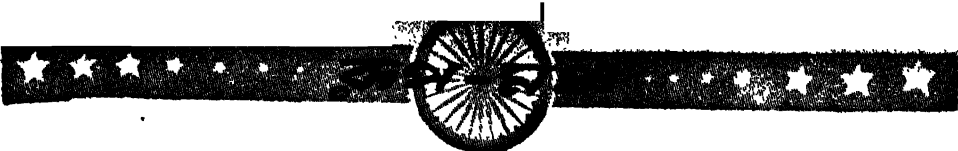
ওঠে—থর্ণ ডাইক বেন গ্রীটের অধীনে ওল্ডভিকে যোগদান করেন। তাঁর স্বামী তখন যুদ্ধে যোগদান করেছেন। তিনি তখন তিনটি শিশু সন্তানের জননী। ওল্ড ভিকের পরিবেশের মাঝে এসে খুবই ভাগ্যবতী বলে নিজেকে মনে করলেন। এসম্পর্কে তিনি বলেন: যুদ্ধের সময়টা আমি খুব আনন্দের মধ্য দিয়ে ওল্ডভিকে কাটিয়েছি।" চতুর্থ সন্তান জন্মগ্রহণ করবার সময় থর্ণডাইক কিছুদিনের জন্য ওল্ডভিক থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তারপর হ্যামলেট নাটকাভিনয়ের সময় আবার ফিরে আসেন। এবং ওফেলিয়া চরিত্রে অভিনয় করবার জন্য মহলা দিতে থাকেন। ছোট একটি পোষাক ঘরে থর্ণ ডাইক একলা বসে রিহার্সেল দিতেন। গ্রীষ্মকালে ষ্ট্রাটফোর্ড অন আভন-এ হ্যামলেট-এর অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। সেক্সপীয়ারের তিনি প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান চরিত্রেই অভিনয় করেছেন। তার ভিতর লেডী ম্যাকবেথ-এর অভিনয় অপূর্ব মহিমায় ভাস্বর হ'য়ে আছে। ইতিমধ্যেই তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থা হন—এতখানি খ্যাতির অধিকারিণী হ'তে পারবেন, থর্ণডাইক স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। শিল্পের প্রতি নিজের ঐকান্তিকতা—অধ্যবসায় ও অনুশীলন ক্ষমতায় চরিত্রকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলা—স্বীয় জন্মগত প্রতিভা, ব্যক্তিত্বও বৈশিষ্ট্যের গুণেই থর্ণডাইক নাট্যপ্রিয় জনসাধারণের সবখানি অন্তর অধিকার করে নিতে পেরেছেন। লণ্ডনের নাট্যমঞ্চে পৌরাণিক গ্রীক নাটকাভিনয়ের জন্য তিনি একটী মিউজিক হল ভাড়া করেন। এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় করেন। এর ভিতর দি ট্রোজান উইমেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লণ্ডনের শিক্ষিত নাট্যামোদীদের এই অভিনয় যতখানি ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে—আর কোন অভিনয়ই ততখানি কৃতকার্যতা অর্জন করতে পারেনি। এরপর স্বামী এবং ভাইকে নিয়ে তিনি গ্রাণ্ড গুইগনল-এ যোগদান করেন। এবং এখানে ছোট ছোট নাটক পর পর মঞ্চস্থ করেন। অভিনয়—রূপসজ্জা—প্রযোজনা ও নাটকীয় সার্থকতার দিক থেকে এই অভিনয়গুলি নাট্যামোদীদের মনে এক নিখুঁত ছাপ আঁকতে সমর্থ হয়। থর্ণডাইকের বিভিন্নমুখীন প্রতিভা সর্বসাধারণকে বিস্মিত করলেও তিনি সব সময়ই নিজেকে একজন নাট্য শিল্পের আগ্রহশীল শিক্ষার্থিনী ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। নিত্য নূতন জানবার জন্য—তাঁর অনুশীলনপ্রিয়তা কোন সময়ই কমে যায়নি। তাই জর্জ বার্ণাড শ-র সেণ্ট জন নাটকের নাম ভূমিকাভিনয়ে তিনি যেন আরো মহিমময়ীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। এই ভূমিকাটি যেন তাঁর কথা চিন্তা করেই সৃষ্টি করা হ'য়েছিল—এবং একজন্য থর্ণ ডাইক যেন সারাজীবন অপেক্ষা করে ছিলেন। অবশ্য প্রখ্যাত নাট্যকারের অনুপ্রেরণায় থর্ণ ডাইকও সহজেই সাড়া না দিয়ে পারেননি।

বর্তমান কালে বৃটেনের যে কোন অভিনেত্রীর চেয়ে থর্ণ ডাইক অধিক খ্যাতি সম্পন্না ও শক্তিময়ী অভিনেত্রী। থর্ণ ডাইকের ভাইয়ের মতে: 'Of all people he has known, she and her friend, the late Lilian Bayliss, the founder of the Old Vic Company have been most deeply concious that a divine power guided & sustained them in their work." থর্ণ ডাইকের ভাইয়ের মতে তিনি যেসব লোকের সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কেবল মাত্র থর্ণডাইক ও তাঁর বন্ধু স্বর্গতঃ লিলিয়ান বেলিসকেই জানেন—যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, এক স্বর্গীয় শক্তি অন্তরালে থেকে তাঁদের পরিচালনা করেন।

সিবিল থর্ণডাইক 'রিলিজিয়ান এ্যাণ্ড দি ষ্টেজ' নামে একখানি পুস্তকও রচনা করেছেন। উক্ত পুস্তকে দুইয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথাই তিনি বিশেষভাবে বোঝাতে চেয়েছেন।

সিবিল থর্ণ ডাইক বহুবার সেণ্ট জনের ভূমিকাভিনয় করেছেন। বৃদ্ধা বয়সেও তিনি এই ভূমিকাটিতে অবতীর্ণা হ'তেন। তারপর তাঁর কন্যা এ্যান ক্যাসন সেণ্ট জনের ভূমিকাভিনয় করতেন। এ্যান ক্যাসনও যখন বৃদ্ধা হন—তখন তাঁকে হুবহু মায়ের মতই দেখাতো। এবং মায়ের শিল্পপ্রতিভার পুরোপুরি ছাপ নিয়ে তিনি ভূমিকাটিকে রূপায়িত করে তুলতেন।

থর্ণ ডাইক সম্পর্কে সবচেয়ে বড় কথা হ'চ্ছে, খ্যাতির উচ্চ

শিখরে অধিষ্ঠিতা হ'য়েও তিনি পরিতৃপ্ত হ'তে পারেননি। কোনদিন নাট্যজগত থেকে বিশ্রাম গ্রহণও করেননি—শেষ বয়স পর্যন্তও নতুন দানে বৃটেনের নাট্য-জগতকে সম্পদশালী করে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা কচ্ছেন। সাম্প্রতিক কালে ওল্ডভিক কম্পানীর অন্যতম খ্যাতনামা অভিনেতাদ্বয় লরেন্স অলিভার ও র‍্যাল্ফ রিচার্ডসন নানানভাবে সিবিল থর্ণডাইকের কাছ থেকে পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়ে ধন্য হ'য়েছেন। সেক্সপীয়ারের নাটক এঁদের সময় যতখানি সাফল্যের সংগে অভিনীত হ'য়েছে—আর কোন সময়েই ততখানি হয়নি।

নাট্যমঞ্চের দায়িত্ব শুধু যে জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনই নয়—একথা ডেম সিবিল থর্ণডাইক মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, নাট্যমঞ্চ হবে জীবনেরই সত্যকার প্রতিবিম্ব এবং জীবনকে মধুর ও সম্পদশালী করে তোলাই তার প্রধানতম কাজ। নাট্যমঞ্চ আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলবে—আমাদের অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করে তুলবে। নাট্যমঞ্চকে জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে জনসাধারণের সংগে নিবিড় যোগ স্থাপনের সাধনাই হচ্ছে ডেম সিবিল থর্ণডাইকের আজীবন স্বপ্ন। "She believes, that, "the greatest thing we can ask of the Theatre is that it shall make us more aware...feeling...making us see where before we had blindness." To bring the Theatre into warm contract with life, to bring it into contract with the great mass of the people ; to achieve this has been her vision splendid".

[ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস-এর অন্যতম ভারপ্রাপ্ত সদস্য শ্রীযুক্ত টি, এন, গাঙ্গুলীকে কেবলমাত্র রূপ-মঞ্চের জন্য ব্রিটেনের চিত্র ও নট্য মঞ্চ সংক্রান্ত যে সব প্রবন্ধ সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হ'য়েছে—আগাসটাস মুর লিখিত ব্রিটেনের অন্যতমা প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ডেম সিবিল থর্ণডাইকের বর্তমান জীবনীটি তার অন্যতম। ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস অন্য যে সব সাধারণ সংবাদ সরবরাহ করে থাকেন, সেগুলি রূপ-মঞ্চের মত অন্যান্য পত্রপত্রিকারও প্রকাশ করবার অধিকার রয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধটি এবং এই ধরণের অন্যান্য রচনা ইতিপূর্বে রূপ-মঞ্চে যা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে—ভারতবর্ষে তার প্রকাশ স্বত্ব একমাত্র রূপ-মঞ্চেরই। ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসেস এবিষয়ে রূপ-মঞ্চের সংগে যে সহযোগিতা কচ্ছেন, সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ]। —শ্রীমন্ম

কিছুদিন পূর্বে আমন্ত্রণ এলো পরিচালক অভিনেতা ছবি বিশ্বাসের কাছ থেকে! তাঁর একান্ত অনুগত চর অচিন্ত্যকুমার—আমরা যাঁকে unthinkable বলে ডাকি—হন্ত দন্ত হ'য়ে এসে বললে : অমুক তারিখে—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে উপস্থিত থাকতে হবে। আমাদের 'যার যেথা ঘর'-এর কাজ প্রায় শেষ হ'য়ে গেছে। কেবলমাত্র মন্টুদার টুকি-টাকি একটু বাকী—সেটুকু ওদিন শেষ হ'য়ে যাবে—তাই সম্পাদনার পূর্বে ছবিখানি আপনাদের একটু দেখিয়ে নিতে চাই। এক নিঃশ্বাসে অচিন্ত্য তাঁর যা বলবার, বলে শেষ করলো। ছবি বাবুকে এড়ানো গেলেও, তাঁর এই বাহকটিকে যে এড়ানো যাবেনা—তা আমরাও যেমন জানি—ভুক্তভোগী আরো অনেকেই তেমন জানেন। অচিন্ত্যকে তাই বল্লাম : যাবো আমরা ঠিকই, যখন তুমি এসেছো—তবে সময়টা পরিবর্তন করতে হবে। সুনন্দাদেবীর কাছ থেকে ইতিপূর্বেই আমন্ত্রণ এসেছে তাঁর সিংহদ্বার-এর দৃশ্যপটে উপস্থিত থাকবার জন্য। মহরতের দিন আমরা যেতে পারিনি—তাঁর জন্য দেখা হ'লেই কথার হুল না ফুটিয়ে ছাড়েন না। আজকেই শেষ চিত্র গ্রহণ না যেতে পারিত মুখ দেখানো যাবে না। আমরা বেলা বারোটায় পৌঁছে যাবো বলে সংবাদ পাঠিয়েছি।' অচিন্ত্য তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো : তাহ'লে যাই দাদা, আবার কৃষ্ণেন্দু দা'র কাছে যেতে হবে। অচিন্ত্যর হঠাৎ গমনের কারণ বুঝলাম না। কারণ, নিশ্চিত করেত তাঁকে তখনও কোন কথা দেইনি। জিজ্ঞাসা করলাম? তুমি

রূপ-মঞ্চ-র নিজস্ব চিত্র বিভাগের সহযোগিতায় নতুনভাবে চিত্র ও নাট্য-সংবাদ পরিবেশনের পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমান বিভাগটির প্রবর্তন করা হ'লো। এই বিভাগটি পাঠকসাধারণের কী রকম লাগে না লাগে, সে বিষয়ে সম্পাদকের কাছে মতামত ব্যক্ত করবার জন্য যেমনি দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছি, তেমনি এই ধরণের সংবাদ পরিবেশনের জন্য যদি চিত্র ও নাট্য কর্তৃপক্ষদের আগ্রহ থাকে, তবে তাঁদেরও চিত্র বিভাগ বা সম্পাদকের সংগে কথাবার্তা বলতে অনুরোধ কচ্ছি। বর্তমান সংখ্যায় 'যার যেথা ঘর' ও 'সিংহদ্বার' চিত্রের সংবাদই মূলতঃ পরিবেশন করা হ'লো। —শ্রীপার্থিব

যে চলে যাচ্ছো—তা' ক'টায় তোমাদের প্রজেকশন?' অচিন্ত্য বল্ল : ছ'টায়—আপনাদের আর কোন অসুবিধা হবে না। এক ঢিলেই দু'পাখী মারতে পারবেন।" অচিন্ত্য চলে গেলে মনে মনে ভাবতে লাগলাম : দু'পাখী নয়—আজ অনেক পাখীকেই মারতে হবে। রাত দশটা অবধি রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে আমাদের কেটে গেল নানান জল্পনা কল্পনায়। কে কে যাবে—কী-কী সংগে যাবে—সব ঠিক করে রাখা হ'লো—পরের দিন যাতে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। এই বিধি ব্যবস্থার ভার ছিল কার্যাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডলের ওপর। এবিষয়ে তাঁর জুড়ি নেই। পাঠকসাধারণের অনুরোধ সত্ত্বেও নানান অসুবিধার জন্য ইতিপূর্বে রূপমঞ্চের নিজস্ব চিত্রবিভাগ খোলা হ'য়ে ওঠেনি। এবার সেই সুযোগ এসেছে। শীতল ষ্টুডিওর অন্যতম স্বত্বাধিকারী প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শীতল ভট্টাচার্য রূপমঞ্চ কর্মীদের স্থির চিত্র গ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন—রূপ-মঞ্চের নিজস্ব কয়েকটি ক্যামেরা কেনা হ'য়েছে। ৬টা অবধি রূপ-মঞ্চে কাজ করে শিক্ষার্থীদের রাত দশটা অবধি কাটে শীতল ষ্টুডিওতে। প্রিন্টিং—ডেভেলপিং—এনলার্জমেণ্ট প্রভৃতি ডার্করুম সংক্রান্ত শিক্ষার ভার নিয়েছেন শীতল ষ্টুডিওর অন্যতম স্বত্বাধিকারী চিত্রশিল্পী নিখিল চক্রবর্তী—ও বীরেন দত্ত প্রভৃতি। সকলের ওপর শীতল বাবুত আছেনই। আজ ষ্টুডিও-য় উপস্থিতি উপলক্ষে শিক্ষার্থীরা কে কতখানি অগ্রসর হ'তে পেরেছেন, তা পরীক্ষা করা হবে। মহাভারতের পাণ্ডব ও কৌরব রাজকুমারদের

অস্ত্রপরীক্ষার কাহিনী আমাদের অপরিচিত নয়—আমাদের অবস্থার সংগে যেন তার মিল খুঁজে পেলাম। তাঁদের ঔৎসুক্য এবং উৎসাহের চেয়ে আমাদের অবস্থাকে বিন্দুমাত্র কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারলাম না। পরের দিন। বড়দা—অর্থাৎ আনন্দবাজার পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিককে খবর দিয়ে আমার ও শ্রীমান মহেন্দ্রের হাজির হবার কথা রূপ-মঞ্চ সম্পাদকের বাড়ীতে। মাঝখানে আর একটা কাজ সেরে নিয়ে যখন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে হাজির হলাম, দেখলাম, সম্পাদকের বাড়ীর সামনে বিরাট জনতার ভিড। ভিড়ের মাঝ দিয়ে কোন রকমে পথ করে নিয়ে ভিতরে যেতেই ভিড়ের কারণ আর অজ্ঞাত রইল না। জনপ্রিয় অভিনেতা কমল মিত্র মডেল হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন—আর সম্পাদক একটার পর একটা ছবি তুলে যাচ্ছেন। কমলবাবুর অবস্থা দেখে ভারি করুণা হ'লো! বেচারা একেত সম্পাদকের পাল্লায় পড়েছেন—তারপর কৌতূহলী জনতার দৃষ্টির সামনে আর মুখ তুলে তাকাতে পাচ্ছেন না। শুধু কমল বাবুকেই নয়—গ্রুপের মাঝে এসে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বড়দাকেও দাঁড়াতে হ'লো। তিনি আমাদের পূর্বেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমরা বেশীক্ষণ ভিড়ের মাঝে দাঁড়াতে পারলুম না—কাজ অনেক ছিল। সময় মত রূপ-মঞ্চ কার্যালয়ে পৌঁছতে হবে। ওদের সংগে চুপি চুপি কথা সেরে চলে এলাম।

বেলা এগারোটার মধ্যেই যাত্রার আয়োজন হ'য়ে গেল। ডজন খানেকের ওপর ফিল্ম এলো—শীতলবাবুর জন্য চললো পৃথক একটা ষ্টীল ক্যামেরা। সম্পাদক ঘাড়ে চাপালেন নতুন ভয়েগল্যাণ্ডার (৩'৫) ক্যামারাটা—জিতেন বাবু আর বীরেন বাবু নিলেন যথাক্রমে রোলিকর্ড আর সুপার আইকন। এস. বি. প্রডাকসনের প্রচারবিদ বন্ধুবর ফণীন্দ্র পালের যাবার কথা আমাদের সংগে। তিনি আসতে বিলম্ব করে ফেলছেন—আমরাও যেন অতি মাত্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছি। ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছি—ফণীবাবুর দেখা নেই—দেখা দিলেন উদীয়মান অভিনেতা শিশির মিত্র। তিনি গাড়ী হাঁকিয়ে কোন কাজে যাচ্ছিলেন, আমাদের ভিড় দেখে—ভিড় বাড়ালেন। সংগে সংগে কালীশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন: যাক—এতক্ষণ হাতটা সুড় সুড় কচ্ছিল—মডেল তবু পাওয়া গেল। প্রথম যাঁরা ছবি তুলতে আরম্ভ করেন—সম্পাদকের অবস্থাটা তাঁরাই কেবলমাত্র উপলব্ধি করতে পারবেন। জিতেন বাবু ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ছবি তুলছেন—শীতলবাবু তার অনেক পূর্বে—তার ওপর তিনি পেশাদার শিল্পী—বীরেনবাবুও পনের বছর ধরে তাঁর সহকারীরূপে আছেন—হাতের সুড় সুড়ুনিটা সম্পাদকেরই এঁদের তুলনায় অসম্ভব বেশী সুরু হ'য়েছে।—সম্পাদক ক্যামেরাটি ষ্ট্যাণ্ডে খাটালেন শিশিরবাবুকে ডাক করে—আমিও জিতেন বাবুকে ইসারা করলাম—এক সংগে দু'জনের ক্যামেরাই ক্লিং করে উঠলো। ব্যস জিতেনবাবু

ভিন্ন একটী কোণ থেকে গৃহীত সুনন্দা দেবী।

চিত্রগ্রহণের সময় গৃহীত রূপ-মঞ্চ সম্পাদক কালীশ মুখোপাধ্যায়।

সর্বজনপ্রিয় অভিনেতা জহর গঙ্গোপাধ্যায়।

আর যান কোথায়? তাঁকেও মডেল হয়ে ক্যামেরা নিয়ে বসতে হ'লো। বসতে হ'লো বীরেন বাবুকেও। শীতল বাবু একধারে রূপ-মঞ্চ গ্রন্থাগার থেকে লাইটিং সম্পর্কিত একখানা বই টুলের পর বসে দেখছিলেন আর কার সংগে যেন কথা বলছিলেন—জিতেনবাবু তাঁকেও রেহাই দিলেন না। হেলতে দুলতে জজসাহেবের ছেলে আমাদের ফণীবাবু জজিয়াতি চালে উপস্থিত হ'লেন। সংগে সংগে সম্পাদকও ক্যামেরা ধরলেন। প্রচার সচিব আর অন্তরালে থাকতে পারলেন না। জিতেনবাবু আর সম্পাদক দু'জনের ক্যামেরাতেই দু'টো স্নাপ-এর উপযোগী ফিল্ম অবশিষ্ট ছিল—সম্পাদক দাঁড় করিয়ে দিলেন রূপ-মঞ্চের বালক কর্মিদের: নির্মল - ধ্রুব, অশোক ও মণীন্দ্রকে—ওদের খুশীর আমেজে আমিও না খুশী হ'য়ে পারিনি!

দুটো ট্যাক্সী এলো—ওদিনকার মত একমাত্র কার্যাধ্যক্ষকে

উদীয়মান অভিনেতা ও প্রযোজক শিশির মিত্র।

অভিনয়ের বাইরে রূপ-মঞ্চের ক্যামেরায়—প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী সুনন্দা দেবী।

রেখে আমরা ষ্টুডিওর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমার আর মেহেন্দ্রের ওপর রইল হাওয়া-খাওয়ার ভার। নির্মল রইল সম্পাদকের হেপাজতে আর বাকী তিন জন রইল যথাক্রমে শীতলবাবু, বীরেনবাবু আর জিতেন বাবুকে যোগান দেবার কাজে। ইন্দ্রপুরীতে যখন আমরা যেয়ে পৌঁছলাম, বেলা একটা হবে।

প্রথমেই গেলাম ভ্যানগার্ড প্রডাকসনের অফিস কক্ষে। শ্রীমান দুয়াজী অর্থাৎ আমাদের শ্যামচাঁদ আপনাদের শ্যাম লাহার হেপাজতে তৈজস পত্রাদি রাখতে। সেখানে যেয়ে প্রথমেই সাক্ষাৎ হ'লো জনপ্রিয় জহর গাঙ্গুলীর সংগে—কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য—শিল্পী সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ও আরো অনেকের সংগেই।

আমরা ছিলাম মালপত্র রাখতে ব্যস্ত—আর শিক্ষার্থীরা ছিলেন ঘরের আলোর শক্তি নিরীক্ষণে রত। তাঁদের শিকার যে জহরবাবু, একথা অনুমান করে নিতেও বেগ
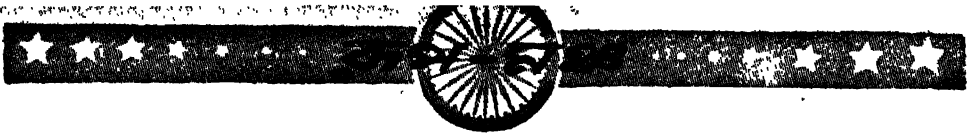
পেতে হ'লো না। একটা জানলা দিয়ে কেবল আলো আসছিল—তারই সামনে কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য আর জহরবাবুকে সম্পাদক বসিয়ে দিলেন—জহর বাবুর পাশে আর কে যেন বলতে যাচ্ছিলেন—সম্পাদক বাধা দিয়ে বল্লেন—ওখানটা রেখেছি—ছুয়ার জন্য। স্নেহেন্দ্র বলে উঠলো: ছুয়াদার প্রতি ওর একটু পক্ষপাতিত্ব আছে।' ছুয়া কটমট করে তাঁর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়লেন। আমাদের পৌঁছ সংবাদ ততক্ষণ পৌঁছে গেছে সিংহদ্বারের দৃশ্যপটে। বারবার তাগিদ আসছে সেখানে যাবার জন্য। চিত্র-সম্পাদক রবীন দাস—সহকারী পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী আর দিলীপ দে চৌধুরী, বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ শিল্পী প্রমোদবাবু এঁরা ততক্ষণের মধ্যে আমাদের দলে এসে যোগ দিয়েছেন। সিংহদ্বারের দৃশ্যপটে যাবার পথে স্টুডিওর উত্তর পূব কোণের খোলা যায়গায় দাঁড় করিয়ে এঁদের ছবি নেওয়া হ'লো—শ্রীমান স্নেহেন্দ্র আর শিল্পী সুশীল বন্দ্যোকেও দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'লো ওদের মাঝে। দৃশ্যপটে প্রবেশ মুখে সাউণ্ড ট্রাকটার সামনে সম্পাদক দাঁড়িয়ে পড়লেন—শব্দযন্ত্রী গৌর দাস তার সহকারীকে নিয়ে ভিতরে কাজে ব্যস্ত—ট্রাকের বাইরে যে ভদ্রলোকটি উৎকর্ণ হ'য়ে বসে আছেন, তাঁকে চিনতে বেগ পেতে হ'লো না। ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে—নিজেও ব্যবসায় বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছেন। জামার হাত গুটিয়ে একটা টুলের ওপর বসে আছেন এস, বি প্রডাকসনের অন্যতম অংশীদার শ্রীযুক্ত রঞ্জিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাউণ্ডভ্যানের ভিতরকার একটা আলো বারবার এসে ক্যামেরার লেন্সে প্রতিফলিত হচ্ছিল। জিতেন বাবুকে বলতে শুনলাম: কালীশদা, ছেড়ে দিন, পারবেন না। কিন্তু সম্পাদক নাছোড়বান্দা—গোটা তিনেক স্ন্যাপ নিয়ে বল্লেন: পরীক্ষামূলক ভাবে নিলাম, দেখাই যাক না কী দাঁড়ায়?—

ফ্লোরে যেয়ে ঢুকলাম আমরা। শীতলবাবু ইতিপূর্বেই সেখানে হাজির ছিলেন। পরিচালক নারেন লাহিড়ীর সংগে তিনি গভীর আলোচনায় ব্যস্ত আছেন বলে মনে হ'লো। শিল্পী বিজয় বসুকে দেখলাম দৃশ্যপটের টুকিটাকি কাজটুকু শেষ করে নিতে। আজকেই সিংহদ্বারের শেষ চিত্রগ্রহণ। সমস্ত চিত্রখানির যেখানে যে কাজটুকু বাকী রয়েছে—আজকের ভিতরই তা শেষ করে নিতে হবে। ছোট একটি কুঁড়ে ঘর তৈরী করেছেন। উঠোনে দিয়েছেন এক বিরাট গাছ—তার গোড়ায় একটা বেদী তৈরী করা হয়েছে। কুঁড়ে ঘরের পাশে একটা ছোট খাটো মনোরম

বা দিক থেকে: আনন্দবাজার পত্রিকার চিত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ ভৌমিক, জনপ্রিয় অভিনেতা কমল মিত্র, শৈলেশ মুখোপাধ্যায় ও চরিত্রাভিনেতা কমল চট্টোঃ।

শব্দযন্ত্রী গৌরদাস ও এস, বি, প্রডাকসনের অন্যতম স্বত্বাধিকারী রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়।
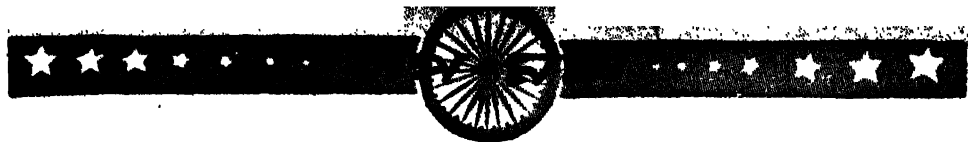
বাগান। বিজয় বাবু গুণী শিল্পী। 'যার যেথা ঘর'-এর দৃশ্য-রচনার ভারও তাঁরই ওপর ছিল। আমরা যেতেই সহাস্যে এগিয়ে এসে নমস্কার করে বল্লেন: কেমন হ'য়েছে! আমি উত্তর দিলাম: চমৎকার, সামনে বলেই নয়—আড়ালেও আপনার প্রশংসা করি অনেকের কাছে। ইতিমধ্যে বেণুবাবু অর্থাৎ নীরেন লাহিড়ীর হাঁক এলো: বিজয়বাবু, আপনি প্রস্তুত?' বিজয়বাবু 'হাঁ' বলে সম্মতি জানালেন।

বেণু বাবু কিছুক্ষণ ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন—তারপর 'Lights' বলে চীৎকার করে উঠলেন। সংগে সংগে সমস্ত কর্মীরা তৎপর হ'য়ে উঠলেন। নিঃশব্দে সকলে কাজ করে যাচ্ছেন। বেণুবাবুর পরবর্তী হাঁক কানে এলো 'Artists!' পিছন থেকে কে যেন উত্তর দিলেন: Ready Sir." ফ্লোরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখা গেল: সুনন্দা দেবী ও রবীন মজুমদারকে! তাঁদের পিছনে আর একজন সুপুরুষ শিল্পীকে ঢুকতে দেখলাম। বেশ মিষ্টি পৌরুষদীপ্ত চেহারা! প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পালকে জিজ্ঞাসা করতে উত্তর পেলাম: সিংহদ্বারের নতুন নায়ক অসীম কুমার।' অসীমকুমারের অভিনয় প্রতিভার সংগে পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি—যদি বিন্দুমাত্রও তাঁর ভিতর অভিনয় ক্ষমতা থাকে এবং নিজের অধ্যবসায়ের দ্বারা তাকে উজ্জলতর করে তোলেন—তিনি যে বাংলার বর্তমান অভিনেতাদের অনেককেই ছাড়িয়ে যাবেন এবং বাঙ্গালী দর্শকমন জয় করতে পারবেন, একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কুড়ে ঘরের পাশে যে বাগানটি তৈরী হ'য়েছিল—তাকে কেন্দ্র করে আলোকশিল্পীরা আলো নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। পরিচালকের নির্দেশে রবীন বাবু আর সুনন্দা দেবী সেখানে

বাঁদিক থেকে: পেছনে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী ছবি বিশ্বাস, নবাগত অসীম কুমার। সামনে: সুনন্দাদেবী ও কাহিনীকার নিতাই ভট্টাচার্য। রূপ-মঞ্চ সম্পাদক ক্যামেরা বাগিয়ে ধরবার সংগে সংগে শ্রীমতী সুনন্দাদেবী তাঁকে যে ভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন, রূপ-মঞ্চ পাঠক সাধারণকে উপহার দেবার জন্য সেই বিশেষ ভংগিমাটী সম্পাদক মহাশয় ক্যামেরায় ধরে না রেখে পারেন নি।— — — — — — — —
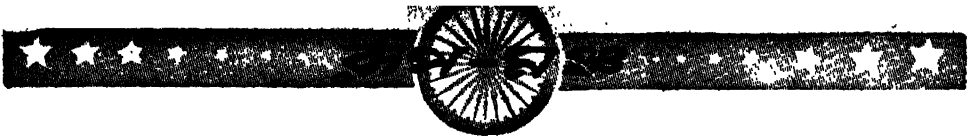
যেয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদের দাঁড় করিয়ে আবার আলো গুলিকে পরীক্ষা করে নেওয়া হ'লো। মুভি-ক্যামেরাম্যান ইতিমধ্যেই ক্যামেরাটি তাঁর প্রয়োজন মত জায়গায় নিয়ে হাজির করেছেন। বেণুবাবু নিজে ক্যামেরার পর যেয়ে দাঁড়ালেন। নিশ্চিত না হওয়া অবধি কোন দৃশ্যই তিনি গ্রহণ করতে অনুমতি দেন না। বেণুবাবুর এই বৈশিষ্ট্য ইতিপূর্বে বহুবার লক্ষ্য করেছি। 'Taking—Scilent every body' বলে তিনি হাঁক দিলেন—আলোগুলি এক সংগে জ্বলে উঠলো—মুভির সংগে সংগে সম্পাদক ও জিতেনবাবুকে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরতে দেখলাম। ওটি নির্বাক দৃশ্য ছিল, তাই প্রয়োজন মত 'শট'টি নিয়ে বেণুবাবু 'কাট' বলে হাঁক দিলেন। ক্যামেরায় খট করে শব্দ হ'লো—সংগে সংগে আলো গুলিও নিভে গেল। এবার পরিচালক সুনন্দা দেবীকে নিয়ে গাছ তলায় এলেন। রবীনবাবু ও সুনন্দা দেবীকে নিয়ে এদৃশ্যটিও গ্রহণ করা হবে। এটি সবাক দৃশ্য। সুনন্দা দেবী কোথায় বসে থাকবেন—রবীনবাবু কোথা দিয়ে আসবেন—পরিচালক শিল্পীদের তা বুঝিয়ে দিলেন। সংলাপও আওড়িয়ে নেওয়ালেন কয়েকবার। সম্পাদককে দেখলাম বেণুবাবুর কাছাকাছি ঘুরতে। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করাতে বুঝলাম, তাঁর মতলব খারাপ অর্থাৎ নির্দেশ দেবার সময় শিল্পীদের সংগে তিনি বেণুবাবুকেও তাঁর ক্যামেরায় ধরে রাখতে চান। বেণুবাবু বুঝতে পেরেছেন তা—তিনি কিছুতেই ধরা দেবেন না। শেয়ানে শেয়ানে লড়াই। দেখি কার জিৎ হয়। গাছতলায় সুনন্দা দেবীকে বেণুবাবু কী যেন নির্দেশ দিচ্ছেন—একটি আলো কেবল তাঁদের মুখের ওপর পড়েছে। বেণুবাবু অন্যমনস্ক। সম্পাদক একবার শীতলবাবুর সংগে কথা বলে নিলেন। তিনি বল্লেন: এ আলোতে পারবেন না। অযথা কেন ফিল্ম নষ্ট করবেন।' সম্পাদক তাঁর কথা এবারও উপেক্ষা করে কয়েকটা স্নাপ নিলেন। সুনন্দা দেবীর ভাইয়ের ভূমিকাটি রবীনবাবুকে অভিনয় করতে হ'য়েছে সিংহদ্বারে। সুনন্দা দেবী গাছতলায় বসে আছেন. ভাই এসে দেখতে চাইলো। সংলাপটা ঠিক মনে নেই। তবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভাইয়ের মন যে কানায় কানায় বিষিয়ে রয়েছে, তার সংলাপ থেকে তা বেশ বুঝতে পারলাম। আলো জ্বলে উঠবার সংগে সংগে তিনটি ক্যামেরাই কর্মতৎপর হ'য়ে উঠলো—রবীনবাবু এবং সুনন্দাদেবী দু'জনেই অভিজ্ঞ ও প্রতিভা-সম্পন্ন শিল্পী—পাতার পর পাতা সংলাপ দু' মিনিটে দেখে নিয়ে তাঁরা নির্ভুল বলে যান। অথচ আজ ছোট ছোট কটা

বাদিক থেকে: রবীন দাস, শ্যাম চক্রবর্তী, নিতাই ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল রায় ও জহর গাঙ্গুলী। প্রফুল্ল রায়ের ভংগিমাটি লক্ষ্য করবার বিষয়। — —

কাটা সংলাপও তাঁরা ভুল করে ফেলছেন। দৃশ্যপটে আমরা যাঁরা উপস্থিত ছিলাম, তাঁরা সবাই বেশ উপভোগ কচ্ছিলাম। কিন্তু চিন্তিত হ'য়ে পড়ে ছিলেন পরিচালক। সুনন্দা দেবীও হতাশ হ'য়ে বললেন: ঐ একটা কথাতেই বারবার ভুল হচ্ছে কেন?' পরিচালক নীরেন লাহিড়ী মুচকী হেসে কালীশবাবুর দিকে তাকিয়ে বল্লেন: ভুলের কারণ হচ্ছেন ইনি। যেভাবে স্যুটিং করছেন—তাতেই 'নারভাস' হ'য়ে যাচ্ছেন আপনারা।' কারণটা যে নেহাৎ অমূলক নয়, আমরা সবাই তা উপলব্ধি করলাম। সম্পাদকও. এর মাঝে স্নেহেন্দ্র এসে খবর দিলো—জহরবাবু চলে যাচ্ছেন।' সম্পাদক ক্যামেরা বন্ধ করে পরিচালককে অভয় দিয়ে বল্লেন: নিন, আমরা একটু আউটডোর স্যুটিং-এ যাচ্ছি—আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ইনডোর শেষ করুন। শীতলবাবুকে রেখে গেলাম কেবল আপনার প্রয়োজনে।' আমরা সদলবলে তাঁর পিছু পিছু বেরিয়ে পড়লাম। ইন্দ্রপুরীর এক নম্বর ফ্লোরের বাইরে গাছ তলা অবধি জহরবাবু বাড়ী যাবার জন্য এগিয়েছেন। কোনদিক না চেয়ে হন হন করে তিনি এগোচ্ছেন। তিনি যে পালিয়ে যাবার মতলব এঁটেছেন, আমরা তা বুঝলাম। সম্পাদক হাঁক দিলেন: জহরবাবু!' কোন উত্তর নেই। আবার:

নিতাই ভট্টাচার্য ও মীরা মিশ্র

—জহরবাবু'—ভ্রূক্ষেপও নেই। সম্পাদককে আবার বলতে শুনলাম: ও উদাসী পথিক—।" জহর বাবু ঘাড় বাঁকিয়ে উদাসী দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করলেন: কী, আমায় ডাকছেন!' উত্তর হ'লো: আজ্ঞে হ্যাঁ।' একটু ঢোক গিলে কপালের রেখা কুঞ্চিত করে—চোখের পাতা ঘন ঘন ফেলে কোঁচাটা বাঁদিকের জামার পকেটে পুরে নিবে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন: বাবা! তোমার হাত কী কিছুতেই এড়ানো যাবে না। ভাবলাম চুপি চুপি পালিয়ে যাবো—তা না—কোত্থেকে খবর পেয়ে ছুটে এলে—নাও, যত খুশী! বলি, ফিল্মটা কিনতে কী পয়সা লাগেনি?' জহরবাবুর কথাগুলি আমরা খুব উপভোগ কচ্ছিলাম—সম্পাদক মুচকী মুচকী হাসছিলেন। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নিতাই দাও। এর মাঝে রূপায়ণ চিত্র প্রতিষ্ঠানের অফিস কক্ষ থেকে নেমে এলেন—চিত্র জগতের প্রবীণ ও মরমী পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়—আমাদের প্রফুল্লদা। জহরবাবুকে ধমকে বলে উঠলেন: কী বকছিস, দাঁড়া ঠিক হ'য়ে। একটু নড়েছো কী তুই গাট্টা।' বলেই জহরবাবুকে জাপটে ধরে তিনি দাঁড়ালেন—তাঁর পাশে নিতাইদা, শ্যাম ও রবীন—বেশ সুন্দর গ্রুপ

জহরবাবুর এই ছবিটি গ্রহণ করবার সময় ক্যামেরার সামনে একটী বলিবর্দ এসে উপস্থিত হ'ন। — — — —

তৈরী করলো। সবাই ক্যামেরা তাক করলেন। জিতেনবাবু আর বীরেন বাবু একটা স্নাপ নেনত সম্পাদক তিনটে নিয়ে নেন। তাঁর স্নাপ নেওয়া শেষ হ'লে প্রফুল্লদাকে বল্লেন: প্রফুল্লদা, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রকে আমি ক্যামেরায় ধরে রাখলাম।' প্রফুল্লদা জিজ্ঞাসা করলেন: তার মানে?' আমরাও কৌতূহলী হ'য়ে উঠলাম। সম্পাদক বল্লেন: যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনি আজীবন লড়ে আসছেন—আপনার এ ছবিটিও হবে ঠিক সেই রকম। অর্থাৎ A challenge to the exploiters & cheaters, শোষক ও অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যুদ্ধ ঘোষণা।' প্রফুল্লদা ধমকে উঠলেন 'তুই মাঝে মাঝে বড্ড বাজে বকিস!' সম্পাদক যে বাজে বকেননি, একথা প্রফুল্লদা না স্বীকার করলেও, এই লোকটিকে চিত্র জগতের যাঁরাই জানেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন—কোনদিন কোন অন্যায় ওঁকে স্পর্শ করেনি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য ওর মন এবং দেহে যেন রয়েছে অসম্ভব শক্তি। আবহাওয়াটা একটু ভারী হয়ে উঠেছিল—তাকে হালকা করে দিতে আবির্ভূত হ'লো কোথেকে একটা হৃষ্টপুষ্ট বলিবর্দ। ঠিক জহরবাবুর সামনে এসে তিনি দাঁড়ালেন। ক্যামেরা গুলি যেন মুহূর্তে তৎপর হ'য়ে উঠলো—সম্পাদক বল্লেন: যাক। রূপ মঞ্চ পাঠকসাধারণকে জানাবার মত একটা সংবাদ পেলাম যে, সাদের প্রিয় জহর গাঙ্গুলী—মটর গাড়ী ছেড়ে এবার বলিবর্দের ঘাড়ে চড়ে ষ্টুডিওয় যাতায়াত কচ্ছেন।' কপট রাগে জহরর বুকে বলতে শোনা গেল: দেখেছো, এক নম্বর ডাকাত—ও ক্যামে-

রূপ মঞ্চ চিত্রবিভাগের অন্যতম সভ্য জিতেন পাল।

রাই আমি আছাড় দিয়ে ভেংগে ফেলবো।" সংগে সংগে প্রফুল্লদা বল্লেন: আপত্তি নেই, একটা দিনের পারিশ্রমিকটা কেবল তার বিনিময়ে দিয়ে দিও।

আমরা যখন এমনি গুলজার কচ্ছি হঠাৎ কোথেকে লাস্যময়ী মীরা মিশ্র যেয়ে সম্পাদকের ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে আক্রমণাত্মক সুরে বলে উঠলেন: এমন কোন অপরাধ করেছি, যে জন্য রূপ মঞ্চের পাতা থেকে আমায় নির্বাসিত করেছেন।' সম্পাদক থতমত খেয়ে বল্লেন: অভিযোগটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' আর কিছু বলবার পূর্বেই আমি উত্তর দিলাম: মাঝে মাঝে বিরহের জ্বালা মন্দ কী—আগ্রহ বাড়ে সম্পাদক বল্লেন: নির্বাসনও যেমনি দিয়েছি—স্বাগত: আহ্বানও আবার জানাচ্ছি। দাঁড়ানত একটু স্থির হ'য়ে।' আবার ক্যামেরাগুলি তৎপর হ'য়ে উঠলো। শ্রীমতী মিশ্রের একাকী কতগুলি ছবি নেবার পর নিতাই বাবুর সংগেও কতগুলি নেওয়া হ'লো। তারপর নেওয়া হলো জহর বাবু, প্রফুল্লদা, নিতাই বাবু প্রভৃতির পৃথক পৃথক ভাবে। সম্পাদক এক একটি রিল লোড কচ্ছেন—আর শেষ কচ্ছেন। প্রফুল্লদা বল্লেন: তোমার কী আশ মিটছে না?' সম্পাদক উত্তর দিলেন: এরকম মডেলত সব সময় পাওয়া যায় না।' জহরবাবুর দেরী হয়ে যাচ্ছিল, তিনি বিদায় নিলেন। জিতেনবাবু ও বীরেনবাবু প্রফুল্লদাকে বাগানের কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন বিশেষভাবে কয়েক ছবি তুলবার জন্য—শ্রীমান গৌর মহাপ্রভু অর্থাৎ মু৺"
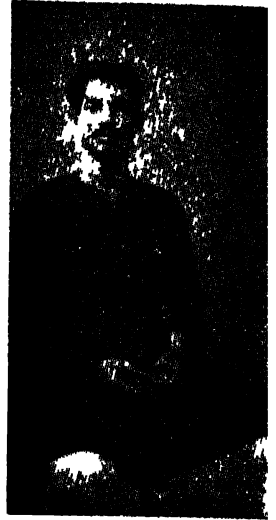
শীতল ষ্টুডিওর অন্যতম স্বত্বাধিকারী ও চিত্রশিল্পী নিখিল চক্রবর্তী।—আমাদের খালাসী সাহেব।
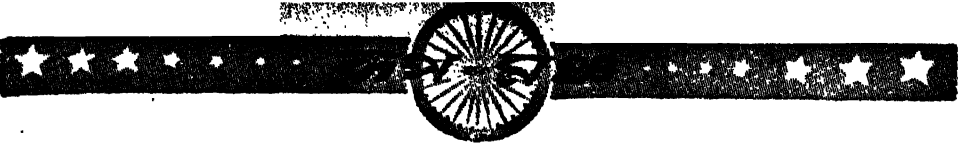
চিত্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যবস্থাপক ও চৌদ্দরসীর জমিদার গৌর রায়চৌধুরী হেলতে দুলতে তাঁদের 'কুহেলিকার' ছবির দৃশ্যপটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন—সম্পাদক দূর থেকে তাঁকেও আটকে রাখলেন ক্যামেরায়। এর পর চুপি চুপি আমাদের ডেকে নিয়ে সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীর দোতলার অফিস কক্ষের দিকে ছুটলেন। বাইরে থেকে আমরা দেখতে পেলাম পরিচালক অভিনেতা ছবি বিশ্বাস সদ্য প্রকাশিত রূপ-মঞ্চের মাঘ সংখ্যাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। জিতেন বাবুকে খবর পাঠানো হ'লো—আর সম্পাদক অতর্কিতে বাইরে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে ক্যামেরাটি ঢুকিয়ে পর পর কতগুলি স্নাপ নিলেন। শ্রীমান অচিন্ত্য কী প্রয়োজনে ছবি বাবুর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে একটা কাগজ ধরলো।

'সিংহদ্বার' চিত্রের একটী বিশেষ দৃশ্যে সুনন্দা দেবী ও রবীন মজুমদার।

তাঁকেও ছবি বাবুর সংগে নেওয়া হ'লো। হঠাৎ অচিন্ত্যর চোখ পড়তেই : আরে,কালীশদা যে!' বলে হেঁকে উঠলো—সংগে সংগে ছবিবাবুও চশমা খুলে তাকালেন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুচকী হেসে ছবিবাবু বল্লেন : ধরা পড়ে গেছো!' ধরা যখন পড়েই গেছি—তখন ভিতরে যেয়েই ধরা দিলাম। জিতেনবাবুরা ততক্ষণ পৌঁছে গেছেন। সপ্তর্ষী চিত্র মণ্ডলীর অন্যান্য কর্মীরা এসে আমাদের ঘিরে ধরলেন। আমি তাঁদের সংগে গল্পে মেতে গেলাম। সম্পাদক আর জিতেনবাবু মেতে গেলেন ছবি তুলতে। তাঁরা পর পর ছবি তুলে যাচ্ছেন। ছবিবাবু একবার অচিন্ত্যকে ডেকে বল্লেন : অচিন্ত্য, কটা 'পোজ'ই এঁদের দিলাম, একবার জেনে নিয়ে একটা বিল করে দাও ত!' সম্পাদক উত্তর দিলেন : বিল করতে পারেন, তবে বিল পাশ হবে কিনা তা রূপ-মঞ্চেরই বিবেচনাধীন।'

রূপ-মঞ্চের গ্রাহিকা শ্রেণীভুক্তা নবাগতা কিশোরী অভিনেত্রী শেফালী সরকার। 'বহুব্রীহি' চিত্রে ইতিপূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 'যার যেথা ঘর' ও আগামী বহু চিত্রেই শ্রীমতী শেফালীকে দেখা যাবে। চিত্র গ্রহণ—রূপ-মঞ্চ।
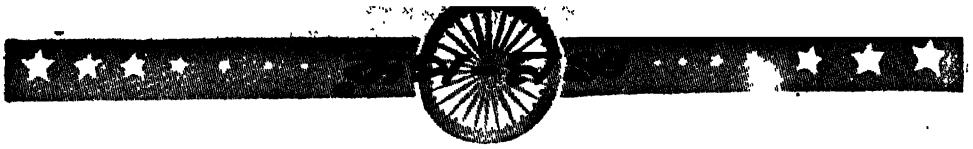
বা দিক থেকে : প্রমোদবাবু, শ্যাম চক্রবর্ত্তী, রবীন দাস, স্নেহেন্দ্র গুপ্ত, দিলীপ দে চৌধুরী ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় . — — —

আমরাও কিঞ্চিৎ দক্ষিণ হস্তের কার্য শুরু না করে পারলাম না। আমাদের কাজ শেষ হ'তে না, হ'তেই শুনলাম, সিংহদ্বার-এর টুকরো টুকরো দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ করে সকলেই বাইরে এসেছেন— উন্মুক্ত হাওয়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করতে। খবরটি শুনেই সম্পাদক তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন—জিতেন বাবুরাও তাঁকে অনুসরণ না করে পারলেন না। স্নেহেন্দ্রকেও ইশারা করে ডেকে নিলেন। একটু বাদে স্নেহেন্দ্র ছবিবাবুকে এসে বল্ল: ছবিদা, আপনাকে সুনন্দা দেবী ডাকছেন বাইরে—কী যেন প্রয়োজন—জ ল দি আসুন। ছবিবাবু না উঠে থাকতে পারলেন না। দোতলার ঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে ছবিবাবু নীচে নামছেন—আমি তাঁর পিছু পিছু। নীচে সিঁড়ির গোড়া থেকে হাঁক এলো—ছবিদা ছাড়া আর কেউ নামবেন না'—নীচে তাকিয়ে দেখলাম: জিতেনবাবু আর সম্পাদক ক্যামেরা বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন: ছবিদাকে উদ্দেশ্য করে সম্পাদককে বলতে শুনলাম: ছবিদা আর একটা ধাপ নেমে আসুন—আর একটা'—ছবিদা পরিচালকের নির্দেশের মত—নামছেন আর উঠছেন। আবার হাঁক এলো: ব্যস, ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ!'

ছবি তোলার পর্ব শেষ হ'লে শুরু হ'লো চায়ের পর্ব। এ ব্যাপারে ছবিবাবু এবং তাঁর প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দ সবাই যেন একই সুরে বাধা। শুধু চা দিয়ে কী আর রূপ-মঞ্চ প্রতিনিধিদলকে আপ্যায়িত করা চলে! তারাপদবাবু—শ্রীমান খোকা—গোরা বাবু—রাজেন বাবু—আর সর্বোপরি শ্রীমান unthinkable ত আছেনই—এমনিভাবে পীড়াপীড়ি সুরু করলেন যে,

শীতল বাবুর সহকারী 'রূপ-মঞ্চ' চিত্র বিভাগের অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বীরেন দত্ত। — — —

শ্রীযুক্ত শীতল ভট্টাচার্য 'রূপ-মঞ্চ' কর্মীদের চিত্রগ্রহণ শিক্ষার ভার নিয়েছেন। —

কার্যাধ্যক্ষ পুষ্পকেতু মণ্ডল 'রূপ-মঞ্চ' কার্যালয়ে ওদিন কেবল এঁকেই রেখে যাওয়া হয়েছিল।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর পূব দিকের মডেলটিকে ঘিরে এবার আমাদের জটলা সুরু হ'লো। বেণুবাবু বল্লেন: নিন এবার আমি ইচ্ছা করে ক্যামেরায় ধরা দিচ্ছি।' সম্পাদক হেসে উত্তর দিলেন: এর পূর্বে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে ধরা দিতে হ'য়েছে।' বেণুবাবু মুখ কাঁচমাচু করে বলে উঠলেন: দোহাই আপনার, ওটি যেন আর রূপমঞ্চে স্থান না পায়।' প্রকৃত সত্য কথা বলে ফেল্লেন সুনন্দা দেবী: হ্যাঁ, উনি সেই পাত্রটিই!' বেণুবাবু, সুনন্দা দেবী, নিতাইবাবু ছবিদা ও নবাগত নায়ক অসীমকুমারকে নিয়ে গ্রুপ সাজানো হ'লো। সম্পাদক সামনে যেয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরতেই সুনন্দা দেবী জিব বের করে ভেঙচি কেটে উঠলেন—সংগে সংগে ক্যামেরার ক্ষীণ ক্রিং শব্দটী আমার কানে এলো। সম্পাদক চোখ ইশারায় আমার মুখ বন্ধ করলেন। গ্রুপের পর সুনন্দা দেবীকে এককভাবে বসিয়ে কতগুলি ছবি তোলা হ'লো। এরপর ছবি বাবু আর সুনন্দা দেবীকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে সম্পাদক আর একটী ছবি নিলেন। সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে এসেছে—বাধ্য হ'য়েই বার বার ক্যামেরা গুটিয়ে নিলেন। আর অচিন্ত্যও এরই মাঝে বার দুই তাগিদ দিয়ে গেছে প্রজেকসনের জন্য। 'সিংহদ্বার' এর সংগীত পরিচালক কৃতি সুরশিল্পী রবীন চট্টোপাধ্যায় এবার আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি অনেকক্ষণ ষ্টুডিওতে এসেছেন কিন্তু ক্যামেরার ভয়ে আত্মগোপন করে ছিলেন। 'সিংহদ্বারে'র

বা দিক থেকে: (সামনে) নীরেন লাহিড়ী, সুনন্দা দেবী ও নিতাই ভট্টাচার্য। (পেছনে) ছবি বিশ্বাস ও অসীম কুমার।

সপ্তর্ষী চিত্রমণ্ডলীর অফিস কক্ষে পরিচালক অভিনেতা ছবি বিশ্বাস ও কার্যাধ্যক্ষ অচিন্ত্যকুমারের এরূপ একাধিক ছবি এঁদের অজ্ঞাতে 'রূপ-মঞ্চ' চিত্র-বিভাগ থেকে গৃহীত হয়। — —

ভ্যানগার্ড প্রডাকসনের অফিস কক্ষে শ্রীযুক্ত নিতাই ভট্টাচার্য, জহর গাঙ্গুলী, শ্যামলাহা ও অন্যান্যদের এই ছবি গ্রহণ করা হয়। মাত্র একটী জানালা দিয়ে আলো আসছিল। — — —

পরিচালক নীরেন লাহিড়ী বারবার লুকোচুরি খেলছিলেন 'রূপ-মঞ্চে'র চিত্র বিভাগের কর্মীদের সংগে। শেষ পর্যন্ত সম্পাদকের ক্যামেরায় তিনি ধরা পড়েন। — — —

চিত্রশিল্পী অনিল গুপ্ত এসেও হাজির হলেন। অসুস্থতার জন্য তিনি আর ওদিন ক্যামেরা চালাতে পারেন নি। রবীন বাবু এবার খুব কর্মতৎপর হ'য়ে উঠলেন—বুঝলাম, গানের দৃশ্যগুলির কাজ শুরু হবে। তার পূর্বে শীতল বাবুকে দিয়ে কয়েকটি বিশেষ ষ্টীল গ্রহণের ব্যবস্থায় পরিচালক অন্যান্যদের নিয়ে চলে গেলেন। আমি, ফণীবাবু ও আর সকলে বাইরে একটা জায়গা বেছে নিয়ে গল্পগুজবে মেতে গেলাম।

প্রচার সচিব ফণীন্দ্র পাল আমার পার্শ্বেই বসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে 'সিংহদ্বার' সম্পর্কে টুকিটাকি সংবাদ মাঝে মাঝে জেনে নিচ্ছিলাম।

চিত্র ও চিত্র জগতের বাইরে সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেপুদা অর্থাৎ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এস, বি, প্রডাকসনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা 'সিংহদ্বার' চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন। অসীমকুমার নামে একজন নবাগত অভিনেতার সংগে পরিচালক নীরেন লাহিড়ী দর্শকসাধারণকে পরিচয় করিয়ে দেবেন—একথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। তাছাড়া অভিনয়াংশে আছেন সুনন্দা দেবী, অলকা, নমিতা, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, মানারঞ্জন ভট্টাচার্য, ফণী বিদ্যাবিনোদ শ্যামলাহা, পাপা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো অনেকে প্রাইম ফিল্মস-এর পরিবেশনায় 'সিংহদ্বার' সহরের একাধিক প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে ফণীবাবু চুপিচুপি আরো একটী সংবাদ দিলেন—দক্ষিণ কলিকাতার নির্মীয়মান প্রেক্ষাগৃহ "ভারতী" সিংহদ্বার দিয়েই সম্ভবত দ্বারোদঘাটন করবে।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর একাংশে চিত্রগ্রহণে রত 'রূপ-মঞ্চ' কর্মীদের সম্পাদক তাঁর ক্যামেরায় ধরে রাখেন।

পরিচালক ছবি বিশ্বাসের টেকনিক্যাল উপদেষ্টা কৃতি চিত্রসম্পাদক ও উদীয়মান পরিচালক রাজেন চৌধুরী এসে ছবি বাবুকে বল্লেন: ছবিদা, এবার উঠতে হবে যে।' অচিন্ত্যও তাঁর সংগে এসেছিল—সে আর কোন কথা বল্ল না—আমাদের হাত ধরে ধরে টেনে তুলতে লাগলো।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওর দোতলার ছোট্ট প্রজেকশন ঘরের মাঝে যেয়ে আমরা হাজির হলাম আজকের দর্শক আর ছবিটি যখন সর্বসাধারণের জন্য আত্মপ্রকাশ করবে—এই দুইয়ে যথেষ্ট প্রভেদ—আজকের দর্শকেরা হ'লেন ছবিটির নির্মাতা—আর পরবর্তী দর্শকেরা হ'লেন গ্রহীতা। আলো নিভে গেল। ছবিটিও রূপালী পর্দায় ভেসে উঠলো। একটী রিল শেষ হচ্ছে—আর একটী রীল চাপছে—নতুন নতুন চরিত্রের সংগে—নতুন নতুন পরিবেশের মাঝে আমাদের তখনকার দর্শকমন কম উত্তেজনা ও আগ্রহের সম্মুখীন হয়নি—যদিও রীল পরিবর্তন ও অকর্তিত গ্র্যাপচি'র নানান বাধা সৃষ্টি করছিল। পরিচালক ছবি বিশ্বাসের সাক্ষাৎ ত পেলামই। পরিচিত হলাম বৈজ্ঞানিক বেশী পাহাড়ী সান্যালের সংগে—এই চরিত্রটির ভিতর দিয়ে—পরিচালক বিশ্বাস আমাদের সামাজিক জীবনে বিবাহ বন্ধনের জটিল সমস্যাটি সমাধানে প্রয়াস পেয়েছেন এবং সেকাজ তিনি সুষ্ঠুভাবেই সম্পাদন করেছেন। বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী রূপে দেখতে পেলাম শক্তিময়ী অভিনেত্রী সংযুক্তালাকে সেদিনকার আমাদের সেই ছোট কেতকী—'যার যেথা ঘরে' অপরূপ কেশবিন্যাস ও রূপসজ্জায় কলেজে পড়া যুবতীরূপে দেখা দিল—মায়ের অভিনয় দক্ষতাকে শ্রীমতী কেতকী ছাড়িয়ে যাবে বলে "রূপ-মঞ্চে" একবার মন্তব্য করা হ'য়েছিল—তাতে অনেকেই ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন। 'যার যেথা ঘর'-এ কেতকীর চাতুর্য তাঁদেরও অভিভূত না করে পারবে না। যাঁরা এই ব্যঙ্গোক্তি করেন, তাঁরা একথা কেন মনে রাখেন না যে, কেতকীর বিকাশের মূলে তার শক্তিময়ী মায়ের আশীর্বাদ ও চেষ্টাই রয়েছে সবার

বেশী। পরিচিত হলাম দাদুর বেশে প্রবীণ অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সংগে। স্বর্গতঃ যোগেশ চৌধুরীর পর এই একটী লোকেরই নাম করা যেতে পারে—যাঁর অভিনয়—অভিনয় বলে মনে হয় না। চরিত্রটি বাস্তবরূপে ধরা দেয়। পরিচিত হলাম আর একজন অভিনেতার সংগে—যিনি আজ অবধি কোন নাটক বা চিত্রেই ব্যর্থ হননি—'যার যেথা ঘরে'ও নয়। রোদে জলে থেকে কাষ্ঠখণ্ড যেমন শক্ত হ'য়ে ওঠে—আমাদের এই অভিনেতাটিকেও তার সংগে তুলনা করা চলে—তিনি হচ্ছেন সন্তোষ সিংহ। পরিচিত হলাম অভিজাত অভিনেত্রী মীরা সরকারের সংগে—লাস্যময়ী রেণুকা রায়—সদাচপল জীবেন বসু—সমর মিত্র—পান্না চক্রবর্তী—নবাগতা সংঘমিত্রা, প্রতিভা বিশ্বাস, শেফালী সরকার ও আরো কয়েকটি কিশোর কিশোরীদের সংগে। বর্তমানে আলো আঁধারের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে যখন সত্যই এই

যশস্বী প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল।

সদ্য প্রকাশিত 'রূপ-মঞ্চে'র গত মাঘ সংখ্যাটি ছবিবাবু যখন পড়ছিলেন, অতর্কিতে তাঁকে 'রূপ-মঞ্চে'র ক্যামেরায় ধরা হয়।

নতুনের দল একদিন আলোর শিখায় ঝলমল করবে—তাদের সেই গৌরবের দিনে রূপ মঞ্চের কথা কোনদিনই তারা ভুলতে পারবে না। আর একটী মুখ রূপালী পর্দায় ভেসে উঠবার সংগে সংগে না হেসে আর থাকতে পারলাম না—শুধু আমিই নই, ছবি বাবু থেকে সবাই—সে মুখখানা হ'চ্ছে আমাদের সব জনপ্রিয় শ্যামচাঁদ অর্থাৎ শ্যাম লাহার। হাসির বেগ থামাতে সকলেরই বেশ কিছুটা সময় লাগলো—ততক্ষণ ছবিটা আরো কিছুদূর এগিয়ে গেছে। শ্রীমান তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবি বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন: ছবিদা, রূপ মঞ্চের নামেও আরো একটা বিল করতে হবে—। ছবিবাবু উত্তর দিলেন: হাঁ, এটার কথাত আমার মনেই ছিল না।' ছবিবাবুর কথা শেষ হ'তে না হ'তেই দেখলাম: রূপালী পর্দায় ভেসে উঠেছে রূপ-মঞ্চের ছবি! এবার সমস্ত বিষয়টি হৃদয়ংগম করতে পারলাম। কিছুদিন পূর্বে দৃশ্যপটের প্রয়োজনে শ্রীমান অচিন্ত্য কয়েক খণ্ড রূপ মঞ্চ নিয়ে গিয়েছিল। দেখলাম সেগুলি কাজে লাগানো হ'য়েছে। আমি উত্তর দিলাম: বিলের বোঝায় আমরা বিকিয়ে যাবো যে!' আমায় আশ্বাস দিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রচারবিদ ফণীন্দ্র পাল: গায়ে গায়ে শোধ দেবেন!' আবার হাসির ফোয়ারা ছুটলো।

এবার মুখ খুললেন সম্পাদক: অন্য কথা দিয়ে। তখন শ্রীমতী

মীরা সরকারের মুখে একখানি গান হচ্ছিল : গানখানি শেষ হতেই তিনি বললেন : না, এবার আর মণ্টুবাবু সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা নেই—তাঁকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে কচ্ছে।' ব্যাপারটি আমি বুঝলাম। মণ্টুবাবু অর্থাৎ শ্রীযুক্ত প্রতাপ মুখোপাধ্যায়কে যখন 'যার যেথা ঘর'-এর সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়—শুধু সম্পাদকই নন—সংবাদটা শুনে আমরাও খুশী হ'তে পারিনি ততটা। কারণ, মণ্টুবাবু যে একজন গুণী সংগীতজ্ঞ, তা তখনও জানতাম না। মণ্টুবাবু বড় লোকের ছেলে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তিনি পরিভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন—তাঁর শিক্ষা এবং রুচির পরিচয় পেয়েছি বহুবার। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দিতে ভালবাসেন—আর ভালবাসেন নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াতে। কিন্তু সংগীতেও যে তাঁর যথেষ্ট দখল আছে, তা জানবার সুযোগ ইতিপূর্বে হয়নি—'যার যেথা ঘর'এর সংগীত সত্যই মন মাতানো হ'য়েছে—একথার সত্যতা পাঠকসাধারণ চিত্রখানি মুক্তির পরই উপলব্ধি করতে পারবেন। 'যার যেথা ঘর' সম্পর্কে আর কয়েকজনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়—এরা হচ্ছেন শিল্প নির্দেশক বিজয় বসু। বিরাট বিরাট দৃশ্য নির্মাণেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উদীয়মান চিত্র শিল্পী অনিল গুপ্ত—সম্পূর্ণ চিত্র গ্রহণের দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও যতটুকু অংশ তিনি গ্রহণ করেছেন, তাতেও কম নৈপুণ্যের পরিচয় দেন নি। শব্দ-গ্রহণে প্রবীণ শব্দযন্ত্রী গৌর দাস তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। প্রজেকশনের পর যাত্রার জন্য আমরা প্রস্তুত হলাম। বীরেনবাবু, জিতেনবাবু—এঁদের আগে পাঠিয়ে দেওয়া হ'লো। আমাদের বাহক হ'লেন শ্রীমান শ্যামচাঁদ। সম্পাদক বাড়ীতে গেলেন না। তাঁকে নামিয়ে দিলাম শীতল ষ্টুডিওতে। সারারাত ধরে পাঁচখানি প্লেট—১৩টি রোল তাঁরা ডেভেলপ করলেন। সকালের দিকে আমি শীতল ষ্টুডিওতে হাজির হলাম। দঁড়িতে একটা একটা করে ডেভেলপড্ ফিল্ম তখন ও ঝুলছে—কেউ ফিল্ম কাটছেন—কেউ প্রিণ্ট-এ ব্যস্ত আছেন। আমাকে দেখেই সম্পাদক ছুটে এসে বললেন : দ্যাখো শ্রীপার্থিব, এঁরা সবাই পনেরো কুড়ি বছর ধরে ছবি তুলছেন—আর আমি মাস খানেক। ওদের হাতে ছিল আমার চেয়ে দামী ও ভাল ক্যামেরা—তা সত্বেও আমি ওদের চেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছি।' নিখিলবাবুই বেশীর ভাগ ফিল্মগুলি ডেভেলপ করেছেন। তিনি বলে উঠলেন : দাদার নেগেটিভ দেখেই চেনা যায়। দাদা পেয়েছেন ৯০ নম্বর—আর ওরা দুজনে মিলিয়ে ৮০।' শীতলবাবু বুক ফুলিয়ে বললেন : গুরুটি কে?'

'রূপ-মঞ্চে'র বালক কর্মীবৃন্দ বা দিক থেকে : শ্রীমান অশোক, মণীন্দ্র, নির্মল ঘোষাল ও ধ্রুব।
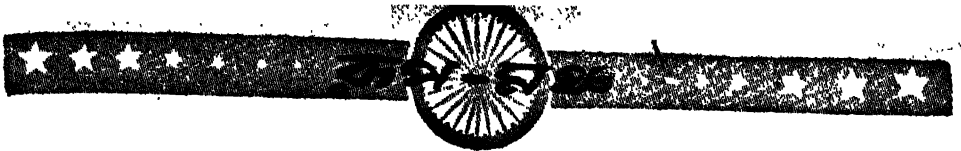
বীরেনবাবু উত্তর দিলেন : যে ভাবে উনি ছবি তুলছিলেন, তাতে আমি আর জিতেনবাবু ভেবেছিলাম, সবগুলিই নষ্ট হয়ে যাবে।' জিতেনবাবু উত্তর দিলেন : আমার ক্যামেরাতেও কালীপদা যত ভাল ছবি তুলেছেন—আমিও এত দিন তত ভাল ছবি তুলতে পারিনি।' সম্পাদক এবার জিতেনবাবুকে বলে উঠলেন : নিন, আর আমড়াগাছি করতে হবে না। আপনি কখানা যা ভাল ছবি তুলেছেন - সেখানে পৌছতে আমার এখনও ঢের দেরী।' আমাদের খালাসী সাহেব অর্থাৎ নিখিলবাবু তাঁর বেশ পরিবর্তন করে এলেন। শীতলবাবু বললেন : হ্যাঁ, বুঝতে পাচ্ছি, সারারাত তুমি রয়েছ—আর কী থাকতে পারবে—যাও তাড়াতাড়ি বাড়ী যাও—নইলে অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হবে।' নিখিলবাবু মুচকী মুচকী হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। শীতলবাবু যে পাঁচটি ষ্টীল নিয়েছিলেন—যে কোন ষ্টীলম্যানের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব ধরা পড়বে। এগুলি রেখে দেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতের জন্য। শিল্পীদের বেশীরভাগ একক ভাল ছবিগুলিও রূপ-মঞ্চের পরবর্তী সংখ্যার জন্য রেখে দিয়েছি। ছবিগুলি প্রিণ্ট হ'য়ে আমার বিভাগে আসে। বর্তমান সংখ্যায় কতগুলিই তার কেবল দেওয়া হ'লো। পাঠকসাধারণের দৃষ্টিতে রূপ-মঞ্চের নবীন শিক্ষার্থী দলের এই প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করে ধন্য হ'য়ে উঠুক—এর চেয়ে বড় কামনা আর কিছু আমার নেই। —শ্রীপার্থিব।

জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীকে অতর্কিতে আক্রমণ !

●

বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চের সম্পাদনা কার্যের শেষ মুহূর্তে এম, পি, প্রডাকসনের প্রচারবিদ শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নন্দ বাবু) এক খবরে প্রকাশ—শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনায় ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে এম, পি, প্রডাকসনের যে বাংলা ছবিখানি নির্মিত হচ্ছে—তার অভিনয়ের প্রয়োজনে জনপ্রিয় অভিনেতা জহর গাঙ্গুলী যখন ষ্টুডিও প্রাংগনে অশ্বারোহণের মহলা দিচ্ছিলেন অতর্কিতে কয়েকজন যুবক ট্যাক্সী থেকে অবতরণ করে পর পর তাঁকে 'স্যুট' করেন—দুপুর বেলা—ষ্টুডিওর অন্যান্য কর্মীরা চিত্রগ্রহণ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী অতর্কিত আক্রমণে দিশে হারা না হ'য়ে দ্রুত অশ্ব চালিয়ে ষ্টুডিওর অপর প্রান্তে যেয়ে আত্মরক্ষা করেন—ইতিমধ্যে তাঁর চীৎকারে ষ্টুডিওর কর্মীরা উপস্থিত হন এবং অগ্রদূতগোষ্ঠীর অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বিমল ঘোষের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্য আক্রমণ কারীরা ধরা পড়ে। সংবাদে আরো প্রকাশ, আক্রমণকারীরা চিত্র জগতের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। আগামী সংখ্যায় বিস্তারীত বিবরণ জানাবার ইচ্ছা রইল। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলী অক্ষত অবস্থাতেই আছেন।

সমালোচনা ও নানা সংবাদ

●

সন্দীপন পাঠশালা ঃ—

ব্যর্থ ও বিকৃত, অক্ষম ও অসফল ছবির পরে ছবি যে সঙ্কটময় মুহূর্তে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পকে চরম অধঃপতনের পথে প্রতিষ্ঠিত করবার অপপ্রচেষ্টায় একান্ত বদ্ধপরিকর, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আশা, আকাংখা ও উৎসাহের নতুন অনুপ্রেরণায় মনে সাড়া জাগালো—ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওর প্রথম চিত্র-নিবেদন, তারাশংকরের "সন্দীপন পাঠশালা।" ব্যক্তিগত নিছক অর্থ সাফল্য অথবা সস্তা ও চটুল খ্যাতি-লাভের মোহে এতটুকু বিভ্রান্ত না হ'য়ে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রকৃত ও যথার্থ শিক্ষা বিস্তারের এক সার্থকতম পরি-কল্পনাকে রূপ দিয়ে ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষ সারা দেশের সামনে যে উজ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তা' চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—শিক্ষা-বিস্তারের অর্থ ও পথ যে শুধুমাত্র পচা ও পুরাণো বুলি সর্বস্ব রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক সমস্যার গতানুগতিক গরম গরম পর্যালোচনাতেই নির্দিষ্ট নয়, সে কথাটাও বোধ করি এই প্রথমবার আমাদের দেশীয় চলচ্চিত্র-ক্ষেত্রে প্রমাণিত হলো। তাই, নতুন যাত্রা পথে অভিযানকারী এই নবজাত চিত্রপ্রতিষ্ঠানটিকে অন্তরের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই এবং সেই সাথে অভিনন্দিত করি পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়কে, যাঁর প্রগতিপন্থী বলিষ্ঠ মনোভাব ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা সম্ভব ক'রে তুলেছে এই "সন্দীপন পাঠশালা।"

অবহেলিত, অনাদৃত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের এক আদর্শবান দরিদ্র গ্রাম্য পাঠশালা পণ্ডিতের সংগ্রাম-মুখর জীবনালেখ্যই "সন্দীপন-পাঠশালা"র মূল কাহিনী। ইতিপূর্বে আমাদের দেশীয় কোনো ছবির আখ্যানভাগ এ ধরণের কাহিনী নিয়ে গঠিত হয়েছে ব'লে খুব মনে পড়ে না এবং এই কাহিনীর দিক থেকে যে relief "সন্দীপন পাঠশালা" আমাদের দিতে পেরেছে, তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। এ ছবি তথাকথিত শ্রমিক অথবা গ্রামোন্নয়নের বহু আলোচিত সমস্যায় ভারাক্রান্ত নয়—ন্যাকা ন্যাকা প্রেম-বিরহের মামুলি ও প্যানপ্যানে পাঁচালি পাঠের কোনো অবকাশও নেই এ ছবিতে। জাতির জীবনের এক সহজ-সরল অথচ অতি বাস্তব ও প্রয়োজনীয় অধ্যায় প্রতিফলিত হ'য়ে উঠেছে এ ছবির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আজকের দিনের পরিবর্তিত মানুষের মনে যে এ ধরণের কাহিনী দোলা দিয়ে যেতে পারে, সে বিষয়ে গভীর সচেতনতা অর্দ্ধেন্দু বাবুর সাফল্য লাভের অন্যতম প্রধান কারণ।—ছবির কাহিনী বিষয়ে, চিরাচরিত পথ অতিক্রম ক'রে গিয়ে "সন্দীপন পাঠশালা"কে নির্বাচিত ক'রে তিনি যে মৌলিকতার পরিচয় দিলেন, তা' খুবই প্রশংসা এবং অনুকরণ যোগ্য। অন্তরের গভীরতম প্রদেশের একান্ত সহানুভূতিশীল এই শ্রেণীর কাহিনীর চিত্ররূপ দেখতে দেখতে নিজেকে এমনি বিস্মৃত হ'তে হয় যে, ছবির ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি আর চোখেই পড়ে না—"সন্দীপন পাঠশালা'-র মূল আবেদনও মনকে এত আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো যে, তার ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি অতি অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য মনে হয়েছে। গত কয়েক বৎসরের বাংলা ছবির গতিপথ যে দিকে নির্দিষ্ট হচ্ছে, "সন্দীপন-পাঠশালা"-র পথ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই আনন্দে এবং এই গৌরবেই মনটা ভ'রে উঠেছে কানায় কানায়। দরিদ্র, অখ্যাত ও অবজ্ঞাত পাঠশালা পণ্ডিত—ছোট্ট তা'র পাঠশালা আর আশেপাশের গুটিকয়েক জনপ্রাণী, এই নিয়ে কাহিনী। এই অতি সংক্ষিপ্ত ও সীমাবদ্ধ পরিবেশে ছবিখানির এক-ঘেয়ে হ'য়ে উঠবার সম্ভবনাও কম প্রচুর ছিল না—কিন্তু অর্দ্ধেন্দুবাবুর গল্প-বলার ভংগি ও প্রয়োগ কলাকৌশল তা থেকে "সন্দীপন পাঠশালা"কে মুক্তি দিতে পেরেছে সাফল্যের সাথেই। তবু মাঝেমাঝে পাঠশালার দৃশ্যগুলিতে তিনি যদি কিছুকিছু কাঁচি চালাতে পারতেন, তবে আরো হৃদয়গ্রাহী হ'তে পারতো এ ছবি। একটা বিষয় ভালো লাগলো না—ছবির প্রথম ভাগে দেখা গেল শামু দেবুর গৃহ-শিক্ষক রূপে নিযুক্ত হয়েছে। ছবির নায়ক সীতারাম পণ্ডিত এবং বলতে গেলে এই শিক্ষকতার পদপ্রাপ্তিই সীতারামের জীবনাদর্শকে সার্থক রূপ দিতে সব চাইতে বেশী সাহায্য করেছিল। কিন্তু সারাটা ছবিতে গৃহ শিক্ষক-

রূপে সীতারামের সাক্ষাৎ একবারও পাওয়া যায় নি—অবশ্য ছাত্রদের একজনকে মাঝামাঝি সময়ে সীতারামের পাঠশালায় পাঠানো হয়েছিল এবং সেটা বোধ করি এই বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবার জন্যই করা হয়েছিল। এ ছাড়া গার্লস স্কুলের টিচার হিসেবে ছবিতে যে ভাবে ধীরাবাবুর স্ত্রীকে উপস্থাপিত করা হ'য়েছে, সে ব্যাপারটাও অস্বাভাবিকতা দোষে দুষ্ট। যেন হঠাৎ এই চরিত্রটিকে হাজির করানো হয়েছে এবং এর প্রয়োজনীয়তাও আমরা খুব বেশী উপলব্ধি করি নি। মনে হয়েছে—কাহিনীর প্রয়োজনে যেন তিনি আসেন নি, এসেছেন নেহাৎ আসতে হ'বে বলেই। তা ছাড়া যে সময়কার ও যে শ্রেণীর বাংলা দেশের গ্রাম্য পরিবেশে কাহিনী গঠিত হয়েছে, সেই সব অবস্থা অনুধাবন করলে ঠিক এই ধরণের গার্লস স্কুল টিচার বেশ বেমানান লাগে না কি? "আকু"কে শেষ সময়ে ধর্মতলার ছাত্র বিক্ষোভের ব্যাপারে জড়িত না করা হ'লে ছবির গাম্ভীর্য ও মর্যাদা আরো অধিক রক্ষিত হতো এবং শেষ সময়কার সীতারামের শোকযাত্রার দৃশ্য ও পতাকা পরিবর্তনের ইংগিত সম্পূর্ণ বর্জিত হ'লে ছবির আবেদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতো। তবু এই সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি গুলি ছবি দেখতে দেখতে ছবির মূল বিষয়বস্তুর মাঝখানে অদৃশ্য হ'য়ে যায় এবং এইখানেই "সন্দীপন পাঠশালা"র সব চাইতে বড় কৃতিত্ব।

অভিনয়াংশের প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সীতারামের ভূমিকায় অবতীর্ণ সাধন সরকারকে। বাংলা ছবির ইতিহাসে সীতারাম পণ্ডিতের চরিত্র-চিত্রণ স্মরণ ক'রে রাখার মত একটি ঘটনা। প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অজ্ঞাত তরুণ অভিনেতা সাধন সরকার যে অদ্ভুত দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা ছবি দেখতে যাবার আগে কল্পনা করা যায় না। সাধন বাবুকে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি "দেশের দাবী", "সাহারা", "পদ্মা প্রমত্তা নদী" প্রমুখ ছবিতে, কিন্তু তাঁর মাঝে যে এত বড় প্রতিভা লুকিয়ে আছে, তা আগে বোঝা যায় নি। চরিত্রানুগ যথাযথ সাবলীল অভিনয় দিয়ে তারাশংকরের "সীতারাম"কে মূর্ত ক'রে তুলতে তিনি যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তা সার্থক
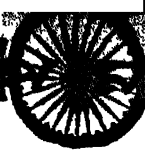
হ'য়ে উঠেছে। তাঁর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। পার্শ্ব-ভূমিকায় ভালো লেগেছে সার্কেল ইন্সপেক্টর রূপে ভূপেন চক্রবর্তীকে এবং "সীতারামে"র বাবার চরিত্রে পঞ্চানন ভট্টাচার্যকে। ধীরাবাবুর ভূমিকায় সুদর্শন প্রদীপ বটব্যাল (প্রদীপকুমার) অত্যন্ত সাধারণ—এ ছাড়া অমিতা বসুর অভিনয় মন্দ লাগে নি। মা'র চরিত্রে সুপরিচিতা সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়কে এই প্রথম নিষ্প্রভ লাগলো। আর মীরা সরকার সম্পূর্ণ অনুল্লেখ্য—এত Stiff তিনি, যা কিনা খুবই দৃষ্টি কটু। চমৎকার লেগেছে পাঠশালার শিশু অভিনেতাদের—তা'র ভেতরে "আকু" ও "লেতো" আর সবাইকে গেছে ছাড়িয়ে। বাংলা ছবিতে ছোটদের এত সুন্দর Team Work খুব কমই পাওয়া গেছে।

"সন্দীপন পাঠশালা"র যে বিভাগের কাজ মনকে সব চাইতে বেশী আহত করেছে, সে হলো তা'র আলোক চিত্রগ্রহণ। এমন অসাধারণ ছবির সাফল্যকে ব্যাহত করতে তা'র অতি সাধারণ চিত্রগ্রহণ যে এভাবে দায়ী হবে, সেটা ভাবতেও দুঃখ হয়। অর্ধেন্দুবাবুর দৃষ্টি এদিকে আরো সুনির্দিষ্ট হলে ছবির সাফল্য বৃদ্ধি পেতো। শব্দ-গ্রহণ উচ্চাংগের না হ'লেও একেবারে নিন্দনীয় নয়।

সংগীত পরিচালনা ব্যাপারে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে প্রশংসা করবো। বিশেষ ভাবে "যদি তোর ডাক শুনে কেউ" গানখানি মাত্র একটি যন্ত্র-সহযোগে, শিল্পীর কণ্ঠ মাধ্যমে পরিবেশন ক'রে তিনি ছবির সে সময়কার চমৎকার একটি আবহাওয়া সৃষ্টিতে খুব সহায়তা করেছেন। কিন্তু ভালো লাগে নি তাঁর নিজের গাওয়া গানখানি। Title Music গতানুগতিকতা বিবর্জিত এবং সেদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। দৃশ্য-সজ্জাও উল্লেখযোগ্য—বিশেষভাবে গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টিতে তাঁর সহায়তাকে অস্বীকার করা চলে না। তবে পোষাক-পরিচ্ছদ এবং মাঝে মাঝে কয়েকটি সংলাপের অসামঞ্জস্যতা পীড়াদায়ক। ভাষাগত পরিচালনা ব্যাপারে, আজ পর্যন্ত অর্ধেন্দুবাবুর যে কটি ছবির সাথে পরিচিত হয়েছি, তার মধ্যে "সন্দীপন পাঠশালা"ই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভংগি নিয়ে গৃহীত এই ছবির সাফল্য তাঁকে বাংলা ছবির উত্তরোত্তর কল্যাণ-সাধনে নিয়োজিত করুক—এই কামনা করি।

পরিশেষে ভারতীয় চলচ্চিত্র রাজ্যে "সন্দীপন পাঠশালা" যে নতুন পথ প্রদর্শন করলো, তাঁর পূর্ণাংগ রূপ সারা ভারতের দর্শক সাধারণের কাছে প্রকাশিত করতে ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই, "সন্দীপন পাঠশালা"র হিন্দি সংস্করণ গ্রহণ করতে। —ভূলু গুপ্ত।

বহুব্রীহি—

কল্পরূপায়ণীর প্রথম ছবি, জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত "বহুব্রীহি।"

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় চলচ্চিত্রের ভেতর দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিরাচরিত রাজনীতিগুলির বিদ্রুপাত্মক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা যে খুবই বেশী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—কিন্তু এই সমালোচনার সার্থকতা তখনই অনুভূত হয়, যখন দেখা যায় তার পেছনে আছে, সমস্যা-সমাধানের সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ কোনো পথ নির্দেশ। অন্যথায় সে সমালোচনা শুধু অর্বাচীনই নয়—অনভিপ্রেতও বটে। "বহুব্রীহি" র বিরাট ব্যর্থতা এইখানেই। "বহুব্রীহি" আজকের দিনের ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার বিষয়-বস্তুগুলি একেবারে খোলাখুলিভাবে রূপায়িত করতে যে সক্ষম হয় নি, সে কথা যেমন অস্বীকার করি না, তেমনি সত্যিকারের গ্রহণীয় ও বরণীয় যে কি হ'তে পারে, সে বিষয়ে "বহুব্রীহি" যে সামান্যতম ইংগিত দিতে পেরেছে, সে কথা-ই বা স্বীকার করি কি ক'রে? ছবির প্রথমার্ধে তাই প্রচুর অশ্লীল, কুৎসিত নোংরামি ও ইতরামি চোখ বুজে সহ্য করেছিলাম শুধু এই জন্য যে, হয়তো বা শেষার্ধে আশান্বিত কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে। ছবি শেষ হ'লো কিন্তু দর্শকসাধারণ যে অন্ধকারে সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল। গতানুগতিক কাঠামোর সেই অক্ষম পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

মাতাল শ্বশুরকে কিভাবে নায়িকা মদের বোতল ছাড়িয়ে একটা মিলনাত্মক আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন, এই ব্যাপারটা দেখাবার জন্য অত কাঠ-খড় পোড়াবার কি প্রয়োজন ছিল—বোঝা কঠিন। কাহিনীকার-পরিচালক মনে করলেন—
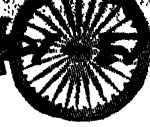
মস্ত বড় শিক্ষনীয় একটা কিছু ক'রে তিনি একেবারে আসর মাত ক'রে দিলেন। এই প্রসংগে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়—আদর্শবাদীনী নায়িকা শ্বশুর বাড়ী গিয়ে শ্বশুরকে মদের নেশা থেকে নিবৃত্ত করলেন, কিন্তু তার আগে অবিবাহিত অবস্থায় বাপের গাঁজার কলকের প্রতি তাঁর কি একটা আসক্তি ছিল না কি? নইলে বাপকেও তো তাঁর বহুপূর্বেই এই নেশা থেকে মুক্ত করা উচিৎ ছিল। তারপর দেখানো হয়েছে—আজকালকার অবাধ মেলামেশার ভেতর দিয়ে যে নায়িকা নায়কের সাথে মিলিত হলো তিনিই বিবাহিতা জীবনে রাতারাতি "আদর্শবতী" হয়ে বাজী মাত করলেন। ওঃ—এই অবাধ মেশামেশার গুণ আছে তা' হলে? নইলে, একই গোষ্ঠীভুক্তা হয়ে নায়িকার আদর্শবোধ যে ছিল না এমন তো নয়। অবশ্য ছবির কাহিনী অনুসারেই এ কথা বলছি। এখন প্রশ্ন জাগে, সেক্ষেত্রে আর অবাধ মেলামেশাকে কটাক্ষ করা কেন? কাহিনীকার অবাধ মেলামেশাকে কটাক্ষও করেছেন, আবার পরিশেষে তা'র অন্তর্নিহিত গুণও পরোক্ষে প্রকাশ ক'রে ফেলেছেন। বোধ হয় এ দিকে তাঁর অত বেশী খেয়ালও ছিল না। নইলে নিজের পাকে তিনি নিজেই জড়িয়ে পড়বেন কি ক'রে? আসল কথা হ'লো, যেন তেন প্রকারেণ একটা ছবি করতে হ'বে, আবার তাতে কিছু নতুনত্বও ঢোকাতে হ'বে। নতুনত্ব মানেই হলো গিয়ে গাঁজা, আফিং, মদ—এই আর কি! (জলধর বাবু কি বলেন?) যদি আমাদের দেখান হতো, অবাধ মিলন প্রসূত যে জীবন, সে জীবন বিবাহ বন্ধনে গ্রথিত হ'লেও পরিশেষে তার ফল বিষময়ই হ'য়ে ওঠে, তবু বুঝতাম যে ছবির সামান্য কিছু সারাংশ আছে। নইলে এ কি? ধাপ্পাবাজী, বুজরুকি ও ফাঁকি ছাড়া একে কিছু বলা চলে কি? অবাধ মেলামেশার বিষময় ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করানো হলো না—অথচ তাকে আঘাত করা হয়েছে একেবারে নির্বিচারে।

জলধর চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি নাটক রচনা ক'রে কিছু পরিচয় যে জনসাধারণের মাঝখানে করেন নি, এমন নয়—কিন্তু সেই লোভে ছবির কাহিনীকার এবং সাথে সাথে পরিচালকও হতে হবে এমন কোনো কথা আছে কি? হঠাৎ গজিয়ে ওঠা পরিচালকদের দলে যে তিনিও নাম লেখাবেন, সে ধারণা আমাদের কমই ছিল। বাস্তবিক, তাঁর "বহুব্রীহি", কোনো বিভাগেই এমন কোনো নিদর্শন দিতে পারেনি, যা নিয়ে কিনা আলোচনা করাও চলে। যেমন কাহিনী,তেমনি অভিনয়,তেমনি চিত্রগ্রহণ, তেমনি সংগীত। সব কিছুর যোগাযোগ একেবারে চমৎকার। তা ছাড়া ছবির সংলাপে এক জায়গায় পুরুষ মানুষ সম্পর্কে যে জঘণ্য ইংগিত করা হয়েছে, তাতে হীন ও কুরুচিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া গেছে।

"বহুব্রীহি"র বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা করা সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম মাত্র। শুধু সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে একটা আবেদন জানাবো—অভিনয়-পেশা নিলেই যে, যে কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং ভাঁড় সাজতে হ'বে, তার কি কোনো বাধ্যবাধকতা আছে? তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম—সেটা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে এসব ব্যাপারে দৃষ্টি দিতে হবে বৈ কি! —ভুলু গুপ্ত

বন্ধুরপথ—

অরোরা ফিল্মস্ প্রযোজিত বন্ধুরপথ—রচনা—নিতাই ভট্টাচার্য, পরিচালনা—চিত্ত বসু, ভূমিকায়ঃ অহীন, ধীরাজ, মিহির, জীবেন, ছয়া, রেণুকা, পূর্ণিমা, রাজলক্ষ্মী, সুহাসিনী, অপর্ণা ইত্যাদি। শ্রী ও পূরবীতে প্রদর্শিত হচ্ছিল।

বন্ধুর পথ আমরা দেখেছি। দেখে মুগ্ধ হইনি, তবে গল্পের জটিলতাকে পরিচালনার সুষ্ঠ প্রয়োগে ছবিখানি যে ভাল হতে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এক ধনীর আপ-টু ডে ultra-modern কন্যা কেমন করে একটা গেয়োছেলেকে বিয়ে করলে। মিঃ ঘোষ ব্যারিষ্টার—অনেকগুলি মেয়ে আর গোবেট ছেলে একটি। আমেরিয়া তার ছোট মেয়ে। বর্ধমানের জমিদার মলয়—আমেরিয়ার বন্ধু, সাহেবী ভাবাপন্ন—অর্থাৎ সোসাইটি ম্যান। এই জমিদার মলয়বাবু প্রজাদের উপরে অত্যাচারী। বর্ধমানের নবীন উকিল রবীন বসু প্রজাদের মঙ্গলকামী—গ্রামের উন্নতি তার কাম্য ও সাধনা। গ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বর্ধমানের

আদালতে ওকালতি করেন। ধানের গোলা লুট সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রজাদের সংগে মলয় বসুর বর্ধমানে এক মকদ্দমা হয়। ব্যারিষ্টার মিঃ ঘোষ কন্যা আমেরিয়ার অনুরোধে মলয়ের পক্ষ নিয়ে বর্ধমানে যান এবং সেখানে প্রতিপক্ষ উকীল রবীন যে তাঁর পূর্ব বন্ধু কমল বসুর ছেলে—জানতে পারেন। রবীনের সংগে তিনি রবীনদের বাড়ীতে যান। এবং মুগ্ধ হন রবীনের দেশপ্রেম ও অনাড়ম্বর জীবন দেখে। কলকাতা ফিরে এসে তিনি আমেরিয়ার সংগে রবীনের সংগে আমেরিয়ার বিয়ের কথা চিন্তা করেন। কিন্তু এদিকে আমেরিয়া যেতে চায় বিলেতে। মলয়বাবুই যে আমেরিয়ার প্রিয় লক্ষ বস্তু, একথা বিলেত যাবার আগের দিনের ভোজের আয়োজনে সবাই জানতে পারে। কিন্তু মলয় আর সেদিন ভোজ সভায় যোগদান করেনা—কারণ মিঃ ঘোষ তার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিহান হন এবং তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। রবীনের সংগে আমেরিয়ার বিয়ে হবে—আমেরিয়া তা জানতে পারে এবং পিতার সংগে বিদ্রোহ করে বাড়ী থেকে চলে যান। বাইরে দুমকার পথে তারা অগ্রসর হয়।

রেলওয়ে ওয়েটিং রুমে রবীন ঘুমিয়ে ছিল - এমন সময় মলয় ও আমেরিয়া সেখানে এল। রবীনের সংগে প্রথম দেখা আমেরিয়ার। তারপর এক হোটেলে মলয় নিয়ে যায় আমেরিয়াকে, সেই হোটেলে, রবীনও থাকে। রাত্রে মলয়ের উগ্র কামনা আমেরিয়াকে বিস্মিত করে। উভয়ের বচসা হয়—পরে মলয় সিড়ি থেকে পড়ে যায়, চারিদিকে গোলমাল হয়। রবীনের সংগে আমেরিয়া পুলিশের ভয়ে পলায়ন করে। জমিদার মলয়ের হত্যার চেষ্টায় রবীন ও আমেরিয়ার বিরুদ্ধে হুলিয়া বের হয়। বহু জঙ্গল, ঝড়, জল, নদী বন্ধুর পথ অতিক্রমে সত্যিকারের পরিচয় নেই, অথচ তাদের মাঝে পরিচয় গড়ে ওঠে। মোটের উপর বিলেতী ভাবাপন্ন মেয়ে আমেরিয়া কেমন করে গ্রামের মায়ায় জড়িয়ে পড়েন। তার কথাই বলা হয়েছে এই ছবিখানিতে।

ছবিখানি দেখতে দেখতে কোথাও মনে দাগ কাটেনা। তার কারণ মনে হয় দুইটি। একটি হচ্ছে—কাহিনীর চিত্রনাট্যে অবান্তর ঘটনার সংযোজনা হয়েছে অনেক। আসল প্রতিপাদ্য বিষয়ে লক্ষ্য রেখে ছবিখানিকে আরও সংযত করা যেত। আসল কথা চিত্রনাট্য খুবই দুর্বল। কাহিনীর সত্যিকারের রূপ চিত্র নাট্যে পরিস্ফুট হয়নি এবং আর একটি কারণ হ'চ্ছে শিল্পী নির্বাচন। যাদের বয়স হয়েছে, মুখে যাদের বয়েসের ছাপ—সাপের মত ফণা করে চুল বাঁধলে বা বেণী করে চুল পিঠে ঝুলালেই তাঁদের ১৮।২০তে নামিয়ে আনা যায়, একথা পরিচালকের বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় না কি? অবান্তর চরিত্রগুলি কেন ঘোরা ফেরা ক'রেছ—তার কোনই যুক্তি নেই। মনে হয় খাপ-ছাড়া অনেকগুলি চিত্র সংযোজক হয়েছে—' রবীন বসুর বাড়ীতে বুনিয়াদী শিক্ষায়তনের মধ্যে গান ও কাজের বহর দেখিয়ে ওটা একটা হাস্যকর ব্যাপার করেছেন পরিচালক মশায়। রেলগাড়ীর কামরা দেখাতে হলে তার ব্যবস্থাটাও ভাল করা উচিত। যে রেলের কামরা দেখালেন, তাতে আর্ট ডিরেক্টারের উর্বর মস্তিস্কের পরিচয় পেয়েছি। বন্ধুর-পথে আমেরিয়া ও রবীনের পলায়ন ও পুলিশের তৎপরতা—এইটেই ছিল ছবির সব চেয়ে বড় লক্ষ্যের বিষয়। কিন্তু পরিচালক এই অংশটুকুর প্রতি এত সামান্য দৃষ্টি দিয়েছেন যে, ছবি জমবে কোথায়? একটা "ক্লাইমাক্স"—"কভু মিলিল না"। দুধকে ক্ষীর করতে হলে—চাই পরিশ্রম, চাই বুদ্ধি। তার অভাব ঘটলে দুধে ছানা কাটে। নিতাই বাবুকে বলি—এত খেলো চিত্র-নাট্যকে ছবি করার অনুমতি তিনি দিলেন কি করে। অবশ্য প্রযোজকের ও পরিচালকের উপরে লেখকের কথা বলার ক্ষমতা আমাদের দেশে নেই। বন্ধুর পথ ছবিখানি দেখে মনে হয়, মশলা ছিল—রাধুনী ভাল হলে—মুখরোচক হতে পারত। তবু গল্পের সংগতি দর্শকের মনে সাময়িক আনন্দ দান করবে একথা বলব।

অহীনবাবু (মিঃ ঘোষ) তার পেটেন্ট অভিনয় করেছেন—ধীরাজ (মলয়) ভিলেইনের অভিনয় করেছেন—মন্দ নয় তবে একটু আড়ষ্ট—মিহির (রবীন) চলন সই। রেণুকা (আমেরিয়া) ভালই। সুর সংযোজনা—খুব মনোরম হয়নি। শব্দগ্রহণ মামুলী। —দীপঙ্কর

অনন্যা—

শ্রীমতী কানন দেবী প্রযোজিত শ্রীমতী পিকচাসে'র প্রথম ছবি। পরিচালনা করেছেন সব্যসাচী। কাহিনী রচনা করেছেন কল্যাণী মুখোপাধ্যায়।

সীতার পিতা ছিলেন শিল্পের পূজারী। নিজের পুত্র-কন্যাকেও উদার প্রকৃতির মত সীমাহীন করে গড়ে তুলেছিলেন তিনি। তাই বুঝি, বন্ধনহীন অনন্ত জীবনের স্বপ্ন গেল ভেংগে। স্বামী কমলকে সে চিনল' ফুলশয্যার রাত্রেই, জ্ঞানহীন অপরিণত মস্তিষ্ক, কাপুরুষ বলে। অগ্রজ কুচক্রী রাঘব ডাক্তার দুটা অন্নের বিনিময়ে কমলের সাথে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করে। সীতা কমলের সুপ্ত চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু দাদা আর বৌদির প্রভাবে সম্মোহিত কমল, সীতার সে প্রচেষ্টাকে উপেক্ষা করে চিরাচরিত পথেই চলে। এরই মাঝে আসে, নূতন অতিথি উমা,—সীতা আর কমলের সন্তান, —যেন সীতার রিক্ততাকে ভরিয়ে দেবারই জন্যে। সীতা তাকে গড়ে তোলে, তার নিজের আদর্শে। ও ভাবে যে, ওর রিক্ত জীবনের ব্যর্থতার আঁচড় উমার জীবনে এতটুকুও লাগতে দেবে না। তাই প্রগতিশালিনী সীতা আর কুসংস্কারাবদ্ধ রাঘবের মাঝে উঠতে লাগল কলহের ঝংকার। একদিন সীতাকে পথের আশ্রয় নিতে হল কন্যার হাত ধরে। সম্মোহিত কমল সেদিনও তার দাদা রাঘবের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারল না। সীতা উমাকে তার বান্ধবীর হাতে তুলে দিয়ে চলে গেল বীরভূমের এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হয়ে। দিনগুলি এমনি করেই কাটছে সীতার। হঠাৎ একদিন কমল এসে দাঁড়াল তার লতা ঘেরা কুঁড়ে ঘরটার আংগিনায়: কমলের ভেতরের সত্যিকারের কমলটা এত দিনে বুঝি জেগেছে। তার ভেতরের ঘুমন্ত পুরুষ সিংহটা সম্মোহনের পিঞ্জর ভেংগে, ছুটে চলে এসেছে তার জীবন সংগিনীর কাছে। সীতার বনবাসে আজ পড়ল পূর্ণচ্ছেদ।

সীতার অনন্যসাধারণ নারীত্ব যে চরিত্রটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে, সে চরিত্রটার সংগে বাস্তবতার কোন সম্বন্ধই নেই। চরিত্রটা হল কমলের। লেখিকা যেন খুসীমত তুলি বোলাবার জন্যেই কমলের মত একটা অবাস্তব Back-ground তৈরী কোরেছেন। কমলকে বলা হয়েছে — বি, এ, পাশ। আমারত মনে হয়, ছবি দেখে কমলকে যিনি Graduate ভাববেন, তাঁরও ডিগ্রী কেড়ে নেওয়া উচিত। ফুলশয্যার রাত্রে Graduate ত' দূরের কথা কোন Matric পাশ ছেলেও স্ত্রীর সংগে আলু পটলের দর নিয়ে আলোচনা করার কথা ভাবতে পারে না। আর একটা কথা হচ্ছে,—কুচক্রী রাঘবের মনে কী ভাইকে বি, এ, অবধি পড়াবার মত উদারতা ছিল? লেখিকা কমলের ঐ Graduate ডিগ্রীটা মিথ্যা বলে পরে দেখিয়ে দিলেই পারতেন। কাহিনী সম্বন্ধে শেষ কথাটা হচ্ছে যে, অসবর্ণ বিবাহ। সমস্যার সরাসরি একটা সমাধান করে দেওয়ায় লেখিকা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। চিত্র-নাট্যের মধ্যে তারিফ করার মত কিছুই

অনন্যার প্রেস শোতে সাংবাদিকদের মাঝে কানন দেবী। বা দিক থেকে: কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, গৌর চট্টোপাধ্যায়, কানন দেবী, মনোজিৎ বসু ও যশস্বী চিত্র-নাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়। —চিত্রগ্রহণ: 'রূপ-মঞ্চ'

নেই। পরন্তু গতির দিক থেকে প্রথম দিকটা অতিরিক্ত মন্থর এবং শেষে অত্যন্ত ক্ষিপ্র। সীতার কৈশোরের এবং যৌবনের দিন গুলোর ছবি আঁকতে গিয়ে অনেক বেশী সেলুলয়েড খরচা করা হয়েছে। অথচ উমার শৈশব থেকে যৌবনের দিন গুলো কি ভাবে সীতার আদর্শে গড়ে উঠলো তা একটুও দেখান হ'ল না। বাচ্চা উমাকে দোলনা থেকে যুবতী করে নিয়ে যাওয়া হল, যেন কলেজের প্রফেসরের সাথে প্রেমালাপ করতে—এর মধ্যে শুধু একটু গান "আমাদের যাত্রা হল সুরু।"

গানগুলির ঠিক পরিবেশ তৈরী হয়নি বলে তাদের বেশীর ভাগ রবীন্দ্র সংগীত হয়েও উপভোগ্য হয়নি যেমন ধরুণ "হারে রে রে" গানটীকে গাওয়াতে হবে বলেই যেন চা খাওয়ার দৃশ্যটীর অবতারণা করা হয়েছে। সীতা তার জায়ের সংগে উমার দুধের জন্মে মনকষাকষি করে এসেই হাসি মুখে "বাবলু আমার" বলে গান ধরল—এই পট ভূমিকাটী একবারে সংগীতের পক্ষে অর্থহীন। তবে অদ্ভুত সুন্দর হয়েছে "বাঁধনা তরী খানি" গানটীর পরিবেশ।

অজয় করের কাছ থেকে আরও সুন্দর চিত্রগ্রহণ আশা করা হয়েছিল। চিত্রের Tone সর্বত্র সমান হলেও,

'অনন্যা'র প্রেস শোতে যশস্বী চিত্রশিল্পী অজয় করের এই চিত্রখানি 'রূপ-মঞ্চ' চিত্র বিভাগ থেকে গৃহীত হয়। অনন্যা'র পরিচালক সব্যসাচী শ্রীযুক্ত কর ছাড়া আর কেউ নন। —

অমৃতবাজার পত্রিকার চলচ্চিত্র সম্পাদক সর্বজনপ্রিয় শ্রীযুক্ত নির্মল কুমার ঘোষ—এন, কে, জি নামে যিনি পরিচিত। অনন্যার 'প্রেস-শো'তে রূপ-মঞ্চের চিত্র বিভাগ থেকে গৃহীত।

গঙ্গার দৃশ্যের Back projection শট্ গুলির সংগে তার contra-angle এর কোন শটেই densityর মিল নেই। ঐ শট গুলি গঙ্গার ধারে গিয়ে নিলেই ভাল হত। দৃশ্য গুলোও খুব নয়নানন্দদায়ী হয়নি। তবে dolly shot এবং Panning গুলি খুব সাবলীল হয়েছে। রাঘব ডাক্তার আর সীতার কলহের দৃশ্যের আলোক সম্পাত অত্যন্ত সুন্দর। বাগানে রাঘব ডাক্তার যে শটে তার ভায়ের বিবাহের প্রস্তাব করে, সে শটটী মাঝে মাঝে out of focus হয়ে যায়। সীতার বাবা যখন পুত্রকন্যাকে তাদের পুরাণো দিনের খেলনাগুলি দেখান, তখন বাঁ দিকের দেওয়ালের এক কোনে michrophone-এর ছায়া দেখতে পাওয়া যায়।

শব্দগ্রহণ সর্বাংগীন সুন্দর। চলন্ত বৈদ্যুতিক পাখা শুদ্ধ talkie shot নেওয়ায় শব্দযন্ত্রী কৃতকার্য হয়েছেন।

সম্পাদনায় দেখাবার মত কিছু পরিস্থিতি নেই। তথাপি সম্পাদক মশাই তাঁর কাজ বেশ ভালভাবেই করেছেন। shot changeএ কোন jerk নেই। সীতার পিতার অসুখের দৃশ্যের Montage টুকু খুব সুন্দর। উমার বড় হওয়ার Time lapse অন্যভাবে দেখালে বেশ ভালই হত।
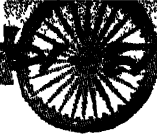
দৃশ্যপট খুবই মনোরম। তবে চিত্রশিল্পী আর একটু যত্ন নিলে, দৃশ্যপটের রূপ এবং depth আরও ভাল করে দেখানো যেত।

অনন্যা চিত্রের প্রধান আকর্ষণ হল অভিনয়। কানন দেবী থেকে সুরু করে রাস্তার ছিঁচকে চোরটী অবধি অত্যন্ত সুন্দর আর সংযত অভিনয় করেছেন। রাঘব ডাক্তারের ভূমিকায় কমল মিত্রের অভিনয় সত্যই উপভোগ্য। পূর্ণেন্দু বাবু কমলের মত হাঁদা গঙ্গারাম মার্কা একটী কঠিন চরিত্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন যথাযত ভাবে। উমা এবং সুকান্ত চরিত্রে যথাক্রমে অনুভা এবং বিকাশ রায়কে অভিনয়ের কোন সুযোগই দেননি চিত্র নাট্যকার। ফণী রায় এবং রেবা বসু, টাইপ চরিত্রের অভিনয়ে আবার আমাদের আনন্দ দিলেন। সীতার ভূমিকায় কানন দেবী সত্যই অনন্যা।

সংযত পরিচালনার জন্য সব্যসাচীকে অভিনন্দন জানাই। এককথায় বলতে গেলে, ছবিটী দর্শককে আকর্ষণ করবার মত যোগ্যতা রাখে। তবে রূপবাণীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ,—তাঁরা যেন আসনগুলিতে ডি, ডি, টি প্রয়োগ করেন। নইলে হয়ত কোন বেয়াড়া দর্শক, হল থেকে বেরিয়েই তাঁদের কাছে "হাপসুল" খরচা চাইতে পারেন। ছারপোকাতে তাঁর সর্বাংগ ঝাঝরা করে দিয়েছে বলে।

—চোখ এবং কান।

এম, পি প্রডাকসন্স—

গত ১লা বৈশাখ অগ্রদূতের পরিচালনাধীন এঁদের আর একখানি ছবির মহরৎ ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। চিত্রজগতের অনেকের উপস্থিতির মধ্যে শ্রীমতী কানন দেবী ক্ল্যাপষ্টিক ধারণ করে অনুষ্ঠানের শোভা বর্ধণ করেন। বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে যে, অগ্রদূত গোষ্ঠীর বর্তমান চিত্রখানি পূর্ণাংগ শিশু চিত্র হবে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। তবে এর নায়ক-নায়িকা কিশোর-কিশোরী। নায়কের ভূমিকায় শ্রীমান অনুপকুমারকে নির্বাচন করা হ'য়েছে। অন্যান্য ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, মলিনা দেবী, নৃত্য শিল্পী কুমারী শিখা বাগ ও আরো অনেককে দেখা যাবে। অগ্রদূত গোষ্ঠীর বর্তমান কাহিনীটি রচনা করেছেন কবি শৈলেন রায়।

স্বাগত পিকচার্স—

চিত্রজগতে আর একজন মহিলা প্রযোজক শ্রীমতী মধুছন্দা রায় প্রযোজিত স্বাগত পিকচার্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্যের মহরৎগত ১লা বৈশাখ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীযুক্ত পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্র, ইন্দু মুখুজ্জে, অমর মল্লিক, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, কানন দেবী, সুনন্দা দেবী, সুমিত্রা দেবী, স্বাগতা দেবী প্রভৃতি আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। মহরৎ উপলক্ষে শ্রীমতী মধুছন্দা রায় ও নবাগত ছবি গাঙ্গুলীকে নিয়ে স্থির চিত্রগ্রহণ করা হয়।

যুগান্তর চিত্র প্রতিষ্ঠান—

গত ১লা বৈশাখ কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে সকাল সাড়ে নটায় এই নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠানটি শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' কাহিনীর চিত্ররূপদানের শুভ মহরৎ সম্পন্ন করেছেন। খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক শ্রীনীরেন লাহিড়ী মহরৎ সটের চিত্রগ্রহণ করেন। তাঁর যোগ্য শিষ্য ও 'এই তো জীবন' এবং 'রাত্রি' চিত্রের পরিচালক মানু সেন 'বৈকুণ্ঠের উইল'-এর চিত্ররূপ পরিচালনা করবেন। দু'টী প্রধান চরিত্রে রূপদান করবেন জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা দেবী।

ওরিয়েন্টাল স্ক্রীণ করপোরেশন লিঃ—

গত ১১ই মার্চ তারিখ থেকে ইন্দ্রলোক ষ্টুডিওতে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ওরিয়েণ্টাল স্ক্রীন করপোরেশনএর প্রথম কথাচিত্র 'সতী সীমন্তিনীর' চিত্রগ্রহণ যথারীতি শুরু হ'য়েছে। ফণী রায়, জীবেন মুখো, পুষ্প দেবী ও মাষ্টার নিরঞ্জনকে নিয়ে ওদিন স্যুটিং করা হয়। বর্তমান চিত্রের কাহিনী রচনা করেছেন উদীয়মান সাহিত্যিক শক্তিপদ রাজগুরু। সংগীত রচনা ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন যথাক্রমে মোহিনী চৌধুরী ও সন্তোষ মুখোপাধ্যায়।

হাওড়া ফিল্মস্—

এদের প্রথম চিত্র প্রভাবতী দেবী, সরস্বতীর কাহিনী অবলম্বনে 'জাগৃহি'র কাজ বেঙ্গল ন্যাশনাল ষ্টুডিওতে শেষ

হ'য়েছে। জটিল সামাজিক সমস্যাকে ভিত্তি করে এই ছবিটির কাহিনী রচনা করা হ'য়েছে। প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ? এবং পরিচালক শ্রীহিতেন মজুমদার Re-recording এর জন্য বোম্বাই রওনা হ'য়েছেন। জাগৃহির এক বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে জহর গাঙ্গুলীকে। অন্যান্য ভূমিকায় রূপদান করেছেন গীতা সোম, প্রমীলা ত্রিবেদী, শান্তি গুপ্তা, ফণী রায়, তুলসী চক্রবর্তী ও আরো অনেকে। সংগীত পরিচালনা করেছেন শ্রীশৈলেন রায়।

কনক ডিস্ট্রিবিউটর্স—

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স লিমিটেডের 'অভিমান' চিত্রখানি সমাপ্তির পথে। অভিমানের সংগীত পরিচালনা কচ্ছেন যশস্বী সংগীতজ্ঞ রামচন্দ্র পাল। বিভিন্নাংশে অভিনয় করছেন সন্ধ্যারাণী, ছায়া দেবী, স্মৃতি, পরেশ, জহর, গুরুদাস, ফণী রায়, হরিধন প্রভৃতি আরো অনেকে।

মৃণালিনী পিকচার্স—

গত ১লা বৈশাখ ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে শ্রীখগেন রায়ের পরিচালনায় এঁদের নতুন ছবির মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ শ্রীযুক্ত রায়ের বর্তমান ছবিখানি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে।

নতুন চিত্রগৃহ অরুণা—

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পিছনে মীর্জাপুরে প্রিমিয়ার থিয়েটার্স লিঃ-এর পরিচালনাধীনে যে নতুন চিত্রগৃহের সৌধ নির্মাণকার্য প্রায় সমাপ্ত হ'য়ে এসেছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অরুণা'। রূপবাণী ও প্রাইমা ফিল্মস-এর পরিচালকবর্গ প্রিমিয়ার থিয়েটার্স লিঃ-এরও কর্ণধার।

শ্রীচিত্রম

গত ১৩ই চৈত্র শ্রীচিত্রম-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য 'তপতী'র মহরৎ উৎসব ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে। চিত্রখানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা কচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মুক্তি প্রতীক্ষিত 'আবর্ত' চিত্রখানিরও অন্যতম প্রযোজক।

কলালক্ষ্মী চিত্র মন্দির

গত ১লা বৈশাখ নব প্রতিষ্ঠিত কলালক্ষ্মী চিত্র মন্দিরের প্রথম বাণীচিত্র শরৎচন্দ্রের 'স্বামীর' শুভ-মহরৎ ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে সম্পন্ন হ'য়েছে। স্বামী পরিচালনা করবেন প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়। শ্রীযুক্তা রমা চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে পশুপতি বাবুই স্বামীর প্রযোজনা করবেন বলে প্রকাশ।

মায়াপুরী পিকচার্স লিঃ

গত ১লা বৈশাখ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে এদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাণীচিত্র 'ছায়ানটী' ও 'বিজুলিকার' মহরৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দু'খানি চিত্রেরই পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

ভারতী চিত্রপীঠ

সত্যাংশু কিরণ দালাল প্রযোজিত এদের প্রথম চিত্র নিবেদন 'দাসীপুত্র' একযোগে শ্রী ও অন্যান্য চিত্রগৃহে আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়। দাসীপুত্র রচনা ও পরিচালনা করেছেন নাট্যকার পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত। সংগীত পরিচালনা করেছেন বিভূতি দত্ত (এ্যাঃ)। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন মঞ্চ সাম্রাজ্ঞী সরযূবালা, নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, দীপক মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, রাণীবালা, প্রীতিধারা, মণিকা, শেফালিকা, শ্যাম লাহা, দেবীপ্রসাদ, রাজলক্ষ্মী, নবদ্বীপ, বেণু মিত্র, আশু বসু, সংঘমিত্রা, মণি মজুমদার, মণি শ্রীমাণি প্রভৃতি আরো অনেকে।

চিত্র দীপ লিঃ

এদের দ্বিভাষী চিত্র রাতনীবালি (হিন্দি) ও নীলাকমলা (বাংলা) এর শুভ মহরৎ কালী ফিল্মস ষ্টুডিওতে সুসম্পন্ন হয়েছে। সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বন করে চিত্র দুখানি গড়ে উঠবে। চিত্র দু'খানির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন সাহিত্যিক পরিচালক সুনীল মজুমদার।

ক্যালকাটা টকীজ লিঃ

এদের পরিবেশনায় সাংবাদিক পরিচালক খগেন রায় রচিত ও পরিচালিত কালসাপ চিত্রখানি মুক্তির দিন গুনছে। শ্রীযুক্ত রায়ের কালসাপ অপরাধ প্লাবিত বর্তমান যুগের সংগে সুরে বাঁধা একখানি অনন্যসাধারণ ডিটেকটিভ চিত্র হবে বলে প্রকাশ। কালসাপের সংগীত পরিচালনা করেছেন সুশান্ত লাহিড়ী। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন

ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ, হরিধন, প্রমীলা ত্রিবেদী, মনোরঞ্জন, আরতি দাস, শিবশংকর, প্রতাপ মুখোঃ, সুশীল, নৃপতি, মধুসূদন, কৃষ্ণকিশোর, আশা বোস, জীবন কানাই প্রভৃতি আরো অনেকে।

চিত্র প্রতিষ্ঠান লিঃ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত এদের 'হের ফের' চিত্রখানি বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার পূর্বেই সম্ভবতঃ চিত্রা, রূপালী ও প্রাচীতে মুক্তি লাভ করবে। হের ফের-এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন চন্দ্রাবতী, দীপ্তি, সমর, অবনী, স্বাগতা, হরিধন, সন্ধ্যা (বড়) প্রভৃতি আরো অনেকে।

রূপায়ন চিত্র প্রতিষ্ঠান

রবি প্রসাদ গুপ্ত ও ইন্দ্রজিৎ সিং প্রযোজিত এদের দেবী-চৌধুরাণী বর্তমান সংখ্যা রূপ-মঞ্চ প্রকাশিত হবার পূর্বেই সম্ভবতঃ একযোগে বীণা ও বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি লাভ করবে। দেবী চৌধুরাণী পরিচালনা করেছেন সতীশ দাশ গুপ্ত এবং জাকজমকময় দৃশ্যগুলি প্রবীণ পরিচালক প্রফুল্ল রায়ের তত্ত্বাবধানে গৃহীত হয়েছে।

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

স্বতঃ প্রণোদিত হ'য়ে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্মের প্রথম থেকেই যাঁরা শিশু চিত্র নির্মাণ করে বাঙ্গালী শিশু দর্শক-দের নমস্য হ'য়ে আছেন এবং বাংলা শিশু চিত্রের ইতি-হাসের পাতা ওলটালে যাঁদের নাম সর্বপ্রথম নজরে পড়ে, তাঁর নাম হচ্ছেন অরোরা ফিল্মস করপোরেশনের কর্তৃপক্ষ। বর্তমানেও অরোরা আর একখানি শিশু চিত্র নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছেন। অরোরার বর্তমান চিত্রখানির প্রযো-জনা ও পরিচালনা ভার দেওয়া হয়েছে উদীয়মান নবীন পরিচালক শ্রীযুক্ত সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়ের ওপর। অরোরার নিজস্ব ষ্টুডিওতে ইতিমধ্যেই বর্তমান শিশু চিত্র 'খেলাঘর'এর কাজ শুরু হ'য়েছে। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী পিনাকী, কুমারী নীতা গুহ, আরতি দেবী, কুমুদ মেঠা, ঝরণা মজুমদার, সরলা প্যাটেল, ইলা মিত্র, ও সংগীত সম্মিলনীর অন্যান্য সভ্যদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই কয়েকটি মনোরম দৃশ্য গৃহীত হ'য়েছে। সংগীত পরিচালনা করছেন ধ্রুব চক্রবর্তী। চৈনিক যাদুকর রূপে অভিনয় কচ্ছেন বেতার-খ্যাত মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও নিখিল সেনগুপ্তকেও মনোরম নৃত্য দৃশ্যে দেখা যাবে। গীতশ্রী ইভা দত্ত, লিলি ঘোষ, গীতা চক্রবর্তী অঞ্জলি সুর, ধীরেন বসু, প্রভাত মিত্র, অচিন্ত্য প্রভৃতি সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। সত্যেন দাশগুপ্ত, বঙ্কু রায় ও বিশু মিত্র যথাক্রমে শব্দগ্রহণ, চিত্রগ্রহণ ও সম্পা-দনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ব্যাবস্থাপনার ভার নিয়ে আছেন নীরেন ঘোষ, বীরেন ভঞ্জ ও নপ্তা মিত্র। আমরা পরিচালক সৌম্যেন মুখোপাধ্যায়ের খেলাঘর-এর সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করি।

এ, এল, প্রডাকসন

এদের দ্বিতীয় চিত্র নিবেদন পরিচালক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় গৃহীত হবে বলে এক সংবাদে প্রকাশ।

অমৃত চক্র

স্বর্গতঃ রসরাজ অমৃতলাল বসুর সপ্তনবতিতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে রঙ্গমহল রঙ্গমঞ্চে অমৃত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নাট্য-কার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভ্যবৃন্দ কর্তৃক নাট্যাচার্যের 'নব যৌবন' অভিনীত হয়।

রূপ-চক্র

গত ৩০শে মার্চ ৭৭, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত রূপ-চক্রের সাধারণ বার্ষিক সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণ নির্বাচিত হ'য়েছেন। পৃষ্ঠপোষক কিরণ চন্দ্র দত্ত, কালীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুপ্রীতি মজুমদার, সনৎ কুমার লাহিড়ী। সভাপতি : গিরিজাপ্রসন্ন সেন। সহঃ সভাপতি : জীবঞ্জীব চন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অনন্ত কুমার বসু, ভূদেব চন্দ্র মল্লিক, মাণিক মোহন রায়, সুবোধ কুমার সুর। সাধারণ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। সহঃ সম্পাদক : দেবব্রত চক্রবর্তী, সুবোধ গাঙ্গুলী। কোষাধ্যক্ষ : দুর্গাদাস নিয়োগী, সম্পাদক সাহিত্য বিভাগ : মণীন্দ্রনাথ দাস, খেলাধূলা বিভাগ : বীরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমোদ প্রমোদ বিভাগ : অসিম নিয়োগী। ব্যাপস্থাপক সমিতির সভ্য : লহর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ রায়, ভবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভট্টাচার্য, মণি সেন, শান্তিদেব ঘোষ।

পরলোকে কৃষ্ণ কামিনী দেবী

গত বৃহস্পতিবার৭ ই এপ্রিল, সকাল ১১-৩০, মিঃ ২৫এ, ল্যান্স ডাউন টেরাস বালীগঞ্জ ভবনে ৮৭ বৎসর বয়সে শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দেবী পরলোক গমন করেছেন। তিনি গরিফা নিবাসী ৺মধুসূদন রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ৺বিনোদ বিহারী গুপ্তের সহধর্মিনী ছিলেন। তিনি চারি পুত্র: শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত, নিত্যানন্দ গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত (ডেপুটি কমিশনার কলিকাতা পুলিশ) ও চন্দ্রশেখর গুপ্ত (উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট জনহিতসেবী কর্মী ও কলিকাতা কর্পোরেশনের সাব এসেসার), দুই কন্যা, পৌত্র ও প্রপৌত্রাদি রেখে গেছেন। তিনি পরোপকারী সহৃদয়া আদর্শ স্ত্রী ও জননী ছিলেন। আমরা তাঁর আত্মার সদ্গতি কামনা করি।

পরলোকে সরোজিনী দাসী

উত্তর ক'লকাতার বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান মডার্ণ লিথো প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এর প্রোপ্রাইটর শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ভড় মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণী গত ১২ই বৈশাখ ১৩৫৬, সোমবার রাত্রি ১২টা ১৫ মিঃ গীতাপাঠ সমাপ্তে ভড় মহাশয়ের নিজ বাটী ১১, ভড় লেনে ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। তিনি দয়াপরায়ণা ও পরোপকারী আদর্শ জননী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে ৪ পুত্র, নাতি নাত্নী ও অনেক আত্মীয়স্বজনাদি রেখে গেছেন। আমরা তাঁর মৃত আত্মার শান্তি কামনা কচ্ছি।

ডিটেকটিভ তপনকুমার

ছোটদের রহস্য উপন্যাস: শ্রীশৈলেশ ভড়। প্রকাশক —দাশ গুপ্ত এণ্ড কোং—২১১ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা। দাম—১৲ টাকা।

আজকাল বাজারে ছোটদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস এত বাহির হয়েছে যে তাদের মধ্যে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ বেছে নেওয়া দায়। কিন্তু আলোচ্য পুস্তকখানির এমন একটা বিশেষত্ব আছে যা তরুণ মনের মনি কোঠায় আঘাত করে। ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে তপনকুমারের গুপ্তচর বিদ্যার অপূর্ব প্রকাশ কৌশল সকলকেই আনন্দ দিবে। বইখানি সুখ পাঠ্য।

ছাপা ও প্রচ্ছদপট ভাল।
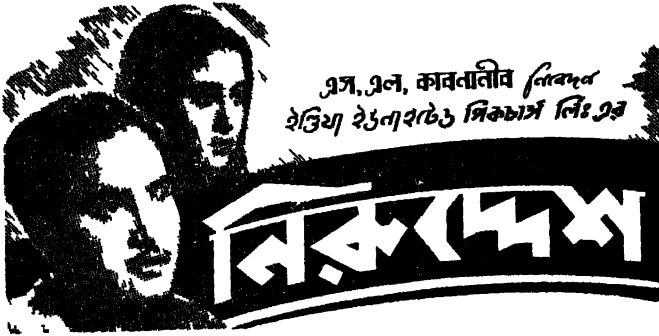
বাইরে থেকে অনেকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন হ'য়ে উঠবে—কিন্তু মাঝে মাঝে অথবা দু' একবারও যাঁরা রূপ মঞ্চ কার্যালয়ে পদার্পণ করেছেন— তাঁরাই বিশ্বাস করবেন, পাঠক সাধারণের কাছ থেকে কি পরিমাণ চিঠি পত্র সম্পাদকের দপ্তরে আসে। সম্পাদকীয় দপ্তরের চিঠি পত্রাদি গুছিয়ে রাখবার জন্য প্রথম মোটা ফাইল এর ব্যবস্থা করা হয়। একটার পর একটা ফাইল এক এক সপ্তাহে স্তূপীকৃত হ'তে থাকে। তখন ডাকবিভাগের মত করা হ'লো—বহু থাক সমন্বিত আলমারী। তাতেও কুলিয়ে ওঠা গেল না—বড় বড় ক্যানভাসের ব্যাগও ব্যবহার করতে হ'লো। আর ২।৩ দিন যদি আমার টেবিল থেকে চিঠি পত্রগুলি সরিয়ে না রাখা যায়, টেবিলের যা অবস্থা হ'য়ে ওঠে, তা সত্যই অবর্ণনীয়। রূপ মঞ্চ সুন্দরের পূজারী কিন্তু তার সম্পাদকের টেবিলের অবস্থা দেখে বহু শিল্প পূজারীরাই সরস টিপ্পনী না কেটে পারেন না। কিন্তু তবু ভাল লাগে—ভাল লাগে আমার এমনি অগোছাল—স্তূপীকৃত চিঠি ও কাগজপত্রের মাঝে বসে লিখে যেতে। শুধু ভাল লাগাই নয়—এই পরিবেশের মাঝে বসে লেখা যেন অভ্যাসেই দাঁড়িয়ে গেছে। চিঠি পত্রের সংখ্যাধিক্য রূপ মঞ্চের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও বিশেষ করে বর্তমান বিভাগটির প্রতি পাঠক সাধারণের উত্তরোত্তর আকর্ষণ বৃদ্ধির পরিচয়ই দেয়। এবং এতে রূপ মঞ্চের সম্পাদক হিসাবে আমারই সবচেয়ে বেশী গৌরবান্বিত ও আনন্দিত হবার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আনন্দকে উপভোগ করতে পাচ্ছিনা—আমার মন একে কোনমতেই মেনে নিতে চায় না। বরং গভীর বেদনার ঝংকারের সংগে সংগে মনের মাঝে এই প্রশ্নই বার বার জেগে ওঠে: এতদিন যে আন্তরিকতা দিয়ে রূপ মঞ্চের সেবা করে আসছি, তা কী সবই ব্যর্থ হ'লো। যে পাঠকসাধারণকে এক সুউচ্চ আসনে বসিয়ে আমার সম্পাদকজীবনে একমাত্র নির্দেশক বলে নির্বাচন করে গৌরব বোধ করেছি—সেই নির্বাচন কী ভুলরূপেই দেখা দেবে? ফুলের সৌরভ ও মাধুর্যের মহিমায় কী তাঁরা আমার আশার পথকে উজ্জ্বলতর করে তুলবেন না? বাংলা চিত্র ও নাট্যের উন্নতির জন্য আমি বা রূপ মঞ্চ কোনদিনইত চাতকের দৃষ্টি নিয়ে কর্তৃপক্ষের দিকে চেয়ে থাকিনি! রাক্ষসপুরীর নিভৃত কক্ষে সুপ্তা রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাবার সোনার কাঠি যে বাঙ্গালী চিত্র ও নাট্যামোদীদের হাতে। একথা এতদিনও যেমনি বিশ্বাস করে এসেছি—আজও তেমনি করি। কিন্তু আজ যেন সে বিশ্বাসের গ্রন্থি ধীরে ধীরে শিথিল হ'য়ে আসছে—সম্পাদকের দপ্তরে পাঠক পাঠিকাদের লিখিত চিঠিপত্রাদি নাড়াচাড়া করতে করতে। তবু একথা এখনও বিশ্বাস করতে মন চায়না—যে, চিত্র বা নাটকের উন্নতির চাবিকাঠি জনসাধারণের হাতে নয়। রূপ মঞ্চের প্রথম আবির্ভাব থেকে এই কথাটাই ঢক্কা নিনাদে প্রচার করতে চেয়েছি—যে, চিত্র ও নাট্যজগতের উন্নতির চাবিকাঠি আমাদেরই অর্থাৎ জনসাধারণের হাতে। আমাদের অনেকে নিজেদের এই শক্তি সম্পর্কে আজও অবহিত হ'য়ে উঠতে পারেন নি। তাহলে এতদিনের সমস্ত প্রচেষ্টাই কী আমাদের ব্যর্থ হ'লো? সম্পাদকের দপ্তরে লিখিত চিঠি পত্রাদি উলটে এই ব্যর্থতার কথাই যে বার বার মনে হচ্ছে। এই ব্যর্থতার কথাই আমাদের সম্মুখের ক্ষীণ আলোক শিখাকেও নির্বাপিত করে দিতে উদ্যত হ'য়েছে। সপ্তাহে ৫০০।৭০০ চিঠি সম্পাদকীয় বিভাগে আসে—তার প্রতিটি চিঠিই আমি পড়ি—মনোযোগ দিয়ে পড়ি। কিন্তু এমন চিঠি খুব কমই পাই—যার ক্ষীণ ছ্যুতিও আশার ইংগিতে আমার মন ভরিয়ে
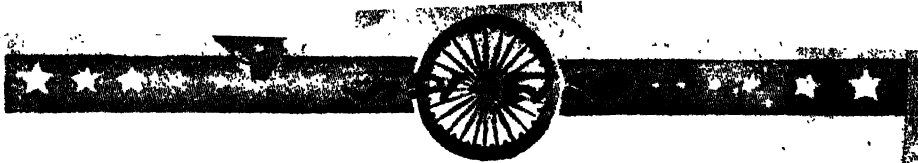
তোলে। বেশীর ভাগ চিঠি পত্রই বাংলা ছবি ও নাটকের মত পুনরাবৃত্তি ও সস্তা কৌতূহলে পরিপূর্ণ। অভিনেত্রীর স্বামীর নাম কী—অমুক অভিনেত্রীর আবার বিবাহ হ'লো কার সংগে—তিনি কী করেন—অমুক অ কী অমুকের আত্মীয়—অমুক অমুক অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের পর পর সাজিয়ে দিন। অমুক অভিনেতা বা অভি ঠিকানা কী—আমি তাঁদের সংগে পত্রালাপ করতে চাই—আমি অমুক অভিনেত্রীকে মা—দিদি বা অনুরূপভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। শিল্পীদের সম্পর্কে পাঠকসাধারণের কৌতূহলকে আমি অস্বীকার করিনা। যাঁদের রূপালী দেখতে পাই—দেখতে পাই মঞ্চ গৃহে বাস্তবদৃষ্টির সামনে—তাঁদের সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানবার ইচ্ছা মনে জাগে পাঠকসাধারণের এই কৌতূহল মেটানোর জন্যই ত ভার দেওয়া হয়েছে শ্রীপার্থিবকে। এবং তিনি প্রতিমাসেই এক একজন শিল্পী সম্পর্কে যতটুকু জানাবার প্রয়োজন, তা জানিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া বর্ত্তমান বিভাগেও আমি যথাসা কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আজকের এই সমস্যা কণ্টকিত জীবনে সস্তা কৌতূহ ী হবে সবচেয়ে বড়? না সেই সমস্যা সমাধানে আমাদের তৎপর হ'য়ে ওঠাই উচিত?

াল নাটক বা ছবি কেন হয়না—কী কী প্রতিবন্ধক রয়েছে তাঁর মূলে—সে প্রতিবন্ধকগুলি কী ভাবে দূর হতে পারে—আজ পাঠকসাধারণকে সমস্ত সমস্যাগুলি এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে বিচার করে—সমাধানের ইংগিত বে। এই সমাধানগুলি যে নির্ভুল হবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। হউক না ভুল—এমনিভাবে প্রতিজনের ক্তি যদি বাংলা নাটক ও চিত্রের উন্নতির পথানুসন্ধানে নিয়োজিত হয়—ভুলের মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্য একদিন আ বিষ্কার করতে পারবো। তখন বুক ফুলিয়ে কর্তৃপক্ষস্থানীয়দের বলতে পারবো—এই পথ—এই পথে চলো। আজ দর্শক ত আর বিশ বছর আগেকার দর্শক নন—যখন প্রেক্ষাগৃহের মালিকদের চাবুকের আঘাত বুক পেতে নিয়েও করতেন একখানা প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করতে। যখন ছায়াচিত্র এক ভৌতিক কাণ্ডকারখানা বলে মনে বিস্ময় জাগা আজকের দর্শক ছবির মতই মূক থেকে মুখরা হ'য়েছেন—তাঁদের অজ্ঞত্ব অনেকখানি ঘুচেছে—রূপালী পর্দার কুমারীর জন্ম রহস্যও তাঁদের অনেকের কাছে উদ্ঘাটিত। তাই অবাস্তর কোন কথা বলে বা অবাস্তর কিছু বেশন করে যদি কর্তৃপক্ষরা নিজেদের তহবিল ফাঁপিয়ে তুলতে পারেন—সে জন্য দায়ী কর্তৃপক্ষ নন—দায়ী সাধারণই। গত সংখ্যার রূপ-মঞ্চেও পাঠকসাধারণকে আত্মসচেতন হ'য়ে উঠবার জন্য আমি আবেদন জানিয়েছিলা বর্ত্তমান সংখ্যায়ও তার পুনরাবৃত্তি কচ্ছি। বর্ত্তমান বিভাগটি নিছক কৌতূহল দমনের মাধ্যম বলে বিবেচনা না ক আমাদের বুদ্ধির বিকাশ ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের মাধ্যম হ'য়ে উঠুক।

আমাদের দর্শকমন যে কী চায়, সে চাহিদা সম্পর্কেও আমাদের নির্দিষ্ট কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। গত সংখ্যার রূপ- 'কোন ধরণের কাহিনী পাঠকসাধারণ পছন্দ করেন এবং কেন করেন'—এ বিষয়ে প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় সাড়া দিয়ে যাঁরা প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন—তাঁদের বেশীরভাগ প্রবন্ধই বর্ত্তমান চিত্রে মত ফাঁকা আওয়াজে পরিপূর্ণ। নির্দিষ্ট কোন অভিমত অনেকেই ব্যক্ত করতে পারেন নি। তাছাড়া—পাঠকসাধা কাছ থেকে এবিষয়ে যে পরিমাণ সাড়া পাবো বলে আশা করেছিলাম, তা পাইনি। তাই গত সংখ্যায় ৩০শে চৈত্রে তারিখ নির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল—তা পরিবর্ত্তন করে পরবর্তী ঘোষণা না করা পর্যন্ত উক্ত প্রবন্ধ পাঠাবার সময় উন্মুক্ত হ'লো। আশা করি পাঠকসাধারণ এ বিষয়ে অধিক সংখ্যায় সাড়া দেবেন। বহু ক্লাব বা অনুরূপ ধরণের সভ্যে আমরা আবেদন জানাচ্ছি—তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও অনুরূপ প্রবন্ধ পাঠাতে।

শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু (ভ্যারাইটি ফিল্মস্, ৬৮, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা)

প্রিয় কালীশবাবু, রূপ-মঞ্চ চিত্র ও নাট্য জগতের একটা নামকরা সাময়িক পত্রিকা। আপনিত চিত্রশিল্প ও না সম্পর্কে বহু আলোচনা করে থাকেন। আপনার মূল্যবান আলোচনা শিল্পপতিদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে কিনা